



১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা

আম্বাভ-১৩৮১

দ্বাদশ বা

সুরভিত
আয়ুর্বেদার কেশোভ

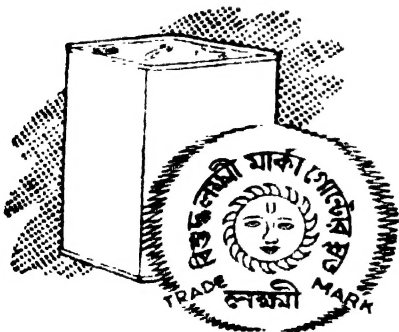
Sajanikanta Das
Collection

জুজেন অর্ ইণ্ডিয়া

BARU BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
ACC. NO. 4741
DATE 18-6-2002

চাই স্বাস্থ্য-চাই শক্তি...

মনুষ্যত্বের
পূর্ণ - বিকাশের
প্রথম সোপান
স্বাস্থ্য ও শক্তি
...
লক্ষ্মী ঘি
ব্যবহারে
উভয়ই সম্ভব



অন্ধ শতাব্দীর উপর
সুপরিচিত ও সমাদৃত
বিশুদ্ধ—স্বাস্থ্য—পুষ্তিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

চন, বক্তবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

বি. সরকার এণ্ড সন্স

লিমিটেড

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নিম্নোক্ত
আমাদের দোকান সহিত আমাদের সান্নিধ্য আছে, এরূপ অনেকগুলি নুতন দোকান হইয়াছে তাহার কোনটিকে
আমাদের দোকান বলিয়া গ্রহণ না হয় এজন্য আমাদের দোকান "বি. বি. হাউস" নামে অভিহিত ও
রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে। একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে
এক অর্ডার দিলেও অতি কালের সহিত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে
সর্বত্র গহনা পাঠাই। পুরাতন সোনা বা রূপার বাজার-দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া
নুতন গহনা দেওয়া হয়। জগৎব্যাপী অর্ধ-সকট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত
গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটাগলের জন্য পত্র লিখুন।



১৩১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকতা

আমাদের আর কোন
ব্রাঞ্চ দোকান নাই।

আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক্ গহনার দোকান করেন নাই।



RENOWNED JEWELLER
TASTE AND NOVELTY:

D. N. ROY & BROS.
Manufacturing Jewellers.

YOUR KIND
PATRONAGE
SOLICITED.

CATALOGUE SENT FREE
ON APPLICATION.

153-5, Bowbazar Street, Calcutta.
(Near Sealdah Church)

আশ্চর্য ঔষধ

গাছ-গাছড়া কাত ঔষধের বিষয়কর কমতা

(নিম্নল প্রমাণ হইলে ১০০ টাকা খেসারত দিব)।

‘পাইলস কিওর’

যন্ত্রণাদায়ক বা দীর্ঘকালের পুরাণো সর্সপ্রকার অর্শ—
অন্তর্কলি, বহির্কলি, শোণিতস্রাবী ও বলিহীন অর্শ সমস্ত
আরোগ্য করে। সেবনের ঔষধ মূল্য ২ টাকা, মলম ১
টাকা।

‘গনোরিয়া কিওর’

পুরানো বা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক গনোরিয়া সারাইয়া হতাশ
ব্যক্তিকে নবজীবন প্রদান করে। বয়স বা রোগের অবস্থা
যেহেতুই হউক না কেন, সর্স অবস্থারই কাজ দিবে।
একদিনে যন্ত্রণা কমায়, পূজ বন্ধ করে, যা সারায়, প্রস্রাব
সরল করে এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্ত উপদ্রবের উপশম
করে। মূল্য ২ টাকা মাত্র

‘ডেক্‌নেস্‌ কীওর’

সর্সপ্রকার কর্ণরোগ, শ্রবণশক্তি হানি ও তেঁ। তেঁ।
শব্দের চমৎকার ঔষধ। পূজ পড়া ও কাণের বেদনা প্রভৃতি
সারায়। শ্রবণশক্তি বাড়ায় ও শ্রবণশক্তি হানি সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য করে। মূল্য ২।

‘পরীক্ষিত গর্ভকারক যোগ’ (বক্ষাৎ দূর করার ঔষধ)

জীবনব্যাপী বক্ষাৎ দূর করিয়া হতাশ নারীকে সন্তান
দেয়। সর্সপ্রকার স্ত্রীরোগ, বিশেষতঃ মৃত-বৎসায় উপকার
দেয় এবং সন্তান-সন্তুতিকে দীর্ঘজীবী করে। এই ঔষধ
ব্যবহারেই ব্যক্তিদের রোগের বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইতে
অনুরোধ করা যাইতেছে। মূল্য ২ টাকা।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

এই ঔষধ মাত্র কয়েকদিন ব্যবহার করিলে শ্বেতকুষ্ঠ
ও ধবল একবারে আরোগ্য হয়। যাহারা শত শত
হাকিম, ডাক্তার, কবিরাজ ও বিজ্ঞাপনদাতার চিকিৎসায়
হতাশ হইয়াছেন, তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা এই
তয়াবহ রোগের কবলমুক্ত হউন। ১৫ দিনের ঔষধ ২০ টাকা।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ঔষধ। ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিলে
পুনরায় সন্তান হইবে। মাসে ২০ বার এই ঔষধ ব্যবহার
করিতে হইবে। এক বৎসরের ঔষধের দাম ২ টাকা।
সমস্ত জীবন সন্তান বন্ধ রাখার জন্য এক বৎসরের ঔষধ ২
টাকা। স্বাস্থ্যের পক্ষে কতকর নয়।

স্বস্ত্রম পিল

সন্ধ্যায় একটা বড়ী সেবনে অক্লান্ত আনন্দ পাইবেন।
ইহা হারানো পৌরুষ ফিরাইয়া আনে ও অবিলম্বে ধারণশক্তির
সৃষ্টি করে। একবার ব্যবহারে ইহার আশ্চর্য্য কমতা কখনো
বিস্মৃত হইবেন না। মূল্য ১৬টা বড়ী ১ টাকা

পাকা চুল

কলণ ব্যবহার করিবেন না, আমাদের আয়ুর্কৌদর সুগন্ধি
তৈল ব্যবহার দ্বারা পাকা চুল কৃষ্ণবর্ণ করুন। ৬০ বৎসর
বয়স পর্যন্ত উহা বজায় থাকিবে। আপনার দৃষ্টিশক্তি
বাড়িবে এবং মাথা ধরা আরোগ্য হইবে। কয়েক গাছা চুল
পাকিয়া থাকিলে ২ টুকর শিশি ও বেশী পাকিয়া থাকিলে
৩ টাকার শিশি এবং প্রায় সব চুল পাকিয়া থাকিলে ৫
টাকার শিশি ক্রয় করুন। নিম্নল হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত
দিব।

আশ্চর্য্য গাছড়া

কেবলমাত্র চোখে দেখিলেই অবিলম্বে সাংঘাতিক রকমের
বৃত্তিক, বোলতা ও মোমাছির দংশনজনিত বেদনা সারে।
লক্ষ লক্ষ লোক এই ঔষধ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছে। শত
শত বৎসর রাখিয়া দিলেও ইহার গুণ নষ্ট হয় না। মূল্য—
প্রতি গাছড়া ১ টাকা এবং একত্রে তিনটা ২০ টাকা মাত্র।

বাবু ব্রজেনকন সহায়, বি-এ, বি-এল, এডভোকেট,
পাটনা হাইকোর্ট—আমি ‘বৃত্তিক দংশন ঝাটানোর’ গাছড়া
ব্যবহারে খুব ফল পাইয়াছি। একটা ছোট মূলে শত
লোক আরোগ্য হয়। এই গাছড়া নির্দোষ এবং অ
প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বৈদ্যরাজ অশ্বিন কিশোর রায়

আয়ুর্কৌদ বিজ্ঞানদ ভিষক-রত্ন

৫৩নং পোঃ অঃ কার্টরী সরাই (গঙ্গা)

IN THE MAKING OF
A NATION—
TAKES THE LEAD
“ERATONE”

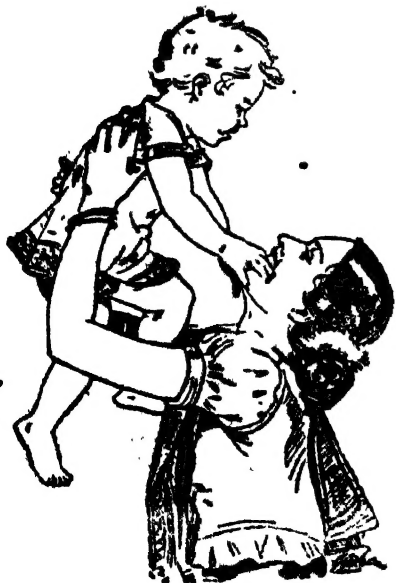
The Ideal Nerve Food
&
Reconstructive Tonic.

Eastern Research Assn. Ltd.,
CALCUTTA.

Stockists :
A. C. COONDU & CO.,
RIMER & CO., CALCUTTA.



এক চুমুকেই বোঝায়
টসের চা



ডোখের বালায়ত

সেবনে

দুর্বল ও শীর্ণকার শিশুরা

অসুস্থদের মধ্যেই

স্বাস্থ্য পায়



BLOCKS
DESIGNS
PRINTING
SLIDES
TAGS



বর্তমান কালে যুদ্ধ
জয় ও ব্যবসায়
উন্নতির এক মাত্র
উপায় সুন্দর ব্লক
ও নিখুঁত প্রিন্টিং

আমরা অভিজ্ঞ কারিকর
দ্বারা লাইন, হাফটোন,
কালার, ফ্রিও, ইলেকট্রো,
সেলাইড, ডিজাইন এবং
কালার প্রিন্টিং করিয়া
থাকি।... ..

DAS GOOPTA & CO

PROCESS ENGRAVERS. COLOUR PRINTERS. PHONE 8.8.5437

12-HURTOODKI BAGAN LANE, CALCUTTA



Dutta & Co.


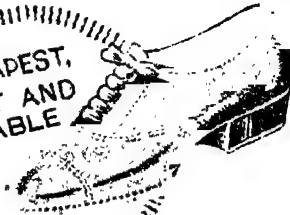
QUALITY SHOE MAKERS

STOCKISTS:
CAWNPORE
—AND—
AGRA SHOES.

16/1, SHYAMACHARAN DEY STREET,
COLLEGE ST. COLLEGE ROW & SHYAMACHARAN DEY ST, JUNG.
CALCUTTA.

G.
D.
N.

CHEAPEST,
BEST AND
DURABLE

বুকের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শাস্তি

সকল অবস্থাতেই

আপনাদের

সেবা করিতে

প্রস্তুত

—হেড অফিস—

৩ ও ৪, হেরার ক্রীট,
কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ৬১১

—শাখাসমূহ—

বড়বাড়ার, ভানুবাড়ার, হাওড়া, [কাল-
কাতা], বেঙ্গল চাকি, কালিম্পাঙ্গ, শিলি-
গুড়ি, কলকাতা, শান্তিপুর, রাণাঘাট,
হাজরাহী, দালী, বগুড়া, তালুকদার
হাওড়া ও তালুক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম. কে. চক্রবর্তী

Jagannath Pramanick **& BROS.**

TAILORS
&
OUTFITTERS



DEALERS OF

GAUZE
&
BANDAGES

16, DHARAMTOLLA STREET,
CALCUTTA.

গোল্ডে সং ডাঙউ

বিত্তক হরিচন্দনসার সহযোগে
উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত
নূতন ও অভিনব সাবান



ফোন : ক্যালকাটা ২৭৬৭

গ্রাম : "জনসম্পদ"

ব্যাঙ্ক অব কালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত-১৯৩৫

হেড অফিস

৩ নং ম্যাংকো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীলফামারী, মালদহ, শিমলিয়া, কক্সবাজার, শান্তিপুর, কর্নেলগোলা, বাজীচক, তমলুক, ডোমার, আনন্দপুর, পুরী, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, বোলপুর, কোলাহাট, জামালপুর (মুন্সেং), চাকুলিয়া ও বেরিলী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ডাঃ এম, এম, চাট্টোপাধ্যায়

Gram—"SUCOO"

Phone—CAL. 5733.

Balsukh Glass Works

Manufacturers of

Quality Glass Ware

Spirit Bottles

A SPECIALITY.

S. R. DAS & CO.,

Managing Agents.

Factory :

4B, Howrah Road,

HOWRAH

Office :

7, Swallow Lane,

Calcutta.

রেডকো **সুবাসিত**
ক্যাষ্টার অয়েল

কেশ পরিচর্যায় অপরিহার্য

নিত্য ব্যবহারে ঘন কেশরাশি মস্তকের
শোভা বৃদ্ধি করে

চিত্রাভিনেত্রী

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা বলেন—

“সুস্বাদি স্নো চমৎকার”

বেঙ্গল ড্রাগ ও কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

বাগবাজার—কলিকাতা

THE BEST SPECIFIC

FOR

Malignant Malaria

MALOVIN

**The Ideal Combination of
Eastern & Western
Therapy.**

Eastern Research Assn. Ltd.

CALCUTTA.

THE CENTRAL GLASS INDUSTRIES LTD.

Manufacturers of

CHIMNEYS, BOTTLES, PHIALS, GLASSES, TUMBLERS,
JARS and various kinds of quality glass-ware.

The Company that gives you goods by latest machines.

CITY OFFICE:
7, SWALLOW LANE,
CALCUTTA.

WORKS:
P. O. BELGHURIA,
24, PARGANAS.

আশ্চর্য বনৌষধি

FIRE

MARINE

হিমালয়ের দিবা বনৌষধি “জলন্ত” হস্তে ধারণ করিলে
‘ধারণাশক্তি’ বেচ্ছাধীনরূপে বর্দ্ধিত হয়। প্রমেহ, পুরুষত্ব-
হীনতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার ত্রুটিলতা দূর করিয়া ধারণাশক্তি
বেচ্ছাধীনরূপে স্থায়ী করিতে “জলন্ত” অধিতীয় ও অব্যর্থ।
যতক্ষণ “জলন্ত” হস্তে ধারণ করা থাকিবে ততক্ষণ কোন-
মতেই ‘শক্তি’ হ্রাস হইবে না। এই অকৃত জ্বাশক্তি
দর্শনে মুগ্ধ হইবেন। কখনও ব্যর্থ হয় নাই। ইহার
দ্বারা আপনি বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।

মূল্য—৪।০ টাকা, ডাকব্যয় ১।০ আনা।

নববর্ষের উপহাররূপে ডাকব্যয় সহ ৩ টাকা।

—ঠিকানা ইংরাজীতে লিখিবেন—

HIMALAYASRAM

POST BOX 172 DELHI

THE Concord OF India

INSURANCE COMPANY LIMITED.

(Incorporated in India)

Accident

Fidelity

8, CLIVE ROW, CALCUTTA.

তত্ত্বাল, তত্ত্বাল

ড্রাম ১০ তিন আনা

দি
ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক
ফার্মাসি

তত্ত্বাল, তত্ত্বাল

ড্রাম ১০ পরস

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধালয়

বিশুদ্ধ আমেরিকান তরল ঔষধ ৩০ শক্তি পর্যন্ত ১।০ ও ২০০ শক্তি ১।০ পরস, বড়িতে (সিউলস-এ) ২০০ শক্তি পর্যন্ত ১।০ হই আনা ও ১।০ পরস ড্রাম।

সেতু কাস্টার বাস, চান্দার বাস, শিশি, বর্ক, হুগার, সবিউলস, চিকিৎসা-পুস্তক ও বাবজীর সরঞ্জামাদি বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

পরিচালক—টি. সি. চক্রবর্তী, এম্-এ, ২০৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশেষ জটীয়া :—আমরা উৎকৃষ্ট বাছাই কর্ক ও ইংলিশ শিলিতে সর্বদা ঔষধ দিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নাবল ৩ (খেলার)
 জুয়েলার্স ২৩ ডায়মণ্ড মার্কেটস
 ১৬০-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

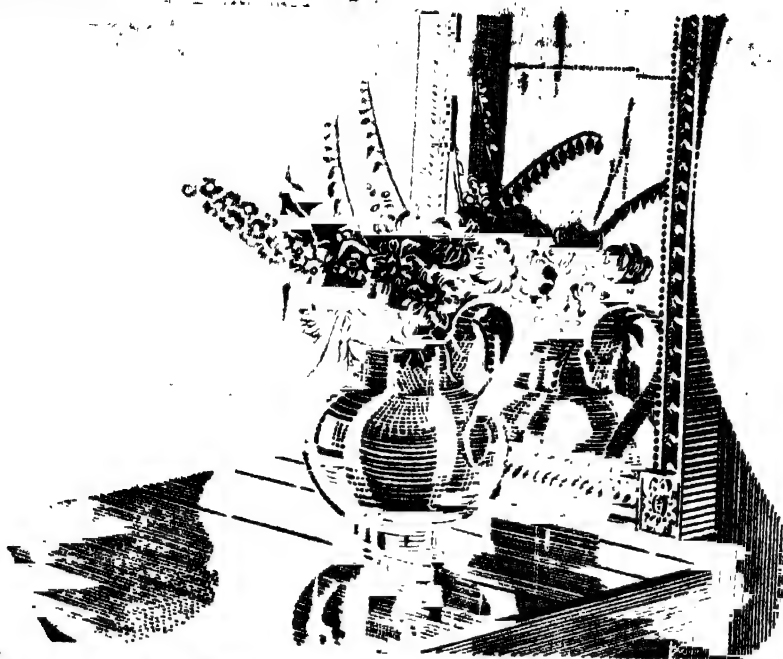
নূতন ডিজাইন ও নূতন সামগ্রী
 ছোঁকা।] অবশ্যই নক [মুক্তা
 আমাদের আশীর্বাদে গুহে গুহে
 পরাগণ করিয়া
 আমাদের এই কল্যাণ ভবা
 শিল্পসাধনা সার্থক হইয়াছে কি না
 দেখিতে অনুরোধ করি।
 মণি] [অদ্বৈত]
 আধুনিক নৈসর্গিক সমাজ
 মুক্ত হইয়াছে।

১৬০-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

বিশ্বকি বাম্বাফুণ

বিশুদ্ধ ও সরস
 ভিষ্কানী সহ
 বঙ্গীয় সংস্করণ

৬০ খণ্ডে সমাপ্ত
 প্রতি খণ্ডের মূল্য—এক টাকা মাত্র।
 মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
 ৯, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা।



TO GET FAITHFUL REPRODUCTION

A nice picture, True-To-Original solely depends on better blocks and neat printing. So many persons take excellent care of their advertisement pictures, but neglect the block-making and printing. To get better result of your advertisement campaign, you should rely on our skilled men who are always ready to help you with their expert advice and will do justice to the original in reproducing it to its proper tone value, depth of etching, neat but bright and charming prints.

Make us responsible for all your process works and colour printings



TELEPHONE
B.B. 601

REPRODUCTION
PROCESS *Syndicate* COLOUR
ENGRAVERS PRINTERS
71 CORNWALLIS STREET CALCUTTA

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মূলধন			
অবিক্রীত	...	২৫,০০,০০০	লক্ষ টাকা
বিালকৃত	...	১২,৫০,০০০	লক্ষ টাকা
গ্রহীত	...	১২,৫০,০০০	লক্ষ টাকা
আদায়াকৃত	...	৬,৪০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক
কার্য্যকরী তহবিল	...	৭৫,০০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে বার্ষিক শতকরা

১০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইয়াছে :

পর্য্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা
হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।



নৃত্যকুণলা ছায়া-
চিত্রশিল্পী শ্রীমতী
সাধনা বসুর অনিন্দ্য-
সুন্দর অভিনয় ও
নৃত্য পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে তাঁহার
অঙ্গের নিখুঁৎ স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে,
এবং আমাদের গর্ব
এই যে, প্রতি রাতে
নিয়মিত দু'ওটীন ক্রীম
বাবচাষের কলে ই
তাঁহার নিখুঁৎ স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ এখনও
অক্ষান আছে।

OATINE CREAM is indispensable for
my toilet I have been using it for a
long time, and find it delightful,
and extremely necessary to preserve
a perfect skin.

Sadhona Bose

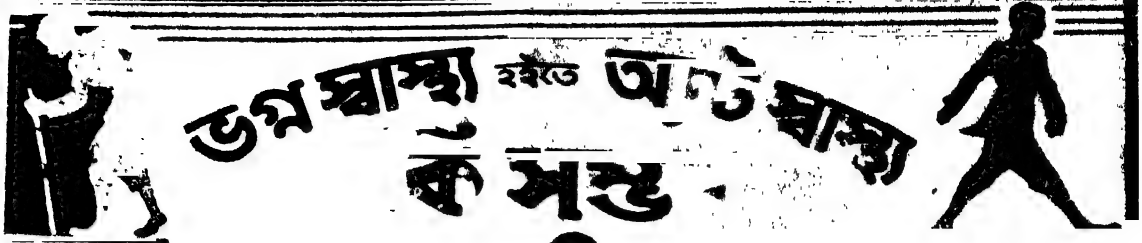


Oatine

CREAM

SNOW

for...
massages
for...
protection



সম্ভব-যদি আপনি
প্রতি ২ সপ্তাহ
করেন



কল্মাটার
কল্মাটার নাম
কল্মাটার মূল্য

কল্মাটার আয়ুর্বেদ ডবল
কল্মাটার ৩০ দিন
২২৩, চিৎর জন এভিনিউ, কলিকাতা

আকল্যাণ



কোম তৈল
কলিকাতা

প্রাণের আনন্দ
পূর্ণ স্বাস্থ্যেই
সম্ভব!

যদি আপনি
ম্যালেরিয়ার হাত
হইতে মুক্তি চান
ম্যালোরিয়া
শ্রেষ্ঠ মারক

অমৃত
শ্রী কলকাতা
কলিকাতা
কলিকাতা

কম্পাণ্ড
আম্বার্কেন্ড ডবন
কলিকাতা প্রাসাদ
২২৩ টিওরজব এডমিউ
কলিকাতা

তনু-দেহের রূপ-লাবণ্যকে
মনোহর করে তোলে

মার্গো সোপ

মোহন সুগন্ধ-যুক্ত নিমের উদ্ভিজ্জ টয়লেট সাবান
শীতের রক্ষতা দূর করে দেহের মন্থনতা আনে।

কাত্তা

ভাবনী

সহু-কুট-পুষ্প-সুবাসের মতো। এই গন্ধ নির্ঘাস
সুন্দরীর বেশকালে কি যেমন এক মদির-মকরনের
মাধুর্য্য এনে দেয়।

এই সুরভিত তুবার-শ্রী সুন্দর মুখখানিকে আরও
সুন্দরতর করে তোলে লাবণ্যের পরশ দিয়ে।

ক্যালকাটা কোমক ল ৪ কলিকাতা



রক্তোর ^{কর্ড} কার্ডের অয়েল

ফ্রান্স রস এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা



গল্প ও উপন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—

টেক-ভা-লী (সচিত্র ১ম সং) ৩-

বর্ষায় (সচিত্র ২য় সংস্করণ) ৩-

বরষাক্তী (সচিত্র ২য় সং) ২১০

নীলাঙ্গুরী (৩য় সংস্করণ) ৩-

বিভূতিবাবুর প্রত্যেকটি গল্প হান্ত-কৌতুক রস-বাক্যপূর্ণ।

পরিচিত জীবনের ছবি রঙীন ভুলিতে আঁকা।

প্রত্যেকটি সুখপাঠ্য।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ—

সমর্পণ ১১০

অন্তর্ভাগ্য ১১০

বহু নিম্ন এবং বহু প্রশংসা একটি সঙ্গে লেখিকার ভাগ্যে

জ্বলিছে, অগচ্চ নিকাংকারী এবং প্রশংসাকারী

উভয়েই তাঁর লেখা সাংগ্ৰহে পড়েছেন।

শ্রীতারাপদ রাহা—

ষোগিনীর মার্গ ১১০

গল্প জমানোর অসাধারণ ক্ষমতা এই লেখকের এই চিত্রা-

কর্ষক কাহিনীটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

কৌতুক নাট্য

শ্রীপরিমল গোস্বামী—

দুঃস্বপ্নের বিচার (২য় সং) ১১০

ঘৃণ (সচিত্র ১ম সং) ২-

উজ্জল কৌতুক আর প্রচুর হাস্য পরিমলবাবুর বৈশিষ্ট্য।

‘দুঃস্বপ্নের বিচার’ ২য় সং-ই অনেক নতুন জিনিষ যোগ

করা হইল—১ম সং বাতিল।

‘ঘৃণ’তে বহুপ্রশংসিত ৮টি ব্যঙ্গ নাটক।

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত—

মহামহত্তর ৩-

ডাক্তারের পট-ভূমিকায় দশ জন খাত লেখকের লেখা

বায়েটি গল্পের সম্বলন। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : “বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ”

ডঃ শ্রীমাদ্রামানন্দ মুখোপাধ্যায় : “অভিনন্দন জানাই”

গল্প ও উপন্যাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী—

শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২১০

শৃঙ্খল (২য় সং) ২১০

মনের গহনে (২য় সং) ২১

সরোজকুমারের প্রথম নাটক—

হালদার সাহেব ২-

মধুর, মর্মস্পর্শী, প্রত্যেকটি গল্প, উপন্যাস বাংলা-

সাহিত্যের এক-একটি সম্পদ।

তাঁর নাটকখানাও পড়বেন।

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস—

অনবগুপ্তিতা ২১০

তারি একদিন ভালোবেসেছিল ১১০

আধুনিক ব্যক্তিত্ব সচেতন মনের পক্ষে যতখানি সাহস

থাকা দরকার, ততখানি সাহসের সঙ্গে আকর্ষণীয়

ভাষায় লেখা এই উপন্যাসগুলি পড়ুন।

অল্প দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের—

বাংলা কবিতার ছন্দ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর—

ক্ষুধা

মুখোপাধ্যায়ের—

বাংলা ও মিশ্রিলার বিচিত্র পট-ভূমিকায়

নতুন টেকনিকে লেখা প্রবন্ধ উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী

শতাব্দীর গ্রন্থমালা

শ্রীবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

ভারতের ঐতিহ্য ১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ—

লোকবাহুল্যের আভাস ১১

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়—

ইস্কাইলাল ২১০

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—

আধুনিক আবিষ্কার ২১০

জে না রেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা



অলঙ্কার নির্মাণে - ভিন্ন ভিন্ন
মৌলিক, মৌলিক, কঠিন, ধাতু
বর্ণের বিভিন্নতাই আলাদা
বৈশিষ্ট্য। আলাদাভাবে মো
টের কারখানায় প্রস্তুত এক
টিম বর্ণের মাঝে মাঝে
ল্যান্সের অলঙ্কার ও রৌপ্যের
বাসমাণি সর্বত্র বিক্রয়ার যত্ন
থাকে এখন অর্থাৎ বিশেষ করে
সময়ে লঙ্কার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
করিয়া দেওয়া হয়। অলঙ্কারের
অর্থাৎ টি পি ডাকে পাইল
কম। পুস্তকাদি বর্ণের পরিবর্তে
প্রধান অলঙ্কার পাওয়া যায়।
কাজের চূড়ান্ত যত্নের ওপর
এবং সর্বোচ্চ অলঙ্কারের
প্রাণ বা নীতি থাকে।

এম বি সর্বকার সর্ব

সন এও সর্ব সর্ব সর্ব সর্ব সর্ব সর্ব সর্ব সর্ব

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাণ

কোট কলিকাতা



১৭০৭

বুধী



১২শ বর্ষ, ১ খণ্ড, ১ম সংখ্যা **বিষয় সূচী**

আষাঢ়—১৩৫১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
'শ্রীচূর্ণাপূজা'র প্রয়োজনীয়তা (৬)	শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	১৮৯	মর্শ ও কর্ম (উপভাস)	ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,	
উপভাসের উদ্ভব ও ভৎকালীন			আকবরের রাষ্ট্রসাধনা (প্রবন্ধ) এস. ওয়াজেদ আলি, বি এ	ডি-এল	৪৪
বঙ্গসমাজের গটভূমিকা			(কেণ্টাব), বার-এ্যাট-ল' ৫১		
(প্রবন্ধ) ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,			ক বি তা—		৬০
এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি ১			চিত্রলেখা	বাণীকুমার	
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপভাস) শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়		৫	মুন্দর ও মুন্দবের		
মিথ্যা অভিযোগ (প্রবন্ধ) শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত		১৩	অভিসারে	শ্রীশিববাসু চক্রবর্তী	
মাহুঘ ও পত্ত (গল্প) শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর		১৬	জীবন-বোমা	ডাঃ শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত,	
প্লেটোর সাহিত্যবিচার (প্রবন্ধ) ডাঃ শ্রীমুখোদচন্দ্র সেনগুপ্ত,				এম্-বি, ডি-টি-এম্	
এম্-এ, পি-আর-এস,			জীবনের চরে এত		
পি-এইচ-ডি ২৩			চোরাবালি	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	
ককাল (গল্প) শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু		২২	ছ'টি প্রাণ	শ্রীভবশচন্দ্র সেনগুপ্ত,	
বাংলাসাহিত্যে উপভাসশিল্প				কাব্যভীর্ণ	
(প্রবন্ধ) ডাঃ শ্রীমুনোমোহন ঘোষ,			অনুশোচনা	শ্রীমতিলাল দাশ	
এম্-এ, পি-এইচ-ডি ৩৮					

[২১ পৃষ্ঠা]

ইন্সিয়ার য়াল টি কা:
৪, রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট এল:

২ চরা ও পাইকারী খরিদারগণের
একমাত্র নিউ-যোগা প্রতিষ্ঠান



ফোন—কলি: ১৪৬৪, ১৪৫৫

গ্রাম—এরিওপলিস

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”

১২, চৌকসী স্কোয়ার কলিকাতা

—মূলধন—

অধিকৃত	২৫,০০,০০০	লক্ষ টাকা
গৃহীত	১৮,০০,০০০	লক্ষ টাকা
আদায়ীকৃত	১০,০০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক

—ডিভিডেণ্ড—

কার্য আরম্ভ করিবার তিন বৎসরের মধ্যেই আমরা অংশীদারদের নিয়োজিত অর্থের শতকরা ১৮ টাকা হিসাবে ফিরাইয়া দিয়াছি।

লাভ এবং নিরাপত্তার জন্য আমাদের

“স্থায়ী আমানত”

তহবিলে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন।

দুই বৎসরের জন্য শতকরা
৫ টাকা হারে
বার্ষিক সুদ দেওয়া হয়।

আমরা সকল প্রকার বাজার
চালু শেয়ার
ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য

আমাদের “মাসুলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” পাঠ করুন।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা-সংখ্যা পাঠান হয়।

বিষয়-সূচী-১২ পৃষ্ঠার পর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নির্দেশ	শ্রী আশুতোষ সারগাল, এম্-এ		কুলের জন্ম		
আগিও না	শ্রী হরেন বিদ্যাস, এম্-এ,		(পৌরাণিক গল্প)	শ্রী নাগরতন দাশ, বি-এ	৭০
	বারিষ্টার-গ্রেট-ল'		বাদের গ'য়ে জোর		
হে সারথি !	শ্রী দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়		আচে	শ্রী উৎকল মল্লিক, বি-এ	৮০
চতুঃপাঠী			কমান বর্ষের		
বাংলার কবিতা প্রবাদ	শ্রী অক্ষয় মুখোপাধ্যায়	৬৮	"লীলা পুরস্কার" ডঃ শ্রীমদেন্দ্রনাথ ঘোষ		৮১
ললিত-কলা (প্রবন্ধ)	শ্রী অশোকনাথ শাস্ত্রী	৮৮	বম্বেড'লিশ (গল্প)	শ্রী মালবিকা দত্ত, বি-এ	৮২
পদ্মার পারে একটি গাছ			গন (প্রবন্ধ)	শ্রী গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	৮৪
(কবিতা)	শ্রী রাইহরণ চক্রবর্তী,		অস্ত্র-পুর		
	এম্-এ, বি-টি, বিভাবিনোদ ৭১		ছহিতা ও অহহিত		
শিশু-সংসদ			পবিত্রন	কলৈক পূজী	৯২
উদয়ন কথা			শেখবাত্রা (গল্প)	শ্রী নীপা সেন, এম্-এ	৯৫
(ঐতিহাসিক চিত্র) প্রিয়দর্শী	৭২		বহিত (কবিতা)	শ্রী সুনীল ঘোষ	৯৮
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রী প্রিয়দাস দাশ	৭৮			[২৩ পৃষ্ঠা]

Sajanikanta Das

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

রক্ষস্রোশাকরভাষ্য—২ খণ্ড ১৫	ডাকার্ণব	৫১	ভায়দর্শন (১-৩ অধ্যায়)	১০১
বাস্তবিক-বাস্তব—প্র'তথ ১১	অধ্যাত্মবাস্তব—১ খণ্ড	১২১	শ্রীতর্ষাচিন্তামণি ৩ খণ্ড	১৪১
কৌলজ্ঞান-নির্ণয় (বৌদ্ধতন্ত্র)	দেবভাস্কর-গম	৫১	২য় খণ্ড ২১, ৩য় খণ্ড ১১	
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সংক্রমণী	বৃন্দাবনসত্য	১১০	রঘুবংশ ২ খণ্ড	৩১০
অভিনয়দর্শন	ভন্দোমজ্জবী	১	ঐ (হিন্দীভাষায়বাদ)	১১০
কাব্যপ্রকাশ	সাংগ্যতর্ষ-বৌমদা	১১০	চতুঃপদীপিকা	১১
মাহাত্ম্যভেদতন্ত্র	সামবেদসংহিতা ২ খণ্ড	১১০	ভায়দর্শন-নির্ণয়	৫
সন্তিপদাধী	ঐ খুল	১১	সুজ্ঞানীপিকা	৫১
ভায়দর্শন ও অদৈতসিদ্ধি	গাতিলগ্নহস্ত	১১১	নন্দিকেশ্বর-কাশিকা	১০
			তর্ষচিন্তামণি	যত্ন

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৯০, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা

বাংলা র গো র ব
বাঙ্গালীর নিজ স্ব

আর. বি. রোজ

নম্র

সুমন্থর গন্ধ-সৌরভে

গন্ধ নম্র

জগতে অতুলনীয়

মূল্য—ভিঃ পিঃ মাণ্ডলসমেত ২০ তোলা

১ টিন ৩১/০ ; ২ টিন ৬০ মাত্র।

ক্যালকাটা স্নাফ ম্যানুফ্যাক্ কোং

১৩৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

ন্যাস্ এণ্ড কোং

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক

বাইওকেমিক ঔষধালয়

১১২এ, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, শ্যামবাজার,

কলিকাতা

বিশুদ্ধ আমেরিকান তরল ঔষধ

ড্রাম ৬/০, ৬/১০

সেগুন কাঠের বাস, চামড়ার ব্যাগ, শিলি, কর্ক, সুগার,

গ্রবিউলস্, চিকিৎসা-পুস্তক ও যাবতীয় জিনিষ সরুদা

বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থী নী

বধিরের শ্রবণশক্তি ?

চিরতরে আরোগ্য—পুনরাক্রমের ভয় নাই

বধিরতা—অতি সহজ উপায়ে আশ্চর্যরূপে
পুনরায় শ্রবণশক্তি ফিরাইয়া আনা হয়। শ্রবণশক্তি যে
কোন প্রকার বৈকল্য ঘটুক না কেন, চিকিৎসার কারণ নাই।

গ্যারাণ্টিয়ুক্ত এবং প্রসিদ্ধ

এমানেল্ড পিলস্

রূপায়িত আউটলাইন ড্রপ (রেজিষ্ট্রিকৃত)

(একত্রে ব্যবহার্য) পূর্ণমাত্রা—২৭৮/০ আনা।

পরীক্ষামূলক চিকিৎসা—৭১/০ আনা।

শ্বেতী বা ধবল

শরীরের সাদা সাদা কেবলমাত্র ঔষধ সেবন দ্বারা

অত্যন্তপূর্ণ উপায়ে আরোগ্য করিবার এই ঔষধটি

আধুনিকতম উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে।

দৈব ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষিত

লিউকোডানমাইন (রেজিষ্ট্রিকৃত)

প্রতি বোতল—২৫৮/০ আনা মাত্র।

ইতিমধ্যেই ইহার খ্যাতি দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। বংশানুক্রমিক অথবা যে কোন প্রকার

প্রবল হউক না কেন, এই ঔষধ সেবনে

আরোগ্যের গ্যারাণ্টি আমরা স্পষ্টসহকারে দিয়া থাকি।

আজমা-কিউর

আপনি চিরদিনের মত হাঁপানীর হাত হইতে

মুক্তি চান ? আপনি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু তাহাতে রোগ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছে মাত্র।

আমি আপনাকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করিব ; আর

পুনরাক্রমণ হইবে না। বতদিনের পুরাতন যে কোন

প্রকার হাঁপানী ব্রঙ্কাইটিস্, অর্শ, ফিশচুল্লা

সাকলোর সহিত আক্রান্ত কহা হয়।

ছানি (বনা অস্ত্রে)

কাঁচা হউক পাকা হউক কিছু দ্বার আসে না। রোগীর

বয়স বত বেশীই হউক কোন চিকিৎসার কারণ নাই।

অনিশ্চিতভাবে আরোগ্য হইবে। রোগশয্যার বা হাস-

পাতালে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। আপনার রোগের

পূর্ণ বিবরণ, রোগের ইতিহাসসহ পত্র লিখুন :—

ডাঃ শ্যান্সন, এক্স.সি.এস্. (ইউ.এস্.

বালিয়াভাঙ্গা (করিনপুর) বেঙ্গল।

বিবরণ-সূচী—২১ পৃষ্ঠার পর

বিবরণ	লেখক	বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
বিচিত্র জগৎ		বিজ্ঞান জগৎ		
প্রাচীন মিশর	শ্রী নিখিল সেন	২২	ব্যবহারিক সভ্যতা ও	
তামারই (উপন্যাস)	শ্রী অলকা-বুধোপাধ্যায়	১০২	গাণিতিক সভ্যতা	শ্রী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০৮
পুস্তক ও আলোচনা		১০৫	সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা	১১৬
নন্দিতা (উপন্যাস)—শ্রী রণজিতকুমার সেন			আমাদের নববর্ষ, কাগজ-সমস্যা, বাঙ্গালার হস্তিক	
মামা-ভান্নে (শিশু-গল্পিকা)—শ্রী অরুণ কুমার			কলেব্রা ও মহামারী, আসাম-সীমান্ত, ইতালীর নতুন	
	বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৬	মজিসভা, দ্বিতীয় ধাপাধণ, ইতালীর সীমান্ত।	
দ্বীপ ও স্বরলিপি				
রচনা—বাণীকুমার	স্বর—শ্রী পঙ্কজকুমার মল্লিক			
স্বরলিপি—শ্রী অনিল দাস ও বিমলভূষণ				

চিত্র-সূচী

ত্রিবার্ণ চিত্র—

“এইত ভালো.....”

শিল্পী—শ্রী নিশানাথ মজুমদার

প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রাবলী—

বিচিত্র জগৎ :

২২

মিশরের পিরামিড, পক্ষা-শিকারে প্রাচীন মিশরীয়

এবং মিশর স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

বিমান বহরে বোমা সমাবেশ করা হইতেছে

১১৮

বঙ্গ-বিকাশী নিবেদন ও নিয়মানবলী

‘বঙ্গ-বিকাশী’র বার্ষিক মূল্য সডাক ৩০ টাকা। বার্ষিক ৩০ টাকা।
 ডাক-পিসি: খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮/০ আনা। মূল্যাদি—
 প্রাধিকার, বঙ্গ-বিকাশী, C/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
 লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায়
 পাঠাইতে হয়।

আবৃত্তি হইতে ‘বঙ্গ-বিকাশী’র বর্ধারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে
 হক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো,
 কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট
 দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য
 ডাক-খরচ দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে ‘বঙ্গ-বিকাশী’ প্রকাশিত হয়।
 যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে
 স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের
 ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য
 থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা বৎসরক্রমে ৩০, ১৫, ৮, ১।
 বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও
 পরিবর্তনের নির্দেশ না আসিলে পরবর্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে
 কথা করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ৫
 তারিখের মধ্যে জানানো প্রকার।

Telegram :—HOLSELT

Estd. 1922.

সত্যিকারের ভাল পাঠাইতে হইলে

খোঁজ কল্পন

বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ—প্রসিদ্ধ চা-বিক্রেতা

মকঃখলবাসী পাইকারগণের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস—৫নং পোলক স্ট্রীট : কলিকাতা : ব্রাঞ্চ—২নং লাল বাজার

ফোন : কলি: ২৪৩৩

ফোন : কলি: ৪১১৩

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE Ltd.,

THE HOUSE

FOR CLASS PRINTING AND TIMELY DELIVERY

90, LOWER CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA

বাংলা কথা-সাহিত্যে অনবদ্য
অবদান

বিল্বব

“শতাব্দী”র কবি ও কথাশিল্পী

শ্রী রূপজিৎ কুমার সেন প্রণীত

সম্পূর্ণ নতুন ধারার কথা-চিত্র। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-
নরনারীর অপূর্ণ জীবনী আলোচ্য। সমাজ ও রাষ্ট্র-
বিপ্লবের পট-ভূমিকায় ক্ষুধিত মানব চিন্তার
শাশ্বত বেদগাথা।

মূল্য—এক টাকা বার আনা

আপনার গ্রন্থাগারকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে

কলিকাতার যে কোনো সস্তা পুস্তকালয় ও ষ্টল হইতে

আজই সংগ্রহ করুন।

উষা পাবলিশিং হাউস

১০, সোয়ার মার্কেট ল্যাব বোড, কলিকাতা

বিনামূল্যে

“শ্রীমদনানন্দ ট্যাবলেট”

আয়ুর্বেদগোষ্ঠ “শ্রীমদনানন্দ মোদক” আধুনিক বৈজ্ঞানিক
প্রণালিতে Vitamin ও Calcium সহযোগে নির্দিষ্ট
মাত্রায় Tablet-আকারে প্রস্তুত। “মদনানন্দ মোদক”
স্বাস্থ্যবৎ চরুতা ও অনিদ্রার অব্যর্থ মনোষ্য। অকর্প,
অগ্নিমান্দ্য, প্রচণ্ড ও Dyspepsia দূর করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি
করিতে ইচ্ছাবশত ঔষধ গ্রহণে আর নাহি। নূতন
রক্ত ও বায়ু সৃষ্টি করিয়া মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চার
করে। বিস্মৃত বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন। দিল্লী অফিসে
পোস্টেজ ও প্যাকিং-এর জন্য ১/- আনার টিকেট পাঠাইলে
বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

BHARAT AYURVED LABORATORY

POST BOX 158 DELHI

—কলিকাতা প্রাপ্তদান—

দিল্লী আয়ুর্বেদ ফার্মেসী

১১, আন্তর্জাতিক মুদ্রাঙ্কন-রোড ও ৮০, শ্রীমদজ্ঞান হাট

ডাক্তারেরা বলেন —
শিশুর ওষধিহীন জীবনের
মূলধন!

আর কে নিউ শাউ হাউ

সোয়ান প্রস্তুতকারী

শ্রীমদজ্ঞান ফার্মেসী

৬১, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।



বঙ্গ-বিজ্ঞানী—আগস্ট, ১৯৫১

RELIABLE TOOLS FOR TO-DAY & TOMORROW. B. I. S. W.

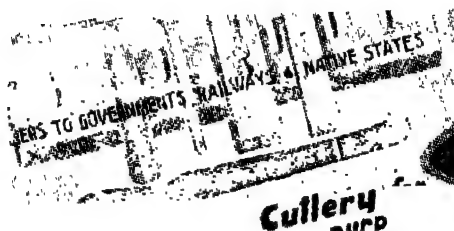
HEAD OFFICE
d
MAIN WORKS
GOTISTA
(Burdwan)



Telegram :
'LOHARBAPAR' (Cal)

Telephones :
Office—Cal, 4716.

CALCUTTA WORKS
121, RAJA DINENDRA
STREET,
CALCUTTA.



Cal. Works—B B. 1506

BRANCH WORKS
FURULIA, GOMOI.

CODES USED,
Oriental 3 Letters
Bentley Com
Phrase & A. B. C.
6th Edn & Private.



CITY 11 01101
8, Canning Street,
CALCUTTA.

B. I. S. W the BRAND that BEARS MANUFACTURERS GUARANTEE.

অক্ষপদ গৌতম প্রণীত—

ন্যা য দ র্শ ন য ২য় খণ্ড

৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় প্রকাশিত হইল

—সম্পাদক—

পণ্ডিত শ্রীহেমন্ত কুমার তর্কতীর্থ

ভাষ্য, বাস্তবিক, তাত্ত্বিক, তাৎপর্যভিত্তিক,
ব্রাহ্ম, পাদভিত্তিক প্রভৃতি সহ

এই দুর্লভ সংস্করণ সংগ্রহ করিতে আজই তৎপর হউন

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
২০, নোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আপনার

গৌরব

ও

আনন্দ

ভীম নাগের সন্দেশ

অপরাজিত ও অপরাজেয় ।

ভীম চন্দ্র নাগ

৬-৮, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ফোন বি, বি, ১৪৬৫

৬৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর—ফোন সাউথ ১১৭৭

৪৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—ফোন বি, বি, ৩৩৭৮

দ্বাদশ বর্ষ]



[প্রথম খণ্ড]

বাৎসরিক বিষয়সূচী

[আশ্বিন, ১৩৮১-অগ্রহায়ণ, ১৩৮১]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
‘শ্রীচর্গাপূজা’র প্রয়োজনীয়তা (৬)	—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ১৮৯, ২৪৩		নারীর কর্তব্য	— শ্রীপ্রতিভা বোস ১৫১
মানবসমাজের বর্তমান সমস্তা পূরণে মানুষের			পদচিহ্ন দর্শন	— শ্রীত্ৰিপুরাশঙ্কর সেন ১৯৬
পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্বের			পারসিক চিত্র-শিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি	— শ্রীগুরুদাস সরকার ৩৫২
বিকাশ সাধন করিবার প্রয়োজনীয়তা	— শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ১		প্রশস্তি	— শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ১৯৫
বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার নাম এবং উহা			প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব	— শ্রীবিধনাথ সেন ৪০৮
সমাধানের সঙ্কেতের নাম	— শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য (১, ১৭ পৃঃ)		প্লেটোর সাহিত্য-বিচার—ডাঃ শ্রীমুখোদচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৩	
বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের সমাধান			‘বঙ্গদর্শন’ বা বাংলার দ্বিতীয় নব জাগরণ	— শ্রীসজনীকান্ত দাস ২৫২
করিবার পরিকল্পনা ও কার্যসঙ্কেত	— শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ৩৫		বর্তমান বর্ষের লীলা-পুরস্কার	— ডাঃ শ্রীমনমোহন ঘোষ ৮১
			বাংলায় জাতীয়তার ধারা	— শ্রীঅমিয়া বসু ২২৯
			বাংলার নদ-নদী	— বৈ-না-ভ ২৩৮
			বাংলা-সাহিত্যে উপভাস-শিল্প	— ডাঃ শ্রীমনমোহন ঘোষ ৩৮
প্রবন্ধ			বিজয়ার প্রলাপ	— শ্রীহরিপদ দত্ত ২৮৪
অন্নদামঙ্গলে মানসিংহ-তবানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্র-প্রসঙ্গ	— শ্রীকালিদাস রায় ৩১৪		বিদ্যাপতি	— ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৭
আকবরের রাষ্ট্রসাধন—এস, ওয়াজেদ আলি ৫১, ১২৯, ১৪৭, ২২১, ৩২০, ৩৬৯			বেয়াড়া বস্ত্রের ডায়েরী	— শ্রীনরেশচন্দ্র পাল ১৬৬
ইউরোপীয় শিল্পে ক্রমোন্নতি	— শ্রীকৃষ্ণ মিত্র ২০৭		ভারতচন্দ্রের কাব্য রঙ্গরস	— শ্রীকালিদাস রায় ২০০
ঐতিহাসের ইঙ্গিত	— শ্রীমন্মথনাথ সাত্তাল ১১৯		ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর	— শ্রীকালিদাস রায় ৩৩৭
উপভাসের উদ্ভব ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের			ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক	
পটভূমিকা	— ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১		ভবিষ্যৎ	— শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬
কব্যকথা ও কালিদাস—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২৬			মন	— শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৮৪
কুমারগুপ্ত	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল ৩০৬		মিথ্যা অভিযোগ	— শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ১৩
খাজুরত্বের চাষবর্জন	— শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৪১৪		রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প	— শ্রীপ্রবোধ ঘোষ ৩৭১
গণকলা, বর্ষর-কলা ও নব্যকলা			রামমোহন ও সংবাদপত্র	— শ্রীমন্মথনাথ সাত্তাল ২৫৭
	— শ্রীযামিনীকান্ত সেন ৩৩৮		ললিত কলা	— শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী ৬৮, ১৩৩, ১৫৯, ২৪২, ২৯৫, ৩৫৯
ধিয়োরীর মরীচিকা	— শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ২১৪		লোভীর অভিযোগ	— শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ২৬৪
দেবীচৌধুরাণীর অমূল্যলতত্ব	— শ্রীরামশশী কর্মকার ৩৯১			
ছ’টি কথা	— শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ১৪৩			
			চতুষ্পাঠী	
			বাংলার ঘরোয়া প্রবাদ	— শ্রীঅসমঙ্গ মুখোপাধ্যায় ৬৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিচিত্র জগৎ					
কাচিনদের দেশ	— শ্রীমুরেশচন্দ্র ঘোষ ১৮৩, ৩০১		(ক) উদ্ধবের প্রতি গোপীগণ		
গুপ্তপল্লী	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল ৩৫৮		(খ) গোপীগণের প্রতি উদ্ধব	— শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৬৮	
প্রাচীন মিশর	— শ্রীনিখিল সেন ৯৯		কঙ্কি	— শ্রীবীণা সেন ৩৩৩	
বিজ্ঞান জগৎ			কথার মর্যাদা	— শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ৩৬২	
ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য			কে বলে রে মায়ার খেলা	— শ্রীমুরেশ বিশ্বাস ২৬৮	
— শ্রীমুরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০৮, ১৮৮, ৩৪১, ৪০৩			কোন ফুলে	— শ্রীমুরেশ বিশ্বাস ১৫৮	
অন্তঃপুর			গরুড়ের আয়তন	— কাদের নওয়াজ ১৭২	
হুঁহিতা ও অজ্ঞাত পরিজন	— জনৈক গৃহী ৯২		গান	— শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য ৬৫	
শিশু-সংসদ			গান	— আব্বাসউদ্দিন আহমদ ৩৩৪	
আমার দেশ (কবিতা)	— নীলরতন দাশ ১৭৪		গান	— শ্রীআতা দেবী ২৭৯	
উদয়ন কথা	— প্রিয়দর্শী ৭২, ১১০, ১৭৩, ২৪০, ৩২২, ৩৬৩		গান	— শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ১৪২	
কণিকা (কবিতা)	— শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ১০২		চাঁদ আয়	— শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ১৯৯	
দিশাহারা	— শ্রীকানাইলাল সাহা ৩৮৫		চিত্রলেখা	— শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত ৩৭৯	
প্রার্থনা (কবিতা)	— প্রিয়লাল দাশ ৭৮		জাগিও না	— বাণীকুমার ৬০	
ফুলের জন্ম (গল্প)	— শ্রীনীলরতন দাশ ৭৯		জীবনের চরে এত চোরাবালি	— শ্রীমুরেশ বিশ্বাস ৬৪	
বন্ধু (গল্প)	— শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২৩০			— শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৬৩	
ষাদের গায়ে জোর আছে	— শ্রীউমেশ মল্লিক ৮০		জীবন বীমা	— ডাঃ শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ৬২	
রাজপুত্র (রূপকথা নাট্য)	— বাণীকুমার ৭৫, ১৩৫		তোমায়ে দিয়িয়া	— শ্রীমুরেশ বিশ্বাস ১৫৮	
সৃষ্টি বুঝি হয় অবসান (কবিতা)	— শ্রীপ্রিয়লাল দাস ৩২৫		দর্প চূর্ণ	— শ্রীআশুতোষ সান্যাল ২৭০	
উপন্যাস			দিনের গ্রহের নাই প্রাণের গ্রহরী	— শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১২১	
তোমারই	— শ্রীঅলক। মুখোপাধ্যায় ১০২, ১০৯, ১৮৭, ২৭৩, ৩২৪		ছ'টি গুণ	— কাদের নওয়াজ ২১৭	
মর্দ ও কর্ম	— ডাঃ শ্রীমুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৫, ১৩৫, ১৬২, ১৯৭, ২৯০, ৩৫৬		ছ'টি প্রাণ	— শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত ৬৩	
সন্ডাট ও শ্রেষ্ঠ	— শ্রীনাথলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫, ১১৫, ১৬৯, ২২৩, ৩১৭, ৪০০		হৃৎগতি নাহে এস মা হৃৎগে	— শ্রীনীলরতন দাশ ২৬৬	
নাটক			‘ধনুদলে লও ডাকি’	— শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ১৮২	
মায়া-মৃগ	— বাণীকুমার ৩৫৬		নব-পরিচয়	— শ্রীমুরেশ বিশ্বাস ১৩৭	
সৃষ্টি-রহস্য	— ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ দাশ ১৯৯		নবায়	— শ্রীচক্রবর্তী ৩৭৯	
কবিতা			নিশীথে	— বাশুতোষ সান্যাল ৬৪	
অগস্ত	— শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১২১		পরজন্মে	— শ্রীআশুতোষ সান্যাল ১৮২	
আগামী স্বপ্ন	— শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫৭		পদ্মার পাশে একটি গাই	— শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ৭	
অনধিকারী	— শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৩৭		পল্লীর ব্যাঘ্র	— শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ১৮২	
অনন্ত যাত্রা	— শ্রীবিমল বায় ৩৩৫		পিতৃবজ্র	— শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৬৯	
অমুশোচনা	— শ্রীমতিলাল দাস ৫৩		(ক) প্রভুর ককণা কতখানি পেলে		
অর্ধাচীন	— শ্রীসুনীল ঘোষ ৩৫৫		(খ) ঘরের বাঁধন ভাঙলি মিছে		
আরো কিছু	— শ্রীপ্রশান্তি দেবী ৮২			— শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২৭০	
			প্রাস্তব	— শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত ১২৮	
			ফুল ফোটে—সে কি জানে	— বন্দে আলি মিয়া ১৪৪	
			বঞ্চিত	— শ্রীসুনীল ঘোষ ৯৮	
			বন্দনা করো	— শ্রীমুরেশ বিশ্বাস ৩৭৯	
			বর্ষা-সন্ধ্যা	— শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ২৬৯	

বিষয়	লেখক
বিজয়া	—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮
ভোগ ও লোভ	—শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ৩৬২
মন ও বন	—শ্রীআন্তোষ সাত্তাল ৩৭৯
মরণ-বাসর	—শ্রীনকুলেশ্বর পাল ৩৮৫
মহাকাল	—শ্রীশতদল গোস্বামী ২১৬
মহানাদের প্রতি	—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল
মা নহে—মহাশ্মশান	

—খান মোহাম্মদ মোহলেহ উদ্দীন ২১৩

মাতৈঃ মাতৈঃ	—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস ৩৩৫
যাযাবর মন ভোলে পথচলা	—শ্রীআশা সাত্তাল ৩৮৫
শরতের রাণী	—শ্রীনীলরতন দাশ ৩৯৫
শুধু তুমি—শুধু আমি দুইজন	—বন্দেআলি মিয়া ২৭০
সুন্দর : সুন্দরের অভিসার	—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ৬১
হিসাব	—শ্রীপ্রিয়লাল দাশ ৩৭৮
হে সারথী	—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৫
হেমন্ত লক্ষ্মী	—শ্রীদীপেন্দ্রকুমার নাগ ২৭৮

গল্প

অনাগত	—শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩১
অশরীরী	—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২৭৭
অনিশ্চিত	—শ্রীঅপরাজিতা দেবী ২০৩
আলো-ছায়া	—শ্রীরমেন মৈত্র ১২১
কঙ্কাল	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু ২৯
কণ্ঠা	—শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮২
কণ্ঠরোধ	—শ্রীজনবঙ্গম রায় ১৫৬
কমরেডশিপ	—শ্রীমালবিকা দত্ত ১২
কামাববুড়ো	—শ্রীজনবঙ্গম রায় ৩৮০

কেরাণীর রবিবাব —শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠক, জুয়াচোর, ঠক-ঠকি আছে, যাবাধান

—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ১৫৪
—শ্রীবাণী সেন ২৫

তীর্থযাত্রা —শ্রীসত্যীকুমার নাগ ৩০৮

নবীন ঘোষাল —শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ২৭৬

পটপটবস্ত্র —শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ১৫৪

পদার্থবিদ পাঁচ —শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ২৪৭

পাশাপাশি —শ্রীনারেন্দ্র গুপ্ত ৩৮৮

পিপৃপবিস্য —শ্রীজনবঙ্গম রায় ৩০৭

প্রাক্তন-স্বপ্ন —শ্রীবটকৃষ্ণ দাস ২০৬

প্রেমের ফাঁদ —শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ২৬১

বদমঙ্গল —শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র ৩৮৬

বাহিব বিধ —শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু ২১০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বায়ু পরিবর্তন (নক্সা)	—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়	৩১৩
বীরেনদা	—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১১
মা	—শ্রীছবি দেবী	১২০
মাণ্ডু ও পদ্ম	—শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর	১৮
রিবলব	—শ্রীদ্বন্দ্ববসু বসু	২৮০
রূপান্তর	—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	২৭১
লিপি	—শ্রীরমেন মৈত্র	৩০৭

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

আহা আষাঢ়ের কোন্ গোপন কথাটি	
কথা—বাণীকুমার। সুর—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।	
স্বরলিপি—শ্রীঅনিল দাস ও শ্রীবিমলভূষণ	১০৬
প্রভু নিতি নব প্রেমের করুণা	
কথা—বাণীকুমার। সুর—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।	
স্বরলিপি—শ্রীঅনিল দাস ও শ্রীবিমলভূষণ	৩০২

পুস্তক ও আলোচনা

অধিনায়ক (নাটক)	—শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	১২৪
উপনিবেশ (উপন্যাস)	—শ্রীঅমলাভূষণ চট্টোপাধ্যায়	১২৪
কবিতা : ১৩৫০	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪২২
গল্পের মজলিশ (শিশু-গল্পিকা)		
	—শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৭৮
ডাবউইন (জীবনী)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৯
নন্দিতা (উপন্যাস)	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	১০৫
পয়লা এপ্রিল (গল্পগ্রন্থ)	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	২৭৯
পুঙ্খ প্রকৃতি (নাটক)	—শ্রীবীরেন্দ্র গুপ্ত	৪২২
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (প্রবন্ধ)		
	— শ্রীঅমলাভূষণ চট্টোপাধ্যায়	১৩৪
বাদশাহী গল্প (শিশুগল্পিকা)	—শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৭৮
বিপ্লব (গল্পগ্রন্থ)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৪
বাংলার ছেলে (শিশু-নাটিকা)	— শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪২২
ভারতের চিঠি	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪২২
মাটির পৃথিবী (উপন্যাস)	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	২৭৯
মামা-ভায়ে (শিশু-উপন্যাস)		
	— শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫
মিছিল (কাব্য সংকলন)	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪২২
রাজা সীতাবাম রায়	—শ্রীঅমলাভূষণ সেন	৪২২
জ্ঞান মিন চু ই (অনুবাদ)	—শ্রীঅমলাভূষণ সেন	১২৪
Racial History of India	—শ্রীঅমলাভূষণ সেন	২৭৮
সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা		
১১৬, ১৪২, ১৯, ২৮০, ২৪৩, ৪২৮		

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের
শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্
লাইনে শিলং যাইবার থু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-
সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে
এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থু টিকেট্ শিলং অফিসে
পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস্

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা



“শ্রীদুর্গা-পূজা”র প্রয়োজনীয়তা

শ্রীমতি দাম্পদ চট্টোপাধ্যায়

(৬)

কার্যকারণের শৃঙ্খলায়ুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে
মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-
প্রাচুর্য্য সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক
অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎ সম্বন্ধীয় কন্মি-
গণের দায়িত্ব বর্টনের বিবরণ

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন
করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান কি কি, তাহা বলা
আমরা “সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে
পূরণ করিতে হইলে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন
হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের নাম ও ব্যাখ্যা” প্রবন্ধে বিবৃত
করিয়াছি।

মানুষের প্রয়োজনের দিকনির্দেশ দেথিলে ঐ অনুষ্ঠানসমূহ
প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

- (১) কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান-
সমূহ ;
- (২) শিল্প ও কারুকাঁচা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান-
সমূহ ;
- (৩) বাণিজ্য কার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
- (৪) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক
অনুষ্ঠানসমূহ ;
- (৫) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক
অনুষ্ঠানসমূহ।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠান তিন শ্রেণীর কন্মীর দ্বারা
প্রত্যেক গ্রামে সাধিত হয়। এই তিন শ্রেণীর কন্মীকে
“সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কন্মী”, “সামাজিক
কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কন্মী” এবং “সামাজিক কার্যের চতুর্থ
শ্রেণীর কন্মী” বলা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর
অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন, সামাজিক কার্যের দ্বিতীয়
শ্রেণীর কন্মীগণকে বুঝাইয়া দিবার দায়িত্বভার লুপ্ত থাকে
“গ্রামস্থ সামাজিক কার্য পরিচালনা-সভা” “সর্বসাধারণের
ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কার্যবিভাগের” পরিচালকগণের
হস্তে। সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কন্মীগণ
উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর
অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধসমূহ সামাজিক
কার্যপরিচালনা-সভার পরিচালকগণের নিকট হইতে শুনিয়া
লইয়া ও বুঝিয়া লইয়া উহা সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর
কন্মীগণকে শুনাইয়া দিয়া থাকেন ও বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।
সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কন্মীগণ ঐ পাঁচশ্রেণীর
অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধসমূহ
সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কন্মীগণের নিকট হইতে
শুনিয়া লইয়া ও বুঝিয়া লইয়া উহা সামাজিক কার্যের চতুর্থ
শ্রেণীর কন্মীগণকে শুনাইয়া দিয়া থাকেন এবং বুঝাইয়া দিয়া
থাকেন। সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কন্মীগণ ঐ

পাঁচ শ্রেণীর অস্থানীয় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক অস্থানীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নির্বাহ করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ মাস্তেব ধনভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্তি সাধন করিবার পাঁচ শ্রেণীর অস্থানীয় বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ তত্ত্ব শ্রেণীর কর্মীগণকে যেরূপ শিখাইবার ও বুঝাইবার জন্ত দায়ী থাকেন, সেইরূপ আবার তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ নিজ নিজ অস্থানীয় বিধিগতভাবে সম্পাদন করেন কি না তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার জন্ত দায়ী থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণও ঐরূপ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের কার্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার জন্ত দায়ী থাকেন।

প্রত্যেক কুড়িট হইতে পঁচিশটি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর কাৰ্য্যপরিদর্শনভার এক একটি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর হস্তে হস্ত হয়।

প্রত্যেক কুড়িট হইতে পঁচিশটি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর কাৰ্য্যপরিদর্শনভার এক একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীর হস্তে হস্ত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগসূত্রে “কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানীয়সমূহ” চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা :

- (১) কৃষিকার্য্যবিষয়ক সামাজিক অস্থানীয়সমূহ ;
- (২) জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অস্থানীয়সমূহ ;
- (৩) বন ও বাগান রক্ষা করিবার ও তৎ জাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অস্থানীয়সমূহ ;
- (৪) খনিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার সামাজিক অস্থানীয়সমূহ।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগসূত্রে কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানীয়সমূহ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা :

- (১) কৃষিকার্য্যবিষয়ক সামাজিক অস্থানীয়সমূহ ;
- (২) জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অস্থানীয়সমূহ ;
- (৩) বন রক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদ, সরীসৃপ,

পক্ষ-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি রক্ষা করিবার অস্থানীয়সমূহ ;

- (৪) বাগান নির্মাণ ও রক্ষা করিবার এবং বাগানজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা করিবার অস্থানীয়সমূহ ;
- (৫) পশু পালন করিবার ও পশু-জাত সর্কশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার অস্থানীয়সমূহ ;
- (৬) পক্ষী পালন করিবার ও পক্ষি-জাত সর্ক শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার অস্থানীয়সমূহ ;
- (৭) কীট পতঙ্গ-সরীসৃপ প্রভৃতি পালন করিবার এবং তৎজাত সর্কশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার অস্থানীয়সমূহ ;
- (৮) খনিজাত দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার অস্থানীয়সমূহ।

কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানীয়সমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগসূত্রে চারি শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগসূত্রে আট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেইরূপ কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ চারি-শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনাসভার “সর্কসাধারণের ধন প্রাপ্তি সাধন করিবার কার্য্যবিভাগের” অন্তর্ভুক্ত “কৃষিকার্য্যবিষয়ক কার্য্যশাখা,” “জলজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক কার্য্যশাখা,” “বন ও বাগানজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক কার্য্যশাখা” এবং “খনিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ বিষয়ক কার্য্যশাখা”র পরিচালকগণ কাঁচামাল উৎপাদন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানীয়সমূহ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্ত দায়ী হইয়া থাকেন।

শিল্প ও কারুকার্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানীয়সমূহ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগসূত্রে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) শিল্প ও কারুকার্য্যের অস্থানীয়সমূহ ;
- (২) বস্ত্রনির্মাণ ও পরিচালনা করিবার অস্থানীয়সমূহ ;
- (৩) ভবন নির্মাণ ও রক্ষা করিবার অস্থানীয়সমূহ।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে, শিল্প ও কারুকার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানসমূহ আঠার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) খাত্ত ও পানীয় বিষয়ক শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (২) ঔষধ, পর্থা, বর্ণ ও গন্ধ, প্রসাধনবস্তু এবং উপভোগ্য বস্তু উৎপাদন করিবার রাসায়নিক শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৩) কার্পাসবস্ত্র সঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৪) রেশমবস্ত্র সঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৫) পশমবস্ত্র সঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৬) কুম্ভকারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ মৃতিকা, প্রস্তর, অস্থি প্রভৃতি জাতদ্রব্যসঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৭) ছুতারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ কাঠ, বংশ, বেত প্রভৃতি বন ও বাগানজাত দ্রব্যসঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৮) কন্দকারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ গৌহজাত দ্রব্য-সঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (৯) কাংশকারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ কাঁসা, তামা, পিত্তল প্রভৃতি অকৃত্রিম ধাতুজাত দ্রব্যসঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১০) স্বর্ণকারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ সোণা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুজাত দ্রব্যসঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১১) রত্নকারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ হীরা, মুক্তা, মণি প্রভৃতি রত্নজাত দ্রব্যসঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১২) চর্মকারের কার্যসঞ্চায় (অর্থাৎ বিবিধ চর্মজাত দ্রব্য-সঞ্চায়) শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১৩) কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি দ্রব্যসঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১৪) ঘান-নির্মাণ সঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১৫) বস্ত্র-নির্মাণসঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১৬) চিত্র ও বায়ু প্রভৃতিসঞ্চায় শিল্প ও কারুকার্যানুষ্ঠানসমূহ ;
- (১৭) ভবন-নির্মাণবিষয়ক অস্থানসমূহ ;

(১৮) যন্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক অস্থানসমূহ ।

শিল্প ও কারুকার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানসমূহ যেকোন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে তিন শ্রেণীতে এবং চতুর্থশ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে আঠার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেটরূপ শিল্প ও কারুকার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ তিন শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণ আঠার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন ।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার “সর্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার কার্যবিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিল্প ও কারুকার্যবিষয়ক কার্যশাখা, যন্ত্র পরিচালনা-বিষয়ক কার্যশাখা এবং ভবন নির্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্যশাখার পরিচালকগণ শিল্প ও কারুকার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানসমূহ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন ।

বাণিজ্য-কার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানসমূহ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) খাল খনন করিবার ও স্থলপথ নির্মাণ করিবার অস্থানসমূহ ;
- (২) রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্যা করিবার (অর্থাৎ বস্ত্র ধৌত করার, ক্ষৌরকর্ম করিবার, মালাগন্ধাদির ব্যবস্থা করার এবং গৃহভৃত্যাদির কার্য প্রভৃতি করিবার) অস্থানসমূহ ;
- (৩) ক্রয়-বিক্রয় করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৪) ঘান পরিচালনা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৫) মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৬) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানেব বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচার করিবার অস্থানসমূহ ।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের দায়িত্বের শ্রেণীবিভাগানুসারে বাণিজ্য কার্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানসমূহ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) খাল খনন করিবার ও স্থলপথ নির্মাণ করিবার অস্থানসমূহ ;

- (২) রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্যা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৩) ক্রয়-বিক্রয়স্থল পরিচালনা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৪) ক্রয়-বিক্রয় করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৫) জলযান পরিচালনা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৬) স্থলযান পরিচালনা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৭) মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৮) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচার করিবার অস্থানসমূহ ।

বাণিজ্য-কাৰ্য্য করিবার সামাজিক অস্থানসমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সামাজিক কৰ্ম্মিগণের দায়িত্বের বিভাগানুসারে ছয় শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণের দায়িত্বের বিভাগানুসারে আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বাণিজ্য-কাৰ্য্য করিবার গ্রামস্থ সামাজিক কাৰ্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণ ছয় শ্রেণীতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন ।

গ্রামস্থ সামাজিক কাৰ্য্যপরিচালনা-সভার “সৰ্বসাধারণের ধনপ্রাপ্ত সাধন করিবার কাৰ্য্য-বিভাগের” অন্তর্ভুক্ত “খাল-খনন ও স্থলপথ নিৰ্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা,” “রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্যা-বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা,” “ক্রয়-বিক্রয় কাৰ্য্য-বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা,” “যান-পরিচালনা বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা,” “মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদান-বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা” এবং “ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচার সম্বন্ধীয় কাৰ্য্যশাখা” পরিচালকগণ বাণিজ্য-কাৰ্য্য করিবার সামাজিক অস্থানসমূহ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন ।

গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানসমূহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণের দায়িত্ববিভাগানুসারে এক শ্রেণীর হইয়া থাকে ; যথা :

“গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অস্থানসমূহ ।”

চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণের দায়িত্বের বিভাগানুসারে গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অস্থানসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) মল ও দৌত জল নিকাশের পথ নিৰ্ম্মাণ, রক্ষা ও পরিচালনা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (২) পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নিৰ্ম্মাণ, রক্ষা ও পরিচালনা করিবার অস্থানসমূহ ;
- (৩) গমনাগমনের পথ পরিস্ফুট রাখিবার অস্থানসমূহ ;
- (৪) গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার অস্থানসমূহ ।

গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অস্থানসমূহ যেরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণের দায়িত্বসমূহের বিভাগানুসারে এক শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণের দায়িত্বসমূহের বিভাগানুসারে চারিশ্রেণীর হয়, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণও সেইরূপ এক শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণ চারি শ্রেণীর হইয়া থাকেন ।

গ্রামস্থ সামাজিক কাৰ্য্য পরিচালনা-সভার “সৰ্বসাধারণের ধনপ্রাপ্ত সাধন করিবার কাৰ্য্যবিভাগের” অন্তর্ভুক্ত “গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যরক্ষা-বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা” ভারপ্রাপ্ত পরিচালক গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার অস্থানসমূহ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন ।

গ্রামের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার অস্থানসমূহ এক শ্রেণীর হইয়া থাকে । ঐ বিষয়ক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণও এক শ্রেণীর হইয়া থাকেন ।

গ্রামস্থ সামাজিক কাৰ্য্যপরিচালনা-সভার “সৰ্বসাধারণের ধনপ্রাপ্ত সাধন করিবার কাৰ্য্যবিভাগের” অন্তর্ভুক্ত “মানুষের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক কাৰ্য্যশাখা” ভারপ্রাপ্ত পরিচালক গ্রামের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন ।

প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের ধনীতাবদূর করিয়া ধনপ্রাপ্ত সাধন করিবার জন্য কয় শ্রেণীর কৰ্ম্মী ও কয় শ্রেণীর অস্থান থাকে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক গ্রামে সামাজিক কাৰ্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মী থাকে ১৫ শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মী থাকে ১৫ শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কৰ্ম্মী থাকে ৩৮ শ্রেণীর ।

প্রত্যেক গ্রামে সামাজিক কাৰ্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মিগণের ১৫ শ্রেণীর অস্থান সাধন করিতে হয়,

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের ৩৯ শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয়।

২৮ শ্রেণীতে বিভক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের মধ্যে শেখোক্ত ১০ শ্রেণীর ছাড়া বাকী ২৮ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের প্রত্যেকের স্ব স্ব শ্রেণীগত অমুষ্ঠান ছাড়া কৃষি-কাধ্যও করিতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের ও উপরোক্ত ২৮ শ্রেণীর প্রত্যেকের হস্তে দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিবার দায়িত্বভার স্তম্ভ থাকে ; যথা :

- (১) কৃষি কাধ্যের দায়িত্বভার।
- (২) স্ব স্ব শ্রেণীগত অমুষ্ঠানের দায়িত্বভার।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের উনচল্লিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের বটনের নিয়মামুসারে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সামাজিক কাধ্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণ প্রধানতঃ আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন বটে ; কিন্তু ঐ উনচল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অমুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর অমুষ্ঠান বহু-সংখ্যক ওস্তাদ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তদমুসারে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের প্রত্যেক শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণও বহুসংখ্যক প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমরা এই প্রসঙ্গে “কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ” বিবৃত করিব।

পাঠকগণকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, “কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অমুষ্ঠান-সমূহের ও কর্মীগণের বটন”—প্রসঙ্গে আমরা এতাবৎ আট শ্রেণীর আলোচনা করিয়াছি—যথা :

- (১) কেন্দ্রীয় কাধ্যপরিচালনা-সভার অমুষ্ঠানসমূহের ও কর্মীগণের বটনের বিবরণ ;
- (২) দেশস্থ কাধ্যপরিচালনা-সভার অমুষ্ঠানসমূহের ও কর্মীগণের বটনের বিবরণ ;
- (৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কাধ্য-পরিচালনা-সভার অমুষ্ঠানসমূহের ও কর্মীগণের বটনের বিবরণ ;
- (৪) গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্যপরিচালনা-সভার অমুষ্ঠান-সমূহের ও কর্মীগণের বটনের বিবরণ ;
- (৫) সামাজিক গ্রামের অমুষ্ঠানসমূহের ও সামাজিক কর্মীগণের দায়িত্ববটনের বিবরণ ;

(৬) মামুঘের পশুপালন নিবারণ করিয়া প্রকৃত মামুঘা সাধন করিবার অমুষ্ঠান সমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্মীগণের দায়িত্ববটনের বিবরণ ;

(৭) মামুঘের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অমুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্মীগণের দায়িত্ববটনের বিবরণ ;

(৮) মামুঘের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্তি সাধন করিবার সামাজিক অমুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্মীগণের দায়িত্ববটনের বিবরণ।

উপরোক্ত আট শ্রেণীর বিবরণে আমরা পাঠকবর্গকে বাহা বাহা দেখাইয়াছি, সেই সমস্তের উদ্দেশ্য কি কি তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে “মামুঘের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মামুঘের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তেব দ্বিতীয়ভাগে” আমাদের বক্তব্য প্রধানতঃ কি কি, তাহা পাঠক-বর্গকে স্মরণ করিতে হইবে।

পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, “যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মামুঘাসমাজের প্রত্যেক মামুঘের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যা করা” আমাদের উপরোক্ত দ্বিতীয় ভাগের প্রধান লক্ষ্য।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যে-যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মামুঘাসমাজের প্রত্যেক মামুঘের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অসম্ভব অনেক আলোচনার সঙ্গে দুই শ্রেণীর বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য-ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা :

একদিকে প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠানসমূহের নামের, স্বতীয়তঃ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যে যে অমুষ্ঠান সাধন করা হয়, সেই সেই অমুষ্ঠানের নামের এবং তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যে যে অমুষ্ঠান সাধন করা হয়, সেই সেই অমুষ্ঠানের সাধনে যে যে শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত করা হয়, সেই সেই শ্রেণীর কর্মীর নামের বর্ণনামূলক আলোচনা, অল্প দিকে মামুঘের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে যে অমুষ্ঠান সাধন করা হয়, সেই সেই অমুষ্ঠানের সাধন করিলে

যে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—তদ্বিষয়ক যুক্তিমূলক আলোচনা।

“কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে অস্থানসমূহের ও কর্মীগণের বণ্টন” প্রসঙ্গে আমরা যে আট শ্রেণীর আলোচনা করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য—উপরোক্ত বর্ণনামূলক আলোচনা করা।

উপরোক্ত বর্ণনামূলক আট শ্রেণীর আলোচনা এবং “কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে দেশ ও গ্রামবিভাগের বিবরণ” হইতে নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীর কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যথা :

- (১) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যত লোক-সংখ্যা বসবাস করেন, তাঁহাদিগের সমষ্টিতে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের লোকসংখ্যার সমগ্রত্ব অথবা সমষ্টি সাধিত হয় ;
- (২) যে যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই ব্যবস্থায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় ;
- (৩) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া বাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে মুখ্যতঃ তিন শ্রেণীর অস্থান সাধিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যথা :
 - (ক) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার পাঁচটি অথবা বারটি প্রত্যন্তর শ্রেণীর অস্থানসমূহ ;
 - (খ) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন ধাপন করিবার সাতটি প্রত্যন্তর শ্রেণীর অস্থানসমূহ ;
 - (গ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ১৫টি অথবা ৩২টি প্রত্যন্তর শ্রেণীর অস্থানসমূহ ;
- (৪) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মুখ্যস্থান স্বতঃই সাধিত হয় তজ্জন্ত গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার ও তাহার ছয়টি কার্যবিভাগের, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার ও তাহার নয়টি

কার্য বিভাগের, দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার ও তাহার নয়টি কার্যবিভাগের এবং কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা সভার ও তাহার নয়টি কার্যবিভাগের সংগঠন করা হয়।

উপরোক্ত চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা সভার এবং তাহাদিগের কার্যবিভাগসমূহের সংগঠন সাধিত হইলে এবং তদনুরূপ কার্য চলিতে থাকিলে যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মুখ্যস্থান স্বতঃসাধিত হইয়া থাকে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

“মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার অস্থানসমূহের মূল নীতিসূত্র এবং ঐ অস্থানসমূহ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের বণ্টন” প্রসঙ্গে আমরা উহার বিশদ আলোচনা করিব। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরোক্তভাবে সংগঠন সাধিত হইলে যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার যুক্তিমূলক আলোচনা করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া বাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে তিন শ্রেণীর মুখ্যস্থান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই তিন শ্রেণীর মুখ্যস্থান সাধিত হইলে যে সেই তিন শ্রেণীর মুখ্যস্থানের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যে সফল হওয়া অনিবার্য হয়—তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে বার শ্রেণীর অস্থান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বার শ্রেণীর অস্থান সাধনে যে তাহাদের অষ্টটি সিদ্ধ হওয়া এবং মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জন-শীল জীবন সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে সাতশ্রেণীর অস্থান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সাত শ্রেণীর অস্থান সাধনে যে মানুষের কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধিত হওয়া অনিবার্য হয়—তাহা আমরা “চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্মীগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি শীর্ষক” আলোচনায় দেখাইব।

মাহুঘের ধনাত্মক নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে যে ১৫ শ্রেণীর অথবা ৩২ শ্রেণীর অল্পষ্ঠান প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই ১৫ শ্রেণীর অথবা ৩২ শ্রেণীর অল্পষ্ঠান সম্পাদিত হইলে যে মাহুঘের ধনাত্মক নিবারণিত হইয়া ধনপ্রাচুর্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখাইতে হইলে ঐ ১৫ শ্রেণীর অথবা ৩২ শ্রেণীর অল্পষ্ঠান সাধিত হইলে সামাজিক গ্রামেব কর্মীগণের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত কারণে আমরা অতঃপর “কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ” বিবৃত করিব।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের কাহার কি উপার্জন হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত করিতে হইলে সামাজিক গ্রামে কয় শ্রেণীর কর্মী বসবাস করেন, তাহার কথা স্মরণ করিতে হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে চারিশ্রেণীর সামাজিক কর্মী (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্মী) বসবাস করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, কোন কোন সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্য পরিচালনা-সভার কর্মীগণ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণ, দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণ এবং কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্মীগণ যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্মীগণের কোন শ্রেণীতে কিরূপভাবে উপার্জন হইয়া থাকে, তাহার কথা আমরা একে একে এই আখ্যায়িকায় সন্নিবেশিত আলোচনা করিব। এই আলোচনা হইতে একদিকে যেরূপ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামেব জনসাধারণের আর্থিক

অবস্থার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, সেইরূপ আবার ধনাত্মক নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার অল্পষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা জানা যায়। আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্মীগণের উপার্জনের কথা আলোচনা করিয়া তাহার পর তাঁহাদের ব্যয়ের কথা আলোচনা করিব।

১। জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অল্পষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের বিবরণ।

এই কর্মীগণের উপার্জন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা—

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) জলজাত দ্রব্যসমূহের মূল্য।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, এই কর্মীগণ যেমন জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার কৃষিকার্যও করিয়া থাকেন।

কৃষিজাত কাঁচামাল ইঁদুরা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন।

জলজাত কাঁচামালের প্রত্যেকটি গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভাকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভা উহা নির্দ্ধারিত মূল্যে হয় জলজাত কাঁচামালসমূহের বণিকগণকে নতুনা ঐ বিষয়ক শিল্পীগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

২। বনরক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি রক্ষা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অল্পষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের বিবরণ।

এই কর্মীগণের উপার্জন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং

(২) বনরক্ষা করিবার সামাজিক অল্পষ্ঠানের বেতন।

বন এবং বনজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষা-বিষয়ক শ্রমিকগণ যেমন বন এবং বনজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষা-বিষয়ক কার্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার কৃষিকার্যও করিয়া থাকেন।

সমস্ত শ্রেণীর বনই গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা সভার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বন এবং বনজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষা করিবার শ্রমিকগণের বেতন

উপবোক্ত কারণে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা সভার দিতে হয়

৩। বাগান নির্মাণ ও বাগানজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানের চতুর্থ শ্রেণীর কার্য-গণের উপার্জনের বিবরণ।

এই কার্যগণের উপার্জন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং
- (২) বাগানজাত উদ্ভিদাদির মূল্য।

ইহাদের কার্যও দুই শ্রেণীর যথা :

- (১) কৃষি কার্য ও
- (২) বাগানের কার্য।

কৃষিজাত কাঁচামাল ইঁহারা নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বাগানজাত উদ্ভিদাদির প্রত্যেকটি গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা সভাকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা-সভা উহা নির্দ্ধারিত মূল্যে ঐ বিষয়ক বণিকগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৪। পশুজাত কাঁচা মাল উৎপাদন-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানের চতুর্থ শ্রেণীর কার্যগণের উপার্জনের বিবরণ।

ইহাদের উপার্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং
- (২) পশুজাত কাঁচা মালের মূল্য।

কৃষিজাত কাঁচা মাল শ্রমিকগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় করিয়া থাকেন। পশুজাত কাঁচামাল গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা-সভাকে বিক্রয় করিতে হয়, মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে।

গ্রামস্থ কার্যাপরিচালনা-সভা উহা ঐ বিষয়ক বণিক এবং শিল্পীগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৫. হইতে ৭। পক্ষিজাত কাঁচামাল, কীট-পতঙ্গজাত কাঁচা মাল, খনিজাত কাঁচামাল উৎপাদন বিষয়ক গ্রামস্থ তিন শ্রেণীর সামাজিক অস্থানের তিন শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কার্যগণের উপার্জনের বিবরণ।

ইহাদের প্রত্যেকের কার্য দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিকার্য এবং
- (২) পক্ষিজাত কাঁচা মাল উৎপাদনের কার্য অথবা

কীটপতঙ্গজাত কাঁচামাল উৎপাদনের কার্য অথবা খনিজাত কাঁচা মাল উৎপাদনের কার্য।

ইহাদের উপার্জনও দুই শ্রেণীর কৃষিজাত কাঁচা মাল ইঁহারা ইঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন। অত্যা কীচা মাল নির্দ্ধারিত মূল্যে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা-সভাকে বিক্রয় করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা-সভা ঐ সমস্ত কাঁচা মাল হয় ঐ ঐ বিষয়ক বণিকগণকে নতুবা শিল্পীগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৮. হইতে ২০। ষোল শ্রেণীর শিল্পবিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানের ষোল শ্রেণীর চতুর্থশ্রেণীর কার্যগণের উপার্জনের বিবরণ :

ইহাদের প্রত্যেকের কার্য দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিকার্য এবং
- (২) ষোল শ্রেণীর শিল্পকার্যের কোন না কোন শ্রেণীর শিল্পকার্য।

ইহাদের উপার্জনও দুই শ্রেণীর। কৃষিজাত কাঁচামাল ইঁহারা ইঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া থাকেন। শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ নির্দ্ধারিত মূল্যে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা সভাকে বিক্রয় করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্যাপরিচালনা সভা ঐ সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য হয় ঐ ঐ বিষয়ক বণিকগণকে নতুবা কারুকরগণকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করেন।

২৪। ভবননির্মাণ-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অস্থানের চতুর্থ শ্রেণীর কার্যগণের উপার্জনের বিবরণ :

ইহাদের কার্য দুই শ্রেণীর যথা :

- (১) কৃষিকার্য এবং
- (২) ভবন নির্মাণ ও রক্ষা বিষয়ক কার্য।

ভবন নির্মাণ ও রক্ষা বিষয়ক কার্য দুই শ্রেণীর যথা :

- (১) সরকারী এবং
- (২) বেসরকারী।

ইহাদের উপার্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচা মালের মূল্য এবং
- (২) ভবন নির্মাণ ও রক্ষাবিষয়ক কার্যের বেতন।

যে সমস্ত শ্রমিক সরকারী ভবন নির্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভা বেতন দিষ্টা থাকেন। আর যাহারা বে-সরকারী ভবন নির্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগের যিনি যে যে গ্রামবাসীর কার্যে নিযুক্ত থাকেন সেই সেই গ্রামবাসীর নিকট হইতে বেতন পাইয়া থাকেন।

বে-সরকারী ভবন নির্মাণ এবং রক্ষার কার্যও গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা সভার তত্ত্বাবধানে সাধিত হইয়া থাকে।

২৫। যন্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানের

চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণের উপার্জনের বিবরণ:—

ইহাদের কার্য দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিকার্য এবং
- (২) যন্ত্র-পরিচালনার কার্য।

যন্ত্রপরিচালনার কার্য সর্বদাই সরকারী কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কার্য গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

এই কন্মিগণের উপার্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং
- (২) যন্ত্রপরিচালনা কার্যের বেতন।

২৬। খাল খনন ও স্থলপথ নির্মাণ-বিষয়ক গ্রামস্থ

সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণের

উপার্জনের বিবরণ:—

এই কন্মিগণের কার্য দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিকার্য এবং
- (২) খাল খনন ও স্থলপথ নির্মাণ করিবার কার্য।

খাল খনন ও স্থলপথ নির্মাণ করিবার কার্য সর্বদাই সরকারী কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কার্যসমূহ গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

উপরোক্ত কন্মিগণের উপার্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচা মালের মূল্য এবং
- (২) খাল খনন ও স্থলপথ নির্মাণ-কার্যের বেতন।

২৭। বস্ত্র-প্রকালন, ক্ষৌর-কর্ষ, মালা-গন্ধাদির ব্যবস্থা,

গৃহ-ভূতাদির কার্য-প্রভৃতি রোগী ও ভোগীগণের পরিচর্যা-

বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর

কন্মিগণের উপার্জনের বিবরণ:—

এই কন্মিগণের কার্য দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিকার্য অথবা শিল্পকার্য অথবা কারুকার্য এবং
- (২) পরিচর্যা করিবার কার্য।

পরিচর্যা করিবার কার্য সর্বদাই বে-সরকারী কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। উহা বে-সরকারী কার্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও, গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার উহা তত্ত্বাবধান করিতে হয়।

পরিচর্যা-বিষয়ক সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণের উপার্জন দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচামালের অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের অথবা কারুকার্যজাত দ্রব্যের মূল্য এবং
- (২) পরিচর্যা কার্যের বেতন।

২৮। ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক

অনুষ্ঠানসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণের উপার্জনের

বিবরণ:—

এই কন্মিগণের কার্য দুই শ্রেণীর যথা :

- (১) কৃষিকার্য অথবা শিল্পকার্য অথবা কারুকার্য ;
- (২) ক্রয় বিক্রয়ের স্থল পরিচালনার কার্য।

ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনার কার্য সর্বদাই সরকারী কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মাল বহন করিবার কার্য ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনার কার্যসমূহের মধ্যে প্রধান। এই কার্য সমূহ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য পরিচালনা সভার তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

উপরোক্ত কন্মিগণের উপার্জন দুই শ্রেণীর যথা :

- (১) কৃষিজাত কাঁচা মালের অথবা শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের অথবা কারুকার্যজাত দ্রব্য সমূহের মূল্য ;
- (২) ক্রয় বিক্রয়স্থল পরিচালনা কার্যের বেতন।

২৯। ক্রয় বিক্রয় করিবার অমুঠান বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের বিবরণ :—

এই কর্মীগণ সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। ইহারা প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয় করিবার অমুঠান-সমূহেই নিযুক্ত থাকেন।

ইহারা প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয় করিবার অমুঠানসমূহে নিযুক্ত থাকেন বটে, কিন্তু অবসর সময়ে ইচ্ছা করিলে কৃষি-কার্য্য অথবা শিল্পকার্য্য অথবা কারুকার্য্য করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন।

ক্রয় বিক্রয় করিবার অমুঠানসমূহ সর্বদাই সরকারী কাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ক্রয় বিক্রয় করিবার অমুঠান বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণকে 'বণিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বণিকগণ তাহাদের কাধ্যের জন্ত স্ব স্ব ব্যয় নির্বাহের উপযুক্ত যথেষ্ট হারে বেতন পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ বেতনই তাঁহাদিগের উপার্জনের এবং সংসার যাত্রা নির্বাহের প্রধান পস্থা হইয়া থাকে। বণিকগণের কাধ্য গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য পরিচালনা সভার সর্বোত্তমোত্তমের তত্ত্বাব-ধারণে সাধিত হয়। প্রত্যেক পণ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য সর্বোত্তমোত্তমভাবে নির্দ্ধারিত হয়। বণিকগণকে কোন লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। বণিকগণকে লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ দিলে বণিকগণের লোভের উদ্রেক হওয়া অনিবাধ্য হয়। লোভের উদ্রেক হইলে বণিকগণ সদৃশ জ্ঞানহারা হইয়া অস্বাস্থ্যকর পণ্যসমূহ পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকেন।

বণিকগণের জীবিকার্জনের সাধারণ পস্থা প্রধানতঃ বেতন বটে, কিন্তু ইহারাও ইচ্ছা করিলে এতদ্ অতিরিক্ত শ্রমের কাধ্যে সক্ষম হইলে কোন না কোন কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল অথবা কারুকার্য্যজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার মূল্য উপার্জন করিতে পারেন।

৩০ হইতে ৩৩। জল-বান পরিচালনা, স্থল-বান পরি-চালনা, সংবাদ আদান প্রদান, এবং সংবাদ প্রচার—এই চারি শ্রেণীর অমুঠান বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের বিবরণ :—

ঐ চারি শ্রেণীর চতুর্থশ্রেণীর কর্মীগণও সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। ইহারা প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীর অমুঠানেই নিযুক্ত থাকেন।

এই চারি শ্রেণীর অমুঠানই "সরকারী কাধ্য" বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই চারি শ্রেণীর কার্য্যের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কার্য্যটি গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য পরিচালনা সভার এবং সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের তত্ত্বাবধারণে সাধিত হইয়া থাকে।

এই চারি শ্রেণীর কর্মীরই উপার্জনের ও সংসার যাত্রা নির্বাহের প্রধান পস্থা সাধারণতঃ তাহাদিগের স্ব স্ব বেতন। ইহারাও ইচ্ছা করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সক্ষম হইলে কোন-না-কোন কাঁচা মাল অথবা শিল্পজাত মাল অথবা কারুকার্য্যজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন, এবং তাহার মূল্য উপার্জন করিতে পারেন।

৩৪ হইতে ৩৭। মল ও দৌতজল নিকাশ ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, গমনাগমনের পথ পরিষ্কারের ব্যবস্থা, গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার ব্যবস্থা—এই চারি শ্রেণীর ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের বিবরণ :—

উপরোক্ত চারিশ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণও সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। ইহারা প্রধানতঃ ঐ চারি শ্রেণীর অমুঠানেই নিযুক্ত থাকেন।

এই চারিশ্রেণীর অমুঠানই সরকারী কাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই চারিশ্রেণীর কার্য্যের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কার্য্যটি গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য-পরিচালনা-সভার এবং ঐ ঐ বিষয়ক—সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের তত্ত্বাবধারণে সাধিত হইয়া থাকে।

ঐ চারিশ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের ও সংসার যাত্রা নির্বাহের প্রধান পস্থা সাধারণতঃ তাহাদিগের স্ব স্ব বেতন। ইহারা ইচ্ছা করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সক্ষম হইলে কোন-না-কোন কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার মূল্য উপার্জন করিতে পারেন।

৩৮। গ্রামের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচির উপাধিকারের বিবরণ :—

উপরোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচিও সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিবার অবসর পান না। তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ক কার্যেই নিযুক্ত থাকেন।

গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক কার্য্য সরকারী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কার্য্য গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার এবং ঐ বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে সাধিত হইয়া থাকে।

গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচির উপাধিকারের ও সংসারযাত্রা নির্বাহের প্রধান পক্ষা সাধারণতঃ তাঁহাদের স্ব স্ব বেতন। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সক্ষম হইলে কোন না কোন কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার মূল্য উপাধিকার করিতে পারেন।

সামাজিক গ্রামের ৩৯ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের ৩৮ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচির উপাধিকারের বিবরণের সারাংশ

উপরোক্ত সারাংশ লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা :

(১) সাত শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সাত শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচির মধ্যে ছয় শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচির উপাধিকারের পক্ষা দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) কৃষিজাত কাঁচামাল সমূহের মূল্য ;

(খ) অন্ততঃ কোন না কোন এক শ্রেণীর কাঁচামালের মূল্য।

বন রক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদাদি রক্ষা করিবার কার্যে যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা কৃষিজাত কাঁচামালসমূহের মূল্য উপাধিকার করিবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু অন্ততঃ কোন শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সুযোগ পান না এবং তাহার মূল্যও উপাধিকার করিতে পারেন না। তৎস্থলে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার নিকট হইতে একটি বেতন পাইয়া থাকেন।

(২) আঠার শ্রেণীর শিল্পের কার্যের আঠার শ্রেণীর চতুর্থ

শ্রেণীর কর্মসূচির মধ্যে ষোল শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচির উপাধিকারের পক্ষা দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য ;

(খ) ষোল শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের কোন না কোন এক শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য।

ভবন নির্মাণের ও যন্ত্র পরিচালনার কার্যে যে দুই শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা কৃষিজাত কাঁচামালসমূহের মূল্য উপাধিকার করিবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু কোন শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য উপাধিকার করিবার সুযোগ পান না। তৎস্থলে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার নিকট হইতে অথবা গ্রামাঙ্গণের নিকট হইতে একটি বেতন পাইয়া থাকেন।

(৩) বাণিজ্য-কার্যের আট শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে—যে তিন শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য এবং একটি বেতন পাইয়া থাকেন।

শেষোক্ত পাঁচ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচি সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার নিকট হইতে প্রধানতঃ একটি বেতন পাইয়া থাকেন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিবার অথবা তাহার মূল্য অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

(৪) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার চারি শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে যে চারি শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের উপাধিকারের পক্ষা সাধারণতঃ কেবলমাত্র সরকারী বেতন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে কোনও না কোন কাঁচা মাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদনের এবং তাহার মূল্য অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

(৫) গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত থাকেন তাহাদিগের উপাধিকারের ও জীবিকা নির্বাহের পক্ষা সাধারণতঃ কেবলমাত্র সরকারী বেতন। ইঁহারাও ইচ্ছা করিলে কোন না কোন কাঁচা মাল অথবা শিল্পজাত মাল উৎপাদনের এবং তাহার মূল্য অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান যে যে উনচল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেই উনচল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানে যে আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কন্ম্যা নিযুক্ত থাকেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের উপার্জনের ও স্ব স্ব সংসারঘাত্মা নির্বাহের পস্থা দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। হয় কৃষিজাত ও অজ্ঞাত কাঁচামালের মূল্য, নতুবা কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য, নতুবা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ও বেতন, নতুবা শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য ও বেতন প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কন্ম্যার উপার্জনের পস্থা হইয়া থাকে। কন্ম্যগণের উপরোক্ত উপার্জনের পস্থা চতুর্থ শ্রেণীর স্ব স্ব ব্যয় নির্বাহ পক্ষে কোন ধনাভাবের উদ্ভব হইতে পারে কিনা, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে আরও তিনটি বিষয়ের কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়, যথা :

- (১) কাঁচা মাল উৎপাদন করিবার জমি বিভাগের কথা ;
- (২) কাঁচা মাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্ধারণের নিয়মের কথা ;
- (৩) বেতন হার নির্ধারণের নিয়মের কথা ।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিষয়ের কথা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে চতুর্থ শ্রেণীর কন্ম্যগণের কাহারও স্ব স্ব প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহপক্ষে কোনও ধনাভাবের উদ্ভব হইতে পারে কি না তাহা নির্ধারণ করা যায় বটে, কিন্তু মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান সাধনের দ্বারা সর্বতোভাবে ধনাভাব নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় কিনা, তাহা কেবল মানুষের ব্যক্তিগত উপার্জনের কথা পরিজ্ঞাত হইলেই স্থির করা যায় না। উহা নিঃসন্দেহভাবে স্থির করিতে হইলে একদিকে যেরূপ গ্রামবাসিগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপার্জনের পরিমাণের কথা নির্ধারণ করিতে হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে মোট ষত সংখ্যক লোক বসবাস করিয়া থাকেন, তাহাদিগের সমগ্র সংখ্যার স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি সাধনের জন্ত যে যে দ্রব্য ষত ষত পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই দ্রব্য তত তত পরিমাণে উৎপাদন করা সুনিশ্চিত হয় কিনা, তাহাও নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। উহার জন্ত “সামাজিক

গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নিয়মের কথা” আলোচনা করিতে হয়।

কাজেই ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত্য সাধন করিবার জন্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধনে যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার প্রত্যেক মানুষের ধনাভাব সর্বতোভাবে নিবারণিত হওয়া ও ধনপ্রাপ্ত্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইবার জন্ত আনুষঙ্গিক ভাবে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, যথা :

- (১) সামাজিক গ্রামের জমি বিভাগের ও অজ্ঞাত ব্যবস্থার বিবরণ ;
- (২) কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্ধারণের বিবরণ ।
- (৩) কন্ম্যগণের বেতনহার নির্ধারণের বিবরণ ;
- (৪) সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নিয়মের বিবরণ ;

সামাজিক-গ্রামের জমি বিভাগের ও অজ্ঞাত ব্যবস্থার বিবরণ

সামাজিক গ্রামের জমি যে যে নিয়মে বিভাগ করিলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোনরূপ ঘেঁষ, হিংসা অথবা ক্ষোভ থাকিতে পারে না এবং গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি সাধন করিবার জন্ত যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্যের প্রত্যেকটি প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে যে যে কাঁচা মালের যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই কাঁচা মাল সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই নিয়মের কথা আলোচনা করা আমাদের এত আত্মীয়িকার উদ্দেশ্য ।

সামাজিক গ্রামের জমি কোন্ কোন্ নিয়মে বিভাগ করা হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কত শ্রেণীর জমি থাকে, এই সমস্ত জমি কোন্ শৃঙ্খলায় স্বভাবতঃ সাজান থাকে, অথবা কোন্ শৃঙ্খলায় মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর জমি সাজাইয়া লন, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কত শ্রেণীর মানুষ থাকেন, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভবনস্থান,

শিক্ষাগার, ক্রয়-বিক্রয় স্থল এবং আমোদ-প্রমোদাদির স্থান কোন শৃঙ্খলায় সাজান হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

“দেশ বিভাগের নীতিসূত্রের” আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে খানিকটা জলভাগ এবং খানিকটা স্থলভাগ বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক দেশের স্থলভাগ প্রধানতঃ পাঁচ অংশে বিভক্ত, যথা : (১) বাগান ও বাসভবনোপযুক্ত অংশ ; (২) বনাংশ ; (৩) পর্বতাংশ ; (৪) অশুষ্করাংশ ; (৫) কৃষি-যোগাংশ।

প্রত্যেক দেশের স্থলভাগ স্বভাবতঃ উপরোক্ত পাঁচ অংশে বিভক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক বন, স্বাভাবিক পর্বত এবং স্বাভাবিক জলাভূমি অথবা মরুভূমি বিদ্যমান থাকে না।

ভূমির স্বভাবের শ্রেণী বিভাগানুসারে সামাজিক গ্রাম প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা :

- (১) পার্বত্যভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম ;
- (২) সমতলভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম ;
- (৩) মরুভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম ;
- (৪) জলাভূমি প্রধান সামাজিক গ্রাম।

পার্বত্যভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ পার্বত্য বন ও পার্বত্য নদী অথবা পার্বত্য জলস্রোত অথবা জল-প্রপাত বিদ্যমান থাকে।

সমতলভূমিপ্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ সমতল ভূমিতে নদী ও খাল সমূহ বিদ্যমান থাকে। কোন শ্রেণীর স্বাভাবিক বন প্রায়শঃ সমতল ভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে বিদ্যমান থাকে না।

মরুভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে প্রায়শঃ কোন শ্রেণীর স্বাভাবিক বন, নদী অথবা খাল বিদ্যমান থাকে না।

জলাভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ জলাভূমির জঙ্গল অথবা বন এবং খাল সমূহ বিদ্যমান থাকে। কোন পর্বতাংশ জলাভূমি প্রধান সামাজিক গ্রামে স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে না।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের বাসভূমি বাহাতে অধিবাস-গণের প্রত্যেকের সর্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিপ্রদ এবং

প্রয়োজন সাধনের সর্ববিধ দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষমতায়ুক্ত হয়, তাহা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের বাসভূমি বাহাতে অধিবাসিগণের প্রত্যেকের সর্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিপ্রদ এবং প্রয়োজন সাধনের সর্ববিধ দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষমতায়ুক্ত হয় তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে বাহাতে প্রথমতঃ—পার্বত্যভূমি, দ্বিতীয়তঃ—নদী অথবা জলস্রোত অথবা খাল, তৃতীয়তঃ—বন, চতুর্থতঃ—বাগান, পঞ্চমতঃ—মানুষের বাসভবন, ষষ্ঠতঃ—সাধারণ শিক্ষাগার, সপ্তমতঃ—সাধারণ ক্রীড়াস্থল, অষ্টমতঃ—সাধারণ আমোদ-প্রমোদ স্থান, নবমতঃ—কৃষিযোগ্য ভূমি, দশমতঃ—শিল্প ও কারুকার্য্যালুষ্ঠানের উৎপাদন ভবন, একাদশতঃ—সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় স্থল এবং দ্বাদশতঃ—সাধারণ চিকিৎসাগার বিদ্যমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের উপরোক্ত বার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক মানুষের বাসভবনের ব্যবস্থা ছাড়া আর বাকী এগার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সাক্ষাৎ সম্পর্কে সর্বতোভাবে কোন না কোন গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য পরিচালনা-সভার দায়িত্ব সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে কার্য্যের জন্য কোন না কোন গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য পরিচালনা-সভার দায়িত্ব থাকে, সেই কার্য্যের জন্য কোন না কোন গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কাধ্য পরিচালনা-সভার, কোন না কোন দেশস্থ কাধ্য পরিচালনা-সভার এবং কেন্দ্রীয় কাধ্য পরিচালনা-সভারও দায়িত্ব থাকে।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের উপরোক্ত বার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিবাসিগণের বাসভবনের ব্যবস্থা করা সাক্ষাৎ সম্পর্কে সর্বতোভাবে গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য-পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে বটে, কিন্তু প্রত্যেক অধিবাসী বাহাতে স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিকর ও প্রয়োজন নিরূপায়িত বাসভবন প্রস্তুত করিতে পারেন, তদুপযোগী বাসভূমি বিনামূল্যে সরবরাহ করা গ্রামস্থ সামাজিক কাধ্য-পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিকর ও প্রয়োজন নিরূপায়িত বাসভবন স্ব স্ব ক্রটি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা অধিবাসিগণের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কোন অধিবাসী বিনামূল্যে বাসভূমি পাইয়াও যত্নপূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর

বাসভবন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নির্মাণ করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি বিচারের উপযুক্ত ও দণ্ডার্থ হইয়া থাকেন। বিচারে যদি দেখা যায় যে, কোন অধিবাসীর ভবন নির্মাণ না করিবার যুক্তিসঙ্গত বাধা আছে, তাহা হইলে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা সভার ঐ অধিবাসীকে ঋণ দান করিয়া তাহার ভবন নির্মাণে অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যত পরিমাণের বাসভবনোপযুক্ত জমি থাকে এবং যত সংখ্যক সংসার ঐ সামাজিক গ্রামে বসবাস করে, তাহা নির্ধারণ করিয়া প্রত্যেক সংসারের ভাগে ঐ সামাজিক গ্রামে কত পরিমাণের বাসভবনোপযুক্ত জমি বিত্তমান আছে, তাহা স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক সংসারের ভাগে যত পরিমাণের বাসভবনোপযুক্ত জমি থাকে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের জমি প্রত্যেক সংসার বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। কোন অধিবাসীর ভবন নির্মাণের রুচির তৃপ্তিসাধনের জন্ত উহার অতিরিক্ত পরিমাণের জমির প্রয়োজন হইলে তাহা মূল্যের বিনিময়ে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা সভার নিকট হইতে কিনিয়া লইতে হয়। বাসভবনোপযুক্ত জমির মূল্য সর্বদাই নির্ধারিত থাকে।

প্রত্যেক বাসভবনের সংলগ্ন ফুল, ফল ও শাক্ সজ্জীর বাগান রাখিতে হয়। প্রত্যেক বাসভবনের সংলগ্ন বাগানে জলাশয় খনন করিতে হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা সভার অমুমতি ব্যতীত যে কোন শ্রেণীর ফুল, ফল ও শাক্ সজ্জীর চাষ, অথবা যে কোন শ্রেণীর বৃক্ষ ও বনলতার বপন অথবা যে কোন শ্রেণীর পশু ও পক্ষীর পালন বাসভবন সংলগ্ন বাগানে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। কয়েক শ্রেণীর বৃক্ষ ও লতা এবং কয়েক শ্রেণীর পশু ও পক্ষী প্রত্যেক বাসভবনের সংলগ্ন বাগানে প্রত্যেক গ্রামবাসী রাখিতে বাধ্য হয়।

সামাজিক গ্রামের অন্তর্গতসমূহের শৃঙ্খলাসুসারে গ্রাম-বাসীগণের বাসভবন শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে।

যে সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক পার্বত্য ভূমি থাকে না, সেই সামাজিক গ্রামে কৃত্রিম পার্বত্য ভূমির রচনা করিতে হয় এবং যথাসম্ভবভাবে পার্বত্য পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গের পালন করিতে হয়।

যে সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক নদী অথবা জলস্রোত

থাকে না, সেই সামাজিক গ্রামে কৃত্রিম খাল খনন করিতে হয়। কৃত্রিম খালসমূহ যাহাতে কোন না কোন স্বাভাবিক নদী অথবা জলস্রোতের সহিত সংযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ব্যবস্থা সাধন করিবার জন্ত সাক্ষাৎভাবে দেশস্থ কার্যসভা এবং গ্রামস্থ বাস্তব কার্যসভা দায়ী হইয়া থাকেন। খাল খনন কার্যে ছয় শ্রেণীর বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, যথা :

- (১) যাহাতে যে কোন দেশের যে কোন গ্রাম হইতে যে কোন দেশের যে কোন গ্রামে দ্রুতগামী জলবানের সাহায্যে যাতায়াত করা যায় তাহার ব্যবস্থা ;
 - (২) যাহাতে বাসভবন সংলগ্ন এবং সরকারী বাগানের প্রত্যেক জলাশয়ে স্বাভাবিক জলস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;
 - (৩) যাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামস্থ প্রত্যেক টুকরা কৃষিযোগ্য জমি বার মাস রস-সিঞ্চিত থাকিতে পারে, এবং কোন ক্রমে শুষ্ক না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;
 - (৪) যাহাতে প্রত্যেক সরকারী বাগানের ও সরকারী বনের প্রত্যেক জলাশয়ে অথবা হ্রদে স্বাভাবিক জল-স্রোতের প্রবাহ চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;
 - (৫) যাহাতে সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক বাসভবনে সমতাপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং অসমতা ও বিষমতাপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা ;
 - (৬) মানুষের প্রয়োজন ও তৃপ্তি সাধনের জন্ত যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করিতে হইলে অথবা খাণ্ড ও পানীয়ের প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে যে সমস্ত জলজাত কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত জলজাত কাঁচামালের কোনটুকু কোন পরিমাণের অভাব যাহাতে কোন সামাজিক গ্রামে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।
- যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ বৃক্ষ, লতা অথবা ফল, ফুল অথবা শাকসজ্জী অথবা পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ বাসভবন সংলগ্ন বাগানে উৎপাদন করা অথবা পালন করা, অথবা রক্ষা করা নিষিদ্ধ, সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ও তৃপ্তি-প্রদ বৃক্ষলতা, ফল, ফুল, শাক সজ্জী এবং পশুপক্ষী ও কীট পতঙ্গ উৎপাদন, পালন ও রক্ষা করিবার জন্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যার ও আয়তনের

সরকারী বাগান নির্মাণ করিতে হয়। কোন প্রয়োজনীয় অথবা তৃপ্তিপ্রদ বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, শাক সব্জী গৃহপালিত পশুপক্ষীর বাহাতে কোন গ্রামবাসীর কোনরূপ অভাব না হয় তাহা করা সামাজিক গ্রামস্থ সরকারী বাগান নির্মাণ করিবার অন্ততম উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে স্বাভাবিক বন অথবা জঙ্গল থাকে না, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যার ও আয়তনের কৃত্রিম বন অথবা জঙ্গলের রচনা করিতে হয়। যে সমস্ত বন্য বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ মাহুষের প্রয়োজনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ সেই সমস্ত বন্য বৃক্ষ, লতা, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ এই সমস্ত কৃত্রিম বন অথবা জঙ্গলে উৎপাদন ও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক কৃত্রিম বন অথবা জঙ্গলে জলজাত কাঁচামাল উৎপাদন করিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদের খনন করিতে হয়।

মাহুষের প্রয়োজন ও তৃপ্তিসাধনের জন্য যে সমস্ত শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন করিতে হইলে অথবা খাদ্য ও পান্যের প্রয়োজন সাধনের জন্য যে সমস্ত পশু ও পক্ষীজাত, অথবা কীট পতঙ্গ-জাত অথবা সরীসৃপজাত অথবা স্তৃক্ষলতাজাত অথবা ফল-ফুলজাত কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কাঁচামালের কোনটির কোন পরিমাণের কোনরূপ অভাব বাহাতে কোন সামাজিক গ্রামে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কৃত্রিম বন ও বাগান রচনা করিবার অন্ততম উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যার ও আয়তনের সাধারণ শিক্ষাগার, সাধারণ ক্রীড়া-স্থান, সাধারণ আমোদ প্রমোদ স্থান, শিল্প ও কারুকার্যগৃহস্থানের উৎপাদন ভবন, সাধারণ ক্রয় বিক্রয় স্থান এবং সাধারণ চিকিৎসাগার রচনা করিতে হয়। ঐ সমস্ত রচনা করা কোন ব্যক্তির দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। ঐ সমস্তের কোনটি কোন ব্যক্তিকে রচনা করিতে দেওয়া সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। উহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যায় ও প্রয়োজনানুরূপ আয়তনে রচনা করা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক কাৰ্য্য পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যে পরিমাণ কৃষিযোগ্য ভূমি চাষ করা, গ্রামস্থ সামাজিক গৃহস্থানের আটত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থশ্রেণীর কন্মিগণের প্রত্যেক সংসারের কন্মসংখ্যার সাধ্যায়ত্ত্ব, সেই পরিমাণ জমি প্রত্যেক চতুর্থশ্রেণীর কন্মসংসারকে বিনামূল্যে ও বিনাকরে দেওয়া প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার অবশ্য দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতির বিবরণ

কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্ধারণ করা কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কাঁচামালের, শিল্পজাত মালের এবং কারুকার্য্যজাত মালের মূল্য নির্ধারিত থাকে। ঐ নির্ধারিত মূল্য ছাড়া অন্য কোন হারে কোন মাল কোন বণিকের ক্রয় বিক্রয় করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক তাহা করেন, তাহা হইলে তিনি বিচারের এবং দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকেন।

কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যহার নির্ধারিত করিতে হইলে সর্বপ্রায়ে মুদ্রামাণ স্থির করিতে হয়। মুদ্রামাণ (unit of money) নির্ধারিত না হইলে কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না। ইহার কারণ মুদ্রার ব্যবহার ব্যতীত কোন দ্রব্যের ক্রয় অথবা বিক্রয় করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় পরিণত বয়স্কের চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণ গড়ে দ্বিপ্রহর সময়ে (অর্থাৎ ছয় ঘণ্টায়) যে পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন, তাহার মূল্যমান নির্ধারিত হয় এক মুদ্রা। এক প্রহর সময়ে যে পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন, তাহার মূল্যমান নির্ধারিত হয় অন্ধমুদ্রা। উপরোক্ত হিসাবে চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণের ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমকে এক একটি “মুদ্রামান” (unit of money) অথবা এক একটি মুদ্রা বলিয়া ধরিতে হয়।

উপরোক্ত ভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কন্মিগণের ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপন্ন পরিমাণের অথবা উৎপন্ন সংখ্যার মূল্যকে “মুদ্রামান” অথবা “একটি মুদ্রা” বলিয়া নির্ধারিত হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য অনায়াসেই নির্ধারিত হইতে পারে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের যে সমস্ত

মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই সমস্ত মূল্যের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক দেশে অথবা প্রত্যেক গ্রামে ঐ নিয়মে মুদ্রামান এবং মূল্যমান নির্দ্ধারিত হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের মুদ্রা বিনিময় করিতেও কোনরূপ অসুবিধা অথবা বিশৃঙ্খলা হইতে পারে না।

মানবসমাজে যখন জমির মূল্য ও খাজনা থাকে, মাল বহনের মাণ্ডল থাকে, মুদ্রার মূল্য থাকে, তখন উপরোক্ত নিয়মে মূল্যমান অথবা মুদ্রামান স্থির করিলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণে কিছু জটিলতা ঘটিলেও ঘটতে পারে কিন্তু তখনও উপরোক্ত নিয়মে মূল্যমান অথবা মুদ্রামান স্থির করিলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হয় না।

যখন জমি বিনামূল্যে ও বিনা খাজনায় চতুর্থ শ্রেণীর কৃষিগণকে বিল করা হয়, যখন মালবহনের ও মানুষের যাতায়াতের কার্য্য বিনা মাণ্ডলে সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার দ্বারা সাধিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়, যখন শিল্পাগারের ভক্ত শিল্পিগণের কোন খরচ করিবার প্রয়োজন হয় না এবং উহা সামাজিক কার্য্য পরিচালনা সভার দ্বারা নিশ্চিত হয় ও বিনা ভাড়া শিল্পিগণ উহা ব্যবহার করিতে পারেন, যখন কোন শ্রেণীর কাঁচামাল ও শিল্পজাত মাল উৎপাদনে কোনরূপ মূল্যধনের প্রয়োজন হয় না, তখন উপরোক্ত নিয়মে মূল্যমান অথবা মুদ্রামান স্থির করিলে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া অতীব সহজসাধ্য হয়।

উপরোক্ত নিয়মে মুদ্রামান ও মূল্যমান স্থির করিলে বিভিন্ন দ্রব্যের পরস্পরের বিনিময়ও সহজসাধ্য হয়। তখন মুদ্রার ব্যবহার না করিয়া এক শ্রেণীর দ্রব্যের পরিবর্তনে আর এক শ্রেণীর দ্রব্যের ক্রয় এবং বিক্রয় করাও সহজসাধ্য হয়।

কৃষিগণের বেতন-হার নির্দ্ধারণ-পদ্ধতির বিবরণ

“কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কৃষিসমূহের শ্রেণীবিভাগ” প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কৃষিসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন; যথা :

- (১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কৃষিগণ ;
- (২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কৃষিগণ ;
- (৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কৃষিগণ ;
- (৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কৃষিগণ ;
- (৫) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কৃষিগণ।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কৃষিগণ আবার প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, যথা :

- (১) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কৃষিগণ ;
- (২) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষিগণ ;
- (৩) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কৃষিগণ ;
- (৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কৃষিগণ।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সাধিত করিতে হয়, এবং ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই পরিচালিত হয়, তাহা করিতে হইলে যে সমস্ত কৃষীর প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কৃষী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া দেখিলে, যেরূপ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ আবার বেতনের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া দেখিলে, প্রধানতঃ আট শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—কেন্দ্রীয়, দেশস্থ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় এবং গ্রামস্থ সামাজিক এই চারি শ্রেণীর কার্য্য-পরিচালনা সভার চারি শ্রেণীর কৃষী আর গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চারি শ্রেণীর কৃষী।

উপরোক্ত আট শ্রেণীর কৃষিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ৬ম হারে বেতন পাইয়া থাকেন গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কৃষিগণ, উহার কারণ—গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কৃষিগণের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা কম হইয়া থাকে। তাহার বাহা কিছু করেন, তাহার প্রত্যেকটি সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর কৃষিগণের নির্দেশানুসারে সাধিত হয়। ঐ সমস্ত কার্য্যের প্রধান দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৃষিগণের হস্তে ব্রহ্ম থাকে। তাহা ছাড়া ঐহারা সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর বন্ধ্যা হইয়া থাকেন, তাহাদের সংসারের পোষ্যসংখ্যা ও সর্বাপেক্ষা কম হইয়া থাকে।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কৃষিগণের বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সর্বপ্রথমে কোন কোন দ্রব্য কত কত

পরিমাণে এক একটি মানুষের নিজ নিজ আহার ও বিহারের জন্য কত কত পরিমাণে সারা বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এক একটি মানুষের যদিও পাঁচজন (পাঁচটি বালক-বালিকা, একটি স্ত্রী এবং ১৮ জন অতিথি অথবা আত্মীয়-স্বজন) পোষ্য থাকে, তাহা হইলে সর্বসমেত ছয় জনের কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে তাহার হিসাব করা হয়। কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে তাহার হিসাব করিবার সময়ে খুব সজ্জল ভাবে চলিতে হইলে আহার, বিহার, বাসভবন প্রভৃতির জন্য যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি ও পূর্ণ স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, সেই সেই দ্রব্য তত তত পরিমাণে ধরা হয়। তৃতীয়তঃ, ছয় জন মানুষের যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে সারা বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে, তত তত পরিমাণের সেই সেই দ্রব্যের মোট মূল্য কত হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। ছয়জন মানুষের যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে সারা বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে তত পরিমাণের সেই সেই দ্রব্যের ষ্টিমটি মূল্য যাহা হয়, তাহার দেড় গুণ মুদ্রা সামাজিক কার্যের এক একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর কর্মীর মাত্র সারা বৎসরের প্রাথমিক (initial) বেতন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বেতন প্রথমতঃ মোট মূল্যের দ্বিগুণ, তাহার পর আড়াই গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি অনুসারে উপার্জনের যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে এবং একই বয়সের ও একই শ্রেণীর অভিজ্ঞতায় কর্মীগণের যাহাতে অনুষ্ঠানের শ্রেণীভেদানুসারে মোট উপার্জন-পরিমাণের অত্যধিক ভেদ না ঘটতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের একই শ্রেণীর বয়সে ও একই শ্রেণীর অভিজ্ঞতায় বাৎসরিক বেতন একই পরিমাণে নির্দ্ধারিত থাকে বটে, কিন্তু কাঁচামাল ও শিল্পজাত মাল উৎপাদন করিবার অবস্থাতেও যতঃ ঐ কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালের উৎপন্ন পরিমাণের ভেদ ঘটতে পারে। তাহাতে কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালের মূল্য হইতে উপার্জনের পরিমাণেরও ভেদ ঘটতে পারে।

উপরোক্ত কারণে তৃতীয় শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের কোন্ শ্রেণীর বাৎসরিক উপার্জনের মোট পরিমাণ কত হইয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। আট-ত্রিশ শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের বিভিন্ন শ্রেণীর বাৎসরিক উপার্জনের মোট পরিমাণে কোন উল্লেখযোগ্য অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে বৎসরান্তে ক্ষতিপূরণের দ্বারা উহার সামঞ্জস্য বিধান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হইতে সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী উন্নয়ন হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী বেতন ও দ্রব্যমূল্য হইতে মোট যত অধিক পরিমাণের মুদ্রা বাৎসরিক উপার্জন হয়, তাহার দেড়গুণ পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয়— সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর আত্মবিস্থায়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি অনুসারে ঐ পারিশ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকের দ্বিগুণ ও আড়াই গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের উপার্জনের পরিমাণ সর্বাবস্থাতেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের তুলনায় বেক্রপ অধিক হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার উহা প্রায়শঃ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের প্রয়োজনানতিরিক্তও হইয়া থাকে। এই কারণে যদিও উপরোক্ত হারে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারিত হয়, এবং তাঁহারা ঐ হারে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা যাহাতে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনানতিরিক্ত মুদ্রা পারিশ্রমিক রূপে গ্রহণ না করেন এবং উহা ত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণকে সর্বদা সর্বতোভাবে অভিমানশূন্য, বিলাসিতা ও আড়ম্বরহীন হইতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের যিনি যত অধিক ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের নিকট তিনি যাহাতে তত অধিক সম্মানভাজন হইতে পারেন, তদুপযোগী শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণকে দেওয়া হয়। এই শিক্ষার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ প্রায়শঃ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহাদিগের প্রয়োজনানতিরিক্ত উপার্জন ত্যাগ করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম হইতে সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মে বেতন ও দ্রব্যমূল্য হইতে মোট যত অধিক পরিমাণের মুদ্রা বাৎসরিক উপার্জন হয়, তাহার তিন গুণ পারিশ্রমিক সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মের আত্মবাহ্য নিৰ্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি অনুসারে ঐ পারিশ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকের সাড়ে তিন গুণ ও চারিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ বাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন, তাহ্ময়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়, সেইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণও বাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন, তাহ্ময়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম হইতে সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মে বেতন ও দ্রব্যমূল্যের সমষ্টি হইতে মোট যত অধিক পরিমাণের মুদ্রা বাৎসরিক উপার্জন হয়, তাহার সাড়ে চারিগুণ সংখ্যার মুদ্রা সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মের আত্মবাহ্য পারিশ্রমিক স্বরূপ নিৰ্দ্ধারিত হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি অনুসারে ঐ পারিশ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকের পাঁচগুণ ও সাড়ে পাঁচগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ বাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন—তাহ্ময়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়, সেইরূপ প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণও বাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন তাহ্ময়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম হইতে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে। গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার

কর্ম হইতে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম হইতে দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে। দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম হইতে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মে উন্নয়ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার চারি-শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকও গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিৰ্দ্ধারিত হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের পারিশ্রমিক গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের পারিশ্রমিকের ছয়গুণ, সাড়ে ছয়গুণ ও সাতগুণ হইয়া থাকে। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের পারিশ্রমিক হয় সাড়ে সাতগুণ, আটগুণ ও সাড়ে আটগুণ। দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের পারিশ্রমিক হয় নয়গুণ, সাড়ে নয়গুণ এবং দশগুণ। কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের পারিশ্রমিক হয় সাড়ে দশগুণ, এগার গুণ এবং বাত্গুণ।

সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ বাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন তাহ্ময়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়, সেইরূপ চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার চারি শ্রেণীর কর্মীগণ বাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ত্যাগ করেন, তাহ্ময়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

সামাজিক গ্রামের অব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির বিবরণ

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যে যে উদ্দেশ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলকে বিভিন্ন দেশে এবং প্রত্যেক দেশকে বিভিন্ন গ্রামে বিভক্ত করা হয়, সেই সেই উদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যতসংখ্যক অধিবাসী থাকেন, তাহাদিগের সমগ্র সংখ্যার সর্ববিধ ইচ্ছার ও সর্ববিধ প্রয়োজনের নির্বাহ করিবার জন্ত যে যে দ্রব্য যত যত পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য তত তত পরিমাণে অনায়াসে উপার্জন করা সহজসাধ্য।

গ্রামবাসিগণের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক দ্রব্য গ্রাম মধ্যে বাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সহজসাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমতঃ গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষি-যোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় সর্ববিধ জল-জাত কাঁচামাল বাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জল স্বাভাবিক স্রোতযুক্ত খাল ও পুষ্করিণী খনন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বস্ত্র বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষি, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ-জাত কাঁচামাল বাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার বস্ত্র বৃক্ষ-লতা উৎপাদন ও রক্ষা করিবার, বস্ত্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ পালন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। চতুর্থতঃ, সম্ভব হইলে খনিজ পদার্থ উৎপাদন করিবার ও সংগ্রহ করিবার, নতুবা অনগ্রাম হইতে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং পঞ্চমতঃ, সর্ববিধ কাঁচামাল উৎপাদন করিবার, সর্ববিধ শিল্প-কাৰ্য্য করিবার, সর্ববিধ কারুককাৰ্য্য করিবার কাৰ্য্য বাহাতে স্বতঃই যুগপৎ চলিতে পারে এবং চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ কাৰ্য্য বাহাতে স্বতঃই যুগপৎ চলিতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যেক্রমে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক গ্রামে সেই গ্রামের সমগ্র অধিবাসীর ইচ্ছা পূরণের ও প্রয়োজন সাধনের সর্ববিধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ আবার ঐ পঞ্চবিধ কাৰ্য্য বাহাতে স্বতঃই যুগপৎ চলিতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং বহুবিধ দ্রব্যই আদৌ উৎপাদন করা অসম্ভব হয়।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ ব্যবস্থার বুনিন্যাদ—গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষি-যোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা।

এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক গ্রামের স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি সর্বতোভাবে সমান নহে। স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি যতই অসমান হউক না কেন, প্রকৃতির এমনই হস্তের নিয়ম যে, প্রত্যেক গ্রামে ও প্রত্যেক দেশে সেই গ্রামের ও সেই দেশের জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি

অটুট থাকিলে, সেই গ্রামে ও সেই দেশে যতসংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মামুসারে বসবাস করিতে পারেন, তাঁহা-দিগের প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণের ও প্রয়োজন-সাধনের প্রত্যেক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা অনায়াসসাধ্য হয়। জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বাহাতে সর্বতোভাবে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা বিজ্ঞমান থাকিলে, এই ভূ-মণ্ডলের কোন কোন দেশে, সেই দেশে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মামুসারে যতসংখ্যক মানুষ বসবাস করিতে পারেন, তাঁহাদিগের সর্ববিধ ইচ্ছা-পূরণের ও সর্ববিধ প্রয়োজন সাধনের জন্ত যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই দ্রব্য, তাহার নয় গুণ পরিমাণে পর্য্যাপ্ত উৎপাদন করা অনায়াস-সাধ্য হয়। অল্প দিকে জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বাহাতে সর্বতোভাবে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা বিজ্ঞমান না থাকিলে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক গ্রামের কৃষিযোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমির উর্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, এবং তখন এমন অবস্থার পর্য্যাপ্ত উদ্ভব হইতে পারে যে, কোন দেশে অথবা কোন গ্রামেই সেই দেশের অথবা সেই গ্রামের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যার সর্ববিধ ইচ্ছা-পূরণের সর্ববিধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা ৩' দূরের কথা, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহও প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত কারণে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে যে যে দ্রব্যোৎপাদন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই দ্রব্য উৎপাদন করা বাহাতে অনায়াসসাধ্য হয়, তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে বাহাতে উপরোক্ত পঞ্চবিধ ব্যবস্থা যুগপৎ ও স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়।

সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির মূল নীতি, উপরোক্ত ভাবে বিধি-ব্যবস্থা এবং উপরোক্ত পঞ্চবিধ ব্যবস্থার বুনিন্যাদ—গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষিযোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বাহাতে অটুট থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

গ্রামাভ্যন্তরস্থ কৃষিযোগ্য ও বাগানযোগ্য জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি যখন অটুট থাকে, তখন আবার চারিটা ব্যবস্থা

যাহাতে সাধিত হয়, তাহার বন্ধোবস্ত করিলেই প্রত্যেক গ্রামে সেই গ্রামের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সর্ববিধ ইচ্ছা ও সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করিবার প্রত্যেক দ্রব্য প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। তখন যে সমস্ত গ্রামের কৃষিযোগ্য ও বাগানযোগ্য ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদনশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক, সেই সমস্ত গ্রামের কোন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ভূমণ্ডলের জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদনশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা যখন শিথিল হয়, তখন সর্বত্রই জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদনশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং তখন অনেক গ্রামেই সেই সেই গ্রামের অধিবাসি-সংখ্যার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যের কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। তখন সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে প্রথমতঃ জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদনশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, সর্বত্রই তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার পর, দ্বিতীয়তঃ, কোন্ কোন্ দেশে কোন্ কোন্ কাঁচা মালের কত পরিমাণে অভাব হইতে পারে এবং কোন্ কোন্ দেশে ও কোন্ কোন্ গ্রামে কোন্ কোন্ কাঁচামাল সেই সেই দেশের প্রয়োজনানুসারে পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার নির্ধারণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যে যে গ্রামে অন্তর্গত অভাবগ্রস্ত দেশের যে যে কাঁচা মাল সেই সেই গ্রামের প্রয়োজনানুসারে পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয়, সেই সেই গ্রামে একদিকে যেরূপ নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পরিমাণের উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ আবার অভাবগ্রস্ত দেশ অথবা গ্রামসমূহের অভাব পূরণ করিবার জন্ত উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

উপরোক্ত কথাগুলি যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও কার্য-প্রযত্ন অটুট থাকিলে সর্বাবস্থাতেই যে যে দ্রব্য মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা ও সর্ববিধ প্রয়োজন নির্বাহে প্রয়োজনীয়, তাহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের আয়-ব্যয় বিবরণের সারাংশ।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে যে অনুষ্ঠান যে যে পদ্ধতিতে সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ ঐ অনুষ্ঠান ঐ ঐ পদ্ধতিতে সাধন করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক মানুষের ধনাভাব নিবারণিত হওয়া ও ধন-প্রাচুর্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখাইবার জন্ত আমরা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহার বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি ; যথা :

- (১) সামাজিক গ্রামের জমি-বিভাগের ও অন্তর্গত ব্যবস্থার বিবরণ ;
- (২) কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্ধারণের বিবরণ ;
- (৩) কর্মীগণের বেতন-হার নির্ধারণের বিবরণ ;
- (৪) সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের নিয়মের বিবরণ।

উপরোক্ত চারিটি আলোচনার মধ্যে প্রথমোক্ত “জমি-বিভাগের কথা” এবং শেষোক্ত “দ্রব্যোৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের নিয়মের কথা” যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সর্ববিধ ইচ্ছা ও সর্ববিধ প্রয়োজন নির্বাহ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, তাহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

“কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্য নির্ধারণের কথা” এবং “কর্মীগণের বেতনহার নির্ধারণের কথা”—

দ্রব্য-মূল্য নির্ধারণ-নিয়ম এবং কর্ম্মিগণের বেতন-হার নির্ধারণ-নিয়ম সম্বন্ধে বাহ্য বাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক সংসারের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করিয়া সচ্ছলভাবে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে বাহা বাহা প্রয়োজনীয় হয়, তাহার প্রত্যেকটি প্রভূত পরিমাণে ক্রয় করিতে হইলে যে পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ মুদ্রার কোনওরূপ অভাব কোনও শ্রেণীর কোনও কর্ম্মীর হইতে পারে না।

মানুষের ধনাত্মাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য-সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে যে অস্থান যে যে পদ্ধতিতে সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সেই অস্থান সেই সেই পদ্ধতিতে সাধিত হইলে যে, কোনও সামাজিক গ্রামের কোনও শ্রেণীর কোনও কর্ম্মীর কোনরূপ ধনাত্মাব ঘটিতে পারে না এবং প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কর্ম্মীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে নিঃসন্দেহভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কর্ম্মীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার কারণ কোন সামাজিক গ্রামে কোন প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী বেকার থাকিতে পারেন না। প্রত্যেকেই কোন না কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। স্বীলোকগণ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাগণ কর্ম্মিগণের সংসারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষ সমাজের প্রত্যেক মানুষের ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার কারণ—সামাজিক গ্রামসমূহের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সমষ্টিতে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের মানুষসংখ্যার সমগ্রতা সাধিত হইয়া থাকে।

“কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্নশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অস্থানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন” সম্বন্ধে উপসংহার।

“কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্নশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অস্থানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন” প্রসঙ্গে আমরা সর্বসম্মত তেরটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, যথাঃ

- (১) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার অস্থানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
- (২) দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার অস্থানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
- (৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার অস্থানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
- (৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার অস্থানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
- (৫) সামাজিক গ্রামের অস্থানসমূহের ও সামাজিক কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;
- (৬) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মানুষত্ব সাধন করিবার অস্থানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ;
- (৭) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অস্থানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ;
- (৮) মানুষের ধনাত্মাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অস্থানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ;
- (৯) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সামাজিক গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মিগণের আয়-ব্যয়ের বিবরণ;
- (১০) সামাজিক গ্রামের জমি-বিভাগের ও অজ্ঞাত ব্যবহার বিবরণ;
- (১১) কাঁচামাল ও শিল্পজাত মালসমূহের মূল্যনির্ধারণ-পদ্ধতির বিবরণ;
- (১২) কর্ম্মিগণের বেতনহার নির্ধারণ-পদ্ধতির বিবরণ;

(১৩) সামাজিক গ্রামের দ্রব্যোৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বিবরণ।

উপরোক্ত তের শ্রেণীর আলোচনার প্রত্যেকটি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্তর্ধানসমূহের ও কর্মীগণের বন্টনের ব্যাখ্যা করিবার জন্ত রচিত হইয়াছে।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা বাহাতে সর্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ, সমগ্র ভূমণ্ডলের সম্পূর্ণ কৃষি-যোগ্য জমি বাগাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেককে সমানভাবে পাইতে পারেন, তাহা করিবার জন্ত সমগ্র ভূমণ্ডলকে কতকগুলি দেশে এবং প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি সামাজিক গ্রামে বিভক্ত করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অন্তর্ধান সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়; তৃতীয়তঃ, ঐ তিন শ্রেণীর সামাজিক অন্তর্ধান বাহাতে স্বতঃই প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধিত হয়, তাহা করিবার জন্ত প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রামে ও প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক কাষাপরিচালনার গ্রামে বিভক্ত করিতে হয়, এবং প্রত্যেক সামাজিক কাষাপরিচালনার গ্রামের অধীনে দুইটি হইতে পাঁচটি পঞ্চাঙ্গ সামাজিক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়; চতুর্থতঃ, ঐ তিন শ্রেণীর সামাজিক অন্তর্ধান বাহাতে স্বতঃই প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধিত হয়, তাহা করিবার জন্ত সমগ্র মানবসমাজের মিলিত কেন্দ্রে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামে, প্রত্যেক সামাজিক কাষাপরিচালনার গ্রামে এক একটা করিয়া কাষাপরিচালনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে প্রধানতঃ যে তিন শ্রেণীর অন্তর্ধান প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, সেই তিন শ্রেণীর অন্তর্ধান বাহাতে স্বতঃই সাধিত হয়, তাহা করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র মানবসমাজের মিলিত কেন্দ্রে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামে এবং প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে চারি শ্রেণীর কাষাপরিচালনা-সভার রচনা করিতে হয়, সেই চারি শ্রেণীর কাষাপরিচালনা-

সভার কোনটিতে কি কি অন্তর্ধান কোন্ কোন্ কর্মীর দ্বারা সাধন করিলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের তিন শ্রেণীর অন্তর্ধান সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে উপরোক্ত তের শ্রেণীর আলোচনার প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর আলোচনায়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে প্রধানতঃ যে তিন শ্রেণীর অন্তর্ধান প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় সেই তিন শ্রেণীর অন্তর্ধান কোন্ কোন্ প্রত্যন্তর শ্রেণীর অন্তর্ধানে বিভক্ত করিলে এবং কোন্ অন্তর্ধান কোন্ শ্রেণীর কর্মীর দায়িত্বাধীনে স্থাপন করিলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে ঐ তিন শ্রেণীর অন্তর্ধান সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখানো হইয়াছে উপরোক্ত তের শ্রেণীর আলোচনার প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর আলোচনার পরবর্তী চারি শ্রেণীর আলোচনায়।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার জন্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে সমস্ত অন্তর্ধান যে-যে পদ্ধতিতে সাধন করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অন্তর্ধান সেই সেই পদ্ধতিতে সাধন করিলে যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর ধনাভাব সর্বতোভাবে নিবারণ হওয়া ও ধন প্রাচুর্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা দেখানো হইয়াছে উপরোক্ত তেরটি আলোচনার শেষোক্ত পাঁচটি আলোচনায়।

চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কাষাপরিচালনা-

সভাসমূহের কাষাগণের শিক্ষা-পদ্ধতি

ও নিয়োগ-পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যে চারি শ্রেণীর কাষাপরিচালনা-সভার রচনা করিতে হয়, সেই চারি শ্রেণীর কাষাপরিচালনা-সভার প্রত্যেক শ্রেণীর কাষাপরিচালনা-সভায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী নিযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণকে যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে যে নিয়মে তাহাদিগকে নিয়োগ করা হয়, সেই সেই শিক্ষা-নিয়ম ও নিয়োগ-নিয়ম বিবৃত করা আমাদের এত আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের পশ্চত্ত্ব নিবারণ করিয়া

প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্ত এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার জন্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যে যে অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের মূল নীতি-সূত্র কি কি তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের পশ্চাত্ত নিবাসিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধিত হওয়া এবং অলস ও বেকার জীবন নিবাসিত হইয়া কর্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধিত হওয়া যে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও উপরোক্ত আলোচনায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারা যাইবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যে চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার রচনা করিতে হয়, সেই চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের শিক্ষা-নিয়ম ও নিয়োগ-নিয়ম কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে পাঠকগণকে প্রথমতঃ, চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার নাম, দ্বিতীয়তঃ, এই চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক সভায় কত শ্রেণীর কর্মী থাকে, তাহার কথা স্মরণ রাখিতে হয়।

চারিশ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার নাম :

- (১) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা ;
- (২) দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভা ;
- (৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা ;
- (৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভা।

কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা যে যে কর্মীগণের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমস্ত কর্মী অভিজ্ঞতার ও দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

- (১) নয়টি কার্যবিভাগের প্রত্যেক কার্যবিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করিবার কর্মীগণ অথবা আনুষ্ঠানিক অমাত্যগণ ;
- (২) নয়টি কার্যবিভাগের প্রত্যেক কার্যবিভাগ পরিচালনা করিবার কর্মীগণ অথবা বিভাগীয় অমাত্যগণ ;
- (৩) নয়টি কার্যবিভাগের সর্বস্বত্বভাবে পরিচালনা করিবার কর্মী অথবা বিরাট পুরুষ।

অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া দেখিলে আনুষ্ঠানিক অমাত্যগণ একষটি শ্রেণীতে, বিভাগীয় অমাত্যগণ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। বিরাট পুরুষকে একটি পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভা, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা সভা, গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভা যে যে কর্মীগণের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সমস্ত কর্মীও অভিজ্ঞতার ও দায়িত্বের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে, কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের মত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :

- (১) আনুষ্ঠানিক সভা-কর্মীগণের শ্রেণী ;
- (২) বিভাগীয় সভা-কর্মীগণের শ্রেণী ;
- (৩) সভাপতির শ্রেণী।

অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণী-বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক সভা-কর্মীগণ ঊনষটি শ্রেণীর এবং বিভাগীয় সভা-কর্মীগণ নয় শ্রেণীর হইয়া থাকেন ; গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক সভা-কর্মীগণ সাতান্ন শ্রেণীর এবং বিভাগীয় সভা-কর্মীগণ নয় শ্রেণীর হইয়া থাকেন ; গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক সভা-কর্মীগণ চল্লিশ শ্রেণীর এবং বিভাগীয় সভা-কর্মীগণ ছয় শ্রেণীর হইয়া থাকেন। তিন শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভারই সভাপতি এক শ্রেণীর হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগণের শিক্ষা ও নিয়োগ কি কি নিয়মে সাধিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে সামাজিক গ্রামের সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের চারি শ্রেণীর কর্মীর শিক্ষা ও নিয়োগ কি কি নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ—সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী হইয়া থাকেন। সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী না হইয়াও সময় সময় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর নিয়োগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর শিক্ষা সর্বস্বত্বভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার

পাওয়া যায় না ; তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না ; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না ; প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা সর্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না ; সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীর শিক্ষা সর্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না ; গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা সভার কর্ম্মীর শিক্ষা সর্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না ; দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মীর শিক্ষা সর্বতোভাবে লাভ করিতে না পারিলে কখনও কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মের শিক্ষার্থী হওয়ার প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না ।

যে কোন শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীর শিক্ষা লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা লাভ করিতে হয় বলিয়া চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের শিক্ষাপদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের শিক্ষা ও নিয়োগ কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সাধিত হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয় ।

চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথমে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় বটে কিন্তু সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে মানুষকে কর্ম্মজীবনের উপযুক্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় ।

এক কথায়, চারি শ্রেণীর কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতে হইলে,

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্য এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মবাস্তব ও উপার্জনশীল জীবন-সাধন করিবার জন্য যে যে অনুষ্ঠানের আশ্রয় লওয়া হয়, তাহা আমূলভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় । ঐ ব্যাখ্যায় আমরা অতঃপর হস্তক্ষেপ করিব ।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্য যে যে অনুষ্ঠানের আশ্রয় লওয়া হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের আমূল ব্যাখ্যা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের মূলসূত্রের সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন হয় ।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের পূর্বাংশ

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্র কি কি তাহা বুঝিতে হইলে মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয় ।

মানুষের “পশুত্ব” ও “মনুষ্যত্ব” কাহাকে বলে এবং কি করিয়া এই দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধতাব একই মানুষের ভিতর উদ্ভব হইতে পারে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে না পারিলে মানুষের পশুত্ব দূর করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্র নির্ধারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ।

মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের জীবনের সঙ্গে যে ছয়টি ভাব অঙ্গাদ্বী ভাবে জড়িত, সেই ছয়টি ভাবের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে হয় । সেই ছয়টি ভাবের নাম : (১) জন্ম অথবা উৎপত্তি, (২) অস্তিত্ব, (৩) পরিণতি, (৪) বৃদ্ধি, (৫) ক্ষয় ও (৬) মৃত্যু ।

ঐ ছয়টি ভাবের সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে মানুষের কোন্ কোন্ ভাব তাহার পশুত্বের অন্তর্ভুক্ত আর কোন্ কোন্ ভাব তাহার মনুষ্যত্বের অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না ।

মানুষের “জন্ম” হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানিতে না পারিলে মানুষের “অস্তিত্ব” সম্ভব

হয়, কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভব হয় না। মানুষের “অস্তিত্ব” সম্ভব হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা না থাকিলে মানুষের পরিণতি সম্ভব হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভব হয় না। মানুষের পরিণতি সম্ভব হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা না থাকিলে মানুষের বৃদ্ধি হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভব হয় না।

মানুষের “ক্ষয়” হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের “পরিণতি” ও “বৃদ্ধি” কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে ও কি কি নিয়মে হইয়া থাকে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় না। উহা প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু মানুষের “জন্ম” ও “অস্তিত্ব” কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে ও কি কি নিয়মে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা জানা না থাকিলে মানুষের ক্ষয় হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের “ক্ষয়” হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা না থাকিলে মানুষের “মৃত্যু” হয় কি কি নিয়মে ও কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় না।

জন্মাদি যে ছয়টি ভাবের সঙ্গে মানুষের জীবন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত সেই ছয়টি ভাবের সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ ছয়টি ভাবের সঙ্গে সমাকৃভাবে পরিচিত হইতে হইলে, প্রথমতঃ, মানুষের “জন্ম” ও “অস্তিত্ব”, দ্বিতীয়তঃ, মানুষের “পরিণতি” ও “বৃদ্ধি”, এবং তৃতীয়তঃ, মানুষের “ক্ষয়” ও “মৃত্যু” স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে ও কি কি নিয়মে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের “জন্মাদি” ছয়টি ভাব স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কার্য-পদ্ধতিতে এবং কি কি নিয়মে তাহার কথা অতীব বিস্তৃত। চারিটি বেদের সংহিতাংশে, ব্রাহ্মণাংশে, আরণ্যকাংশে, প্রাতিশাখ্যাংশে, উপনিষদাংশে, -গৃহ্যসূত্রাংশে এবং শ্রৌতসূত্রাংশে যে সমস্ত কথা আছে সেই সমস্ত কথার অন্ততম প্রধান অংশ মানুষের জন্মাদি ছয়টি ভাব বিষয়ক।

ঘ

মানুষের “জন্মাদি” ছয়টি ভাবের সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করিতে হইলে চারিটি বেদের সাতটি অংশের প্রায় সমস্ত কথাই আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। অতখানি আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং উহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্যও নহে।

মানুষের জন্মাদি ছয়টি ভাবের সহিত সমাকৃভাবে পরিচিত হইতে হইলে যে সমস্ত কথা জানিবার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত কথার মধ্যে যে যে কথা প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য সেই সেই কথা আমরা ঠাঁতপূর্বে পাঠকবর্গকে স্তনাইয়াছি। মানুষের পশ্চৎ ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে জন্মাদি ছয়টি ভাব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কথা জানা অপরিহার্য-ভাবে প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র সেই সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করিব।

যে যে কার্য-পদ্ধতিতে ও নিয়মে মানুষের জন্ম ও অস্তিত্ব স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয়, সেই সেই কার্য-পদ্ধতির ও নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে “মানুষ” বলিতে কি কি বুঝায় তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

প্রধানতঃ, পঞ্চবিধ উপাদান (অর্থাৎ দ্রব্য), কতিপয় গুণ ও কতিপয় শক্তির মিলনে “মানুষ” গঠিত হইয়া থাকে।

মানুষের অভিব্যক্তি হয় তাহার আকৃতিতে অথবা রূপে এবং তাহার কর্মপ্রবৃত্তিতে ও কর্মে। মানুষের আকৃতি অথবা রূপের মূল তাহার গুণসমূহ এবং ঐ গুণসমূহের মূল তাহার পঞ্চবিধ উপাদান। মানুষের কর্মপ্রবৃত্তির ও কর্মের মূল তাহার শক্তিসমূহ এবং ঐ শক্তিসমূহের মূল তাহার পঞ্চবিধ উপাদান।

শুধু মানুষ কেন, এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শ্রেণীর স্থূল-শরীর-যুক্ত পদার্থ অথবা জীব স্বতঃই উৎপাদিত হয়, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রধানতঃ পঞ্চবিধ উপাদান, কতিপয় গুণ ও কতিপয় শক্তির মিলনে গঠিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চবিধ উপাদান, গুণ ও শক্তির আদি কারণ তেজ ও রসের এক শ্রেণীর মিশ্রণ। উহা সর্বব্যাপী।

যে পঞ্চবিধ উপাদানে মানুষ এবং এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থ গঠিত হইয়া থাকে, সেই পঞ্চবিধ উপাদানের প্রত্যেকটির মধ্যে তেজ ও রস মিশ্রিত ভাবে বিद्यমান আছে। ঐ পঞ্চবিধ উপাদানের নাম : (১) ব্যোমীয়

পদার্থ (Etherial matter), (২) বায়বীয় (aerial) পদার্থ, (৩) বাষ্পীয় (gaseous) পদার্থ, (৪) তরল (liquid) পদার্থ, (৫) স্থূল (solid) পদার্থ। এই পাঁচ শ্রেণীর উপাদানের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক উপাদান আদি-কারণ-অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের রূপান্তর মাঝ। সর্বব্যাপী তেজ ও রস আদি-কারণ অবস্থায় সর্বতোভাবে চলৎশীলতাহীন (static), অপরিবর্তনশীল (constant), সমতাময় এবং সর্বতোভাবে মিলিত থাকে।

মানুষের শরীরে যে ব্যোমীয় ও বায়বীয় পদার্থসমূহ বিস্তারিত আছে তৎসম্বন্ধে আধুনিক কোন বিজ্ঞানে কোন কথা পাওয়া যায় না। ঐ সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া ত দূরের কথা, ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য আছে তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন জ্ঞানের সাফা পাওয়া যায় না। পাঠকগণের সুবিধার জন্য ঐ তিন শ্রেণীর পদার্থের মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি।

চলৎশীলতা (Dynamicity) যুক্ত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাময় মিশ্রণকে “ব্যোমীয়” (Etherial) পদার্থ বলা হয়।

বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাময় মিশ্রণ যখন সর্বতোভাবে চলৎশীলতাহীন এবং অপরিবর্তনীয় (static) হন, তখন তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় “ত্রুট” (অথবা constant) বলা হয়।

চলৎশীলতা (Dynamicity) যুক্ত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাহীন তেজ-প্রধান মিশ্রণকে “বায়বীয়” (aerial) পদার্থ বলা হয়।

চলৎশীলতাব্যুক্ত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সমতাহীন রস-প্রধান মিশ্রণকে বাষ্পীয় (gaseous) পদার্থ বলা হয়।

ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে প্রত্যেক মানুষের শরীর, গুণ ও শক্তিসমূহের সূত্রাধার যে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর পদার্থ তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বর্তমান বিজ্ঞানে মানুষের শরীরস্থ ব্যোমীয় ও বায়বীয় পদার্থসমূহের কোন কথা পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ দুই

শ্রেণীর পদার্থ যে মানুষের শরীরের দুইটি প্রধান উপাদান তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন সন্দেহ করা চলে না। মানুষের শরীরে যতপি ব্যোমীয় পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে ঐ শরীরের নমনীয়তা (flexibility) এবং যতপি বায়বীয় পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে মানুষের পাচন-শক্তি (power of digestion) থাকিতে পারিত না।

মানুষের জন্মাদি ছয়টি ভাব স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয় কোন কোন কার্য-পদ্ধতিতে এবং কি কি নিয়মে তাহার কথা চারি শ্রেণীর বেদের চারি শ্রেণীর সংহিতা প্রভৃতিতে বৈরূপ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, সংস্কৃত ভাষায় এবং অসংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার কোন গ্রন্থে ঐরূপ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। যে যে কার্য-পদ্ধতিতে ও নিয়মে স্বতঃই মানুষের জন্ম হয়, সেই সেই কার্য-পদ্ধতির ও নিয়মের কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের “জন্ম”, “অস্তিত্ব”, “পরিণতি” ও “বৃদ্ধি” সহিত পরিচিত হইতে হইলে ঐ চারিটি কথার প্রত্যেকটির অর্থের সহিত সর্বতোভাবে পরিচিত হইতে হয়। এই চারিটি কথার অর্থের সহিত পরিচিত হইতে হইলে প্রধানতঃ পঞ্চবিধ উপাদান, কতিপয় গুণ ও কতিপয় শক্তির মিলনে যে মানুষ গঠিত হইয়া থাকে তাহা স্মরণ রাখিতে হয়।

পঞ্চবিধ উপাদান এবং তাহাদের গুণ ও শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যখন মানুষের আকৃতির ও রূপের মত একটি আকৃতি ও রূপযুক্ত জীবের উৎপত্তি হয় এবং ঐ জীব মানুষের প্রবৃত্তি ও কার্য-ক্ষমতাসমূহের মত প্রবৃত্তি ও কার্য-ক্ষমতা যুক্ত হয় তখন মানুষের “জন্ম” হইয়াছে তাহা বুঝিতে হয়।

মানুষের আকৃতি ও রূপের মত একটি আকৃতি ও রূপ-যুক্ত জীব যতদিন পর্যন্ত মানুষের প্রবৃত্তি ও কার্য-ক্ষমতা-সমূহের মত প্রবৃত্তি ও কার্যক্ষমতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহার “অস্তিত্ব” বিস্তারিত আছে ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের আকৃতি আয়তনে যত প্রসারতা লাভ করিতে পারে, মানুষের রূপ ঔজ্জ্বল্যে যতদূর উজ্জ্বল হইতে পারে, মানুষের কার্য-প্রবৃত্তি সংখ্যায় যত অধিক হইতে পারে এবং মানুষের কার্যক্ষমতা পরিমাণে যত বৃদ্ধি পাইতে পারে, মানুষ যখন তত প্রসারতা, তত ঔজ্জ্বল্য, কার্যপ্রবৃত্তির

তত সংখ্যাধিক্য এবং কার্যক্ষমতার তত পরিমাণ লাভ করিবার অভিপ্রেত হয়, তখন মানুষের “পরিণতি” হইতেছে তাহা বুঝিতে হয়।

মানুষের জন্ম যে স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার সাক্ষাৎ কারণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

- (১) প্রাকৃতিক কার্য্য ;
- (২) পিতৃমাতৃ-কার্য্য ;
- (৩) স্বাভাবিক কার্য্য।

মানুষের জন্মের কারণ যেরূপ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, মানুষের গুণ এবং শক্তিসমূহও সেইরূপ তাহাদিগের উৎপত্তির কারণের দিক দিয়া দেখিলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি ;
- (২) পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তি ;
- (৩) স্বাভাবিক গুণ ও শক্তি।

প্রাকৃতিকাদি তিন শ্রেণীর কার্য্য যেরূপ মানুষের জন্মের সাক্ষাৎ কারণ সেইরূপ প্রাকৃতিকাদি তিন শ্রেণীর গুণ এবং শক্তিও প্রকারণের মানুষের জন্মের কারণ হইয়া থাকে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথা কয়টি আমরা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

আদি কারণ অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আদি কারণ অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণ এই ভূমণ্ডলের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ববিধ পদার্থে বিস্তৃত আছে, সেই অবস্থা আদি কারণ অবস্থার পরবর্তী অবস্থা। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের এই দ্বিতীয় অবস্থার কার্য্য—এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের এবং প্রত্যেক মানুষের জন্মের মূল অথবা মূখ্য কারণ। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের উপরোক্ত দ্বিতীয় অবস্থার কার্য্য যে এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের এবং প্রত্যেক মানুষের শুধু জন্মের মূল অথবা মূখ্য কারণ তাহা নহে, উহাদের অস্তিত্বের, পরিণতির এবং বৃদ্ধিরও মূল অথবা মূখ্য কারণ।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের যে দ্বিতীয় অবস্থার কার্য্য এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের এবং প্রত্যেক মানুষের জন্ম,

অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির মূখ্য অথবা মূল কারণ, সর্বব্যাপী তেজ ও রসের সেই দ্বিতীয় অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া-অবস্থা (Non-variable condition) বলা হয়। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া অবস্থার কার্য্যের নাম প্রকৃতি। এই হিসাবে এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের ও প্রত্যেক মানুষের জন্ম যে স্বতঃই সম্ভব-যোগ্য হয়, তাহার মূল অথবা মূখ্য কারণ “প্রকৃতি” অথবা প্রাকৃতিক কার্য্য।

প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে যেমন মানুষের জন্ম, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সাধিত হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মানুষের অবস্থাবে এক শ্রেণীর গুণ এবং শক্তিও ঐ প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গুণ ও শক্তিকে “প্রকৃতির দেওয়া গুণ ও শক্তি” অথবা প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি বলা হয়।

মূলতঃ অথবা মূখ্যতঃ একমাত্র “প্রাকৃতিক কার্য্য” এবং “প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি” হইতে মানুষের জন্ম স্বতঃই সম্ভবযোগ্য হয়।

মূলতঃ অথবা মূখ্যতঃ একমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্য এবং প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি হইতে—মানুষের জন্ম স্বতঃই সম্ভব-যোগ্য হয় বটে কিন্তু কার্য্যতঃ পিতামাতার কোন মিলন না হইলে এবং মাতা গর্ভধারণ না করিলে কোন মানুষের জন্ম হয় না। কেন উহা হয় না তাহার ব্যাখ্যা করিতে বসিলে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত কথা মানুষের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অন্তর্ধান-সমূহের মূলস্থত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নপ্রয়োজনীয়। এই কারণে ঐ সমস্ত কথার আলোচনা আমরা এখানে করিব না।

পিতামাতার যৌন-মিলন না হইলে এবং মাতা গর্ভধারণ না করিলে কোন মানুষের জন্ম হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্য এবং প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির কার্য্য না থাকিলে কোন মানুষের জন্ম হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

পিতামাতার যৌন মিলনের কার্য্যকে মানুষের জন্মের এক শ্রেণীর কারণ বলা হয়। পিতামাতার কার্য্যের অপর নাম পিতৃমাতৃ-কার্য্য। পিতামাতার কার্য্য যেমন মানুষের জন্মের এক শ্রেণীর কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পিতামাতার গুণ এবং শক্তিও মানুষের অবস্থাবৎ সর্ববিধ উপাদানের এক

শ্রেণীর গুণ ও শক্তি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গুণ ও শক্তিকে মানুষের পিতামাতার দেওয়া গুণ ও শক্তি অথবা পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তি বলা হইয়া থাকে।

মানুষ তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অবস্থায় যে রূপ ছোট্ট শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ ছোট্ট শরীরের জন্মকেই মানুষের জন্ম বলিয়া ধরিয়া লইলে মানুষের জন্মের কারণ কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর বলিয়া ধরিতে হয়; যথা : (১) প্রাকৃতিক কাণ্ডা এবং (২) পিতৃ-মাতৃ কাণ্ডা। কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে উপরোক্ত ছোট্ট শরীরের জন্মকেই পূর্ণ মানুষের জন্ম বলিয়া ধরা চলে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রত্যেক নিমেষে যে ছোট্ট বড় পরিবর্তনসমূহ দেখা যায়—সেই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে এক অবস্থার জীবন হইতে যে আর এক অবস্থার জীবনের উদ্ভব হয়, সেই অবস্থান্তরসমূহ জীবনের সম্পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিসঙ্গতভাবে এই অবস্থান্তরসমূহের প্রত্যেকটিকে মানুষের এক একটা জন্ম বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। প্রাকৃতিক কাণ্ডা, পিতৃমাতৃ-কাণ্ডা, প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি এবং পিতৃ-মাতৃ গুণ ও শক্তি উপরোক্ত অবস্থান্তরসমূহের অন্তঃসম কারণ হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক কাণ্ডা, পিতৃমাতৃ-কাণ্ডা, প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি এবং পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তি যেরূপ উপরোক্ত অবস্থান্তর-সমূহের অন্তঃসম কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার মানুষের স্ব স্ব স্বভাবের কাণ্ডা এমন কি স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ ও শক্তি পর্যন্ত ঐ অবস্থান্তর সমূহের কারণ হইতে পারে এবং হয়।

মানুষ তাহার স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্ত যে সমস্ত কাণ্ডা করে, সেই সমস্ত কাণ্ডাকে সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় মানুষের স্ব স্ব স্বভাবের কাণ্ডা, অথবা স্বাভাবিক কাণ্ডা বলা হইয়া থাকে। মানুষের স্বাভাবিক কাণ্ডা এক শ্রেণীর হইতে পারে, আবার একাধিক শ্রেণীরও হইতে পারে।

মানুষ তাহার স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্ত যে সমস্ত কাণ্ডা করে, সেই সমস্ত কাণ্ডা যখন সর্বতোভাবে প্রকৃতির কাণ্ডার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয়, তখন মানুষের স্বাভাবিক কাণ্ডাসমূহ সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক কাণ্ডাসমূহের অনুরূপ হয়। তখন নামে প্রাকৃতিক কাণ্ডা ও স্বাভাবিক কাণ্ডা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও কলে দুই শ্রেণীর কাণ্ডাই এক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

পিতামাতা তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্ত যে সমস্ত কাণ্ডা করেন, সেই সমস্ত কাণ্ডা যখন সর্বতোভাবে প্রকৃতির কাণ্ডার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয়, তখন পিতামাতার স্বাভাবিক কাণ্ডাসমূহও সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক কাণ্ডাসমূহের অনুরূপ হয়। তখনও নামে পিতৃমাতৃ-কাণ্ডার শ্রেণী বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কলে উহার কোন শ্রেণী বৈশিষ্ট্য থাকে না।

মানুষ তাহার স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্ত যে সমস্ত কাণ্ডা করে সেই সমস্ত কাণ্ডা যখন প্রকৃতির কাণ্ডার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় না, তখন মানুষের স্বাভাবিক কাণ্ডাসমূহ একাধিক শ্রেণীর হইয়া থাকে। সেইরূপ পিতামাতা তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্ত যে সমস্ত কাণ্ডা করেন, সেই সমস্ত কাণ্ডা যখন প্রকৃতির কাণ্ডার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় না, তখন পিতামাতার স্বাভাবিক কাণ্ডাসমূহও একাধিক শ্রেণীর হইয়া থাকে।

মানুষের জন্মের কারণ যেমন প্রাকৃতিকাদি তিন শ্রেণীর কাণ্ডা ও তিন শ্রেণীর গুণ ও শক্তি, মানুষের অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ, সেইরূপ তিন শ্রেণীর কাণ্ডা এবং তিন শ্রেণীর গুণ ও শক্তি হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কাণ্ডা ও প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি।

পিতার অথবা মাতার অথবা মানুষের নিজের স্বাভাবিক প্রত্যেক কাণ্ডা যখন সর্বতোভাবে শরীরস্থ প্রাকৃতিক কাণ্ডার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হয় এবং আদৌ অসামঞ্জস্য অথবা বিরুদ্ধ হয় না, তখন পিতৃমাতৃ-কাণ্ডা এবং মানুষের স্ব স্ব স্বাভাবিক কাণ্ডাও মানুষের অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে।

পিতার অথবা মাতার অথবা মানুষের নিজের স্বাভাবিক কোন কাণ্ডা যখন কোনরূপে শরীরস্থ প্রাকৃতিক কাণ্ডার অসামঞ্জস্য অথবা বিরুদ্ধ হয়, তখন পিতৃমাতৃ-কাণ্ডা অথবা স্ব স্ব স্বাভাবিক কাণ্ডা, পরিণতি ও বৃদ্ধির কারণ হওয়া তো দূরের কথা, ঐ উভয় শ্রেণীর কাণ্ডাই মানুষের ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে।

পিতা অথবা মাতার অথবা মানুষের নিজের স্বাভাবিক কাণ্ডা প্রাকৃতিক কাণ্ডার বিরুদ্ধ হইলেও মানুষ কিছুদিন সুখ ও দুঃখ-মিশ্রিত জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম

হয় এবং এমন কি জীবনের কয়েক বৎসর পর্যন্ত পরিণতি ও বৃদ্ধি পর্যন্ত চলিতে থাকে।

পিতৃমাতৃ-কাৰ্য্যের এবং মানুষের নিজের কাৰ্য্যের শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যের বিৰুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যে শরীরের পরিণতি ও বৃদ্ধি ঘটতে পারে, তাহার একমাত্র কারণ মানুষের শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্য।

মানুষের শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্য কখনও ক্ষয় অথবা মৃত্যুর কারণ হয় না।

মানুষের “ক্ষয়” ও “মৃত্যু” বিবরণ

মানুষের শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্য সৰ্বদা শৰীরের মধ্যে বিद्यমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের “ক্ষয়” ও “মৃত্যু” হওয়া সম্ভব হয় যে যে কাৰ্য্য বশতঃ, সেই সেই কাৰ্য্যের কথা মানুষের “ক্ষয়” ও “মৃত্যু” কথাসমূহের মধ্যে প্ৰধান।

মানুষের শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্য সৰ্বদা শৰীরের মধ্যে বিद्यমান থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের “ক্ষয়” ও “মৃত্যু” হওয়া সম্ভব হয় তাহাব কারণ দুই শ্ৰেণীর, যথা :

- (১) পিতৃমাতৃ-কাৰ্য্যের এবং শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও উভয়বিধ কাৰ্য্যের বিৰুদ্ধতা ; এবং
- (২) মানুষের নিজের স্বভাবের কাৰ্য্য এবং শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও উভয়বিধ কাৰ্য্যের বিৰুদ্ধতা।

মানুষের শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্য সৰ্বদা শৰীরের মধ্যে বিद्यমান থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের ক্ষয় ও মৃত্যু হওয়া সম্ভব হয় কি কৰিয়া, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে প্ৰথমতঃ “ক্ষয়” ও “মৃত্যু” কাহাকে বলে, এবং দ্বিতীয়তঃ শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যসমূহ মানুষের “পরিণতি” ও “বৃদ্ধি” সাধন করে কোন্ কোন্ কাৰ্য্য-পদ্ধতিতে—তাহার কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

পরিণতি ও বৃদ্ধির বাহা বিপৰীত, তাহার নাম মানুষের “ক্ষয়”।

গুণ ও শক্তিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি ও রূপ ধারণের সক্ষমতার, এবং কাৰ্য্য-প্ৰবৃত্তি ও কাৰ্য্যক্ষমতা রক্ষা কৰিবার সক্ষমতার বিলুপ্তির নাম মানুষের “মৃত্যু”।

মানুষের “মৃত্যু” দুই শ্ৰেণীর।

বিশেষ কোন একটা অথবা ততোধিক গুণ ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন আকৃতিবিশেষের ও রূপবিশেষের ধারণ

কৰিবার সক্ষমতার এবং কাৰ্য্যপ্ৰবৃত্তি-বিশেষ ও কাৰ্য্যক্ষমতা-বিশেষ রক্ষা কৰিবার সক্ষমতার বিলুপ্তি মানুষের এক শ্ৰেণীর মৃত্যু। এই শ্ৰেণীর মৃত্যুতে মানুষের অবস্থা-বিশেষের বিলুপ্তি হইয়া অবস্থান্তর অথবা ক্ষয়কর অবস্থার পৰিবৰ্ত্তন ঘটয়া থাকে। অপর শ্ৰেণীর মৃত্যুতে সৰ্ববিধ আকৃতি ও রূপ ধারণ কৰিবার এবং কাৰ্য্যপ্ৰবৃত্তি ও কাৰ্য্যক্ষমতা রক্ষা কৰিবার সক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত দুই শ্ৰেণীর মৃত্যুর মধ্যে শেষোক্ত শ্ৰেণীর মৃত্যু প্ৰত্যেক মানুষের পক্ষে অপৰিহাৰ্য্য। প্ৰথম শ্ৰেণীর মৃত্যুর হাত হইতে সৰ্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া মানুষের সাধ্যান্তৰ্গত। প্ৰথম শ্ৰেণীর মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়াকে সংস্কৃত ভাষায় “নিৰ্বাণ” বলা হয়। “নিৰ্বাণ” আর “পশুত্বের নিবারণ” একার্থক। “পশুত্ব দূর করাকে” সংস্কৃত ভাষায় “মুক্তি” বলা হয়। “সৰ্ববিধ হুংস সৰ্বতোভাবে দূর করাকে” সংস্কৃত ভাষায় “মোক্ষ” বলা হয়।

শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যসমূহ মানুষের “পরিণতি” ও “বৃদ্ধি” সাধন করে যে যে কাৰ্য্য-পদ্ধতিতে সেই সেই কাৰ্য্য-পদ্ধতির কথা ধারণা কৰিতে হইলে ঐ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যসমূহ যে যে পদ্ধতিতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখে সেই সেই কাৰ্য্য-পদ্ধতির কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

শরীরস্থ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যের ধৰ্ম্ম প্ৰধানতঃ তিন শ্ৰেণীর, যথা :

- (১) শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের প্ৰত্যেক শ্ৰেণীর উপাদানে যে সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্ৰণ থাকে, সেই মিশ্ৰণের তেজের পরিমাণের ও কাৰ্য্যের বৃদ্ধি সাধন করা ;
- (২) শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের প্ৰত্যেক শ্ৰেণীর উপাদানে যে সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্ৰণ থাকে, সেই মিশ্ৰণের রসের পরিমাণের ও কাৰ্য্যের বৃদ্ধি সাধন করা ;
- (৩) শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের প্ৰত্যেক শ্ৰেণীর উপাদানে যে সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্ৰণ থাকে সেই মিশ্ৰণের তেজ ও রসের পরিমাণের ও কাৰ্য্যের সমতা সাধন করা।

প্ৰত্যেক মানুষের শৰীৰে প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যের উপরোক্ত তিনটি ধৰ্ম্মের কাৰ্য্য যুগপৎ সাধিত হওয়া ঐ প্ৰাকৃতিক কাৰ্য্যের নিয়ম।

শরীরের কোন উপাদানের তেজ কমিয়া যাওয়া অথবা তেজের বৃদ্ধি হইবার আগেই রসের বৃদ্ধি হওয়া প্রাকৃতিক কার্যের নিয়ম নহে।

যে মানুষের শরীরে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্যই চলিতে থাকে এবং প্রাকৃতিক কার্যের সহিত অসামঞ্জস্যবদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক কার্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য চলিতে পারে না, সেই মানুষের শরীরে জন্মাবধি তেজ ও রসের পরিমাণ ও কার্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া নিয়মিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবৎকালে ঐ তেজ ও রসের পরিমাণ ও কার্য কখনও একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি পাইতে পারে না। জীবৎকালে ঐ তেজ ও রসের পরিমাণ ও কার্য কখনও হ্রাস পাইলেই বৃদ্ধিতে হয় যে, শরীরের মধ্যের প্রাকৃতিক কার্যের সহিত অল্প কোন শ্রেণীর কার্যও চলিতেছে।

যে মানুষের শরীরে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্যই চলিতে থাকে এবং প্রাকৃতিক কার্যের সহিত অসামঞ্জস্যবদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক কার্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য চলিতে পারে না, তাহার গুণ ও শক্তিসমূহ পরিমাণে ও বেগে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায় কিন্তু সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাকৃতিক কার্য হইতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি কখনও সংখ্যায় অসংখ্য হইতে পারে না। বৈকৃতিক কার্য হইতে যে সমস্ত বৈকৃতিক গুণ ও শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত গুণ ও শক্তি সংখ্যায় অসংখ্য হইয়া থাকে। বৈকৃতিক কোন গুণ ও শক্তি পরিমাণে ও বেগে কখনও সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

যে মানুষের শরীরে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য চলিতে থাকে, সে সাধারণ জীবন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও যৌবন উপভোগ করিতে থাকে। তাহার যতই বয়স হউক না কেন, সে কখনও ব্যাধিগ্রস্ত অথবা জরাগ্রস্ত হয় না। তাহার শারীরিক অথবা মানসিক বল কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না; উভয়বিধ বলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার মৃত্যু হয় একবার এবং সেই মৃত্যু পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্যু। মানুষের পক্ষে তেজ ও রসের যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ও বেগ লাভ করা সম্ভবযোগ্য, তেজ ও রসের সেই

সর্বোচ্চ পরিমাণ ও বেগ লাভ করিবার পর তেজ ও রসের বিচ্ছেদ ঘটে। যে মানুষের শরীরে কেবল মাত্র প্রাকৃতিক কার্য চলিতে থাকে, সেই মানুষের মৃত্যু হয় তাহার শরীরস্থ তেজ ও রসের উপরোক্ত বিচ্ছেদবশতঃ।

মানুষের শরীরে কেবল প্রাকৃতিক কার্য বিস্তারিত থাকিলে এবং যে সমস্ত কার্য প্রাকৃতিক কার্যের সহিত অসামঞ্জস্যবদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক কার্যের বিরুদ্ধ সেই সমস্ত কার্য বিস্তারিত না থাকিলে যে-মানুষের পক্ষে উপরোক্ত আকাজক্ষণীয় জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, তাহার একমাত্র কারণ প্রাকৃতিক কার্য সর্বদাই মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের সমতা রক্ষা করে এবং মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের এক যোগের, এক পরিমাণের এবং এক বেগের কার্যের সহায়তা করে।

মানুষের পিতামাতার স্বভাব যত্বপি সর্বতোভাবে তাঁহাদিগের স্ব স্ব শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের অনুরূপ হয় তাহা হইলে মানুষ তাহার পিতামাতার নিকট হইতে যে সমস্ত গুণ ও শক্তি পাইয়া থাকে, সেই সমস্ত গুণ ও শক্তির কার্যও প্রাকৃতিক কার্যের সহিত সামঞ্জস্য বৃদ্ধি হয় এবং তখন পিতৃমাতৃ-কার্য, গুণ এবং শক্তিও মানুষের পরিণতি ও বৃদ্ধির সহায়তা করে।

সেইরূপ আবার মানুষের নিজের স্বভাব যত্বপি সর্বতোভাবে স্ব স্ব শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের অনুরূপ হয় তাহা হইলে মানুষের স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কার্যও প্রাকৃতিক কার্যের সহিত সামঞ্জস্যবদ্ধ হয় এবং তখন মানুষের নিজ নিজ স্বাভাবিক কার্য, গুণ এবং শক্তিও মানুষের পরিণতি ও বৃদ্ধির সহায়তা করে। মানুষের পিতার অথবা মাতার স্বভাব অথবা মানুষের নিজের স্বভাব যখন তাঁহাদিগের স্ব স্ব শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের অনুরূপ না হইয়া অসামঞ্জস্যবদ্ধ হয়, তখন মানুষের পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তির কার্য এবং স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কার্য শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের সহিত অসামঞ্জস্যবদ্ধ হয়।

মানুষের পিতৃমাতৃ-গুণ ও শক্তির কার্য অথবা স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কার্য শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের সহিত অসামঞ্জস্যবদ্ধ হইলে মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব

হওয়া অনিবার্য হয়। মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে, শরীরস্থ বোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি মানুষের আকৃষ্টতা বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ সাধারণতঃ তরল ও স্থূল-উপাদানসমূহের কার্য, গুণ ও শক্তিসমূহ বত গুরু (heavy) ও বত সহজে অম্লত্বের যোগ্য, বোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের কার্য, গুণ ও শক্তিসমূহ তত গুরু ও তত সহজে অম্লত্বের যোগ্য নহে। মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্যের অসমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইয়া সমতার প্রবৃত্তি বজায় থাকিলে পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার উপরোক্ত প্রভেদের অথবা অসমতার উদ্ভব হইতে পারে না।

পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার উপরোক্ত তারতম্যবশতঃ দুই শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্যের উদ্ভব হয়। এক শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য মানুষের নিজ নিজ গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে ধারণা-বিষয়ক, আর এক শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্য মানুষ যে সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি লাভ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তির নির্বাচন-বিষয়ক। মানুষের উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্যকে সংস্কৃত ভাষায় “অভিমান” বলা হয়; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রান্তিমূলক কার্যকে বৈকৃতিক ইচ্ছা বলা হয়। পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার উপরোক্ত তারতম্য না ঘটিয়া সমতা বিস্তমান থাকিলে মানুষের অভিমান অথবা “বৈকৃতিক ইচ্ছার” উদ্ভব হইতে পারে না।

মানুষের অভিমান অথবা বৈকৃতিক ইচ্ছার উদ্ভব হইলে মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের একযোগের, এক পরিমাণের এবং এক বেগের কার্য অসম্ভব হয়।

মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের একযোগের, এক পরিমাণের এবং একবেগের কার্য অসম্ভব হইলে একদিকে প্রতিনিমেয়ে নূতন নূতন বৈকৃতিক গুণ ও বৈকৃতিক শক্তির উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করে এবং আবার তাহাদের বিলুপ্তি ঘটে; অত্নদিকে প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের ও বেগের বৃদ্ধি ঘটা

অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপে মানুষের ক্ষয় অনিবার্য হইয়া থাকে।

উপরোক্তভাবে মানুষের ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিলে প্রতিনিমেয়ে মানুষের প্রথম শ্রেণীর মৃত্যু হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্যুও অকালে ঘটয়া থাকে।

মানুষের মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা—

যাহা কিছু মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের অথবা প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের ও বেগের বৃদ্ধি সাধন করিবার সহায়তা করে অথবা এক কথায় মানুষের বৃদ্ধির সহায়তা করে, তাহার নাম মানুষের “মনুষ্যত্ব”।

উপরোক্ত কথামুসারে প্রথমতঃ মানুষের তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতা ও বিষমতা নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্যসমূহ; দ্বিতীয়তঃ, বোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের কার্য গুণ ও শক্তির প্রতি আকৃষ্টতার বৃদ্ধি নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্যসমূহ, তৃতীয়তঃ—অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছা নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্যসমূহ; চতুর্থতঃ—মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের কার্যের যোগহীনতা, পরিমাণ-প্রভেদ ও বেগ-প্রভেদ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার কার্যসমূহ—প্রধানতঃ মানুষের মনুষ্যত্বের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের পশুত্বের সংজ্ঞা—

যাহা কিছু মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্যের অথবা প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের ও বেগের ক্ষয় সাধন করে অথবা এক কথায় মানুষের ক্ষয় সাধন করে, তাহার নাম—মানুষের পশুত্ব।

প্রধানতঃ চারিশ্রেণীর কার্য মানুষের পশুত্বের অন্তর্ভুক্ত, যথা :

- (১) মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি আনয়ক কার্যসমূহ ;
- (২) মানুষের শরীরের পঞ্চবিধ উপাদানের কার্য, গুণ ও শক্তির প্রতি সমান আকৃষ্টতা রক্ষা না করিয়া বোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের প্রতি অধিকতর আকৃষ্টতার কার্যসমূহ ;

(৩) অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার কার্যসমূহ ;

(৪) মানুষের পঞ্চবিধ উপাদানের যোগহীনতা, পরিমাণ-প্রভেদ ও বেগ-প্রভেদ বুদ্ধিকর কার্যসমূহ ।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন
করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের উত্তরাংশ

মানুষের মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে কোন্ কোন্ কারণে মানুষের পশুত্বের উদ্ভব হয় এবং কোন্ কোন্ উপায়ে মনুষ্যত্ব সাধন করা সহজ-সাধ্য হয়, তাহা নির্ধারণ করা যায় ।

মানুষের জীবনের ছয়টি ভাবের উৎপত্তি হয় যে যে কারণে এবং যে যে কার্য-পদ্ধতিতে, সেই সেই কারণ ও কার্য-পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের পিতার ও মাতার স্ব স্ব জীবনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্যাবশতঃ সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি উদ্ভব হয় ।

শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও বেগের উপরোক্ত অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তিবশতঃ, শিশুর অবয়বে যখন ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছা-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়—তখন বিচারময় ইচ্ছা-শক্তির ও ইচ্ছা-প্রবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কতিপয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রতি অমুখ্যাপ্রবৃত্তি আর কতিপয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রতি বিবেকের প্রবৃত্তি বিকাশ হইয়া থাকে ।

উপরোক্ত রাগ, ঘেব-প্রবৃত্তিবশতঃ মানুষের অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার উৎপত্তিবশতঃ মানুষ নানা রকমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য করে এবং শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের যোগহীনতা-পরিমাণ-প্রভেদ, ও বেগ-প্রভেদ বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং মানুষ পশুত্বময় হইয়া পড়ে ।

অত্ৰুদিকে শিশুর শরীরস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণের পরিমাণের ও বেগের বাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, শিশুর হৃদয়ে রাগ-ঘেবের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা অসম্ভব হয়। শিশুর হৃদয়ে রাগ-ঘেবের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য

না হইলে অভিমানের বীজাকুরিত হওয়া কষ্ট-সাধ্য হয়। শিশুর হৃদয়ে রাগ-ঘেবের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে অভিমানের বীজাকুরিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয় বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে অসাধ্য হয় না। শিশুর হৃদয়ে অভিমানের বীজাকুরিত হওয়া বাহাতে সর্বতোভাবে অসাধ্য হয়, তাহা করিতে হইলে শিশু তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে একদিকে তাহার নিজের অবয়বের পঞ্চবিধ উপাদানের এবং গুণ ও শক্তির অবস্থা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে অক্ষম না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। অত্ৰুদিকে, অপরের গুণ ও শক্তির অবস্থা বাহাতে বিচার করিয়া নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করিতে পারে তাদৃশ-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরোক্ত দুইটা ব্যবস্থা সাধিত হইলে এবং রাগ-ঘেবের প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা অসম্ভব হইলে—অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার বীজাকুরিত হওয়া অসাধ্য হয়। ইহার কারণ, মানুষ যে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হয়, তাহার মূলে থাকে রাগ ও ঘেব এবং নিজেকে খুব প্রকৃষ্ট বলিয়া অথবা অপরের তুলনায় প্রকৃষ্টতর বলিয়া গণনা করিবার প্রবৃত্তি ও অপরকে নিজের তুলনায় নিকৃষ্টতর বলিয়া গণনা করিবার প্রবৃত্তি। মানুষ যদি স্ব স্ব পঞ্চবিধ উপাদানের এবং গুণ ও শক্তির অবস্থা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে অক্ষম না হয় এবং অপরের গুণ ও শক্তির অবস্থা নির্ভুলভাবে বিচার করিয়া নির্ধারণ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে নিজেকে অথবা প্রকৃষ্ট অথবা প্রকৃষ্টতর এবং অপরকে নিকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিতে পারে না এবং অভিমানের বীজও অকুরিত হইতে পারে না।

মানুষ যদি অভিমানগ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে সহজে কোন বৈকৃতিক ইচ্ছা স্থান পায় না। অভিমান-গ্রস্ত না হইলে সহজে কোন বৈকৃতিক ইচ্ছা স্থান পায় না বটে, কিন্তু বাহিত অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির নির্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকিলে অভিমানগ্রস্ত না হইলেও অতিক্রান্তভাবে বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষ বাহাতে কোন বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত না হইতে পারে এবং না হয়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যত্নপ

মানুষ বাহাতে অভিমানগ্রস্ত না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়—সেইরূপ আবার বাহিতে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির নির্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বাহাতে অজ্ঞতা না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষ যদি নিজেকে সর্ববিধ বৈকৃতিক ইচ্ছার হাত হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়।

প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য যদি মানুষ না করে, তাহা হইলে তাহার পশুত্বের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়।

মানুষের পশুত্ব বাহাতে সর্বতোভাবে নিবারিত হয়, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে বাহাতে অসমতা ও বিষমতার উৎপত্তি হইতে না পারে তাহা করিতে হয় ; দ্বিতীয়তঃ, মানুষের হৃদয়ে বাহাতে রাগ-দেব স্থান না পায় তাহা করিতে হয় ; তৃতীয়তঃ, বাহাতে অভিমান স্থান না পায় তাহা করিতে হয় ; চতুর্থতঃ, বাহাতে বৈকৃতিক ইচ্ছা স্থান না পায় তাহা করিতে হয় ; পঞ্চমতঃ, মানুষ বাহাতে তাহার শরীরস্থ প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য না করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় ; ষষ্ঠতঃ, মানুষের শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের কার্যের যোগহীনতা, পরিমাণ-প্রভেদ ও বেগ-প্রভেদ বাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিবার অমুষ্ঠানসমূহের মূল নৃত্র সাত শ্রেণীর, যথা :

(১) মানুষের অবয়বস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে বাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা ;

(২) মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে বাহাতে সর্বতোভাবে অক্ষম না হয় এবং অস্বাভাবিকভাবে সক্ষম হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ ও কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বাহাতে সর্বতোভাবে অজ্ঞ না হয় পরন্তু অস্বাভাবিকভাবে জ্ঞানবান হয় তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) কোন্ কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য, কোন্ কোন্ শ্রেণীর গুণ, এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর শক্তি মানুষের স্ব স্ব প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের বৃদ্ধির সহায়ক, আর কোন্ কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য, কোন্ কোন্ শ্রেণীর গুণ এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর শক্তি মানুষের স্ব স্ব প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির বিকৃতিসাধক তৎসম্বন্ধে মানুষ বাহাতে সর্বতোভাবে অজ্ঞ না থাকে পরন্তু অস্বাভাবিকভাবে জ্ঞানবান হয় তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শ্রেণীর প্রকৃতিজাত ও স্বভাব-জাত দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে সমস্ত শ্রেণীর প্রকৃতিজাত ও স্বভাবজাত গুণ ও শক্তি অনুভব করা যায় তাহার প্রত্যেকটির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যুর মূল কারণ ও কার্যপদ্ধতি কি কি তৎসম্বন্ধে মানুষ বাহাতে সর্বতোভাবে অজ্ঞ না থাকে, পরন্তু অস্বাভাবিকভাবে জ্ঞানবান হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) মানুষের শরীরের অথবা অন্তরের বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইলে তাহা বাহাতে স্থায়ী না হয় এবং অনতিবিলম্বে নিবারিত হয়, তদ্ব্যবস্থামূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা ;

(৭) মানুষের কোন কার্যে অথবা স্বাভাবিক কোন কারণে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইলে তাহা বাহাতে কোন কৃষ্ণ-আনয়ক না হইতে পারে তদ্ব্যবস্থামূলক “স্বাভাবিক কার্যের” ব্যবস্থা।

উপরোক্ত সাতটি ব্যবস্থার প্রথমোক্ত পাঁচটি ব্যবস্থা সাক্ষাৎভাবে মানুষের রাগ, দেব এবং অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার উদ্ভব বাহাতে না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যমূলক ; আর শেষোক্ত দুইটি ব্যবস্থা গোণভাবে ঐ উদ্দেশ্যমূলক। মানুষের অবয়বস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে বাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয়, অথবা অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হইলে তাহা বাহাতে নিবারিত হয় তদ্ব্যবস্থায় শেষোক্ত দুইটি ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হয়।

মানুষের বাহাতে রাগ-দেবের উদ্ভব না হইতে পারে এবং না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার অবয়বস্থ তেজ ও রসের

মিশ্রণে বাহাতে অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের বাহাতে অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে বাহাতে সর্বতোভাবে অক্ষম না হয় এবং অল্লাধিকভাবে সক্ষম হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অজ্ঞতা থাকিলে এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণের জ্ঞান না থাকিলে উপরোক্ত উপলব্ধি করিবার সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না বলিয়া অভিমানের প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন উপলব্ধি শিখিবার ব্যবস্থা করিতে হয় সেইরূপ আবার মানুষ তাহার নিজের ও অপরের শরীরের ও অন্তরের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বাহাতে সর্বতোভাবে অজ্ঞ না হয় পরন্তু অল্লাধিকভাবে জ্ঞানবান্ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের কোন ইচ্ছা বাহাতে তাহার অজ্ঞাতভাবে বৈজ্ঞানিক বলিয়া গণ্য হইতে না পারে, তাহা করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

কোন শ্রেণীর জ্বা, কোন শ্রেণীর গুণ, কোন শ্রেণীর শক্তি মানুষের স্ব স্ব প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তির পরিমাণের বৃদ্ধির অথবা ক্ষয়ের সহায়ক তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য উপরোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের অবয়বস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে বাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয় এবং মানুষ বাহাতে অস্থূল না হয় তাহার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যবস্থার সহায়তার জন্য সপ্তম শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের পশুত্ব বাহাতে নিবারণিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে স্বতঃই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। ইহার কারণ মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্য বিনা বাধায় চলিতে থাকিলে মানুষের প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তিসমূহ স্বতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশুত্বের কার্য্যসমূহ মানুষের শরীরস্থ প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ঐ বাধাসমূহ অপসারিত হইলে প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহই মানুষের মনুষ্যত্ব সাধন করে।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহের ব্যাখ্যা

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহের মূলমন্ত্র যে সাতটি ব্যবস্থা—সেই সাতটি ব্যবস্থার প্রথম ব্যবস্থার নাম—

“মানুষের অবয়বস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণে বাহাতে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব না হয়—তাহার ব্যবস্থা—”

কোন কোন অমুষ্ঠান সাধন করিলে উপরোক্ত ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে কোন কোন কারণে অথবা কোন কোন কার্য্যে মানুষের অবয়বে যে তেজ ও রস মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে সেই তেজ ও রস অসম ও বিষম হইতে পারে—তাহা নির্ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক মানুষের অবয়বে যে তেজ ও রস মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই তেজ ও রস সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর কার্য্যবশতঃ অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিসূক্ত হয়, যথা :

- (১) মানুষের পিতামাতার কার্য্যসমূহ ;
- (২) মানুষের অপ্রাপ্ত বয়সে তাহার পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের কার্য্যসমূহ ;
- (৩) মানুষের প্রাপ্ত বয়সে তাহার নিজ কার্য্যসমূহ ;
- (৪) জমি, জল ও হাওয়ার অত্যন্তরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতার কার্য্যসমূহ।

প্রত্যেক মানুষের অবয়বে যে তেজ ও রস বারবার অবস্থায় মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই তেজ ও রস, মাতাপিতার যে সমস্ত কার্য্যে অসমতা ও বিষমতার

প্রবৃত্তিযুক্ত হয়—সেই সমস্ত কার্য প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :

- (১) মাতার ও পিতার অযোগ্য-মিলন ;
- (২) মাতার গর্ভাশয় গর্ভধারণযোগ্য হইলে গর্ভাশয়স্থিত তেজ ও রসের যে অসমতা ও বিষমতা প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ;
- (৩) মাতা গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারণ বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ;
- (৪) মাতৃ-গর্ভস্থিত ভ্রূণ যখন তরলাকার ও স্থলাকার ধারণ করে তখন ঐ ভ্রূণের ক্রমবিবর্ত্তমান অতিরিক্ত গুরুত্ব-বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয় সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ।

মাতাপিতার অযোগ্য মিলন কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখিতে হয় যে, সন্তানের গুণ ও শক্তির উৎপত্তি হয়—সাক্ষাৎভাবে পিতার গুণ ও শক্তির সহিত মাতার গুণ ও শক্তির মিশ্রণে। পিতার গুণ ও শক্তি অথবা মাতার গুণ ও শক্তি অপকৃষ্ট হইলে যেদ্রুপ সন্তানের গুণ ও শক্তি অপকৃষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ আবার যে দুই শ্রেণীর গুণ ও শক্তির মিশ্রণ, যোগ্য মিশ্রণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাদৃশ যোগ্য মিশ্রণ না হইলেও সন্তানের গুণ ও শক্তি অপকৃষ্ট হইতে পারে।

প্রধানতঃ পিতার শরীরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সহিত মাতার অন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে সন্তানের উৎপত্তি হয়। পিতার শরীরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রস যখন মাতার গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন ঐ মিশ্রণের ফলে যত্বেপি মাতার গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ এবং রস সর্বতোভাবে মিলিত হয়, তাহা হইলে সন্তানের উৎপত্তি হয়। মাতাপিতার যৌন-মিলনে যত্বেপি মাতার গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ এবং রস সর্বতোভাবে মিলিত না হয়, তাহা হইলে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। কোন গর্ভধারণ-

যোগ্য। জীলোকের গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ এবং রস সাধারণতঃ কখনও সর্বতোভাবে মিলিত হয় না। উহারা (অর্থাৎ তেজ ও রস) সর্বদাই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রযত্নশীল থাকে। কেবল মাত্র পুরুষের শরীরস্থ বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের কাণ্যের ফলে জীলোকের গর্ভাশয়স্থিত তেজ ও রসের সর্বতোভাবে মিলন অথবা মিশ্রণ সম্ভবযোগ্য হয়। এই কারণে পুরুষের সহিত সংযোগ বাতীত কখনও কোন জীলোকের গর্ভধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থার তেজ ও রসের সর্বতোভাবে মিলন অথবা মিশ্রণ ব্যতীত কখনও কোন সন্তান-সম্ভাবনা হয় না বটে কিন্তু সন্তানের শরীরে যে তেজ ও রসের উৎপত্তি হয় সেই তেজ ও রস সর্বদা মিলন প্রবৃত্তিযুক্ত হয় না। কোন সন্তানের তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়। আবার কোন কোন সন্তানের তেজ ও রসে অমিলন প্রবৃত্তির আধিক্য থাকিতে পারে। শ্রেণী-বিশেষের পুরুষের সহিত শ্রেণীবিশেষের জীলোকের যৌন মিলন হইলে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় সেই সন্তানের শরীরের তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়। যে শ্রেণীর পুরুষের সহিত যে শ্রেণীর জীলোকের যৌন মিলন হইলে সন্তানের শরীরের তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়, সেই শ্রেণীর পুরুষের সহিত সেই শ্রেণীর জীলোকের বিবাহকে যোগ্য বিবাহ বলা হয়। যে শ্রেণীর পুরুষের সহিত যে শ্রেণীর জীলোকের যৌন মিলন হইলে সন্তানের শরীরের তেজ ও রস অমিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়, সেই শ্রেণীর পুরুষের সহিত সেই শ্রেণীর জীলোকের বিবাহকে অযোগ্য বিবাহ বলা হয়। অযোগ্য বিবাহ অথবা অযোগ্য মিলনের ফলে যে সমস্ত সন্তানের উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রস কখনও মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয় না। ইহার ফলে ঐ সমস্ত সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রস সর্বদাই অসমতায়ুক্ত হইয়া থাকে এবং সময় সময় বিষমতায়ুক্তও হয়।

যাহাদের শরীরস্থ তেজ ও রস অসমতার অথবা বিষমতার প্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয় তাহাদের অভিমান-প্রবৃত্তির ও বৈকৃতিক ইচ্ছার প্রবৃত্তি অনিবার্য হইয়া থাকে। অভিমান-

প্রবৃত্তি ও বৈকৃতিক ইচ্ছার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে মানুষের শরীরের পঞ্চবিধ-উপাদানের (অর্থাৎ বোমীর, বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল ও স্থূল উপাদানের) যোগবিহীন কার্য অনিবার্য হইয়া থাকে। মানুষের শরীরের পঞ্চবিধ উপাদানের যোগ-বিহীন কার্যের উদ্ভব হইলে পশুষের উদ্ভব হওয়াও অনিবার্য হয়।

যোগ্য বিবাহ হইলেই যে সন্তানসমূহের শরীরস্থ তেজ ও রস মিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়, তাহা নহে। যোগ্য বিবাহ হইলেও অসমতা শ্রেণীর কারণে সন্তানসমূহের শরীরস্থ তেজ ও রস অমিলনপ্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হইতে পারে। যোগ্য বিবাহ না হইলে সন্তানসমূহের শরীরস্থ তেজ ও রস কোন ক্রমেই অমিলন প্রবৃত্তির আধিক্যহীন হইতে পারে না।

উপরোক্ত কারণে মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে স্ত্রী-পুরুষের যাহাতে অযোগ্য বিবাহ না হয় এবং যোগ্য বিবাহ হয় তাহা করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

বিবাহ অথবা যৌন মিলন বিষয়ে কোন্ শ্রেণীর পুরুষ কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের যোগ্য অথবা অযোগ্য তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের ও অন্তরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষাকার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। ঐ সমস্ত কথার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সমস্ত কথার কোনটাই আমরা এখানে উল্লেখিত করিব না।

পশুত্ব নিবারণ অথবা দূর করিতে হইলে মানুষের শরীরের তেজ ও রসের যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব না হয় তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের শরীরের তেজ ও রসের যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব না হয়, তাহা করিতে হইলে কোন জনক-জননীর যাহাতে অযোগ্য বিবাহ অথবা অযোগ্য মিলন না হইতে পারে এবং না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

তরুণ-তরুণীগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় কর্তব্য পালন বিষয়ক অমুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর। এই সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠানসমূহের কথা আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গী ১৮২ পৃঃ পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিব না।

“মাতার গর্ভাশয় গর্ভধারণযোগ্য হইলে গর্ভাশয়স্থিত তেজ ও রসের যে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হয়, সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা” অপর নাম “তরুণীগণের গর্ভধারণযোগ্য-গর্ভাশয়সমূহের অস্বাস্থ্য নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্তব্যপালন-বিষয়ক অমুষ্ঠান”সমূহ। এই সমস্ত অমুষ্ঠান মূলতঃ এক শ্রেণীর। কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম এই সমস্ত অমুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

মাতা গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারণ বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয় সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিতে হইলে এক শ্রেণীর অমুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই এক শ্রেণীর অমুষ্ঠানের কথাও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গী ১৮২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হইয়াছে।

মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণ যখন তরলাকার ও স্থূলাকার ধারণ করে তখন ঐ ভ্রূণের ক্রম-বিবর্ত্তমান অতিরিক্ত গুরুত্ব বশতঃ মাতার শরীরস্থ তেজ ও রস যে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, সেই অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি দূর করিতে হইলে এক শ্রেণীর অমুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই শ্রেণীর অমুষ্ঠানের কথাও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গী ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠানেরই প্রধান কার্য্য কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম।

মানুষের যাহাতে পশুত্বের উদ্ভব না হয় তাহা করিতে হইলে শৈশবাবধি শরীরের তেজ ও রসের পরিমাণেরই হউক, আর বেগেরই হউক, কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার যাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা না হয়—তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা “পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহের মূলমন্ত্রের” আলোচনায় দেখাইয়াছি।

এক্কে শৈশবাবধি কোন্ কোন্ কারণে মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে এবং যাহাতে এই অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে তাহা করিবার পন্থা কি কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমেই দেখান হইল যে, শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার আগেই শিশুর শরীরের তেজ ও রসের বাহাতে অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে চারিশ্রেণীর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; যথা :

- (১) পিতামাতার যোগ্য বিবাহ ও যোগ্যমিলন ;
- (২) গর্ভধারণযোগ্য মাতার গর্ভাশয়ের তেজ ও রসের সমতা ;
- (৩) গর্ভের প্রথম অবস্থায় গর্ভিণী মাতার গর্ভাশয়ের তেজ ও রসের সমতা ;
- (৪) গর্ভের পরিপক্ব অবস্থায় গর্ভিণী মাতার গর্ভাশয়ের তেজ ও রসের সমতা ।

পুরুষ ও রমণীগণের বাহাতে অযোগ্য বিবাহ অথবা অযোগ্য মিলন না হইতে পারে এবং সহজেই যোগ্য বিবাহ ও যোগ্য মিলন হয়, তাহা করিতে হইলে সাত শ্রেণীর সতর্কতা-মূলক সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় ।

সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রস বাহাতে কোনরূপে অসমতার অথবা বিষমতার গুণ অথবা শক্তি অথবা প্রবৃত্তিযুক্ত না হইতে পারে তাহার জন্য গর্ভ-ধারণযোগ্য রমণী সযত্নে বাহা বাহা করিতে হয় তাহা সাধারণতঃ এক শ্রেণীর অমুষ্ঠান, যথা : কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম ; গর্ভিণী রমণীগণ সযত্নে বাহা বাহা করিতে হয় তাহা সাধারণতঃ গর্ভের দুই অবস্থায় দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠান এবং ঐ দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠানেই কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম প্রধানতঃ সাধন করিতে হয় । গর্ভ-ধারণযোগ্য ও গর্ভিণী রমণীগণ সযত্নে বাহা বাহা করিতে হয়, তাহা প্রধানতঃ কতিপয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম বটে ; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম সাধন করিলেই সন্তানের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয় না । ঐ জন্য প্রত্যেক বিবাহিত যুগ্ম ও যুবতীকে কয়েক শ্রেণীর শিক্ষা দান করিবার প্রয়োজন হয় । ঐ শিক্ষা বিবাহ-সংস্কারের প্রধান অঙ্গ ।

* যে যে বিষয়ে ঐ সাতশ্রেণীর সতর্কতার প্রয়োজন হয় সেই সেই বিষয়ের কথা আমরা জ্যেষ্ঠ মাসের বঙ্গভ্রমণে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল না ।

প্রথমতঃ, যুগ্ম-যুবতীগণের বিবাহ, বিতীয়তঃ, গর্ভধারণ-যোগ্য রমণীগণের গর্ভাশয় রক্ষা এবং তৃতীয়তঃ, গর্ভিণী রমণীগণের পালন—এই তিন শ্রেণীর কার্যে যে যে অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয়, সেই সেই অমুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা না করিলে মাহুষের শৈশবাবস্থায় তাহার শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটবার আশঙ্কা তিরোহিত হয় না । উপরোক্ত অমুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার ব্যবস্থা না করিলে মাহুষের শৈশবাবস্থায় তাহার শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটবার আশঙ্কা তিরোহিত হয় না বটে ; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সমস্ত অমুষ্ঠান সাধন করিলেই মাহুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটবার আশঙ্কা সর্বতোভাবে তিরোহিত হয় না । শৈশবাবধি বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে । মাহুষ যখন শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহার পরবর্তী জীবনে যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রত্যেক-টির প্রাকৃতিক গুণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্তারিত থাকে বটে কিন্তু কোন প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিরই বিকাশ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় না । বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে এক একটা করিয়া যৌল বৎসর বয়সের মধ্যে প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটয়া থাকে । যৌল বৎসর বয়সের মধ্যে প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটয়া থাকে বটে কিন্তু কোন শক্তি ও প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ কোন মাহুষের যৌল বৎসর বয়সের মধ্যে সংঘটিত হয় না ।

উপরোক্ত এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি ও এক একটা প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতার আশঙ্কার উদ্ভব হইয়া থাকে । ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মাহুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা ঘটবার আশঙ্কাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।

এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ ও রসের অসমতার

ও বিষমতার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় বটে ; কিন্তু কার্যতঃ এই অসমতা ও বিষমতা নাও ঘটতে পারে। এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও মাত্রা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে তেজ ও রসের অসমতার ও বিষমতার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়, তাহার কারণ প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশে ও মাত্রার বৃদ্ধিতে শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের মধ্যে ব্যোমীয়, বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের প্রতি আকৃষ্টতার তুলনায় তরল ও স্থূল উপাদানের প্রতি অধিকতর আকৃষ্টতার আশঙ্কা ঘটয়া থাকে। এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ ও রসের অসমতার ও বিষমতার আশঙ্কা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা বাহাতে না ঘটতে পারে তাহা করিবার শক্তিও সেইরূপ বৃদ্ধি পায়।

শিশুগণের ও তরুণ-তরুণীগণের প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, বাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা না ঘটতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির মাত্রার বৃদ্ধি হইলেও, শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা ঘটতে পারে না। অতএবে, শিশুগণের ও তরুণ-তরুণীগণের প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, বাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা না ঘটতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির মাত্রার বৃদ্ধি হইলে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য হইয়া থাকে। শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য হইলে মানুষের অবস্থা অসুস্থ, অথবা বিধেয়, অতিমান, বৈকৃতিক ইচ্ছা, শরীরস্থ পঞ্চবিধ উপাদানের পরিমাণের ও বেগের বোগবিহীনতা এবং পশুত্ব অস্বাভাবিক পরিমাণে অনিবার্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিতে হইলে শৈশবাবধি পুরুষ ও রমণীর কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক শক্তি ও কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তদ্বিষয়ে এবং যে যে ব্যবস্থায় ঐ ঐ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা অথবা বিষমতা

ঘটিতে না পারে তাহা করা নিশ্চিত হয়—সেই সেই ব্যবস্থা-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি এক বৎসর বয়স অতিক্রম না করা পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর চারিশ্রেণীর প্রাকৃতিক শক্তি ও চারিশ্রেণীর প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, যথা :

- (১) শারীরিক শক্তির (অর্থাৎ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের শক্তির) ও শরীরজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ ;
- (২) ইন্দ্রিয়গত শক্তির ও ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তির উন্মেষ ;
- (৩) মানসিক শক্তির ও মনজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ ;
- (৪) ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছাজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ।

এক বৎসর বয়স অতিক্রম করা অবধি পাঁচ বৎসর বয়স অতিক্রম না করা পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর উপরোক্ত চারিশ্রেণীর প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রাথমিক মাত্রার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের উপরোক্ত চারিশ্রেণীর প্রাকৃতিক শক্তির ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে তাহাদের কাহারও শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের অথবা বেগের অসমতা ও বিষমতা ঘটতে না পারে, তজ্জন্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে প্রত্যেক এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে উপরোক্ত প্রতিবিধানমূলক শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং চারিশ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরোক্ত শিক্ষা ও চারিশ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মকে এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুপালন সম্বন্ধীয় পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

এক বৎসরের অধিক-বয়স্ক এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণ সম্বন্ধে ঐ পাঁচ শ্রেণীর অনুষ্ঠান পালন করিবার প্রয়োজন হয় ; তাহা ছাড়া, আরও অতিরিক্ত দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথাও আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

পঞ্চম বৎসর অতিক্রম করা অবধি দশ বৎসর অতিক্রম না করা পর্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকার শারীরিক শক্তি ও

শরীরজাত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়গত শক্তি ও ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তি, মানসিক শক্তি ও মনজাত প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছা-জাত প্রবৃত্তি, মুহু মাধ্যমিক মাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

দশম বৎসর অতিক্রম করা অবধি পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর উপরোক্ত চতুর্বিধ প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি তীব্র মাধ্যমিক মাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করা অবধি উপরোক্ত চতুর্বিধ প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি উচ্চ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম বৎসরের অধিক বয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাগণের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণ অথবা বেগ বাহাতে অসমতা অথবা বিঘ্নমতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা করিবার জন্য তাহাদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বাহাতে পঞ্চম বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের মত পূর্বোক্ত সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, ইহাদের প্রত্যেকের বাহাতে বয়সের উপযোগী ভাবে এবং বয়সের প্রয়োজনানুসারে পরিমাণে দশশ্রেণীর অভ্যাস, দশশ্রেণীর নীতি এবং দশশ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পায়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। পঞ্চম বৎসরের অধিক-বয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালক-বালিকা-গণের শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণ ও বেগের যেমন অসমতা ও বিঘ্নমতা ঘটবার আশঙ্কা থাকে, সেইরূপ তাহাদের অভিমান এবং বৈকৃতিক ইচ্ছার উদ্ভব হইবারও আশঙ্কা থাকে। তাহাদের বাহাতে অভিমানের উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাদিগকে দশ শ্রেণীর অভ্যাসে অভ্যস্ত করান হয়। তাহারা বাহাতে দশশ্রেণীর অভ্যাসের প্রত্যেক শ্রেণীর অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে পায়ে তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দশ শ্রেণীর নীতিশাস্ত্র শেখান ও পালন করান হয়। তাহারা বাহাতে অতিক্রমিত ভাবে বৈকৃতিক ইচ্ছার দাস না হইয়া পড়ে—তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করান হয়।

পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালকগণকে সাতশ্রেণীর অনুষ্ঠান, দশশ্রেণীর অভ্যাস,

দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান যে-প্রণালীতে অভ্যাস করান হয় অথবা শেখান হয়, বালিকাগণকে সেই প্রণালীতে অভ্যাস করান অথবা শেখান হয় না।

বালকগণকে অনুষ্ঠানসমূহ, অভ্যাসসমূহ, নীতিসমূহ এবং বিজ্ঞানসমূহ যে-যে প্রণালীতে শেখান হয়, সেই-সেই প্রণালীর উদ্দেশ্য থাকে তাহাদিগকে কন্ঠ্য প্রস্তুত করা, আর বালিকাগণকে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি যে-যে প্রণালীতে শেখান হয়—সেই সমস্ত প্রণালীর উদ্দেশ্য থাকে তাহাদিগকে সু-গৃহিণী প্রস্তুত করা।

নবম বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই বালিকাগণের স্ত্রী-জনোচিত ইন্দ্রিয়-সমূহ পরিপুষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের ইচ্ছাশক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মাহুষের পশ্চৎ বাহাতে নিবাসিত হয় এবং মনুষ্য বাহাতে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে যুবতীগণের স্বাস্থ্যবান্ জননেশ্রিয় অত্যধিকভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। এইজন্য নবম বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই বালিকাগণের ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। বালিকাগণের ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে দুইশ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ দুইশ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা কৈষ্ঠ-সংখ্যার বঙ্গশ্রীর ১৮০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালিকাগণকে তাহাদিগের বিবাহের পূর্ববর্তী কাল পর্য্যন্ত দ্বাদশশ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়; যথা :

- (১) দশ-শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয়মাংশ ;
- (২) দশ-শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয়মাংশ ;
- (৩) দশ-শ্রেণীর বিজ্ঞান-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয়মাংশ ;
- (৪) নৃত্য-গীত বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রাথমিক অংশ ;
- (৫) শিল্প-কার্য্য বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৬) কারু-কার্য্য-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৭) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৮) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;

- (৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (১০) গৃহিণীর দায়িত্ব শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (১১) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বড়বিধ নীতি ; *
- (১২) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য সাধন করিবার অষ্টবিধ নীতি ; †

* বড়বিধ নীতির নাম

- (ক) মানুষের যে সমস্ত কার্যে জমি অথবা জল অথবা বাতাসের কোনরূপ অসমতা অথবা বিঘ্নমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্যের নাম ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;
- (খ) প্রত্যেক মানুষ সে সমগ্র মনুষ্য সমাজের এক একটা অংশ এবং সমগ্র মনুষ্য সংখ্যায় যে মানব সমাজের পূর্ণতা তাহা বিদ্যুত হইয়া দেশগত অথবা বিভাগত অথবা বংশগত অথবা ধনগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত অথবা সাধনাগত অথবা অন্ত কোন শ্রেণীর কারণ প্রসূত কোনরূপ অভিমানে অথবা অহংকার পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;
- (গ) সমতা ও স্বাভাবিকতার প্রবৃত্তির স্থলে, আত্মসম্মানের স্থলে, উচ্চ, নীচ ভাব এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়তার নামে দলাদলির ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;
- (ঘ) কার্যকারকের বিচার বিবেচনামূলক বিজ্ঞান, নীতি ও বিধি নিষেধ শাস্ত্রের স্থলে কাল্পনিক সংস্কার অথবা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-নীতি ও বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;
- (ঙ) প্রথমতঃ, বাস্তবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিশ্রণেই যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম ; দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যতে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অপকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্মের অপকর্ষ এবং তৃতীয়তঃ, বাহ্যতে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্মের উৎকর্ষ—এই তিনটি কথা বিদ্যুত হইয়া সংস্কারমূলক ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার এবং ধর্ম সংস্কার লইয়া রাগদ্বৈষ পোষণ করার অথবা ধ্বংস-কলহ করার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;
- (চ) বাহ্যতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি যুগপৎ সম্পাদিত হয়, তাহাই যে প্রকৃত উপভোগের—তাহা বিদ্যুত হইয়া কেবলমাত্র শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা বুদ্ধির তৃপ্তজনকতা অথবা স্বাস্থ্যজনকতা উপভোগা মনে করার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার ।

† অষ্টবিধ নীতির নাম

- (১) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে প্রধানতঃ যে সপ্তবিংশতি শ্রেণীর সামাজিক কার্যের আয়োজন হয় সেই সপ্তবিংশতি শ্রেণীর কার্য বধাসম্মত সমান ভাবে না চালাইয়া অসমান ভাবে চালাইবার দুষ্টতা সত্বে প্রচার কার্য ;
- (২) প্রত্যেক গ্রামের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যায় আয়োজন নির্বাহ করিবার জন্য যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে উৎপাদন করিবার আয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্য বাহ্যতে সেই সেই পরিমাণে গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং অন্ত কোন গ্রামের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় তাহার জন্য প্রকল্প লীল না হওয়ার দুষ্টতা সত্বে প্রচার কার্য ;

দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালিকাগণকে তাহাদিগের বিবাহের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত উপরোক্ত দশ শ্রেণীর শিক্ষা দিবার জন্য ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয় । এই ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কথা আমরা জ্যেষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গভীর ১৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিবৃত করিয়াছি ।

বিবাহ হইবার পর বালিকাগণকে অভিরিক্ত ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় ; যথা :

- (১) বিবাহিত জীবনে রমণীগণের দায়িত্ব ও তাহা পালন করিবার সঙ্কেত-বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (২) গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৩) গর্ভিণীর ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য-বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৪) শিশুপালন-বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৫) বালক-বালিকা পালন-বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;
- (৬) তরুণ-তরুণী পালন বিষয়ক ক্রী-শিক্ষার প্রথমমাংশ ;

বালিকাগণ বতদিন পর্যন্ত পঞ্চদশ বৎসর বয়স অভিক্রম না করেন, ততদিন তাহাদিগকে সর্বসম্মত উপরোক্ত আঠার শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

- (৩) যে যে দ্রব্য গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন হয় সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা বাহ্যতে গ্রামবাসীগণের সর্ববিধ উপভোগের অভিস্রাব পরিতৃপ্ত হয় তাহার জন্য প্রকল্প লীল না হইয়া অন্তগ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তর নির্ভরশীল হওয়ার দুষ্টতা সত্বে প্রচার-কার্য ;
- (৪) একই শ্রেণীর শ্রমের পারিশ্রমিক হার বিভিন্ন কার্যে সমান না হইয়া অসমান হওয়ার দুষ্টতা সত্বে প্রচার-কার্য ;
- (৫) কোন শ্রেণীর শ্রমিকের পারিশ্রমিক হার ঐ শ্রেণীর শ্রমিকের সর্ববিধ আয়োজন নির্বাহ পক্ষে অগ্রচুর হওয়ার দুষ্টতা সত্বে প্রচার-কার্য ;
- (৬) যে-শ্রেণীর দ্রব্য মানুষের তৃপ্তি অথবা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে একম পুরুত্ব অতৃপ্তির অথবা অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে, সেই শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদন করিবার দুষ্টতা সত্বে প্রচার-কার্য ;
- (৭) উপার্জনযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষ বাহ্যতে সাত শ্রেণীর শ্রমের কোন না কোন শ্রেণীর শ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকাার্জনের জন্য প্রকল্প লীল হইবে এবং শ্রমের দ্বারা উপার্জন চাড়া বাহ্যতে ধনের দ্বারা কোন ধন উপার্জন সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা না করিবার দুষ্টতা সত্বে প্রচার-কার্য ;
- (৮) মানুষের আয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের জন্য যে-সমস্ত কার্যধারার আশ্রয় লওয়া হয় সেই সমস্ত কার্যধারার কোনটি বাহ্যতে ঐ সমস্ত কার্যধারার উৎপন্ন দ্রব্যের কোনটির কাঁচ মালে বাস্তবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষকারিতার অপহারক না হয় এবং জমি অথবা জল অথবা বাতাসের অসমতা অথবা বিঘ্নমতা সাধক না হয়, তৎসত্বে সতর্ক না হওয়ার দুষ্টতা সত্বে প্রচার ।

বালিকাগণের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদিগের শিক্ষার ও অভ্যাসের জন্ত মূলতঃ দায়ী হ’ন সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ এবং সাক্ষাৎভাবে দায়ী হ’ন তাহাদিগের পিতা-মাতা প্রভৃতি পিতৃালয়ের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ।

বিবাহের পরেও বালিকাগণের শিক্ষা ও অভ্যাসের জন্ত মূল দায়িত্ব সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের হস্তেই ক্রান্ত থাকে। বিবাহের পর সাক্ষাৎভাবে ঐ কার্যের জন্ত দায়ী হইয়া থাকেন বালিকাগণের স্বামী, স্বশ্রু, শাশুড়ী প্রভৃতি স্বশ্রুগণের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ। বালিকাগণের শিক্ষা ও অভ্যাস ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিবার আরম্ভ করা হয়। উহা সাক্ষাৎভাবে অন্তঃপুর মধ্যে মাতা প্রভৃতি অভিভাবিকাগণের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। উহা কখনও সাধারণ প্রাক্তন শিক্ষাগারে অথবা সাক্ষাৎভাবে পুরুষগণের দ্বারা সাধিত হয় না। বালিকাগণের অথবা রমণীগণের শিক্ষা পুরুষগণের দ্বারা সাধিত হইলে রমণীগণ পুরুষতাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং তখন উহারা সংসার ও সমাজের উপকারের তুলনায় অধিকতর অপকার সাধন করিয়া থাকেন। বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পঞ্চদশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণের শিক্ষার সমাপ্তি হয় না। রমণীগণের সারাজীবন অধ্যয়ন করিতে হয় এবং নূতন নূতন শিক্ষা ও অভ্যাস অর্জন করিতে হয়।

দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষা, দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক স্ত্রী-শিক্ষা এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক স্ত্রী শিক্ষা দশতাগে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। দশ শ্রেণীর অভ্যাসের, দশ শ্রেণীর নীতির এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন যুগপৎ বাহাতে চলিতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। উহাদের এক একটা অংশের শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরে পরিসমাপ্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ রমণীগণ যখন পঞ্চদশ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন তখন তাহাদিগের অভ্যাস, নীতি ও পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হয়।

নৃত্য-গীতাঙ্গি অপর পনেরটি বিষয়ের প্রত্যেকটি-বিষয়ক স্ত্রী শিক্ষা দুই অংশে পরিসমাপ্ত হয়। পনেরটি বিষয়ের শিক্ষা

রমণীগণ কুড়ি বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকেন।

কুড়ি বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার পর প্রত্যেক রমণীকে প্রতিদিন প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর কার্য করিতে হয়; যথা :

- (১) সংসারের গৃহীণীপণা ;
- (২) সংসারস্থ শিশু, বালক, বালিকা ও তরুণ-তরুণীগণের শিক্ষা ও অভ্যাস ;
- (৩) স্ব স্ব স্বামীর উপার্জনের কার্যের অভিজ্ঞতাকর্জন ও তদ্বিষয়ে স্বামীকে সহায়তা করা ; এবং
- (৪) অভ্যাস, নীতি ও বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা, দর্শন ও অধ্যয়ন।

বালকগণের বালকজনোচিত শিক্ষা সাধারণতঃ আরম্ভ করা হয় তাহাদের একাদশ বৎসর বয়সে। পঞ্চম বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকগণকে মুখে মুখে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান শেখান আরম্ভ করা হয়। সপ্তম বৎসর বয়স অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে একদিকে বৈষ্ণব লিখতে ও পড়িতে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়, সেইরূপ আবার দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক অংশ পাঠ করান হয়।

একাদশ বৎসর বয়সে বালকগণের পুরুষজনোচিত ইঙ্গ্রিসমূহ পরিপুষ্টিলাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ঐ ইঙ্গ্রিসমূহের ইচ্ছাশক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষের পশুত্ব বাহাতে নিবারণিত হয় এবং মানুষত্ব বাহাতে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে যেমন স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-জননেত্রির প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বাস্থ্যবান পুং-জননেত্রিরও প্রয়োজন হয়। এই জন্ত বালকগণ যখন একাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে তখন বালকগণের ইঙ্গ্রিসমূহের স্বাস্থ্যের প্রতি উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। বালকগণের ইঙ্গ্রিসমূহের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠানের সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠানের কথা জ্যৈষ্ঠসংখ্যার বঙ্গত্রীর ১৮০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

তরুণ অথবা কৈশোর শিক্ষার ব্যবস্থা

একাদশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত বালকগণকে আট শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা করা হয় ; যথা :

- (১) দশশ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়্যাংশ ;
- (২) দশশ্রেণীর নীতিবিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়্যাংশ ;
- (৩) দশশ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়্যাংশ ;
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসংগঠন বিষয়ক শিক্ষার প্রথম্যাংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম্যাংশ ;
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ শিক্ষার প্রথম্যাংশ ;
- (৭) মাহুষের পুষ্টি নিবারণ করিয়া মাহুষ্য সাধন করিবার ষড়্বিধ নীতি ,
- (৮) মাহুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত সাধন করিবার অষ্টবিধ নীতি ।

উপরোক্ত শিক্ষাকে “তরুণ” অথবা “কৈশোর শিক্ষা” বলা হয় । চলতি ভাষায় ঐ শিক্ষাকে “মাধ্যমিক শিক্ষা” বলা যাইতে পারে । সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে তরুণগণের শিক্ষা সাধিত হয় । সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম-গণ শিক্ষকতার কার্য করিয়া থাকেন । সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগার পরিচালনার দায়িত্ব দ্রুত হয় সামাজিক কার্য পরিচালনাসভার কর্মীগণের হস্তে । সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে কোন ছাত্রের নিকট কোন বেতন চাওয়া হয় না ; প্রত্যেক ছাত্রই বিনা বেতনে সাধারণ শিক্ষাগারে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন ।

সামাজিক কার্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা

তরুণগণ যখন ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কার্য শেখান হয় । সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কার্যের অপর নাম “শ্রমজীবীর কার্য” । ষোড়শ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক যুবক “শ্রমজীবীর কার্য” শিক্ষা করিয়া থাকেন । এই শিক্ষাও সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হইয়া থাকে । সামাজিক

কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ শ্রমজীবীর শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন । শ্রমজীবীর কার্যশিক্ষাগণের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না । প্রত্যেকেই বিনা বেতনে সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে শ্রমজীবীর কার্য শিক্ষা করিয়া থাকেন ।

শ্রমজীবীর কার্য শিক্ষার সর্বসমেত সাত শ্রেণীর বিষয় পাঠ করান ও শেখান হয় ; যথা :

- (১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস বিষয়ক তত্ত্বের তৃতীয়্যাংশ,
- (২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের তৃতীয়্যাংশ,
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের তৃতীয়্যাংশ,
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়্যাংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়্যাংশ ;
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ বিষয়ক শিক্ষার দ্বিতীয়্যাংশ ;
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাপ্ত সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বেরও প্রথম্যাংশ ।

* ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের নাম ।

- ১। কৃষিতত্ত্ব ;
- ২। জলজাত দ্রব্য-তত্ত্ব ;
- ৩। বাগান ও বাগানজাত দ্রব্য-তত্ত্ব ;
- ৪। বন ও বনজাত উদ্ভিদ, সরোহপ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-তত্ত্ব ;
- ৫। পশুপালন-তত্ত্ব ;
- ৬। পক্ষীপালন-তত্ত্ব ;
- ৭। কীটপতঙ্গ ও সরোহপ প্রতিপালন করিবার তত্ত্ব ;
- ৮। খণিজাত দ্রব্য-তত্ত্ব ।
- ৯। খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১০। রাসায়নিক শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১১। কার্পাস বস্ত্র সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১২। রেশমবস্ত্র সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৩। পশমবস্ত্র সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৪। সুতারের কার্য সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৫। ছতারের কার্য সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৬। কর্মকারের কার্য সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৭। কাংস্তকারের কার্য সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৮। বর্ণকারের কার্য সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;
- ১৯। রত্ন সঞ্চয়ী শিল্প-তত্ত্ব ;

ইহা ছাড়া, শ্ৰমজীবীৰ কাৰ্য্য শিক্ষাৰ্থীগণেৰে প্ৰত্যেকেৰ ধনাত্মক নিৰ্বাৰণ কৰিয়া ধন-প্ৰাচুৰ্য্য সাধন কৰিবাব ৩২ শ্ৰেণীৰ শ্ৰমাসুষ্ঠানৰে যে কোন ছয় শ্ৰেণীৰ অসুষ্ঠান তিন বৎসৰে অভ্যাস কৰিতে হয় এবং ঐ ছয় শ্ৰেণীৰ অসুষ্ঠানে শ্ৰম-নৈপুণ্য লাভ কৰিতে হয়।

শ্ৰমজীবীৰ কাৰ্য্য শিক্ষাৰ্থীগণ যখন অষ্টাদশ বৎসৰ বয়স অতিক্ৰম কৰিয়া উনবিংশ বৎসৰ বয়সে পদাৰ্পণ করেন তখন তাহাদিগেৰে মধ্যে কে কে সামাজিক কাৰ্য্যেৰে “তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্ম” শিক্ষাৰ উপযুক্ত তাহা পৰীক্ষা কৰিয়া দেখা হয়। যুবকগণ সাধাৰণতঃ প্ৰকৃতিৰ নিয়মানুসাৰে দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, যথা :

- (১) দৈহিক শ্ৰমোপযুক্ত যুবক ; এবং
- (২) মানসিক শ্ৰমোপযুক্ত যুবক।

যাহাৰা প্ৰতিদিন অনেকক্ষণ ধৰিয়া দৈহিক শ্ৰমেৰে কাৰ্য্য কৰিতে সক্ষম হন অথবা শিক্ষা অথবা তত্ত্বগ্ৰন্থসমূহ অনেকক্ষণ ধৰিয়া পাঠ অথবা অধ্যয়ন কৰিতে সক্ষম হন না, পৰস্পৰ অক্ষম হন, তাহাৰা “দৈহিক শ্ৰমোপযুক্ত যুবক শ্ৰেণীৰ” অন্তৰ্ভুক্ত হইয়া থাকেন। যাহাৰা প্ৰতিদিন অনেকক্ষণ ধৰিয়া দৈহিক শ্ৰমেৰে কাৰ্য্য কৰিতে সক্ষম হন না, পৰস্পৰ অক্ষম হইয়া থাকেন, অথচ শিক্ষা-গ্ৰন্থ অথবা তত্ত্ব-গ্ৰন্থসমূহ

অনেকক্ষণ ধৰিয়া পাঠ অথবা অধ্যয়ন কৰিতে সক্ষম হন, তাহাৰা “মানসিক শ্ৰমোপযুক্ত যুবক শ্ৰেণীৰ” অন্তৰ্ভুক্ত হইয়া থাকেন।

শ্ৰমজীবীৰ কাৰ্য্য শিক্ষাৰ্থীগণেৰে যখন অষ্টাদশ বৎসৰ বয়স অতিক্ৰম কৰিয়া উনবিংশ বৎসৰ বয়সে পদাৰ্পণ করেন, তখন তাহাদিগেৰে মধ্যে কে কে সামাজিক কাৰ্য্যেৰে “তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্মেৰে” উপযুক্ত তাহা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবাব তত্ত্ব যে পৰীক্ষা কাৰ্য্যেৰে ব্যবহা কৰা হয় সেই পৰীক্ষা কাৰ্য্যেৰে প্ৰধান লক্ষ্য থাকে—ঐ যুবকগণেৰে মধ্যে কে কে দৈহিক শ্ৰমোপযুক্ত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত আৰ কে কে মানসিক শ্ৰমোপযুক্ত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত তাহা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা।

যে নিয়মে যুবক-যুবতীগণেৰে বিবাহ সাধিত হয়, যেকুল ভাবে গৰ্ভযোগ্যা ও গৰ্ভিণী রক্ষণীগণকে পৰ্য্যবেক্ষণ কৰা হয়, যে যে সূত্ৰে শিশু, বালক-বালিকা ও তৰুণ-তৰুণীগণকে পালন ও শিক্ষিত কৰা হয়, তাহাতে কোন যুবকেৰে পক্ষে দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শ্ৰমেৰে অল্পপযুক্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহা পশ্চাৎ নিৰ্বাৰণ মূলক অসুষ্ঠান সমূহেৰে ও প্ৰতিষ্ঠান সমূহেৰে বৈশিষ্ট্য।

আজকালকাৰ ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে-সমস্ত যুবক উৎপন্ন হইয়া থাকেন তাহাদিগকে দেখিলে মনুষ্যসমাজে যে এমন শিক্ষা বিধান সংঘটিত হইতে পাৰে যাহাতে দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শ্ৰমেৰে অল্পপযুক্ত কোন যুবক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হয় তাহা অনুমান কৰা যায় না। ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ; এম্-এ; বি-এল্, ডি-এল্; ডি-এস্-সি; পি-এইচ-ডি; ডি-লিট্ প্ৰভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়া যে-সমস্ত যুবক গত চল্লিশ বৎসৰ হইতে কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে প্ৰেৰিত হইয়াছে তাহাদিগেৰে অধিকাংশই আমাদিগেৰে মতে শাৰীৰিক ও মানসিক এই উভয়বিধ পৰিশ্ৰমেৰেই অল্পপযুক্ত হইতেছেন। ইহাদিগেৰে অধিকাংশই যে কোন দৈহিক পৰিশ্ৰমেৰে উপযুক্ত নহেন তাহা প্ৰমাণ কৰিবাব তত্ত্ব কষ্ট স্বীকাৰ কৰিতে হয় না। আপত্তিদৃষ্টিতে মনে হয় ইহাৰা মানসিক পৰিশ্ৰমেৰে উপযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগকে লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে, ইহাদিগেৰে অনেকেই ভাৰ্য্যকথিত অৰ্থহীন নভেল, গল্পেৰে পুস্তক, ভ্ৰমণ-

- ২০। কাপজ, কলম পেন্সিল প্ৰভৃতি দ্ৰব্য সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
- ২১। ঘাস নিৰ্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
- ২২। যন্ত্ৰ নিৰ্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
- ২৩। তাৰ-পথ নিৰ্ম্মাণ ও রক্ষা সম্বন্ধীয় শিল্প-তত্ত্ব ;
- ২৪। চিত্ৰ ও বাস্তৱ যন্ত্ৰাদি উৎপাদন কৰিবাব শিল্প-তত্ত্ব ;
- ২৫। যন্ত্ৰ পৰিচালনা তত্ত্ব ,
- ২৬। ভবন নিৰ্ম্মাণ তত্ত্ব ;
- ২৭। খাল খনন ও স্থলপথ নিৰ্ম্মাণ-তত্ত্ব .
- ২৮। যোগী ও ভোগীগণেৰে পৰিচৰ্যা বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ২৯। ক্ৰয় বিক্ৰয় স্থল পৰিচালনা বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩০। ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবাব কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩১। জলযান পৰিচালনা বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩২। স্থলযান পৰিচালনা বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩৩। সংবাদ আদান প্ৰদানেৰে কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব .
- ৩৪। বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ প্ৰচাৰেৰে কাৰ্য্য বিষয়ক তত্ত্ব ;
- ৩৫। মূল ও খোঁত জল নিকাশেৰে কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩৬। পানীৰ জল সৰবৰাহেৰে কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩৭। গমনাগমনেৰে পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবাব কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব ;
- ৩৮। গমনাগমনেৰে পথ আলোকিত কৰিবাব কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব .
- ৩৯। মাছুবেৰে শক্তি ও শৃংখলা রক্ষা কৰিবাব কাৰ্য্য বিষয়ক-তত্ত্ব।

কাহিনী, বিজ্ঞান গ্রহ পাঠ করিতে পারেন বটে কিন্তু চিন্তাশীল কোন লেখার মর্ম ইহারা উদ্ধার করিতে পারেন না এবং পাঠ করিবার ধৈর্য্য ও ইহাদের থাকে না।

উনবিংশ বৎসর বয়স্ক যুবকগণের মধ্যে যাহারা সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মোপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হন তাহাদিগকে ধনাভাবে নিবারণ করিয়া ধনপ্রার্থী সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কৃষিকার্য্য ছাড়া যে আটত্রিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধিত হইয়া থাকে, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের কোন না কোন একশ্রেণীর অমুষ্ঠানে নিযুক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেকেই কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত প্রচুর জমি বিনা মূল্যে ও বিনা করে দেওয়া হয়। উহাদের প্রত্যেকেই যেমন উপরোক্ত আটত্রিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের কোন না কোন একশ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেকেই কৃষিকার্য্যও করিতে হয়। উনবিংশ বৎসর বয়স্ক দৈহিক শ্রমোপযুক্ত যুবকগণকে উপরোক্তভাবে কার্য্যে নিয়োগ করা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মগণের দায়িত্বভূক্ত।

উনবিংশ বৎসর বয়স্ক দৈহিক শ্রমোপযুক্ত যুবকগণ যখন উপরোক্তভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকেকে যোগ্য তরুণীর সহিত বিবাহিত হইতে হয়। বিবাহের ব্যবস্থা করা সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার-কর্ম্মগণের এবং সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগণের দায়িত্বভূক্ত।

প্রত্যেক বিবাহিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীকে ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় ; যথা :

- (১) বিবাহিত জীবনে যুবক-যুবতীগণের দায়িত্ব ও তাহা পালন করিবার শিক্ষার সঙ্কেত-বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ ;
- (২) জনেন্দ্রিয় ও গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ ;
- (৩) গতিশীল ও গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ ;
- (৪) এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর পালন-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ ;

(৫) পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং এগার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাগণের পালন ও শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষার—প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ ;

(৬) দশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পনের বৎসরের নিম্নবয়স্ক তরুণ ও তরুণীগণের পালন ও শিক্ষা-বিষয়ক শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর শিক্ষা সামাজিক গ্রামের কোন সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হয় না। বিবাহিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মগণকে ঐ ছয় শ্রেণীর শিক্ষা তাহাদিগের ঘরে ঘরে এবং অবসর সময়ে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ছয় শ্রেণীর শিক্ষা প্রদান করিবার দায়িত্বভার হস্ত থাকে সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগণের হস্তে।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মে যাহারা নিযুক্ত থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত হন—তাহা প্রাপ্ত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পিত হয়—সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মগণের হস্তে।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

উনবিংশ বৎসরবয়স্ক যুবকগণের মধ্যে যাহারা মানসিক শ্রমোপযুক্ত শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্ম-নিযুক্ত যুবকগণের মধ্যে যাহারা তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিখিবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হন—তাহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শেখান হইয়া থাকে।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম শিখিবার শিক্ষা-কাল হই বৎসর। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে এই শিক্ষাকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগণ এই শিক্ষাকার্য্যে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মশিক্ষাবিদগণের কাহারও কোম বেতন দিতে হয় না। সামাজিক কার্য্যের

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মশিক্ষার সর্বসম্মত সাত শ্রেণীর বিষয় পাঠ করান ও শেখান হয়, যথা :

- (১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;
- (২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অমুষ্ঠান সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার তৃতীয়াংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার তৃতীয়াংশ ;
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ বিষয়ক শিক্ষার তৃতীয়াংশ ;
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ।

ইহা ছাড়া, সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহ, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণের শ্রেণীবিভাগানুসারে যে পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেই পনের শ্রেণীর যে কোন দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠান দুই বৎসরে কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা দুই বৎসরকাল লাভ করিবার পর, শিক্ষার্থিগণকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে হস্ত থাকে।

উনিশ বৎসর-বয়স্ক যুবকগণের মধ্যে যাহারা সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মশিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন এবং ঐ শিক্ষা পাইয়া থাকেন—তাহারা একুশ বৎসরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত হইবার সক্ষমতা লাভ করেন এবং ঐ নিয়োগ পাইয়া থাকেন। এই যুবকগণের নিয়োগ পাওয়া মাত্র যোগ্য তরুণীর সহিত বিবাহিত হইতে হয়। ইহাদিগের বিবাহ-ব্যবস্থার দায়িত্বভার অপিচ থাকে সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে এবং সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মগণের হস্তে।

সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মগণের বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে যেকোন ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেইরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণকেও বিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে ছয় শ্রেণীর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। পনের শ্রেণীর সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণের প্রত্যেকেরই ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণের কাহারও ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অমুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণের বেতনের হার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। বেতনহারের তারতম্যের একমাত্র কারণ কর্ম্যভিজ্ঞতা-কালের তারতম্য।

সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণের মধ্যে যাহারা ঐ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম শিক্ষা লাভ করিবার উপযুক্ত তাহা প্রতি বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষাকার্যের দায়িত্বভার হস্ত হয়।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্ধারিত হন, তাহাদিগকে সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স উনত্রিশ বৎসরের কম অথবা যাহারা সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাট, তাহারা কখনও সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম শিক্ষার শিক্ষা-

কাল দুই বৎসর। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্মগণ সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষার্থিগণের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না। সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষায় সর্বসমেত নয় শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

- (১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;
- (২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অমুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার চতুর্থাংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার চতুর্থাংশ ;
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার চতুর্থাংশ ;
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন প্রাচুর্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ;
- (৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অমুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের প্রথমমাংশ ;

* মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অমুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের নাম :

- ১। বিবাহতত্ত্ব,
- ২। গর্ভধারণযোগ্য রমণীগণের গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষা-তত্ত্ব,
- ৩। গর্ভাশয় রমণীগণের গর্ভাশয়ের স্বাস্থ্য-বিষয়ক তত্ত্ব,
- ৪। এক বৎসরের অধিকবয়স্ক শিশুপালনতত্ত্ব,
- ৫। এক বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পাঁচ বৎসরের অনুর্দ্ধবয়স্ক শিশুগণের পালন ও শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
- ৬। পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক এবং দশ বৎসরের অনুর্দ্ধবয়স্ক বালিকাগণের পালন ও শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
- ৭। পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পনের বৎসরের অনুর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের পালন ও শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
- ৮। একাদশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইচ্ছা-সংঘর্ষ ও ইঞ্জিরের স্বাস্থ্য-রক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
- ৯। নবম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক বালিকাগণের ইচ্ছা-সংঘর্ষ ও ইঞ্জিরের স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব,

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মবাস্তব ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অমুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের প্রথমমাংশ।

ইহা ছাড়া, সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগণের শ্রেণীবিভাগানুসারে যে পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেই পনের শ্রেণীর যে কোন দুই শ্রেণীর অমুষ্ঠান দুই বৎসরে কাধ্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা দুই বৎসর কাল লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে স্তম্ভ থাকে।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। পনের শ্রেণীর সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগণের প্রত্যেকেরই ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয়।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগণের কাহারও ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অমুষ্ঠান ছাড়া, অল্প কোন শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধন করিতে হয় না।

১০। বিবাহিত যুবক-যুবতীগণের বিবাহ-জীবনের দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে শিক্ষকতা-বিষয়ক তত্ত্ব,

১১। চিকিৎসা কার্য-বিষয়ক তত্ত্ব,

১২। সামাজিক কার্য-বিষয়ক তত্ত্ব।

† মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মবাস্তব উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অমুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের নাম :

- ১। সামাজিক কার্যে চতুর্শ্রেণীর কর্মগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
- ২। সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
- ৩। সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
- ৪। রমণীগণের গৃহীণীপণা শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অমুষ্ঠান তত্ত্ব,
- ১। সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মগণের শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্ব,
- ১। গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
- ১। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
- ১। দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব,
- ১। কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের বেতনের হার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। বেতনহারের তারতম্যের একমাত্র কারণ কর্ম্যভিজ্ঞতা-কালের তারতম্য।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের মধ্যে যাহারা ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষা করিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মীগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষা কার্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা।

সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণের মধ্যে যাহারা প্রথম শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স উনচল্লিশ বৎসরের কম অথবা যাহারা সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাট, তাহারা কখনও সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর। সামাজিক গ্রামের সাধারণ শিক্ষাগারে প্রথম শ্রেণীর কর্ম শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মীগণ সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মশিক্ষাগণের কাহারও কোন বেতন দিতে হয় না। সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মশিক্ষার সর্বসমেত দশ-শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

- (১) দশ-শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের বর্ধাংশ ;
- (২) দশ-শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের বর্ধাংশ ;
- (৩) দশ-শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের বর্ধাংশ ;

(৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার পঞ্চমাংশ ;

(৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার পঞ্চমাংশ ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার পঞ্চমাংশ ;

(৭) ধনাত্মক নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;

(৮) মাহুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ ;

(৯) মাহুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম-ব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ ;

(১০) কার্যপরিচালনা-সভা-পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য বিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের প্রথমাংশ।

কার্যপরিচালনা-সভা-পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য-বিভাগ বশতঃ নয় শ্রেণীর কার্যের নাম :

- (১) বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (২) বিধিনিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৩) সৌম্যতা নির্দ্ধারণ-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৪) বিচার-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৫) কোষ-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৬) নিয়োগ ও নির্বাচন-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৭) বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৮) কর্মীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ;
- (৯) সর্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য সাধন-বিষয়ক কার্যবিভাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব।

ইহা ছাড়া সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মশিক্ষাগণের প্রত্যেকের, প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের যে নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়, সেই নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের যে কোন দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান দুই বৎসরে কার্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মের শিক্ষা দুই বৎসরকাল লাভ করিবার পর, শিক্ষার্থীগণকে প্রথম শ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের হস্তে হস্ত থাকে।

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। নয় শ্রেণীর সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের প্রত্যেকেরই পশ্চাদ্ নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য সাধন করিবার অথবা অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার কোন না কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়। ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত্য সাধন করিবার কোন অনুষ্ঠান সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ কখনও সাধন করেন না।

প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের বেতনের হার তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। কর্ম্যভিজ্ঞতা-কালের তারতম্যানুসারে বেতন-হারের তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়।

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের মধ্যে যাহারা ঐ প্রথম শ্রেণীর কর্মে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়। সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষা-কার্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের মধ্যে যাহারা সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স ঊনপঞ্চাশ বৎসরের কম অথবা যাহারা সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনও সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

কোন কোন বিষয়ের বিজ্ঞা এবং কোন কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম-শিক্ষা করিবার অথবা সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মী হইবার উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ, তরুণ শিক্ষা; দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম-শিক্ষা; তৃতীয়তঃ, সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মশিক্ষা; চতুর্থতঃ, সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মশিক্ষা; পঞ্চমতঃ, সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মশিক্ষা; ষষ্ঠতঃ, ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত্য সাধন বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা; সপ্তমতঃ মানুষ্যের পশ্চাদ্ নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা; অষ্টমতঃ, অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা—সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিলে, সামাজিক কার্য পরিচালনা সভার কর্মশিক্ষা করিবার উপযুক্ত হওয়া যায়। উপরোক্ত আটটি বিষয়ের কোন একটির অভাব হইলে, সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার শিক্ষা পর্য্যন্ত লাভ করার অধিকারী হওয়া যায় না।

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মী হইতে পারিলে, শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আজকালকার শাসক-শ্রেণীর তুলনায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের শাসকশ্রেণী যে কত অধিক বিদ্বান ও অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা বিশেষভাবে প্রাধান্যের যোগ্য।

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কার্য শিখিবার শিক্ষা-কাল দুই বৎসর।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণ সামাজিক কার্য পরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষার্থীগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা বহন করেন।

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের কর্মশিক্ষায়

সর্বসম্মত দশ শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

- (১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস বিষয়ক তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;
- (২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্থানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার ষষ্ঠাংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার ষষ্ঠাংশ ;
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার ষষ্ঠাংশ ;
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অস্থানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;
- (৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মানুষত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অস্থানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ;
- (৯) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অস্থানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ;
- (১০) কার্যপরিচালনা-সভা পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য-বিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ ;

ইহা ছাড়া, সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষাগণের প্রত্যেকের সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের যে চল্লিশ শ্রেণীর কার্যশাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই চল্লিশ শ্রেণীর কার্যশাখার যে কোন দুই শ্রেণীর কার্য-শাখার কার্য দুই বৎসরে ব্যবহারিকভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মের শিক্ষা দুই বৎসর লাভ করিবার পর শিক্ষাগণকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে হস্ত থাকে।

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের মধ্যে যাহারা ঐ কর্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাদিগের মধ্যে কে কে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিখিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্ধারণ করা হয়। গ্রামস্থ

রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষাকার্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষা করিবার ব্যবস্থা

সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণের মধ্যে যাহারা গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মের শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হন, তাহাদিগকে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স ঊনষাট বৎসরের কম অথবা যাহারা সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই; তাহারা কখনও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর।

দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার কর্মগণ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষাগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভা বহন করেন।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষায় সর্বসম্মত দশশ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

- (১) দশশ্রেণীর অভ্যাস বিষয়ক তত্ত্বের অষ্টমাংশ ;
- (২) দশশ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের অষ্টমাংশ ;
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বের অষ্টমাংশ ;
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্থানসমূহের সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার সপ্তমাংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন বিষয়ক শিক্ষার সপ্তমাংশ ;

- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ বিষয়ক শিক্ষার সপ্তমাংশ ;
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের বর্ধমাংশ ;
- (৮) মামুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অমুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;
- (৯) মামুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অমুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থাংশ ;
- (১০) কার্য-পরিচালনা-সভাসমূহের পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্য-বিভাগ বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের তৃতীয়াংশ ।

ইহা ছাড়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম-শিক্ষাগণের প্রত্যেকের গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের যে সাতাশ শ্রেণীর কার্য-শাখার পরিচালনা-করিতে হয়, সেই সাতাশ শ্রেণীর কার্য-শাখার যে কোনও ছুই শ্রেণীর কার্য-শাখার কার্য ছুই বৎসর ব্যবহারিক ভাবে অভ্যাস করিতে হয় ।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মের শিক্ষা ছুই বৎসর লাভ করিবার পর শিক্ষাগণকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করা হয় । এই নিয়োগের দায়িত্বভার দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে স্থাপিত থাকে ।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের মধ্যে যাহারা ঐ কর্মে অন্ততঃ পক্ষে আট বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিখিবার উপযুক্ত, তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্ধারণ করা হয় । দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষা-কার্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয় ।

দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষা
করিবার ব্যবস্থা

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা সভার-কর্মগণের মধ্যে যাহারা দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষা করিবার

উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় ।

যাহাদিগের বয়স উনসত্তর বৎসরের কম অথবা যাহারা গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাট, তাঁহারা কখনও দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না ।

দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিখিবার শিক্ষাকাল ছুই বৎসর ।

কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয় । কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণ দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন ।

দেশস্থ কার্য পরিচালনা-সভার কর্মশিক্ষার্থিগণের শিক্ষা কালের সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভা বহন করেন ।

দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষার সর্বসমেত দশ শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয়, যথা :

- (১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের নবমাংশ,
- (২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের নবমাংশ,
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের নবমাংশ,
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অমুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার অষ্টমাংশ,
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার অষ্টমাংশ,
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার অষ্টমাংশ,
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য সাধন করিবার উনচল্লিশ শ্রেণীর অমুষ্ঠানের উনচল্লিশ শ্রেণীর তত্ত্বের সপ্তমাংশ ;
- (৮) মামুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অমুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;
- (৯) মামুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম-বাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অমুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ ;

(১০) কার্য-পরিচালনা-সভাসমূহের পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্যবিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের চতুর্থংশ।

ইহা ছাড়া দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম-শিক্ষার্থি-গণের প্রত্যেকের দেশস্থ কার্য-পরিচালনা সভার-কর্মগণের যে উনষাট শ্রেণীর কার্য-শাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই উনষাট শ্রেণীর কার্যশাখার যে কোন দুই শ্রেণীর কার্য শাখার কার্য দুই বৎসর ব্যবহারিকভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মের শিক্ষা দুই বৎসর লাভ করিবার পর শিক্ষার্থীগণকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে স্তম্ভ থাকে।

দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের মধ্যে যাহারা ঐ কর্মে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিখিবার উপযুক্ত তাহা প্রতি বৎসর বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্ধারণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের হস্তে উপরোক্ত পরীক্ষাকার্যের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা।

দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মগণের মধ্যে যাহারা কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া পরীক্ষায় নির্ধারিত হন, তাঁহাদিগকে কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

যাহাদিগের বয়স উনআশী বৎসরের কম অথবা যাহারা দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মে অন্ততঃ পক্ষে অষ্ট বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, তাহারা কখনও কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন না।

কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম শিখিবার শিক্ষাকাল দুই বৎসর। কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার অধিষ্ঠানক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কার্য শিখাইবার শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার বিভাগীয়

অমাত্যগণ এবং বিহাট পুরুষ কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা সভার কর্মশিক্ষার শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। সময় সময় যাহারা কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা-সভার কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হন, তাহারাও ঐ শিক্ষকতার কার্য করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার আনুষ্ঠানিক অমাত্যগণকে কখনও উপরোক্ত শিক্ষকতার কার্য করিতে দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনার-সভার কর্ম শিক্ষার্থীগণের শিক্ষাকালের সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা বহন করেন।

কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা-সভার কর্ম শিক্ষার সর্বসমেত দশ শ্রেণীর বিষয় অধ্যয়ন করান ও শেখান হয় যথা :

- (১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক তত্ত্বের দশমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (২) দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক তত্ত্বের দশমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিষয়ক তত্ত্বের দশমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৪) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার নবমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৫) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন-বিষয়ক শিক্ষার নবমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ-বিষয়ক শিক্ষার নবমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৭) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য সাধন করিবার উনচ'ল্লশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের উনচ'ল্লশ শ্রেণীর তত্ত্বের অষ্টমাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৮) মানুষের পশু নিবারণ করিয়া মানুষ্য সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের বার শ্রেণীর তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (৯) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম-ব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নয় শ্রেণীর তত্ত্বের ষষ্ঠাংশ অথবা শেবাংশ ;
- (১০) কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের পরিচালনার নয় শ্রেণীর কার্যবিভাগ-বিষয়ক নয় শ্রেণীর তত্ত্বের পঞ্চমাংশ অথবা শেবাংশ।

ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম-শিক্ষার্থিগণের প্রত্যেকের, কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণের যে একটি শ্রেণীর কার্যশাখার পরিচালনা করিতে হয়, সেই একটি শ্রেণীর কার্যশাখার যে কোন দুই শ্রেণীর কার্যশাখার কার্য দুই বৎসর ব্যবহারিক ভাবে অভ্যাস করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মের শিক্ষা দুই বৎসর কাল লাভ করিবার পর শিক্ষার্থিগণকে কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভায় কর্মীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মীগণের হস্তে স্তম্ভ থাকে।

যে সমস্ত কারণ দূর করা অথবা নিবারণ করা কোন মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অথবা ব্যক্তিগত পরিশ্রমে সম্ভব-যোগ্য নহে, সেই সমস্ত কারণের কোন কারণে আট শ্রেণীর কর্মীগণের কোন শ্রেণীর কোন কর্মী নিজ কর্ম উপার্জন করিবার কার্য করিতে অথবা উপার্জন করিতে অক্ষম হইলে, গ্রামস্থ কেন্দ্রীয় কার্য-সভা তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার লইয়া থাকেন। কোন অস-চ্ছত্রিত্ব অথবা অঐক্য-কার্য বশতঃ কাহারও কার্যক্ষমতার অভাব হইলে অথবা উপার্জনের অসামর্থ্য ঘটিলে তাঁহার ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার কোন কার্য-সভা গ্রহণ করেন না। পরন্তু, তিনি বিচারের যোগ্য হইয়া থাকেন এবং দণ্ড প্রাপ্ত হন।

যে সমস্ত কারণ দূর করা অথবা নিবারণ করা মানুষের ব্যক্তিগত সাধের বহির্ভূত সেই সমস্ত কারণের কোন কারণে অথবা অন্ত কোন কারণে আট শ্রেণীর কর্মীর কোন শ্রেণীর কর্মী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পোষ্য-বর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য-সভার লইতে হয়। ঐ পোষ্যবর্গের কেহ উপার্জনক্ষম হইলে কেন্দ্রীয় কার্যসভার ঐ দায়িত্বভার থাকে না।

আট শ্রেণীর কর্মীর কোন শ্রেণীর কোন কর্মী একশত ছুড়ি বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে তাঁহাকে কর্ম হইতে অবসর লইতে হয়। অবসর লইবার পর নিজ নিজ কর্মের শ্রেণী বিভাগানুসারে বিধিবদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়।

অবসরপ্রাপ্তির পর তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার হস্তে স্তম্ভ হয়। অবসর প্রাপ্তির পর প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মী প্রধানতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনায় এবং অভ্যাসে জীবনান্ধিত করিয়া থাকেন।

কোন সামাজিক গ্রামে অথবা কোন কার্যপরিচালনা-সভায় কোন শ্রেণীর কোন কর্মীর অভাব হইলে ঐ অভাব অন্ত কোন গ্রাম হইতে কর্মী আনয়ন করিয়া পূরণ করিতে হয়।

চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের চারি শ্রেণীর কর্মীর এবং সামাজিক গ্রামের তিন শ্রেণীর সামাজিক অস্থানের চারি শ্রেণীর কর্মীর শিক্ষা ও নিয়োগ উপরোক্ত বিধিবদ্ধভাবে চলিতে থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানেই সাধারণতঃ একদিকে যেমন কোন শ্রেণীর কর্মীর অভাব হয় না, সেইরূপ আবার কোন্ শ্রেণীর কর্মীর সংখ্যা কখনও প্রয়োজনানতিরিক্ত হয় না।

কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রেণীর কর্মীর অভাব হইলে যে সমস্ত কর্মীর উপর দায়িত্বভার অর্পিত থাকে, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ অভাব পূরণ করিতে হয়।

কোন শ্রেণীর কর্মীর সংখ্যা কখনও প্রয়োজনানতিরিক্ত হইলে ঐ অতিরিক্ত কর্মীগণকে অতিরিক্ত সহকারী কর্মীরূপে নিযুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কর্মীগণের বৈশিষ্ট্য ছয় শ্রেণীর, যথা :

(১) যাহাতে শরীরস্থ তেজ ও রস কখনও অসম অথবা বিবম না হয় এবং সর্বদা সম থাকে তাহা করিবার পদ্ধতি তাঁহাদিগকে শিখিতে ও অভ্যাস করিতে হয়। উহা শিখিতে ও অভ্যাস করিতে হয় বলিয়া কোনরূপ অতিরিক্ত উত্তেজনা অথবা অতিরিক্ত বিবাদ এই কর্মীগণকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না।

(২) উত্তেজনা ও বিবাদের দ্বারা কর্মীগণ কখনও আক্রান্ত হন না বলিয়া একদিকে ইহাদিগের বিচারশক্তি সর্বদাই নির্ভরযোগ্য থাকে এবং ইহারা কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না। অন্তদিকে ইহারা কখনও অযথ্যভাবে

কাহারও প্রতি অনুরাগযুক্ত অথবা বিদ্বেষযুক্ত হইতে পারেন না এবং হন না।

(৩) অথবা তাহা কাহারও প্রতি অনুরাগযুক্ত অথবা বিদ্বেষযুক্ত হইতে পারেন না এবং হন না বলিয়া কশ্মিগণ একদিকে সকলের প্রতি সমান ভাবে কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারেন এবং হইয়া থাকেন। অন্তদিকে ইহারা কখনও কোনরূপ অভিমানের অথবা অহঙ্কারের বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না।

(৪) কশ্মিগণের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ অভিমানের অথবা অহঙ্কারের বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না বলিয়া একদিকে কোন কন্মী কাহারও মনে অযথা-ভাবে কোনরূপ আঘাত দিতে পারেন না এবং দেন না এবং সকলেরই মনের কথায় সমান ভাবে কান দিয়া থাকেন। অন্তদিকে ইহারা কখনও কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না।

(৫) কশ্মিগণের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারেন না এবং হন না বলিয়া ইহাদিগের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম শক্তি কখনও ভগ্ন হয় না। পরন্তু সর্বদাই অটুট থাকে। ইহাদিগকে কোনরূপ অস্বাস্থ্য অথবা অশান্তির জ্ঞান কখনও দায়িত্ব-ভার নির্বাহের কার্য্য হইতে ছুটি অথবা অবসর নইতে হয় না।

(৬) মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যুগপৎ সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত যত প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠান সম্পাদিত করিবার ব্যবস্থা থাকে, এক একটা করিয়া বোল বৎসর ধরিয়া প্রায়শঃ তাহার প্রত্যেকটির দায়িত্বভার ব্যবহারতঃ নির্বাহ করিয়া এবং যাহা কিছু মানুষের জ্ঞাতব্য তাহা অধ্যয়ন করিবার পর—অভ্যাস হইবার পর—কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে যাহারা কোন কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মী (অর্থাৎ শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত) হন তাঁহারা প্রত্যেকেই একদিকে কাঁচামাল উৎপাদনের অনুষ্ঠান, শিল্পানুষ্ঠান, কারুকার্য্যের অনুষ্ঠান, বাণিজ্যানুষ্ঠান, কন্মীশিক্ষানুষ্ঠান,

তরুণ-তরুণীর শিক্ষানুষ্ঠান, বালক-বালিকার শিক্ষানুষ্ঠান, শিশুগণের পালন ও শিক্ষানুষ্ঠান সমূহের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া থাকেন; অন্তদিকে মানুষের সর্ববিধ দুঃখ সর্বতোভাবে দূর করিতে হইলে অথবা মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত বিজ্ঞান জ্ঞানিবার প্রয়োজন হয় এবং যে সমস্ত বিজ্ঞা অভ্যাস করিবার প্রয়োজন হয় তাঁহার প্রত্যেকটি জ্ঞানিতে ও অভ্যাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কশ্মিগণের উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যবশতঃ মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই সমস্ত অনুষ্ঠান স্বতঃই সাধিত হইয়া থাকে এবং সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বতঃই পরিচালিত হইয়া থাকে। ফলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছাও সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বর্তমানে যাহারা ছোট বড় ভাবে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—তাঁহাদিগের বৈশিষ্ট্য কি কি তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

বর্তমানে যাহারা ছোট বড় ভাবে শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহাদিগের কাহাকেও কখনও শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা ও বিষমতা যে সঙ্কেতে প্রতিরোধ করা যায় সেই সঙ্কেত শেখান অথবা অভ্যাস করান হয় না।

ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই কখনও উত্তেজনায়, কখনও বা বিবাদের আবার, কখনও বা উদাসিন্ধে নিমজ্জিত থাকেন। ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই মনগড়া সংস্কার বশতঃ কাহারও প্রতি অথবা অনুরাগযুক্ত আর কাহারও প্রতি অথবা বিদ্বেষযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের অনুরাগ ও বিদ্বেষের কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ ইহারা দিতে পারেন না। মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে যে সমস্ত বিজ্ঞান জ্ঞান এবং যে সমস্ত বিজ্ঞান অভ্যাস হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞা সম্বন্ধে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই এক একটা অকাট মূর্খ অথচ ইহাদিগের প্রায় প্রত্যেকেই দম্ব ও অহঙ্কারের এক একটা প্রতিমূর্ত্তি। জনসাধারণের মধ্যে

যাহারা আত্মসম্মান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সজাগ
 তাঁহারা আজকালকার শাসক সম্প্রদায়ের ছোট বড় কাহারও
 সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইতে
 পারেন না। আজকালকার শাসক সম্প্রদায়ের প্রায়
 প্রত্যেকেই মানুষের মনে আত্মত প্রদান করিতে কোন
 সংকল্প অথবা চেষ্টা অনুভব করেন না। ইহাদিগের
 অধিকাংশই পানদোষযুক্ত, যৌননিষ্ঠাহীন উচ্ছৃঙ্খল
 হইয়া থাকেন। প্রকৃতি ও বিকৃতি কাহাকে বলে
 তাহা ইহাদিগের না জানা থাকায় ইহাদিগের প্রায়
 প্রত্যেকের প্রত্যেক ইচ্ছা বিকৃতি মূলক ও বিকৃতি সাধক
 হইয়া থাকে। উপরোক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও বৈকৃতিক ইচ্ছা
 বশতঃ ইহাদিগের অনেকেরই শারিরীক ও মানসিক
 স্বাস্থ্য প্রায়শঃ নির্ভরযোগ্য হয় না। কাঁচামাল উৎপাদনের
 অনুষ্ঠান অথবা শিল্পানুষ্ঠান অথবা কারুকাণ্ডের অনুষ্ঠান

অথবা বাণিজ্যানুষ্ঠান অথবা শিক্ষানুষ্ঠানের কোন অভিজ্ঞতা
 সাক্ষাৎভাবে লাভ না করিয়া আজকাল প্রায় প্রত্যেক
 দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাসক ও বিচারক হওয়া সম্ভবযোগ্য
 হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, জনসাধারণের হুখে দূর করা
 অথবা সুবিচার করা যখন শাসন সম্প্রদায়ের অথবা বিচারক
 সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হয়, তখন কাঁচামাল উৎপাদনের অনুষ্ঠান
 প্রভৃতি প্রত্যেকটির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া
 শাসক ও বিচারক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের অপরিহার্য্যভাবে
 প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

যখন উপরোক্তভাবে অনুপযুক্ত লোক সমূহের হস্তে
 জনসাধারণের শাসনভার অথবা বিচার ভার অর্পিত হয়
 তখন সর্বব্যাপী অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অভাব এবং মারামারি
 অপরিহার্য্য হইয়া থাকে এবং জগতের সর্বত্র আজকাল
 হইতেছেও তাহাই।

[ক্রমশঃ



আষাঢ়—১৩৫১

১২শ বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

উপন্যাসের উদ্ভব ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকা

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ঈংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য শিক্ষামুদ্রার প্রাথমিক ও অনিয়মিত, স্বৈচ্ছানিয়ন্ত্রিত ক্ষুরণকে সুসংবদ্ধ, কেন্দ্র-সংহত রূপ দিল। কিন্তু তাহারও পূর্বে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী-সমাজে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন চলিতেছিল। বামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ঈংরেজের সহিত সম্পর্কে ব্যবসায়িক বা অর্থ-নৈতিক ভিত্তি হইতে বুদ্ধি ও মনন-শক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করিয়া এক বিশ্লবকারী পরি-বর্তনের সূচনা করিলেন। তিনিই এখন দেখাইলেন যে, বাঙ্গালী কেবল ঈংবেজদের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের বাচন মাত্র নহে—ঈংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতিব উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদ তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনার প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন দাঙে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও আচারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের অথবা আক্রমণ ও অপরদিকে গোড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ও মূঢ় বাৎসল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্ত যেমনোভাবে অবলম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ় বুদ্ধিবাদ ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধে

প্রয়োগ করিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্ত নিরূপিত হইল।

এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল-মুগ্ধ, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অচ্যুত ধর্মোচ্চারণ ও আচার-বাবচারণখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার দ্বারা যুক্তিতর্কের মধ্য প্রণালী ছাড়াইয়া জদয়াবেগে বেগমান প্রবাহের মত সংযুক্ত হয়—তথ্যবিচার সাহিত্যপদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ-শ্লোকের সম্বিষ্ট দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে স্রষ্টালোকস্পৃষ্ট বর্ষাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লোকপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ অবশ্য প্রয়োজনীয়ের সংকীর্ণ গাঙী ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আভিযা, অসম্মতিব প্রতি মনঃসংসর্গে সচেতন হইয়া উঠে—এই নব জাগ্রত দেবতার জন্ত বহিঃখুঁজিয়া বেড়ায়। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্রেণিক-পর্যবেক্ষণ ও ইচ্ছাব হাত্তোদ্ভীপক বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন উপন্যাসরচনার আবশ্যিক পূর্ববর্তী স্তব।

দুই

এই সময়ে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা (১৮১৮) কিছুদিন ধরিয়া মনোমধ্যে সঞ্চিত শ্লোক-প্রবণতাকে অভিব্যক্তি

ক্ষেত্র ও প্রেরণা যোগাইল। সংবাদপত্রের সহিত উপজ্ঞাসের অভ্যাস ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপজ্ঞাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের শুভেই রচিত হইয়াছে। খবরের কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জননের জন্য দেশের মধ্যে যাহা কিছু বিচিত্র, কোতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সচেষ্ট থাকেন। নানা রকমের উড়ো পাখী, আজগুবি খবর, অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনা, যাহা মনকে নাড়া দেয় ও হাশু-কোতূকের সৃষ্টি করে—এই সাংবাদিক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বাসা বাঁধে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যার লঘু সরস আলোচনা নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের কুৎসা রটনা ও তাহার ভূনীতির নানা মুখরোচক উদাহরণ ইহাকে বাস্তব জীবনের সত্য ও উপভোগ্য প্রতিচ্ছবির মর্মান্দা দেয়। সংবাদপত্রের দর্পণে সমাজ নিজ বহিরাবয়ব ও মনোবাসনার নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐকান্ত্রে গ্রথিত হইয়া, খনির ধারাবাহিকতা ও শিল্পী-মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ অস্তঃসম্মতি-বিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপজ্ঞাসসৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। শ্রেণীবিশেষের জীবনের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলি কিরূপে কাল্পনিক চরিত্রের সমগ্রতায় পরিণত হইল, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ১৮২১ সালে সমাচারদর্পণে ‘বাবু’ চরিত্রে আলোচনায়। সম্পাদক তাঁহার কাগজের দুইটি সংখ্যায় ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৯ই জুন ১৮২১—বড় লোকের আদুরে গোপাল, শিক্ষা-চরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির একটা সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন। এই তিলকচন্দ্র উপজ্ঞাস-জগতের প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত বাবু বংশের আদিপুরুষ। ইনি মোসাহেব মণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও আত্মাভিমানগুণ্ট হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরে অন্তরের অন্তঃসার-শূন্যতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া নানা হাশুকের অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও লেখকের বিজ্ঞপ-বাণবিদ্ধ হইয়া পাঠকের শিক্ষাবিধান ও মনোরঞ্জননের দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইয়াছেন। এই আদি ‘বাবুর’ চরিত্রে দুঃশীলতা ও ব্যসন-বিলাস অপেক্ষা মোসাহেব-মহলে

প্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতি বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

তিনি

ইহার দুই বৎসর পরে ১৮২৩ সালে প্রকাশিত প্রথম নাথ শর্ম্মার রচিত ‘নব-বাবু-বিলাস’ প্রথম উপজ্ঞাসেই গৌরব দাবী করে। প্রথম নাথ শর্ম্মা “সমাচার চন্দ্রিকা” ও “সংবাদ-কৌমুদী” পত্রিকাঘরের সম্পাদক ও নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ধর্ম্মসভার কার্যাব্যক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। সম্ভবতঃ ইনিই সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত তিলকচন্দ্রের জীবনকাহিনীর সঙ্কলয়িতা। এই অমুমান সত্য হইলে “নববাবু-বিলাস” “সমাচার-দর্পণের” “বাবু” কাহিনীর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—প্রথম মৌলিক পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত পল্লবিত বিস্তার। ইহাতে “বাবু” জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, খেলালী অস্থিরমতিত্ব, সৌজন্ম ও সুরূচির অভাব, বাল্য-কালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রক্ষুরণ নহে, সমস্ত সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কন। বাবু অপেক্ষা যে সমাজে বাবুর উদ্ভব তাহার প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেশী।

এই সময়ের কলিকাতা-সমাজে যে বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে খুব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তাহা মনে হয় না। যে ‘বাবু’ এই সমাজের বিশিষ্ট সৃষ্টি, তিনি ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ ধার ধারেন না। ‘নববাবু-বিলাসের’ ৩৫ বৎসর পরে রচিত “আলালের ঘরে দুলালে’র (১৮৫৭) নায়ক মতিলাল শেরবোণ সাহেবের স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু কয়েকটা ইংরেজী শব্দ ও কিছু ইংরেজী হাব-ভাব ও চাল-চলন শিক্ষা ব্যতীত তাহার বিদ্যা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঠিক দায়ী করা যায় না। এই দিক দিয়া ইহাদের সহিত পরবর্তী যুগের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ইংরেজী আচার-ব্যবহারের সত্যকার অনুরাগী, সমাজবিদ্রোহী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজ মতবাদের জন্য দুঃখ-

বরণে প্রস্তুত দৃঢ়চেতা যুবকসম্প্রদায়ের প্রভেদ। মতিলাল ও মাইকেল মধুসূদনের মুখে হয়ত একই রকমের বলি, তাহাদের বিলাতী খানাপিনা ও সুরার দিকে সাধারণ প্রবণতা—কিন্তু মানব আদর্শের দিক দিয়া ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

আসল কথা, বাবু-সমাজের অমিতাচারের জ্ঞান দায়ী ইংরেজী শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শ নহে, ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসার। এই যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটা ক্ষণস্থায়ী জোয়ার আসিয়াছিল। বাঙ্গালী বেনিয়ান এদেশে ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তারের জ্ঞান কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্ৰত্যাশিত ধনাগমের অহঙ্কারে ক্ষীণ হইয়া এই বৈদেশিক প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগণ এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করিতেছিল। কেহ দালালি করিয়া, কেহ নিমক মহালের ইজারা লইয়া, কেহ বা ইংরেজের রাজস্ব সংগ্রহ-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরেজের সৌভাগ্যলক্ষী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন, তাহার দুই একটা পাঁপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিলেন। এই সময় কলিকাতার বনিয়াদি পরিবারবর্গের অভ্যুদয়ের প্রথম ভিত্তি স্থাপন হইল। মহানগরী সমুদ্রগর্ভস্থিতা ঐশ্বর্য্যদেবীর হায়ে আকাশস্পর্শী অট্টালিকা-শ্রেণীতে নিজ সমৃদ্ধির দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল। সমস্ত সহরের আকাশ-বাতাসে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। উচ্ছ্বসিত প্রাণস্রোত, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন, বাঙ্গবিক্রপ প্রহসনের নানা উদ্ভাবনে, চড়কের গাজনে, বারোয়ারী উৎসবে কবির লড়াই-এ, সুরা-সঙ্গীতের উন্মত্ত ভোগলিপ্যায়—বিজয় অভিযানে নির্গত হইল। অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লী-সমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উজ্জলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসংখ্যার সম্মিলিত হৃৎস্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নব-যৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্তায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই আশা ও সীমাহীন সম্ভাবনার পুনঃকোৎসূর প্রতিবেশে বাবুর উদ্ভব। সে যেন জীব-

নোৎসবের এই ফেনিল, মত্ত বিক্ষোভের প্রথম স্বপ্নায়ুঃ রঙ্গীন বৃষ্ণুদ। আর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই উচ্ছ্বাস অসংক্লত জীবন-প্রবাহের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উগ্র উদ্গাদনা, বিদ্রোহী নীতিবোধ ও নিগূঢ় সৌন্দর্য্যাহুভূতি যুক্ত হইয়া এক উচ্চতর সৃষ্টির বীজ বপন করিবে। বাবুর স্থূল ভোগবিলাস কবি ও সমাজ-সংস্কারকের সূক্ষ্মতর জীবনরসোপভোগে পরিবর্তিত হইবে। ‘নববাবু-বিলাস’ (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৭) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোমপ্যাঁচার নক্সা’ (১৮৬২), এই তিনখানি উপন্যাসে বাবু চরিত্র ও বাবু-প্রসূতি সমাজ-জীবন আলোচিত হইয়াছে। ‘নববাবু-বিলাসের’ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’ ঠিক উপন্যাস নহে—নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছ্বল অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রের ও মরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-প্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্য্যোব নূতন জোয়ারে নাগরিক জীবন-যাত্রায় যে সনস্ত উদ্ভট অসঙ্গতি ও রুচিবিকারের দৃষ্টান্ত, ক্ষুণ্ণ-ইয়াকির নূতন নূতন প্রকরণ, উপভোগের যে মত্ত আতিশয়া ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তাঁর স্নেহপূর্ণ কষাখাত করিয়া নিজ পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য ও তাঁড়ামির পর্য্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগ-চঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বসমন্বিত চরিত্র স্পষ্ট হয় নাই—সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।

চার

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে ‘আলালের ঘরের দুলালই’ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণবিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব—বাস্তব বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ ও মননশীলতা—সমস্ত দিকেই পরিষ্কৃত। ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা ‘নববাবু-বিলাস’ ও ‘হুতোমের’ সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটা গ্রন্থেই কেবল হান্ধা ক্ষুণ্ণের উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেতালয়—বর্ণিত হইয়াছে। ‘আলালের’ প্রতিবেশ আরও

পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কৰ্মব্যস্ততা ও সজীব চাক্ষুণ্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শাস্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহল-পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের যে সুকল্লিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বাস্তবজীবনের গতিছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র। চরিত্রাঙ্কণে ইহার শ্রেষ্ঠ আরও সুপ্রকট। মানুষ যে ঘটনা-প্রবাহে ভাসমান খড়্গকূটা মাত্র নয়, তাহার বাস্তবিক যে নদীতরঙ্গ-প্রহত পর্বতের ত্রায় কল্পিত হইলেও স্থানশ্রুত হয় না—ইহাতে চরিত্র-চিত্রণের এই আদর্শই অমূল্য হইয়াছে। বাবুরাম বাবু নিজের, তাহার গৃহিণী ও কন্যাদ্বয়, মতিলাল ও তাহার দুষ্ক্রিয়ার সহযোগীবৃন্দ—ইহারা সকলেই ঘটনা-তরঙ্গে গা ভাসাইলেও এই তরঙ্গোৎকলিত জলকণা মাত্র নহে—ইহারা জীবন্ত, বাস্তব-সম্পন্ন মানুষ, ‘বাবুর’ ত্রায় চন্দ্রের ক্ষীণ আবরণে ঢাকা কঙ্কাল শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র নহে। তাছাড়া, লেখকের পরিকল্পনার এমন একটা সাবলীল সজীবতা আছে, যাহাতে ঘটনার সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি আরও অধিক পরিমাণে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠিকচাঁচা উপত্যাসের মধ্যে সর্কাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; কুটকৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা ইহার মধ্যে এমন চমৎকার ভাবে সমন্বিত হইয়াছে যে, পরবর্তী উন্নত শ্রেণীর উপত্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাস্তারাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা অমুনাসিক উচ্চারণে কেহ বা সঙ্গীত প্রিয়তায়, কেহ বা কোন বিশেষ বাক্য-ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই বাহ্য বৈশিষ্ট্যের উপর ঘাঁক ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন-প্রবণতায় (caricature) পারীচাঁদ অনেকটা ডিকেন্সের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বরং রামলাল ও

বরদাবাবু চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া দ্বন্দ্ব ও বিশেষত্ব-বর্জিত কতকগুলি সদৃশ্যের যান্ত্রিক সমষ্টি মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। কৃত্রিম সাহিত্যরীতি বর্জনে ও কথা ভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে ‘আলালের’ বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কণ আরও বাস্তবরস-সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থে মননশীলতার পরিচয় পাই ইংরেজী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ত্রায়নিষ্ঠ, অপক্ষপাত মনোভাবে, ইহার কুফলের প্রতি অন্ধ না হইয়া ইহার সুফলের সম্বন্ধে সচেতনতায়, লেখকের সমন্বয়কারী, চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে। রামলাল ও বরদাবাবু এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাথমিক ফল; তাহাদের উদার ক্ষমাশীলতা, পরহুঃখকাতরতা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ, সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির বিরোধী না হইলেও, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে যে সামাজিক শিথিলতা ও উন্নয়নগামী হইবার প্রচুরতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। গ্রন্থ-মধ্যে তত্ত্বালোচনার প্রাচুর্য্য—যদিও ইহা অনেকস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও উপত্যাসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী—লেখকের চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দেয়। ‘নববাবু-বিলাস’ হইতে ৩৫ বৎসরের ব্যবধানে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব উপত্যাসের বিবর্তন বহুদিনের প্রত্যাশিত সম্ভাবনাকে সঠিক রূপ দিয়াছে। উপত্যাস হিসাবে ইহা খুব উচ্চশ্রেণীর নহে—অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ও গভীর আলোড়ন ইহাতে নাই। মতিলালের অমূল্যোচ্চারণ ও সংশোধন বহির্ঘটনার চাপে, অন্তরের প্রেরণায় নহে। তথাপি ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপত্যাস-সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়তাত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির সূচনা ঘোষণা করে। ইহার মাত্র ৮ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) হইতে উপত্যাসের মহিমাম্বিত প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল যৌবনের

অদ্ভুত ও প্রেমী

স্বদেশী

তিন

আলকাপের আসর যখন ভাঙল, রাত তখন বারোটোর কাছাকাছি। বারোয়ারী তলায় একথানা চালাঘরেই ওদের থাকবার জায়গা। ঘরখানার তিনদিক খোলা, পেছনে একটা মাটির নোনাখরা দেওয়াল। হাটের দিনে এখানে মরিচের দোকান বসে, অস্থায়ী রাতচরা গরু মহিষ, কখনো বা গাড়ির বলদ স্বেচ্ছাস্থখে রোমস্থন করে' রাত কাটায়। রাশি রাশি শুকনো গোবর ও গুবরে পোকাকার ওপর চাটাই আর চট বিছিয়ে আলকাপ দলের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় ওরা আপত্তি করেনা। বাংলা দেশের নিত্যন্ত অজ পাড়াগা-গুলিতে এর চাইতে ভালো অভ্যর্থনা আশা করাই অসম্ভব।

হাটের চৌহান্দি পেরিয়ে চারদিকে ঢালু মাঠ। শ্রাবণের ভরা বর্ষাতে মাঠগুলো প্রায় সবই তলিয়ে গেছে। আকাশ ভরা তারা বকমক করছে কালো জলের ওপর—হঠাৎ দেখলে সামনে যেন ছলে উঠছে সমুদ্র আর দূরে দূরে তালের বনের নীচে ঘুমন্ত গ্রামগুলো এক একটা দ্বীপ মাত্র। ছাগলের মতো গলা কাঁপিয়ে সোণা ব্যাং ডাকছে, অন্ধকারে উড়ছে অসংখ্য পোকা, আধ ডোবা গাওড়া গাছের মাথায় রাশি রাশি আলোর ফুলের মতো জোনাকি জ্বলছে। শুধু একদিকে সরকারী রাস্তা, তার ওপরে বর্ষার জল ওঠেনি, বাঁধের তলা দিয়ে হু হু করে ফেঁগল আর প্রখর শ্রোত নেমে যাচ্ছে। কারা যেন লণ্ঠন জালিয়ে কোঁচ দিয়ে সেই বাঁধের নীচে মাছ মারবার চেষ্টা করছে, আর টিমটিমে আলো ছলিয়ে তিন চারখানা গোরুর গাড়ী চলেছে কুমারদহের দিকে—বোধ করি সোণাদীঘির মেলায়।

গায়ে কাপড়ের খুঁটটা ভালো করে জড়িয়ে ব্রজহরি

বললে, উহুহ বড্ড শীত ধরেছে রে। এক ছিলিম তামাক সাজনা রে ভূষণ।

ভূষণ চটের বিছানায় লম্বা হয়ে পড়েছিল। বললে, এখন আর আমি উঠতে পারব না খুড়ো, সারাদিন নাচা-নাচি করে হাতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তা ছাড়া অন্ধকারে কে এখন হাঁকো-কল্কে খুঁজে বেড়াবে। তার চে একটা বিড়ি ধরাও বরং।

—আচ্ছা দে, বিড়িই দে।

উবু হয়ে বসে ব্রজহরি বিড়ি ধরাল একটা।

—মাইরি, এ কি ল্যাঠায় পড়লুম বল্ দেখি ?

ভূষণার শীত করছিল। ছেঁড়া চাদরের ফাঁকে ঠাণ্ডা আটকায় না—মাঠের ভিজ়ে বাতাস যেন মাঘের হাওয়ার মতো তীব্র আর তীক্ষ্ণ হয়ে এসে হাড়ের ভেতরটা অবধি কাঁপিয়ে তুলছিল। আরো ঘন হয়ে হাঁটুটাকে বুকের কাছ অবধি টেনে নিয়ে ভূষণ বললে, হাঁ, ল্যাঠা বইকি। আচ্ছা, সেই গানটা তোমার মনে আছে খুড়ো ?—

‘শিবো হে, এ কি ল্যাঠাত্ ফেলিলে হামারে হে,

ভাং-ধুতুরা তুমি খিবা,

কুচনীর বাড়ীত্ খিবা,

কেমনে হে পূজিব তুম্হারে হে—’

বিরক্ত কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, থাম বাপু, ইয়াকী এখন ভালো লাগে না। ব্যাপারখানা বুঝছিল তো ? এক কোণে শুয়ে কালীবিলাস কুণ্ডু কাপছিল। কালীবিলাস আলকাপের দলে পনেরো টাকার হার্মোনিয়ামটা বাজায়, গোরবে বলে, আর্গিন। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। যৌবনের প্রথম দিকটায় বাড়ী থেকে পালিয়ে কিছুদিন বরিশালের চারণ মুকুন্দ দাসের সাঁকরেদী করেছিল। সেই সময় ফরিদপুরের নড়িয়াতে ‘যে ইংরাজে প্রাণের ভাইদের হত্যা করল পালাবে, সে ইংরাজের মধুর

রবে ভোলে কোন্ পিচাশে' (পূর্ববঙ্গে পিচাশকে পিচাশ বলা হয়) গানটি গেয়ে তিন মাস জেল খেটে এসেছিল পর্য্যন্ত। এই জন্ত দলে তথা সমাজেও তার কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে দেশের জন্তে 'সহীদ' হতে গিয়েও জেল থেকে কালীবিলাস গাঁজা খাওয়া শিখে এল। দীর্ঘ এবং একনিষ্ঠ গঞ্জিকা সেবনের ফলে দু'বছর থেকে কাশি দেখা দিয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে রক্ত আসে, কাশির আশ্বাদটা অস্বাভাবিক মিষ্টি বলে মনে হয়।

সমস্ত মাথাটা তার, একটু জরও হয়েছে যেন। একটা ছেঁড়া রূপার বারো মাস ত্রিশ দিনই সঙ্গে থাকে, সেইটেই ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গভীর গলায় কালীবিলাস বললে, টাকাই সব নয়। আগে কথা রাখতে হয়।

ব্রজহরি বললে, কিন্তু এক এক রাত কুড়ি টাকা করে। আলকাপ তো আলকাপ, ওর সঙ্গে আর পাঁচটা টাকা জুড়ে দিলে হারাধন সাউয়ের যাত্রার দল এসে আপখোরাকী গেয়ে যাবে।

জর হলেই স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মাথার শিরাসগুলো দপ দপ করে। রক্তের মধ্যে যে জ্বালা ধরে, সেটা যেন কালীবিলাসের চিন্তাধারাতেও সংক্রামিত হয়। তার সঙ্গে গাঁজার প্রভাব মস্তিষ্কের মধ্যে এখনো ঘনীভূত হয়ে আছে। এই অশ্রদ্ধা আর মযার একত্র সম্মেলন ঘটলেই কালীবিলাস তার আদর্শমানব মুকুন্দ দাসের ওজস্বিতায় অল্পপ্রাণিত বোধ করে।

—টাকা। টাকার পেছনে গোলামী করেই না দেশটা উদ্ধরে গেল। সেই জন্তেই তো অধিকারী মশাই (কালীবিলাস মাথায় হাত ঠেকাল) বলতেন :

সোনার পিঞ্জিরের পক্ষী স্নেহে নিদ্রা যায়,

সাদা ইন্দুর আইয়া রে তোর ঘরের আধার খায়

ওরে হায় হায় হায়—

কালীবিলাসকে সকলে মাঝ করে বটে, কিন্তু তার কথাগুলোকে বিশেষ মূল্য দেয় না। বাস্তব জগতে চলা-ফেরা করবার পক্ষে তাদের বিশেষ কোনো দাম নেই। তারা মুকুন্দদাস নয়, দেশকে স্বাধীন করবার

মহতী ব্রতও তারা নেয়নি। সংসারী মানুষ একান্ত ভাবে শাস্তিপ্রিয় এবং নিজস্ব।

সুতরাং ব্রজহরি এমন ভাবে কথাটাকে উড়িয়ে দিলে যেন শুনতেই পায়নি।

—হাবু যে কথা বলছিস না ?

হাবু মুচি ভূষণ মুচির মামাতো ভাই এবং দলের চিরস্তন হিরো। তা ছাড়া গানের মাষ্টার। সুতরাং তার মতামতের একটা আলাদা এবং গুরুত্বার ওজন আছে। নিজের এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে হাবুও যথেষ্ট সচেতন। সুতরাং সে সহজে মুখ খোলে না বটে, কিন্তু যখন খোলে তখন সে একেবারে মোক্ষম। আপ্তবাক্যের মতো এক একটি সারগর্ভ বাণী উচ্চারণ করে বিরাট হিমালয়ের মতো নীরব আর নিশ্চল হয়ে যায়।

হাবু বললে, ব্যাপার যা দেখছি তাতে আর ট্যা-ফো করে দরকার নেই। চাটিবাটি তুলে সোজা চম্পট দিলেই সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—চম্পট ? চম্পট কিসের ভয়ে ?—উত্তেজিত হয়ে কালীবিলাস কী একটা বলবার আপ্রাণ চেষ্টা করলে। কিন্তু কথা এল না। উদ্গত একটা কাশির প্রবল উচ্ছ্বাসে সমস্ত চাপা পড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে কালীবিলাস কাশতে শুরু করে দিলে অমাসুধিকভাবে। সামনেই নিম গাছে একটা ময়ূর এসেছিল নিম ফলের আশায়, কাশির শব্দে চমকে সে ঝটপট করে উড়ে গেল। কাশতে কাশতে বেদম হয়ে কালীবিলাস শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

ভূষণকে গানে পেয়েছিল। গুণ গুণ করে সে তখনো গেয়ে চলেছে : শিবো হে, ভস্ম বিভূতি মাখ, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে থাক—

ক্ষেপে গিয়ে ব্রজহরি হাতের কাছ থেকে ডুগীটা তুলে নিয়ে এল। বাঘাটে গলায় বললে, থামলি, থামলি হারামজাদা ? আর একটা টাই মেরেছিস কি এই ডুগী তোর মাথায় ফাটিয়ে দেব। আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর ইদিকে—

ভূষণ চিমটি কাটলে।—গান ভালো লাগছে না ? একখানা নাচ দেখিয়ে দেব ? গম্ভীরার একখানা ডোম কালীর নাচ ?

ডুগী উদ্ভত রেখেই মেঘমল্লৈ ব্রজহরি বললে, তা হ'লে তোর বুকে উঠে চাঁড়ালে কালীর নাচ নাচতে শুরু করে দেব আমি।

ভূষণা বললে, থাক থাক। পায়ে গেঁটে বাত নিয়ে অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না, ফুলে শেঁষটায় ঢোল হ'য়ে যাবে।

—রাখ, ফকুড়ি রাখ।—হতাশ কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, ওরে ব্যাটা ভূষণী, একটা বুদ্ধি বাতলে দে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে—মরুক গে, কিন্তু আমরা উলুখড়েরা যে গেলাম। লালাজীর বায়না না নিলে এ তল্লাটের কাজ-কন্ম এই ইস্তক সব কাবাড়। ওদিকে কুমারদ'র বায়না ফিরিয়ে দিতে গেলে—

হাবু সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে অনিশ্চিত অভিমত জানালে, বেশী কিছু হবে না, শুধু মাথাটা ফাটিয়ে সোনাদীঘির পাকের তলায় পুঁতে দেবে।

ব্রজহরি পাল উত্তেজনায় হঠাৎ রুদ্ধকান্ত পাল হ'য়ে গেল। মাথার ঝাঁকড়া বাবরী ঢুলে উঠল জটার মতো। ডম্বর বদলে ডুগী ছলিয়ে বললে, যাব্—যাঃ—যাঃ! এ হচ্ছে ইংরেজের রাজত্ব। মাথা ফাটিয়ে পাঁ—থু, থু, ওয়াক!

একটা উড়ন্ত গুবরে পোকা গোবরের গাদা ভ্রমে ব্রজহরির গর্জমান ব্যাদীত মুখের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করছিল। সঙ্কটকারে সেটাকে ভূষণার দিকে নিক্ষেপ ক'রে ব্রজহরি বললে, থু, থু, শা—। ঢোকবার আর জায়গা পেলো না। ঠেলে বমি আসছে মাইরি। থু, থু,—

পাশে শিবনাথ ঘুমুচ্ছে অকাতরে। মুখে বিজাতীয় তরলতার স্পর্শ অনুভব ক'রে নিদ্রাজড়িত স্বরে বললে, আঃ, থু, থু ফেলছে কোন্ শা—?

হিংস্রভাবে শিবকে একটা ধাক্কা দিয়ে ব্রজহরি বললে, ওয়াক। আরে ওঠোনা ব্যাটা গাড়োল। ইদিকে সন্ধানাশ হ'য়ে গেল, আর—

—ধ্যাৎ—শিবু আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল।

ভূষণা বললে, ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক না। এই মাঝরাতিরে সবাইকে উদ্বাস্ত করছ কেন?

—হঃ, ঘুমুচ্ছে। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি আর এঁরা যেন শব্দের বাড়ীর রাজশয্যায় গদীয়ান হয়েছেন। তবু তো রাজকন্তো জোটেনি। নাঃ, যা থাকে কপালে, কালই চলে যাই কুমারদয়।

হাবু বললে, যাও। কিন্তু লালাজীর খালি টাকা নয়, লাঠিও আছে। ফিরবে কোন্ পথ দিয়ে শুনি। হলুদি ডাঙার মাঠের মাঝখানে ঠেকিয়ে যদি আটা বানিয়ে দেয়—

ব্রজহরি প্রায় কঁদে উঠল।—কী করা যায় তা হ'লে?

—কিছুই করা যায় না। শেষ রাত্তিরে উঠে সিঁধে আইহোর রাস্তা—বেলা উঠবার আগেই মামুদপুরের টাল পাড়ি দেওয়া। মানে মানে ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

—তবে তাই। শোড়ার বোতল ভাঙার মতো শব্দ করে এক দমকা ঝড়ে। হাওয়ার মতো বুকফাটা খানিকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ব্রজহরির : কিন্তু কুড়ি টাকা করে দিত এক এক রাত্তিরে।

ভূষণ বললে, কিন্তু খুড়ী যে বিধবা হত। টাকা দিয়ে শেষকালে আমরা তোমার শ্রাদ্ধ করব নাকি। ব্রজহরি আবার ক্রোধে উঠল, তুই হতভাগা কেবল কুড়াক ডাকবি। আমি মরলে আমার শ্রাদ্ধ খাবি এই আশাতেই নোলা শানিয়ে বসে আছি।

—বালাই ষাট ষাট। খুড়ী পাকা চুলে সিঁহুর পরুক, মুড়ো চিবুতে গিয়ে নড়া দাঁতগুলো খসে যাক।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব আর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কালো রাত যেন ঝামঝম করছে। ছাগলের মতো শব্দ করে সোণা ব্যাং ডেকে চলেছে একটানা। শনশনে হাওয়ার মাঠ ভরা কালো জলে তরঙ্গের দোলা লেগেছে। জেলা বোর্ডের বাঁধের তলা দিয়ে খরস্রোতে জল নেমে চলেছে কলকল করে। একটু দূরে বারোয়ারী তলায় বিষহরির বেদীর নীচে মিটমিট করছে প্রদীপ। কোন্ স্রুদর দিগন্তে গোদাগাড়ী লাইনের একখানা রেলগাড়ী বেরিয়ে গেল, নিস্তব্ধ রাত্রির ঈথারে জলভরা মাঠের ওপর দিয়ে গমগম করে ভেসে এল তার অশ্রুট প্রতিধ্বনি।

কালীবিলাস আবার উঠে বসল। কাশির ধমক

কিছুটা শাস্ত হয়েছে এতক্ষণে। উত্তেজিত গলায় বললে, পালানোর মধ্যে আমি নেই কিন্তু। কথা দিয়েছ, রাখতে হবে। মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত! কুমারদয়েই গান গাইব আমরা।

বিরক্ত হয়ে ব্রজহরি বললে, বাজে কথা কোয়োনো বুড়ো দা। আমরা তোমার মুকুন্দ দাস নাই। জেল খাটা পোষাবে না, লাঠি খেতেও পারবনা।

উদ্দীপ্ত স্বায়ুগুলোর মধ্যে জ্বালাধরা রক্ত চনচন করে উঠল কালীবিলাসের।

—খবদার বেজা। আমাকে যা খুসি তাই বলনি, কিন্তু অধিকারী মশাইকে (কালীবিলাস রূপালে হাত ঠেকাল) অপমান করিসনে।

ব্রজহরি ভেঙে বললে, খাত্তোর অধিকারী মশাই। তাকে নিয়ে তুমি ধুয়ে খাওগে, তার সঙ্গে আমাদের কোন্ সাতপুরুষের সম্পর্কো?

কালীবিলাসের চোখ মুখ দিয়ে আগুনের বিন্দু ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে লাগল! তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর, তুই কি মনে করিস যে দশটাকা মাইনের জন্তে এত অপমান সয়ে তোর এখানে পড়ে থাকব!

নানা দুশ্চিন্তায় ব্রজহরির মাথা ঠিক ছিলনা, সমস্ত বিরক্তি আর অসন্তোষ যেন কালীবিলাসের ওপরেই গিয়ে পড়ল। তিক্ত কণ্ঠে বললে, না থাকো যাওনা চলে। পায়ে ধরে সাধছে না কেউ। একটা ভালো পরামর্সোর নামে গোল নেই, সব কথায় কেবল ওই মুকুন্দদাসের ফাঁকড়া!

কালীবিলাস গর্জে বললে, খবদার বলছি খবদার। তোর দল ছেড়ে আমি চলে যাব কালকেই। কিন্তু তুই অধিকারী মশাইকে অপমান করলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

ভূষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, থামো না থুড়ো। কেন খামোক। ক্যাপাচ্ছ বুড়োকে?

—না মাইরি, ভালো লাগে না। কেবল মুকুন্দদাস আর মুকুন্দদাস। অতই যদি, তা হলে বেশতো বাপু সোজা তার কাছেই চলে যাওনা। আমাদের খামোকা এত ভোগাও কেন।

কালীবিলাস কী বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। অসহ উত্তেজনা আর দুর্কার একটা কাশির উচ্ছ্বাসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কাশতে কাশতে গলা দিয়ে জলের মতো খানিকটা উত্তপ্ত তরল জিনিস বেরিয়ে এল, কাপড়ের খুঁটে কালীবিলাস মুছে ফেলল সেটাকে। অন্ধকার না থাকলে তার চোখে পড়ত সেটা আর কিছুই নয়, টাটকা তাজা খানিকটা রক্ত মাত্র।

* * *

আইহোর পথ ধরে চলতে চলতে দলটির সঙ্গে যখন প্রথম সূর্যের দেখা হল, তখন ওরা নবীপুর আর কুমার-চৌহদ্দি পেরিয়ে এসেছে। তিনদিকে ডুবুরি জল ভরা বর্ষায় মহাসাগরের মতো ফুলে উঠছে, ফেনিয়ে উঠছে—নদী-নালা বন-জঙ্গল সব একাকার হয়ে গেছে। দূরে ডুবুরি বৃক্কে মহাজনী নৌকোর পালে সোনালি রোদ জ্বলছে। ভিজ়ে ঘাস, পচা পাতা আর রাশি রাশি জলের অপূর্ণ স্নগন্ধ—বিলের অজস্র তরঙ্গে কলধ্বনি, যেন গন্ধ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে উড়ন্ত জলকণাগুলো এসে লাগছে চোখে-মুখে, যেন নিম্নল নির্মেষ আকাশ থেকে গুঁড়োয় গুঁড়োয় ঝরছে বৃষ্টির ছিটে। একটু দূরেই দিয়াড়িয়ারদের গ্রাম মামুদপুর, ওখান থেকে একখানা নৌকো কেরায়া করে নিয়ে এই বিল পাড়ি জমাতে হবে।

ব্রজহরি বগলের তবলা বাঁয়া দুটো নামিয়ে একটা আমগাছের গুঁড়ির ওপরে বসে পড়ল। বললে, নে ব্যাটা মুচির পো, চিঁড়ের পুঁটলিটা বের কর। বা-কা হাঁফ ধরে গেছে। আর দ্যাখ, বুড়োদাকে চাড্ডি বেশি করে দিস। রাত থেকে বুড়োদার মাথা গরম হয়ে আছে, ক্ষিদেও নিশ্চয়—কিন্তু বুড়োদা কই?

কালীবিলাস নেই। শেষ রাত্রিতে তাড়াহুড়োব সময় কালীবিলাসও উঠেছিল, তার পোঁটলাও গুঁড়িয়ে-ছিল তারপরে এক সঙ্গে রওনাও যে দিয়েছিল তাও ঠিক। কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালীবিলাস সঙ্গে আসেনি।

ভূষণ ভীত হয়ে বললে, রোগা মানুষ, পথের মাঝখানে পড়ে-টড়ে নেই তো?

ব্রজহরির অল্পতাপ হচ্ছিল। বললে, তাই তো। একটু থুঁজে আর না রে।

ভূষণ থুঁজতে গেল! * কিন্তু বৃথা। যতদূর চোখ চলে, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে কালীবিলাসের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

চার

রূপাপুরের কামারপাড়ার নীচে কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া এসে থামল।

তখন বেলা উঠেছে অনেক। মাথার ওপর রূপপুরের সূর্য জলছে। ঘোড়ার চ্যাপটা আর কালো কালো ঠোঁটের কোণে ফেনার বিন্দু দেখা দিয়েছে, ক্ষুধার আর তৃষ্ণার হিংস্র ভাবে কড়মড় করে চিবুচ্ছে মুখের লাগামটাকে। হাঁটু অবধি ধুলো আর কাদা। কুমার বিশ্বনাথের মুখের ওপরেও ধুলোর একটা পুরু আবরণ পড়েছে, মাথার অসংযত চুলগুলো নেমে এসেছে কপালে। চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি আর উত্তেজনা।

কামারেরা উঠে দাঁড়াল শশব্যস্ত হয়ে। বিশ্বনাথকে তারা ভালো করেই চেনে, ওই ঘোড়াটাও তাদের পরিচিত। তেজী টাঙ্গন ঘোড়া, ঘাড়ের ওপর সিংহের মতো কেশরগুচ্ছ। কদম চালে যেন হাওয়ার মুখে উড়ে চলে যায়। অমন ঘোড়া এ তল্লাটে আর কারো নেই।

রূপাপুরের কামারেরা বিশ্বনাথের প্রজা নয়। তবু তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল বিশ্বনাথকে। রামনাথ হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়াল।

—কোন ভাগ্যে এখানে পায়ের ধুলো পড়ল হজুরের?

—বলছি।

কিন্তু বিশ্বনাথ রূপাপুরে আসবার আগে আরো একটু ভূমিকা আছে।

কুমারদহ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নবীপুরে পৌঁছলেন। এতদিন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ আসবার পথে কুমারদহের সঙ্গে নবীপুরের স্বাতন্ত্র্যটা যেন তাঁর বিশেষভাবে চোখে পড়তে লাগল। নবীপুর বেড়ে

উঠছে, অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে উঠছে। হু' বছর আগে যেখানে কাঁকা মাঠে ঘনশ্রমল ধানের শীষ মাথা তুলত, আজ সেই সব জায়গায় নতুন নতুন পাড়া বসেছে। কাঁচা ঘর, কোঠা ঘর। ঘরের দরজায় ঘোড়া বাঁধা, খচ্চর বাঁধা। ছোট বড় রাশি রাশি দোকান; পানের দোকান, বিড়ির দোকান, মনোহারী দোকান—এমন কি চায়ের দোকান পর্যন্ত। বাসিন্দারা অধিকাংশ হিন্দু-স্থানী, বালিয়া আর আরো জেলার বাসিন্দা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পশ্চিমের একটা শহরকে এনে কে যেন রাতারাতি উড়িয়ে এনে বাংলা দেশের এই প্রকাণ্ড ঢালু মাঠের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। হাঁ, নবীপুরকে এখন কলকাতার কাছাকাছিই বলা যায় বই কি। আর সকলের ওপরে মাথা তুলে রয়েছে লাল হরিশরণের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ীটা। চিলে কোঠার ওপরে রেডিয়োর তার—সেই তারের ওপরে উড়ে উড়ে জটলা করছে এক কাঁক কবুতর—সৌভাগ্যের প্রতীক ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কুমারদহের কথা। কুমারদহ। একটা ভাঙাচুরো এলোমেলো কন্ডাল। রাস্তার হু' পাশে ছড়িয়ে পড়ছে বিচূর্ণ কোঠা বাড়ীর ইট পাথর। অসংলগ্ন জঙ্গলের মাঝখানে এক একটা জরাজীর্ণ বাড়ী—যেন অসুস্থতা আর বার্কাক্য সর্বান্তে বহন করে মৃত্যুর প্রতীক করছে। বড় বড় দীঘিতে কলমী-দাম, এক হাত পুরু হ'য়ে পানা জমেছে, আর সেই পানার ওপর এব-রাশ নীল রঙের ডিম নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে আলাদ-গোকুর। ঐশ্বর্য নেই, আছে অরণ্য; মালুস নেই, আছে ফেনায়িত বিদ্রোহ আর হিংসা।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন দাঁতের চাপ এসে নীচের ঠোঁটটার ওপর পড়েছিল। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের আচমকা কিসের একটা টক্কর লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দাঁত সোজা বসে গেল মাংসের ভেতর। যন্ত্রণাবিকৃত মুখের রক্ত কমাল দিয়ে মুছে ফেলে ঘোড়ার রাশি টানলেন বিশ্বনাথ। সামনেই লাল হরিশরণের গদী।

—রাম রাম। আইয়ে রায়জী, আইয়ে।

হু' পাশ থেকে হু'জন লোক এসে বিশ্বনাথের ঘোড়া ধরলে। সিঁড়ির সামনেই লালাজীর ভাইপো রাম

গোপাল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বিড়ি ফেলে দিয়ে সন্মানে অভিবাদন করে বললে, নমস্ते, আইয়ে, আইয়ে।

প্রতি অভিবাদন জানালেন বিশ্বনাথ। কিন্তু কিসের একটা সঙ্কোচে তিনি যেন চোখ তুলে রামগোপালের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। যে কুমারদেহের জমিদার বাড়ীতে একদিন হরিশরঙ্গের পূর্বপুরুষ পদসেবা করে অরসংস্থান করত, আজ সেই হরিশরঙ্গের কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। তিনি—কুমার বিশ্বনাথ। মনে হ'তে লাগল চারদিক থেকে অসংখ্য অবজ্ঞা আর অমুকম্পার দৃষ্টি এসে তাঁর গায়ে হ'চের মতো বিধেছে।

প্রকাণ্ড গদী বাড়ী। প্রায় পনেরোখানা বড় বড় সিঁড়ি পার হ'য়ে উঠতে হয় দোতলা সমান উঁচু বারান্দায়। ওপরের দিকে সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সিঁড়ির মাথায় ছ'দিকে ছ'টি স্বেত পাথরের মূর্তি—একটি সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আর একটি গন্ধমাদন বহনরত মহাবীর। মূর্তি দু'টিই সিঁড়ুরে বিচর্চিত। নকল মার্কেলে বাঁধানো মেজে, ফুলের কাজ করা। বারান্দার এক পাশে প্রকাণ্ড একটা লোহার দাঁড়িপাল্লা, দু'জন লোক সেখানে ধান মাপছে। আর এক পাশে আট দশটা কাপড়ের গাঁট আছে শুপাকার হ'য়ে। সাদা দেওয়ালের গায়ে নীল সিঁড়ুর দিয়ে লেখা 'লাভ শুভ' 'লাভ শুভ'। কোথা থেকে বেনেতী মসলার খানিকটা উগ্র মিশ্র গন্ধ তেলে আসছিল।

বারান্দা পেরিয়ে লম্বা একখানা ঘর—এই গদী। ঘরে পুরু জাজিম পাতা, তার ওপর ধবধবে সাদা চাদর। তিন চারটে বিরাটকায় গির্দা বালিশ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এমনি একটা বিরাটকায় বালিশে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে গড়গড়া টানছেন লাল হরিশরঙ্গ। পরণে সূক্ষ্ম খানের কাপড়, গায়ে পাতলা আঁঙ্গুর পাঞ্জাবী। লালাজীর ঠিক পেছনেই দেওয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা ফুল্লুঙ্গি; সেখানে লাল রঙের আর একটা ফুল্লুঙ্গি গণেশ মূর্তি, রূপোর প্রদীপ, রূপোর ধূপদালী। তার ওপর বড় একটা দেওয়াল ঘড়ি আর

দেওয়াল ঘড়ির ছ'পাশে ছ'খানা বড় আকারের ছবি—মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত জওহরলাল।

লালাজী গড়গড়া টানছেন আর ফরাসের ওপর ভিড় করে বসেছেন তাঁর কর্মচারী, মোসাহেব আর প্রসাদা-কাজ্জীর দল। ঠিক পাশেই নীল রঙের একটা গড্রয়েজ সিন্দুক, একজন লোক তার ভেতর থেকে একতাড়া নোট বের করে গুনছিল।

বিশ্বনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই লালাজী সোজা উঠে দাঁড়ালেন তারপর এগিয়ে এসে এবং বিশ্বনাথ কিছু বলবার আগেই ছ' হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন, আসুন রাজাসাহেব, কিরপা করকে গরীব খানেমে পা ধারিয়ে

সাপের কামড় খাওয়ার মতো বিশ্বনাথ চমকে ছ' পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ছিঃ, ছিঃ, এ কী করছেন আপনি।

লালাজী হাসলেন—হাসিতে যেন শ্রদ্ধা আর বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, না, না, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো আপনার চাকর, আপনার গেয়েই তো আমরা মানুষ।

লালাজীর গদীতে যারা বসেছিল, তারা তাকিয়ে আছে বিশ্বয় বিমূঢ় দৃষ্টিতে—যেন কী একটা বিচিত্র অভিনয় দেখছে তারা। কিন্তু বিশ্বনাথের ছ' কান লাল আর গরম হয়ে উঠল। কপালের ওপর ফুটে উঠল ঘামের বিন্দু। জামার আস্তিনে কপালটা মুছে ফেলে বিশ্বনাথ বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে লালাজী।

কথা আছে—বিলক্ষণ! আসুন, আসুন, আমার বসবার ঘরে আসুন। এ রাম দেইয়া, রাজাবাবু কো ওয়াস্তে চা লাগাও জলদি—

জী। রাম দেইয়া বেদিয়ে গেল প্রস্তুত হয়ে।

মাপ করবেন, চা আমি এখন খাব না।

চা খাবেন না, এও কি একটা কথা হল। গরীবের মোকামে যখন কষ্ট করে এসেছিলেন,—লালাজী আবার হাসলেন : তখন আর একটু তকলিফ—

গরীবের মোকাম—তাই বটে ! কলকাতার বিবেক-
নন্দ রোডে আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ তুলেছেন লালাজী।
বাংলার গভর্ণর স্বয়ং তাঁর প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন
করেছেন। বিরাট ব্যবসা, বিশাল কারবার, লক্ষ লক্ষ
টাকার তিনি মালিক। সে ঐশ্বর্যের চিহ্ন এই গ্রাম্য বাড়ীর
সর্বত্রই সোণালি রঙে ঝলমল করছে। ড্রাই ব্যাটারী
দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, ঘরে ঘরে ইলেকট্রিকের
আলো আর পাখা। পুরু পার্শী কার্পেট। মনে পড়ল
ধ্বংসেশ্বর কুমারদেহের অপনয়মান রাজপ্রতাপ।

লোভনীয় বসবার ঘরটি। লালাজীর গদী থেকে
একেবারে আলাদা। গদীর প্রয়োজন ব্যবসায়িক, তার
পাবহার স্থূল এবং সর্বজনীন। কিন্তু এ একটা বিভিন্ন
জগৎ। কাচের শেল্ফে বাধানো দামী ইংরেজী, হিন্দী,
বাংলা বই ঝকমক করছে। সোফার ওপর হরিণ আর
চিতাবাঘের চামড়া বিছানো, লালাজী নিজের হাতেই
এদের শিকার করেছেন। কালো আবলুস কার্টের ফ্রেমে
দামী ক্লক। মেহগিনীর টেবিলে ফুলের তোড়া।

লালাজী সবিনয়ে বললেন, বৈঠিয়ে।

বিশ্বনাথ বসলেন। কিন্তু অকারণে, অত্যন্ত অকারণে
তাঁর সমস্ত চোখমুখ ঘণ্টাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। লালাজী
টেবিল-ফ্যান খুলে দিলেন, তবু বিশ্বনাথের মনে হতে
লাগল, শরীরের ভেতর থেকে যেন অসহ্য একটা উত্তাপ
শাশ্বত রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে, যেন তাঁর নিঃশ্বাস-
প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

লালাজীর মুখে অসীম বিনয়—চোখদুটি যেন বিনয়ে
ছল ছল করছে। কোমল কণ্ঠে বললেন, ফরমাইয়ে।

বিশ্বনাথ একবার শুক ওষ্ঠ লেহন করলেন।
পিপাসায় যেন গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছে, এখন
একপাত্র মদের প্রয়োজন। নিজে না এলেই বোধ করি
ভালো হত। কিন্তু এখন আর ফেরবার জো নেই কোনো
দিক থেকে।

বললেন, মেলা সংক্রান্ত সেই কথাটা বলবার
জন্তেই—

বললেন, রাম রাম। সেজন্তে এত কষ্ট করে
রাজাবাহাদুরের আসবার দরকার ছিল কী। কোনো

আমলাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। এই দুপুর রোদে
এতখানি ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কী রাজাবাহাদুরের স্কুমার
শরীরে কখনো নয় !

—রাজাবাহাদুর...রাজাবাহাদুর!—কথাটা যেন
কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করতে থাকে। যেন ইচ্ছে
করেই লালাজী তাঁর গায়ে বিজ্রপের চাবুক মারছেন।
কিন্তু লালাজীর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, এতটুকু
বৈলক্ষণ্য নেই কোথাও। একরাশ মাখনের মতো নরম
আর কোমল প্রশান্ত মুখশ্রী, উদ্বিগ্ন ও ভাবার্থীর মতো তাঁর
মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুমালে মুখ মুছে বিশ্বনাথ বললেন, মেলাটা কি
আপনি নিতেই চান ?

লালাজী হাসলেন। সোনার সিগারেট কেস খুলে
এগিয়ে দিলেন বিশ্বনাথের দিকে। বললেন, রাজাবাবুর
মেলা আমি নিতে পারি এতবড় কথা বলব কী করে।
বহর তিনেক মেলাটা গোলামের তাঁবে থাকুক, এই
আজি। মনিবের সম্পত্তি তো চাকরেই দেখা শোনা
করে, তাতে অস্তায় কিছু নেই।

ব্রজহরি পালের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দামী চূর্ণভ
‘বার্ডসাই’ কিন্তু বিশ্বনাথ স্পর্শও করলেন না। তাঁর
শিরাগুলো যেন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে জলে
উঠেছে। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনা আর উগ্রতাকে গলার
নীচে ঠেলে রেখে তিনি শাস্তস্বরে বললেন, মেলা না
পেলে কি আপনি টাকা দিতে পারবেন না।

—কী করে দিই ? আরো কোমল, অনেকটা
অমুনয়ের ভঙ্গিতেই জবাব এল : আমারও বালু-বাচ্ছা
আছে। তাদের একটা ব্যবস্থাও তো করা দরকার।
রাজাবাহাদুর নিজেই বিবেচনা করুন।

উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফ্যানের
বাতাসেও শরীরের সর্বত্র প্রাথমিত উত্তাপ এতটুকু শান্ত
হতে চায় না। বিশ্বনাথ রুমালে আবার চোখ মুছলেন।
গলার কাছে কী একটা আটকে ধরেছে, কথা বলতে
কষ্ট হয়।

—বেশ, তবে তাই।—কণ্ঠের প্রশান্তি সত্ত্বেও

বিশ্বনাথের চোখ জ্বলতে লাগল, আর লালাজীর চোখ হাসতে লাগল কৌতুকে। বিশ্বনাথ বললেন, কাগজপত্র তৈরী থাকে তো দিন। আমি সই করে দিই।

—রাম রাম সীতারাম।—লালাজী সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে গেলেন: তাও কি হয়। গরীবের বাড়ীতে এসেছেন, চা-পানি খান, একটু বিশ্রাম করুন। কাগজ পত্র আর টাকা আমি কাল নিজেই লোক দিয়ে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। চোখের দৃষ্টিকে স্থির আর দৃঢ় করে রাখলেন লালাজীর মুখের ওপর: আর সে টাকা যদি আমি কেড়ে রাগি? যদি দলিল সই না করে ছিড়ে ফেলে দিই?

লালাজী আবার হাসলেন: তা হলে সে টাকা আমি রাজাসাহেবের নজরানা বলেই ধরে নেব।—কথাটা এসে পড়ল যেন কঠিন একটা মুষ্ঠাঘাতের মতো। স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিশ্বনাথ, কোনো উত্তর মুখে জোগাল না। লালাজী টেবিলে কমুইয়ের ভর রেখে অসুস্থকিৎসু চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টেবিল-ফ্যানটা অশ্রান্তভাবে কট কট করতে লাগল আর বাইরে থেকে শোনা যেতে লাগল ধান মাপার জ্বর: রামে রামে দো—দো—দো তিন, তিন তিন চার, চার—চার—পা—নু

ঠিক এমনি সময় চা নিয়ে ঘরে ঢুকল রামদেইয়া। সঙ্গে সঙ্গে যেন জমাট অস্বস্তির একটা কালো দমকা হাওয়া হ হ করে দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল।

এক নিম্নাসে চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে এবং খাঙ্ক-জবোর একটি কণাও স্পর্শ না করে বাহিরে এসে বিশ্বনাথ ঘোড়ায় উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাবুক পড়ল, তার পরেই ঘোড়া দ্রুতবেগে উড়ে চলল সোজা রূপাপুরের পথে।

রূপাপুরের মজলিস শেষ করে বিশ্বনাথ যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেলা দুপুর। ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে বসলেন, মনে থাকবে?

জ্বরচের হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, ফুলে উঠেছে সমস্ত বুকখানা। কালো কঠিন হাত মুষ্টিবদ্ধ করে জবাব দিলে, থাকবে।

রামনাথ দাঁড়িয়েছিল মাথা নীচু করে। বিশ্বনাথ এবার তাঁকেই সম্ভাষণ করলেন।

তুমি কী বলছ ওস্তাদ?

রামনাথ মুখ তুলল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, আপনার হুকুম আমরা মানব।

—হাঁ। মেলা ভেঙে দিতে হবে। যেমন করে হোক। আগুন লাগিয়ে, দাঙ্গা বাধিয়ে—যেমন করে হোক। ধাক্কা সামলাতে আমি আছি। আর টাকা—সে তো আগেই বলা আছে।

—তাই হবে।—কিন্তু ঘরের দিক থেকে রামনাথ কোনো প্রেরণা পেলনা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবার বয়স বা উৎসাহ কোনোটাই তার আর নেই। সেদিনের উত্তপ্ত রক্ত গেছে শীতল হয়ে, যাযাবর জীবন আমের ননের ছায়ায় নিভুতে এসে আশ্রয় নিয়েছে; ফসল কাটবার সময় অনেক আলো আর স্বপ্ন ভবিষ্যতের মোহমায়ী বুলিয়ে দিয়ে যায়। তারপর রাজে কামিনী যখন বৃকের মধ্যে একান্ত ঘন আর নিবিড় হয়ে আসে—তখন—প্রেমে, পূর্ণতায় আত্মতৃপ্ত পাশবিক জীবন। মারামারি, হাঙ্গামা কিংবা অনিশ্চয়তাকে যেনে নেবার অল্পপ্রেরণা কোথায়?

তবু রামনাথ বললে, তাই হবে।

রূপাপুরের তলা দিয়ে জনশ্রোতের বিরাম নেই। অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে, ধুলোয় কাদায় কোলাহলে পথ মুখরিত করে চলেছে। বিশ্বনাথ আবার ঘোড়ায় চাবুক বসালেন, তারপর শেষবারের মতো মুখ ফেরাতেই রামনাথের ঘরের দাওয়ায় দেখলেন ভানীকে। একবার ছুবার, তিনবার ফিরে ফিরে দেখলেন তিনি। মাথার ওপর রোদ ঝলকাচ্ছে, অনেকক্ষণ থেকে একপাত্র মদ পেটে পড়েনি। তবু—বিশ্বনাথ চকিতের জন্তে ঘোড়ার রাশ টানলেন, তারপরেই আবার হাওয়ার মতো ছুটিয়ে দিলেন তাঁর তেজী টাঙ্গন ঘোড়াটা।

ভানী কে?

তার পরিচয় যথাসময়ে দেব। আমার এই কাহিনীর সে নায়িকা, উপনায়িকাও বলতে পারেন আপনারা।

[ক্রমশঃ]

মিথ্যা অভিযোগ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মাছুষের পরে মাছুষের উৎপীড়ন সনাতন। দল বেঁধে মাছুষ অস্ত্র দলের মুণ্ডপাং করে। বিশ্বব্যাপী অশান্তির অবসানের চেষ্টা মাঝে মাঝে সহৃদয় প্রবল জাতির মনে জেগে ওঠে। আজ তেমনি এক বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টায় মেদিনী কম্পমান।

আন্তর্জাতিক উৎপীড়ন কোনোদিন নিষ্পূর্ণ হবে কিনা, সে অতি বৃহৎ সমস্যা। কিন্তু প্রত্যেক সভ্য জাতি নিজের শাসন-গণ্ডীর মাঝে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার বন্ধ করবার সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কেবল সভ্য-জাতি কেন, প্রত্যেক সম্ভব লক্ষ্য একের পরে অস্ত্র-জনের অনর্থক অনাচার অত্যাচার প্রতিরোধ। কিন্তু অসভ্য এবং অর্ধ-সভ্য সমাজের উৎপীড়ক শাসনকর্ত্তা বা শাসক সম্প্রদায় স্বয়ং। সভ্য-জগৎ সাম্যবাদী। এখানে বিধি-নিয়মের অধীন সবাই। আইন কারও কাছে মাথা নত করে না—ধনী-নিধন সকলকেই আইন মেনে চলতে হয়।

দেশের বিধি-নিয়ম মানব-প্রবৃত্তির বিধি-নিয়মকে অবদমন করতে পারে, নিষ্পূর্ণ করতে পারে না। দেব প্রকৃতি মাছুষের মনের গভীরে উৎপীড়নের রাক্ষস লুকিয়ে আছে। জ্ঞানের আলোর আশেপাশে ঝাঁপে ঝাঁপে গাঢ় অন্ধকার সত্যের প্রবেশ-পথ বন্ধ করে। উদার জগতের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রকৃতির বাণী মানব-মনের রাক্ষসের কোঠায়ও পৌঁছায়, কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সেখানে হিংসা-অশ্রু বড়যন্ত্র-তৎপর। নর-রক্ত পানে আত্ম-প্রসাদ লাভের প্রত্যাশা তার প্রকৃতি।

শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ-নীতি এবং ধর্ম সর্বদাই আমাদের সহজাত আত্মরী প্রকৃতিকে দমন করবার চেষ্টা করে। সভ্যতার দেব-ভাব বোঝে, অহিংসার শাস্ত নিকেতনই কাম্য বিশ্রাম স্থল। কিন্তু হিংসার দেবতা বলে, সে তো দুঃস্বপ্ন কথা। আপাততঃ অস্ত্রের অশ্রুতে নিজের কঠোর চলার পথ একটু ধুলি-হীন করা মনোরম। অবদমিত হিংসা-বৃত্তি সদাই মাথা তুলতে চায়।

সভ্য-জগতে নিছক নিরাবরণ হিংসা মাথা তুললে, তার উপর চতুর্দিক হ'তে নিন্দাবাদী, এমন কি লণ্ড বর্ষণ অনিবার্য। আত্মীয়ের অননুমোদন, সমাজের নিন্দা, রাজ শক্তির শাসন, এমন কি নিজ-প্রকৃতির পরি-হাসের দুর্গতি এড়াবার জন্য, হিংসাকে অহিংসার সুখোশ পরতে হয়। এ আত্মগোপনে হিংসা অহিংসার মহিমা-কীর্ত্তন করে। তত্ত্বাবধী—গুণ্যের প্রতি পাপের প্রত্যা-নিবেদন। কিন্তু পাপের সেবা-নিরত দাস তত্ত্বাবধী। প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে সে অনেক অস্ত্রায় সাধতে পারে।

ধর্মের নামে সমাজের চোখে তত্ত্বাবধী কি রকম ধূলা দেয়, সে কথা সকলে জানে। অথচ প্রত্যেকের চোখে মাঝে মাঝে সে ধূলা পড়ে। কারণ জাতির প্রতিও মাছুষের প্রত্যাশা শাস্ত।

অস্ত্রায় নিরাকরণ, অস্ত্রত: নিবারণে, সকল সভ্য-সমাজ তৎপর। রাজশক্তি আত্মনিয়োগ করে অসাধুতা গোপের প্রচেষ্টায়। যেখানে প্রতিরোধ অসম্ভব, শাসন সেখানে পাপীকে শাস্তি দেয়। শাস্তির উদ্দেশ্য—আইন-ভাঙ্গা অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া—যার ফলে সে আত্মশোধন করতে পারে। শাস্তির অস্ত্রতম উদ্দেশ্য সমাজে দুষ্টির প্রাণে ভীতি সঞ্চার। দেওর ভয়ে মাছুষ অস্ত্রায়ের প্রবৃত্তিকে অবদমন করে।

কিন্তু হিংসার রাক্ষস যেমন নিষ্ঠুর তেমনি কুট-বুদ্ধি। তার সুখ—উৎপীড়নে, পরের নিগ্রহ লাহন। এবং দেহ ও মনের ক্রেশে। আইনের শাস্তি মাছুষকে কষ্ট দেয়। যে প্রকৃত পাপী নয়, চক্রান্তমূলক ভ্রান্তিতে আইনের শাস্তি তাকে নিগৃহীত লালিত এবং ক্লিষ্ট করতে পারে। সুতরাং রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ হিংসার উৎপীড়নের একটা প্রণালী। ব্যথিতের সুখোশ পরিধান ক'রে তত্ত্বাবধী-রাজ-শক্তির শরণাপন্ন হয়। মিথ্যাকে সত্যের রূপ দেয়। তার ফলে অনেক নিরীহ লোক শাস্তি পায়।

রাজশক্তির এক কর্তব্য—অপকৃত সম্পদের উদ্ধার। এক কর্তব্য বুদ্ধি অপব্যবহারে নিবৃত্ত করতে পারলে

লোভী পরধন নিজস্ব করতে পারে। পরধাপহরণ দণ্ডনীয়। এই নীতির উপর লোভীর লাভের জন্ত মিথ্যা অভিযোগের কু-বুদ্ধি। নিজের সম্পত্তি অন্নের কবলে, এ কথার মিথ্যা প্রমাণ দিতে পারলে, নিজে দণ্ডনীয় না হয়ে, পরের দ্রব্য নিজস্ব করা যায়। কারণ বিচারকের কর্তব্য বুদ্ধি যতই হুস্ন বা ভীক্স হ'ক, তাঁকে যাহুযের কথা শুনে সিদ্ধান্ত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ভণ্ডামীর ছদ্মবেশ যার যত পরিপাটি, তার বিজয়-সম্ভাবনা তত অধিক।

ধর্ম বা নীতি সমাজকে শক্ত না করলে, উৎপীড়ন অবশ্যস্বাভাবী। হুস্ন বিচারবুদ্ধিও পদে পদে কু-চক্রীর কুট-বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হয়।

বলা বাহুল্য কুচক্রী লোভী কাপুরুষ। সন্মুখ সমরে শত্রুকে আক্রমণ করলে, জয় পরাজয়ের সমান সম্ভাবনা। কিন্তু আদালতে মিথ্যা অভিযোগ, ভাল দলিল, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতির সাহচর্যে, বিপক্ষের হানির সম্ভাবনা অত্যধিক। সেই দুর্বল অস্বস্তি মিথ্যা মামলার বিচারালয় অপবিত্র করে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার বলতে পারি, মিথ্যা নোকদমার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত থাকে, তারা দুর্বল ঐকান্তিক। তারা সোজা কথা কয় না, লোকের মুখের দিকে স্পষ্ট তাকাতে পারে না। নিছক লাভের জন্ত ব্যবসা হিসাবে এরা মিথ্যা অভিযোগ করে।

এই শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য 'ব্ল্যাকমেলার' পড়ে না। সে কুটিল বুদ্ধি, দেহের দুর্বলতা বহু ক্ষেত্রে তার নাই। তেমন লোক জীবনের ভয় দেখিলে, আত্মীয়ের দৈহিক ক্ষতির বিভীষিকায় শীকারকে অভিজুত ক'রে পরধাপহরণ করে। এক্ষেত্রে উৎপীড়িত দুর্বল। তার সামান্য ভুল-ত্রাস্তির উপর 'ব্ল্যাকমেল' অপরাধীর মিথ্যা দোষারোপ প্রতিষ্ঠিত। এদেশে এদের অভিযান খুব বেশী নয়।

বহুদিন পূর্বে এমন একজন অপরাধী সত্যার পুস্তক প্রকাশ ক'রে অনেক উচ্চপদস্থ নাগরিকের নিকট অর্থ-শোষণের চেষ্টা করেছিল। তাদের যৌন দুর্বলতা সর্বদা ইঙ্গিত ক'রে, আগামী বারে হাটে হাঁড়ি ভাঙবে ব'লে ভয় দেখিয়ে, কিছু অর্থ পেলে, ভবিষ্যত সংখ্যার সে সর্বদা দীর্ঘ থাকতো। কিস্তি আদায় করতে না পারলে,

কম্বিত নারিকার সঙ্গে বিশিষ্ট নাগরিকের গুপ্ত প্রেমের চিত্র আকত। কাদের অর্থ লেখক নিজস্ব করেছিল, সে সংবাদ সঠিক পাওয়া যায় নি। কিন্তু বাদের বিধ্বস্ত করতে পারে নি তাদের মধ্যে একজন প্রবল ব্যক্তি ছিল। পুলিশ পুস্তিকা প্রকাশকের উপর মামলা চালায়। আমি সরকার পক্ষের উকীল ছিলাম। অপরাধীর মাস কতক ফেল হ'ল। কিন্তু শুনেছি এই নোংরা পুস্তক ফেরী ক'রে সে বহু অর্থলাভ করেছিল।

আর এক শ্রেণীর মিথ্যা মামলা পুলিশ কোর্টে এবং ছোট আদালতে রুজু হত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যুক্ত প্রদেশ এবং বেহারের গ্রামের প্রবল শত্রুকে কলিকাতার আদালতের মারফত টেনে এনে নিগ্রহ করা। এখানে অভিযোগ ক'রে তাদের নামে ওয়ারেন্ট বার করা হ'ত। লোকগুলোকে কলিকাতায় এনে বহুদিন মামলা চালিয়ে কষ্ট দেওয়া হ'ত। ছোট আদালতে এই শ্রেণীর অভিযোগের সংখ্যা এত বেড়ে উঠেছিল যে, সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত করতে হয়েছিল। কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগীর পুলিশ কোর্টে শাস্তি হবার পর এ শ্রেণীর মামলার সংখ্যা কমেছে।

এই রকম এক শ্রেণীর মামলাকে পুলিশ কোর্টে—“উড়িয়া চিটিং কেশ”—বলা হয়। এমন নালিসের বিবরণ অতি সরল। একটি নিরীহ উড়িয়া পাচক কিবা জলের কলের মিস্ত্রী কপালে চকনের কোঁটা কেটে, জোড়হাতে হাকিমের সন্মুখে অভিযোগ করে। বিবরণ তার গ্রামের দৈত্যারি মহাপাত্র দেশে যাচ্ছিল। সংসারের ইষ্টের জন্ত অভিযোগী দৈত্যারিকে এক কুঁদো মিছরী, এক জোড়া ধূতি, নিজের পরিবারের জন্ত এক খানা সাড়ি, নগদ কুড়িট টাকা সমর্পণ করেছিল—বাদীর পুত্রকে দেবার জন্ত। অভিযোগী পুত্রের এক খণ্ড পোটকাঁড় পেশ করে, প্রমাণ করবার জন্ত যে সে দৈত্যারির নিকট সমর্পিত সম্পত্তি পায় নাই। অসাধু দৈত্যারি সমর্পণ অস্বীকার করেছে।

পূর্বে হাকিমরা এমন অভিযোগে ওয়ারেন্ট দিতেন। যেচার দৈত্যারি কশিন্ধালে হয় তো বাজপুরের উত্তরের কু-খণ্ডে পদার্পণ করে নি। এখন এমন মামলা হ'লে

দেশে তদন্তের অস্ত্র পাঠানো হয়। সত্য প্রকাশ পায়। ফলে “উড়িয়া চিটিংকেশ” এখন বিরল। বলা বাহুল্য, প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় দৈত্য্যারি ঐ রকম গচ্ছিত হন আত্মসাৎ করে। বলেছি মিথ্যা সত্যের মুখোঁস না পড়লে পরের ক্ষতি করতে পারে না। একটা সত্য ঘটনার কাঠামোয় মিথ্যার গল্প রচনা ক’রে ছদ্মস্তরার স্বকার্য সাধন করে।

বেঙ্গাপুত্রকে আইন অঙ্গুসারে ধোরাকী দিতে হয়। কিন্তু সহজে লোকে আরজের পিতৃষ স্বীকার করতে চায় না। আমি প্রথম বধন ওকালতি আরম্ভ করি, পুলিশ কোর্টে এক দারুণ উত্তেজনারুলক মামলা চলেছিল। আমি বর্ণনায় কল্পিত নাম ব্যবহার করব। কিন্তু ঘটনা সত্য।

শ্রীমতী দোপাট্টারানী ছিল অভিযোগকারিণী। তার ছ’মাসের শিশু হাবুকে তার পিতা বরেন্দ্র ধোরাকী দিতে অস্বীকার করেছে, এই ছিল দোপাট্টার অভিযোগ। বরেন্দ্রের উকীলের আমি সহকারী ছিলাম। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বোসের এজলাসে মামলার শুনানী। মিঃ বোস সহদয় খুঁটান—ধার্মিক, মিষ্টভাবী, মহাপ্রাণ। দোপাটি পতিতা, কিন্তু শিশু হাবু অসহায়। আমরা বুঝলাম হাকিমের দরদেব স্রোত কোন্ মুখে। হাকিম হাবুর মা’র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু শিশু হাবুর হাত পা ছোঁড়া লক্ষ্য করেন সম্মুখে।

চারজন তার সমশ্রেণীর জ্রীলোক প্রমাণ করলে যে বরেন্দ্র ব্যতীত অস্ত্র পুরুষের সঙ্গে দোপাট্টার কোনো সংশ্রব ছিল না। মাঝে মাঝে বরেন্দ্রের সঙ্গে তার ছ’একজন বন্ধু গান শুনে আসতো। কিন্তু কোনো লোক একেলা এলে দোপাটি তার মুখ দর্শন কর্ত্ত না, রসালোপ তো দূরের কথা।

এক ভীষণ প্রমাণ দিলে অভিযোগিনী দোপাটি, হাবুর পিতৃষের। মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম রজিষ্ট্রিতে দেখা গেল, হাবুর পিতৃ পরিচয়—বরেন্দ্র নাথ মায়। ঠিকানা মিলে গেল। বাদী পক্ষের উকীল সগর্বে বলল—মামলা তো রুজু হয়েছে ঐ জন্ম তারিখের ছয় মাসের। ছনিয়ায় এত আত্মীয় ওমরাহ হোমরা চোমরা হতে কেবাগী বরেন্দ্রের উপর ভবিষ্যতে মিথ্যা মামলা

রুজু করার অস্ত্র কি শ্রীমতী দোপাটি রাণী, তার ছেলের পিতা ব’লে বরেন্দ্রের নাম রেজিষ্ট্রি করেছিল?

ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর হ’য়ে দাঁড়ালো। হাকিমের স্নেহের হাসিটুকুও শেলের মত আমাদের বুকে বিধলো। আমার ‘সিনিয়র’ অন্তরালে বরেন্দ্রকে ভিজাসা করলেন—ব্যাপার কি?

সে বলে—ভগবান জানেন, আমি ও জ্রীলোককে চিনি না। আমার খুঁড়ো-খুঁড়কে আমি রুট ভাষায় বাড়ী থেকে বার ক’রে দিয়েছিলাম। আমার জ্রীও আমাকে ছেড়ে পিতৃষ ঘরে যেতে চান নি, তাই সে মিথ্যা মামলা ক’রেছে।

ছ মাস বড়যন্ত্র করে?

সে বলে—আজ্ঞা হ্যাঁ। আমি তাকে অপমান ক’রে ছিলাম সাত মাস পূর্বে।

—বেশ কথা।

আবার আমার সিনিয়র তাল খুঁকে লেগে গেলেন। রমারম বুদ্ধ চললো। দোপাট্টার সখিদের জেরা হয়, তা’রা মুখ তেড়ে জবাব দেয়। কিন্তু লড়তেই হবে। সত্যের জয় নিশ্চয় হবে।

দোপাট্টার জেরার সময় এক প্রকাণ্ড কাণ্ড হ’ল। আদালত গৃহে হৈ হৈ ব্যাপার। উকীলের জেরায় দোপাটি কেঁদে বলে—চিনি না। এই দেখুন। এটাও কি জাল!

সে বুকের কাপড় খুলে। টেনে আঁকেটের বোতাম ছিড়িলে। সেমিজ সরালে। বুকের ওপর উদ্ভিতে লেখা—প্রাণের বরণ।

ধর্মপ্রাণ গ্রেট খুঁটান হাকিম, চাকো, চাকো, ব’লে চোখ বুজলেন। দোপাট্টার উকীল বলে—না হজুর দেখতে হবে। বিচার গৃহ তো মন্দির। সেখানে লজ্জা কি? নেহাত বিপদে না পড়লে জ্রীলোক বজ্র সরিয়ে বুকের লেখা দেখায় না।

তারপর আর কোনো কথা চলে না। বরেন্দ্রের পক্ষের মামলা হার হ’ল। তার বিরুদ্ধে ডিক্রী হ’ল—প্রতি মাসে শ্রীমান হাবুচন্দ্র রায়কে বরেন্দ্র রায় দশ টাকা ক’রে ধোরাকী দেবে। পুত্র তার।

হাইকোর্টে আপীল হ'ল।

কিন্তু হাবুচক্স পরলোকগমন করলে।

তার শোক-সন্তপ্তা জননী আমার সিনিয়রের কাছে এলে স্বীকার করলে, বরেন্দ্রের খুড়-খন্তরের সঙ্গে বড়বক্স ক'রে সে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। বরেন্দ্র তার অপরিচিত। ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

এ সব মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহ রুজু হয় না। কিন্তু যাহুজের শরভানী অপরের উপর উৎপীড়ন করবার অস্ত্র কতখানি মিথ্যাকে আশ্রয় করতে পারে, দোপাটি-বরেন্দ্রের মামলা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সত্য মিথ্যা জানি না। এক দিনের আদালতের মজার কথা বলি। তখন আমি অতি নবীন। ধরন্থীল সাহেব হাকিম।—বাবু বিভাবী। পুলিশ কোর্ট তখন লালবাজারে। দ্বি-ভাবী-বাবু এবং সে মামলার উকীল ক—বাবু উভয়েই পরলোকে।

সকাল বেলা নালিশের সময়। উকীলরা দরখাস্ত পেশ করে। ইন্টারপ্রোটার একে একে বাদীর নাম ডাকে। বাদী কাটগড়ায় উঠে। উকীল বুঝিয়ে দেয় কি মামলা। হাকিম হুকুম দেন, আসামী তলব হবে কি পুলিশ তদন্ত হবে ইত্যাদি।

দ্বি-ভাবী ডাকলেন—সাকিনা বিবি।

বোরকা-ঢাকা একজন কাঠ-গড়ার দাঁড়ালো।

উকীল ক—বাবু বললেন—হুকুম এর স্বামী খসকু খাঁ একে যেতে দেয় না। সে আহাজে কাজ করে।

হাকিম যখন হুকুম লিখছেন ইন্টারপ্রোটার—বাবু বললেন—ও ক—বাবু বোরকার ভেতর থেকে আপনার মক্কেলের যে দাড়ি উকী মারছে।

আমরা সব হেসে উঠলাম। ক বাবুর মক্কেল “সাকিনা বিবি” বেশ ভাল ক'রে অবগুষ্ঠন টেনে লজ্জাবতী লতার মত দাঁড়ালো।

তার স্বামীর উপর শমন জারী হ'ল।

কু লোকে বলেছিল—মামলাটা সত্য। তবে সাকিনা বিবি পরদানসীন গৃহস্থের মেয়ে, কাছারীতে আসতে গা হুঁ হুঁ করছিল। তাই তার ভাই হালিম বোরকা ঢাকা দিয়ে সাকিনা সঙ্গে মামলা রুজু করে গিয়েছিল।

পরে মামলা মিটে গিয়েছিল। সাকিনা—খসকু সুখে স্বচ্ছন্দে বরকরা করেছিল।

আত্মীয় বিরোধের ফলে খোর-পোষের অভ্য একটা অভিযোগের বিষয় স্বরণ হচে। চাকল্যকর সে-মামলা হ'য়েছিল লালবাজারে তদানীন্তন বিত্তীয় ম্যাজিস্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল সালিমের এজলাসে।

এক প্রসিদ্ধ মুসলমান বংশের ধনী যুবকের নামে এই মামলা হয়। বাদিনীর পক্ষ হ'তে তার তথাকথিত ভ্রাতা নালিশ করে যে তার ভগ্নীপতি রহিম (কল্পিত নাম) সাহেব তার ভগ্নীকে নিকা করেছে। কিন্তু তারপর তাকে ত্যাগ করেছে। খানা-খোরাকী দেয় না। বেচারী পরিত্যক্তা স্বামীবিরহে এবং অনশনে কষ্ট পাচ্ছে।

মামলা খাঁ বাহাদুরের এজলাসে বদলী হ'য়েছিল। তখনকার দিনের সকল হোমরা চোমরা উকীল ব্যারিষ্টার প্রতিবাদীর পক্ষে নিযুক্ত হ'ল। বাদিনী গরীব। তার পক্ষে ছিলাম আমি এবং এক প্রবীন উকীল। আমি বুঝেছিলাম যে অভিযোগ সত্য। ধনী যুবক রহিম মোহের বশে তরুণীর পাণি গ্রহণ করেছে। এখন চোখের নেশা কেটে গেছে। ছেঁড়া আমার মত পরিশীতা জীকে বর্জন করেছে। তার ভ্রাতার কথা বার্তা হ'তে ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভিন্ন মতান্তরের অবকাশ ছিল না।

প্রতিবাদী নালিশ অস্বীকার করেছিল। তার কোন শত্রু বড়বক্স ক'রে তার অপবন করবার অস্ত্র এই মামলা রুজু করেছে।

সাকী হ'ল। মোজা, উকীল বাপ প্রভৃতি বখাবথ বিবাহ প্রমাণ করলে। শেষে জীর সাকী দিবার পালা পড়লো।

বাদিনী আদালতে হাজির হ'ল, অর্থাৎ বড় বরের বেগম সাহেবার মর্যাদা অনুসারে কাছারী গৃহে এক পাকী প্রবেশ করলো। তার উপর আন্তরক ঢাকা।

তার ভ্রাতা পাকীর মধ্যে দেখে বেগমকে সনাক্ত করলে। পাকীর কাছে দ্বিভাবী চৌকী নিয়ে বসলেন। তখন হাকিম বললেন—“প্রতিবাদী পাকীর মধ্যে দেখুক কে আছে। একজন, কি দু'জন তার নিজের বেগম কি অঙ্গজন।”

সত্যই তো এ তথ্য আসামী ভিন্ন প্রতিপক্ষের কারও সংগ্রহ করবার অধিকার নাই। পাক্কীর ভিতর অসুখ্যাম্পত্তা কুল মহিলা।

অনেক আপত্তি হ'ল। বে-আইন, জার অজ্ঞায় সম্বন্ধে বক্তৃতা হ'ল। মাহুযের কৌতুহলও তো সহজাত। প্রতিবাদী মিঃ রহীম বাদিনীকে দেখতে সম্মত হ'ল।

সবাই স্থির। সত্য যদি জী হয়, পরম্পরের চারিচক্ষুর মিলনে প্রেমের দেবতার ফুলশর লক্ষ্য ভেদ করবে না কে বলতে পারে। একটা বড় ঘরের কলঙ্ক মুছে যাবে। হাকিমেরও ঐ রকম একটা উদ্দেশ্য ছিল।

বুঝলাম পাক্কীর মধ্যেও বাদিনী বোরকা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। ষার সামান্য উন্মুক্ত হ'ল। গোলাপী আতরের গন্ধে কাছারী কক্ষ ভরপুর হ'ল। ইন্টারপ্রেটার অ বাবুর একাধিকবারের অমুরোধে বাদিনী মুখের কাপড় তুললে।

—“ইঃ আল্লা! তোবা তোবা বলে প্রতিবাদী রহীম দৌড়ে পালিয়ে গেল।

—“কী ব্যাপার?”—হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন।

—“ভূতনী—ভূতনী”—ব'লে রহীম চিংকার করে উঠলো।

দ্বিতীয় বোঝালেন—পেক্সী বলছে প্রতিবাদী।

সভার গম্ভীর ভাব পরিবর্তিত হ'ল। শান্তি শৃঙ্খলা গোলায় গেল। হাসির রোলে আদালতের মর্যাদা অবলুপ্ত হ'ল। সার্জেন্ট—‘চোপ, আস্টে’ বলে মুহূর্ত চীংকার করতে লাগলো।

যখন বাদিনীর এজাহার হ'ল, আমি স্বয়ং লজ্জিত হ'লাম। পাক্কীর ষারোদ্বাটনের অবসরে আমি তার মুখ দেখেছিলাম। এক কুৎসিত বীভৎস চেহারা—কালো মোটা, মুখে বসন্তের দাগ। তার ভাষা, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর

প্রভৃতি হ'তে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, সে অতি নিরশ্রের গণিকা।

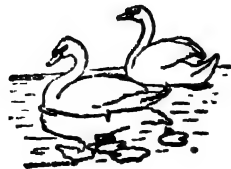
মামলা ডিসমিস হ'ল।

পরে উভয় পক্ষের তথ্যকারকদের মুখে শুনলাম—রহিমের তরীপতি এই মিথ্যা মামলা রুজু করিয়েছিল। প্রথমে তারা এক সুল্লরী সংগ্রহ করেছিল। চেহারা ভাল, জবান সিরিন্ দোরস্ত। কিন্তু রহীমের তথ্যকারকেরা তাকে ভয় দেখিয়ে, কিংবা অর্থব্যয়ে নিরস্ত করেছিল। তারপর তারা অন্য এক রমণীকে সম্মত করেছিল। তারও দশা পূর্বের মত হ'য়েছিল। শেষে গোপনে হাওড়া থেকে তারা এই প্রেত রমণীকে শিকিয়ে পড়িয়ে এনেছিল।

মাহুযের হিংসারূত্তির সীমা নাই। সমাজ তাকে সংযত করে। কিন্তু চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে সফল হয় না। আমি যে কার্য্য করি, তাতে মাহুযের মনের এই কুৎসিত বিকাশটা পর্য্যবেক্ষণ করবার অবসর প্রত্যাশাই পাই।

বন্ধু বান্ধব অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেন—নিজের মনের উপর এর কি ফল হয়?

মানব প্রকৃতিকে সত্য ব'লে মানি তাই এসব দেখেও মাহুযের প্রতি শ্রদ্ধা হারাই না। মাহুয বিরোধ-ধর্ম্মী, পশু ও দেবত্বের সংমিশ্রণ। এইটাই মাহুয-জগতের ধারা। সে জ্ঞানের খেত আলোকের আবাধন করে, আবার জ্ঞানের রশ্মিকে চোখ বুজে প্রবেশ-অধিকার দেয় না। পৃথিবীর এই ধারার নামই মায়ী। স্মৃতির সর্বাব উপরে মাহুয সত্য—এ সত্যের প্রতি আস্থা হারাবার কোনো কারণ নাই। আপনাকে শুদ্ধ করা মাহুযের ধর্ম্ম। তাকে ঘৃণা করা পশু-প্রবৃত্তি। পাপী ঘৃণ্য নয়, কারণ সে আমারই মত দোষ গুণে মেশানো মাহুয।



মানুষ ও পশু

[গল্প]

ত্রিকুমুদিনীকান্ত কর

আকুল আর্জুনাদ ! বিরাম নাই ! বাতাস চঞ্চল করিয়া তুলিল। গাছের পাতা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ যেন কাটিয়া পড়িতেছিল।

—সহরের পূর্বপ্রান্তে তত্র পল্লী। পাছাড়-কাটা আঁকা-বাঁকা উচু নীচু লাল পাথরের সুন্দর পথটি পল্লীর বুক চিড়িয়া পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে ফুল-ফল গাছে ঘেরা একই নমুনার ছোট ছোট বাড়িগুলি ঠিক ক্লেয়ারই মতন দেখিতে সুন্দর। দুপুরের খরতর রোজ। নিম্ন পল্লীটি যেন ক্রান্ত দেহে সুস্থ। ঘন পল্লবের ছায়ায় বসিয়া মুখর পাখী নীরব। নতশির ফুলের গুচ্ছ অচঞ্চল। পথ পরিত্যক্ত। এই নির্জন পথে মশ্মভেদী আর্জুনাদ করিতে করিতে উদ্ধ্বাসে ছুটিতেছিল একটা বুভুক্ষিত শীর্ণ কুংসিং রাস্তার কুকুর। সে ছুটিতেছিল আর প্রতিটি গৃহের দরজার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে খুঁজিতেছিল তার প্রাণ রক্ষার জন্ত একটু নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু সমস্ত গৃহদ্বারই ছিল বন্ধ। এমন সময় রাস্তাটির প্রায় পশ্চিম সীমায় একটা গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। একটা পাঁচ বছরের বালক ছুটিয়া বাগানের দরজা খুলিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। কুকুরটা প্রায় সেই সময়েই তাহার উপর আসিয়া বাপাইয়া পড়িল। বালক উহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। হাসিতে হাসিতে গা বাড়া দিয়া উঠিয়া কুকুরটাকে কিল দেখাইয়া বলিল, ‘এই ভারি হুঁতু তুই, আমায় যে ওভাবে ফেলে দিলি, অ্যা ?—হা-হা-হা—আচ্ছা আবার ফেল ত দেখি—’

কুকুরটা রাস্তার দিকে সভয়ে তাকাইয়া তিন বার যেউ—যেউ—যেউ করিয়া উঠিল। তার পর ঘাড় নাড়িয়া তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খোকা তাহার কাণ দুটা ধরিয়া হাসিয়া বলিল, ‘এই, ভয় পেয়েছিস বুঝি, ভারি বোকা ত তুই ? আচ্ছা দাঁড়া তবে আমি তোকে ফেলে দিচ্ছি—’

কুকুরের লেজটা ধরিবার জ্ঞান সে হাত বাড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরটা পুনরায় আর্জুনাদ করিয়া উঠিল।

হটফট করিতে করিতে বালকের দুই পায়ের কাঁকের মধ্যে কোন রকমে ঢুকিয়া উ-উ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালক পিছন ফিরিয়াই দেখিল মাথায় লাল পাগড়ি, গায় কালো জামা মিশমিশে কালো একটা লোক প্রকাণ্ড তেল-কুচকুচে একটা বাঁশের লাঠি উঠাইয়াছে কুকুরটাকে মারিবার জ্ঞান। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কুকুরটাকে দুই হাতে বকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, ‘মারিস্ নি, মারিস্ নি ওকে, যা তুই এখান থেকে, নইলে ব’লে দোব মা’কে, ভারি হুঁতু তুই, যা—’

লোকটা বলিল, ‘ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওটাকে খোকাবাবু, ওটাকে আমি মেরে ফেলব।’

‘কেন মেরে ফেলবি তুই ওকে ? ও তোমার কি করেছে ? কষ্ট হবে না তোমার ? ওকে মারলে আমি কাঁদবো দেখিস্। যা, তুই চলে যা এখান থেকে।’

খোকা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কুকুরটাকে বকে আরো চাপিয়া ধরিল।

কুকুরটা খোকায় ক্ষুদ্র বুকটুকুকে সারা সংসারের মধ্যে তাহার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়া উহার সঙ্গে লাগিয়া রহিল এবং থাকিয়া থাকিয়া লোকটির মুখের দিকে কাতর নয়ন তুলিয়া যেন জীবন ভিক্ষা মাগিতে লাগিল।

খোকায় চোখের জল এবং কুকুরের কাতর নয়ন লোকটার অন্তরে কি জানি কি করিল ! কেমন যেন একটা ব্যথায় তাহার সারা অন্তর টন্ টন্ করিয়া উঠিল ! কিসের এ অহুভব ! এরকম ত তাহার কোন দিন হয় নাই ! ব্যথাটা চাপা দিবার জ্ঞান তাহার একটা হাত যেন আপনা হইতেই বকের উপর আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। কি যেন সে বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। কি যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে বলিল, ‘খোকাবাবু, আমি যে ডোম, এগুলোকে মারাই যে আমার কাজ।’

কথাগুলি নরম। গলায় সে জোর যেন আর নাই। তাহার নিজের কথায় নিজেরই সে চমকিয়া উঠিল।

খোকা বলিল, ‘না, তুই মারতে পারবি না আর ওদের। মারতে তোর স্ত্রী হয় না?’

খোকার যেন কত অধিকার তাহার উপর, যেন কত কালের কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা তাহার সঙ্গে! কি মিষ্টি কথা খোকার!

ডোম তাকাইল খোকা আর কুকুরটার পানে। তাহাদের চারিটি কাতর নয়ন এক যোগে যেন তাহাকে তীব্র ঝিকার দিয়া উঠিল। তাহার মাথায় যেন হঠাৎ কে বড় জোরে আঘাত করিল! তাহার নিত্যকার অতি সাধারণ শিকার সামান্য একটা কুকুরকেও ত সে এত জোরে কখনো আঘাত করে না! মাথাটা তাহার যিম্ যিম্ করিয়া উঠিল।...একি! তাহার খাসটা যেন হঠাৎ একটু ধামিয়া গেল না! একি! তাহার ভিতরটা কেমন যেন একটু মোচর দিয়া উঠিল না! একি! বাঁধা পাইয়া পাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটিয়া আসিতেছে না?...‘নাঃ—’ সে-সব যেন সে গায়ের জোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, ‘না, দেখি দেখি, তুমি সরে যাও খোকাবাবু।’ সে খোকাকে এক হাতে ধরিতে গেল। খোকা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ডোম একটু দূরে সরিয়া আসিয়া ক্রীণকণ্ঠে বলিল, ‘তা হ’লে যে আমার ভাত জুটবে না খোকাবাবু।’

খোকা অশ্রুমাখা মুখখানা তুলিয়া বলিল, ‘আমার ভাত তোকে দোব খেতে মা-কে ব’লে। মারবি না ত তবে ওকে?’

ডোম লাঠি হাতে শুভিত হইয়া স্থাগুর জায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকটা আর লাঠি সমেত হাতটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

খোকার চৌৎকারে অনেকগুলি ঘরের দরজাই পট পট খুলিয়া গিয়াছিল। লোকেরা দরজায় দাঁড়াইয়াই ব্যাপারটা একবার দেখিয়া লইল। তারপর মায়েরা ছেলে-মেয়ে সমেত একে একে আসিয়া সেখানে জড় হইল। খোকার মা, বোন, ভাইও আসিল। তাহারা অবাক হইয়া খোকার কাণ্ড দেখিতেছিল। সকলের লাল চোখ ঐ ডোমের উপর। কি আশ্চর্য্য ওর! সকলের চোখেরই যেন এই নীরব ভাষা। এক বৃদ্ধা কিন্তু হঠাৎ

সহানুভূতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, ‘আহা-হা, ওকে তোমরা কিছু ব’ল না গো ব’ল না! আর জন্মের না জানি কত মহাপাপের ফলে ওর এই জন্ম! আহা হা বেচারী!’

ডোম অদূরে একইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চোখে তাহার পলক নাই। দৃষ্টি তাহার স্থির হইয়া ছিল খোকা আর কুকুরের উপর।

খোকা কুকুরটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, ‘ও আর তোকে মারবে না জানিস? আমি ওকে খেতে দোব।’ কুকুরটা ডোমের দিকে চাহিয়া চোখ পাকাইয়া আক্রোশ প্রকাশ করিয়া ডাকিল, ‘ঘেউ—ঘেউ।’

খোকা এবার তাহাকে একটু দূরে ঠেলিয়া নিয়া বলিল, ‘এই ফেল ত আবার আমার চিং ক’রে?’

কুকুরটা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া ঘাড়টা একবার কাত করিল, বার কয়েক কাণ দুইটা নাড়িল, তারপর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে পায় মাথা ঘসিতে লাগিল, তারপর মাথা তুলিয়া ডাকিল, ‘ঘেউ—উ—উ’। দীর্ঘ স্বর, বড় করুণ! আবার পায় মাথা রাখিল, আবার সেই করুণ ডাক ডাকিল। কৃতজ্ঞতা! চোখে যেন একটু জল! সত্যিই ত! খোকার কাছে কিন্তু ফাঁকি চলে না। বন্ধুর চোখের জল সে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, ‘এই, তুই কাদছিস, অ্যা? দ্যাখ্ ত আমি কাদিনি। কাদলে মার চ’খে জল আসে, জানিস?’

কুকুর ‘ঘেউ’ শব্দ করিয়া তাহার চতুর্দিকে দুই চারি বার ছুটাছুটি করিল, সাথে আসিয়া তাহার হাত চাটিয়া দিল একবার, ঘাড় দোলাইয়া লেজ নাড়িয়া সাব্বের একটা পা উঠাইয়া একটু ঝাঁক করিয়া বাড়াইয়া দিল বন্ধুর দিকে। হি—হি—হি—হি—খোকা ঝিল্ ঝিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহার পা-টা ধরিয়া বলিল, ‘খেলবি? আয়।’

‘গো-ও-ও-ও’ শব্দ করিয়া কুকুরটা বন্ধুর পা চাটিয়া দিল। আফ্লাদ! আফ্লাদ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সে এবার তার ক্ষুদ্র বন্ধুটির একটা হাতে আঙুলে কামড় দিল, এত আঙুলে যে তাহার কচি হাতেও একটাও দাঁতের দাগ পড়িল না। শব্দ করিল, গো-ও-ও

খোকা আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিল, “লাগেনি—লাগেনি রে—এই আরো জোরে দে—”

এই সময় হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল। ‘বেল—বেল—খোকাকে বেল—’ বলিয়া খোকার মা পাগলের মতন ছুটিয়া আসিল। তাহার চীৎকার শুনিবামাত্র কুকুরটা বজুর হাত মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মা এক লাথি মারিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুত গতিতে ঘরের দিকে চলিয়া গেল। খোকা চীৎকার করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল, “ওকে তুমি মারলে কেন? ওষে কিছু খায়নি এখনও, ওই যে—ওই—যার হাতে লাঠি, ওকে আমার ভাত দেবে খেতে...ছেড়ে দাও, যাব না আমি।”...

উত্তর স্বরূপ মা খুব কম করিয়া তিন চারিটি কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খোকার বুক-ফাটা কান্না কিন্তু তবুও বেশ শোনা যাইতেছিল। খোকার বন্ধ লাথির চোটে যেখানে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, তখনো সেখানেই মরার মতন দাড়াইয়াছিল। উঁ-উঁ-উঁ—খোকাদের ঘরের দিকে চাহিয়া সে থাকিয়া থাকিয়া কাদিয়া উঠিল। সামনের একটা পা উঠাইয়া দু’ একবার একটু ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া যেন বন্ধকে ডাকিল। একটা প্রতিবেশিনী তিন সন্তানের মা, তাড়াতাড়ি তাহার ঘর হইতে কিছু মাছ মাথা ভাত আনিয়া তাহার মুখের নীচে রাখিয়া বলিল ‘খা-।’

কুকুরটা ভাতের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া দাতার মুখের দিকে করুণ নয়নে চাহিল। তারপর খোকাদের ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, বেউ-উ-উ-উ-। খেদোক্তি! মুকের অন্তর যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। সে ভাত ছুইলও না।

সকলে চলিয়া গেল। কিন্তু বুক বিষন্ন হৃদয় লইয়া বসিয়া রহিল তাহার সরল বজুর আগমন প্রত্যাশায়।

আরো একজন গেল না। সে ডোম। সে একটু উপর হইয়া লাঠির উপর দুইটা হাতে তার বামগণ্ড রাখিয়া তখনো একই ভাবে তাহার বধ্য জীবটা এবং

খোকাদের ঘরের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে একবারও ত কেহ ফিরিয়া চাহিল না! সে মৃত্যু! ওই পঙটিও মৃত্যু! কিন্তু সে অমৃত্যু! সে হত্যাকারী! মানুষ হ’লেও বৃত্তি তাহার পশুর। আর ওই পশুর যেন মানুষের আত্মা। সে ওই পশুরও নীচে—নীচে—নীচে! তবে—তবে? কি হইবে—কি হইবে তাহার? এই প্রশ্ন—এই কঠিন প্রশ্ন জাগিল তাহার অন্তরে। অন্তর জিজ্ঞাসা করিল এই প্রশ্ন অন্তরাত্মাকে; ক্লিষ্ট অন্তর খুঁজিল আশ্রয় একমাত্র আশ্রয়দাতার কাছে। হা ভগবান!—একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক কাঁপাইয়া ঘরের জায় হ হ করিয়া বহিয়া গেল। সে হু হু করিয়া চলিয়া গেল বাতাসের আগে পূব দিকে।

* * * *

“ভগবান! কেন হয়েছিল আমার এ জনম!” গভীর রাত্রির অন্ধকারে গাছের নীচে একাকী বসিয়া এক দুঃখী যন্ত্রণায় কাতর হইয়া দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে এই অনুযোগ জানাইল তাহার ভগবানকে। কাতর নয়ন তাহার চাহিয়া রহিল উর্দ্ধপানে। গভীর নিস্তরতা ঘিরিয়া রহিল তাহাকে। হঠাৎ ঠন্ করিয়া সে নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া খুব জোরে একটা মোটা বাঁশের লাঠি আসিয়া পড়িল লাল পাথরের পথের বুকে। তারপর একটা পাগড়ী, তারপর একটা জামা, তারপর একখণ্ড ছিন্ন মলিন পরিধেয় বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া রহিল সেগুলি পথের মাঝে। লালপাগড়ীটা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিল একটা মস্ত বড় নিস্তেজ অজগরের মতন। লেংটিসার লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। “মালেক! কোথা তুমি? পথ দেখাও।” তাহার অন্তরের আকুল আত্মনা! দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া সে তাকাইয়া রহিল উর্দ্ধমুখে তারা-ভরা ওই আকাশের দিকে। টস্ টস্ টস্—অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল তাহার বুকের উপর। পথের সন্ধান বুঝি তাহার মিলিল।

হঠাৎ সে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিল পশ্চিম দিকে পাগলের মতন। একটা ভীত আকুলতা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল।

খোকাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহার অতি দ্রুতগতি হঠাৎ থামিয়া গেল। সে বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া রাস্তার

উপর ধীরে ধীরে বসিয়া কুকুরটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কুকুর তাহার একটু সায়ে খোঁকাদের কুলবাগানটুকুর দরজার মুখে বসিয়া তখনো সেই একই ভাবে বাড়ীটার দিকে তাকাইয়াছিল। হঠাৎ সে পিছনে পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ঘাড় ফিরাইয়া লোকটাকে দেখিয়াই প্রাণ ভয়ে চীৎকার করিতে যাইতেছিল। কিন্তু লোকটার মুখের দিকে নজর পড়িতেই তাহার ভাব যেন হঠাৎ বদলাইয়া গেল। লোকটার অবিরাম অশ্রুধারা তাহাকে যেন টানিতে লাগিল। উঁ-উঁ-উঁ—সমবেদনা! শব্দটা অক্ষুট। সে যেন ছটফট করিতে করিতে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। না, তাহার ভিতরের অস্থিরতা যেন তাহাকে আর বসিতে দিল না। সে উঠিয়া নবাগতের দিকে মুখ করিয়া নীরবে কণ্ঠে দাঁড়াইল। পরে এক পা এক পা করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল। সম্মুখে আসিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উঁ উঁ উঁ—এবারও সেই অক্ষুট শব্দে গভীর সহানুভূতি! নবাগত তখনও নীরব। কুকুরের দিকে তাহার সেই করুণ অপলক দৃষ্টি! নীরব অশ্রুতে তাহার কত কথা—কত প্রশ্ন, কত উত্তর, কত ব্যথা, কত নিবেদন! মন তাহার কাঁদিয়া আকুল হইয়া লুটাইতেছিল ওই মুক পশুর পায়! তাহার নীরবতা যেন হাহাকার তুলিয়া মাগিতেছিল কমা—কমা—কমা।

কুকুর লেজ নাড়িয়া ডোমের হাত পা শুকিয়া মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল, ঘেউ -। পশু এবার কমা করিল মাহুৎকে।

তারপর দুই বন্ধু পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল সেই পথের দিকে চাহিয়া যে পথে কাল তাহাদের ক্ষুদ্র সরল গন্ধুটি তাহাদের ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

শোর। খোঁকাদের ছোট জাম গাছটার সব চেয়ে নীচু ডালে বসিয়া একটা দোয়েল ভোরের হাওয়ায় আনন্দে মাতিয়া বড় মিঠা শূরে শিস্ দিয়া গান ধরিয়াছিল। কিন্তু সেই সবটুকু মিটি নষ্ট করিয়া খোঁকাদের চালায় উড়িয়া আসিয়া বসিয়া একটা কাক অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। ঘরের সায়ের একটা জানালা আন্তে আন্তে খুলিয়া গেল। একখানি ক্ষুদ্র মুখ তাহার

ভিতর দিয়া উঁকি দিল। বাহিরের অপেক্ষমান জীব দু'টা আনন্দে ছলিয়া উঠিল। মাহুৎটির মুখে আনন্দের নীরব হালি, পশুটির মুখে আনন্দের ডাক—ঘেউ-উ-উ। হি-হি-হি-হি—খোঁকাও বন্ধুদের দেখিয়া আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, “এই দাঁড়া তোরা, যাচ্ছি আমি।” তাহার পিছনে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল একটা পুরুষ, তাহার পিছনে একটা নারী—খোঁকার মা ও বাবা। বাবা বাহিরের দিকে তাকাইয়াই সবিস্ময়ে বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! জাখ—জাখ এসে।” মা ভেমনি বিস্ময়ে বলিলেন, “তাই-ত’, এ যে অদ্ভুত!” তাহারা অবাক হইয়া ডোম এবং কুকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাবা দরজাটা খুলিয়া দিলেন। জাখটা খোঁকা ছুটিয়া গেল বন্ধুদের কাছে। ঘেউ-ঘেউ—করিয়া কুকুরটা পিছনের দুই পায় ভর করিয়া দাঁড়াইল একবার, তারপর খোঁকার গা-টা বারবার শুঁকিল; তারপর তাহার পায় লুটাইয়া পড়িয়া মাথাটা ঘসিতে লাগিল। খোঁকা ভেমি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, “এই, ফেলে দে ত’ আমার আবার কালকের মতন চিত্‌ক’রে।” শুধু একবার ঘেউ করিয়া কুকুর যেন তাহার অপারগত জানাইল।

স্বামী এবং স্ত্রী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী স্ত্রীকে প্রতিবেদীদেব দেওয়া অভুক্ত ভাতগুলি ইঙ্গিতে দেখাইলেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছিলেন কিছু খাবার আনিতে। কিন্তু স্বামী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, “উঁহ—খোঁকার হাতে দিয়ে নিয়ে এস, তা’ না হ’লে কুকুর ছোবেও না।” তাহাই হইল। খোঁকা নিজ হাতে খাইবার পাত্রটা কুকুরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। আজ ক’দিনের অভুক্ত কুকুর ভাতগুলি একবার শুকিয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে কতবার সে মুখ তুলিয়া খোঁকার দিকে চাহিয়া ঘেউ ঘেউ করিল। তাহার কৃতজ্ঞতার যেন আর শেষ নাই।

ডোমের মুখ হাসিতে ভরা। চোখ দুটা আনন্দে উজ্জল, কিন্তু একটু আকুল। চোখের কোণে দুই বিন্দু

অল টলটলায়মান। তাহার দুটি হাত খোকার দিকে এক সময় ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহার দৃঢ় পেশীবহুল বাহুয় খোকাকে আকুল আহ্বান জানাইতেছিল। ভীত আকুলতায় তাহার বাহুয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কেহ তাহা লক্ষ্যও করিল না। সে একই ভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল। হঠাৎ উহা খোকার নজরে পড়িল। হি-হি-হি-হি-হাসিতে হাসিতে চারিদিকে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া খোকা তাহার দিকে পা বাড়াইল। বাপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মায়ের বুক কিন্তু ছর-ছর করিয়া কাঁপিতেছিল। ও ডোম, ওর কাছে যাবে, ও ধরবে, ওর চাউনিটা যেন কি রকম, খোকার যদি কিছু হয় শেষে—মমতাময়ী মায়ের প্রাণের অহেতুক ভয়। চিন্তাকুল মা পা বাড়াইলেন তাহাকে ধরিতে। বাপ তাঁহাকে চোখের ইসারায় বারণ করিলেন।

ডোম খোকাকে সন্তর্পণে বৃকে রাখিয়া চোখ বুজিল। কিছুক্ষণ পর একটা মাত্র শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—আঃ! অস্ফুট শব্দ। আনন্দের স্রোতে নিমজ্জিত কণ্ঠস্বর! তাহার সে নিঃশ্বাসে ছিল পূর্ণ শান্তি!

খোকার শির চূষন করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে বক্ষ্যুত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ! আনন্দ যেন তাহার সর্বত্র দিয়া চুয়াইয়া পড়িতেছিল। অশ্রু! দরবিগলিত অশ্রু! বিদায়—বিদায়! সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চতুর্দিকে চাহিল। শেষ বার খোকা এবং কুকুরের দিকে চাহিয়া চিরপরিচিত লাল পাথরের পথের উপর দিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। আর সে ফিরিয়া চাহিল না। তাহার কণ্ঠ খেন চীৎকার করিতে থাকিল—কমা কমা—কমা! অন্তরে সে শুনিল বিবাদের ধ্বনিতে ইহার প্রতিধ্বনি—কমা—কমা—কমা।

খোকা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, ‘আয়, আয়—’ তবুও সে আসে না দেখিয়া রাগ করিয়া বলিল, ‘বারে,—আসছে না তবু—বাবাকে তবে ব’লে দোব, তাকে মারবে—’ কিন্তু তবুও সে ফিরিল না। খোকা রাগ করিয়া রাস্তার মাঝখানে পা ছুড়িতে ছুড়িতে কান্নার সুর ধরিল।

কুকুরটাও খোকার সঙ্গে গিয়াছিল। ডোম খোকাকে ফেলিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন সে ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল, ‘ঘেউ—ঘেউ—’ সাদর আহ্বান—আয়, আয়। তবুও ডোম চলিতে লাগিল। কুকুর এবার তাহার একমাত্র সঞ্চল নেংটির একটা কোণ দাঁতে কামড়াইয়া টানিয়া ধরিল। এবার ডোম থমকিয়া দাঁড়াইল। ‘ঘেউ—ঘেউ—’, কুকুর তাহার মুখের দিকে চাহিয় পুনরায় ডাকিল, ‘ঘেউ—ঘেউ—আয়, আয়—ওরে ফিরে আয়—’ স্নেহের অধিকারে সে যেন জানাইল তাহার প্রাণের আবেদন। ডোম নীরবে পরম স্নেহে তাহার মাথায় দুই হাত বুলাইয়া দিয়া গ্রীবা দোলাইয়া যেন জানাইল,—‘না, না, না তাই আর ফিরব না, আমার আর ডেক না—’ বন্ধকে ছাড়িয়া ডোম আরো দ্রুতগতি গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কুকুর হতাশভাবে সেখানে বসিয়া পড়িয়া সেই পথের দিকে চাহিয়া যেন বড় আকুল হইয়া কাঁদিল—উ—উ—উ!

খোকার বাবা আসিয়া খোকাকে বৃকে তুলিয়া লইলেন। খোকা কাঁদিয়া বলিল, ‘ও চ’লে গেল কেন? ও আমার ভাত খাবে না?’ বাবা বলিলেন, ‘না, সে আর আসবে না খোকা—’

তার পর ডোমকে আর সে অঞ্চলে কেহ দেখে নাই। কুকুরটা বারবার উপেক্ষিত হইয়াও জীবনদাতা খোকার সঙ্গ জীবনেও ছাড়ে নাই।



প্লেটোর সাহিত্যবিচার

শ্রীশ্রীবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

এক

সাহিত্যের স্বরূপ লইয়া বাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্লেটোর বৈশিষ্ট্য নানাদিক্ দিয়া বিচার্য। প্রথমতঃ কবিদের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আর কোন শ্রেষ্ঠ লেখক করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজের পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে বহিস্কৃত করিবার জন্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন। যদি কোন কবির কোন কাব্য রাষ্ট্রে স্থান পায়, তাহা হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিচার করিয়া দেখিবেন যে, ইহাতে দেবতা ও মহামানবদের জয়গান করা হইয়াছে কি না। প্লেটো কবিদের প্রতি এইরূপ প্রতিকূলতার পরিচয় দিলেও কবি ও সমালোচক সম্প্রদায় তাঁহাকে কাব্য ও সমালোচনা-জগতে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছেন। কবিগণ প্লেটোকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সকল রচনা নাট্যকাব্যে লিখিত এবং তন্মধ্যে নাট্যকোচিত গুণ বর্তমান। তিনি গল্প ও কিংবদন্তীর সাহায্যে নিজের মতবাদ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন এবং সেই সকল গল্প ও কাহিনী উচ্চ শ্রেণীর কবিকল্পনার পরিচয় দেয়। তাঁহার ভাষা যুক্তিতর্কের ভাষা হইলেও তাহার মধ্যে কবি-প্রতিভাতোতক উজ্জলতা ও সজীবতার ছাপ মুদ্রিত হইয়া আছে। তিনি কবি ও কাব্যের সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও সেই পক্ষপাতদুষ্ট মতবাদের মধ্যে কাব্যের স্বরূপের সন্ধান করা যাইতে পারে—ইহা সবাই স্বীকার করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতের যথোচিত আলোচনা করা দরকার।

প্লেটোর মতের আলোচনায় একটি প্রধান অসুবিধা আছে। জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো

। কিন্তু অজ্ঞাত দার্শনিকেরা যেমন একটি সুনির্দিষ্ট সুসংকল্পিত প্রকাশ করেন এবং শুধু সেই মতবাদের প্রামাণ্য দেখাইবার জন্তই অপরপক্ষের মত খণ্ডন করেন এবং স্বীয় চিন্তাধারার মধ্যে স্ববিরোধিতা পরিহার করেন, প্লেটো তাহা করেন নাই। তিনি প্রমোত্তরের মধ্য দিয়া

সত্যের স্বরূপ অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি নাই, প্রত্যেক প্রশ্নকে তিনি নানাভাবে বিচার করিয়া আলোচনা করিয়া সত্যের সন্ধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এখন বাহাকে গ্রহণ করিতেছেন পরমুহূর্তে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। কোন একটি জায়গায় যে মত প্রচার করিয়াছেন, অপর কোন প্রসঙ্গে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার সুবিধাত আইডিয়াবাদ বা ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচনা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন। এই জন্ত অজ্ঞাত দার্শনিকদের মতবাদ যেমন ভাবে আলোচনা করা যায়, প্লেটোর মতবাদের আলোচনা ঠিক তেমনভাবে করা সম্ভব কি না সন্দেহ। যেখানে মনে করিতেছি যে, একটি স্থির সিদ্ধান্তে পঁহুঁছিয়াছি, ঠিক সেইখানে হয়ত পূর্বপক্ষের মতবাদ বিবৃত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু প্লেটো যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার খানিকটা সুবিধাও আছে। তিনি প্রত্যেক প্রশ্নকেই নানাভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহার সকল আলোচনার মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি কোন পূর্বপরিকল্পিত মতবাদ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নাই এবং যেহেতু বিরুদ্ধ মতের কথা তিনি নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, তাই যে সকল সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন—তাহা অনিবার্য বলিয়া মনে হয়। অবাস্তব যুক্তি ও আলোচনা বাদ দিলে যে কয়েকটি প্রধান চিন্তাধারা পাওয়া যায়, সত্যানুসন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দুই

প্লেটোর দর্শনের গোড়ার কথা হইতেছে সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা। প্রত্যেক জগতে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হইতেছে; মনে হইতেছে, কিছুই স্থির হইয়া থাকিতেছে না। তাই প্লেটোর পূর্ববর্তী কোন কোন দার্শনিক প্রচার করিয়াছিলেন যে, বিশ্ববাপী গতিই একমাত্র সত্য। প্লেটো এই মতবাদকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তিনি চক্লের অন্তরালে স্থিরকে খুঁজিয়াছেন, বহুর অন্তরালে এককে বাহির করিতে চাহিয়াছেন; তিনি চরাচরব্যাপী পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু পরিবর্তমান পদার্থপুঞ্জের পশ্চাতে আবিষ্কার করিয়াছেন ভাবস্বরূপ অপরিবর্তনকে। ইহা তাহার ভাবতত্ত্ব বা Theory of Ideas নামে বিখ্যাত। ইহার স্বরূপের একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। মিস্ত্রী অনেকগুলি খাট তৈরী করে। প্রত্যেক মিস্ত্রীই প্রতিদিন বিচিত্র রকমের খাট তৈরী করিতেছে। কিন্তু প্রত্যেকগুলিই খাট, কারণ প্রত্যেকগুলিই একটি বিশিষ্ট আইডিয়া বা পরিকল্পনা অনুসারে নিশ্চিত হইতেছে। কোন একটি বিশিষ্ট খাট ক্ষণস্থায়ী; তাহার মধ্যে একটি শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা নির্মাণ কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু যে ভাব অনুসারে এই খাট বা অস্ত্রাস্ত্র সকল খাট নিশ্চিত হইয়াছে—তাহা চিরন্তন, তাহা অপরিবর্তনীয়। শুধু বস্তুজগতে কেন, মনোজগতেও ভাবের পারমাণ্বিকতার প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা কোন দুইটি জিনিষ মিলাইয়া দেখি—ইহার সমান কি না; কখনও দেখি ঠিক সমান, কখনও অস্বাভাবিক বৈষম্যও থাকে। কোন বিশিষ্ট সময়ে, কোন দুইটি বস্তুর সমতা যে আমরা বিচার করিতে পারি, তাহার কারণ সমতা সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা বা আইডিয়া আছে। সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, জ্ঞানবিচার—এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ বা গুণের অন্তরালেই একটি করিয়া মৌলিক আইডিয়া আছে, যাহা ব্যক্তির বা সমাজের জীবনে প্রতিমুহূর্তে প্রযুক্ত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই আইডিয়া-বাদ বা ভাবতত্ত্বের মধ্যে নূতন বা মৌলিক চিন্তার এমন কি পরিচয় আছে? সমাজাত্মীয় অনেকগুলি খণ্ড বস্তুর অন্তরালে অবশ্যই একটি সর্ব্বব্যাপী বস্তুপ্রযোজ্য সাধারণ ভাব বা General আইডিয়া থাকিবে। তাহা না হইলে তাহাদের সকলের একটি নাম থাকিতে পারে না। প্লেটোর মতের স্বকীয়তা এই—খানেক যে, তিনি এমন কথা মনে করেন না যে, খণ্ড বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলি একত্র করিয়া আমরা সাধারণ ভাবগুলি আহরণ করি। বরং সাধারণ ভাবগুলি আছে বলিয়াই আমরা কোন একটি ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারি;

সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভাবগুলি অনাদি ও চিরন্তন এবং তাহারাই খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, তৎকালিক তৎস্থানিক ব্যাপারের প্রয়োজক। সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে একটা স্বতঃপ্রামাণ্য ভাব আছে বলিয়াই তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আমরা গোলাপ ফুলের বা রমণীর চারুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। এই সমস্ত পারমাণ্বিক ভাবের আদি বা অন্ত নাই। আমাদের জন্মবার পূর্বেও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল এবং প্রাক-সত্তাবিশিষ্ট ভাব লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমরা মন দিয়া ইহাদিগকে উপলব্ধি করিলেও ইহাদের সত্তা আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না। ইহারা বাস্তব। আমরা যাহাকে বস্তুজগৎ বলি—তাহার মধ্যে পারমাণ্বিক বাস্তবতা নাই; তাহা আংশিকভাবে বাস্তব। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ভাবের মধ্যে পারমাণ্বিক অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেক বস্তুপুঞ্জ বা মানবের খণ্ডিত চিন্তা ভাবনা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেমন করিয়া তাহারা এই ভাবে পারমাণ্বিক ভাবনিচয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা প্লেটো যুক্তিতর্ক দিয়া স্পষ্ট করিতে পারেন নাই; এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যে সকল ভাব অনাদি ও অবিনশ্বর, যাহারা মানবের জন্মের পূর্বেও বর্তমান ছিল, যাহাদের সম্পর্কে অস্বাভাবিক সংস্কার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহারাই স্থির ও অপরিবর্তনীয়; তাহারাই প্রকৃত পক্ষে বাস্তব। মানবের কল্পনা, ভাবনা, অনুভূতি—ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে ঐ সকল পারমাণ্বিক ভাবনিচয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া, ইহাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া।

প্লেটোর বিচার অনুসারে দুই স্তরের বাস্তবের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রথমতঃ পরিচয় পাই অখণ্ড, অপরিবর্তনীয় ভাবসমূহের। দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু হইতেছে মানবের ক্ষণিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মানসিক অনুভূতি—যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে জাগতিকতা সাংসারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে। পারমাণ্বিক ভাবনিচয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্লেটো কল্পনা করিয়াছেন যে, স্বর্গে অবস্থানকালে ইহাদের প্রত্যেকের স্পষ্ট রূপ ছিল; কিন্তু মর্ত্যে শুধু সৌন্দর্য্যের

অধিষ্ঠাতা ভাবই ইঞ্জিয়গ্রাহ্য হইয়াছে। চক্ষু অস্ত্র সকল ইঞ্জিয় অপেক্ষা তীক্ষ্ণ; তাহার কাছে সুন্দর অনেকাংশে ধরা দিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র কোন ভাবই ইঞ্জিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। মানুষের মনের যে সুখ-দুঃখ অনুভব করার সামর্থ্য আছে, তাহার কোন পারমাণ্বিক অস্তিত্ব নাই। সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিশেষ সময়ে সজ্ঞাত হয় বা বিলয়প্রাপ্ত হয়। যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ আছে, তাহার কোন মৌলিক সত্তা নাই। বাস্তব সত্তা আছে শুধু আদিহীন, অন্তহীন, পরিবর্তনহীন সার বস্তুর। সুখ দুঃখ মনে অনুভূত হইলেও ইহার কণিক বলিয়া আত্মাকে ইহার নখর দেহের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। সুখ-দুঃখ অনুভূতির আর একটি দোষ এই যে, ইহার যখন কোন মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সেই অনুভূতির প্রাবল্যের জন্ত মানুষের মনের বিচার-বুদ্ধি ব্যাহত হয়; যে বস্তু অনুভূতির বিষয়ীভূত হয়, মনে হয় তাহাই একমাত্র সত্য। এই ভাবে মানুষের সত্যাপত্তা বোধ ঝাপসা হইয়া পড়ে। এইখানে আমরা প্লেটোর দ্বিতীয় প্রধান মতে উপনীত হই। তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন অনুভূতির অতীত জ্ঞান বা বিচারবুদ্ধিকে। এই জ্ঞানের সাহায্যে—ইঞ্জিয়ের অনুভূতি বা সুখ-দুঃখবোধের মধ্য-বর্তিতা ছাড়াই মানব-মন ভাবনিচয়কে উপলব্ধি করিতে পারে। মানব মনের অধিকাংশ মৌলিক বৃত্তির আলোচনা করিয়া প্লেটো দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের সঙ্গে জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কোন কোন জায়গায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অজ্ঞাত যে সকল গুণের কথা আমরা বলি, তাহার জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। প্রসঙ্গান্তরে তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য গুণগুলি তখনই গুণপদবাচ্য হয়, যখন জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি তাহাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়। ভগবান মানুষের মনে যে সকল কল্যাণকর বৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, বিচার-বুদ্ধি তাহাদের নেতা এবং বিচার বুদ্ধি বা জ্ঞানই সত্যোপলব্ধির উপায়।

জ্ঞান বা বিচার বুদ্ধির অচল কর্তৃত্ব মানিয়া লইলেও সকল সমস্তার সমাধান হয় না। একাধিক স্থানে প্লেটো সাহসকে জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সাহস অনেক ক্ষেত্রে একটা সহসা সজ্ঞাত

বৃত্তিমাত্র—যাহা জ্ঞানহীন শিশু ও পশুর মধ্যেও দেখা যায়। দুই শ্রেণীর বিচারবুদ্ধিহীন সাহসকে তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। মানবের আত্মার মধ্যেও তিনি তিনটি বৃত্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন—বিচার-বুদ্ধি, তেজ ও কামনা। সুতরাং একটি মৌলিক সূত্রের সন্ধান করা দরকার, যাহা নানা বিবোধী বৃত্তি বা শক্তির সমন্বয় করিতে পারে। প্লেটো এই মৌলিক ও পারমাণ্বিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন—পরিমাণ-বোধের মধ্যে। প্লেটো মনে করেন যে, এমন কোন লোক থাকিতে পারে না—যে পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞান বা পরিপূর্ণ ভাবে সুখ চায়। ইহাদের সামঞ্জস্যই প্রার্থনীয়; সুতরাং যে দেবতা মিশ্রণের অনুষ্ঠানের মালিক, তিনি তাঁহার জয়গান করিয়াছেন। এই সামঞ্জস্যের জন্যই মিথ্যার ও জ্ঞান একাত্ম হইতে পারে। সাহস সম্পর্কে প্লেটো স্পষ্ট করিয়া এই যুক্তি দেন নাই। তবু মনে হয়, তাঁহার মতে যে সাহস নিকোমিশ শিশু ও পশুতেও দেখা যায়, তাহা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই কল্যাণকর গুণে পরিণত হয়। পরিমাণ-বোধ, সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের প্রাধান্যের জন্তই প্লেটো শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সঙ্গীত বিভিন্ন সুরের মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করে, তাই ইহা মানব-মনকে নিয়মের স্বরূপ ও মর্যাদা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। গণনা করিবার ও পরিমাপ করিবার শক্তি মানবের দুইটি প্রধান বৃত্তি। ইহাদের দ্বারাই সে অকল্যাণকে এড়াইয়া চলে এবং নানা প্রকারের কল্যাণকর বস্তুকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে পারে। বাহিরের এবং অন্তরের জগৎ আমাদের কাছে অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল হইয়াই থাকিত; কিন্তু সংখ্যার দ্বারা গণনা করিতে পারি বলিয়া এবং যেখানে গণনা সম্ভব নয় সেইখানে তারতম্যের পরিমাপ করিতে পারি বলিয়া অস্পষ্ট স্পষ্ট হয়, মিথ্যা ধারণা সত্যজ্ঞানে পরিণত হয়। সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় এবং পরিমাপ বোধের দ্বারা বিচার—ইহার জন্ত অনুভূতি বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি সম্ভব হয়।

এই যে মিশ্রণ, পরিমাপ ও সামঞ্জস্য—ইহার উদ্দেশ্য কি? যে সকল ভাবনিচয়কে পারমাণ্বিক সত্তা বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই বা কোন্টিকে

সার বস্তু বলিয়া স্বীকার করিব? যদি পরিবর্তমানকে ছাড়িয়া পরিবর্তনাতীতকে খুঁজিতে হয়, যদি সামঞ্জস্য বা সমন্বয়কেই প্রাধান্য দিতে হয়, তাহা হইলে একটি একক মানদণ্ড বাহির করিতে হইবে—যাহা অপর সকল বস্তুর নিয়ামক। পারমার্থিক ভাবের মধ্যেও একটি অতি-পারমার্থিক ভাব আছে; প্লেটো এট প্রেষ্ঠ দিয়াছেন মঙ্গলের অধিষ্ঠাতা ভাবকে। যাহা শিব তাহাই সত্য এবং তাহাই সুন্দরও বটে। কল্যাণের যে ভাব তাহাই সৌন্দর্য ও জ্ঞানবোধের উৎস; তাহাই প্রত্যক্ষ জগতে আলোক-সম্পাত করে এবং তাহাই আত্মার জগতে বিচারবুদ্ধির প্রেরণা জোগায়।

তিনি

প্লেটো নিজে কবি ছিলেন এবং কবিদিগকে তিনি ঐশী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তবু তিনি কবিদিগকে আদর্শ রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিতে চাহিয়া ছিলেন কেন?—প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ হইবে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সুশৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার নিয়ামক মানুষের বিচার-বুদ্ধি এবং ইহার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণসাধন। কাব্য-কলা মানুষের অমুভূতিকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে এবং বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের তৃপ্তি বা আনন্দের সঞ্চারণ, তাহার কল্যাণ-সাধন নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সুখ-দুঃখের অমুভূতি যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ সত্যোপলব্ধি করিতে পারে না; যে বস্তু সুখ বা দুঃখের কারণ, তাহাই একান্ত ভাবে সত্য বলিয়া মনে হয়; এই ভাবে যাহা মিথ্যা তাহা সারবান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহা ছোট তাহাকে বড় দেখায়। সুতরাং কবি অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া প্রচার করেন; তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে আনন্দ দান করা, অমুভূতিকে জাগ্রত করা। কাব্যবর্ণিত চিত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। যাহারা বাহুবল্য, ভোজবাজী ২.ভূতির চর্চা করে, তাহারা অনেক মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া দেখায়; সেই মোহের উপরেই তাহাদের বিদ্যার ও ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। কবির কল্পনা উদ্ভাদনাধিগম্য; কবির নিজের বুদ্ধিই যে

আচ্ছন্ন হইয়া যায় তাহা নহে, এই উদ্ভাদনা পাঠকের মনেও মোহের সঞ্চারণ করে এবং মোহের প্রভাবে অলীক পদার্থও বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হোমার হেসিয়ড প্রভৃতি কবিরা দেবতাদের সম্পর্কে বহু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল মিথ্যা কাহিনীর প্রভাব অকল্যাণকর। যে উদ্ভাদনগুস্ত সে কখনও অপরের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বা বিচার বুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারে না। তাই কবির প্রভাব মানবসমাজে কল্যাণকর হইতে পারে না।

আর এক দিক হইতেও কবির রচনার সারহীনতা প্রমাণিত হয়। প্লেটোর মতে পারমার্থিক বিচারে শুধু এক ভাবনিচয়েরই অস্তিত্ব আছে; ইহারাই শুধু সত্য। যে বস্তুজগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং যে বস্তুজগতে আমাদের জীবন, তাহা খাঁটি সত্য হইতে একটু দূরে অবস্থিত। তাহার সত্যতা আংশিক; যে পরিমাণে ভাবনিচয় আমাদের চিন্তা ও কার্যের প্রয়োজক হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের জীবন বাস্তবতা দাবী করিতে পারে। কবির সৃষ্টি আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের জীবনই আংশিকভাবে বাস্তব। সুতরাং কাব্য অমুবাদের অমুবাদের মত, ইহা মূল সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। খাটের মৌলিক আইডিয়া খাঁটি সত্য, শিল্পী যে খাট নির্মাণ করে তাহা আইডিয়া হইতে ব্যবহৃত বলিয়া আংশিকভাবে সত্য। কবি বা চিত্রকর যে খাটের সৃষ্টি করে তাহা শিল্পীর খাটের অমুকরণ মাত্র। এই অমুকরণের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। এইজন্তই যে বিচার-বুদ্ধি বা জ্ঞানার্জনী বৃত্তির দ্বারা আমরা সত্যকে বুঝিতে পারি, কাব্যে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে অমুভূতি কণস্থায়ী, যাহা সত্যোপলব্ধির পরিপন্থী, তাহাই কাব্যে প্রাধান্য পাইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে, কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা তো সুন্দর, সুন্দরের কি পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই? এই বিষয়ে প্লেটোর মত সম্পূর্ণ স্পষ্ট নহে। তিনি এক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাতা যে মৌলিকভাব, তাহা ইজ্রিসগ্রাহ্য। এই দিক দিয়া এই মৌলিকভাব অজ্ঞাত ভাব

হইতে বিভিন্ন। কিন্তু এই ভাবে সুন্দরকে অপরাপর ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলেও প্লেটো কাব্যকে সুন্দরের অভিব্যক্তি বলিয়া দেখিতে চাহেন নাই। তিনি সুন্দরকেও খুঁজিয়াছেন শৃঙ্খলার মধ্যে, সামঞ্জস্যের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির অচল কর্তৃত্বে। সুতরাং কাব্যের মধ্যে তিনি খাঁটি সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যদি কবি সত্যের চিত্র আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বিচার বুদ্ধির সাহায্যেই সেই চিত্র আঁকিতে পারিবেন এবং সেই জ্ঞানসমৃদ্ধ চিত্রের স্রষ্টাকে আমরা বলিব দার্শনিক, কবি নহে। কাব্যের কাজ হইতেছে চিত্রবিনোদন করা, তাই ইহা স্ততিবাদের পর্যায়ে পড়ে। এই স্ততিবাদের মধ্যে চিত্রের চাকচিক্য ও সঙ্গীতের ঝঙ্কার থাকে। চিত্রের ঐশ্বর্য ও সঙ্গীতের ঝঙ্কারকে বাদ দিলে কাব্যের যে সার-বস্তু থাকে তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং যে ভাবেই বিচার করি না কেন, কাব্য সর্বতোভাবে পরিভ্রাণ্য। যদি কবিদের রচনা জ্ঞানের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে দার্শনিকদের কোন পার্থক্য থাকে না। আর যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে তাহার সারবস্তু থাকে না এবং তাহাকে মর্যাদা দেওয়ার কোন কারণ থাকে না।

প্লেটো কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার কয়েকটি মৌলিক ক্রটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্লেটো বলিয়াছেন যে, বিচারবুদ্ধি ও অমুভূতির মধ্যে পার্থক্য আছে এবং কবিকল্পনায় বিচার-বুদ্ধির স্থান নাই। তিনি নিজেই এক প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকৃত এই পার্থক্য কাল্পনিক। বাস্তবিক পক্ষে দর্শনে বা গণিতশাস্ত্রে বিচারবুদ্ধি কল্পনা ও অমুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া কাব্যে কল্পনা অমুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে এইরূপ আড়াআড়ি সম্পর্ক অসম্ভব করা অসঙ্গত। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আছে, ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটিতে যাহা থাকিবে অপন্থিতে তাহা থাকিবে না এবং একটিতে যাহা থাকিবে না অপন্থিতে তাহার প্রাচুর্য থাকিবে—এইরূপ

মনে করার কি যুক্তি আছে? প্লেটো নিজেই আটকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—কতকগুলি আর্ট সৃষ্টি করে, কতকগুলি জ্ঞান অর্জন করে। কাব্য সৃষ্টি করে, দর্শন জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকেই নিজের নিয়মামুসারে বুদ্ধি ও অমুভূতির মধ্যে সামঞ্জস্য করে, অথবা কোন একটিকে প্রাধান্য দেয় বা পরিবর্জন করে। দর্শনে বা গণিতে যে পরিমাণ বোধ, গণনাযোগ্যতা বা নিয়মামু-বর্তিতা আছে, কাব্যে তাহা নাই। কিন্তু কবি বিশৃঙ্খল-বাক্ নহেন; তাঁহার রচনায় উচ্ছ্বাস থাকে, কিন্তু উচ্ছ্বাসের ও অত্যাতিরিক্তের মধ্যেও তাঁহার ভালবোধ নষ্ট হয় না। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে উচ্ছ্বাসের মধ্যেও সংযম থাকে; কিন্তু সেই সংযম দর্শন বা গণিতের সংযম নহে, কাব্যেরই সংযম।

প্লেটোর মতের দ্বিতীয় দোষ এই যে, তিনি কাব্যকে বাস্তবের অমুকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। “অমুকরণ” বলিতে প্লেটো ঠিক কি মনে করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, এবং এই বিষয়ে প্লেটোর নানা প্রসঙ্গে বিকর্ণ মতাবলীর মধ্যে স্মরণোদ্ভূত আছে। কিন্তু যেখানে তিনি কবির কাব্যকে সত্য হইতে তিন ডিগ্রী দূরবর্তী বলিয়া হয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি কাব্যকে প্রত্যক্ষ জগতের নিছক নকল বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন কোন বিষয়ের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে কবির কোন জ্ঞান নাই; কবি শুধু বাহির হইতেই মনুষ্যের জীবনযাত্রার নকল করিয়া যান। প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে কবির বিশেষ সংস্রব আছে, মানুষের জীবনযাত্রা হইতেই কবি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, মানুষের জীবন সম্পর্কেই তিনি কাব্য রচনা করেন এবং মানুষের মনেই তাহা আনন্দের সঞ্চার করে বা চিন্তার উজ্জেক করে। কিন্তু কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ জগতের বা মনুষ্যচরিত্রের অমুকরণ করে না; ইহা নূতন জগতের সৃষ্টি করে। যে অর্থে প্রত্যক্ষ জগৎ সত্য সেই অর্থে কবির কাব্য সত্য নহে। কিন্তু কবির কাব্যের মধ্যে অন্তরকনের সারবস্তু আছে, যাহা মিথ্যা নহে। কবি মায়ালোকের সৃষ্টি করেন, কিন্তু “বস্তু হইতে সেই মায়া তো সত্যতর।”

সেই সত্য, যা রচিবের ভূমি

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি

রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

সত্যের একই মানদণ্ডের দ্বারা কাব্য ও দর্শন, কল্পনা ও জ্ঞানের বিচার করিতে যাইয়া প্লেটো মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি বিরোধী পদার্থে সামঞ্জস্য বিধা করিতেন, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে কল্পনা ও বুদ্ধির সঙ্গতির মধ্য দিয়াই সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

চার

এই সকল ভ্রমে পতিত হইলেও প্লেটো সাহিত্যের সৃষ্টিধর্মিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই উপলব্ধির জগ্গই বহু ক্রটি সত্ত্বেও তাঁহার মতবাদের বিশেষ মূল্য আছে। কবিকে তিনি উন্মাদগ্রস্ত লোকের পর্য্যায় ফেলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, কবির প্রেরণা এশী প্রেরণা এবং সেই প্রেরণার দ্বারা উদ্বোধিত না হইলে কোন লোক শুধু বুদ্ধির দ্বারা, শুধু কলাকৌশলের দ্বারা কাব্য লিখিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না। কবিপ্রতিভা একটি দৈবশক্তি, ইহা ব্যুৎপত্তি-লভ্য নহে। প্লেটো বলিয়াছেন যে, কবি যখন কল্পনার প্রেরণা অনুভব করেন, তখন তিনি নৃতনের উদ্ভাবন করেন—পুরাতনের অমুকরণ নহে—এবং কবি পবিত্র, পক্ষবিশিষ্ট জীব অর্থাৎ তিনি অনন্তসাধারণ ব্যক্তি। তিনি এই নালিশও জানাইয়াছেন যে, কবির কল্পনার উন্মাদনা জাগ্রত হইলে কবির চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং মন কবির নিকট হইতে বিদায় লয়। এই বিদেবদিক্ত বর্ণনার মধ্যে কাব্যের স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কবিকর্ম্ম অন্ত সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন, কারণ ইহা জ্ঞান নহে, ইহা সৃষ্টি। প্রসঙ্গ বিশেষে প্লেটো কবিকে রাষ্ট্র-নেতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মোটামুটি ভাবে তিনি সর্বত্র কাব্যের স্বকীয়তা ও অনন্তপরতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও মানিয়া লইয়াছেন যে, কবির এই শক্তি চরাচরব্যাপী, এমন কোন বাধা নাই যাহা ইহা অতিক্রম করিতে পারে না; এমন কোন পদার্থ নাই যাহা ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না। এই অনন্তপ্রসারী শক্তি অমুকরণকারীর আয়ত্তের অতীত।

প্লেটো পারমার্থিক ভাব সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা কতদূর গ্রাহ্য—তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। ইহার অর্ধেক দর্শন, অর্ধেক কবিকল্পনা। কিন্তু ইহার মধ্যেও কাব্যের স্বরূপের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। প্লেটো মনে করেন যে, অশরীরী ভাব-নিচয়ই বাস্তব; সেই সকল ভাবনিচয়ের প্রয়োজনায়ই মানুষের জীবন আংশিক বাস্তবতা লাভ করে। এই পারমার্থিক জীবন্তুলি মানুষের জীবন হইতে স্বতন্ত্র হইলেও মানুষের মন দিয়াই তাহাদিগকে জানা যায় এবং প্লেটোর উক্তি বিস্তারিত করিয়া বলা যায় যে, মানবের জীবনের মধ্য দিয়াই ইহার অভিব্যক্তি পাইতেছে। এই অভিব্যক্তি খণ্ডিত; ইহার মধ্যে খাঁটি সত্যের সম্পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। ইহা কি বলা যায় না যে, সত্যের যে অংশ জাগতিক জীবনে প্রকাশ পায় না, যাহা বুদ্ধির অনধিগম্য, কবি তাহাকেই উপলব্ধি করিয়া রূপ দিতেছেন এবং সেই জন্ত কবির কাব্য পারমার্থিক ভাব বা প্রকৃত সত্যের এমন একটি দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে—যাহা বস্তুজগতে ধরা দেয়না, শুধু বুদ্ধির দ্বারা যাহাকে জানা যায় না। এই জগ্গই কবিকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহার সৃষ্টি প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে বিভিন্ন। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে যে, তিনি স্রষ্টা, তাঁহার ক্ষমতার অবধি নাই, সমস্ত বিশ্ব তাঁহার রচনায় নূতন সৃষ্টি পরিগ্রহ করিতেছে। প্লেটো স্বীকার করিয়াছেন যে, কবির নির্মাণ বিচিত্র ও জটিল; কবি অ-সৎ (non-Being) হইতে সৎ (Being) বস্তুর সৃষ্টি করেন, তাঁহা সমস্ত শিল্পকৌশল সৃষ্টিধর্ম্মী। যাহা বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাপণীয়, তাহা দার্শনিকের বিচারে অ-সৎ বা অস্তিত্বহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্লেটোও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাহার মধ্য হইতে কবি নূতন জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন। যাহা সৃষ্টি তাহা মিথ্যা নহে; তাহা বিচার বুদ্ধির একাধিপত্য স্বীকার করে না; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অলৌক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কবি-কল্পনার সৃজন-ক্ষমতা মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া প্লেটোকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কাব্যের নিজস্ব সত্তা আছে; এই নিজস্ব সত্তার আর বাহাই অপরাধ

ধাক্ক, ইহা সত্য হইতে বহু দূরবর্তী হইতে পারে না। ইহা পুরাতনের অনুকরণ নহে, ইহা নূতন সৃষ্টি এবং বোধ হয় প্রত্যক্ষ জগতের মত ইহা পারমাণবিক সত্যেরই পরিচয় দেয়। সেই পরিচয় তথাকথিত বাস্তব জগতের পরিচয় হইতে ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা অনস্বীকার্য।

প্লেটো মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া কাব্যের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

যে যুক্তির সাহায্যে তিনি কাব্যকে ছেয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, সেই যুক্তিই তাঁহাকে কাব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। যিনি শত্রু হিসাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তিনিই কাব্যের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কবিকে শ্রদ্ধা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহাকে অনুকরণকারক বলিয়া গালি দিলে সেই গালি অর্থহীন হইয়া পরে। যদি মনে করা যায় যে, প্রত্যক্ষ জগৎ ভাবনিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং

তাহা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অধিগম্য, তাহা হইলে তাহার অনুকরণ করিবার জন্ত ঐশী শক্তি বা সৃজনী প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে যাহারই অনুকরণ করি না কেন, অনুকরণ বিচার জন্ত বুদ্ধিবৃত্তিরই আবশ্যক হয়, যদিও সেই বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় অপকৃষ্ট রকমের। প্লেটো কবির স্বকীয় প্রেরণা বা inspiration-র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; এই স্বীকৃতিই তাঁহার অনুকরণভয়ের মূলোচ্ছেদ করে। প্রকৃতপক্ষে যাহারা কাব্যের স্বয়ংসিদ্ধতা ও অন্ত ফল নিরপেক্ষতায় (Art for Art's sake) বিশ্বাস করেন, প্লেটো তাঁরাই পিতামহ। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে পার্থিব কল্যাণকে সকলের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তিনি কাব্যের উপযোগিতা নির্ণয় করিতে পারেন নাই এবং নানা স্ববিরোধী উক্তি করিয়াছেন! কিন্তু তৎসঙ্গেও ইহা মানিতেই হইবে যে তিনি কাব্যের রহস্যের উপরে আলোকসম্পাত করিয়া তাহার মর্ম উদ্ঘাটন করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

ককাল

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

পুরোণো যা কিছু, মানুষের মনেতেই নাকি দাগকেটে বসে থাকে। কথাটা সত্যিই, অন্ততঃ রমেশের কাছে সত্যি।

রমেশ!...নামটা ভজগোছের। বাবা মা যখন নাম রেখেছিল, তখন ছিল তাদের সংসারের লক্ষ্মীর পারম্পর্শ, তারপর এলো গেলো অনেকগুলো বছর। বাবা মায়ের মেহছায়ায় বড় হয়ে উঠেছিল,...তারও অনেকদিনের পরের কথা বলছি, যখন রমেশের জীবনে এসেছে বরষের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ভার; এসেছে বার্কিক্যের ছায়া—। সেই রমেশের কথা বলছি। আর! আর লক্ষ্মীর স্পর্শ তাদের গৃহাঙ্গণে নেই, রমেশ নামটা সাক্ষ্য দেয় মাঠের মাঝে আধবোঝা অবস্থার খর রোদে ধাঁ ধাঁ করা মজা তালপুতুরের মত।

রমেশের জীবনে এসেছে দারিদ্র্যের ক্লম স্পর্শ!...

পুরোণো জমিদার-প্রধান গ্রাম।...বিগতকালের গৌরব-

ময় যুগের সাক্ষ্য দেয় বিশাল ভাঙ্গা বস্তীগুলো, রাস্তার দু'দিকে জীর্ণ অবস্থায় শেওলার আলিঙ্গনে কালো হয়ে অশথ-গাছের ঝোপ বৃক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সঙ্কায় অন্ধকারে ভূতের মত। বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে-সুরে রমেশ টিমটিমে লঠনটা হাতে নিয়ে ইট ভাঙ্গা রাস্তাটার বৃক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাড়ীর দিকে আসে।

সারাদিনের পর ছুটি। কাজ সূক হবে আবার সেই ভোর হতে। উচু পাঁচাল-ঘেরা শ্রাম-পুতুরটার পাশে আসতে আসতে রমেশের গতি আরও বেড়ে যায়—থমথমে অন্ধকার...ওখানটার জোড়া আমগাছে নাকি ভূতের বাসা। —তা ছাড়া, অনেকখানি জায়গা জনমানবের বসতি নাই! কোরে পা চালিয়ে আসে রমেশ।

"...আচ্ছা মানুষ বা হোক! রাতে বাবুদের বাড়ীতে

থাকলেই পারি !” অস্বত বলে ওঠে ! এটা তার রোজকারই কথা !

রমেশ জ্বরিকেনটা নামাতে নামাতে বলে ওঠে, “হঁঃ, তুর এত মাথাবাথা কেন বল দেখি ? চাকরী করতে গেলে পরের দিকে দেখতে হবে ত ?”

তাত বাড়তে থাকে অমন্ত ! এঁঠো হাতটা একবার ঘুরিয়ে ‘নয়ে বলে, “কীটা গার অমন চাকরীর মুখে, তারি ও আমার চাকরী !”

“ছুঁচোর চাকর চামচকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে !”
বারুদের বাতাসে হাঁড়ি নড়ছে অথচ চাকর চাই !”

গর্জ্জ ওঠে রমেশ, “চু—চুপ কর বলে দিচ্ছি। যার খাওয়া তারই নিন্দে...”

আরও কি যেন সব বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথাটা তার মাঝে মাঝে আটকে যায়, বারকতক ঢোক গিলে অসংযত জিবটাকে স্বহানে প্রতুষ্টিত করার চেষ্টা করতে থাকে।

অমেস্তর অভিযোগটা সত্যিই ! রমেশ... শুধু রমেশ কেন, রমেশের বাবা চাকরী করত মুখ্যোদের বড় তরফে ! সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা ! চারিদিকে বড় বড় তে-মহলা বাড়ী, বাড়ীর বাইরে রাস্তার হুঁদিকে চকমেলান জালান। সারি সারি দোকান-পাট বসত। পাশেই বিশাল ঠাকুরবাড়ী... নাটমন্দির ! সব কিছুই পরিচয় দেয় তাদের শোঁধা-বীর্ধোর, ভাগ্যলক্ষীর শুভদৃষ্টির।

রমেশের এল ভালনের যুগ ! অজ্ঞাত প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম পরিহাস এল অভাবনীয় রূপে

বিলাসপুরের মামলায় ছেলে বাওয়ার পর থেকেই কোন অদৃশ্য পথ ধরে অন্ধকার পুরী থেকে বার হয়ে গেল ভাগলক্ষী ! উত্তরপাড়ার রায় বাবু আরও হুঁ একজন হয়ে উঠল প্রতাপাশ্রিত।

সেই ভালন-ধরা মুখ্যো বাড়ীর আশে-পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সেই গৌরবময় যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, রমেশ তাদের মধ্যে অন্ততম !

মাইনে পারি না, হুঁমাস-হুঁমাস পর পারি হুঁচার টাকা, কিন্তু তবুও ঐ ধ্বংসপূরী মায়ী কাটাতে পারে না, জীবন্ত প্রোত্তের মত সে আজও রয়েছে ওদের বাড়ীতেই !

হুঁপুর গড়িয়ে এসেছে, সারা পাড়াটা হুঁপুরের রোদে নিখর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

খুলি-খুলির পথে চলেছে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হুঁ একটা কুকুর। ভাঙ্গা বাড়ীর পেয়ারা গাছে বসে ক্লান্তভাবে ডেকে চলেছে ঘুঘু... ক্লান্ত মধ্যাহ্ন আরও উদাস করে তোলে।

রমেশ ভাঙারের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! বিশাল ঘরটা ফাঁকা হয়ে রয়েছে, এক কোণে হুঁ একটা বস্তার কিছু চাল-ডাল আর আটা পড়ে আছে। রমেশই দেখেছে তার ছোটবেলার ঘরখানা বোঝাই হয়ে থাকত সারি সারি বস্তা টিনে। দেউড়ীর ঝারোয়ান চাকর-বাকর সকলের সিঁদে দিয়ে যেতে ; একজন সরকার হিমসিম খেয়ে যেত !

“এ রমেশ... এ !” বিজাতীয় কঠে একটা চৌৎকারে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, মুখ তুলে সামনেই তুরগসিংকে দেখে বিরজিত-ভরা কঠে বলে ওঠে—“এসেছ ! কাল শতুর !”

কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না তুরগ সিং ! দেউখানা চোক বার কতক পিট পিট করে, কোমরের ময়লা গামছাখানা দালানে বিছিয়ে আবার হেকে ওঠে “দেও না ভাইয়া, এ রমেশ... এ !”

তুরগ সিং বেতায় পালোয়ান। ধ্বসেপড়া মুখ্যো বাড়ীর ফুটো অশথ-শিকড়ের জালবোনা দেউড়ীর একচ্ছত্রাধিপতি ! সবেধন রামকান্ন ঐ তুরগ সিং !

ময়লা গামছাখানাতে সের খানেক চাল আর গোটাকতক আলু ফেলে দিয়ে বলে রমেশ—“বাস

“কৈও ! আটা কাঁহা !” জেরা করে তুরগ সিং রমেশ বাক্যব্যয় না করে ভাঙার-ঘরের দরজায় তালাটা এঁটে দিয়ে লম্বা দরদালান দ্বিজে চলতে শুরু করে।

তুরগ সিং গামছাটা এঁটে বাঁধতে বাঁধতে আপন মনেই বলে ওঠে, “তুমি বড় খচরা আছে !” পুটুনিটা কাঁধে কেলে চকুর পার হয়ে আবার অলিগলির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে দেউড়ীর দিকে। রমেশ চলেছে বাড়ীর দিকে। বারুদের খাওয়ার-বাওয়ার পর হয় রমেশের খাওয়ার ছুটি !

ভাঁড়ার থেকে হুঁ পলা ভেল নিয়ে গারে মাথায চাবড়িয়ে একেবারে দীঘির জলে ডুব সেরে বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

ভয়ে ভয়ে উঠোনে পা দিতেই—বা ভয় করেছিল ঠিক তাই ! সামনেই একেগারে অমেস্ত ! কাঠখোটা রোদে

ভারও মেডাজটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে ! জেরা করে বসে, “সিদের চাল কই ?”

আমতা আমতা করতে থাকে রমেশ—“ইয়ে ইয়ে ভাঁড়ারে আজ চাল বাড়ন্ত কি না ! কাল কাল...” থানিয়ে দেয় তাকে অমেন্ত, “বেশ, আজ আর খেও না, কাল একবারেই খাবে।”

দাঁতের ডগায় একটু তাসি টেনে আনতে থাকে রমেশ—“হেঁ হেঁ হেঁ।”

“রতে—খবরদার বলছি, একটি ভাত ফেলবি না।” অমেন্তর হাকুনিতে রমেশ দাঁড়ায় দিকে চাইতে থাকে। রতন পুঁই ডাটার চচ্চড়ি আর পুঁটি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছে।

লোলুপ লুকু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রমেশ। সারা পেটের নাড়ীভুঁড়ীগুলো চন্ চন্ করছে, ...ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় ব’সল।

অমেন্ত আপন মনে গর্জে চলেছে, “বাবু! যেন ওর বাবা হয়, মাগনা খেটে দিয়ে আসছে ! মাইনে নেই, সিদে নেই। ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, এমন মরদ দেখিনি। বসে কেন যাও না সেই চুলোয় ! সিদে না হোক এক খালা পেসাদও ত আনতে পার।”

তিক্ষ-বিরক্ত হয়ে বার হয়ে পড়ে রমেশ।

হু’পুরের রোদ শ্রামপুতুরের জলে অলস শয়ন বিছায়। তীব্র রোদ জোড়া আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছায়াময় ঘাসের বুকে রচনা করে আলোছায়ার মায়াজাল। হু’ একটা চিল সন্ধানী দৃষ্টিতে সরপথ ঝোপের আঁড়াল থেকে চেয়ে থাকে জলের দিকে। তাক বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে আপন মনে চলেছে রমেশ। “এ রমেশ ! এ—” তুরগ সিং এর ডাকে ফিরে চাইল রমেশ।

“...আ—এ রমেশ, আইয়ে না—এ—”

তুরগসিং একটা বিশাল কড়াই-এ করে প্রায় সব চালটাই ফুটিয়েছে। লাল চালগুলো যেন শাসনতরা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ময়লা চিটকে কাপড়খানাকে সামলে নিয়ে হু’টো ইটের উপর বসান কড়াইখানাকে কয়েকটা শালপাতার উপর উপুড় করে দিল।...

পরক্ষণেই কড়াইটাকে দু’র সঠিকে, গলা ভাতগুলোতে থানিকটা নুণ ছিটিয়ে, গোটা দুই সিদ্ধ মূলো তিবিয়ে,

মেসিনের মত কৌৎ কৌৎ করে চোখ বুজে গিলতে থাকে।... বাঁ হাতটা মাটিতে ধাবড়িয়ে, রমেশকে বসবার ঠাই বাতলে দিয়ে আবার ডান হাতের কাজে ব্যস্ত হয়। “এ-রমেশ... এ।”

রমেশের খিদে যেন আরও তিনগুণ বেড়ে ওঠে।... ধীরে ধীরে মুখ্যে মশারের খাস কাষরার দিকে পা বাড়াল।...

খাওয়া দাওয়ার পর চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন, অদূরে কুড়সীটা নামান। রোজকার মত রমেশ কুড়সীটা গেছে আশুন চাপিয়ে নলটা বাবুর হাতে ধরিয়ে দিলে বড়বাবুও চোখ বুজে সটকাটা হাতে নিয়ে টান দিতে থাকেন।...

রমেশ পা টিপতে থাকে...।

...কাজে মন বসে না...। মাঝে মাঝে খেমে যেতেই বড়বাবু বলে উঠেন—“কি রে, তোরও কি ঘুম আসছে না কি ?”

...শশব্যস্তে রমেশ আবার পা টিপতে থাকে।...

ডাকবাবুর বাড়ীতে অমেন্ত কাজ করতে যায়। সকাল-বিকাল ছু’বেলা—তবে রমেশের মত অমন মাগনা খাটবার সং ইচ্ছা তার নাই।...দীঘীর ঘাটে এক গোছা বাসন-পত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি করে মেজে আবার ছুটে ফিরে আসে বাড়ীতে।

রতন বাড়ী আগলায়।...বাবাকে বাড়ীতে আসতে দেখলেই দূর থেকে তার দিকে দৃষ্টি রাখে, এ-সব অবশ্য মাঘের শিথান।...

মুখ্যে বাড়ীতে পূজার আয়োজন শুরু হয়। ভান্সা দুইয়ে-পড়া বিশাল দালানের গায়ে বাঁশ-কাঠ লাগিয়ে দিন কয়েকের মত ঝোপ-জঙ্গল কতকটা পরিষ্কার করা হয়।—চক-মিলান বাড়ীর আশে-পাশে দেওয়ালের গা ফুড়ে গজিয়ে ওঠে দুর্কীঘাস, অশ্বখ, কালকাসিন্দার ঝাঁকড়া জঙ্গল।

...মুচিপাড়ার রস বায়েন বিবেচনাক জমি পত্তন পেয়েছিল কোন পূর্বপুরুষের আমল থেকে। সেইদিন থেকে একটা কাজ তাদের চেপে রয়েছে কাঁখে জগদল পাথরের মত—পূজোর ক’দিন একটা ঢাক আর কাঁসি দিতে হয়।...

রমেশের অবসর নাই, কোমরের গামছাখানা কাঁখে উঠেছে ; কাপড়টা সামলে নিয়ে ছুটাছুটি করে।

মুখ্যে মশার একমনে তেবে চলেছেন। দোতলার

ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সারি সারি কুতোপুরীর মত আধ-ভাঙা বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন—তার চোখের সামনে তেঁসে ওঠে অনেকদিন আগেকার ঘটনাগুলো—

...পুজোমণ্ডপের কোলাহল গাঁয়ের বাইরে থেকে শোনা যেত। বিলাসপুর, আক্কা, গোবরডাঙ্গা বৃন্দা সব ক'টা মাহাল থেকে আসত তারে তারে দুধ-মাছ, ফলমূল, আতপ চাল, গোপীগায়ের মুচিদের বস্তি ব্যাগপাইপের দল। সারা উঠানে আরতির সময় লোক ধরত না।...মুণের ধুনোর নৈবেদ্যের অন্তরালে বিশাল দেবীপ্রতিমূর্তি ঝঙ্কঝঙ্ক করতে থাকত। মহিম মুখুয্যে স্বয়ং পাটের জোড় করে গদগদকণ্ঠে মাঘের চরণে প্রণতি জানাত—

“ও সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্কার্ধসামিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥”

রমেশের পিছনে একজন অপরিচিত লোককে দেখে তিনি কিরে এলেন আবার বর্তমান পৃথিবীতে।

লোকটা ছোট একটা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকে।... রমেশ বলে ওঠে—“আজ্ঞে বড়বাবু এ এসেছে গোপগায়ে থেকে, নোতুন জগন্নাথের দল খুঁলেছে, তাই এসেছে বাবুর কাছে।”

লোকটা এইবার স্তব্ধ করে—“হজুরের দরবারে এলাম পুজোর মরসুমে!” তার কথা আর বার হয় না, হাত দু'টো কচলাতে থাকে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হিসাবে। “হেঁ হেঁ, সারা ভাট্টার রাজা আপুনি, আনি আপনার দরবারে কিছু...” দাঁতের ডগায় টেনে টেনে হাসতে থাকে।

মুখুয্যে মশায় গম্ভীর হয়ে ওঠেন। রমেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাঁর মূর্তি দেখে ভয়ে ভয়ে চুপ করে যায়। ছাদের উপর তিনজনেই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে সারা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে ছোট তরফ থেকে ব্যাঙ ব্যাগপাইপের সম্মিলিত শব্দ। চতুর্থীর ঘট আসছে। সপ্তম ছোট বাবু গরদের জোড় পরে নগ্ন পদে ঘরের পিছু পিছু চলেছেন! আগে আগে সারা পাড়া মাথার করে চলেছে ব্যাঙের দল। গোপী গায়ের সেই পুরোণো দল।

রুদ্ধ কণ্ঠে মুখুয্যে মশায় রমেশকে বলে ওঠেন,

“আজ্ঞা ওকে বায়না করে দাঁড়ি'গে, কাল থেকে ও আসবে।”

লোকটা আবার একটা প্রণাম করে রমেশের সঙ্গে বার হয়ে যায়। রমেশের সামনেকার দাঁত দু'টো আপনা থেকেই বার হয়ে আসে খুলীর আভার।

“দেখলে বায়েন! মরা হাতী সত্তরা লাখ। বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। দিল বাবে কোথায়। আবার আমাদের থোকাবাবুকে দেখো নি, একেবারে বংশের নাক। হু' হু'টো পাশ দিয়ে এখনও পড়ছে।” বায়েন নীরবে ঘাড় নাড়তে থাকে।

“একটা মোটে?” বায়েন যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ে। পুজোর বায়না মোটে একটাকা।

তার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে রমেশ বলে ওঠে, “হাঁ। হাঁ। বায়না-পত্তর কি না, তোমার যা পাওনা তাই পাবে। লাও, জল-খাবার লাও।”

তার আঁচলে ঢেলে দেয় কতকগুলো হলদে রান্ধা মুড়ী আর গোটাছই সিঁড়ীর নাড়ু। ক্ষুধ মনে লোকটা বার হয়ে গেল চম্বর দিয়ে।

একরকম ছুটে ছুটে তুরগসিংকে আসতে দেখে রমেশ হাসি চাপতে পারে না, ঠাকুরবাড়ীর কি মানদাও ভাঁড়ারে এসেছিল কি কাজে, সে হাসতে থাকে—“মর মুখপোড়া ছাতুখোর।”

“এ রমেশ—এ—থোড়া ভুজা।” মূলো খাওয়া লালচে দাঁতগুলো বের করে ময়লা গামছাটা পেতে বসে “তুরগ সিং।

রমেশও মুখ তেংচে ওঠে—“ম'ল, ব্যাটার হাড় অবধি কাঁপা—লে বাপু, মকাইএর ছাতু লে, ও ফুলো মুড়ি পাঁচসের দিলেও তোঁর জলগাবার হবে না।”

দেশ থেকে নোতুন আমদানী তুরগসিং সব কথাটা রমেশের সঠিক বুঝতে পারে না, তবুও বলতে থাকে, “তুমি বহুৎ খচরা আছে।”

গামছাটাতে কতকগুলো মুড়ী আর দু'টো কাঁচা লঙ্কা ফেলে দিতে, গোলগাল মুখখানা আবার চিক চিক করে ওঠে হাসির আভাষ। দেড়খানা চোখ পিট পিট করচে থাকে, গলার কালকারে বাঁধা ছোট তক্তাটা আলগা করতে করতে চলে যায় সে। পিছন কিরে মাঝে মাঝে তাকায় রমেশের দিকে।

রমেশের আনন্দ দেখে কে। এক মুখ হেসে বলে ওঠে, “দেখ দেখ অমেন্ত তুই বলিস বাবুদের হয়ে এসেছে। ওরে জানিস না...লক্ষ্মীর ঘরের কপাট বতদিন ওদের বন্ধ থাকবে, ততদিন মা-লক্ষ্মীর বাবার সাধি কি পালাই।”

“কিছু বলে না, ভাট, না হলে ঐ ছোট তরফ রায় বাবুরা ওদের নতি।”

অমেন্ত কথার কান না দিয়ে কাপড় ক’খানা দেখে চলেছে। ক্রমশঃ নাকটা উপরে উঠে গিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে—মাগো এই ক্যাটকেটে কাপড় আমি সাতজন্মেও পরিনি। ছাকর, এই আবার পরে। রতনের জামা দিয়েছে টিটিমুটি।

এই দেখ। তবু কিছুতেই মন ওঠে না। খোকাবাবু এনেছে কলকাতা থেকে, ওনারা কি আর রতনের মাপ জানে। কিন্তু জামাখানা বলিহারী যাই।

রমেশের কথার উত্তরে ঠোট ছুটে উল্টে দেয়—“আখার ছাই।” বিরক্ত হয়ে ওঠে রমেশ। সজোরে কি বেন বলতে বাচ্ছিল, কিন্তু জিবটা আটকে যায়, চোখ দুটো উঠে পড়ে কপালে। “তু-উর বাপ দেখেছে এমন জামা-কাপড়।” অমেন্ত বিজ্ঞানস্পৃষ্টার মত উঠে দাঁড়াতেই রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলতে থাকে।

গোপীপুরের বায়েন ‘জগন্নাথ’ নিয়ে এসে পড়েছে বিপদে। আর কোনো বাজনা নেই; মাত্র রস বায়েনের একটা টিমটিমে তেঁতুল কাঠের ঢাক, আর তার বেটার একটা কাসি। পুরুত ঠাকুরও বার কতক নৈবেদ্যের দিকে চেয়ে সাদা পৈতেটা স্ক্র মনে নামাবলীর মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। “মোটো নটা ভুজি।”

খোকাবাবু দাঁড়িয়েছিলেন অদূরে। পুরুত ঠাকুরের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান।

রমেশ কীসরখানার একটা দড়ি বাঁধছিল; শশবাত্তে বলে ওঠে, “সপ্তমীর দিন ন’টা ভুজি দেওয়া হয় ঠাকুর মশায়। যার যেমন রীতি।”

আড়চোখে এক একবার খোকাবাবুর দিকে চাইতে থাকে। মনে মনে আসে কথাটা—“হাঁ হাঁ বাবা, এ শরীর কাছে পুরুতী চাল চলবে না।”

“বাজা বাজারে রস—ওহে বায়েন লাগাও ভোমার

জগন্নাথ বেশ যুৎ করে—‘লাগা খড়খড় মস্‌নে কাটা’, বুঝলেন খোকাবাবু, ও বায়েনের তুল্যি বাজানদার এ ভজাটে আর নাই।”

...রমেশ বলে চলেছে।

সবচেয়ে জোর বেশী রস বায়েনের বেটার। কাসিটার প্রাণপণে আঘাত করে চলেছে, সেটা তীব্র হয়ে কঁদে চলেছে কাঁই—কাঁই।

এতদিন পর ‘অমেন্তর’ মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। তালপাতার ঠোঁড়ার মোড়া কাঁচা মাংসটা খুলে তাড়াতাড়ি করে নুন হলুদ মাখাতে থাকে। পাশে বসে তারিফ করে রমেশ,—দেখ, বলছিলাম না খোকাবাবুর দিল আছে।

অমেন্তও স্বীকার করে কথাটা—হ্যাঁ তা বটে বৈকি। এই রতন ঘুমোস না—মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত চাট্টি খেয়ে শুবি, ততক্ষণ ঐ খালা থেকে পেসাদ তুলে নে।

সপ্তমীর ভোগ—বাবুদের বাড়ী থেকে রমেশ বড় এক-খালা পেসাদ ফলমূল আর খানিকটা কাঁচা মাংস নিয়ে এসেছে।

রাগা-বাগা করতে রাজি হয়ে গেল অনেক। অমেন্ত জেদ করতে ছাড়ে না রমেশকে, “উঁহ, ঐ ক’টি ভাত মাংস দিয়ে খেলে হবে না, আরও চাট্টি দিই, মাংসও লাও।”

আসল কারণটা ধরা পড়ল তার পরদিনই। রতনের সখ করে পোষা কালো পাঁঠাটা কাল রাত্রি থেকেই ফেরেনি। অপ্রত্যাশিত মাংস আর পেসাদ পেয়ে ছাগল খোঁজা বন্ধ হয়েছিল, আর খুঁজলেই বা পেত কোথায়?

মুখ্যো মশায় গজীর হয়ে বসে রয়েছেন, সারা গ্রামে একটাও পাঁঠা মেলেনি, আশে-পাশের গ্রামেও না। ছোট তরফ রায় বাবুদের বাড়ীতে আজ ছাগলের রক্তগজা হয়ে যায়। চড়া দাম দিয়েও মেলে না। তা ছাড়া, বেশী দাম দিয়ে ছাগল কেনার মতের বিরোধী মুখ্যো মশায়।

চমকে ওঠেন রমেশের কথা শুনে, “বল কি, গোবিন্দ গঁরাই, এককালে আমাদের সাবক প্রজা ছোট পাঁঠাটার দাম বললে সতের টাকা।”

স-চেয়ে থাকে।

খোকাবাবু নীরবতা ভঙ্গ করেন, “বলি বন্ধ থাকুক অত রচা করবার—” তার কথা শেষ হল না...মুখ্যো মশায়ের

গভীর ভাবে মাথা নাড়তে থাকেন তিনি, “তা হয় না—
তা হয় না।”

...তাকিয়াটা ছেড়ে উঠে পড়লেন কি ভেবে, খড়ম
তোড়াটার পা চুকিয়ে শশব্যস্তে বার হয়ে গেলেন ভিতর-
বাড়ীর দিকে।

বাইরের আকাশে চলেছে ছোট তরফের ব্যাঙের গগন-
ভেদী শব্দ।...একদল মেয়েভেলের কান্নার মত...মাঝে মাঝে
কানে আসে বাগ-পাইপের সুরটা।

বলির আর দেয়ী নাই।

মুখ্যো মশায় এসে হত্যা ভাবে বসে পড়েন, তাঁর অস-
হায় মুখে ভেসে ওঠে শ্রীকীর্তার আভাষ। দেওয়ালের
নিবর্ণ চবিশুলোর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তাঁর বুক বিদীর্ণ
করে বার হয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

—“থোকা একবার পুজোর আয়োজনটা দেখগে, বলির
বা হয় একটা ব্যবস্থা করছি। ওর জন্ত কিছু তয় নেই।
তুমি একবার তুরগ সিংকে পাঠিয়ে দেবে এইখানে”। থোকা-
বার হয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে ধীরপদে নেমে যাওয়ার পর
মুখ্যো মশায় মেজাইয়ের পকেট থেকে বেগুনী রং-এর
কাগজে মোড়া একটা আংটি বার করে দেন রমেশের
হাতে...

“যেমন করে হোক এর থেকে একটা ছাগল”—অবাক
হয়ে ওঠে রমেশ—আংটি থেকে ছাগল।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও দেয়ী করো না।” মুখ্যো মশায় তাড়াতাড়ি
করে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের অন্তপ্রান্তে চলে গেলেন।
রমেশ আশ্চর্য হয়ে যায়। আয়নাখানাতে দেখা যায় মুখ্যো
মশায়ের গওদেশে দু’এক বিলু অস্ত্র। সহসা আয়নার
ছায়ার রমেশকে দেখতে পেয়ে তিনি সরে গেলেন সচকিত
হয়ে।

ইতাবসরে আংটিটা নামিয়ে রেখে সরে পড়ল রমেশ।
তারও মনটা কেমন ভারি ভারি হয়ে যায়।

রতনের কালো নখর পাঁঠাটা জামপুকুরের ধারেই
চরছিল, গোটাকতক আমশাতা তেজে তার কাছে নিয়ে
যেতেই ধরা দিল। বোকা পাঁঠা কি না।

তাঁহাড়া মুখ্যোদেবের অদৃষ্ট সু প্রসন্ন বলতে হবে বৈকি।

অমেন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে চলেছে—“বাবু ওর
বাবা হয় কি না। বাবুদিকেই বা কি বলব, আজ খেতে
কাল নাই, আবার ঘরে পুজো—।” ধমকে ওঠে রমেশ, “এ্যাই
খবরদার বলছি;”

“ভারি আমার খবরদারীওয়ালা রে, কান্নার বাণের খাই
না পরি, কাল থেকে চাকরী করতে যাবে ত’।”

বাধা দিয়ে ওঠে রমেশ, “আরে ম’ল! পাঁঠার নাম দেবে
বলেছে।”

অমেন্তকে কথায় পারা তার। মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—
“পাঁঠার নাম দেবে? একটা খাড়ী পাঁঠা সপ্তসর নাকে
দড়ি দিয়ে খাটছে, তারই বড় দাম দেয়, ও দেবে পাঁঠার
দাম।”

রতন শুদিকে নাওয়ার এক তানে কঁদে চলেছে...রমেশ
বিরক্তিভরে বলে ওঠে, “এ্যাই। কঁদছিল কেনে, তুর বাবা
মরেছে নাকি?” অমেন্ত জবাব দেয়, “কঁদবে বেশ করবে,
অমন বাবার মুখে তিল, কুশ শিশু দেবে—”

অতিনয় বেশ ভমে উঠেছে, ঠিক এমনি সময়ে এসে
হাজির তুরগ সিং...দেড়খানা চোখ পিট পিট করে পেটেন্ট-
মার্ক গলা বার করে বলে, “এ রমেশ—এ—।” কাছেই
দাঁড়িয়ে আছে রমেশ, তবুও চীৎকার থামাবার নাম নাই।
উত্তর দেয় অমেন্ত।

উঠানের একপাশে পড়েছিল একটা নারকেল-শিকের
কাঁটা, সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যায়,
“দেখবি দেখবি মিনসে? বাঁড়ের মত হাকড়তে এসেছে।”

...তুরগসিংএর চীৎকার থেমে যায়। ছ’ হাত পিছিয়ে
এসে ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে, “আরে আরে ই কিয়া!
মারে গা মারে গা তুম।” অমেন্তও হিন্দীতে হুক করেছে,
মারে গা বই কি!...পোড়ারমুখো মিনসে, বা...বলগা
তোম বাবুকে, ‘ও কাজ করতে যাবে না’!...গেলি?
উত্তর কাঁটার সামনে তুরগসিং কঁচোর মত শান্ত হ’য়ে
চোখ দেড়খানা পিট পিট করতে থাকে, ...পরক্ষণেই বার
হয়ে যায় ক্রংবেগে।

অমেন্তর শাসন তখনও থামে নি।

আজ বিসর্জন!...চকের তালো বাড়ীর দু’দিকে কাতায়ে
কাতায়ে দাঁড়িয়ে লোক।

সারা অঞ্চলটার লোক আজ ভেঙ্গে পড়ে দীঘির
বাটে !...ছোট তরক—রারবাড়ী—সেনবাড়ী-নন্দের প্রতিমা
বিসর্জন হয়। তার মধ্যে সেরা জমকালো হয় ছোট
তরকেরই !...বাড়ীর সামনে বিশাল চত্বরে দায়োয়ানদের
লাঠিখেলা, তরোয়াল-খেলা অনেক কিছুই হয় !...

মুখুযো বাবুয়া কেউ কেউ ছাতে থেকে দেখেন...মুখুযো
মশায়ের চোখে নামে অভীতের স্বপ্নের কথা...তার মনে পড়ে
এই চত্বরে তাঁদেরই দায়োয়ান রামদেব লছমী সিং...কাল
হাড়ির লাঠিখেলা হ'ত !...তিনি চার প্রহ্ন বাজনা! সারা
বাড়ীর মাঝে তাদের গুরু গভীর শব্দ গুমরে ফিরত !...

তুরগসিং দেউড়ীর তাল্পা ছাত থেকে প্রেতমূর্তির মত
খালি পায়ে মাঝে মাঝে হাত পা নেড়ে চলেছে ! গলার
হুমান-মার্কী তক্তাটি মাঝে মাঝে হুলছে।

মুখুযো ম'শায় আশ্চর্য্য হয়ে উঠেন, গোপীপুরের
জগৎম্পের দল...ছোট তরকের দলে বাজাচ্ছে। তাঁর সারা
শরীরের শিরায় শিরায় বয়ে যায় বিদ্যুৎপ্রবাহ। মাথায়
যেন সব রক্তটা উঠে গিয়ে বীরদর্পে নৃত্য শুরু করেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর অজ্ঞাতেই তিনি চীৎকার করে ওঠেন
“তুরগসিং—!” ...নিজে থেকেই আবার চুপ করে যান !...
তাদের দোষ নাই—পুণ্ডার দু'টো দিন তারা বাড়িয়েছে।
পেয়েছে মাত্র সেই একটাকা !...নিজেরই আসে একটা
লজ্জা ! ধীরে ধীরে গিয়ে খাসকামরার ঢুকলেন। এ মুখ
দেখাতেও তাঁর লজ্জা হয় !...

সারা পাড়া কাঁপিয়ে ঠাকুর-বিসর্জনের পূর্ব সারা হ'ল।
সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বিশাল দীঘির নিখর জলে জাগে চাঁদের
উছল স্পর্শ। গিটুলীগাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে
এক ঝলক চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে কর্দ্ধমাক্ত ঘাটের
উপর। শত শত মাহুবেব পদতড়নার ঘাটের ধারে আজ
দধিকর্দ্ধম উৎসব।

দীঘির ঘাট জনশূন্য হয়ে এসেছে। একা দাঁড়িয়ে আছে
রমেশ ! তার চোখে যেন অস্ত্র কোন জগতের ছায়া !
জলের দিকে যেন আধ-ডুগন্ত মূং প্রতিমার দিকে চেয়ে থাকে ;
জলের ধারে চেউয়ের দোলায় ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ডাকের
সাজ মনসা-পাতা...কলা বো-এর সজা দুটো বেগ।

রতন তাগাদা দেয়, “ও বাবা চল গো, আর ঠাকুর
আগবে মা—”

ধমকে ওঠে রমেশ—“খাম না !”

রতন বাক্যব্যয় না করে জলের ধারে ডাকের সাজ
কুড়োতে থাকে।

জনহীন পথদ্বিমে চলেছে মুখুযো বাবুদের প্রতিমা ! রস
বারেন নেহাৎ দায়সারা গোছেয় পিটিং পিটিং করে ঢাকের
কাটিটা ঠুঁকে চলেছে, মুখুযো ম'শায় আসেনি এই প্রাণহীন
শোভাযাত্রায় ! গজারতাবে পায়চারী করে চলেছেন বিম্বৃত
হল-ঘরে, আধ-তাল্পা ঝাড়ের কাঁচের পলাঙলো ম্লান চিম্নীর
আলোর যেন তাঁর দিকে বাজ করছে, হাঁ, সারা ধ্বংসপ্রায়
বাড়ীটা যেন বাজ করছে তাঁকে।

খোকাবাবু প্রতিমার সঙ্গে চলেছেন। তুরগসিং এইবার
মনোমত করে সাজবার সময় পেয়েছে। লাল সালুর
পাগড়ী আর হাঁটু অবধি ঝুল পাঞ্জাবী পরে জুদীর্ঘ একখানা
কাচা বাঁশের লাঠির ডগায় মালবাহী মটরের মত একখানা
লাল কানী বেঁধে চলেছে।

কিন্তু রাত্তর্য লোক কেউ নাই, তবুও ঢাক কাঁশির শব্দ
ভেদ করে মাঝে মাঝে হুকার ছাড়ে ‘এইয়ো-ও-ও’

রমেশ চমকে ওঠে—“খোকাবাবু ?” খোকাবাবু উত্তর
দিলেন না, নীরবে সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ালেন ! তুরগসিং
শূন্য ঘাটের ধারে বার কতক লাল-কানী-বাঁধা লাঠিখানা
ঘুরিয়ে নিয়ে চলে।

রমেশ চীৎকার করে ওঠে—“এই বিটকেলী দেখ ব্যাটা
ছাতুখোরের।”

তুরগসিং লাঠিখানা থামিয়ে হাঁকাচ্ছে। কোন রকমে
প্রতিমাখানা ঠেলে জলে ফেলে দিয়ে তারা আবার ফিরে
চলে বাড়ীর দিকে। রস বারেনের ছেলেটা চোখ বুজে
কাঁসিটায় ঘা দিয়ে চলেছে—

‘ট্যাঁট ট্যাঁট।’

বিরক্ত হয়ে ওঠে রমেশ—“খাম বাপু, সেই যে পঞ্চম দিন
থেকে ‘নাই নাই’ করছিস তোর ‘নাই নাই’-এর ঠেলায় সব
উবে গেল।

ছেলেটা তমে কাঁসি বাজান বন্ধ করে দেয়।

দিন যায় —

শীতের সন্ধ্যা নেমে আসে ধূমাক্ত পল্লী-আকাশ তেজ
করে মৃতপ্রায় ধরণীর বুকে। অন্ধরে গ্রামগ্রামের মাঠে

লগেগেছে রিক্ত ধরণীর স্পর্শ। ধান উঠে গিয়েছে, বাকী রয়েছে
ঠাই ঠাই ছোলা খাসারীর সবুজ স্পর্শ।

আখের ক্ষেতের মাথায় নীচ হয়ে নেমে আসে সন্ধ্যার
গাঢ় কালিমা। সারা বাড়ীখানা নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে
আছে।

ভাঙ্গা পাঁচল, ছাদের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার ধ্বংসপুরীতে
উঁকি মারে সন্ধ্যার আবছা আলো, খিলানের গায়ে পাহারা
দেয় ঝাঁকড়া তেতুল গাছের দল !

...ছাদের উপর এখনও সারি সারি দাঁড়িয়ে হাত-পা-মাথাভাঙ্গা
পরীর দল বিখন্তভাবে আজ পর্য্যন্তও বাড়ীর শ্রীবুদ্ধি করে
চলেছে।

মুর্তিমান প্রহরী রয়েছেন মুখয্যে মশায়, শীর্ণ লম্বা চেহারা।
চোখ দু'টোতে এসেছে কোন অজানা জগতের আলোর স্পর্শ।
খড়মটা শেওলা গড়া ছাতে আঘাত করে প্রাণহীন বাড়ীতে
তোলেন প্রাণের স্পন্দন।

আজ পুণ্যাহর দিন। সারা জমিদারীর সমস্ত প্রজারা
এসে দিয়ে যাবে তাদের খাজনা, কাছারী বাড়ীতে ধূলি-ধূসরিত
ঘর ক'খানা পরিষ্কার করে খাটখানার উপর ফরাস পাতা
হয়েছে। তুরগসিং কোথা থেকে হুঁটো কলার তেউড় এনে
পুঁতে রীতিমত পেয়াদা সেজে তাই পাহারা দিচ্ছে! যে
পাড়ার বদমাঠস ছেলে, এন্টুনি গাছকে গাছ সাঁকাই করে
দেবে।

রমেশ গোটা হুঁএক তাকিয়া এনে সামনে রেখে দিয়েছে
একখানা বড় রেকাবী।

মুখয্যে ম'শায় পিতলের রেকাবীখানা দেখে নাক
সিটকান। তাঁর পিতা-পিতামহের সময়ে ওখানে বসত
নহবৎ, আজ যেখানে তুরগসিং কলাগাছ আগলান্নে ঐখানে।
বাড়ীর বাইরে দেবদারু ডাল দিয়ে সাজান হুঁত। রাত্রিতে
ঝাড় লষ্ঠনের আলোতে সারা বাড়ী ঝকঝক করত। আর
আজ।

রমেশ ভাড়াভাড়ি করে কোথা থেকে একখানা ধোয়ান
তোয়ালে দিয়ে রেকাবীখানা ঢেকে ফেলে—এইবার বুঝুক
ও কিসের, চাঁদির না রূপার?

কিন্তু এত চেষ্টা সব কিছু বিফল হয়ে গেল। কেবলমাত্র
কর্তার আমলের গাবেক মহাল ধরমপুরের হুঁ চারজন

এসেছিল। আর বড় একটা কেউ আসবে না! প্রজা
সমস্ত ত' আর নাই।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সারা বাড়ীটা নীরবে চেয়ে থাকে
সন্ধ্যা-আকাশের দিকে। প্রাণহীন প্রতিমার মত বসে
রয়েছে রমেশ, কলাগাছ পাহারা দিয়ে চলেছে তখনও
তুরগসিং, অবশ্য খোলা চোখে নয়, ত্যাং-এর দরবার ঝিমিয়ে
পড়েছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে উঠে যান মুখয্যে মশার বাড়ীর ছাতে।
সারা পৃথিবী আজ স্থপ্তিমগ্ন।

রমেশের চমক ভাজে ছোট তরফের ঢোল-কাঁসির শব্দে,
আজ তাদেরও উৎসব। প্রজাদি'কে একসরা করে কচুরি
সিদ্ধাড়া মিহিদানা দেওয়া হচ্ছে! ও চত্বরটা ভরে গেছে
তাদের কোলাহলে।

সামনের রেকাবীর দিকে চাইতেই রমেশের চোখের
সামনে ফুটে ওঠে কয়েকটা মাত্র আধূলি আর হুঁটো টাকা!

বিরক্তিতে হাতের কাছে ধামায় রাখা গুড়ের পাটালি-
গুলো উঠানের দিকে পেংটি কুকুরগুলোর দিকে ছুড়তে
থাকে লে লে পেরজা দি'কে আর দরকার নাই, তুরাই
খা—

চোখ বুজে ছড়াতে থাকে পাটালীগুলোকে; হুঁ একটা
পাটালীর গুড়ো তুরগসিং-এর গায়ে লাগতেই সে চমকে
উঠে পড়ে, “এইরো—উল্লুক! বাচ্চা!” লাঠিখানা হাতে
নিয়ে গজরাতে থাকে! তার দোষ নাই! পাড়ার
ছেলেগুলো তাকে প্রায়ই আলাতন করে! কিন্তু আসল
কারণটা দেখতে পেয়েই ছুটে এসে বারান্দার উপরকার
পাটালীগুলো কুড়িয়ে মুখে পুরতে থাকে...গজার ধারের
ভিখিরীর মত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে।

অমেন্ত গাছকোমর করে গাড়ী থেকে কলাই নামাচ্ছে।
রতনও বা পারছে করছে। কয়েক বিঘা মাত্র জমি, তাই
ভাগীদের দিয়ে চাষ করিয়ে চারুট ধান কলাই পাকড় হয়,
আর অমেন্তর গতর-খাটুনিতে চলে যায় সংসার কোন রকমে!
রমেশের সঙ্গে বাড়ীর কোন সন্ধক নাই, দিনের মধ্যে বার
হুঁয়েক আসে খেতে। বাসু, সারাদিন পড়ে থাকে
ঐখানেই।

যা হেলেকে গাড়ী থেকে কলাইগুলো নামাতে দেখে
ভাগীদার নিঃশব্দে বলে ওঠে, “ওগো মিতেন, তুমিই লেগেছ,

মিতে কোথা ?” হাসতে থাকে গৌকের ফাঁকে ফাঁকে !
অমেষ্ট কাপড়খানা ঠিক করতে করতে অব্যব দেয়, “কে জানে
বাপু কোথায় ? মরদ মানুষ চরে খায় ত ; তুমি কি বলে
যাও মিতেনকে কোথা গেছ ।”

নিয়ামুদ্দি একটু এগিয়ে এসে নিজেই গাড়ী থেকে
কলাইএর বোকাগুলো নামাতে থাকে, গায়ে গা ঠেকে যেতেই
হেসে ফেলে অমেষ্ট !

নিয়ামুদ্দি প্রায় সব কলাইগুলো নামিয়ে দেয় ! “ও কি
গো, তোমার ভাগ যে কম হ’ল ?”

অমেষ্টর কথায় হেসে ফেলে নিয়ামুদ্দি সলজ্জ হাসি !

লাল পিটুলীজমা দাঁত ক’টা বের হয়ে আসে ; গরু
হ’টোকে গাড়ীতে জুড়তে জুড়তে বলে ওঠে, “লাও গো
মিতেন, তুমি লিলে কি কমে বাবে ?”

নিয়ামুদ্দির মনটা হয়ে যায় অনেকপানি হাল্কা—অমেষ্টর
হাসি তখনও মুখ থেকে মুছে যায় নি ! পিছন ফিরে চাইতে
চাইতে গাড়িটা চালিয়ে যায় !

রমেশের অবস্থাটা দেখলে কেউই হাসি চাপতে পারবে
না ! বিরাট ঢোল-কোম্পানী মার্কী একটা সাবেকী কোট
গায়ে ! কোটখানা নাকি খাস-বিলেজী, বড়বাবু সেবার
শীতের সময় দিয়েছিলেন রমেশকে । যা গরম, সারাদিন গা
শুন শুন করে ! এ হেন কোট কি না বিশ্বাস-ঘাতকতা করে
বসে ! ছই বিশাল পকেট বোঝাই করে নিয়েছে নোতুন
বুটের ডাল—

চুপি চুপি বাড়ী থেকে বাইরে বাবে, হঠাৎ অমেষ্টর
গলার শব্দে সচকিত হয়ে ছুটেতে থাকে ! হাতের কাজ ফেলে
য়েখে অমেষ্টও ছোটো তার পিছু পিছু ।

হু’পুয়ের রোদ অলস শয়ন বিছায় জোড়া আমগাছের
সবুজ পাতায় । শ্রামপুত্রের ঘাটে হু’একজন লোক রান
করছিল, সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ! কিছুদূর অবধি
তাড়া করে’ এসে আর পারে না অমেষ্ট । রমেশ তখন
নাগালের বাইরে ভীত কাতর চাউনিতে পিছুপানে চাইছে,
আবার শুরু করে ছুট ।

কোটের একটা পকেটের সেলাই থুলে ফাঁক হয়ে ছিল,
জানে না রমেশ ! ছোঁলার ভালগুলো দিব্যি পড়ে আসছে,
তারই জন্ত অমেষ্টর ঘোড়দোড় ! অমেষ্ট তখনও থামেনি,

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ নেড়ে চলেছে, “খাওয়ার এইবার ।
আখার তলের ছাই যদি পাতগোড়ায় না গিই, আমি এক
বাপের বিটা লই ।”

যার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা, সে তখন মুখুজ্যে বাড়ীর
ভাণ্ডারে ! মাটির সরাতে অবশিষ্ট ডাল ক’টা রাখতে রাখতে
হাঁক ছাড়ছে ।

বিরজি ধরে যার ঠাকুরবাড়ীর কি মানদার । আজ
পঁচিশ বছর থেকে সে চাকরী করে আসছে, কিন্তু এমন
অবস্থার পড়েনি । গজগজ করতে থাকে—“আমার পাওনা
মিটিয়ে দেক, আমি আর খাটতে পারব ।”

তার দোষ নাই, আগেতে মাইনে ঠিক মত পেত না বটে,
কিন্তু উম্মুল করে নিত চাল ডাল তেলে । আর সে উপায়
নাই, বাধ্য হয়েই পথ দেখতে চায় ।

রমেশ খাঁটি কথার মানুষ, বলে বসে—“আর কেনে পোষাবে
গো—সুখের পায়রা তোমরা, যেদিন থেকে তিন সেরের
জায়গায় তিন পোয়া হ’ল, রাতে ঠাকুরের লুচির জায়গায়
কুটী হল, সেই দিনই বুঝলাম মাসীর ভাত উঠল এবারে ।”

মানদা ফৌস করে ওঠে, “আমার ত মাগে রোজগার
করে না বাছা, নিজের রোজগারে পেট পোরাতে হয় ?

উত্তরের আশায় না থেকে গজ গজ করে চলে গেল
মানদা ।

নিজস্ব বাড়ীটাতে নেমে আসে দিনের বিলীয়মান সূর্যের
ছায়াবেশা, স্বপ্নপুরীর মত এ জগতের ধরাছোঁয়ার বাঃরে !
জাঁকাবাকা তেলেপড়া দেওয়ালের পাশ দিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন
পিচ্ছিল পথে প্রবেশ করে না ঐ আগাছার জল ঠেলে এ
জগতের পরিবর্তন ।

ছাতের মাথায় হলদে রোদ ক্রমবিলীয়মান হয়ে মুছে
নিঃশেষ হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে, জনমানবহীন ধ্বংসপুরীতে নেমে
আসে সন্ধ্যার অন্ধকার ! সারা বাড়ীতে বিরাজ করে অথও
নীরবতা । সব্বাই ঘন হৃত ।

সুদীর্ঘ হলধরখানাতে জলে ওঠে হুহ শেজের আলো,
কাচের আধারটার মধ্যে জলে ভীষণ চকিত চাহনিতে একটা
মোমবাতি কল্পিত শিখার । ফরাসের উপর পায়চারী করে
চলেছেন মুখুজ্যে মশায় ! খড়মের বন ঘন শব্দে ঘরখানা

সুখরিত। চোখে মুখে কুটে উঠেছে তাঁর উত্তেজনার ছায়া, পদশব্দেই তা বোঝা যায়।

রমেশ গামছাখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে অকারণে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে ওঠে, “আমিই বলেছিলাম থোকাবাবুর চাকরী না হয়ে যায় না, তিন তিনটে পাশ, এমন মাণিকের টুকরা ছেলে, হাজার হোক মুখুজ্যে-বংশের ছেলে—”

তার কথা শেষ না হতেই ধমক দিয়ে ওঠেন মুখুজ্যে মশায়, “খাম! মুখুজ্যে বংশের ছেলে আজ পর্যন্ত কেউ চাকরী করতে যায়নি—কেন জমিদারী দেখতে পারত না? এই বাড়ী এ সব দেখবে কে? চাকরী?”

গম্ভীর ভাবে পারচারী করতে থাকেন মুখুজ্যে মশায়। থোকা তাঁরই সম্মান, আজ পরের চাকরী করতে যাচ্ছে। আর তাই কিনা জোর গলায় জানায় বাবাকে। আগন্তুক জানায় এই বাড়ী—ধ্বংসপ্রায় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ছেলের বাসায় থাকতে।

...রাগে গুঞ্জে কাঁপতে থাকেন মুখুজ্যে মশায়... ছোট তরক, রায় বাবুরা সবাই জানবে তাঁর এ অপমানের কাহিনী। কাদের বাড়ীতে খাটত আমলা, নায়েব, তাদেরই ছেলে বাবে চাকরী করতে!...

...সারা ঘরখানায় তিনি মত্ত বিক্রমে পারচারী করে চলেছেন। সারি সারি বড় তৈলচিত্র তাঁরই পূর্ব-পুরুষদের...। সকলেই আজ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে... সে আজ... বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতক!!

...নীরবতা ভঙ্গ করে তিনি চীৎকার করে ওঠেন।

“টেলিগ্রাফ করে দাও, রমেশ, তাকে চাকরী ছাড়তে হবে—ছাড়তে হবে। আমি মরে গেলে সে বা খুসী করুক, আমি দেখব না, দেখতে আসব না...।

কথা শেষ হতে না হতেই তিনি এগিয়ে গেলেন খাস কামরার দিকে।...সারা শরীরে আজ নৃত্য করে তাঁর সেই আদিম সামন্ত-রক্ত। শিরায় শিরায় যেন বয়ে যায়—বিদ্রোহপ্রবাহ।

বহু দিনের বন্ধ কাচের আলমারীটা খুলতে থাকেন। এম অর্থ জানে রমেশ। এখন হুজ্ব হবে... উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। রুদ্ধকণ্ঠে, চীৎকার করে ওঠে—“বড়বাবু বড়বাবু!!”

মুখুজ্যে মশায় কোন কথায় কান দেন না। তিনি আজ লক্ষ্যের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে!...

কঠিন স্বরে ধমক ওঠেন, “এই চূপ কর।”... তাঁর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে রমেশ, ...মনে পড়ে সেই আগেকার যুগের কথা—প্রথম সে যখন এসেছিল এ বাড়ীতে। সারা রাত্রি চলত বোতলের পর বোতল... আর বড় হলটা হয়ে উঠত ও পাড়ার বেনেদের অচলার লীলা-নিকেতন।

...গ্রামের মধ্যে... অন্ধপ্রকাশ ভাবে সম্ভ্রান্ত মহলে বে দেহ বেগাতি করত, সেই অচলা আজও বেঁচে আছে।...

চোখের সামনে ভূত দেখলেও অতখানি আশ্চর্য্য হ’ত না রমেশ। তুরগসিং দরজার কাছ থেকে একটা সেলাম করে, সরে গেল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শোনা যায় তার পদশব্দ...।

...হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই অচলা... দেহে বয়সের ছোঁয়া এসেছে, তবুও অমলিন করে দিতে পারেনি তাকে, তার হাসিকে!... ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বড় বাবুর দিকে...।

...বড় বাবুর কোনদিকে নজর নেই, বহুদিন পরে আবার হাতে বোতল পেয়ে সব ভুলে গেছেন!... মাসটা হাত থেকে নামিয়ে চীৎকার করে ওঠেন—“আমি মরি, তারপর—সে বা খুসী করবে।... আমি দেখব না, দেখতে আসব না।—

রমেশ তখন এসে পড়েছে বাইরে... হলের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়ায় অন্ধকারের মধ্যে।...

কানে আসে বড় বাবুর অটহাসি, বোধ হয় অচলাকে দেখেই—হাঃ হাঃ হাঃ...।

একটা ঠিক পৈশাচিক শব্দ...। সারা মৃত পুঁথীটাকে সচকিত করে তোলে...। পুরোনো খামের আড়ালে কবুতর-দম্পতি ওঠে শিউরে...।

অন্ধকার পুরীর মধ্যে পথ হারিয়ে হাসিটা যেন ঘুরে বেড়ায় গুর আনাচে-কানাচে...। থমথমে অন্ধকারে শিউরে ওঠে রমেশ!...

তবু লাগে। ঘন-তমসাবৃত বাড়ীটা থেকে শত শত বাহু যেন তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার কণ্ঠ রোধ করে দিতে চায়...। তাকে নিঃশেষ করে দিতে চায় এই অতৃপ্ত আত্মগুলো। যারা তৃপ্ত হয়নি, কোন দিন হবে না!...

অনাগত কালেও যারা তৃপ্ত হবে না... সারা গায়ে ঘাম দিয়ে ওঠে রমেশের... স্রুতপদে সিঁড়িটা থেকে নামতে থাকে...।

বাংলা সাহিত্য উপভাস-শিল্প

ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ

প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপভাস লিখলেও কোনো কোনো লেখক এ কথাটি স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে, বাংলা সাহিত্যে উপভাস সৃষ্টির জন্ম শ্রেষ্ঠ প্রাশংসার জ্যোতিষ দাবীদার হচ্ছেন 'নব বাবু বিলাস'ের লেখক। কিন্তু এক্ষেপ মত খুব বুদ্ধিসঙ্গত নয়। অঙ্কিত চরিত্রগুলি ও তাদের কার্যকলাপ কথাবস্তুর (plot) মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণনা করা এবং চরিত্রগুলির কথোপকথনের দ্বারা সুস্বাদু ভাবে ছুটিয়ে তোলাট হচ্ছে উপভাসের উদ্দেশ্য। কাজেই দেখা যায় উপভাসের মোটামুটি চারটি অঙ্গ :—(১) চরিত্র-চিত্রণ, (২) বর্ণনা, (৩) বয়োজ্ঞি বা সংলাপ, (৪) এ তিনটি পদার্থের যথাযোগ্য সমাবেশ। এ চারটির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ চরিত্রাঙ্কণ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগেও কিছু পরিমাণে বর্তমান ছিল। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু, দত্ত, দুর্জলা দাসী, ফুল্লরা এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী আদি চরিত্রাঙ্কণের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নলিখিত নয়। কাজেই 'নববাবুবিলাস' বাবু চরিত্রের যে নক্সা দেখতে পাওয়া যায়, তাকে নব উদ্ভাবনের গৌরব দান করলে অজ্ঞান হবে। শেষোক্ত বইতে কিছু কিছু সরস বর্ণনা আছে, এটুকুই এর কৃতিত্ব। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার গদ্যের সঙ্গে পঙ্ক্তির মিশ্রণ ঘটিয়েও লেখক উপভাস হিসাবে এর প্রবন্ধ-গৌরব নষ্ট করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও গল্প পদ্ধতি মিশ্রিত চম্পূকাব্য আছে বটে, তবে সে সব কখনও প্রথম শ্রেণীর রচনা বলে গণ্য হয় নি। উপভাসে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের জন্ত যে কথাবার্তার ভাব্য প্রয়োজন, তার প্রথম নমুনা প্রকাশ করেন উইলিয়াম কেরী তাঁর সঙ্কলিত কথোপকথনে, কিন্তু এ বইকে উপভাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এতে কোনো গল্পবস্ত্র নেই। নানা বিষয়ের কথোপকথনগুলিকে সমসাময়িক সমাজ চিত্রের ছোট ছোট নক্সা বলে গণ্য করা যায় মাত্র। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' উপভাস রচনার যে আদর্শ প্রবর্তন করলেন, তার মধ্যে উপভাসের চারটি মুখ্য অঙ্গই অল্প বিস্তর বর্তমান। এ জন্তই বরং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপভাসিকের গৌরব দান করে গেছেন। চরিত্র সৃষ্টি ব্যাপারে নতুন উদ্ভাবক না

হয়েও তাঁর সৃষ্ট ছোটবড় চরিত্রগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের জন্ত প্যারীচাঁদ বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 'আলালে' কোনো জীচরিত্র তেমন ভালো ক'রে কোটে নি, কিন্তু এ জন্ত প্যারীচাঁদকে দাবী না ক'রে সমসাময়িক সমাজকেই দাবী করা উচিত। 'আলালে'র অন্তর্গত সংলাপগুলি চরিত্র বিকাশের অঙ্গ হিসেবে বিশেষ উপযোগী, তবে কখনও কখনও উপদেশকথার কিঞ্চিৎ বাহুল্য বশত একটু নীরস হয়েছে। মাঝে মাঝে 'নববাবু বিলাস'ের ধরণে ছোট পদ্ম বর্ণনা থাকারও বইখানি একটু অন্তত হয়ে পড়েছে। তবু সব দিক থেকে দেখলে উপভাস হিসাবে 'আলালে'র প্রশংসাই করতে হয়।

কলিকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের তৎকালীন বাঙালী সমাজের যে নানা সরস প্রাঞ্জল ও টিটলিখিতবৎ বর্ণনার 'আলাল' পরিপূর্ণ, তৎপূর্বে রচিত কোনো বাংলা গ্রন্থে সে সকলের সন্ধান মেলে না। এ গ্রন্থে বুদ্ধিগত বিস্তৃতি ও লক্ষ্য করবার মতো। 'নববাবুবিলাস' একবারে নগণ্য রচনা না হলেও এতে ছিল নিতান্ত কদম্ব কচির পরিচয়। এদিক দিয়েও প্যারীচাঁদ নতুন আদর্শের প্রবর্তন করলেন। তিনি 'বৎকিঞ্চিৎ' এবং 'অভেনী' নামক যে দু'টি উপদেশাত্মক আখ্যান লিখেছিলেন, সে দুটিও উপদেশ কথার বাহুল্য বশত, সুন্দর বর্ণনা এবং সংলাপ থাকা সত্ত্বেও উপভাসের পর্যায়ের দাঁড়াতে পারে নি।

প্যারীচাঁদের 'আলাল'কে সর্বপ্রথম লিখিত বাংলা উপভাস বলা গেলেও এ-বইতে কোন উচ্চশ্রেণীর মুখ্য চরিত্র আখ্যান বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা পর্যায়কে ঐক্যদান করে নি। সেদিক দিয়ে 'আলাল'কে শিথিল ভাবে গ্রহিত কতকগুলি নক্সার সমষ্টি বলে মনে হয়। তবু তাঁর এই পরীক্ষামূলক গ্রন্থ যে বাংলা সাহিত্যে উপভাস রচনার পথকে খুব সুগম করেছিল, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এ পথে অগ্রসর হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভাশূণে কৃতিত্বলাভ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত প্রথম উপভাস Rajmohon's Wife শিল্পকৌশলের দিক দিয়ে আলালের বেশী ওপরে যেতে পারে নি। ইংরেজীতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিম প্রবর্তিত উপভাস

শিল্পের আলোচনার এ বইটিকে বাদ দেওয়া চলে না। গঠন-কলার দিক দিয়ে বইখানি বড়ই কাঁচা। এর পাত্র-পাত্রী-গুলি পুতুলের মতো নির্জীবপ্রায়; কারো ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য-বেশ নেই; আখ্যানে বারো একবার সাধু হিসাবে দেখা দিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত অটল অচল সাধুত্বের ছবি; আর যাদের প্রথম সাক্ষাৎ পাই দুর্কর্ম্যার মূর্তিতে, তারা উত্তরোত্তর পাপের পথেই অগ্রসর। এক্ষণে একটানা ভালো বা মন্দ চরিত্র আঁকার কলে গল্পাংশে নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসখানি নিতান্ত অঙ্গহীন হয়ে ছিল। উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য যথাযুক্ত পটভূমিকার আশ্রয়ে আখ্যানগত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাপর্যায়ের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্ভবকে প্রকাশ করা। এ ছুটি জিনিষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসে একেবারে অমুপস্থিত। এ গ্রন্থের আর এক দোষ এই যে, এতেও ‘আলালে’রই মতো এমন কোনো মুখ্য চরিত্র নেই যে বর্ণিত ঘটনা নিচয়কে ঐক্য দান করেছে। সাময়িক পত্রিকায় গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত এর গুণাগুণ বুঝতে পেরে ছিলেন। তাই তিনি একে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি।

সে যাই হোক, এ পরীক্ষামূলক লেখাটি সাফল্যলাভ না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তারপরে যে কয়খানি উপন্যাস ক্রমাগত লিখলেন তার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অতাবনী পরিণতি ঘটল। তাঁর কোনো কোনো বইতে গঠনগত সামান্য ত্রুটি থাকলেও উপন্যাসশিল্পের মূলতত্ত্বগুলি তাঁর বইগুলিতে প্রায় নিঃশেষে দৃষ্টান্ত লাভ করেছে। এ বিষয়টি বুঝতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানবস্তুর নির্বাচন সম্বন্ধে ক্রটি আলোচনার দরকার। কোনো কোনো লেখক এ নির্বাচনের মধ্যে বঙ্কিমের শ্রেণীগত মনোবৃত্তি ও পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ খেলা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে এ রকম ধারণার সমর্থন করা যায় না। ‘আনন্দমঠ’ ‘দেবী চৌধুরাণী’ ‘সীতারাম’ আদি প্রচারমূলক উপন্যাসগুলির কথা বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানভাবে ছিলেন সাহিত্যে শিল্পী। তিনি তাঁর সময়ের প্রতাবশালী শ্রেণীর বাঙালী হলেও তাঁর উৎকট শ্রেণীগত অভিমান ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাক্কা দশদশদশ উত্তর মনোভাবই ছিল তাঁর মধ্যে

ক্রিয়ামূল। চরিত্র চিত্রণে ও আখ্যানবস্তুর সংগঠনে যদি কোনো প্রতাব তাঁর রচনার কাজ করে থাকে, তবে সে হচ্ছে তাঁর সহজাত শিল্পীমূলত দৃষ্টি।

চরিত্র চিত্রণ উপন্যাসের এক প্রধান অঙ্গ। যে সকল নরনারীর সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার কাহিনীকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচিত হবে, তাদের জীবন্ত রূপে চিত্রিত করা লেখকের অবশ্য কর্তব্য। এ জীবন্ত চরিত্রের অর্থ এই যে, প্রত্যেক চরিত্র তার নিজের দেশ ও কালের পক্ষে এবং সাধারণ মনুষ্য চরিত্রের হিসাবে স্বাভাবিক হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই রাজা রাজোড়া, ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মাঝ থেকে পাত্র-পাত্রী কল্পনা করেছেন, তার মূলে ছিল স্বাভাবিকতার দাবী। প্রত্যেক সার্থক উপন্যাসেই দেখা যায় যে, এমন দুয়েকটি পাত্র-পাত্রী আছেন যাদের চরিত্রের গতি ও বিকাশ বহুমুখী এবং জটিল। বঙ্কিম যে সময় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখনকার বাঙালী সমাজে ও চরিত্রে সবেমাত্র বৈচিত্র্য বিকশিত হতে শুরু করেছে। সে বিকাশ তখনো সম্পূর্ণ হবার বিলম্ব ছিল। নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ব্যক্তি তখনো সমাজের অঙ্গভায়ে দুর্নিবার নিয়ম শৃঙ্খলা থেকে স্বাধীনতা পায় নি; কাজেই তেমন সমাজের প্রাণীদের নিয়ে জীবন্ত চরিত্র আঁকা একটু দুঃসাধ্য ছিল। এ দুঃসাহস্য আবার বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছিল নারী চরিত্র অঙ্গণে। উপন্যাসের এক মুখ্য উপজীব্য নরনারীর ভালবাসা। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এই ভালবাসার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে কোনো নারিকার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার এক বিষম বাধা ছিল; কারণ, একান্ত দরিদ্র ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নারিগণ নিজেদের জীবন-সংগ্রামে ও সমাজের চাপে প্রায় ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। সমাজের চাপ ধনী সম্প্রদায়ের উপরও খুব কম ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সময় সময় অর্থ বলের মহিমা যে সামাজিক বাধাকে অতিক্রম বা অগ্রাহ করেছে, তার দৃষ্টান্ত বিশেষ বিরল নয়। এজন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকটা বাধা হয়েছেই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝ থেকে নিজ উপন্যাসের পাত্রপাত্রী বাছিতে হয়েছে। প্রাচীন কালে যৌন বিবাহ ও গাংকরী বিবাহের কথা শুনেও পাওয়া গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবাহপূর্ব বা বিবাহ-

বহির্ভূত প্রেম এ দেশের সমাজে অত্যন্ত নিদারুণ ছিল। কিন্তু বিবাহ-সিদ্ধ প্রেম আদর্শ হিসেবে বতাই ভালো হোক, তাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে নাটক উপন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র স্বভাবাঙ্গুণ চরিত্র সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। মানুষের অন্তরে যে দুর্নিবার প্রবৃত্তি নিচয় আছে, সেগুলির গতি বহুধা বিচিত্র আর সমাজ শাসনেরও বিধিনিষেধের প্রকৃতিই হচ্ছে ঐ গতিকের বাধা দেওয়া। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব কোনো সমাজের শক্তি যদি নিরন্তর জন্মী হয়, তবে সে সমাজের কোনো নরনারীর জীবন নিয়ে সৃষ্ট নাটক বা উপন্যাস হয়ে ওঠে নিত্যন্ত একঘেয়ে ও অস্বাভাবিক। সংস্কৃত নাটকগুলির অধিকাংশই এর প্রধান দৃষ্টান্ত। স্বাভাবিক কারণে তাতে নরনারীর চরিত্রগত বৈচিত্র্য সুলভ নয়। কাজেই সার্বক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতি সাবধানে পাত্রপাত্রী নির্বাচন করতে হয়েছে। তখনকার সমাজে কেন পূর্ববর্তী দু'পাচশ বছরের মধ্যেও বাংলা দেশের সনাতন-প্রথা নিয়ন্ত্রিত সমাজে উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার মত প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যা খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করলেন তিলোত্তমার। এর জননী ছিলেন স্বীয় মাতার অর্ধেক সন্তান। বীরেন্দ্রসিংহ স্বেচ্ছাচারী সমৃদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন বলেই তিলোত্তমার মাতাকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। এরকম দম্পতির সন্তান বলেই তিলোত্তমা প্রাপ্তযৌবনা হয়েও কুমারী থাকতে পেরেছিলেন। জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর প্রণয়কাহিনীকে বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে স্বাভাবিক করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে এত কল্পনা বাহুল্য করতে হয়েছিল। তিলোত্তমার বিমাতা বিমলাও ছিলেন নিজ মাতার অর্ধেক সন্তান। এজন্য তাকে প্রগলভারূপে আঁকা হলেও তার চিত্র নারীত্বের আদর্শ সঘনো সমসাময়িক পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে আঘাত করে নি বা অস্বাভাবিক বিবেচিত হয় নি। আয়েসা পাঠান রাজের নিত্যন্ত আদরের মেয়ে, তাই তার আচরণের স্বাধীনতাকে খুব সম্ভবপর মনে না হলেও অস্বাভাবিক মনে হয় না।

পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকা লোকসমাজ থেকে দূরবর্তী স্থলে কেবল প্রৌঢ় বয়স্ক ছুটি লোকের মধ্যে পালিত; তাই তার উপন্যাস-কথিত যৌবনাবস্থা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে কোনো অসম্ভাবতা দেখা দেয় নি। ধর্ম-

ভ্রষ্টা মতিবিবিকে দিল্লীর রক্তমহলের আশ্রয়ে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র তার চরিত্রের উপন্যাস বর্ণিত বিকাশকে স্বাভাবিক করেছেন। যুগলিনী বাংলার মেয়েই নন এবং একালেরও নন। তাই তাঁর স্বাধীন প্রেম অস্বাভাবিক লাগে না। আর পদ্মপতি মনোরমার যে প্রেম তা প্রথমত বিধি বহির্ভূত হলেও গ্রহকার হজনের বিবাহের রহস্য উদ্ঘাটন করে সে বিষয়ে দৃষ্টিকটুতা আরোপের সম্ভাবনা দূর করেছেন। এরকম 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' আদি উপন্যাসগুলির সমালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাপ্তযৌবনা রমণীকে তিনি যে যে ব্যয়গায় আখ্যানবস্তুতে প্রবেশ করিয়েছেন সেখানেই তারা, হয় ভিন্ন দেশের নয় ভিন্ন কালের, নয়তো দুইই, অথবা তারা দৈব হর্ষিপাকে বা দুর্ভাগ্যের জন্ত সমাজভ্রষ্টা।

'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি যে সব উপন্যাসে বঙ্কিম প্রায় সমসাময়িক বাঙালী সমাজের ছবি এঁকেছেন, সেখানেও অত্যাবশ্যক প্রাপ্তযৌবনা নারীচরিত্র-গুলির—যাদের দ্বারা আখ্যানের ঘটনাবলি অপরিহার্য রূপে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—যৌবনাবস্থা কল্পনার বেলায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন, কুন্দনন্দিনী ভাগ্যদোষে যৌবনে মাতা পিতাহারা ও বালবিধবা, ইন্দিরা পিতার আর্থিক দত্তবশত দীর্ঘকাল বিরহিণী ও পিজালয়বাসিনী; রজনী দরিদ্র ও জন্মাক, রোহিণী ও হীরা দরিদ্র গৃহস্থ-কন্যা, বালবিধবা ও উপযুক্ত অভিভাবকহীন, এসব কারণে যৌবন সমাগমে এদের স্বসমাজচলিত প্রেমোন্মত্ততার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

যথোপযুক্ত বয়সের পরেই লোকের চরিত্রকে বৈচিত্র্য দান করতে পারে তার শিক্ষা-দীক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখন এ-দেশে সবে মাত্র স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। কোনও প্রকারের অল্প-বিস্তর শিক্ষা পেয়েছে এমন নারী তখনও নিত্যন্ত জলন্ত। তাই 'বিষবৃক্ষ'র সুধা-মুখী ও কমলমণির বেলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে মিস্ টেম্পল নারী যেম শিক্ষয়িত্রীর অবতারণা করতে হয়েছিল। রজনী জন্মাক বলে লেখাপড়ার অভ্যাস, সাধারণ চিঠিপত্র লেখার বেশি বিভা যে ভ্রমের ছিল তা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়লে মনে হয় না। রোহিণী বা হীরা নিয়ন্ত্রণের চরিত্ররূপে কল্পিত, কাজেই

তাদের শিক্ষার কথা ছেড়ে দেওয়া যায়। এই যে সমস্ত চরিত্রের কথা বলা গেল, তাদের মধ্যে সূর্যাসুখী ও কমলমণির চরিত্র সব চেয়ে উজ্জ্বল ও মহিমাময়। সমসাময়িক সমাজে এরকম চরিত্র সৃষ্টির উপাদান সুলভ ছিল না বলেই বঙ্কিম-চন্দ্র বাংলার ও ভারতের অতীত ইতিহাসের ভেতর থেকে ও সেট সঙ্গে রাজপুতানার এবং উত্তর-ভারতের মোগল রাজ-অস্ত্রপুরাদিতে পাত্রপাত্রীর কল্পনা করে গেছেন। নিজের দেশ কাল থেকে দূরে অবস্থিত বলে এসব চরিত্রের স্বাভাবিকতার দাবী খানিকটা গোণ হ'য়ে পড়েছে। যে দেশ বা কাল সম্বন্ধে পাঠকদের তথ্য লেখকের জ্ঞান সুপরিষ্কৃত বা সম্পূর্ণ নয়, সে দেশ-কালের কোনো অবস্থা বা চরিত্রকে নিত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কারণ অল্পই ঘটতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র পাত্রপাত্রীদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁর প্রচারমূলক উপন্যাসগুলি বাদ দিলে তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রকে অস্বাভাবিকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এ গুণটির পরে উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। কোনো কোনো উপন্যাসে বা তার অংশ বিশেষে তিনি নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কৃষ্ণ-কান্তের উইলে'র দ্বিতীয়ার্দ্ধ, 'চন্দ্রশেখরে'র প্রথমার্ধ, 'সীতারামে'র প্রথমার্ধ, 'কপালকুণ্ডলা' এ বিষয়ে প্রমাণ।

আখ্যান বিকাশের এ পদ্ধতিটিকে বলা হয় নাটকীয় কৌশল। কারণ নাটক রচনার সময়ে গ্রন্থকারকে থাকতে হবে কাহিনী থেকে দূরে প্রচ্ছন্নভাবে। অথচ চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি এমন সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হবে যাতে তাদের ওপর আরোপিত উজ্জ্বল প্রতীকগুলিতে তাদের অন্তরের গোপন তথ্য বেশ সহজেই প্রকাশ পাবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এ কৌশলটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করলেও তা খুব তেমন সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে যে যে অংশে চরিত্র বিকাশের নাটকীয় পন্থা অনুসরণ করেছেন—তা বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র এ পন্থা খুব সফল ভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি—বাদও সে চেষ্টা করে-ছিলেন। আবার 'কপালকুণ্ডলা'র ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথমার্দ্ধে বঙ্কিম বেশ সার্থক ভাবে নাটকীয় কৌশলের সঙ্গে

চরিত্রগুলিকে ফুটিয়েছেন। 'সীতারাম' উপন্যাসের একাংশও এ নাটকীয় কৌশলে রচিত। কোনও সমালোচকের মতে এ বইখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আখ্যান বিকাশ ব্যাপারে নাটকীয় কৌশলের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও উপন্যাসে তাকে একান্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, আর বাহ্যনীয়ও নয়। এমন অনেক ক্ষেত্রে আছে যেখানে পাত্র পাত্রীদের নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব বা কার্যকলাপের বাস্তবতা তাদের কথাবার্তায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। সে সকল ক্ষেত্রে লেখককে সর্বজন্য রূপে সে সব বর্ণনার ব্যবস্থা করতে হয়। আর কোনো কোনো জায়গায় ঘটনা বিশেষ সম্বন্ধে সুবিবেচিত মন্তব্য ও বর্ণিত কাহিনী সম্বন্ধে পাঠকের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উপন্যাস লেখককে সাবধানে নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বর্ণনার কাজ চালাতে হয়। 'সুগালিনী' উপন্যাসের তুর্কী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের বর্ণনা গ্রন্থকারের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইতিহাস এ সম্বন্ধে যে আবিষ্কাশ কাহিনীর উল্লেখ করে গেছে, বাঙালীর পৌরুষ বজায় রেখে তিনি তার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এ জাতীয় প্রয়োগে তাঁকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর বলে সমস্ত আখ্যানটিকে ও তার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিকে ফোটাতে হয়েছিল। নিজাম ধর্মের ও অমুশলনতন্ত্রের বিগ্রহ হিসেবেই তিনি এঁকেছিলেন প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণীর চরিত্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এ উপন্যাসের মধ্যে অকুণ্ঠিত ভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে হয়েছে। এগুলি ছাড়াও প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যে এখানে সেখানে তিনি পাত্রপাত্রীদের কার্যকলাপাদি সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো মন্তব্য করেছেন যা উপাখ্যানের উপাদেশতা বাড়াবার সাহায্য করেছে। এরকম মন্তব্যই কিয়দংশে উপন্যাসকে তার বৈশিষ্ট্য দান করে। পূর্বোক্ত ছুটি ছাড়াও আখ্যান বিকাশের এক তৃতীয় পদ্ধতি আছে। সে হচ্ছে আখ্যানের অন্তর্গত পাত্রপাত্রী বিশেষের দৃষ্টিতে অপরোপার পাত্রপাত্রীর কার্যকলাপকে দেখা। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষার্ধ্বে আখ্যানটিকে প্রায়শঃ বিমলার দৃষ্টিতেই দেখেছেন, আর 'আনন্দমঠে' তিনি কাহিনীটিকে দেখেছেন তাঁর কাম্রত মহাপুরুষের দৃষ্টি দিয়ে। আখ্যান বিকাশের তিনটি পন্থা অনুসরণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র

কোনো উপন্যাসে কোনোটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেন নি। তাতে তাঁর উপন্যাসগুলি গঠনবৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খুব মনোজ্ঞ হয়েছে।

নিজ রচনাকে বৈচিত্র্য দান করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র আরও নানা কৌশল আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর কতকগুলি উপন্যাসে (যেমন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিদ্যুবন্ধ, চন্দ্রশেখর, রজনী ও রাজসিংহ) গল্পাংশ আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও ঘটনা পর্যায়ের সমবায়ের তৈরী, কিন্তু তাঁর শিল্পকৌশলে এ বিচ্ছিন্নতাও ঐক্য লাভ করেছে। ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে বিমলা ও আয়েষার মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু উভয়ের সঙ্গে পরিচিত জগৎসিংহ এ দুই নারীকে উপাখ্যানগত ঐক্যে আবদ্ধ করেছেন। ‘কপালকুণ্ডলা’রও নান্দিকা এবং মতিবিব পরস্পরের থেকে নানা বিষয়ে একান্ত পৃথক হয়েও নবকুমারের সম্পর্কে একত্রে মিলেছেন। ‘বিদ্যুবন্ধে’ নগেন্দ্রনাথ ও হীরা এ দুজনের নানাদিক থেকে প্রভেদ সত্ত্বেও এক দিক দিয়ে তাদের এ সাদৃশ্য ছিল যে তারা উভয়েই প্রেমের তাড়নায় আস্বাহার। এ উগ্র প্রেমতৃষ্ণাই তাদের একত্রে বেঁধেছিল কুলনন্দিনীরূপ স্ত্রীর সাহায্যে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও দুটি কাহিনীকে একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর এক দিকে আছে প্রতাপ-শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের আখ্যান, অপরদিকে আছে দলনী গুরগণ মীরকাশিমের কাহিনী ও তদাভিযুক্ত নবাব ও হংগেরজের লড়াই। এ শেষোক্ত কাহিনীর যুদ্ধ ব্যাপারই দুটি আখ্যানকে একত্র করেছে। রজনী এবং রাজসিংহও এরকম কৌশলের পরিচয় আছে।

চরিত্র-চিত্রণ ও আখ্যান বিজ্ঞানের কৌশল আলোচনার পরে দৃষ্টি দিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আনুযায়িক দেশকালের বর্ণনার ওপর। এ বর্ণনা যথোচিতভাবে করা হলেই আখ্যান বস্তুর কাঠামোটি এবং বর্ণিত চরিত্রগুলি জীবন্তবৎ প্রতিভা

হয়, আর সমগ্র আখ্যানের বিশ্বাস্যতা যথোচিত রূপ লাভ করে। একরূপ বিশ্বাস্যতার ফলে উপন্যাস বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে সজ্জন পাঠকগণ এক সমপ্রাপ্ততা অনুভব করেন, যার দ্বারা রসানুভব সহজ হয়ে আসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিদ্যুবন্ধ আদি উপন্যাসের আরম্ভ ভাগের বর্ণনাগুলি মনে করা যেতে পারে। গ্রন্থগুলির অভ্যন্তর ভাগেও একরূপ বর্ণনার অসম্ভাব নেই। ‘কপালকুণ্ডলা’র সমুদ্রতটে নারিকার বর্ণনা, ‘দেবী চৌধুরাণী’তে ত্রিশ্রোতার কূলে জ্যোৎস্না রাতে সখীসহিত নারিকার বর্ণনা (২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) এ কথার উত্তম দৃষ্টান্ত। এ সকল স্থলে বঙ্কিমের গল্প কাব্যের পর্যায়ের উন্নীত হয়েছে এবং তার ফলে সমগ্র আখ্যানবস্তু এক অপূর্ব রসৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ রসকে মাঝে মাঝে নিজ ব্যক্তিগত চিন্তার দ্বারা অধুষিত করে আরো অপরূপ করে তুলেছেন। সীতারাম উপন্যাসের উদয়গিরি ললিতাগিরি বর্ণনা (১ম খণ্ড ১৩ শ পরিচ্ছেদ) এর দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু স্থানে স্থানে দেশকালের নানা সূক্ষ্ম বর্ণনায় সমৃদ্ধ হলেও বঙ্কিমের উপন্যাস গুলি কখনো অতি বৃহৎ হয়ে ওঠে নি। এদিক দিয়ে তাঁর গুরু স্থানীয় Walter Scott-এর চেয়ে তিনি বেশি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাজ্ঞান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বঙ্কিমের সংলাপ রচনাও চিত্তাকর্ষক এবং কৌশলপূর্ণ। তাঁর এ গুণগণনা সহজেই চোখে পড়ে, তাই এখানে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হন না। চরিত্র চিত্রণ, আখ্যান বিজ্ঞান আদির সুকৌশলের সঙ্গে এ গুণটি থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত বাংলা উপন্যাস শিল্পের আদর্শ অতুলনীয়। একজোই বাংলা উপন্যাসশিল্পে তাঁর দান চিরস্মরণীয়। পরবর্তী শক্তিমান লেখকরাও অনবিস্তর তাঁর পথেই চলেছেন।



ন-১ ও কক্ষ

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(পাঁচ)

হঠেলে ফিরে বিকাশ সসঙ্কোচে তার ঘরের জানালাটা খুলে একবার ভয়ে ভয়ে চাইলো সেই বস্তুর দিকে ।

ভয়ে ভয়েই— কেন না যদিও সে অনেকটা বিশ্বাস ক'রে— ছিল যে, তার সেদিনকার অপকীর্তির কথা কিছু প্রকাশ হয় নি, তবু একটু ভয় ছিল। চাই-কি তাকে আবার সেদিকে চাইতে দেখলেই হয়তো স্বামীটির রাগ চড়ে যাবে এবং নালিশ না করুক অন্ততঃ নেপথ্যে ছুঁটো গালি-গালাজ করতে পারে। কেন না সে স্বকর্ণে যা শুনেছিল, তাতে তার সন্দেহ ছিল না যে, স্বামীটি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, 'ছোটেলের বাবুদের' সঙ্গে তার জীবন ইয়াকি চলে এবং এতটা এগিয়েছে তাদের ভাব যে, বাবুরা টাকা ছুঁড়ে দেয়। হয় তো টাকাটা পেয়ে সে কমা ক'রে গেছে শুধু সেবারের জন্ত, কিংবা হয় তো বা ওৎ পেতে ব'সে আছে যে একবার হাতে-নাতে ধ'রে তবে ঘা' কষবার ক'রবে ।

ভয় ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু দেখবার কোডুচলেরও সীমা ছিল না তাই সে সসঙ্কোচে জানালাটা খুলে একবার তাকাল ।

যা' দেখলো তাতে প্রথমেই তার ঘাম দিয়ে জর ছাড়লো ।

সে পরিবার আর সেখানে নেই—ঘরটা খালি প'ড়ে র'য়েছে। সেখানে এসে হৈ-টৈ ক'রছে বুড়ী একটা—এ বস্তুর বাড়ীওয়ালী। এমন বাঁজখাই গলায় সে বুড়ী সহজ কথা কয় যে, হঠেলের তেতলা ভেঙে তার সেই গলাই অনেক উচ্ছে ওঠে। এখন তো সে প্রাণপণে চীৎকার ক'রছে আর লাফাচ্ছে !

তার সঙ্গে একটু পরে যোগ দিল এসে সেই কাবলী-ওয়ালী। তার গলা, বাড়ীওয়ালীর পাশে হৃদয়ঙ্গম হ'লেও তার মিহিঙ্গুরের ঝাঁক ঝাঁক কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট ।

এদের বাগ্‌বাছলের সার বোঝা গেল এই যে, ভাড়াটেটি সস্ত্রীক নিঃশব্দে সটকে পড়েছে কাল রাত্রে। আগা সাহেব আরও জানালেন যে কাল তার আফিসে হপ্তা পাবার দিন শুনে আফিসে গিয়ে শুনে এসেছে যে সেখান থেকেও সে

সটকেছে—ক'লকাতার বাইরে'না কি কোথায় একটা ভাল কাজ পেয়ে সে পালিয়েছে—কিন্তু ঠিকানা রেখে যাওয়া আবশ্যক মনে করে নি ।

মনের বোঝা নেমে গেল। এখন বিকাশের মনে হ'ল যে এদের দারিদ্র্য ও অভাবের কথা শুনে সে এদের যতটা অসহায় ভেবেছিল, তা তারা মোটেই নয়। দেনার দায়ে গিল্লীর নোলক বাঁধা থাকতে পারে, কিন্তু কাবুলী ও বাড়ী-ওয়ালীর কাছে যে দেনা, যার কতকটা শোধ ক'রে দেবার জন্ত একটা অর্ধফুট কল্লনা একবার বিকাশের মনে এসেছিল, সে দেনার ভার থেকে মুক্ত হবার জন্ত তাদের, বিকাশের বা আর কারও উদারতার অপেক্ষা ক'রতে হয়নি। তার চেয়ে সহজ পথে মুক্তি পেয়েছে তারা ফাঁকি দিয়ে। বাহুল্য লট-বহর ছিল না এ পরিবারের—প্রধান লগেজের মধ্যে তিনটি বাচ্চা। তাদের নিয়ে নিঃশব্দে রাত্রে অন্ধকারে সরে প'ড়ে তারা সহজেই পঞ্চাশ-ষাট টাকা ফাঁকি দিয়েছে। ঋণমুক্ত হবার এই সহজ উপায় বিকাশের মাথায় আসে নি। এ বিত্তা যার জানা আছে তার অর্থকষ্ট হবার কোনও কথা নয় ।

যা'ক, একটা দারুণ জ্বাংগন থেকে যেন জেগে উঠলো বিকাশ। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়কে পায়ের জোরে পরাভূত করে আসবার আনন্দ ও গৌরবটা এ কয়দিন বিকাশ ভাল ক'রে উপভোগ ক'রে উঠতে পারে নি—আবার এই পরিবারকে নিয়ে কি ক্যাসাদে সে প'ড়বে তারই কল্পনার। এখন সে-আনন্দটা সে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রতে লাগলো ।

মাসিমা ও মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে সে এখনো যায় নি। ভারী সঙ্কোচ হ'চ্ছিল তার। তাদের ভোলাবার মত একটা বেশ লাগসই কাহিনী সে এখনও রচনা ক'রে উঠতে পারে নি। তার লগাই ভয় হয় যে, ফটু করে আবার কি নতুন গল্প সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে স্বন্দ-বুদ্ধি মেসোমশায়ের কাছে ধরা প'ড়ে যাবে। তাই বা কিছু সে রচে—তার স্মৃতিস্মরণ বিশ্লেষণ করে সে—আর দেখতে পায় যে, সব রচনার মধ্যেই কোথাও না কোথাও ধরা পড়বার মত ফাঁক র'য়ে গেছে ।

শেষ পর্যন্ত অনেক সুসাবিধা ক'রে সে মেসোমশায়কে

লিখে জানালে যে তার শরীর খারাপের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। সে দিন খেলায় একটা ভুল করবার পর হৃদযন্ত্রের nervous breakdown এর লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। তার ক'দিন পরেই কাশীতে খেলতে হবে, সেই জন্য সে কয়েকদিন চরিত্রের গিয়ে nerveটা একটু ছরস্ট ক'রে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাকে কিছুতে ছাড়লে না ব'লে তার সোজা কাশীতেই যেতে হ'ল। যা' হ'ক সে ফিরে এসে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ ক'রছে এবং প্রাণেপাণে পড়াশুনা ক'রছে। কলেজ ছুটি হ'লেই শ্রীচরণ দর্শন ক'রতে যাবে।

প্রাণপণ করে সে পড়তে পারছিল না মোটেই। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা, এর ভিতর সে যা দেখেছে ও যা অনুভব ক'রছে, তাতে তার মনের ভিতর এমন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিল যে, পড়ায় সে কিছুতেই মন দিতে পারতো না। পড়ায় বই হাতে ক'রে সে বসে থাকতো সর্বক্ষণ, কিন্তু প'ড়তো না, ভাবতো ব'সে।

অতাবের সঙ্গে সংকিশ্ণ হ'লেও খুব নিবিড় পরিচয় হ'য়ে গেছে তার—চাক্ষুষ এবং ঔদরিক।

নীচে বস্তীর যে শ্রমিক পরিবারের চাক্ষুষ পরিচয় সে পেয়েছে, তা' থেকে কল্পনাযোগে সে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে। ঐ শ্রমিকটি যখন আফিসে বের হয়, তখন সে ফরসা কাপড়, রঙিন সার্ট প'ড়ে কুচকুচে চুল চকচকে ক'রে মচ্ মচ্ করে জুতোর আওয়াজ ক'রে পান চিবোতে চিবোতে চ'লে যায়—যে কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। সেই চক্-চকে আবরণের তলায় যে অভাব, তার পরিচয় পেয়েছে বিকাশ। ছেঁড়া ছাকরা প'রে থাকে ঘরের ভিতর স্বামী-স্ত্রী; খাবার জোটাতেই এত হিম্‌সিম্‌ থেয়ে যায় যে, এক পয়সার এক খুঁটি চায়ের জন্ত নোলক বাঁধা রাখতে হয়। তাও কাবলী ওয়ালার কাছে ধার হয়, বাড়ীওয়ালীর ছ'মাসের ঘর-তাড়া বাকী থাকে। ফাঁকি দেবার মহাবিজ্ঞা আরম্ভ না থাকলে তার যে বাঁচাই দায় হ'ত।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে বিকাশের মনে হ'ত—এই যে জৌলুসভরা শহর, আকাশ কোড়া এর সব প্রাসাদ, এর বুকের ভিতর কত লক্ষ লোক না জানি এমনি অভাবে নিপীড়িত হ'য়ে এমনি নানা কিকির ক'রে অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে শুধু বেঁচে আছে। সকাল আটটা থেকে দশটা আর বিকেল

পাঁচটার পর যে বিপুল জনস্রোত আফিস পাড়ায় হন্ হন্ ক'রে যাতায়াত করে, তাদের চেহারা হোক না হয় তো চক্-চকে, তাদের পেটের ভিতর যে কতখানি খালি আছে, দেনার বোঝা ঘাড়ের কত চেপে আছে, কে জানে? হয় তো বা এদের ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ নারী হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এদের ঠাঁট বজায় রাখছে অভুক্ত জঠরের জালা জোর ক'রে চেপে।

সে জালা যে কী—তা সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছে শুধু একবেলার অর্ধাহারে। সেদিন সে হুটো ছাত্তুগড় খেয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়েছিল পথে। হু'এক মাইল যেতে না যেতে—সে কী আঁকু পাকু। কয়েক আনা পয়সা সঞ্চল নিয়ে তখন সে দেখেছিল অনাহারের বীতংস মূর্তি—কেবল তাগ্য-ক্রমে দাঁড়িয়ে গেল সেটা শুধু কল্পনা!

তার কাছে যেটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নিছক কল্পনা, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে সেটা নির্দ্বন্দ্ব চিরন্তন সত্য। অথচ এদেরই পাশে, হাজার লোক কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে শুধু ছিনিমিনি খেলছে; বত টাকা পাচ্ছে ততই আরও চাইছে; বিলাসের পর বিলাসের আয়োজন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে, আরও নূতন আয়োজন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে, আরও নূতন আয়োজন এসে আত্মহীন ক'রছে।

এ কী বিসদৃশ ব্যাপার! দারুণ দারিদ্র্যের এই বীতংস মূর্তির পাশে সম্পদের এত প্রচণ্ড দাপট! প্রতিকার নেই কি এর?

বইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হ'ত, কেন প'ড়ছে সে? পাশ ক'রবে, পাশ ক'রে ভাল কাজ ক'রবে, উপার্জন ক'রবে, তত্ৰ ভাবে আরামে থাকবে—হয় তো বড়লোক হবে। কিন্তু তার পাশে পাশে যখন এত অভাব, তখন তার মাঝখানে তার বড়লোক হওয়ার মানে কি? কি অধিকার আছে তার বড়লোক হবার?

এই প্রশ্নে তার মনে হ'ল আজ যে, সে এই ভেতলা হাট্টেলে বাস ক'রে আরাম ক'রে প'ড়ছে—যেখানে হাজার হাজার ছেলে নানা রকম উজ্জ্বলিত ক'রে কোনও মতে তাদের পড়ায় খরচ জোগাড় ক'রছে; এতেই বা তার কি অধিকার? ঐ বস্তী থেকে যে সব গরীব নোংরা ছেলেগুলো বের হয়, তারা পড়ে না, প'ড়তে পার না, কেন না তাদের বাপের টাকা

নেই। বিকাশেরও তো বাপের টাকা নেই। তার বাপ মা-ও তো তাকে একেবারে নিঃস্বনাধ ক'রে রেখে শিশু-কালে বিদায় নিয়েছিলেন। বিকাশ যে তবু ভদ্রলোকের মত আশ্রয় ক'রে লেখাপড়া শিখে, সে কেবল তার মাসিমার মেহের উপর বাণিজ্য ক'রে। মেসোমশায়ের টাকায় তার কোনও অধিকার নেই, তবু সে তারই বলে আজ ভদ্রলোক, তারই জোরে সে প'ড়ছে। তার নিজস্ব সম্পদে সে ঐ বস্তীর ছেলেদের চেয়ে এক ফোটাও বেশী ধনী নয়।

মেসোমশায়ের এ মেহ ও দয়ার কি প্রতিদান দেবে, সে এই লেখাপড়া শিখে? পড়াশুনায় সে বেশী ভাল নয়। কোনও মতে পাশকোর্সে বি.এ.-টা সে হয় তো পাশ ক'রতে পারবে, কিম্বা হয় তো পারবে না। এর জন্ত মেসো-মশায়ের টাকাগুলো এমনি ক'রে অপব্যয় করবার কি অধিকার আছে তার? যদি সে কৃতি ছাত্র হ'ত, খুব ভাল ভাল ডিগ্রী পেয়ে জীবনে বড় বড় কাজ করবার অধিকার পেতো, তবে বটে এ অর্থব্যয় সে সার্থক ক'রতে পারতো, আর হয় তো বা একদিন তার অর্জিত সম্পদ দিয়ে মেসো-মশায় মাসিমার ঋণ প্রচুর পরিমাণে শোধ ক'রতে পারতো। প'ড়েনে পাশ ক'রে সে ক'রবে হয় তো বিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীগিরী। তাতে কোনও মতে নিজের পেট চা'লিয়ে যেতে পারলেই চের, মাসিমা মেসোমশায়ের কিছু ক'রবে কি?

মনে হ'ত, নাঃ, ফিরে এসে সে ভাল করে নি। পড়া হেড় গিয়েছিল, ভালই ক'রেছিল। তাতে একজামিন পাশ করবার পণ্ডশ্রম করার চাইতে হয় তো ভাল কিছু করতে পারতো সে। অন্ততঃ মেসোমশায়ের টাকার অপব্যয়টা নিবারণ হ'ত।

তার কাণে হঠাৎ ধ্বনিত হ'ল স্নানোদ্যম কথা।—সখের দলদী—হাখাগ! রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো। জাবলে—দেখিয়ে দেবে সে তার জীবন দিয়ে যে সে হাখাগ নয়।

দেখাবে জগৎকে কত দরদ তার প্রাণে আছে—কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে। তার জন্ত বড়লোক তার হ'তে ছয়। বি.-এ.-টা না পাশ ক'রলে মাসিমা ছাড়বেন না, এটাকে কোনও মতে পাড়ি দিয়ে সে প্রাণপণ ক'রে লেগে

বাবে বড় লোক হবার চেষ্টায়। একজন মনোবী ব'লেছেন ক'লকাতার পথেঘাটে বাজারে-বাজারে টাকা ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়। বি.-এ, পরীক্ষাটা দিয়েই সে ক'লকাতার সব পথ ঝেঁটিয়ে বেড়াবে—হ'তে কুড়িয়ে তুলবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! টাকা হ'লে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা হ'লে সে দেখিয়ে দেবে কেমন ক'রে টাকার সম্ভাবহার ক'রতে হয় গরীবের সেবা ক'রে!

কোনও মতে বি.-এ পরীক্ষার দায়টা মিটিয়ে দিয়ে এই টাকা শীকারের খেলার জন্ত সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

ছয়

খয়ের কাগজ বিকাশ পড়ে শুধু স্পোর্টিং-এর খবর দেখবার জন্ত, আর কোনও খবরে তার কোনও আকাজক্ষা থাকে না। একদিন কাগজের এক পৃষ্ঠায় দেখলে খুব বড় বড় অঙ্গরে হেড লাইনে লেখা র'য়েছে যে, ঘোড়দৌড়ে একজন Triple tote-এ এক বাজীতে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেছে। তার মনে হ'ল চটপট বড়লোক হবার এ একটা সহজ উপায়।

একদিন সন্ধ্যাে সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হ'ল গোটা তিরিশেক টাকা জোগাড় করে।

লোকে বলে আনাড়ীর হাতে দান পড়ে ভাল। রেস সম্বন্ধে আনাড়ি হ'য়ে কপাল ঠুঁকে বিকাশ Triple tote-এ যে বাজীটা ধ'রলে, সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে সেই দানে সেই outsider গুলোই সবার আগে উইনিং পোষ্ট পার হ'য়ে গেল। এতে তার সৌভাগ্যের মাত্রা যে কতদূর গেল তা বুঝতে পারলে প্রথম যখন তার টিকিট দাখিল ক'রতেই তাকে এক হাজার টাকার করক'রে নোট দিয়ে দিলে।

আর অপেক্ষা ক'রতে তবু সইল না তার। সে একেবারে লাফাতে শুরু করলে। একটু পরেই সে বের হ'য়ে চ'লে গেল, ফের কোনও বাজী ধরবার কথাও তার মনে হ'ল না।

নাচতে নাচতে ফিরবার পথে সে দেখতে পেল ময়দানের একটা নির্জন জায়গায় ব'সে একটা লোক কেবলি মাথা চাপড়াচ্ছে ব'সে। কাছে গিয়ে দেখলে—একি! সেই মজুরটি, যে তার ঘরের নীচে বস্তীতে বাস ক'রতো।

তার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাস ক'রলে, "কি হয়েছে তোমার?"

লোকটা বললে, “কি আর হবে? আমার মাথাটি খেয়েছি। হায় হায়, এমন ছোড়াটা ধরলুম, সে এমনি ক’রে আমার খনে প্রাণে মারলে গো! হস্তার সব কটা টাকা খেয়ে দিয়েছে। এখন কেমন ক’রে মুখ দেখাব মাগ-ছেলের কাছে! হায়, বিকাশের টাকা পাওয়ার আনন্দটা হঠাৎ চূপসে গেল। টাকাটা নিয়ে যেন সে চুপী ক’রেছে ব’লে মনে হ’ল। কত মুখ দরিদ্র এই লোকটার মত যথাসর্ব্ব পণ ক’রে খেলতে এসেছিল হঠাৎ বড়লোক হবার রত্নিন নেশায় মেতে! কে জানে তার এই হঠাৎ পাওয়া হাজার হাজার টাকার মধ্যে এমনি কত গরীবের বুকের রক্ত ও ক্ষুধার অন্ন আছে।

পথে পাছে পকেট-মারা যায়, এই ভয়ে বিকাশ পকেটে হাত চেপে ছিল। তাতে হাজার টাকার নোটের স্পর্শ তার হাতে প্লকের বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়ে দিচ্ছিল, তার করকরানি ঢেলে দিচ্ছিল কাণে মধুর সঙ্গীত। এখন সে স্পর্শ যেন তাকে পোড়াতে লাগলো, করকরানিতে তার গা শিউরে উঠতে লাগলো।

হন্ হন্ ক’রে মাঠের ভিতর দিয়ে চ’লতে চ’লতে সে ভাবতে লাগলো। এই বেচারী শ্রমিকের অবস্থা যে কি তা’ই জানে। এর আজকের এই দুর্লভের ফল হয় তো সপ্তাহব্যাপী স্নানাহার—না হয় আবার ধার—কাবলীওয়ালার কাছে। ভাবতেই তার হাসি পেল। ভাবলে ধার ক’রবে তাতে এর দুঃখ কি? শোধ তো দেবে না, আবার পালাবে কোন ধারে।

তবু, আজ বিকাশের নিজেরও তো ওই দশা হ’তে পারতো। যে ত্রিশ টাকা সে নিয়ে এসেছিল, তাই ছিল তার এ মাসের খরচার টাকা। এ থেকে কলেজের মাহিনা হাট্টেলের খরচ সব দিতে হবে, যদি এ টাকা খোয়া যেত তবে সে যে কি ক’রতো—তা’ ভাবতে তার ভিন্নমী লেগে গেল।

বাপ! ও পথে আর নয়।

কিন্তু ও বেচারার কি হবে? ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ এসে পড়েছিল সে। হঠাৎ তার মনে হ’ল ‘সখের দয়দী’! বললে, কিছুতেই না। এই হাজার টাকা থেকে ওকে শ’খানেক টাকা দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক’রে গোটা পথটা

সে হেঁটে কিয়ে গেল। ততক্ষণ লোকটা উঠে কোথায় চ’লে গেছে—দেখা গেল না।

এই লোকটার ছরবছা দেখে তার মনে যে মানি হ’য়েছিল, মরদান দিয়ে খানিকটা পথ চ’লতে চ’লতে সেটা মিশিয়ে গেল। পথে দেখলে শিকানবিশ মিলিটারী পুলিসেরা এক ভায়গার ফুটবল খেলছে, একটা সাহেব তাদের খেলা দেখাচ্ছে—রেকারীও ক’রেছে। সে দাঁড়িয়ে গেল। লোকগুলো নেহাৎ আনাড়ী নয়, খেলছে বেশ। দেখে তার আটা লেগে গেল। এক একটা লোকের ভুল দেখে পা ছুটো নিশ-পিশ ক’রতে লাগলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেগা দেখে সে যখন ফিরলো, তখন তার মনের মানির বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে গিয়ে সে বেশ ক’রে খেয়ে-দেয়ে ছুটো বেশ দামী স্নুটের অর্ডার দিয়ে এটা ওটা কিনে প্রায় শ’খানেক টাকা খরচ ক’রে হাট্টেলে ফিরলে।

—সে হাজার টাকার পরবর্ত্তী ইতিহাস সংক্ষেপে ব’লে রাখা যাক। কথাটা প্রকাশ হ’য়ে গেল। কাজেই তার কাছে রোজ ছেলেরা খাওয়া আদায় করে, খিয়েটার দেখে, সিনেমা দেখে। অনেক কিছু চাঁদা দিতে হ’ল তাকে। বেশীর ভাগ টাকাটাই অনেকে নিলে ধার। এমনি ক’রে দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে এ-টাকার প্রায় সবটাই শেষ হ’য়ে গেল। বিকাশ দেখতে পেলে যে হোটেলের যে-সব ছেলেরা মোটা মোটা ধার নিয়েছিল, তাদের সে-টাকা শোধ দেবার গা’ দেখা গেল না। বুঝলে যে, পাওনাদারকে ফাঁকি দেওয়ার বিত্তা কিছু বস্তীবাসীর একচেটে নয়—সবাই এ-বিত্তার উপাসক, কেবল স্বেযোগ পাওয়ার বা অপেক্ষা।

সে সঙ্কল্প ক’রেছিল—টাকা হ’লে সে দরিদ্রসেবায় লাগাবে। কি রকম করে সে কাজটা ক’রবে—তা ভাবতে ভাবতেই এমনি ক’রে টাকাটা ফুঁকে গেল।

সাত

বিকাশের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এক সময় কেশিকের ব্ল। ছেলেদের পড়াশুনার চেয়ে তাদের খেলা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশী। যারা ভাল খেলতে পারে তাদের তিনি ছিলেন মা বাপের চেয়ে বড়। তাই সুবোধ

চ্যাটার্জী ছিল তাঁর নয়নের মণি, তার কথার তিনি উঠতেন বলতেন। বিকাশও খুব প্রিয় পাত্র ছিল।

সুবোধ এম. এ. পরীক্ষা দিতেই প্রিন্সিপাল তাকে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাকরী বোগাড় করে দিলেন। তারপর অবশ্য এম. এ. ফেল ক'রলো। আর বিকাশ যখন বি. এ. দিলে, তিনি তখনই তাকে ডেকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠালেন একটা বড় সওদাগরী অফিসের ছোট সাহেবের কাছে। এই ম্যাকরে সাহেব ক'লকাতার খেলা ধুলার মস্ত বড় পাণ্ডা। এক সময়ে সব খেলাতেই অল্প বিস্তর সুনাম ছিল তাঁর, এখন খেলেন শুধু ক্রিকেট ও টেনিস। ম্যাকরে প্রিন্সিপালের চিঠি পেয়ে বিকাশকে একেবারে দেড়শো টাকা মাইনের একটা চাকরী দিয়ে দিলেন—বল্লেন, অফিস টায়ে তার খেলতেও হবে কিন্তু।

পরীক্ষার কলের তখনও অনেক দেয়ী। বি. এ. পাশ করতে পারবে কি না পারবে সে—তাও বেশ অনিশ্চিত—কল কথা শেষ পর্যন্ত সে ফেলই ক'রেছিল, কিন্তু তার প্রিন্সিপাল ধ'রে ক'রে গ্রেস দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। এখনি সে এমন একটা ভাল চাকরী পেয়ে গেল যা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীর পেনে ভাগ্য মানতো। উল্লাসে তার প্রাণ মেতে উঠলো।

মাসে দেড়শো টাকা। তার কাছে তখন কুবেরের ঐশ্বর্য্য! এ-নিষে যে সে কি ক'রবে, তার অনেক রকম সুসারিদা ক'রতে লাগলো। তা' বলে এখন তার একশো টাকার বেশী কিছুতেই লাগবে না। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোনও রকম দরিদ্রের সেবার লাগাবে। জসসেবার যে মহাসঙ্কল্প সে ক'রেছিল কানীর পথে, সেটা তার মনে তখন বেশ জল্জল্ ক'রছে। প্রথম মাসের মাহিরানার সবটা টাকাই সে মাসীমাকে দেবে। তাঁদের মেহ ও কৰুণার ঋণ তো ভুললে চলবে না।

মাস কাবার হ'তেই দু'দিনের ছুটি নিয়ে সে গেল মাসির কাছে রাঁচী। সেখানে তার মেসো হরিনাথবাবু ছিলেন বড় উকীল।

হরিনাথ বাবুর রোজগার প্রচুর কিন্তু তিনি ধনী নন।

তাঁর পরিবার, ব'লতে গেলে কিছুই নয়। ছেলে নেই, ছুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, বড়টি ছুটি ছেলে-মেয়ে রেখে

মারা গেছে, তারা এখানেই মাহুয হচ্ছে, ভামাই আবার বিয়ে-খা' ক'রে সংসারী। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বড় লোকের ঘরে, তার স্বস্তর এখনও দিবা জল জ্বলাট হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু বড় ছেলে বেঁচে থাকতে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই নিঃসন্তান বিধবা বউয়ের স্বস্তরঘরে স্থান নেই। সে বাপের ঘরে ফিরে এসে বোনের ছেলে মেয়ে নিয়ে আছে।

এ ছাড়া, বিকাশ আছে, হরিনাথ বাবুর ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অনেক দিন ছিলেনও, তার ছুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। বড় ছেলে অনন্ত বি-এ পাশ করতে না পেরে তার বদলে বিয়ে করেছে, তাঁর ছেলে-পিলেও হ'য়েছে। তার পেশা এখন এই পরিবারের ম্যানেজারী এবং প্রচুর বাবুগিরি। রাঁচী সহরে হরিনাথ বাবুর চেয়ে তাঁর ভাইপো অনন্তর দপ-দপানি ঢের বেশী।

আর আছে হরিনাথ বাবুর মুহুরী, তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আরও গণ্ডাখানেক হরেক রকমের লোক—যারা এখানে ছোট খাটো কাজকর্ম করে, আর হরিনাথ বাবুর অল্প ধ্বংস করে।

অপুত্রক হরিনাথ বাবুর এই বিপুল পরিবারে মাহুয হ'য়েছে বিকাশ ঠিক ছেলেরই মত। কিন্তু হরিনাথ বাবু ও তাঁর স্ত্রীর বিকাশের বিষয়ে যে কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল তা নয়। এ বাড়ীতে যে কেউ থাকে সেই যেন বাড়ীর ছেলে। শুধু খাওয়া পরা পায় এমন নয়, যখন যা খুসী চাইলেই পায়, না চেয়েও পায়।

হরিনাথ বাবু রোজগার ক'রেই খালাস। খরচ করবার তার ঘরে তাঁর স্ত্রী অল্পপুঁর, আর বাটরে অনন্তের। এরা দু'জনেই খরচে একেবারে যুক্তহস্ত। কেউ কিছু না চাইতে দেওয়ার মস্ত আনন্দ অল্পপুঁর। ঘরে যখন যার যা দরকার বা দরকার নেই, অল্পপুঁর আগে থেকে তা তাকে গছিয়ে দেন। আর পরিবারের বাইরে দেশে বিদেশে যে আনে, যে আত্মীয় স্বজন আছে সবারই সত্য বা কল্পিত প্রয়োজনের জন্য রোজই তিনি পাঠান টাকা। আর লোক-জনকে খাওয়ানটা তাঁর ব্যাধি বিশেষ।

সবাই বলে অল্পপুঁর সাক্ষাৎ মা অল্পপুঁর। দেবীর দানের জোগান দেন স্বয়ং বক্ষরাজ সুবের, মাহুযীর জোগান-

দায় মাহুব হরিদাথ এই বা তফাত। এ তফাতটা যে গুরুতর কিছু সে জান হ'তে অনেকদিন দেয়ী হ'য়েছিল।

বিকাশ সেই তার প্রথম মাসের মাইনের গোটা টাকাটা তার মাসীর পারের কাছে রেখে তাঁকে প্রণাম করলে। মাসী আশীর্বাদ ক'রে টাকাগুলো তুলে নিলেন।

মেসো হেসে বল্লেন, “বা রে, সব ঠুকে দিলে, আমি একেবারে ফাঁকী।

এ কথা বিকাশ তারী লজ্জা পেলো। তখন মনে স্থির ক'রলে পরের মাসের মাইনে থেকে একশো টাকা তার মেসোকে দেবে, কিন্তু তখনকার মত একটা উপস্থিত জবাব দিলে, “আপনার ও টাকার সমুদ্রে আমার এ এক ঘটি জল যে দেখাই যেতো না মেসো মশায়।”

মেসো মশায় তার পিঠ চাপড়ে বল্লেন, “বেশ! বেশ!”

মাসী বল্লেন, “আহা! তোমাকে টাকা দিয়ে কিই বা হ'ত, তুমি তো সেই আমাকেই দিতে।”

“বটে।” ব'লে মেসোমশায় হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন।

তারপর তার মাসতুত খোনের ছটি ছেলেমেয়ে অমল ও শ্রামলী এসে তাকে ধ'রলে, “মামা, চাকরী পেলে, আমাদের কিছু দিলে না?” বিকাশ ভাবলে, অজ্ঞায় হ'য়ে গেছে, এদের ভয় কিছু জানা উচিত ছিল। সে তাদের হাতে চুটো সিকি দিয়ে বল্লেন, “এখন এই নে, আবার বখন আসবে। তখন জিনিষ আনবে।”

তাঁথে বল্লেন, “মামা, আমাকে একটা ভাল রাকেট আর একটা হকি ষ্টিক দেবেন।”

বিকাশ বল্লেন, “নরপাং মাতুল ক্রমঃ, দেবো রে দেবো।”

শ্রামলী বল্লেন, “আমাকে একটা Badminton set দেবে।”

বিকাশ প্রতিশ্রুত হ'ল।

অনন্ত বললে, “বিকাশ, তুমি এলে, আগে যদি জানাতে আমার একখানা ভাল রাগ আর সোয়েটারের দরকার ছিল। বাক গে, এবার তো হ'ল না, সামনের মাসে নিয়ে এসো। বাজে জিনিষ এনো না, বুঝলে।” চুটো খুব দামী মার্কীর নাম ক'রে বললে, সেই জিনিষ চাই। বিকাশ এবারে চট ক'রে হ'ল বলতে পারলে না। তার টাকার উপর দাবীর

পরিমাণ যেভাবে বেড়ে বেতে লাগলো, তাতে মনে হ'ল বেড়শো টাকা মাইনের কুলিয়ে ওঠা বাবে না। সে শুধু ঘাড় নেড়ে স'য়ে গেল।

অনন্তের ছোট ভাই বসন্ত খুসী হ'য়ে বিকাশের কাছে এসে দাঁড়াল, বললে, “হাঁ বিকাশ দা', এবার তুমি গীজে খেলবে, না?”

হেসে বিকাশ বললে, “হাঁ তাই।”

বসন্ত যেন আল্লাদে নেচে উঠলো। সে বললে, “বিকাশ দা, Statesman-এ তোমার খেলার কথা কি লিখেছে দেখেছ? এবারকার ফুটবল লীগনের Summaryতে।”

“না তাই, দেখিনি তো।”

“লিখেছে, গোলকীপারের মধ্যে সবচেয়ে ভাল'র মধ্যে একজন তুমি, যদিও তুমি জুনিয়র কম্পিটিশনে খেল। লেখক আশা করেন যে, আগামী বারে তুমি ফাউ' ক্লাশ ফুটবলে খেলে তোমার প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় দিতে পারবে।—কি গ্রাণ্ড! না বিকাশ দা?”

বিকাশ তারী খুসী হ'ল বসন্তের এই সগর্ভ আনন্দ দেখে। বললে, “আজ্ঞা গ্রাণ্ড তো আমি হ'লাম, তুমি কি? কেমন খেলছো এখন?”

“আমি!—দাদার ভাই আমি, এই বলে সবাই!” ব'লে একটু সলজ্জ ভাবে হাসলে আর তার খেলার মেডাল এনে দেখালে।

আনন্দে বিকাশ তার পিঠটা খুব জোরে চাপড়ে দিলে।

গীতা—বসন্তের বড় বোন চুপ চাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকাশ বললে, কিরে গীতা, তোর খবর কি?

তুইও কিছু বাহাদুরী ক'রেছিস নাকি?”

গীতা একটু হেসে ব'লে, “হাঁ, ক'রেছি বই কি?—চর্করী রাঁখতে শিখেছি।”

“সে তো অনেক দিনই জানিস তুট। বাস পাতা আর খুলোর কত চর্করী খেয়েছি তোর।”

বসন্ত বললে, “ঈস্ বিনয় হ'চ্ছে! চর্করী শিখেছেন! কেন সেদিন যে পোলাও কালিয়া চপ কাটশেট ক'রে নেমস্তয় খাওয়ালি। সত্যি বিকাশ দা', ও তারী রান্না শিখেছে। আর দেখবেন”, বলে সে ছুটে একখানা বই এনে দেখালে।

সেটা প্রাইভেটের বই। গীতা সেকেন্ড ক্লাশ থেকে কাট'হ'য়ে
এই প্রাইভেট পেয়েছে, তাতে তাই লেখা আছে।

গীতা ২সস্তের গালে মাংসে এক চড়।

বিকাশ বললে, “ওরে বাপরে! এত বিজ্ঞের বোঝা বইতে
পারবি? না বইয়ের জন্তে একটা মুটে জোগাড় ক'রে
দেবো?”

গীতা বললে, “বইতে না পারি তুমি ব'য়ে দেবে।”

বসন্ত বা গীতা কেউ কিছু চায় নি, কিন্তু বিকাশ
মনে মনে স্থির করলে, তাদের দুজনকেই বেশ ভাল প্রেক্ষেপট
দিতে হবে।

মনে মনে একটা হিসেব ক'রে দেখলে যে এদের সবাইকে
মন খুসী ক'রে দিতে হ'লে আড়াই শো টাকার কম
হবে না। তার মানে ছ' মাসের মাইনে থেকে জমিয়ে
টাকাটা করতে হবে। স্থির ক'রলে এর পর আসবে
ছ'মাস বাপে।

বাড়ীর লোকের সঙ্গে সন্তোষনের পর বিকাশ একবার
সহর ঘুরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল। ফিরতে
সন্ধ্যা হ'ল।

বাড়ীতে উঠেই একটা বারান্দা, তারপরই हरिनाथ বাবুর
বৈঠকখানা।

বৈঠকখানা বা বারান্দায় আলো জ্বলছে না দেখে বিকাশ
একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেল। हरिनाथ বাবুর এতটুকু ঘর কখনও
শুষ্ক বা অন্ধকার থাকতো না আগে সন্ধ্যাবেলায়। বেদীন
মজল না থাকে সেদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে মজলিস। হাসি গল্পে
স্থানটি মুখর হ'য়ে উঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পার হ'য়ে বিকাশ বৈঠকখানার
সুইচ টিপে দিলে। আলো জ্বলতেই সে দেখতে পেলো
ঘরটি শুষ্ক নয়, একখানা ইঁজি চেয়ারের উপর অন্ধকারে
গুয়ে আছেন हरिनाथ বাবু নিঃশব্দে।

ব্যস্ত হয়ে বিকাশ গিয়ে বললে, “আপনার কি অসুখ
করেছে মেসোমশায়?”

সোলা হয়ে বসে বিকাশের পিঠে হাত দিয়ে তিনি ভেসে
বললেন, “না বাবা, অসুখ করে নি, কিছু হয় নি, এমনি চুপ
চাপ গুয়ে আছি।”

হেসেই বললেন কথা কয়টা, কিন্তু বিকাশের মনে সে
হাসিটা খুব স্বচ্ছ বা সত্য বলে মনে হ'ল না।

সে আর কিছু না ব'লে অন্যরে গিয়ে মাসিমাকে ধ'রে
বললে, “মাসিমা, মেসোমশায়ের কি হ'য়েছে?”

মাসিমা একটু বিস্মিত, একটু ব্যস্তভাবে বললেন, “কই
কি হ'য়েছে?”

“উনি চুপচাপ ঘর অন্ধকার ক'রে বসে রয়েছেন বৈঠক-
খানায় ইঁজি চেয়ারে।”

“ওঃ! এই! ও অমনি থাকেন উনি আজকাল।
ডাক্তার স্ত্রীকে ব'লে দিয়েছে চোখটাকে বিশ্রাম দিতে তাই।”

“চোখের বিশ্রাম কেন?—অসুখ কিছু হ'য়েছে?”

“অসুখ নয়। কিন্তু বৃড়ো বয়সে রাত্তিরে বেশী পড়লে
যেমন হয়।”

মাসিমার কথায় তার উদ্বেগ কমলেও বিকাশ নিশ্চিন্ত
হ'তে পারলে না। কেন না, সে জানে মাসিমার স্বভাব।
নিরতিশয় ভাল মানুষ তিনি, দয়া ও স্নেহের অবতারণা, কিন্তু
কোনও কিছু বেশী ক'রে গায় মাথা তাঁর অভ্যাস নেই।

हरिनाथ বাবুর বিপুল উপার্জন ছ' হাতে বিতরণ করবার
কাজ তাঁর, তাতে তাঁর আনন্দ এবং তারই উপায় উদ্ভাবন ও
তার ব্যবস্থা করা এই সবই হ'ল তাঁর দিন-রাতের চিন্তা।
সংসারের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তাঁর বিধবা মেয়ে
এবং অনন্তের স্ত্রী, তাদের কেউ নিপুণ গৃহিণী নয়—মাসিমাও
নয়। কিন্তু পুরোণো চাকর বামুন ওস্তাদ ও প্রভুভক্ত, তাই
খাওয়া-পরাইর কাজ বেশ প্রাচুর্য ও তৃপ্তির সঙ্গেই চলে—
তাতে বায় কি হয় না হয় সেটা কারও দেখবার কথা নয়।
কাজেই মাসিমার কোনও কিছুই গায় মাথতে হয়ও না, গায়
মাথেনও না তিনি।

हरिनाथ বাবুর পরিচর্য্যার ভিত্তি একটি পুরাতন হুদুক
চাকর আছে, কাজেই সেদিক দিয়ে মাসিমার একেবারে হাত
পা ধোয়া। চাকর এসে যদি কিছু রিপোর্ট করে, তবে তিনি
জানতে পারেন, हरिनाथ বাবু নিজে কখনও কোনও অত্যা-
জ্ঞবিধা বা অস্বস্তির কথা বলেন না, এবং লোকটি এমন
সুস্থ, এমন ব্যস্ত এবং এত ভাল-ভোলা যে, তাঁর কোনও
অত্যা বা অস্বস্তি হ'লেও চট ক'রে তিনি তা' অস্বস্তি
করেন না, এবং অস্বস্তি করলেও সেটা প্রকাশ করবার কথা
তাঁর মনে থাকে না।

তাই মাসিমার কথায় বিকাশের মন খুব স্থির হ'ল না।
সে ভাবলে, কাল সে ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু পরের দিন নানা গোলমালে ডাক্তারের কাছে
বাওয়া হ'ল না তার, ক'লকাতার দিকে যেতে হ'ল। [সমাপ্ত]

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

এস, ওরাজেন আলি, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

ভিঞ্জার

রাজার রাজ্য যুদ্ধ হয় হোক, তবে জনসাধারণ বাতে সে যুদ্ধের দক্ষতা কতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে আকবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। অনিবার্য যুদ্ধের দক্ষতা কতিগ্রস্ত জমীদার, কৃষক এবং জনসাধারণের ক্ষতি পূরণের সমুচিত ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এক্ষণে ব্যবস্থা তাঁর পূর্বে কিছা পরে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নাই। Col. Mallsen লিখেছেন :—

Averse to war, except for the purpose of completing the edifice he was building, and which, but for such completion, would, he well knew, remain unstable, liable to be overthrown by the first storm, he took care that neither the owners nor the tillers of the soil should be injuriously affected by his own movements, or by the movements of his armies. With the object of carrying out this principle, he ordered that when a particular plot of ground was decided upon as an encampment, orderlies should be posted to protect the cultivated ground in its vicinity. He further appointed assessors whose duty it should be to examine the encamping ground after the army had left it, and to place the amount of any damage done against the government claim for revenue.

আকবর যখন বিজয়বীর গুজরাট অভিযান করেন, তখন শত্রুকে তিনি একান্ত অরক্ষিত এবং অতর্কিত অবস্থায় পেয়েছিলেন। সুসভ্য কোন ইউরোপীয় সেনাপতি হলে শত্রুকে তৎক্ষণাৎ সমুদয় ধ্বংস করতেন। মহামুতব আকবর কিন্তু সেভাবে যুদ্ধ করাকে কাপুরুষোচিত বলেই মনে করতেন। তাঁর আদেশে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শত্রুকে আগ্রত করা হল। যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হতে তাকে সময় দেওয়া হল। ইতিমধ্যে আকবর নদীর অপর পারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শত্রু যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হল। অল্পতক্ষণ বাদশা তখন সন্তরণের সাহায্যে নদী অতিক্রম করে ভীম পরাক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করলেন, আর তার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

তাগ্যান নরপতিরা তাঁদের বিজোহী তাইদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন ইতিহাসপাঠক মাজেই তা জানেন। আকবরের ব্যবহার কিন্তু তাঁর মহেশ্বরই অমূল্য ছিল।

আকবরের তাই মহম্মদ হাকিম মির্জা কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে তিনি তারত আক্রমণ করেন। আকবর তাঁর প্রতিরোধার্থে অগ্রসর হন। হাকিম মির্জা সাহস হারিয়ে কাবুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আকবর বখাসময়ে কাবুলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করেন। বিজোহী প্রাত্যহিক কমা করে পুনরায় তাঁকে তিনি কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে অল্প কোন নরপতি যে কিরূপ ব্যবহার করতেন, তা সহজেই অনুমের।

পরাজিত শত্রুকে দাসে পরিণত করবার এবং তার স্ত্রী-পরিজনদের ভোগ-বিলাসের বস্তুরূপে ব্যবহার করবার যে বর্বর প্রথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছিল, আকবর সে প্রথা সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করেন। কলে শত্রুর আত্মগত্যা লাভ তাঁর পক্ষে একান্ত সহজসাধ্য হয়ে পড়ে।

চূষার

আকবরের অর্ধশতাব্দীব্যাপী শাসনকে ভারতের সুবর্ণ যুগ বললে অতিশয়োক্তি মোটেই হবে না। তিনি দেশে যে সুখ, শান্তি, উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি এনেছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাজা এবং নবাব থেকে কৃষক এবং মজুর পর্যন্ত প্রত্যেক প্রজাই তাঁকে তাদের স্নেহবান্ পিতারূপে দেখতো আর তিনি তাদের নিজের সম্ভান রূপে দেখতেন। তাঁদের সুখকে তিনি নিজের সুখ বলে মনে করতেন, আর তাদের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বলে মনে করতেন। তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠতম পদ সব ধর্মের সব জাতির এবং সব শ্রেণীর লোকের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। প্রত্যেকেই অবাধে তার ধর্ম পালন করতে পারতো। কাউকে তার ধর্মের জন্ত কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হতোনা, কোন ও কর দিতে হতো না। প্রত্যেকের ধর্মের তিনি সম্মান করতেন। প্রত্যেক ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের সমুচিত ব্যবস্থা করতেন। দেশের সাহিত্যের, শিল্পের, কৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্ত সর্বদা তিনি সচেষ্ট থাকতেন। গুণীর সম্মান করতে কখনও তিনি কুণ্ডিত হতেন না। সবল তাঁর রাজ্যে দুর্বলের উপর অত্যাচার

করতে পারতো না। বৈদেশিক শত্রু তাঁর যুগে ভারত আক্রমণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। সুখ আনন্দ এবং শান্তিতে ভারতের লোকেরা তখন জীবন যাপন করতো। Col. Malleon ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলেছেন—

“When we reflect what he did, the age in which he did it, the method he introduced to accomplish it, we are bound to recognise in Akbar one of those illustrious men whom providence sends, in the hour of a nation's trouble, to reconduct it into those paths of peace and toleration which alone can assure the happiness of millions.”

পঞ্চাশ

সাধারণের ধারণা আকবর অশিক্ষিত ছিলেন। প্রশ্ন উঠে, শিক্ষা কাকে বলে? দার্শনিক সংজ্ঞার দিক থেকে দেখতে গেলে, শরীর, মন এবং ভাবের উৎকর্ষ সাধনের নামই হচ্ছে শিক্ষা। দার্শনিক প্লেটো (Plato) ব্যায়াম-চর্চা, গণিতচর্চা এবং সঙ্গীতচর্চাকেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। প্লেটোর পর বহু শতাব্দী অতীত হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা হয়েছে।

তবে প্লেটোর আদর্শ এখনও শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিরূপে অটুট অবস্থায় বর্তমান আছে। বিভিন্ন ব্যায়ামচর্চার সাহায্যে শরীরকে সুস্থ, সবল, মাংসপেশী-বহুল, মেদ-বর্জিত এবং কর্মঠ করে তোলা এখন শিক্ষার অন্ততম আদর্শরূপে সত্য জগতে গণ্য হয়ে থাকে। সে দিক থেকে বিচার করলে, আকবরের দৈহিক শিক্ষা যে আদর্শ রকমের হয়েছিল, আমরা তা পূর্বেই দেখিয়েছি। শক্তি, সামর্থ্য এবং কর্মঠতার দিক থেকে আকবর তাঁর যুগে অতুলনীয় ছিলেন। সঙ্গীত-সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুকুমার ভাবের চর্চা, সুকোমল বৃত্তি-নিচয়ের অন্বেষণ; এদিক থেকেও আকবরের শিক্ষা অতি উচ্চাঙ্গেরই হয়েছিল। তিনি একজন অতি সমজদার সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং বাদকেরা সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন আর তাঁদের সুরধূর সুর-লহরী সর্বদা তাঁর মনকে ভাবের উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে বিচরণ করতে সাহায্য করতো। বাদশা স্বয়ং একজন উচ্চ শ্রেণীর সুর-শিল্পী ছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন—“বাদশা সঙ্গীত

বিভার বিশেষ অমুরাগী, আর সুর-সাধকদের তিনি যথেষ্ট অমুরাগ করেন।” চিত্রশিল্পের প্রতিও আকবরের যথেষ্ট অমুরাগ ছিল এবং বিখ্যাত চিত্রকর আবদুল সামাদের কাছে সবসময় তিনি চিত্রাঙ্কন-বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। স্থাপত্যবিভার প্রতি আকবরের যে বিশেষ অমুরাগ ছিল এবং স্থাপত্য-শিল্পে তিনি যে অতুলনীয় এক স্রষ্টা ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কাব্যের প্রতিও আকবরের অশেষ অমুরাগ ছিল। কাব্যের সাহায্যে তিনি ভাবের চর্চা করতেন। তাঁর রচিত কয়েটি কবিতা এখনও বর্তমান আছে।

এখন গণিতের পর্যায়ে আসা যাক। আকবর যে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁর চিত্তের অবরোধের ব্যবস্থা থেকে স্পষ্টই তা বোঝা যায়। আজীবন তিনি কল-কজা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অনন্তসাধারণ। অনেক রকমের সুক্ষ যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে উচ্চ শ্রেণীর একজন বৈজ্ঞানিক বললে কিছু মাত্র অত্যাুক্ত হবে না। সুতরাং প্লেটোর আদর্শানুযায়ী তিনি একজন অতি উচ্চ-শিক্ষিত লোক ছিলেন।

তবে শিক্ষার একটা সংকীর্ণতর সংজ্ঞাও আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুঁথিগত বিজ্ঞাকেই শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। সে দিক থেকে আকবরের পারদর্শিতা কত দূর ছিল?

ছায়া

আকবর যখন চার বৎসর, চার মাস, চার দিন বয়সে পদার্পণ করেন, পিতা হুমায়ুন তখন তাঁর হাতে-খড়ির ব্যবস্থা করেন। মোল্লা ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তিকে আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। পর পর মোল্লা বায়েজিদ, মোলানা আকুল কাদের প্রভৃতি আকবরকে শিক্ষা দান করেন। তবে আকবর অসাধারণ লোক ছিলেন, সুতরাং সাধারণ ধরণের শিক্ষা-প্রণালী মোটেই তাঁর মনঃপুত হয় নি। বেশীর ভাগ সময় তিনি অখারোহণ, উষ্ট্রারোহণ, কুকুর-পরিচালনা, পায়রা উড়ান প্রভৃতি চিত্তবিনোদক কাজেই অতিবাহিত করতেন। নীরস পড়াশুনার চেয়ে এই সবই তাঁর বেশী ভাল লাগতো। বয়স একটু বেশী হলে পর তিনি “দিওয়ান হাফেজ” প্রভৃতি

কার্ণি কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি শেখ মোবারকের কাছে কিছু আরবীও শিখেছিলেন।

আকবরের প্রকৃত জ্ঞানসুহা জাগে পরিণত বয়সে, বাস্তব জীবনের তাড়নায়। আর প্রয়োজনের অমূরূপ শিক্ষা-লাভের এক অতিনব পন্থাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করার জন্য আকবর কতপুত্র শিকারীর “এবাদতখানায়” বিভিন্ন ধর্মের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা দার্শনিকদের আহ্বান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাঁদের জেরা করেন, তাঁদের সাথে তর্কবিতর্ক করে ধর্ম এবং দর্শন-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের নিগূঢ়তম তত্ত্বের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত হন।

আকবর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন ভাষাবিদ পণ্ডিতদের সাহায্যে। সন্ধ্যার পর পণ্ডিতেরা এসে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যগ্রন্থ আকবরকে পড়ে শুনাতেন। তিনি মনোযোগের সঙ্গে তাঁদের পাঠ শুনতেন, পাঠের বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করেছিলেন। তাঁর বিরাট পুস্তকালয়ের কতক অংশ প্রাসাদের সদর মহলে এবং কতক অংশ অন্তর-মহলে রক্ষিত ছিল। সংগৃহীত পুস্তকাবলী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভ্রমণ, কাব্য, গল্প-সাহিত্য প্রভৃতি। হিন্দী, ফার্সি, কাশ্মীরী, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের বিভিন্ন বিভাগ ছিল। আকবরের আদেশে পণ্ডিতেরা জ্ঞানগর্ভ পুস্তকগুলির আন্তোপাত্ত তাঁকে পড়ে শুনাতেন। পড়া যেখানে স্থগিত রাখা হতো, সেখানে ব্রহ্মত্ব তিনি চিহ্ন দিয়ে রাখতেন, পরদিন আবার সেই চিহ্নিত স্থান থেকে পাঠ আরম্ভ হতো।

এমন কোন বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল না যে, আকবরের কাছে পঠিত হয়নি। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবহার শাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের সঙ্গেই আকবর এইভাবে গভীর পরিচয় লাভ করেন। ঐতিহাসিক বদায়ুনি একবার আকবরের কাছে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার তুল বর্ণনা করেন। আকবর তৎক্ষণাৎ তাঁর ভ্রম সংশোধন করে দেন এবং সেই ঘটনা-সংক্রান্ত অনেক খুঁটিমাটি তথ্যের অবতারণা

করেন। আকবরের ঐতিহাসিক জ্ঞান দেখে বদায়ুনি চমৎকৃত হন। সুকি ভাবমূলক কার্ণি সাহিত্য আকবরের একান্ত প্রিয় ছিল। শেখ সাদীর গুলিস্তা এবং বোস্তা শুনতে তিনি বড় ভাল বাসতেন। জালালুদ্দীন রুমীর মাসনাবী তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে পঠিত হতো। তারপর হাফেজ, খসরু, খাকালী, জামী, আনওয়ারী প্রভৃতি কবিদের রচনা তিনি একান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ফেরদৌসীর মহাগ্রন্থ শাহনামা শুনতেও তিনি বড় ভাল বাসতেন।

সাতার

সুপণ্ডিত অমুবাদকেরা গ্রীক, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার পুস্তকাবলী হিন্দী কিংবা ফার্সি ভাষায় অমুবাদ করতেন আর সেই অমুবাদ নিয়মিতভাবে বাদশাকে পড়ে শুনাতেন। যে সব পুস্তকের অমুবাদ আকবরের আদেশে হয়েছিল তাদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল :

- ১। বজ্রি সিংহাসন বদায়ুনি কর্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।
 - ২। “হারাভুল হারওয়ান” বা প্রাগীত্ব শেখ মোবারক কর্তৃক আরবী হ’তে ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৩। অধর্মবেদ—তাদন নামক ব্রাহ্মণকর্তৃক সংস্কৃত থেকে ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৪। রামায়ণ—পণ্ডিতদের সাহায্যে বদায়ুনি কর্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৫। বাবরের আশ্চরিত—আকবর রহিম কর্তৃক তুর্কি থেকে ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৬। রাজতরঙ্গিনী বা কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত—মোজা শাহ মোহাম্মদ কর্তৃক সংস্কৃত থেকে ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৭। মহাভারত—দেবী ব্রাহ্মণের সাহায্যে ফারজী কর্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৮। নল-দময়ন্তী—ফারজী কর্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।
 - ৯। লীলাবতীর বীজ-গণিত—ফারজী কর্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।
 - ১০। হরিবংশ—মোজা শেরী কর্তৃক ফার্সিতে অনূদিত।
 - ১১। ইউরোপীয় মিশনারীদের সাহায্যে রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস ফার্সি ভাষায় সঙ্কলন করা হয়।
- হিন্দুদের ধর্ম এবং শাস্ত্রের বিষয় অবহিত হবার জন্য আকবর বখাসাধ্য চেষ্টা করতেন। পরবর্ত্তম ব্রাহ্মণের

নিকট এবিষয় তিনি নিয়মিত ভাবে পাঠ গ্রহণ করিতেন। তাছাড়া অস্ত্র পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি নিতেন। বদায়ুনি বলেন, “বাদশা “খাবগাহ” প্রাসাদের গবাক্ষের ধারে বসতেন। মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদক দেবীভ্রামকে একটা চার-পায়ের সাহায্যে গবাক্ষের কাছে তুলে নেওয়া হতো। ভ্রামণ সেই শূত্র অবস্থান করে বাদশাহকে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়, দেবদেবীদের বিষয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা-পদ্ধতির বিষয় বাদশাহকে শিক্ষা দিতেন। তিনি হিন্দু-দের ধর্মের ব্যাখ্যা এবং তাদের ধর্মের পুরাণ, উপাখ্যান প্রভৃতি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন আর বলতেন, এ সবের অনুবাদ হওয়া বাছনীর।”

আটার

আকবর একান্ত ভাবে যুক্তিপন্থী, সংস্কারপ্রিয়, নূতন-কামী এবং উন্নতশীল নরপতি ছিলেন। তিনি বে-সব সংস্কারের প্রবর্তন করেন তাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে; যথা :

১। জিজিয়া করের উচ্ছেদ সাধন। মুসলমান বাদশারা হিন্দু প্রজাদের নিকট থেকে জিজিয়া নামক একপ্রকার কর আদায় করতেন। এই প্রথা হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাদের মধ্যে অনাবশ্যক এক বিভেদের সৃষ্টি করতো। আকবর প্রথম থেকেই এই কর তুলে দবার পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্মবাক্কদেরা কিন্তু বাদশার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করেন। আকবরের সিংহাসন আরোহণের নবম বৎসরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ধর্ম-বাক্কদের (আলেমদের) তখন অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁরা বললেন জিজিয়া হচ্ছে ধর্মের অলঙ্ঘনীয় বিধান। বাদশার তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই। তখনকার মত আকবর নিরস্ত হলেন। সিংহাসন আরোহণের পঞ্চবিংশতি বৎসরে আকবর এই প্রস্তাব পুন-রুত্থাপন করেন। ধর্মবাক্কদের তীব্র আপত্তিসত্ত্বেও এবার জিজিয়া বিবর্তিত করমান তিনি জাহী করেন। এই করমানে আকবরের এবং আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট পার্থক্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। সম্রাট এই করমানে বলেছেন, “আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে জিজিয়া কর আদায় করতেন, তার কারণ, তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের (অ-মোস্তেমদের) হত্যা এবং লুণ্ঠন করাকে তাঁদের স্বার্থের পরিপোষক বলে বিশ্বাস করতেন।

তাঁদের ধারণা ছিল, যারা তাঁদের অধীনস্থ তাদের দমনে রাখা দরকার, আর যারা তাদের অধীনে আসেনি, তাদের প্রতি বাহুবল প্রয়োগ করা দরকার। আর প্রয়োজনমত অর্থ-সংগ্রহের প্রশস্ত পথ হচ্ছে, বিরুদ্ধীদের কাছ থেকে কর আদায় করা। আর সেই করকেই তাঁরা জিজিয়া নামে অভিহিত করেছিলেন।

বর্তমানে আমাদের বন্ধুত্ব, দয়া এবং জাতি-ধর্মনির্কিশেমে সকলের প্রতি দানশীলতার কলে, অ-মোস্তেমদের বৃহৎ একদল সর্ববিধের আমাদের সহযোগিতা করছে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করছে। এরূপ অবস্থায় কি করে তাদের আমরা লুণ্ঠন করতে পারি, কি করে তাদের হত্যা করতে পারি, কি করে তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করতে পারি? আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব লোক অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেন, তাদের কি করে আমরা শত্রু বলে মনে করতে পারি? অ-মোস্তেমদের মধ্যে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অতীত কালে যারাত্মক শত্রুতা ছিল। এখন সে শত্রুতা চলে গেছে। সে হিংসা-বিষেব আর নাই। এখন সেই বিষেবের ভাবকে জাগিয়ে রাখা কিম্বা তাদের ইচ্ছন যোগান কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক?” আকবরের যুক্তি যে অকাট্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা কে এখন অস্বীকার করতে পারে?

২। ফসলী সনের প্রবর্তন : চান্স্রমাসের হিসাবে রাজ-কাধ্য পরিচালনা অনুবিধানক-হওয়ার দরুণ আকবর সূর্যের গতিবিধির হিসাবে বৎসর-গণনার প্রথা প্রবর্তন করেন। আকবরের প্রবর্তিত এই প্রথা ইলাহি বা ফসলী সন নামে এখনও প্রচলিত আছে। ধর্মবাক্কদেরা যে এবিষয়ে তুমুল আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, সে কথা সহজেই অতুমেয়। আবুল ফজল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : মহামান্ন বাদশা হিন্দুস্থানে নূতন এক অশ্বের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের সন, তারিখ প্রভৃতি থাকার দরুণ রাজকাধ্য পরিচালনায় বিশেষ অনুরোধ হরে থাকে বলেই তিনি এই সংস্কারের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। “হিজরী” নাম তিনি পছন্দ করতেন না। তবে অজ্ঞ জনসাধারণকে উত্তাক করতেও তিনি চাহিতেন না। জনসাধারণের মধ্যে এই ফসলী প্রচলিত আছে যে, হিজরী সনের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের অচ্ছেদ্য

সম্বন্ধ বর্তমান। যারা জানী ওঁরা সহজেই বুঝতে পারেন যে, সন তারিখ প্রকৃতি সাংসারিক কাজকর্মের সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

৩। হিন্দু প্রজাপুঞ্জের সম্বন্ধে সাধনের জন্য আকবর গোহত্যা সম্পর্কে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্তিম প্রধান কারণ ছিল গো-হত্যা। আকবর যে গভীর রাজনীতি জানেন যার অল্পপ্রাণিত হয়েই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, সংক্ষেপে তা অল্পমান করা যায়। আকবরের পিতামহ জুলতান বাবর এবিষয়ে পুত্র হুমায়ুনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। জাতীয় একতার সৃষ্টি করতে হলে আপত্তিকর আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু উন্নত জাতিরই বর্জন করা দরকার। তাতে প্রকৃত ধর্মের কোন ক্ষতি হয় না। হায়দারাবাদের মুসলিম রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। তাতে সেখানের মুসলমানদের কোন ক্ষতি কিম্বা অসুবিধা হয় নি।

(৪) দাসত্ব-প্রথার মূলোচ্ছেদ—তখনকার যুগে বিজয়ী যোদ্ধারা পরাজিত শত্রুর স্ত্রী-পরিজনকে দাসরূপে ব্যবহার করতে পারতো এবং দাসরূপে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারতো। আকবর ফরমান জারি করে এই বর্ষের অনুমাত্রিক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। ফরমানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, “শত্রুর অপরাধ যাই হোক না কেন, তার স্ত্রী-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততি যেখানে ইচ্ছা থাক, যেখানে ইচ্ছা থাকুক, তাহাতে কোন বিয়ের সৃষ্টি করা হইবে না। ইচ্ছা হয়, তারা নিজেদের বাড়ীতে থাকতে পারে, আর ইচ্ছা হয়, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। ছোট বড় কাউকে দাসে পরিণত করা হবে না। আমি যদি কুপথে যাই, তাতে স্ত্রীর অপরাধ কি? আর পিতা যদি রাজ-ক্রোধিতা করে, তাতে সন্তানের অপরাধ কি?”

(৫) সতীদাহ-নিরস্ত্রণ—সতীদাহ-প্রথা হিন্দুদের মধ্যে বহুকাল থেকে চলে আসছিল। হিন্দুরা এই প্রথাকে ধর্মের অঙ্গ বলেই বিশ্বাস করতেন। এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন হয়, এই ছিল আকবরের ইচ্ছা। তবে একেবারে ততদূর অগ্রসর হওয়া তিনি সমীচীন বলে মনে করেন নি। তবু কিছু অসংখ্য নারীদের কথা তিনি ভোলেন নি। তিনি কখন

জারি করেন যে, যদি কোন বিধবা কিছুমাত্র অচ্ছা প্রকাশ করে, তা হলে তাকে চিতায় উঠান যেআইনী কাজরূপে গণ্য হবে। আকবর কেবল ফরমান জারী করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর আদেশ বাতে কার্যক্ষেত্রে পালিত হয়, সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী জয়মল (রাজা বিহারী মাল্লার ভ্রাতৃপুত্র) বঙ্গদেশে দেহত্যাগ করেন। জয়মলকে আকবর বড় ভাল বাসতেন। জয়মলের বিধবা ছিলেন যোধপুর-রাজ উদয় সিংহের কন্যা। বিধবা রাজকুমারী চিতায় জীবন বিসর্জন দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর আচরণে সমাজ এবং বংশের লোকেরা কেপে উঠেন, এবং সকলে পরামর্শ করে স্থির করেন, বলপ্রয়োগ করে রাজকুমারীকে চিতায় চড়ান হবে। রাজকুমারীর পুত্র উদয় সিং এই বলপ্রয়োগের ব্যাপারে সকলের অগ্রণী হলেন। যথাসময় চিতা প্রস্তুত হল। বলপ্রয়োগ করে রাজকুমারীকে চিতায় চড়ান হল। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হল। ঠিক এই সঙ্কটের মুহূর্তে পরলোকগত জয়মলের পিতৃব্যের নেতৃত্বে শাহী ফৌজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। বাদশার আদেশে রাজপুত্রবীর নিগৃহীতাকে অগ্নি চিতা থেকে উদ্ধার করলেন। উদয় সিংকে গ্রেপ্তার করা হল।

(৬) আকবর হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কর আদায়ের প্রথা রহিত করেন। পাঠান বাদশারা হিন্দু তীর্থ-যাত্রীদের কাছ থেকে, তাদের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে, নিয়মিতভাবে কর আদায় করতেন। এইভাবে কোটা কোটা টাকা প্রত্যেক বৎসর রাজকোষে আসতো। আকবর এই প্রথা সম্পূর্ণ ভাবে তুলে দিলেন। মাহুঘ ধর্ম্মাচরণ করবে, তার জন্য কেন তাকে কর দিতে হবে? রাজকর্মচারীরা বাদশাকে বললেন, “তীর্থ করা একটা কুসংস্কার মাত্র। হিন্দুরা তীর্থ করা ছাড়বে না। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে রাজকোষে যদি নিয়মিতভাবে অর্থাগম হয় তাতে আপত্তি কি?” মহামন্ত্র সন্ত্রাস্ট উত্তর দিলেন, “হতে পারে কুসংস্কার। কিন্তু তীর্থ করা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের অপরিহার্য অঙ্গ। হিন্দুরা এই ভাবেই খোদার প্রতি তাহাদের ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়ে থাকে। সুতরাং খোদার প্রতি জাতীয় প্রথমত ভালবাসা দেখাবার পথে কোন বিয়ের সৃষ্টি করা রাজশক্তির পক্ষে অনুচিত।”

উনবাট

আকবর শাসনকর্তা এবং রাজকর্মচারীদের প্রতি বিভিন্ন সময় বেসব করমান বা অহুজা পত্র জারী করেছিলেন তাদের একটি সংকিপ্তসার মোহাম্মদ হোসেন আজাদ তাঁর “দরবারে আকবরীতে” দিয়েছেন। এই সব রাজলিপি থেকে আকবরের রাজনৈতিক আদর্শ অতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আকবর তাঁর কর্মচারীদের বলেছেন : প্রজাদের অবস্থার বিষয় তোমরা সঠিক সংবাদ রাখবে। লোক-সংসর্গ থেকে ঘুরে খেঁচো না তোমরা, কেননা, তাহলে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ থেকে যাবে। আর সে সব বিষয়ে তোমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে সম্মান-সূচক ব্যবহার করবে। অনেক রাজ্য পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে। সকলে দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যরাত্রে বিশ্বপ্রভুর দিকে মন সংযোগ করে তাঁর বিষয় চিন্তা করবে। নীতিগ্রহ, উপদেশমূলক পুস্তক, ইতিহাস প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করবে। যেসব দরিদ্র ব্যক্তি এবং ধার্মিক লোক কারও কাছে থেকে কিছু চায় না, তাহাদের বিষয় সর্বদা সজাগ থাকবে, যেন তাহারা অজাবের দরুণ কষ্ট না পায়। যারা প্রকৃত খোদা-ভক্ত, যারা প্রকৃত ধার্মিক, যারা উচ্চমনা তাদের সেবার সর্বদা তৎপর থাকবে। আর তাদের শুভাশীষ কামনা করবে। অতিথুদের অপরাধের বিষয় খুব গভীরভাবে চিন্তা করে স্থির করবে, কাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, আর কাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

সংবাদ আনয়নকারীদের বিষয় সর্বদা সাবধানে থাকবে। যা করবে, নিজে দেখে শুনে করবে। বিচারপ্রার্থীদের অভিযোগ নিজে শুনেবে। সব কাজ অধীনস্থ কর্মচারীদের ভরসায় ছাড়বে না। প্রজাদের বস্ত্রের সঙ্গে পালন করবে। কৃষিকার্য্য যাতে ব্যাপক ভাবে হয়, আর পল্লীসমূহ যাতে আনন্দে থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। দরিদ্র প্রজাদের বিষয় সর্বদা খোঁজ-তল্লাস করবে। নজরানা, সেলামি প্রভৃতি গ্রহণ করবে না। সৈনিকেরা যাতে জোর-জবরদস্তি করে লোকের বাড়ীতে না উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। দেশের শাসন শৌকর্য্য নশ জনের সঙ্গে পরামর্শ করে করবে। লোকের ধর্ম এবং সংস্কারে কখনও হস্তক্ষেপ করবে না।

পৃথিবীর জীবন হুদিনের। তবু মানুষ সামান্য মাত্র আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে পারে না। ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞার হস্তক্ষেপ কি করে তারা সহ্য করবে? তাহাদের ধর্ম এবং সংস্কারের মূলে নিশ্চয় যুক্তির ভিত্তি আছে। যদি তাদের ধারণা ঠিক হয়, তাহলে সংস্কারের বিরোধিতা করে তুমি সত্যের বিরোধিতা করছ। পক্ষান্তরে তোমার মত যদি ঠিক হয়, আর তাদের ধারণা যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে, তাদের তুমি অজ্ঞতা নামক ব্যধিগ্রস্ত বলে মনে করতে পার; আর তাদের প্রতি কল্পনা দেখাতে এবং তাদের সাহায্য করতে পার। তাদের বিরোধিতা করবার, তাদের সঙ্গে কলহ করবার কোন দরকার নাই। সর্ব ধর্মের সং এবং উচ্চমনা লোকদের নিজের বন্ধুরূপে গণ্য করবে।

জ্ঞানের চর্চ্চা এবং সাধনা যাতে সর্বত্র হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। জ্ঞানী এবং গুণী লোকদের সম্মান করবে যাতে করে তাদের সাধনা বাধা না হয়। প্রাচীন বনেদী বংশের লোকদের প্রতিপালনের বিষয় যত্নবান হবে। সৈনিকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে; তাদের কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান করবে। তুমি স্বয়ং তীরন্দাজি, বর্ষা-চালনা প্রভৃতি সৈনিকের উপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকের নিয়মিত অভ্যাস করবে। কেবলমাত্র শিকার নিয়ে সময় ক্ষেপণ করবে না। তবে শিকার প্রভৃতির অন্নুষ্ঠানও সৈনিক জীবনের কল্প প্রয়োজন বলে জানবে।

সহর কোতওয়ালের কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক নগর, মহকুমা, গ্রাম প্রভৃতিতে যত বাড়ী আছে, বাড়ীর মালিক আছে, বাসিন্দা আছে—সবের ফিরিস্তি তৈয়ার করা এবং প্রত্যেকে যাতে সাধারণের প্রতি তার কর্তব্য-পালন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রত্যেক মহল্লা বা বসতির জন্ত একজন করে মীর-মহল্লা বা মওল থাকা দরকার। গুপ্তচর মোতামেন রাখবে, যাতে করে প্রত্যেক জায়গার ভাল মন্দ খবরাখবর তোমার কাছে পৌঁছতে থাকে। লোকের উৎসব-অন্নুষ্ঠান, শোক-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সর্ব-বিষয়ের খবর রাখবে। রাস্তা, গলি-ঘুলি, হাটবাজার, পুল, খেরাঘাট প্রভৃতি স্থানের জন্ত পাহারার ব্যবস্থা রাখবে। পথ-ঘাটের পাহারার এমন বন্দোবস্ত করবে, যে, যদি কোন লোক পালিয়ে ফেরার হয়, তার বিষয় তোমার কাছে সমস্ত খুঁটিনাটি খবর বেগ এলে পৌঁছোয়।

চোর এলে, আশুন লাগলে, কিছা অস্ত্র কোন বিপদ উপস্থিত হলে, গ্রামবাসীরা যেন পরস্পরের সাহায্য করে; গ্রামের মোড়ল এবং চৌকিদার যেন তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এইসব সঙ্কটের সময় যে ব্যক্তি আত্মগোপন করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, সে রাজস্বারে অপরাধী বলে গণ্য হবে। প্রতিবেশী, গ্রামের মোড়ল এবং চৌকিদারকে না জানিয়ে কেউ যেন সফরে বের না হয়; এবং কোন নূতন স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্র সে যেন সেই স্থানের এইসব লোকদের সংবাদ দেয়। ব্যবসায়ী, সৈনিক, রাষ্ট্র-সুসাক্ষর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। যে লোকের অস্ত্র কেউ জারীন হতে রাজী নয়, তাকে পৃথক্ কোন স্থানে রাখবে। উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও বাতে এসব বিষয় তাদের দায়িত্ব পালন করে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখবে। লোকের আমদানী এবং খরচের দিকে লক্ষ্য রাখবে। যার খরচ তাঁর আমদানীর চেয়ে বেশী, নিশ্চয় জানবে তাঁর জীবনে কোন গুণ রহিত আছে। এই সমস্ত কাজ করবে দেশের সুশাসনের জন্ত, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ত। লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার উদ্দেশ্যে এসব কাজ করতে য়েয়ো না।

বাড়ারের কেনা-বেচার অন্য বিখ্যাত দালাল নিযুক্ত করে দেবে। কেনাবেচা যেন গ্রামের মোড়ল এবং “খবরদারের” অজ্ঞাতসারে না হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতার নাম রোজ-নামচায় (Diary) লিখে রাখবে। যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে কেনাবেচা করবার চেষ্টা করবে তার জরিমানা হওয়া দরকার।

শহরের প্রত্যেক মহল্লায় এবং শহরতলীতে রাজে যেন চৌকিদার পাহারায় নিযুক্ত থাকে। সন্দেহজনক, অজ্ঞাত-কুলশীল লোকদের স্থান থেকে স্থানান্তরে তাড়াতে থাকবে। চোর, পকেটমার, ঠগ প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন না থাকে। যদি এমন কোন লোক মারা যায় কিছা দেশান্তরে চলে যায় যার কোন উত্তরাধিকারী নাই, তা হ'লে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমতঃ সরকারী পাওনা উম্মূল করবে, তার-পর, উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বের করে সম্পত্তি তাদের হাতে অর্পণ করবে। যদি ভ্রমাস করেও কোন উত্তরাধিকারী

না পাওয়া যায়, তা হ'লে সম্পত্তি সরকারী আমীনের (Trustee) কাছে জমা দেবে, আর রাজসরকারে সংবাদ পাঠাবে। প্রকৃত দাবীদার উপস্থিত হলে সম্পত্তি তাকে যেন দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এ বিষয় খুব বিখ্যন্ততার সঙ্গে তোমার কর্তব্য পালন করবে।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। মদ্যের ব্যবহার বাতে না হয়, তার অন্য কড়া ব্যবস্থা করবে। মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারী, বিক্রয়কারী এবং প্রস্তুতকারী সকলেই আইনের চক্ষে অপরাধী এবং দণ্ডনীয়। তাদের শাস্তি এমন হওয়া উচিত যে, তাতে যেন তাদের চোখ খুলে যায়। তবে বারা মাদক দ্রব্য স্বাহ্যের উন্নতির জন্ত কিছা মনের শক্তিবৃদ্ধির জন্ত ব্যবহার করে, তাদের কিছু বলবে না। জিনিষ-পত্রের গুজনের দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা প্রভৃতি বাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। অনাবশ্যক সঞ্চয়ের দিকে (Hoarding) লোক বাতে না বার সে-দিকে লক্ষ্য রাখবে। নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে জীলোক এবং পুষ্করের ব্যবহারের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ ঘাট নির্মাণ করবে। ব্যবসায়ীরা রাজকীয় অস্থমতি ব্যতীত ঘোড়া এদেশ থেকে যেন বিদেশে রপ্তানী না করে। ভারতবর্ষ থেকে যেন দাসদাসী বিদেশে রপ্তানী করা না হয়। ক্রয়-বিক্রয় যেন শাহী মুদ্রার সাহায্যে হয়। বিবাহের বিষয় যেন রাজকর্ণচারীদের অবহিত করা হয়। জনসাধারণের বিবাহে, বিবাহ-অস্থমতিনের পূর্বে, বর-কন্ডাকে যেন কোতওয়ালীতে উপস্থিত করা হয়। কনের বয়স, বরের চেয়ে বার বছরের বেশী হলে, বিবাহের অস্থমতি দেওয়া হবে না। কেন না একরূপ বিবাহের কলে পুষ্করের স্বাস্থ্যহানি হয়। পাত্তের বয়স ১৬ বৎসর এবং পাত্তীর বয়স ১৪ বৎসর না হলে বিবাহের অস্থমতি দেওয়া হবে না। চাচাতো এবং মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না, সেকরূপ ক্ষেত্রে যথোচিত ঘৌন আকর্ষণ হয় না। তা ছাড়া সম্মান-সম্মতি দুর্বল এবং ক্ষয় হয়। হিন্দুর ছেলে যদি শিত্ত অবস্থার বাধা হ'য়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকে, তা হ'লে, সাবালক বয়সে সে যে ধর্মে ইচ্ছা থাকতে পারে। যে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে, কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। মন্দির,

শিবাঙ্গর, অগ্নিমন্দির, গির্জা প্রভৃতি নির্মাণে মানুষের অবাধ অধিকার থাকবে। কেউ যেন তাতে বাধা না দেয়।

সুধোদয়ের সময় এবং মধ্যরাতে (সূর্য্য যখন প্রকৃত পক্ষে আবির্ভূত হন) নহবত বাজানোর ব্যবস্থা রাখবে। আর সূর্য্য যখন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গমন করবেন, তখন তোপ এবং বন্দুক ছোড়ার ব্যবস্থা রাখবে (প্রহর গণনার ক্রম) ; মানুষ এইভাবে সময়ের গতির বিষয় অবহিত থাকবে। আর খোদার কাছে নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করতে পারবে। উৎসব, পর্ব্ব প্রভৃতি যথার্থীতি পালন করবে। সব চেয়ে বড় পর্ব্ব হচ্ছে নওরোজ—কেন না, এই দিন থেকেই সূর্য্যের সাংসারিক যাত্রা শুরু হয়। এ পর্ব্বের অনুষ্ঠান হবে ফারওয়াদির দিন মাসের প্রথম তারিখে (১লা বৈশাখের অমরুপ)। ঐ মাসের ১২ তারিখও উৎসবের দিন বলে গণ্য হবে। আরও কয়েকটা তারিখে উৎসবের ব্যবস্থা করবে। প্রথমেই দুই পর্ব্ব যেন রাজযোগে দেয়ালীর ব্যবস্থা হয়। সূর্য্যাস্তের সময় নাকিরা বাজাবার ব্যবস্থা করবে। মুসলমানদের ঈদ পর্ব্বেরও যেন যথোচিত অনুষ্ঠান হয়। আর সেই উপলক্ষে শহরে যেন শাদীমানা বাত বাজান হয়। ”

(ষাট)

অজকালকার সুসভ্য রাজ্যসমূহে ten years plan, five years plan প্রভৃতি ধারাবাহিক সংস্কার স্থিতির কথা শুনতে পাই। এই সব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অর্থ নৈতিক এবং সাময়িক উন্নতি এবং ত্রিবৃদ্ধি। আকবরও একটা 12 years plan বা বার বৎসরের পরিকল্পনা ক’রে ছিলেন। তবে তাঁর আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের! বথা—

প্রথম বৎসর—মুঘিকদের কোন কষ্ট যেন দেওয়া না হয়।

দ্বিতীয় বৎসর—গরু, বাঁড় প্রভৃতিকে যেন কোন কষ্ট দেওয়া না হয়।

তৃতীয় বৎসর—চিতা বাঘের শিকার করা যেন না হয়, এবং চিতার সাহায্যে যেন কোন শিকার না করা হয়।

চতুর্থ বৎসর—খরগোঁস ভক্ষণ করা যেন না হয়; এবং খরগোঁসের শিকার করা যেন না হয়।

পঞ্চম বৎসর—মৎস্য আহার এবং মৎস্যের শিকার বর্জন।

ষষ্ঠ বৎসর—সাপকে যেন হত্যা করা না হয়।

সপ্তম বৎসর—ঘোড়াকে যেন হত্যা কিংবা ভক্ষণ করা না হয়।

অষ্টম বৎসর—ছাগ হত্যা এবং ছাগ মাংসের আহার বর্জন।

নবম বৎসর—বানরকে কেউ যেন হত্যা না করে এবং বার পোষা বানর আছে সে যেন তাহাকে মুক্তি দেয়।

দশম বৎসর—মোরগের লড়াই এবং মোরগ হত্যা যেন বন্ধ থাকে।

একাদশ বৎসর—কুকুরের সাহায্যে শিকার করা যেন না হয় এবং কুকুরকে, বিশেষতঃ অভিভাবকহীন কুকুরকে যেন যত্নের সঙ্গে রাখা হয়।

দ্বাদশ বৎসর—শূকরকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়।

বার বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পরিকল্পনার কাজ আবার প্রথম থেকে আরম্ভ হবে, এই ছিল শাহিনে শাহের নির্দেশ।

চাস্ত্র মাসের হিসাবে আকবর আর একটা কর্ম্মশূচী প্রস্তুত করেন, বথাঃ—

(১) মহরম (প্রথম মাস)—জীব জন্তুকে কষ্ট দিবে না।

(২) সফর (দ্বিতীয় মাস)—দাসীদের মুক্তি দিবে।

(৩) রকিউল-আউল (তৃতীয় মাস)—৩০ জন সচ্চরিত্র অত্যাচারিত লোককে আর্থিক সাহায্য দিবে।

(৪) রবি-উল-সানী (চতুর্থ মাস)—এ-মাসে দেহের শুচিতার দিকে লক্ষ্য রাখবে।

(৫) জামাদি-উল-আউয়াল (পঞ্চম মাস)—রেশমের বস্ত্র এবং অন্যান্য আকর্ষক পোষাক এ-মাসে বর্জন করবে।

(৬) জামাদি-উল-সানী (ষষ্ঠ মাস)—এ-মাসে চামড়ার ব্যবহার বর্জন করবে।

(৭) রজব (সপ্তম মাস)—সমবর্ষীদের এ-মাসে সাহায্য করবে।

(৮) শাবান (অষ্টম মাস)—এ-মাসে কাহারও উপর কঠোর ব্যবহার করবে না।

- (৯) রামজান (নবম মাস)—দরিজ্রদের আহার দিবে, বস্ত্র দান করবে।
- (১০) শাওরাল (দশম মাস)—প্রভাহ হাজার বার খোদার নাম জপ করবে।
- (১১) জিলকাদ (একাদশ মাস)—রাজ্যের প্রথম ভাগ জাগ্রতভাবে কাটাবে, আর কয়েক জন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করবে, আর বিভিন্ন উপায়ে তাদের আনন্দ বিধান করবে।
- (১২) জিলহাজ্জ (দ্বাদশ মাস)—মাহুকের মঙ্গলের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি প্রস্তুত করবে।

একষষ্টি

আকবরের বিভিন্ন সংস্কার এবং বিধি-নিষেধের বিষয় বিবেচনা করলে, তিনটি আদর্শের প্রেরণা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, যথা, (১) জাতীয় একতার প্রেরণা (২) জাতি-ধর্মনির্কিশেবে মাহুকের এবং মাহুকের প্রাণীসমূহের অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতির মঙ্গল সাধনের প্রেরণা, এবং (৩) রাষ্ট্রীয় মঙ্গল সাধনের বিষয় ধর্ম-নিরপেক্ষ, মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রেরণা। আজ বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের চিন্তা এবং কর্ম নেতারা এই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে, স্বাধীন বিজ্ঞান এবং দর্শনের নির্দেশ অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় জীবনকে গঠিত করার চেষ্টা করছেন। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ,—প্রাচীন আচারের ইজিত এবং নির্দেশ এখন আর তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নির্দেশিত পথ থেকে বিচলিত করে না। রাজধর্ম এখন সংস্কারধর্ম এবং শাস্ত্র-ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকবরের গৌরব এই যে, অদূর যোড়শ শতাব্দীতে, সমস্ত পৃথিবী যখন সংস্কার-ধর্মের এবং শাস্ত্র-ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতো, দর্শন এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যখন রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার কল্পনাও মাহুকের করতে সাহস করেনি, সেই তমসাক্ষর যুগে এই দূরদর্শী, অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন ভারত-সম্রাট, বৈজ্ঞানিক যুগের

আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে নিজের উজ্জ্বল অন্তরের মধ্যে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন, এবং বিশ্ববহুল বাস্তব জীবনে অকাতরে এবং ব্যাপক ভাবে সে আদর্শের প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।

বিখ্যাত ব্যবহারবিদ Sir Henry Maine ব্যবহার-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তরের নির্দেশ করেছেন। প্রথম স্তরে মাহুকের শাস্ত্রের আক্ষরিক নির্দেশমতই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিচালনা করে। আক্ষরিক নির্দেশ যখন জটিলতর জীবনকে পরিচালিত করতে অক্ষম হয়, তখন মাহুকের দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে পৌঁছায়, অর্থাৎ Interpretation বা ব্যবহার সাহায্যে জীবনকে পরিচালিত করে। Maine এর মতে এশিয়াবাসীরা এই দ্বিতীয় স্তরে অতিক্রম করতে পারেন নি। কেবল ইউরোপবাসীরা তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ Legislation বা নব-সৃষ্টির স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে কেবল তাঁরাই শাস্ত্রনিরপেক্ষ ভাবে বাস্তব জীবনের তাগিদে নির্দেশ মত নূতন আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি Legislation সংজ্ঞা দিয়াছেন Legislation, the enactments of a legislature which whether it takes the form of an autocratic prince or of a Parliamentary assembly, is the assumed organ of the entire society, is the last of the ameliorating instrumentalities."

Maine যদি আকবরের আদর্শ এবং রাষ্ট্রসাধনার সঙ্গে যথোচিত ভাবে সুপরিচিত হতেন, তাহলে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে, ইউরোপের Legislation-এর স্তরে পৌঁছোবার তিনশত বৎসর পূর্বে, ভারতের এই অলোক-সামান্য সম্রাট ব্যবহার-শাস্ত্রকে এবং রাষ্ট্রজীবনকে ক্রম-বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে, অর্থাৎ Legislation-এর পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।



চিত্রলেখা

বাণীকুমার

বসুন্ধরা একই ছবি আঁক্চে দিনে দিনে,
 নিত্য-চেনা গান বাজে তা'র বাঁধে ।
 প্রভাতবেলায় দিগন্তরে গুঞ্জে অরুণ-বেণু,
 মৌমাছির পথে পথে ছড়িয়ে চলে রেণু,
 বহুযুগের স্বপ্ন-প্রাণে ঝঙ্কত সে-বাণী—
 কতই সুরে আজ ধরণীর বক্ষে দিল আনি' ;
 অমর প্রেমে মুগ্ধ মনে বিশ্ব-বরণ বাণী—
 জ্যোতির অরূপ চিরন্তনের গোপন-প্রাণে লীন ।

গগনে কোন্ পরম জাগার চরম শুভক্ষণে,
 জাগলো উষা প্রেমের সঙ্গোপনে ।
 আপন-হারি নিখিল মেলে স্বপ্ন-নিবিড় আঁখি,
 বিশ্বের সব দেখলো হাতে বাঁধা আলোর রাখী,
 আনন্দ যে কলোন্মাসে নাচলো সাগর-নীয়ে,
 জয়-ঘোষণা বনে বনে মাতন শৈল-শিরে ;—
 প্রথম দেখার সে-মত্ততা চিন্তে কাঁপন আনে,—
 এখনো তা'র ছন্দ দোলে শ্রামল-ভরুণ প্রাণে ।

বিচিত্রা যে-রূপের লীলায় আন্দোলিত তৃণ—
 সেই মহিমা পুষ্পদলে শ্রীণ ।
 পাতায় পাতায় গন্ধে-ভাষায় বর্ণ-আলিঙ্গনে—
 অতুল রসের তুলির লিখন দীপ্ত প্রতিরূপে ;
 স্নান-রেখা নৃত্য-তালে নিত্য-নবীন রাগে—
 ফুল-ফোটা ফুল-ঝরার সনে অমর ভঙ্গী জাগে ।
 দুঃখে-সুখে বরণ-মালায় সৃষ্টি-প্রলয়-মাঝে—
 বিশ্বমোহন অনন্ত সুর দিক্-বেণুতে বাজে ।

নীল-আকাশের গুমরে-ওঠা চির-ব্যাকুল গীতি
 গাইচে ধরার অন্তরপুর নিতি ।
 দিন-রজনী ছন্দিত সেই বাণীর করুণ সুরে,
 ভৈরবেরি ঝঙ্কার-তান তপন-সোমে ঘুরে,
 কমল-বুকে গন্ধ-স্বপন—সেই ললিতা ব্যথা—
 বস্মিনী সে বিন্দু হ'য়ে মধুর গোপন কথা ।
 বিরহিনীর আঁখির জলে উঠলো সে-গান ভরি' ;
 প্রেম-বেদনার নির্জন প্রাণ অমৃত শ্রাম করি' ।

নারিকেলের পল্লবেতে তাল-তমালী বনে—
 বিরহেরি মর্ম্মরিমা-স্বনে—
 মস্ত্রিত যে-বাণী সদাই ঋতুর আবর্তনে,
 মধ্যদিনে কল্লোল-গান নির্যয়ে নির্জনে,—
 কোন্ সে রাখাল বাজায় বেণু রুদ্র-মোদন সুরে,
 সেই রাগিণীর নিত্যধ্বনি ধরার গভীর বুকে,—
 ইন্দ্রধনু সে-সঙ্গীতের চিত্রলিপি নীলে,—
 তাই সুরের তৃষ্ণা-সনে অনন্ত প্রেম মিলে ।

চিত্র-লেখায় মগ্নচেতন ধরার সাধনখানি—
 নানান রূপে তুলির বাঁধন টানি'—
 দিবস-রাত্তির বুকের 'পরে আঁক্চে অমুরাগে,
 রেখায় রেখায় রঙের খেলায় গ্রীষ্মের তপ জাগে,
 কখনো বা বাদল-দিনের প্রাবন-গানের মায়া,
 শীতের কাড়াল শুভ্র বুকের শঙ্কা-ত্যাগের ছায়া,—
 বসন্ত-দাক্ষিণ্যে ফুটে ছবির রঙীন আশা,
 সুরলোকের বাণীর বিলাস আকাজক্ষার ভাষা

ধরণী সেই রূপ-প্রকাশে রয়েছে উন্মদা,
 যুগে যুগে যায়না সে-দিন গণা ।
 কালবোশেখীর ঝড়ের দোলায় ধরার চপল হিয়া—
 অর্পুণতার বিদ্রোহ-কোভ তুললো হিল্লোলিয়া,
 চূর্ণ করে এতোদিনের সাধন-স্বপ্নখানি,
 আবার আঁকে আগ্রহের অনন্ত রূপ-বাণী ।
 বসুধা কোন্ স্বর্গ-সুখের মিলন-প্রবাহিনী—
 মার্ত্ত-প্রাণের গোপন-লোকে তুলছে রিশিখি ।

সুন্দরী

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

ঘাতকেও অপেক্ষা কর্তে হয়
বধের জন্ত ওৎ পেতে গোপনে ।
সূর্যকেও অপেক্ষা করতে হয়
রাত্রি-প্রভাতের প্রত্যাশায় ।
সত্যও অপেক্ষা করে' থাকে
আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজে' ।
প্রেম জেগে থাকে অনির্দিষ্ট কাল
শুভদৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় ।
মৃত্যুও অপেক্ষা করে দিন 'গুণে' ।
এমন কি তুমি—তোমাকেও প্রতীক্ষা করতে হয়
অনন্তকাল ধরে'—
আমায় উন্মুখ হওয়ার মুখ চেয়ে ।

তুমি চিরন্তন ।—
কিন্তু তোমার সুন্দর কণ্ঠভঙ্গুর ।—
(ও কি তোমায়ই সৌন্দর্য ?)
সমস্ত ছাড়তে পারি তোমার জগৎ,
কিন্তু সুন্দরের জগৎ তোমাকেও আমি ভুলব ।

সুন্দরের অভিসারে

কিন্তু তোমাকে ভুললে সুন্দরকেও ভুলি বুঝি—
ভুল বুঝি হয়ত বা—
তোমাকে ছাড়লে সুন্দরকেও ছেড়ে যাই ।
সুন্দরের আঁচল ধরে' যেতে যেতে
সৌন্দর্যকে কখন হারাই যে !
প্রদীপ তো আলো নয়—তার শিখাই আলো :
কিন্তু আলোকে ফেলে দীপকেই ভালোবাসি হয়ত কখন ।
দীপদানকেও ভালো লাগে ক্রমে ক্রমে ।
মধুর চেয়ে মধুর পাত্রকেই মিষ্টি লাগতে থাকে ।

রূপের অমূল্যরূপে রস—
রসের অধিবর্ণে গন্ধকেই রস বলে' রূপ বলে' ভ্রম হয়—
সুরভির টানকে সুর বলে' ভাবি ।
আন্তে আন্তে স্পর্শস্বরূপকেই সুন্দর বলে' মনে হয় হয়ত ।

চোখ ইন্দ্র ।
রূপের অহল্যাকেই খুঁজে ফেরে দিন রাত ।
কিন্তু সহস্রাক্ষ হলেই কি খুঁজে পাওয়া যায় রূপকে ?
অপরূপকে ?—
অহল্যাকে পেতে গিয়ে তার প্রস্তুত মূর্তি পাই ।
ইন্দ্রের শিছু শিছু আসে আরো ইন্দ্রিয়বা—
তাদের দিয়ে
প্রস্তুতময়ী স্পর্শকেই খোঁদাই করে'
মনের মত প্রতিমা করে' গড়ে ভুলতে চাই বুঝি তখন ?

ত্রিভুবনে কেবল একজন অপেক্ষা করে না—
সব সময়েই তার সংক্রমণ—
প্রতিমূহূর্তেই তার বৈজয়ন্তী উড়ছে :
সে সুন্দর ।
সে অপেক্ষা করে না তার প্রিয়প্রাত্নের জগৎও—
এমন কি নিজের জগৎও নয়—
নিজেকে ছেড়েই সে চলে যায়—
প্রাণ বেঁচে থাকতেই চলে' যায় সে—
নিজ দেহের যৌব রাজ্য ত্যাগ করেই ।
এই সংক্রান্তি, এই সমাপ্তি, এই তার দেহান্তর-লাভ
কারো মুখাপেক্ষা তার নাই ।

স্পর্শ থেকে শব্দ ।
তার পড়ে কেবল শব্দের মধ্যে খুঁজি সৌন্দর্য—
আর্টে আর কাব্যে—
সাহিত্যে আর শিল্পকলায়—
রূপ যেখানে রঙ হয়ে সুর যেখানে শব্দ হয়ে এসেছে :
শব্দরূপের মধ্যে সুন্দরের রূপ !
শব্দ-অর্থ-গন্ধ মিশিয়ে রূপের ব্যঞ্জনা :
রসের রসায়ন :
রসায়ন কিবা রসাতল কে জানে !
রসায়ন থেকে রসাতল কতই বা দূর ?
তারপরেই তো শব্দে আর অর্থে মিশিয়ে গড়ি
আরেক মিশ্রণ :
জ্ঞান আর বিজ্ঞান—
দর্শন পুরাণ আর সাহিত্য ।

অবশেষে অর্থ : বিস্কৃত অর্থ ই অবশেষে ।
 অর্থের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে
 বিষয় আর বিলাসের মধ্যে সুরমা খুঁজে বেড়াই ।
 অর্থ আর অনর্থের মিশিয়ে
 বানাই কল আর কারখানা—
 প্রাসাদময়ী নগরী আর নগরময় বস্তি
 সাম্রাজ্য আর উপনিবেশ ।

শেষে থাকে অনর্থ ।
 অনর্থ আর নিরর্থকতা ।
 কদম্বতা, জীবমৃত্তি আর অপমৃত্তা ।

ভিলে ভিলে পলে পলে বার্থ হয়ে যাওয়া—
 নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যন্ত্রাঙ্গীর মতন ।
 আর থাকে আত্মঘাত—
 আত্মঘাত ও আত্মীয় হনন—
 অস্ত্র হনন আর অগণ্য হনন—
 পলিটিক্স আর যুদ্ধ—
 তার মধ্যেই পাই আমার অনন্ত সুলভকে ।

কিছু তুমি তখন কোথায় ?
 আর কোথায় তোমার সুলভ ?

জীবন-বীমা

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

স্নেহের সুরোরাণী বৃদ্ধ মাতামহে
 এমন ছটোকথা তুলিয়া যদি কহে—
 বাহাতে ভরে উঠি হৃদয় গিরি টুটি
 স্নেহের ভরা নদী সাগর পানে বহে,—

বলিও জামাতারে না করে মন ভার—
 তাহার স্তরুণ আমার দিন আর
 ফুরায়ে এল ভাই, মিটাতে তাই চাই
 দাহুর দাবী দাওয়া যেটুকু মিটিবার ।

এই তো হাতে হাতে গরম প'ড়ে এলে
 তোমার দিদিমাতা আমারে যাবে ফেলে,
 হৈম গিরি বাসে তয়তো এই মাসে
 এ ভাঙা তরলীরে যাবেন পায়ে ঠেলে ।

তখন তুমি যদি ভাগর ছুটি আঁখি
 নলিনী ঢল ঢল আমার পানে রাখি'
 আসিতে নিরঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে
 দিতাম কানে কানে আমিও কত না কি

ছটো বা পাকা চুল তুলিয়া দিতে দিতে
 চোখের ছটো কথা চোখেই শুনে নিতে
 কভু বা হাতখানি হৃদয় পরে আনি
 জুড়িয়ে দিতে ব্যথা বুলায়ে দিতে দিতে ।

বয়সে ছোটো বারা সহজে যায় ভুলে,
 আলুগা বাধা গেরো আপনি যায় খুলে ;
 বুড়ার হাড়ে হাড়ে জড়ায় একেবারে
 স্মৃতির মাধবিকা ফুটিয়া ফলে ফলে ।

হৃদয় কটাহের দুধ সম মোর
 সফেন সুরাশি ধরিব মুখে তোব,
 স্মৃতির ইন্ধনে হায় রে পোড়া মনে
 আকুল বেদনায় উথলে আঁখি লোর ।

বছর কুড়ি চার করিয়া দিয়া পার
 এখন বসে আছি পারের পথ চেয়ে,—
 তাহারি তরীখানি আমারি বলে জানি
 যে জন দয়া করে আসিবে তরী বেয়ে ।

কেহ বা লীলাময়ী 'করুণাময়ী' কেহ,
 কেহ বা ভালোবাসা কেহ বা দিবে স্নেহ—
 কাহারো আঁখিলোর পাথের হবে মোর,
 স্মৃতি মনে মনে...স্মৃতিবে কেহ কেহ ।

তরুণ তরুণীর স্মৃতির অমরায়—
 অমর হব মরি তাহারি ভরসায়—
 মরণে নাহি ভয় মরণ যদি হয়
 মিলিলে লিপখানি সঠিক ঠিকানায় ।

একটু মনে হয় অচেনা মহোদধি
 ভবের পারাবার গরজে নিরবধি,
 উঠিলে তাহে ঢেউ সাহস দিতে কেউ
 অসীম সাহসিকা রহিত সাথে যদি ।

যাত্রা হ'লে সুর সভয়ে কব তা'রে—
 বুকের দুক দুক আমার অভয়ায়ে
 মরণ সহচরী বঙ্গে ধরি ধরি
 জীবন বীমা করি চলিব পর পায়ে ।

জীবনের চরে এত চোরাবালি

দুটি প্রাণ

শ্রীভবৈশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ

আর কেন এত গুপ্তনগীতি অভিসার আয়োজনে ।
এ সব কণিক ছলনার খেলা দেয় যে দুঃখ ক্লেশ,
ভবিষ্যতের ভাবনা কেন বা নিঃসহ ঘোঁবনে ।
দিনকয়েকেই শেষ ।
তোমার নয়নে পুলকের রেখা কেন যে চকিতে আঁকে ।
পলকে পলকে আঁখি পল্লব প্রেমের পরাগ মাখে,
মরম বীণায় স্পন্দন জাগে তব ।
কত দূরে যাওয়া কত ফিরে আসা কত জানাজানি নব ।
জীবনের চরে এত চোরাবালি তবুও চলতে হোলো,
ফুলঝরা রাতে মনের ছায়ায় আবেগে বলতে হোলো
প্রমীলা তোমায় মোহাতুর আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি
চেতনার কলরোলে ।
উদাস হাওয়ার পথে যেন কার বাজে স্তব্ধের বাঁশী,
মন দেয়া নেয়া তোমায় আমায় থমকে থাকার মাঝে
বিরহের সুর দোলো ।
বলতে পারিনে বলবার বাহা আছে ।
সোহাগে আবেশে তোমারে সাজাতে জাগলো যে অমুরাগ
কে যেন আমায় গানের ওপারে বাবে বারে দেয় ডাক ।
জীবনের স্রোতে জাগে বুদ্ধ মিশে যায় অবশেষে,
কণিকের প্রেম বুদ্ধ সম মন কেড়ে নেয় এসে ।

সেখা কুল কুল রবে বহিছে তটিনী...শীতল-সিক্ত তট ।
ধরণীর বুকে ফুলে-পল্লবে নববসন্ত-পট ।

বাজে বীণ ওই অলি-গুপ্তনে কোকিলের-কল-গানে ।
মধুমাসে আজ মধুর মিলন বধু-বঁধুয়ার সনে ।

সেই গঙ্গা পুলিনে বসিয়া বিজনে দুটিপ্রাণে কথা কয়
যবে সাক্ষ্য-গগনে গোধূলি-লগনে মলয় পবন বয় ।
নিতি-নব রূপ, সোণার বরণ, ভুবন-মোহন সাজ ।
শত বাধা দলি' কত সাধনার যুগল মিলেছে আজ ।
সব-ইন্দ্রিয় পরাণ সহিত, নয়নে মিলায়ে চায়—
নিখিল-রাগিণী মিশায়ে কণ্ঠে হুঁ হুঁ প্রেমালাপ গায় ।

সুখে গঙ্গা পুলিনে বসিয়া বিজনে দুটিপ্রাণে কথা কয় ।
যবে সাক্ষ্য-গগনে গোধূলি-লগনে মলয় পবন বয় ।
সরস পরশে, শিহরি' পুলকে, রসভরে ভাবে ভোর ।
হৃদয়ের ভাব, ভাষার না ফোটে, হরষে নয়ন-লোর !
পরিবর্তনে ছায়াছবি সম হুঁ হুঁ ধৌতে মিশি যায়—
অধর অমৃত পিয়ে মর-লোকে অমর-মিথুন প্রায় ।

ভাবে গঙ্গা পুলিনে বসিয়া বিজনে দুটি প্রাণে কথা কয় ।
যবে সাক্ষ্য-গগনে গোধূলি-লগনে মলয় পবন বয় ।

অনুশোচনা

শ্রীমতিলাল দাশ

কালো বলে গাল দিয়েছি তোমায় আমি প্রিয়তমে,
ভালবেসে আদর দিয়ে করিনি ত পূজা ;
সতীর মত অহঙ্কারে পুড়ে গেলি মনোরমে,
স্নেহের পরশ গুটিয়ে নিলি অগ্নি যুগলভূজা ।

সহজ করে পেয়েছিলাম মূল্য যে তাই দেইনি কিছু
হৃদয় তব নিইনি জিনে গভীর তপস্রাত্তে,
মানিক পেয়ে ফেলে দিলাম তাই ত শোকে মাথা নীচু,
তাইত কাঁদি চোখের জলে তিমিরঘন রাতে ।

কাঙালের ঘরে তুমি এসেছিলে রাজপ্রানী,
একটি দিনও সে কথা যে করিনি ত মনে ;
প্রভু হয়ে দেমাক ভরে শুনি নিত তোমার বাণী,
সেই কথা আজ পড়ছে মনে পড়ছে কণে কণে ।

প্রেমের হাটে যখন চলে পরস্পরের বিকি কিনি,
হৃদয় দিয়ে হৃদয় যখন নেই গো মোরা জিনি,
প্রেমের কমল ফোটে তখন সৌরভেতে গরবিনী,
সত্য শিবে সত্য করে লই গো তখন চিনি ।

গোঁয়ার আমি গায়ের জোরে কিনতে গেলাম প্রেমের হাটে,
ভেবেছিলাম বিনে কড়ি সওদা নেব কিনে,
ফাঁকি দিয়ে পায় কে ধনে ? পৌঁছে কে গো পারের ঘাটে,
সে ফাঁকি মোর গভীর ব্যাথায বাজে হৃদয়-বীণে ।

দিয়েছিলি সুযোগ কত, একটা দিনও বুঝিনি তো
আমি যে হার নেহাৎ বোকা ছিলাম না কি মনে ?
অগ্নি প্রিয়ে কাব্য দিয়ে মিছে ভরি শূন্য পাতা,
যে ধন গেছে ফিরবে না রে হার ত কোনই ক্ষণে ।

নিশীথে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম-এ

গঠন রজনী নিব্বম ধরণী,
প্রাণে জাগে হাচাকার ।
মনে হয় শুধু বিকল জনম—
ব্যর্থ জীবন-ভার ।
কি লাগিয়া খাটি—কি লাগিয়া ছুটি,
কোন্ আশা নিয়ে পড়ি আর উঠি ?
বিস্তৃত হৃদয়—তিস্ত তীত্র
জ্বালাময় সংসার ।

নিজ্রা-নিলীন নিখিল বিশ্ব,
মন করে ক্রন্দন ।
শিথিল হইয়া প'ড়েছে জীবনে
যেন কোন্ বন্ধন ।
কে দিল হৃদয়ে তুবানল জ্বালি'
ভরা বুক হায় কে করিল খালি ?
কোন্ অভিলাষে মরমের মাঝে
ব্যথা জাগে অমুখন ?

ফুলের সুবাস আসিছে 'ভাসিয়া,
নয়নে অশ্রুজল ।
ভাবি ব'সে একা কেমনে নিবাই
মরমের চিত্তানল ।
জীবনে মাধুরী আর কোথা নাই,
গেছে যাহা চ'লে আর কোথা পাই ?
চির অতৃপ্ত বহি' অন্তরে
বেঁচে আর কিবা ফল ।

চাঁদের কিরণে হাসিছে ভুবন,
হৃদয়ে অঙ্গকার ।
সেথায় উজল আলোকের রেখা
জ্বালিবে না কেহ আর !
এ জগতে হেরি' কাহার বয়ান
উলসি' উঠিবে আবার এই প্রাণ ?
বুকের আকাশে শুকতারা সম
জাগিবে হাসিটি কার ?

জাগিওনা

শ্রীশুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

শ্রুতির অন্তল পাতাল হইতে
জাগিও না কাল নাগিনী,
ঘুমাও ঘুমাও মিশরের মমী
অশরীরী হতভাগিনী ।
রজনীগন্ধা ঘুমায়েছে বনে,
সে মধুসন্ধ্যা আসে না ভবনে,
কেন এসেছিলে নীরব চরণে
ওগো নব অমুসাগিনী ?
ঘুমাও ঘুমাও অরুণ-বরণী
বিশ্রুতি অবগাহিনী ।

তব দংশন-বিষে মিশে তমু
সুধায় ভরিয়া ছিলে,
সে কি জ্বালা সখি সে কি রঙে রঙে
ভুবন রাঙায়ে দিলে ।
আকণ্ঠ বিষ করিয়াছি পান
নীলকণ্ঠের সম,
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো
সুন্দরী নিরুপম ।
ওগো বিদেশিনী জাগিও না তুমি
ঘুমঘোরে আমি জাগি নি ।

তোমার অধর-পরশে নিমেষে
জাগে নব নব রাগিনী ।

হে সারথি !

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আজিকার সংসারের কুরুক্ষেত্র রণে
সর্বনাশা সংঘাতের ক্রুর ঝলস্কণে
কোথা তুমি হে পার্থ-সারথি !
পাঞ্চজন্তু বাজেনা তো বিপ্লবের প্রথম আঘাত
উত্তাল উদ্ভাস ছন্দে ! কালজয়ী চক্রের ঘূর্ণনে
দাবানল জ্বলেনা তো বিশ্বগ্রাসী অগ্নির প্রাবনে !

—কোথায় গাণ্ডীবী তব ?
স্বর্ণরথে মদক্ষীত অশ্ববরা ধরি' তুমি যারে আনিলে সমরে,
বজ্রহস্তে তুলি' রক্তধনু, রাথি' তব চরনের 'পরে
যে তোমারে করিল প্রণাম !
আসন্ন ঝটিকা পূর্বে মুহূর্ত্ত বিরাম :
তাবপর তোমারি ইংগিতে
স্বর্গ মর্ত্য কেঁপে ওঠা তুর্য্যের সংগীতে
কোষযুক্ত অস্ত্রের ঝঙ্কার,
কুরুক্ষেত্র কালানল জ্বলে দিল মৃত্যুর বহ্নিতে ।

কই সে বিজয়ী বীর, বিশ্বজয়ী রথী ?
কোথায় দ্রৌপদী সতী ?
ধ্বংসের আগুনে রাঙা প্রলয়েব জলন্ত বিপ্লবে
যে নারী জনম লভে
উদ্ধাপাত সম ?
জীবন্ত প্রলয় শিখা, রক্তলিখা কল্মষ জটা শিবে,
উন্মত্ত আনন্দে মাধে জীবনের শেষ ব্রতটিরে
বেগীর বন্ধন লাগি' দুর্কৃত্তের কবোক্ষ কদরে ।
কই সেই চির বিপ্লবিনী ?
লাঞ্ছনার অপমানে বিশ্ববিজয়িনী
ধ্বিঁতা রক্তানী কই ?

হে চক্রী ! বৃথা তুমি সাজায়েছ ঐ
চতুরঙ্গ সেনা সমারোহ,
অগণিত অর্কোহিনী, শত লক্ষ রথী,
নিফল সংগ্রামে আজ একা তুমি নিঃসঙ্গ সারথী ।
মিথ্যা এই অভিমান, ব্যর্থ আয়োজন,
আজও তাই মদগর্বী ঘৃণ্য হুঃশাসন
সৃষ্টিরে শাসন করে লক্ষ নিষ্পেষনে,
কুর্জরিত বেদনার কঠিন বন্ধনে
নিষ্পিষ্ট জীবাত্মা কাদে ;

—হুর্নিবার দশ্যাতার লুক অত্যাচারে
পশুত্বের প্রমত্ত ব্যভিচারে—
দিকে দিকে লজ্জাহীন স্বার্থের লুণ্ঠনে
আজও বিশ্ব কেঁপে ওঠে কাতর ক্রন্দনে ।
প্রবলের অহংকারে, দুর্ব্বলের নিত্য অপমানে
প্রাণ মরে নিশিদিন মাথা খুঁড়ে ভাগ্যের পাখাণে ।
শক্তি আজি অবসন্ন, বীৰ্য্য অচেতন,
নিরুপায় নিরুৎসাহে মৃত্যুর মতন
বিভ্রান্ত অর্জুন কীদে যৌন অবসাদে ।

—দ্রৌপদীরা চুল বাঁধে
অধোমুখে অপমান হীন।
নির্লজ্জ ভোগের অভিসারে মধুহৃদে বেঁধে লয় বীণা,
চিরন্ত লালসার-কলঙ্ক শয়নে
আজিও ভজন করে নিত্যদিন নিরুদ্বেগে লক্ষ হুঃশাসনে ।

আজও সে অনাদি রিপু, আদিম বর্বর,,
বঞ্চনার মিথ্যা ভোগে সাজানো সংসার :
নিজিত দুর্জয় বল, নির্জিত পাণ্ডব,
নির্বীৰ্য্য নিঃস্বের কানে আবার বাজাও তব মহাশঙ্খ রব
শোনাও অমৃত গীতা ;
গত হোক ঘৃণ্য স্বার্থ ক্লিন্ন অবসাদ,
আবার জাগুক পার্থ বিপ্লবের মন্ত্র ল'য়ে কানে
দলিতা পাঞ্চালী নারী ক্ষিপ্ত অপমানে
দগ্ধ প্রাণ বেদনার ভস্মবাহি হ'তে
আবার লতুক জন্ম করালিনী ভূবন মোহিনী ।

সর্বজয়ী সংঘমেব বজ্রগর্ভ হ'তে
জলিয়া উঠুক শক্তি পূর্ণ বীৰ্য্যে চিহ্ন নিঃশঙ্কিনী ।
কল্পনার পটে আঁকা অশরীরি দৈবমূর্ত্তি নয়,
বাস্তব সংসার প্রান্তে জাগ্রত জীবন মাঝে
জনে জনে সে শক্তির হোক অভ্যাস ।

বিক্ষাসী এ বিপ্লবেরে—
হে নায়ক ! কুপায়িত কর নব প্রাণে,
এ যজ্ঞ সফল কর পূর্ণ কর
লক্ষ লক্ষ জীবনের নিত্য আত্মদানে !



বাংলার ঘরোয়া প্রবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জুতার কীকর—না ফেলা যায়, না রাখা যায়।

পথ চলিতে চলিতে যদি জুতার মধ্যে কীকর প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিরূপ অশান্তিতে পড়িতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাহাকে জুতার মধ্যে রাখাও যায় না, আবার বাহির করিবারও অসুবিধা।

সেইরূপ বাক্যটি আমাদের সংসারের ব্যাপারেও খাটে। বর্তমান যুগে অনেক দ্বীপুত্র জুতার কীকরের জায় পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। তাহাদের বাড়িতে রাখাও যায় না, দূর করিয়া দেওয়াও যায় না। গাখিলে অশান্তির জ্বালায় জ্বলিতে হয়; বার করিয়া দিলে লৌকিক গল্পনা ও দুর্গামের আঘাত সহ্য করিতে হয়। উভয়ই সম্ভব অবস্থা।

ঝিকে মেয়ে বউকে শিখানো।

পূরবধু পরের ঘরের মেয়ে; কোনও অজ্ঞারের জ্ঞান তাহাকে শাসন করার মধ্যে বিপর্যয় আছে। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে, হেলেরা বউদেরই আজ্ঞাধীন। এ অবস্থার বউকে কিছু থালা চলিবে না। অথচ তাহাকে একটু শিক্ষা না দিলেও নয়। তাই হুতর গৃহিণী আপন কন্ডাকে মারিয়া বউকে জানাইয়া দেন যে, এ মার আমার কন্ডাকে ঠিক নয়—তোমাকেই।

“ঠাকুর ঘরে কে?”

“আমি ত কলা খাট নি।”

বুদ্ধিহীন চোর! অপরাধ করিয়া সমস্ত চিন্তে আছে এবং কখন যে ধরা পড়ে সে জন্ত সতর্ক হইয়া আছে। তাহার কলা চুরি করিয়া খাওয়াটাই তাহার সারামন অধিকার করিয়া তাহাকে চকল করিয়া তুলিয়াছে। চায়া দেবিয়াই তার কারা কাপিয়া উঠিল, অর্থাৎ ঠাকুর ঘরের কথাতেই, পাকে-প্রকারে সে বীকার করিয়া ফেলিল যে সে নৈবেদ্যের কলাটি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এরকম চোরকে পায় আঁচে, কিন্তু চতুর চোরকে কারালা করা যায় তার কাজ নহে।

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই

নিধিহীন সর্দার!

পূর্বকালে বাংলার বহুগ্রামে ভূমিদার-আজিত ‘সর্দার’ থাকিত; তাহার বলবান এবং সাহসী ছিল এবং তাহাদের ঢাল তরোয়াল, লাঠি, বর্শা প্রভৃতি থাকিত। ভজাটের লোক এই সর্দারদের ভয়ের সহিত ভ্রম করিত। কিন্তু

নিধিহীনের ঢালও নাই, তরোয়ালও নাই; এবং বোধ হয় সর্দার হওয়ার উপযুক্ত শক্তি ও সাহসও নাই, আঁচে শুধু সর্দারের ভ্রম বুড়াইতে। কিন্তু তাহা হয় না। মিথ্যার উপর কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় না। সত্য চাই।

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

ঢেঁকির একমাত্র কাজই শুধু ধান ভানা। ধান ভানা ভিন্ন তাহার আর আর অজ্ঞ কোন কাজই চলে না। হুতরাং, মর্ন্তোও সে ধান ভানে, আর সশরীরে যদি স্বর্গে যাইতে পারে, সেখানেও তার ঐ একই কাজ। আমাদের সংসারে সমাজে বহু মানুষ-ঢেঁকি আছে, তাহাদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

ঢেঁকিকে থামাবো কত, নিত্য ধান ভানে।

অবোধকে বুঝাবো কত, বুঝ নাহি মানে।

ঢেঁকিকে থামাইয়া রাখা যায় না, গৃহস্থঘরে নিত্যই তাহাকে ধান ভানিতে হয়। তেমনি যে অবোধ, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারা যায় না। বিজ্ঞান নিত্যকর্মে তাহার সত্তা বৃদ্ধি পাওয়া দুর্লভ।

তরকারীর গুঁড়া ঝিঙে।

পাখীর গুঁড়া ফিঙে।

তরকারীর মধ্যে ঝিঙেকে গুঁড়া অর্থাৎ নিকুট রুলা হইতেছে। কিন্তু সত্যই ঝিঙে নিকুট কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। কারণ আয়ুর্বেদের মতে ঝিঙের গুণঃ—“ইহা শীতল, পিত্তনাশক, আগ্নেয়, জ্বর, কাস ও কৃমিনাশক, বহুমূত্র, মূত্রক্লমতা ও রক্তপিত্তে উত্তম পথ্য।”—হুতরাং ঝিঙে ত নিগুণ নহে। তবে পাখীর মধ্যে ফিঙে পাখী হয়! গুঁড়া হইতে পারে; যেহেতু সে বুলি বলিতেও পারে না, ভাল শিশু দিতেও পারে না; তাছাড়া তার গায়ের রং মিশ কালো। কিন্তু তার ঐ কালো রংটাই আমাদের মতো লোকের চোখে পরম সৌন্দর্য বিকাশ করে।

ভিল কুড়িয়ে ভাল।

অল্প অল্প সঞ্চয়ের দ্বারা বৃহৎ ভাণ্ডারের সৃষ্টি করা যায়। এই বাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ। মধ্যমিককার মধ্যক্ষে ইহার মূল্য প্রমাণ।

তুমি খাও ভাঁড়ে,

আমি খাই ঘাটে।

তুমি ত ভাঁড়ে জল খাও; আমার ভাঁড়ও নাই, আমি ঘাটে গিয়া জল খাইয়া আসি। আমি যে অভাবজনিত কষ্টে মনে ব্যথা অনুভব করি, অসু-

সন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে তাহাপেকাও অতাব অস্ত্রে ভোগ করিতেছে !
আগন হুঃখকট, নীচের দিকে অগ্নের সুঃখকটের সঙ্গে তুলনা করিলে,
নিজের হুঃখকট তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতে বখেট
সাবুনা পাওয়া যায় ।

তেল তামাকে পিত্ত নাপ—

বদি হয় বার মাস ।

আমাদের দেশে দেখা যায় যে মানের পূর্বে তৈল মাখিয়া অনেকেই এক-
ছিলম তামাক খাইয়া তারপর স্নান করিতে যান । কিন্তু ইহাতে সত্যই
পিত্তনাশ হয় কিনা, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন । কথটার বখন স্মৃতি
হইয়াছে, তখন ইহার মধ্যে অন্ততঃ কিছু সত্য থাকি সম্ভব ।

তোমার বা ভালবাসা—

কালীপূজার পাঠা পোষা ।

কালীপূজার বলিদানের লক্ষ পাঠা কিনিয়া লোকে তাকে ভারী বস্ত্র করে ;
উদ্দেশ্য— পাঠাটি বেশ ফুটপুট হয় এবং কোন প্রকার খুঁত না পায় । তাহা
হইলে বলিদান সর্বাঙ্গসুন্দর এবং পুণ্যময় হইবে । ইহা ছাড়া পাঠার
প্রতি বস্ত্র ভালবাসার দ্বিতীয় কোন কারণ নাই । পুত্রক নিজের লক্ষ্যই
পাঠাকে ভালবাসিতেছেন, পাঠার লক্ষ্য নহে । এখানে এই বাক্যের বক্তা ও
তাহার প্রতি আর একজনের ভালবাসা সবকে হুঃখ করিয়া বলিতেছে,
“আমার প্রতি তোমার এই যে ভালবাসা এত শুধু আমাকে ধ্বংস করিবার
অভিপ্রায় !” পূর্বকালে এদেশে কাপালিকরা তাহাদের বলির মানুষের
প্রতিও এরূপ ভালবাসা দেখাইত ও তাহাকে নানাভাবে তোরঙ্গ করিত ।

তোমারও পারে গোদা,

আমারও ভগ্নশোধ ।

উত্তরের বাগীতে উত্তরের বাতারাৎ, উত্তরের প্রতি উত্তরের স্রীতি ভালবাসার
এই শেষ । তুমিও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলে, আমিও তোমার সহিত সকল
সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম ।

“তোরা ধান ভানাবি গা ?

—না-ভানাবার গা ।”

কোন এক ব্যাপারে, চতুর লোক মুখে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া ইলারা ইঞ্জিতের
দ্বারা জানাইয়া দিল যে তাহার একাধা করিতে ইচ্ছা—অর্থাৎ গা নাই ।
সংসারে বাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে ।

তোর শিল, তোর নোড়া—

তোরই ভাজি দাঁতের গোড়া ।

মর্ধ্যং, তোমারই অস্ত্র লইয়া তোমাকেই আঘাত করিব । নানা বিভিন্ন
বিষয়ে বাক্যটি খাটে ; যেমন—তোমারই শত্রুক্ষেত্র, তোমারই পরিভ্রম,
তোমারই চাব-আবাদ, তোমারই শত্রু সত্তার, অথচ তোমাকেই সে-সবে
প্রতি করিয়া না খাইতে দিয়া মাঝি ।

দশচক্রে ভগবান ভূত ।

দশ জনের অর্থাৎ অনেকের মিলিত যে চক্রান্ত, তাহার শক্তি অধিক । সেই
শক্তির বলে ভগবানকে পর্যন্ত ভূত বানান যায় ।

দেশে মিলি করি কাজ,

হারি জিতি নাহি লাজ ।

দশজনে মিলিয়া কোন কাজ করিলে তাহা সকল হইবারই সম্ভাবনা বেশী ।
আর যদি না-ও সফল হয়, তাহা হইলে তাহাতে লজ্জার কিছু থাকে না,
পরাজয়ের মানি কোন একজনকে সম্পূর্ণ ভোগ করিতে হয় না, তাহা সকলের
মধ্যে অংশ হইয়া যায় । মানুষ সামাজিক প্রাণী ; সুতরাং কোন বড় কাজ
সকলের মিলিত পরামর্শ মত করাই ভাল । শক্তি অতি সামান্য হইলেও,
যদি তাহা দেশের মিলিত শক্তি হয় তবে তহার মং কাজও সমাধা হয় ।
এক এক বিন্দু বৃষ্টি বারি মিলিত হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয় ।

দেশের আঁটি একের বোঝা ।

দশজনের দশটা আঁটি, একজনের পক্ষে বোঝা হইয়া পড়ে ! এই বাক্যের
বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরোজন । কাজ ভাগ করিয়া লইলে, কাহারও পক্ষে
তাহা সম্পন্ন করা কঠিন হয় না, অথচ সমস্ত কাজটি নির্বিকার ও সহজে
সম্পন্ন হইয়া যায় ।

দাতার অগ্র, বখিলের শেষ ।

প্রথম থেকেই দাতার হাত খোলা । বখিলের—অর্থাৎ ভুগুণের যদি বা হাত
খোলে ত শেষের দিকে । যেমন, কোন ভোজ্যের ব্যাপারে যদি সন্দেশ
ইত্যাদি পরিবেশনের ভার কোন দাতা স্বভাবের লোকের উপর পড়ে, তাহা
হইলে গোড়া হইতেই তিনি তার দরজা হাতে সন্দেশ বটন মূর করিবেন ।
পরে দেখিবেন, সন্দেশ কমিয়া আসিতেছে, অথচ বহু লোক এখনো বাকী ।
কিন্তু বখিলের কাজ ইহার ঠিক বিপরীত ।

দাঁত আর আঁত ।

দন্ত আর মস্ত ; অল্পকে এখানে হজমশক্তি বৃদ্ধিতে হইবে । মানুষের দাঁত
যদি ভাল থাকে আর ‘লিভার’ অর্থাৎ আঁত যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে
তাহার বড় একটা রোগ হয় না । অনেকে আবার এই অর্থে এই বাক্যটিও
ব্যবহার করেন—‘ভুড়ি আর মূড়ি’ । মানে, মস্তিষ্ক এবং ভুড়ি অর্থাৎ পেট
ভাল থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে ।

দুর্জনেকে পরিহার,

দূর থেকে নমস্কার ।

দুষ্ট লোকের সঙ্গে ভাগ কর এবং তাহাকে দূর হইতে নমস্কার কর ।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো দুষ্টের সংসর্গে থাকে না । দুষ্টকে নমস্কার করিবার
আবশ্যক হইলে দূর হইতেই নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়ে ।

দিয়ে কিঞ্চিৎ,

না কোরো বঞ্চিত ।

দিবার শক্তি থাকিলে, দ্বারীকে একেবারে রিক্ত হাতে ফিরাইয়া না দিয়া
কিছু তাহাকে দিও । সে যদি দানের উপযুক্ত পাত্রও না হয়, যদি

অপাত্রই হয়, তাহা হইলেও তাহাকে কিঞ্চিৎ দিরা বিহার কর; ইহাই নীতিশাস্ত্র।

দেখিস্-ভোর,

না-দেখিস্—মোর।

যেমন তোমার জিনিস; আশ্রসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহা হস্তগত করিলাম; সেই সময়ে তাহা যদি তোমার লক্ষ্যে পড়ে, অমনি কোন অহিলায় তাহা তোমার কিরাউরা দিয়া আমার সাধুতার বাহাদুরী লইলাম।

‘দেবী! তুমি কোথা?’

‘—তাড়াতাড়ি যেথা।’

অর্থাৎ যে কাজে তাড়াতাড়ি করা যায়, প্রায়ই দেখা যায় যে সেইকাজেই দেবী হইয়া পড়ে।

দাতার চেয়ে বখিল ভাল—

স্পষ্ট জবাব দেয়।

কুপণের চকুলজ্জা নাই। তুমি কুপণের কাছে গিয়া কোন বিষয়ের চাঁদা চাহিলে, কুপণ চারিটা পয়সা দিয়া বলিল, আর পারিব না। তার স্পষ্ট কথা। ঐ চারি পয়সা নিতে হয় নাও, না নাও ত সিদে পথ দেখ, সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। আর সাধারণ লোক—তাদের চকুলজ্জায় স্পষ্ট কথা বলিবার সাহস নাই। তাহা হইত বড় রকম কিছু একটা আশা

দিল; কিন্তু একমাস ঘুরাইয়া তোমাকে কাহিল করিয়া ফেলিল। কলে তাহার কাছ থেকে তুমি একটি পয়সাও পাইলে না, উপরন্তু সময় নষ্ট হইল।

ধরি মাছ, না ছুঁই পাণি।

জল না ঘাঁটিয়া, কাপড়-চোপড়ে কাপা না মাখিয়া মাছ ধরিয়া আনি। ইহাতে আমার কত-না বাহাদুরী?—সত্যই বাহাদুরী বটে। এমনভাবে কাথোজ্য করিবার শক্তি সকলের থাকে না। সকলের অলক্ষ্যে, সকলের অজ্ঞাতসারে, কোনরূপ হৈ-চৈ না করিয়া কাজ হাসিল করিয়া আসা—ইহা খুব কম লোকেই পারে।

ধান ভানিতে শিবের গীত।

এক বিষয়ের আলোচনায়, অল্প বিষয়ের অবতারণা বিষদৃশ্য। শিবের গীত গাহিতে হইলে শিব-মন্দিরে বা গাজনতলায় গাহিতে হয়। ধান ভানিতে ভানিতে শিবের গীত চলে না।

ধারে কাটা, আর ভায়ে কাটা।

ধারে কাটাই স্বাভাবিক, ভায়ে হয়ত কাটিতে পারে কিন্তু তেমন কাটার কোন মূল্য নাই—আমর নাই। শক্তি এবং গুণের জন্ত যে পুরস্কার তাহাই বখার্ব পুরস্কার। আর পিছন হইতে হুপারিশের জোরে যে পুরস্কার, তাহার কোন সত্যিকারের মূল্য নাই।

[ক্রমশঃ]

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

ছয়

(৫) বিশেষক-চ্ছেদ্য—বিশোধরজ্ঞ বলিয়াছেন—‘বিশেষক’- শব্দের অর্থ—‘তিলক’, বাহা ললাটে প্রদত্ত (অর্থাৎ অঙ্কিত) হইয়া থাকে। ভূর্জপত্রাদি নানা-পত্রময় তিলক অনেক প্রকারে ছেদন করা হইত। ইহাকেই ‘পত্রক্ষেত’ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। মহর্ষি বাৎস্তায়ন এই সকল নানা প্রকার পত্রক্ষেতের উপযোগিতা যথাস্থানে বলিয়াছেন—‘নানারূপ অভিপ্রায়ে সূচক পত্রক্ষেত নায়ক নাট্যকার নিকট প্রেরণ করিবেন’ ইত্যাদি। বিশোধর আরও বলিয়াছেন যে—‘বিশেষক’-শব্দটি আদর্শার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিলাসিনীগণের অতি প্রিয় ছিল বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইত ‘বিশেষক’।^১

১। ‘বিশেষকতিলকো বা ললাটে প্রদত্ত, তত্ত্ব ভূর্জপত্রময়ভাষ্য-প্রকারং যেনননৈব হেতুঃ। পত্রক্ষেতমিতি বক্তব্যং। বক্তৃতি চ—

মোটের উপর ‘বিশেষক-চ্ছেদ্য’ হইতেছে—অলকা-

তিলকা-কাটা। সে কালে সে কেবল চন্দন-কুঙ্কুমাদি-দ্বারা তিলক রচিত হইত তাহা নহে, পক্ষান্তরে অনেক সময় ভূর্জপত্র বা ঐরূপ কোন কোন সূক্ষ্ম মৃৎ ও পাতলা বৃক্ষজ ইত্যাদিভাষ্য বস্ত্র নানা আকারে কাটিয়া কপালে ও কপোলে আঁটিয়া দেওয়া হইত। বর্তমান সময় হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পল্লীগ্রামের বাজালী মেয়েদের

‘পত্রক্ষেত্যানি নামান্তিপ্রাকৃতানি শ্রেষ্ঠে’ (৫৪৮।৩৮)—ইতি। সত্যং। বিশেষকগ্রহণবাদ্যর্থং, বিলাসিনীনাতিভিন্নার্থং।—জন্মজলা।

৩মহেশচন্দ্র পালের কামমূর্ত্তের সংস্করণে টীকাযুগ-কর্ত্তা বলিয়াছেন—‘এস্থলে টীকাকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। পত্রক্ষেত বিশেষকক্ষেত্রেই একটি প্রকারভেদ বলিয়া আমরা জ্ঞানি। বাৎস্তায়নেরও সেইরূপ অভিপ্রায় না হইলে হুই স্থানে হুইরূপ বলিলে কেন? বিশেষক-ক্ষেত বলিলে বুঝিতে হইবে, বাহা কোন অভিপ্রায় বা সঙ্কেতের পরিচায়ক, অথচ সাধারণের ভ্রমের হেতু-ভেদাদি-বোধ্য চিহ্ন-বিশেষ। বর্তমানকালে

মধ্যে কাঁচপোকা-সোনাপোকা ইত্যাদি পতঙ্গের পাখা কাটিয়া টিপ-পরার প্রথা খুবই প্রচলিত ছিল। তাহার পর মধ্যে কিছুদিন টিপ কাটিয়া পরার প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য তাই বলিয়া সিন্দূরের টিপ পরার প্রথা কোন দিনই উঠিয়া যায় নাই। তবে টিপ-কাটার প্রথা মধ্যে প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। সম্প্রতি সিনেমার প্রভাবে আবার নানারূপ আকৃতির টিপের খুবই প্রচলন হইয়াছে। সেলুলয়েড, পাতলা কাচ, রাঙা ইত্যাদি নানাজাতীয় পদার্থই ইহাদিগের উপাদান। আর অতি ক্ষুদ্র খড়িকার অগ্রভাগ হইতে এক বা দেড় ইঞ্চি ব্যাস পর্য্যন্ত উহাদিগের পরিমাণ। আর আকৃতির ত কথাই নাই। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় বা লৌকিক পদার্থের প্রতীক-রূপে বস্তু কিছু চিহ্ন কল্পিত হইতে পারে, প্রায় সে সকল আকারেরই টিপ বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

অক ও বখিরাদির শিক্ষার্থ আবিস্কৃত সঙ্কেতলিপি প্রভৃতি এই কলারই অন্তর্গত হইবে—(কামনুত্র, ৮মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, পৃঃ ৮৭)

আমাদিগের বক্তব্য এই যে, লেখক পত্রচ্ছেদ ও বিশেষকচ্ছেদের মধ্যে যে ভেদ পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন, তাহার কোন সমর্থক দৃঢ় প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহা অসম্ভব নহে যে, অতিপ্রায় বিশেষের সূচক হইত বলিয়াই এইপ্রকার চেষ্টাকে ‘বিশেষকচ্ছেদ’ নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া পত্রচ্ছেদ ও বিশেষকচ্ছেদকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কলা বলার পক্ষে কোন বিশেষ যুক্তিসহ প্রমাণ নাই। মহর্ষি বাৎস্ত্যয়ন এ স্থলে ‘বিশেষকচ্ছেদ’ ও অন্তঃস্থলে ‘পত্রচ্ছেদ’—এই দুইটি নাম ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই যে ইহারা দুইটি অত্যন্ত ভিন্ন কলা—এরূপ মনে করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাব। ইহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলে চতুঃষষ্টি কলার তালিকার মধ্যে উভয়ের পৃথক্ উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। কিন্তু তাহা না থাকার উভয়ের প্রভেদ পরিস্ফুট নহে। অব-বখিরাদির শিক্ষার্থ ব্যবহৃত সঙ্কেত-লিপি (Code) বিশেষকচ্ছেদ কলার অন্তর্ভুক্ত—ইহা মনে করা যায় না। সঙ্কেত-লিপির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, চিহ্নবিশেষ অক্ষরবিশেষের প্রতীক, এমন কি, কোন কোন স্থলে চিহ্নবিশেষ শব্দ-বিশেষ বা ক্ষুদ্রবাক্য ও বাক্যাংশের প্রতীক রূপেও ব্যবহৃত হয়—(যথা, Morse Telegraph Code, Braile Code, Pitman's short-hand Code ইত্যাদি)। কিন্তু বিশেষকচ্ছেদ ঠিক ঐ ভাৱে নহে। ধরুন, কোন নারক একটি মূর্তি পদ্মপুষ্প ও একটি অক্ষুটিত কুম্ভ-পুষ্পের আকারে বিশেষক-চ্ছেদ কাটিয়া নারিকার নিকট প্রেরণ করিলেন। উহাতে বুঝাইবে যে—গুরুগণকে সজ্ঞা-সমাগমে পদ্ম মূর্তি ও কুম্ভ অক্ষুটিত হইলে নারক নারিকার সহিত মিলিত হইবেন। ইহা সম্পূর্ণ ভোক্তা-ব্যঞ্জনার ব্যাপার। কোন Codeএ এতখানি অর্থ বুঝাইতে পারে না। এইরূপ সাঙ্কেতিক অতিপ্রায়-জ্ঞাপনের কথাই মহর্ষি পারদারিকাদিকরণের চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন ও উহাই বংশোদ্ভূতের টীকার উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা কোন নারক-নারিকার পরস্পর জ্ঞাত সঙ্কেত, সর্বজন-পরিচিত কোনরূপ সাঙ্কেতিক লিপি (Code) নহে।

কখনও কখনও একাধিক টিপের ব্যবহারও বর্তমানে দেখা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ‘বিশেষক’ কপালের তিলক বা টিপ। কপালের তিলকই তিলক-জাতির প্রধান বলিয়া পরম সমাদরে সেই নামেই কলাটির নাম-করণ করা হইয়াছে—ইহাই বংশোদ্ভূতের নিগূঢ় অতিপ্রায়। বস্তুতঃ, এ কলাটির ব্যাপক নাম—‘পত্রচ্ছেদ’। পত্র-লেখা, পত্র-ভঙ্গ, পত্র-মঞ্জরী ইত্যাদি ইহারই নামান্তর। কেবল কপালে কেন, কপোলে, গলায়, বাহুতে, বক্ষে ও অন্যান্য নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও পত্রচ্ছেদ রচনা করা হইত। কেবল যে ভূজাদি পত্র কাটিয়া এই সব ছেদ রচিত হইত—তাহা নহে; গোবোচনা-কন্তুরী কুঙ্কম-অঙ্ক-চন্দন ইত্যাদি নানাপ্রকার স্তম্ভক্সি স্নিগ্ধ অমূল্যপদ-দ্রব্যের সাহায্যে লতা-পাতার আকারে নানারূপ চিত্র-বিচিত্র অলকা-তিলকা কাটা হইত বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছিল ‘পত্রচ্ছেদ’। প্রাচীন যুগে এই কলাটি নারীজাতির অতি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শুধু নারিগণ নহেন, কখনও কখনও পুরুষগণও ইহার চর্চার বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। ইহার জাজগামান নিদর্শন ছিলেন স্বয়ং বৎসরাজ উদয়ন। বর্তমানে বিবাহাদির সময়ে ক’নেকে যে ‘কনে-চন্দন’ পরান হয় বা বরকে যে ভাবে ‘বর-চন্দন’ দিয়া সাজান হয়, সে কোশলও এই প্রাচীন কলাটির তত্ত্বাবশেষ বলা চলে। নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের উপাসকগণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ললাটদেশে যে-সকল নানা বর্ণ ও আকৃতির নানাবিধ তিলক রচনা করেন (যথা রামাঞ্জলী, মাধব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিভিন্নরূপ তিলক, গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ‘হরিমন্দির’ বা বৈষ্ণবীর ললাটের ‘রসকলি’, শৈবের ললাটস্থিত ত্রিপুরা, শাক্তের কপালে সুরহং সিন্দূরের কোটা ইত্যাদি), সে সকল তিলক-রচনার কোশলও এই কলাটির অন্তর্গত। আর গজার ঘাটে (বিশেষ ভাবে কলিকাতা ও কালীতে) উড়িয়া বা হিন্দুস্থানী ঘাট-পাণ্ডাগণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বা পাড়ারগেয়ে স্ত্রীলোকদিগের কপালে-কপোলে-নাগিকায় ও চিবুকে যে নানারূপ দেবতার নামযুক্ত লতা-পাতার ‘ছাপা’ চন্দন অথবা তিলক-মাটির সাহায্যে কাটিয়া দেয়, তাহাও বিশেষকচ্ছেদেরই রূপান্তর বলিতে হইবে। বিগত যুগের

বাক্যালী মেয়েরা যুখে ও অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে নানা বর্ণ ও আকৃতির উর্দ্ধ পরিভেন ও এখন পর্যন্ত হিন্দুস্থানী মেয়েরা বাহা পরিয়া থাকেন, বাহার প্রভাব কেবল নারীসমাজে নহে, পুরুষসমাজেও (বিশেষতঃ দেশ-বিদেশের সৈনিক-সম্প্রদায়ে) বিপুল ভাবে সংক্রামিত হইয়াছে—সেই উল্লি-পন্নর কৌশলও এই কলারই অন্তর্ভুক্ত—ইহা নিঃসংশয় বলা চলে। আর কোন কোন পায়ে আলতা-পরাণকেও কথঞ্চিৎ ইহার মধ্যে ফেলা চলিতে পারে। তবে আমাদের মতে উহাকে অঙ্গরাগের মধ্যেই ধরা সঙ্গত।

এইবার এই প্রসঙ্গে আধুনিক ব্যাখ্যাভূগণকে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমাদের উক্তির সমর্থন-কল্পে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা যাউতেছে।

স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর কালীধর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার পট্টিচর-প্রদান-করে বলিয়াছেন—“পূর্বকালে এ দেশের নর-নারীগণ চন্দন ও কুঁড়ুমাদি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিত। এই চিত্র-রচনার (অলকা তিলকা প্রভৃতি) কৌশল-বিশেষকে ‘বিশেষকচ্ছেদ’ বলিত। ইহা মালীর মেয়ে ও নাপ্তেনী প্রভৃতির জীবিকা ছিল। এক্ষণে লোক সত্য হইয়াছে বলিয়া অলকা-তিলকা পরে না ও কাজে কাজেই উহা এক্ষণে জীবিকা-পনবাচ্য নহে। কেবল নাপ্তেনীর কখন কখন আলতা পরাইয়া দুই এক পরস্যা পায় মাত্র। বিশেষকচ্ছেদ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য এক্ষণে একটি মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতার ও কাশীর গঙ্গার স্নান করিতে গিয়া লোকে উড়ে ও হিন্দুস্থানী বাটওয়ালার নিকট যে চন্দনের ছাপা পরিয়া আইসে, তাহাই পূর্বকালের বিশেষকচ্ছেদের অপভ্রংশ বা অলুপ্তরূপ”। ২

পণ্ডিতপ্রবর ৮পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কামহৃত্যের সংস্করণে বলিয়াছেন—“বিশেষক ললাটের তিলক,—ভূর্জপত্র কাটিয়া তিলক রচনার প্রথা ছিল ;—কেবল ভূর্জপত্র নহে—আরও উপকরণ ছিল, কিছুদিন পূর্বে কাচপোকাকার টিপকাটা এই সহর অঞ্চলেও ছিল। ললাটের তিলক প্রধাম বলিয়া তাহার নামই এখানে আছে ; কলহঃ এত যে কলা, ইহার বাপক নাম ‘পত্রচ্ছেদ’। কেবল ললাটে নহে—কপোলে ও

তখন প্রকৃতিতেও এই পত্রচ্ছেদ রচিত হইত। পত্রবৎ আকৃতিযুক্ত কুঁড়ুমাদি অঙ্কিত, তিলকও পত্রচ্ছেদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই শিল্প তখন অত্যন্ত উৎকর্ষগত করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কলাকুশল বৎসরাজ এই তিলক-রচনার অধিতীর ছিলেন”। ৩

৮হুয়েশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—“চন্দন ও কুঁড়ুম প্রভৃতি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিবার ব্যবসা-বিশেষ”। ৪

৮কুন্ডলচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন—“বিশেষকচ্ছেদ বোঝ হয় অলকা তিলকা প্রভৃতি দেওয়ার কাৰ্য্য”। ৫

বৎসরাজ উদয়ন এই বিশেষকচ্ছেদ-রচনার সবিশেষ অতিষ্ঠ ছিলেন—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে দৃষ্ট হয় যে—কুমার উদয়ন বাল্যকালে এক ব্যাধের হস্ত হইতে বাহুকির জোষ্ঠ ভ্রাতা নাগরাজ বহু-নেমিকের রক্ষা করার তিনি শ্রীত হইয়া কুমারকে ঘোববতী বীণা প্রদান করেন ও তাৎপূর্ণ-রচনার কৌশল ও অঙ্গান মালা তিলক-যুক্তির কৌশল শিখাইয়া দেন। ৬ বছরদিন পরে উদয়ন যখন বাসবদত্তাকে লাভগণকে অগ্নিদাহে দগ্ধা হ্রি করিয়া পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন, তখন বিবাহকালে পদ্মাবতীর ললাটে অঙ্গান তিলক ও গলদেশে অঙ্গান-মালা দেখিয়া সন্দেহ করেন যে, বাসবদত্তা সত্যই অগ্নিদগ্ধা হন নাই, কারণ ঐরূপ মালা-তিলক-রচনার কৌশল একমাত্র তিনি জানিতেন ও তাঁহার

৩। কামহৃত্য, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৬০-৬১।

৪। ৮হুয়েশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ককিপুরাণ, পৃঃ ২৫, পাদটীকা। সমাজপতি মহাশয় ‘ছেদ’ শব্দটির বৌদ্ধিক অর্থটি ধরিতে পারেন নাই। ভূর্জাদি পত্র নানা আকারে ছোঁত হইত বলিয়াই ইহার নাম ‘পত্রচ্ছেদ’—ইহাই এই শব্দটির মূখ্যার্থ। চন্দন-কুঁড়ুমাদি দ্বারা তিলক অঙ্কন ইহা গৌণার্থ।

৫। কৌমুদী, পৃঃ ২৭ ‘বোধ হয়’ বলিবার কোন সার্বকতা নাই। বিশেষকচ্ছেদ আর অলকা-তিলকা একই।

৬। “বহুনেমিরিত খ্যাতো জ্যোষ্ঠা ভ্রাতামি বাহুকেঃ। ইমাং বীণাং গৃহাণ বঃ...তাত্মলীপ্ত সহাচান-মালাতিলকযুক্তিঃ।—কথাসরিৎসাগর, কথামুখ-লবক, প্রথম ভাগ, ৮০-৮১ ; নির্ণয়সাগর সং, পৃঃ ২৩। ক্ষেমেস্তের বৃহৎকথামঞ্জরীতে বর্ণিত আছে যে, নাগটির মাখ কিরুর ; তিনি নাগরাজ যুতরাষ্ট্রের পুত্র। তিনি নিজ ভগিনী ললিতার সহিত উদয়নের বিবাহ ঘেন ও ঘোববতী বীণা ও অঙ্গান মালা উপহার দিয়াছিলেন। তিলকের উল্লেখ এ স্থলে নাই।

“স কিরুরাভিধো নাগো যুতরাষ্ট্রহন্তঃ.....

ভগিনীং ললিতাভিখ্যাং নদঃসুহরনার সং.....

তাত্মলীপ্তপ্রহরানাতং বীণাং ঘোববতীমপি ॥ ১৭ ৯০

বৃহৎকথামঞ্জরী, কথামুখলবক, প্রথমভাগ।

২। শির—‘বার্ভাগাঙ্গ বা জীবিকাতত্ত্ব’—৮কালীধর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক লিখিত—লিঙ্গপুঞ্জালি, প্রথম খণ্ড, ১১২২ সাল, পৃঃ ৩।

প্রথমা পত্নী বাসবদত্তা তাঁহার নিকট উহা শিখিয়াছিলেন—
অপর কাঁচারও পক্ষে উহা জ্ঞানার সম্ভাবনা ছিল না ৭।

বিশেষকচ্ছেদ, পত্রভঙ্গ, পত্রফল্লরী, পত্রলেখা, তিলক ইত্যাদির বর্ণনার সমগ্র সংস্কৃত-কাব্য-সাহিত্য বিশেষভাবে সুখর। তিলকাক্ষিত বৈদ্যবিন্দু-নিচিত সুবতী-মুখ-পদ্ম সংস্কৃত কবিগণের একটি অতি প্রিয় বর্ণনার বিষয়। পাদটীকায় কয়েকটি বিশেষ স্থল উদ্ধৃত হইল ৮।

৭। “তস্তাচ্চ মালাতিলকে দিবাংবালোকা তৌ নিভৌ ।...রাজা
পদ্মাবতীঃ রহঃ । পশ্চচ্চ মালাতিলকে কেনেনৌ তে কৃতাবিতি ”।

৭৮—:০১

(কথাসরিৎসাগর, লাবণ্যক-লব্ধক, দ্বিতীয় ভরঙ্গ)

‘অবস্তিকাবিরচিতাং তিলকং মালিকাং তথা ।

অন্নানাং বীক্য ভূপালো বর্ণিতা ধৃতিং যথো ।

বথঃ জীবতি মে দেবী নাজা বৈজি হরা বিনা ।

মালিকাং তিলকং চেষমিতি ধ্যাওয়া জহর্থ সঃ ২৮-২২

৮ ১। “বিরচিতা মধুনোপবনজিহ্মভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ”—
(রঘুবংশ, ২।২৯) কুরবক-কুম্ভমণিকায় দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন
কুসুমের বসন্ত উপবনলক্ষ্মীর পত্রলেখা রচনা করিয়া দিয়াছেন ।

২। “ষেদোদগমঃ কিস্পুকযাজ্ঞানানাং

চক্রে পদং পত্রবিশেষকেবু ।” (কুমারসম্ভব ৩।৩০)

কিস্পুক-রমণীগণের পত্রলেখার ষেদোদগম দেখা দিল ।

৩। “বিশেষকো বা বিশিষেয যস্তাঃ

প্রিয়ং ত্রিলোকীতিলকঃ স এব ।” (শিশুপালবধ ৩।৬০)

বধুর ললাটস্থ তিসকের স্থায় ত্রিলোকীভূষণ হরি সেই নগরীর শোভাবর্ধন
করিয়াছিলেন ।

৪। “মুদৈন্দনবিশেষকভক্তিঃ” (শিশুপালবধ ১০।৮৪)

সজোগ দ্বারা চন্দন-তিলক-রচনা মর্দিত ।

৫। ‘কল্পত কালাভরণপত্রা’ (রঘু ১৩ ৫৫)

কৃষ্ণাভরণ-রচিত পত্রলেখার স্তায় ।

৬। “রচয় কুচরোঃ পত্রং চিত্রং কুবব কপোলরোঃ” (পীতগোবিন্দ ১২)
— কুচবৃগে ও কপোলবৃগে পত্র রচনা কর ।

৭। ‘কন্তুরীধরণপত্রভঙ্গনিকরো যুট্টো ন গণ্ডহলে’ (শূদ্রারতিলক ৭)

— গণ্ডহলে কন্তুরী রচিত-পত্রভঙ্গনবৃহ মর্দিত হয় নাই (কাশ্মীরীতেও
‘পত্রভঙ্গ’ বহুহলে বর্ণিত হইয়াছে) ।

৮। “চকার যাইরদুহরানানাঃ গণ্ডহলীঃ প্রোঁষতপত্রলেখাঃ”—রঘু
(৩।২) শরনিকরে অস্ত্রাঙ্গনাদিগের গণ্ডহলের পত্রলেখা বিবৃত
করিয়াছিলেন ।

৯। “উদ্বলকেপশ্চাত্তপত্রলেখাঃ” (রঘু ১৩.৬৭) বেশপাশ বন্ধনমুক্ত
ও পত্ররচনা বিচ্যুত হইয়া ভটিয়াছে ।

১০। “ভুজো লটীপত্রবিশেষকাভতে” (রঘু ৩।৫৫) লটীর পত্রলেখাক্ষিত
মুখমণ্ডলের বর্ণণে ইন্দ্রের যে বাহু চন্দনাদির রেখাভূষিত ।

১১। “কস্তান্তিমুখমমু খৌতপত্রলেখম্” (শিশুপালবধ ৮।৫৬)

কোন অঙ্গনার মুখে পত্রাবলী খৌত হইয়া গিয়াছে ।

১২। “গণ্ডেবু ক্ষুটরনোজপত্রবদী” (শিশুপালবধ ৮।৫৯) বধুগণের
গণ্ডদেশে পত্রলেখার স্তায় পদ্মপত্র পরিস্ফুটভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল ।

১৩। “মুখে মধুশ্রী তিলকং প্রাকান্ত” (কুমারসম্ভব ৩।৫০) বসন্তলক্ষ্মী
তিলকপুষ্পরূপ তিলক মুখমণ্ডলে প্রাকটিত করিলেন ।

১৪। “কন্তুরীকাতিলকমালি বিধার সারম্” (ভামিনী-বিলাস ২ ৪)

সখি । সজ্জায় কন্তুরীতিলক রচনা করিয়াছিলে ।

১৫। “চাক নৃত্যবিগমে চতুসুখং ষেদভিপ্রতিলকং পরিপ্রমাৎ” (রঘু
১০।১৫) নৃত্যাবসান পরিপ্রমত্তবশতঃ বিগলিত ষেদবারার নর্তকীগণের
তিলক বিলুপিত হইয়া যাইত ।

১৬। “কন্তুরীতিলকং ললাটকলকে

বন্ধঃহলে কোন্তুভম্” (দ্বিতুকভক্তিঃ)

ললাটকলকে কন্তুরীতিলক ও বন্ধে কোন্তুত মণি বিরাজমান ।

কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইল । এক্ষণ শত শত যুট্টান্ত সংস্কৃত-কাব্য-
সাহিত্যের পাত্রে পাত্রে ছড়ান রহিয়াছে । সে সকলের সম্বন্ধে প্রবন্ধ অবশ্য
ভাষ্যক্রান্ত করার কোন লাভ নাই ।

[ক্রমশঃ

পদ্মার পারে একটি গাই

শ্রীরাইচরণ চক্রবর্তী, এম-এ, বি-টি, বিদ্যাবিনোদ

অকুল পদ্মার পার—সজ্জার কুলার

রবি ডুবে যায় যায়, চেরে আছে গাই ;

তুবা মিটিয়াছে তার, জল নাহি খায়

কত কি বলিতে যেন রহিয়াছে তাই ।

কেহ নাহি কাছে—গৃহভলি অতি দূর,

মনে মনে বলিলাম এ যেন কেমন ।

দিন যায়, রাত্রি আসে তবু নিজা ঘোর,

দাঁড়াইয়া আছে গাই পারেরেতে তেমন ।

জীবন্ত ছবির মত কহিতেছে কথা

তনি তার মর্ম্মবাণী পেতে থাকি কাণ—

দূর হ’তে জানি হার কত তার ব্যথা

অশ্রু উপহার দিয়ে ছড়ায় পরাণ ।

অনন্ত শ্রোতের সাথে সে যে বাক্যবারা,

জানে তার কল্পনের তুবাধীন ধারা ।

শিশু-সংবাদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

(গোড়ার কাচিনী : তৃতীয় পর্ক)

নড়াগিরি থেপ্‌বার দিন তিন চার পরে * একদিন উদয়ন সঙ্গীতশালায় রাজকুমারীকে বীণা-শিক্ষা দিচ্ছেন, এমন সময় তাঁর মনে হ'ল তাঁর সামনে যেন কার ছায়া এসে পড়েছে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখেন মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ সামনে দাঁড়িয়ে—মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় বৎসরাজকে কথা কইতে বারণ করছেন। বৎসরাজ বললেন যে, মন্ত্রী এসেছেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হ'লে—তখন কথা কইলে তাঁর মতলব ফেসে যাবে। তাই তিনিও একটু হেসে রাজকুমারীকে বললেন—“ভদ্রে! আজ এই পর্যন্ত থাক। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।” রাজকুমারী তাই শুনে বললেন—“আচ্ছা, এ বেলা আমি যাই। আপনি যদি স্তব্ধ থাকেন, ও বেলা সংবাদ পাঠাবেন—তা হ'লে আমি আসব। আর যদি বেশী অসুস্থ মনে করেন ত বলুন, আমি গিয়ে রাজবৈজ্ঞকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।” উদয়ন তাড়াতাড়ি বললেন—“না, সে রকম কিছু নয়, একটু ক্লান্ত বোধ করছি—একটু বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।”

রাজকুমারী চ'লে যাবার পর মন্ত্রী ম'শায় আস্তে আস্তে বৎসরাজের সামনে প্রবট হলেন। ততক্ষণে বিদূষকও সেখানে এসে জুটেছেন। যোগন্ধরায়ণ বললেন—“দেব! আমি বসন্তকের কাছে আপনার বক্তব্য সব শুনেছি। আমার প্রতিকার কথাও আপনি নিশ্চয়ই তার মুখে শুনেছেন। আজ আমি নিজে এলুম—কি

* নড়াগিরির থেপে যাওয়ার ঘটনার কোন উল্লেখ 'কথাসরিৎ-সাগরে' বা 'বৃহৎকথামঞ্জরীতে' নেই। এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—ভাস্কর 'প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণে'।

উপায়ে খুব শীগ্গির আপনাকে ও রাজকুমারীকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে পারি, তার একটা মুখোমুখি পরামর্শ করতে।”

উদয়ন খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—“মন্ত্রিবর! কি স্থির করলেন?—কবে কি ভাবে পালাতে হবে।”

যোগন্ধরায়ণ—“মহারাজ! প্রজ্ঞাত আপনার পায়ের বেড়ী খুলে দিলেও আপনাকে বন্ধন থেকে একেবারে মুক্তি দেন নি। আপনি জানতে পারছেন না বটে, কিন্তু একদল প্রহরী খুব দূরে থেকে আপনার অলক্ষ্যে আপনার উপর সদা সর্কদা নজর রেখেছে। আপনি যে ভাবছেন এখন খুব সহজে পালাতে পারবেন—তা হবে না। আপনাকে এই বাড়ীর পিছনের কপাট নিঃশব্দে ভেঙ্গে বাইরে বেরতে হবে। সে কপাট লোহার শিকলে জাঁটা। কিন্তু আপনি ত লোহার শিকল ও পায়ের বেড়ী ভাঙবার কৌশল জানেন। এ কাজ আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। তারপর খিড়কীর বাগান। বাগানের শেষ সীমায় পাঁচিল। ঐ পাঁচিল ডিঙাবার কৌশলও আপনাকে শিখিয়েছি—সে কাজও আপনার কঠিন হবে না। প্রজ্ঞাতের প্রহরীর দল সামনের দিকে বেশী আছে—পিছনে খুব কম—হু' চারজন মাত্র। তাদের কেউ আপনাকে বাধা দিতে এলে দু'চার জনের মোহাড়া নেওয়া আপনার একার পক্ষে কিছু কঠিন হবে না। প্রজ্ঞাত আপনাকে কেন এতটা জাঁট-ঘাট বেঁধে আটকে রেখেছেন—এর কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন। আপনি একবার তাঁর মেয়েটিকে বিবাহ করবার সম্মতি দিলেই তিনি পরম সমাদরে আপনাকে মুক্তি দেবেন। তবে

তার জেদ যে তিনি যেচে মেয়ে দেবেন না। আর মহারাজ! আমাদেরও ত বরাবরের সঙ্গর আমাদের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রার্থনা করা হবে না। কাজেই আপনি যা ঠিক করেছেন—আমারও তাই মত। প্রজ্ঞোতের চোখে ধুলো দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে হবে। আপনার একা পালান কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন কাজ। মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন দিন বাসবদত্তার সঙ্গে কথায় বার্তায় এটুকু বুঝতে পেরেছেন কি যে, তিনি বাপ-মা'কে ছেড়ে, এমন কি তাঁদের ঘৃণাকরে কোন কথা না জানিয়ে চুপি চুপি আপনার সঙ্গে পালাতে রাজি আছেন?”

উদয়ন—“মন্ত্রিবর! তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হ'য়েই আছে। তিনি ত আমার সঙ্গে এখনই পালাতে রাজি! আর তাতে তাঁর মা রাণী অজ্ঞারবতীরও মত আছে। তিনি নাকি মেয়েকে বলেছেন যে, যদি আমি রাজকন্তাকে নিয়ে পালাতে পারি, তাতে তিনি এতটুকু হুঃখিত হবে না। বরং তাতে তাঁরও মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, আর আমারও সম্মান বজায় থাকবে—এইভাবে ছ'দিক্ রক্ষা হবে ব'লে তিনি খুব সুখীই হবেন। অবশ্য প্রজ্ঞোত এতে একটু চটতে পারেন। কিন্তু রাণী তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার তার নিয়েছেন—আর আমাদের পালাতে খুবই উৎসাহ দিচ্ছেন।”

যোগকন্নারগ—“মহারাজ! এ অতি ভুলংবাদ! এবার মনে করতে পারেন যে আপনি মুক্ত। এবার বাকী ফলীটা আপনার কাছে জানিয়ে রাখি, ওছুন। রাজ-কুমারী বাসবদত্তার একটি খুব ভাল মাদী হাতী আছে। তার নাম ভজবতী। তার মত জোরে ছুটেতে পারে—এক নড়াগিরি ছাড়া—এমন হাতী প্রজ্ঞোতের গজশালার নেই। আবার নড়াগিরি ভজবতীকে একটু স্নেহের চোখে দেখে—এজন্ত ভজবতীর কোন অনিষ্ট সে করবে না—এ কথা নিশ্চিত। আমি তার মাহত আবাহককে অনেক সোনার গহনা খুব দিয়েছি। সে আমরা যা বলব তাই করতে রাজি। তবু যদি সে বিগড়ে যায় এই ভয়ে এখানে যে মহাপাত্র ছিল, তার অল্পমতি নিয়ে

আমার একজন বিখ্যাত চরকে ভজবতীর মাহত ক'রে দিয়েছি। সে গাত্রসেবক নাম নিয়ে ভজবতীর সেবা করছে।* সে সর্কদা আবাহককে সেবা করছে বাতে সে কার্যকালে না বৈকে বসে। তার উপর আরও একটা কাজের তার আছে। পালাবার করেক ঘণ্টা আগে থেকে সে মহামাত্রকে মদ খাইয়ে বেহ'স ক'রে রাখবে। নড়াগিরি যখন খেপেছিল তখনও মহামাত্রকে এই ভাবে নেশায় চুর ক'রে রাখা হয়েছিল। নইলে এই মহামাত্র লোকটা গজশাল্বে এমনই পণ্ডিত যে সে যে কোন হাতীর ভাব-ভঙ্গী দেখলেই বুঝতে পারে—হাতীটাকে দিয়ে কেউ কোন খারাপ কাজ করার চেষ্টা করছে কি না। কিন্তু লোকটার এক দোষ—ভয়ানক মাতাল। কাজেই খুব সহজে তার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে। নির্দিষ্ট দিনে রাজকুমারী তাঁর একজন সখী সঙ্গে সরোবরে জলক্রীড়া করার ছলে সন্ধ্যার সময় যখন সঙ্গীতশালার পিছনের রাস্তা দিয়ে এগুতে থাকবেন, ঠিক সেই সময় পাঁচিলের পাশে ধাঁড়িয়ে বসন্তক ঢাক বাজিয়ে আপনাকে ইসারায় ব্যাপারটা জানাবে। বসন্তকের ঢাকের শব্দ শুনে শুনে সহরের লোকের এমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে, যে গ্রহরীরা তাতে কানও দেবে না। এই সুযোগে সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনি সঙ্গীত-শালার পিছন দিক্কার কপাট তেজে বেরিয়ে পড়বেন। আপনার হাতে থাকবে ঘোববতী বীণা। বীণার শব্দ শুনেই ভজবতী হাঁটু গেড়ে ব'সে থাকবে, নড়বে না। এই অবসরে আপনি পাঁচিল টপকে বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে ভজবতীকে হাঁকিয়ে দেবেন। তখন যদি গ্রহরীরা তেড়ে আসে, আমার লোকজন ছদ্মবেশে আশেপাশেই থাকবে। তারা তাদের বাধা দেবে। আপনি সোজা হাতী ছুটিয়ে আপনার ব্যাধরাজ পুলিন্দকের রাজ্যে গিয়ে উঠবেন। সেখান থেকে কিছু সেনা সঙ্গে নিয়ে একেবারে কোশাখীতে হাজির হবেন। যদি প্রজ্ঞোতের কোন ছেলে নড়াগিরিকে চালিয়ে আপনাদের ধরতে যায়,

* ‘কথা সঙ্গিসাগর’ ও ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’তে কেবল আবাহকের কথা আছে। আর গাত্র সেবকের নাম পাওয়া যায় ভাসের ‘প্রজ্ঞা যোগকন্নারগে’।

কোন ভয় নেই ; কারণ, ভদ্রবতীর সহকে নড়াগিরির একটু ছুর্কলতা আছে। সে কিছুতেই তেমন জোরে ছুটে গিয়ে ভদ্রবতীকে আক্রমণ করবে না। আর তা ছাড়া পিছনে ত আমরা আছি। সেনাপতি রুমধানু, তাঁর বাছাই করা সৈন্তেরা, আমার চরেরা, আমি—আমরা সবাই ত ছদ্মবেশে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আমাদের এড়িয়ে যাওয়া খুব সোজা কাজ হবে না।”

এইভাবে মহারাজ উদয়নের পালাবার কৌশলটি বর্ণনা করে যোগকরায়ণ থামলেন। মহারাজ উদয়ন সানন্দে বলে উঠলেন—“মস্তিষ্ক! ধন্ত আমি যে তোমার মত বুদ্ধিমান ও প্রভুভক্ত মন্ত্রী পেয়েছিলাম! আর বসন্তক ত আমার দ্বিতীয় প্রাণ—সেনাপতি রুমধানু আমার রক্ষা-কবচ! আর আপনার সেনারা—তাদের কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব, কথা খুঁজে পাচ্ছি না”।

যোগকরায়ণ বললেন, “মহারাজ! এখন আসি তা হ’লে। হয়ত এই শেষ দেখা! আপনি নিশ্চয়ই নির্বিকারে কোশাঙ্গী পৌছাবেন। কিন্তু প্রজ্ঞোত্তের সেনাদের হাতে আমার প্রাণও যেতে পারে।”

রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক—সকলেরই চোখে জল, মুখে হাসি। হাসি-কারার ভিতর দিয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করে তাঁরা বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার দু’দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাজ-বাড়ীর রাণীর খাসমহলের একজন চাকর হাতীশালায় এসে গাত্রসেবকের খোঁজ করতে লাগল। খানিক বাদে দেখে গাত্রসেবক আর মহামাত্র ছুজনেই মদ খেয়ে টলুতে টলুতে আসছে। রাজবাড়ীর চাকর গাত্রসেবককে একটু গরম মেজাজে জিজ্ঞাসা করলে, “রাজকুমারী সরোবরে যাবেন জলকেলি করতে। তাঁর হাতী ভদ্রবতী কোথায়? শীগগির নিয়ে চল। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?” গাত্রসেবক জড়ান গলায় উত্তর দিল, “ছিলাম আর কোথায়? কঙিল শুঁড়িনীর দোকানে আমার প্রভু মহামাত্র আর আমি একটু কারণ করছিলাম। তাতে তোমার কি হা!” রাজবাড়ীর চাকর কের বললে, “মহামাত্র ত দেখছি একেবারে বেহঁস। তুমি তবু

এখনও পাড়া আছ। ভদ্রবতী কৈ?” গাত্রসেবক—“ভদ্রবতীকে চালাব কি ক’রে? তার অক্লুশ বাঁধা দিয়ে কারণ করেছি।” রাজবাড়ীর চাকর—“অক্লুশ কি হবে! ভদ্রবতী খুব ঠাণ্ডা হাতী, বিনা অক্লুশেই চলবে।” গাত্রসেবক—“তারপর তার গলার অর্ধচন্দ্র মালাও বাঁধা পড়েছে।” রাজবাড়ীর চাকর—“কি জালা! ভদ্রবতীকে কি অর্ধচন্দ্রমালা দিয়ে বাঁধতে হয়? ও এতই লক্ষ্মী হাতী যে ফুলের মালা দিয়েও ওকে বেঁধে রাখা যায়।” গাত্রসেবক—“ঘণ্টাও বাঁধা দিয়েছি।” রাজবাড়ীর চাকর—“কি গর্দভ! শুনছ—যাচ্ছে হাতী জলক্রীড়া করতে। ঘণ্টায় কি হবে?” গাত্রসেবক—“তবে শোন আসল কথা! ভদ্রবতীকেই বাঁধা দিয়ে আমরা দু’জনে মদ গেয়েছি।” রাজবাড়ীর চাকর এ কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে—“বেশ করেছ! কি শাস্তি তোমাদের হয়, তা শীগগিরই দেখতে পাবে। আর কঙিল শৌভিকীরই বা কি আক্কেল!—যে রাজকুমারীর হাতী বাঁধা রাখে! দাঁড়াও, সব একধার থেকে মজা দেখাচ্ছি একবার। যাই এবার রাণীমার কাছে!”

গাত্রসেবক তখন যেন একটু ভয় পেয়েছে এই ভাব দেখিয়ে বলে উঠল—“তা ভাই! আমার এতে বিশেষ কোন দোষ নেই। আমি কঙিল শুঁড়িনীকে এত ক’রে বললুম, ‘দেখ! মূলটি নষ্ট কোরো না’। তা সে তা শুনবে কেন? আর আমার প্রভু মহামাত্র এত মদ খেলেন যে তার দামে এত বড় জলজ্যান্ত হাতীটা বিকিয়ে গেল।”

এই সময় একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল রাজপথে। রাজবাড়ীর চাকর বাস্ত-সমস্ত হয়ে বললে, “ও কিসের শব্দ!” গাত্রসেবক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, “বুঝেছি, বুঝেছি। যেমন কর্ম তেমন ফল! কঙিল শুঁড়িনীর ঘর ভেঙে ভদ্রবতী নিশ্চয় পালাচ্ছে। ও তারই শব্দ।” রাজবাড়ীর চাকর—“না, না, তা নয়। ঐ যে সব লোক বলছে—‘বৎসরাজ রাজকুমারী বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রবতীর পিঠে চড়ে পালিয়ে গেছেন। ব্যাপার কি! যাই দেখি গে।”

গাত্রসেবক—“জয় মহারাজের জয়! ওঃ! এতকণে আমি দায়বৃত্ত—নিশ্চিন্ত হলাম।”

ঠিক এই সময় মহামাত্র মেঝের গাড়াতে গাড়াতে জড়ান গলার ব'লে উঠল—“বাবা! আমি যে বেশ শুন্তে পাচ্ছি, ভদ্রবতী চীৎকার ক'রে বলছে আজ রাত্রেই সে তেবট্ট যোজন পথ যাবে!”

রাজবাড়ীর চাকর—“নাঃ! জালালে এই ছুটো মাতালে মিলে!”

গাত্রসেবক—“বন্ধু! মাতাল তোমাদের এই মহামাত্র। আমি মাতাল নই। আমি কে শুন্বে। আমি বৎসরাজ উদয়নের একজন ভৃত্য। এতদিন মাহতের কাজে এখানে ছিলুম তাঁর পালাবার সুবিধা ক'রে দিতে। আজ আমার সে বাসনা সফল হয়েছে। বাও, বন্ধু! তোমাদের রাজবাড়ীতে এ কথা জানাও গিয়ে!”

রাজবাড়ীর চাকরটা প্রথমে খানিক বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে থেকে তারপর রাজবাড়ীর দিকে ছুট দিলে।

গাত্রসেবক—“ও কিসের গোলমাল! যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে বোধ হয়! এ কি প্রজ্ঞোতের সেনারা এত জয়ধ্বনি করে কেন! তবে কি মহারাজ ধরা পড়লেন না কি!”

সেই দিকে হুঁজন লোক বলাবলি করতে করতে ‘হাঁ, একেই বলে বীরত্ব! আমরা জান্তাম মন্ত্রী যোগক্লরায়ণ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি! কিন্তু তিনি যে বীরত্বে অর্জুনের সমান, তা জান্তুম না। এক অর্কোহিণী সেনার মোহাড়া একলা নিয়েছিলেন! তিনি এই বাধা না দিলে বৎসরাজের কি সাধ্য ছিল, পালিয়ে পার পান! একলা তরোয়াল হাতে এক অর্কোহিণীকে হুঁদও আটকে রেখেছিলেন। শেষে বিজয়জন্মর নামে হাতীটার দাঁতে লেগে তাঁর তরোয়াল ভেঙ্গে গেল, তাই ত তিনি ধরা পড়লেন।

গাত্রসেবক—“কি সর্বনাশ! এ যে হরিষে বিবাদ! প্রভুর বিপদ! যাই তাঁর পাশে থাকবার চেষ্টা করি গে!”

*

ওদিকে যোগক্লরায়ণ যেমন কন্দী এঁটেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই কাজ ঠিক ঠিক করা হয়েছিল। সন্ধ্যার যুগেই গাত্রসেবক আর আবাতক হুঁজনে মিলে ভদ্রবতীকে গাজিরে শুড়িয়ে বার করতে বাবে—এমন সময় মহামাত্র

বললেন—“এ অসময়ে হাতী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?” গাত্রসেবক উত্তর দিলে, “রাজকুমারী জলকেলি করতে যাবেন কি না, তাই হাতী নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।” মহামাত্র এর আগেই কিছু নেশা করেছিলেন, তবে নেশাটা তখনও তেমন জমে নি, তখনও তাঁর জ্ঞান ছিল কিছু কিছু। তিনি বললেন—“ভদ্রবতী যেন বলছে—আজ রাতে আমি তেবট্ট যোজন পথ যাব—এর মানে কি?” গাত্রসেবক দেখলে বড়ই বিপদ। মহামাত্র যদি বাগড়া দেয় তবে হাতী নিয়ে পালান দায় হবে। আর মহামাত্রের কথায় যদি অস্ত্র মাহতেরা একটু সাবধান হ'য়ে হাতীর গতিবিধির উপর নজর রাখে, তা হ'লেও মহা মুশ্কিল—সব ফিকির ভিস্তে যাবে। মহামাত্রের কথা শুনে এরই মধ্যে অস্ত্র হাতীর মাহতরা বেশ একটু কোঁতুহলী হ'য়ে উঠেছিল। তারা সবাই জানত যে মহামাত্র হাতীদের ভাষা বুঝতে পারে। তাই ভদ্রবতী কি বলছিল তা শোন্বার জন্তে তারা এসে মহামাত্রের চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রসেবক দেখলে বেগতিক! মহামাত্র আর হুঁচারটে কথা বললেই আর বেরোন যাবে না। তাই সে মহামাত্রকে বললে, “প্রভু! চলুন, আপনাকে যে ভদ্রবতীর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে, নইলে সন্ধ্যার সময় কি হাতী একলা ছেড়ে দেওয়া যায়!” মহামাত্র বললে—“আচ্ছা! সে ভাল কথা। কিন্তু বড় তেষ্ঠা পাচ্ছে যে।” গাত্রসেবক তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিলে,—“শীগগির চলুন, পথে আপনাকে ঠাণ্ডা সরবৎ খাওয়াব।” মহামাত্রের নেশা তখন জমতে শুরু হয়েছে। সে চুপি চুপি বললে—“গাত্রসেবক, আবাতকে হাতী নিয়ে এগুতে বল। তুমি আর আমি চল পিছু পিছু হেঁটে যাই। পথে কণ্ডিল শুঁড়িনীর দোকানে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাবে’খন, কি বল?” গাত্রসেবক ত এই সুযোগই চাইছিল। একবার মহামাত্রকে কণ্ডিল শুঁড়িনীর দোকানে ঢোকাতে পারলে আর তাঁকে উঠতে হবে না। সে অস্ত্র মাহতদের দিকে চেয়ে বললে, “আরে! আজকে প্রভু যে সব কথা বলছেন, তা’কি আর সত্যি ব'লে ধরতে আছে! দেখছ না ওঁর পা টলছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। আজ কি উনি আর ধাতো

আছেন যে হাতীর কথা বুঝতে পারবেন। আজ মাহুকের কথাই ওঁর কাণে পৌঁছচ্ছে না, দেখছে তা। মাহুতরা দেখলে, ব্যাপারটা সত্যই তাই। তাই যাতালের প্রলাপ ভেবে তারা আর মহামাত্রের কথার কোন বিশ্বাস না করে যে বার কাজে চলে গেল।

এদিকে ঠিক যেমন কৌশল করা হয়েছিল, সেই অঙ্গুসারে আবাচক রাজকুমারী বাসবদত্তা ও তাঁর সমবয়সী প্রধান সখী কাকুনমালাকে নিয়ে সঙ্গীতশালার খিড়কীতে হাজির হলেন। সেখানে বিদুষকের ঢাকের আওয়াজ পেয়ে উদয়ন বোম্বতী বীণা হাতে কণাট ভেঙে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন। পরে বিদুষককে সঙ্গে নিয়ে হাতীতে উঠে যারলেন ছুট। সে দিকের প্রহরীরা কিছুই জানতে পারলে না। আর ওদিকে মহামাত্র ওঁড়িমীর দোকানে খুব নেশা করে গাত্রসেবকের সঙ্গে হাতীশালায় ফিরে আসবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

বৎসরাজ, বাসবদত্তা, কাকুনমালা, বসন্তক আর মাহুত আবাচক—এই পাঁচজনে যখন ভদ্রবতীর পিঠে চড়ে যাত্রা করলেন, তখন অঙ্গুসারে কেউ তাঁদের পালান প্রথম বুঝে উঠতে পারে নি। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রধান নগর-দ্বার ত সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে যায়। আর তার ছপাশে সারারাত জেগে পাহারা দেয় অনেক সশস্ত্র প্রহরী। কাজেই নিরুপায় হয়ে আবাচক বৎসরাজের মুখের দিকে চেয়ে বললে, “মহারাজ! এতদূর ত আপনাদের নির্ঝিয়ে নিয়ে এলুম। কিন্তু এবার ত ধরা পড়তে হবে। উজ্জয়িনী থেকে এখন বেরোই কি করে?”

উদয়ন হেসে উত্তর দিলেন, “কোন ভয় নেই, আবাচক! আমরা নগর-দ্বার দিয়ে বেঞ্চ না। কোন এক জায়গা নির্জন দেখে সেই ধারের পাঁচিল ভেঙে বেরিয়ে পড়ব।” আবাচক ‘হাসি হাসি’ হেসে বললে—“মহারাজ! অসম্ভব কথা বলছেন। ভদ্রবতীর মত বিশটা হাতীতেও এ পাঁচিল ভাঙতে পারবে না।” বৎসরাজ বললেন—“আবাচক! তুমি শুধু দেখে যাও। আমি পাঁচিল ভাঙবার কৌশল জানি। পাঁচিলে আমি

কাঁঠু ধরিয়ে দেব। তখন ভদ্রবতী ঠেলা যারলেই পাঁচিলের খানিকটা পড়ে যাবে।”

এই বলে যোগদ্ধারায়ণ তাঁকে পাঁচিল ভাঙবার যে উপায় শিখিয়েছিলেন সেই কৌশল উদয়ন প্রয়োগ করতেই পাঁচিল গেল কেটে। কিন্তু পাঁচিলের গাধুনির মধ্যে আবার বড় বড় লোহার শিকল দিয়ে পাঁচিলকে মজবুত করা হয়েছে। সেই শিকলের জাল-বুনানি ছিঁড়ে বাইরে বেরোন যায় কি করে? উদয়ন হতাশ হলেন না। পায়ের বেড়ী, বাঁধনের শিকল ছেঁড়বার কৌশলও তাঁর যোগদ্ধারায়ণের কাছে শেখা আছে। সেই কৌশলে মোটা মোটা শিকলগুলো সরু সূতোর মত পটপট করে ছিঁড়ে গেল। তখন আবাচকের মুখে ফুটে উঠল হাসি। সে সবেগে দিলে ভদ্রবতীকে চালিয়ে। ভদ্রবতীর মাথার এক ঠেলায় খোলা পাথরগুলো ধুপ-ধাপ শব্দে পড়ে গেল। কিন্তু তাতে হ’ল আর এক বিপদ! বীরবাহু আর তালভট নামে দুই সামন্ত রাজকুমার পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁরা এই পাঁচিল-ভাঙার শব্দে এলেন ছুটে। কিন্তু, উদয়ন আর এক মুহূর্তও দেরী না করে নিজের হাতের তরোয়াল চালিয়ে দু’জনেরই মাথা কেটে ফেললেন। কিন্তু মরবার ঠিক আগে তাঁরা দু’জনে যে চীৎকার করেছিলেন, তাতে উজ্জয়িনীর অস্তান্ত প্রহরীরা সেখানে ছুটে আসে। এসে তারা দেখল যে বৎসরাজ ততকণে উজ্জয়িনীর গণ্ডী পেরিয়ে হাতী চড়ে ছুটে পালাচ্ছেন। তাদের ডাক-হাঁকে প্রজ্ঞোভের সেনারা সব বেরিয়ে পড়ল। কুম্ভান্ তাঁর ছয়বেশী সেনা নিয়ে ছিলেন নগরের মাঝে—কাজেই তিনি প্রজ্ঞোভের সেনাদের বাধা দিতে পারলেন না। কিন্তু যোগদ্ধারায়ণ নিজে এক মুহূর্তও উদয়নকে চোখের আড়াল করেনি। তিনি অস্ত্রের অলক্ষিতে বরাবর বৎসরাজের পিছু পিছু আসছিলেন। এখন প্রজ্ঞোভের সেনারা তাঁর পিছনে ধাওয়া করছে দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সেই ভাঙ্গা পাঁচিলের ওপরে দাঁড়িয়ে তরোয়াল হাতে একাই এক অকৌশলী শত্রু-সেনার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। প্রজ্ঞোভের দুই ছেলে

—পালক আর গোপাল—হুই হাতীতে চড়ে লড়াই-এ এসেছিলেন। কিন্তু যোগদ্ধারায়ণ এমন কোশলে এই সেনাদের আটকাতে লাগলেন যে, তারা কিছুতেই সেই ভাঙ্গা পাঁচিল পেরিয়ে নগরীর বাইরে যেতে পারল না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল—বাইরে যাবার ঐ একটি মাত্র পথ—যেখানে পাঁচিলটা ভাঙা। সেই মুখটা যোগদ্ধারায়ণ একাই এমন কোশলে আটকেছিলেন যে এক অক্ষৌহিণী সেনা তাঁর একার বীরত্বের কাছে হার মানতে বাধ্য হ'ল। শেষে গোপালের হাতী বিজয়মুল্লর তার লম্বা দাঁতের আঘাত দিয়ে যোগদ্ধারায়ণের হাতের তরোয়ালখানা ভেঙে ফেললেন। তখন যোগদ্ধারায়ণ হলেন বন্দী। কিন্তু হুঁদও ধ'রে তিনি যেভাবে সেনাদের আটকে রেখেছিলেন তার সুযোগ পেয়ে বৎসরাজ ততক্ষণে বহু যোজন পথ চলে গিয়েছেন। তবু ছোট রাজকুমার পালক নড়া-গিরির উপর চেপে একদল সৈন্ত নিয়ে উদয়নকে ধরতে ছুটলেন সেই রাত্রির অন্ধকারে। আর গোপাল যোগদ্ধারায়ণকে নিয়ে ফিরে এলেন উজ্জয়িনীর রাজ-প্রাসাদে।

* * * *

যোগদ্ধারায়ণের হাত-পা বাঁধা। একখানা চৌপায়ার উপর শুইয়ে তাঁকে উজ্জয়িনীর প্রধান রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পথে বড়ই লোকের ভিড়। প্রজারা সব যোগদ্ধারায়ণকে দেখবে ব'লে কাতারে কাতারে এসে পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। সামনে হুঁজন রক্ষী সেনা তরোয়াল হাতে লোক সরিয়ে পথ সাফ করছিল—“এই হঠ যাও, হঠ যাও!” বলে। চৌপায়া বইছিল জন আঠেক বেহারা। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে চৌপায়া কাঁধে ক'রে একরকম প্রায় দাঁড়িয়েই ছিল, তিন চার ঘণ্টাতেও ভিড় ঠেলে ক্রোশ খানেকের বেশী এগুতেই পারে নি। অথচ—চৌপায়াখানি রাস্তায় নামিয়ে যে তারা একটু জিরিয়ে নেবে, তারও উপায় ছিল না। কারণ চৌপায়া রাস্তায় নামালেই সেইখানে ভিড় এত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা যে তার চাপে হয়ত যোগদ্ধারায়ণের আহত দেহ আরও আঘাত পেতে পারত। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চৌপায়ার উপর শুয়ে ঘণ্টার পর

ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, অথচ গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারা যাচ্ছে না—যোগদ্ধারায়ণের এ হ'য়ে উঠছিল অসহ্য। আর বেহারাদেরও একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চৌপায়া কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা হ'য়ে উঠছিল অপ্রাণত্বকর। তারা সকলেই ঘন ঘন হাঁকাচ্ছিল, আর তাদের সারা গা দিয়ে দর-দর ধারায় ঘাম ছুটছিল। যোগদ্ধারায়ণ তাই দেখে হাত-পা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও অতি কষ্টে চৌপায়ার উপর সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন। তারপর বেহারাদের বললেন, “এই তোরা এইখানে চৌপাই নামিয়ে একটু জিরিয়ে নে। আমায় বরং ধরাধরি ক'রে তোরা এই চৌপায়ার উপরে দাঁড় করিয়ে দে, তা হ'লে সকলেই আমায় দেখতে পাবে।” বেহারা ত যোগদ্ধারায়ণের কথায় হাতে যেন স্বর্ণ পেলে। তারা তাড়াতাড়ি চৌপাই নামিয়ে মজী ম'শায়কে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই খাড়া ক'রে দিলে। এতক্ষণ শুয়ে থাকার জন্ত ভিড়ের লোকেরা যোগদ্ধারায়ণকে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। এবার তাঁকে দাঁড়াতে দেখে একটু ভাল ক'রে দেখে নেবার আশায় রাস্তার ছড়ান ভিড়টা তাঁর চৌপায়ার চারপাশে যেন জমাট বেঁধে গেল। তাই দেখে তাঁর রক্ষী সেনারা তরোয়াল ঘুরিয়ে তাদের সরিয়ে দিতে লাগল “এই! হঠ যাও, হঠ যাও।”

যোগদ্ধারায়ণ হাসিমুখে তাদের বাধা দিয়ে বললেন, “ওহে বীরপুরুষ বর! আমাকে যে দেখতে চায়, সে দেখুক, তাকে বাধা দিও না। মনে মনে যদি কারও মজী হবার বাসনা থেকে ত আমার এই অবস্থা দেখে হয় তা একেবারে সমূলে লোপ পাক, নয় ত সে বাসনা বেশ পাকা হ'য়ে উঠুক।”

তবু রক্ষীরা প্রজাদের তাড়া দিতে লাগল—“এই! হঠ যাও। মজী যোগদ্ধারায়ণকে কি আগে কখনও দেখ নি নাকি যে এত ভিড় করেছে তাঁকে দেখতে।”

যোগদ্ধারায়ণ তাই শুনে হেসে বললেন, “দেখেছে আমার প্রায় সকলেই, তবে এ বেশে নয়। একটা পাগুলা আজ ক'দিন ধ'রে এই নগরীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুর পাগুলামি ক'রে বেড়াত, এ কে না জেনেছে। কিন্তু সে যে যোগদ্ধারায়ণ তা ত প্রজারা তখন কেউ বোঝে নি।”

এমন সময় একজন সেনা দূর থেকে খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে এসে একটু ঠাট্টার স্বরে বললে—“মন্ত্রী ম’শায়। খুব অসংবাদ। বৎসরাজ ধরা পড়েছেন।”

যোগকরায়ণ একথা শুনে ব’লে উঠলেন, “মিথ্যা কথা। আমার সঙ্গে তামাসা কোরো না। কয়েক দণ্ড আগে যিনি এ নগর থেকে ছাড়া পেয়ে ভদ্রবতীর পিঠে চড়ে পালিয়েছেন, তিনি এক নিমিষে বহু যোজন পথ এগিয়ে গেছেন। এখন তাঁকে পিছু ধাওয়া ক’রে ধরা কোন হাতী বা ঘোড়ার পক্ষেই সম্ভব নয়। আজ্ঞা বাপু, ধরলুম, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু বল দেখি, কি ক’রে তিনি ধরা পড়লেন?”

সেনাটি বললে—“মহারাজকুমার পালক নড়াগিরির পিঠে চেপে তাঁকে ধরতে বেরিয়েছিলেন কি না। তাঁরই হাতে ধরা পড়েছেন।”

যোগকরায়ণ গম্ভীরমুখে বললে, “হ্যাঁ! এক নড়াগিরিই পারে বটে ভদ্রবতীকে তেড়ে গিয়ে ধরতে। কিন্তু তাকে চালাবার মত উপযুক্ত মাহুত কোথা তোমাদের? ওদিকে ভদ্রবতীকে চালাচ্ছেন স্বয়ং বৎসরাজ। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নড়াগিরিকে চালাতে পারে—এমন লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তাই তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।”

তখন সেনাটি তার মিথ্যা কথা হাতে-হাতে ধরা

প’ড়ে গেল দেখে বললে, “আমাদের মন্ত্রী ম’শায়ের হুকুম, আপনাকে অজ্ঞাগারে বন্দী রাখতে হবে। ঐ স্থানটা খুব নিরাপদ, ওখান থেকে পালান অসম্ভব।”

যোগকরায়ণ এই কথায় হো-হো ক’রে হেসে উঠলেন, “বৎসরাজকে বন্দী ক’রে মন্ত্রী ম’শায়েরা তাঁর পাহারার ভাল ব্যবস্থা করেন নি। এখন তিনি পালিয়েছেন ব’লে যত কড়াকড়ি আমাকে নিয়ে। এ যেন জড়োয়া গমনা চুরি যাবার পর তার বাস্তুটাকে খুব যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হচ্ছে। চল তোমাদের অজ্ঞাগারেই নিয়ে চল।”

*

পাশের একটা সফর রাস্তা দিয়ে বেহারারা যোগকরায়ণের চৌপায়া অজ্ঞাগারে নিয়ে এল। সেখানে ঐ সেনাটি তাঁর হাত-পার বাঁধন খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করায় বললে—“মন্ত্রী ম’শায়ের এই রকমই হুকুম। এখন আপনি একটু বিশ্রাম করলেই আমাদের মন্ত্রী ম’শায় আসবেন আপনাকে দেখতে।”

যোগকরায়ণ—“কে? মন্ত্রী ভরতরোহক বোধ হয়? আমার বিশ্রাম পথেই হ’য়ে গেছে। আমি ভরত-রোহকের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। তাঁকে জানাও গিয়ে।”

“যে আজ্ঞা”—ব’লে সৈন্তটি চ’লে গেল।

[ক্রমশঃ]

প্রার্থনা

ত্ৰিপ্রিয়লাল দাশ

ধূপশিখা সম নির্মল কর,

চঞ্চল কর মোরে ;

অলে উঠি যেন নরকায়ির মাঝে।

আমার প্রাণের অগ্নি বাসনা

তোমার আরাতি তরে

প্রদীপের মত জলুক নিত্য মাঝে ॥

অস্তরে মোর আসন নিও হে,

ওগো অন্তর্যামী,

তব রূপশিখা মুছে দিক মোর কালো।

অস্তর কর পুষ্পের মত

হে মোর জীবন-স্বামী ;

(প্রভু) . অস্তরকোণে ফোটাও পথের আলো।

ফুলের জন্ম

(বিদেশী পৌরাণিক গল্প)

ক্রীতীলরতন দাশ, বি-এ

“খন ধাত্তে পুষ্পে ভরা আমাদের এই রত্নভূমি” সত্যই আজ যেদিকে তাকাও, দেখতে পাবে কত বিচিত্রবর্ণ গন্ধের ফুলে ফুলময়ী আমাদের জননী পৃথ্বী। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, কত রঙবেরঙের ফুল ইন্দ্রধনু বর্ণ এবং স্বর্গের স্রবশা নিয়ে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন মর্ত্যে ফুলের নাম গন্ধও ছিল না। তখন ছিল শুধু সবুজের অখণ্ড রাজত্ব, ধরিত্রীর বুকে ফুটে থাকত শুধু তৃণলতাগুচ্ছের গাঢ় সবুজ আভা, আর সেই সজীব আমলতায় বলমূল্য করত স্নিগ্ধ ধরণীর সারা অঙ্গ। কেমন করে একদিন সবুজের এই অনাবিল রাজত্বের মাঝে পুষ্পরাজি আত্মপ্রকাশ করল, সেই কাহিনী আজ তোমাদের বলি।

সৃষ্টিকর্তা যখন বিচিত্র রূপ রস রঙ দিয়ে গড়ে তুললেন আমাদের এই আদিম ধরিত্রীকে, তখন স্বর্গের জানালা দিয়ে দেবতারা তার অপকল্প সৌন্দর্য্য দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হ’লেন। তারপর যেদিন ভগবান্ সৃষ্টি করলেন আদিম মানবকে, সেদিন দূর থেকে তার অতুল রূপলাবণ্য দেখে দেবতারা হ’য়ে গেলেন বিস্ময়ে হতবাক, তাঁরা স্বর্গ হ’তে নেমে এসে মেঘের ওপর চড়ে ভাল ক’রে দেখে গেলেন আদি সৃষ্টির সেই অপূর্ণ নরমূর্ত্তিকে। এর পর বিশ্বের সৌন্দর্য্যসাগর মন্বন করে বিধাতা যেদিন সৃষ্টি করলেন আদি মানবীকে, সেদিন সৃষ্টি-কর্ত্তাও বোধ হয় তাঁর এই সেরা সৃষ্টির জন্ত গর্ভ ও আত্মতৃপ্তি বোধ ক’রেছিলেন। এই নূতন সৃষ্টির সংবাদ পেয়ে স্বর্গের দেবতারা আবার আনন্দে চঞ্চল হ’য়ে উঠলেন। তাঁরা আকাশের জানালা দিয়ে নীচে পৃথিবীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে বার বার চেয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু দূর থেকে দেখে তাঁদের সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটল না। তাঁরা নেমে

এলেন মেঘলোকে। সেখান থেকে তাঁরা অসীম রূপ-লাবণ্যময়ী আদি মানবী মূর্ত্তির পানে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলেন। যতই দেখেন, তাঁদের দেখবার আকাঙ্ক্ষা ততই যায় বেড়ে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ ছাড়া নীচে নামতে সাহস হলো না তাঁদের। তরুণ তপন এই মহিমময়ী তরুণীকে দেখবার জন্ত পূর্ব গগনে উঁকি মারতে লাগলেন। আকাশে তখন পেন্জা তুলার মত সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল; পৃথিবীর এক প্রান্তে উজ্জল একটা সাত রঙা রামধনু উঠেছিল। প্রথমে কয়েকজন হুঃসাহসী দেবতা উড়ে এসে রামধনুর ওপরে বসলেন, তাঁদের দেখাদেখি ক্রমে ক্রমে সবাই এসে বসলেন সেখানে। দেবতাদের দেহ খুব হালকা বটে; কিন্তু ক্ষীণ রামধনুটির ওপর যখন তাঁরা দলে দলে এসে চাপলেন, তখন তাঁদের ভার সহ্যে না পেরে রামধনুটি হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছচূর্ণের মত তার অজস্র রঙিন রেণুগুলি ছড়িয়ে পড়ল ধরিত্রীর সারা অঙ্গে। পৃথিবীর তরুণতা তখন ভাবাবেশে উদ্ভূত হ’য়ে ছিল; চূর্ণ ইন্দ্রধনুর রেণুগুলিকে তারা সাদরে বরণ ক’রে নিল আপন আপন বুকে। সেই দিন হ’তে চিরসামল বৃক্ষরাজিতে ফুটেছে স্নেহ হ’লো নানা বর্ণের ফুল, আর তাদের স্রবাস ছড়িয়ে পড়ল দিগ্দিগন্তে।

এই ফুল ফোটার কথাটি আমাদের দেশের একজন কবি কেমন সুন্দর ভাবে বলেছেন শোন :-

পুষ্প আমি স্রষ্টা ছিলাম কুঁড়ির আকারে,

গন্ধ আমার বন্ধ ছিল বুকের প্রাকারে।

এক নিমেষে আত্মকে মোরে ছুটিয়ে দিলে গো,

গন্ধ আমার ছড়িয়ে গেল বায়ুর পাখারে।



যাদের গারে জোর আছে

ক্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

বাঁড়েরতলার ঘাট—চুঁচুড়ার চিরপ্রসিদ্ধ। ঘাটের উপর বিহৃত চক্রে মহেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির। পাদদেশে বৃদ্ধ বটবৃক্ষ, বিহৃত শাখা-প্রশাখায় মন্দিরটি যেন আশ্রিত। সম্মুখে প্রশস্ত গঙ্গা। মন্দিরের পাশ দিয়ে খাঁজ-কাটা-কাটা স্মৃতিকণ দীর্ঘ সিঁড়িগুলি নেমে এসেছে গঙ্গার বক্ষে।

বৈশাখ মাস। পুণ্যলোভী স্নানার্থীর ভীড়ের আর অন্ত নেই। মোক্ষ লাভের আশায় ছুটে এসেছে নরনারী দেশ-দেশান্তরে। এই উপলক্ষে মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে এক মেলা বসেছে। দরমা-ঘেরা ছোট ছোট ছাঁচি বেড়ার এক একটি স্নসজ্জিত দোকান; প্রথমেই কৃষ্ণ-নগরের মাটির খেলনা। বিচিত্র বর্ণের নানারূপ দেব-দেবীর মূর্তি। চোখে পড়ে চামুণ্ডে যুগ্মমালিকে মা কালীর ভয়াবহ মূর্তি। তার পাশে রণ উন্মাদিনী মা দুর্গা, সতীদেহ স্বর্গে নটরাজের নৃত্যভঙ্গিমায় মহেশ্বর, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মূর্তি প্রভৃতি অসাধারণ মৃৎশিল্প চাতুর্যের পরিচয় দেয়। পরে স্বল্পপরিসর ছবির দোকান; সর্ব প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্নিতহাস্তে দেশ-বহু চিত্তরঞ্জন, তার পাশে দেশগৌরব সূভাব চন্দ্র, আলামরী ভাবার বক্তৃতা-ভঙ্গিমায় সুরেন্দ্রনাথ, অপরূপ প্রতিভার রবীন্দ্রনাথ, তেজস্বী বিবেকানন্দ, সাধক রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর মনোহর আলেক্য। বিক্রেতা একজন মুসলমান। পরের দোকানটি অনেকটা জায়গা জুড়ে এক কাঁচের বাসন ও খেলনা বিক্রেতার। নানা বর্ণের পুষ্পাধার, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি খেলনা, কাঁচের গেলাস, চায়ের কাপ, পিরীচ প্রভৃতিতে ভরাজাস্ত। ক্রমে পর পর চীনে মাটির খেলনা, পাথরের বাসনের দোকান পরিপূর্ণ। মেলার পূর্বদিকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ময়রার দোকান। পরিচ্ছন্নতার অমূল্যবস্তু। বড় বড় নানাবিধ অস্ত্রাস্ত্র দোকানগুলির দ্রব্যসম্ভারে স্থানটি হয়ে উঠেছে লোভনীয়, কণ্ঠব্যস্ততার কোলাহলে মুখর।

স্নানার্থীদের মধ্যে একটি বালিকা ও বালকের বেশ-ভূষা দেখলে মনে হয়—এরা যেন আভিজাত্য-সম্প্রদায়ের।

মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। যেন একটি অর্ধপ্রক্ষুটিত পদ্ম-কোরক। অন্নবয়স্ক বালকটি তারই সহোদর। পিছনে পরিচারিকা। অদূরে অপেক্ষমান সোফার ও আরদালি। নিত্য স্নানার্থীদের মধ্যে এদের দেখা যায় না। বীর পদক্ষেপে অনাবশ্যক প্রেরণ উত্তর দিতে দিতে তারা ঘাটের পথে এগিয়ে চললো। সহসা নির্মল প্রভাতের স্বচ্ছ আকাশ গৈরিক বসনের মত ধূলি-মলিন হয়ে উঠলো। তীব্র বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে স্নক হলো কাল-বৈশাখীর ভৈরব নৃত্য। স্নানার্থীদের গাজে নিষ্কিন্ত তীক্ষ্ণ বাণের মত বিদ্ধ হতে লাগলো গুরু পত্র ও ধূলি। অত্যধিক ঝটিকাপ্রবাহে মুহূর্তে মেলার পূর্ব দিকের দরমা-ঘেরা অংশটি আবর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রকৃতির সর্বগ্রাসী মূর্তির পৈশাচিক বিকট শব্দ উর্দ্ধ গগনে ছড়িয়ে পড়লো। লক্ষ কণা বিস্তার করে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত নদীও ছুটে চললো সংহার মূর্তিতে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে একটির পর একটি সিঁড়ি নিমজ্জিত হতে লাগল। ভীত ত্রস্ত স্নানার্থীরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কোন প্রকারে প্রাণভয়ে ঘাট পরিত্যাগ করতে লাগলো। ঝটিকা-প্রবাহের মেঘধূলি-সমাজ্বর ছুঁকার গতিমুখে মানুষের পক্ষে পরম্পরের নিরাপত্তা রাখা হয়ে উঠলো অসম্ভব! বিকুদ্ধ নদীপ্রান্তে কারো কোন প্রকার চিহ্নটি পর্যন্ত রইল না। সেই প্রবল জলের আলোড়নের মধ্যে অসংখ্য ছুইটি শিশু। উন্মল তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীবক্ষে তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার সে কি জীবন-মরণ-বুদ্ধ। শিশু দুটির মুখে কুটে উঠেছে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল ছায়া। ক্রমে অবসর দেহে তাদের ভেসে থাকার কক্ষতা পর্যন্ত অস্তহিত হল।

ভগবানের আশীর্বাদে মত উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একটি নৌকা গঙ্গার বুক চিরে আসতে দেখা গেল। স্রোতের প্রবলতার গতি অতিমন্দ্র। উপবিষ্ট এক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। দীর্ঘদেহ যেন লৌহনির্মিত! কেশদাম কাশভেদর মত ওজ্র। অঙ্গে নামাবলী, হাতে কজ্রাকের মালা। শিশুদের উপস্থিত বিপদ বুঝে ইষ্ট দেবতার নাম

স্বরণ করে বৃদ্ধ নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে প্রলয়োচ্ছ্বাস তাঁকে কোন বন্ধা দিতে পারলে না। অতিকষ্টে শিশুর কটিদেশ স্পর্শ করে বৃদ্ধ নিমজ্জমান বালকটিকে নৌকার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করে নদীবক্ষে বালিকাটিকে উদ্ধার করবার জ্ঞাত প্রচণ্ড চেউয়ের মধ্যে অগ্রসর হলেন। তখন বালিকার মুখমণ্ডল স্বেতবর্ণ, শ্বাস-প্রশ্বাস একরূপ নিশ্চল। অত্যধিক জলপানে শরীরে একপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিরাছে। বৃদ্ধ সবল হস্তে বালিকাটিকে কোনরূপে দৃঢ়

মুষ্টিবন্ধে আবদ্ধ করে সাঁতারে চললেন। প্রবল চেউয়ের আঘাতে মুষ্টিবন্ধ শিথিল হয়ে আসে। বৃদ্ধ অমাত্মিক শক্তিবলে যখন বালিকাটিকে উদ্ধার করলেন, তখন নদীবক্ষে পাহাড়েব মত চেউয়ের সমাবেশ। প্রচণ্ড এক চেউ তাঁর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো। একটির পর একটি চেউয়ের আঘাতে বৃদ্ধ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হলেন। প্রকৃতির পরিহাসের মত তখন ত্রিভুবন কম্পিত করে দিশান কোণে এক বজ্রপাত হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই আত্মত্যাগী বৃদ্ধের নাম।

শর্তমান বর্ষের “লীলা পুরস্কার”

ডাঃ শ্রীমোনোহন ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্তিত “লীলা পুরস্কার” সর্বপ্রথমে পেলেন সুপরিচিত লেখিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (জন্ম ১৮৭৪ ইং)। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর একমাত্র পরলোকগত কন্যা লীলাদেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে যে অর্থদান করেছেন, তার থেকে তার অভিপ্রায় মত, প্রতি দু’বছর অন্তে মহিলা সাহিত্যিকদের রুতিত্বের সম্মানার্থে এ পুরস্কারের সৃষ্টি। কিছুদিন আগে হেমলতা দেবীর গুণানুরক্ত ব্যক্তিদের উৎসাহে তাঁর সপ্ততিবর্ষপূর্তির উৎসব স্তম্ভস্বরূপ হয়েছে। এ উৎসবে তাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র, সমাজ সেবা আদি নানা গুণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ক্ষমতার কথাও আলোচিত হয়েছিল। তবু বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক দানের কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। গোড়ার দিকে কবিতা লিখেই তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কাব্য-গ্রন্থ “জ্যোতিঃ” ও “অকল্লিতা” ভাষা, ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়ে অনায়াসে পাঠকের সম্মম দাবী করে। দৃষ্টিকে যারা মাঝে মাঝে অন্তরের দিকে পাঠাবার সাধনা করেন, এ কবিতাগুলির বিচিত্র আধ্যাত্মিক রস তাঁদের অবশ্যই মুগ্ধ করবে—এরূপ আশা করা যায়।

“হুনিয়ার দেনা” নামক গল্পপুস্তকে পরিচয় পাই গল্প রচনায় ও কথা-সাহিত্যে হেমলতা দেবীর রুতিত্বের। এ বইয়ের ভাষাটি ভারী মধুর ও মনোজ্ঞ। গল্পগুলিতে তিনি যে বিষয়মিশ্রিত শাস্ত্র রসের পরিবেশন করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। খুব সম্ভব, বাংলার রসজ্ঞ পাঠকগণ লেখিকাকে এজন্তে দীর্ঘকাল ধরে মনে রাখবেন। তাঁর “দেহলি”ও বেশ সুলিখিত গল্পপুস্তক। তিনি “মেয়েদের কথা” নামক প্রবন্ধ পুস্তকে সহজ সরল ভঙ্গীতে সুন্দর ভাষায় মেয়েদের আদর্শ ও নানা সমস্যা নিয়ে যে সারবান আলোচনা করেছেন তা সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল পাঠকের নিকট খুবই মূল্যবান বিবেচিত হবে।

অতএব মনে হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অতি যোগ্য পাত্রকেই ‘লীলা পুরস্কার’ দিয়েছেন। ইতিপূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয় করেকজন মহিলাকে সাহিত্যের জ্ঞাত পদকাদি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এক স্বগীয়া কামিনী রায় ছাড়া আর কারো রচনার সাহিত্যিক গুণ তাঁর রচনার গুণোৎকর্ষের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয় না। একটু বিলম্ব হলেও বিশ্ববিদ্যালয় যে তাঁর গুণের সমাদর করেছেন, এজন্তে আমরা আনন্দিত।

কমরেডশিপ

(গল্প)

শ্রীমালবিকা দত্ত, বি-এ

প্রাণকৃষ্ণবাবু চটিয়াছেন : চটিবার কথাই তো। না হয় কলিকাতায় দুই দিন বোমাই পড়িয়াছে, তাই বলিয়া যেখানে তিনি সপরিবারে থাকিতে পারেন, চাকর ব্যাটা সেখানে থাকিতে পারিল না ! জন্মিয়াছে যখন তখন যে মরিতেই হইবে—ইহা তো জানা কথা। কলিকাতা ছাড়িলেই কি আর মরিবে না ? তাহা হইলে এত লোক মরে কেন ? পরের বাড়ীতে কাজ করিয়া যাহাদের দিন চালাইতে হইবে, তাহাদের জীবনের মায়া এত বেশী হইলে চলে না। এই বোমার বাজারে ঠাকুর চাকর মেলা যা' দুর্ঘট—তাই তো তিনি ছুটি দেন নাই রমাকান্তকে। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার গৃহিণী হইলেও অর্দ্ধাঙ্গিনী যে নহেন, তাহার প্রমাণ দিলেন রমাকান্তকে বিদায় দিয়া : প্রাণকৃষ্ণবাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া সুধাকণ্ঠে অমৃত ঝরিতে লাগিল—“চাকরটাকে দু'দিন ছুটি দিতে গেলে গায় লাগে। কেন গা—না হয় ও গরীব লোক, তাই বলে ওর প্রাণের মায়াও থাকবে না ? ও তো তোমাদের মত 'জাপানকে রুখতে হবে' বলে বেড়ায় না—যে জাপানকে রুখবার জন্তে বোমা মাথায় করে এখানে বসে থাকবে। ওকে তো আমি টাকা দিচ্ছি না আমরা—যেখানে খাটবে সেখানেই টাকা পাবে। যা যা—রমা তুই চলে যা বাছা ! আমার জন্ত ভাবনা কি রে—তোমার বাবু না গেলে তো আমি যেতে পারি না। তুই যা', দু'দিন ঘুরে ফিরে অবস্থা ভাল দেখলে চলে আসিস্।”

কাজেই প্রাণকৃষ্ণবাবু হুকুম ছাড়িতেছেন : না ছাড়িয়াই বা উপায় কী। সমস্তা তো একটা নহে : রমাকান্ত বাড়ী গিয়াছে পর্যাস্ত আর চাকর জুটাইতে পারেন নাই। ঠাকুর যত কাজই করুক, বাজারে যাওয়ার তার সময় নাই—অগত্যা গৃহিণীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে বাজারে যাইতে হয় তাঁহাকেই। তাহাতেও কি স্বস্তি আছে ? তিনি না কি রোজই ঠকিয়া আসেন, —রমাকান্ত কখনও এত খারাপ জিনিষ আনিতে না—

ইত্যাদি নানা অভিযোগ শুনিতে শুনিতে তাঁহার কাণ খালাপালা হইয়া গিয়াছে। দেশটা নেহাৎই সংস্কারাচ্ছন্ন, তাই সাবিত্রী রক্ষা পাইল। ভারতবর্ষ “বুর্জোবাদের নরককুণ্ড” না হইয়া “সাম্যবাদের স্বর্গপিঠ” হইলে কবেই প্রাণকৃষ্ণবাবু তাহার বিরুদ্ধে Divorce suit আনিতেন। কিন্তু তাহা তো হইবার নয় ! বহু দুঃখে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়—“দুর্গা! দুর্গা!”

এই তো গেল একদিকের কথা : অত্নদিকে ব্যাপার আরও গুরুতর। তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান অমুযায়ী নোয়াখালী জেলাতে যে ১৮০০ মেয়ে দলভুক্ত করা হইয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা “পাক্সা সাম্যবাদী” বনিয়া উঠিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। এখন প্ল্যানের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ এই ১৮০০ মেয়ের বিবাহ দিতে আরও : ৮০০ ছেলেকে দলে টানিবার প্রস্তাব কার্যকরী করিতে হইবে। অথচ এ সব ছেলে কোথায় মেলে, যাহারা স্ত্রীর মতামত নির্বিশেষে মানিয়া নিবে। অত্নাত্ন জেলার খবর এতো খারাপ নয়—কিন্তু নোয়াখালীর ছেলেগুলি একেবারেই বুর্জোয়া, না হইলে এই সব আধুনিকাদের বিবাহ করিতে চায় না। গভীর দুঃখে প্রাণকৃষ্ণবাবু চোখ বুজিয়া কাহাকে অরণ করিলেন তিনিই জানেন।

সেদিন সকালবেলা চা খাইতে খাইতে প্রাণকৃষ্ণবাবু ভাবিতেছিলেন—এখনই তো বাজারে যাইতে হইবে। রমাকান্তটা ফিরিয়া আসিলে বাঁচা যাইত। এমন সময় কাণে আসিল—“মা-ঠাইরাণ কই ঠাউর মশাই ?” কে কথা বলে ? রমাকান্ত না ? তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখেন রমাকান্তই বটে—ভুলুঙিত হইয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিতেছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন—“দুর্গা ! দুর্গা”—তা'হলে ফিরে এসি রমা ?”

রমাকান্ত জবাব দিবার পূর্বেই সাবিত্রী মুখ খুলিল, —“দুর্গা! দুর্গা! কেন গা ? বল না ঠ্যালিন। ঠ্যালিন !”

প্রাণক্লম্ব বাবু জলিয়া ওঠেন! কিন্তু জবাব দিবার চেষ্টা করেন না, কারণ এতদিনে এই জিনিষটা অন্ততঃ তাঁহার চোখ এড়ায় নাই যে, তাঁহার মুখে খই ফুটিলে সাবিত্রীর মুখে ভুবড়ী ছোটো। অগত্যা মনের রাগ মনে চাপিয়া তিনি ঘরে ঢুকিয়া পড়েন।

গৃহিণী সরসেহে জিজ্ঞাসা করেন—“ভাল ছিলি রমা? দেশের খবর কি? শুনিছ তোদের জেলাতেও নাকি বোমা পড়েছে?”

—“বোমা পইড়ছে মা-ঠাইরান, ত আমাগো সহর’ পড়ে ন’। ফেণীত পইড়ছে! আর আপনাগো আশীর্বাদে আছিলাম ভালাই। কিন্তুক মা-ঠাইরান গো, এইবার দেশ’ যেই বিপদ—যত ছেইলাধরা নাইমছে। যেয়ে পায় হেরেই ধর্যা ফালায়। আমার’ও ত ধরছিল—এক ফেরে পালাইয়া আইছি।”

—“সে কি রে? তোকে ধরল কেন?”

—“কেমতে কইমু মা-ঠাইরান? ইষ্টিশনে ত নাইমছি—হেমনি ছইড়া মানুষ আইয়া কইল—কইতুন আইছ? আমি ত ভয়ে ভয়ে বাবুর নাম কইলাম—হেমনে আমারে কয়—তা’গ লগে যাইবার লাইগা! আমিও যাইতাম না—তারাও ছাইড়ত না : হেসে রমাকান্ত বলে—আমার বিয়া দিব! আমি কইলাম—কেরে? তারা কয়—বাবু বলে আমারে পাঠাইছে বিয়া করনের লাইগা। বাবুর নাম কওনে আমি তো আর ফিরতাম পারি না—গেলাম তা’গ লগে!”

—“সে কি রে? তুই বিয়ে করলি?”

—“আরে হোনেনই মা-ঠাইরান। গেলাম ত তা’গ লগে। এক বাড়ীতে আমারে তো লইয়া গেল—কত মাইয়া মা-ঠাইরান, কি কইমু! তারা আমারে কইল—কারে বিয়া করবা কও। আমি কি কইতাম পারি—হেষকালে তারাই ঠিক কইরা দিল। কিন্তুক মা-ঠাইরান, বাবু এই কা’গ লগে আমার বিয়া দিল—তারা না আইনল বামন ঠাউর—না কইরল কিছু! আমগো দো-জনেই ফুল পুষ্প দিল—কইল, বিয়া হইয়া গেছে। আরও য্যাম কি কইল “কম-রাডশেপ”। তা’ কম-সম নয়

বুইজলাম মা-ঠাইরান—রাডশেপ যে কি কইল ধইরবার নারলাম।

—“তারপর—তারপর?” সাবিত্রীও যেন ছেলে মানুষ হইয়া ওঠে।

—“হেরপর মা ঠাইরান বিয়া ত হইল। আমি কইলাম—আমাগো বাড়ীত যাইত হইব। তা মাইয়া ত’ কিছুতে যাইত না। আমি আর থাকতাম না পাইরা কইলাম—ত আমারে বিয়া করলা কে রে? এ কথা হইয়া ত’ কি হাসি ছুটল? কয়, বিয়া কি? এইড়া ত ‘কমরাডশেপ’। আমি কইলাম, হেড়া আবার কি? হেরপর থাকিয়া গো মা-ঠাইরান, আমারে যে কত কি কয়—মজুর, চাষা, কত কি, আমার যদি মনে থাকিত ত কইতাম পারতাম। বেবাক ত তুইল্যা গেছি। হেষকালে বুইজলাম যে বিয়া ত দেওন না—আমারে এক মাষ্টরনীর হাত’ তুইল্যা দিছে পড়াইবার লাইগ্যা। আরে আমি যদি লেখাপড়াই করমু ত তোরা খাওয়াইবি আমার মা-ভইনেরে? তা’গরে আমার টাকা দেওন লাগে না মাস মাস? কিন্তুক কি মুন্সিল’ যে পড়লাম মা-ঠাইরান—ইষ্টিশনে বেবাক সময় তা’গ লোক আছে—আইবার নারি। হেসে মনে মনে অনেক ভাইব্যা রাত থাকতে উইঠ্যা হাইট্যা পলাইয়া আইছি।”

সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“থাক থাক—তোরা আর দেশে গিয়ে কাজ নেই। যা’ কাজ কর্ম কর গে।” রমাকান্ত যাইতে যাইতে কহিল—“কিন্তুক মা-ঠাইরান একডা কথা—!”

—“কি রে?”

—“তেমন কিছু নয়। এই রাডশেপের অর্থডা কি যদি বাবুরে জিগ্যাংয়া আমারে একটু কইয়া তান! আমি ত জিগ্যাংইতাম পারতাম না।

—“তুই-ই জিগ্যেস করিস এক সময়। এখন যা।”—

রমাকান্ত চোখের আড়াল হইতেই সাবিত্রী সশব্দে ফাটিয়া পড়ে—“আ মরণ, কি কমরেডশিপ রে। বাড়ীর চাকরবাকরগুলোর দফা শেষ হ’বে পাঁচ বছর ধরে এমন ছেলে ধরার প্র্যান চললে...”

ত্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

যোগবাশিষ্ট অবলম্বনে পূর্ব প্রবন্ধে মনের আবির্ভাব সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু সম্ভব বর্ণনা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থিতি বিস্তৃতি এবং নিরোধ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

মন দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক বশতঃই কর্তৃত্বজ্ঞানে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পার্থক্য এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হয়। স্বপ্নকৃত কর্মদ্বারা কেহই সেই জ্ঞান আপনাকে অপরাধী মনে করে না। মনের স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থার বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

মানসিক যে অবস্থা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে তাহা দ্বিবিধ :—

(১) অজ্ঞানাবস্থা, (২) জ্ঞানভূমি।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম এবং তাহার অভ্যাসের পরিণামে ভোগবাসনার বৃদ্ধি, এই অবস্থায় অজ্ঞানভূমির স্থিতির কারণ। ইন্দ্রিয়গণের যথেষ্টাচার যেমন বাসনা তদনুরূপ কার্য করা, যাহা ইচ্ছা তাহাই হওয়া, পরিণাম ও হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া বিধি নিষেধ না মানা, ভোগাশক্তির উৎকর্ষ যথা অজ্ঞানসম্ভ্রাত সুখ অতি উপাদেয়, কিরূপে সেই সুখ পাওয়া যাইবে ইত্যাদি মনোভাবের কার্য্যে আগ্রহান্বিত হওয়াই ঐ অজ্ঞান ভূমিকার দৃঢ়তা জন্মায়।

শাস্ত্রোক্ত সাধন চতুষ্টয় বিশিষ্ট হইয়া শ্রবণ মননাদির প্রয়ত্ত ও মোক্ষাভিলাষের চেষ্টা এই দুইটি জ্ঞানভূমিকার দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

এই উভয় মানসিক অবস্থার আধার কিন্তু সর্কাধার ব্রহ্ম তাঁহারই অস্তিত্বে উভয়েরই অস্তিত্ব; তদীয় প্রকাশের উৎকর্ষাপকর্ষ হইতে ঐ অবস্থায়ের হ্রাস ও বৃদ্ধির ক্ষুরণ হয়, ঐ অজ্ঞানভূমিতে অবস্থান করিলে অবসন্ন হইতে হয়, কিন্তু জ্ঞানভূমিকায় আরোহণ করিবার প্রয়ত্তে শান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

চিদাধারে অজ্ঞানের সংশ্রব বা অবস্থা নিম্নোক্ত সপ্তভাবে যোগবাশিষ্টে উল্লিখিত।

* বৈশাখ সংখ্যার প্রকাশিতের পর।

(১) বীজজাগ্রৎ—ব্রহ্মচৈতন্য হইতে সৃষ্টির আদিতে এবং অম্বদাদির জাগ্রতের মূলে চেতনার যে প্রথম ক্ষুরণ, বা চিদাভাস সম্বলিত মায়াক্রান্তির আত্মবিকাশ, যাহার নাম নাই, তাহাই প্রাণ ধারণাদি ক্রিয়ার অবলম্বন, এবং তাহাই চিন্তা, জীবাদিশব্দের প্রকৃত অর্থ।

(২) জাগ্রৎ—এই বীজজাগ্রতের পরে স্বরূপের বিস্তৃতি বশতঃ সামান্যতঃ “এই আমি” “ইহা আমার” এই প্রকার যে জ্ঞান প্রস্ফুট হয়, তাহাকেই ‘জাগ্রৎ’ অবস্থা বলে।

(৩) মহাজাগ্রৎ—এই জাগ্রত অবস্থায় জন্মান্তরীয় সংস্কার বিশেষের উদ্ভেদে এবং অভ্যাসের দৃঢ়তায় স্থূল হইলে মহাজাগ্রৎ অবস্থা হয়। ইহাই সাধারণের মানসিক অবস্থা—জীবের অজ্ঞান ভূমিকায় অল্প তিন অবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ, এবং সুষুপ্তি।

এই সাত অবস্থা শত শত শাখা সম্পন্ন হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যেকেরই ঘটিতেছে।

চিন্তাবৃত্তি সমাক্রান্ত ব্রহ্মই জ্ঞানের প্রতিপাদ্য। অজ্ঞানের নাশক বলিয়াই তাহার নাম জ্ঞান। এবং সেই ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি বলিয়া বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানভূমিকার সপ্তাবস্থা নিয়ে লিখিত হইল;—

(১) শুভেচ্ছা,—সংশয়, সজ্জনসঙ্গ, এবং তাহা হইতে জ্ঞাতব্য কি, কর্তব্য কি তাহা জানিবার যে আগ্রহ এবং নিত্যানিত্য বিচার পূর্বক ঐ সকল বিষয়ে যে অনুসন্ধিৎসা তাহাই শুভেচ্ছা।

(২) বিচারণা,—শাস্ত্রানুশীলন, সজ্জনসঙ্গ, বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্বক যে সদাচারবৃত্তি দিন দিন বাড়িতে থাকে তাহাই বিচারণা।

(৩) তত্ত্বমানসা, শুভেচ্ছা ও বিচারণার ফলে জ্ঞানে ধীরে ধীরে যে বিষয়ে অনাশক্তি জন্মে এবং তৎকারণে বিষয় বাসনার ক্ষীণতাই তত্ত্বমানসা।

(৪) সঙ্কাপতি,—শুভেচ্ছা, বিচারণা, ও তত্ত্বমানসা এই জ্ঞানভূমিত্রয় অভ্যাস করিতে করিতে করিতে বাহ্য বিষয়ের সংস্কার ও অঙ্গে অঙ্গে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার বলে যে আত্মনিষ্ঠা জন্মে তাহা সঙ্কাপতি।

তাহার পরে অল্প তিন অবস্থার নাম অসংশক্তি, পদার্থ-ভাবনী ও তূর্য্যাগ।

এই সপ্তবিধ অজ্ঞানভূমি ও সপ্তবিধ জ্ঞানভূমি জানিবার জন্ত বাহাদের ঔৎসুক্য জন্মিবে, যোগবাশিষ্টের উৎপত্তি প্রকরণ পড়িবার জন্ত তাঁহাদিগকে অমুরোধ করি।

বাহার অস্তিত্ব নাই, কল্পনার বা প্রান্তির প্রভাবে তাহা থাকার জায় কাথ্যকরী হয়। থাকুক বা নাই থাকুক, জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে সমারোপিত হইলেই সত্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া তাহা প্রয়োজন নির্বাহে সমর্থ হইয়া থাকে। সকল কাল্পনিক অবস্থার মূলে কিন্তু এক অহংভাব বিদ্যমান। এই অহংকার দেহ নহে, দেহে অবস্থিত এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র আপনার সঙ্কল্পমাত্রের উৎপন্ন। একমাত্র সঙ্কল্প বা বাসনাতন্ত্রে নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্প বা বাসনাতন্ত্র ছিন্ন হইলে বিষয়ভাব সকল কোথায় পলায়ন করে, কোথায় যায় বা তাহার কি হয়, তাহাও জানিতে পারা যায় না।

জগৎ সৃষ্টি চিদাকাশে বোধ-বিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অল্প কিছুই নহে। সকলই চিত্তের অন্তর্গত বলিয়া এবং সেই চিত্তের আবির্ভাব কল্পনাজাত, এই কারণে অবিজ্ঞা, জীব এবং চিত্তশব্দের প্রকৃত ভেদ নাই। “অবিজ্ঞা চিত্ত জীববুদ্ধি শব্দানাং ভেদো নাস্তি বৃক্ষতরুশকরোরিব।”
যোঃ উঃ ১১৬।৮।

পূর্বে প্রবন্ধে মন ও চিত্ত শব্দের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা মনেই অবস্থা ভেদ মাত্র। এই বোধান্তর্গত অহংভাবই কাল্পনিক এবং অপ্রতিষ্ঠ হইলেও সংসারপদবাচ্য। মনের বিস্তৃতির মূলকারণ অহংকারের ত্রিবিধ অবস্থা—

(১) সর্বত্রই আত্মচৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। এবং আমিই সেই আত্মা এই যে অহংভাব তাহা বন্ধন কারণ নহে তাহা মোক্ষেরই কারণ হয়। কিন্তু এই অহংকার জীবমুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান, অল্পত্র নহে।

(২) আমি এই দৃষ্ট বিশ্ব হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র ও পরম সূক্ষ্ম এইভাবেই যে জ্ঞান তাহা দ্বিতীয়াহঙ্কৃতি। ইহাও মোক্ষের কারণ এবং মাত্র জীবমুক্তপুরুষেই বিদ্যমান।

(৩) তৃতীয় অহংকারই পরম শত্রু ও বর্জনীয়। অর্থাৎ আমি হস্তপদাদিমুক্ত দেহী, আমি মনুষ্য, আমি কর্তা,

আমি ভোক্তা, ইত্যাদি প্রকারের যে মিথ্যাভিমান, তাহাই তৃতীয়াহঙ্কৃতি এবং তাহাই সাধারণ মনুষ্য মধ্যে বর্তমান। পুরুষ ঐ হৃৎসদায়িনী তৃতীয়া অহঙ্কৃতিকে যতই পরিত্যাগ করে, মঙ্গলময় পরমাত্মা ততই নিকটবর্তী হন এবং আনন্দের মাত্রা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

পরমাত্মার নামান্তর অমুভূতি তিনি অমুভূতিরূপী। সর্বজীবেই অমুভূতি আছে; ব্রহ্ম চৈতন্তের অবস্থিতির পরিচায়ক সর্বজীবেই সেই অমুভূতি। ঐ অমুভূতি হইতে উদ্ভিত মন আপনা আপনিই প্রবৃত্তি বাসনার প্রভাবে চিদার্ণবে লহরীর মত আবির্ভূত হয়, এবং নিবৃত্তি বাসনার দৃঢ়তার সহিত লয় প্রাপ্ত হয়; নিজে অচেতন স্বভাব হইলেও মন ব্রহ্ম চৈতন্তের অমুগ্রহে চেতন হিরণ্যগর্ভ বা প্রজ্ঞাপতিবাচ্য হন। বাসনাভিভূত চিত্ত বা মন বাহা ভাবনা করে, তাহাই তাহার অমুভূত হয়, অবিদ্যমান হইলেও কল্পনামুযায়ী সর্ববিষয় সত্যরূপে প্রতীত হয়, সর্ববাসনার মূলে অহংকার নিহিত থাকে; এই অহংকারই শরীর ধারণ করিতেছে। মরণকালে অহং অভিমান থাকে না, দেহও বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সময়েই ঐ অহং অভিমান এক দেহ ত্যাগ করিয়া অল্প এক ভাবময় দেহ আশ্রয় করে।

এই অহং-ভাব অবিজ্ঞারই বিকার এবং চিত্ত বৈপরীত্যের ফল। এই অহং ভাবাদিময়ী অবিজ্ঞা চিত্ত, মন, বা বুদ্ধি আদি অন্ত মধ্যরহিত স্তুরাং অনন্ত, চিত্তের প্রতিভাসে বা কল্পনামুযায়ী—পদার্থের পরিবর্তন হয়। বাসনামুসারেই চিত্তের আকস্মিক উদয় হয়—এবং তাহার ব্যবহার পরম্পরা ও তদনুরূপ সত্যতায় অভ্যাদিত হয়। জগৎ কিন্তু আপনারই অন্তরে, জগদবুদ্ধি তাহার অব্যতিরিক্ত।

আকাশ বৃক্ষের বৃদ্ধি করে না, মাত্র বৃদ্ধির অনিবারক হয়। চিদ্রূপী পরমাত্মা কিছু না করিলেও অনিবারক যেহেতু সৃষ্টির কর্তা বলিয়া অভিহিত হন। আকাশ যেমন ঐ অনিবারক কারণে বৃক্ষের বৃদ্ধির কারণ, চিং ও সেই কারণেই সৃষ্টির কর্তা, চিং, চিত্ত ও জীবাদিক্রমে মনের উৎপাদক হয়। জীববাসনাবাসিত চিং ও প্রলয়ান্তে পুনর্বার চিত্ত চেতাদি সৃষ্টির আকারে বিবর্তিত না হইয়া

থাকিতে পারে না ; যথা বীজসংযুক্ত বৃষ্টি-জলবিন্দু বৃক্ষ-শতাদিতে প্রবেশ করে ও পুনরায় বীজ প্রাপ্ত হয়। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্গ থাকি, পরে সংকল্পদ্বারা অন্তরে বিষয়ের রচনা করি, পশ্চাৎ নিশ্চয় করি, জীব ও নিষ্ক্রিয়ভাব হইতে উথিত হইয়া সঙ্কল্প করে, এবং পরে তাহার ক্রিয়া কলাপ বিস্তার।

আত্মার জীবভাব স্বভাবসিদ্ধ, অহংভাব-শূন্য জীব স্বাভাবিক দর্শনের অভাবে আপনাতে অহংভাব ভাবনা করে। পূর্ব-সঙ্কল্প-সংস্কার দ্বারাই সেই অহংভাব উদ্ভূত হয়, কারণান্তরে নহে। বাসনার দৃঢ়তার সহিত পরং ব্রহ্ম পরম হইলেও অহংভাব প্রাপ্ত হন। সেই অহংভাব বাতস্পন্দনের জায় দেশ, কালাদিরূপে প্রস্ফুরিত এবং চিত্ত, জীব, মন, মায়ী ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কল্পনাচ্ছাদিত চিত্তের আবরণে ব্রহ্মসত্তা জ্ঞান হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। জ্ঞান এক বস্তুর অত্যাশ্রয়ে অল্প জ্ঞানদ্বারা হইয়া পড়ে।

মনে হইতে পারে যে যখন মনের অস্তিত্বজ্ঞান হইতেছে, যখন তাহার মূর্ত্তি জ্ঞান ভিন্ন কিছুই নহে, এবং জ্ঞান যখন আমার অন্তরেই রহিয়াছে, তখন ব্রহ্ম চৈতন্য আমার প্রত্যক্ষ ; কিন্তু তিনি অহংরূপে লব্ধ থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে অলব্ধ তাঁহাকে লাভ করিলেও এইরূপে লাভ করা লাভ না করার সমান।

আত্মা যত্নশতপ্রাপ্যো লক্কেহ্মিন্ ন চ কিঞ্চন।

লব্ধং ভবতি তচ্চৈতৎ পরমং বা ন কিঞ্চন ॥

যোঃ উঃ ৮১।৯

সর্বজীবই অদেহ ও চিদাকৃতি— ! চিদাত্মা কিন্তু মনের লভ্য নহে ; সাংসারিক বিচিত্র দুঃখ পরম্পরা দেহের চিদাত্মার নহে। দেহের অস্তিত্ব কিন্তু মনের উপর নির্ভর করে।

দেহের আতিবাহিক জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। সুবাসনার দৃঢ়তায় আতিবাহিকদেহ প্রাপ্ত হইলেই স্থূলদেহ বিশীর্ণ হইয়া যায়। বর্তমান কালিনিক জ্ঞানে অহংকার ও দেহ এক বলিলেই চলে। শাস্ত্রমতে কিন্তু একমাত্র আতিবাহিক দেহই আছে—আধিভৌতিক দেহ নাই। বাসনাদির দৃঢ়তায় অধ্যন্তজ্ঞানে আতিবাহিকে আধি-

ভৌতিক জ্ঞান হয়, এবং অধ্যাসের উপশম হইলে প্রাক্তন আতিবাহিক উদয় হয়, মনই বাসনাময়ী ব্যবহার্য বস্তুতে আপনার অভিমত আকার স্বজন করে দেশ, কালাদির প্রতীক্ষা করে না। যেকূলে দেখে তাহাই দৃষ্ট হয় ; যে যে বিষয়কে যে প্রকারে জানে, সে বিষয় তাহার জ্ঞানে সেই প্রকারেই সমুদিত হয়, অর্থাৎ তাহাই তাহার জ্ঞানে তাহার সম্বন্ধে সত্য হইয়া দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয়গণ থাকিলেও মন ব্যতীত প্রকৃত বস্তুদর্শন হয় না, মন হইতেই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন, ইন্দ্রিয় হইতে মন উৎপন্ন হয় নাই। চিত্ত ও শরীর আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন, মনই বিচিত্র কার্য্যকরী হয় বলিয়া কার্য্য অনুসারে জীব, বাসনা, কর্ম্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় পুরুষকার অবলম্বনে এই কল্পনাবরণ উন্মুক্ত করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, মোক্ষ অপৌকষেয় নহে।

চিং বদ্ধ হয় না কিন্তু চিত্ত বদ্ধভাব ধারণ করে। সকল ভেদজ্ঞান মনোবৃত্তির, চৈতন্যের নহে, তাহা বুদ্ধির অনতিরিক্ত। মনঃ প্রভৃতি ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় বহিমুখী বৃত্তিদ্বারা দেখে, শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবলই কল্পনা, স্মৃতির অসত্য। পুরুষকার দ্বারা বিচার ও ভাবনার সাহায্যে ঐ বাসনাময় মনকে ব্রহ্মে বিলীন করিতে পারিলে আর মন বা চিত্তের উদয় হয় না। অভ্যাস বশতঃ চিত্তও বিষয় দর্শনের অভাবে উপশান্ত হইয়া যায়।

কালিনিক অহংকারই আত্মার সঙ্কোচক, এই অহংভাবের ক্ষয়ের সহিত পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন।

জল মধ্যস্থ যুগ্মভাও যেমন জলের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসারাবস্থায় বিচিত্র ভাবরাশি বা দৃশ্যসমূহ এবং তদ্বিষয়ক বোধ, জ্ঞানের পরিপক্বতা জ্ঞাত বোধের সহিত ব্রহ্মৈকরস হইয়া যায়—। আত্মতত্ত্বরূপে আত্মা চেতন এবং জগৎস্বরূপত্ব রূপে তিনি অচেতন। চিদাকাশের স্বপ্রকাশ-শক্তিতেই চিত্তের বা মনের প্রকাশ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও স্বতঃ প্রকাশের শক্তি নাই, চিত্ত আত্মাতেই স্থিত।

যাহাদের চিত্ত ধ্যানপরিপাক লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাধিবিলীন, তাহাদের দিবাও নাই, রাত্রিও নাই, দৃশ্য পদার্থও নাই এবং জগৎও নাই, তাহার কেবল আত্মাই থাকে, অস্ত্র কিছুই থাকে না। এই প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপায় আত্ম-বিচার। দৈশ্বরাহুগ্রহে যদি এই বিচারের ক্ষমতা জন্মে তাহা হইলে আর অস্ত্র গুরুর আবশ্যক হয় না, নিঃকৃত আত্ম-বিচারই—পরমোত্তম গুরু বলিয়া পরিজ্ঞেয়।

বিদিতপরমকার্যাত্মজাত

অমরমুচ্যেতনসমিধং বিচার্য।

অমননকলনানুসার এক-

স্থিৎ গুরুঃ পরমো ন রাঘবাত্মঃ।

যোঃ উঃ ১৪।২৮

চিত্ত বা মন স্বস্বভাবে তরঙ্গমালার মত বিস্তৃত হইতেছে, তাহার আধার কিন্তু পরমাত্মা। বিচিত্র স্বাবর-জঙ্গমাশ্রয় দৃশ্য বিশ্ব এই মন হইতেই সমাগত। ভোগ্য বস্তুর ভাবনামুযায়ী অর্থাৎ যে প্রকার কল্পনার বস্তুর অভি-লাষ হয় দেহও তদনুরূপেই স্পন্দিত হইতে থাকে। জল-পরিবিক্ত ক্রমবর্দ্ধমান লতার মত চিত্তে স্বসংকল্পজাত সুখ দুঃখাদি ভোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভয়প্রদ না হইলেও বাসনার আবেশে মন অতি ভীষণ হইয়া উঠে। বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। মনই দেহসম্পন্ন নর, দেহ জড় কিন্তু মন জড় নহে, আবার অজড়ও নহে। পক্ষান্তরে প্রাণ-শক্তি নিরুদ্ধ হইলেও মন বিলীন হয়, কারণ প্রাণ ও মন মূলতঃ একই বস্তু। প্রাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সেই প্রাণ যতক্ষণ শরীরে ক্রিয়াশীল থাকে ইন্দ্রিয়ও ততক্ষণ কার্য্য করে; ইন্দ্রিয় অবসন্ন হয় কিন্তু প্রাণের অবসাদ নাই।

মনের দেহাশ্রয়ী আমিষ বুদ্ধি অবিজ্ঞা, তাহার ভিত্তি বাসনা। ঐ অবিজ্ঞা দুঃখ প্রদানের জন্তই বর্দ্ধিত হয়, অবিজ্ঞা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, সেই হেতুই নিবৃত্ত হইয়া যায়, সমস্ত বাসনাই লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। কুস্মাতি কুসুমতম গুরু-পীতাদি-রসবাহিনী সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী হৃদয় হৃদয় নাড়ীর উপরেই সপ্তদশ অবয়ব ঘটিত লিঙ্গশরীর অবস্থান করে, সেই লিঙ্গশরীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সমষ্টি যাত্র।

নীহারিকাক্ষর আকাশের মত মনঃশক্তির আবরণে জ্ঞানের মালিঞ্চ ঘটে। মন যেখানে অহঙ্কারে পরিণত হয় সেইখানেই তাহার কল্পনামুযায়ী দৃষ্টেরও উদয় হয়। জীব চৈতন্ত ও মনের অতিরিক্ত অস্ত্র কিছুই নহে। কিন্তু জীবের পক্ষে কল্পনা সত্য, ব্রহ্মের কল্পনা কল্পনাই। এই কারণেই সর্ব্বসঙ্কল্পবিরহিত অবস্থা ব্রহ্মানুভূতির একমাত্র ক্ষেত্র। নির্মূল ব্রহ্মপদে জীবমণ্ডলী প্রভাসিত হইতেছে। জগৎকে যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় তাহার কেবলমাত্র কারণ আত্মবিস্মৃতি। সেই বিস্মৃতির অবস্থাই মন এবং তাহাই পুনরুৎপত্তিবিধারিনী। জীবের উৎপত্তির অপর কোন কারণ নাই, মন যাহা চিন্তা করে ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা বা ক্রিয়া তদনুরূপেই হইয়া থাকে, মনের সেই উন্মেষ সর্ব্বকর্ম্মের মূল কারণ। যে উপাধির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের স্বভাব।

মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে চিত্ত ক্রমে মুক্তিলাভ করে। ‘ব্রাহ্মি’ এই জ্ঞান হইবামাত্রই আপনা হইতেই চিত্ত ব্রাহ্ম অবস্থা পরিত্যাগ করে। বর্তমান জ্ঞানধারা কল্পনায় প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার স্বরূপাবস্থার অন্তরায়, এই জ্ঞান হইবামাত্রই চিত্ত অন্তর্মুখীন হয়, এই অন্তর্মুখীন হইবার সঙ্কল্প এই জন্মেই প্রয়োজন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর ইন্দ্রিয়লয়ের জন্ত পৃথক্ চিন্তার প্রয়োজন হয় না, কারণ বিষয় ও ইন্দ্রিয় একই, এক বিষয়লয় দ্বারা ইন্দ্রিয়-লয় সিদ্ধ হয়। বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান বিচারসাপেক্ষ। সেই জ্ঞানের উন্মেষের সহিত অর্থাৎ বিষয়ের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি হইলেই চিত্ত তাহাতে আর আশ্রিত থাকে না।

বাসনাক্ষয়ে ইন্দ্রিয়ও আর বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। বিষয়ের কাল্পনিক মূর্ত্তি জ্ঞানকে বদ্ধ রাখে। মাত্র বিষয় বন্ধের কারণ নহে। বন্ধনের স্বরূপজ্ঞান হইলেই বন্ধনের পরিত্যাগ সম্ভব হয়, নচেৎ অন্ধের পথ-পর্যটনের মত অতীষ্ট লাভ হয় না।

শ্রুতি ও আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথের পথিক হইলেই অগাধ মোহ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কারণ, শ্রুতি ও আচার্য্যগণ জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকা দ্বারা মন, চিত্ত বা বুদ্ধির অহঙ্কারাদিময়ী অবিজ্ঞার আবরণ অপসারিত করে।

আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশক, বুদ্ধি প্রকাশ্য, সেই জ্যোতিঃ বুদ্ধির আকার প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি স্বভাবতঃই স্বচ্ছ এবং আত্মার অতি সন্নিহিত। এই কারণে উহা আত্মচৈতন্য জ্যোতির ঠিক অনুরূপ হইয়া থাকে, অন্ধকারে প্রদীপ যেমন সর্ববস্তুর প্রকাশক হয়, বুদ্ধিও তরূপ আত্মার সমস্ত বিষয়-প্রতীতির প্রধান সহায় হয়। জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে বুদ্ধিই প্রধান; অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণ কেবল তাহার দ্বার মাত্র।

উপরোক্ত অবিজ্ঞা পরিত্যাগের বাসনাই শুদ্ধা বাসনা; সেই বাসনা বা সঙ্কল্প বুদ্ধিসাধ্য। এবং তাহাই জন্ম-বিনাশিনী বলিয়া কথিত। এই অবিজ্ঞা-বরণ উন্মোচন স্বীয় প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়। দেবতা, কাল কেহই কর্মফলের বিষয় করিতে পারেন না, তাহার। যথা সময়ে কর্মের অনুকূলই হন। মোক্ষ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। ঐ অবিজ্ঞার ব্যবধানে অপ্রাপ্তবৎ প্রতীত হয়।

চিত্ত বা মনোরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসাথ স্ব-পুরুষকারই অব্যর্থ মহৌষধ। যত্ন সহকারে অভ্যাসের সহিত চিত্তরূপ বালককে বিষয় বা বাহ্য বস্তু হইতে নিরস্ত করিয়া ব্রহ্মপদে সংযোজনের ফলে আত্মবোধ জন্মে। ব্রহ্মই মনন শক্তির উদ্বেক্তে মনঃপ্রাপ্ত হন। মনের প্রাতিভাসিক বা অধ্যাত্ম জ্ঞানে আত্মাই মন ও জগৎ উভয়াকারে উদ্ভিত হইয়াছে। নিজকে জানিতে না পারাতেই আত্মা জীব হইয়া আছেন। সঙ্কল্পাহীন হইয়া প্রকাশ পাওয়াই চিৎশক্তির স্বভাব, পদার্থের সত্যতাও ভাবানুগামী। শুদ্ধা বাসনার সঙ্কল্পে মন প্রথমে রাগশূন্য হয়; পশ্চাৎ বোধোদয়ে পরম পবিত্র জ্ঞাদিক্রিয়াশূন্য পূর্ণ শান্ত ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হেতু জীবমুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে মহাবিপদ উপস্থিত হইলেও তজ্জনিত শোক অনুভব করিতে হয় না। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আত্মার বিনাশ নাই, গতাগতি নাই। দেহ ক্ষয় হইলে ঐ উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা অনন্ত আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে। আত্মনাশের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানান্বেষী বতীত সংসারবিহারী মনও বিনষ্ট হয় না। দেহ-ভঙ্গ হইলে ঘটস্থ আকাশের মত দেহাভিমাত্রী জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। মনই মনরূপ শত্রুকণ্ঠক আক্রান্ত হয় মাত্র; মননমূর্খতার পরেই জীবের পর-জগৎ

দর্শন হইয়া থাকে, তাহাও তাহার পূর্ব-সঙ্কল্পাহীন। জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা মরণ-মূর্খা অনুভব করিয়া প্রাক্তন ভাব বিন্যস্ত হয়। এবং অজ্ঞপ্রকার সংসার অনুভব করে।

অনুভূত ক্ষণ জীবো মিথ্যা মরণমুচ্ছন্নম্।

বিশুদ্ধ প্রাক্তনঃ ভাবমন্তঃ পশুতি মৃত্যুতে।

যোঃ উঃ ২০:৩১

মনের অহঙ্কারজাত মমত্বই ইষ্টানিষ্টের কারণ, তাহারই সামর্থ্যে ভ্রান্ত হইয়া জীবমণ্ডলী স্বপ্নতুল্যা সংসার দর্শন করিতেছে। জন্মের পর জন্ম চলে, পূর্বজন্মের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের কোন কথাই স্মৃতিপটে উদ্ভিত হয় না। প্রতিজন্মে নূতন সংসার-রচনা। আসক্তির তাড়নায় সর্ববিষয়েই কাল্পনিক আশিষের প্রভাব এত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়, যে তাহার মিথ্যাত্ব, পরিবর্তনশীলতা, ক্ষণ-ভঙ্গুত্ব ও আপাতরমণীয়তা জ্ঞানে স্থানই পায় না। স্বরূপোপলব্ধির বিচার হৃদয়ে জাগিলে আমি বা আমার যে কোন মূল্যই নাই তাহা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম হয়।

ব্রহ্মাকার। সঙ্ঘিৎ ও জগদাকার। সঙ্ঘিৎ এই দু'য়ের মধ্যে যাহার শক্তি অধিক হইবে তাহারই জয় অবশ্যস্তাবী। স্বয়ং-সম্মত বেগ অপেক্ষা যত্নজবেগ অধিক বলশালী। সত্যবিজ্ঞানের নিকট মিথ্যাবিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বল। প্রযত্নোখিত ব্রহ্মসঙ্ঘিৎ অবত্মমূলভ জগৎসঙ্ঘিতের বেগকে জয় করিবেই করিবে। সদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ব্রহ্মসঙ্ঘিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞান সত্য কিন্তু জগৎ জ্ঞানের রূপ কাল্পনিক বা মিথ্যা; তখন এইরূপ যত্ন করা উচিত যে, তাহাতে বাহ্যসঙ্ঘিৎ দুর্বল হইয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞান দুর্বল হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া যায়, ইহাই নিয়তির স্বভাব। নিজসঙ্ঘিতের প্রযত্ন ব্যতীত অজ্ঞ কেহ ফলদাতা নাই।

নিজে আত্মমাত্রাকার বৃত্তিধারা—এই চিন্তারূপ পৌরুষ দ্বারা চিত্তকে জয় করা যায়, শাস্ত্র ও সংস্কারের প্রভাবে ধীরতা লাভ করিয়া চিন্তানলে অমৃতপ্ত স্বীয় লৌহস্থানীয় মনের দ্বারা চিন্তানলতপ্ত লৌহাস্তরস্থানীয় মনকে ভগ্ন করিতে হয়। চিত্তকে বালকের মত অগ্নয়ত্নে আত্মবস্তুতে যোজিত করা যায়। পৌরুষপ্রযত্নে উদ্দীপিত করিলে চিত্তরূপ শিশু বশীভূত হইতে থাকে। আপনি আপনায়

দ্বারা নিজ চিন্তকে বিগুহ্য করিতে হয়। বাসনাভ্যাগরূপ পুরুষকারে অগ্নে অগ্নে মত্তকে শমিত করিতে হইবে, মনঃপ্রশমন ব্যতীত শুভলাভের সম্ভাবনা নাই। মন যদি প্রশমিত না হয়, গুরুপদেশ, শাস্ত্রানুশীলন এবং সকল সাধনই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সমস্তই সাধনের সাধ্য, সাধনের অসাধ্য কিছুই নাই, আপাতরমণীয় বিষয়ের দোষাহুসন্ধানের ফলে যদি বিষয় অরমণীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই অহঙ্কারমেঘ চৈতন্য, সূর্য্যকে আর আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। মুক্তিতে জগৎ উপশমপ্রাপ্ত হয় না; চিত্তই উপশমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাকে জগৎসৃষ্টি বলা যায় তাহা বস্তুতঃ চিদাকাশের বোধবিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নহে। বাসনার প্রাবল্যে চিত্তের জড়তা জন্মে; এবং তাহার ফলে কেবল অশান্তিই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণ রথের অশ্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মন সেই অশ্বের রজ্জু এবং বুদ্ধি ঐ রথের সারথিরূপে উল্লিখিত। প্রাণ, মন ও বুদ্ধির অভীত, প্রাণ না থাকিলে বুদ্ধি ও মন কার্য্য করিতে পারে না, আবার মনঃসংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মশীলতা লোপ পায়। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্র মনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় পদে সংস্থাপিত করিয়াছে, বুদ্ধি মনের উপর, প্রাণ বুদ্ধির উপর, সকলই কিন্তু এক আত্মার বিচিত্র বিকাশ, সেইজন্ত যোগ-বাশিষ্ঠ মন ও প্রাণ মূলতঃ একই বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিষয়-পিপাসা মন হইতেই সমুৎপত্ত হয়। পিপাসা না থাকিলে যেমন জলপানের ইচ্ছা থাকে না, যতদিন সংসারের স্রুথে সত্য বোধ থাকিবে, তাহার ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা যতদিন উপলব্ধি না হইবে ততকালই ইহার রমণীয়তা অতি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সত্য-জ্ঞান থাকার জন্তই যাহা নিত্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাই জন্মে না অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের পক্ষে অসত্য হইয়া রহিয়াছে। চিত্তের এই অবস্থার ফলে হতাশা ও অশান্তি অবশ্যজ্ঞাবী। বর্ত্তমান কালনিক জ্ঞানে স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা কোন কালেই সফল হইবে না। ব্রহ্ম বুঝিবার কালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সম্বন্ধিত “অহং” অভিমানের

আধারবিশেষকেই ‘আত্মা’ বুঝা হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ক্ষুধা-পিপাসা-বিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন অস্ত্র কিছুই তাহার বুদ্ধি-গোচর হয় না। যে শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা এই শরীরে উৎপত্তি হইয়াছে সেই কর্ম্মই বিপরীত জ্ঞানের হেতু। যদি আপাতরমণীয় বিষয়ে দোষাহুসন্ধানপূর্ব্বক অরমণীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই মনোজয় অবশ্যই সম্ভব হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আত্মপ্রাণাহীনতা অদা-স্তিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আত্মনিগ্রহ-বিষয় বৈরাগ্য, জন্ম-মৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র-স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির স্নেহ-দুঃখে আপনাকে স্নেহী বা দুঃখী মনে না করা এবং ইষ্টানিষ্টলাভে সর্বদা সমচিত্ততা সর্বভূতে আত্মদৃষ্টিদ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি ইত্যাদিকে জ্ঞানরূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহা তাহার, বিপরীত, তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, ভয়—এই সমস্তই মনের পরিণামবিশেষ, ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাকার জ্ঞানই মনের শরীর। সর্বপ্রকার বাসনা এবং বিষয়-তৃষ্ণার পশ্চাতে এই কল্পিত আমিভব বর্ত্তমান। এই পরিবর্ত্তনশীল কালনিক আমিভবে অনাস্থা আসিলেই মনের শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আধারহীন ছিন্ন হইলেই মানসিক বিকল কল্লনাও তিরোহিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্প বর্জ্জনে বায়ু-প্রবাহিত অতি ঘন মেঘের মত বাসনাসমূহ বিলীন হইয়া যায়। এই মন ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া চিত্তোপশমার্খী-দিগকে অমুপম আনন্দ দান করে। অপর পক্ষে যদি সঙ্কল্প বৃদ্ধি করা যায় এইরূপ লক্ষ লক্ষ সংসার একমাত্র চিদগুর অন্তরে কল্পিত, ব্যক্ত ও বিভক্ত দৃষ্ট হইবে, অথচ তাহাতেও সঙ্কল্পের পরিশেষ হইবে না। বাসনাশূন্য হইয়া সন্তোষমাত্র অবলম্বন করতঃ মনকে সম্যক্ প্রকারে জয় করা যায়—ইহাই যোগবাশিষ্ঠের মত।

মন যে পদার্থেও যেক্রপ বাসনায় তীব্রবেগ-সম্পন্ন হয়, তাহার নিকট সেই প্রকারই সেই পদার্থ পরিদৃষ্ট ও বাহ্যিক হয়। মনের সেই বাসনাজাত তীব্র বেগ জলে বৃন্দ-বৃদের জায় স্বাভাবিক কিন্তু উপেকার প্রাবল্যে তাহার

অত্মদর এবং নিরোধ-প্রযত্নে তাহার বিলয় ঘটয়া থাকে। মনের চঞ্চলতা বহির উষ্ণতার ত্রায় স্বাভাবিক। চিন্তে যে চাঞ্চল্য বা স্পন্দন শক্তি রহিয়াছে তাহাই জগতের কাল্পনিক মূল। সৃজন করে, স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর পৃথক অস্তিত্ব প্রতীত হয় না, সেইরূপ চিন্তাস্পন্দ ব্যতীত এই জগতের কোন পৃথক উপাদান বা রূপ নাই। মনের বিলয়ে সর্বদুঃখপ্রশান্তি এবং তাহার স্পন্দনে দুঃখ-পরম্পরা সমুদিত হইয়া থাকে। ঐ চাঞ্চল্যবর্জিত মনকে মৃত বলা হয় এবং তাহাই মোক্ষ। শাস্ত্রকারেরা এই মানস চাঞ্চল্যকেই অবিজ্ঞা বলেন, সকল বাসনাই এই মানস চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি, সুতরাং তাহারা অবিজ্ঞাপদবাচ্য। মন জাড্য অমুসন্ধানের দৃঢ় অভ্যাসে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং বিবেকামুসন্ধানের দৃঢ় অভ্যাসে চিদংশাক্রুত হয়, চিন্তের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়।

পুরুষকার প্রয়োগে এই মনকে বাহ্যতে নিযুক্ত করা যায়—অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহাই লাভ হয়। সংসারচিন্তায় নিমগ্ন মনকে যদি শাস্ত্রীয় উপায়ে বলপূর্বক উদ্ধার না করা হয় তদুদ্ধারের আর অল্প উপায় থাকে না। একমাত্র মনই মনের নিগ্রহে সমর্থ।

“মন এব সমর্থং বা মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।

অরাজা কঃ সমর্থঃ স্তাৎ রাজো রাধব নিগ্রহে।”

যোঃ উঃ ১১৪

মনোহি মনসা গ্রাহম্—মহাঃ শাস্ত্রপৰ্শ

মনদ্বারাই মনোরূপ বন্ধনরজ্জু ছেদন করিয়া আত্মাকে বিমুক্ত করিতে হয়। একমাত্র মনই বিষয়তৃষ্ণাপূর্ণ বাসনা-বর্ন্তে পতিত মানবগণের নৌকাস্বরূপ—সংসারবন্ধন মোচনের অল্প উপায় নাই।

“উদ্ধারোদ্যমো নান্যনামবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুসাক্ষনঃ। গীতা ৬।৫

সংসার বাসনায় বিকার, বাসনা মুহু হইলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অন্তঃসারশূন্য হইলেও সারময়ীর ত্রায় প্রতীতা হয়, ভিত্তিহীন হইলেও সর্বত্র বিস্তারমানার ত্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে, এই চিন্তাস্পন্দোপজীবিনী অবিজ্ঞা স্বয়ং জড়রূপিণী হইয়াও চিরময়ীর ত্রায় এবং নিমেষাপেক্ষায়ও অস্থায়িনী হইয়াও চিরস্থায়িনীর ত্রায় প্রতিভাত হইতেছে। এই অবিজ্ঞা পরমাত্মার প্রসাদে বিবিধ আকার প্রসব করে

এবং তাহার সাক্ষাৎলাভে বিনষ্ট হয়। নানাকারে পরিদৃষ্ট-মান হইলেও মৃগতৃষ্ণিকার ত্রায় শুষ্ক, ললনার ত্রায় চপলা ও লুকা। মমতাক্ষয়ে অবিজ্ঞা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আশা দ্বারা সজীব থাকে, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়, কেহ প্রার্থনা না করিলেও উপস্থিত হইয়া থাকে। আপাততঃ রমণীয় হইলেও বিবিধ অনর্থদায়িনী অবিচ্ছেদে বহমান হইতেছে, দাহসদৃশ দুঃখপ্রদায়িনী জীবে আবিষ্ট হইয়া তাহাদের পরমার্থরূপ রস পান করতঃ অবিজ্ঞা সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ। তৃণান্নির্মিত রজ্জুর ত্রায় সংসার-সংস্কারে স্থলুতা, জনগণ ইহাকেই বর্জনশীল বোধ করে, কিন্তু ইহা বর্জিত হয় না, বিষমিশ্রিত মোদকের ত্রায় আপাতমধুরা অথচ পরিণামে অত্যন্ত দারুণা—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ইহা যে কোণায় যায় তাহা জানা যায় না, স্রোত রুদ্ধ হইলে যেমন নদী শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি বিচারে এই অবিজ্ঞার নিরোধ এবং তন্নিরোধে মনের অভাব হইয়া থাকে। অবিদ্যার রূপ নাই, রস নাই, আকার নাই, চেতনা নাই, সত্যতাও নাই, বিনাশ প্রাপ্তও হয় না—অথচ জগৎকে অক্ষীকৃত করিয়া রাখিয়াছে জ্ঞানালোকে বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানাত্মকারে স্মৃতি হইয়া থাকে, কাম ও ক্রোধ তাহার অঙ্গ—তমঃ তাহার মুখ। ব্যবহারে এই অবিদ্যা কল্পণোৎক্লম্ব-নয়না স্নেহসমুদ্রসিতা গৃহিণীর ও জননীর অমুরূপ।

সকল দেহেই ব্রহ্ম বা আত্মা বিরাজমান আছেন। কিন্তু মনুষ্যদেহেই মনোহর ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান ক্ষেত্র। বিদ্বান্ পুরুষ জীবন্ত অবস্থাতেই অমৃত বা মুক্ত হয়েন, এই বর্তমান শরীরে থাকিয়াই বিমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব ভোগ করেন। “অথ যদেহেহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমপ্লুত ইতি।” (বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণ ৪র্থ অধ্যায়)।

যতদিন না মোহক্ষয়কারিণী আত্মদর্শনেচ্ছা উদিত হয়, ততদিন ঐ অবিদ্যা দেহাভিমাত্রী জীবকে পাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ বিলুপ্তি করে। বিচারের প্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে অভিবৃত্ত করা যায়। পরমাত্মবিষয়ক বোধ উদিত হইলে অবিজ্ঞা স্বয়ংই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। চিন্তা স্ব বাসনার প্রাচুর্য্যেই সংসার-বন্ধন দৃঢ় হয়; বাসনার ক্ষয় কালে নহে। ভোগাশারূপিণী অবিজ্ঞা পুরুষকার সাহায্যেই তিরোহিত হয়, অপর কিছুতেই নহে।

আমি মাংস নহি, অস্থি নহি, দেহও নহি—আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান অন্তঃকরণকে কীর্ণা অবিজ্ঞা বলে। আত্মার অদর্শনে ঐ অবিজ্ঞার বিভ্রুতি এবং তাহার দর্শনে উহার বিনাশ। মন বাহ্য অহুসন্ধান করে, ইন্দ্রিয়গণ রাজ-আজ্ঞা পালনের মত তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে, কিন্তু এই মন নিত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। কল্পনাচ্ছাদন বশতঃ ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাসনাই আমার পুত্র-আমার ঐশ্বর্য ইত্যাদি রূপ অহুসাব করাইতেছে। কিন্তু তাহাদের আধার আত্মতত্ত্বব্যতীত অপর কিছুই নহে। দেহ ও দেহী সংশ্লিষ্ট থাকিলেও এক নহে। ভক্তা দম্ব হইলে তদ্ব্যবস্থা বায়ু দম্ব হয় না, সেইরূপ দেহ ভগ্ন হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, মন ও বিনষ্ট হয় না। অবিজ্ঞা মনোরক্তি দ্বারা হুলস্থ ও বিজ্ঞার লাভ করে। তাহার ফলেই সুখদুঃখাদি ভোগ।

দেহ জড়, সেই জন্ত তাহার দুঃখই নাই। যাহাকে দেহী বলা যায়, তাহারই অবিজ্ঞা প্রযুক্ত দুঃখানুভূতি ঘটে। অজ্ঞানই সেই দুঃখের কারণ এবং সেই অজ্ঞানই হুলস্থ অবিচারের মূল। সেই অজ্ঞানচ্ছন্ন অবস্থায় মন বিবিধ রক্তি ধারণ করিয়া নানা আকারে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই মনই শরীরে উদ্ভিত হয়, শোকাচ্ছন্ন হয়, ক্রন্দন করে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, বিচলিত হয়, প্রশংসা করে ও নিন্দা করে। শরীর ঐ সকলের কিছুই করে না। গৃহস্থামী কার্য্য করে, গৃহ কিছুই করে না, জীবই দেহমধ্যে থাকিয়া বিবিধ কার্য্যে রত হয়। জড় দেহ মনের ক্রীড়নক মাত্র। সকল সুখদুঃখের কর্তা ও ভোক্তা মন; মনই দেহেজ্ঞিয়ার সম্পর্কবশতঃ কর্তৃত্বজ্ঞানে দুঃখ-কষ্টাদি ভোগ করে। কর্তৃত্ব দেহেজ্ঞিয়ার সম্পর্ক বশতঃই জন্মে; অন্তথা নহে। এই কারণেই স্বপ্নকৃত কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম সঞ্চিত হয় না এবং তাহার ফলভোগও নাই। সত্ত্বগুণভাবানী পুরুষের চিত্ত বিবেকসম্পন্ন হইলেই সেই চিত্তে পূর্বোক্ত যোগভূমিকা সকল ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়। বাহ্যারা ভোগবিরত এবং বর্তমান কামনিক বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাহ্যারা ইন্দ্রিয়গণের

বস্ত্র নহেন, তাঁহারা ই জগদাকাশে দৃশ্যমানা মায়ী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

যে তু পায়ং গত বুদ্ধিরিত্রিরৈব কথিতাঃ।

ত এনাং লগতীং মায়ং পশ্যন্তি করদিবৎ ॥

বোঃ স্থিতি—১৮২

এই সৃষ্টির মূল বা সার বোধ। সেই জন্তই মনে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভব।

দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, বিবেক প্রকাশ করেন না, দেহ ব্যাপারে লিপ্ত বা আসক্ত হন না। যেমন প্রস্তুত জল নাই, জলে অনল নাই, তেমনি স্বরূপাবস্থায় চিত্ত বা মন নাই। তথায় কল্পনা কল্পনাই, চিত্ত বা মন কল্পনা মাত্র। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সং-সংসর্গ এই দুইভিন্ন অস্ত্র উপায়ে মহাপ্রবাহশালিনী চিত্ত, মন, বুদ্ধি বা অবিজ্ঞা-নদী পার হওয়া যায় না। শাস্ত্রা-হুশীলন ও সংসঙ্গের প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি জন্মে। এই মনঃ-প্রশমন সিদ্ধির উপায় মনেরই নিগ্রহ এবং স্বীয়মনই তাহা করিতে সক্ষম। এই কারণে মনই মানবগণের ভাবার্ণব তরণের নৌকাস্বরূপ। ইন্দ্রিয়জয়রূপ সেতুদ্বারা ঐ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, মনই সর্বরূপী, সেই জন্ত মনেরই চিকিৎসায় প্রযত্নশীল হওয়া কর্তব্য।

মনের প্রকৃত রূপ কি, তাহা জ্ঞান হইলেই বিবেকবুদ্ধি জন্মে। তখন স্বরূপ প্রত্যাবর্তনের বাসনা চিত্তে উদ্ভিত হয়, ঐ মহাবাসনা উদ্ভিত হইলেই সেই বাসনা অনন্তসুখদা ও ব্রহ্মপদদায়িনী হয়। বাসনা ব্রহ্ম হইতেই আসে সত্য, কিন্তু কল্পনাবাসনে ব্রহ্মকেই স্বরণ করতঃ ব্রহ্মেই লীন হয়।

ভুবনত্রয় বাসনাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মে উদ্ভিত হইয়াছে। সকল বাসনাই প্রকৃতপক্ষে স্বরূপাবস্থার অভাব বশতঃ জাত; কিন্তু কল্পনার ভেদে ভ্রান্তজ্ঞানে তাহা নানা বিষয়ে ধাবিত হয়। আপনাকে চিনিলে বা স্বরূপে পৌছাইলেই সমস্ত জ্ঞান যায়। নিত্যানিত্য বিচারের ফলে এই মনই মুক্তির কারণ হইয়া উঠে। সাধনার ফলে মনই স্বয়ং গন্তব্য স্থানের পন্থা অহুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়া দেয়। এই কারণেই উপনিষৎ চিন্তাবাহারাই প্রাণের ব্রহ্মরূপে প্রবেশের উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন।

“যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাপ্তোহন হি গচ্ছতি।”

অমৃতবিন্দু বর প্রাপক।



দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্বস্মৃতি)

বর্ষায়ান ও বর্ষায়সী—শিশুকে যেমন যত্নসহকারে লালন পালন করিতে হয়, ইহাদিগকেও তেমনি আন্তরিক যত্নের সহিত সেবাশ্রদ্ধা করা অবশ্যক। অতি-বার্দ্ধক্য মাহুষের দ্বিতীয় শৈশব (second childhood)। শিশু যেমন নিজের কোন প্রয়োজন সাধন করিতে অসমর্থ, ইহারাও সেইরূপ সর্বপ্রকার কার্যসাধনে অক্ষম না হইলেও অধিকাংশ কার্য ইহাদের ক্রেশসাধ্য। তত্ত্বি ইহাদের অরণশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়—কোন সময়ে কোন কাজ করিতে হইবে, সে-বিষয়ে খেয়াল থাকে না এবং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ইহারা লোকের নাম সহজে অরণ করিতে পারেন না। নির্দিষ্ট সময়ে ইহাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা করা উচিত। নচেৎ ইহাদের মেজাজ খারাপ হয়। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সে-বিষয়েও অপরের দৃষ্টি আবশ্যক। ইহাদের মেজাজ সাধারণতঃ খিটখিটে হয়, সকলের কার্যে ক্রটিগ্রাহিতা ইহাদের স্বভাবজাত হইয়া উঠে, কোন বিষয়ে সামান্য ক্রটি হইলেই ইহারা অহুযোগ ও তিরস্কার করেন। ইহাদের এই প্রকৃতি বিশিষ্টতা (idiosyncrasy) স্মৃতি করিতে হয়।

বার্দ্ধক্যে মিতাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতিহার বর্ষায়ানের পক্ষে মারাত্মক—ইহা অরণ রাখা উচিত। পরন্তু মিতাহারের ফলে আয়ু দীর্ঘতর হইবার সম্ভাবনা অধিক। হিন্দুবিধবাদিগকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়; ইহা মিতাহারের ফল। তাহারা একবেলা নিরামিষ ভোজন করেন এবং রাত্রিকালে সামান্য জলযোগ করেন। তত্ত্বি ইহাদের উপবাস ও অর্কোপবাস বহুসংখ্যক। প্রতিমাসে দুইবার একাদশীর নিরঘু উপবাস।

মধ্যে মধ্যে ইহাদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে এবং কাছে বসিয়া ইহাদের সহিত ক্রিয়াকাল কথোপকথন করিলে ইহারা প্রীত হন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইলে বৃদ্ধারা অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন—কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত শুনিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। কৃতবিদ্য বর্ষায়ান কেবলমাত্র রামায়ণ মহাভারত শুনিয়াই পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বা অভাব না ঘটিলে তাঁহারা নিজেরাই সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করেন, কিন্তু দর্শন-শক্তি ক্ষুদ্র হইলে তাঁহাদের রুচিসম্মত গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতে হয়। শুনাইবার লোকের অভাব হইলে তাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়।

বৃদ্ধা পিতামহী ও মাতামহীর কাছে নাতিনাতিনীরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। সন্ধ্যার পরে যখন তাহাদের পাঠ-অভ্যাস সমাপ্ত হয়, তাহারা পিতামহীর নিকটে (মাতামহীকে মাভুলালয়ে ভিন্ন পাওয়া যায় না) “রূপকথা” শুনিবার জন্ত সমবেত হয়। উপকথার মধ্যেও শিখিবার বিষয় অনেক থাকে। তবে গল্প শুনাইতে শুনাইতে বালকবালিকাদিগকে অনেক সময়ে “জুজুর” ভয় দেখান হয়; ইহা ভাল নহে। কারণ, ইহার ফলে সুকুমারমতি বালক-বালিকার চিত্তে ভূতের ভয় প্রভৃতি বহুমূল হইবার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে ইহারা সকল কার্যে সাহস-হীনতার পরিচয় প্রদান করিবে ইহাও অসম্ভব নহে। ফলতঃ হিন্দুস্থানে সাহসবিহীন ও “ভীতু” লোক বহু-পরিমানে দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকের সংসাহসেরও (moral courage) অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেরূপ দুষ্কর, সচরাচর যে-সকল ভৌতিক গল্প

শোনা যায়, তাহা শুনিবার পর ভূতের অভিশেধে অবিশ্বাস করাও সেইরূপ কঠিন। যাহা হউক “ধান ভানিতে শিবের গীত” গাহিবার অভিপ্রায় নাই। তবে বালক-বালিকাগণকে এমন গল্প বলিতে নাই—যাহা শুনিয়া তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। তাহাদিগকে শাস্ত করিবার উদ্দেশ্যেও ভয় দেখান অমুচিত।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়েই নাতিনাতিনীর সংসর্গ ভাল বাসেন। সন্ধ্যাকালীন আত্মিকপূজা সমাপ্ত হইলে ইহারাও রাত্রিকালের মত নিশ্চিন্ত হয়েন এবং বালক-বালিকাগণও পাঠ ও আহার সমাপ্ত করিয়া নিদ্রার জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পরেই শয্যা আশ্রয় করা অমুচিত। অনেকের মতে সন্ধ্যা বা নৈশ আহারের পরে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল জাগরণ আবশ্যক; কারণ, ইহাতে ভুক্তখাদ্য-পরিপাকের সৌকার্য্য হয়। এই সময়ে ছোট ছোট বালক-বালিকা বৃদ্ধার নিকট উপকথা এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক-বালিকা বৃদ্ধের নিকট মহৎ ব্যক্তিগণের ও মহিয়সী রমণীগণের চরিত্রের ও কার্য্যাবলীর ইতিহাস আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুই-ই লাভ করা যায়। অধিকাংশ বালক-বালিকা এইরূপ গল্প শুনিতে শুনিতে নিদ্রাগত হয়।

আধুনিক কালের বালক-বালিকা উপকথা (Folk tales) এবং পুরাকালীন আচার ও সামাজিক পদ্ধতি সম্বন্ধে উপাখ্যানাবলী (Folk lore) অবগত নহে, কারণ, তাহারা এগুলি শুনিবার সুযোগ পায় না। সে-কালে বালিকাগণ বৃদ্ধাদের কাছে কত গাথা, কত ছড়া প্রভৃতি শুনিতে ও শিখিতে পাইত। এ-গুলি বহুকাল, হয় ত’ অরণ্যভীতকাল হইতে, মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহা আক্ষেপের বিষয়, কারণ, অনেক গাথা ও ছড়া শিক্ষাপ্রদ। অনেক ব্রতকথাও এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, তবে বটতলার কলাগণে ইহাদের অধিকাংশ মুজিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; কয়েক বৎসর হইতে নানাবিধ বৃহদাকার গ্রন্থও প্রকাশিত হইতেছে। কিছুকাল পূর্বেও উল্লিখিত গল্পগুলির যথেষ্ট আদর ছিল। অনেকগুলি

গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া স্বর্গীয় অধ্যাপক লাল-বিহারী দে “Folk Tales of Bengal”-নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাক্কল ও সহজ ভাষায় লিখিত হওয়ার ইহা তরুণগণের সুখপাঠ্য। এক সময়ে ইহা জনপ্রিয়, অন্ততঃ তরুণগণের প্রিয় ছিল। ইদানীং গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার জন্ত কতকগুলি গান ও তাহাকে খেলাইবার জন্ত কতকগুলি “ছড়া” দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। এগুলি বৃদ্ধাদের কাছে শিখিতে হইত এবং বালিকারাই ইহা আগ্রহ সহকারে শিখিয়া আয়ত্ত করিত, কারণ, অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে, যেখানে, ছেলের মাকে গৃহকর্ণে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, বালিকাগণই ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া থাকে। ছেলেকে আদর করিবার উপযোগী “ছড়া”ও প্রচলিত ছিল এবং তাহা বৃদ্ধাগণই প্রথমে শিখাইতেন। এইরূপ শিক্ষাদানের স্পৃহা বৃদ্ধাদের অতাপি আছে, কিন্তু, তাহারা যাহাদিগকে শিখাইতে চাহেন, তাহাদের শিখিবার আগ্রহ কোথায়?

পূর্বে কথিত হইয়াছে এবং অনেকেই অবগত আছেন যে, হিন্দু বিধবা একাদশীতে নিষ্কলা উপবাস করিয়া থাকেন। বর্ষীয়সী বিধবাকে একাদশীর উপবাস কোন্ দিন করিতে হইবে, তাহা অরণ্য করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা দিন গণনা করিয়া কতক হিসাব রাখেন, কিন্তু দিনের হিসাবে তিথির হিসাব শুদ্ধ হইতে পারে না; সেইজন্ত পঞ্জিকা দেখিতে হয়। বৃদ্ধা হইলেও বিধবারা যথাসময়ে বাড়ীর অন্ত কোন পরিজনকে পঞ্জিকা দেখিতে বলেন। পুত্রবধূ বা পৌত্রবধূ কর্তব্য যথাসময়ে পঞ্জিকার সাহায্যে একাদশীর উপবাসের দিন পরিজ্ঞাত হইয়া পূর্বদিবসে বৃদ্ধার রাত্রিকালীন জলযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, অথচ এমন সময়ে ও এমন পরিমাণে বৃদ্ধাকে ভোজন করানো উচিত, যাহাতে একাদশীর মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের উল্কার উথিত না হয়, কারণ, তাহা হইলে ব্রত ভঙ্গ হয়।

মিতাহারের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। বিধবাগণ যেমন নিয়ামিষ ভোজন ও একাহারের ফলে দীর্ঘজীবন

লাভ করেন, বৃদ্ধগণ যদি আহার বিষয়ে অল্পরূপ রীতি অবলম্বন করেন, মনে হয়, তাঁহারাও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন। নিত্যস্থ অর্থকী না হইলে বৃদ্ধগণেরও কিছু কিছু ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কলিকাতার পার্কগুলিতে অনেক বৃদ্ধকে দুইবেলাই বেড়াইতে ও বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; কেহ কেহ গড়ের মাঠে, অবশ্য দৈহিক সামর্থ্য থাকিলে, বেড়াইতে যান। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দীর্ঘকাল চাকরীজনিত পরিশ্রমের পরে যে সকল পেশনভোগী ব্যক্তি গৃহে শুইয়া বসিয়া আরাম ও পেশন ভোগ করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে পেশন ভোগ অধিক দিন ঘটে না। ভ্রমণের অভ্যাস থাকুক বা না থাকুক, বৃদ্ধদিগের পক্ষে রাত্রিকালে লঘু আহার প্রশস্ত। পরন্তু, রাত্রি নয়টার মধ্যে ইহাদের আহার সমাপ্তি আবশ্যক। রাত্রি নয়টার পরে যাহা খাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় না এবং আমে পরিণত হয়। ইহা হইতে ক্রমশঃ গ্রহণী রোগের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার ফলে বৃদ্ধের আয়ু সংক্ষেপ সম্ভাব্য। কর্মক্ষেত্রে হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যে সকল বৃদ্ধ স্ত্রী মস্তক সর্বতোভাবে অলস করিয়া রাখেন এবং ভ্রমণে বা অন্তরূপ কায়িক পরিশ্রমে বিরত থাকেন, তাঁহাদের ক্ষুধামান্য অবশ্যজ্ঞাবী।

মৎস্ত ও মাংস যে গুরুপাক ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৃদ্ধদিগের পক্ষে, (বিশেষতঃ, বাহাদের স্বাভাবিক দস্তের অভাব), মৎস্ত-মাংস ভোজন পরিবর্জনীয়, বিশেষতঃ মাংস। বাহারা মাংস পরিত্যাগ করিতে একেবারেই নারাজ, তাঁহারা যদি সূপ (soup) খাইয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন, তাঁহাদের পাকস্থলী বিশেষ বিব্রত হয় না। পাকস্থলীকে নিয়ত বা পুনঃ পুনঃ বিব্রত করিলে উহা ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য পাকস্থলীর বিকৃতি উপস্থিত হইলে নানাবিধ ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। বালক ও যুবক জীবনীশক্তির আধিক্যপ্রযুক্ত ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত। বার্ককে অধিকাংশ লোক বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মৎস্ত ও মাংস তাঁহাদের পক্ষে বিধ। মৎস্তপরিহারও বাতরোগাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। মাংস বা অধিক পরি-

মাণে মৎস্ত ভক্ষণ করিলে পিপাসার আভিযা হয়, ইহা মৎস্তমাংসের দুশ্চাচ্যতার অন্যতম লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন মাছ না খাইলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও মাখন খাইলেও নিরামিষাশীর দর্শনশক্তির ব্যত্যয় হয় না। শেথোক্ত মতই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ, পুরাকালের ঋষিদের কথা না ধরিলেও, যে সকল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হবিষ্যাদ ভোজন করেন, অথচ, অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় নিয়ত এবং স্বহস্তে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতির টীকা লিখিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগকে দৃষ্টিশক্তির বিকার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে শুনা যায় না।

বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ বহুভাবী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, বাহাদের বয়স পঞ্চাশতের অনধিক, তাহারা স্বরদর্শী ও বহুবিষয়ে অনভিজ্ঞ। এইরূপ বয়োজনিত ব্যক্তিগণের সহিত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে কথোপকথনের বা আলোচনার সময়ে তাঁহাদের সুপ্তপ্রায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাবসাহচর্যের (association) ফলে উৎকৃষ্ট হইয়া অর্ধকৃত্ত অরণ্যধারে আঘাত ও তাহা উৎকৃষ্ট করে এবং তাঁহাদের যে জ্ঞানধারা ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হয়, তাহার গতিরোধ তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। অল্প কেহ তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলে বৃদ্ধ যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়েন। যেমন শিক্ষক স্মৃতিনিবিষ্ট করা-ইবার উদ্দেশ্যে ছাত্রের নিকটে একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন, সেইরূপ বৃদ্ধও একই উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে এক কথা একাধিকবার কহিয়া থাকেন; ইহাতে শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি প্রকাশ অনুচিত। পরন্তু বৃদ্ধ বৃদ্ধকে কখনই, কোন বিষয়ে ও কোনরূপে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে।

বৃদ্ধবৃদ্ধাবিষয়ক বিবৃতির সঙ্গে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল। প্রবন্ধের দীর্ঘতানিবন্ধন যদি কোন পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটয়া থাকে, তাঁহারা অন্ততঃ, “ক্রমশঃ”-র বালাই হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বাহাদের শিক্ষকরে প্রবন্ধটি লিখিত হইল, যদি তাঁহারা আলোচ্য বিষয়গুলি শিখিবার উপযুক্ত মনে করেন এবং উহা হইতে কথঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে লেখকের উদ্দেশ্য স্বল্প ও পরিশ্রম সফল হইবে।

সমাপ্ত

তীর্থযাত্রা

(গল্প)

শ্রী সেন, এম, এ

“ছুটী,—ছুটী কোথায় বল ?” মুখের চেহারাকে যথেষ্ট বিপন্ন করে অসিত মায়ার মুখের দিকে শব্দিতে দৃষ্টিতে তাকালো।

“কেন ? সুলতানপুর থাকতে তো দেখি ছুটির অভাব হয় নি। তোমার বছরের পাওনা ছুটিগুলিও কী হাত খরচের টাকার মতোই হয়ে উঠলো না কী ?” মায়ার কণ্ঠস্বর রীতিমতো ধারালো হয়ে উঠলো।

পুরোণো কথাই জের টেনে অসিত ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, “ছুটী পেলেই বা টাকা কোথায় ?”

আঙুনের ফুল্কির মতো মায়ার মুখ থেকে তপ্ত বাক্যবান অসিতের গায়ে ছিটকে পড়লো, “কত চুনোপুঁটি ঘুরে এল, আর আমার বেলায়ই যত টাকার প্রদ্ব। এক পা বাড়ালেই যেখানে দিব্যি চলে যাওয়া যায়, সেখানে যাওয়ার জন্তে আমার আর খোসামুদীর অন্ত নেই। মন থাকলে আবার টাকার চিন্তা ওঠে না কি ? পাড়ায় কারো যেতে বাকী আছে না কী ?” শাণিত চোখ নিয়ে মায়া একটু এগিয়ে এল।

“পাড়ার সবাই গেলে যে তোমারও যেতে হবে, এর কোনো মানে আছে না কী ?” অসিত খেঁচিয়ে উঠলো। এবার সে রাগ করতে সুরু করেছে।

“নিজের তো দিব্যি মজা করে ফাঁকি দিয়ে একা একা ‘আগ্রা ঘুরে এসেছিলে। তখন তো পাড়ার লোকের সঙ্গে তাল বজায় রেখেছিলে, আর আমার বেলায়ই বুঝি কোন মানে খুঁজে পাচ্ছ না। বৌকে বাদ দিয়ে তাজ-মহলের প্রেমে পড়তে লজ্জা করে নি তখন, না ?” দরজার পর্দাটাকে ছ’পাক ঘুরিয়ে দিয়ে মায়া ক্রতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

“কী, কী বললে তুমি ?” এবার অসিতের গলার স্বরও সপ্তমে উঠলো।—“আমি ওরকম বৌ ঘাড়ে করে দেশভ্রমণে বেরুতে পারবো না।”

দূর থেকে মায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, “চাই না, চাই না কোথাও যেতে। তোমার টাকাও বাঁচুক ঝড়টোও

কমুক। কিন্তু বিয়ে করার সময় মনে ছিল না কিছু ?” শেষের দিকে মায়ার গলা অভিমানের কান্নার বুজে এল। চোখের জলে তার বুকের আঁচল ভিজতে লাগল।

ব্যাপারটা সামান্য। অসিতের কণ্ঠস্থল মিরান্ট থেকে বলাবন করে কণ্ঠস্বর পথ। প্রতিবেশী এবং বেশিনীদের বলাবন ভ্রমণ মায়ার মনেও লোভ জাগিয়ে তুলেছিলো। তাই অসিতের কাছে ঘন ঘন তাগিদ ও অমুরোধের অন্ত ছিল না। অথচ অমুরোধ রক্ষার দিকে স্বামীর মন নেই। সেই জন্তেই মায়ার মনের ধুমায়িত বহিঃ এতকালে অগ্নি-কণা বর্ষণের শক্তিতে করে আজ বহুসব বাঁধিয়ে দিলো। ভিক্ত হয়ে উঠলো সংসারের মধুভাণ্ড।

আজ তিন দিন কথা বন্ধ। মায়ার মনের মেঘ তার সর্বাঙ্গে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এমন একটা অসহনীয় ধমধমে গম্ভীর ভাবের ভেতর থেকে অসিতেরও দিনরাত অসহ হয়ে উঠলো।

তৃতীয় দিন অফিস প্রত্যাগত অসিতের জলখাবার সামনে দিয়ে মায়া ধীর গম্ভীর পদে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অসিত ডাকলো, “মায়া”—

মায়া থমকে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চুপ ক’রে থেকে ফিরে তাকিয়ে বেশ সহজ গলায় বললো ; ‘কেন ?’

সহজ স্বর শুনে অসিত প্রথম একটু ধতমত পেয়ে গেল। তারপর একটু ইতস্ততঃ ক’রে নিজের গলার স্বরকেও যথাসম্ভব সহজ করার চেষ্টা ক’রে বললো, ‘কাছে এস বলছি।’

‘কেন এখান থেকেই বেশ শুনে পাব।’ —মায়ার গলার স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হ’য়ে উঠলো।

অসিত অতিরিক্ত সাহসী হ’য়ে খপ্ ক’রে মায়ার হাতটা ধ’রে ফেলে বললো ; ‘যেয়ো না শোন।’

‘শুনছিইতো’—বলে মায়া হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো ; কিন্তু অসিতের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নেওয়া তার পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। মায়ার মুখ এতে বতই রাগে রঙিন হ’য়ে উঠতে লাগল,

অসিতের মুখেও ততই হাসি ও কৌতূহলের আলো ঝিকমিক ক'রে উঠতে লাগলো। তরল কণ্ঠে সে ব'লে ফেললো, 'এমন রাঙা মুখ করে থাকলে শুধু হাতের বাঁধনেই ছাড়া পাবে না বলছি।'

অসিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই তীরবেগে মায়া হাত ছাড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। এদিকে ঘরের ভেতর অসিত একেবারে নিভে গেছে।—সে চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বাইরে আসতে আসতে আকুল-কণ্ঠে বলে উঠল, 'মায়া, মায়া—শুনে যাও, শুনে যাও—তিন দিন ছুটি পেয়েছি—।'

'বেশ ভালো কথা, এ ছুটিতে কোথায় যাবে, বলে যেয়ো—বাক্স শুড়িয়ে রাখব।'—মায়ার রোষদীপ্ত কণ্ঠের বাগী অসিতের গায়ে ছিটকে পড়লো। সে দ্রুতপদে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো। তখন তার চোখে শ্রাবণের নিবিড় বর্ষা নেমেছে। মেয়েমানুষ বলে কী তার আত্ম-সম্মানও থাকতে নেই! —কেন? কীসের জন্তে অসিত তার সঙ্গে এমন ধারা ব্যবহার করবে!—

অসিতও এবার রীতিমতো চটে গেছে। ভারীতো! —আজ সমস্তটা দিন সাহেবের খোসামুদি করে তবেই না তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়েছে!—আর এ ছুটি কার জন্তে? মায়ার জন্তেই তো! অসিতের কাছে সমস্ত পৃথিবী কালো হয়ে উঠলো। 'হুস্তোর ছাই'—বলে ঠক করে চায়ের পেয়ালাটা টিপয়ের ওপর রেখে আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে অসিত বেড়িয়ে পড়লো। পার্কের একটা বৈষ্ণিতে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে এক সময় যখন অসিতের হস হ'ল, তখন গীর্জার ঘড়িতে চং চং করে এগারটা বাজছে। যে ঘর-কন্না কে 'হুস্তোর' বলে অসিত বিবাসীর ভঙ্গী তুলে চলে এসেছে, সেই ঘরের ভেতরই মায়া হু'টো অপোগণ্ড শিশু নিয়ে একা একা আছে, মনে করে এবার সে অস্থির হয়ে উঠলো। পা হু'টো জোরে চালিয়ে দিয়ে অসিত ভাবতে লাগলো : মায়া, বাদল আর বেলু ছাড়া সে বেঁচে থাকবে কী করে?—সে বাঁচার কী কোনো অর্থ আছে?—

এদিকে বাদল আর বেলুকে ঘুম পাড়িয়ে মায়া এঘর

ওঘর করছে। অসিতের ফিরতে যতই দেরী হচ্ছে, ততই তার বুকের ভেতর দ্রুত দ্রুত ক্রমে উঠছে ...

...অসিতের ওপর রাগ না হয়েই বা যার কী করে? জীর সাধ মেটানোতেই বুঝি কাপুরুষতার লক্ষণ? তার মনের সুখ দুঃখের কাঁচা ভিৎ এর ওপর স্বামীর খেয়াল-খুসীর নৃত্য-ভঙ্গীতে-ঐং জখম হয়, কিন্তু কিছুই গড়ে ওঠে না।...না সে কোনমতেই এবার নরম হবে না। কথা সে কিছুতেই আর বলবে না। জানেই তো এরপর সাধা-সাধির পালা আসছে।...কিন্তু এবার সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।...সবই অসিতের অঙ্গুলি সঙ্কেতে হবে নাকি?...

চং চং চং...একী এগারটা বাজল যে! অসিতের ফিরতে এখনো এত দেরী হচ্ছে কেন? এক্সিডেন্ট হ'ল না তো? নাঃ—মায়া আর পারে না! সব রকমেই এই একটা মানুষ তাকে বাতিবাস্ত্য করে তুলেছে। মায়া ক্ষোভে, দুঃখে একা ঘরে বসে চোখের জলে ভিজতে লাগলো। রাত বারোটা নাগাদ অসিত বাড়ী ফিরে এল। আশ্চর্য! যার জন্তে মায়া এতক্ষণ কৈদে বস্তু বইয়েছিল—তারই আগমনের পর তার চোখের কোলে পাথরের শীতলতা ও কাঠিগের ছাপ পড়লো।

নিশুতি রাত! জানালায় পাশ দিয়ে চাঁদের আলো টুকরো টুকরো হয়ে বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে। অসিতের চোখেও সেদিন জ্যোৎস্নার নিজা হীনতা। সে চেয়ে দেখল মায়ার মুখের ওপরও একখানি জ্যোৎস্নার আলো হেসে উঠেছে। কিন্তু একি! তার নিমলিত চোখের নীচে কালি—চিবুকের ভাঁজে যেন একটা নিরুপায় অভিমানের প্রতিক্রম। তাকে দেখে অসিতের অন্তস্ত মায়া লাগলো। সে মায়ার বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। পিঠের নীচে ও চুলের ওপরকার হাতের স্পর্শ পেয়ে মায়ার গভীর ঘুম ভেঙে গেল। সে একটু নড়ে উঠেই কাণের কাছে শুনতে পেল, 'মায়া—মায়া'—কাল ভোরে আমরা বৃন্দাবন যাব; তিন দিনের ছুটি নিয়ে এলাম—ভোরের ট্রেন ধরতে হলে কাকভোরেই কিন্তু উঠতে হবে লক্ষ্মীটা।' মায়া ঘুমের ভেতর বৃন্দাবন যাত্রার স্বপ্ন দেখছিল; সেই জন্তেই সে

তন্ত্রাজ্ঞার মনে অসিতের সঙ্গে মান-অভিমানের কথাটা ভুলেই বসেছিলো। কাণের কাছে অসিতের কথা শুনে তাই সে নিজাববিক্রিত কণ্ঠে বলে উঠলো, ‘আচ্ছা!’—তারপর অসিতের বক্ষসংলগ্ন হ’য়েই সে মহানিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। তার চোখের জলে ভিজা চুলগুলিকে ওপর দিকে তুলে দিতে দিতে অসিতের নিজস্বাধীন চোখেও তখন শান্তির ঘুম নেমে এসেছে।

শুকতারী নিশ্চিন্ত হবার আগেই সেদিন মায়ার ছোট্ট সংসারে সমুদ্রের কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেল। বাজ, বিছানা, টিফিন ক্যারিয়ার, হরলিক্স, দুধ, ফল, রুটি, মাখন, চিনি, চা, পেয়ালার, ঝিঝুক, বাটি এবং বাদল, বেলুর জামা, জুতো, মোজা, টুপির অরণ্যে মায়ী ডুবে গিয়ে তার মিশিরজীকে সারাটা সকাল ভাকাডাকি, বকাবকি করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এমন একটা আরোহণ যেন মায়ার। সেদিন দিখিজয়ে বেরবে। জীবনের এমন একটা অনা-স্বাদিতপূর্ব্ব দিবস সামনে এসেছে যে, মায়ী তার প্রতিটি শুভমুহুর্তকে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চায়। গাড়ী দোরগোড়ায় আসা মাত্রই বাদল ও বেলু তাতে চড়ে বসেছে। মুখের ভেতর ছুটি আঙ্গুল পূরে বেলু গাড়ীর চারিদিকে প্রতিবেশীর ভিড়ের দিকে পরম বিশ্বয়ে তাকিয়ে আছে। সকলেই আজ মায়ীদের পরম সুহৃদ। যারা বন্ধুবান গিয়েছে তারা ওদের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছে। যারা বন্ধুবান যার নি, তারাও নানা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। নানা কথার উপক্রম আজ মায়ী হাসিমুখে সহ্য করছে। তার জীবনে আজ যে প্রভাতস্বর্ষের সূচনা হচ্ছে, তার কাছে এসব যেন জোনাকীর দীপালি। সে যেন আজ সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে এমন মনের ভাব। ঘরে তালি দিয়ে নিকটতম গৃহবাসী প্রতিবেশীকে বাড়ীটা সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টি রাখতে বলে মায়ী ও অসিত গাড়ীতে উঠতে যাবে, হঠাৎ ধুমকেতুর মত অসিতেরই অফিসের বন্ধু যতীন এসে উপস্থিত হলো। সে ঘটা করে যাত্রা দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো, “কী হে অসিত, কোথায় যাওয়া হচ্ছে নাকি?”

“হাঁ—তিনদিনের ছুটি পেলাম একবার বন্ধুবান ঘুরে আসি গে। এত কাছে, তাই সুযোগ ছাড়তে গিন্নী

কিছুতেই রাজী হলেন না।—” মায়ার দুই চোখের জ-ভকী দেখে অসিত মাঝপথেই থেমে পড়লেন।

যতীন সহান্তে অসিতের পিঠ চাপড়ে মায়াকে সমর্থন করে বললে, “বৌদি ঠিকই করেছেন, অসিত। যাও ঘুরে এস গে। তোমাদের ‘মধু-বামিনী’ সার্থক হোক।” অসিতের আনন্দে গদগদ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে যতীন অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ী ছেড়ে দিলো। কিন্তু গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসিতের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো। রাস্তার দু’পাশের গাছপালা, বাড়ী, দোকান—সবই আজ মায়ার চোখে বিচিত্র হয়ে দেখা দিল। সে অনর্গল অসিতকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। “হোটেলের দরকার কি? কোথায় ওঠা হবে?—হোটলে না? খর্শালায়; নিজেস্বাধী রান্না করবে না হোটলেই ব্যবস্থা হবে? শোয়ার ব্যবস্থা কী রকম হবে? বেলু বাদলকে রাখাবার জন্তে ত্রিকাল লোক পাওয়া যাবে কিনা—ইত্যাদি: ইত্যাদি।” তিনদিনের দু-বেলার ভ্রমণের তালিকা মায়ী মুখে মুখে তৈরী করে নিলো। কী উৎসাহ! মায়ার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না—এমনি একটা চঞ্চল আনন্দ তার সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। আনন্দের আতিশয্যে অসিত যে মাঝে মাঝে অজ্ঞমনস্ক হয়ে পড়ছে, এটা মায়ার নজরেই পড়লো না।

রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই দূরে স্টেশন দেখা গেল। বাদল-বেলুর সঙ্গে মায়ীও যেন নৃত্য করে উঠলো। হঠাৎ রাস্তার ওপাশ থেকে কথা শোনা গেল, “কী হে অসিত, কোথায় চললে?”

অসিত চমকে চেয়ে দেখল তাঁদের আফিসের হেড-ক্লার্ক সুকুমারবাবু ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে অসিতের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সুকুমার বাবুকে এড়িয়ে যাওয়াও তখন কঠিন, কারণ গাড়ী একেবারে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে শুক হাসি টেনে দু’হাত তুলে নমস্কার করতে করতে অসিত কোনরকমে বলে ফেললো, “এই—তিনদিনের ছুটি পেয়েছি জানেন তো, তাই একটু তীর্থভ্রমণে বেরলাম।”

“বেশ, বেশ—সপরিবারে দেখছি—যাত্রাটা শুভ

হোঁক—গাড়ী অগ্রসর হয়ে গেল। গাড়োয়ানকে জোরে চালাতে ইচ্ছিত করে অসিত জানালায় কঁক দিয়ে আড়-দৃষ্টিতে পেছনের রাস্তায় তাকিয়ে দেখল যে, সুকুমারবাবু তখনও তাদেরই চলিছে গাড়ীর দিকে নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অসিতের অবস্থা আরোও সঙ্গীন হয়ে উঠলো—সে বিড়বিড় করে গুরুমুখে বলে উঠল, ‘লোকটা আবার দেখে ফেললে।’ গাড়ী অনেকটা এগিয়ে গেল, হঠাৎ অসিত গাড়োয়ানকে ডেকে জোরে বললে, ‘এ—টাকোওয়ালে, টাকো ঘুমাও।—’

গাড়োয়ানটা অসিতের বিচিত্র ব্যবহার কিছু বুঝতে না পেরে খতমত খেয়ে গাড়ী ফিরিয়ে নিলো। গাড়ী ফিরতেই মায়া সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। ‘এ-কী গাড়ী ফিরছে কেন?—আরে এই টাকোওয়ালে—আরে ট্রেন যে ছেড়ে দিলো, প্রথম ঘণ্টা তো শোনা যাচ্ছে।’—

অসিত বাধা দিয়ে বলে উঠলো, ‘আরে গেলে তো ঘণ্টা শুনবো।’—

‘এ-কী?—কেন, কিসের জন্তে?’—বিস্ময়ে দুঃখে

রাগে মায়ায় কণ্ঠস্বর কাঁঝালো হয়ে উঠলো। বর্ণের নন্দনকানন থেকে কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে মর্ন্ত্যের কঠিন বজুর মাটিতে ফেলে দিয়ে গেছে।

অসিত বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে কোনরকমে বলে ফেললো, ‘না-না, যাওয়া হ’ল না—অফিসের দু’দু’টা লোক দেখে ফেললে।’—

‘দেখে ফেললো তো হ’ল কী!’ মায়া প্রায় কেঁদেই ফেললো।

অসিত তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়েই কল্পিত কণ্ঠে বলে ফেললো, ‘ট্রেনলিভের পারমিশনটা নিই নি—অফিসে জানাজানি হলে চাকরী নিয়েই টানাটানি। সুখের চাইতে শোয়াস্তি ভালো।’—সে আম্তা আম্তা করে থেমে পড়লো।

এর উত্তরে মায়া আর কী বলতে পারে? এখন তার চোখের সামনে দিনের সমস্ত আলো নিম্প্রভ হয়ে পড়েছে। এত আয়োজনের এই পরিণাম।

গাড়ী ফিরে চললো।

বঞ্চিত

শ্রীমুনীল ঘোষ

জীবনের শেষ হ’বে—এ কথা তো সহজ সরল,
জীবাধার রহস্ত এসে ঢেকে দেবে জগতের হাসি;
মরণের খেয়াঘাটে দেখা দেবে বিস্মৃতি অতল;
পদচিহ্ন মুছে দিয়ে কোন্ দূরে চলে যাব ভাসি।

এ তো সত্য চিরন্তন; জীবনের এই তো বিলাস;
তোমার খেলার ঘরে নিত্য চলে এই আনাগোনা;
জীর্ণ জীর্ণ অস্থি মাংস তাই আভো হ’ল না নিরাশ,
তবুয়ের সাথে তাই অনন্তের নিত্য জানাশোনা।

কিন্তু একি দেখি আজ? নগ্ন যত কদম্বের গানি:
ক্ষুধাতুর বিভীষিকা দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্নহারা;
তোমার ভুবনে উঠে অশ্রুক্ষেয় হতাশার বাণী,
মায়াবেরে পত্ত করে সভ্যতার দস্ত করে যার।

ওদের জীবনে মৃত্যু সে যে শুধু কঠিন বন্ধনা—
শুধু মৃত্যু, হাহাকার! দূরে হাসে দগ্ধ মরীচিকা।
আশা নাই ভাষা নাই; আত্মঘাতী আত্মব বজ্রণা
বাস্তবের ভালে আজ এঁকে দিল পরাজয় টিকা।



প্রাচীন মিশর

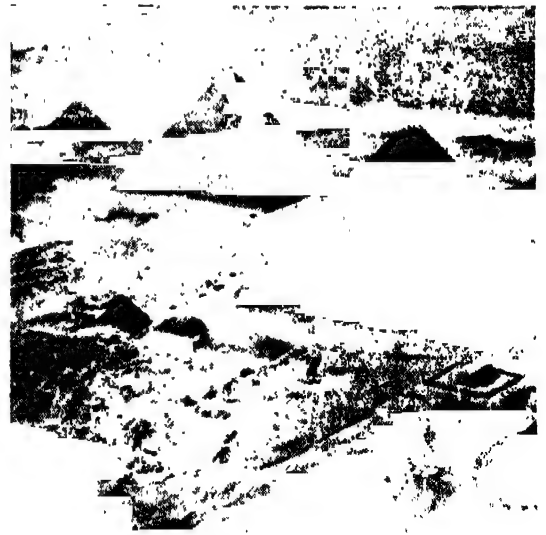
ত্রিনিখিল সেন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত মিশরের লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে খনন-কার্য সাধিত হয়েছে। অতিসন্ধিক্ষু বহু প্রত্নতাত্ত্বিক আর সহস্র সহস্র স্থানীয় অধিবাসী কাটিয়ে দিয়েছে তাদের সারাটা জীবন মরুভূমির ধূ ধূ বালুকারাশির গর্ভে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার লুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটনে। তাঁদের এই কঠোর সাধনার ফলে ধ্বনিকা আজ অপসারিত হয়েছে নীল নদের তীরে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার প্রাচীন এক সুসভ্য জগতের : তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারণ—কৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাসের ধুলুর পাণ্ডুলিপি।

যে সব পণ্ডিত ধ্বংসস্তূপের অন্তরাল হ'তে প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় এই পাতাগুলি উদ্ধারের জন্ত ব্রতী হয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হার্ডাড-বোষ্টন মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডক্টর বিসনারের (Reisner)। ১৯২৫ সালে তিনি প্রথম এল-গিজার (El-Giza) তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান শুরু করেন এবং পিরামিড ত্রয়ের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা উঁচু, তার পাশে আবিষ্কার করেন প্রাচীন ৪র্থ বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্নেফু (Snefru) মহিষী হাতেপ-হোরেসের কবর। কবর-খননকারী দস্যুরা যদিও তাঁর খেত-পাথর-নির্মিত শব-ধার থেকে মহামূল্য সবকিছুই প্রায় অপহরণ করে নিয়ে গেছে, তবুও তাঁর সোনার চেয়ার, আরাম-কেনারা, অলঙ্কারের বাস্ক, আর সোনার কাঁজ-করা চক্রাতপ প্রভৃতি যা কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যেও সুপ্রাচীন নীল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। মিশর সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সিসিল ফার্থের (Cecil Firth) আবিষ্কৃত তৃতীয় বংশীয় ক্যারাও ডোভারের পিরামিডের আভ্যন্তরীণ কাঠের খোদাই কারুকার্য বর্তমান

মাত্রা থেকে পর্যন্তও তাঁক লাগিয়ে দেয়। অবাক বিশ্বনে থাকিয়ে থাকতে হয় হাজার হাজার বৎসর আগেকার প্রাচীন মিশরীয়দের শিরনৈপুণ্যের দিকে। এই পিরামিডের ভিতরকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থেকে ১৯৩৬ সালে জেম্‌স্‌ কুইবেল (Quibell) প্রায় ৫০ হাজারটি জালা আর খলে ভর্তি স্ফটিক ও মহামূল্য প্রস্তর (পিরামিডের রত্নসন্ধানী দস্যুরা যা কেলে গেছে) উদ্ধার করে জাহাজে করে চালান দেন পৃথিবীর নানা যাত্রাঘরে আর প্রত্নতাত্ত্বিক রক্ষণাগারে।

তারপর ১৯১৪ সালে পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমর শুরু হয়। কিন্তু মামুঘের রহস্ত-সন্ধানী মন রণ-দামাডার আর কামান গর্জনে দমলো না। ১৯১৪ সালে মঃ লে গ্রেন (Legrain) এল কান'কে আবুনের বিখ্যাত মন্দিরের উদ্ধার



মিশরের পিরামিড

কার্যে যেতে গেলেন। আমুনের এই মন্দিরের সামনে অষ্টাদশ বংশীয় তৃতীয় আমেন হোভেন তৈরী করেছিলেন স্তম্ভের এক স্তম্ভ কটক। বিরাট বিরাট ওই স্তম্ভগুলি



পক্ষী শিকারে প্রাচীন মিশরীয়

প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের এক চিরস্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু সব চাইতে যুগান্তকারী আবিষ্কার হোল মিশর সরকারী দপ্তরের মিঃ এমারীর। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সাকারার খনন করে সন্ধান পান ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় বংশীয় কারাভক্ত সামন্তদের তত্ত্বাবধানে পরিণত ইটের সমাধি-মন্দিরের। এই নীল উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদের প্রসিদ্ধ বিবরণ ডাঃ ব্রেডেড্‌ তাঁর বিখ্যাত “প্রাচীন ইজিপ্টের ইতিহাসে” লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নীল উপত্যকার প্রাচীন এই বাসীন্দারা কারা? কোথা থেকেই বা হয়েছিলো তাদের আগমন এবং তাদের আকৃতি আর প্রকৃতিই বা কেমন ছিল? প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন : প্রায় চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাংশের নাইল নদের উত্তরপার্শ্ব সমতল ভূমি ক্রমশঃ জনশূন্য শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়ে পড়ে। জীবন ধারণ সেখানে কঠিন হয়ে উঠে। তাই সেখানকার প্রাচীন বাসাবসী বাসীন্দারা নাইল নদের উপত্যকার এলে বসবাস করতে শুরু করে। আর আগেকার

বাসাবসী শিকারী জীবন পরিত্যাগ করে মন দেয় কৃষিকার্যে। ভূমধ্য-সাগর থেকে নিউবিয়িং সোমাল পর্বত প্রায় সাড়ে সাত শ’ মাইল স্থানে প্রাচীন মিশরীয়দের প্রাথমিক বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গত কয়েক দশকের খনন-কার্যের ফলে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় মিশরের প্রাগৈতিহাসিক যুগ শুরু হয়েছে খৃঃ পূঃ তেরো হাজার বৎসর পূর্বে। উত্তর-আফ্রিকায় তখন প্যালিওলিথিক বা আদিপ্রস্তর যুগ চলছিল। অল্পমাত্র চকমকি প্রস্তর আর প্যালিওলিথিক যুগের একমাত্র হাতিয়ার হাত-কুঠারের কাল পেরিয়ে নিউলিথিক বা নতুন প্রস্তর-যুগের অপেক্ষাকৃত উন্নত বা বিভিন্ন ধরণের হাড়, বিষুক আর পাথরের নতুন নতুন অস্ত্র-শস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে বসতি স্থাপন করতে নীল নদের প্রাচীন অধিবাসীদের লেগেছিল অনেক সহস্র বৎসর। খৃঃ পূঃ আনুমানিক ৫০০০ বৎসর পূর্বে যখন নতুন প্রস্তর-যুগের যবনিকা অপসারিত হোল, আমরা সন্নিহনে অবলোকন করলাম—প্রাচীন মিশরীয়রা সমসাময়িক পৃথিবীর তুলনায় নব সৃষ্টি জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। নিজেদের প্রয়োজন-মার্কিক ওরা পোড়ামাটির বাসন-পত্র আর কাঠের ও মাটির ঘর-দোর নির্মাণ-কৌশল শিখে নিয়েছে। খাদ্য-শস্ত্র উৎপাদন আর সংরক্ষণ থেকে শুরু করে গবাদি পশুর পালন আর মৃত্যুর পর শবরক্ষার পারলৌকিক অঙ্কঠান সম্বন্ধেও সজাগ হয়ে উঠেছে।

কালের বাত্মা তারপর এগিয়ে চলে দীর্ঘ পদক্ষেপে। ৩৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশরীয়রা হতা ও বস্ত্র-প্রস্তুতের কৌশল আয়ত্ত করে নেন। হস্ত কাকর্কার্য, সূত্র আর আইতরী শিল্পে হয়ে উঠে পারদর্শী। পরবর্তী ছয় শ’ বৎসরের মধ্যে খনিজ-ধাতু-নির্মিত যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র-শস্ত্রের প্রচলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্রাচীন মিশরে।

এবার এসে পড়ল রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা। মিশরীয়রা এতদিন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের স্ব স্ব জিলায় বা “Nome”-এ এক এক জন “nomarch”-এর অধীনে বাস করছিল স্বাধীন ভাবে। জোমার্করাই ছিল তখন দেশের প্রকৃত অধিপতি। ক্রমশঃ এই সব স্বতন্ত্র জোমার্করাই উত্তর ও দক্ষিণ—আগার ও লোয়ার ইজিপ্টে বিভক্ত হয়ে পড়ল। দক্ষিণ বা নীল উপত্যকার মিশরীয়রা অপেক্ষাকৃত

অল্পমত ছিল। এবং রাষ্ট্রীয় ও কৃষ্টিগত বৈষম্য বিস্তারিত থাকার আগার ও লোভার মিশরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আর লেগে থাকত। এই যুদ্ধে 'আপার' জৈন্টিলিটাই জয় হয় এবং তার কলে খৃষ্টপূর্ব আর তিন হাজার বৎসর পূর্বে জন্ম হ'ল নতুন মিশরের—প্রথম ক্যারাও মেনেসের (Menes) অধীনে সমগ্র জৈন্টিলিট পরিণত হ'ল সম্মিলিত জাতিতে।

লিবিয়া, সোমালী, গালা প্রভৃতি জাতিদের মত মিশরীয়রা আফ্রিকার "হ্যামেটিক" বংশোদ্ভূত বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গণিতেরা মনে করেন। এই "হ্যামেটিক" বংশ "পিজল" "ভূমধ্যসাগরীয়" গোষ্ঠীরই এক শাখা। উন্নতমতক পাতলা-গড়ন অশ্রুবিহীন, মাঝারি আকৃতির এই শ্রামাদী মিশরীয়দের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্বত্র দেখা যায়। বহু জাতি, বহু সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে প্রাচীন মিশর। এশিয়া থেকে এসে হানা দিয়েছে বলদৃশ্য হুর্কুর্ষ আরমেনিয়ানেরা; ধূলা উড়িয়ে এসেছে হিক্সস, আমরীয়রা; গ্রীক, রোমান আর বৈজ্ঞানিক্যানেরা—আরব আর তুর্কীরা, কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়দের আকার ও প্রকৃতিতে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ১৯৪৪ সালের কোন মিশরীয়ের সঙ্গে খৃঃ পূঃ ১৯৪৪ সালের কোন মিশরীয়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না একটুও।

প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা বৃদ্ধির প্রাথমিক ও ঐশ্বরিক প্রতিভার অত্যন্ত দক্ষ ও সজাগ ছিল, এ ভুল ধারণা এখনো পর্যন্ত অনেকেই করে থাকেন। পিরামিড যুগের মিশরীয়রা বর্তমান জৈন্টিলিটীয়দের মত অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর হস্তমুখর আর ঘোর বাস্তববাদী ছিল। ওরা মোটেই কল্পনাশ্রিয় ছিল না। অল্প কয়েক রহস্যের সঠিক সন্ধান ছিল তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু কর্মশক্তি ছিল তাদের অক্ষুরন্ত; ছিল অটুট অধ্যবসায় আর অপূর্ণ গঠন-কমতা। বিশেষ এই গুণটির প্রভাবেই প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের প্রচুর কাঁচামাল আর জনবলকে দক্ষতার সঙ্গে খাটাতে সক্ষম হয়েছিল নিজেদের পারিবারিক, নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন-পরিচালনার কার্যে। কঠোর পরিশ্রমী প্রাচীন মিশরীয়দের এ গুণটির জন্ম গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর সমগ্রাঞ্চলের অন্ততম পিরামিড। এই পিরামিড নির্মাণের পিছনে তাদের তেমন কোন মেকানিকেল নৈপুণ্যের পরিচয়

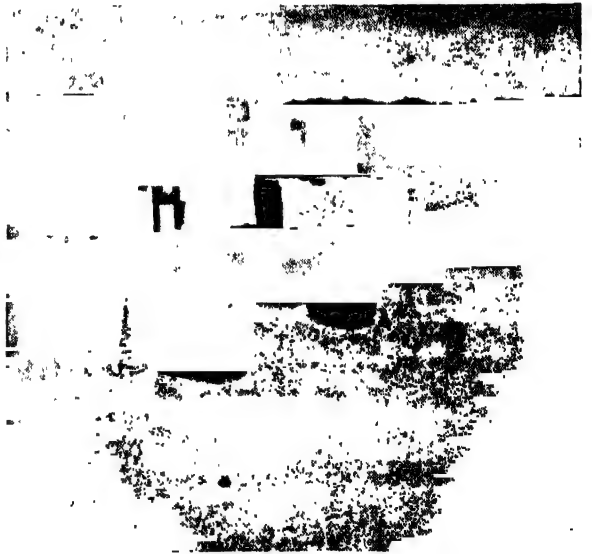
পাওয়া যায় না। কপিকলের ব্যবহারও তাদের অজ্ঞাত ছিল।

প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রগাঢ় হোলোও, বিরাট কোন ধর্মপ্রচার বা প্রবর্তন করার মতো তাদের তেমন কোন মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল না। প্রাচীন মিশরের ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করলে আপাত-বিস্কট চারটি মত বা বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই চারটির কোনটাই তাদের আত্মত্বয়ের গতি-ভিত্তিতে অল্প দোষে প্রচারিত হয়নি। প্রাচীন মিশরীয়দের পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে যে ধারণার কথা আমরা জানি, সেটা ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাস আর পৌরাণিক উপাখ্যানের মতই বিচিত্র আর বিভিন্ন। তাদের বিশ্বাস ছিল :

(ক) দেহ অবিনশ্বর, লৌকিক এই দেহের অবস্থানের পরেও, তাদের আত্মা আর "ইগো" (Ego) অবস্থান করতে থাকবে এই পৃথিবীতে।

(খ) মৃত্যুর পরেও কবরের মধ্যে তারা পার্থিব জীবন-যাপনের বিশ্বাসী ছিল।

মাগুয়ের স্বভাবজাত মৃত্যুতরই তাদের প্রথম দৃষ্টি



মিশর যাপ্তোর শেষ নিগর্শন

বিশ্বাসের মূল। মৃত্যুর পরেও তারা পূর্বের মত সংসারে বাস করতে থাকবে, উদ্ভট এই ধর্মবিশ্বাস অজ্ঞাত, তবিল মৃত্যুভীতিক লঘু করে তুলেছিল অনেকটা। শুধু এই

জন্মই প্রাচীন মিশরীয়রা হাতমুখর, রহস্যপ্রিয় ও অকুতোভয় ভাবিতে পরিণত হতে পেরেছিল। মৃত্যুর পরেও কবরের মধ্যে পার্থিব জীবন-বাগনের উদ্দেশ্যে প্রাচীন মিশরীয়রা জীবন্ধার যে সব স্রব্যাদি পেতে ভালোবাসতো ও ব্যবহার করতো পারিবারিক সে সব আসবাবপত্র সজ্জিত করে তুলত অশরীরী আত্মার জন্য নিশ্চিত সুরমা একটি গৃহ। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রাচীন মিশরীয়রা কাইরো থেকে সুরু করে নীল নদের ৬০ মাইলব্যাপী স্থানে সারি সারি সমাধি-মন্দির আর পিরামিড নির্মাণে প্রণোদিত হয়েছিল। মহাকালের কোল হ'তে তরাল মৃত্যুকে অবিনশ্বর করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম আর বহু অর্থ ব্যয়ে একদা তারা গড়ে তুলেছিল এটসব সমাধি-গৃহ—তেল, মসলা আর ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে এক একটি মমি। দস্ততরে বলেছিল, মৃত্যু নেই তাদের—মরেও তারা থাকবে অমর হয়ে তঙ্গুর এ জগতে।

সেদিন বুঝি মহাকাল ফুটল হাসি হেসে উঠেছিল। ক্যারাওদের অক্ষর কীর্তি পিরামিডগুলি তাদের মৃতদেহকে ধরে রাখতে পারে নি। পিরামিডগুলি আজ কেবল কবরের রত্নসন্ধানী দস্যুদের একটি মহা শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীন মিশরীয়দের সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও জগতের সত্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান হোল মিশরের অমর শিল্প—ট্যাকনিকেল নৈপুণ্যের খাঁটি, নিখুঁত তাদের প্রচেষ্টা। নিজের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে—আশেপাশের জীবনের মধ্যে বা কিছু সুন্দর, মনোরম—মহাকালের আবর্ত থেকে শিল্পী তাকে ধরে রেখেছেন তুলি আর ছেনির সাহায্যে আপন শাখত সৃষ্টি-প্রতিভায়। নিউলৈতিক শিল্পীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এখনো বহন করে চলেছে দেশ-বিদেশের বহু বাহুবল আর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারগুলি।

তোমারই

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

তিন

জ্যোতির নতুন জীবন আরম্ভ হল।

স্বলেখার জীবন নতুন মানুষটিকে অবলম্বন করে আবার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

বন্ধুর বাড়ীতে দেখা হওয়ার পর আরও অনেকদিন কেটে গেছে। হু'তনের জীবন হু'টো পথ দিয়ে এসে একটা পথে মিলল। ওরা পরস্পর পরস্পরকে সন্ধ্যার অন্ধকারে চিনেছে; জেনেছে আবছায়া অন্ধকারে, যে ওদের হু'তনের জীবনেই মিল আছে ভবিষ্যতের হিসেবে; গরমিল আছে অতীতের অঙ্কে। স্পষ্ট কোন কথা ওরা কেউ কাউকে বলে নি, কিন্তু অস্পষ্টও কিছু থাকে নি। বলার মধ্যে যার আভাষ ছিল, দৃষ্টির মধ্যে তার ছিল প্রকাশ। দৃষ্টি যেন বধার ঘন কালো জীবন্ত মেঘ; কথা যেন কঠিন শীতের নির্জীব কুয়াসা।

পরস্পরকে উপলক্ষ্য করে চেনা অচেনার অভিনয়ের মধ্যে ওদের জীবন এগিরে চললো একই উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ গোপনে। স্বলেখার প্রচণ্ড বাধা—সে স্ত্রী। আরও একটা কথা আছে। ওর বিয়ের রাত্রে নিমজ্ঞের আসরে ওর এক ব্যারিষ্টার বন্ধু মুহু ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, স্বলেখা, হাল্কা বাঁধনের গ্রন্থী সহজেই খুলে যায়, ব্যারিষ্টার মানুষ আমি, বাঁধন খোলবার ভারটা আমাকেই দিও।

উত্তরে স্বলেখা বলেছিল, ধন্যবাদ, এ সৌভাগ্য আপনার কোনদিনও হবে না, একথা স্পষ্ট জেনে রাখুন।

এই ছোট কথা হু'টো স্বলেখার যতবার মনে পড়েছে ততবারই ও নিজেকে কঠিন ভাবে বাঁধতে চেয়েছে। এতখানি লজ্জা, এতবড় পরাজয় ও কোন রকমেই স্বীকার করবে না, মনে মনে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে।

ব্যারিষ্টার বন্ধুটির কথার উত্তর ও সগর্বেই দিয়েছিল। পৃথিবীর বুকের ওপর সদর্পে পা ঠুঁকে এতবড় কথা বলার পেছনে ছিল তার মনের কঠিন বাঁধন। আর যাই হ'ক, যে সমাজের উঁচু মাথাকে তার নিজের মনের জোর দিয়ে নিচু করেছে, সেই সমাজকে হাসবার সুযোগ সে কিছুতেই দিতে পারে না। মনের আর মানের এই ঋণ প্রাণের মধ্যে ওর দিল প্রকাণ্ড শক্তি। তাই বিয়ের পাচ বছর পরে স্বলেখা যখন দেখল যে সহজ বাঁধনের গোরা ভালবাসার বাঁধন দিয়েছে খুলে, আকর্ষণ দিয়েছে কমিয়ে, তখন জোর করেই স্বলেখা কর্তব্যের গ্রন্থিকে শক্ত করে নিল। সংসারের বুকে ভালবাসার পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের বুকে স্বলেখা অভিনয়ের পালা আরম্ভ করলো! সগর্বে সমাজের সকলের সামনে স্বলেখা প্রমাণ করলো—ওর বিবাহিত জীবন হ'ল সোনার রথ, কিন্তু মনে মনে ও জানল, সেই সোনার রথের চাকা অচল। বিবাহিত জীবনটা ওর হ'ল মরসুমী ফুলের বাগান, সৌন্দর্য্য আছে, সুগন্ধ নেই, চোখ বলসানো ঔজ্জ্বল্য আছে,

স্থিতি নেই। এমন সব নানান কারণে স্নলেখা নিজের মনের কথা জ্যোতিকেও জানাতে পারল না।

জ্যোতির ভাবনাটি একটু সেকেন্দ্রে ধরণের গতিতে চলে। এ-যুগের সঙ্গে বেখাপ্পা, মানায় না। তাই বার বার ও ঠাকে যায়। স্নলেখাকে নিয়ে ওর মন তাই সমস্যার পড়ল। জ্যোতি নিজের মনের কথা স্নলেখাকে বলতে পারল না, এমন কি আভাষেও না। কয়েকটা কথা মনের এই নতুন অলোকে অন্ধকারে গসা টিপে মারল।

প্রথম কারণ হ'ল অনিতা। অনিতার সঙ্গে ওর সমস্ত সম্বন্ধ চূকে গেছে ঠিকই, কিন্তু মন তাতে যা খেয়েছে। ওর ভালবাসার কমলকলির মাঝে পোকায় কাটা ঐ একটি লাগ, কেমন করে দেবে এ ফুল ও স্নলেখাকে। তাছাড়া আরও একটা বড় কারণ ছিল। জ্যোতি নিজের মনকে করে সম্পূর্ণ অবিবাস। মনে ওর কেবলই স্বপ্ন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যাচাই না করে ও কোন কথাই স্নলেখাকে বলতে নারাজ।

এই সব নানান কথার মাঝখানে আরও একটা কথা ক্রমেই বড় হ'তে থাকে ওর মনে। স্নলেখা হয়ত অসুখী সত্যিই, কিন্তু তবু সে ত' জী। সমাজে তার স্থান আছে, সংসারে সে কল্যাণী। বিয়ে যখন তার স্বামী তাকে ভালবেসে করেছিল, তখন নিশ্চয় উপযুক্ত স্থান দেবে বলেই করেছিল। স্বামী যখন নিজেকে জীবন কাছে বিলিয়ে দেয়, তখন ঠিক কি ভাবে দেয়, তা জ্যোতি মনে মনে ঠিক জানে। ওর এ বিষয়ে ধারণাটা সেকেন্দ্রে তাই ভিত্তিটা পাকা। পাকা ভিত্তির ওপর আধুনিক মনোবৃত্তিটা ঠিক খাপ খায় না, অনিতাকে জীবনের মধ্যে জড়িয়ে জ্যোতি তা জেনে নিয়েছে। পাশ্চাত্য হাওয়ার ঝড় পল্লীমায়ের বৃকে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের 'স্বামী-স্ত্রী' জীবন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। জ্যোতির ধারণাটা ঠিক পল্লী-সংসারের উপযোগী। জী, ওর মতে সে, যে সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠে সবার আগে, এমন কি সূর্যেরও, শুতে যায় সবার পরে, এমন কি রাত্রিরও। গায়ে যার সংসারকে চালিয়ে নিয়ে যাবার অসীম শক্তি, মনে যার পাশাণ গলান ভক্তি; সমস্ত বাধা বিপত্তি, স্বপ্নের ঝড় আর দুঃখ অশান্তিকে উপেক্ষা করেও হাসিটি যার ঠোঁটের কোনে জাগে নিশ্চিন্তে অথবা নীরবে। কথায় যে নিজেকে জাহির করে না, ব্যাখ্যা সে নিজেকে সবার সামনে বাতির করে না। স্বার্থ যার মধ্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, পরার্থ যার মধ্যে প্রবল। সন্ধ্যা দীপ জ্বালিয়ে যে শুধু স্বামীকে মনে করে না, মনে করে সকলকে, ...নিজের কল্যাণ কামনা করে না, সকলের কল্যাণ কামনা করে।—যে বেল ফুলের মতন সরল, শেফালির মত রাঙাল' অথচ আত্মতরুর মতন সবাইকে ঘিরে আছে। সে রোঁদ্র পায়, ছায়া দেয়, সে ঝড় মাথায দাঁড়িয়ে আছে শুধু ফল দেবার লোভে।...

জ্যোতি জানে স্নলেখা আধুনিকতার জৌলুসে উজ্জ্বল সংসারের রঙচঙে জী। কিন্তু তবু স্নলেখা মেয়েটা কেমন অদ্ভুত। সে সকলের মতন নকল নয়, এ কালের মেয়েদের মতন ডলি পুতুলের অবিকল নকল নয়। সাধারণের মধ্যে ও অসাধারণ, অসাধারণের

মধ্যে ও অদ্ভুতম; একরাশ বিলীতি ফুলের চকমকে বাগানে নিভৃতের চামেলী ঝড়। ভোর রাতের শুকতারার মতন সে স্বভব, রাতের অন্ধকারের কোল ঘেঁসে দিনের আলোকের আগে; স্পষ্টতার ওপরে। জীবন চাইতে মাড়ের প্রভাব বেশী। বিয়ের বাসরে বোঁ হ'লে ও চলনসই, ছেলের পাশে মা হলে ও পরিপূর্ণ। দৃষ্টিতে ওর রঙ মাখানো জীবনের উদ্ভূত সামাজিকতার জৌলুস নেই, আছে গীতা সাবিত্রীর ছায়া। ওর কথায় আছে শ্রীতির বেশ, ওর হাসিতে আছে স্নেহের প্রভাব, ওর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিমান।

জ্যোতি স্নলেখাকে মনে মনে এই রকম ভাবে চিনে নিয়েছে। স্নলেখা ওর কাছে তাই পরের জী নয়, পরের সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীর চরণে ও স্বল্পক্ষে অর্ঘ্য নিয়ে যেতে পারে, নীরবে চলে দিতে পারে, কিন্তু প্রচার করতে পারে না। মনে তাই ওর স্বপ্ন। একদিকে ভালবাসা, অন্ধনিকে কর্তব্য। দুটোই বড়, দুটোরই ভিত্তি ত্যাগের। একদিকে ভালবাসার প্রবল শ্রোত যেমন তলা দিয়ে সিঁধ কেটে ওপরে রাখে চোরা বালির স্তূপ, অন্ধনিকে তেমনি ত্যাগের বোঝা ভারী হ'তে থাকে দিনের পর দিন, শেষকালে পঙ্খ করে দেয় মনের অঙ্গ সব ভারকে। জ্যোতি নিজের মনে মনে এই স্বপ্নটাকে বড় করে তুলেছে ভেবে ভেবে। সাধারণতঃ এ অবস্থায় যা হ'য়ে থাকে, মন ওর তাতে সাহা দেয় না। অথচ এমনই বিপদ, নিজের মনের মধ্যে মনের সহজ গতিটাকে গলাটিপে মেরে ফেলে গুমবে গুমবে কাঁদতেই বা কখনে পারে? বেল ফুটেবে, যুঁই ফুটেবে, গন্ধ তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কুঁড়ির বৃকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে মরবেই বা কেন? মানুষ যখন সঙ্গীহীন হয়ে একলা পথ চলে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে তখন ছায়া যদি একটা দৈবাৎ মিলেই যায়, তাহলে কি ভারতে বসবে মালিকের অহুমতির কথা?

জ্যোতি তবু কিন্তু নিজের মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না। ভালবাসবে তবু বলতে পারবে না, তার দৃষ্টির মধ্যে নিজের অশান্ত মনটাকে শান্ত করার উপকরণ পাবে, অথচ চাইতে পারবে না। কথা বলবে, নিজের সুখ দুঃখের কথা, অথচ লক্ষ্য স্থির করতে পারবে না, ওকে উপলক্ষ্য করতে হবে। ওর সাহচর্য্য পেলে মনে হয় দিনের গতি দ্রুত, ওর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় পৃথিবীটা স্থল্লর, বৈচে থাকার প্রবল আনন্দ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে তীড় করে আসে, অথচ এমনই বিপদ, শিক্ষার প্রভাব, প্রবল সংস্কার ওর মনে কার্যমি হ'য়ে বসেছে। এ যেন ঠিক ফুলের বাগানে বড় বড় হরফের নোটিশ "ডু নট প্লাক ফ্লাওয়ারস"...

স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন,...

কিন্তু নিয়তি যেখানে প্রবল, সেখানে মনও দুর্বল হয়। মনের এই স্বপ্নের মাঝে হঠাৎ বড় উঠল। নিয়তি সঙ্কট হয়ে আশীর্বাদ করল, সেই আশীর্বাদ ওদের দুজনের মিলনের সেতু হ'য়ে থাকল সত্যীর রূপ নিয়ে।...

সত্যী স্নলেখার দিদি, একমাত্র বোন।

দিদি ত' নয়, চকমকি পাখর, ধাক্কা লাগলেই আলো জ্বলে।

জীবনের গতি তার অনেক বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে তিরিশ বছরে চারটি ঋতু পেরিয়ে এসেছে। বোল বছরে প্রথম বসন্ত, একুশে বর্ষা, সম্ভ্রান্তি হেমন্ত পেরিয়ে শরতের মাঝামাঝি।

সতী অপরূপ সুন্দরী। ছেলে বেলা থেকেই ও ঐ রকম। জন্ম যেদিন হল, সেদিন সংসারের আলো জ্বলল। ও-ই পিতা-মাতার প্রথম কোল জোড়া, সংসার পূর্ণ করা শিশু।

দিদিমা ঠাকুরমার দল নাতনী দেখতে এলেন সদর্পে; সগর্বে বললেন, “মেয়েতো নয় হীরের টুকরো, রাজ রাজার ঘরেও মেলে না হাজার তপস্যা করে।” বাবার আশীর্বাদ, সকলের আদর আর সবার স্নেহ কুড়িয়ে মেয়েটি বড় হতে লাগল। ঘটা করে নামাকরণ হল সতী। প্রথমে নামটা রূপ দেখেই হয়েছিল, পবে দেখা গেল গুণের সঙ্গেও খাপ খেয়েছে চমৎকার। প্রথম সন্তান হ’লে যা হয়, একেত্রেও তাই হল। পিতার আদরে সতীর আদার রইল সকলের ওপরে।

পোনোরোতে পা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকলেই সচকিত হ’য়ে উঠল। হঠাৎ সকলে বললে, পূর্ণিমার চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে, উপযুক্ত আকাশ চাই, যার ওপরে মানাবে ভাল। পাত্রের সন্ধান লোক ছুটল, ঘটক জুটল, আর লোকের মুখে মুখে ছুটল কথা। সবাই বললে, “ওমূকের মেয়ে সতী, মেয়েত’ নয়, চাঁদের কণা, পটে আঁকা আল্পনা, স্বামীর ঘর আলো করবে, সংসারের মুখ ক’রবে উজ্জ্বল।

পাত্র ঠিক করতে গ্রাম উজার হল, সহর উজার হল, জমিদারীতে হৈ-চৈর’ অন্ত নেই, কিন্তু পাত্র মিলল না। রূপ আছে ত’ গুণে কম, গুণ থাকে ত’ পয়সায় কমতি। এমন মেয়েকে ত’ আর হাত পা বেঁধে জলে ফেলা যায় না। পাত্র যদিও বা মনের মতন মেলে, কৃষ্টিতে বাঁধে বিভাট। বাদ-বিচার দেখে বিধাতা হাসলেন, নির্যাত পাত্র মেলাল, কিন্তু ভাগ্য মেলাল না। কৃষ্টি লুকিয়ে বিয়ে হ’য়ে গেল ঠিক বোল বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

বিয়ের বাতাস গায়ে লাগল যেমন বনে লাগে বসন্তের ছোঁয়াচ। সতীর হুকুল ছাপিয়ে দিয়ে ঘোঁবনের ছোঁয়াচ এল। জীবনটা ওর কানায় কানায় উবছিয়ে উঠল। স্বামী ওর বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অর্থের সিংহাসনে কায়েমী আসন। সতীর মা বাবা অভিযাত্রার বিনয় ক’রে বললেন, “আমাদের আর কি বলুন, ওরই বরাত ? এমনটি হবে আমরাই কি জানতুম।”

পাড়ার লোকের মনে সাড়া পড়ল, বললে, “হবেই ত’, মেয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করা আলোর কণা, ও মেয়ে ত’ সতী।”

বছর দুই পরে ছোট্ট বেলা সতীর কোল জুড়ে এল। সতীর মনে হ’ল জীবনটা ওর পরিপূর্ণ। বেলা এল, সঙ্গে আনল বসন্তের শেব বেলার শুকনো পাতা বরার পালা। তিনটি বছরের ছোট্ট মেয়ে আর একুশটি বসন্তের সুন্দরী স্ত্রী রেখে স্বামী ওর বিদায় নিল। সতীর জীবনে বসন্তের পালা শেব হ’ল, নাবল বর্ষা। শুধু সতীর জীবনে নয়, সংসারেও। সংসার ভেঙ্গে পড়ল একটু একটু করে টুকরো টুকরো হ’য়ে। জমিদারীতে ভান্স ধরল,

সরিকদের মধ্যে অংশ নিয়ে বিবাদ বাঁধল, উঠল আদালতে। জমিদারী আদালতে হ’ল হু’ভাগু। দশ ছয়, উকিল বাড়ীতে হ’ল হাজার ভাগ, নয় ছয়। ভাঙনের শেষ তবু নেই, প্রাণন এল। সতীর দেহ ভাঙল, মন ভাঙল, বিশ্বাস ভাঙল না। পিতার কিন্তু সব ভাঙল। নিয়তির এত বড় কবাবাত তাঁর সহ্য হল না। দেবতার বিরুদ্ধে বজ্রঘৃষ্টি তুলে ধরে নিয়তিকে করলেন বিজ্ঞপ, মামলার কথা শুনে বললেন, “চলুক মামলা।”

বৃদ্ধ কাকা ছিলেন শনের নুড়ী ব মতন বেঁচে। অনেক সাধা সাধনা করলেন মামলা মূলতুবী রাখতে, কিন্তু ভান্সের নেশা যখন মেতে ওঠে, বুদ্ধি তখন বিলোপ পায়। ধ্বংসের নেশা জমিদারী বিরুদ্ধে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলল। সহজ ভাবে ছাড়লে যদি যেত ছ’ আনা, উকিলের আশ্রয় নিয়ে আর তাদের বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে গেল বোল আনা। জমিদারীর জমি গেল, রইল কঙ্কাল। জমিদারীর মান গেল, রইল পাওয়ানাদারদের অপমান। সরিকে সরিকে মারামারির সুযোগ নিয়ে পার্শ্বের গ্রামের জমিদার তাঁর বাগানটাকেও বিঘে কয়েক এগিয়ে নিয়ে এলেন এদের এলাকার মধ্যে। আবার মামলা, আবার উকিলবাড়ী, আবার অজস্র অর্থ শ্রোতের মতন ভেসে গেল। মামলায় জয়লাভ হল, কিন্তু দেখা গেল, জমিদারীর যে অংশের জন্তে এত’ মামলা মারামারি, সে অংশটাব ভগ্নাংশও এদের নয়, ছ’ আনাওয়ালাদের। তারা মজা দেখল, জমার খাতায় জমিটা উঠে এল। সতীর বাবা অর্থ দাবী করলেন, হল অনর্থের সৃষ্টি। আবার মামলা।

এমনি করে মামলায় মামলায় সব গেল, ভাড়া মন শরীরকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করল, তিনি শয্যা নিলেন। সতী সংসারে পিতাকে আশ্রয় করে ছিল, মেয়ে বেলা আর মামলায় ব্যস্ত পিতার পরিচর্যায় তার দিন কাটত, হঠাৎ সেও বিছানা নিল।

ওদের সংসারে এমনি করে নামল হেমন্তের ঘন-কুয়াশা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কালকের দিনে কি হবে কেউ বলতে পারল না। ইতিমধ্যে হঠাৎ কাকা মারা গেলেন। এতদিন পর্যন্ত সুলেখা বড় হচ্ছিল সবার অলক্ষ্যে। সতীর অসুখে তার ওপর পড়ল সংসারের ভার। বেলা সুলেখাকে আশ্রয় করে বড় হ’য়ে উঠল। রুগীর পরিচর্যা ক’রে আর ছোট্ট বেলার দেখা শুনা করে দিন গেল সুলেখার। সতীর অসুখ বাড়তে বাড়তে ওকে বাড়ী ছাড়া করল, নিয়ে গেল হাসপাতালে।

সেখানে মিনিটে মিনিটে ও বাঁচল যত্নের দরজায় করাঘাত করে। একটু সেরে বাড়ী এসে দেখল ‘মা বিছানা নিয়েছেন, বেলা আর পাঁচজনের অবহেলা নিয়ে চার বছরের হয়েছে। সুলেখা সবার অমতে বিয়ে করেছে প্রায় মাসখানেক আগে। এ খবরটা সুলেখা ইচ্ছে করেই কাউকে জানায় নি, বিশেষ করে দিদিকে, কারণ সতীর বাবা ও এড়াতে পারত না। মাও শয্যা নিয়েছেন ঠিক এই কারণে।

সতী হাসপাতাল থেকে বাড়ী এসেই অসুখের করল একটা অশান্তির কাল ছায়া বাড়ীর ওপরে নির্ধম ভাবে ছড়িয়ে আছে।

সুলেখার সব কথা শুনে কিছু বলল না, হাসল শুধু। ভাগ্যের বে বিড়ম্বনা একটির পর একটি ওদের আঘাত করে

চলেছে, এইটাই তার সবচেয়ে বড় আঘাত। পাছে স্থলেখা কিছু মনে কবে, তাই পরে হাসতে হাসতে বলেছিল, যদি ভাল বেলে বিয়ে করেছিল, ভালবাসাকে কোনদিন ছোট করিসনি যেন।

কতবড় অভিশাপ এই বিয়ে, তার আভাব সতী ছাড়া আর কেউ সেদিন পায়নি। তাই সতীর সব চিন্তার মাঝখানে মণি রইল মধ্যমণি হয়ে। বেলা আর স্থলেখাকে উপলক্ষ্য করে সতীর

ভাড়া জীবন এগিয়ে চলল' একটি একটি দিনের ওপর পা ফেলে। সতীর জীবন হল ওদের হৃৎকনের জীবনের তত্ত্বাংশ। প্রতিমুহূর্তে সতীর ভর, প্রতিদিনে সতীর শত চিন্তা...স্থলেখার কপালে না জানি কি আছে।

দিন গিয়ে মাস এল, মাস গিয়ে বছর ঘুরল, শুধু ঘুরল' না স্থলেখার কপালে নিয়তির কন্ডাঘাত। [ক্রমশঃ

পুস্তক ও আলোচনা

নন্দিতা : ত্রিঅলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্‌ সন্স, ২০৩।১।১

কর্ণওয়ালিস ট্রাষ্ট, কলিকাতা। দাম—১।০ টাকা মাত্র।

হুচনা, বুদ্ধি ও পরিণতি লইয়া প্রধানতঃ উপন্যাস বা বড় গল্পের আবয়বিক উপাদান গঠিত। রহস্যের সমাজ বা সংসারের পরিপ্রেক্ষিতে যে বস্তু ও ভাবরাশি স্মৃতিত হইয়া মানব-মনকে আনন্দে দুঃখে সর্বদা আন্দোলিত করিয়া তোলে, বিশেষ ভাবে তাহারই পটভূমিকায় উপন্যাসের সৃষ্টি। যিনি রহস্যের শিল্পী, তাঁর রচনায় সেই সৃষ্টি সত্যকার রসোজ্জীর্ণ ও প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকার হাতে সেই সৃষ্টিকুশলতার যাহা আছে—যাহাকে শুধু বাহিরের প্রচ্ছদপট দিয়া বিচার করা চলে না। খাঁটি উপন্যাসের উপাদানে 'নন্দিতা'র বিভিন্ন ছন্দমুখর দেহাবয়ব গঠিত। লেখিকা বিচারশীল আধুনিক দৃষ্টিতে নিপুণ। প্রগতিযুগের ভাসমান রুষ্টির উপরে আজ আমাদের সমাজ যে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—তাহারটরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে গ্রন্থের নায়ক নায়িকারা। ডাঃ চৌধুরী, কণিকা, নন্দিতা, প্রেমাঙ্কুর, রতীন—প্রত্যেকটি চরিত্রই এই প্রগতিসভ্যতার রূপ আবেষ্টনীর মধ্যে বেদিশারী চঞ্চল বিক্ষুব্ধতায় সর্বাঙ্গিক বিদ্ধ। অথচ কোথাও তাহার স্থির নয়, জীবনের আদর্শ ও ধারা তাহাদের বিভিন্নমুখী। লেখিকা নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া বিচারশীল যুক্তির দ্বারা চরিত্রগুলিকে তাহাদের প্রতিমুহূর্তের স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়া এমন ভাবে স্ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা তাহার গভীর সংযম ও মননশীলতারই পরিচয় দেয়।

নন্দিতা প্রগতিযুগের মেয়ে হইয়া প্রগতির ছাঁচে গড়িয়া উঠিলেও বার বার তার মন এই শূন্যের সত্যতার বিষমিত্ততার বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছে; কিন্তু একদিকে শিক্ষাগত সংস্কৃতি ও অন্যদিকে বৌদ্ধগত চিত্র-

বৃত্তির দোটানায় পড়িয়া মনের জড়তাতেই বাধা পড়িয়াছে, উজ্জীর্ণ হইতে পারে নাই। এই দুর্বলতাই তাহাকে পদে পদে আঘাত করিয়াছে,—যে আঘাত স্বেচ্ছায় সে সমাজের বুকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।

গ্রন্থখানির আগাগোড়া এই দ্বন্দ্ববৈচিত্র্য। নায়ক-নায়িকার অন্তঃবিপ্লবের মধ্য দিয়া লেখিকা এমন কাব্যময় ভাষায় কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহাকে বলা যায়—‘লিরিক-মুভ্‌ ইন্‌ ফিক্‌শন’ (Lyric-move in Fiction); এবং এই লিরিক-মুভ্‌ বা কাব্যসম্পৃক্ত গতি আছে বলিয়াই আবহ কাহিনীর সাথে সাথে বিভিন্ন চরিত্রগুলিও অনায়াসে মনের উপর রেখাপাত করে। গ্রন্থচরিত্রের সার্থকতা এইখানেই।

ত্রিগঞ্জ কুমার সেন

মামা-ভাণ্ডে : ‘ভালদা’ প্রণীত শিশুগল্পিকা। দি ইয়ং পাবলিশার্সের পক্ষ হইতে আজিজুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা মাত্র।

ছোটদের মনের কথা ঠিক তাহাদের উপযোগি করিয়া সহজ ও সাবলিল ভাষায় বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে শিশু-সাহিত্যের যথার্থ ‘আর্ট’টি লুকান রহিয়াছে। তাহার সহিত গল্পে জীবনের উচ্চ আদর্শ ও মহত্তর অনুপ্রেরণা যুক্ত হইলে শিশু-জীবনের সত্যকার উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়া লেখকের সৃষ্টি সার্থক হয়।

আলোচ্য গ্রন্থ ‘মামা-ভাণ্ডে’তে তেমন কোন আদর্শ-সম্ভাত অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত না থাকিলেও লেখক অতি সহজ ও সরল ভাষায় নতুন সহরে আগত মামা নকুড়চন্দ্র ও ভাণ্ডে কেবলচন্দ্রের রহস্যকর জীবন-চিত্র আঁকিয়া শিশু-চক্ষে খানিকটা হাসির উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিষয় বস্তু নির্বাচনে লেখকের প্রশংসা করা যায় না। ভবিষ্যতে গ্রন্থ রচনাকালে লেখক আরও অনেকখানি আত্মস্থ হইয়া শিশু-জীবনের প্রত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাই আশা করি।

ত্রিঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



গান

রচনা : বাণীকুমার

স্বরলিপি : অনিল দাস ও

সুর : গজকুমার মল্লিক

বিমলভূষণ

আহা	আবারে কোন্ গোপন বাণীটি বাঝালো হৃদয়-বীণা-তার !	কত	আসিবে না কি গো মিলন-দেবতা, থামিবে কি মোর বীণা-তান !
ওগো	জানায় বিরহ করুণ বারতা, কাদে মিলনের ফুলহার !	শুধু	অশ্রু ভিজাবে যুথীর মালিকা, বিরহের নাহি অবসান !—
আজি	একা ব'সে আছি শুধু হাঁকে বাজ, নয়নের জলে নাহি কোনো কাজ, জীবনের সুর বাজিল বেসুর, মন্দির মোর কারাগার ॥	কেন	চমকিয়া উঠি আপনার গীতে, আসিবে কি প্রিয় শেষ গোধূলিতে, গুমরি' গুমরি' মরিছে আমার দীর্ঘ নীরব অভিসার !

—স্বরলিপি—

স সা	{	সরা	রমা	-মা		পা	পদা	মা		পা	পদা	প'গসা		প'দ	দা	পদমা
আ হা	{	সা.	বা.	ঢে		র	কো.	ন্		গো	প.	ন.		বা	গী	টি..
		মা	মপা	মা		-গা	সরা	গমা		রগা	গা	রসা		-৷	(সা সা)	}
		বা	জা.	লো		ছ	দ.	য়		বী.	গা	তা.		র	"আ হা"	}
		[মা	গমা	পদা]												
সা সদা	{	দা	দা	-৷		দা	দা	দা		দা	দসা	গসা		দা	পদা	মা
ও গো	{	জা	না	য়		বি	র	হ		ক	ক.	গ..		বা	র.	তা
		মা	মপদা	মা		মপা	মা	গা		গা	মা	গমা		পদা	প'মপা	-৷
		কা	দে..	মি		ল.	নে	র		কু	ল	হা.		র
																"বাঝালো হৃদয়-বীণাতার".
পা	পা	পা		গদা	পদা	প'মা		পদা	মা	পদা	সা	-৷	-৷			
এ	কা	ব		সে.	আ.	ছি		ও.	ধু	হা.	কে	বা	জ			
দা	খা	খা		-৷	খা	খা		সা	সখা	খা	খা	সা	না	সা		
ন	র	নে		র	জ	লে		না	হি..	কো.	নো	কা.	.			

-১ -১ -১ | -১ (-১ -১) } | -১ দা দা | দা সী সী
 . . . | . . জ } | জ আ জি | জী ব নে
 ১ সখী সী | না সী নসনা | দা (পদা মপা) | পদপা মা
 র জু. র | বা জি ল.. | বে জু. .র } | জু.. র
 পা গা গা | গা গসী গা | দা দা পদা | মপা -১ -মা
 ম ন্ দি | র মো. র | কা রা গা. | .. . র

“বাজালো হৃদয় বীণাতার”

সা সা || { সা সমা মা | মা মা মা | জা মা জমপা | পা পা পমা
 ক ভু || { আ সি. বে | না কি গো | মি ল ন.. | দে ব তা.
 মা দা দা | দা দগা দা | জা জমপদা মপা | -১ -১ পদা
 থা মি বে | কি মো. র | বী গা... তা. | . ন শুধু
 দা সী সী | সী সী সী | গসরী রী রী | রসী সী গদা
 অ . শ্রু | ভি জা বে | যু.. খী .র | মা . লি. কা.
 পা পগা গা | দা পদা মা | ম গমপদা মপা | ১ (পা পা)
 বি র. হে | র না. হি | অ ব... সা. | ন ক ভু
 -১ -১ -১
 . . . ন

{ পদা সী সী | সী সী সী | সী সী সী | -১ সী সী
 চ . ম কি | যা উ টি | আ প না | র গী তে
 দা খী খী | খী খী খী | সখী জা খজী | খী সী সখী
 আ সি বে | কি প্রি য় | শে. ব গো. | ধু লি তে.
 নসী -১ -১ | -১ (-১ -১)

দা পা || { দা দসী সী | সী সখী সী | না সী নসনা | (দা পদা মপা)
 কে ন || { শু ম. রি | শু ম. রি' | ম রি ছে.. | আ মা. .র
 দা পদা মা
 আ মা. র

মপা দগা গা | গসী গা দা | দা দা পদা | মপা -১ মা
 দী. .রু ঘ | নী. র ব | অ ভি সা. | .. . র

“বাজালো হৃদয়-বীণাতার”.



বিজ্ঞান জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(৫৫)

কি কারণে অণু পরমাণুর দল জড়বিশেষে ভিত্তি প্রস্তররূপে এবং কারবারের জগতে ক্ষুদ্রতম মাপকাঠিরূপে সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কেনই বা ওদের এ দাবী টিকলো না, অতঃপর আমরা সেই সকল কথা, বিবধের গুরুত্ব বিবেচনার কতকটা বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করবো। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন স্পষ্টরূপে অণু ও পরমাণুর সংজ্ঞা নির্দেশ।

বাস্তব জগৎটা স্থূল জড়দ্রব্য নিয়ে—এই বোধ বখন শিকড় গেড়ে বসলো, তখন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাস্তা হলো, জড় পদার্থের এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে কি, যাদের কোন ক্রমেই আর কাটা বা ভাঙা যায় না এবং থাকলে তাদের স্বরূপ কি? বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই এ প্রশ্নের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কারবারের জগতে ব্যবহারিক সত্যই বখন ঐক্য সত্য, তখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে নিতে হয় যে, জড়দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশগুলি শত ক্ষুদ্র হলেও সমীচীন হবে। অতঃপক্ষে, নিছক গাণিতিক সত্যের কাছে এ প্রশ্নের কোন মূল্য নেই। গাণিতিক সত্যাতার অভিমাত্র ধারালো মন-গড়া ছুরিখানা বের করে এবং কল্পনার সাহায্যে তা' একটা পেলিল বা একটি মনুষ্যদেহের ওপর অসংখ্যবার প্রয়োগ করে অনায়াসে প্রমাণ করে দেবে যে, জড়ের বিভাজ্যতার কোন সীমা পরিসীমা নেই—ক্রমাগত ভাগ করতে থাকলে এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার পৌছতে হয়, যাদের অবস্থান থাকলেও বিস্তৃতি নেই; হুতরাং যারা জড়-বিন্দু বলে পরিচিত হ'তে চাইলেও সত্যই জড়বিন্দু কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ এসে পড়ে।

কিন্তু জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এই আয়াসবিহীন মানসিক কসরত-টাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন এবং কারবারের জগতের প্রত্যাক-লক সত্যগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে অবিস্তাভা সসীম জরকণার জয় ঘোষণা করবেন।

বৈজ্ঞানিক বলবেন : রেখে দাও তোমার কাল্পনিক ছুরি। বাস্তব জগতে পদার্থকে চূর্ণ করবার অস্ত্র হচ্ছে টেকি বা যাতা এবং কাটবার অস্ত্র হচ্ছে লোহার ছুরি বা কাঁচি। আরো হৃদয়তর অস্ত্রের খবরও আমরা জানি—তা' হচ্ছে তাপ ও তড়িত-শক্তি। তড়িতরূপ অস্ত্র প্রয়োগে জড়ের বিশ্লেষণ ঘটায় আমরা যে সকল ক্ষুদ্রতম কণার সাক্ষাৎ পাই, তাদের আদৌ জড়-বিন্দু বলা চলে না। সর্বাংশে ক্ষুদ্র হইলেও এবং এমন কি, প্রচণ্ড শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করলেও, ওরা অসীম ক্ষুদ্র নয়। সসীমতার ছাপ নিয়েই ওরা কারবারের জগতে আনাগোনা করে। আকৃতি বা আয়তনে কিবা স্বাভাবিক চাল-চলনে দৃশ্যমান জড় বস্তুগুলির সঙ্গে ওদের প্রকৃতিগত ভেদ নেই—বা' কিছু ভেদ পরিমাণ নিয়ে। এককভাবে ইঞ্জিয়ার অগোচর হলেও ওদেরই সমষ্টিতে আমরা জড় দ্রব্যরূপে প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি। চকলতা ওদের বিশিষ্ট ধর্ম। দল বেঁধে আঘাত ক'রে ওরা আমাদের স্পর্শবোধকে জাগ্রত করে এবং ওদেরই অদৃশ্য লক্ষন, কম্পন, কল্পন বা ঘূর্ণন গতির তারতম্য থেকে আমরা গোটা পদার্থটাকে গরম বা ঠাণ্ডা, জ্যোতিমান বা জ্যোতিহীন রূপে অনুভব ক'রে থাকি। কারবারের জগতে ওরা মত ব্যাপারী। সবাই কর্মকর্ম, সবাই ব্যস্ত। ওদেরকে আমরা

কোন ক্রমই অগ্রাহ্য করতে পারিনে। গাণিতিকের কার্যনিক ছুরির আঘাত ওদেরকে আদৌ স্পর্শ করে না।

এই খুন্সে কথাগুলির জীবন কাহিনী অতি বিচিত্র। কারবারের প্রকারভেদ নিয়ে ওদের মধ্যে ছোট বড় ভেদ রয়েছে। কলে এক শ্রেণীর জড়কণাকে বলা যায় ‘অণু’ বা Molecule এবং অপর এক শ্রেণীকে বলা যায় পরমাণু বা Atom. অণু ও পরমাণুর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও বহু বিষয়ে বৈষম্য রয়েছে। প্রধান পার্থক্য ওদের ক্ষুদ্রতার সীমা নিয়ে। অণু ক্ষুদ্র, পরমাণু ক্ষুদ্রতীক্ষ্ণ। সাধারণতঃ ছ’চারটা কিম্বা দশ বিশটা পরমাণু দল পাঁকিয়ে এবং বিশিষ্ট বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বদ্ধ হয়ে এক একটি অণু গঠন করে। ছ’টা বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর (যেমন কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণু) মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহাকে বলা যায় রাসায়নিক আকর্ষণ বা Chemical Attraction এবং ছ’টা সমজাতীয় পরমাণুর (যেমন ছ’টা অক্সিজেন পরমাণু) মধ্যে যে আকর্ষণ, তাকে বলা যায় সংসক্তি বা Cohesion, ক্ষেত্র বিশেষে ছ’শো, চারশো এমন কি দশ বিশ হাজার পরমাণুও দলবদ্ধ হয়ে এক একটি অণু গঠন করে থাকে। আবার গোটাকতক এমন পদার্থও আছে, যাদের অণুর ভেতর একাধিক পরমাণু খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের বোলায় অণু ও পরমাণু একই জিনিস এবং উভয়ে একই ক্ষুদ্রতার সীমা নির্দেশ করে থাকে। এক পারমাণবিক অণুও অতি ক্ষুদ্র স্বীকার করা যেতে পারে কেবল কোন কোন মূল পদার্থের ভেতরেই। অল্পক্ষেপে যৌগিক পদার্থের (Compoundএর) অণুর ভেতর অন্ততঃ ছ’রকমের ছ’টা পরমাণু না থাকলে চলে না। এর কারণ অতি স্পষ্ট। নিছক পুরুষদের বা নিছক নারী-সমাজের নাচে নৃত্যপরায়ণ ক্ষুদ্রতম অংশটি একটি মাত্র পুরুষের বা একটি মাত্র নারীর আকার ধারণ করতে পারে, (অবশ্য একাধিক পুরুষ বা একাধিক নারী হতেও আপত্তি নেই) কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের বল-নাচে ঐ ক্ষুদ্রতম অংশের ভেতর অন্ততঃ একটি পুরুষের ও একটি নারীর সাক্ষাৎলাভ ঘটবেই। যৌগিক পদার্থ মাত্রই অন্ততঃ ছ’রকমের ছ’টা মূল পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং এই মিলন ব্যাপারে উভয়ের যে সকল ক্ষুদ্রতম অংশগুলি নারক নারিকার ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের যদি ঐ পদার্থবহুর পরমাণু বলা

যায়, তবে ঐ যৌগিক পদার্থের অল্পক্ষেপে ক্ষুদ্রতম অংশের ভেতর অন্ততঃ ছ’টা বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র স্বীকার করতেই হয়। অন্ততঃ জ্যাটনের মতে পরমাণু বলতে মূল পদার্থের ঐরূপ অংশগুলিকেই বোঝায়। কলে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশরূপে পরমাণুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওদেরকে কেবল বিশ্ব-রচনার শেষ ইটকখণ্ড রূপে কল্পনা করলেই চলে না, পরন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয় চঞ্চল কণারূপে ওদের কারবারের দিকটাকেই। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই কারবার ছ’টা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে, যাদেরকে আমরা বলতে পারি ওর সামাজিক রূপ ও সাংসারিক রূপ। এ হলো স্থল বর্ণনা। বিজ্ঞানের ভাব্য এদের বর্ণনাক্রমে বলা হয়ে থাকে ভৌতিক পরিবর্তন (physical change) এবং রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical change) এই ছ’ শ্রেণীর পরিবর্তনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের ছ’টা মস্ত বিভাগ—ভূতবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান (Physics) এবং রাসায়নিক বিজ্ঞান (chemistry) কাকে অণু বলব, কাকে পরমাণু বলব, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই—

ভৌতিক পরিবর্তনে ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম জড়ের এইরূপ ক্ষুদ্রতম অংশ-গুলির নাম ‘অণু’; এবং রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করতে পারে, জড়ের এইরূপ ক্ষুদ্রতম অংশগুলির নাম ‘পরমাণু’।

ভৌতিক ও রাসায়নিক কারবারে পার্থক্য কি? এর উত্তরে বলা হয়, ভৌতিক পরিবর্তনে পদার্থের বস্তু বা প্রকৃতি বদলায়না; আর রাসায়নিক পরিবর্তনের বিশিষ্ট লক্ষণই হচ্ছে পদার্থের নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্তন-সাধন। বলতে পারা যায়, বিয়ের পরে অনেকের যেমন হয় কতকটা সেই-রকম। আসল মানুষটি তাই থাকে, তবু যেন এক নতুন মানুষ—নতুন রং নতুন ঢং। যে ধরনের কারবারে পদার্থের বস্তুই কোন পরিবর্তন হয়না, তা’র সবই ভৌতিক পরিবর্তনের অন্তর্গত। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, জল পড়া, পাতা নড়া, ফুল কোটা, গান গাওয়া, হাটা চলা, লক্ষন, কক্ষন, পদার্থের ছুঁ-পতন, ট্রেনে ট্রেনে কলিশন, অণুতে অণুতে ঘাত প্রতিঘাত, ধূমকেতুর আবির্ভাব, উৎসাপাত, গ্রহণ, চন্দ্রের কু-প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ, কঠিন পদার্থের গলন, তরলের বাষ্পীভবন, তাপ ও আলোর সঞ্চালন, বিদ্যুতের প্রবাহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ভৌতিক পরিবর্তনের অন্তর্গত। এই ধরনের

ক্যাপারে যে সকল জড়ত্ব্য অংশ গ্রহণ করে, তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম এবং ব্যক্তিত্ব হারায় না। ওদের মধ্যে আবার যারা সব চেয়ে ছোট, তারাই উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, নাম গ্রহণ করেছে অণু। জড়ত্ব্য শত সহস্র রকমের, সুতরাং অণুও শত সহস্র রকমের। কেউ বা যৌগিক অণু, কেউ বা মৌলিক অণু, কারো ভেতর পরমাণুর সংখ্যা একটি মাত্র, কারো ভেতর ছ'টি চারটি বা শত সহস্রটি।

অন্তপক্ষে যে ধরণের কার্যবারে পদার্থের ধর্ম বদলে যায়, তার সমস্তই রাসায়নিক পরিবর্তনের অন্তর্গত। রাসায়নিক পরিবর্তনের বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দহন। বস্তুতঃ বিকলী বাতির কথা ছেড়ে দিলে প্রায় সকল দহন কার্যকেই রাসায়নিক পরিবর্তনের অন্তর্গত করা যায়। কার্বন বা কয়লা পুড়ে যখন ছাই হয়, তখন কার্বনের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের এমন নিবিড় সংযোগ ঘটে যে, তখন ওদের কাকুরই আলাদা অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়না, অথচ কেউ ওরা ধ্বংস হয়না। উভয়ে মিলে গঠন করে কার্বনিক এসিড নামক গ্যাস বা' অদৃশ্য হাওয়ার আকারেই হাওয়ার সাথে মিশে যায় এবং বা'র ধর্ম অক্সিজেন গ্যাসের ঠিক বিপরীত;—কারণ অক্সিজেন নির্কোণোন্মুখ প্রদীপকেও জালিয়ে তোলে আর কার্বনিক এসিড গ্যাস অত্যাচ্ছন্ন দীপ শিখাকেও নিবিয়ে দেয়। এই ধরনের সংযোগকে বলা যায় রাসায়নিক সংযোগ। কার্বন বা অক্সিজেনের এক কণাও বিনষ্ট হয়না, অথচ সংযুক্ত অবস্থার ওদের প্রকৃতি যেন বদলে যায়। আবার ঐ যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটিয়ে ওর মূল উপাদান ছ'টাকে পৃথক করতেও পারা যায়। তখন ওদের পূর্ব ধর্ম আবার পূর্ণ মাত্রাতেই ফুটে ওঠে। এই দুই প্রক্রিয়াকে বলা যায় যথাক্রমে রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ (বা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ)। উভয় ব্যাপারই ঘটে, আমা-
দের মনে নিতে হয়, ঐ দুই মূল পদার্থের এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মিলন ও বিচ্ছেদের কাহিনী রচনা যাদের কখনো চোখে দেখবো ব'লে আমরা আদৌ আশা করতে পারিনে, অথচ তারা যে অসীম ক্ষুদ্র নয়, পরস্তু কর্তৃজগতে আমাদের মতই বড়ই কার্যবাহী (এবং এমন কি, হয়ত আমাদের মতই স্বাধীন জগতের অধীন) তা'ও ব্যবহারিক সত্যের দৃষ্টিকোণ দিয়ে না মনে পারা যায়না। রাসায়নিক কার্যবারে বা'রা

এইরূপ সসীমতার ছাপ নিয়েই ক্ষুদ্রতম কণারূপে পরিচিত হতে চায় তাদেরকেই উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায় পরমাণু। পরমাণু মাত্রই মূল পদার্থ। যে অর্থে কার্বন বা অক্সিজেন মূল পদার্থ, কার্বন-পরমাণু অক্সিজেন-পরমাণুও সেই অর্থেই মূল পদার্থ—কারো ভেতর থেকেই ছ'রকমের ছ'টি (বা বহু রকমের বহু) পদার্থ বেরিয়ে আসার কথা নেই। মূল পদার্থ বহু রকমের পরমাণুও তত রকমের এবং এ পদার্থ বহুটা জানতে পারা গেছে, উভয়েই ৯২ রকমের, অর্থাৎ প্রায় শত রকমের। মাত্র বিরানব্বই রকমের বিরানব্বইটি পরমাণু, কিন্তু প্রত্যেকেই ওরা দলে ভারী—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। ওরাই পরস্পরের আকর্ষণে বদ্ধ হয়ে এবং ছ'চারটা বা দশ বিশটা করে' দল পাকিয়ে গঠন করেছে কত সহস্র রকমের অণু। আবার কত কোটি কোটি অণু জোট পাকিয়ে গড়ে তুলেছে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য এক একটি ভড় পদার্থ এবং তাদের সমষ্টি এই বিরাট জড়জগৎ। এই হলো জড়বাহীর জগৎচিত্র। এই জগতের পরমাণুরূপী অবিভাজ্য ইটেক খণ্ড-গুলি নিজেরা অবিকৃত থেকে জগতের ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস রচনা করে এবং ব্যবহারিক জগতে ক্ষুদ্রতম মাপকাঠিরূপে বিশিষ্ট মর্যাদাও দাবী করে।

ওপরে পরমাণুর যে সংজ্ঞা দেওয়া গেল, তার তিষ্ঠি প্রতিষ্ঠা করেন ড্যান্টন (১৭৬৬—১৮৪৪)। প্রকৃত পক্ষে পরমাণুর কল্পনা বহু পুরাতন এবং এ কল্পনা পাস্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। গ্রীক পণ্ডিত ডেমোক্রাইটাসের পরমাণু এই কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল, যে, সমগ্রভাবে জড়জগতের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। ওদের মূল উপাদান হচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, যাদের কোন ক্রমেই কাটা যায়না। জন্ম মৃত্যু বা জরা ঐ সকল কণাকে স্পর্শ করতে পারেনা। এদের নাম অ্যাটম (Atom) বা পরমাণু। Atom (অ্যাটম্) কথার অর্থ হচ্ছে—that which can not be cut (বা'কে কাটা যায়না)। ছ'হাজার বৎসরেরও আরো পূর্বে ডেমোক্রাইটাস শিথিরেছিলেন :

‘একত পক্ষে পরমাণু ছাড়া আর কোন বাস্তব পদার্থ নেই। ইন্ড্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুতলিক বাস্তব পদার্থ ব'লে মনে হয়, কিন্তু তা' তুল। পরমাণু এবং পরমাণুতে পরমাণুতে কাঁক—এই হলো জগতের বাঁকি রূপ’।

জড়দ্রব্য মাত্রেরই যে বস্তুত্ব : এইরূপ সসীম ও অবিতাণ্ড্য অংশ রয়েছে, তার কোন প্রমাণ প্রাচীনেরা দেন নি। প্রমাণ উপস্থিত করলেন ড্যান্টন—রাসায়ন বিজ্ঞানের তরক থেকে। ড্যান্টন দেখলেন যে, অক্সিজেন রাসায়নিক কার্যবারে জড় দ্রব্যের ঐক্য অবিতাণ্ড্য অংশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি পরমাণুর সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন এই বলে যে, পরমাণু বলতে বুঝতে হবে পদার্থের সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে যারা রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং যাদের চেয়ে ছোট কিছু পারেনা। তিনি আরো বললেন যে, কোন বিশিষ্ট মূল পদার্থের (যেমন সোনার) পরমাণুগুলি সর্বত্র সমান। ওদের সবারই ওজন বা গুরুত্ব সমান এবং অস্ত্রান্ত ধর্মও কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু বিভিন্ন মূল পদার্থের (যেমন সোনা, রূপা, লোহা, তামা, গন্ধক, কার্বন, পারদ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতির) পরমাণুদের গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন এবং অস্ত্রান্ত ধর্মও বিভিন্ন। পরমাণুর বিশিষ্ট ধর্মরূপে গ্রহণ করা গেল ওর গুরুত্বকে; কারণ দেখা গেল, অস্ত্রান্ত ধর্মের কথা না তুলেও, এক গুরুত্বের দিক থেকেই পরমাণুতে পরমাণুতে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

মোটের ওপর ড্যান্টনের পরমাণু শুধু এই দাবীই জানাতে পারলো যে, রাসায়নিক কার্যবারে ওরাই হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। বস্তুতঃই ওরা অবিতাণ্ড্য কিনা এবং বিতাণ্ড্য হলে ঐ টুকরা অংশগুলি অস্ত্র কোন কার্যবারে অংশ গ্রহণ করে কিনা, ড্যান্টনের পরমাণুবাদ তার কোন উত্তর দেয় না। তবু সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ তখন থেকে মেনে নিলেন যে, প্রাচীনরা যে একান্ত অবিতাণ্ড্য পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন, ড্যান্টনের পরমাণুতেই তা' বাস্তবরূপে গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রাচীনদের পরমাণু ও ড্যান্টনের পরমাণু একই পদার্থ। এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বুদ্ধিসঙ্গত না হলেও অস্বাভাবিক নয়। মানবচিত্ত স্বভাবতঃই সসীম পদার্থ নিয়ে কার্যবার করতে চায়। অসীম ছোট ও অসীম বড়; উভয়েই আমাদের নাগালের বাইরে। সুতরাং ড্যান্টন যখন তাঁর পরমাণুবাদ প্রচার করলেন এবং দেখা গেল যে, এই মত মেনে নিলে রাসায়নিক সংযোগ বিচ্ছেদের নিয়মগুলি—বিশেষতঃ বিশিষ্টাণুপাতের

ও গুণানুপাতের নিয়ম ছ'টার (Laws of Definite and Multiple Proportion) সঙ্গত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই এই ধারণা বহুশ্রম হলো যে, সত্যিকার 'অকাটা' পরমাণু বলতে যদি কিছু থাকে তবে ড্যান্টনের পরমাণুই সেই পদার্থ।

যে-সকল পরীক্ষামূলক সত্যকে ভিত্তি করে ড্যান্টনের পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঐ নিয়ম ছ'টা। সুতরাং ঐ নিয়মসমূহকেও 'কিঞ্চিৎ আলোচনার দরকার। উক্ত বিশিষ্টাণুপাতের নিয়মটা এই :—যখন ছ'টা বিশিষ্ট মূল পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, তখন মিলনটা ঘটে উভয়ের যথেষ্ট পরিমাণের মধ্যে নয়, পরস্পর উভয়ের ওজনের মধ্যে একটা বিশিষ্ট অনুপাতের মধ্যমা রক্ষা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারা যায় যে, যদি একটা পাতের তৈতর যথেষ্ট পরিমাণের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস চুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে যদিও, যথেষ্ট পরিমাণ বলে, ওদের ওভঃ প্রোত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশবার পক্ষে কোন বাধা হবে না, তবু এই মিশ্রণটা হবে একটা ভৌতিক পরিবর্তন (Physical change) এবং এর ফলে পাওয়া যাবে একটা সাধারণ মিশ্রপদার্থ (Mechanical Mixture) যা'র তৈতর ঐ দুই গ্যাসের ধর্ম (নাইট্রোজেন অক্সিজেন দীপশিখাকে নিবিধে দিতে চায় আর অক্সিজেন তা' আরো উজ্জ্বল করে তোলে) পরস্পরের আড়ালে থেকেও উকি মারতে থাকে; কিন্তু যদি ওদের পরস্পরের রাসায়নিক সংযোগের সুযোগ ঘটে এবং ফলে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম বিশিষ্ট একটা যৌগিক পদার্থের—যা'র যাক্ নাইট্রোজেন-মনোক্সাইড নামক গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তবে দেখা যাবে যে, মিলনটা ঘটেছে ঐ দুই গ্যাসের ওজনের মধ্যে ৭ : ৪ এই অনুপাতটা বজায় রেখে; অর্থাৎ যেন, প্রতি সাত সের, সাত তোলা বা সাত গ্রেণ ওজনের নাইট্রোজেনের সঙ্গে চার সের, চার তোলা বা চার গ্রেণ ওজনের অক্সিজেন মিলে ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করেছে। আরো দেখা যাবে যে, ওদের বাড়তি ওজনটা—যদি কারো কিছু থাকে—আলাদা হয়ে অম্লি পড়ে রয়েছে। রাসায়নিক সংযোগের এই হ'ল একটা বিশেষত্ব এবং একেই আমরা বলেছি বিশিষ্টাণুপাতের নিয়ম। কিন্তু কেন এ নিয়ম? কেন ঐ গ্যাস

হুঁটা (নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন) আমার ইচ্ছামত অমুপাতে—যে অমুপাতে ওদেরকে আমি পাত্রে ভেতর ঢুকিয়ে দিই—ঐ অমুপাতে—মিলিত হয়ে ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থকে (নাইট্রোজেন-মনোক্সাইডকে) গড়ে তোলে না? এ প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে ঐ দুই গ্যাসই অস্বাভাবিক অমুপাতেও পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হতে পারে কি, এবং তার কলে নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয় কি? এর উত্তর—হ্যাঁ। পরীক্ষিত সত্য এই যে, ওরা পরস্পরের সঙ্গে ৭ : ৮, ৭ : ১২ প্রভৃতি অমুপাতেও মিলিত হয়ে থাকে এবং কলে যে-সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের নাম দেওয়া হয় যথাক্রমে নাইট্রোজেন-বি-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ত্রি-অক্সাইড প্রভৃতি। সুতরাং নাইট্রোজেন-মনোক্সাইড থেকে আরম্ভ করে বি-অক্সাইড, ত্রি-অক্সাইড ক্রমে চলতে থাকলে আমরা দেখতে পাই যে, এই সকল যৌগিক পদার্থের উৎপাদনে যে যে পরিমাণের অক্সিজেনের আবশ্যক হয়, তাদের ওজনের অমুপাত হচ্ছে ৪ : ৮ : ১২ ইত্যাদি বা ১ : ২ : ৩ ইত্যাদি। এই নিয়ম কেবল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বেলায়ই নয়, অস্বাভাবিক পদার্থ সম্বন্ধেও খাটে। এই নিয়মকেই আমরা বলেছি গুণানুপাতের নিয়ম। সাধারণ ক্ষেত্রে নিয়মটাকে এইরূপে প্রকাশ করা যায় :—যখন একটা মূল পদার্থের একটা নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে আর একটা মূল পদার্থের বিভিন্ন ওজন মিলিত হয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তখন দ্বিতীয় পদার্থের বিভিন্ন ওজনগুলির মধ্যে ১ : ২ : ৩ এইরূপ সরল গুণিতকের সঙ্কলন হলে ঐ সকল মিলন ঘটে থাকে। প্রশ্ন এই, অক্সিজেনের (বা অন্য কোন মূল পদার্থের) এ প্রবৃত্তি কেন? অক্সিজেন বাটত যৌগিক পদার্থগুলির অন্তর্গত অক্সিজেনের মাত্রা ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত বেড়ে না গিয়ে ধাপে ধাপে বাড়ে কেন? এ প্রশ্নেরও উত্তরের প্রয়োজন।

উত্তর প্রশ্নেরই উত্তর পাই আমরা ড্যান্টনের পরমাণুবাদ থেকে। কারণ, যদি ঐ মতবাদ অনুসারে অনুমান করা যায় যে, পদার্থ ভাঙেরই পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সসীম এমন সকল অংশ রয়েছে, যাদের চেয়ে ছোট কিছু রাসায়নিক কার্যবারে অংশ গ্রহণ করতে পারে না এবং এ-ও স্বীকার

ক'রে নেওয়া যায় যে, একই মূল পদার্থের সকল পরমাণুর ওজন সমান ও বিভিন্ন মূলপদার্থের পরমাণুর ওজন ভিন্ন ভিন্ন এবং তার ভিন্ন ওদের অস্বাভাবিক ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন, তবে রাসায়নিক সংযোগ বিশ্লেষণ ব্যাপারগুলি কেন ঐ নিয়ম হুঁটাকে মেনে চলে, তা বুঝতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে সংযোগটা ঘটে উত্তর পদার্থের গোটা গোটা পরমাণুর মধ্যে, যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও সসীম এবং কারবারের জগতে যাদের আমাদের মতই এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও ওজন রয়েছে। সুতরাং নির্দিষ্ট সংখ্যক নাইট্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্সিজেন-পরমাণু মিলেই নাইট্রোজেন-মনোক্সাইড নামক ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। যদি ঐ নাইট্রোজেন-পরমাণুগুলি অপর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার থেকে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হবে, তার ধর্ম আর নাইট্রোজেন-মনোক্সাইডের ধর্ম ঠিক এক হতে পারে না। তা' হবে একটা ভিন্ন পদার্থ। এই হ'ল বিশিষ্টাংশপাতের নিয়ম। আবার নাইট্রোজেনের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর মিলনও খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এর কলে যে-সকল যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হবে, তাদের অন্তর্গত অক্সিজেন-পরমাণুও ১, ২ প্রভৃতি পূর্ণ-সংখ্যাক্রমেই বাড়তে থাকবে; সুতরাং ওদের অন্তর্গত অক্সিজেনের ওজনও ধাপে ধাপে বা একটা সরল গুণানুপাতের নিয়ম মেনে বাড়তে থাকবে। এইরূপে উত্তর নিয়মেরই একটা সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবং কলে ড্যান্টনের পরমাণুবাদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। সকল যুক্তিতর্কের মূলে রইল এই অনুমানটা যে, পরমাণু শব্দ ক্ষুদ্র হলেও অসীম ক্ষুদ্র নয়, সুতরাং কারবারের জগতে ওরা ব্যবহারযোগ্য ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি হবারই ক্ষমতা রাখে। এইরূপে এই মতবাদ থেকে এই ধারণা বহুমূল হ'ল যে, পরমাণু সসীম এবং অন্ততঃ এতটা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যে প্রত্যেকে এক একটা নির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য ওজনের ছাপ বহন ক'রে রাসায়নিক কার্যবারে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে থাকে—ঠিক যেমন দাম্পত্য সঙ্কলন সংস্থাপন (বা খণ্ডন) ব্যাপারে ষার ষার আকৃতি আয়তন ও গুরুত্ব বজায় রেখেই

উত্তর পক্ষ পরম্পরের সঙ্গে নিমিত্ত (বা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন) হয়ে থাকে।

উক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, যদি ছ'টা মূল পদার্থের পরমাণুকে “ক” ও “খ” বলা যায় এবং ওদের পাশে ১, ২ প্রভৃতি অঙ্ক বসিয়ে ওদের সংখ্যা নির্দেশ করা যায়, তবে উত্তর পদার্থের মিলনের ফলে যে-সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাদের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে ক১ খ১, ক১ খ২, ক১ খ৩, প্রভৃতি দ্বারা অর্থাৎ অঙ্ক-সম্বিত কতকগুলি যুক্তাক্ষর দ্বারা সৃষ্টি দান করা যেতে পারে। রসায়ন বিজ্ঞানে এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়ে থাকে। যৌগিক পদার্থের অণু বলতে এই সকল ক্ষুদ্রতম অংশকেই বুঝায়। এদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল যৌগিক অণু বিভাজ্য, এবং বিশিষ্টাঙ্গপাত ও গুণাঙ্গপাতের নিয়ম ছ'টাকে অঙ্গের ভূষণ করেই ওরা এই সকল সৃষ্টি গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এ-ও সহজে বুঝা যায় যে, এই সকল যৌগিক অণু যখন অপর কোন অণু বা পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক কার্যবাসে লিপ্ত হয়, তখন ওদের অন্তর্গত পরমাণুগুলি পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুরাণো অণু ভেঙ্গে যায় এবং ওদের পরমাণুগুলি নূতন একদল পরমাণুর সঙ্গে মিলে মিশে নূতন অণু গঠন করে। এই ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস নিয়েই রসায়ন-বিজ্ঞান। কিন্তু যতক্ষণ কোন রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটে, ততক্ষণ এই অণুগুলি ঐ যৌগিক পদার্থের অবিভাজ্য এবং ক্ষুদ্রতম অংশরূপে পরম্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও ঠোঁকাঠুকি ব্যাপারগুলি—যাদের আমরা বলেছি ভৌতিক ব্যাপার (Physical Phenomena)—সম্পন্ন করে থাকে; এবং এরই ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিকগণ ভৌতিক কার্যবাসকে ভিত্তি করে অণুর এবং রাসায়নিক কার্যবাসকে ভিত্তি করে পরমাণুর সংজ্ঞা নির্দেশ করে থাকেন।

আবার যৌগিক পদার্থের অণুর মত মূল পদার্থেরও অণু রয়েছে। এরাও ভৌতিক কার্যবাসে অবিভাজ্যতার দাবী নিয়েই চলা-কেন্দ্র করে। তথাৎ এই যে, যদিও যৌগিক অণুর গঠনে, কম পক্ষে অন্ততঃ ছ'রকমের ছ'টা পরমাণুর প্রয়োজন, মৌলিক অণুর ভেতর একাধিক পরমাণু নাও থাকতে পারে। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। মৌলিক অণু মূল পদার্থ, সুতরাং ওর ভেতর ওর একটা মাত্র পরমাণু

থাকতেও যেমন বাধা নেই, একাধিক পরমাণু জোট পাকিয়ে থাকতেও আপত্তি হতে পারে না। সুতরাং ‘ক’ পদার্থের অণুগুলির সম্ভবপর আকার হবে ক১ ক২ ক৩ প্রভৃতি এবং ‘খ’ পদার্থের পক্ষে খ১ খ২ খ৩ প্রভৃতি। এইরূপ প্রত্যেক মূল পদার্থের পক্ষে। বহু মূল পদার্থের অণু, যথা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির অণুগুলি ‘বি-পারমাণবিক’; সুতরাং এই সকল পদার্থকে হা, অ, না, প্রভৃতি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করলে এদের অণুদের চেহারা হবে হা২, অ২, না২ প্রভৃতি।

আমরা বলেছি পরমাণুর বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে ওর ওজন। প্রত্যেক পরমাণুরই অবশ্য এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও বস্তুমান রয়েছে, কিন্তু ড্যান্টনের সময় পরমাণুর এই সকল ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে বর্তমান কালেও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। ওরা গোলাকার না ডিম্বাকার না ইটের মত অষ্টকোণ-বিশিষ্ট তা’ আজও জানতে পারা যায়নি। সকল পরমাণুর একই চেহারা কি না, কিম্বা পরম্পরের সঙ্গে স্বাভ-প্রতিস্বাভে ওদের চেহারা বদলে যায় কি না তারও কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে বদলে যাওয়া যে স্বাভাবিক তা’ নানা কারণেই মেনে নিতে হয়। প্রাচীনদের পরমাণু অবশ্য অক্ষর ও অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব রূপেই পরিচিত হতে চেয়েছিল, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে ঐরূপ সৃষ্টি অচল। স্বাভ-প্রতিস্বাভে অণু ও পরমাণুর চেহারা কিছু না কিছু বদলে যাবে, নিউটনের বল-বিজ্ঞান এইরূপই দাবী করে। ওদের গোলাকার কল্পনা করে, আধুনিক বিজ্ঞান বহু অণু ও পরমাণুর ব্যাস ও আয়তন এবং কারো কারো বস্তুমান ও গুরুত্বও আলাদাভাবে নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ড্যান্টনের সময়ে কোন পরমাণুরই নিজস্ব বস্তুমান বা নিজস্ব গুরুত্ব জানা ছিলনা। তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ কার্যবাস করতেন পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। তাঁদের পরিমাপ থেকে এটা জানা গেল যে, হাইড্রোজেন পরমাণুই সব চেয়ে হালকা পরমাণু এবং ওর ওজনটাকে ১ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করে অন্যান্য অনেক পরমাণুতেই তাঁরা এক একটা নির্দিষ্ট ওজনের ছাপ এঁকে দিতে সক্ষম হলেন। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুতে ওজনের ছাপ পড়লো যথাক্রমে ১৪ ও ১৬। এর অর্থ এই যে,

এই পরমাণুদ্বয়ের ওজন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ করনা করা যেতে পারে ;—যদি অনুমান করা যায় যে ছুঁটা নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের একটা, ছুঁটা ও তিনটা পরমাণু সংযুক্ত হয়ে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, মনোক্সাইড, দ্বি-অক্সাইড ও ত্রি-অক্সাইডের অণু গঠিত হয়েছে, তবে এই সকল যৌগিক অণুব অন্তর্গত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত হবে যথাক্রমে ২৮ : ১৬, ২৮ : ৩২ এবং ২৮ : ৪৮ অথবা ৭ : ৪, ৭ : ৮ এবং ৭ : ১২ অর্থাৎ পরীক্ষা থেকে এদের ওজনের মধ্যে যে সকল অনুপাত দেখতে পাওয়া যায়, তা'ই। ফলে এই সকল যৌগিক পদার্থের অণুব চোঁরা হ'বে যথাক্রমে নাই অ১, নাই অ২, এবং নাই অ৩। এইরূপে রসায়নবিদগণ বিবিধ যৌগিক অণুর চিত্র তখন করেছেন। এই সকল চিত্র থেকে কোন অণুর ভেতর কোন কোন পদার্থের কতটি ক'রে পরমাণু বসবাস করছে, তা' আমরা দৃষ্টিপাত মাত্র বুঝে নিতে পারি।

প্রশ্ন হতে পারে, এক জাতীয় কোন একটা পরমাণু ভিন্ন জাতীয় একটি মাত্র পরমাণুর সঙ্গেই সর্বদা মিলিত না হ'য়ে কখনো তা'র একটির সঙ্গে, কখনো দু' তিন বা দশ বিশটির সঙ্গে মিলিত হতে চায় কেন, এবং ফলে নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে কেন? অথবা, ভিন্ন ভাবে বলতে গেলে, বিশিষ্টানুপাতের নিয়মই একমাত্র নিয়ম না হয়ে আবার অণুপাতের নিয়ম কেন? এর কোন উত্তর নেই। এর কত পাণ্টা প্রশ্ন করতে হয়, মানুষের ভেতর সকলেই একপত্নীক না হয়ে, কেউ কেউ বা দ্বি-পত্নীক বা ত্রি-পত্নীক হতে চায় কেন? মানুষের বেলায় এই পার্থক্য নির্দেশের জন্য আমরা 'সঙ্গ-স্পৃহা' কথাটা ব্যবহার ক'রে বলতে পারি যে, এক-পত্নীক ব্যক্তির সঙ্গ-স্পৃহার মাত্রা ১, এবং দ্বি-পত্নীক, ত্রি-পত্নীক প্রভৃতির বেলায় ঐ মাত্রা হচ্ছে ২, ৩ প্রভৃতি। পরমাণুদের বেলায়ও এ কথা খাটে। ওদের সঙ্গ-স্পৃহার বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে 'ভ্যালেন্সি' (Valency). উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহা ১, অক্সিজেন পরমাণুর ২, নাইট্রোজেন পরমাণুর ৩, এইরূপ। যৌগিক পদার্থের সংখ্যাবাহুল্যও ঘটেছে প্রধানতঃ এই জন্য। সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, 'ক' ও 'খ' যদি দু'টা ভিন্ন-

জাতীয় পরমাণু হয় এবং প্রত্যেকের সঙ্গ-স্পৃহা ১ পরিমিত হয়, তবে উভয়ের মিলনের ফলে এক রকমের একটা যৌগিক অণুই গঠিত হতে পারে—যা'র চোঁরা হ'বে ক১ খ১। কিন্তু 'ক' এর সঙ্গ-স্পৃহা যদি ১ না হ'য়ে ৩ হয় তবে 'ক' পরমাণুটা 'খ' পদার্থের একটা, দু'টা বা তিনটা পরমাণুর পাণি গ্রহণ ক'রে তিন রকমের যৌগিক অণু গঠন করতে পারে—ক১ খ১, ক১ খ২, ক১ খ৩। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে আমরা এইরূপ চোঁরাবিশিষ্ট অণুদেরই সাক্ষাৎ পাই—অবশ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে নয়, মানস-প্রত্যক্ষে। এইরূপে যৌগিক অণু ও যৌগিক পদার্থের সংখ্যাবাহুল্য ঘটেছে। কোন কোন অণুতে, আমরা বলেছি, পরমাণুর সংখ্যা দশ বিশ চাক্ষুরও হতে পারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীর সংখ্যা ছিল নাকি বোল হাজার। বাস্তব জগতে কার্কেণ বা কালো করলাই এ-বিষয়ে কতকটা শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মী। করলায় পরমাণুকে কেন্দ্র ক'রেই অসংখ্য পরমাণুর দল (প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুগুলি) ভিড় জমায় বেশী। ফলে, কার্কেণঘটিত অণুগুলির ভেতর পরমাণুর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই খুব বেশী এবং ওদের রকমারিরও অস্ত নেই। আশ্চর্য্য এই যে, জৈবদেহ মাত্রেই কার্কেণ একটি মূল উপাদান। কার্কেণের সঙ্গে প্রাণধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি? বিজ্ঞান বলে—থাকতে পারে কিন্তু জানি নে।

ওপরের কথাগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই : অণু ও পরমাণু উভয়ই কারবারের জগতে পরিচিত হতে চায় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশরূপে। যারা ভৌতিক কারবারের পক্ষে ক্ষুদ্রতম মূর্ত্তি নিয়ে উপস্থিত হয়, তাদের বলা যায় অণু, আর যারা আরো ভেতরের ব্যাপারে, অর্থাৎ রাসায়নিক কারবারে, ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিত্ব নিয়ে আনাগোণা করে—তারা হচ্ছে পরমাণু। হুতরাং অণুব তুলনায় পরমাণু সাধারণতঃ ছোট। এর ব্যতিক্রম ঘটে শুধু এক পারমাণবিক অণুদের (Monatomic Molecule-দের) বেলায়। যৌগিক পদার্থের অণু স্বতাবতঃই যৌগিক পদার্থ এবং মূলপদার্থের অণু মূল পদার্থ। উত্তর-শ্রেণীর অণুই যেমন ভৌতিক কারবারে, সেইরূপ রাসায়নিক কারবারেও অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। ভৌতিক কারবারে সাধারণতঃ অণুগুলি ভাঙে না। এ-ক্ষেত্রে ওরা

নিভয় স্বর্গ বজায় রেখেই পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা বা ঠোকাঠুকি করতে থাকে। সাধারণ ছুরি কাঁচির পক্ষে অণুগুলি পরমাণুর মতই 'অকাটা'। তবু তড়িৎরূপ সূক্ষ্ম অস্ত্রের প্রয়োগে কিছা জলের ভেতর অতিমাত্র জ্বলের কলে ওরা যে ভেঙ্গে যায়, তার বখেটে প্রমাণ আছে। কিন্তু অণুর সংসারে ভাঙ্গন ধরে বিশেষ ক'রে রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে—যেমন ধরেছিল বিনোদিনীর আবির্ভাবে মহেন্দ্রের সংসারে কিছা সুরেশের আনাগোনার কলে মহিমের সংসারে। এ-পক্ষে মিলন, ও-পক্ষে বিচ্ছেদ। কলে যে গৃহদাহ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাই সৃষ্টি গ্রহণ করে রাসায়নিক পরিবর্তনের আকারে আর তারি আগুন ফুটে ওঠে সর্বপ্রকার দহন, পচন, জারণ, মারণ, তন্দ্রীকরণ ব্যাপারে। ব্যাপার-গুলো করুণ হলেও একটু সাব্বনা এই যে, এ-সকল ব্যাপারে ঘরই ভাঙে কিন্তু ঘাদের নিরে ঘর সংসার, তারা ভাঙে না—অণুগুলি চূর্ণ হয় কিন্তু ভেতরকার পরমাণুগুলি ঠিকই থাকে।

অল্পপক্ষে, পরমাণুর বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক ব্যাপার, এবং তার জন্ত যে আরোক্তনের প্রয়োজন তার উদ্দেশ্য হবে মূল পদার্থের মৌলিকত্ব এবং পরমাণুর পরমাণুত্বের বিলোপ সাধন। তাই শকা-বিচলিত বৈজ্ঞানিকগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—সাবধান,

পরমাণুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে বেও না। পৃথিবীতে এমন কোন অস্ত্র নেই বা' পরমাণুদের ছটুকরা করতে পারে। পরমাণু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অমর, বিশ্বসৌধের আদি ও অন্তিম ইষ্টকথণ্ডে এবং কারবারের জগতের ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি। জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ সসীমই বটে। ব্যবহারিক সত্যই সত্য। নিছক গাণিতিক সত্যকে ভিত্তি ক'রে বৈজ্ঞানিকের জগৎ রচিত হতে পারে না। কি বিচিত্র ও কি প্রকাণ্ড এই জড়জগৎ! কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে মাত্র শত রকমের শতটি পরমাণু। শত পরমাণুর ওপর সংখ্যা কলিরে এবং সজ-স্প, হা মূলক ওদের মিলন ব্যাপারে সমবার ও বিজ্ঞাসের (Combination এবং Permutation-এর) রকমারি ঘটাবার সুযোগ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই ডাক্টনের পরমাণু তার ভঙ্গপ্রবণতা প্রচার ক'রে বিজ্ঞান জগৎকে ভানিয়ে দিল যে, পরমাণু জড়বিশ্বের শেষ প্রস্তরখণ্ডও নয় এবং কারবারের জগতের ক্ষুদ্রতম মাপকাঠিও নয়। অতঃপর আমরা পরমাণুর ভাঙ্গনের কাহিনী বিবৃত করবো।

[ক্রমশঃ]



সাময়িক সমস্যা

মালোচনা

আমাদের নববর্ষ

বর্তমান আবার সংখ্যা হইতে বঙ্গী ষাট বৎসরে পদার্পণ করিল। দেশ ও জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল আমরা বঙ্গীকে সংসাহিত্যের যশমঞ্জুয়ায় সাজাইয়া বাংলা ও ভারতের অন্তরের প্রত্যন্ত নিবিড়ে পৌছাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহারা আমাদের শুভামুখ্যারী, যাহারা আমাদের এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল নামাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, আজ ষাট বৎসরের পথে চলিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁহারা আমাদের গর্বজনকভাবে সাহায্য করিয়া দেশ ও জাতির হিতসাধনই করিবেন।

দেশবাসী সর্বসাধারণকে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও প্রীতিমন্ডল জ্ঞাপন করি।

কাগজ সমস্যা

কাগজের অভাব বর্তমানে গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে বেসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনে, কিঞ্চিদধিক প্রায় দুই লক্ষ টন কাগজ পাওয়া যাইত। তন্মধ্যে ৫০ হাজার টনের অধিক কাগজ এক এই দেশেই প্রস্তুত হইত। যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু পূর্বের তুলনায় দেশের মিলগুলির উৎপাদন কিছু বাড়ি। এই বাড়তি-মুখে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ষাট ১ লক্ষ টন, যাহার সহিত বেসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজন বাদেও গভর্ণ-মেন্টের ও সামরিক কর্তাদের অত্যধিক চাহিদা আসিয়া পুষ্ট হইয়াছে ভীষণ ভাবে। ফল স্বরূপ ষাট ১ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে ৭০ হাজার টন কাগজ গ্রহণ করিতেহেঁম গভর্ণমেন্ট সিকে এবং বাকী

মাত্র ত্রিশ হাজার টন বেসামরিক জনসাধারণ পাইতেছেন। দুই লক্ষ টন কাগজের স্থলে ৩০ হাজার টন কাগজ লইয়া আজ দেশবাসী সর্বসাধারণকে যে কি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়া কাটাইতে হইতেছে, তাহা শুধু অমুমেয়ই নহে, প্রত্যেকেই প্রতিদিনের ভুক্তভোগী। এই ভাবে যখন দেশের শিক্ষা এবং অবশ্য-করণীয় কার্যগুলি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন আবার ভ্রমিতেছি, বর্তমান বৎসরে কাগজের উৎপাদন প্রায় ৩০ হাজার টন কমিয়া যাইবে। এখানে স্বভাবতঃই সংশয় হইতেছে, বেসামরিক জন-সাধারণের প্রয়োজনীয় ৩০ ভাগ কাগজও সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া না যায়। কারণ সরকারী পক্ষ তাঁহাদের (ইচ্ছানু-রূপ আইনতঃ প্রাপ্ত!) ৭০ ভাগের এক কড়াও ছাড়িবেম বলিয়া অন্ততঃ সুস্থ মনে ভাবা যায় না। ইতিপূর্বে জন-সাধারণের প্রয়োজনে উৎপাদিত কাগজের ৫০ ভাগ দিবার অমুমোদনের জন্য বারংবার গভর্ণমেন্টকে অমুখোশ জানান হইয়াছে। কিন্তু তাহা শুধু অরণ্যেই রোদন হইয়াছে; ফল হয় নাই।

দেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গভর্ণমেন্ট এখনও সুবিবেচকের পরিচয় দিউন, ইহাই আমাদের সম্মিলিত জাতির পক্ষ হইতে দাবী জানান হইতেছি। নতুবা খাণ্ড সামগ্রীর মতো কাগজের ক্ষেত্রেও আজ যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎফল অন্ধকারময়।

ইতালীর নতুন মন্ত্রিসভা

ইতালীয়া মন্ত্রিপক্ষের হেড্ কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষিত বিগত ৬ই জুনের রয়টারের বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, বাদোনিও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন, এবং ইতালীয়ান লেক্ টেন্যান্ট-জেনারেল যুবরাজ উবার্ডো তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া গত ৯ই জুন ইতালীর তৃত্বপূর্ব প্রধান

মন্ত্রী আইভাভুনা বোনোমিকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সঙ্গঠনে মন্ত্রিগণ রাজ্যভূগত্যের শপথ গ্রহণ না করিয়া দেশভূগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সিনর বোনোমি সতর্কবদ্ধ। তবে সর্বের সঠিকতা সতর্ক জালা না গেলেও বিগত ৯ই জুনের রোমের সংবাদে জানা যায়, নবতম মন্ত্রিসভা গঠনে দপ্তরহীন সাতজন মন্ত্রীই তালিকার শীর্ষস্থানে রহিয়াছেন। তন্মধ্যে আছেন কাউন্ট ফোর্জা, অধ্যাপক বেনেদেতো ফ্রোচে এবং কমুনিষ্ট নেতা সিনর পালমিরো ভোগলিয়াভি। কাউন্ট আলোসান্সো সমর ও বিমানসচিব এবং এডমিরাল দেকুতের্নই নৌগতিব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের প্রায় কোটি নরনারীকে ধ্বংস করিয়া যে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা দেখাইয়া গিয়াছে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দেও তাহার বিপুল দুর্ভিক্ষ যে এখনও বাংলার বর্তমান আছে, ইহা দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। এখনও বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে বাট টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিকাইতেছে। চট্টগ্রামের শোচনীয় অবস্থার কথা বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা করিতে দেওয়া হয় নাই। নোয়াখালী প্রভৃতি জিলায় যেখানে সবচেয়ে বেশী ধান জন্মে, সেখানে এখনই ২০।২২ টাকা চাউলের মণ। চাউল বহু স্থানে পাওয়া যায় না, সরকারও এই বিষয়ে যে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। শুধু চাউল কেন, সমগ্র বাংলাদেশে সকল জিনিষই পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। ডাল, সরিষার তেল, দুধ, স্নাত, তরিতরকারী, মৎস্য—আজ সবই দুর্মূল্যের চরম সীমায় উঠিয়াছে। শনি ও মঙ্গলের কোপে যেন দেশটা জলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া বাইতে বসিতেছে। বাংলা সরকার ইহার কি প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতে পারি কি? সমগ্র বাংলার দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। বুদ্ধু ও নিপিষ্ট বাংলার এই ক্ষণ-বিভীষকার গভর্ণমেন্টের সাম্রাজ্যবাদী-মন কি এখনও একবার ভীতিভয় হুলিয়া উঠিতেছে না?

কলোরা ও মহামারী

আমরা বাংলার মফস্বল অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতিদিনই খবর পাইতেছি, সর্বত্রই কলোরার প্রকোপ বাড়িয়া গিয়াছে; প্রায়ের পর গ্রাম ক্ষণে হইতে চলিয়াছে। এখনও স্থানে স্থানে কলোরার সঙ্গে বসন্তরোগেরও প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে; পূর্ববঙ্গে কুমিল্লা প্রভৃতি জিলায় ঐ সঙ্গে দুই-তিন রোগেও বহু লোক মারা গিয়াছে, এখনও রোগের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, এই সকল গ্রহ উপগ্রহের চাপে বাংলা যে ক্ষণে হইতেছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইহার কি প্রতিকার করিতেছেন, বাংলার প্রজাগণ তাহা জানিবার অধিকারী। বাংলার নিরাপত্তা ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা বিষয়ে গত দীর্ঘকাল যাবৎ বহু আলোচনা ও বাস্তবিত্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গভর্ণমেন্টের যুদ্ধ-জয় আমরা কামনা করি বটে, কিন্তু বাংলার স্বাস্থ্যসম্পদ ও আহাৰ্য্য হারাইয়া বাংলার পূর্ণ জীবন-সঞ্জীবন ভিন্ন সর্বত্রই অস্ত্র কোনো কামনা ও দাবীই আমাদের থাকিতে পারে না। গভর্ণমেন্ট এই বিষয়ে এখনও তৎপর হউন, ইহাই প্রার্থনা করি।

আসাম সীমান্ত

আসাম ও মণিপুর অঞ্চলে এখনও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। এখানেও জাপানীগণ অনবরত নূতন সৈন্ত আমদানী করিতেছে। উত্তর ব্রহ্মে জেনারেল ষ্টীলওয়ার্ডের সৈন্তগণ মোগাউং উপত্যকার পূর্বদিকে কুমোন পাহাড়ে যুদ্ধ করিতেছে। মন্দ-বুখিঙ অঞ্চলেও ইংরেজ পক্ষ মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাইতেছে; প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকানরা আক্রমণ চালাইতেছে।

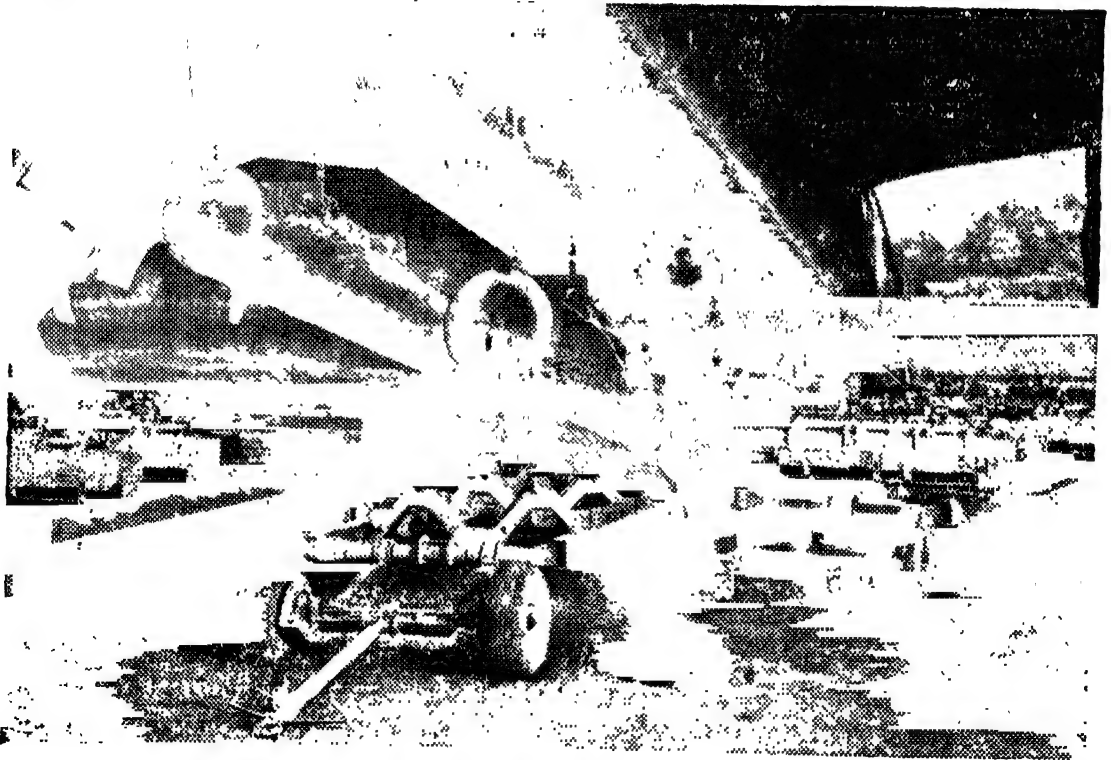
দ্বিতীয় যুগ্মজন

গত ৬ই জুন তারিখ বিশ্ববৃক্ষের ইতিহাসে মিত্র অস্ত্র-যানের অরণীয় দিন হিসাবে স্থান লাভ করিবে। ঐ দিন প্রাতে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে জেনারেল আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বাধীনে ব্রিটিশ ছত্রিবাহিনী এবং নৌবাহিনীর সাহায্যে বহু মার্কিন সৈন্ত অবতরণ করিয়া বহু প্রত্যাশিত

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে। মিত্রবাহিনী ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ১২ মাইলের অধিক অগ্রসর হইয়াছে এবং ৬০ মাইল বিস্তৃত সেতুমুখ স্থাপন করিয়াছে। শেরবুর উপদ্বীপ অকলে যুদ্ধের তীব্রতা খুবই প্রচণ্ড এবং শেরবুর বন্দরের পতন আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই স্থানের যুদ্ধের অবস্থা বর্তমানে মিত্রপক্ষের বিশেষ অগ্রকূল বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই বহু প্রত্যাশিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সূচনা দেখিয়া ভবিষ্যত ইয়োরোপের অবস্থা সম্পর্কে আমরা আশাবিত্ত হইয়াছি। ইয়োরোপকে চক্রশক্তির হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য অমরুপ আরও সীমান্ত খোলা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ইতালীয় সীমান্ত

ইতালীয় সীমান্তের যুদ্ধের গতি কয়েক সপ্তাহ বাবত মধুর গতিতে অগ্রসর হওয়ায় সাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা রোম নগর মিত্র-বাহিনীর হস্তগত হওয়ায় বিদূরিত হইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রোম নগরী যুদ্ধের তাণ্ডব লীলাস্থলী না হইয়া অকত অবস্থায় তাহার প্রসিদ্ধি বজায় রাখিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়া আমরা যুদ্ধরত জাতিগুলিকে তাহাদের ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। ইতালীর রণক্ষেত্রের সমর-গতি এখন হইতে দ্রুততর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।



শত্রু অকলে অভিযানের পূর্বে বিমান বহরে বিক্ষোভক বোমা সরিবেশ করা হইতেছে।

ম্যাক্সিম গোর্কি জুতো সেলাই থেকে আরম্ভ করে কৃষিকার একজন যুগনমস্ত লেখক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক হয়েছিলেন। তাই ব'লে কেউ যদি জুতো সেলাই করাকেই জীবনের 'ম্যাক্সিম' ব'লে গ্রহণ করে—আমরা হয় ত' তার উচ্ছৃঙ্খল প্রশংসা করতে পারব না। প্রাচীনগ্রন্থীয় বিদ্বানাগর মহাশয় অপূর্ব তেজস্বিতা দেখিয়ে লোভনীয় চাহুতীতে ইন্দ্রকানিতোৎকৃষ্ট হন নি। তাঁর জীবনের উহা এক শ্রমণীয় অধ্যায় হ'লেও আমাদের সাধারণের পক্ষে তার অনুসরণ করা যে অনেক কারণেই নিরাপদ নয়—সে কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে। মুক্তকণ্ঠে অজস্র নৈতিক (?) নিন্দা আমরা করতে পারি (কেন না, তা' স্থূলত ও নিরীহ পক্ষ), কিন্তু তার সেট সমুদ্রপ্রদর্শিত তেজস্বিতার দাম সেদিন থেকেই বাচাই করতে হবে আর হ'তে হাতাস্তরে নাতিগন্তীয় গর্জনের কাছে—অন্ততঃ এ-যুগে এর বাতক্রম নিবল ঘটনা বললেও অত্যাধিক হয় না। দৃষ্টান্ত মহৎ হ'লেও তার অনুসরণ করে মহৎ হওয়ার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নয়।

যেমন জলের রং বদলার—জলের পাত্রের সঙ্গে, তেমনি নীতিও পরিবর্তিত হয় স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে। এমন কোন অক্ষয় নীতি আজও বোধ হয় জন্মায় নি, যা' সময়ের সময়সীমা অথবা কালের কটিপাথরে বাচাই করেও যার খাদ ধরা পড়ে নি।

সবল দুর্জলের উপর অত্যাচার করে, এ শুধু ব্যবহারিক সত্যই নয়, সবল ইচ্ছা দুর্জল ইচ্ছাকেও পিষে মাঝে। জন্মান্তর আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি দেখতে পার—নির্দিষ্ট ছক-আঁকা বহু পদচিহ্নে বিবর্ণ ধূসর সড়ক—জীবন আমাদের কাছে সেই একটানা পাকা রাস্তা আর তার নির্ভয় অভিযান ছাড়া আর কিছুই নয়। দিগন্তবিসারী সোনার ফসল ক্ষেতের পাশ ঘেঁসে-বাওয়া মেঠো পথ সে নয়, দু'ধারে যার নামতীন ফুল ফোটে আর ক'রে যায় নিঃশব্দে। এ-যেন যাস্ফান্টেমের তপ্ত রাস্তা—নীতির ভারী রোলার এর বুক পিষে দেয়—সফলতার ট্র্যাফিক গর্জন বহু ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ বেশ ডুবিয়ে। গাণ্ডেভের স্বপ্ন হিসাব যেন তেমন নির্ভয়—কোথাও এক চুল ফাঁক থাকবার ঘো নেই। কিন্তু গাণ্ডেভের হিসাব দিয়ে আর বাই হোক, জীবনের হিসাব মিলাতে পার না। মনে হয়, ভুলকে ভুল ব'লে চেনবার গোড়াতাই কোথায় যেন আমাদের মস্ত একটা ভুল র'য়ে গেছে।

আমাদের দেশে বহু ভাগের দৃষ্টান্ত, বহু পরার্থপরতার উদাহরণ আছে—মহানুভব প্রাণ বিসর্জনের সে কি অকুণ্ঠ

উদারতা! কিন্তু এই সত্য প্রশংসার ঘোলাটে পর্দা সরিয়ে আমরা ত' দেখতে পাই যে, বেশী তাঁরা দিয়ে শুধু বান নি, ফিরিয়েও পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী।

জগতের সব চেয়ে বড় ভাগীকে সে জন্ত বেশী ভোগী বললে আর বাই হোক মিথ্যা বলা হবে না। ভাগ্য হয় ত' আসলে ভোগেরই প্রণামী অথবা তার রাজ-সিংহাসন। রাজর্ষি জনক শুধু ভাগীই নন, মস্ত বড় ভোগীও বটেন—খ্রীষ্টচৈতন্যদেবের প্রধান ভক্ত ছিলেন এমন একজন, যার আরাধনা-প্রণালী আধুনিক নব্য সমাজও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে।

আটপোড়ে জীবনেও ত' আমরা দেখতে পাই যে, নীতির খাঁখাঁ আমাদিগকে কত হরহরান করে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ করেছে। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সংসারে যে-জন নিজেকে বঞ্চিত করে পরের বাহবা কুড়িয়েছে, প্রকারান্তরে সংসারকে অস্থায়ীভাবে সেই-ই ঠিকার বেশী। সে আত্মভাগী নয়, আত্মপ্রতারক অথবা নিরোধ। উদাহরণ-স্বরূপ এমন একটা বিশেষ লোকের কথা আজ বলব সংসারের প্রতি যার দরদেয় অভাব নেই, এবং পরিজনদের প্রতি ভালবাসা তার সত্যিই অকৃত্রিম ও নিরেট। সংসারের অবস্থা তার স্বচ্ছল ছিল না। দেখা গেল, সংসারের অরসংস্থান করতে গিয়ে নিজের যে সময়মত এবং দরকারমত স্বানাহার প্রয়োজন, তা সে ভুলে গেছে—পরিজনের সুখ-স্বাস্থ্যকোষ জন্তে নিজের স্বাস্থ্য স্বস্তি বিসর্জন দিতে সে ক্রটি করে নি, কঠোর ও অনিয়মিত পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য গিয়েছে ভেঙে, হস্তমশক্তি হয়েছে দুর্বল, রক্ত গেছে কমে—ডাক্তার তাকে আজকাল-কার সেরা টনিক ভাইনো-মল্ট খেতে বলেছেন, কিন্তু এ সামান্য অর্থ ব্যয় পর্যন্ত সে অনাবশ্যক অপব্যয়ের সাহিল মনে করে—এত স্বপ্ন তার হিসাব-জান—এত গভীর তার সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধ! বাঙ্গালীর ঘরে এমন ব্যক্তির উজ্জল তথ্যও সম্বন্ধে কারও সম্বন্ধ থাকে না। আশা করি, তার উজ্জলতর তথ্যভাণ্ডার সাড়বর উপসংহার সম্বন্ধে আপনাদের এখনও সংশয় জাগে নি। কিন্তু ক্রমশঃ সহিত বলতে হচ্ছে, এই আত্মবিশ্বস্তি অথবা আত্মপ্রবন্ধনার ফলে তার স্বাস্থ্য গেল চিরতরে ভেঙে, মন গেল অস্থির হ'য়ে আর সেই ছিন্নপথে জীবনের মারাত্মক শত্রু এসে দিল হানা। যে-সংসারের জন্ত নিজেকে সে একদিন নিষ্ঠুরভাবে বকনা করে-ছিল, তাকে সে করল বঞ্চিত এবং জীবনের পরিসমাপ্তি হ'ল এসে এক করুণ ট্রাজেডিতে, যার পুনরাবৃত্তি বাঙ্গালীর জীবনে অনিবার্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকান লিমিটেড

[১৯০৮ সালে বরোদার সংগঠিত]

সভাগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের
গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	২,৪০,০০,০০০\	টাকা
বিজ্ঞানার্থ এবং বিজ্ঞাত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০\	"
ভাগিদে দেওয়া মূলধন	...	১,০০,০০,০০০\	"
আদানীকৃত মূলধন (২২-২-৪৪)	...	৯৯,৭৭,৪০০\	"
মজুদ তহবিল	...	১,০০,০০,০০০\	"

—হেড অফিস—

ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা

—কলিকাতা শাখা—

১১, ক্লাইভ

কলিকাতার স্থানীয় কমিটি

শেঠ বৈজনাথ জালান (মেসার্স সুরমল নাগরমল)।

ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম. এ., বি. এল., পি. এইচ. ডি.,

(মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোং)।

শেঠ সুরমল মোটা, (ছোট এণ্ড গানি-ব্রোকার্স লিঃ)।

মিঃ কে. এম. নাসেরক, ডি. ডি. এ., আর. এ.

(ম্যানেজার, হাশহাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ. জি. গ্রাউণ্ডওয়ারটার,
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এস. এইচ. জোখাকার,
এ্যাক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

মেট্রোপলিটনের ক্রমোন্নতির পরিচয়-

নুতন কাজের পরিমাণ

১ম বৎসর ১৯৩১	প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা
৭ম বৎসর ১৯৩৮	৭৫ লক্ষ টাকার উপর
১৩শ বৎসর ১৯৪৩	১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার উপর

দানী প্রদানের পরিমাণ

১ম বৎসর পর্য্যন্ত	২ হাজার টাকা
৭ম " "	২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার উপর
১৩শ " "	১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার উপর

দি মেট্রোপলিটন
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড
কলিকাতা

—ব্রাঞ্চ এবং সাব-অফিসসমূহ—

হাওড়া, ঢাকা, চাঁদপুর, শিলং, পাটনা, লক্ষ্ণৌ,
লাহোর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ।
অর্গেনাইজিং কেন্দ্র—ভারতের সর্বত্র

দি
বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কমার্শিয়াল এণ্ড আর্টিষ্টিক প্রিন্টারস্,
ষ্টেশনার্স এণ্ড একাউন্টবুক মেকার্স

প্রোগ্র. এ. সি. মৈত্র এণ্ড সন্স,
কন্ট্রাক্টর এণ্ড কমিশন এজেন্টস্,

১২ নং ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল ২১২৮

বাংলা র বঙ্গ-সমস্যা র সঙ্কটে

তাঁতের ও মিলের কাপড়ের জুগ

দি
ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী লিমিটেডকে

অরণে রাখিবেন

ফোন
বি. বি. ৩৩১২

পরিচালক
বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গাগারের কর্তৃপক্ষ

(বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গাগার আদায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে)

কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ও শাড়ী

আগেকার দিনের মতই টেকসই
ও সস্তা

কোন মিলের পকেই আজ আর যথেষ্ট
বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
মিটাইতে পারিতেছি না।



প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বস্ত্র কিনিবেন না, যাহা আছে
তাহা দিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে
সেলাই করিয়া পকুন। এই দুর্দিনে
তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।



যদি নিত্যান্ত প্রয়োজন হয়
আমাদের অনুরণ করিবেন।

বঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান —

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদেৰ
শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্
লাইনে শিলং যাইবার থু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-
সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে
এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থু টিকেট্ শিলং অফিসে
পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস্

১১, ক্লাইভ স্ট্রীট্, কলিকাতা

যুদ্ধের দিনেও

“বঙ্গলক্ষ্মী”র আয়ুর্বেদীয় ঔষধসমূহ

পূর্বামুরূপ বিশ্বক উপাদানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ

কবিরাজমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।

যুদ্ধের অজুহাতে ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এ কারণ, “বঙ্গলক্ষ্মী”র ঔষধ সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্য।

অল্পমূল্যে বিশ্বক ঔষধ পাইতে হইলে

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মেট্রোপলিটান হস্পিওরেন্স কোং

“বঙ্গলক্ষ্মী”রই কিনিবেন।

প্রভৃতির পরিচালক কর্তৃক প্রাপ্তিও

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্বেদ ওয়ার্কস

অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধপ্রস্তুতকারক

প্রধান কার্যালয়—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। কারখানা—বরাহনগর।

শাখা—৮৪নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, বাগেরচাট, বরিশাল, যশোহর, মাদারীপুর ও ধানবাদ।

বঙ্গলক্ষ্মী সোণ ওয়ার্কস্



হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাখা—দু'রকমের সাবানের জুগুই

“বঙ্গলক্ষ্মী” প্রশস্ত।

INDIAN FABRICS—House of Graceful Sarees

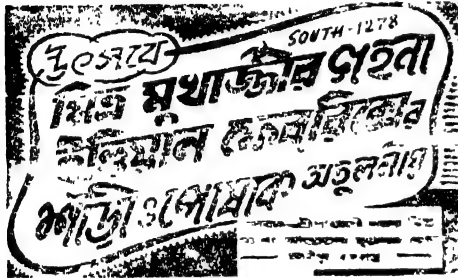
35, Asutosh Mukherji Road, Bhowanipur.

Phone, South—1278

প্রিয়জনকে উপহার দিতে

‘ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্স’-এর

আধুনিক ডিজাইনের সিল্ক ও সূতীর যাবতীয়



ঢাকাই, টাঙ্গাইল, বাঙ্গালোর, মাদুরা,

বোম্বে-ছাপ ও ক্রেপ শাড়ী,

শান্তিপুর ও করাসডাকার

ধুতি ও শাড়ী ইত্যাদি

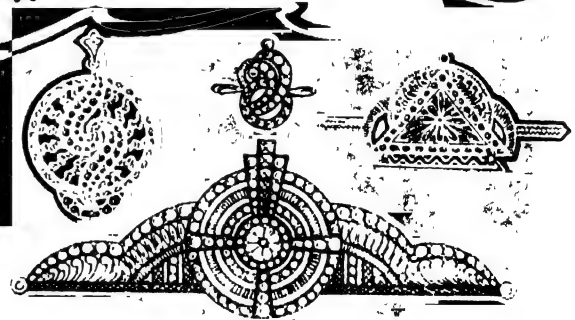
সস্তার পাউন্ডে

সকলের সহায়ত্ব ও পরীক্ষা প্রার্থনীর

পূর্বস্বত্বক্রমে আপনাদের সেবার নিয়োগিত—শ্রী পার্শ্বতীন্দ্রকর মিত্র



FOR Graceful
ORNAMENTS INSIST ON



MIRZA MOOKHERJEE & CO.

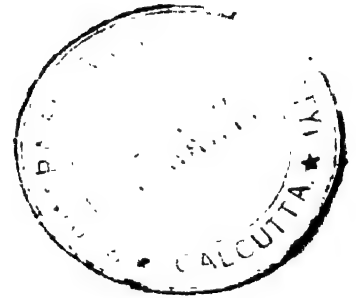
• RENOWNED SINCE 1884 •

BANKERS and JEWELLERS

35, ASHUTOSH MUKERJEE ROAD, CALCUTTA

SOUTH 1278 • GRAM. METALITE

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট,
শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা
আসিবার থ্রু টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের
১১নং ক্লাইড রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা
রিটার্ন টিকেটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ
রসিদের পরিবর্তে পাণ্ডুতে টিকেট পাওয়া যায়।
এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।



দি কমার্শিয়াল কারিয়ার কোং

(আ সা অ) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস

১১, ক্লাইড রো, কলিকাতা

—আমরা নাম মাত্র প্রচার—

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে

এবং

শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন

স্থানে সর্বদা পৌছাইয়া দিয়া থাকি।



দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(বেঙ্গল) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের খেলাধুল চাই-ই...



শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ
ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খেলা
মাঠে ব্যায়াম, বিস্তৃত হাওয়া ও হৃদয়ের
আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য
সম্পদ। সেট সঙ্গে ভাল আহাৰ্য্যও চাই।
পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও
কমল করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও
বাড়ায়।

বি-ই প্রেট খাদ্য

বি-ই
স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে



Manufactured By **THE LILY BISCUIT CO** CALCUTTA.



স্মরণীয়
আয়ুর্বেদীয় কেশটেল

“কল্যাণী”

জুয়েল অন্ ইণ্ডিয়া



নৃত্যকুশলা ছায়া-
চিত্রশিল্পী শ্রী মতী
সাধনা বসুর অনিন্দ্য-
ভঙ্গির অভিনয় ও
নৃত্য পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে তাঁহার
অঙ্গের নিখুঁত স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে ;
এবং আমাদের গর্ব
এই যে, প্রতি বার্তা
নিয়মিত ওটীন ক্রীম
ব্যবহারের ফলেই
তাঁহার নিখুঁত স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ এখনও
অগ্নান আছে ।

OATINE CREAM is indispensable for
my toilet. I have been using it for a
long time, and find it delightful,
and extremely necessary to preserve
a perfect skin.

Sashona Bose



Oatine

CREAM

SNOW

or nightly
massage
for daily
protection



এম বি সরকার সন

সন এও প্রাও সন অ ব ল ট বি. সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রীতা

১২৪ ১২৪-১৩ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

দি
বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কমার্শিয়াল এণ্ড আর্টিষ্টিক প্রিন্টারস্,
ষ্টেশনার্স এণ্ড একাউন্টবুক মেকার্স

প্রোঃ এ. সি. মৈত্র এণ্ড সন্স,
কন্ট্রাক্টর এণ্ড কমিশন এজেন্টস্,

১২ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল ২১২৮

THE NEW INDIAN GLASS WORKS (Calcutta) LTD.

Factory :—2, Church Road, Dum Dum Cantonment
and
101/1, Ultadanga Main Road.

OFFICE :—7, Rawdon Street, Calcutta.

Manufacturers of all kinds of BOTTLES both narrow and
wide-mouth, stoppered and screw-caps

NEUTRAL GLASS A SPECIALITY

ADRENALINE and VACCINE FILES and TUBES
are manufactured from absolutely neutral glass.

For Particulars Apply to the Head Office of the Company.

বঙ্গ-বিজ্ঞানী যুতি ও শাড়ী

আগেকার দিনের মতই টেকসই
ও সস্তা।

কিন্তু কোন মিলের পক্ষেই আজ আর যথেষ্ট
বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
মিটাইতে পারিতেছি না।

প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বস্ত্র কিনিবেন না, যাহা আছে
তাহা দিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে
সেলাই করিয়া পুনন। এই দুইদিনে
তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।

যদি নিত্যান্ত প্রয়োজন হক
আমাদের অনুরণ করিবেন।

— বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান —

বঙ্গ-বিজ্ঞানী কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা



সংশ্লিষ্ট
সংস্করণ



বঙ্গ-বিভাগী-সংবাদ

ফ্রান্স রস্ এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা



শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী
শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী

সূচী-পত্র

প্রাবণ-১৩৫১

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
‘শ্রীদুর্গাপূজা’র প্রয়োজনীয়তা	শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	২৪৩	কণিকা (কবিতা)	শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	১৩২
ইতিহাসের ইঙ্গিত (প্রবন্ধ)	শ্রীমন্নথনাথ সাত্তাল	১১৯	ললিত-কলা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী	১৩৩
অগস্ত্য (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১২১	মর্ম্ম ও কর্ম্ম (উপন্যাস)	ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩৫
দিনের প্রহরে নাই প্রাণের প্রহরী (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১২১	নব পরিচয় (কবিতা)	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল	১৩৭
আলোছায়া (গল্প)	শ্রীরমেন মৈত্র	১২২	বাংলার নদ-নদী (প্রবন্ধ)	বৈ-না-ভ	১৩৮
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠা (উপন্যাস)	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৫	তোমারই (উপন্যাস)	শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়	১৩৯
প্রাস্তর (কবিতা)	শ্রীমনীন্দ্র গুপ্ত	১২৮	গান (কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	১৪২
আকবরের রাষ্ট্র সাধনা (প্রবন্ধ) এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ, (কেন্টাব) বার-এ্যাট-ল		১২৯	সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা		১৪২
শিশু-সংসদ :			পরলোকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, বাংলায় দ্বিতীয় ছুভিক্ষের পূর্বাভাস, চীনের মুক্তি-সংগ্রাম, উড়ত- বোমা ।		
উদয়ন কথা	প্রিয়দর্শী	১৩০			

চিত্র-সূচী

ত্রিবার্ণ—

আয় চাঁদ আয়... শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বঙ্গোপাধ্যায়

প্রবন্ধান্তর্গত—

সাময়িক প্রসঙ্গ : আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৪২

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২, ব্রাহ্মবাজার রো, কলিকাতা

মূলধন			
অবিক্রীত	...	২৫,০০,০০০	লক্ষ টাকা
বিলকৃত	...	১২,৫০,০০০	লক্ষ টাকা
গ্রহীত	...	১২,৫০,০০০	লক্ষ টাকা
আদায়াকৃত	...	৬,৪০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক
কার্যকরী তহবিল	...	৭৫,০০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক

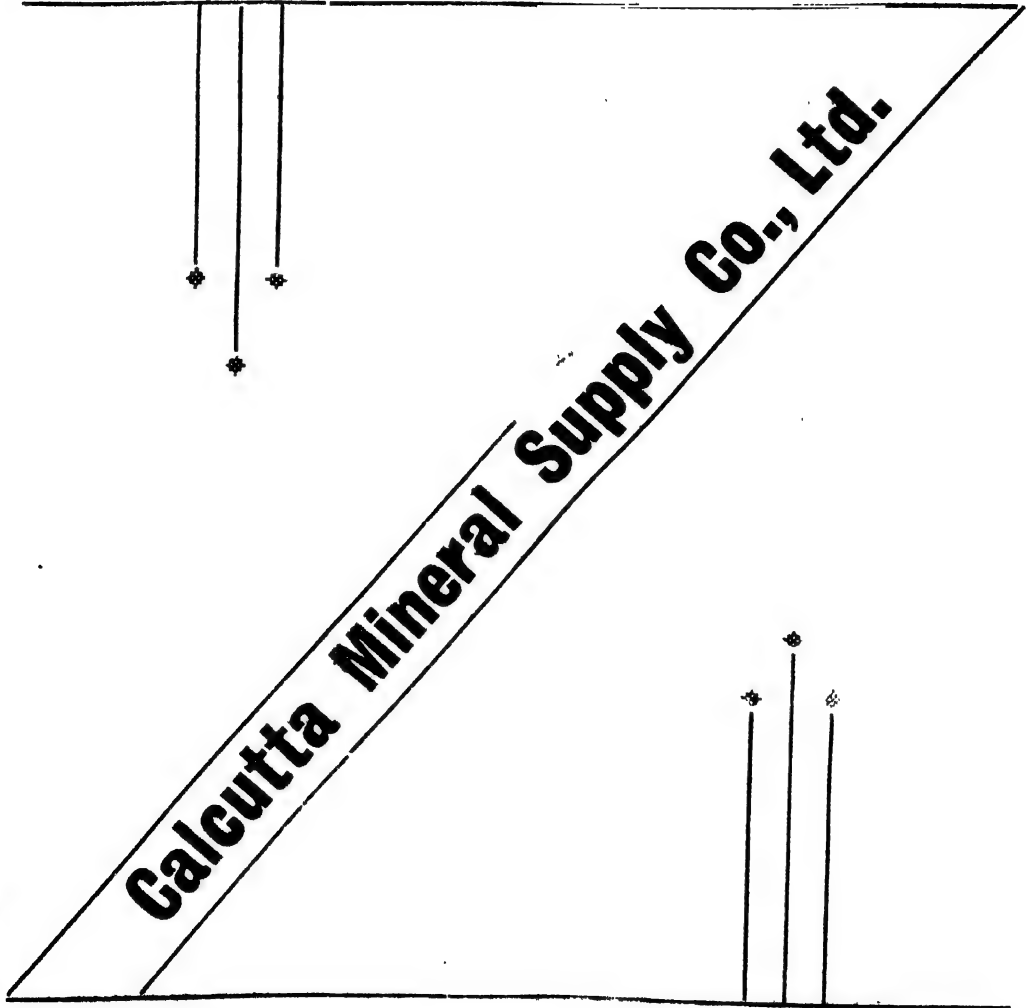
১৯৪৩ সালে বাষিক শতকরা

৩০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইয়াছে :

এ পর্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা

হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

Dealers in
INDIAN MINERAL
&
RAW MATERIALS FOR SOAP



**31, JACKSON LANE,
CALCUTTA.**

PHONE : B. B. 1397.

रफ्तार

1, 1907

Jagannath Pramanick

& BROS.

TAILORS

&

OUTFITTERS



DEALERS OF

GAUZE

&

BANDAGES

16, DHARAMTOLLA STREET,

CALCUTTA.

শিলং-সিলেট লাইনের টিকেটসমূহ আমাদের শিলং অফিস এবং সিলেট অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট লাইনে শিলং যাইবার থ্রু-টিকেট এ. বি. জোনের স্টেশনসমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট লাইনে এ. বি. জোনের স্টেশনসমূহের থ্রু-টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থ্রু-টিকেট শিয়ালদহ স্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা আসিবার থ্রু-টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের ১১, ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা রিটার্ন টিকিটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ রসিদের পরিবর্তে পাণ্ডুতে টিকেট পাওয়া যায়। এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ারিং কোং (আসাম) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

আমরা নাম মাত্র প্রস্তাব—

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে
এবং

শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন স্থানে
সর্বদা পৌছাইয়া দিয়া থাকি।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ারিং কোং
(বেঙ্গল) লিমিটেড
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

।দুর্গা-পূজা”র প্রয়োজনীয়তা।

(৬)

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

কার্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে

মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় ভাগ

জন-সভা সমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন-পদ্ধতি,

সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য-পদ্ধতির বিবরণ

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অস্থাপন বাহাতে যুগপৎ সাধিত হয় এবং চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভা বাহাতে বিধিবদ্ধ ভাবে যুগপৎ পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ আবার জনসভাসমূহ বাহাতে যুগপৎ রচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয়।

জন-সভাসমূহের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত জনসভা রচনা করা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সমস্ত জনসভা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর, যথা :

- (১) গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা ;
- (২) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা ;
- (৩) দেশস্থ জনসভা ;
- (৪) কেন্দ্রীয় জনসভা।

জন-সভাসমূহের প্রয়োজনীয়তা

জনসভা সমূহের প্রতিনিধি নির্বাচনে, সংগঠনে এবং কার্য পরিচালনায় যে যে পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় সেই সেই পদ্ধতির বিবরণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে জনসভা সমূহের রচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় কেন তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। জনসভা সমূহের রচনা করা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হয় কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার মূলসূত্র যে তিনটি তাহা পাঠকগণের স্মরণ করিতে হয়। এই তিনটি মূলসূত্রের কথা বঙ্গভীর জ্যোতিষ সংখ্যার ১৫২ পৃষ্ঠার বিবৃত করা হইয়াছে।

এ তিনটি মূলসূত্রের শেষ সূত্রোহুসারে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে সমগ্র মানব সমাজের

প্রত্যেক মানুষ ঐ প্রতিষ্ঠানকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন এবং স্বৈচ্ছায় ও সানন্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ সমূহ পালন করেন, সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, বাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অস্থাপন যুগপৎ স্বতঃই সাধিত হয় তাহা করিবার জন্য, সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভা, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা, দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভা, এবং কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা—এই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচিত হইলেই মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় এবং এই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ইহাও মনে হয় যে, জন-সভা সমূহের রচনা নিম্নপ্রয়োজনীয়।

বাহাতে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে তিন শ্রেণীর সামাজিক অস্থাপন যুগপৎ সাধিত হয়, তাহার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র চারি-শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার রচনা করিলে সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বটে কিন্তু কার্যতঃ উহা নাও হইতে পারে।

চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কোন শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কোন কর্মী বাহাতে কোন ক্রমে যথেষ্ট ব্যবহার না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে কার্যপরিচালনা-সভার কন্নিগণের যথেষ্টাচারী হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কার্যপরিচালনা-সভা-সমূহের কোন কর্মী বাহাতে যথেষ্ট ব্যবহার না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে কার্যপরিচালনা-সভার কন্নিগণের যেরূপ যথেষ্টাচারী হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ জন-সম্প্রদায়েরও যথেষ্টাচারী হইবার আশঙ্কা থাকে। ইহার কারণ মানুষের স্বভাবের নিয়মানুসারে শাসক সম্প্রদায় যথেষ্টাচারী হইলে শাসিত সম্প্রদায়ও যথেষ্টাচারী হইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের প্রত্যেক কর্মী যে পদ্ধতিতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন এবং যে পদ্ধতিতে কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের কন্নি-

গণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, তাহাতে কোন কর্মীর যথেষ্টাচারী হওয়া খুব সহজসাধ্য নহে। যথেষ্টাচারী হওয়া সহজসাধ্য নহে বটে কিন্তু অসাধ্য নহে। কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের নিয়তন কর্মীগণ যাহাতে যথেষ্টাচারী না হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে উপরিতন কর্মীগণের যতই লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় না কেন, ঐ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের উপর আংশিকভাবে দায়িত্বভার অর্পিত হইলে কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের যথেষ্টাচারিতা যত সুনিশ্চিতভাবে নিবারণিত হইতে পারে অল্প কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না। ইহার কারণ কার্য-পরিচালনা সভার কোন কর্মী কোনরূপে যথেষ্টাচারী হইলে জনসাধারণ উহার জন্ত যত সত্বর ও যত অধিক পরিমাণে ভুক্তভোগী হইয়া থাকেন অল্প কেহ তাহা হন না।

উপরোক্ত কারণে, যে কোন কার্য-পরিচালনা সভার যে কোন কর্মী সামান্ত মাত্রও যথেষ্টাচারী হইলে জনসাধারণের যে কেহ যাহাতে অবাধে ও অনায়াসে ঐ কর্মীকে বিচারের যোগ্য ও দণ্ডপ্রাপ্তির আশঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। প্রধানতঃ ঐ ব্যবস্থা করার জন্তই জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া জনসভাসমূহের রচনা করা মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। উপরোক্তভাবে জনসভাসমূহের রচনা না করিলে একদিকে যে রূপ কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের কর্মীগণের যথেষ্টাচারী হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়, সেইরূপ আবার কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের কার্যসমূহসম্বন্ধে জনসাধারণের কাহার কাহার ঔদাসীন্যের আশঙ্কাও থাকিয়া যায়।

যে কোন কার্য-পরিচালনা সভার যে কোন কর্মী সামান্ত-মাত্রও যথেষ্টাচারী হইলে জনসাধারণের যে কেহ যাহাতে অবাধে ও অনায়াসে ঐ কর্মীকে বিচারের যোগ্য ও দণ্ড-প্রাপ্তির আশঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা যেরূপ জনসভা-রচনার অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে রূপ আবার জনসাধারণের কেহ যাহাতে উত্তেজনা অথবা বিদ্বেষ বশতঃ কার্যপরিচালনা সভার কোন কর্মীকে অথবা অসম্মতভাবে বিপর্যয় করিতে না পারেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাও জনসভা-রচনার অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

জন-সভাসমূহ রচনা করিবার উদ্দেশ্য

প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত জন-সভাসমূহের রচনা করা হয়, যথা :

(১) সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা সভাকে সর্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ যাহাতে কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য

সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ দেশস্থ কার্যপরিচালনা সভাকে সর্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ উহার কোন কার্য সম্বন্ধে যাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা সভাকে সর্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ যাহাতে ঐ কার্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৪) প্রত্যেক সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রামের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা সভাকে সর্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং কোন মানুষ যাহাতে ঐ কার্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৫) কোন কার্য-পরিচালনা সভার কোন কর্মী অথবা কোন সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের কেহ যাহাতে কোন গ্রামে যথেষ্টাচারী না হইতে পারেন ও না হন এবং কর্মীগণের ও জনসাধারণের প্রত্যেকেই যাহাতে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা সভার নির্দ্ধারিত বিধি-নিষেধ পালন করেন তাহার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া জনসভাসমূহের রচনা করা হয় এবং ঐ জন-সভা-সমূহকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রত্যেক জন-সভার সংগঠনের মূল দায়িত্ব থাকে তিনশ্রেণীর, যথা :

(১) প্রত্যেক জনসভার অন্তর্গত জনসাধারণ যাহাতে ঐ জনসভার সংশ্লিষ্ট কার্য-পরিচালনা সভাকে সর্বতোভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) প্রত্যেক জনসভার অন্তর্গত জনসাধারণের কেহ যাহাতে ঐ জনসভার সংশ্লিষ্ট কার্য-পরিচালনা সভার কোন কার্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) প্রত্যেক জনসভার অন্তর্গত জনসাধারণের কেহ অথবা ঐ জনসভার সংশ্লিষ্ট কার্য-পরিচালনা সভার কেহ যাহাতে কোনরূপ যথেষ্টাচারী না হইতে পারেন এবং প্রত্যেকেই যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কেন্দ্রীয় কার্য-

পরিচালনা সভার প্রত্যেক বিধি ও প্রত্যেক নিষেধ পালন করেন তাহার ব্যবস্থা করা।

জনসাধারণ ছাড়া অপর কাহাকেও জন-সভার সভ্য না করিবার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র জন-সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষগণের প্রতিনিধি লইয়া জনসভাসমূহের রচনা করা হয় কেন এবং অন্য কোন শ্রেণীর মানুষকে কোন জন-সভার সভ্য হইতে দেওয়া হয় না কেন তৎসম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে কোন্ শ্রেণীর মানুষকে জনসাধারণ বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা সর্বপ্রথমে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্যের যে-সমস্ত চতুর্থ-শ্রেণীর কর্মী (অথবা শ্রমিক) থাকেন তাঁহাদিগকে “জন-সাধারণ” বলিয়া গণ্য করা হয়।

কেবলমাত্র সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণকে “জনসাধারণ” বলিয়া ধরা হয় কেন, আর কাহাকেও জন-সাধারণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না কেন, তাহা না বুঝিতে পারিলে চারি শ্রেণীর জনসভা রচনা করিয়া কি প্রণালীতে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করা হয়, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কেবলমাত্র সামাজিক কার্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণকে “জনসাধারণ” বলিয়া ধরা হয় কেন এবং অপর কাহাকেও জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না কেন তাহা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে কোন্ শ্রেণীর লোক বিद्यমান থাকেন অথবা থাকিতে পারেন—তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করার প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামেই প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর লোক বসবাস করেন, যথা :

- (১) সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ ও তরুণ-তরুণীগণ ;
- (২) সামাজিক কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ ও তরুণ-তরুণীগণ ;
- (৩) সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ ও তরুণ-তরুণীগণ ;
- (৪) সামাজিক কার্যের প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ ও তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ, ও তরুণ-তরুণীগণ।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মানুষবিহীন কোন সামাজিক গ্রাম কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে থাকিতে পারে না।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কোন

শ্রেণীর মানুষবিহীন কোন সামাজিক গ্রাম থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু কোন কোন সামাজিক গ্রামে ঐ চারি শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও থাকিতে পারে।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণ, তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণ তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামে দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মীগণ, তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

যে সামাজিক গ্রামে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভা অধিষ্ঠিত থাকে, সেই সামাজিক গ্রামে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কর্মীগণ, তাঁহাদিগের পোষ্য রমণীগণ, শিশুগণ, বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীগণও বসবাস করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক কার্যের চারি শ্রেণীর কর্মীর কোন শ্রেণীর কর্মী ছাড়া কোন সামাজিক গ্রাম সাধিত হয় না এবং সর্বসম্মত আট শ্রেণীর কর্মীর অতিরিক্ত কোন শ্রেণীর মানুষ কোন সামাজিক গ্রামে থাকিতে পারে না।

যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে বসবাস করেন, তাহাদিগের জীবিকার্জনের বৃত্তি অথবা জীবন বাপনের কর্ম প্রণালীর দিক দিয়া দেখিলে তাহারা চারি শ্রেণী হইতে আট শ্রেণীতে পর্যন্ত বিভক্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের গুণ ও শক্তির শ্রেণীর বিভাগের দিক দিয়া দেখিলে তাহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

এক শ্রেণীর মানুষ মানুষের মত স্বভাবযুক্ত হইয়া কেবল মাত্র নিজদিগকে এবং নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহারা নিজদিগকে এবং নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তি দ্বারা অপরকে অথবা অপরের সংসারভুক্ত মানুষকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিযুক্ত নহে। এই শ্রেণীর মানুষকে সংস্কৃত ভাষায় “শূদ্র” বলা হয়।

আর এক শ্রেণীর মানুষ মানুষের মত স্বভাবযুক্ত হইয়া যেমন নিজদিগকে এবং নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে

পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিব্যুক্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আবার অপরকে এবং অপরাপর সংসারভুক্ত মানুষগণকেও পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিব্যুক্ত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মানুষকে সংস্কৃত ভাষায় “আর্য্য” বলা হয়।

যে শ্রেণীর মানুষ কেবলমাত্র নিজদিগকে ও নিজ নিজ সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তি-ব্যুক্ত হইয়া থাকেন এবং অপরকে ও অপরাপর সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিবহীন হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গুণ ও শক্তিকে সাধারণ-মানুষের গুণ-শক্তি বলা হয়। এই শ্রেণীর মানুষ কেবলমাত্র সাধারণ-মানুষের গুণ ও শক্তিব্যুক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া ইহাদিগকে লৌকিক ভাষায় “জনসাধারণ” বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সংস্কৃত ভাষাসম্মত লৌকিক ভাষামুসারে যাহারা জন-সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য, তাহারা অপরকে ও অপরাপর সংসারভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিবহীন হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহারাও মানুষের মত স্বভাবযুক্ত (অর্থাৎ হিংস্র প্রবৃত্তি অথবা পরশ্রীকাতরতা প্রবৃত্তি অথবা নিজ গুণ ও শক্তি সঞ্চক্ষে অহঙ্কারের প্রবৃত্তি বিহীন) হইয়া থাকেন এবং নিজদিগকে ও নিজ নিজ সংসার-ভুক্ত মানুষগণকে পরিচালনা করিবার গুণ ও শক্তিব্যুক্ত হইয়া থাকেন। পশুশু নিবারণ করিয়া মনুষ্যস্ব সাধন করিবার অমুষ্ঠান সমূহ যখন মনুষ্য সমাজ হইতে বিলুপ্ত হয় তখন মনুষ্যাবয়বে এমন জীবও দেখা যায় যাহারা হিংস্র প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতার প্রবৃত্তি এবং নিজ স্রষ্টার কথা বিস্মৃত হইয়া নিজ গুণ ও শক্তি সঞ্চক্ষে অহঙ্কারের প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা মনুষ্য-বয়বযুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বভাবযুক্ত নহে।

ইহারা সংস্কৃত ভাষাসম্মত লৌকিক ভাষায় জনসাধারণ শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত নহে। সংস্কৃত ভাষাসম্মত লৌকিক ভাষায় ইহারা মনুষ্যাবয়বী পশু অথবা মনুষ্যাবয়বী স্নেহ অথবা মনুষ্যাবয়বী চণ্ডাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কোন শ্রেণীর গুণ ও শক্তিব্যুক্ত হইলে মানুষকে জনসাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যায়, তাহা ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যাহারা সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী কেবলমাত্র তাঁহারা জনসাধারণ শ্রেণীর অথবা শূদ্র-শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত; আর কোন শ্রেণীর কর্ম্মী জন-সাধারণ (অথবা শূদ্র) শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহারা এতদেকেই “আর্য্য” শ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের সর্ববিধ দুঃখ সর্বতোভাবে নিবারণ (অথবা দূর) করিবার অথবা সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে কেবলমাত্র জনসাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে লইয়া “জনসভা”সমূহের রচনা করা হয় কেন এবং আর্য্য

শ্রেণীর মানুষগণের কাহাকেও কোন জনসভার কোন সভ্যত্ব দেওয়া হয় না কেন তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনের যাহা যাহা প্রাথমিক লক্ষ্য, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারিটি, যথা :

- (১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করা ;
- (২) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করা ;
- (৩) মানুষের পশুশু নিবারণ করিয়া মনুষ্যস্ব সাধন করা ;
- (৪) সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের শূদ্রত্ব হইতে আর্য্যত্বে উন্নয়ন সাধন করা।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয় চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের হস্তে এবং ঐ চারি শ্রেণীর কার্যের ফলভোগী হন প্রাথমিক ভাবে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণ। চারি শ্রেণীর কার্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের দায়িত্বভার বধ্যবধভাবে নির্বাহ হইতেছে কি না তাহা তাহাদিগের প্রতি অথবা তাহাদিগের বিভিন্ন কার্যের প্রতি সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের মনোভাব কোন্ শ্রেণীর, তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। কার্য-পরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মীগণ সঞ্চক্ষে এবং তাহাদের কার্য সঞ্চক্ষে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের মনোভাব কোন শ্রেণীর তাহা না বুঝিতে পারিলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার অমুষ্ঠানসমূহ বধ্যবধভাবে সাধন করা হইতেছে অথবা বধ্যবধভাবে সাধন করা হইতেছে না, তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না।

কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মীগণের ব্যক্তিগত ব্যবহার সঞ্চক্ষে এবং তাহাদিগের কার্য সঞ্চক্ষে সামাজিক কার্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের মনোভাব কোন শ্রেণীর, প্রধানতঃ তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের প্রতিনিধি লইয়া জনসভা-সমূহের রচনা করা হয়। কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কোন কর্ম্মীকে যে কোন জনসভার সভ্যত্ব দেওয়া হয় না তাহার উদ্দেশ্যও প্রধানতঃ কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্মীগণের ব্যক্তিগত ব্যবহার সঞ্চক্ষে ও তাহাদের কার্য সঞ্চক্ষে সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণের মনোভাব কোন শ্রেণীর তাহা পরীক্ষা করা।

সামাজিক কার্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীগণ ও কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণ মিলিত হইয়া কোন জনসভার

সভা হইলে উপরোক্ত মনোভাব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

জন-সভাসমূহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সঙ্কেত

কোন কোন শ্রেণীর সূত্রানুসারে কার্য্য করিয়া চারিশ্রেণীর জনসভা তাহাদিগের প্রত্যেকের তিনশ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন তৎসম্বন্ধে আমরা অতঃপর একে একে আলোচনা করিব।

কেন্দ্রীয় জনসভার তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য বাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্ত উহার রচনার পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অবলম্বন করা হয়। যথা :

- (১) কেন্দ্রীয় জনসভা বাহাতে কেবলমাত্র সামাজিক গ্রামের সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা রচিত হয় এবং বাহাতে অন্ত কোন শ্রেণীর কোন কর্ম্মীর কোন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় জনসভার সভা না হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হয় ;
- (২) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রতিনিধি বাহাতে কেন্দ্রীয় জনসভার সভা হইতে পারেন ও হন এবং কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর কোন প্রতিনিধি বাহাতে এই কেন্দ্রীয় জনসভার সভায় পাইতে বাধা প্রাপ্ত না হন তাহার ব্যবস্থা করা হয় ;
- (৩) কেন্দ্রীয় জনসভার সভাগণ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মগণের কাহারও কোন অসুবিধাকর অথবা অপ্রীতিকর অবস্থার কথা উল্লেখ করিলে কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা সভার কর্ম্মগণ বাহাতে এই অসুবিধাকর অথবা অপ্রীতিকর অবস্থা দূর করিবার জন্ত অথবা নিবারণ করিবার জন্ত অনতিবিলম্বে প্রযত্নশীল হন এবং বাহাতে এই সম্বন্ধে উপরোক্ত কোন কার্য্যে কোনরূপ অবহেলা না করিতে পারেন ও না করেন তাহা করিবার ব্যবস্থা করা হয় ;
- (৪) কেন্দ্রীয় জনসভার প্রত্যেক সভা বাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য পরিচালনা সভার প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে অবশ্যে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন এবং ঐ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বাহাতে প্রত্যেক কার্য্য পরিচালনা সভার প্রত্যেক কর্ম্মী দণ্ড প্রাপ্ত হন তাহা করিবার ব্যবস্থা করা হয় ;
- (৫) কেন্দ্রীয় জনসভার কোন সভা বাহাতে কোন শ্রেণীর কার্য্য পরিচালনাসভার কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুক্তিবিরুদ্ধ কোনরূপ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে না পারেন ও না করেন এবং কোনরূপ যুক্তি-বিরুদ্ধ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিলে বাহাতে অভিযোগকারী ঐ সভা দণ্ড প্রাপ্ত হন তাহা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের প্রত্যেক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রতিনিধি বাহাতে কেন্দ্রীয় জনসভার সভা হইতে পারেন ও হন কেবলমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণের প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় পরিচালনা সভাকে অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। তাহারপর আবার যদি অপর চারিটা ব্যবস্থা সাধিত হয় তাহা হইলে যে সমগ্র মনুষ্য সমাজের জনসাধারণের প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় পরিচালনা-সভাকে সর্ব্বতোভাবে নিঃসন্দেহ প্রতীক্সন বলিয়া মনে করিতে প্রলুব্ধ হন এবং উহার কোন কার্য্য সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন না তাহা নিঃসন্দেহভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

কেন্দ্রীয় জনসভার প্রত্যেক সভা বাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন এবং ঐ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বাহাতে প্রত্যেক কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রত্যেক কর্ম্মী দণ্ডপ্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে কোন কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন কর্ম্মীর কোনরূপে যথেষ্টাচারী হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা অনায়াসে নিঃসন্দেহভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় জনসভার কোন সভা বাহাতে কোন শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার কোন শ্রেণীর কর্ম্মীর বিরুদ্ধে অবশ্যভাবে কোনরূপ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিতে না পারেন ও না করেন এবং কোনরূপ অসঙ্গত অভিযোগ উপস্থিত করিলে বাহাতে অভিযোগকারী ঐ সভা দণ্ড প্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে জন-সাধারণের কাহারও যে কোনরূপ যথেষ্টাচারী হওয়া সম্ভব-যোগ্য হয় না তাহাও অনায়াসে নিঃসন্দেহভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় জনসভার তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য বাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্ত উহার রচনার যেরূপ পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ দেশস্থ জনসভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য বাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্ত উহাদের প্রত্যেকের রচনার উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অবলম্বন করা হয়।

জন-সভাসমূহের নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার পদ্ধতি

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সূত্র অনুসারে চারিশ্রেণীর জন-সভার সভা নির্বাচন পদ্ধতি, সংগঠন পদ্ধতি ও কার্য্যপরিচালনা পদ্ধতি কিরূপ ভাবে কার্য্যতঃ পরিচালিত হয় তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার, দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার তৃতীয়তঃ, দেশস্থ জনসভার এবং চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। ইহার কারণ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতি বুঝা যায় না, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতির সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে, দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতি বুঝা যায় না, এবং দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতির সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে, কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন পদ্ধতি বুঝা যায় না।

কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন করিতে হইলে প্রথমতঃ, গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্বাচন করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন করিতে হয়; তৃতীয়তঃ, দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্বাচন করিতে হয়; দেশস্থ জনসভাসমূহের সভ্য নির্বাচিত হইলে কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য-নির্বাচন, সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতির বিবরণ

সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রামস্থ জন-সভার
সভ্যনির্বাচন-পদ্ধতির বিবরণ

প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য পরিচালনা-সভার সংশ্লিষ্ট যে জন-সভার রচনা করা হয়, সেই জন-সভাকে “গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা” বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যে কয়টি সামাজিক গ্রাম এক একটি সামাজিক কার্য পরিচালনার গ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই কয়টি সামাজিক গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ-সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া “গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভা” রচিত হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের জনসাধারণ (অর্থাৎ সামাজিক কার্যের চতুর্শ্রেণীর কর্মীগণ) যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের আটত্রিশ জন প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়া এক একটি সামাজিক গ্রামের সমগ্র জন-সাধারণ-সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের জনসাধারণ যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর কোন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে দলাদলি থাকিলে সেই শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে কয়টি দল থাকে সেই কয়জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়; সেই শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে কয়টি দল থাকে সেই কয়জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ শ্রেণীর জনসাধারণের

সমগ্র সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন ইহা মনে করা চলে না। অন্তর্গত, যে শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে দলাদলি থাকে, সেই শ্রেণীর জনসাধারণের প্রত্যেক দল হইতে এক একটি করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলে, সেই শ্রেণীর জনসাধারণের সমগ্র সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে মনে করা চলে।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের জনসাধারণ যে আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন, সেই আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কোন শ্রেণীর মধ্যে যখন কোন দলাদলি থাকে না, তখন ঐ আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কেবলমাত্র আটত্রিশ জন প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়া থাকেন; এবং ঐ আটত্রিশ জন প্রতিনিধি ঐ সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের সমগ্র সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

কিন্তু যখন কোন সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের আটত্রিশ শ্রেণীর কোন এক অথবা একাধিক শ্রেণীর মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয়, তখন আর ঐ আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কেবলমাত্র আটত্রিশ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন না। দলাদলির সংখ্যানুসারে প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন সামাজিক গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা ‘আটত্রিশজন’ের অধিক নির্বাচিত হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হয় যে, সেই সামাজিক গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে রাগ-দ্বेष এবং হিংসা-কলহের প্রবৃত্তি বিজ্ঞমান আছে। তখনই জনসাধারণের হিংসা-কলহের ও রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তি দূর করিয়া ঐ গ্রামের সামাজিক কার্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মীগণের ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মীগণের অধিকতর প্রযত্নশীল হইতে হয়।

কোন গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কোন শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা দুই জনের অধিক হইলে সেই শ্রেণীর জনসাধারণের গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য করিবার অধিকার বিলুপ্ত হয়।

কোন গ্রামের আটত্রিশ শ্রেণীর জনসাধারণের কোন শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা একজনের অধিক হইলে সেই শ্রেণীর জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট সামাজিক কার্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ এবং এমন কি গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা সভার কর্মীগণ পর্যন্ত বিচারের যোগ্য ও দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকেন। এই বিচারে উপরোক্ত সামাজিক কার্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্মীগণ

এবং গ্রামস্থ সামাজিক ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভার কর্মসিগণ “পঞ্চম” (অর্থাৎ সমাজের ক্ষয়কারক) বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন এবং অপ্রিয় আহার-বিহার অথবা আংশিক আহার-বিহারে সমাজের স্তুণার যোগ্য হইয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন ।

কোন গ্রামের কোন একশ্রেণীর জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে বাহ্যতে কোনরূপ দলাদলির উদ্ভব না হয়, তদ্ব্যতীত কঠোর দণ্ডের বিধান থাকায় এবং সামাজিক কার্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্মসিগণের এবং কার্য-পরিচালনা সভাসমূহের কর্মসিগণের কঠোর দৃষ্টি থাকায় কার্যাতঃ কোন গ্রামের জন-সাধারণের মধ্যে সভ্যনির্বাচন লইয়া কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইতে পারে না এবং হয় না ।

সভ্য নির্বাচনের সময় উপস্থিত হইবার আগেই সামাজিক কার্য-পরিচালনাসভার নিয়োগ ও নির্বাচন বিভাগের পরিচালক সভ্য নির্বাচন বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব-কলহের আশঙ্কা আছে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । যদি দেখা যায় যে, কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দলাদলির আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে সভ্য নির্বাচনের নির্দ্ধারিত দিনের আগেই সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্তান্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসিগণের সহায়তায় গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনাসভার কর্মসিগণ ঐ দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দলাদলির সর্ববিধ কারণ দূর করিয়া দেন ।

উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের আট-ত্রিশশ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষ হইতে আটত্রিশ জন প্রতিনিধি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যরূপে নির্বাচিত হ’ন ।

এক একটা সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রামে যে কয়টা সামাজিক গ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, তত সংখ্যক আটত্রিশ জন সভ্য লইয়া একটা “গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভা” রচিত হয় ।

পাঠকগণকে স্মরণ করিতে হয় যে, প্রত্যেক সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রামে হয় দুইটি, নতুবা তিনটি, নতুবা চারিটি, নতুবা পাঁচটি পর্য্যন্ত সামাজিক গ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকে । গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভার সভ্যসংখ্যা ৭৬ জন অথবা ১১৪ জন অথবা ১৫২ জন অথবা ১৯০ জন হইয়া থাকে । অধিকাংশ স্থলেই চারিটা সামাজিক গ্রাম লইয়া এক একটা সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রাম গঠিত হইয়া থাকে । এই হিসাবে, অধিকাংশ স্থলেই গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভার সভ্য-সংখ্যা হয় ১৫২ জন ।

সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রামস্থ জনসভার সংগঠন-পদ্ধতির বিবরণ

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে সামাজিক কার্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মসিগণের পনেরটা শ্রেণীবিভাগমুসারে ধেরূপ

ধনাতাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের পনের শ্রেণীবিভাগকে ভিত্তি করিয়া গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণকে পনের শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভাসমূহের আলোচ্য বিষয় সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা :

- (১) জনসাধারণের ধনগত অবস্থা সঙ্ক্ষে ধনাতাব নিবারণ করিয়া ধন প্রাচুর্য্য সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক পনের শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের ফলাফল ;
- (২) জনসাধারণের কর্মশিক্ষা-বিষয়ক অবস্থা সঙ্ক্ষে অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের ফলাফল ;
- (৩) জনসাধারণের গভিগণের, শিশুগণের, বালক-বালিকা-গণের, তরুণ-তরুণীগণের এবং অবিবাহিত যুবক ও অবিবাহিতা যুবতীগণের অবস্থা সঙ্ক্ষে পশুস্ত নিবারণ করিয়া মনুষ্যস্ত সাধন করিবার গ্রামস্থ সামাজিক বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের ফলাফল ;
- (৪) জনসাধারণের প্রতি সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মসিগণের এবং অন্তান্ত কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্মসিগণের ব্যবহারের ফলাফল ।

উপরোক্ত পনের শ্রেণীর সভ্য, একজন সভাপতি, একজন সহকারী সভাপতি এবং তিনজন সভ্য-বিবরণ-লেখক লইয়া প্রত্যেক “গ্রামস্থ সামাজিক জন-সভা” গঠিত হইয়া থাকে ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া নিজ-দিগের মধ্য হইতে সভাপতির, সহকারী সভাপতির এবং সভ্য-বিবরণ-লেখকগণের নির্বাচন সাধন করিয়া থাকেন ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যনির্বাচন সাধারণতঃ প্রত্যেক তিন বৎসরে একবার করিয়া সাধিত হয় ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশন সাধারণতঃ প্রত্যেক তিন মাসে একবার করিয়া সাধিত হয় ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্বাচন, সভাপতি প্রভৃতি কর্মী নির্বাচন এবং অধিবেশন প্রভৃতি কার্যের দায়িত্বভার (অর্থাৎ ঐ সমস্ত কার্য যথাসময়ে ও যথানিয়মে সাধিত হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার দায়িত্বভার) গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা সভাসমূহের নিয়োগ ও নির্বাচনবিভাগের হস্তে হস্ত থাকে ।

সামাজিক কার্য-পরিচালনার গ্রামস্থ জন-সভার কার্য-পদ্ধতির বিবরণ

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যনির্বাচন সাধারণতঃ তিন বৎসরে একবার করিয়া সাধিত হইয়া থাকে । যদি

কোন কারণে—সভ্যগণের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহের অথবা দলাদলির প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে যে কোন একজন অথবা একাধিক জন সভ্যের আবেদনে এবং এমন কি জন-সাধারণের যে কোন একজনের আবেদনে যে কোন সময়ে সভ্যানির্বাচন-কার্য সাধিত হইতে পারে। যখনই কোন এক অথবা একাধিক গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্বাচন করা হয়, তখনই ঐ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় জনসভার এবং দেশস্থ ও কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য-গণের পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

যখন কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার কোন সভ্য অথবা কোন সামাজিক গ্রামের কোন শ্রেণীর জনসাধারণের কেহ সাধারণ-নিয়ম-বহির্ভূত কোন সময়ে কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্বাচনের জন্ত আবেদন করেন, তখন প্রথমতঃ ঐ আবেদন কোনরূপ উত্তেজনা অথবা ঘেষ-হিংসামূলক কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়। অনুসন্ধানে ঐ আবেদন যত্বে উত্তেজনা অথবা ঘেষ-হিংসামূলক বলিয়া সন্দেহ করিবার যোগ্য হয়—তাহা হইলে ঐ আবেদন-কারীকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয় এবং বিচারানুসারে প্রয়োজন হইলে—এমন কি কঠোরতম দণ্ডভোগ করিতে হয়।

যদি অনুসন্ধানে অথবা বিচারে দেখা যায় যে, ঐ আবেদন উত্তেজনা অথবা ঘেষ-হিংসামূলক নহে—পরন্তু যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত, তাহা হইলে প্রথমতঃ সামাজিক কার্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কক্ষিগণ এবং সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কক্ষিগণ মিলিত হইয়া আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করিবার জন্ত এবং ঐ আবেদনকারীকে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্ত প্রযত্নশীল হইয়া থাকেন। যত্বে আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করা সম্ভব না হয়, অথবা আবেদনকারী প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সভ্যগণের পুনঃ নির্বাচন সাধন করিতে হয়।

এতাদৃশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কক্ষিগণ ও সামাজিক কার্যের আধিগণ স্ব স্ব দায়িত্ব নির্বাহে অবহেলার অথবা অক্ষমতার দোষে দৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন এবং বিচারের ও দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকেন। উপরোক্ত দুইভার জন্ত তাঁহারা সমাজের ক্ষয়কারী (অথবা পক্ষম) বলিয়া গণ্য হইয়া পঞ্চমের কার্যের দণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার নিয়মবিরুদ্ধ সময়ে সভ্য নির্বাচন ক্ষেত্রে উপরোক্ত কঠোরতম বিচার ও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা থাকায় কোন নিয়মবিরুদ্ধ সময়ে সভ্যানির্বাচনের কার্যতঃ কোন প্রয়োজন হয় না এবং কার্যতঃ প্রতি তিন বৎসরে এক বার করিয়া সভ্যানির্বাচন-কার্য সাধিত হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যানির্বাচন সাধারণ নিয়মানুসারে যদিও প্রতি তিন বৎসরে একবার করিয়া সাধন করিতে হয়, তথাপি যেমন জনসাধারণের অথবা সভ্যগণের কোন একজনের আবেদনে উহা যখন তখন সংঘটিত হইতে পারে, সেইরূপ ঐ জনসভার অধিবেশন—বাহা সাধারণ নিয়মানুসারে প্রতি তিন মাসে একবার করিয়া হইবার কথা, তথাপি উহা যে কোন একজন অথবা একাধিকজন সভ্যের আবেদনে যখন তখন সংঘটিত হইতে পারে।

জনসভার অধিবেশনের নিয়ম জনসভার সভ্যানির্বাচনের নিয়মের অনুরূপ।

যখন কোন সভ্য নিয়মবহির্ভূত কোন সময়ে কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশনের জন্ত আবেদন করেন, তখন প্রথমতঃ ঐ আবেদন কোনরূপ উত্তেজনা অথবা ঘেষ-হিংসামূলক কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়। অনুসন্ধানে ঐ আবেদন যত্বে উত্তেজনা অথবা ঘেষ-হিংসামূলক বলিয়া সন্দেহ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদনকারীকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয় এবং বিচারানুসারে প্রয়োজন হইলে এমন কি কঠোরতম দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যদি অনুসন্ধানে অথবা বিচারে দেখা যায় যে ঐ আবেদন উত্তেজনা অথবা ঘেষ-হিংসামূলক নহে, পরন্তু যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত তাহা হইলে প্রথমতঃ সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষিগণ এবং সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কক্ষিগণ মিলিত হইয়া আবেদনকারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করিবার জন্ত এবং ঐ আবেদনকারীকে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্ত প্রযত্নশীল হইয়া থাকেন। যত্বে আবেদন-কারীর অভিযোগের কারণসমূহ দূর করা সম্ভব না হয় অথবা আবেদনকারী প্রতিনিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আবেদন-কারীর আবেদনানুসারে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধি-বেশন সাধিত করিতে হয়।

আবেদনকারীর আবেদনানুসারে যখন-তখন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার অধিবেশন সাধিত করিতে হইলে ইহা বুলিতে হয় যে, কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কক্ষিগণ ও সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষিগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দায়িত্ব নির্বাহে অবহেলা অথবা অক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তখন ঐ কক্ষিগণের মধ্যে বাহারা ঐ অবহেলা অথবা অক্ষমতার জন্ত সাক্ষ্য অথবা গোণভাবে দায়ী বলিয়া স্থির করা হয়, তাঁহাদিগের অপরাধের বিচার করা হয়, বিচারে এমন কি কঠোরতম দণ্ড পর্য্যন্ত প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

উপরোক্ত ভাবে কঠোরতম দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষিগণ এবং

কার্যপরিচালনা-সভাসমূহের কর্তৃগণ মিলিত হইয়া এত স্ফূর্তভাবে তাঁহাদিগের দায়িত্বভার নির্বাহ করিয়া থাকেন যে, জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের ও ঘেঁষ-টিংসার প্রভৃতি সর্বতোভাবে নির্বাপিত হইয়া যায় এবং কখনও কোন সামাজিক জনসভার কোন অধিবেশন কোন নিরমবিকৃত সময়ে কার্যভূতঃ সম্বিত করিবার প্রয়োজন হয় না।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সভাবিষয়-লেখক প্রভৃতি কর্মী নির্বাচনের তার সাধারণতঃ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণের হস্তে প্রাপ্ত থাকে। কিন্তু তাঁহারা ঐ নির্বাচন ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধন করিতে সক্ষম না হইলে, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার সভাপতি (অর্থাৎ প্রধান পরিচালক) উহা সাধন করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণ ঐ নির্বাচন ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধন করিতে না পারিলে সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্তৃগণ এবং সামাজিক কার্য-পরিচালনা সভার কর্তৃগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দায়িত্ব নির্বাহে অবহেলার অথবা অক্ষমতার দোষে ছুট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্তৃগণের এবং সামাজিক কার্য-পরিচালনার কর্তৃগণের মধ্যে যাহারা উপরোক্ত অবহেলার ও অক্ষমতার দোষে ছুট বলিয়া সন্নিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ ভাবে বিচার করা হয় এবং তাঁহাদিগকে বিচারালয়ে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে।

এতাদৃশ বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা থাকার গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভাপতি প্রভৃতি কর্তৃগণের নির্বাচনকার্য ঐ জনসভার সভ্যগণ সর্বতোভাবে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সাধন করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণ জনসভার অধিবেশনে যে চারি শ্রেণীর আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক আলোচনা শৃঙ্খলিত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথমতঃ, সামাজিক গ্রামে জীবিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সমস্ত অসুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহার কোন অসুষ্ঠান সন্থকে অথবা কোন অসুষ্ঠানসাধনের কোন প্রণালী সন্থকে কোন প্রমিতের কোন অভিযোগ আছে কি না তাহার আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্তৃগণের এবং সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্তৃগণ সামাজিক গ্রামের উপরোক্ত অসুষ্ঠানসমূহ পরিচালিত করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কাহারও কোনও ব্যবহার সন্থকে কোন প্রমিতের কোন অভিযোগ আছে কি না তাহার আলোচনা করা হয়।

যদিও গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কোন কর্মীকে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার কোন সভ্যদের স্থান

দেওয়া হয় না, তথাপি সামাজিক জনসভার প্রত্যেক অধি-বেশনে সামাজিক কার্যপরিচালনা সভার কর্তৃগণের উপস্থিত থাকিতে হয় এবং জনসভার সভ্যদের উপরোক্ত অভিযোগ-সমূহ মনোযোগের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

জনসভার সভ্যগণের উপরোক্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে কোন কোন অভিযোগ যুক্তিসূক্ত ও সঙ্গত, তাহা সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার বিচারবিভাগের বিচার করিতে হয়। ঐ সমস্ত অভিযোগের যে যে অভিযোগ যুক্তিসূক্ত ও সঙ্গত বলিয়া উপরোক্ত বিচারবিভাগ সিদ্ধান্ত করেন, সেই সমস্ত অভিযোগের প্রত্যেকটির কারণ ব্যাধিতে অনতিবিলম্বে দূর করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার পরিচালকবর্গের দায়িত্বসমূহের অন্ততম দায়িত্ব।

উপরোক্ত অভিযোগসমূহের কোন অভিযোগের কোন কারণ পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে দূরীভূত না হইলে সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্তৃগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দায়িত্ব নির্বাহে অবহেলার ও অক্ষমতার দোষে ছুট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই ছুটতার জন্য তাঁহাদিগের বিচার করা হয় এবং বিচারালয়ে তাহাদিগের দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামস্থ জনসভার সঙ্গত অভিযোগের কারণসমূহ অনতি-বিলম্বে দূরীভূত না হইলে বৈরূপ গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্তৃগণের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্তৃগণের বিচার করা হইয়া থাকে ও বিচারালয়ে তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রামস্থ জনসভা কোন অসুষ্ঠান সন্থকে অথবা উহার সাধনপ্রণালী সন্থকে কোন সঙ্গত অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেই উপরোক্ত সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্তৃগণ এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কর্তৃগণ স্ব স্ব দায়িত্ব নির্বাহে অবহেলা ও অক্ষমতার দোষে ছুট বলিয়া সন্নিহিত হইয়া থাকেন। দায়িত্ব নির্বাহে অবহেলার অথবা অক্ষমতার দোষে ছুট বলিয়া সন্নিহিত হইলেই ঐ কর্তৃগণের বিচার করিবার ও বিচারালয়ে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সামাজিক কার্যের প্রথম অথবা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর কোন কর্মীর অথবা সামাজিক কার্যপরিচালনা-সভার কোন কর্মীর কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক জনসভার কোন অধিবেশনে ঐ জনসভার কোন সভ্য কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলে ঐ অভিযোগ কোন উত্তেজনা অথবা হিংসা-ঘেঁষপ্রসূত কি না তৎসন্থকে সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করা হয়। ঐ অভিযোগ কোন উত্তেজনা অথবা হিংসা-ঘেঁষ-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে অভিযোগকারীর বিচার করা হয় এবং বিচারালয়ে অভিযোগকারীকে দণ্ড দেওয়া হয়। ঐ অভিযোগ কোন উত্তেজনা অথবা হিংসা-ঘেঁষ-প্রসূত বলিয়া

সম্মেহ করিবার কারণ না থাকিলে যে যে কর্ম্মীর ব্যবহাৰের বিরুদ্ধে গ্রামস্থ জনসভার সভ্যবৃন্দের কেহ অভিযোগ উপস্থিত করেন সেই সেই কর্ম্মীর বিচার করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এমন কি কর্ম্মীগণকে ক্ষয়কারী পক্ষের দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

উপরোক্ত অমুসন্ধান, বিচার এবং দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় গ্রামস্থ সামাজিক কার্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীগণের প্রত্যেকের এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের প্রত্যেকে একদিকে যেরূপ জনসাধারণের প্রতি প্রত্যেক বিষয়ক ব্যবহাৰে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন, সেটরূপ আবার জনসাধারণের সম্মুখে যে তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত সামাজিক ক্ষুদ্রাঙ্গনসমূহ সাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে কিনা—তদ্বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ স্বত্বকেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সতর্কতার ফলে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার কোন সভা কোন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ কার্য্যতঃ উত্থাপিত করিবার কোন সুযোগ লাভ করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জন-সভার সভ্য নির্বাচন, সংগঠন ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জন-সভার সভ্যনির্বাচন-পদ্ধতির বিবরণ

প্রত্যেক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার সংশ্লিষ্ট যে জনসভার রচনা করা হয়—সেই জনসভাকে “গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা” বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যে কয়টি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রাম এক একটি রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা-গ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই কয়টি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামের জনসভার সমগ্র সভ্যসংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা রচিত হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালক গ্রামের জনসভায় যে পনের শ্রেণীর সভ্য থাকেন, সেই পনের শ্রেণীর সভ্যের পনেরটি প্রতিনিধি প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের জনসভায় সেই সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের জনসভার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

যে কয়টি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রাম এক একটি রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-গ্রামের অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই কয়টি “গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা” এক একটি গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে কয়টি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা এক একটি “গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার” অন্তর্ভুক্ত

থাকে, সেই কয়গুল পনের জন সাধারণতঃ এক একটি গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য হইয়া থাকেন।

এক একটি গ্রামস্থ সামাজিক জনসভায় যে পনের শ্রেণীর সভ্য থাকেন, সেই পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি থাকিলে ঐ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার প্রতিনিধির সংখ্যা পনেরটির অধিক হয়। কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলে, ঐ দলাদলির কারণ স্বত্বকে কঠোর অমুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করা হয়—এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মীগণের মধ্যে অথবা গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সভ্যগণের মধ্যে যাহারা কোনক্রমে অপরাধী বলিয়া সম্মেহের পাত্র হয়, তাহাদিগের বিচার করিবার ও কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, প্রয়োজন হইলে গ্রামস্থ জনসভায় সেই গ্রামস্থ জনসভার প্রতিনিধিত্ব পর্য্যন্ত স্থগিত করা হয়। এতাদৃশ কঠোর ব্যবস্থার ফলে কোন গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার পনের শ্রেণীর সভ্যের কোন শ্রেণীর সভ্যের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি কার্য্যতঃ অসম্ভব হয় এবং প্রত্যেক গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা হইতে আঠার জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যত্ব করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যমণ্ডলীকে ঐ রাষ্ট্রীয় গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র সামাজিক গ্রামসংখ্যার সমগ্র জনসাধারণ-সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ইহার কারণ প্রত্যেক সামাজিক জনসভা তদন্তগত সমগ্র সামাজিক গ্রামসংখ্যার সমগ্র জনসাধারণ সংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া রচিত হয়, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনসভা উপরোক্ত সমগ্র প্রতিনিধিসংখ্যার প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া রচিত হয়।

জনসভার সভ্য নির্বাচন করিবার মূলমন্ত্র মূলতঃ সামাজিক জনসভার সভ্য নির্বাচন করিবার মূলমন্ত্রের অনুরূপ।

রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জন-সভার সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ

“রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ জনসভার” সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতি মূলতঃ গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার সংগঠন পদ্ধতি ও কার্য্য-পদ্ধতির অনুরূপ হইয়া থাকে।

দেশস্থ জন সভার সভ্য নির্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন- পদ্ধতি ও কার্য-পদ্ধতির বিবরণ

দেশস্থ জন-সভার সভ্য নির্বাচনপদ্ধতি

প্রত্যেক দেশস্থ কার্যপরিচালনা-সভার সংশ্লেষে যে জন-সভার রচনা করা হয় সেই জনসভাকে “দেশস্থ জনসভা” নামে অভিহিত করা হয়।

যে কয়টি রাষ্ট্রীয় গ্রাম লইয়া এক একটি দেশ গঠিত হয়, সেই কয়টি রাষ্ট্রীয় জনসভার প্রতিনিধি লইয়া এক একটি “দেশস্থ জনসভা” গঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন। ঐ পনের শ্রেণীর সভ্যের পনেরটি প্রতিনিধি সাধারণতঃ দেশস্থ জনসভার প্রত্যেক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সমগ্র সভ্যসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত হিসাবে যে কয়টি রাষ্ট্রীয় গ্রাম এক একটি দেশের অন্তর্ভুক্ত, সেই কয়গুলি পনের জন সভ্য লইয়া এক একটি দেশস্থ জনসভা গঠিত হয়।

দেশস্থ জনসভার সভ্য নির্বাচনের-সংগঠনের ও কার্যের পদ্ধতির মূলসূত্র প্রধানতঃ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্য-নির্বাচন-সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতির মূলসূত্রের অনুরূপ।

কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্য নির্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য-পদ্ধতির বিবরণ

কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার সংশ্লেষে যে জনসভার রচনা করা হয় সেই জনসভাকে “কেন্দ্রীয় জনসভা” নামে অভিহিত করা হয়।

যে কয়টি দেশ লইয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্রস্থ সাধিত হয়, সেই কয়টি দেশস্থ জনসভার প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় জনসভা গঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেশস্থ জনসভার সভ্যগণ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন। ঐ পনের শ্রেণীর সভ্যগণের পনেরটি প্রতিনিধি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় জনসভার প্রত্যেক দেশস্থ জনসভার সমগ্র সভ্য-সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হিসাবে যে কয়টি দেশ লইয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্রস্থ, সেই কয়গুলি পনের জন সভ্য লইয়া কেন্দ্রীয় জনসভা রচিত হয়।

কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যনির্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য-পদ্ধতির মূলসূত্র প্রধানতঃ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার সভ্যনির্বাচন-পদ্ধতি, সংগঠন-পদ্ধতি ও কার্য-পদ্ধতির মূলসূত্রের অনুরূপ।

গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার, দেশস্থ জনসভার এবং কেন্দ্রীয় জনসভার সভ্যনির্বাচন-সংগঠন ও কার্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে সাধিত হইলে প্রত্যেক

জনসভার রচনা করিবার যে তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে সেই তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া যে স্থানান্তিত হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের স্থান নির্ধারণ করিবার নীতিসূত্র

চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ

যে চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের স্থান নির্ধারণ করিবার নীতিসূত্রের প্রয়োজন হয়, সেই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের নাম :

- (১) “কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভা” ও “কেন্দ্রীয় জনসভা”। এই দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—“কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান”।
- (২) “দেশস্থ কার্য-পরিচালনা-সভা” ও “দেশস্থ জনসভা”। দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—“দেশস্থ প্রতিষ্ঠান”।
- (৩) “গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা-সভা” ও “গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা”। দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—“গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান”।
- (৪) “গ্রামস্থ সামাজিক কার্য-পরিচালনা-সভা” ও “গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা”। দুইয়ের মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম—“গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান”।

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যালয়ের স্থান নির্ধারণ করিবার সাধারণ সূত্রের পূর্বাংশ

এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষেত্র মূলতঃ কতিপয় সামাজিক গ্রাম। যে সমস্ত সামাজিক গ্রাম লইয়া উপরোক্ত চারি শ্রেণীর এক এক শ্রেণীর এক একটি প্রতিষ্ঠান রচিত হয়, সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামের মধ্যে যে সামাজিক গ্রামটি সর্বাপেক্ষা কেন্দ্রীয়, সেই সামাজিক গ্রামে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থাপিত হয়। যে সামাজিক গ্রাম হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের স্থান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সমস্ত সামাজিক গ্রামের সমতাসমূহ মোটামুটিভাবে সমান রকমে নিঃসন্দেহরূপে বিচার করা স্থানান্তিত হয়, সেই সামাজিক গ্রামকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধরা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় হইতে তদন্তভূক্ত প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সমস্ত সামাজিক গ্রামের সমতাসমূহ বিচার করা সম্ভব-বোধ্য এবং অনায়াসসাধ্য না হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বিধি-নিষেধ এবং তদন্তভূক্ত কোন গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কোন বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করা কার্য-পরিচালনা-সভাসমূহের কর্মগণের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। সমস্ত সামাজিক গ্রামের সাধারণ ভাবে কি কি বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের

বিশেষ বিশেষ ভাবে কি কি বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত তাহা অজ্ঞাতভাবে নির্দ্ধারিত না হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার প্রধান সূত্র—প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গ্রামসমূহের মধ্যে যে সামাজিক গ্রাম কেন্দ্রস্থানীয় সেই সামাজিক গ্রাম নির্দ্ধারণ করা এবং ঐ সামাজিক গ্রামে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থাপন করা।

ইহা ছাড়া, যে সামাজিক গ্রামে কোন কার্য-পরিচালনা-সভার অথবা কোন জন-সভার কার্যালয় স্থাপিত হয় সেই সামাজিক গ্রাম বাহাতে কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর অথবা অত্যধিক শীতলতা ও অত্যধিক উষ্ণতা বশতঃ অধিবাসিগণের অপ্রীতিকর না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়। আধুনিক কালে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন ভাগের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যেরূপ বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যে-সামাজিক গ্রামে কোন কার্য-পরিচালনা-সভার অথবা কোন জন-সভার কার্যালয় স্থাপিত হয় সেই সামাজিক গ্রাম বাহাতে অস্বাস্থ্যকর অথবা কোনরূপ অপ্রীতিকর না হয় তাহা করা অবস্থাবিশেষে খুবই কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। উহা মনে হইতে পারে বটে কিন্তু মানুষের সর্ববিধ দ্বন্দ্ব সর্বতোভাবে দূর করিবার সংগঠনে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের শাস্তি ও শৃঙ্খলা এবং স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সর্বতোভাবে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এমন ব্যবস্থা করা হয় যে প্রত্যেক সামাজিক গ্রামই আদর্শতাবের শাস্তি ও শৃঙ্খলার এবং স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হইয়া থাকে।

আধুনিক ভূমণ্ডলের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ ও কোন কোন অংশ এত শীতল যে ঐ উষ্ণতা ও শীতলতা অনেক মানুষেরই অপ্রীতিকর হয় এবং অনেকেরই ঐ উষ্ণতার ও শীতলতার তীব্রতা সহ্য করিতে পারেন না। উহা লক্ষ্য করিলে ইহা মনে হইতে পারে যে, যে-সামাজিক গ্রাম কোন শ্রেণীর কার্য-পরিচালনা-সভার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গ্রাম-সমূহের কেন্দ্রস্থানীয়, সেই সামাজিক গ্রামকে সর্বাবস্থায় ইচ্ছামত উষ্ণতা ও শীতলতার তীব্রতাবিহীন করা সম্ভব-যোগ্য নাও হইতে পারে। জল-হাওয়ার আধুনিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে উহা মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে জল, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা নিবারণ করিবার জন্ত এবং সমতা রক্ষা করিবার জন্ত এমন ব্যবস্থা করা হয় যে, ভূমণ্ডলের কোন অংশেই উষ্ণতা অথবা শীতলতা অসহ্য রকমের তীব্র হইতে পারে না এবং হয় না। ভূমণ্ডলের কোন অংশেই উষ্ণতা অথবা শীতলতা বাহাতে অসহ্যকর অথবা অপ্রীতিকর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই

সংঘটিত হয় প্রাকৃতিক কোন কোন কার্য-নিয়মে তাহা বিধনভাবে ও নিঃসন্ধিভাবে জানা অপরিহার্য্য রকমে প্রয়োজনীয় হয়। প্রাকৃতিক যে যে কার্যনিয়মে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয়, সেই সেই কার্য-নিয়মের বিবরণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (অর্থাৎ বেদের) একটি অংশ। আধুনিক কালে মনুষ্য-সমাজ ঐ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথা প্রায়শঃ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া এখন আর ভূ-মণ্ডলের কোন অংশের উষ্ণতা অথবা শীতলতা প্রয়োজনানুরূপ ভাবে নিবারণ করা সম্ভব হয় না।

প্রাকৃতিক কোন কোন কার্য নিয়মে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয় তাহার কথা আধুনিক-কালের মানব-সমাজ প্রায়শঃ বিস্মৃত হইয়াছেন বটে কিন্তু মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী এবং বিবিধ শ্রেণীর কশ্মিগণের শিক্ষায় যে দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান পাঠ করান হয় সেই দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানে ঐ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। তখন প্রাকৃতিক কোন কোন কার্যনিয়মে উষ্ণতার অথবা শীতলতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় তাহা যেমন মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই জানা থাকে, সেইরূপ আবার ঐ উষ্ণতার ও শীতলতার তীব্রতা কিরূপে নিবারণ করিতে হয় তাহার সঙ্কেতও মানব-সমাজের প্রায়শঃ জানা থাকে। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই পরিপূর্ণতার ফলে সমগ্র ভূমণ্ডলের কোন সামাজিক গ্রামেই উষ্ণতার অথবা শীতলতার তীব্রতা ঘটতে পারে না।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় যে সামাজিক গ্রামে স্থাপিত করা হয়, সেই সামাজিক গ্রামে বাহাতে কোন সময়েই উষ্ণতার অথবা শীতলতার তীব্রতা না ঘটতে পারে তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য করিতে হয় সেইরূপ আবার ঐ সামাজিক গ্রাম বাহাতে প্রতিষ্ঠানান্তর্গত সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থানীয় হয় তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় নির্দ্ধারণ কার্যে ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র-ভাগ, পৃথিবী-ভাগ এবং আকাশ-ভাগ স্বতঃই কোন কোন প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্তিত হয়, তাহা বিদিত হইবার অপরিহার্য্য আবশ্যকতা।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় সমগ্র ভূমণ্ডলের সম সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিতে হয়। সমগ্র ভূমণ্ডল যে সমস্ত সামাজিক গ্রামে বিস্তৃত হইতে পারে, কোন সামাজিক গ্রাম সেই সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থল তাহা নির্দ্ধারণ করা আপাতদৃষ্টিতে খুবই কষ্টসাধ্য। কোি একটি স্থানের সমগ্র আরতনের কোন অংশ সেই সমগ্র আরতনের কেন্দ্রস্থানীয় তাহা বর্তমান বিজ্ঞানানুগা

নির্ধারণ করিবার প্রধান উপায় ঐ স্থানের সমগ্র আয়তনের জরিপ করিয়া তাহার মান-চিত্র (অথবা নকশা) প্রণীত করা এবং ভূমিতির সাহায্যে কেন্দ্রস্থান নির্ধারণ করা। কোন্ সামাজিক গ্রাম সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত সামাজিক গ্রামের কেন্দ্রস্থানীয় তাহা বর্তমান বিজ্ঞানের জরিপ-কার্যের দ্বারা নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য নহে। ইহার কারণ, সমগ্র ভূমণ্ডলের আয়তন (area) ও মানচিত্র (map) সর্বদাই অস্বাভাবিক ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। স্থলভাগের যে অংশ আজ জলে নিমজ্জিত, কয়েক বৎসর পরে তাহা স্থলভাগে পরিণত হইতে পারে। আবার স্থলভাগের যে অংশ আজ লোকালয়ে পরিপূর্ণ কয়েক বৎসর পরে তাহা জলে নিমজ্জিত হইতে পারে।

কোন্ সামাজিক গ্রাম সমগ্র ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় তাহা নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করিতে হইলে ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র-ভাগ, পৃথিবীভাগ (অর্থাৎ স্থলভাগ) এবং আকাশভাগ স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে তাহা সর্বত্র বিদিত হইতে হয়। ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং আকাশভাগ স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্তিত হয় তাহা বিদিত হইতে পারিলে, মহাসমুদ্রভাগের, পৃথিবীভাগের, আকাশভাগের এবং সমগ্র ভূমণ্ডলের পূর্ণ ও স্থায়ী আয়তন (area) কতখানি এবং উহাদের প্রত্যেকটির পূর্ণরূপ কোন্ কোন্ শ্রেণীর তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভবযোগ্য হয় এবং তখন সমগ্র ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোন্ সামাজিক গ্রাম তাহাও নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করা যায়।

ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র-ভাগ, পৃথিবী-ভাগ এবং আকাশ-ভাগ স্বতঃই যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্তিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণ

ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং আকাশভাগ স্বতঃই যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্তিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (অর্থাৎ বেদের) অন্ততম অংশ। বেদ ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় রচিত আর যে-সমস্ত বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার কোনখানিতে উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিবাসযোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং আকাশভাগ স্বতঃই যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্তিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কথা আমরা আমাদের এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণের সুবিধার জন্ত এই সমস্ত আলোচনার প্রধান কথাসমূহের পুনরুল্লেখ করিব।

এই ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের (অথবা স্থলভাগের বা

Natural Solids-এর) উৎপত্তি হয় উহার মহাসমুদ্রভাগের (অথবা তরল ভাগের বা Natural liquids-এর) উৎপত্তি হইবার পর। মহাসমুদ্রভাগ এবং পৃথিবীভাগের উৎপত্তি হইবার পর অচর উদ্ভিদ শ্রেণীর পদার্থসমূহের উৎপত্তি হয়। মহাসমুদ্রভাগ, পৃথিবীভাগ এবং অচর উদ্ভিদ শ্রেণীর পদার্থসমূহের উৎপত্তি হইবার পর চরজীবসমূহের উৎপত্তি হয়। মহাসমুদ্রভাগের, পৃথিবীভাগের, অচর উদ্ভিদ শ্রেণীর পদার্থসমূহের এবং চরজীবসমূহের উৎপত্তি হইবার পর ভূমণ্ডলের আকাশভাগের উৎপত্তি হয়। ভূমণ্ডলের আকাশ বলিতে বুঝায় নীলাকাশের নিম্নবর্তী শুভ্রাকাশকে।

এই ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের অচর উদ্ভিদ শ্রেণীর, চরজীবের এবং আকাশের স্বতঃই উৎপত্তি হওয়ার সাক্ষ্য কারণ মহাসমুদ্রের উৎপত্তি। মহাসমুদ্রের (অথবা তরল ভাগের) উৎপত্তি না হইলে পৃথিবীর (অর্থাৎ স্থল অবস্থার) অচর পদার্থাবস্থার, চরজীব অবস্থার এবং আকাশ অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে না। অন্তর্দিকে মহাসমুদ্রের অথবা তরল অবস্থার উৎপত্তি হইলে স্থল অবস্থা প্রভৃতি আর চারিটা অবস্থার স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সর্বতোভাবে সম্ভবযোগ্য হয়।

উপরোক্ত কারণে, কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে এই ভূমণ্ডলের মহাসমুদ্র, পৃথিবী ও আকাশের স্বতঃই উৎপত্তি ও পরিবর্তন হয় তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে, তাহা সর্বত্র নির্ধারণ করিতে হয়।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলে পৃথিবীর (অর্থাৎ স্থলভাগের) উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে তাহা অসম্ভবভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে এই ভূমণ্ডলের অথবা এই পৃথিবীর প্রকৃত রূপ কি তাহাও অসম্ভবভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। অতীত এই পৃথিবীর প্রকৃত রূপ কি তাহা অসম্ভবভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে তাহা অসম্ভবভাবে নির্ধারণ করিবার পন্থা স্থির না করিয়া পৃথিবীর রূপ কমলালেবুর মত—ইহা সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্তস্থিতিও হইতে পারে এবং ভ্রান্তিভুক্তও হইতে পারে।

সমগ্র ভূমণ্ডলের অথবা এই পৃথিবীর সমগ্র রূপ নির্ধারণ করিতে পারিলে উহার কেন্দ্রস্থান কোন্ সামাজিক গ্রাম তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়—ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে

হইলে এই ভূমণ্ডলের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এবং ঐ কারণের কারণ (causes of all causes) সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য কথা কয়টি আমরা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিব।

সাক্ষাৎভাবে এই ভূমণ্ডলের উৎপত্তির ও পরিবর্তনের কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা (Variable or dynamic condition of the mixture of heat and moisture.) ইহার অপর নাম “ব্যোমীয়” (Etherial) অবস্থা।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার উৎপত্তি হয় এবং অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে বলিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ জলভাগ, স্থলভাগ, উদ্ভিদ শ্রেণীর, চরজীব শ্রেণীর এবং আকাশের উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব সম্ভবযোগ্য হয়। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার উৎপত্তি না হইলে এবং ঐ চলৎশীল অবস্থার অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলে এই ভূমণ্ডলের জলভাগ অথবা স্থলভাগ অথবা উদ্ভিদ শ্রেণীর অথবা চরজীব শ্রেণীর অথবা আকাশের উৎপত্তি অথবা অস্তিত্ব সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং হইত না।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা সাক্ষাৎভাবে এই ভূমণ্ডলের উৎপত্তির ও পরিবর্তনের কারণ বটে—কিন্তু সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা যে সম্ভবযোগ্য হয় তাহার কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য এবং অটল অবস্থা, (constant and static condition of mixture of heat and moisture)। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য এবং অটল অবস্থা এই ভূমণ্ডলের সর্ববিধ পদার্থের উৎপত্তির কারণের কারণ (causes of all causes)।

এই ভূ-মণ্ডলে বাহ্য কিছু স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং বাহ্য কিছু অস্তিত্ব স্বতঃই রক্ষিত হয় তাহার প্রত্যেকটির উৎপত্তি ও অস্তিত্বের সাক্ষাৎভাবে কারণ যে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা এবং ঐ চলৎশীল অবস্থার কারণ যে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য এবং অটল অবস্থা, তাহা এক্ষণে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের কেহই বিদিত নহেন। উহা এক্ষণে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের কেহই বিদিত নহেন বটে, কিন্তু ঐ কথা ছয় হাজার বৎসর আগে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের পরিণতবয়স্ক প্রায় প্রত্যেকেই বিদিত ছিলেন। ছয় হাজার বৎসর আগে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকেই যে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের উপরোক্ত কারণ ও কারণের

কারণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহভাবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতে পারে।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে একদিকে ধারণা এই ভূ-মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ ও কারণের কারণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার সাক্ষাৎভাবে এই ভূমণ্ডলের কারণ হইতে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইবার কারণ কি কি তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে হয়। আনুমানিক ভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎভাবে বাহ্য বাহ্য এই ভূ-মণ্ডলের কারণ হইতে পারে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইবার কারণ তাহাই। এই ভূ-মণ্ডলের বাহ্য কিছু উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটির উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ।

এই ভূ-মণ্ডলে বাহ্য কিছু উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটির পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুও স্বতঃই ঘটয়া থাকে। উহার প্রত্যেকটির পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে স্বতঃই ঘটয়া থাকে সাক্ষাৎভাবে তাহার কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রবাহের অবস্থা এবং উহার “বায়বীয়” অবস্থা। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রবাহের অবস্থার অপর নাম উহার “বায়বীয়” অবস্থা। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের “বায়বীয়” অবস্থাও উহার এক শ্রেণীর “চলৎশীল” অবস্থা। বায়বীয় অবস্থাও সর্বব্যাপী তেজ ও রসের এক শ্রেণীর চলৎশীল অবস্থা বটে, কিন্তু উহার যে চলৎশীল অবস্থা সাক্ষাৎভাবে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের কারণ, সেই “চলৎশীল অবস্থা” ও “বায়বীয় অবস্থা”র মধ্যে পার্থক্য আছে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের যে চলৎশীল অবস্থা এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের কারণ, সেই চলৎশীল অবস্থায় চলৎশীলতা (Dynamicity) বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু ঐ চলৎশীলতা কেবল মাত্র অবয়বের স্ব স্ব স্থানেই নিবদ্ধ থাকে। ঐ চলৎশীলতার অবয়বের কোন অংশ তাহার স্থান চ্যুত হইয়া অন্যস্থানে গমন করিতে পারে না। “বায়বীয়” অবস্থার অবয়বের প্রত্যেক অংশ স্থান-চ্যুত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার (variable condition) অথবা (Etherial condition) তেজ ও রসের সমতা বিদ্যমান থাকে। “বায়বীয়” অবস্থার তেজ ও রসের ঐ সমতা বিদ্যমান থাকে না। পরন্তু অসমতা বিদ্যমান থাকে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয়

অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে তেজাধিক্য বিদ্যমান থাকে। আর সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের “বাস্পীয় অবস্থা” তেজ ও রসের মিশ্রণে রসাধিক্য বিদ্যমান থাকে।

এইখানে লক্ষ্য করিতে হয় যে, সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য ও অটল অবস্থার যেরূপ তেজ ও রসের মিশ্রণে সমতা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ঐ মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থারও তেজ ও রসের মিশ্রণে সমতা থাকিতে পারে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থার ঐ মিশ্রণের চলৎশীলতা সত্ত্বেও উহারের সমতা বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থাকে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (অর্থাৎ variable or etherial) অবস্থা বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলে বাহ্য কিছুর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটীর পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুও যে স্বতঃই ঘটয়া থাকে সাক্ষাৎভাবে তাহার কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের “বায়বীয়” ও “বাস্পীয়” অবস্থা বটে কিন্তু ঐ পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণের কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা (constant condition) হইতে উহার চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার (Non-variable condition এর) উৎপত্তি।

এই ভূমণ্ডলে বাহ্য কিছুর উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই ঘটয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটীর পরিণতি, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ যেরূপ সাক্ষাৎভাবে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয় ও বাস্পীয় অবস্থা এবং ঐ কারণের কারণ যেরূপ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার উৎপত্তি, সেইরূপ সাক্ষাৎভাবে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হওয়ার কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয় ও বাস্পীয় অবস্থা এবং ঐ কারণের কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার উৎপত্তি।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য ও অটল অবস্থা (Constant and static condition) হইতে চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তির ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার (Non-variable condition এর) উৎপত্তি হয়। ঐ চলৎশীল অবস্থার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থা (Non-variable condition) হইতে চলৎশীল অবস্থার (Variable and Dynamic condition এর) উৎপত্তি হইয়া থাকে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থা (Variable and Dynamic condition) হইতে ক্রমে ক্রমে বায়বীয় ও বাস্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল, বায়বীয় ও

বাস্পীয় অবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ উহার তরল (অর্থাৎ মহাসমুদ্রাবস্থা) ও স্থূল অবস্থার (অর্থাৎ পৃথিবী অবস্থা) এবং ক্রমে ক্রমে অচর উদ্ভিদ শ্রেণীর ও চরজীব শ্রেণীর এবং ভূমণ্ডলের আকাশ-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলের অচর উদ্ভিদ শ্রেণীর ও চরজীব শ্রেণীর উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে স্বতঃই সংঘটিত হয়, সাক্ষাৎভাবে তাহার একমাত্র কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার (অর্থাৎ চলৎশীল, বায়বীয় ও বাস্পীয় অবস্থার) বিদ্যমানতা এবং উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার বিদ্যমানতার কারণ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের নিত্য অটল অবস্থার এবং চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার বিদ্যমানতা। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার উৎপত্তি হয় বলিয়াই উহার চলৎশীল, বায়বীয় ও বাস্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ ত্রিবিধ অবস্থার উৎপত্তি হয় বলিয়াই তরল (অর্থাৎ মহাসমুদ্র), স্থূল (অর্থাৎ পৃথিবী), উদ্ভিদ, চরজীব ও আকাশ-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদ শ্রেণীর ও চরজীব শ্রেণীর অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই ঘটয়া থাকে।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও পরিবর্তন স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা স্থির করিতে হইলে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল অবস্থা হইতে উহার চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ ঐশী নিয়মে এবং উহার চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষাবস্থা হইতে চলৎশীল, বায়বীয় ও বাস্পীয় অবস্থার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা নির্ধারণ করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল অবস্থাকে ঋষিগণের সংস্কৃত ভাষায় “ব্রহ্ম” বলিয়া অভিহিত করা হয়। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় “ব্রহ্ম-রূপ” এবং স্থানবিশেষে “মায়” নামে অভিহিত করা হয়।

যে সমস্ত কার্যাবশতঃ “ব্রহ্ম” হইতে “ব্রহ্ম-রূপের” অথবা “মায়ার” উৎপত্তি হয় এবং যে-সমস্ত কার্য-ব্রহ্মের বিদ্যমানতা ছাড়া আর কোন কারণের অথবা পদার্থের বিদ্যমানতা বশতঃ ঘটিতে পারে না, সংস্কৃত ভাষায় সেই সমস্ত কার্যের নিয়মের নাম ‘ঐশী-নিয়ম’। যে সমস্ত কার্য “ব্রহ্ম-রূপের” অথবা “মায়ার” বিদ্যমানতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষায় সেই সমস্ত কার্যের নিয়মের নাম ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’।

আমাদিগের বিচারানুসারে গত তিন হাজার বৎসর হইতে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার “ব্রহ্ম”, “ব্রহ্ম-রূপ” এবং “মায়ী” এই তিনটী শব্দের তাৎপর্য যথাযথভাবে বুঝিতে না পারিয়া মানবসমাজকে নানারকমভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত ঐশী নিয়ম ও প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ জানা থাকিলে একদিকে বৈরূপ মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ নিয়মে, তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় সেইরূপ আবার মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সংঘটিত হয় কোন্ কোন্ কারণে এবং কয় ও মৃত্যুই বা সংঘটিত হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়। কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই ঘটিয়া থাকে তাহা অপ্রাস্তভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের বৃদ্ধি হয় কোন্ কোন্ সঙ্কেতে এবং কয় হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহাও অপ্রাস্তভাবে নির্ধারণ করা সুনিশ্চিত হয়। মানুষের বৃদ্ধি অথবা উন্নতি হয় কোন্ কোন্ সঙ্কেতে এবং কয় হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা অপ্রাস্তভাবে নির্ধারণ করা সুনিশ্চিত হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিধিমূলক ও কোন্ কোন্ নিবেদনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহাও অপ্রাস্তভাবে নির্ধারণ করা সুনিশ্চিত হয়।

অত্য়দিকে কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই সংঘটিত হয়, তাহা অপ্রাস্তভাবে জানা না থাকিলে মানুষের বৃদ্ধি অথবা উন্নতি কোন্ কোন্ সঙ্কেতে সুনিশ্চিত হয় এবং মানুষের কয় কোন্ কোন্ কারণে ঘটিয়া থাকে তাহা স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহা স্থির করিতে না পারিলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে বিধিমূলক ও নিবেদনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সেই ব্যবস্থা নির্ধারণ করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

আনুমানিকভাবে আমাদিগের বিচারানুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের ও ভূমণ্ডলের অন্ত্যন্ত প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই সংঘটিত হয় তাহা বর্তমান বিজ্ঞানের আদৌ জানা নাই এবং উহা জানা না থাকায় যে যে ব্যবস্থার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়—বর্তমান বিজ্ঞানে সেই সেই ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। যে যে ব্যবস্থার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয় সেই সেই ব্যবস্থা স্থির করিতে হইলে কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের ও ভূমণ্ডলের অন্ত্যন্ত প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু স্বতঃই সংঘটিত হয় তাহা স্থির করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

মহাসমুদ্রসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্তন (অর্থাৎ জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি) স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ ঐশী ও প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা স্থির করিতে হইলে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রথমতঃ, নিত্য-অটল-অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থা, তৃতীয়তঃ, চলৎশীল অবস্থা, চতুর্থতঃ, বায়বীয় অবস্থা, এবং পঞ্চমতঃ, বাষ্পীয় অবস্থা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কোথায় বিস্তারিত আছে, তাহা সর্বোত্তম পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অবস্থারই বিবিধ শ্রেণীর কার্য এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রাকৃতিকজাত পদার্থের মধ্যে বিস্তারিত আছে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার বিবিধ শ্রেণীর কার্য এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রাকৃতিকজাত পদার্থের মধ্যে বিস্তারিত আছে বটে, কিন্তু ঐ পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার কোন শ্রেণীর অবস্থারই অফুরন্ত ভাণ্ডার এই ভূমণ্ডলের কোন প্রাকৃতিকজাত পদার্থের মধ্যে বিস্তারিত নাই। যে নীলাকাশ এই ভূমণ্ডলের জল-ভাগ ও স্থল-ভাগ, উদ্ভিদ-ভাগ, চরজীব-ভাগ এবং আকাশ-ভাগকে সর্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেই নীলাকাশের মধ্যে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের ঐ পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থার অফুরন্ত ভাণ্ডার বিস্তারিত আছে।

স্বাত্তিকালে নীলাকাশকে যে অবস্থার এই ভূমণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই অবস্থা সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (অথবা variable) অবস্থা। ঐ নীলাকাশকে সর্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থা (অথবা non-variable condition)। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের “চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ-অবস্থাকে” সর্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য অটল-অবস্থা (constant static condition)।

সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (variable) অবস্থার পশ্চাতে যে উহার অপর দুইটি অবস্থা পরে পরে বিস্তারিত আছে, তাহা মানুষ কোন বস্তু অথবা সাধারণ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। উহা কোন মানুষ কোন বস্তু অথবা সাধারণ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু মানুষের চক্ষু বাহ্যতে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার পশ্চাতে দেখিতে সক্ষম হয়, তাহা করিবার সঙ্কেত আছে। ঐ সঙ্কেতের সাহায্যে চক্ষুকে প্রস্তুত করিতে পারিলে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল (variable) অবস্থার পশ্চাতে যে উহার অপর দুইটি অবস্থা পরে পরে বিস্তারিত আছে, তাহা মানুষ নিজ চক্ষুর দ্বারাই দেখিতে

পায়। সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের ঐ অপর দুইটি অবস্থা। মাহুৰ নিজ চক্ষুৰ দ্বাৰা দেখিতে সক্ষম হওক আৰু নাই হওক, ঐ দুইটি অবস্থা। যে নীলাকাশের পশ্চাতে বিস্তৰমান আছে, তাহা অনায়াসে বিচাৰ কৰিয়া বুঝা যায়। ভূমণ্ডল সৰ্বদাই নীলাকাশ দ্বাৰা ঘেৰাৱহিয়াছে, এবং ঐ নীলাকাশের প্ৰতিবিম্ব এই ভূমণ্ডলে নীলবৰ্ণের প্ৰাৱল্য হওয়ার কথা, অথচ দিনের বেলায় স্বেত বৰ্ণের প্ৰাৱল্য এবং ৰাজিবেলায় কালবৰ্ণের প্ৰাৱল্য দেখিতে পাওৱা যায়। এতাদৃশ বিৰুদ্ধাবস্থা কেন হয়, তাহাৰ বিচাৰ কৰিতে বসিলে দেখিতে পাওৱা যায় যে, সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থা শুভ্ৰ স্ফটিকের মত উজ্জ্বল স্বেতবৰ্ণবিশিষ্ট বলিয়া দিনের বেলায় সমগ্ৰ ভূমণ্ডলে স্বেতবৰ্ণের প্ৰাৱল্য দেখিতে পাওৱা যায় এবং চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্ৰবৃত্তিৰ উন্মেষ-অবস্থা উজ্জ্বল কাল-বৰ্ণবিশিষ্ট বলিয়া ৰাজিবেলায় কালবৰ্ণের প্ৰাৱল্য দেখিতে পাওৱা যায়।

দিনের বেলায় নীলাকাশকে যে অবস্থায় এই ভূমণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই অবস্থা সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বাষ্পীয় অবস্থা। বাষ্পীয় অবস্থার পশ্চাতে বিস্তৰমান থাকে সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বায়বীয় অবস্থা।

সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বাষ্পীয় অবস্থা হইতে মহাসমুদ্ৰের উৎপত্তি হয়।

সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থা। নীলাকাশে সৰ্বদাই বিস্তৰমান থাকে। ঐ পাঁচটি অবস্থা। নীলাকাশে সৰ্বদা বিস্তৰমান থাকে বটে, কিন্তু এক সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের এক নিত্য-অটল-অবস্থা ছাড়া আৰু কোন অবস্থাই সৰ্বদা সৰ্বতোভাবে অপরিবৰ্ত্তিত থাকে না। আৰু চাৰিটি অবস্থাই প্ৰতি নিমেষে অস্বাধিক পৰিমাণে পৰিবৰ্ত্তন ঘটয়া থাকে। ৰাজি বিপ্ৰহৰ হইতে দিবা বিপ্ৰহৰ পৰ্যন্ত আন্তে আন্তে বাষ্পীয় অবস্থার বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে; এই বৃদ্ধিৰ ফলে ঐ সময়ে মহাসমুদ্ৰের ভাঁটা হইতে থাকে এবং ৰাজিকালের নীলাকাশ প্ৰত্যুবে বাষ্পীয় অবস্থার দ্বাৰা সৰ্বতোভাবে আবৃত হইয়া থাকে; দিবা বিপ্ৰহৰ হইতে ৰাজি বিপ্ৰহৰ পৰ্যন্ত তেজ ও রসের মিশ্রণের বাষ্পীয় অবস্থা জলাকাৰে পৰিণত হইতে থাকে। এই পৰিণতিৰ ফলে একদিকে মহাসমুদ্ৰসমূহৰ জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহাৰেৰ জোৱাৰ হয়, অন্য দিকে সন্ধ্যাৰ সময় ৰাজিকালের নীলাকাশ পুনৰায় মাহুৰ দেখিতে পায়।

আমরা আগেই উল্লেখ কৰিয়াছি যে, সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের প্ৰথমতঃ, নিত্য-অটল-অবস্থা হইতে চলৎ-গুণ, শক্তি ও প্ৰবৃত্তিৰ উন্মেষ অবস্থায়; দ্বিতীয়তঃ,

গুণ, শক্তি ও প্ৰবৃত্তিৰ উন্মেষ অবস্থা হইতে চলৎশীল অবস্থায়; তৃতীয়তঃ, চলৎশীল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায়; এবং চতুৰ্থতঃ, বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয়

অবস্থায় উৎপত্তি হয়। নীলাকাশের মধ্যে উপরোক্ত চাৰি শ্ৰেণীৰ কাৰ্য্যের অতিশয় সৰ্বদাই যুগপৎ বিস্তৰমান আছে। ঐ চাৰি শ্ৰেণীৰ কাৰ্য্যের উৎপত্তি হইতে মহাসমুদ্ৰসমূহের উৎপত্তি হয় এবং ঐ চাৰি শ্ৰেণীৰ কাৰ্য্যের এবং মহাসমুদ্ৰ-সমূহের যুগপৎ অতিশয় বশতঃ প্ৰতি চক্ষিণ ঘণ্টায় বাষ্পীয় অবস্থায় একবার বৃদ্ধি ও একবার হ্ৰাস ঘটয়া থাকে। বাষ্পীয় অবস্থায় বৃদ্ধি ও হ্ৰাস বশতঃ মহাসমুদ্ৰসমূহের প্ৰতি চক্ষিণ ঘণ্টায় একবার কৰিয়া ভাঁটা ও একবার কৰিয়া জোৱাৰ ঘটয়া থাকে। মহাসমুদ্ৰসমূহের জোৱাৰ-ভাঁটাৰ নাম মহা-সমুদ্ৰসমূহের “পৰিবৰ্ত্তন”।

কোন কোন ঐশী ও প্ৰাকৃতিক নিয়মে মহাসমুদ্ৰসমূহের উৎপত্তি ও পৰিবৰ্ত্তন হয় তাহা স্পষ্টভাবে ধাৰণা কৰিতে পারিলে যে যে ঐশী ও প্ৰাকৃতিক নিয়মে এই ভূমণ্ডলের স্থল-ভাগের অথবা পৃথিবী-ভাগের উৎপত্তি হয়—সেই সেই ঐশী ও প্ৰাকৃতিক নিয়মের কথাও ধাৰণা কৰিতে পাৱা যায় এবং তখন কোন সামাজিক গ্ৰাম সমগ্ৰ ভূমণ্ডলের কেন্দ্ৰ-স্থানীয়, তাহাও নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা যায়।

যে যে ঐশী ও প্ৰাকৃতিক নিয়মে মহাসমুদ্ৰসমূহের উৎপত্তি হয় সেই সেই ঐশী ও প্ৰাকৃতিক নিয়মের ফলে নীলাকাশের মধ্যে সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসের চলৎশীল অবস্থার, বায়বীয় অবস্থার ও বাষ্পীয় অবস্থার যে যে স্তৰ বিস্তৰমান আছে, সেই সেই স্তরের সৰ্ব্বজট অণুকাৰের (elliptical) চলৎশীলতা বিস্তৰমান থাকে। অণুকাৰের চলৎশীলতা চাৰি শ্ৰেণীৰ, যথা :

(১) শব্দাকাৰ, (২) চক্ৰাকাৰ, (৩) গদাাকাৰ এবং (৪) পদ্মাাকাৰ। ঐ চাৰিশ্ৰেণীৰ অণুকাৰের চলৎশীলতা ছাড়া উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰের কোন চলৎশীলতা নীলাকাশের কোন স্তরে বিস্তৰমান থাকে না। মহাসমুদ্ৰসমূহের উৎপত্তি হওয়ার পৰ উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয়। নীলাকাশের নিম্নস্থ আকাশের যে অংশ শুভ্ৰাকাৰের, সেই অংশে চাৰিশ্ৰেণীৰ অণুকাৰের চলৎশীলতা ছাড়া উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰের চলৎশীলতা বিস্তৰমান আছে। ঐ অংশকে আমরা এই প্ৰবন্ধে “ভূমণ্ডলের আকাশ” বলিয়া অভিহিত কৰি-তেছি।

অণুকাৰের চলৎশীলতা হইতে উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰের চলৎ-শীলতার উৎপত্তি হয় কোন কোন কাৰ্য্যক্ৰমে (process of works-এ) তাহা বুঝিতে না পারিলে এই ভূমণ্ডলের স্থলাংশের (অথবা পৃথিবীর) উৎপত্তি হয় কোন কোন কাৰ্য্যক্ৰমে তাহা বুঝা যায় না। এই ভূমণ্ডলের স্থলাংশের (অথবা পৃথিবীর) উৎপত্তি হয় কোন কোন কাৰ্য্যক্ৰমে তাহা বুঝিতে হইলে অণুকাৰের চলৎশীলতা (elliptical movements) হইতে উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰের (upward and

downward) চলৎশীলতার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্যক্রমে তাহা বুঝা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। আমরা অতঃপর ঐ বিষয়ের আলোচনা করিব।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে জলের গুরুত্ব বশতঃ নীলাকাশের মধ্যে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার (variable condition) যে স্থর বিদ্যমান আছে সেই স্থরের উপর অতিরিক্ত চাপ নিপতিত হয়। নীলাকাশস্থিত সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার (variable condition-এর) স্থরের উপরস্থিত অতিরিক্ত চাপ ক্রমে ক্রমে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীলতার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উন্মেষ অবস্থার (Non-variable condition-এর) স্থরকে অতিক্রম করিয়া নিত্য-অটল-অবস্থার (constant condition-এর) স্থরে উপনীত হয়। উপরোক্ত অতিক্রমণের অবস্থায় মহাসমুদ্রসমূহের তলদেশের তরলাবস্থার মধ্যে বিবিধ রকমের রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্যসমূহ হইতে থাকে। ঐ সমস্ত রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য প্রধানতঃ চতুর্দশ শ্রেণীর।

নীলাকাশস্থিত সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের চলৎশীল অবস্থার স্থরের উপরস্থিত মহাসমুদ্রসমূহের অতিরিক্ত গুরুত্বের অতিরিক্ত চাপ নিত্য-অটল-অবস্থার স্থরে উপনীত হয় বটে, কিন্তু উহা তেজ করিতে সক্ষম হয় না পরন্তু অক্ষম হয়। ইহার কারণ নীলাকাশের বহিঃস্থিত সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থার (constant and static condition-এর) স্থর অচেতন ও অনতিক্রমণীয়। প্রথমতঃ, সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের নিত্য-অটল-অবস্থার অচেতনতা, দ্বিতীয়তঃ, মহাসমুদ্রসমূহের অতিরিক্ত গুরুত্বের অতিরিক্ত চাপজাত বেগ এবং তৃতীয়তঃ, চতুর্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য—এই তিন শ্রেণীর কারণ বশতঃ নীলাকাশস্থিত সর্বব্যাপী তেজ ও রসের যে মিশ্রণে অণুকারের চলৎশীলতা ছাড়া অন্য কোন চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে না, সেই মিশ্রণে উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা উৎপত্তি হয় এবং উহা এই ভূমণ্ডলের আকাশের প্রাথমিক অবস্থায় উপনীত হয়। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতায়ুক্ত উপরোক্ত আকাশাবস্থায় পূর্কোক্ত চতুর্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্যপ্রযুক্ত গুরুত্ব-বিশিষ্ট (weighty) পদার্থসমূহ বিদ্যমান থাকে। এই গুরুত্ব-বিশিষ্ট পদার্থসমূহের বিদ্যমানতা বশতঃ সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতায়ুক্ত উপরোক্ত আকাশাবস্থায় যেমন উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার নৃগপৎ অধঃ আকারের চলৎশীলতাও বিদ্যমান থাকে। এইরূপে অণুকারের চলৎশীলতা হইতে উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয়।

যে নীলাকাশ এই ভূমণ্ডলকে অণুকারে সর্বতোভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে সেই নীলাকাশে যে কেবল মাত্র অণুকারের চলৎশীলতাই বিদ্যমান আছে এবং উর্দ্ধাধঃ আকারের কোন চলৎশীলতা বিদ্যমান নাই তাহা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত নীল আকাশে যতপি উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল যে যে অবস্থায় তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে সেই সেই অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারিত না। এই বিষয়ে আর অধিক কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা চলে না এবং প্রয়োজনও নাই।

এই ভূমণ্ডলের আকাশে যেমন অণুকারের চলৎশীলতা বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আবার উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতাও বিদ্যমান আছে।

এই ভূমণ্ডলের আকাশে, মহাসমুদ্রের উপরিভাগ হইতে খানিকদূর উর্দ্ধ পর্যন্ত উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার মধ্যে উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা অধিকতর প্রভাবযুক্ত; যতদূর পর্যন্ত উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা অধিকতর প্রভাবযুক্ত ততখানি দূরত্বের উপরস্থিত খানিকদূর উর্দ্ধ পর্যন্ত উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার মধ্যে উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা এবং অধঃ আকারের চলৎশীলতা সমান প্রভাবযুক্ত। এই ভূমণ্ডলের আকাশের সর্বোপরিস্থিত অংশে যে উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতা আছে সেই উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার মধ্যে অধঃ আকারের চলৎশীলতাই অধিকতর প্রভাবযুক্ত। এই ভূমণ্ডলের আকাশের বিভিন্ন অংশে যে উহার উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উপরোক্ত তিন শ্রেণীর তারতম্য বিদ্যমান থাকে তাহার প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা : (১) মহাসমুদ্রসমূহের অন্তর্গত পূর্কোক্ত চতুর্দশ শ্রেণীর রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্যসমূহ এবং (২) নীলাকাশের বিভিন্ন অংশে তাহার অণুকারের চলৎশীলতার বেগের বিভিন্নতা।

প্রথমতঃ, নীলাকাশের অণুকারের চলৎশীলতা হইতে ভূমণ্ডলাকাশের উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্যক্রমে ও কোন্ কোন্ নিয়মে এবং দ্বিতীয়তঃ, ভূমণ্ডলাকাশের উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উর্দ্ধাধঃ আকারের ও অধঃ আকারের চলৎশীলতার প্রভাবের তারতম্য হয় কোন্ কোন্ কার্যক্রমে ও কোন্ কোন্ নিয়মে—এই দুই শ্রেণীর বিষয় স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে এই ভূমণ্ডলের স্থলভাগের অথবা পৃথিবীর স্বতঃই উৎপত্তি হয় ও অস্তিত্ব বজায় থাকে কোন্ কোন্ কার্যক্রমে ও কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা ধারণা করিতে পারা যায়।

ভূমণ্ডলাকাশের উর্দ্ধাধঃ আকারের চলৎশীলতার উৎপত্তি হইলে, মহাসমুদ্রসমূহের তলদেশে সর্বব্যাপী তেজ ও রসের

মিশ্ৰণেৰ চলংশীল অবস্থায় অথবা বোম-অবস্থায় যে স্থান বিদ্যমান আছে সেই স্থানেৰ কেন্দ্ৰস্থিত বিন্দু হইতে উৰ্দ্ধমুখী নীলাকাশস্পৰ্শী চলংশীল অবস্থায় সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসেৰ মিশ্ৰণ-নিৰ্মিত একটা সরলৰেখাৰ উৎপত্তি হয়। এই সরলৰেখা ভূমণ্ডলেৰ স্থলভাগেৰ অথবা পৃথিবীভাগেৰ মেৰুদণ্ডৰূপ হইয়া থাকে। সাক্ষাৎভাবে যে তিন শ্ৰেণীৰ কাৰণ বশতঃ নীলাকাশস্থিত সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসেৰ মিশ্ৰণে উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰেৰ চলংশীলতাৰ উৎপত্তি হয়, সেই তিন শ্ৰেণীৰ কাৰণ এবং অণ্ডাকাৰেৰ নীলাকাশেৰ বিভিন্ন প্ৰদেশেৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কৰ্ম উপরোক্ত তেজ ও রসেৰ মিশ্ৰণ-নিৰ্মিত সরল রেখাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ হইয়া থাকে। এই সরল রেখা সংস্কৃত ভাষায় “বোম-কক্ষা” নামে অভিহিত হয়। ইংৰাজী ভাষায় পৃথিবীৰ Axis বলিতে যাহা বুঝা উচিত সংস্কৃত ভাষায় তাহাৰই নাম “বোম-কক্ষা”।

ষে চাৰি শ্ৰেণীৰ কাৰণে বোম-কক্ষাৰ উৎপত্তি হয় সেই চাৰি শ্ৰেণীৰ কাৰণ বশতঃই বোম-কক্ষাকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া বোম-কক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰদেশে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ অণ্ডাকাৰেৰ চলংশীলতাৰ উৎপত্তি হয় এবং চতুৰ্দশ শ্ৰেণীৰ রাসায়নিক ও আবহবিক কাৰ্য্যবশতঃ ভূমণ্ডলেৰ স্থল অথবা পৃথিবীভাগেৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ উপাদানেৰ ও বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ গঠনেৰ উৎপত্তি হয়।

বোম-কক্ষাকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া বোম-কক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰদেশে যে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ অণ্ডাকাৰেৰ চলংশীলতাৰ উৎপত্তি হয়, সেই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ অণ্ডাকাৰেৰ চলংশীলতাৰ বহিঃস্থিত সীমানাৰ মিলনে পৃথিবীৰ (অৰ্থাৎ এই ভূমণ্ডলেৰ স্থলভাগেৰ) আকাৰ নিৰ্দ্ধাৰিত হইয়া থাকে। পূৰ্বোক্ত চতুৰ্দশ শ্ৰেণীৰ আবহবিক ও রাসায়নিক কাৰ্য্যবশতঃ পৃথিবীৰ বিভিন্ন প্ৰদেশে যে সমস্ত শ্ৰেণীৰ উপাদান ও গঠনেৰ উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত শ্ৰেণীৰ উপাদান ও গঠনই পৃথিবীৰ বিভিন্ন প্ৰদেশেৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ উপাদান ও গঠন।

বোম-কক্ষাকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া বোম-কক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰদেশে যে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ অণ্ডাকাৰেৰ চলংশীলতাৰ উৎপত্তি হয় সেই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ অণ্ডাকাৰেৰ চলংশীলতা বোম-কক্ষাৰ পূৰ্ব, দক্ষিণ, পশ্চাৎ, উত্তৰ, উৰ্দ্ধ এবং অধঃ এই ছয় দিকেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। এই সীমাবদ্ধতাৰ কাৰণ বোম কক্ষাৰ চাৰি শ্ৰেণীৰ কাৰণেৰ চাৰি শ্ৰেণীৰ সীমাবদ্ধতা; যথা :

- (১) সৰ্বব্যাপী তেজ ও রসেৰ মিশ্ৰণেৰ নিত্য-অটল-অবস্থায় অভেদত্বা জনিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সীমাবদ্ধতা ;
- (২) মহাসমুদ্ৰসমূহেৰ অতিৰিক্ত গুরুত্বেৰ অতিৰিক্ত চাপ-জাত বেগেৰ সীমাবদ্ধতা ;
- (৩) চতুৰ্দশ শ্ৰেণীৰ রাসায়নিক ও আবহবিক কাৰ্য্যেৰ পরিমাণেৰ ও বেগেৰ সীমাবদ্ধতা ;

(৪) অণ্ডাকাৰেৰ নীলাকাশেৰ বিভিন্ন প্ৰদেশেৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কৰ্মেৰ পরিমাণেৰ ও বেগেৰ সীমাবদ্ধতা।

প্ৰথমতঃ, মহাসমুদ্ৰসমূহেৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব; দ্বিতীয়তঃ, উৰ্দ্ধাধঃ আকাৰেৰ চলংশীলতাৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব; তৃতীয়তঃ, প্ৰাথমিক ভূ-মণ্ডালাকাশেৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব; চতুৰ্থতঃ, বোম-কক্ষাৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব এবং পঞ্চমতঃ, ভূ-মণ্ডলেৰ পৃথিবীভাগেৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব—এই পাঁচটা বিষয়ক তত্ত্ব অত্যন্ত দুৰূহ। ঐ পাঁচ শ্ৰেণীৰ তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ধারণা কৰিতে হইলে প্ৰথমতঃ, প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থসমূহেৰ অবস্থাবস্থ রসেৰ কাৰ্য্যেৰ অথবা রসায়ন শাস্ত্ৰেৰ (Chemistry); দ্বিতীয়তঃ, প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থসমূহেৰ অংশসমূহেৰ কাৰ্য্যেৰ অথবা প্ৰাকৃতিক যন্ত্ৰ-বিজ্ঞানেৰ (Natural Mechanics-এৰ); তৃতীয়তঃ, প্ৰাকৃতিক স্থিতিবিজ্ঞান (Natural Statics-এৰ) এবং প্ৰাকৃতিক গতিবিজ্ঞান (Natural Dynamics-এৰ) এবং চতুৰ্থতঃ, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান (Astronomy) এবং পঞ্চমতঃ, শৰীৰ ও মনেৰ তত্ত্ববিজ্ঞা উপলব্ধি কৰিবার (Physical & mental function's realisation-এৰ) অধ্যবসায়ী ছাতি হওয়া অপরিপূৰ্ণভাবে প্ৰয়োজনীয় হয়। উহা প্ৰত্যেক মানুহেৰ পক্ষে সাধাৰণতঃ সম্ভবযোগ্য নহে। উপরোক্ত পাঁচ শ্ৰেণীৰ বিষয়েৰ বিজ্ঞা ও উপলব্ধি কৰিবার ক্ষমতা অৰ্জন কৰিয়া মহাসমুদ্ৰ প্ৰভৃতিৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব-তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ধারণা কৰা খুবই দুৰূহ বটে, কিন্তু ঐ পাঁচশ্ৰেণীৰ উৎপত্তি ও অস্তিত্ব-তত্ত্ব ধারণা কৰিতে না পাৰিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয়েৰ স্থান নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবার নীতিসূত্ৰ বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য হয় না।

যাহাৰা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয়েৰ স্থান নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবার নীতিসূত্ৰ বুঝিতে চাহেন, তাহাদিগকে উপরোক্ত প্ৰণালীতে উহা বুঝিবার অস্ত প্ৰস্তুত হইতে হয়।

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয়েৰ স্থানেৰ বিবৰণ ও তৎসম্বন্ধে কয়েকটি আনুষঙ্গিক কথা

যে স্থান এই পৃথিবীৰ মধ্যে সৰ্ব্বোচ্চ, সেই স্থান বোম-কক্ষাৰ উৰ্দ্ধ-কৃষ্ণ-গত স্থল ভাগেৰ শেষ সীমানা এবং ঐ স্থানই সৰ্ব্বতোভাবে ভূমণ্ডলেৰ পৃথিবীভাগেৰ কেন্দ্ৰস্থলীয়া। ঐ স্থান কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয়েৰ সৰ্ব্বোপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।

ঐ স্থান হইতে একদিকে যেরূপ সমগ্ৰ পৃথিবীৰ সমস্ত সামাজিক গ্ৰামেৰ স্থানগত উপাদান, গুণ ও শক্তি-সমূহেৰ মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান, গুণ ও শক্তি সমান অথবা সাধাৰণ (common) তাহা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ আবার প্ৰত্যেক সামাজিক গ্ৰামেৰ স্থানগত উপাদানে, গুণে ও শক্তিতে কি কি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে তাহা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰাও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, সমগ্ৰ পৃথিবীতে যে সমস্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ বিদ্যমান

থাকে সেই সমস্ত শ্রেণীর মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সাধারণ অথবা সমান (common) এবং কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের শ্রেণীগত সাধন করিবার উপাদান, তাহা নির্ধারণ করাও ঐ স্থান হইতে অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর কারণে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ বিধি-নিষেধ সাধারণভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত এবং কোন্ দেশে অথবা কোন্ কোন্ গ্রামে কোন্ কোন্ বিধিনিষেধ বিশেষভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা এইস্থান হইতে অপেক্ষাকৃত নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব-যোগ্য হয়।

মহাসমুদ্রসমূহ হইতে এই ভূমণ্ডলের স্থলভাগের উৎপত্তি স্বতঃই সাধিত হয় যে যে কার্যক্রমে এবং ঐ স্থলভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রক্ষিত হয় যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে, সেই সেই কার্যক্রম ও প্রাকৃতিক নিয়ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, যে স্থান অথবা যে বিন্দু সমগ্র ভূমণ্ডলের পৃথিবীভাগের কেন্দ্রস্থানীয়, সেই বিন্দুর পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন (area)* সমগ্র পৃথিবীভাগের মধ্যে স্বতঃই সর্বাপেক্ষা অধিক উর্ধ্বাংশভুক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কৃষ্ণিগত আয়তনের প্রত্যেক অংশই পৃথিবীর অন্তর্গত অংশের তুলনায় স্বতঃই অধিকতর উর্ধ্বাংশভুক্ত হয়। কৃষ্ণিগত আয়তনের মধ্যে আবার পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন স্বতঃই সর্বাপেক্ষা অধিকতম উর্ধ্বাংশভুক্ত-যুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত আয়তনের প্রাকৃতিক উর্ধ্বাংশভুক্তির প্রকৃষ্টতা এত অধিক যে, যে-সমস্ত দ্রব্য মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্য-প্রদ ও তৃপ্তিপ্রদ সেই সমস্ত দ্রব্য সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজন নির্বাহের জন্য যে যে পরিমাণে আবশ্যক সেই সেই পরিমাণের তিন গুণ পরিমাণে এক পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন হইতে অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। অবশ্য মানুষের অনাচার অথবা অসঙ্গত ব্যবহার বশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা অথবা বিধমতার উৎপত্তি হইলে উহা সম্ভবযোগ্য হয় না। যে যে স্থান লইয়া পশ্চাৎভাগের ও উত্তরভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন গঠিত হইয়া থাকে, সেই স্থানসমূহ এই ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবীভাগের কেন্দ্রীয় স্থানের সর্বাপেক্ষা অধিকতম নিকটবর্তী হইয়া থাকে; ইহার কারণ কৃষ্ণিগত স্থানের আরম্ভ হয় ব্যোম-কক্ষার পূর্বদিক হইতে এবং উহা অতিক্রম করে পূর্ব

হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে পশ্চাতে, পশ্চাৎ হইতে বামে এবং বাম হইতে উর্ধ্বে। পূর্বভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন পৃথিবীর সর্বনিম্নভাগে, দক্ষিণভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন পৃথিবীর উর্দ্ধাংশে; দূরত্বকে চারিভাগে বিভক্ত করিলে যে চারিটি ভাগ হয় তাহার দ্বিতীয় ভাগে, পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন উহার তৃতীয় ভাগে, এবং বাম ভাগের কৃষ্ণিগত আয়তন উহার চতুর্থভাগে অবস্থিত থাকে।

এই ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবী ভাগের কেন্দ্রীয় স্থানে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থাপিত করিতে হয়, তাহার অন্ততম কারণ পশ্চাৎ ভাগের কৃষ্ণিগত স্থানের উপরোক্ত প্রকৃষ্টতম প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় উপরোক্ত কেন্দ্রীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, মানুষের অনাচার অথবা অসঙ্গত ব্যবহার বশতঃ সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির বিরুদ্ধতা ঘটিলে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনা-সভার-কন্ঠিগণ পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত স্থানের নৈকট্য বশতঃ উহার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির বিরুদ্ধতাসমূহ অনায়াসে অপ-সারিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন এবং অনায়াসে পৃথিবীর অভাবগ্রস্ত দেশসমূহের কাঁচামালের অভাব দূর করিতে কৃত-কার্য হন।

আমাদিগের বিচারবুদ্ধি অনুসারে এই ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবী-ভাগের সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্ট (অথবা গৌরীশঙ্কর অথবা কৈলাস-পর্বত)। এ কৈলাস-পর্বত সমগ্র পৃথিবীভাগের কেন্দ্রস্থান।

পূর্ব-ভাগের কৃষ্ণিগত স্থান—উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার কতিপয় অংশ এবং তন্মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জ লইয়া অবস্থিত।

দক্ষিণভাগের কৃষ্ণিগত স্থান—প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়ার কতিপয় অংশ লইয়া অবস্থিত।

পশ্চাৎভাগের কৃষ্ণিগত স্থান—ইণ্ডো-চায়না, মালয়, জাম, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের কতিপয় অংশ লইয়া অবস্থিত।

উত্তর ভাগের কৃষ্ণিগত স্থান—প্রধানতঃ পক্ষীদের অংশ ও কান্দীর লইয়া অবস্থিত।

(weightএর) প্রতিক্রিয়া বশতঃ পৃথিবীর রূপের পূর্ণতা সাধিত হয়। উপ-রোক্ত পাক দেওয়া চল-শীলতা বশতঃ পৃথিবীর প্রাথমিক রূপ পাক দেওয়া অথবা পেঁচাল (spiral) হইয়া থাকে। পৃথিবীর এই পাক দেওয়া অথবা পেঁচাল প্রাথমিক রূপ অথবা স্থানকে সংযুক্ত ভাষায় “কৃষ্ণি” বলা হয়। পৃথিবীর পেঁচাল প্রাথমিক সমগ্র হনকে “কৃষ্ণিগত আয়তন” বলা হয়। পৃথিবীর পেঁচাল প্রাথমিক স্থানের আরম্ভ হয় ব্যোমকক্ষার পূর্বদিক হইতে, উহা দ্বিতীয়তঃ উপনীত হয় দক্ষিণ দিকে; তাহার পর উহা তৃতীয়তঃ ব্যোম-কক্ষার পশ্চাতে উপনীত হয়; চতুর্থতঃ দক্ষিণে; পঞ্চমতঃ উর্ধ্বে এবং ষষ্ঠতঃ অষ্টমদিক উহার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। সমগ্র স্থানকে যেমন কৃষ্ণিগত আয়তন বলা হয়, সেইরূপ এক একদিকের স্থানকে সেই দিকের কৃষ্ণিগত আয়তন বলা হয়।

* “কৃষ্ণিগত আয়তন” মহাসমুদ্র হইতে যখন এই ভূমণ্ডলের স্থলভাগের উৎপত্তি হয় তখন ঐ স্থলভাগ সর্বপ্রথমে পাক দেওয়া (spiral) চল-শীলতার (Dynamicityতে) উৎপত্তি হইতে থাকে, তাহার পর চতুর্দিক কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও আকর্ষক কার্যের এক স্থলভাগের গুরুত্বের

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের স্থান নির্ধারণ করিবার নীতিসূত্র সম্বন্ধে এই আশংকিকার যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথার তাৎপর্য্য এবং অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে,—কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সর্বোপযুক্ত স্থান “গৌরী-শঙ্কর”। স্থান নির্ধারণ করিবার নীতি-সূত্রানুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সর্বোপযুক্ত স্থান “গৌরী শঙ্কর” বটে, কিন্তু ঐ কার্যালয়ে বাহাতে সর্ব শ্রেণীর মানুষ প্রয়োজনানুসারে অনারাসে বাতায়িত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে “গৌরী-শঙ্কর” বাতায়িত করা অনারাসসাধ্য হয় না, পরন্তু কোন কোন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সময় সময় উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণে যদিও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সর্বোপযুক্ত স্থান “গৌরী-শঙ্কর”, তথাপি গৌরী-শঙ্করে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য হয় না; কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনা-সভার অমাত্যগণের গবেষণাগার গৌরী-শঙ্করে স্থাপিত করিয়া উহার কার্যালয় স্থাপন করিতে হয়—হিমালয়ের পাদদেশে; ব্যবহারতঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সর্বোপযুক্ত স্থান “কাশীধাম”—অথবা “বারাগনী”। “বারাগনী” অথবা “কাশীধাম”কে ব্যবহারতঃ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সর্বোপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ধারণ করিবার যুক্তি এই যে, উহা একদিকে যেমন বাতায়িতের পক্ষে সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে অনারাসসাধ্য, সেইরূপ আবার গৌরীশঙ্করের পরেই উহা সমগ্র পৃথিবীভাগের কেন্দ্রীয়।

আনুমানিকভাবে ইহা বলা বাইতে পারে যে, বাহাতে আগামী সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে পুনরায় সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী কোন যুদ্ধের আশঙ্কা উদ্ভূত না হইতে পারে এবং বাহাতে মানুষ আবার অনাশঙ্কিত মনে শান্তির আশ্বাদ উপভোগ করিতে পারে তাহার কোন ব্যবস্থার কথা যদি দ্রুদশিতাব্যক্ত কোন মানুষের প্রাণে উদয় হয়—তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বাহাতে মানুষের প্রাণের রাগ-ষেযের অথবা উত্তেজনা-বিবাদের প্রবৃত্তি সর্বদা সর্বতোভাবে সংযত থাকিতে বাধ্য হয় এবং বাহাতে উহা কোনক্রমে অসংযত না হইতে পারে তাহার আয়োজন না করিতে পারিলে উপরোক্ত ব্যবস্থা হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে।

বাহাতে মানুষের প্রাণের রাগ-ষেযের অথবা উত্তেজনা-বিবাদের প্রবৃত্তি সর্বদা সর্বতোভাবে সংযত থাকিতে বাধ্য হয় এবং বাহাতে উহা কোনক্রমেই অসংযত না হইতে পারে তাহার আয়োজন করিতে হইলে, প্রথমতঃ—অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—ভূমণ্ডলের সমগ্র পৃথিবীভাগকে দেশবিভাগের বৈজ্ঞানিক

নিয়মানুসারে কতকগুলি দেশে বিভাগ করিতে হইবে। তাহার পর গ্রামবিভাগের বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রামে, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক গ্রামে বিভাগ করিতে হইবে। তাহার পর দুইটি হইতে পাঁচটি পর্যন্ত—সামাজিক গ্রাম লইয়া এক একটি সামাজিক কার্যপরিচালনার গ্রাম গঠিত হইবে। তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে বাহাতে তিন শ্রেণীর অমুষ্ঠান অর্থাৎ (১) মানুষের ধনাত্মক নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহ (২) মানুষের পশুশ নিবারণ করিয়া মনুষ্য সাধন করিবার অমুষ্ঠানসমূহ এবং (৩) মানুষের অলস ও বেকার, জীবন নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার অমুষ্ঠান-সমূহ, স্বতঃই সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে বাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অমুষ্ঠান স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে—
প্রথমতঃ, প্রত্যেক সামাজিক কার্যপরিচালনার গ্রামে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনার গ্রামে, প্রত্যেক দেশে এবং অস্থায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া অস্থায়ীভাবে কার্যপরিচালনা-সংগঠিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সামাজিক কার্যপরিচালনার গ্রামের অস্থায়ী কার্যপরিচালনা-সভার বাহাতে ছয় শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনার গ্রামের, প্রত্যেক দেশের, অস্থায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অস্থায়ীভাবে কার্যপরিচালনা-সভার বাহাতে নয় শ্রেণীর অমুষ্ঠান সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, বাহাতে কার্যপরিচালনা-সভার কর্তৃগণের অথবা জনসাধারণের কেহ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেক কার্যপরিচালনা-সভাকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন এবং উহার নির্দেশ অথবা বিধি নিষেধ চালনা করেন, তদ্ব্যতীত প্রত্যেক কার্যপরিচালনা-সভার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি জনসভার রচনা করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে যুগ্মমান ৯ বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর উপার্জনহারা বাহাতে এক নিয়মে নির্ধারিত হয় এবং বাহাতে কোন শ্রেণীর কর্মীর ধনাত্মকের কোন আশঙ্কা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১। বল্লী ‘বৈশাখ’ ৫১ সংখ্যা ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। বল্লী ‘বৈশাখ’ ৫১ সংখ্যা ১০৬, ১০৭ ও ১০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তঃ, সমগ্র পৃথিবীর কোন সামাজিক গ্রামে বাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদন্ততুল্য অস্ত্রাত্ত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ছাড়া অস্ত্র কোন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইতে না পারে অথবা উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ সামাজিক গ্রামের প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কার্য-পরিচালনার প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠান, দেশীয় কার্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান) ছাড়া অস্ত্র কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বাহাতে স্থাপিত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

সপ্তমতঃ, কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কেন্দ্রীয় জন-সভার কার্যালয় বাহাতে বারাগসৌধামে স্থাপিত হয় এবং কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা-সভার কক্ষগণের গবেষণাগার বাহাতে গৌরীশঙ্করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

উপরোক্ত দশ শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলে যেমন বর্ত্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধের অবস্থা বাহাতে আগামী সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে পুনরায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন যুদ্ধের আশঙ্কা উদ্ভূত না হইতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের মানুষ আবার আশঙ্কাবিহীন মনে প্রকৃত শান্তির আশ্বাস উপভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, সেইরূপ ঐ দশ শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অস্ত্র কোন ব্যবস্থায় এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না ।

গত ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের অবসানে যে শ্রেণীর League of Nations জেনেভাতে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই শ্রেণীর League of Nations এর দ্বারা যে সমগ্র মানব জাতির কোন শ্রেণীর শান্তি স্থানিষ্ঠিত হইতে পারে না—তাহা সর্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের জন্তও পুনরায় League of Nations স্থাপিত করিবার প্রস্তাব কোন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় গুরুগণ উত্থাপিত করিয়াছেন । তাঁহারা ভবিষ্যতে League of Nationsকে অধিকতর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । যাহারা League of Nationsকে অধিকতর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবজাতির শান্তি স্থানিষ্ঠিত করিতে পারা যায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে উহা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে । মানব-চরিত্রের ও মানব-মনের প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, পাশবিক বলের—শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা পাশবিক প্রবৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধিত হয় । পাশবিক শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা অথবা পাশবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কখনও মনুষ্যোচিত শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হয় না । মনুষ্যোচিত শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ

সাধিত না হইলে কখনও মানুষের সর্বতোভাবে শান্তি সাধিত হইতে পারে না ও হয় না । মনুষ্যোচিত শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিতে করিতে হইলে মানুষের পাশবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি নিবারণ করা ও দূর করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয় ।

যাহারা ইতিহাসের ছাত্র তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, মানব-সমাজে যখন হইতে সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে বর্ত্তমান ভাবামুসারে মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তখন হইতে মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে । মানুষের অতাব ও অশান্তিও তখন হইতে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ।

আমাদিগের সিদ্ধান্তামুসারে League of Nationsকে অধিকতর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে মানব-সমাজের শান্তি স্থানিষ্ঠিত করা সম্ভবযোগ্য হইবে না । মানব-সমাজের শান্তি স্থানিষ্ঠিত করিতে হইলে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত League of Nations-এর রচনা করিতে হইবে এবং ঐ League of Nationsকে প্রকৃত মনুষ্যোচিত বলের উপর স্থাপিত করিতে হইবে ।

ব্যাসদেবের কথাসমূহ হইতে সঙ্গ্রহ করিয়া আমরা যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি সেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ইংরেজীতে League of Nations বলা বাইতে পারে । উহা প্রকৃত মনুষ্যোচিত বলের উপর স্থাপিত League of Nations-এর চিত্র । যে কোন মানুষ অথবা যে কোন জাতি ঐ শ্রেণীর League of Nations স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিলে প্রত্যেক দেশের মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ শ্রেণীর League of Nations-এ যোগদান করিতে বাধ্য হইবেন । তখন উহা সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত League of Nations হইয়া পড়াইবে ।

আমরা যে League of Nations-এর অথবা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চিত্র পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি, সেই League of Nations-এর অথবা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় ভারতবর্ষে বারাগসৌধামে স্থাপন করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাসনভার দেশ-ধর্ম্ম-নির্কিলেশে যাহারা সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ক্ষমতা-যুক্ত তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে ।

সমগ্র মানবসমাজের বিভিন্ন দেশে সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ক্ষমতাব্যুক্ত যে-সমস্ত মানুষ আছেন তাঁহারা মিলিত হইয়া যত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রচনা করেন এবং ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক উৎকর্ষ শক্তি হ্রাস-

প্ৰাপ্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কাৰণ অনায়াসে এক বৎসৰেৰ মধ্য দূৰ কৰা অনায়াস-সাধ্য হইতে পাৰে। যে সমস্ত কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাকৃতিক উৰ্ব্বৰাশক্তি হ্ৰাস প্ৰাপ্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কাৰণ দূৰ কৰিতে পাৰিলে সমগ্ৰ ভূমণ্ডলেৰ বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কঁচামালেৰ অভাব আছে সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কঁচামালেৰ অভাব এক ভাৰতবৰ্ষ হইতেই সৰ্ব্বতোভাবে দূৰ কৰা সম্ভব হইতে পাৰে। সমগ্ৰ ভূমণ্ডলেৰ বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কঁচামালেৰ অভাব আছে সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কঁচামালেৰ অভাব দূৰ কৰা নিশ্চিত হইলে একদিকে কোন দেশেই অস্ত্ৰ কোন দেশ দখল কৰিবাৰ উদ্দেশ্যে আক্ৰমণ কৰিবাৰ কোন অজুহাত থাকিতে পাৰিবে না এবং অস্ত্ৰদিকে মানুহেৰ বন্দ-কলহেৰ প্ৰবৃত্তি সৰ্ব্বতোভাবে দূৰ কৰিতে প্ৰত্যেক সামাজিকগ্ৰামে যে তিন শ্ৰেণীৰ অমুঠান সাধন কৰা অপরিহাৰ্য্যভাবে প্ৰয়োজনীয় হয়, সেই তিন শ্ৰেণীৰ অমুঠান সাধন কৰিবাৰ ব্যবস্থা কৰা অনায়াস-সাধ্য হয়।

সমগ্ৰ মানবসমাজেৰ বিভিন্ন দেশে সৰ্বোৎকৃষ্ট “শাসন-কৰ্মতাত্ত্বিক” যে-সমস্ত মানুহ আছেন, তাঁহাৰা মিলিত হইয়া যত্ৰপি কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ (অথবা League of Nations-এৰ) রচনা কৰেন কিন্তু তাঁহাৰ কাৰ্যালয় যত্ৰপি ভাৰতবৰ্ষে প্ৰতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে যে-সমস্ত কাৰণে ভাৰতবৰ্ষেৰ প্ৰাকৃতিক উৰ্ব্বৰাশক্তি হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কাৰণ সৰ্ব্বতোভাবে নিৰ্দ্ধাৰিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। সেই সমস্ত কাৰণ সৰ্ব্বতোভাবে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা সম্ভবযোগ্য না হইলে তাঁহা দূৰ কৰাও সম্ভবযোগ্য হয় না। তাঁহা দূৰ কৰা সম্ভবযোগ্য না হইলে সমগ্ৰ ভূমণ্ডলেৰ বিভিন্ন দেশে যে-সমস্ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কঁচামালেৰ অভাব আছে সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কঁচামালেৰ অভাব দূৰ কৰাও সম্ভবযোগ্য হয় না। সমগ্ৰ ভূমণ্ডলেৰ বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত কঁচামালেৰ অভাব আছে সেই সমস্ত কঁচামালেৰ অভাব দূৰ না হইলে বিভিন্ন দেশেৰ মানুহেৰ বিভিন্ন দেশ দখল কৰিবাৰ ও বিভিন্ন দেশ আক্ৰমণ কৰিবাৰ প্ৰবৃত্তি দূৰ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহাৰ ফলে একদিকে ধ্বংস যুদ্ধেৰ প্ৰবৃত্তি দূৰ কৰা সম্ভব-যোগ্য হয় না সেইরূপ আবার প্ৰত্যেক সামাজিক গ্ৰামে যে তিন শ্ৰেণীৰ অমুঠান সাধন কৰা অপরিহাৰ্য্যভাবে প্ৰয়োজনীয় হয় সেই তিন শ্ৰেণীৰ অমুঠান সাধন কৰিবাৰ ব্যবস্থা কৰাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাৰ্ত্তেই ইহা সিদ্ধান্ত কৰিতে হয় যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয় বাহাতে ভাৰতবৰ্ষে স্থাপিত হয় তাহা কৰা মানুহেৰ সৰ্ববিধ ইচ্ছা সৰ্ব্বতোভাবে পূৰণ কৰিবাৰ ব্যবস্থা কৰিতে হইলে একান্তভাবে প্ৰয়োজনীয় হয়।

প্ৰতিষ্ঠানসমূহেৰ কাৰ্যালয়েৰ স্থান নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবাৰ সূত্ৰেৰ শেৰাংশ

যাহা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয়েৰ স্থান নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবাৰ সূত্ৰ, তাহাই দেশীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ, গ্ৰামস্থ রাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ এবং গ্ৰামস্থ সামাজিক কাৰ্য্যপরিচালনা-প্ৰতিষ্ঠানেৰ কাৰ্যালয়েৰ স্থান নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবাৰ সূত্ৰ।

সমগ্ৰ ভূমণ্ডলেৰ অন্তৰ্ভুক্ত সমস্ত সামাজিক গ্ৰামেৰ কেন্দ্ৰ স্থান যে প্ৰণালীতে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিতে হয়, সেই প্ৰণালীতেই প্ৰত্যেক দেশস্থ প্ৰতিষ্ঠানেৰ অন্তৰ্ভুক্ত সামাজিক গ্ৰামসমূহেৰ, প্ৰত্যেক গ্ৰামস্থ রাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰ অন্তৰ্ভুক্ত সামাজিক গ্ৰামসমূহেৰ এবং প্ৰত্যেক গ্ৰামস্থ সামাজিক কাৰ্য্যপরিচালনাৰ প্ৰতিষ্ঠানেৰ অন্তৰ্ভুক্ত গ্ৰামসমূহেৰ কেন্দ্ৰস্থান নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা যায়।

মানুহেৰ সৰ্ববিধ ইচ্ছা সৰ্ব্বতোভাবে পূৰণ

কৰিবাৰ অমুঠানসমূহেৰ এবং প্ৰতিষ্ঠান-

সমূহেৰ মূল নীতি-সূত্ৰ

অমুঠান, প্ৰতিষ্ঠান ও নীতি-সূত্ৰ এই তিনটী শব্দেৰ অৰ্থ

মানুহেৰ সৰ্ববিধ ইচ্ছা সৰ্ব্বতোভাবে পূৰণ কৰিবাৰ অমুঠানসমূহেৰ এবং প্ৰতিষ্ঠানসমূহেৰ মূল নীতি-সূত্ৰ কি কি তাহা বুঝিতে হইলে “অমুঠান”, “প্ৰতিষ্ঠান”, এবং “নীতি-সূত্ৰ” এই তিনটী শব্দেৰ অৰ্থ বুঝিতে হয়।

কোন কাৰণ বশতঃ মানুহ যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনে ত্ৰতী হয়, তখন ঐ উদ্দেশ্য সাধনেৰ জন্ত শৃঙ্খলিতভাবে মিলিত হইয়া যে-সমস্ত কাৰ্য্য মানুহ কৰিতে থাকে সেই সমস্ত কাৰ্য্যকে ঐ উদ্দেশ্য সাধনেৰ “অমুঠান” বলা হয়।

ঐ উদ্দেশ্য ও অমুঠানসমূহ সাধনেৰ জন্ত কৰ্ম্মিগণেৰ যে সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সজ্জা রচিত হয় সেই সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সজ্জাৰ এক একটিকে এক একটী “প্ৰতিষ্ঠান” বলা হয়।

কোন উদ্দেশ্য সাধনে ত্ৰতী হইলে ঐ উদ্দেশ্য সাধন কৰিবাৰ মূল সঙ্কেত কি কি তাহা সৰ্ব্বপ্ৰথমে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিতে হয়। মূল সঙ্কেত কি কি তাহা নিৰ্দ্ধাৰিত হইলে ঐ সমস্ত মূল সঙ্কেত কাৰ্য্যে পরিণত কৰিয়া, উদ্দেশ্য বাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা কৰিতে হইলে ঐ সমস্ত মূল সঙ্কেত অনুসারে কয়েকটী অমুঠান সাধন কৰা ও কয়েকটী প্ৰতিষ্ঠান রচনা কৰা অপরিহাৰ্য্যভাবে প্ৰয়োজন হয়। যাহা ঐ উদ্দেশ্য সাধন কৰিবাৰ মূল সঙ্কেত তাঁহাৰ নাম ঐ উদ্দেশ্যসাধক অমুঠান ও প্ৰতিষ্ঠানসমূহেৰ মূল নীতি-সূত্ৰ।

আজকাল নানাবিধ অমুঠানেৰ ও প্ৰতিষ্ঠানেৰ নানাবিধ নীতিসূত্ৰ সৰ্ব্বদে নানা রকমেৰ কথা নানা রকমেৰ সূচীপণ বলিয়া থাকেন। আমাদিগেৰ মতে ঐ সূচীপণেৰ অনেকয়েই

নীতিসূত্র (Principles of programmes and assemblies) বলিতে যে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সাধারণ বক্তাগণও “নীতিসূত্র” (Principles) এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন ধারণা অর্জন না করিয়া “নীতিসূত্র” সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant) কথা কথিয়া থাকেন।

প্রধানতঃ উপরোক্ত দুই কারণে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে “নীতিসূত্র” শব্দটির সংজ্ঞা বুঝা অপেক্ষাকৃত দুষ্কর হয়। আমাদের পাঠকগণকে আমরা সতর্ক হইয়া “নীতিসূত্র” শব্দটির সংজ্ঞা ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার অমুষ্ঠানসমূহের এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিসূত্র কি কি তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে যে যে কারণ বশতঃ মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেই সেই কারণের ব্যাখ্যা আগেই করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষ যখন কোন রকমের দুঃখ ভোগ করে, তখন বাহ্যতে মানুষের দুঃখ দূর হয় অথবা কোন দুঃখের উদ্ভব না হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। মানুষের দুঃখের প্রধান কারণ তাহার “অভাব”। মানুষ তাহার স্বাস্থ্য অথবা তৃপ্তির জন্ত যখন যে যে বস্তু পাইবার ইচ্ছা করে, সেই সেই বস্তুর কোনটী না পাইলে অথবা কোনটী পাইতে বিলম্ব হইলে অথবা কোনটী পাইতে ক্লেশ হইলে মানুষের অভাব-বোধের উৎপত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করে। মানুষের জীবনের প্রতিপদ-বিক্ষেপে দুঃখের আশঙ্কা থাকে বলিয়াই দুঃখ আসিলে তাহা বাহ্যতে দূর করা যায় এবং দুঃখ যাঁহাতে না আসিতে পারে তাহা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের বাহ্যতে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হয় তাহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। মানুষের বাহ্যতে কোনরকমের অভাবের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনা মনুষ্যসমাজে একাঙভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

মানুষের সর্ববিধ-ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সম্ভব-যোগ্যতা।

আজকাল মানুষের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেক মানুষের অভাবের শ্রেণী ও মাত্রা যেরূপ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা দেখিলে কোন মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা যে সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনা সম্ভবযোগ্য—ইহা মনে

হয় না। আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হয় যে, মানুষের ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণী ও মাত্রা অসংখ্য; তদনুসারে অভাবের শ্রেণী এবং মাত্রাও অসংখ্য হইতে বাধ্য; এবং মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া অসম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণী ও মাত্রা অসংখ্য বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ও দার্শনিকের বিশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মানুষের ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণীও অসংখ্য নহে এবং মাত্রাও অপরিমিত নহে।

মানুষের ইচ্ছা-সমূহ মূলতঃ তিন শ্রেণীতে আবদ্ধ। হয় জব্যার্থক, নতুবা গুণার্থক, নতুবা শক্ত্যর্থক ইচ্ছা ছাড়া কোন মানুষের আর কোন শ্রেণীর ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে না।

কোন মানুষের কোন শ্রেণীর ইচ্ছার মাত্রাও অপরিমিত হইতে পারে না। তিন শ্রেণীর ইচ্ছার মধ্যে জব্যেরই হউক, আর গুণের হউক, আর শক্তিরই হউক, মানুষ হয় তাহার নিজের নিজের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্ত, নতুবা তাহার প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্ত, নতুবা তাহার শরণাগত জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কোন মানুষের নিজের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্ত, অথবা প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্ত, অথবা শরণাগত জনের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির জন্ত, কোন দ্রব্য অথবা কোন গুণ অথবা কোন শক্তি অপরিমিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয় না। কোন দ্রব্যের অথবা কোন গুণের অথবা কোন শক্তির যখন কোন মানুষের অভাব থাকে, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ঐ অভাব পূরণের জন্ত অপরিমিত পরিমাণের দ্রব্য, গুণ, ও শক্তি প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয়। যখন মানুষের অভাব থাকে তখন উহা মনে হয়, বটে কিন্তু যখন অভাব পূরণের ব্যবস্থা হয় এবং ঐ অভাব পূরণের জন্ত পরিবেশন হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক মানুষই “আর না, আমি আর চাই না” এবিধভাবে অতি অনায়াসে পোষণ ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। যখন কেহ ত্বরিত ভোজনের আয়োজন করেন তখন উপরোক্ত কথার উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমগ্র ভূমণ্ডলের মনুষ্যসংখ্যা অসংখ্য নহে। কোন একটা মানুষের তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের জন্ত অতিলব্ধি অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের অথবা গুণসমূহের অথবা শক্তিসমূহের পরিমাণ অপরিমিত হয় না।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা নিঃসন্দেহভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মানুষের ইচ্ছাসমূহ আপাতদৃষ্টিতে অসংখ্য বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাসমূহের শ্রেণী যেরূপ সীমাবদ্ধ সেইরূপ দীপ্তিত দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহের পরিমাণও সীমাবদ্ধ। ইচ্ছাসমূহের শ্রেণী এবং দীপ্তিত দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহের পরিমাণ যখন সীমাবদ্ধ তখন মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা অসম্ভব—এবিধ সিদ্ধান্ত

অনার্যসে করা চলে না। পরন্তু, মানুষের নিজের এবং তাঁহার সর্ববিধ ইচ্ছা পূরণের সর্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও শক্তির উৎপাদন যে জল, মাটি ও হাওয়ার হইতে সম্ভব হয়, সেই জল, মাটি ও হাওয়ার উৎপত্তি ও পরিণতি প্রকৃতির যে-যে নিয়মে স্বতঃই সাধিত হইয়া থাকে, সেই-সেই নিয়মের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা খুবই সম্ভব। মনুষ্যসমাজে যখন মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা অবিদ্যমান থাকে এবং যখন অধিকাংশ মানুষ নানারূপ অভাবে হাবুডুবু খাইতে থাকে, তখন ইহা বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যসমাজ প্রকৃতির নিয়ম সৰ্ব্বদা অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একটি অথবা একাধিক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা খুবই সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন দেশের কোন একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কোন দেশের কোন একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে যে কোন দেশের কোন একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না—তাঁহার প্রধান কারণ এই যে, কোন একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের জৈপ্ত সর্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও শক্তির সর্বশ্রেণীর অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রাচুর্য সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে যে ভেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে সেই মিশ্রণের মধ্যস্থ ভেজের পরিমাণের অথবা রসের পরিমাণের বাহাতে একটীর তুলনার আর একটীর বৃদ্ধি সাধিত না হইতে পারে এবং না হয়, তাঁহার ব্যবস্থা করা সর্বোপায় প্রয়োজনীয় হইয়া

থাকে। প্রত্যেক স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে যে ভেজ ও রসের মিশ্রণ থাকে সেই মিশ্রণের মধ্যস্থ ভেজের পরিমাণের অথবা রসের পরিমাণের একটীর তুলনার আর একটীর বৃদ্ধি সাধিত হইলে একদিকে হাওয়া বেল্প অতিরিক্ত গরম অথবা ঠাণ্ডা এবং অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হয়, সেইরূপ আবার জমি ও জলের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোন স্থানের হাওয়া অস্বাস্থ্যকর অথবা অপ্রীতিকর হইলে সেই স্থান হইতে বহুদূর পর্যন্ত মানুষের জৈপ্ত সর্ববিধ গুণ ও শক্তি সর্বতোভাবে অর্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কোন স্থানের জমি ও জলের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানের কোন একটি মানুষের পক্ষেও কোন কৃত্রিম উপায়ে জৈপ্ত সর্ববিধ দ্রব্য সর্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর উপযোগী ভাবে অথবা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। প্রকৃতির নিয়ম-সম্মত উপরোক্ত কথাগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞান নাই। বর্তমান বিজ্ঞানের ঐ কথা কয়েকটি জানা নাই বটে, কিন্তু ঐ কথা কয়েকটি সর্বতোভাবে সত্য। হাওয়ার ভেজের তুলনার রসের আধিক্য হইলে হাওয়া যে অতিরিক্ত শীতল হয় এবং রসের তুলনার ভেজাধিক্য হইলে হাওয়া যে অতিরিক্ত গরম হয়, হাওয়া অতিরিক্ত গরম অথবা শীতল হইলে উহা যে অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হয়, হাওয়া অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হইলে কোন কৃত্রিম উপায়ে যে মানুষের শরীরের ও মনের স্বাস্থ্য অথবা জৈপ্ত গুণ ও শক্তি সর্বতোভাবে রক্ষা করা ও বৃদ্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা যে কেহ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমান করিতে পারেন। জমির মধ্যে রসের তুলনার ভেজাধিক্য ঘটিলে যে জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা মরুভূমির অবস্থা হইতে এবং ভেজের তুলনার রসাধিক্য ঘটিলে যে জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাহা জলাভূমির অবস্থা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে যে মানুষের সর্ববিধ জৈপ্ত দ্রব্য ঐ জমি হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহাও মরুভূমির এবং জলাভূমির অবস্থা হইতে অনুমান করা যায়। জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ঐ জমি হইতে কৃত্রিম উপায়ে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয়—সেই সমস্ত দ্রব্যের কোনটি যে মানুষের স্বাস্থ্য সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু প্রত্যেকটি যে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহা আজকালকার বিজ্ঞান হইতে মানুষ যে সমস্ত সংস্কার লাভ করিয়াছে, সেই সমস্ত সংস্কারের ফলে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছে। উহা এক্ষণে মানুষের বুঝা অসাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ভারতবর্ষে চল্লিশ বৎসর আগে যে সমস্ত ধাত-

শত বৈজ্ঞানিক কোন উপায়ের বিনা সাহায্যে উৎপন্ন হইত সেই সমস্ত খাদ্যশস্য হইতে উৎপন্ন খাদ্যসমূহের স্বাদের সহিত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন খাদ্যশস্য হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ তুলনা করিলে উহা অস্বাদিকভাবে বুঝা সম্ভবযোগ্য হয়।

জলের মধ্যে ভেজের তুলনার রসের আধিক্য ঘটিলে অথবা রসের তুলনার তেজের আধিক্য ঘটিলে যে জলের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা কতিপয় শ্রেণীর ডোবার ও কতিপয় শ্রেণীর নলকূপের জল সেচন করিয়া জমিকে কৃষিযোগ্য করিবার চেষ্টা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কোন একটি স্থানের একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের দৈনন্দিন সর্ববিধ দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে ঐ স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদিকা শক্তির প্রাকৃতিক উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত কথার উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখান হইয়াছে। আমরা ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিতে চাই না।

জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যে, যে কোন মানুষের অভিলষিত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তির প্রাচুর্য্য সাধন করিবার ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই ইহা দেখা যায় যে, কোন একটি দেশের একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলেই সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ—

কোন এক স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের কোন স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের কোনও স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের জমির, জলের ও হাওয়ার

অখণ্ডতা নিবন্ধন যে-কোন একটি স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা হইতে অস্বাদিক পরিমাণে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র জমি-ভাগের, সমগ্র জল-ভাগের এবং সমগ্র হাওয়া-ভাগের তেজ ও রসের মিলিতভাবে অসমতা সংঘটিত হইতে পারে। সমগ্র ভূমণ্ডলের কোনও স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, যে দেশের যে মানুষের ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হয়, সেই দেশের পক্ষে এবং সেই মানুষের পক্ষে কোন না কোন একটি স্থানের জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয়।

সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই যে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্থানের জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা সর্বতোভাবে নিবারিত হয়, তাহা নহে। ঐ আশঙ্কা সর্বতোভাবে যদিও নিবারিত হয় না, তথাপি কোন একটি দেশের কোন একটি অথবা একাধিক সংখ্যার মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলেই সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। নতুবা, কোন ক্রমেই সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র জমি, জল ও হাওয়া-ভাগের অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে এবং ঐ অসমতা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাত্তরিত নহে। এই মতবাদ সর্বতোভাবে সত্য নহে। জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ অসমতা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে না। উহা যেমন প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে সেইরূপ আবার মানুষের কৃত কাৰ্য্যে ঘটিতে পারে ও ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতা বধন ঘটে তখন প্রকৃতির কাৰ্য্যেই আবার স্বতঃই ঐ তেজ ও রস সমতাবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কৃত কোন কাৰ্য্য বশতঃ তেজ ও

রসের অসমতা ঘটতে থাকিলে এ’ অসমতা স্বতঃই দূর হয় না। উহা দূর করিতে হইলে উহা দূর করিবার পন্থা মানুষের জানিবার প্রয়োজন হয় এবং এ’ পন্থা অনুসারে মানুষের কার্য করিতে হয়। উহা দূর করিবার জন্য মানুষের ব্যবস্থা সাধিত না হইলে উহা দূর করা সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের যে অসমতা ঘটে সেই অসমতা প্রাকৃতিক কার্যের নিয়মানুসারে ঘটয়া থাকে। উহা বধন তখন ঘটতে পারে না এবং ঘটে না। উহা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাত্তর্গত নহে। তেজ ও রসের এ’ অসমতা আবার স্বতঃই প্রাকৃতিক নিয়মে সমতাপন্ন হয় বলিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য মানুষের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রস যে অসমতা নিয়মিতরূপে ঘটয়া থাকে সেই অসমতার ফলে জমি, জল ও হাওয়ার উৎপাদিকা ও স্বাস্থ্য-প্রদায়িকা শক্তি কথঞ্চৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হয় বটে— কিন্তু উৎপাদিকা ও স্বাস্থ্যপ্রদায়িকা শক্তির ঐ হ্রাসতা পূরণ করা সর্বতোভাবে মানুষের সাধ্যাত্তর্গত। এ’ হ্রাসতা যাঁহাতে পূরণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা মানুষের সাধ্যাত্তর্গত এবং মানুষের ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে উহা সমগ্র ভূ-মণ্ডলের জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা নিবারণ না করিতে পারিলে যেমন কোন এক অথবা একাধিক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন এক অথবা একাধিক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, মানুষের মধ্যে কাহারও কাহারও কতিপয়সংখ্যক অভাবের বিস্তারিত আনিবাধ্য হয়। বাহ্যিক অভাবগ্রস্ত তাহার অভাবশূন্য মানুষগণকে হয় প্রভাষণ করিয়া, নতুবা লুপ্তন করিয়া, নতুবা চৌধ্যপ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া, হয় অভাবগ্রস্ত নতুবা অশান্তিগ্রস্ত করিয়া থাকেন। এই কারণে কতিপয়সংখ্যক মানুষের অভাবগ্রস্ততা বশতঃ অভাবশূন্য মানুষগণও পুনরায় অভাবগ্রস্ত ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কোন এক দেশের একটা অথবা একাধিক সংখ্যক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার কারণ সৰ্ব্বদে বৈশম্য কথ্য বলা হইল

সেই সমস্ত কথা হইতে দেখা যায় যে, উহার কারণ দুই শ্রেণীর; যথা :

- (১) জমি, জল ও হাওয়ার অন্তরস্থিত তেজ ও রসের অসমতার আশঙ্কা নিবারণ করিবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ;
 - (২) অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রভাষণ-প্রবৃত্তি, চৌধ্যপ্রবৃত্তি ও লুপ্তনপ্রবৃত্তি নিবারণ করিবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা।
- উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কারণ ছাড়া আরও একাধিক শ্রেণীর কারণ বশতঃ সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কোন এক দেশের কোন একটা অথবা একাধিক সংখ্যক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, সেই সেই অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিসূত্র কি কি তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারিলে উপরোক্ত কারণসমূহ বুঝা যায় না। কাহেই অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলসূত্রের কথা না বলিয়া আমরা এ’ সমস্ত কারণের কথা আলোচনা করিতে পারি না। পাঠকগণকে শুধু এইটুকু জানিয়া রাখিতে হয় যে, কোন মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে উহা কেবলমাত্র কোন একজন মানুষের চেষ্টায় সাধিত হইতে পারে না। উহার জন্য সজ্জবদ্ধ মানুষের চেষ্টা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। মানুষের সমাজের মধ্যে কোথায়ও ঘেঁষ-হিংসা থাকিলে মানুষের সর্বতোভাবে কোন শ্রেণীর সজ্জবদ্ধতা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের কোন সজ্জবদ্ধতা সর্বতোভাবে সাকল্যমণ্ডিত করিতে হইলে একদিকে যেদিক মানুষের ঘেঁষ-হিংসা-প্রবৃত্তির সর্বতোভাবে সংযত করিবার প্রয়োজন হয় সেইরূপ আবার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেক মানুষ বাহ্যতে সজ্জবদ্ধ জন্তু কার্য করে তাহার প্রবৃত্তি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। উভয়তঃই কাহারও সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, নতুবা বাহ্যিক এ’ ব্যবস্থার বাহিরে থাকেন তাঁহাদিগের রাগ, ঘেঁষ ও হিংসা-প্রবৃত্তি আনিবাধ্য হয় এবং মানুষের সজ্জবদ্ধতা অসম্ভব হয়। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অভাবের অবশ্রুতাব্য পরিণাম

বাহ্যিক মনে করেন যে, সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা না হইলেও একরকম ভাবে জীবন কাটাওয়া দেওয়া সম্ভবযোগ্য, তাঁহাদিগকে মনুষ্যবর্গের পশুর প্রবৃত্তিবৃত্ত বুলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। সমগ্র মনুষ্য-

সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা মানুষ-সমাজে অবিচ্ছিন্ন থাকিলে, মানুষের অবস্থা পশুপক্ষীর অবস্থা অপেক্ষাও হীন হয়। আমাদের এই কথা সত্যতা সর্বশ্রেণীর মানুষ সর্বসময়ে বুঝিতে সক্ষম হয় না বটে, কিন্তু এ কথা যে সত্য তাহা বর্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধকালীন মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষ-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অভাব থাকিলে, কোন দেশের কোন মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া সম্ভবযোগ্য ও অনিশ্চিত না হইলে, কোন না কোন শ্রেণীর অভাব অনিবার্য হইয়া থাকে। মানুষের কোন না কোন শ্রেণীর অভাবের উৎপত্তি হইলে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে অর্থোক্তিক অসুযোগ ও ঘেঁষ অনিবার্য হয়। অর্থোক্তিক অসুযোগ ও ঘেঁষ অনিবার্য হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে একদিকে হিংসা ও মতানৈক্য এবং অন্যদিকে উদ্বেজনা—বিবাদ, ভ্রম—আলস্য অনিবার্য হয়।

উদ্বেজনা—বিবাদ অনিবার্য হইলে ক্রমে ক্রমে ঘৃণা-কলহ, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য হয়। ভ্রম—আলস্য অনিবার্য হইলে সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনাহার, অর্দ্ধাহার, ব্যাধি-গ্রস্ততা, ভয়সঙ্কুলতা, অশান্তি ও অকালমৃত্যু অপরিহার্য হইয়া থাকে।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা অবিচ্ছিন্ন থাকিলেই যে কার্য্যতঃ প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে সর্বদা পূরণ হয়, তাহা নহে। তখনও যাহারা অত্যাচার ও শিকার হইতাবশতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে অস্বাভাবিকভাবে অভাবগ্রস্ত হইতে হয়।

সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানুষসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার অভাব হইলে মানুষের অভাবগ্রস্ততার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বত অধিক হয় এ ব্যবস্থার অভাব না হইলে মানুষের অভাব-গ্রস্ততার ব্যাপকতা ও তীব্রতা তত অধিক কখনও হইতে পারে না। এ ব্যবস্থা মানুষসমাজে অবিচ্ছিন্ন থাকিলে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই সর্ব শ্রেণীর অভিজাত ভ্রাতা, গুণ ও শক্তির অভাবশূন্য হইয়া থাকেন।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অসুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম—

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতো-

ভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে সমস্ত অসুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় তাহা স্বাভাবিক সাত শ্রেণীর, যথা :

(১) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ;

(২) সমগ্র ভূমণ্ডলকে কতকগুলি দেশে, প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রামে, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামে, প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামকে কতকগুলি সামাজিক গ্রামে বিভাগ করিবার অসুষ্ঠান ;

(৩) সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র কার্য্যপরিচালনার সমগ্র কেন্দ্রীয় “কার্য্যপরিচালনা-সভার”, প্রত্যেক দেশের কার্য্যপরিচালনার সমগ্র “দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার”, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামের কার্য্যপরিচালনার সমগ্র “রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার” এবং প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামের কার্য্যপরিচালনার সমগ্র “সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার” প্রতিষ্ঠান ;

(৪) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ নয়টি কার্য্য-বিভাগে* প্রত্যেক দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ নয়টি কার্য্যবিভাগে* প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ নয়টি কার্য্যবিভাগে* এবং প্রত্যেক সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কার্য্যসমূহ ছয়টি কার্য্য বিভাগে* বিভক্ত করিবার অসুষ্ঠান।

* কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, প্রত্যেক দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টি কার্য্য-বিভাগের নাম :

(১) বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(২) বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৩) সীমানা রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৪) বিচার-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৫) কোষ-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৬) নিয়োগ ও নির্যাসন-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৭) জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৮) জনসাধারণের ও কর্ম্মিগণের কর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৯) জনসাধারণের খনপ্রাচুর্য্য সাধনবিষয়ক কার্য্যবিভাগ।

একই রকমের লেন-দেনের সমস্ত তিন শ্রেণীর (অর্থাৎ কেন্দ্রীয়, দেশস্থ এবং রাষ্ট্রীয় গ্রামস্থ) কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর কার্য্যবিভাগ গঠিত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক বিভাগীয় কার্য্যবিভাগ বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিস্তৃত বিষয় “কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অসুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বটন” শীর্ষক আলোচনার বেগু হইয়াছে।

সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ছয়টি কার্য্য-বিভাগের নাম :

(১) বিচারবিষয়ক কার্য্যবিভাগ ;

(৫) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামে ঐ গ্রামস্থ প্রত্যেক অধিবাসীর যুগপৎ বাহাতে ধনাভাব নিবারিত অথবা দূরীভূত হইয়া ধনপ্রাপ্ত্য সাধিত হয়, পশু নিবারিত অথবা দূরীভূত হইয়া প্রকৃত মনুষ্য সাধিত হয় এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারিত অথবা দূরীভূত হইয়া কর্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধিত হয়—তাহা করিবার উদ্দেশ্যে তিন শ্রেণীর অমুষ্ঠান ;

(৬) প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের অষ্টাদশ বৎসর বয়সের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণকে চারি শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মান্তে বিভক্ত করিয়া প্রথম শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মগণের হস্তে পশু নিবারণ করিয়া মনুষ্য সাধন করিবার এবং অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মবাস্ত ও উপার্জনশীল জীবন সাধন করিবার ; এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মগণের হস্তে ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাপ্ত্য সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পণ করিবার অমুষ্ঠান ;

(৭) মুখ্যতঃ বাহাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মগণের এবং চারিশ্রেণীর কাষাপরিচালনা-সভার কর্ম্মগণের অথবা চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক কর্ম্মগণের কেহ যথেষ্টাচারী না হইতে পারেন এবং গোপতঃ বাহাতে জনসাধারণের প্রত্যেকে চারিশ্রেণীর কাষাপরিচালনা-সভার প্রত্যেক নির্দেশ (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ) স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পালন করেন এবং তজ্জন্ত কাহাকেও প্রত্যাক্ততঃ অথবা পরোক্ততঃ কোন রকমের ভয় দেখাইবার প্রয়োজন না হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক কাষাপরিচালনা-সভার সংশ্রবে জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি করিয়া জনসভার প্রতিষ্ঠান ।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় যে সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইল, সেই সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার মুখ্যমুষ্ঠান—প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের তিন শ্রেণীর অমুষ্ঠান। ঐ তিন শ্রেণীর অমুষ্ঠান বাহাতে প্রত্যেক

সামাজিক গ্রামে স্বতঃই সাধিত হয় এবং ঐ তিন শ্রেণীর অমুষ্ঠানের প্রত্যেকটির সর্ববিধ উদ্দেশ্য বাহাতে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় তদ্বিষয়ে সুনিশ্চিত হইবার জন্য আর হয় শ্রেণীর অমুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয় ।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা

সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের

মূলনীতিসমূহের পূর্ববাস্ত

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার যে-সমস্ত অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিসমূহ কি কি তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার মূল সঙ্কেত কি কি তাহা নির্ধারণ করিতে হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার মূল সঙ্কেত কি কি তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মানুষের ইচ্ছা ও অভাব মূলতঃ কয় শ্রেণীর—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয় ।

আগেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা মূলতঃ তিন শ্রেণীর ; যথা—(১) দ্রব্যার্থক ইচ্ছা, (২) গুণার্থক ইচ্ছা ও (৩) শক্ত্যর্থক ইচ্ছা। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা যেরূপ তিন শ্রেণীর, সেইরূপ মানুষের যে সমস্ত রকমের অভাব হইতে পারে ও হয়, সেই সমস্ত রকমের অভাবও মূলতঃ তিন শ্রেণীর ; যথা : (১) দ্রব্যমূলক অভাব (২) গুণমূলক অভাব ও (৩) শক্তিমূলক অভাব। মানুষের ইচ্ছা অথবা অভাব যে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অতিরিক্ত হইতে পারে না তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারে।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সঙ্কেত কি কি তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার আদৌ প্রয়োজন হয় কেন, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিবার প্রয়োজন হয় ।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার আদৌ প্রয়োজন হয় কেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভে “মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা” শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি। ঐ আলোচনার

(২) কোষবিষয়ক কার্যবিভাগ ;

(৩) নিরোগ ও নির্দোষ-বিষয়ক কার্যবিভাগ ;

(৪) জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা ও সাধনাবিষয়ক কার্যবিভাগ ;

(৫) জনসাধারণের ও কর্ম্মগণের কর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ক কার্যবিভাগ ;

(৬) জনসাধারণের ধনপ্রাপ্ত্য সাধন-বিষয়ক কার্যবিভাগ ।

আমরা বলিয়াছি যে, “মানুষের বাহাতে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার পরিকল্পনা মানুষসমাজে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।”

মানুষের বাস্তবজীবন লক্ষ্য করিলে ইহা মনে করিতে হয় যে, মানুষের যত্বে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার কোন পরিকল্পনার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না। মানুষের জন্ম, পরিণতি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যেসকল প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ স্বতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ যদি প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ স্বতঃই কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা স্বতঃই সর্বতোভাবে পূরণ হইত, তাহা হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার কোন পরিকল্পনার আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানুষের নানাবিধ অভাব স্বতঃই উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং অভাবই মানুষের দুঃখের কারণ হয় বলিয়া, মানুষের বাহাতে কোন রকমের অভাবের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ ব্যবস্থারই অপর নাম “মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা”।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষের সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। উহা বুঝা যায় বটে কিন্তু স্বতঃই মানুষের অভাবসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সম্বন্ধ কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করা যায় না।

স্বতঃই মানুষের অভাবসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে স্বতঃই মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা নির্ধারণ করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ইহার কারণ—স্বতঃই মানুষের অভাবসমূহের উৎপত্তি হয় কেন তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ কারণে স্বতঃই মানুষের ইচ্ছাসমূহের অপূরণ হওয়া সম্ভব হয় তাহা জানা আবশ্যকীয় হয় এবং ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা জানা না থাকিলে স্বতঃই ইচ্ছাসমূহের অপূরণ হওয়া সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা জানা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের অভাবসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্ধারণ করা যায়। মানুষের ইচ্ছাসমূহের ও অভাবসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্

কারণে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সম্বন্ধ কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করা যায়। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সম্বন্ধ কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলে সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রয়োজনীয় সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের নীতিমূত্র কি কি হওয়া উচিত, তাহাও নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করা যায়।

স্বতঃই মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কেন, তাহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারিটি বেদ ছাড়া আর কোন ভাষায় লিখিত আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারিটি বেদ ছাড়া আর কোন ভাষায় লিখিত আর কোন গ্রন্থে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু যখন যে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, সেই ইচ্ছা মনের মধ্যে কিরূপভাবে কার্য্য করে, তাহা যত্বে মানুষ উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে উপরোক্ত উপলব্ধির অভ্যাসদ্বারা এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারিটি বেদের সংস্কৃত ভাষা যে-পদ্ধতিতে পড়িতে হয় ও বুঝিতে হয় সেই পদ্ধতির সহিত এখন আর কোন সংস্কৃত পণ্ডিত পরিচিত নহেন। মানুষের ইচ্ছা মানুষের মনের মধ্যে যে যে ভাবে কার্য্য করে সেই সেই ভাবে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে যে সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, সেই সেই সম্বন্ধের সহিতও এখন আর কোন মানুষ সর্বতোভাবে পরিচিত নহে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর পরিচয়ের অভাববশতঃ মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করা আধুনিক কালের কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। উহা সম্ভবযোগ্য হয় না বটে কিন্তু মানুষের ইচ্ছাসমূহ স্বতঃই উদ্ভূত হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিলে, মানুষের অভাবসমূহের স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। মানুষের অভাবসমূহের স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সম্বন্ধ নির্ধারণ করা যায় না। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে না পারিলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি-মূত্র নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

যেটি কথা, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান

সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের মূল-নীতি-স্বত্র কি কি তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহের ও বিবিধ শ্রেণীর অভাবের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের বধন অভাব হয়, তখন তাহার ব্যাখ্যা করিবার অন্ততম উপায়—মানুষের ও অন্তান্ত যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সমস্ত পদার্থের উপাদানের ও উপাদানের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের ব্যাখ্যা করা। ইহার কারণ, মানুষের উপাদানে যতগুলি তাহার ইচ্ছাসমূহের বীজ বিস্তারিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন শ্রেণীর ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে পারে না এবং ঐ কারণে উপাদানসমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ নিয়মে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আমরা অতঃপর মানুষের ও অন্তান্ত প্রকৃতিজাত পদার্থের উপাদানের ও উপাদানের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য কথা পাঠকগণকে শুনাইব।

মানুষের ও অন্তান্ত প্রকৃতিজাত পদার্থের উপাদান ও তদন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা

মানুষের ইচ্ছাসমূহের সহিত মানুষের অবয়ব অঙ্গাদী ভাবে জড়িত। মানুষের অবয়ব যদি বিস্তারিত না থাকিত তাহা হইলে মানুষের কোন বিষয়ে কোন ইচ্ছা করা সম্ভব-যোগ্য হইত না। মানুষের অবয়বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাসমূহেরও পরিবর্তন স্বতঃসিদ্ধ হয়। বালকের ইচ্ছা আর যুবকের ইচ্ছা, এই দুইএর মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায় তাহার মৌলিক কারণ বালকের অবয়ব আর যুবকের অবয়বের পার্থক্য। অবয়বের পার্থক্যমানুষের ইচ্ছাসমূহের পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ হয় বলিয়া ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মানুষের অবয়বের মূল উপাদান কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। মানুষের অবয়বের মূল উপাদান তিন শ্রেণীর, যথা :—

(১) দ্রব্যগত উপাদান, (২) গুণগত উপাদান এবং (৩) শক্তিগত উপাদান। এই তিন শ্রেণীর উপাদানের প্রত্যেকটি আবার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। পাঁচ শ্রেণীর দ্রব্যগত উপাদানের নাম—(১) স্থূল দ্রব্যগত উপাদান, (২) তরল দ্রব্যগত উপাদান, (৩) বায়বীয় দ্রব্যগত উপাদান, (৪) বায়বীয়

দ্রব্যগত উপাদান এবং (৫) বোম্বীয় দ্রব্যগত উপাদান। পাঁচ-শ্রেণীর গুণগত উপাদানের এবং শক্তিগত উপাদানের নামও দ্রব্যগত উপাদানসমূহের নামের অনুরূপ হইয়া থাকে। যথা—স্থূল দ্রব্যগত গুণ, তরল দ্রব্যগত গুণ, স্থূল দ্রব্যগত শক্তি, তরল দ্রব্যগত শক্তি—ইত্যাদি।

মানুষের অবয়ব তাহার গুণ ও শক্তির সহিত অঙ্গাদী ভাবে জড়িত বলিয়া মানুষের নানা রকম পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। কোন রকম পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্য অথবা গুণ অথবা শক্তি) লাভ করিবার প্রবৃত্তির নাম ইচ্ছা। সংক্ষেপতঃ মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তির কারণ মানুষের অবয়বস্থ গুণ ও শক্তি। মানুষের অবয়বে যতগুলি গুণ ও শক্তি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের কোন কাম অথবা ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে পারিত না, এবং মানুষ নিজাম অথবা কামনাশূন্য হইতে পারিত। কিন্তু গুণ ও শক্তিশূন্য মানুষ হইতে পারে না। তাহার কারণ দ্রব্য, গুণ ও শক্তি ছাড়া কোন প্রাকৃতিক অবয়ব হইতে পারে না। যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার সাধন করিবার শক্তিযুক্ত, সেই সমস্ত পদার্থের অবয়বের গুণ ও শক্তির বিস্তারিততা বশতঃ স্বতঃই তাহাদিগের নানা রকম পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব স্বতঃই সাধিত হয় না, পরন্তু কোন না কোন মানুষের নৈপুণ্য বশতঃ সর্বতোভাবে মানুষের দ্বারা সাধিত হয় এবং তাহাদিগকে চলতি ভাষায় কৃত্রিম অথবা মৃত পদার্থ বলা হয়, সেই সমস্ত পদার্থের কোন প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না এবং তাহাদের কোন প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না বলিয়া তাহাদিগের কোন ইচ্ছারও উদ্ভব হয় না। ঐ সমস্ত কৃত্রিম পদার্থের যে কোন প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না—তাহার কারণ ঐ সমস্ত পদার্থের নানাবিধ গুণ থাকে বটে কিন্তু তাহাদিগের স্বতঃই কোন নিজস্ব শক্তির উদ্ভব হয় না। যখন মানুষ ঐ কৃত্রিম পদার্থসমূহের মধ্যে শক্তি সঞ্চারণ করে কেবলমাত্র তখনই উহাদের শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। মানুষ যত পরিমাণের শক্তি কৃত্রিম পদার্থে সঞ্চারিত করে, কেবলমাত্র তত পরিমাণের শক্তিই কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে এবং তাহার একটুও বেশী শক্তি কোন কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইলে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার সাধন করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত পদার্থের স্বতঃই অন্তান্ত রকম পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় কিন্তু বাহ্যিক কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার

করিবার শক্তিযুক্ত হয় না, তাহাদিগের নানারকমের শক্তির উদ্ভব স্বতঃই হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাদিগেরও অস্ত্র কোন পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না।

যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তাহাদিগের স্বতঃই নানা রকমের শক্তির উদ্ভব হইবার কারণ এই যে, যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় সেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়—সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার (constant, non-variable, variable, aerial and gaseous condition of all pervading mixture of heat and moisture-এর) কার্য (work) বশতঃ। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর অবস্থার কার্য এই ভূমণ্ডলে স্বতঃই চলিতে থাকে বলিয়া এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় সেই সমস্ত পদার্থের শক্তিও স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার কার্য যত শ্রেণীর হইয়া থাকে, মানুষের কার্য কখনও তত শ্রেণীর হইতে পারে না এবং সর্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের পাঁচ শ্রেণীর অবস্থার কার্য যে রূপ স্বতঃই চলিতে থাকে মানুষের কোন কার্য সে রূপ স্বতঃই চলিতে পারে না বলিয়া মানুষ যে সমস্ত কৃত্রিম পদার্থের উৎপাদন করে সেই সমস্ত কৃত্রিম পদার্থের কোনটাই কোন শক্তি স্বতঃই উদ্ভব অথবা সঞ্চারিত হইতে পারে না।

এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তাহাদিগের প্রত্যেকটির গুণ এবং শক্তির উদ্ভবও স্বতঃই সাধিত হয় বটে, কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব সর্বশ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের হয় না। অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের, যে শ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের প্রকৃতির নিয়ম ব্যতিচার করিবার শক্তির উদ্ভব হয়।

পদার্থের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত কৃত্রিম ও প্রকৃতি-জাত পদার্থ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটিরই গুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রত্যেকটিরই স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে না। কৃত্রিম পদার্থের প্রত্যেকটিরই গুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু কোনটিরই স্বাভাবিক শক্তি অথবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে না ও থাকে না। স্বাভাবিক শক্তি অথবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান না থাকিলে অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিও (অর্থাৎ ইচ্ছাও) কোনরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এই কারণে কোন শ্রেণীর কৃত্রিম

পদার্থের কোনরূপ স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে না ও থাকে না।

প্রকৃতিজাত প্রত্যেক পদার্থেরই স্বাভাবিক শক্তি থাকে বটে কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সর্বশ্রেণীর প্রাকৃতিক পদার্থের থাকে না। যে শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থ স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তিযুক্ত হয়, কেবলমাত্র সেই সমস্ত পদার্থের অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির (অর্থাৎ ইচ্ছার) উদ্ভব হয়। যে সমস্ত প্রকৃতিজাত পদার্থের প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তির উদ্ভব হয়, কেবলমাত্র সেই সমস্ত প্রকৃতিজাত পদার্থের স্বতঃই প্রবৃত্তিসমূহের উদ্ভব হয় এবং কেবলমাত্র তাহারাই অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছাযুক্ত) হইয়া থাকে।

এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে বাহ্যার চরণ-শক্তিযুক্ত এবং বাহাদিগকে চলুতি ভাবায় চরজীব বলা হয়, কেবলমাত্র তাহার প্রকৃতির নিয়ম-সমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। এই হিসাবে প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র চরজীবগণের স্বতঃই নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় এবং কেবলমাত্র তাহারাই স্বতঃই অস্ত্রাস্ত্র পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছাযুক্ত) হইয়া থাকে।

চরজীবগণ যে স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার কারণ—তাহাদিগের অবয়বস্থ পাঁচ শ্রেণীর দ্রব্যগত উপাদানের মধ্যে বোম্বীয়, তরল ও স্থূল দ্রব্যগত উপাদানের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় দ্রব্যগত উপাদানের গুণ ও শক্তির আধিক্য। ঐ আধিক্য বশতঃ চর জীবগণের চরণ-শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ঐ আধিক্য বশতঃই তাহার প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তিযুক্ত এবং নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছা করিবার প্রবৃত্তির সহিত অঙ্গাদী ভাবে জড়িত) হইয়া থাকে।

চরজীবগণের ভিতর মানুষের অবয়বস্থ বোম্বীয়, তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তি যত অধিক, অস্ত্রাস্ত্র চরজীবের অবয়বস্থ বোম্বীয়, তরল ও স্থূল উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানসমূহের গুণ ও শক্তি তত অধিক হয় না। এই কারণে প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তি মানুষের যত অধিক হইতে পারে, অস্ত্রাস্ত্র কোন শ্রেণীর চরজীবের ঐ শক্তি তত অধিক হইতে পারে না। মানুষ ছাড়া অস্ত্রাস্ত্র শ্রেণীর চরজীবের প্রকৃতির নিয়ম-সমূহের ব্যতিচার করিবার প্রাকৃতিক শক্তিবশতঃ চরণ-শক্তির এবং ভৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার

প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের বাহ্য অথবা তৃপ্তি সাধনের বিরুদ্ধ, সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার কোন প্রবৃত্তি মানুষ ছাড়া অজ্ঞাত শ্রেণীর চরকীবের স্বতঃই কখনও উদ্ভব হয় না। যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের বাহ্য এবং তৃপ্তি সাধনে সর্বতোভাবে সক্ষম—মানুষ ছাড়া অজ্ঞাত চরকীবের কেবলমাত্র সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির স্বতঃই উদ্ভব হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের বাহ্য এবং তৃপ্তি সাধনে সর্বতোভাবে অক্ষম, সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার ও ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি একমাত্র মানুষের স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) স্ব স্ব অবয়বের বাহ্য সর্বতোভাবে সাধনে অক্ষম, কেবল মাত্র আংশিকভাবে তৃপ্তি সাধনের জন্য সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার ও ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি, আবার, যে সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব অবয়বের সর্বতোভাবে তৃপ্তি সাধনে অক্ষম, কেবলমাত্র আংশিকভাবে বাহ্য সাধনের জন্য সেই সমস্ত পদার্থ লাভ করিবার ও ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি একমাত্র মানুষের স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার প্রাকৃতিক শক্তি বশতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর চরকীবের চরণ-শক্তির এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থ লাভ করিবার প্রবৃত্তির স্বতঃই উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু একমাত্র মানুষ ছাড়া অজ্ঞ কোন শ্রেণীর চরকীবের নিজ নিজ অবয়বে প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করিবার বিরুদ্ধ গুণ ও শক্তিসমূহ (অর্থাৎ বৈকৃতিক) কোন শ্রেণীর পদার্থ (অর্থাৎ কোন শ্রেণীর দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই উদ্ভূত হয় না। নিজ নিজ অবয়বে প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করিবার বিরুদ্ধ গুণ ও শক্তিসমূহ (অর্থাৎ বৈকৃতিক) পদার্থসমূহ (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও শক্তিসমূহ) লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি একমাত্র মনুষ্যজাতির স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার কারণ মানুষের অবয়বস্থ বারবীর ও বাম্পীর উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের তুলনায় ব্যোমীর, তরল ও স্থূল উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের পার্থক্য বহু অধিক, অজ্ঞাত শ্রেণীর চরকীবের অবয়বস্থ বারবীর ও বাম্পীর উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের তুলনায় ব্যোমীর, তরল ও স্থূল উপাদানের গুণ ও শক্তির পরিমাণের পার্থক্য তত অধিক হয় না। উপরোক্ত আধিক্য বশতঃ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তি মানুষের বহু অধিক হইতে পারে এবং হয়, অজ্ঞাত শ্রেণীর চরকীবের ঐ শক্তি তত অধিক হইতে পারে না এবং হয় না।

প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তির

আধিক্য বশতঃ বৈকৃতিক পদার্থসমূহ লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি যেমন একমাত্র মনুষ্য জাতির স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তিকে সংবর্ত করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তিও ব্যাতিচার করিবার শক্তির আধিক্যবশতঃ একমাত্র মনুষ্যজাতির স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। বৈকৃতিক কোন পদার্থ লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার কোন প্রবৃত্তি যেমন মনুষ্য ছাড়া অজ্ঞ কোন শ্রেণীর চরকীবের স্বতঃই উদ্ভূত হয় না, সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তিকে সংবর্ত করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তিও মনুষ্যজাতি ছাড়া অজ্ঞ কোন শ্রেণীর চরকীবের স্বতঃই উদ্ভূত হয় না।

বৈকৃতিক কোন পদার্থ লাভ করিবার অথবা উপভোগ করিবার কোন প্রবৃত্তি মনুষ্যজাতি ছাড়া অজ্ঞ কোন শ্রেণীর চরকীবের স্বতঃই উদ্ভূত হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্যজাতি বহন প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তিকে সংবর্ত করিবার শক্তির ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া বৈকৃতিক পদার্থসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি-সমূহকে প্রশ্রয় প্রদান করে, তখন মানুষের কার্যবশতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই বৈকৃতিক গুণ ও শক্তির উদ্ভব হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর চরকীবেরই বৈকৃতিক পদার্থসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিসমূহের উদ্ভব হয়।

মানুষের ও অজ্ঞাত শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উপাদানের ও উপাদানের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা উপরে বলা হইল, সেই সমস্ত কথা বৃষ্টিতে পারিলে মানুষের ইচ্ছাসমূহের এবং অতাব-সমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে, তাহা নির্ধারণ করা যায়। ঐ সমস্ত কথা বৃষ্টিতে পারিলে একদিকে যেমন মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে—তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সেইরূপ আবার মানুষের ইচ্ছাসমূহের শ্রেণীবিভাগের কারণ কি কি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা বৃষ্টিতে পারিলে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর অতাবের উৎপত্তি হয় কেন—তাহা বৃষ্টিতে পাওয়া যায়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহের যে স্বতঃই উৎপত্তি হয় তাহার মূল কারণ

মানুষের ইচ্ছা সমূহের যে স্বতঃই উৎপত্তি হয়, তাহার মূল কারণ—

মূলতঃ চারি শ্রেণীর কারণ বশতঃ মানুষের ইচ্ছাসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয়, যথা :

- (১) অবয়বস্থ সাধারণ গুণসমূহের বিস্তারিততা ;
- (২) অবয়বস্থ সাধারণ শক্তিসমূহের বিস্তারিততা ;
- (৩) প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তিসমূহের বিস্তারিততা। ইহার অপর নাম “ব্যাতিচার-মূলক” শক্তি ;
- (৪) প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তিসমূহ সংযত করিবার শক্তিসমূহের বিস্তারিততা। ইহার অপর নাম “সংযম-মূলক” শক্তি।

অবয়বস্থ সাধারণ গুণসমূহের বিস্তারিততা বশতঃ অবয়বস্থ সাধারণ শক্তিসমূহের উৎপত্তি হয়। অবয়বস্থ সাধারণ শক্তিসমূহের উৎপত্তি বশতঃ সাধারণ প্রকৃতিসমূহের উৎপত্তি হয়।

মানুষের অবয়ব মূলতঃ তিন শ্রেণীর উপাদান (যথা দ্রব্য, গুণ ও শক্তি) দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া মানুষ মূলতঃ ঐ তিন শ্রেণীর পদার্থ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বলা হয় যে, মানুষের ইচ্ছা মূলতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

- (১) দ্রব্যার্থক ইচ্ছা, (অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি) ;
- (২) গুণার্থক ইচ্ছা, (অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি) ;
- (৩) শক্ত্যার্থক ইচ্ছা, (অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তি লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি)।

প্রকৃতির নিয়মসমূহের ব্যাতিচার করিবার শক্তি এবং ঐ ব্যাতিচার করিবার শক্তিসমূহকে সংযত করিবার শক্তি মানুষের অবয়বে বিস্তারিত থাকে বলিয়া মানুষের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেকটি দুইটি করিয়া প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। দ্রব্যার্থক ইচ্ছাসমূহ কখন কখন প্রকৃতিব নিয়মসমূহের ব্যাতিচার প্রণোদিত হইয়া বিকৃতি সাধক দ্রব্যসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়, আবার কখন কখন ঐ ব্যাতিচার শক্তির সংযম সাধনে প্রণোদিত হইয়া সংযম সাধক দ্রব্যসমূহ লাভ করিবার ও উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়। গুণার্থক এবং শক্ত্যার্থক ইচ্ছাসমূহও ঐরূপ দুইটি প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

তিন শ্রেণীর ইচ্ছাই যখন ব্যাতিচার সাধক হয়, তখন পরিণতি মানুষের অনিষ্টজনক হয়, আর যখন সংযমসাধক হয়, তখন পরিণতি মানুষের ইষ্টজনক হয়।

দ্রব্য-শ্রেণীর, গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর ছাড়া আর কোন শ্রেণীর পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে

পারে না। তাহার কারণ মানুষের অবয়বে বাহ্য কিছু উৎপন্ন হয় ও বিস্তারিত থাকে, তাহার প্রত্যেকটি মূলতঃ হয় দ্রব্য-শ্রেণীর নতুবা গুণ-শ্রেণীর নতুবা শক্তি-শ্রেণীর। শুধু মানুষের শরীরে কেন, এই ভূমণ্ডলে বাহ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, নতুবা বাহ্য বাহ্য মানুষের কথার বিষয় হয়, তাহা মূলতঃ—হয় দ্রব্য-শ্রেণীর, নতুবা গুণ-শ্রেণীর নতুবা শক্তি-শ্রেণীর। দ্রব্য, গুণ ও শক্তি ছাড়া আর কোন পদার্থ এই ভূমণ্ডলে পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তি ও কর্মকে আপাত-দৃষ্টিতে পৃথক শ্রেণীর পদার্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুর পক্ষে প্রবৃত্তি ও কর্ম গুণ ও শক্তিরই বিকাশ এবং তাহাদিগকে মৌলিকতাবের কোন পদার্থ বলিয়া মনে করিবার যুক্তি পাওয়া যায় না। একে মানুষের অবয়বে দ্রব্য-শ্রেণীর, গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর পদার্থ ছাড়া আর কোন শ্রেণীর পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহার পর এই ভূমণ্ডলে দ্রব্য, গুণ ও শক্তি শ্রেণীর বহির্ভূত কোন পদার্থ হইতে পারে না—এই দুই কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, দ্রব্য, গুণ ও শক্তি ছাড়া আর কিছু মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা যে দুইটি প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং ঐ প্রত্যন্তর শ্রেণী বিভাগের মূল কারণ যে মানুষের অবয়বস্থ ব্যাতিচার শক্তির ও সংযম শক্তির বিস্তারিততা—তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষের ব্যাতিচার শক্তির বিস্তারিততা বশতঃ স্বতঃই মানুষের অভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর, সংযম শক্তির বিস্তারিততা বশতঃ সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষের অভাবসমূহের যে স্বতঃই উৎপত্তি হয়—তাহার কারণ

মানুষের অবয়বে স্বতঃই প্রাকৃতিক নিয়মে দুইটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর শক্তির (অর্থাৎ ব্যাতিচার শক্তির ও সংযম শক্তির) উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু ঐ দুইটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর শক্তি স্বতঃই সমান পরিমাণের হয় না। মানুষের অবয়বের ব্যোমীর, তরল ও স্থূল উপাদানের গুণ ও শক্তির তুলনায় বায়বীয় ও বাষ্পীয় উপাদানের গুণ ও শক্তির আধিক্য বশতঃ স্বভাবতঃ মানুষের সংযম-শক্তির তুলনায় ব্যাতিচার শক্তি অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ সংযম-শক্তির তুলনায় ব্যাতিচার শক্তি অধিকতর প্রবল হয় বটে, কিন্তু শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা ব্যাতিচার শক্তির হ্রাস সাধন করা, সংযম শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা এবং ব্যাতিচার শক্তির তুলনায় সংযম শক্তির প্রাবল্য সাধন করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত হইয়া থাকে। শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা ব্যাতিচার

* “সাধারণ গুণ” “সাধারণ শক্তি”—যে শ্রেণীর গুণ ও যে শ্রেণীর শক্তি চর ও অচর প্রকৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের অবয়বে বিস্তারিত থাকে, সেই শ্রেণীর গুণ ও সেই শ্রেণীর শক্তিকে “সাধারণ গুণ” ও “সাধারণ শক্তি” বলা হয়।

শক্তির হ্রাস সাধন করা, সংঘম শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা এবং ব্যক্তিগত শক্তির তুলনায় সংঘম শক্তির প্রাধান্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু যে শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা উহা করা সুনিশ্চিত হয়, সেই শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতি, প্রকৃতির সর্ববিধ নিয়ম সর্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে, নিঃসন্দেহ ভাবে নির্ধারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। স্বতাবতঃ (অর্থাৎ কোনও শ্রেণীর শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং শিক্ষা না পাইলে) সংঘম-শক্তির তুলনায় মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি যেরূপ প্রবল হইয়া থাকে, সেইরূপ যে শিক্ষা ও সাধনা মানুষের সংঘম-শক্তির বর্দ্ধক না হইয়া ব্যক্তিগত-শক্তির বর্দ্ধক হয়, সেই শিক্ষার এবং সাধনাতে মানুষের সংঘম-শক্তির তুলনায় ব্যক্তিগত-শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে শিক্ষা এবং সাধনাতে মানুষের ব্যক্তিগত শক্তির তুলনায় সংঘম শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা সহজসাধ্য ও সুনিশ্চিত হয়, সেই শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইলে সর্বোপায় সর্ববিধ প্রাকৃতিক নিয়ম সর্বতোভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যখন মনুষ্য-সমাজে মানুষের সংঘম-শক্তির বৃদ্ধির ও ব্যক্তিগত-শক্তির হ্রাসের সহায়ক শিক্ষা ও সাধনার অভাব বিদ্যুতিপ্রাপ্ত হয়, অথবা যখন ব্যক্তিগত-শক্তির বৃদ্ধির ও সংঘম-শক্তির হ্রাসের সহায়ক শিক্ষা ও সাধনার অভাব বিদ্যুত হয়, তখন মানুষ স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মের ব্যক্তিগত সাধন করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতির নিয়মের ব্যক্তিগত সাধিত হইতে থাকিলে সর্বোপায় মানুষের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিকৃত প্রাপ্ত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ (অর্থাৎ জ্বা, গুণ ও শক্তি) মানুষের অপকারক, সেই সমস্ত পদার্থকে মানুষ উপকারক বলিয়া মনে করিতে থাকে ও সেই সমস্ত পদার্থ লাভ ও উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। ইহার কারণ মানুষের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মানুগত কার্য অটুট ভাবে সাধিত না হইলে কোন মানুষের যথেষ্টাচার দ্বারা মানুষের বৃদ্ধির অথবা মনের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা শরীরের উৎপত্তি অথবা উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে মানুষ জমি, জল ও হাওয়ার অতিশয় ও পরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যক্তিগত সাধন করিতে আরম্ভ করে। জমি, জল ও হাওয়ার অতিশয় ও পরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যক্তিগত সাধিত হইতে থাকিলে জমি, জল ও হাওয়া হইতে মানুষের বাহ্যিক ও তৃপ্তির সহায়ক যে সমস্ত জ্বা, গুণ ও শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে সহজেই উৎপাদন করা অনায়াসসাধ্য হয়, সেই সমস্ত জ্বা, গুণ ও শক্তি

উৎপাদন করা কষ্টসাধ্য হয় এবং তৎফলে মানুষের অস্বাস্থ্যকর ও আপাত-তৃপ্তিকর জ্বা, গুণ ও শক্তিসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। তখন মানুষ তাহার বুদ্ধির, মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি হেতু জমি, জল ও হাওয়ার দেওয়া জ্বা, গুণ ও শক্তি যে মানুষের অস্বাস্থ্যকর ও প্রকৃতপক্ষে অতৃপ্তিকর হইয়াছে তাহা বিচার করিতে এবং বৃষ্টিতেও অক্ষম হইয়া থাকে। জমি, জল, ও হাওয়ার অতিশয় ও পরিণতির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যক্তিগত সাধিত হইতে থাকিলে যে মানুষের স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর জ্বা, গুণ ও শক্তিসমূহ উৎপাদন করা অসম্ভব হয়, তাহার কারণ জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণ ও শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণ ও শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন না হইলে কোন মানুষের পক্ষে যথেষ্টাচার দ্বারা উহাদের কোনটী উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। বাহা-বাহা মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, তাহার কোনটী প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যক্তিগত দ্বারা কখনও উৎপন্ন করা অথবা রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

জমি, জল ও হাওয়া হইতে মানুষের স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর জ্বা, গুণ, ও শক্তিসমূহ উৎপাদন করা অসম্ভব হইলে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর অভাব অনিবার্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়—মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয় মূলতঃ দুইশ্রেণীর কারণ বশতঃ, যথা :

(১) মানুষের সংঘমশক্তির তুলনায় ব্যক্তিগতশক্তির বৃদ্ধি বশতঃ, আর—

(২) জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার গুণ ও শক্তির অতিশয় ও পরিণতি যে-যে প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয়, সেই-সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যক্তিগত সাধন বশতঃ।

উপরোক্ত দুইশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি না হইলেও মনুষ্যসমাজে ব্যক্তিগতভাবে অভাব অভ্যন্ত কারণে উৎপন্ন হইতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে অভাব অভ্যন্ত কারণে উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে কোন শ্রেণীর অভাব ঐ দুইশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। মূলতঃ উপরোক্ত যে দুইশ্রেণীর কারণে মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর অভাব ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হয়, সেই দুইশ্রেণীর অভাব দুইটি বস্তু দ্বারা মত। একশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি হইলেই স্বতঃই আর একশ্রেণীর কারণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সঙ্কেত

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বোপায় মানুষের সর্ববিধ অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূর হয় এবং কোন শ্রেণীর অভাব বাহাতে উদ্ধৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূর হয়, এবং কোনশ্রেণীর অভাব বাহাতে উদ্ধৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে বসিলে ঐ ব্যবস্থা কখনও সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। ইহার কারণ—অভাবের আশঙ্কা সর্বতোভাবে তিরোহিত না হইলে মানুষের কোন কোন ইচ্ছা পূরণ না হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

উপরোক্ত কারণে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে দুগুণ চারিশ্রেণীর নীতি অবলম্বন করিতে হয়, যথা :

- (১) যে-যে-শ্রেণীর কার্যপ্রণালীতে মানুষের অবয়বস্থ সংযম শক্তির (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যতিচার করিবার শক্তিসমূহকে সংযত করিবার শক্তির) তুলনায় ব্যতিচার শক্তির (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের • ব্যতিচার করিবার শক্তির) বৃদ্ধি পাইতে পারে সেই-সেই শ্রেণীর কার্যপ্রণালীর কোনটি বাহাতে মানুষের কোন কার্যে কোন মানুষ অবলম্বন না করিতে পারে এবং না করে তাহার নীতি ;
- (২) যে যে শ্রেণীর কার্য-প্রণালীতে মানুষের অবয়বস্থ ব্যতিচার-শক্তির তুলনায় সংযম-শক্তির বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই সেই শ্রেণীর কার্য-প্রণালীর প্রত্যেকটি বাহাতে মানুষের প্রত্যেক কার্যে প্রত্যেক মানুষ অবলম্বন করিতে পারে এবং করে তাহার নীতি ;
- (৩) জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাহারকা করিবার গুণের ও শক্তির অস্তিত্ব ও পরিণতি যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বভাৱে সাধিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিচার যে যে কার্য-প্রণালীতে আদৌ সাধিত হইতে পারে সেই সেই কার্য-প্রণালীর কোনটি বাহাতে কোন মানুষ মানুষের

কোন রকমের কার্যে অবলম্বন না করিতে পারে এবং না করে তাহার নীতি ;

- (৪) জমি, জল ও হাওয়ার এবং তাহাদের উৎপাদন করিবার ও স্বাহারকা করিবার গুণের ও শক্তির অস্তিত্ব ও পরিণতি যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বভাৱে সাধিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যেকটির সহিত সঙ্গতি যে যে কার্যপ্রণালীতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হইতে পারে সেই সেই কার্য-প্রণালীর প্রত্যেকটি বাহাতে প্রত্যেক মানুষ মানুষের প্রত্যেক রকম কার্যে অবলম্বন করিতে পারে এবং করে তাহার নীতি।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর নীতির নাম মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সঙ্কেত।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল নীতিসূত্রের উদ্ভাৱণ

যে চারিশ্রেণীর নীতি মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার সঙ্কেত সেই চারিশ্রেণীর নীতিই সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের চারিশ্রেণীর মূল নীতিসূত্র।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার যে সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক হয় সেই সাত শ্রেণীর অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কার্য-প্রণালী কি কি হওয়া উচিত এবং তাহাদের বিধি ও নিষেধ কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য ঐ চারিশ্রেণীর নীতিসূত্র অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার যে সমস্ত অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান রচনা করা হয় তাহাঙ্গির কার্য-প্রণালীর ও বিধিনিষেধের নীতিসূত্র সর্বতোভাবে বৃক্তিসঙ্গত না হইলে প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হইয়া সন্দেহজনক হইয়া থাকে। অন্তরিক উপরোক্ত নীতিসূত্র সর্বতোভাবে বৃক্তিসঙ্গত হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া নিশ্চিত হয়।

বঙ্কী

দ্বাদশ বর্ষ

শ্রাবণ—১৩৫১

১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

ইতিহাসের ইঙ্গিত

শ্রীমদ্বনাথ সান্যাল

Man is explicable by nothing less than
all his history. —Emerson.

প্রায় ২২শ' বছর আগেকার কথা। চীনদেশের সম্রাট তখন ওয়াং চেং (খ্রী: পূ: ২৪৬—খ্রী: পূ: ২০৯)। তিনি চীনের বংশের চতুর্থ সম্রাট ছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি শিহু হুয়াঙ, তি নাম গ্রহণ করলেন। এ নামের অর্থ হল প্রথম সম্রাট। কিন্তু শুধু নাম গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না—কাজেও তিনি প্রথম সম্রাট বলে পরিচিত হতে সক্ষম করলেন। তিনি চাইলেন—তার আগে হু'হাজার বছর ধরে যে সব সম্রাট চীনে রাজত্ব করেছেন, যে সব মনুষী তাঁদের সাধনার দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সবার কথাই লোকে ভুলে যাক—অতীতের স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যাক—ইতিহাস বিলুপ্ত হোক, তাঁর থেকেই হোক ইতিহাসের আরম্ভ। কাজেই তিনি কড়া আদেশ জারী করলেন—“যারা অতীতের দোহাই দিয়ে বর্তমানকে ছোট করে দেখবে, তাদের আত্মীয়-স্বজনসহ সবাইকে হত্যা করা হবে।” শুধু হুকুম জারী করেই তিনি নিশ্চিন্ত রইলেন না—তা' যাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তার দিকেও তিনি প্রথম দৃষ্টি রাখলেন। ফলে মাত্র লোকজনরা—যে সমস্ত গ্রন্থে অতীতের কথা লেখা আছে, যাতে কনফুসিয়াস প্রমুখ মনুষীদের নীতি-দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ আছে,—তা নিশ্চয়ভাবে পুড়িয়ে ফেলাতে লাগলো। রেফাই পেল কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র এবং খান কয়েক বিজ্ঞানের বই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রমাদ গলেন, তাঁরা তাঁদের অমূল্য গ্রন্থবাক্স মাটির নীচে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন। তা করতে গিয়ে যারা ধরা পড়লেন, রাজার ভক্রে তাঁদের জীবন্ত অবস্থাতেই পুতে ফেলা হল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, একটা ব্যাপারে এই একম অভূত খেয়ালের পরিচয় দিলেও শিহু হুয়াঙ, তি খুব পাকাপাকি সম্রাট ছিলেন। তিনি সমগ্র চীন—এমন কি আনাম পর্যন্ত তাঁর শাসনাধীনে এনেছিলেন। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের ষষ্ঠম স্রবহু চীনের প্রাচীরের পত্তনও তিনিই করেন। কিন্তু শিহু হুয়াঙ, তি'র অতীতকে মুছে ফেলবার এত যে প্রচেষ্টা, তা কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর রাজত্বকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই। মাটির নীচে প্রোথিত পুঁথিপত্র আবার বেরিয়ে এল—ইতিহাস আবার তার আশ্রয়প্রার্থী করল। ১

* “Those who shall make use of antiquity to belittle modern times shall be put to death with their relations.”

১। Glimpses of World History by Jawaharlal Nehru, revised edition June, 1939, pp. 68—69.

এ ঘটনার উল্লেখ করলাম এই ক্ষেত্রে যে, আজও পৃথিবীতে শিহু হুয়াঙ, তি'র অম্লরূপ মনোবৃত্তির অভাব নেই। হুশিকিত লোকের মধ্যেই এখনও এমন অনেক লোক মিলে, বাঁদের পৃথিবী আরম্ভ হয়েছে তাঁদের জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে। এমন লোকও আছেন যারা শিহু হুয়াঙ, তি'র ক্ষমতা না থাকলেও মনে অতীতের প্রতি একটা তীব্র বিরাগ পোষণ করেন এবং অতীতই যে সমস্ত অনিষ্টের গোড়া—এমনতর মতবাদ প্রচার করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

মানুষের যা কিছু হবার এবং যা কিছু করবার, তা অতীতেই হয়ে গেছে, অতীতই ছিল মানুষের সোনার যুগ, তখনই হয়েছিল মানুষের চরম উন্নতি, বর্তমানে আমাদের কর্তব্য শুধু অতীতের আদর্শের দিকে তাকিয়ে থাকা, আর তারই গুণগান করা—এ শ্রেণীর যে একটা মনোভাব আছে এবং তা যে সত্যিই অনিষ্টকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ রকমের ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণা মানুষের মন থেকে বত শীগগির দূর হয় ততই ভাল। কারণ, সমষ্টিগত ভাবে মানুষ যে এগিয়ে চলেছে, অতীতের মানুষের চেয়ে আমাদের মানুষ যে নানাভাবেই উন্নত, একথা যারা অতীত ও বর্তমানকে খতিয়ে দেখবেন, তাঁদেরই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা আপত্তি তুলে বলবেন, অতীতের মানুষ অনেক বেশী সখ্য ছিল, আজকের মানুষের চেয়ে। তাদের মতামত ছিল অনেক বেশী, অল্পেই তারা পরিতুষ্ট থাকত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দাবায় যারা চিন্তা করেন তাঁরা যৌবনকে শৈশবের চেয়ে মানুষের উন্নততর অবস্থা বলে স্বীকার করেন কিনা জানি না। যদি করেন তা হলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়, শৈশবের সাবল্য, বিবেচনাতীর্ন সাহসিকতা, অক্ষমতাপ্রসূত সন্তানের কি সত্যি উন্নততর জীবনের পরিচায়ক? ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি তা না হয়, তা হলে জাতির ক্ষেত্রেই বা ওগুলোকে উন্নততর গুণ বলে মেনে নিতে হবে কেন? কিন্তু তাঁদের যদি বক্তব্য হয় যে, শৈশবই যৌবনের চেয়ে উন্নততর অবস্থা—“মাগো আমার দরাক করে শিশুর মত করে রেখো”—“আমার শরীর বাড়ুক তার ক্ষতি নাই” মনটি আমার শিশুর রেখো—এই যদি হয় তাঁদের প্রার্থনা, তা হলে তাঁদের বিশ্বাস আর শিশুর মন নিয়ে তাঁরা থাকুন। তাঁদের সঙ্গে কোন তর্ক আমরা করব না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করব যে, মানবজাতির শৈশবের চেয়ে আজ মানুষ অনেক এগিয়ে এসেছে এবং যে সোনার যুগের কথা মানুষ বলে, তা মানুষের অতীতে নয়, ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত রয়েছে। ২ একটা কথা মনে রাখতে

২। Poets dream of a golden age when the world was young and men lived in innocent peace

হবে যে, মানুষ সৃষ্টির সর্বশেষ জীব এবং সে তার কৈশোর অবস্থাই এখনও অভিক্রম করে নি।^৩ কাজেই তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিরাশ হবার কোন কারণ তো নেই-ই, বরং আশাব্যস্ত হবার কারণ রয়েছে বরং।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে—অতীতকে যদি আমরা হাড়িয়েই এসে থাকি, তা হলে অতীতকে দিয়ে আর প্রয়োজন কি? কেউ কেউ কবির কথার পুনরাবৃত্তি করে হয় তো বলবেন—“Let the past bury its dead” আমরা পূর্বেই বলেছি, অতীতকে ধীরে বর্তমানের ঘাড়ে বোঝার মত চাপিয়ে দিতে চান, যাঁরা মনে করেন বর্তমান মানুষের বাসের পক্ষে একটা নিতান্তই অনুপযোগী কাল, মানুষের জীবনের যত কিছু কাম্য—যত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সব অতীতে শেষ হয়ে গেছে এবং কথায়, চিন্তায় এবং ব্যবহারে অতীতের অনুসরণ করেন বলে যাঁরা গর্ব্ব বোধ করেন, তাঁদের দলে আমরা নই। কিন্তু তবুও আমরা মনে করি, অতীতের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন কি, এক কথায় তার জবাব দিতে হলে বলতে হয়—বর্তমানকে ভাল করে বোঝবার জন্তে—আর ভবিষ্যৎকে গড়বার জন্তেই অতীতের প্রয়োজন। কিন্তু এ জবাব এমনই সংক্ষিপ্ত যে, এতে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। কাজেই কথগুলো আর একটু পরিষ্কার করে বোঝবার চেষ্টা করব।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জীবিকার সংস্থান করতে, হিংস্র জন্তু, নৈসর্গিক উৎপাত প্রভৃতির থেকে আশ্রয়সাধন করতে, নিত্য নূতন পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে, জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দতর ও সুন্দর করে তুলতে কত উপায়ই যে তাকে টেঁহাবন করতে হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। পাথর, ধাতু, আগুন, তীর, ধনুক, বন্দুক, কামান, পণ্ডবাচিত শকট, বাষ্পীয় এঞ্জিন, এরোপ্লেন এই সবই মানুষকে করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, জীবনকে স্বচ্ছন্দতর করার অতীশা থেকে। মানুষের এই অগ্রগতিই ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, পূর্বগামীদের অন্ধকারই তাকে

and happy plenty. Sober science tells a different tale and teaches that everywhere the earliest men were rude savages, dwelling in caves or huts, ignorant even of the use of fire and the commonest arts of life.” The Oxford Students' History of India—By Vincent A. Smith. 12th edition, 1929, page 24.

৩. A Short History of the World by H. G. Wells (Penguin Books) revised edition 1938. p 310. —Man is still only adolescent. His troubles are not the troubles of senility and exhaustion but of increasing and still undisciplined strength. When we look at all history as one process,..... when we see the steadfast upward struggle of life towards vision and control, then we see in their true proportions the hopes and dangers of the present time. As yet we are hardly in the earliest dawn of human greatness.” (Italics mine).

সম্পূর্ণ অগ্রসর হয়ে যাওয়ার ভিত্তি যুগিয়েছে। সভ্যসমাজে বহুতর কোন অপরিণতবয়স্ক বালককে যদি রবিন্সন ক্রুসোর মত একটা নির্জন দ্বীপের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে ঐতিহ্যের সংস্পর্শ ছাড়া সেই বালক যে আদিম মানববালকদের মতই অসহায় ও নিকপায় হবে পড়বে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের যদি এগিয়ে চলতে চান, তবে পূর্বগামীদের সঙ্কর সঞ্চার করেই নূতন সঙ্করের পথে অগ্রসর হ'তে হ'বে। তা না হ'লে—তারা যে পথে হেঁটে গেছেন, সেই পথেই হরতো বৃথা আবার আমাদের নূতন ক'রে হাটতে হবে, তারা যে ভুল করেছেন হরতো সেই ভুলেরই আবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তা' হ'লেই দেখা যাচ্ছে অতীতের সাধনা যাতে বর্তমানের কাছে ব্যর্থ না হয়, একই সাধনার পুনরাবৃত্তি ক'রে শ্রমের অপচয় করা না হয়, তার জন্তে জানা প্রয়োজন আমাদের অতীতকে। তা ছাড়া, পূর্বগামীরা অতীতে চলবার পথে যে সব ভুলচুক করেছেন, সেইসব ভুলচুক আমরাও নূতন ক'রে না করি, তার জন্তেও ইতিহাসকে জানার ও বোঝার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বর্তমানকে ঠিকভাবে বোঝবার জন্তেই ইতিহাস আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। মনে করা যাক, আমরা কোন আধুনিক ভাষ্যের ক্ষোদিত একটা মূর্তি নিয়ে আলোচনা করছি। ভাষ্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় না থাকে, তা' হলে বর্তমানের এই তরুণ-শিল্প পূর্বাবস্থা থেকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, কোন্ দিকে অগ্রসর হয়েছে, কি বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে, আদৌ অগ্রসর হয়েছে কি না, যতটা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল তা হয়েছে কি না, অগ্রসর না হয়ে পিছিয়েই পড়েছে কি না—ইত্যাদি কোন বিচারই আমরা করতে পারব না। ঐ তরুণ-শিল্পকে যেমন তেমন ভাবেই (as it is) মেনে নিতে হবে। এরূপ মেনে নেওয়া যে মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রত্যাক অবমাননা, সে কথা বোধ হয় না বললে চলে। কাজেই বর্তমানকে বোঝার জন্তে ইতিহাসের অপরিহার্য্যতা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আর ঐ ঐতিহ্যবোধ থেকেই যে আমরা—ভবিষ্যতে এর রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা করতে পারি এবং এই ঐতিহ্যজ্ঞান ছাড়া যে সে রূপ-পরিকল্পনা সম্ভব হয় না, সে কথাও বোধ হয় দুর্কোধ্য নয়। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রুশ লেখক এম, এল, পুরুভস্কি কয়েকটি সুন্দর ও সূচিস্থিত কথা বলেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি বলেছেন :—“কয়েক দশক বা শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে, গভীর অভিনিবেশ করতে পারলে সে বিধানও আমাদের অজানা থাকে না। ভবিষ্যতে কয়েক হাজার বছরে মানব-সমাজ কি রূপ গ্রহণ করবে, তা আমরা স্পষ্ট না দেখতে পেলেও সমাজের বিকাশ কোন্ পথ দিয়ে হ'বে, সে বিষয়ে একটা ধারণা করতে পারি। এ জ্ঞানের গুরুত্ব-হেতু এই যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি থাকলে ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়—পরে কি ঘটবে, পূর্বে থেকে তাঁর আভাস থাকলে আমরা ভবিষ্যতের ভয় ভৈরী থাকতে পারি, অনেক বিপদ এড়িয়ে যেতে পারি, অনেক স্বপ্নের সন্ধানবাহার করতে

পারি। অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান হচ্ছে ভবিষ্যৎকে আয়ত্ত করার প্রকৃষ্ট উপায়।”৪

কিন্তু ইতিহাস জানলেই তার সম্যক প্রয়োগ ও ফললাভ আমরা করতে পারি না। তার জন্তে প্রয়োজন ইতিহাস-বিশ্লেষণের। কিন্তু এই বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি মানুষ খুব বেশী দিন আগে আবিষ্কার করেনি। এর জন্তে তাকে অপেক্ষা করতে হ’য়েছিল—উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই আবিষ্কারের সর্বপ্রথম গৌরব যদিও জার্মান দার্শনিক হেগেলের প্রাপ্য, তথাপি হেগেলের প্রদর্শিত পথের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে তাকে সত্যিকারের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র গৌরব দিতে হয় অল্পতম জার্মান মনোবী কাল মার্কসকে।

৪। “ইতিহাস”—এম এন পুরুষোত্তম লিখিত ও শ্রীচীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-অনুদিত। চতুর্থস, আশ্বিন, ১৩৪৮ পৃ: ২৪।

ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করবার যে পদ্ধতিটি তিনি দেখিয়েছেন, ইংরেজীতে তার নাম হ’ল dialectical materialism, বাংলায় বলা যেতে পারে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ। ইতিহাসকে এই পদ্ধতিতে যে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে বলা হয় materialistic study of history বা ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা। সত্যিকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্ত এই পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যিক। কিন্তু সে পরিচয় নিরলস অধ্যয়ন ও সতর্ক অমূল্যলন ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যেতে পারে—এ পদ্ধতিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হ’লে প্রয়োজন—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের। বাংলা ইতিহাসকে বইয়ের পাতায় আবদ্ধ না রেখে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে চান, তাঁরা ইতিহাসের ইঙ্গিত ঠিকভাবে বোঝবার জঙ্গ। সে প্রয়াস যে করবেন, এ আশা আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করবো।

অগস্ত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফিরে এসো হে মুনিস্বর,
আমরা তোমায় পিছন ডাকি।
বিজ্ঞা উঠুক তায় ক্ষতি নাট
দেখবে—হলো বিখ্যাত কি ?
কাঁপ ধরেছে ভূমণ্ডলে
উঠছে ফুলে পল-বিপলে,
দম্ভী এবং দর্পীদলের
আক্ষালনের নাই কো বাকি।
স্বর্ধ্যকে নয়—উঠছে এরা
ভগবানকে রোধ করিয়া।
শ্রাস্ত নহে অবিশ্রান্ত
হিংসা গরল উল্গায়িয়া।
এই ধরনী চূর্ণ করি’
নতুন করে তুলবে গড়ি’
ছুটেরা সব অষ্টার ঋণ—
দেবে বেবাক শোধ করিয়া।
এসো তুমি, হয় তো তোমায়
দেখবে না অবজ্ঞাভরে,
মদোচ্ছতের গর্জিত শির
দাও লুটায় ধূলার পরে।
বিনাশ কর হৃৎতিকে,
কিরাও কিরাও আন্তর্দিকে,
গণ্ডবে সব শক্তি তাদের
নিমেঘে লও শোষণ করে’।

দিনের প্রহরে নাহি প্রাণের প্রহরী

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

জ্যামিতিক সমস্তার মত
জটিল হয়েচে মোর চিন্তাস্রবণলি।
স্বল্পতায় চিন্তা অবনত,
বেদনার মেঘে মেঘে অদৃশ্য অঙ্গুলি
দিয়ে যায় আলোব কম্পন।
আমার মনের ভার ঘন গুরু জানি না কখন।
কিছুতে যায় না মন পথপাশে বসে আমি একা,
দিনের প্রহরে নাহি প্রাণের প্রহরী।
বাহিরে আকাশ ডাকে,—নৃত্য করে কেকা,
টহল দিতেছে বায়ু বৈরাগীর রূপ ধরি’।
জনহীন গ্রামখানি যেন উদাসিনী
সীমন্তিনীসম কার প্রতীকার বিরলে একাকী।
কোথায় কাদিছে যেন উড়ে বাওয়া কার প্রাণপায়ী,
অরণ্য ঝরেছে পথ, হাটে নাহি আর বিকি-কিনি।
থেমে গেছে কলকণ্ঠ, বহে ক্ষীণ নদী
দীর্ঘশ্বাস ওঠে নিরবধি।
অনাদি বিরহী যেন মৌন ধ্যানে,—শিরে তার ভাবনার জটা,
দিগন্তপ্রসারী মাঠ, শূন্য হৃদি তার।
প্রাণ এয়েছে আর মেঘেমেঘ যটা,
আমর দিন বুঝি গেল রে আমার।

“ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার খবর বেরিয়ে গেল। ভাল ভাবেই পাশ করেছে। আরও কিছুকাল পড়বার ইচ্ছে আছে। বি, এ-টা অল্প পাশ না করে ছাড়ছি না। এখন হাতে প্রচুর সময়। দিনগুলো বড় দীর্ঘ আর নিজেকে ভারী অলস বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত দিনটা বেজার গরম। দৈনন্দিন কটিন শুকবেন? সমস্ত মিনটা ঘরের মধ্যে, ঘুমিয়ে, কিংবা বই পড়ে কিংবা রেডিও শুনে একধরকম কাটিয়ে দিই। তারপর বিকেলের দিকে ইডেন-গার্ডেনে কিংবা গঙ্গার ধারে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসি; কিংবা টেনিস খেলে কাটিয়ে দিই সুনীলদা’দের বাড়ীতে। কোনদিন সিনেমা বা ক্যান্ডি টুয়েণ্ড হাই। তারপর রাতে কোন কোনদিন বই নিয়ে বসি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়তে পড়তে যখন অমেক রাত হয়ে যায়, যখন রাতের হাওয়ার সঙ্গে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, তখন শয্যা নিই। কোনদিন অর্গ্যানের সামনে বসে ববীন্দ্রনাথের গান, তুলসী চোঁটা করি, গ্রামোফোন রেকর্ড শুনি, বা রেডিওতে বড় বাজিরের সেতার শুনি। আপনি বোধ হয় শোনেন নি, মিউজিক কনফারেন্সে এবার আমি সেতারে ফাষ্ট হয়েছি। মাসখানেকের মধ্যে আর একবার এলাহাবাদের একটা function-এ যাবার কথা আছে। ইচ্ছে আছে যাবো। রেওয়াজ এখন কিছুদিন বন্ধ রেখেছি। মনটা আগে খানিকটা হাল্কা হোক, তারপর রেওয়াজ ধরব। এলাহাবাদ থেকে সোজা কলকাতায় আসবো। কাল খবরের কাগজে আপনার খবর কথার কথা পড়ছিলাম। আজকাল ফুটবলে খুব নাম করছেন শুনি। খুব খেলাধুলায় মেতে আছেন, না? প্রায়ই আপনার নাম কাগজে দেখি। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছেন না কি? বাড়ীর সকলে এখনও আপনার নাম কবেন। কলকাতায় এলে দেখা করবেন কিন্তু। ভুলবেন না।”

অমিতার বিশাল পত্র! রাজশেখর আর পড়িলেন না, পাতা উন্টাইয়া গেলেন।... রাজশেখর যখন ডাক্তারি পরীক্ষা দেন, তখন এই অমিতা চ্যাটার্জির শিক্ষার ভার তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে। অমিতা তখনও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় নাই। বড়লোক না হইলেও গরীবের মেয়ে সে ছিল না। পিতা অর্থব্যয় করিয়া কতক তাই সর্কাবিষয়ে শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। রাজশেখর কাছাকাছি থাকিতেন। কাজেই তাঁহার উপর দশটাকা লাভের পথ সুগম হইয়া গেল। তাঁর পড়ানোর গুণেই হোক আর শিক্ষার্থীর আপনার বুদ্ধিবলেই হোক অমিতা সে বৎসর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। পরীক্ষার ফল বাত্মির হইলে রাজশেখর কয়েকদিনের ছুটি লইয়া বাত্মিরে খেলিতে চলিয়া গেলেন। সেবারের খেলার রাজশেখর আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনেও ভুলেন নাই। অমিতার চিঠি পড়িয়া সেই সব কথাই আজ আরও বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল। তাহার লেখা এই পুরাণে চিঠিগুলিকে রাজশেখরের ঘেন মনেই ছিল না, আজ সহসা ফাইল উন্টাইতে উন্টাইতে চিঠি-গুলিকে তিনি আবিষ্কার করিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটা পড়িলেন, কয়েকটা পড়িলেন না। কারও খানিকটা পড়িলেন মাত্র। চিঠির তারিখ দেখিয়া বুঝা গেল দশবৎসর আগে এমনই

একদিনে অমিতা তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিল। তাঁহার চাকরীতে বহাল হইবার মাসকরের পরের চিঠি। সত্যি, দশবৎসর আগেকার চিঠির কথা কাহারও মনে থাকে? রাজশেখর ভাবিবার চেষ্টা করিলেন তাঁহার শিক্ষতার কাহিনী। মনে পড়ে, রাজশেখর তখন চাকরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই মিলিতেছে না। কলিকাতার মত বৃহৎ জারগার রাজশেখরের মত কত ডাক্তার নিত্য গজাইয়া উঠিতেছে। সেখানে তাঁহার স্থান সহজে মিলিবে কি করিয়া। রাজশেখর কিন্তু দমিয়া যান নাই। সুযোগ পাইলেই দরখাস্ত করিতেন। অবশেষে ভাবনার একদিন অবসান হইল। চাকরী মিলিল বিদেশে। হোল্ড, অল ও স্ট্রাকেশ লইয়া অধ্যাপনা কার্যে যবনিকা টানিয়া দিয়া একলা তিনি নূতন চাকরীতে বহাল হইয়া সুদূর পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। বাইবার সময় অমিতার শিক্ষার ভার লইবার জন্য ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রামলালকে বলিয়া গেলেন। শ্রামলাল নিরীহ ও শিক্ষিত, পড়াইবে ভাল। অমিতা বাহিরের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই তো জীবনের প্রথম দিক, তারপর কর্মজীবন, আর আজ! রাজশেখরের যুগে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফাইলের কাগজ উন্টাইয়া চলিলেন। কত পুরাণে কথা, কত কাহিনী, কত এনগেজমেন্টের তারিখ, ক্যাস-মেমো চাপা পড়িয়া গেল। একসময়ে তাঁহার হাত আর এক জারগার আসিয়া থামিল। আর একখানি চিঠি, অমিতা লিখিতেছে—

“কাল টেনিস টুর্নামেন্টে সুনীলদা’দের বাড়ীতে হেরে গেলাম, হাতে খুব লেগেছে! আপনি তো ডাক্তার। যদি কোন ওষুধ আপনার জানা থাকে, তাহলে শীগগির আমাকে লিখে জানাবেন। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। চকিণে তারিখে কলকাতা রেডিও থেকে রাত সাড়ে সাতটায় সেতার বাজাচ্ছি, শুনবেন। শুনে জানাবেন, কেমন লাগল। আপনার খেলাধুলা হচ্ছে কেমন? ছেড়ে দেননি তো? আপনার খেলা কখনও দেখতে পেলুম না। এবারে কোথায় খেলছেন, জানিয়ে দেবেন।—

হ্যাঁ, মজার কথা শুনুন! সেদিন সুনীলদা, আমি, ঝুণ্ডু, মা, আর বড়মামা সকলে মিলে সুনীলদা’দের মোটরে করে বোটনিক্যাল গার্ডেনে ফিট করতে গিয়েছিলাম। ফিরবার সময়ে পথে গাড়ী গেলো খারাপ হয়ে। তখন রাত হয়ে গেছে। অত রাতে গাড়ী সারাবার লোক পাওয়া গেল না। সুনীলদা’ আর বড়মামা শেষে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে। রাত ছুটোর সময় পৌছেছিলাম সেদিন। তারপর দিন গায়ে, হাতে বা বাখা হোল, ওঃ! সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ফিট-এ যাবি না। পড়াগুলো আরম্ভ করে দিয়েছি। সময় বড় কম। এবার ভাল করে না পড়লে বোধহয় ভাল Marks রাখতে পারবো না। এই সময়ে আপনি থাকলে তবু খানিকটা উপায় করে দিতে পারতেন। তা এখন আপনি ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছেন। আপনার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তাদের আমার রোহাশীষ দেবেন।”

এক নিঃশ্বাসে রাজশেখর এতখানি পড়িয়া গেলেন। চিঠিতে নূতন কিছুই নাই। ছেলেদাদুঝিৎ ভরা। তবুও পড়িতে কেমন

একটা আনন্দ লাগে। পুরাণে জিনিষের প্রতি এইরকমই একটা মমতা থাকে। বোধ হয় সনাতন রীতি। জিনিষ পুরাণে হইলে সেই জগতে কি তাহার দাম বাড়ে? কে জানে। প্রতিটি দিনের কথা রাজশেখর আর একবার ভাবিবার চেষ্টা করিলেন। দিনগুলির কথা অবস্থা অবস্থা মনে পড়ে, কিন্তু দশ বৎসর আগে দেখা অমিতার সেই মুখখানা তাঁহার কিছুতেই মনে পড়ে না। সে মুখ কোথায় নিলিয়া গিয়াছে। সে দিনের জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের কোন সাদৃশ্য নাই, সেদিনের ভাবনা ছিল একরূপ, আজকের ভাবনা অস্তরকম। সেদিনকার জীবন-নদীর উদ্দাম স্রোত আজ শব্দ হইয়া আসিয়াছে...সেখানে আসিয়াছে গভীরতা। হৃতবায় সেদিনের অমিতাকে মনে না পড়াটা কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক নহে। বিশেষতঃ ডাক্তারের পক্ষে! তা' ছাড়া চাকরীতে ঢুকিবার পর তাহাকে অনেক স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে। অমিতা প্রথম প্রথম অনেক চিঠিই লিখিয়াছিল। সবগুলির জবাব দেওয়া তাঁহার হস্তা উঠে নাই। তারপর কোথা হইতে কোথা বলি হইয়া রাজশেখর ঘুরিয়াছেন, সে সকল অমিতাকে জানানো হয় নাই। সেও তাঁহার হিকানা পায় নাই। সে আজও হয়ত ভাবিতেছে তাহার মাষ্টারমশাই চুকা করিয়া চিঠি লিখেন না। রাজশেখরের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল অমিতাকে জানাইবেন যে তিনি শ্রী কলিকাতার ফিরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত...চিঠি লেখা তাহার হইয়া উঠে নাই।

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে কলিকাতার ফিরিয়া আসিয়া আজ ঠাঁই ফাইল উন্টাইতে উন্টাইতে অমিতার চিঠি দেখিয়া রাজশেখরের তাহাকে মনে পড়িয়া গেল। কে জানে অমিতা এখন কোথায়? হয়ত এতদিনে সে এক ধনী সংসারের কন্যা হইয়া

আবশ্যকীয় একখানা কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া, ফাইল তুলিয়া রাখিয়া-রাজশেখর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন। অনেককণ অবধি ঘুম আসিল না। অজস্র বাজে ভাবনা মাথার মধ্যে আসিয়া ভিড় করিল। সামনে বসে আসিতেছে! -ডাক্তার-খানার সামনের রাস্তাটা ভাল করিয়া না তৈয়ারী করিলেই নয়। পানের ঘরটার ইলেকট্রিক আলোর বাল্বটা খারাপ হইয়াছে, নতুন একটা বাল্ব কিনিতে হইবে। শিখ, ঠ্যানিস্টিটের দোকান হইতে কতকগুলি গুণপত্র কালই আসিয়া পড়ার কথা। মেওলি বুকিয়া পড়িয়া খালাস করিতে হইবে। এ মাসের বিলিতি ন্যাগাজিনগুলো আসিতে দেয়ী করিতেছে কেন? কয়েকটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়। একটু অবসর রাজশেখরের নাই। খালি কাজ আর কাজ। সকাল হইতে না হইতেই এনগেজমেন্ট।

সকালে উঠিয়া সর্বপ্রথমে বাহিরে কোথায় একটা রোগী দেখিবার জন্ত রাজশেখর প্রস্তুত হইলেন। 'এনগেজমেন্ট বুক'এ সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে যাইতে হইবে 'নিবারণ' নামে এক ভক্তলোকের ছেলেকে দেখিবার জন্ত। ভক্তলোক কাল আসিয়া নাকি রাজশেখরের দেখা পান নাই। তাই ভক্তের হাতে একটা চিঠি লিখিয়া ডাক্তারবাবুকে দিবার জন্ত বলিয়া গিয়াছেন। রাজশেখর এখন বাড়ী ছিলেন না, থাকিলে টাকা-পয়সার কথাও কহিয়া

রাখিতে পারিতেন। এ অঙ্কে ডাক্তারকে বড় একটা কেহ টাকা দিতে চাহে না। হু'একবার রাজশেখর নিজেরও ইচ্ছা দেখিয়াছেন। তাই তাঁহার মনের ভিতর একটা অজানা আশঙ্কা বামনীর আসিয়া উঁকি দিতেছিল। প্রথমতঃ, এতখানি পথ তাঁহাকে যাইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ মোটর-বাইকের অনেকটা পেট্রোল খরচ হইবে। উপযুক্ত ও জ্ঞাত্য দাম পাওয়া যাইলে, তাহার কিছুই আসিবে যাইবে না। কিন্তু এই জ্ঞাত্য দামটুকু পাওয়া লইয়াই তো বত কথা। সহজে যে দাম পাওয়া যাইবে না, রাজশেখর তাহা জানিয়াও সাজ-সজ্জা করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ তিনি শুধু রাজশেখর বলিয়া কলিকাতার ডাক্তার মহলে পরিচিত নন...আজ ডাঃ মিটার। মানুষকে রোগ-মুক্ত করিবার বিনিময়ে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের জোরে, এই টালিগঞ্জের রাস্তার উপর তাঁর এই সুসজ্জিত গৃহ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর ফটকের গায়ে লেখা—“ডাঃ আর মিটার”।

নিবারণবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া লইতে তাহার বেশী দেয়ী হইল না। বাড়ীখানি বহাদুরের। অগ্রে স্থানে স্থানে ভাসিয়া পড়িয়াছে। সেই ফটকের মধ্য হইতে কয়েকটা চারাগাছ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে! জানাপার কাঠগুলি বহু পুরাতন। বাড়ীর বাহিরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রাজশেখর তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সাইকেল থামাইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—“নিবারণবাবুর কোন বাড়ী?”

ছেলেমেয়েগুলি পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। রাজশেখর অভয় দিলেন—“বল না, ভয় কি?”

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বড়, সে এবার আগাইয়া আসিল। তারপর ম্লান চোখ দু'টি তুলিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল—“বাবা বাড়ীতে আছেন। ডেকে দেবো।”

তাহার গায়ের পুরাতন, ময়লা কোটটার পানে চাহিয়া রাজশেখর কহিলেন—“গিয়ে বল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।”

“আচ্ছা” বলিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। রাজশেখর বাহিরে দাঁড়াইয়া বাড়ীর আশে-পাশে একবার চোখ কুলাইয়া লইলেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে একবার দেখিলেন। বোধ হয় নিবারণ বাবুরই ছেলে-মেয়ে। মনের আশঙ্কাটা তাঁহার বহুমূল হইতে চলিয়াছে। কিছু আজ মিলিবে বলিয়া বোধ হয় না। সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন কে জানে।...ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল—“আমুন, বাবা ভেতরে।”

“চল” বলিয়া রাজশেখর ছেলেটিকে অহুসরণ করিলেন, যাইতে কহিলেন—“তোমার নাম কি?”

“অলক! অলক ব্যানার্জি।”

“কি করো, পড়ো?”

“আগে পড়তাম স্কুলে, এখন বাড়ীতে পড়ি। এই যে, এই ঘরে—”

অলককার দৃষ্টি একটা ঘরে রাজশেখর ঢুকিলেন। বিজী একটা গন্ধ। রাজশেখরের কাছে এ গন্ধ নতুন নয়। বুঝিলেন রোগীকে

এখানেই রাখা হইয়াছে। রোগীর মা বোধ হয়, অবশেষে টানিয়া মুখ নীচ করিয়া পীড়িত পুত্রের শিরের খাটের এক প্রান্তে বসিয়াছিলেন। একটি ছোটগোছের ভক্তলোক ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ ডাক্তার বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজশেখরকে চুকে দেখিয়া তিনি সামনে আগাইয়া আসিয়া বিমর্ষ মুখে কহিলেন, “বলুন”!

রাজশেখর বলিলেন না, কহিলেন, “আপনার নামই নিবারণ বাবু”।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, নিবারণ ব্যানার্জি”—বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন, তার পর কহিলেন, “আপনাকে খবর দিইছিলাম, পেয়েছিলেন তা হলে।”

রাজশেখর উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, এখন অবস্থা কি বকম?” কই আপনার ছেলে—কোথায়? ঘরের একটা জানালা খুলে দিন।”

নিবারণ ব্যানার্জি মুখ তুলিলেন, কোন কথা কহিলেন না। রাজশেখর নিজেই আসিয়া ঈষৎ খুলিয়া দিলেন। তার পর রোগীর শয্যার দিকে আগাইতেই নিবারণ ব্যানার্জি কহিয়া উঠিলেন, “কাল রাতে মারা গেছে। বলিয়া একটু চুপ করিয়া আবার কহিলেন, “রাত্তিরের দিকে যদি একবার আসতেন তা হোলে—অবিস্ত্র আপনাকে কষ্ট খুবই হোত, রাস্তা তো ভাল না।”

“হঁ” বলিয়া রাজশেখর বিছানায় যেখানে নিবারণের মৃত পুত্র কাপড়-ঢাকা অবস্থায় পড়িয়াছিল সেইখানে আগাইয়া গেলেন। পাখোপবিষ্টা মাতাকে কহিলেন, “সকল, দেখি।”

“দেখবার তো আর কিছুই নেই।” নারীকণ্ঠের আওয়াজটা যেন কিছু দৃষ্ট। রাজশেখর দমিয়া গেলেন। কি ভাবিয়া কহিলেন, “তবুও আমার একবার দেখা দরকার।”

“তা জানি! ঠিক সময়ে আসা দরকার মনে করেন নি। জানি, আপনারা ডাক্তার মানুষ, আপনাদের সময়ের দাম আছে, কিন্তু একটা মানুষের জীবনের দাম কি তার চেয়েও বেশী নয়?”

“ভগবানের হাতে সব। আমি এলেও বোধ হয় কিছু বেশী করতে পারতাম না।”

“ভগবানের হাত! মানুষ যখন নিজের অক্ষমতায় সজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন ভগবান আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু আমার ক্ষতির যে কোন সান্ত্বনাই আমার নেই।”—বলিয়া চুপ করিয়া হঠাৎ রাজশেখরের মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন।

রাজশেখর বলিলেন, “তা এমন করে বসে থাকলে তো চলবে না। একটা বিহিত করতে হবে। আপনি উঠুন। ব্যাপারটা আমার দেখতে দিন। যা কিরবে না—”

“মাঠার মশাই!”

রাজশেখর সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

“আমার ছেলে কেন চলে গেল, “মাঠার মশাই!”

“অমিতা! তুমি! আমি জানতাম না তুমি এখানে আসবে।”

“জানলেও চিন্তেন না। কিন্তু আমার কি উপায় হবে?”

“খবর দাওনি কেন আগে?” রাজশেখর শুক কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিবারণ বাবু সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। এইবার তিনি অঙ্গদিকে মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলেন। অমিতার কান্না উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আর রাজশেখর বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? জীবনের প্রথমভাগে বাহার এত উচ্চাভিলাষ, উচ্চশিক্ষা, তাহার আজ এ অবস্থা হইল কি করিয়া? প্রথম জীবন যে খেলাধুলা, লেখাপড়া, হাত-কোঁতক ও গানের মধ্য দিয়া কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে আজ অজ্ঞাতকুলশীলের মত গৃহের কোণে দিনের পর দিন এইভাবে কাটাইতে হইতেছে কেন? বাল্যের স্মৃতিময় আলোকিত দীপ্ত জীবনের কি দুঃখময় ছায়া! ইহা অভিশাপ, না ভাগ্য! শিক্ষা ও শালীনতার কি চরম পরিণতি এমনই!

“মাঠার মশাই”—

রাজশেখর অমিতার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

“বলুন না মাঠার মশাই, আমার ছেলের কি হয়েছিলো?”

“কে দেখছিলেন আগে?”

“কেউ না। দেখাতে পারিনি। ডাক্তারকে ডাকতে পারিনি।”

“হঁ”—বলিয়া রাজশেখর উঠিলেন—“অনর্থক আমার এখানে থাকায় কোন ফল হবে না।”—বলিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ নীচ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। নিবারণবাবু ঘরের গাছ-পালার দিকে তাকাইয়া স্থাপুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজশেখর সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমিতা ভিতর হইতে ধরা গলায় কহিল—“দাঁড়ান, যাবেন না।”

রাজশেখর নিবারণবাবুকে কহিলেন—“তাড়াতাড়ি সংকার করবার ব্যবস্থাটা করুন। আমি এখানে থাকলে আপনাদের অনেক ক্ষতি হবে! তা ছাড়া লোকও জোগাড় করতে হবে। বাবার পথে আমি জন-কয়েক লোককে বলে যাচ্ছি। তারা এসে আপনাকে সাহায্য করবে। বুঝলেন?”

নিবারণবাবু ঘাড় নাড়িলেন। তারপর কহিলেন—“যা বা করবার সব বলে দিয়ে যান, আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না।”

“কিছু ভাববেন না।”—

“ডাক্তারবাবু”—

রাজশেখর মুখ তুলিলেন। অমিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিল—কহিল, “আপনাকে প্রণাম করা হয় নি”—বলিয়া রাজশেখরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া কহিল,—“এই নিবু।”

রাজশেখর শুক হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে কহিলেন, “ধাক, ও তোমার কাজেই লাগবে।”

“না, আপনাকে নিতেই হবে।”

“আমার দরকার নেই। দেখে দাও সময়ের অসময়ে—”

“না, সত্যি আপনাকে নিতেই হবে, মানে, আমার দেওয়া উচিত।”

রাজশেখর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “তার মানে?”

“মানে খুব সহজ”—বলিয়া অমিতা একটু চুপ করিল। তারপর কহিল, “কষ্ট ক’রে এতদূর এসেছেন। মরা ছেলেকে একবার দেখেছেন। নিশ্চয়, ধন্য।”

“তুমি ভুলে গেছ অমিতা—বা বলি, আমি তাই করি। টাকা নেব না বলেছি যখন তখন কোনমতেই নেব না। ছেলেমানুষী কোর না।”

“বুঝছি”—বলিয়া অমিতা আবার খামিল, কণপরে বলিল, “আপনার ভিজিট কত তা আমি জানি। কিন্তু আমার অবস্থা আপনি তো—”

“অমিতা”—রুদ্ধ আক্রোশে রাজশেখর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মুখখানা লাল করিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া

বীরে বীরে আসিয়া তিনি এককণ্ঠে বাহিরের মোটর-বাইকের উপর বসিলেন। তাঁহার মনে হইল চোখ দুইটা তাঁহার আজ বুঝি কোন বাধা মানে নাই। নিজেরই অগোচরে কখন সহসা কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। পকেট হইতে কমল বাহির করিয়া অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ দুইটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলেন; তারপর মোটর-বাইকে ষ্টার্ট দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না। আবার অলক্ষ্যে একটা নিঃশ্বাস তাঁহার বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বিমূঢ়ের মত অমিতা এতকণ দেখিতেছিল। রাজশেখর চলিয়া বাইবার পরও অনেককণ পর্য্যন্ত সে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সহসা ক্রত ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

নিবারণবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাহির হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,— “তুমি অলক্ষ, তোর মা আবার কঁাদতে শুরু করল।” তারপর স্বগতই কহিলেন,— “খামখা কেঁদে কি লাভ যে হয়, তাও বুঝিনে।”

সত্ৰাট ও শ্ৰেষ্ঠী (উপভাষা)

ত্ৰীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ

প্রায় চল্লিশ ঘর কামারের বসতি গ্রামে। আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কুড়ি বছরেও বাঁধা ঘরবাড়ী ওদের মূলটাকে মাটির মধ্যে বেশিদূর খিত্তিরে দিতে পারে নি। আর পাশাপাশি ভাবে ঘরবাড়ী করে বাস করবার ইচ্ছা থাকলেও তার কি জো আছে আজকাল। একটু বেশি সজীব হয়ে যারা দাঁচতে চায়, প্রতি পদে পদে বাইরের সংঘাত এসে খর্ষক করতে চায় তাদের। চুরি-ডাকাতি করলে ইংরেজের আইন চারিদিক থেকে বার বাড়িয়ে আসে, খাজানার গোলমাল করলে জমিদারের বক্তচক্ষু আত্মপ্রকাশ করে নানা খুঁটিনাটি অত্যাচারের রক্ত পথে। খাঁচার ভেতরে বন্দী সিংহ যতকণ ঘুমির থাকে, ততকণ তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না; কিন্তু রক্তের মধ্যে যখন তার অরণ্যের আহ্বান মর্মরিত হয়ে ওঠে আর তার প্রচণ্ড শক্তি লোহার গবদভুলোকে ভেঙে চুরমার করবার মতলব করে, তখন তার হস্তে অগ্নি বাঁধা কবা হাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

তরঙ্গী, শহু, কেশোলাল—আরো কতজন। কেউ জেলে, কেউ বীপান্তরে, কেউ কেউ বা এখানে কেরারী। ওই সব ফেরাবীদের সন্ধানে পুলিশ এখানে মাঝে মাঝে রূপাপুবে এসে হানা দিয়ে যায়। বিশেষ করে কেশোলাল। ছ’ দু’টো খুনে’ নামলার সে আসামী। ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির কর্তার, গলাটাকে সে পৌঁচিয়ে পৌঁচিয়ে কেটেছিল, যেমন করে লোকে মুগী জবাই করে—অনেকটা সেই রকম। তারপর তাকে ধরতে এল চৌকীদার। চৌকীদারের নাম আলী মহম্মদ; দশসই জোরান, দশটা বাঘে তাকে খেতে পারে না। ছ’বার সে নিছক বাহুবলে জাপটে চোর-ডাকাত ধরে ফেলেছে। কিন্তু নিতান্ত কৃষ্ণগেই সে

কেশোলালকে ধরবার জন্তে এগিয়ে এসেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্যে কেশোলাল ল্যাজা ছুঁড়ল। আলী মহম্মদ নাটকতে পড়ল, আর উঠল না।

তারপর থেকে কেশোলাল নিরুদ্দেশ। পুলিশের রাগ তার ওপরেই সব চাইতে বেশি; তার মাথার ওপর বুলছে দশহাজার টাকার পুরস্কার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ধরা পড়েনি। কেউ বলে—সে নাকি জাহাজের খালসী হয়ে বিলেত চলে গেছে, কেউ বলে নাগা সন্ন্যাসী সেজে সে হিমালয়ে গান-ধারণার মন দিয়েছে। কিন্তু এব কোনোটাই যে সত্যি নয়, রূপাপুরের কামারেরা তা জানে। কেশোলালের মতো মানুষ তো চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। জীবনকে সে রূপান্তর দিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে জীবন স্তিমিত গান-ধারণার নয়, পালাসী হয়ে কাঠালের চুলোয় করলা ঠোঁপও নয়।

সাত আট বছর পেরিয়ে গেল, রূপাপুরের কামারেরা কেশোলালকে প্রায় ভুলতে পড়েছে। কিন্তু রামনাথ ভোলে নি। তাবই সার্থক মন্ত্রশিষ্য ছিল কেশোলাল। সুরবের মধ্যে সে রক্ত মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে ওঠে কিন্তু তাই বলে কি কেশোলালের সঙ্গে তাব তুলনা চলে। একবার সব করে অনেকখানি কাঁচা মাংস চিবিরে খেয়েছিল সে। কব বেয়ে টপ টপ করে পড়ছে রক্ত, রক্তাক্ত দাঁতের সঙ্গে মাংসের ছিবড়েগুলো জড়িয়ে রয়েছে—প্রকাণ্ড মুখখানার আকর্ষণ রক্তিম হাসি হেসে কেশোলাল বলেছিল—একবার মানুষের মাংস খেয়ে দেখতে হবে, স্বাদ কেমন লাগে।

সেই কেশোলাল।

আর একজন তাকে ভোলে নি, সে তার বউ ভানী।

বিশ্ব-বাইশ বছর বয়স হক-ভানীর। মোটা খাটো চেহারা, সমস্ত শরীরে মেদ নয়, মাংসের প্রাচুর্য। পুরুষের মত শরীরের পটন—অনুরের মতো খাটো, রান্ধসের মতো ঝায়। কোনো মেয়ে যে এক সঙ্গে এই পরিমাণ খেতে পারে এ বেন নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। হাসলে গালের দু'পাশে মাংসের শিশু গোল হয়ে ফুটে ওঠে আর তাদের আড়ালে ছোট ছোট চোখ দু'টো প্রায় তলিয়ে যায় তার। পারের পাতা দু'টো অস্বাভাবিক বড়, ভারী শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভানী যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় যেন হাতী আসছে।

বেশি কথা বলে না, বোঝেও না। অর্থহীন খানিকটা হাসি দিয়েই সচরাচর সব কথার জবাব দিতে চায়। নিঃসঙ্গ ঘরে একলা দিন কাটার, অল্প কামারদের খুঁটিনাটি কাজকর্ম করে দেয়, খেতে পায়। স্বামীর বিরুদ্ধে সে যে খুব বেশি মর্দঙ্গীড়া বোপ করতে না—তাকে দেখলেই সে কথা মনে হয়। প্রচুর স্বাস্থ্য এবং আকর্ষণীয় আহারে নিজের ভেতরেই সে সব সময়ে পরিভূক্ত হয়ে আছে। কাজকর্ম না থাকলে ঘরের দাঁড়ায় বসে গলার নানা রকম সুর করে, কোকিল ডাকে, শিশু দেয়, বলে 'বউ কথা কও।' খামোকা একটা কুড়ুল নিয়ে কাঠের গুঁড়ি চালা করতে লেগে যায়। স্থান করতে গিয়ে অল্প বউঝিদের ধরে চুবিয়ে দেয়, ডুব দিয়ে এসে পা ধরে টানে, শুকনো কাপড়ে পাক ছিটিয়ে দেয়।

মেয়েরা রাগ করে।—অত যে হাসিস, লজ্জা করেন।

লজ্জা? কিসের লজ্জা? ভানীর হাসি তাতে বদ্ধ হয় না। মাংসের টিবি আড়ালে প্রায় তলিয়ে যাওয়া চোখ দু'টো মিটমিট করে বলে, "কেন?"

সোয়াবীর পাতা নেই সাত বছর, কোন্ স্মৃতি আঁছিস তুই?

ভানীর চোখ-মুখে ছায়া পড়ে, হাসি বেরখাটা হ্রস্ব হয়ে আসে ক্ষম। বলে, 'সাত বছর পাতা নাই থাকল, আসবে না একদিন।'

—তাই আসবে। এতদিনে সে হবে—

আর একজন বাণা দিয়ে বলে, থলেই বা। তাকে কি আশা হবে নেবে ভেবেছিস তুই।

—নাঃ ঘরে নেবে না? কে তবে রেঁধে দেবে তুনি? কে পাখার বাতাস দেবে, পা টিপে দেবে কে? রাগ মল লাখি মাঝবে কাকে?

এব পরে যে কথাটা মনে আসে মেয়েরা তা বলতে পারবে না। হুঃ হয়, সংকোচ হয়, লজ্জা হয়। ভানী কিন্তু নির্দ্বিকার।

—তোদের সোয়াবীর চাইতে আমার সোয়ানী আমাকে ঢের বেশী ভালোবাসে।

বুদ্ধিহীন সরলতা অল্প মেয়েদের মনে সহ্যভূতির একটা প্রতিফলি আনে। একজন বলে, 'বাসেই তো।'

ভানী বলে, তার মনে আমার আবার দেখা হবে।

মেয়েরা মনে মনে বলে, বখালয়ে। প্রকাশে জবাব দেয়, নিঃশব্দ।

খুবপাড়ে আঁখিমাছে কোকিল ডাকছে। ভানী উৎকর্ষ

হয়ে শোনে, তার পরেই তার শিশুর মতো অস্থির আর চক্কল মনটা চলে যায় সেই দিকেই। উঁচু কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলে—কু-উ-উ।

কোকিলটা চটে গিয়ে আরো ওপরে স্বরধাম তোলে, ভানীর গলাও তার সঙ্গে পর্দায় পর্দায় চড়ে। বলে—কামিনী দি, এবার আমি একটা কোকিল পুষব।

মেয়েরা মনে মনে আবার বলে, মরণ! তারপর কলসীতে জল ভরে নিয়ে যে বার ঘরে চলে যায়। বেলা বাড়ছে, মরদুলো ভোর না হতেই হাপরে বসেছে। দ্বিদের সময় ভাত ঠিক মতো না পেলে হাতুড়ি পিটিয়ে ওদের মাথাগুলোকে ভেঙে দেবে। ভানীর মতো মনের আনন্দে কোকিল ডাকলে তাদের চলে না।

তবু মেয়েরা রাগ করে না ওর ওপরে। কল্পনা হয়, সহ্যভূতি হয়। কি চমৎকার আনন্দভূক্ত হয়ে আছে ভানী। নির্ভর, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ। নিজের ভালোমন্দ নিজের মান-সম্মান কোনো কিছুই তুলিয়ে বুঝবার মতো ক্ষমতা তার নেই। কেশোলাল কোনো দিন ফিরবে না, ফিরলে তার ফাঁসি অনিবার্য। আর যদি এমন হয়, কোনো দিন চুপি চুপি সে ফিরেও আসে, তা হলেও সে ভানীকে কোনোমতে ঘরে নেবে না। নিজের কতিরি কথা ভানী বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু ওরা তো সবই জানে। জবানবন্দী দেবার জন্তে পুলিশের লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল থানার। তখন ভানীর বয়স অল্প—চৌদ্দ-পনেরো বছরের বেশী হবে না। জবানবন্দী সে কি গিরেছিল কেউ জানে না, কিন্তু তিন চার দিন পরে যখন সে ফিরে এল, তখন দশ মাইল দূরের থানা থেকে হেঁটে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, তাকে আনতে হয়েছিল গাড়ীতে এবং দু'দিন যাবৎ সে অচেতন হয়ে ছিল। থানার দায়োগা থেকে দায়োগাব গাড়ীর গাড়োয়ান পথান্ত ফেউই তাব নিকুপায় দেহটা ওপব পাশবিক চকুপাত করতে ছাড়ে নি।

সকলে মনে কবেছিল—ভানী বাঁচবে না, কিন্তু শরীরের প্রচুর প্রাণশক্তিই তাকে বাঁচিয়ে তুলল। আর শুধু শারীরিক ভাবেই নয়; যে স্বাভাবিক অপমান এবং যুগ্ম রূপাণুণে কামারের মেয়েরা পুষ্প আনুভূতি করতে পারত—অন্ততঃ একটা অস্বস্তি আনুগানিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত তাদের চেতনা, সে অপমান, সে গ্রানি ভানী অনাস্রাসেই কাটিয়ে উঠেছে, অপরিমেয় একটা জীবনী-শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামান্য কালি ছিটার মতো যে দাগ তার গায়ে লেগেছিল, অত্যন্ত সহজেই তা ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে গেছে,—শারীরিক একটা হুঁটনার মতোই সে মনে নিয়েছে সেটাকে।

তাই ভানীর হাসিতে কখনো এতটুকু হ্রস্বপতন ঘটে না, তাই সে বুঝতে পারে না কোন্ অপরাধে কেশোলাল ঘরে নেবে না তাকে। কিন্তু অল্প মেয়েরা তার মতো নির্দোষ নয়। ভানীর অদৃষ্ট ভেবে তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কত বড় সর্বনাশ রেঁ তার হক্রে পেছে, সে কথা বলতে গিয়েও ওরা থমকে থেমে যায়—থাক না। তুলেই যদি আছে, তা হলে আর মনে করিয়ে দিয়ে কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী।

পুরুষেরা অবজ্ঞা সবাই সে দৃষ্টিতে ভানীকে দেখে না। কালো

সহায়ত্ব হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে; আবার ভানীর অসংবত চলাকেরা, নিজের সম্পর্কে অসত্য অচেতনা, কারো কারো মাথার মধ্যে আশ্রয় আশ্রয় দেয়। মাংস পূর্ণিমা দিগন্তের দিকে উল্লস-সম্প্রদায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে—ভানী তো রাজ্যে একাই থাকে।

কিন্তু বছর দুই আগে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, তারপর থেকে ভানীর ঘরে কেউ আর ঢুকতে সাহস করে না।

সারাদিন ঢেঁকি কুটে এক সের চালের ভাত খেয়ে কুস্তকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল ভানী। অনেক রাজ্যে ঝাঁপের দড়ি কেটে কে তার ঘরে ঢুকল। চকিত স্পর্শে ভানীর গভীর নিদ্রা দূর হয়ে গেল, মাথার কাছ থেকে পিতলের একটা ঘটি তুলে নিয়ে সজোরে অঙ্ককারের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত বলিয়ে দিলে।

কুড়াল ধরা, জাঁতা ভাঙা কঠিন হাত—উদ্ভেজনার আধিক্যে আঘাতটা মারাত্মক হয়ে বসল। ভানীর গায়ের ওপর থেকে ভারী একটা জিনিষ প্রবল আর্জনার করে পড়ে গেল মাটিতে, তারপর বিজ্ঞপতিতে উঠে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। আলো জ্বলে ভানী দেখলে ঘরটা রক্তে ভাসছে।

পরদিন সকালে ব্যাপারটা তার ভালো করে মনেই পড়ল না। আর বৈজ্ঞানিক মাথার একটা রক্তাক্ত শ্রাব্য জড়িয়ে তিন দিন পড়ে রইল বিছানায়। অঙ্ককারে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েই তার এই দুর্ঘটনা। দৈব-দুর্বিপাকে এমন কত বিভবনা মানুষকে ভোগ করতে হয় যে!

তারপর থেকে ভানী মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটিয়ে আসছে। আকার-ইঙ্গিত দু' চারজন মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু বেশী কাছে এগিয়ে আসবার সংসাহস আর নেই কারো। সে সব ইঙ্গিত ভানী ভালো করে বুঝতেও পারে না, পুঙ্খবহ মতো স্বাভা, পুঙ্খবহ মতো জীবন-যাত্রা মনের দিক থেকেও তাকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। যে সমস্ত ইঙ্গিত ও কথাবার্তার অস্ত্র মেয়েরা লজ্জার মুখ তুলতে পারতো না, তাদের সমস্ত শিরাস্ত্রাগুলো চমকে উঠত, সেগুলো ভানীর কাছে নিছক ঠাণ্ডা আর অর্থহীন মুখভঙ্গী বলেই মনে হয় শুধু। কিন্তু কেশোলালকে সে তুলতে পারেনি।

ভালো করে মনে কি পড়ে? সবটা পড়ে না—সাত আট গছের ব্যবধান একটা স্তম্ভ পরদার মতো তার ওপরে নেমেছে, তার অন্তরালে সে সব দিনগুলো দেখা যায় ছায়ার মতো, কতক দেখা যায়, কতক দেখা যায় না। তা ছাড়া ভানীর বয়স তখন বেশী নয়, আর বয়সের অস্থিগত বুদ্ধিও ছিল অপরিণত। তরল অগতি চিন্তার ওপরে সে দিনের স্মৃতি কোনো রেখাপাত করেনি, দাগ কাটতে না কাটতেই মিলিয়ে গেছে। কেশোলাল সাধি মেয়েছে তাকে, নির্ধ্যাতন করেছে নানারকম, কঠিন হাতে টেনে টেনে মাথার চুল অর্ধেকের বেশী উপড়ে ফেলেছে, আর—আর ভালোবেসেছে নির্ভয়ভাবে, নিষ্ঠুরভাবে—রূপাপুরের কামাবেবা যেমন ভাবে ভালোবেসে থাকে।

তাই এক একটা দিন হঠাৎ অতিরিক্ত উজ্জল হয়ে দৃষ্টির সামনে বলমল করে ওঠে যেন। যেন পাতলা পর্দাটা জারগায়

জারগায় ছিড়ে গিয়ে সূর্যের আলো গিরে প্রসারিত হয় তাদের ওপরে। দাঁওয়ার বসে আপন খোলা কোকিল ডাকতে ডাকতে ভানী হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

ভানীকে বেগম প্রহায় করে বেরিয়ে গেছে কেশোলাল, ফিরেছে অনেক রাতে! গায়ের ব্যথার চোখের জল ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে ভানী, আচমকা জেগে উঠেছে কেশোলালের নিশ্চেষ্ট সোহাগের উদগ্র উচ্ছ্বাসের মাঝখানে।

রক্তবাসে কেশোলাল বলেছে, খুব রাগ হয়েছে না? আজ্ঞা, এবার হাট থেকে তোরা জন্তে ডুবে শাড়ী কিনে আনবে আর সোনাদীঘির মেলা থেকে কিনে দেব নানারঙের কাঁচের চুড়ি।

কোথায় সেই কেশোলাল। বুধদের মতো মিলিয়ে গেছে একদিন। অত বড় মানুষটা, অমন শক্তিমান, হাতুড়ির মুখে বার আশুন ছুঁত আর চারিদিকের সমস্ত মানুষ-জানোয়ার তটস্থ থাকত বার ভয়ে, একদিন এক দমকা হাওয়ার মতোই বিলীন হয়ে গেল সে। সমস্ত রূপাপুর, শুধু রূপাপুর-কেন, আশেপাশের সব অঞ্চলগুলো যে জুড়ে থাকত,—আজ কোনোখানে তার এতটুকু পাতা পাওয়া যায় না। এও কি সম্ভব! ভানীর ভারী বিষয় বোধ হয়।

সামনে দিয়ে মানুষের শোভাযাত্রা। গাড়ীর মিছিল। কত লোক চলেছে, কত অসংখ্য লোক। দূর বিদেশ থেকে সব আসছে—দেখলেই বোঝা যায়। মানুষগুলোর হাঁটু অববিধুলো, জামা কাপড় লাল আর ময়লা হয়ে গেছে। চোখে মুখে গভীর ক্লান্তি। মাথার ওপর জলছে জ্যৈষ্ঠের সূর্য, এখনো বৃষ্টি নামেনি, ফাটা মাঠগুলোর ফাটল দিয়ে আশুন উঠছে, পথের পাশে মরা বিলগুলো শুধুই কাদা। লোকগুলো তৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সেই শুকনো বিলগুলোর দিকে, রূপাপুরের দীর্ঘ তাল গাছগুলোর রূপন ছায়া তাদের মনে কণিক বিশ্রাম নেবার প্রলোভন জাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই তাদের। গরুর গাড়ীর চাকার ধূলা জমে সেগুলো আকারে যেন বিগুণ হয়ে গেছে, চাকার ভেতর থেকে ক্যাচক্যাচ শব্দে উঠছে একটা কাতর আর্জনার। গরুগুলো পা ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে, যেন অস্ত্রিম যাত্রার; মহিষের গালের হ' পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনা।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভানীর কত কী মনে হয়। মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোন লোক বাকী নেই, সবাই দল বেধে আজ সোনাদীঘির মেলায় দিকেই এগিয়ে চলেছে। এত লোকও কি আছে সংসারে। লগ্নে লগ্নে মনের সামনে ভেসে ওঠে আর একজনের কথা—সে কেশোলাল।

কেশোলাল। সে কোথায় আজকে? সেও কি এখন দুপুরের রেগে আজ পথ চলেছে ছর ছাড়া, লক্ষীছাড়ার মতো? প্রথম রোদের আলার পুড়ে ব্যুছে মাথার ওপরটা, তৃষ্ণার তিক্তি এসেছে কঠ, কিন্তু কোনোখানে এতটুকু ছায়া নেই, জল নেই একটি বিন্দুও। তবু সে চলেছে, চলেছে—তার চলার শেষ নেই। হ' হ'টো খুন করেছে সে, ডাকাতি করেছে সে, পুলিশ তাকে এক-বিন্দু শিষ্টাম দেবে না, এক কথা ভানীও জানে।

যে লোকগুলো চলেছে, তাদের দিকে ভানী আকস্মিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। কে জানে, এদের মধ্যেও হয়তো কেশোলাল থাকতে পারে, হয়তো এদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সেও চলেছে মেলায়। কিন্তু ভানী কি তাকে চিনতে পারবে? ওই যে লোকটা অতি কষ্টে কুঁজো হয়ে পথ চলছে, ওই কি? কিণ্ড কেশোলালের তো অত বুড়ো হবার কথা নয়। কিংবা ওই কে একজন এক মুখ দাড়ি নিয়ে সতর্ক চোখে চাবদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে, ওই যে কেশোলাল হতে পারে না, এমন কথা কে বলবে। সাত আট বছর আগেকার কথা, ভানীর তাকে ভালো করে মনে পড়ার কথা নয়।

কামিনী এল পিছন থেকে।

—এত করে কী ভাবছিস ভানী।

চিন্তার স্বর কঁটে গেল। ভানী জবাব দিলে না, তাকিয়ে রইল বড় বড় নির্কোষ চোখ মেলে।

—এমন করে বসে আছিস যে? কিধে পেয়েছে? চল এক ধামি মুড়ি দেব তোকে। আমার এক কাঠা ধান কিষ্ট ভেনে দিতে হবে।

—নাঃ। —ভানীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

কামিনীর বিষয় বোধ হ'ল। —ভাবছিস কী, সোয়ামীব কথা নাকি?

ভানী এবারেও জবাব দিলে না, তেমনি কবেই তাকিয়ে রইল, কিন্তু এবারে তার নির্কোষ চোখে কী যেন একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল কামিনীর কাছে।

সহায়ভূতি এল কামিনীর। সত্যিই ভানীর বড় দুর্ভাগ্য। আরো নিজের সঙ্গে তুলনা করলে সে দুর্ভাগ্যের রূপ আর বেখাটা যেন বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। রামনাথ তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে, অস্বাভাবিক সোহাগের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর একা ঘবে বাত কাটায় ভানী; নিজের কোনো জীবন নেই—সকলের সঙ্গে নিজেকে চড়িয়ে দিয়ে নিজেকেই সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে বেগেছে, ভুলিয়ে বেগেছে।

করেক মুহূর্ত কামিনী চুপ করে রইল।

—কাল তো সব মেলায় যাচ্ছে। বাবি তো তুই?

অনাসক্ত কণ্ঠে ভানী বললে, গিয়ে কী হবে?

—খালি খালি গড়ে থাকবি কেন? কত জিনিষ আনবে মেলায়, কত দেখবার জিনিষ। নাচ গান আরো কত কী।

ভানীর মনে পড়ে গেল সোনাদীঘির মেলা থেকে কেশোলাল তারজন্তে বেলেয়ারী কাঁচের রং-চঙে শাড়ী কিনে আনত; একবার জ্বলন্ত শিশিতে করে ভালো তেল নিয়ে এসেছিল; মাথার মাথলে তার মিষ্টি গন্ধটা দু'দিন পর্যন্ত ভানীকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু ভানী তো তেল মাথতে জানত না, জটাধা চুলের কাঁক দিয়ে কোঁটায় কোঁটায় তেল গড়িয়ে পড়ত তার গায়ে। কেশোলাল আদর করে বলত, তুই একটা জংলী, এ সব বাবুগিরি করা তোয় কাজ নয়।

পর্দার আবরণটা ছিঁড়ে আরেক বলক আলো এসে পড়ল।

ভানী হঠাৎ যেন জেগে উঠল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো কামিনীর মুখে।

—আচ্ছা দিদি—

—কী বলবি?

—মেলায় তো অনেক লোক আসে, তাই না?

—আসে বই কি।

—তা হলে, তা হলে, সেও তো আসতে পারে?

এতক্ষণে কামিনী সব বুঝতে পারল। ভানীকে বাইরে থেকে যা দেখার সে তা নয়। তার মনের প্রচ্ছন্ন প্রান্তে প্রান্তে এখনো কেশোলাল আসন জুড়ে রয়েছে, তাকে সে ভুলতে পারে নি। আবার সহায়ভূতির একটা প্রবন এসে তার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। এখনো প্রতীক্ষা করে আছে, কেশোলাল আসবে, ওকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে। কিন্তু—

কিষ্ট সে কথা বলে কী হবে। কামিনী আন্তে আন্তে বললে, আশ্চর্য্য তো কিছু নয়, কত লোক আসে, কেশোলালও আসে; পারে হয়তো।

ভানী সতৃষ্ণ নয়নে সামনেবু, জনতার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, চলো দিদি, তোমার ধান ভেনে দিই।

এইবার কামিনীই বললে, নাঃ, সে থাক এখন।

ক্রমশঃ—

প্রান্তর

বিলাসী ফাণ্ডন ছুঁয়ে গেল এসে চাঁদের চুল,
কিশোরী পাতারা সাড়া দিলো বুঝি বসন্তের;
ভীক জমরের বাসর সাজালো রসিক ফুল,
স্বপ্ন বুঝিবা রং পেলো নীল দিগন্তের।

সবুজ করাসে মিষ্টি আলোর ভরা-ভোয়ার,
খন্ডিল চোখে নেমেছে কখন স্নিক স্মন;
নগরীর মতে এখনো চাঁদের খোলা-দুয়ার—
পৃথিবীর পথে স্থপ্তি এখনো স্থির নিশ্চল।

ক্রীমীকৃত গুণ

সাদা বোশনারে ঢেকে গাছে বুঝি শিখর,
নবম চুলের গন্ধে তোমার রাত মাতাল;
ধোঁপার কুসতে জোনাকীর জমে সম্বর,
অফুট ধনি সব ধমনীতে আজ দামাল।

প্রান্তরে আঁক রেখে আসি চলো কল্পনার
গভীর আবীরে রাভানো রাতের স্নিক রূপ;
সবুজ হাসের বুক চিবে আজ পৃথ-রেখার
উজ্জল স্মৃতি সর্বোব নতো জগুক পূন।

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

(বাণিজ্য)

এনিরা মহাদেশের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের রাজত্বের সাধারণতঃ খ্যাতি কর্তন করেছেন আচার ধর্ম স্থাপন করে, শাস্ত্রের বিধান রাজ্যের জীবনে প্রয়োগ করে। তাঁদের আচার নিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণ তাঁদের দেবতার আসনে বসিমাতে, কবি এবং সাহিত্যিকেরা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেছেন, পুরোহিত, আলোচক, কথক প্রভৃতির আদর্শ নরপতিরূপে, আদর্শ মানবরূপে সমাজের সমুখে তাঁদের উপস্থিত করেছেন। আকবর যদি সেই সুদূর পথ অবলম্বন করতেন, তাহলে তিনিও জনসাধারণের পূজনীয় এক দেবতারূপে তাঁদের ভক্তি অর্থাৎ পেতেন, আচার পন্থী ঐতিহাসিকেরা সংস্কার পন্থী ধর্মাবলম্বকেরা তাঁর অশংসার পক্ষমুখ হতেন। তিনি কিন্তু লোকের অশংসার চেয়ে অন্তর-দেবতার নির্দেশের অনুসরণ করাকেই তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছিলেন, আর এই অন্তর-দেবতার নির্দেশে, যেখানে তাঁকে আচার কিম্বা লিখিত শাস্ত্র বা কবির পরিপত্তা হতে হয়েছে, সে পথ অবলম্বন করতে কখনও তিনি বিধা বোধ করেন নি।

সাধারণ নরপতির রাজ্যের কর্তব্যের এবং খোদার নির্দেশের সন্ধান করেছেন, সনাতন আচারে অথবা লিখিত শাস্ত্র বা কবির; আর আকবর সে সন্ধান সন্ধান করেছেন তাঁর অন্তরের প্রেরণায়। আকবর এবং আওরঙ্গজেবের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য আমরা এইখানেই দেখতে পাই। হিন্দু-বিষেবী বলে আওরঙ্গজেবের একটা কুখ্যাতি অনুমানের সমাজে প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষ কিংবা তিনি হিন্দু বিষেবী ছিলেন না, কোন বিশেষ জাতির প্রতি। তিনি বিষেবের ভাব গোষণ করতেন না। তবে তিনি একান্ত ভাবে আচার নিষ্ঠা একজন মুসলমান ছিলেন, আর সেই হিসাবে ত্রিপুরার আচার, রীতি নীতি প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এভাবে তিনি ছিলেন আকবরের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের মানুষ। আওরঙ্গজেবের রাজশাসন যে পক্ষপাতী হওয়ায় ছিল না, তার দৃষ্টে অবাগ আমরা সমসাময়িক লেখকদের সন্দেহ পাই।

Alexander Hamilton নামক একজন ইংরাজ পরিব্রাজক আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি লিখেছেন :—

The religion of Bengal by law established is Mahometan, yet for one Mahometan there are above hundred pagans, and the public offices and posts of trust are filled with men of both persuasions.

... ..

Every one is free to serve and worship God in his own way. And persecutions for religion's sake are not known among them.—Vide—Hamilton's A New Account of the East Indies.

Sir T. W. Arnold তাঁর The Preaching of Islam গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"In an interesting collection of Aurangzeb's orders and despatches, as yet unpublished, we find him laying down what may be termed the supreme law of toleration for the ruler of people of another faith. An attempt had been made to induce the emperor to deprive of their posts two non-Muslims, each of whom held the office of pay-master, on the ground that they were infidel Parsis, and their place would be more fittingly filled by some tried Muslim servant of the Crown; moreover, it was written in the Koran 'O,

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেমিস্ট্রি) বার-এস-এ

believers take not my fo and your foe for friends.' The Emperor replied, 'Religion has concern with secular business, and in matters of this kind bigotry should find no place. He too appeals to the authority of the sacred text which says : 'To you your religion, and to me, my religion' and points out that if the Verse his petitioner had quoted were to be taken as an established rule of conduct 'then ought we to have destroyed all the Rajas and their subjects. Government posts ought to be bestowed according to ability and from no other considerations."

Ovington নামক ইংরাজ পরিব্রাজক আওরঙ্গজেবের যুগে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি লিখেছেন :

"The Great Mogal is the main ocean of justice. He generally detrmines with exact justice and equity, for there is no pleading of peerage or privilege before the emperor, but the meanest man is as soon heard by Aurangzeb as the chief Omrah; which makes the Omrahs very circumspect of their actions and punctual in their payments."—Vide Ovington's Voyage to Suratt in the year 1689,

করাদী পরিব্রাজক Bernier লিখেছেন :

"The great Mogal, though he be a Mahomedan, suffers there heathens (Hindoos) to go on in their old superstitions, because he will not, or dareth not cross them in the exercise of their religion."

(তবে)

তবে একথা সত্য যে আওরঙ্গজেবের সধর্মনিষ্ঠা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তাঁকে এমন এক পথে নিয়ে গিয়েছিল, যে, তার বলে হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আর সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানের জন্য অনেক সময় তিনি এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যা থেকে (সে যুগে একান্ত বাস্তবিক হলেও) প্রথম দৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, হিন্দু বিষেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এলব কাজ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এসবের কারণ ছিল রাজ্য শাসন এবং বিদ্রোহ দমন। হিন্দু দমন নয়। একথা ভুলে চলে না যে, যে শরিফের আওরঙ্গজেব একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং যে শরিফের ভাষাতে তিনি রাষ্ট্র-শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাতে হিন্দু দমনের নির্দেশ কোথাও নাই। তবে আকবরের উদার সার্বজনীন নীতি ছেড়ে লিখিত শাস্ত্র বা কবির অনুসরণ করতে গিয়ে আওরঙ্গজেব মহা ভুল করেছিলেন, আর সেই ভ্রান্তি থেকেই এসেছিল তাঁর রাষ্ট্র জীবনের ব্যর্থতা। আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত জীবন (মন্তব্য: সিংহাসন আরোহণের পর থেকে) ছিল একজন সাধক দর্শনের, কিন্তু রাজ্যের ব্যাপারে তিনি জটিল ভারতীয় জীবনের তাগিদে সাদা দিতে পারেন নি, আর সে জীবনের জন্য যে উদার, সার্বজনীন মনোভূতির দরকার, সে মনোভূতি যেখানে পড়েন নি। প্রকৃতপক্ষে আকবর হাড়ি কর্তন নরপতি তা দেখাতে পেরেছেন? আওরঙ্গজেব ছিলেন মানুষ আর আকবর ছিলেন দেবতা—আলোচ্য। দুই-মোলা সম্রাটের পার্থক্য এইখানে। দেবতার কুলে লিখা মুক্ত আবহাওয়ার বিস্তার করবার ক্ষমতা মানুষের নাই।

(কখনও)

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

তৃতীয় পর্ব (গোড়ার কাহিনী)

একিঞ্চ ভরতরোহক পথে আসতে আসতে তাহ্মিলেন, "যৌগন্ধারায়ণ বন্দী কটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমারই যেন লজ্জার মাথা কাটা যাচ্ছে। সকল নৌ-হাতী দিয়ে আমরা ধরতে চেয়েছিলাম বৎসরাজকে। ধরা পড়েছিলেনও তিনি। কিন্তু যৌগন্ধারায়ণের কোণে তিনি উদ্ধার পেয়েছেন, তবে এর জন্য বরং যৌগন্ধারায়ণকে বাধীনতা ও মন্ত্রি হারাতে হয়েছে। কিন্তু বাই হোক! প্রভুর জন্য এরকম আত্মত্যাগ এ কলিযুগে হ্রাস"।

অন্ত-পালার চুকে তিনি ঘুর থেকে হেঁকে বললেন, "টক, কোথায় মন্ত্রিবর যৌগন্ধারায়ণ"?

যৌগন্ধারায়ণ গভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "এই যে আজ্ঞন, মন্ত্রিবর"।

ভরতরোহক—"মন্ত্রিবর! এতদিন যৌগন্ধারায়ণ, যৌগন্ধারায়ণ" নামটিই শুধু শুনে আসছিলাম—বর্ণনের সৌভাগ্য ত হয় নি। আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্ত হয়েছি"।

যৌগন্ধারায়ণ—"পরিহাসে প্রয়োজন কি, মন্ত্রিবর! আমার বর্ণন যদি আপনার এতই কাম্য হয়, দেখুন আমাকে তা হ'লে ভাল ক'রে—প্রভুর উদ্ধারের চেষ্টায় বরং বন্দী, বেহ কত বিকৃত—রক্তে ভাসছে সারা শরীর। তবে বীর-মাত্রেই এই অবস্থা কাম্য"।

ভরতরোহক—"আপনি ত বীরের মত প্রভুর উদ্ধার করেন নি—করেন তোরের মত। মানুষকে ঘুষ দিয়ে হাতী নিয়ে পালান কি বীরের ধর্ম? প্রকৃত বীর যে সে কি হাতীর ব্যাপারে এরকম হঙ্গন করে"?

যৌগন্ধারায়ণ—"হাতী নিয়ে হলনার পথ বেধেছিলেন ত আপনাতাই। বৎসরাজকে যে কপট হাতীর সাহায্যে ধরেছিলেন, সেটা কি খুব বীরোচিত কাল হয়েছিল"?

ভরতরোহক—"আজ্ঞা, ও কথা ছাড়ুন। আমাদের মহারাজ অগ্নি সাকী ক'রে নিজের ঝেরটিকে বৎসরাজের শিঙা ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁকে চুরি করে নিয়ে পালান কি রাজধর্ম?"

যৌগন্ধারায়ণ—"মন্ত্রিবর! আপনি ব্যাপারটা বুঝেও বুঝছেন না। কোন কালে কে কোথায় অগ্নি সাকী ক'রে গুলবরণ ক'রে থাকে? অগ্নি সাকী হয় ত শুধু বীরের সময়। এই অগ্নি-সাকীতেই বৎসরাজ বাসবদত্তার শুভ গাভীর-বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। আপনি জেনে রাখুন মন্ত্রী মহাশয়, ভরত-বংশের নিরাস এই যে ঐ বংশের কোন রাজা এক বিবাহিতা পত্নী ছাড়া অল্প কোন প্রীলোককে কখনও ললিত-কলা শিখা দেন না। নিজের ধর্মপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বাগ্মতা ত কোন সোয়ের নয়।"

ভরতরোহক—"এই ক'দিন আগেও আমাদের মহারাজ বৎসরাজের কষ্টে সমাধর ক'রে তাঁর বাধন খুলে দিয়েছিলেন। সে সম্মানের এই কি উপযুক্ত প্রতিদান"।

যৌগন্ধারায়ণ—"মন্ত্রী মহাশয়! আপনি একটু পক্ষপাত করছেন আপনার মহারাজের প্রতি। নড়াগিরি যখন বেগে যায়, তখন তাকে এক বৎসরাজ ছাড়া আর কেউ বাগ মানাতে পারবে না কেনে নিভান্ত দ্বারে পড়েই মহারাজ প্রত্যন্ত বৎসরাজের বাধন খুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর তাঁর কষ্টে মহারাজ প্রত্যন্তের উপকারই কি কম হয়েছিল? এখন যে তাঁর নিরীহ প্রজারা, তারা যেন-প্রাণে মরতে মসেছিল, তারা সকলেই খেঁচ গেল। তবে পর, প্রত্যন্তের আপনার সোকদের প্রাণ ও বশ বজায় রইল। কেন না—হাতীটা বৎসরাজের তাঁর নিভরই পারভেন না—তাতে তাঁদের বহ্নান হ'ত 'অপবর্ষ' ব'লে। আর সেই অপবর্ষ বুর করতে গিয়ে তাঁরা বার বার নড়াগিরি ধরবার চেষ্টা করতেন, তাতে হস্ত কামর কামর প্রাণও যেত।

আর তা ছাড়া, শেষ অবধি হয় ত সোঁকের প্রাণ বাঁচাতে হাতীটাকেই বেধে ফেলতে হ'ত—সে কতি মহারাজ প্রত্যন্তের বুকে শেলের মত বাগ্নত। কাজেই বৎসরাজকে মুক্তি দিয়ে উজ্জয়িনীপতি বৎসরাজকে সম্মান দেখান নি, নিজেই স্বার্থসিদ্ধি ক'রে নিয়েছিলেন"।

ভরতরোহক—"আজ্ঞা, সে ত না হয় যেসে নিশ্চয় যে—নড়াগিরিকে ধরার সময় বৎসরাজকে মুক্তি দিয়ে মহারাজ তাঁর স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরেও ত আর তাঁকে বন্দী ক'রে রাখেন নি—অতিথির মতই রেখেছিলেন"।

যৌগন্ধারায়ণ—"আবার বন্দী করলে তাঁর অকৌর্ষিতে বেশ ছেঁয়ে যেত যে। কৃতজ্ঞতা ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে। রাজা হ'য়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা করা সাজে কি"?

ভরতরোহক—"মন্ত্রিবর! আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় আপনি রাজনীতি শেখেন নি কোন দিন। আজ্ঞা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যুদ্ধে বন্দী শত্রুর প্রতি কি রকম ব্যবহার করবার উপদেশ দেয় রাজনীতি"?

যৌগন্ধারায়ণ—"বধ"।

ভরতরোহক—"তা হ'লে বলুন, মন্ত্রিবর! বৎসরাজ যদি আমাদের মহারাজের কাছে বধের ধোঁয়া হ'ন, তবে আমাদের মহারাজ কেন তাঁকে এতটা সমাদর করলেন"?

যৌগন্ধারায়ণ—"কৃতজ্ঞতা দেখাবার জেতে"।

ভরতরোহক—"কিলের কৃতজ্ঞতা?"

যৌগন্ধারায়ণ—"মহারাজ প্রত্যন্তের প্রাণরক্ষা করার দক্ষ কৃতজ্ঞতা"।

ভরতরোহক সবিম্বরে বললেন—"এও আপনি সম্মত মনে করেন না কি"?

যৌগন্ধারায়ণ—"নিশ্চয়। যখন বৎসরাজ নড়াগিরির পিঠে—আর আপনাদের মহারাজ নিরস্ত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে হাতীর পায়ের কাছে, তখন বৎসরাজ একবার একটু ইঙ্গিত করলেই নড়াগিরি আপনারদের মহারাজের বেহ পিবে ফেলতে পারত। আপনারা এ রহস্যটুকু না বুঝে থাকুন, আপনারদের মহারাজ যে বুঝেছিলেন, তা বৎসরাজের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞ আচরণ দেখেই বেশ বোঝা যায়"।

ভরতরোহক কথা-কাটাকাটিতে যৌগন্ধারায়ণকে এঁটে উঠতে না পেয়ে এইবার যৌগন্ধারায়ণকে ব্যস্ত ক'রে ব'লে উঠলেন—"তা হ'লে বলুন মন্ত্রী মহাশয়! আপনি কি এখনও আশা করেন যে আবার কোণাবী কিয়ে যাবেন"?

যৌগন্ধারায়ণ একটু হেসে বললেন—"আপনি এবার হাসলেন, মন্ত্রী মহাশয় আপনারদের সামনেই যখন নির্ভয়ে দাঁড়িতে পেরেছি, তখন কোণাবী কিয়ে বাগ্মরা আমার পক্ষে এমন কি একটা কঠিন কাজ"।

টিক এই সময়ে রাজবাড়ী থেকে একজন কছুকী এসে মন্ত্রী ভরতরোহকের কানে কানে কি যেন বললেন। তাই শুনে মন্ত্রী বললেন—"আপনি খুলে বলুন সব কথা"।

তখন কছুকী এক সোনার গাডু (ভুনার) যৌগন্ধারায়ণের সামনে রেখে বললেন—"মন্ত্রী মহাশয়! মহারাজ জানিয়েছেন—'আপনি আপনার প্রভুকে ক্ষমত কোণলেজ্ঞার করেছেন, শত্রু আপনারদের প্রতি যে হলনা করেছিল, তাঁর উপযুক্ত পাণ্ডা প্রবাব' আপনি শত্রুকে দিয়েছেন, আপনার কৌর্ষি এই ব্যাপারে আপনার চেয়েও বেড়ে গিয়েছে। আপনার প্রভুত্বের তুলনা হয় না। শুধু প্রভুত্বের মর, আপনার প্রভু হা বা চেয়েছেন—আপনি প্রাণপণে তাঁর সে সব ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন, আর আমার বহ্নিদের সঙ্কট যে বৎসরাজের হাতে

আমার যেটিকে সম্ভাবন করি—আমার সে সমস্ত আপনি পূর্ণ করেছেন। একত্রে আমি আপনায় কাছে কৃতজ্ঞ। আপনায় সঙ্গে আমার কোন শত্রুতাও নেই। আপনি আমার কোন অপকীর্ত্য করেনই নি—বরং উপকারই করেছেন। তাই আমার বন্ধুত্বের নিদর্শন এই জুয়ার আপনাকে উপহার দিলাম। অনুগ্রহ করে আপনি এটি বীকার করলে কৃতজ্ঞ হব”।

যোগস্বরায়ণ—“এইবারেই ত বিপদে পড়লাম। নড়াগিরিকে খেপিয়ে দিতে যে সব বর আলিয়েছিলুম—সে গলির ক্ষতি এখনও প্রকার্য্য তোলে নি। উজ্জরিনীর হস্তীরে কুট কোশল সব ব্যর্থ করেছি—সে জন্ত তাঁদের হৃদয়ে এখনও বাধা বাজছে। এর লজ্জা এটি মুহুর্তে বধ-নও আশা করছিলাম—সে বধ হ’ত আমার পক্ষে অসম্ভব। তার বশে কিন্তু এল মহারাজ প্রভোতের সম্মান—উপহার। এ অশ্রু! অপরাধী শত্রুকে সম্মান দেখান মানেই চাকে বধ করা। শিরশ্চন্দ তার পক্ষে পুরস্কার! নাঃ! এ জুয়ার কথখেনা নেওয়া হবে না”।

হঠাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে হালির সঙ্গে চাপা-কারা-মিশান শব্দ উঠতে মনে ভরভরোহক ও যোগস্বরায়ণ দু’জনেই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওরা-চাওরি করতে লাগলেন। ভরভরোহক কণ্ঠকীক বললেন—“ঠাকুর! আপনি শীগগির জেনে আস্থান, বাপারটা কি”।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে কক্করী বললেন—“মেরের রক্তে উত্তলা হয়ে মহারাজী অজ্ঞানবতী প্রাসাদের চাকর উপর থেকে ঝাঁপ খেতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁকে পিছন থেকে ধরে কেলে মহারাজ প্রভোত বললেন—তোমার মেরের বিয়ে ত কজিরের ধর্ম্ম-মতে হ’য়েই গিয়েছে। তুমিই ত তার পথ নিয়ে প্রেযুক্ত ক’রে দিয়েছ। এখন আমার এ আশ্বনের সময় কারা-কাট পাগলামি কেন? এস আমরা উজ্জরিনীতে দু’জনের ছবিতে চব্বিতে বিয়ে দিয়ে উৎসব করি। আর গোপালকে পাঠাই কোণাবীতে। পালক নড়াগিরির পিঠে চেপে তাড়া করেছ মেরে-জামাইকে। গোপাল তাকে গেলমাল বিধাতে বাগন ক’রে ফিরিয়ে আনুক—আর সঙ্গে বাসবদত্তকে বখালায় সম্ভাবন ক’রে দিয়ার কাটা খেব ক’রে আনুক। মন্ত্রী যোগস্বরায়ণ তার আসেই এই বর নিয়ে কোণাবী চ’লে যান”।

“তাই না কি!”—বলে যোগস্বরায়ণ লাকিয়ে উঠলেন। “মহারাজ কুটুবিভা করছেন। তবে ত মধ্যাহ্ন হিসাবে জুয়ারটা নিতে হয়”।

“এই নিন”—বলে কক্করী জুয়ার এগিয়ে দিলে।

ভরভরোহককে আলিঙ্গন ক’রে মহারাজ প্রভোতকে কক্করীর মুখে অভিবাগন জানিয়ে হাতীর পিঠে যোগস্বরায়ণ কোণাবীতে যাত্রা করলেন।

একিকে বৎসরাজ অন্ধকারে ভ্রমবতীকে জোরে চালিয়ে বনের মধ্যে কিছুদূর যাত্রা গিয়েছেন, হঠাৎ পিঠে সেবের ডাকের মত প্রকাণ্ড এক হাতীর গভীর আওয়াজ তাঁর কানে এল। বুঝলেন—এ নড়াগিরি—তাঁদের পিছু নিয়েছে। নড়াগিরির পিঠে কে অন্ধকারে চেনা বাচ্ছিল না ঘটে; কিন্তু তিনি বুঝলেন যে নড়াগিরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে ভ্রমবতী কখনই পারবে না। কাজেই তিনি তখন মরিচা হ’য়ে বশুক-বাণ নিয়ে বুদ্ধের মত তৈরী হ’য়ে রইলেন। সেনাপতি কসবান তাঁর সেনাদের নিয়ে পিছু পিছু যে ছুটে আসছিলেন—এ বিষয়ে তিনি নিঃশঙ্কহ ছিলেন। কাজেই তাঁর তরঙ্গা ছিল যে এক আধ বড় একলা লড়তে পারলে শিহনের সাহায্য এসে পৌঁছবে।

লেখতে লেখতে নড়াগিরি শুঁড় তুলে গর্জন করতে করতে এল বেগে এগিয়ে এল। আবার তখন চোঁড়ের বলে উঠল—“মহারাজ! এ যে নড়াগিরি দেখছি। এ আপনি নিয়ে সাহাবান—এর মুখ থেকে বাতান আমার কণ্ঠ নহ”। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! নড়াগিরি শব্দই হাত বুয়ে এসেই হঠাৎ থেমে গেল—তাঁর নাকের নত চোঁড়তেও সে আর এক পাও এগুতে চাইবে না। এমন কি তাঁর সে দুর্দান্ত জীবও বেন কোথায় উড়ে গেল—বেন পোষা হরিণের বাচ্ছা—এমনই শান্ত তাব দেখাতে লাগল।

আবার বললে—“মহারাজ! আমাদের খুব ভায়া ভাল যে ভ্রমবতীর পিঠে চেপে আমরা খেরেছিলাম। ভ্রমবতীর স্নায়ের সম্মুখে নড়াগিরি খেয়ে গেছে—ভ্রমবতীকে ও খুব ভালবাসে কিদা, তাই ভ্রমবতীকে নড়াগিরি কখনও আক্রমণ করবে না। তবে নড়াগিরির পিঠে দেখছি মহারাজকুমার পালক। তাঁর সঙ্গে আপনারা বোখাপড়া করুন”।

ইতিমধ্যে মহারাজ উদরন বশুকবাণ জুড়েছেন দেখে বাসবদত্তা কেঁদে উঠলেন—“মহারাজ! দাদাকে বেন মেরে ফেলবেন না”। উদরন বললেন—“আমি যদি শুঁক না ঘারি আগে ত উনি আমাকে মারবেনই। এই দেখ, উনিও আমার দিকে বাণ লক্ষ্য করছেন”। তাই সঙ্গে বাসবদত্তা হাতীর পিঠে লাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—পালকের বাণের সাহসে বুক পেতে দিয়ার হাত জোড় ক’রে দাঁড়ালেন। পালক বাণ ছুড়তে গিয়ে দেখলেন সাহসেই দাঁড়িয়ে তাঁর আগরের ছোট বোনটি বাকে উদ্ধার করার জন্য এত কাঁদে। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত বিস্ময়ে হতভম্ব—হাতের বাণ হাতেই রয়ে গেল। এই অবস্থার তাকে পেয়ে বৎসরাজ সুযোগ চাড়লেন না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তাঁর বশুকের ছিলে কেটে ফেললেন নিজের বাণ দিয়ে। ঠিক এই সময় পিঠে থেকে গোপাল এসে পড়লেন, তাঁর সব চেয়ে স্নেহগামী ছোড়া হস্তীরের পিঠে চ’ড়ে। তিনি খুবই কম সময়ের মধ্যে এসে পড়তে পেরেছিলেন। ছুই তাইএ নিলে কিছুক্ষণ কথা-বাড়ীর পর পালক বধন জন্মলেন যে, তাঁর বাবা প্রভোত বরং এ ব্যাপারে দুঃখিত ত হনই নি, বরং সুখীই হয়েছেন, তখন তিনি আর করেন কি! নিরীহ ভাল মানুষটির মত উজ্জরিনী বিয়ে যেতে রাজি হলেন।

ছুই তাই গোপাল আর পালক নড়াগিরির পিঠে চেপে উজ্জরিনীর দিকে রওনা হয়েছেন, এমন সময় সৈন্তের ক্রমাগত এসে হাজির—পিঠে পিঠে যোগস্বরায়ণ। যোগস্বরায়ণের সারা দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখে বৎসরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—“মন্ত্রিবর! এ কি”। যোগস্বরায়ণ সব ঘটনা খুলে বলবার পর বসন্তকে অসুরোধ করলেন—“বসন্ত! তুমি একবার পুলিন্দকের রাজ্যে এগিয়ে গিয়ে মহারাজের আশ্রয় কথা জানাও”। তারপর সেনাপতির দিকে ফিরে বললেন—“কসবান! তাই তুমি শীগগির কোণাবী চ’লে যাও। প্রজাদের এ হৃৎকর দাঁও গে”। এবার তিনি মহারাজকে বললেন—“মহারাজ! আপনি বেশ খোঁর হয়ে আছেন—আশ্রয় সবার আপনায় বন্ধ পুলিন্দকের রাজধানী দিয়ে ঘুরে আসবেন, কারণ আমার কথা ভেঙা আছে। আমি এগিয়ে বাই, রাজ্যের সীমানায় আমার অপেক্ষা করতে হবে, উজ্জরিনীর হুত আসবে, তাকে সঙ্গে নিয়ে কোণাবীতে যাব। এর মধ্যে আপনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক’রে একটু জিরিয়ে রাজধানীতে এসে পৌঁছতে পারবেন”।

বসন্তক, কসবান ও যোগস্বরায়ণ সকলেই এগিয়ে চ’লে গেলেন। বৎসরাজ খুবই সুখী—বাসবদত্তা ও কাঁকসবালাকে নিয়ে ভ্রমবতীর পিঠে চ’ড়ে যোগস্বরায়ণকে এগিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে রাত শেষ হ’য়ে গেল। প্রায় দুপুর হয় হর—হাতীটা ঠিক তেথটি যোজন চ’লে এসেছে উজ্জরিনী থেকে। হঠাৎ আবার বললে—“মহারাজ! বুঝে একটা সন্ধ্যার দেখা যাবে। হাতীটা একদমে এতটা পথ এসেছে; ও একটু জল না খেয়ে আর চলবে না। আপনারা সকলে এইখানেই সন্ধ্যাকর যাবে বেনে যাব ক’রে একটু জিরিয়ে নিন—আমি দেখি যদি আপনাদের সঙ্গে কিছু কলমুল বোখাড়া করতে পারি কি না। ততক্ষণ ভ্রমবতীও জলে নেমে একটু খেলা করুক”। এই বলে আবার বনের মধ্যে হুক পড়ল। সকলে হাতীর পিঠে থেকে নামতেই সে খুঁ-আগেই জলের মধ্যে নেমে গেল। কিন্তু খানিকটা জল খেতে না খেতেই সেইখানে চ’লে পড়ল। সন্ধ্যাকর জলে বাঁধেরা বিব মিশিয়ে রেখেছিল। তাই খেয়ে ভ্রমবতীর জীবন শেষ হ’ল। কিন্তু নিজের জীবন দিয়েও সে উদরন, বাসবদত্তা প্রভৃতির

আশীষ দিয়ে দিলে। জল বিবাক্ত জেনে তাঁরা আর সে জল ছুঁলেন না।
এখন সময় আবার কল-মূল নিয়ে কিংবদন্তি। হাতীর চক্ষু দেখে সকলেই
‘হরি হরি’ করতেন, এমন সময় এক পরমাত্মার বিজ্ঞান-কথা সেইখানে
আবিষ্কৃত হ’য়ে জ্বলেন,—‘বঙ্গরাজ। আমি এক বিজ্ঞান-বধু—সাম
আমার মাতা-বউ। আজ আপনার সেবা পেয়ে আপনার কিছু উপকার
করেছি। আপনার কৃপার আজ আমি শাপমুক্ত হলাম। এ উপকারের
প্রত্যুত্তর আমি করব আপনার ছেলে হ’লে। এই যে রাজকন্যা বাসবদত্তা,
তিনি আপনার স্ত্রী হবেন। ইনি সাধারণ মানবী নন—শাপমুক্তা দেবী।
কিঞ্চিৎ কারণে মানুষের ঘরে এসে জন্ম নিয়েছেন। এ’র গর্ভে আপনার
যে তেলে হবেন, তিনি সমস্ত বিজ্ঞানদের একচ্ছত্র সম্রাট হবেন। সেই সময়
আমি আবার আসব।’ এই বলে শাপমুক্তা ভক্তবতী অদৃশ্য হ’য়ে গেলেন।

তখন বঙ্গরাজ আর কি করেন! পায়ে ধৌটেই ক’জনে চলতে লাগ-
লেন। পুলিন্দকের রাজ্যের কাছে বরাবর এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়
একদল দলী এসে তাঁদের ঘিরে ফেললে। বঙ্গরাজ একলাই তাঁদের সঙ্গে
লড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর বাপ খেয়ে একশ’ পাঁচ জন ডাকাত প্রাণ
হারািল। এমন সময় বঙ্গরাজের সঙ্গে বাধরাজ পুলিন্দক সৈন্য এসে
উপস্থিত। বাকী দলীরা তড়িয়ে দিলেন ব্যাধরাজ। তারপর উদয়নকে
প্রথম ক’রে নিজের রাজধানী সমাধির নিয়ে গেলেন। সে দিনটা ভাগ-
রাজধানীতেই আনন্দ উৎসবে কেটে গেল।

পরের দিন সকালে দেখা গেল প্রধান মন্ত্রী যোগেশ্বর, সেনাপতি
কুমার, কোশাধীর প্রধান প্রধান প্রজানারকেরা, সেনাদল সকলে মিলে দশ
মলে এগিরে আস্তে মহারাজ উদয়নকে প্রত্যুদয়ন ক’রে নিয়ে যেতে। এমন
সময় উজ্জয়িনী থেকে একজন বণিক এসে উপস্থিত হলেন। প্রধান মন্ত্রী
যোগেশ্বরের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের সঙ্গ ছিল। তিনি এসে জানালেন
যে উজ্জয়িনীতে প্রত্যুদয়ন তাঁর জামাই বঙ্গরাজ উদয়নের উপর খুবই খুশী
হ’য়ে একজন দূত পাঠিয়েছেন। সে দূত একটু আস্তে আস্তে আসছে।
আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিরে এসেছি আপনার এ হৃদয়বাণী দেব বলে।
এই বলে বণিক নিজের কাজে চলে গেল।

তখন যোগেশ্বর বললেন, ‘মহারাজ! চলুন, আমরাও আস্তে আস্তে
এগিরে বাই। কোশাধীরাজ্যের সীমানার পৌঁছে সেইখানে দূতের জন্ত
অপেক্ষা করা যাবে’।

উদয়ন রাজী হলেন। তখন সকলে মিলে কোশাধীর দিকে যাত্রা
করেন। যাবার সময় উদয়ন পুলিন্দককে ছাড়লেন না—সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে
গেলেন।

কোশাধীরাজ্যের সীমানার গিয়ে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে, প্রজারা
রাজ্যের সীমা থেকে আরম্ভ ক’রে রাজধানী পর্যন্ত সারাপাতি লতা-পাতা,
ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়েছে। পথের মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ, বীণা মাথার
পতাকা। চারিদিকে নালা রকম আনন্দের বাজনা বাজছে—সমস্ত রাজ্যে যেন
আনন্দের শ্রোত বইছে।

রাজ্যের এখন তোরণের নীচে সকলে উজ্জয়িনীর রাজদূতের জন্ত অপেক্ষা
করতে লাগলেন। বেগুতে বেগুতে চণ্ডমহাদেবের মহাপ্রতীহার এসে

পড়লেন। রাজা উদয়ন, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রথম জায়গায় তিনি
ঘিরে ধীরে বললেন, ‘মহারাজ! আপনি যে আমাদের রাজকন্যাকে হরণ
ক’রে এনেছেন—এতে আমাদের মহারাজ বিন্দুবার ভ্রূষিত হন নি—বরং খুব
আনন্দিত। তিনি বলতেন, ‘বোলো বঙ্গরাজকে যে আমি ও অরিসাক্ষী
ক’রে আমার ঘেরেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছি। কাজেই তিনি আমার
দেহকে হরণ ক’রে নিয়ে গেলেন বলে যেন আমাদের কাছে কোন লজ্জা না
করেন। তবে একটি কথা—বঙ্গরাজ যে আমার ঘেরেকে গৃহকর্তা হতে
বিবাহ করেছেন—তা আমার অনুমানেই জানা আছে। কিন্তু আমার
অনুরোধ যে তিনি যেন গাধার-বিবাহ ক’রেই ক্ষান্ত না থাকেন। নিজের
রাজধানীতে পৌঁছে যেন আমার ঘেরেকে যথাযথ বিবাহ করেন। কন্যা-
সম্প্রদানের জন্ত আমি খুব নীচ গিরিই আমার ছেলে। গোপালকে পাঠাচ্ছি
কোশাধীরে। তার যাওয়া পর্যন্ত বঙ্গরাজ যেন অপেক্ষা করেন’। মহা-
রাজ! আমাদের মহারাজের বক্তব্য আপনার কাছে নিবেদন করলাম।
এখন আপনার যা অভিকর্ষ’।

মহাপ্রতীহারের বখায় উদয়ন ত খুবই আনন্দ করলেন। রাজকুমারীও
পরম আনন্দে প্রতীহারকে ডেকে তাঁর বাগের বাড়ীর সকলের কুশল সংবাদ
জিজ্ঞাস করতে লাগলেন। সে দিনটা ঐভাবে আমোদে আনন্দে কেটে
যাবার পর দ্বিতীয় দিন সকালেই উদয়ন প্রত্যাব করলেন—মহাপ্রতীহার!
আমরা তা’হলে রাজধানীতে এগিরে বাই। তবে কুমার গোপালকে অভ্যর্থনা
করবার জন্ত আপনি, মন্ত্রির যোগেশ্বর আর আমার পরম বন্ধু ও
হিতৈষী ব্যাধরাজ পুলিন্দক এইখানেই করেকদিন অপেক্ষা করতে থাকুন’।

সকলেই এ প্রস্তাবে রাজী। উদয়ন কোশাধীরে পৌঁছে দেখলেন,
আগে থেকেই খবর পেয়ে রাজধানীর প্রজারা বিবাহ উৎসব আরম্ভ ক’রে
দিয়েছে। চারিদিকে নাচ-গান বাঁশ-দাওয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাঁচ। কয়েক
দিনের মধ্যেই উজ্জয়িনী থেকে গোপালক এসে উপস্থিত হলেন। প্রত্যুদয়ন
তাঁর সঙ্গে মেরে জামাইকে যৌতুক দেবার জন্ত অগ্রসর রত সোনা-রূপার
গহনা—হাতী-ঘোড়া দাস-দাসী প্রচুর খাবার জিনিষ পাঠিয়েছেন। তাই
দেখে যোগেশ্বর প্রস্তাব করলেন, ‘মহারাজ! রাজ্যের সমস্ত প্রজা
আ-বাল বৃদ্ধ-বিনীতা সকলে আপনার বিবাহ-মহোৎসবে যোগ দিয়ে নিমন্ত্রণ-
ভোজন করুক। তা’র বর্ষদিন আপনার অর্ঘ্যনে কান্ত হ’ল, এখন ক’দিন
খাওয়া-দাওয়া ক’রে একটু আনন্দ পাক’। উদয়ন সানন্দে সম্মতি দিলেন।
সাতদিন খ’রে রাজ্যের কোন প্রজার জাড়া আর হাঁড়ী চড়ল না।

তারপর একদিন শুভলগ্নে কুমার গোপালক তাঁর আদরের ছোট বোন
বাসবদত্তাকে যথাযথ বঙ্গরাজের হাতে সম্প্রদান করলেন। রাজপুত্রোচিত
বধন বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধা হলেন, তখন বিবাহ-মঞ্চের দাঁড়িয়ে রাজ্যের
প্রজারা বলাবলি করছিল—যেন সাক্ষাৎ রত্ন আর কামদেব এসে পৃথিবীতে
মিলিত হয়েছেন।

কোশাধীরে কদিন পরম সুখে কাট্টিরে বঙ্গরাজের স্তন্য সখী কুমার
গোপালক উজ্জয়িনী ফিরে গেলেন তাঁর বাপ-মাকে এই বিবাহের খবর দিতে।
মহারাজ উদয়ন তাঁর স্তন্য সখী বাসবদত্তাকে নিয়ে নবম আনন্দে দিন
কাটাতে লাগলেন। [গোড়ার কাহিনী সমাপ্ত]

কণিকা

শুকনি সে বতই উঠুক নভে
কুই ভাষার রহে শশান গানে,
ভোগি যে জন বতই করুক তপ
সংসারে তার কেবলই মন টানে।

ঐপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

মাটির মাঝে অশখ রহি’ তবু
আকাশ পানে তুলল মাথাটিকে,
সবার মাঝে থেকেই মহৎ হওয়া
যার গো বদি ইচ্ছাই থাকে।

(আট)

৬. তত্ত্ব-কুহব-বলি-বিকার—যথার্থের মতে ইহার মধ্যে দুইটি কলা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—(ক) তত্ত্ব-বিকার ও (খ) কুহব-বলি-বিকার। 'বলি' অর্থে পুজার উপহার। ঠিকাকার অর্থ করিয়াছেন—(ক) সরস্বতী-ভবনের বা কামদেব-মন্দিরের মণিময় মূর্তি, যা নানাবর্ণে রঞ্জিত অথবা তত্ত্ব-ভাগে ভাগে সাজাইয়া নানা আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি রচনা; (খ) আর শিবলিঙ্গাদির পুজার নিমিত্ত নানাবর্ণ কুহব-গ্রহণপূর্বক ভাগে ভাগে আকৃতিতে সাজাইবার কৌশল। নানা ঠিকাকার বলিতেছেন—এই যে ফুলগুলি তরে তরে সাজান হইবে, তাহাতে স্তম্ভ-সংলগ্ন থাকিবে না—বিনা স্তম্ভের গাথিতে হইবে। কারণ স্তম্ভ দিয়া গাথিলেই উহার কৌশল সাদৃশ্য-বিকল্প-নামক (চতুর্দশ-সংখ্যক) পৃথক্ একটি কলার অন্তর্ভুক্ত হইবে; আর ভাগে ভাগে তরে তরে সাজাইবার কৌশলই এখন হইতে পৃথক্ এই কলার বিষয়।

মহাশয়ের, এই কলাটির মধ্যে তিনটি ছোট কলার সমাবেশ আছে—

(ক) তত্ত্ব-বিকার—(১) আশ্রিত আশ্রিত চাল সাজাইয়া পদ্ম, হাতী, ঘোড়া ময়র ইত্যাদি নানারূপ ফুল-পত্র-পাখী ইত্যাদির প্রতিকৃতি রচনা। যে যুগে সাধারণতঃ দেব-দেবীর মন্দিরে নানারূপ মণি মুক্তা দিয়া বাঁধান যেখানের উপর অথবা তত্ত্ব সাজাইয়া এই সকল আকৃতি (figure) রচনা করা হইত। (২) কেহ কেহ বলেন—ইহার অর্থ অল্পরূপ। চাল ভাঙিয়া নানা প্রকার ফুলের রসে তাহা রঙ করিয়া তাহার সাহায্যে নানাবিধ মণ্ডল বা আকৃতি রচনার কৌশল এই কলার বিষয়। (৩) আবার অপর কোন কোন ব্যাখ্যা তার মতে চাল বাটিয়া ও ভলে গুলিয়া সেই গুলিগোলা দিয়া আলিপনা দেওয়ার কৌশল এই কলার অন্তর্গত। (৪) আবার অন্তমতে—চাল ভাল ইত্যাদি ভোজ্যাদি নৈবেদ্যের আকারে নিপুণভাবে সাজাইবার কৌশলই ইহার বিষয়। এখনও নৈবেদ্য নানা আকারে সাজান হইয়া থাকে—মন্দিরের আকারে, গোল, ত্রিকোণ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি নানাভাবে। অল্পকট ইত্যাদি উৎসবে অন্নাদি ভোজ্যাদি যে নানা আকারে সাজান হয়, তাহার কৌশলও এই কলার অন্তর্গত।

(খ) কুহব-বিকার—(১) নানা বর্ণ ও আকৃতির পুষ্পগুলিকে ভাগে ভাগে তরে তরে পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিতভাবে সাজাইয়া উহার সাহায্যে দেব-বিগ্রহকে নানা ভাবে সাজাইবার কৌশল। আজকাল দেখা যায়—৮ কলীধামে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের, ৮ পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর,

১। কুটিম-বাঁধান মেঝে; সিনেট, মোজারেক, মার্বেল, প্রভৃতি ইত্যাদি দিয়া বাঁধান মেঝে। ৮ মণ্ডলপত্র পালের সংস্থাপন বলা হইতে—'মণ্ডল চর প্রদেশে (সানবাঁধান উঠান)।'

২। অথবা তত্ত্বলৈন্যবর্ণে: সরস্বতীভবনে কামদেবভবনে বা মণি-মূর্তিগণের ভক্তিবিহারঃ। অত্র এখনং সাদৃশ্য-এবং অল্পকট; ভক্তি-বিলম্বণাবস্থাপনং কলাভরত—জয়মঙ্গল।

ভক্তি—(১) বিভাগ, ভাগ, ভাগে ভাগে বা তরে তরে সাজান—t xture, arrangements, সাজ গোজ—decoration, embellishment.

জয়মঙ্গলার মূল বক্তব্য এই যে বৃদ্ধা দিয়া ফুল গাঁথা হইলে উহা 'সাদৃশ্য-এখন' কলার মধ্যে পড়িবে। আর না গাঁথিয়া ফুল কেবল সাজাইলে উহা এখন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এই কুহব-বলি-বিকার কলার মধ্যে পড়িবে।

৩। (১) জ্যেষ্ঠের সত্যাবলিগণের নিমিত্ত এই কলাটির তিনটি কুহব বিভাগ আর সম্ভব হয় না—হয় ঠিক দুইটি—(১) তত্ত্ব-বিকার ও (২) কুহব-বলি-বিকার। (১) (২) (৩) জ্যেষ্ঠের সত্যাবলিগণের মতে ইহাতে তিনটি আবৃত্ত কলার অন্তর্ভাব।

এমন কি এই কলিকাতা মহানগরী নানা দেবদেবের (যথা—৮ কলীধামে ৮ কলীধামাচার, বাগবাজারের ৮ কলীধামাচার দেবের ও কলী-মন্দিরের স্তম্ভানবাটে ৮ কলীধামাচার দেবের) দেব-বিগ্রহগণের সাজায়ে পুজার বেশ ইত্যাদি নানারূপ সজ্জা প্রধানতঃ নানাবিধ ফুলের সাহায্যেই রচিত হইয়া থাকে। এই সকল কুহব-সজ্জার কৌশল কুহব-বিকারের অন্তর্ভুক্ত। (২) বিনামূল্যে পুষ্পের মালা বা হার গাঁথিয়া দেব-বিগ্রহের সজ্জা করার কৌশল এই কলার বিষয়—এইরূপ মতও কেহ কেহ পোষণ করেন। (৩) অন্তমতে—ফুলের তোড়া বাঁধা বা পাখা তৈয়ারী করা অথবা কোন পাত্রে ফুল দিয়া তাহাতে নানা আকারে ও বিভিন্ন কৌশলে ফুল সাজাইবার কৌশল। পুজার উদ্দেশ্যে পুষ্পদ্বারা ভাগে ভাগে নানা জাতীর ফুল সজ্জাভাবে সাজাইবার কৌশলও ইহার অন্তর্গত। Flower vase-এ সুনিপুণ ভাবে নানাবর্ণের ফুল সাজানও এই কলার অন্তর্গত। নানাবর্ণ ও আকৃতির ফুলের সাহায্যে দেবদেবের স্তম্ভদেশ, মন্দিরের ভিত্তি-গাত, দেবতার বৈদিক বা সিংহাসন সাজাইবার কৌশলও এই জাতীর। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে ফুল দিয়া বাড়ীর স্তম্ভদেশ বা উৎসব-প্রাঙ্গণ বা গৃহসজ্জাও এই কলার অন্তর্গত। পুষ্পদ্বারা স্তম্ভকাদির সজ্জাও ইহার সজ্জাতীয়।

(গ) বলিবিকার—সবপুজার নৈবেদ্য নানা আকারে খরখরে সাজাইবার কৌশল। অথবা অল্পকটাদি উৎসবে রক্ত-গজদ্বন্দ্ব-পায়সাদির সাহায্যে পাহাড়, নদী, সরোবর ইত্যাদি সৃষ্টি। অথবা নৈবেদ্যের মত নানা আকার নিপুণভাবে সাজাইয়া স্তম্ভ-গজদ্বন্দ্বাদির পরিবেশন। কেহ কেহ তত্ত্বচূর্ণ দ্বারা মণ্ডল রচনা, বা কুহব ভাগ-রঞ্জিত তত্ত্ব-বাটা (পিটুনি) ভলে গুলিয়া তাহা আলিপনা দেওয়ার কৌশল এই কলার অন্তর্গত মনে করেন।

এইবার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের মত নিয়ে সংগৃহীত হইতেছে।

৮ তত্ত্ব-মহাপ্রভুর মতে—'অথবা তত্ত্ব বাগ পদ্মাদি রচনা, বিনা স্তম্ভে কুহবাবলী-বাগা ফুলে লতা-প্রতান-নির্মাণ, তত্ত্বাদি চূর্ণ-দ্বারা মণ্ডল-রচনা, কুহব-রসে তাহার রঞ্জন—এ সকল শিল্প ইহা এই অন্তর্গত।'

৮ কলীধাম দেবদেবগণের মহাপ্রভুর মতে—'পূজা কি বাগ-বজ্রের স্তম্ভ ? ফুলের নৈবেদ্য-রচনা, পুষ্পের স্তম্ভ-রচনা, উপহার-স্বয়ং সাজান রচনা। পূর্বকালের অকর্ণপা ব্রাহ্মণেরা এই কার্য করিত। এখন আর ইহা নাই, একেবারে লোপ হইয়াছে'। ৭

৯। আমি আর আমার এক বজ্রমান-গৃহে একটি উড়িয়া মালীকে এমন কলার ভাবে পুজার পুষ্পদ্বারা সাজাইতে দেখিয়াছি যে, হঠাৎ একটি ঘুর হইতে দেখিলে একখানি ছবি বলিয়া ভুল হইত।

১০। বাঁহাচার নৈবেদ্য সাজানকে 'তত্ত্ব-বিকার'ের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন, তাহাণিগণের মতে 'বলি-বিকার' আর একটি স্বতন্ত্র কলা নহে—তত্ত্ব-বলি-বিকার ও কুহব-বলি-বিকার এই দুইটি মাত্র কলা।

১১। কামদেব, বঙ্গবাসী স, পৃ. ৩৮। ৮ তত্ত্ব-মহাপ্রভুর ইহার তিনটি বিভাগই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলি-বিকারের মধ্যে কেবল নানাবর্ণের মণ্ডল রচনাই ধরিতেছেন—নৈবেদ্যকে বাদ দিয়াছেন।

১২। শিল্পপুঞ্জালি, ১২২২, এখন পত্র, পৃ. ৬। ৮ দেবদেবগণের মহাপ্রভুর মতেও ইহার মধ্যে তিনটি কলার কল। তবে তিনি যে কোন বলিলেন—এখন আর ইহা নাই, একেবারে লোপ হইয়াছে—তাহা বুঝা যায় না। এখনও এসকল কৌশলের পরিচয় বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আর 'অকর্ণপা ব্রাহ্মণেরা এই কার্য করিত'—ইহাও বলা অস্বাভাবিক। বাঁহাচার একজন শিল্প-কুশল ভাষাবিশারদ 'অকর্ণপা' বলা বার কিসের? হরৎ 'সুখ' বলিলেই শোভন হইত।

৮ হুয়েশচেন সমাজপতির মতে—“পূজা-বাগ-বজের সময়ে নৈবেদ্য প্রকৃতির রচনা, পুষ্প প্রকৃতির সংহীনরূপ ব্যবহার” ৮

কলা—ততুল-বলি-বিকার ও কুহু-বলি-বিকার।

৮ কুহুচেন সিংহের মতে—“ইহা বোধ হয়, আলোপন দেওয়া প্রকৃতি কার্য ও মালা গ্রন্থন কার্য” ১২

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শতপথ বলি-কর্ণের পক্ষে পঞ্চাশ পুষ্প চরনের উল্লেখ দুই হয়। আর যুদ্ধকটিকে পাওয়া যায়—“বিজ চাক-নগর গৃহ দেহীতে প্রবৃত্ত ভূত-বলি হংস ও সারসে ভোজন করিত ১০

কুহু সম্ভার বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর। উহার আর বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৭। পুষ্পান্তর—‘আত্মরূপ’ শব্দের অর্থ আয়রণ, আচ্ছাদন, ঢাঘর। ভরমজলা চাঁকতে বলা হয়।—‘সীতা ও পুত্রের সহযোগে নানা বর্ণের কৃত্রিম গ্রন্থিত করিয়া বাসগৃহ ও দেবতার উপস্থান-মণ্ডপাদি সজ্জিত করার কৌশল—ইহারই অপর নাম ‘পুষ্পশরন’ বা ফুলের বিভানা ১১। মালাগাঁথা এ বলার অন্তর্গত নহে—উহা ‘মালা-গ্রন্থন-বিকারের অন্তর্ভুক্ত। এ কলাটির মূল বিষয় হইতেছে ফুল দ্বারা বিভানা তৈয়ারী করা। ফুলের সাজ ও ফুলের গহনা, ফুল দিয়া বাড়ী-ঘর-বার সাজান, ফুলের তোড়া বাঁধা ইত্যাদি কার্যও ইহার অন্তর্গত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

৮ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে প্রশিধানযোগ্য—পুষ্পদ্বারা শয্যারচনা-শিল্প। ফুল পাতিলেই শয্যা রচনা হয় না; এমন কৌশলে এই পুষ্প-বিস্তার হইত, বাহা দেখিলে শুভবসনাসজ্জিত সোপান পুরু বিছানা বলিয়া বা নানা বর্ণের উৎকৃষ্ট পাণিচা বলিয়া জ্ঞান হইত” ১২

যেমন নানা রঙের ফুল-লতা-পাতা-কাটা ঢাঘর গালিচা ইত্যাদি বিকসিষ্টা শয্যা রচনা করা হয়, সেইরূপ কেবল নানা বর্ণের ফুল সুকোশলে সাজাইয়াও ফুলের কৃত্রিম বিভানা তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তবে কেবল এলোমেলো ভাবে কতকগুলি ফুল চড়াইয়া রাখিলেই বিছানা হইবে না। এমন কৌশলে ফুলগুলি সাজাইতে হইবে যে, কিছু দূর হইতে সহসা দেখিলে নানা রঙের ফুল-কাটা, গালিচা বা ঢাঘর বলিয়া জ্ঞান হইবে। শরন-গৃহ বা দেবতার উপাসনা-স্থানের এইরূপ ‘ফুল-শয্যা’ তৈয়ারী করার কৌশল এককালে খুবই আদৃত হইত।

মতান্তরে এ কলাটিতে বাগানে নানারূপ ফুলের কেরারী করা বুঝাইয়া থাকে।

৮ কালীদাস বেদান্তবাসিনী মহাশয়ের মতে ‘ফুলের শয্যা ও বাজন প্রভৃতি

৮। কঙ্ক-পুরাণ, প্রথম অংশ, পৃঃ ২৩। ইহার মতে দুইটিমাত্র।

৯। কৌমুদী, পৃঃ ২৭। মালাগ্রন্থন যে এই কলাটির বিষয় নহে—উহা মালা-গ্রন্থন-বিকারের অন্তর্গত—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১০। “অভিজ্ঞানি বলি-কর্ণ-পঞ্চাশতানি কুহুবাণি (অবহীনাইং বলি-কর্ণপঞ্চাশতাইং কুহুবাণিঃ)” অভিজ্ঞান-শতপথ, অঙ্ক ৪।

“বাসাং বলিঃ সপদি বদগৃহদেহলীনাং হংসৈশ্চ সারসশৈশ্চ বিলুপ্তপূর্নঃ” যুদ্ধকটিক ১১২। এ স্থলে ‘বলি’ অবজ্ঞা ভূত-বলি; পক্ষ বহাংয়ের অন্তর্গত কুহু-বজের অঙ্গরূপে প্রযুক্ত।

১১। “ব্রহ্মানাবর্ধে: পুষ্পং হৃদীবানাদিবিদ্যৈরভ্যাততে” তদেব বাসগৃহোপস্থান-মণ্ডপাদি, বহু পুষ্পশরন বিভাগরা সংজ্ঞা” — ভরমজলা।

হৃদী-বানবহু হৃদী ও পুত্র দ্বারা সেলাই করা।

উপস্থান-মণ্ডপ—পূজার স্থান। উপস্থান দেবপূজা।

১২। কামপুর, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪।

নির্ধারণ করা। মালীরা এই কার্য করিত। এখনও ফুলের শুবক (ভোরা) পাখা ও হার প্রভৃতি রচনা করিয়া মালীরা উপার্জন করিয়া থাকে” ১৩

৮ হুয়েশচেন সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“ফুলের শয্যা আত্মরূপ প্রকৃতির রচনা” ১৪

৮ কুহুচেন সিংহ মহাশয়ের মতে—“হৃৎ-দ্বারা সেলাই করত নানা বর্ণে পুষ্পের মালা রচনা কার্য” ১৫

৮। দশনবসনানুসঙ্গ—চাঁকাকার বলিয়াছেন, ‘রাগ’ শব্দটি ‘দশন’ ‘বসন’ ও ‘অঙ্গ’ এই তিনটি শব্দের সহিতই যুক্ত করিয়া অর্থ বিবরণ করিতে হইবে। অঙ্গরাগ—কুহু-মাণি-রাগ। অঙ্গ-মার্জনা। সাধারণভাবে ‘রঞ্জন-বিধি’ এই নাম দেওয়াই উচিত ছিল। তাহা না দিয়া দশন-বসন-অঙ্গ-শব্দগুলি প্রযুক্ত হওয়ার কারণের আদিক) স্মৃতি হইতেছে; কারণ বিলাসিনী নারীগণের নিকট দশনাদির সংস্কার অত্যন্ত অতীর্ণিত ১৬

চাঁকাকারের মতে, এই কলাটির মধ্যেও ছোট ছোট তিনটি কলার একত্র সমাবেশ—(১) দশনরাগ—দীত রঙ করা। অনেক সময় দীতে সোনালী-রূপালী রঙ ও অজ্ঞান্য অনেক প্রকার চিত্র-বিত্ত করা হইত। আশাবের বাজালা দেশে কিছুদিন আগেও মেয়েদের মধ্যে মিশি দেওয়ার প্রথা ছিল। উক্ত কবিতাতেও ‘গৌড়ানাদিগণের দপ্তে কামদেবের বসতি—এই মর্মে পৌড়-কামিনীগণের দশনরাগের প্রয়োগের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৭। অনেক অসভ্য আদিমজাতির মধ্যে আজিও লাল নীল ইত্যাদি নানা রঙে দুইপাটী দীত চিত্রিত করার প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও সোনা বা রূপা দিয়া অথবা সোনালী-রূপালী সিমেন্ট দ্বারা বাঁধাই বা দীতের গর্ত ভরাট করা হইয়া থাকে; কখনও কখনও বা সোনালী জলে বা সিমেন্টে দীত গিলটি করা হয়। খোটা-মারবাড়ীগণও অনেক সময় সপ্তমের দীত চিত্র করিয়া উহাতে সোনা গুরিয়া ভরাট করে—বাহার দিবার উদ্দেশ্যে। তবে আর-কাল এসকল কার্য দৃষ্ট-চিকিৎসকগণই প্রায় একচেটিরাভাবে করিয়া থাকেন।

(২) বসনরাগ—কাপড় ছোবান, কাপড়ের পাড় ছোবান, কাপড়ের খোলে নানারূপ ফুল-লতা-পাতা ছোবান, গায়ের কাপড় (বিশেষ শীতবস্ত্র) রঙ করা ইত্যাদি ইহার বিষয়। ইংরাজী ভাষার বাহ্যকে বলে dyeing, এককালে রঙ-করা ফুলদার মিহি ঢাকাই শাড়ী ইত্যাদির চলন খুব বেগী ছিল। আজকাল উহার পরিবর্তে নানা রঙে ছোবান সিক বা খন্ডের শাড়ী, ঢাঘর, শাল ইত্যাদি বাজারে খুবই চলিতেছে। এসকলই বসনরাগের দৃষ্টান্ত। এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিস্তারোজ্জন।

১৩। শিল্পপুস্তকালি, ১২৯২ সাল, পৃঃ ৬। কেবল মালীরা এই কার্য করিত—ইহা বলা অসুচিত। ইহা এখন একটি কলা, ভগ্নন কলাভিজ্ঞ ও কলাভিজ্ঞা নরনারীগণ নিশ্চয়ই ইহার অভ্যাস করিতেন। মালীদের ইহা জীবিকার উপায় হইতে পারে, কিন্তু কলা হিসাবে ইহা কলাবিদগণের গভ্যগার্হ।

১৪। কঙ্কপুরাণ, প্রথম অংশ, পৃঃ ২৩। ফুলের আত্মরূপ রচনা এ কলার বিষয় নহে। উহা অন্য কলার অন্তর্গত (শেখরকাপড়বোজন প্রভৃতি)।

১৫। কৌমুদী, পৃঃ ২৮। পুষ্পের মালা রচনা এ-কলার বিষয় নহে—ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬। ‘রাগশব্দ: প্রত্যেক: বোজাতে। তজ্জানরাগেহিনবাসিঃ কুহু-মাণিনা। রঞ্জনবিধিরিত বস্ত্রবো দশনবিপ্রদশনানুসঙ্গং—বিলাসিনীনাঃ দশনাদিসংস্কারতাস্তাত্তাত্তীত্বং—ভরমজলা।

১৭। বাচি শ্রীমদধর্মপুরাণ জনকজননদ্বারীনাং কটাক্ষে।

দপ্তে গৌড়জনানাম হৃদিন(ত) ভজনে চৌবকলপ্রেরণীনাং।
তৈলজনীনাং নিতম্বে সজলখনকুটৌ-কেরলীকেশপাশে
কর্ণটানাম মুখেন্দো স্মৃতি রত্নপতিশ্চ জঁরীণাং স্তনবুঃ।

(৩) অঙ্গরাগ—অঙ্গরাগের নৃতন করিয়া পরিতর দিবার কিছুই নাই। অঙ্গরাগ করার অর্থাৎ সেকালেও ছিল, একালেও আছে, পরবর্তী কালেও থাকিবে। তবে সেখানে যে সকল পদার্থ অঙ্গরাগের উপকরণ বলিয়া গণ্য হইত, এখন সে সকল উপাদান পুরাতন অচল হইয়া গিয়াছে। নিত্য নূতন অঙ্গরাগের উপকরণ আবিষ্কৃত হইতেছে। দেশী বিদেশী এসাধনের ব্যবহার পূর্ণ। সে যুগে অথরাগে কেওরা হইত লাঙ্গারাগ, পাউডারের পরিবর্তে বিলাসিনীপ বদনে মাখিতেন লোণ-পুস্পের রেণু, চরণ রঞ্জিত হইত লাঙ্গার-সিক্ত অলঙ্কার-রাগে, আর গাত্র-মল দূরীকরণ উদ্দেশ্যে নিয়মিত। তবে 'কেনক' ব্যবহৃত হইত। ১৮ আঙ্গকাল যেমন ঠোটে 'লিপ্‌টিক্' ঘষা হয়, সেকালেও সেঙ্গপ অথরাগ-রাগের অভাব ছিল না। পাঁতলা করিয়া আলতার রঙ, ঠোটে লাগাইয়া তাহার উপর সিক্‌খকণ্টিকা (যোমের গুলি) দিয়া মাজিয়া দিলে উহা বেশ চিকণ রক্তবর্ণ দেখাইত। সেকালের অঙ্গরাগের কি কি উপাদান ছিল ও কি ভাবে কোনটি কোন অঙ্গে লাগাইতে হইত, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ কামদ্বয়ের 'নাগরক-রক্ত'র মধ্যে পাওয়া যায়। ১২

সিক্‌খকণ্টিকা—যোমের গুলি। অলঙ্কার-পিত্তা দিয়া ওষ্ঠাধর রক্তনের পর সিক্‌খকণ্টিকা ঘষিলে লিপ্‌টিক্‌ ঘষার কার্য্য হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও সিন্দুর, নানাবিধ তৈল, দুধের সর, নার্নন, বেনন, মরুয়া ইত্যাদি খাঁটি দেশী ব্যবহার অঙ্গরাগের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইত। উড়িচা, মাস্রা ইত্যাদি দক্ষিণ অঞ্চলে দরিত্র স্ত্রীলোকগণ অর্থাভাবে প্রসাধনের অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া হলুদ বা ঐরূপ হলুদ খণ্ড বাস্বাকর পদার্থের সাহায্যে অঙ্গরাগ সমাধা করিয়া থাকেন।

১৮। কেনক—যাহাতে কেনা জন্মায়, এরূপ কোন তৈলজাত পদার্থ, সাবানের মত জিনিষ—(কাঃ পৃঃ (১৪)১৭)

১২ নাগরক-রক্ত বা সেকালের বাবুয়ানা—কামদ্বয় প্রণম্যাদ্যায়ের চতুর্থ পাদ্যয় দ্রব্য।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল পদার্থ অঙ্গরাগের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত, কেবল বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করাই সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের লোবকপুঞ্জলি পরিষ্কার রাখা ও অঙ্গরাগ রাখিবার কালে অঙ্গ-মর্দন-বারা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন ও বর্ধক্য ভাবে রক্ত সঞ্চালন, শাখ্যের অনুকূল অথচ ক্ষয়িত ও ক্ষত নানা শাখ্যের অনু-লেপন-বারা শরীরের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্গে সঙ্গে মনের এসজ্ঞতা সম্পাদন ইত্যাদি ছিল তৎকালে অঙ্গরাগের উদ্দেশ্য।

৭ তর্করত্ন মহাশয়ের মতের সহিত যশোধরের মতের ঐক্য বর্তমান—“এক কথায় ইহা রক্তনশিলা নামে অভিহিত”। ২০

৭ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“পূর্বকালের লোকেরা গীতে নানা প্রকার ছক কাটিত, গায়ে উল্কি পরিত, সে সকল এক্ষণে সভ্য-সমাল হইতে দূর হইয়াছে। বস্ত্র-রঞ্জন ও অঙ্গরাগের মধ্যে আলতা পরা এই দুইটি বিলাসিনীরা আত্মাণি কীয়া রাখিয়াছেন”। ২১

৭ সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“দশন, বসন ও অঙ্গরঞ্জনের বিজ্ঞা বা ব্যবসায়”। ২২

৭ কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—“দন্তে, বস্ত্রে এবং অঙ্গে (শরীরে) নানা প্রকার বর্ণবাগ”। ২৩

২০। কামদ্বয়, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪

২১। শিরপুঞ্জালি, পৃঃ ৬; ইহার মতে—উল্কি-পরাও অঙ্গরাগের মধ্যে গণ্য। আমাদের মনে হয়, উল্কি-পরা বিশেষকণ্ঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলেই শোভন হয়।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন, “অঙ্গরাগের মধ্যে এক আলতা পরা নাম বিলাসিনীরা আত্মাণি কীয়া রাখিয়াছেন”। তাহা কি ঠিক? আঙ্গকাল অঙ্গরাগের বহর অনেক বেশী।

২২। ককিপুরাণ, ১ম অংশ, পৃঃ ২৩

২৩। কৌমুদী, পৃঃ ২৮

মর্শা ও কর্শ (উপভাস)

আট

বিকাল একটা সন্তা মেসেই বাসা' নিলে। তার বড়ুরা তাকে বলে, “এত টাকা মাইনে পাও, এঁটা বাড়ী ভাড়া কর না।”

সে কিছু বলে না, মূণ টিপে হাসে। সংক্ষেপে ষরচ চালায়, বাকী টাকা মেনিস বাঁকে রাখে—দু'বাস বাদে সবার জন্ত প্রজেক্ট নিয়ে যেতে হলে, মার জন্ত টাকা চাই।

খুব ভাল টান করেও দু'বাসের ভিতর টাকাটা হুমলো না, আর এক বাস অপেক্ষা করে হ'ল।

শিন বাস পর রোগ আকিস থেকে ফেরবার পথে সে কতক জিনিষ কিনে এনে মজুর করতে আরম্ভ করলে। যে যা চেয়েছিল সব কেনা হ'ল, আর বসন্তের জন্ত কেনা হ'ল একখানা খুব ভাল টেনিস শ্যাকট। গীতার ভজ হ'ল একটা চুপি বসান সোণার ইয়ার-টপ। কেনা কাটা হয়ে গেলে গুজবায়ের জন্ত বস্ত্র প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলো সে। শনিবারটা ছুটি নিয়ে সে গুজবায়ই বাবে রাঁচী।

এবার সে এসে সবাইকে যার যার জিনিষ বিক্রি করে দিলে। আর সবাই খুশি হ'ল, কেবল হ'ল না অনন্ত আর গীতা। অনন্ত তার রাগ আর সোরেটারটা বার বার টিপে টিপে দেখে বললে, “এঃ! একদম ঠকিয়েছে। কোথাথেকে কিনেছিল?”

ডাঃ শ্রীনিরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিকাল একটা বড় দেশী দোকানের নাম বললে, অনন্ত বললে, “হা, তেবেছি। এসব জিনিষ সাহেবী দোকানে কিনতে হয়। একই দোকানের এক দারকার জিনিষ দেশী আর বিলাতী দোকানে কোয়ালিটির আকাশ পাভাল তফাৎ হয়। যা'ক, যা' এনেছ এই বেশ। সাহেব বাড়ী থেকে আসলে দামও বেশী লাগতে, হয় তো কুলোতে পারতে না।”

বিকালের তুচ্ছ দেড়শো' টাকা রোজগারের উপর স্পষ্ট কটাকপাত। পরের দিন বিকাশ দেখলে অনন্ত এক বন্ধুকে সেট রাগ ও সোরেটার দিয়ে দিলে অজ্ঞান করে। বিকাশ মনঃপুর হ'ল, রাগও হ'ল তার। সে কিছু বলে না।

গীতার অসন্তোষটা হ'ল ভিন্ন রকমের। কাণের টপটা দেখে সে বললে, “দিবা টপটা। কত দিয়ে কিনলে?”

“পঁচিশ-টাকা।”

“ও বাবা! হী বিকাশ দা', কত টাকা তুমি রোজগার কর যে সবাইকে এমন সব দামো দানী—জিনিষ দিচ্ছে? হাজার দু'হাজার? ভিঃ এমন অশব্যাস করে না। নিজে হয়তো সেখানে শেট গুদিয়ে পড়ে থাক। না হবে কেন? যে করে মানুষ হয়েছ তার হাওয়া বাবে কোথায়?” বলে সে হেসে উঠলো।

এই তিরস্কারে বিকাশের মনের ভিতর খাঁচা লাগলো, বিশেষ করে

এই জগতে যে এই ভিরঝারটা সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে অনুভব করলে যে গীতা বা' বলতে ঠিক, কিন্তু তবু সে তাকে আবার ক'রে একটা জিনিষ দিতে এসেছে, তাতে এ কথা তাকে বলাটা অস্বাভাবিক রূপে। বোলো স্বপ্নের ঘোরের পক্ষে এ সব কথা তার বসন্তোচ্ছ্বসে বলা একটা খোঁড়া স্বপ্নের জ্যাঠাঘো। তা ছাড়া তার খুব বেশী ক'রে মনে হ'ল এই কথা যে, গীতাও তার দালা অনন্তের মতই তার সাহায্য রোজগার দিতে একটু টিকারী দিয়ে গেল। তাইটা এই যে, তুমি আমাদের বাড়ীর কুঁড়ার মত হ'লার টাকা রোজগার তো কর না, সাহায্য দেড়শো টাকা রোজগার তোয়ার, তোয়ার এসব দেবার স্পীক কেন ?

বিকাশ মেটাকে ঠাওরালে তার রোজগারের খরচতার উপর প্রচুর টিকারী, তাতে সে এত চটে গেল যে সে এ কথার কোনও একটা ভাব দিতে পারল না, বুঝ ক'রে চলে গেল। মনে মনে মনে সে তখনই প্রতিজ্ঞা করলে, বড়লোক হ'তে হবে তার, মেসোম'শারের চেয়ে অনেক বেশী বড় লোক হতে হবে, তবে এদের খোঁতা বুঝ ভোঁতা করা বাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল যেসোম'শার না বড় লোক আছেন, তিনি দেড়শো টাকা রোজগারকে তুচ্ছ ক'রতে পারেন, কিন্তু এরা ছুটি তাইবোন, মেসোম'শারের অনুগ্রহপূর্ণ পরামর্শভাজী হয়ে এদের এতখানি তেজ কিসে ? সাথে কি বলাছেন কবি, "দীপ্তহৃদী সখ্য হর তপ্ত বালি চেয়ে।"

হরিনাথবাবু অফিস থেকে জিরে খেয়ে দেয়ে হুঁহু হ'লে বিকাশ অত্যন্ত সন্তোষে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেসোম'শারকে সে তার একমাসের মাইনে প্রণামী দিতে এসেছে। এতক্ষণ সে এই টাকটা দেওয়ার বজ্রবাহু খুব উল্লাস ও তৃপ্তি অনুভব ক'রছিল। কিন্তু এখন যেন সন্তোষে তার হাত-পা' পেটের ভিতর ঢুক বাচ্ছিল। বিশেষতঃ অনন্ত ও গীতার কথা শুনে তার মনে হচ্ছিল যে, মেসোম'শারকে সাহায্য এই দেড়শো টাকা দিতে যাবার স্পীক তিনি হয় তো তাকে টিকারী দেবেন না, হয় তিরস্কার করবেন।

হরিনাথবাবু আজও একলা ব'সেছিলেন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের ভিতর তাঁর বৈঠকখানার ইল চেয়ারে—এক। বিকাশ এসে কম্পিত হতে আলোর হুইচ টিপে দিয়ে তার পার প্রণাম ক'রে মেসোম'শারের ইঞ্জিনের হাতলের উপর দেড়শো টাকার নোট রেখে দিয়ে নত মস্তকে দাঁড়াল।

হরিনাথবাবু উঠে ব'সলেন। টাকার দিকে চেয়ে পরম আনন্দে হেসে উঠে বিকাশকে একেবারে বুকের ভিতর টেনে নিলেন। যখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন, তখন বিকাশ দেখতে গেল তাঁর বুখ আনন্দে উদ্ভল, কিন্তু চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না মেসোম'শার। নিঃশব্দে টাকাতল দিয়ে তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ঢাবী বন্ধ করে দিলেন। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক, টাকা পেলে তিনি তা' বন্ধ না করেই নিয়ে দেন মাসীয়ার কাছে। তার পর সে টাকার আর কোনও খোঁজবাব বেন না।

অনেকক্ষণ মনে হ'ল তাঁর কঠোর হ'য়ে ছিল। যখন তিনি কথা কইতে পারলেন তখন বললেন, "জানিস ডোকরা, তোর এ টাকার নাম কত ?—আমার কাছে এর এক এক টাকার নাম লাখ টাকা। এ টাকা খরচ হবে না। একে আমি খুব দামী album-এ বাঁধিয়ে রেখে দেবো। কেন জানিস ? সাধারণত আমি কেবল দিয়েই পেছি, রোজগার বা' ক'রেছি এক পরসাত রাবি দি, দিয়েই পেছি—কিন্তু কেউ আমাকে ভালবেসে বা কৃতজ্ঞতাবশত একটি কাপা-কড়িও দেয় নি। জীবনে এই আমার প্রথম ভালবাসার উপহার।" বলতে বলতে তাঁর হুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিকাশ চিরজ্বল মেসোম'শারকে জানে হাতখর রসিকতার একেবারে উইটুও। পাশাপাশি-স্বীকৃতিসে সবার সঙ্গে তিনি কথা কন পরিহাস

ক'রে, হাসি ছাড়া কথা নেই তাঁর। তাঁর এরকম ভাবাবেগ, তাঁর প্রেমে 'জল বিকাশ' বেখেও নি, দেখে-ব'লে কল্পনাও করে নি কোনও দিন। তাই সে একটু খতমত খেয়ে গেল। কিন্তু আনন্দে গর্গে তাঁর বুখ ফুলে উঠলো।

জন্ম সে পেরেছে বাপ-মার কাছে, কিন্তু তার জীবন বলতে কিছু সবই তার মেসোম'শারের দান। শিশুতাল থেকে সে তাঁর আরে পুষ্ট, তাঁর সম্পদে সম্পন্ন। শিকা বা কিছু পেয়েছে সে তাঁরই দয়ার, আর তার খেলা, বা থেকে বলতে গেলে আর তার প্রতিষ্ঠা—সেও মেসোম'শারের শিকা ও উৎসাহের কাছে সম্পূর্ণ ধনী। এ জন্ম কৃতজ্ঞ সে ছিল চিরদিনই, কিন্তু প্রজ্ঞা তার মেসোম'শার তাঁর অন্তরের রক্ত একটা কপাট খুলে তাঁর অন্তর যেমন করে মেলে দিলেন, তার কাছে তাতে তার সমস্ত জ্ঞান আচ্ছন্ন ও প্রাণিত ক'রে বয়ে গেল এমন একটা প্রীতি ও সহানুভূতির বজ্র, যা সে জীবনে কোনও দিন অনুভব করে নি।

হরিনাথ বাবু আবার সেই ইঞ্জিনের বসে তার হাত ধ'রে তাকে চেয়ারের হাতলের উপর বসালেন, তার হাতটা চেপে ধ'রে। সেই হাতের ভিতর দিয়ে বিকাশ অনুভব করলে তাঁর অন্তরের আবেগের মূহু কম্পন।

হরিনাথ বাবু বলে গেলেন, "তুই হয়তো ভাবছিল যে, এত টাকা রোজগার করি আমি, তবু এ পাবার জন্ম গ'লোপানো আমার কেন ? কিন্তু বাবা, যে টাকা আমি রোজগার করি সে সবই রোজগার আমার পরিচয়ের নাম। তার ভিতরই নেই এক ফোটা। তার নামের সঙ্গে তুলনায় মেসোম'শারের দান যে কাপা-কড়ি, তারও দাম অনেক বেশী। সেইটে আমি পাইনি সারা জীবন, তাই তারই জগতে আমার বুকতরা আঁছ তৃষ্ণা। পৃথিবীর সবার মুখের দিকে আমি আকুল তিস্তা নিয়ে চেয়ে দেখেছি এই মেহ ও প্রীতির দানের আশায়, পাই নি। সেলাম শুধু তোর কাছে। তাই আশা আমার এত আনন্দ। আশীর্বাদ করি বাবা, বেঁচে থাক, সুখী হও, আর এমন দুখ তুমি চিরজীবন সবাইকে বিতরণ কর।"

বিকাশের চোখ এবার জলে ভরে উঠলো, তারও বৃষ্ঠ রক্ত হল বাপে। সে কম্পিত কণ্ঠে ব'লে, "আপনার আশীর্বাদ মেসোম'শার ব্যর্থ হবে না।" বলে সে প্রণাম করলে আবার।

বাড়ীর ভিতর সে গেল না, গেল বাইরে। হাটতে হাটতে সে চ'ললো পথ দিয়ে।

তার অন্তর এতখানি পরিপূর্ণ হ'য়ে ছিল যে গাইরের সবকিছু তার কোনও জ্ঞান ছিল না। মেসোম'শারের সম্পন্ন আনন্দের জীবনে যে এতবড় একটা নিঃসঙ্গ শূন্যতা চেপে রয়েছে তা সে কোনও দিন কল্পনাও করে নি।—আজ সে পেলো তার নিখিড় স্রিচর।

তাতে তার আশ্রয় করণায়, মেহে তার অন্তর ভ'রে উঠলো।—সে যে তার এই রক্ততার ভিতর এক ফোটা আনন্দ তরে দিতে পেরেছে তাতে সে কৃতজ্ঞ মনে ক'রলো আপনাকে।

চ'লতে চ'লতে সে এসে প'ড়ল রাঢ়ী পাহাড়ের-পাদমূলে। এইখানে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

চারিদিকের সমতলের মাঝখানে এই পর্বত আকাশ হুঁড়ে উঠে গেছে অনেক দূরে। অবিস্মৃতিত শৌরবে সে মহান, তার উচ্চতার আশে পাশে একটা ছোট টিলাও নেই তার সৌভাগ্য নিঃসঙ্গতা ঘূর করবার। বিকাশের মনে হ'ল এই পাহাড়টা হরিনাথ বাবুর প্রহর। তার বিস্তীর্ণ পরিধারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এই তুঙ্গ শৃঙ্গের মত সগৌরবে। কিন্তু কি নিঃসঙ্গ তাঁর এই মহাবীর শিখর।

সে প্রতিজ্ঞা করলে মেসোম'শারের জীবনের এই উল্লাস রিক্ততা সে ঘূর ক'রে দেবে তার একার মেহ ও সঙ্গ দিয়ে। টাকা পরসার কাড়ল

তিনি নন, তবু সে কি পারবে না কোনও দিন তাঁকে এই টাকা রোজগারের বার্ষিক প্রতি থেকে মুক্তি দিবে তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য ও আনন্দের খায়ায় অবিচ্ছিন্ন করে রাখতে ?

মনে মনে কত কল্পনার ছবি রঙিন হ'য়ে ফুটে উঠলো। বয়স দেখলে সে যে হঠাৎ সে হ'য়ে উঠেছে মেসোম'শারের চেয়ে ধনী... সে এসে তাঁকে বলছে, আপনি আর কাজ করবেন না, আমার সংসারে প্রভু হ'য়ে ব'সে আমার রোজগারের সব টাকা নিয়ে বা খুসী করুন। ভাবতে তার সর্বজনীন আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

বিকাশ যে আফিসে কাজ করে, তার বিপুল কারবারের একটা বড় অংশ পাটের রপ্তানী। সেই পাটের কারবারেই এখন বিকাশ কাজ করে, আর এখানে ইতিমধ্যেই তার আলাপ চ'রেছে অনেক দালাল, মহাজন ও আড়তসারদের সঙ্গে। তাদের কাছে অনেক কাঁচিনী গুনেছে। পাটের কারবারে কতলোক যে রাতারাতি ধনী হ'য়েছে, কত বা ককীর হ'য়েছে সে খবর কে জানে। বিশেষ করে কাটকা খেলার, আর কিছুই সম্বল না নিয়ে একটা season-এর জন্যে যেটা লক্ষ টাকা করা যায়, এ খবর সে শুনেছে।

... যদি সে তেরমিন হঠাৎ লক্ষপতি হ'য়ে পড়ে। তা' হ'লে সে তার লক্ষ টাকা যদি এনে দিতে পারে মেসোম'শারের হাতে তবে কি জুঁতি, কি আনন্দে ভরে উঠবে তাঁর চিত্ত।

পরের দিন বখন সে ক'লকাতার ট্রোণে উঠলো, তখনও তার এ রঙিন স্বপ্নের আনন্দ স্পর্শ কাটে নি। যে মনে মনে ছিন্ন ক'রলে একবার দাঁড়কার বাজারটার টোকা মেরে দেখতে হবে। কে জানে হয় তো অদৃষ্ট খুলেও যেতে পারে।

চটপট ধনী হবার স্বপ্ন সে দেখতে লাগলো। আজকের এ স্বপ্নে দরিদ্র মেবার কল্পনা নেই—নিজের সুখের চিন্তা নেই—আছে মেসোম'শারের তৃপ্তি ও আনন্দ ভরা অন্তর দেখবার আশা ও আনন্দ।

ক'লকাতায় এসে একজন পরিচিত পাটের কারবারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল তার আফিসেই।

সে বললে, "এখন কাটকার বাজার বা মন্দা যাচ্ছে, এই সময় যদি কিছু কিনে রাখা যায় তবে লোকসান হ'তে পারে না, কেন না হয় এর চেয়ে নীচে কিছুতেই নামবে না। যদি মাসে তো দু-চার আনা। বেশ কিছু বেড়ে যাবারই বোণী সম্ভাবনা। হাজার টাকার মুক্তি যদি নিতে পারেন, তবে বরাতে থাকলে অনেক টাকা পেতে পারেন।

হাজার টাকা! কোথায় পাবে সে? বছর খানেক বাদে হয় তো সে হাজার টাকা জমাতে পারে, কিন্তু তখন পাটের এ বাজার তো থাকবে না!

কিন্তু বজীমবাবু সঙ্গায়। তিনি হিসাব ক'রলেন বিকাশ দেড়শো টাকা মাইনে পায়, আরও মাইনে বাড়বে, একে হাজার টাকা ধার দিলে আদার হওয়া সম্ভব। হেসে বললেন, "আমি ধার দিচ্ছি হাজার টাকা।"

কাটকা বাজারে পাটের কথা বোঝা হয় কোটি কোটি টাকার। তার মত পাটের দরকার হয় না। রোজগারের কথামত পাট কেনা বেচার চুক্তি হয়, নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেশ কোথায় চুক্তি। অধিকাংশ মনেই এ চুক্তি অনুসারে পাট সত্যি সত্যি বিক্রী হয় না, নির্দিষ্ট দিন এসে তার ডেলিভারীও দিতে হয় না। যে দরে কোথায় চুক্তি হল, নির্দিষ্ট তারিখে যদি তার চেয়ে বেশী দর হয় তবে বিক্রয় ক্রেতাকে সেম difference অর্থাৎ বাড়তি দামের পরিমিত টাকা। যদি দর কম থাকে তখন ক্রেতা difference দিয়ে খালাস হয়। নির্দিষ্ট তারিখ থাকে তিন মাস বা ছ'মাস পাবে। কাজেই কাটকা বাজারে পাটের একটি আশেপাশে মালিক না হ'য়ে লোকে লক্ষ মণ পাট কেচে আর এক গাইট পাট কেনবার ইচ্ছা না ক'রলেও লক্ষ গাইট কিনতে পারে।

বিকাশ এই অর্থ নিয়ে কাটকার বাজারে খেলতে শুরু ক'রলেন। বিকাশ পাট জমে বেখেছে কি না সম্বন্ধ, কিন্তু তার জোকার তার হিসাবে বিস্তার পাট বোঝা কেনা করতে গেলে গেল—সত্যি কিনবে ব'লে নয়—difference নিয়ে লেন দেন করবে বলে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে তার ভাগ্যের যে পতিত সে পেরেছিল, সে ভাগ্য এ জুয়াখেলাও তার সঙ্গে ছোট খাট কাজ থেকে শুরু করে ক্রমে সাহস করে সে আট মণ হাজার গাইটের কথা বোঝা আরম্ভ করলে। আর দেখা মেল সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর তম্ তম্ করে বেড়ে যেতে লাগল আর সে ভাতে দুই সপ্তাহ অন্তর difference পেতে লাগল বিস্তার টাকা।

বাজারে সাধারণ একটু মন্দা পড়তেই সে সব পাট কেচে দিলে। তাতে লাভ লোকসান খতিয়ে তার থাকে ক'মালের মধ্যেই জমলো হ'কা মণ হাজার টাকা।

উল্লাসে বুক ফুলিয়ে সে ভাবলে, "এই শনিবার ব'রাব মেসোম'শারের কাছে দশ হাজার টাকার চেক নিয়ে।" আর গীতার সুখের উপর একবার সে ডেকটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। দেখাবে সে শুধু মাসে দুজনে দেড়শো টাকা মাইনের কেরানী নয়—হাজার হাজারের খবরও সে রাখে। সাধারণ একটা পাঁচল টাকার টপ সে দিতে পারে।

দেখে গীতার পরাভূত গর্জ মাটিতে মিশে যাবে এ কথা ভাবতে বিকাশের খুব আনন্দ বোধ হল।

ব্যাগ্রভাবে সে শুক্রবারের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

শুক্রবার সকাল এলো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো সর্বমেশে টেলিগ্রাম।

মেসোম'শারের এপোলেক্সী হ'য়েছে, অবিলম্বে যেতে হবে বড় ডাক্তার দিয়ে।

মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে বিকাশ তার চেক বই হাতে ক'রে খেরিয়ে পড়লো। ব্যাক থেকে টাকা নিয়ে বৈদিক হাজার টাকা কি নিয়ে কলকাতায় শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে সঙ্গে করে সে টাঙ্গি নিয়ে রওনা হ'ল রাতী।

[ক্রমশঃ

নব পরিচয়

শ্রীমুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল

ওংলা এ-গলে দিও না,
ওংলা সহিব কেমনে?
রজনী যে হ'ল উত্তল।
গকে বহির ফুলবনে।

ও কথা আমারে বল' না,
ও ব্যথা করিব কেমনে?
ফুল ফুল বহে তলিনী
এস বলি তুণ-আসনে।

বিজ্ঞ লও তব ফুলহার,
মুহুরে কেল দিহে মনোভার।
অনায়াসে সহর দিখি
জুগুবি মোর ছ'লনে।

মালা নয় ওং যে আলাদা,
কথা নয় কথা জেগে নয়।
আজ শুধু নব পরিচয়,
উদিল কি টাঁদ পপনে?

ভিন

বাঙলার প্রবাহিনী-প্রকৃতি

বাঙলার নদ-নদীর প্রবাহিনী-প্রকৃতিকে এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্তারী নানাক্রমে স্রষ্টা করে তুলেছে। সেইজন্তে বাঙলার স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধি দিবে মনে কল্পিত হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত প্রাচীন আনানিক ওষ্য থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে এই বাঙলা ছিল স্বাভাবিক ও হৃদয়ঙ্গম। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভাগে এক প্রাচীনকালে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের অভিমতে প্রকাশ—‘বাঙলা বিশারের চেয়ে সমৃদ্ধতর’, তিনি দুইবার বাঙলাদেশ পরিদর্শন এই ধারণা গঠন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও অপর এক বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলাগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলে গেছেন যে—‘অকলের’ আকার-বিস্তার অনুপাতে সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে হাওড়া-হুগলী-বর্ধমান উপাদানগুলি কৃষি-বিষয়ক মূল্যে সর্বোৎকৃষ্ট। উচ্চস্থান অধিকার করে; কিন্তু এই উচ্চ স্থান মধ্য হ'য়ে গেছে, ঐ অঞ্চল বর্তমানে স্বাভাবিক ও জমির অনুর্বরতা বিষয়ে নিকট হ'য়ে উঠেছে—এ খুব অতিরঞ্জিত কথা নয়। বাঙলার পূর্বভাগে তার নদীগুলি দ্বারা পৃষ্ঠ হ'য়ে ব'লে আজিও সমৃদ্ধিশালী ও স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক কালের পরিবর্তিত হুতাগার প্রকৃতিও যথেষ্ট পূর্ববঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারবে না, এর কারণ নির্ণয় করা খুব দুঃস্বপ্ন নয়, অবস্থাগতিক বাধা-বিশিষ্ট এসে প'ড়ে স্বাভাবিক স্বাভাবিক নদী হবার উপক্রম হয়েছে, জমির উর্বরতাও কিঞ্চিৎ বাধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। তবে এ আশঙ্কা অল্পদিনের, এই অকলের নদীর বাক্যতা স্বাভাবিক জীবনী-শক্তি ধীরে ধীরে ব'লেই বিধায় হয়। বাঙলার অজ্ঞাত অংশে জল-সঙ্গতির কোনো অভাব নাই, কিন্তু স্রষ্টা জল-বন্টনের ফলে স্বাভাবিক ও জমির উর্বরতার উত্তরোত্তর ক্ষয় হচ্ছে। কতকগুলি নদী দিয়ে প্রয়োজনোচিত জল প্রবাহিত হ'য়ে প্রায়ই ওরফে বস্তার অনবধাতির হুটি করছে, আর কোনো কোনো স্থলে স্বাভাবিক নাথায় প্রত্যন্ততার মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহ এতাবূহ হ্রাস পেয়েছে যে—অনেক ক্ষেত্রে পল্লী-অঞ্চলের জল-নির্গমের কাজও সেই সকল স্রষ্টা হারা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। এর মধ্যে অনেক নদীই প্রকৃতি-চালিত নিয়মে পূর্বাপর প্রবাহিত হ'তে পারলে যে যে অঞ্চল দিয়ে তাদের গতি—সেই সমস্ত স্থানে উপচে প'ড়ে গঙ্গা ও দামোদর প্রভৃতি নদীর তীরে পলি-দানে প্রাচুর্য্য ও স্বাভাবিক উজ্জীবিত রাখতে সমর্থ হতো। কিন্তু ভাগ্যবশে এই নদীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বহুবদ্ধ জলকূলে পরিত্যক্ত হয়েছে—বার ফলে মলকবৎ বৃদ্ধি পাকে। এই কারণে বাঙলার বহু জেলা—বিশেষতঃ পশ্চিম ও মধ্য ভাগের স্থান—অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও কমে যাচ্ছে, আর জমিও ক্রমশঃ চাষ-আবাদের অভাবে পণ্ডিত হ'তে চলেছে।

প্রাচীন সকল জল-সঙ্গতির এইরূপ ত্রুটিযুক্ত অসম্পূর্ণ সন্নিবেশ হেতু বর্তমান দুর্দশায় এসে পৌঁছতে হয়েছে। আমরা জানি—স্বাভাবিক প্রণালীতে ‘ব’-বীণ গঠন-কার্যে মানুষের মধ্যস্থতা এর জন্ত আংশিক দায়ী, আর দায়ী প্রাকৃতিক বিশদায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে—মানুষ বিয়ের হুটি করছে—নদীর অববাহিকা-অঞ্চল-বর্ধা (বৌদী ভাগ বাঙলার প্রান্তর বিভাগে) স্থবর্তী অঞ্চল ধ্বংস করে, আর জমির উপরের প্তর ক্ষয়-সাধন প্রভৃতি কাজে। এই কার্য-কারণে বস্তার সর্বোচ্চ সীমা চিহ্ন আরো বৃদ্ধি হয়, অনাবৃষ্টি-বহুর প্রবাহ হ্রাস পায়, আর প্রত্যেকক্ষেত্রে যে পরিমাণ পলি ধারণ করত অঞ্চল—তার চেয়েও বেশী পলি প্রস্রোত বাহিত হ'য়ে নদী-গর্ভকে ভরাট ক'রে দিয়ে। বাঙলার প্রান্তরীয়ার মধ্যে মানুষের মধ্যস্থতার প্রকৃতি বৃষ্টিপাত পড়ার বার—প্রধানতঃ পশ্চিম বাঙলার ও অংশতঃ মধ্য বাঙলার বস্তারোহী বাঁধগুলি লক্ষ্য করলে; এর ফলে এ অঞ্চলের বরপ্রাপ্ত ও জোড়ার-ভাটা-খেলা নদীগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাঁধ-সকল বস্তার জল-নির্গম-প্রবাহিত্বা বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রকৃতির দেওয়া সার থেকে জমিকে বঞ্চিত ক'রে তুলেছে, তদুপরি স্বাভাবিক জল-নির্গম জাল ও অক্ষমতা পঃ-প্রণালীগুলিকে ধ্বংস ক'রে আজকের এই শোচনীয় অবস্থায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি সনাতনোত্তর নদীগুলি অনেকাংশে প্রাকৃতিক কারণে বাহিত হয়েছে। এই সকল নদীর গতি-পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক জল-নির্গম পথ ও পঃ-প্রণালীর অযোগ্যতা লক্ষ্য করা গেছে, এই কারণবশতঃ মধ্য ও উত্তর বঙ্গ আর ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু অংশের স্বাভাবিক সম্পদ ও মাটির উৎপাদন-শক্তি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

এই সমস্তার সমাধান রয়েছে—বাঙলার প্রচুর জল-সঙ্গতির প্রাচুর্য্য ও পক্ষপাতশূন্য সন্নিবেশ করার পরে। বাঙলার পল্লী সংস্কার ও উন্নতির ওজ্ঞ এই কাব্যরীতি গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বাঙলার নদীগুলির প্রবাহ-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হ'য়ে উঠতে পারে।—প্রথম শ্রেণীর সনাতনোত্তর নদীর মধ্যে গঙ্গা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এখানে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র আমাদের আলোচ্য বিষয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিস্তানদীর গতি-পরিবর্তনের জন্ত উত্তর বঙ্গের দুর্দশার হুতাগার,—উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগে বর্ধমান যমুনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোতোধারার গতি-পরিবর্তন। আংশিক ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলাকে দুর্গতি স্পর্শ করেছে,—আর বোড়াল শতাব্দীতে গঙ্গার স্রোতোধার পল্লী দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে মধ্যবাঙলার অবস্থান্তর ঘটিয়েছে।

তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের গতি-পরিবর্তন সম্বন্ধে কোনো তর্ক উঠতে পারে না, কারণ এ ঘটনা বৌদ্ধিমান আগে ঘটে নাই।

তিস্তানদীর গতি-পরিবর্তনের ফলে উত্তরবঙ্গের বিকল্প অবস্থান্তর ঘটেছে—সেইটাই এখন বক্তব্য বিষয়।

তিস্তা ও তিস্তা সম্ভবতঃ ত্রিস্রোতারই অপংশ। এই নদী পূর্বভবা, আত্রোয়ী, কংতোয়া প্রভৃতি শাখা সমন্বিত হ'য়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই সমস্ত শাখা-নদী নিরনদিকে উত্তরবঙ্গের পশ্চিম-সীমা-বাহিনী মহানন্দা নদীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে, তখন হরসাগর নাম নিয়ে বর্তমান গোয়ালন্দর নিকটবর্তী জায়গায় গঙ্গার স্রোতোধারা নিশেষ ক'রে দিয়েছে। হরসাগর নদের আজিও অস্তিত্ব আছে—এই নদ গঙ্গার একটি প্রবাহিকা-স্রষ্টা, বোড়াল নদ, আত্রোয়ী, যমুনা বা যমুনেশ্বরী (যমুনেশ্বরী—যে নদীপথে এখন ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত—সেই প্রধান যমুনা নয়), আর কংতোয়ার সম্মিলিত জলধারা,—কিন্তু গঙ্গার মিলিত না হ'য়ে এই মধ্য প্রধান যমুনার এসে নিশেষে—গোয়ালন্দে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম থেকে কয়েক মাইল উর্দ্ধে। বর্তমানে পূর্বভবা মহানন্দার উপনদী। মহানন্দা আর হরসাগর নদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত না হ'য়ে স্বাধীনভাবে গোদাবরির কাছে গঙ্গার এসে মিলিত হয়েছে।

এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে—তিস্তা তার করেকটা শাখা নদী ও মহানন্দার সহায় উত্তরবঙ্গ গঠন ক'রে তুলেছে! উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূতাপ থেকে প্রতীত হয় যে—প্রাচীন যুগে আরো করেকটা নদী এই গঠন-কায়ে সহায় হয়েছিল। এই সম্পর্কে এক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের অভিমত—যে বেশী নদী এখন ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত, পূর্বে উত্তরবঙ্গ প্রবাহিত হ'য়ে উক্ত নদীগুলির নিম্নবীক এসে মিশতো, অতএব বেশী উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চল গঠনে সহায় ছিল—বলা যেতে পারে। ব্রহ্মপুত্র নদ-ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত ময়মনসিংহ দিয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হবার আগে উত্তরবঙ্গ গঠনে সহায়ক ছিল। অবশ্য এ-টি বিশেষজ্ঞের অনুমান মাত্র—এ সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগের অবকাশ আছে।

বোড়াল শতাব্দীর প্রথম ভাগে গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী হবার পূর্ব পর্যন্ত পল্লী নদীও খুব সম্ভব উত্তর বঙ্গের দক্ষিণাংশ দিকগে সাহায্য এনে দিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিস্তানদীতে জীবন-বান ডাকে, সেই থেকে পূর্বদিকে একটি পুরাতন পরিভ্রমণ লব্ধ দিয়ে এই নদীর গতি পরিবর্তিত হয়, আর তাঁর মিলন হয় বাহাউগাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। এই পরিবর্তন হঠাৎ ঘটছে বলেই মনে হয়। বাংলার বিবরণ-সংগ্রহে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় এই : “১১১৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের যে ভগ্নাবধি বস্ত্রাং পুরের ইতিহাসে স্মরণীয় হ’য়ে রয়েছে—সেই বস্ত্রার সময়ে তিস্তানদী তাঁর প্রবাহ-পথ সহসা পরিভ্রমণ করে প্রবল প্রোতোধারা একটি পূর্বতন ক্ষুদ্র নদীস্রোত দিয়ে চালিত করে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছুটে চলে ব্রহ্মপুত্রে এসে পড়ে। সমস্ত মাঠ ও দেশের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে বস্ত্রাশ্রোত দিকে দিকে বেগে প্রবাহিত হয়।”

গতি-পরিবর্তনের আগে তিস্তা ও মহানন্দার বর্তমান উপনদী পূর্ণত্বা আয়েরী ও করগোয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র জলভার উজাড় করে দিত, এই জলধারা গিয়ে পড়তো গঙ্গানদীতে। সেনিন উত্তরবঙ্গ বঙ্গলংখা প্রবাহিকা ও পরঃপ্রণালী দ্বারা আকর্ষণ ছিল, তাই এই স্রোতগুলির কাঁধাকারিতার মূলে সমগ্র অঞ্চল ছিল বাস্তবপূর্ণ ও সজ্জিত-সম্পন্ন। তিস্তার গতি পরিবর্তিত হবার পর থেকে হিমালয়ে গৃহীত কলস্রাস্থ পলি-বাহা মধ্য জলধারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হয়ে গেছে। সেই জন্ত এই স্রোতগুলি ক্রমশঃ মজে যেতে বসেছে, আর এসময় জল-নিকাশের কারণে এ-গুলি প্রোতোহীন হ’য়ে পড়েছে, ...দেশের ও খাড়া ও উর্বরতা অসিগতিতে নষ্ট হ’য়ে যাচ্ছে। জল নিকাশের স্বচ্ছন্দ

পতি মল হবার আর একটি কারণ উর্দ্ধদিকে উচ্চভূমিই জল-চাপের অভাব, কল হাঁড়িতে এই যে—গঙ্গা-বহুবার বস্ত্রাশ্রোত পিছন দিকে চলে এসে উত্তরবঙ্গের জল-নির্গম-পথগুলিকে পলিপথে রুদ্ধ করে দিতে।

এই সমস্ত বিবরণ লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ড-নিকাশ-কর্ম উপরুক্ত জল-নির্গম স্রোতের অভাবে বস্ত্রার আত্মজীবন হরতে, উপরুক্ত গঙ্গা-বহুবার বস্ত্রা-শ্রোত উচ্চ ও প্রবল হ’য়ে উঠলে—এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের আর সীমা থাকে না। বস্ত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর্জবের কোনো রকম সাহায্য দেওয়া কঠিন হ’য়ে ওঠে। বস্ত্রার সমস্ত পূর্বাধারা যদি কিরিয়ে আনতে পারা যায়—তাঁ হ’লে এই সমস্তার সমাধান হ’তে পারে,—এই অর্থ...নদীগুলির পুনঃসংযোজন ও সেগুলির মধ্য দিয়ে তিস্তার প্রোতের কিরদংশ পরিচালিত করা। এই তিস্তানদীর প্রোতঃপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিলে কোনো উপকারেই আসছে না—বরং বহুবার উত্তরপাখে বস্ত্রার বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হ’য়ে উঠেছে। তিস্তার গতি-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারুল পলি সমৃদ্ধ বস্ত্রার সহায় উত্তরবঙ্গের উর্বরতা ও শত-উৎপাদন-শক্তি কিরিয়ে আনা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে জল-নির্গমপ্রণালীগুলিকে কাঁচকরী করে তোলা সম্ভব হ’বে, সুগতি প্রবাহিকার সাহায্যে অমিতে পলি গচ্ছিত রেখে জল হবে নির্গত। উত্তরবঙ্গের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্ত আরো কারণ নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। কিন্তু পরঃপ্রণালীর উৎকর্ষ আনতে পারলেই সাধারণ ব্যায়ের উন্নতি করা সম্ভব হ’য়ে উঠবে।

তোমারই (উপভাস)

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

হুলেখার বিয়ের পর একটি বছর কেটে গেছে। কত লোকে কত কথা বললো, হুলেখার বিয়ের কথা নিয়ে কত আলোচনা চললো, লোকের মুখে মুখে কথাটা ঘুরতে ঘুরতে সত্যীর কানে আঙুল জড়িয়ে দিল। হুলেখা যত শুনল সেই সব কথা ততই মনটাকে শক্ত করে দিল। ওদের সমাজের সমস্ত আইনের ওপর ও কালির আঁচড় বুলিয়েছে, লোক-লৌকিকতার সমস্ত বীধন বুলিয়েছে ওদের কথার মালা গলায় ক’রে—সেই কথাকে ভর পেলে এখন চলবে না, মনকে তাই ও নতুন ছোঁবে ঠেলে দিল। সত্যী, কিন্তু চিরকালই অতীত কালের সংস্কারের অইংকার করে। ওর মন যতই হুলেখাকে শক্ত করে তুলে ধরতে চেষ্টা করে সহজ ভালবাসার তাগিদে, ততই বাইরের প্রচণ্ড সমালোচনার স্পর্শে ভেঙে ভেঙে পড়ে। পাড়ার পাঁচজন চড়া গলায় নিশ্চয় করছে বলে নয়, ওর মন থেকে থেকে এরই মধ্যে অন্তত একটা কালো ছায়া দেখে ভর পেয়ে শিউরে উঠছে।

হুলেখাকে সত্যী বারবার ভাবে জিজ্ঞাসা করবে, ও সুখী কি না, কিন্তু পারে না। একটা ভর ওর গলা টিপে ধরে। হুলেখা মাঝে মাঝে তাই যখন এ বাড়ীতে আসে, সত্যী তখন হতবাক হ’য়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। হুলেখা যদি জিজ্ঞেস করে কোনো কথা, চমকে উঠে ভাঙা ভাঙা উত্তর দেয়, এ কথাই সে কথার হুলেখার স্বামীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়।

হুলেখার স্বামীকে দেখতে ভাল। যারা হুলেখাকে ভালবাসে, যারা হুলেখার সমাজের পিঠে চাবুক মারাকে সমর্থন করে, তারা বলে হুলেখার পছন্দ আছে। সত্যীও কখনও জানতে দেয় যে হুলেখার স্বামীকে ও দেখতে পারে না। তাকে দেখলেই সত্যীর মনে পড়ে এরই সঙ্গে ভাগা জড়িয়ে নিয়ে হুলেখার ভাগাটা আজ নির্দেশহীন ছুটে চলেছে, আজ হুলেখার জীবনে এরই কালো ছায়া পড়েছে।

আজ হুলেখার প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী।

সকাল থেকেই সত্যীর মনটা খুব খারাপ। ঘুম থেকে উঠেই জানালার বাইরে প্রথম চোখে পড়ল ল্যাম্প-পোস্টের তারের ওপর ঝুলছে একটা সরা

কাক। তাকে ঘিরে জটিল কাক গোলমাল করছে। বাড়ানীর ঘের, অন্ধ কুসংস্কার ঘিরে আছে অন্ধের দৃষ্টিতে চিরন্তনী অন্ধকারের মতন। অচল মনটার ওপর নিষ্ঠুর কবাবাত করলে সকালের ঐ দুখ।

অস্পষ্টে মনটা বলে উঠল, “ভগবান”.....

বিছানা ছাড়বার আগে ভেট্টে ঘেরে বেলায় গারে চাঁদকটা টিক করতে গিয়ে বেলায় গারে হাত পড়ল। পাটা গরম। স্বপ্ন হয়েছে। মার স্পর্শ পেয়েই ‘মাগো’ বলে বেলা পাশ ফিরে স্তলো। মনটা সত্যীর আগে ঝালাপ হ’য়ে উঠল।

আজ বসাতে না জানি কি আছে!

দরজার বাইরে পা দিতেই সত্যীর চোখে পড়ল বাড়ীর পোষা পেশোরাগী বেড়ালটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছে বারান্দার কোণে। থমকে দাঁড়াল সত্যী। আড়ষ্ট মনটা অচল হ’য়ে উঠল। অস্পষ্ট ডাকল নাম ধরে। বেড়ালটা নিশ্চয় পাখরের মতন। সময়ে এসিয়ে গিয়ে সত্যী দেখল বেড়ালটা মরে গেছে।

মনটা ওর ভেতর টুকরো টুকরো হ’য়ে গেল। এমন দিনে হুলেখার বিবাহ-বার্ষিকী! কি যে সব ভগবানই জানেন?

কোন রকমে সত্যী মনটাকে শক্ত করে বেঁধে দিল। বাড়ীতে ওই ককা। ওর ওপর ভর ক’রে সমস্ত সংসারটা চলে। ওর ভেঙে পড়লে চলবে না।

কাজের ভীড়ের মধ্যে সত্যী নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইলে, কিন্তু পারলে না। থেকে থেকে ও যে জানালার কাঁধের চেয়ে চূপ করে কি ভাবছে, দৃষ্টি যে ওর গতিহীন, অনির্দিষ্ট, তা মার মজরে পড়েছে। তিনি যে জিজ্ঞাসা করবেন সে সাহসও নেই। তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করে বসুনি ছাড়া কিছুই মিলিল না। সত্যী থমক দিয়ে উঠল, বললে “কিছু না।” তারপর আরও দু’তিনটে প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষকালে না পেরে বলে উঠল, ‘সমস্ত দিনটা বন্ধ বন্ধ করবে, না আমার কাজ করতে দেবে।’

আমি কোন রাত, কোন দুটিটার রাত ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অমনভাবে নির্গোষিত করত ?

স্বপ্নের নির্জনতার চূপচাপ করে শুয়ে সতী ভাই ভাবছিল। ভাবনার ওর শেষ নেই। কেন এল না হলেখার বাবা? এই একটি প্রশ্নকে ঘিরে কত সঙ্গ উদ্ভব, কিন্তু কোনটিই ওর মনে ধরে না। বতবারই ও বতরকম উত্তর ঠিক করে, কোথাও না কোথাও একটা কাটা থেকে যায়। যন কিছুতেই মানতে চাইছে না যে ওর শরীরটা ধরাগ। আজ সকাল থেকে ওর মন থেকে থেকে থেকে বেকে বসেছে। কালো আকাশের গারে বিজ্ঞানের কথারোহর বহন ওর অন্ধকার মনের ওপর অকলাপের আশঙ্কা থেকে থেকে রেখা এঁকেছে।

সতী হঠাৎ চমকে উঠল।

কোন শব্দে পৃথিবীর ধান ভাঙল ?

কে যেন কীলকে? কোন শব্দ নেই, কোন ইজিত নেই, কিন্তু আত্মা আছে স্পষ্ট। এ যেন সেই অশুভুতি, যা দুমত মাহুকের মনে জাগে, বহন কারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তার ওপর।

স্বপ্নের অবশেষে এক বিবাত্তর সত্যের মনে বি'খল' মতুন করে।

হলেখা? সতীর মনটা ভেঙে খান খান হ'য়ে গেল।

সতীর দৃষ্টি গিরে পড়ল হলেখার ওপর।

কোন শব্দ নেই... নিমন্তক।

সতী আস্তে আস্তে উঠে গিরে ঝাঁড়াল' হলেখার বিছানার ধারে। হলেখা ওপাশ কিরে শুয়েছিল, দ্বিধার ঠাঁত হাতখানা কপালের ওপর পড়েছে ও যেন হেঙে পড়ল। বড় বড় কালো চোখের কোণ দিয়ে গড়ির পড়ল একটি একটি অশ্রুধিন্দু। একটি, দুটি... আরো একটি... তারপর আরো অনেক।

কীলার আজ কোন মানা নেই।

বাইরের পৃথিবী আরও গভীর নিমন্তকায় আচ্ছন্ন। তারাতুলার মধ্যে মনস্তরীরবতা, অন্ধকার আরও তীক্ষ্ণ। আলোগুলো যুগোদ প'রে রাতা-গুলোকে পরিহাস করছে। রাতার ধারে ধারে গাছগুলো এক একটা কালো ভূতের মতন। সবাই আজ ওরা ভয়ের চিক আঁকা স্পষ্ট অকলাপ। ওপাশের বড় চুনবালা খনা পুরাণো বাড়ীটাও ঠিক তাই। অন্ধকারের মধ্যে আঁকাছা দেখাচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ভগ্নস্থপ।

সতী বিছানার ওপর বসে পড়ল। হলেখা ওর কোলের মধ্যে মুখটা তুলে দিল। কান্নাটা সেইখানেই ও লুকাবে—যখন করে পারে।

এসের ছ'জনের কোন ভাবা নেই। ভাসা ভাসা চাঁদনি, সতীর আগ্রহে মহাহুত। কি বলবে সতী? কীভাবে? সমস্ত পৃথিবীটাই ও কাঁদছে।

হলেখা কীলকে, সতী কান্না চেপে কান্না দেখছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল।

হলেখা অনেকক্ষণ কীদল, অনেক চেষ্টা করেও কোন মতে নিজেকে নামগাতে পারল না।

সতী বললে, "যুনা লেখা।"

হলেখা অস্পষ্ট বললে, "তুমি যুনাতে বাও দ্বিধা..."

"তুই যু না দেখি।" ...সতী বললে "কীলকে কি হবে, নিজেকে জীবনের সাজে ভেট করা হাড়া ত' কিছুই নয়।"

হলেখা কিছু বললে না, কেবল কপিরে কপিরে কীদতে লাগল। "কি হেঙে লেখা, আমাকে বল, সব তোমার কিছু হালকা হবে।" কি করে গোষাবে, কি বলবে? হলেখা ভাবতে থাকে। দ্বিধিক বললে মন তবু ওর হালকা হবে, কিন্তু কি করে বোঝাবে?

যে কথা জড়িয়ে আছে ওর অনাগত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে, যে দক্ষ রেখার অলপনার ওর হৃদয় বাকি জীবনের সাক্ষ্য, কেমন করে আজ সে কথা ও দ্বিধিক বলবে? কোন মুখে বলবে ও? সর্বসহা, সর্বসহা গোদিক ওর ভাঙ্গের পরিহাসের কথা। ওর জীবনের যে কীকটী সঙ্গীত

হ'রে ওর মন আপ, ওর সমস্ত অভিব্যক্তি, ওর দারী জীবনের চরম সার্বক-তাকে গ্রাস করছে, সে কথা কেমন করে দ্বিধিক বলবে? কেমন করে বোঝাবে জীবনে ওর কি সেই, কিসের ওর অভাব। ওর হৃদয় দ্বাধী, ওর অর্ধের বজলতার হাসিমাখা সংসার, কিন্তু কিসের শূণ্যতা সব অর্ধীন এলাপ করে দিয়েছে।

নিমন্তক, নিমন্ত পৃথিবী, সারি যেন পুরোপুরি জননীর মতন। বাইরের অনন্ত দীর্ঘতায় মধ্যে মনঃসংবেদন হ'য়ে আজ সেটা এক হ'য়ে মিশে গেছে ওদের মনের সঙ্গে। দুটোর মধ্যে একা, দুটোর মধ্যে মিল, দুটোর মধ্যে কান্না-কানি, জানাণাণি। মনের মধ্যে ওদের ঝড়, প্রকাশ করবার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কেমন করে, কেন, কি হবে?

সতী সমসেহে আবার বললে, "বলি না তো?"

হলেখা বলবে। না বললে ওর চলবে না। জন্মাবার পথ থেকে দ্বিধা ছিল ওর হারা, আজ পর্যন্ত তার চেয়ে আপন আর কেউ হয়নি। ওকে বলবে, ওকে জানাবে নিজের ভাগ্যের কথা, জানাবে নিরতির ব্যঙ্গ কেমন করে অন্ধ হ'য়ে মিশে গেছে ওর জীবনের সঙ্গে। জানাবে জীবনের সব চেয়ে পূর্ণতার মধ্যে কতখানি শূন্যতা গোপন থাকতে পারে। দ্বিধিক আজও সব কথা বলবে, মনটাকে হালকা করবে, জীবনটাকে শক্ত করবে, বৈধটাকে প্রথর করে দেবে। নিরতির পরিহাসকে ও পরিহাস করবে, সমস্ত করার আঙনে নিজেকে পুড়িয়ে, দ্বিধির স্নেহের আড়ালে, মহাহুততে, নিজের শূণ্যতার অশ্রুতাকে জুরিয়ে দিয়ে।

আজ ও বলবে বলবে বলবে। সবাইকে বলবে। সবাইকে জানাবে নিজের গোপন কথা। যে কথা আজ আর একবছর ও মনের মধ্যে চেপে নিয়ে কৈব বৈধিয়েছে গোপনে, সবার সামনে হুখ আর শান্তির মুখোশ প'রে।

যেমন যেমন হলেখা বলতে থাকে, "বাইরের দৃষ্টিতে আজকের দিনের প্রাচুর্য অপরিসীম, কিন্তু এর মধ্যে আছে গভীর শূন্যতা। সকলের দৃষ্টিতে আজকের দিনের মধ্যে যে রঙ মোনালী, আমার জীবনের কানার কানার আজ তার মূদ্র প্রতিবিশ্ব।"

দ্বিধি চূপ করে শোনে - তারায় তারায় হলেখার কথার প্রতিধ্বনি।

হলেখা একটু খেমে আবার বলতে আরম্ভ করে, "তার প্রতি আমার ভালবাসার প্রথম সংসারের উজ্জল আলোকে, কল্পনার আড়াল করা জীবনের কোতুলকী রূপে। ছোট সংসার, ছোট তার পরিদর। তার বাঘে আঁধারের বৈ'সার্থ্যনি। সংসারের প্রতি কোণে কোণে তীর ভ্রমাল রূপের বিকাশ, তার ব্যাহত, দ্বাধী চিরচিরন্ত শূণ্যহীনতারক প্রসার দিয়ে তাকে সংসারের আঁকুনে দিয়ে শূণ্যবাক্য করে রাখা। কল্পনা করতান"—হলেখা তারার দিকে অসহায়ের মতন চেয়ে বলে চলে, "ওকে নিয়ে গড়া আমার এই ছোট সংসারের মধ্যে হান করে নেরে ছোট শিশু। একদিন আমার মধ্যে ভালবাসার সংযোগকে সে হৃদয় ও সার্থক করে তুলবে তার সরল হাসি দিয়ে, তার আবির্ভাবে অল্প পরিদর সংসার হবে অপরিসীম। ছোট বেলার পুতুল খেলার যে দারী-জীবনের সহজ প্রকাশ আমার মনে ছিল, তারই পরিপূর্ণ রূপ আমার কল্পনাকে রঙিয়েছিল। একদিন আমার এই আশা পূর্ণ হবে, এই ছিল মনের কোণে সন্ধ্যা-প্রদোষের মতন সময়ে আলিয়ে রাখা আশা। এই আশার ওই ছিল আমার ক্ষেত্র... তারপর? তারপর কি বলবে?..."

সতী দীর্ঘবে সবই শুনেছে। কি শুনেছে? ও ত সবই জানে। আপন তার জগত দারী। একমদ ও বোধনের শত হুরতী নির ও নিজের ত' সংসারের কোণে কোণে নিজেকে বসিয়েছিল। ওর মধ্যেকার চিরদিনের যে দারী, সংসারের যে অনিবার্য দেবী, সেও ত একদিন রূপ নিঃস্রব্ধ সংসারের শত দৌলধীর ম'খ। আজকে বিবের চোখে হৈ'স্রব্ধ কথা বিশ্বাসের অন্ধরালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার আশ ত হারিয়ে যায় নি। তবে

আজ কোন রাজ, কোন দুর্ভটনার রাজ ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অমনভাবে নিশ্চেষ্ট করছে?

রাজার নির্জনতার চূর্ণচূর্ণ গুণে গুণে সতী তাই ভাবছিল। ভাবনার রস শেষ নেই। কেন এল না স্নেহের বায়ী? এই একটি প্রশ্নকে ঘিরে কত সংসার উত্তর, কিন্তু কোনটিই ওর মনে ধরে না। যতবারই ও যতরকম উত্তর ঠিক করে, কোথাও না কোথাও একটি কাঁটা থেকে যায়। যন কিছুতেই মানতে চাইছে না যে ওর শরীরটা ঝাড়া। আজ সকাল থেকে ওর মন থেকে থেকে বেঁকে বসেছে। কালো আকাশের গায়ে বিজ্ঞানের কবাবোজের মতন ওর অক্ষরটির মতন ওপর অক্ষরটির আশঙ্কা থেকে থেকে রেখা এঁকেছে।

সতী হঠাৎ চমকে উঠল।

কোন শব্দ পৃথিবীর ধ্যান ভাঙল?

কে যেন কীলছে? কোন শব্দ নেই, কোন ইচ্ছিত নেই, কিন্তু আত্মন আছে স্পষ্ট। এ যেন সেই অশ্রুভূতি, বা যুদ্ধ মাসুকের মনে জাগে, যখন কারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ হয় তার ওপর।

রাত্রির অবশেষে এক বিবাক্ত জীব সতীর মনে বিঁধল মতন করে।

হলেখা? সতীর মনটা ভেঙে থান থান হয়ে গেল।

সতীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হলেখার ওপর।

কোন শব্দ নেই... নিতক।

সতী আন্তে আন্তে উঠে গিয়ে ঝাঁড়াল হলেখার বিছানার ধারে। হলেখা ওপাশ কিয়ে শুয়েছিল, দিদির ঠাণ্ডা হাতখানা কপালের ওপর পড়তেই ও যেন তেড়ে পড়ল। বড় বড় কালো চোখের কোণ দিয়ে গড়ির পড়ল একটি একটি অশ্রুধারা। একটি, দুটি... আরো একটি... তারপর আরো অনেক।

কীটার আজ কোন মানা নেই।

বাইরের পৃথিবী আরও গভীর নিতকরার আচ্ছন্ন। তারাগুলোর মধ্যে মশপট নীরবতা, অক্ষর আরও তীব্র। আলোগুলো মুখোমুখি হয়ে রাস্তা-গুলোকে পরিহাস করছে। রাস্তার ধারে ধারে গাছগুলো এক একটা কালো ভূতের মতন। সবাই আজ ওরা ভয়ের চিহ্ন আঁকা স্পষ্ট অকল্যাণ। ওপাশের বড় চুনবাগী খসা পুরাণো বাড়িটাও ঠিক তাই। অক্ষরারের মধ্যে আবছায়া দেখাচ্ছে যেন একাধিক ভগ্নস্থপ।

সতী বিছানার ওপর বসে পড়ল। হলেখা ওর কোলের মধ্যে মুখটা তুলে দিল। কান্নাটা সেইখানেই ও লুকাবে—যখন করে পারে।

এদের দু'জনের কোন ভাবা নেই। ভাগা ভাগা চার্চিন, সতীর আগায়ে মহামুহূর্ত। কি বলবে সতী? কীভাবে? সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁকলে। হলেখা কীলছে, সতী কান্না চেপে কান্না দেখছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল। হলেখা অনেকক্ষণ কীদল, অনেক চেষ্টা করেও কোন মতে নিজেই নামগাতে পারল না।

সতী বললে, "ঘুমো লেখা।"

হলেখা অস্পষ্ট বললে, "তুমি ঘুমোতে বাও দিদি..."

"তুই ঘুমা দেখি..." সতী বললে "কীদল কি হবে, নিজেই জীবনের সাজে ভেটি করা হাড় ভাঙে কিছুই নয়।"

হলেখা কিছু বললে না, কবল ঈপ্সে ঈপ্সে কীদল লাগল। "কি হয়েছে লেখা, আমাকে বল, সব তোর কিছু হালকা হবে।" কি করে গোবাবে, কি বলবে? হলেখা ভারত থাকে। দিদি-ক বললে মন তবু ওর হাল্কা হবে, কিন্তু কি করে বোঝাবে?

যে কথা জড়িয়ে আছে ওর অনাগত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে; যে অশ্রু রেখার অলপনার ওর হৃদয় বাকি জীবনের সাক্ষ্য, কেমন করে আজ সে কথা ও বিদিকে বসবে? কোন মুখে বলবে ওর সর্বস্ব, সর্বস্বা? যেনটিকে ওর ভাষ্যের পরিহাসের কথা। ওর জীবনের যে কীকটী সর্বস্বা

হ'রে ওর মন আশ, ওর সমস্ত অভিজ্ঞকে, ওর দারী জীবনের চরম সার্থক-তাকে ঝাঁস করেছে, সে কথা কেমন করে দিলে কখন? কেমন করে বোঝাবে জীবনে ওর কি নেই, কিসের ওর অভাব। ওর হৃদয় বাসী, ওর অর্ধের বহুলতার হাসিমাখা সংসার, কিন্তু কিসের শূণ্যতা সব অর্ধীন প্রলাপ করে দিচ্ছে।

নিতক, নিয়ম পৃথিবী, রাত্রি যেন পুরোপুরি জননীর মতন। বাইরের অনন্ত নীরবতার মধ্যে মৃণমে যে হয় আজ সেটা এক হ'রে মিশে গেছে ভয়ের মনের সঙ্গে। দুটোর মধ্যে একা, দুটোর মধ্যে দিল, দুটোর মধ্যে কান্না-কান্নি, কান্না-কান্নি। মনের মধ্যে ওদের মড়, প্রকাশ করার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কেমন করে, কেন, কি হবে?

সতী স্নেহে আবার বললে, "বলি না তো?"

হলেখা বলবে। না বললে ওর চলবে না। জন্মবার পব থেকে দিদি ছিল ওর হারা, আজ পর্যন্ত তার চেয়ে আপন আর কেউ হয়নি। ওকে বলবে, ওকে জানাবে নিজের ভাষার কথা, জানাবে নিরন্তর ব্যঙ্গ কেমন করে অল হয়ে মিশে গেছে ওর জীবনের সঙ্গে। জানাবে জীবনের সব চেয়ে পূর্ণতার মধ্যে কতখানি শূণ্যতা গোপন থাকতে পারে। বিদিকে আজ ও সব কথা বলবে, মনটাকে হাল্কা করবে, জীবনটাকে শক্ত করবে, বৈধব্যটাকে প্রথর করে দেবে। নিরন্তর পরিহাসকে ও পরিহাস করবে, সন্ত করার আঙনে নিজেকে পুড়িয়ে, বিদির স্নেহের আড়ালে, মহামুহূর্ততে, নিজের শূণ্যতার অসহ্যতাকে জুরিয়ে দিয়ে।

আজ ও বলবে বলবে বলবে। সবাইকে বলবে। সবাইকে জানাবে নিজের গোপন কথা। যে কথা আজ আর একবছর ও মনের মধ্যে চেপে নিয়ে কীভাবে বেড়িয়েছে গোপনে, সবার সামনে হুখ আর শান্তির মুখোমুখি প'রে।

খেমে খেমে হলেখা বলতে থাকে, "বাইরের দৃষ্টিতে আমকের দিনের প্রাচুর্য অপরিসীম, কিন্তু এর মধ্যে আছে গভীর শূণ্যতা। সকলের দৃষ্টিতে আমকের দিনের মধ্যে যে রঙ সোনালী, আমার জীবনের কানার কানার আজ তার ধূসর প্রতিবিম্ব।"

দিদি চুপ করে শোনে - তারার তারার হলেখার কথার প্রতিধ্বনি।

হলেখা একটু খেমে আবার বলতে আরম্ভ করে, "তার প্রতি আমার ভালবাসার প্রথম সংসারের উজ্জ্বল আলোকে, কল্পনার আড়াল করা জীবনের কোঁতুলকী রূপে। ছোট সংসার, ছোট তার পরিসর। তার মাঝে আমাদের যে সাঁচোঁচ। সংসারের প্রতি কোণে কোণে গ্রীষ্ম জ্বল রূপের বিকাশ, ভায় বাতাস, খানী চিরাচরিত শৃংখলহীনতাকে প্রসার দিয়ে তাকে সংসারের আবেষ্টনী দিয়ে শৃংখলবদ্ধ করে রাখা। কল্পনা করতাম—হলেখা তারার দিকে অসহায়ের মতন চেয়ে বলে চলে, 'ওকে নিয়ে গড়া আমার এই ছোট সংসারের মধ্যে স্থান করে নেবে ছোট শিশু। একদিন আমাদের মধ্যে ভালবাসার সংযোগকে সে হৃদয় ও সার্থক করে তুলবে তার সরল হাসি দিয়ে, তার আবির্ভাবে অলপ পরিসর সংসার হবে অপরিসীম। ছোট বেলার পুতুল বেলার যে নারী-জীবনের সহজ প্রকাশ আমার মনে ছিল, তাইই পরিপূর্ণ রূপ আমার কল্পনাকে রাঙিয়েছিল। একদিন আমার এই আশা পূর্ণ হবে, এই ছিল মনের কোণে সন্ধ্যা-প্রদোষের মতন সবচেয়ে আলিয়ে রাখা আশা। এই আশার ওই ছিল আমার কেন্দ্র।...তারপর? তারপর কি বলবে?.....

সতী নীরবে সবই শুনেছে। কি শুনেছে? ও ত সবই জানে। আরে তার ভাবিত নারী। একদম ওর যৌবনের শত হুহুদী নিয়ে ও নিজেকে ত' সংসারের কোণে কোণে নিজেকে বসিয়েছিল। ওর মধোকার চিরদিনের যে নারী। সংসারের যে অবিভাজী দেবী, সেও ত একদিন রূপ নিয়েছিল সংসারের শত সৌন্দর্যের মধ্য। আরকে বিধের চোখে সে'মতনর কথা বিদ্যুতির অন্তরালে হাসিয়ে গেছে, কিন্তু তার আশ ত হারিয়ে যায় দি। তবে

আশা আকাঙ্ক্ষা যে নিরতির পদাঘাতে চূর্ণ হয়েছে, সেই নিরতিকে বঙ্গ করে আজিও তেমনি ভাবেই বেঁচে আছে—যেমন সহজ ভাবে সে মেরে গ উঠেছিল। কোথায় নারীর সব চাইতে শৃঙ্খলা, তা ত ওর সব চাইতে ভল করেই লামা আছে।

বেশা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে, অর তার কনোছে বোথ হয়। সতী লেখ র কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

মুন্সেখা বলে চলে, “আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আজও তেমনি ভাবেই উজ্জ্বল হ’য়ে আছে, কিন্তু থাকে কেন্দ্র করে সে আশা এবল হ’য়ে উঠেছে, সে তা চূর্ণ করে দিয়েছে। নিরতির এ নিষ্ঠুর পরিহাস। ওকে দিয়ে আমার আশা কোনদিনও পূর্ণ হবে না। দুর্ভাগ্য পক্ষ।” এষট্‌খো

আবার বলে, “আজকের দিনের মধ্যে তুমি চেরেছিলে বন্ধের ভাগরণ, আমি দেখেছি তার মৃত্যু। আজ আমার বিবাহ বাধিকী নয়, আমার আশিষের আজ প্রথম মৃত্যুবাধিকী।”

আর বলতে পারে না মুলেখা। কারার এবল বেগ পলাটা, ওর সবল ভাবে টিপে ধরেছে।

পৃথিবী থবকে দাঁড়িয়েছে। আজ সময়ের গতি রথ। পৃথিবীর শিয়ার শিয়ার নিরাশার কথাবারত। রাজির কালোমুগ আজ নির্মম, নিষ্ঠুর।

সতী কাঁদবে না। কারা দিয়ে বরণ করবে না ভাগের মতন বিভবনাকে। মজের বাধ দিয়ে বাধবে, কিন্তু কাঁদবে না কাঁদবে না কাঁদবে না, কিছুতেই

গা:

থরে হিমালি ছর শিরে,
চরণ খোয়ার সিন্ধু,
মলর করে চামর বাজন,
আলো দেয় রবি ইন্দু

জয় ভারত। জয় ভারত।
তুমি এক, তুমি আদি
ভারতবাসী এক ভাষাভা।
এক টররবাসী।

খুটান, শিখ, জৈন, পাসি,
মুসলমান, হিন্দু।
উজ্জ রেখো জয়-পতাকাটা
জয় ভারত। জয় ভারত।

প্রাণ নিতে কাছে প্রাণ দিতে নাচ
প্রতি শোণিতের বিন্দু;
জয় ভারত। জয় ভারত।
জয় ভারত। জয় ভারত।

ক্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচন.

পরলোকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

জন্ম
২রা আগষ্ট, ১৮৭২
মৃত্যু
১৬ই জুন, ১৯৪৮



ভারতের সাময়িক,
শিক্ষাব্রতী ও দেশবন্দী
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আর
ইহলগতে নাই।

শিল্পে, বিজ্ঞানে,
সাহিত্যে, মর্শনে, শিক্ষার,
স্বাস্থ্যে, ত্যাগে ও গুণি-
সং এ সে—জা জী র

জীবনের সর্বদিকে যিনি আজীবন সমগ্র বাঙালী ও ভারতবাসীকে উদ্ধক করিয়া নির্বাহী জীবনের অবসরে আপন প্রাণপাতের একান্ত নিভতে কটোটিয়াছেন, ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন জাতির ভাষা হইতে তাঁহাকে অকস্মাৎ ঘুরে সরাইয়া লইল। আজ হইতে ঠিক উনিশ বৎসর পূর্বে এই ১৬ই জুন তারিখেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরা হারাইয়াছিলাম।

আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার কলাপ কামনা করি।

বাংলায় দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের পূর্বভাস

১৯৪৪ সালেই বাংলার দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত হয় নাই। ক্রমাগত তাহার

ক্রিষ্টা ও মৃত্যুলালী চলিয়াছিল, তাহা মাঝখানে গভর্ণমেন্টের অপসার প্রথার কিছুকালের জন্য এসমিত থাকিলেও সম্প্রতি আবার বীরে বীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। কলিকাতার এখনও চাউলের মূল্য ১০, টাকার বীরে নামিল না। মধ্যবলের অধিক মূল্যেই ১২।১৩, টাকার করিয়া এখনও চাউল বিক্রয় হইতেছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চলে চাউলের ভাষণ অভাৱ দৃষ্ট হইতেছে। বাংলার লাট মি: কেরি আশাস দিরাছেন—বর্তমান ১৯৪৪ সাল দুর্ভিক্ষ হইতে (একরূপ) মুক্ত। কিন্তু বাংলার চতুর্দিকে এখনই যে অবস্থার হুপ্রপাত হইয়াছে, তাহাতে ভরনার লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। রাজপথ আবার বীরে বীরে ভিখারীর কান্নার ভরিয়া উঠিতেছে। গভর্ণমেন্ট এদিকে পূর্বাচ্ছেই সতর্ক হউন, ইহাই প্রার্থনা করি।

চীনের মুক্তিসংগ্রাম

বর্তমান বর্ষের ৭ই জুলাই হইতে চীন-জাপান যুদ্ধের অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপান চীনের বিরুদ্ধে অন্তর যুদ্ধ অবতারণা করিয়া এবং ক্রমাগত এই হুদীর্ঘ সাত বৎসর ব্যাপী জাপান তাহার যুদ্ধ-মত্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। এই হুদীর্ঘকাল ধরিয়া চীনবাসী কঠিন অধ্যবসায়, একান্ত তপস্বী ও ঐক্যবদ্ধ জাতীর শক্তির দ্বারা নিজেদের অশেষ-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার শক্তনৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। অধ্যবসায় ও তপস্বীর জয় অবশ্যস্বাভাবিক।

উড়ন্ত বোমা

মহাযুদ্ধের গর্ভপথে সম্প্রতি হিটলারের বহু প্রকাশিত গোপন অস্ত্র—উড়ন্ত বোমার স্রোতি স্রাসনের হুটি করিয়াছে। যথার্থের বিভিন্ন ঘোষণায় যখন আমরা যুদ্ধবুঁহ মিত্রশক্তির জয়ের পথে ক্রমশ: অগ্রসরের হুতলা লক্ষ্য করিতেছি, ইহারই মধ্যে উড়ন্ত বোমার আক্রমণিক আক্রমণে লক্ষ্য নয়, আবার বিধ্বস্ত হইয়া চলিয়াছে। শিশু-যুদ্ধের অপসরণ চলিতেছে। ইতর্য্য বিশেষজ্ঞদের মতামতানুযায়ী যুদ্ধ যে বীর সমাপ্তির পথে আগাইয়া বাইবে, তাহা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতেছে না। এখনও হুদীর্ঘকাল মিত্রশক্তিকে যুদ্ধ ও শক্তি খাটাইতে হইবে বলিয়া। জেনারেল আইসেনহাওয়ারও সম্প্রতি আশঙ্ক-শক্তিকে বিচার করিয়া বসন্ত্য করিয়াছেন।

বাহির হইল !

সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র
মজুমদার লিখিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ
ও বি-এ শ্রেণীর পাঠ্য। সহজ ইংরেজী ভাষায়
লেখা—বহুল চিত্র সমন্বিত। রয়েল অস্ট্রেভো

সাইজ, সুন্দর বাঁধাই—

মূল্য—৫ টাকা।

বাহির হইল !!

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নবতম গল্পসংগ্রহ

হৈমন্তী—৩

বিভূতিবাবুর নূতন উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী

বাংলা ও মিথিলার বিচিত্র পটভূমিকার লেখা

সুবৃহৎ উপন্যাস।

মূল্য—৪ টাকা।

-যে সব বই সবাই পড়তে ভালবাসেন—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অন্ত্যস্ত গল্প-সংগ্রহ চৈতালী (সচিত্র ১ম সংস্করণ)—৩, বর্ষাকাল (সচিত্র ২য় সংস্করণ)—৩, বরষাকী (সচিত্র ২য় সংস্করণ)—২।০, এর প্রত্যেকটি গল্প হান্ত-কৌতুক-রস-বাক্যপূর্ণ। তাঁর প্রথম এবং সফল উপন্যাস নীলজ্বরী (এক বছরে দুটি সংস্করণ নিঃশেষ, ৩য় সংস্করণ)—২।

শ্রীমতী আশালতা সিংহের উপন্যাস সমর্পণ—১।০, অন্তর্যামী—১।০। কাহিনীগুলি আধুনিক মনকে খুশী করবে।

জনপ্রিয় লেখক শ্রীতারাপদ রায়ের বিচিত্র কাহিনী ঘোণীনির মাঠ পড়ুন, মূল্য—১।০।

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর মধুর হৃদয়ের চিত্তহারী উপন্যাস শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সংস্করণ)—২।০, শৃঙ্খল (২য় সংস্করণ)—২।০, মনের গহনে (২য় সংস্করণ)—২।০, এবং তাঁর প্রথম নাটক জ্বালদার সাহেব—২।০, সর্বত্র অভিনয় উপযোগী।

শ্রীনরেন্দ্রগোপাল দাস, আই-সি-এস, লিখিত মনতত্ত্বমূলক উপন্যাস অমবশুভিতা—২।০, তারা একদিন ভালবেসেছিল—১।০।

শ্রীপরিমল গোস্বামীর—দুঃসম্ভবের বিচার (২য় সংস্করণ)—১।০, প্রাণখোলা হাসি, সহজে অভিনয় করা যায়। সুখ (সচিত্র)—২।০, চী বাজনাটিকা, ক্লগ কলেজে অভিনয় করা যায়। তাঁর সম্পাদিত মহামহত্ত্ব—৩, অবিশেষ সংগ্রহ করে রাখুন। চিত্রকের পটভূমিতে লেখা—১।০ জন লেখকের ১২টি গল্প।

আর একখানি ভাল বই পুজার আগেই পাওয়া যাবে : শ্রীসরোজকুমারের ক্ষুধা ৩।

কে না রেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ

১১২, ১

৩

আপনার

গৌরব

ও

আনন্দ

ভীম নাগের

সন্দেশ

অপরাজিত ও অপরাধের ।

ভীম চন্দ্র নাগ

৬-৮, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা—ফোন বি, বি, ১৪৬৫

৬৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর—ফোন সাউথ ১১৭৭

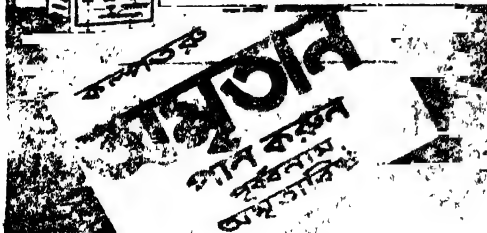
৪৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—ফোন বি, বি, ৩৭৮



প্রাণের আনন্দ
পূর্ণ স্বাস্থ্যেই
সম্ভব !



যদি আপনি
ম্যালেরিয়ার হাত
হইতে মুক্তি চান
ম্যালেরিয়ার
শ্রেষ্ঠ ঔষধ



কলস্রতরু
আয়ুর্বেদ ডবন
কলস্রতরু প্রাসাদ
১২৩, শিওরগ্রন এডেনটি
কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মী সোণ ওয়ার্কস্



হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাথা—দু'রকমের সাবানের জন্মই

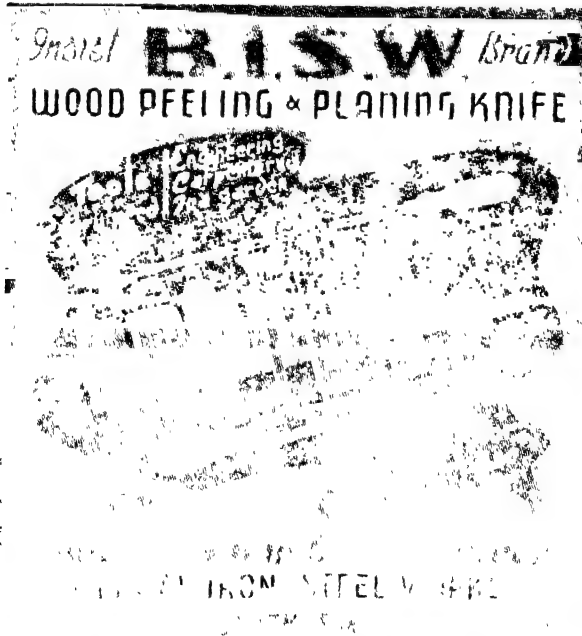
“বঙ্গলক্ষ্মী” প্রস্তুত।

RELIABLE TOOLS FOR TO-DAY & TO-MORROW. B. I. S. W.

HEAD OFFICE
CALCUTTA WORKS
CUTTACKA
(Burdwan)

CUTTACKA WORKS
21, RAJA DINENDRA
STREET,
CALCUTTA.

ESTABLISHED
Oriented 3 Letters
Bentley Com
Phras & A. B. Co
Sh Eds & Private.



Telegram -
'LOHARBAPAR' (Cal)

Telephones :
Office—Cal. 4716.

Cal. Works—B.B.1506

BRANCH WORKS :
PURULIA, GOMOH

CITY SALES OFFICE
8, Canning Street,
CALCUTTA.

B. I. S. W. the BRAND that BEARS MANUFACTURERS GUARANTEE.





**BLOCKS
DESIGNS
PRINTING
SLIDES
TAGS**



বর্তমান কালে যুদ্ধ
জয় ও ব্যবসায়
উন্নতির এক মাত্র
উপায় সুন্দর ব্লক
ও নিখুঁত প্রিন্টিং

আমরা অভিজ্ঞ কারিকর
দ্বারা লাইন, হাফটোন,
কালার, ফ্রিও, ইলেকট্রো,
সেলাইড, ডিজাইন এবং
কালার প্রিন্টিং করিয়া
থাকি।... ..

DAS GOOPTA & CO

PROCESS ENGRAVERS. COLOUR PRINTERS

42-HURDOOKI BAGAN LANE, CALCUTTA



Gram—"SUCOO"

Phone—CAL. '5733.

Balsukh Glass Works

Manufacturers of

Quality Glass Ware

Spirit Bottles

A SPECIALITY.

S. R. DAS & CO.,

Managing Agents.

Factory :

4B, Howrah Road,

HOWRAH

Office :

7, Swallow Lane,

Calcutta.

FIRE

MARINE

THE **Concord** OF **India**

INSURANCE COMPANY LIMITED.

(Incorporated in India.)

Accident

Fidelity

8, CLIVE ROW, CALCUTTA.

ন্যাস্, এণ্ড কোং

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক

ও

বাইওকেমিক ঔষধালয়

১১২এ, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, শ্রামবাজার,

কলিকাতা

বিশুদ্ধ আমেরিকান তরল ঔষধ

ড্রাম—১/০, ১/১০

সন্তান কাঠের বাস, চামড়ার বাগ, শিশি, বর্ক, তাম্বা,

মবিউলস্, চিকিৎসা-পুস্তক ও যাবতীয় জিনিষ সরঞ্জাম

বিক্রয়ার্থে সম্ভৃত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনী

Telegram:—HOLSELT

Estd. 1922.

সত্যিকারের ভাল কাপড়ে হলে

মোঃ জঃ কঃ রঃ মঃ

ব. কে. সাহা ও ব্রাদার্স লিঃ—প্রসিদ্ধ চা-বিক্রেতা

মকঃখলবাসী পাইকগাছার একমাত্র বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস—৫নং পোলক স্ট্রীট : কলিকাতা : ব্রাঞ্চ—২নং লাল বাজার স্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ২৫২৩ ফোন : কলিঃ ৪১১৩

বাংলা র গোঁর ব
বাংলা লীর নিজ স্ব

আর. বি. স্নোজ

নম্র

সুগন্ধযুক্ত পঙ্ক-সৌরভে

পঙ্ক নম্র

জগতে অতুলনীয়

মূল্য—ভিঃ পিঃ মাণ্ডলসমেত ২০ তোলা

১ টিন ৩৮/০, ২ টিন ৬০ মাত্র।

কালকাটা স্নাক ম্যানুফ্যাক্ কোং
১৩৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

বেডকে সুবাসিত
ক্যাটিন অসেনল

কেশ পরিচর্যায় অপরিহার্য

নিত্য ব্যবহারে ঘন কেশরাশি মস্তকের
শোভা বৃদ্ধি করে

চিত্রাভিনেত্রী

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা বলেন—

“সুস্বাদি মোঃ চমৎকার”

বেঙ্গল ড্রাগ ও কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
বাগবাজার—কলিকাতা

বাংলার বস্ত্র সমস্তার সফটে তাঁতের ও মিলের কাপড়ের জুগু

দি ক্যালকুলাটা ক্রেডেন্স, সোসাইটী
নিমিটেঙ্কে স্মরণে রাখিবেন

পরিচালক

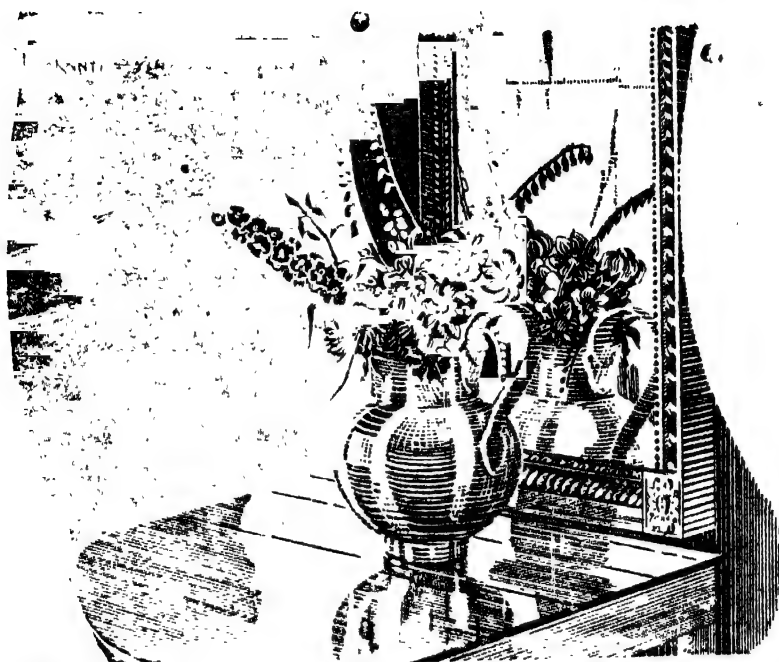
বঙ্গলক্ষী বস্ত্রাগারের কর্তৃপক্ষ

(বঙ্গলক্ষী বস্ত্রাগার আদায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে)

কলেজ স্কোরার
কলিকাতা

কোন

বি. বি. ৩৩১২



TO GET FAITHFUL REPRODUCTION

A nice picture, True-To-Original solely depends on better blocks and neat printing. So many persons take excellent care of their advertisement pictures, but neglect the block-making and printing. To get better result of your advertisement campaign, you should rely on our skilled men who are always ready to help you with their expert advice and will do justice to the original in reproducing it in its proper tone value, depth of etching, neat but bright and charming prints.

Make us responsible for all your process works and colour printings



TELEPHONE
B.B. 601

REPRODUCTION
PROCESS *Syndicate* COLOUR
ENGRAVERS PRINTERS
71 CORNWALLIS STREET · CALCUTTA

ছেলেমেয়েদের খেলাধূল চাই-ই...



শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ
ছেলেমেয়েদের খেলাধূল। চাই-ই। খোলা
মাঠে ব্যায়াম, বিস্তৃত ছাওয়া ও সূর্য্যের
আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য
সম্পদ। সেই সঙ্গে ভাল আচাৰ্য্যও চাই।
পুষ্টিকর খাঞ্জে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও
কর্ষষ্ট করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দৰ্য্যও
বাড়ায়।

চি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য

চি-ই

স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে

মেট্রোপলিটনের ক্রমোন্নতির পরিচয়-

নূতন কাজের পরিমাণ

১ম বৎসর ১৯৩১	প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা
৭ম বৎসর ১৯৩৮	৭৫ লক্ষ টাকার উপর
১৩শ বৎসর ১৯৪৩	১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার উপর

দানী প্রদানের পরিমাণ

১ম বৎসর পর্যন্ত	২ হাজার টাকা
৭ম " "	২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার উপর
১৩শ " "	১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার উপর

দি মেট্রোপলিটন
হাউস ও রুম কোং, লিমিটেড
কলিকাতা

—ব্রাঞ্চ এবং সাব-অফিসসমূহ—

হাওড়া, ঢাকা, চাঁদপুর, শিলং, পাটনা, লক্ষৌ,
দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ।
অর্গেনাইজিং কেন্দ্র—ভারতের সর্বত্র



দ্বাদশ বর্ষ

ভাদ্র-১৩৮১

১ম বঙ্গ-৩য় সংখ্যা

জীবনন নীচ ব ভাষা

দি মেট্রোপলিটান

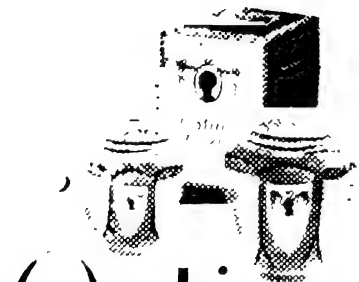
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা



নৃত্যকুশল! ছায়া
চিত্রশিল্পী স্রী মতী
সাধনা বস্তুর আনন্দ্য-
স্বন্দর অভিনয় ও
নৃত্য পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে তাঁহার
অঙ্গের নিখুঁৎ স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে ;
এবং আমাদের গর্ব
এই যে, প্রতি বাক্তে
নিয়মিত ওটান ক্রীম
ব্যবহারের ফলে ই
তাঁহার নিখুঁৎ স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ এখনও
অক্ষান অছে ।

OATINE CREAM is indispensable for
my toilet. I have been using it for a
long time, and find it delightful,
and extremely necessary to preserve
a perfect skin.

Sachina Bose



Oatine CREAM for nightly
massage
SNOW for daily
protection

ভারতবাসী প্রত্যেকেই ফ্যাসী বিরোধী।
স্বাধীন ভারত জাপানী আদর্শের ডিক্টেটর বরদাস্ত
করবে না। যে-দেশ সামরিক এবং বৃহৎ ব্যব-
সায়ের বৈত ডিক্টেটরী দ্বারা শাসিত সে-দেশ
থেকে স্বাধীনতা দানের আশ্বাস যেমন হাস্যকর
তেমনি ভূয়ো। জাপান থেকে আমাদের কোন
সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

জয়ের মারফতে স্বাধীনতা

AAA 1318

গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড

বিশুদ্ধ হরিচন্দনসার সহযোগে
উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত
নূতন ও অভিনব সাবান



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থু টিকেট
 শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা
 আসিবার থু টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের
 ১১নং ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা
 রিটার্ন টিকেটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ
 রসিদের পরিবর্তে পাণ্ডুতে টিকেট পাওয়া যায়।
 এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।



দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(আ সা ম) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শ্রী শ্রী যশস্বীনাথ চন্দ্রনাথ
এর নিরাপদ সংস্থানের সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎকেও নিরাপদ করুন

কলিকাতা হাউসিং ট্রাস্ট লিঃ

কলিকাতা, সেরতলী ও নিকটবর্তী স্থানীয় স্থানে জমিজায়গা বাসোপযোগী করিয়া
সুবিধাজনক সৰ্ভে বিলি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অংশীদারগণকে

১৯৪২-৪৩ সালে শতকরা দশ টাকা, ১৯৪৩-৪৪ সালে শতকরা দশ টাকা

লভ্যাংশ দিয়াছেন, ১৯৪৩-৪৪ সালেও অনুরূপ লভ্যাংশ দেওয়া হইবে।

৬ ৩ সরকার ১০% মূল্যের আরও ১৪,৫৫৮ বানি অংশ বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

(ভারত সরকার আইনের ৯৪-এ ধারা মতে শেয়ারসমূহ বিক্রয়ার্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিহাররূপে
জানা আবশ্যক যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার উহাদের কোন পরিকল্পনা আর্থিক সুবৃদ্ধি ভিত্তির অথবা উহাদের সম্পদে
কোন মন্তব্য করা হইলে বা কোন মতামত প্রকাশ করা হইলে তাহার আর্থিক বাখার্য সম্পর্কে কোন হারিশ্ব লইতেছেন না।

অংশ বিক্রয় করিবার জন্য কর্মঠ সজ্জান্ত এজেন্ট আবশ্যক

৭ পূরক বিবরণের জন্য পত্র লিখুন :-

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

কলিকাতা হাউসিং ট্রাস্ট লিঃ,

উইণ্ডসর হাউস,

পি-১৪, বেকিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

আপনার

গৌরব

ও

আনন্দ

ভীম নাগের

সন্দেশ

অপরাজিত ও অপরাজেয়।

ভীম চন্দ্র নাগ

৬-৮ ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কলিকাতা—ফোন বি, বি, ১৪৬৫

৬৮, অরুণোদয় মুখার্জী রোড, তবানীপুর—ফোন সাউথ ১১৭৭

৪৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—ফোন বি, বি, ৩৩৭৮

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মূলধন			
অধিকৃত	...	২৫,০০,০০০	লক্ষ টাকা
বিলকৃত	...	১২,৫০,০০০	লক্ষ টাকা
গ্রহীত	...	১২,৫০,০০০	লক্ষ টাকা
আদায়ীকৃত	...	৭,০০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক
কার্যকরী তহবিল	...	৮৫,০০,০০০	লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে বার্ষিক শতকরা

১০% টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা
হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড এম. মুখার্জী, এম-এস-সি (কাল),

এন্ড-আই-এস-এস-এস-এস, চার্টার্ড সেক্রেটারী।

THE CENTRAL GLASS INDUSTRIES LTD.

Manufacturers of
CHIMNEYS, BOTTLES, PHIALS, GLASSES, TUMBLERS,
JARS and various kinds of quality glass-ware.

The Company that gives you goods by latest machines.

CITY OFFICE :
7, SWALLOW LANE,
CALCUTTA.

WORKS :
P. O. BELGHURIA,
24, PARGANAS.

হাইকোর্ট শাখা
৭নং ওল্ড সোথ বর্ফিস স্ট্রীট
(কলিকাতা)

FIRE

MARINE

THE Concord OF India

INSURANCE COMPANY LIMITED.

(Incorporated in India)

২৮৪ বি.সেন, এটর্নি-এ্যাট ল মহোদয়ের
সহযোগিতায় শীঘ্রই খোলা হইবে।

বঙড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

১৫বি, ক্রাইভ রো, কলিকাতা

পাঠক ১৯২০-৩ টেলিগ্রাম "লেনদেন" কলি:

Accident

Fidelity

8, CLIVE ROW, CALCUTTA.

ইন্সিয়ার্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

৪, বাজা উডমন্ট স্ট্রীট, কলি:

১৮৮৩ ও পাইকারী ইন্সিয়ারগানের
একমাত্র নিচ-খোলা-১৩৩৩

আমরা না মাত্র খরচায়

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে

এবং

শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন

স্থানে সর্বদা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(বেঙ্গল) লিমি. ভদ্র

দি মেট্রোপলিটান ইলেকট্রিক হাউস—১১, ক্রাইভ রো, কলিকাতা।

Dutta & Co.

QUALITY SHOE MAKERS



STOCKISTS.
CAWNPORE
-AND-
GRA SHOES.

16/1, SHYAMACHARAN DEY STREET,
COLLEGE ST. COLLEGE ROW & SHYAMACHARAN DEY ST, JUNC.
CALCUTTA.

CHEAPEST,
BEST AND
DURABLE



প্রাণের আনন্দ
পূর্ণ স্বাস্থ্যেই
প্রসব!

যদি আপনি
মসলোয়ারিয়া, হাত
দইত সুতি চাম
মসলোয়ারিয়া,
শ্রেষ্ঠ মদৌষধ



অমৃতান
পান করুন
সুস্থতা
অমৃতান

কম্পাত
আয়ুর্বেদ ডবন
কম্পাত প্রসাদ
কম্পাত প্রসাদ

অলঙ্কার বিচিত্রা

MBS



অলঙ্কার নির্মাণে - চিত্রাঙ্কনের
মৌলিক, মনোরম কাজ এন
অঙ্গের বিস্তৃততাই আমাদের
বৈশিষ্ট্য। আমাদের লোকের
স্বিকৃত কারুশিল্পের প্রত্যেক একক
গঠিত অঙ্গের জাতি বিচিত্র
কাসিনেও অলঙ্কার ও সৌন্দর্য
বাসনাবি সর্বদা বিস্তারিত
থাকে এলা অঙ্গের বিশেষত্ব
সময়ে পছন্দ বস্তু নির্মিত দেয়ালী
অঙ্গের, যে তারা হয়। অলঙ্কারের
অঙ্গের জি পি জাল পাতাল
হয়। পুরাতন অঙ্গের পরিবর্তে
নতুন অলঙ্কার পাওয়া যায়।
কাজেই কলিকাতা অঙ্গের
এক প্রত্যেকই অলঙ্কার
কাজেই বাজি বাজে।



এম বি প্রসঙ্গা - ২৩

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাণ
১২৪ ১২৪-১ বহুবিজ্ঞান কীট, কলিকাতা

অতিকারের ভাল

চা

পাইতে হইলে

খোঁজ করুন—

ব. কে. সাহা ও ব্রাদার্স

—জিঃ—

প্রসিদ্ধ চা - বিক্রেতা

বঙ্গবাসী পাইকারগণের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

১০ অফিস—৫নং পোলক স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ২৪২০

২০ নং হাল বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪২১৬

মদনানন্দ ট্যাবলেট

আয়ুর্বেদগোষ্ঠ "ঐশ্বর্যমদনন্দ বৈদ্যক" আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে Vitamin ও Calcium লব্ধকোণে নির্দিষ্ট আকারে Tablet-আকারে প্রস্তুত। "মদনানন্দ ট্যাবলেট" দৈনন্দিক কর্মসম্পত্তা ও অনিদ্রার অব্যর্থ মহৌষধ। অলৌপ, অগ্নিদীপ্ত, গ্রহণী ও Dyspepsia দূর করিয়া ক্ষুধা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে ইহার প্রায় ঔষধ পৃথিবীতে আর নাই। নূতন রক্ত ও বীজ প্রস্তুত করিয়া পৌরুষবীর্য বৃদ্ধি প্রায় দেখে নবজীবন সঞ্চার করে। বিবৃত্ত বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন। দিল্লীতে পোস্টেজ ও প্যাকিং-এর জন্য ১/০ আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

মূল্য মোট শিলি (৩২ ট্যাবলেট) ১২, ডাকঘর ১০

মূল্য এক শিলি (৮০ ট্যাবলেট) ২২, ই ১০

BHARAT AYURVED LABORATORY

POST BOX 158 DELHI

—কলিকাতা প্রাণিহান—

দিল্লী আয়ুর্বেদ কার্পোরেশন

২২, আন্তোব সুখার্কী রোড ও ৮০, ভাববাজার স্ট্রিট
বেনারস একেন্ট—কল্যাণী ট্রোস—গোবোলিয়া।

বঙ্গলক্ষ্মী সোণ ওয়ার্কস

হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গারে-মাথা—হুঁরকয়ের সাবানের জুহুই

“বঙ্গলক্ষ্মী” প্রশস্ত।

দি
বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কমার্শিয়াল এণ্ড আর্টিষ্টিক প্রিন্টারস্,
ষ্টেশনার্স এণ্ড একাউন্টবুক মেকার্স

প্রোঃ এ. সি. মৈত্র এণ্ড সন্স,
কন্ট্রাক্টর এণ্ড কমিশন এজেন্টস্,

১২ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল ২১২৮

THE NEW INDIAN GLASS WORKS (Calcutta) LTD.

Factory :—2, Church Road, Dum Dum Cantonment
and

101/1, Ultadanga Main Road.

OFFICE :—7, Rawdon Street, Calcutta.

Manufacturers of all kinds of BOTTLES both narrow and
wide-mouth, stoppered and screw-caps

NEUTRAL GLASS A SPECIALITY

ADRENALINE and VACCINE FILLS and TUBES
are manufactured from absolutely neutral glass.

For Particulars Apply to the Head Office of the Company.

Grass - "SUCOO"

Phone - CAL 5733

Balsukh Glass Works

Manufacturers of

Quality Glass Ware

Spirit Bottles

A SPECIALITY.

S. R. DAS & CO.,

Managing Agents.

Factory :

4B, Howrah Road,

HOWRAH

Office :

7, Swallow Lane,

Calcutta.

ন্যায্য পারিশ্রমিকে

এবং

অল্প সময়ে

সর্বপ্রকার রক

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ

ও

আধুনিক ডিজাইন

রিপ্রোডাক্সন

সিঙ্কি কেট

৭১, কণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা র গো র ব

বাঙ্গালীর নিজ স্ব

আর. বি. রোজ

নতুন

সুমন্থর গন্ধ-সৌরভে

গন্ধ নতুন

জগতে অকুলনীল

মূল্য—ভি: পি: মাস্কলসমেত ২০ তোলা

১ টিন ৩/০ ; ২ টিন ৬/০ মাত্র।

ক্যালকাটা স্নাক ম্যানুফ্যাক্ কোং

১৩৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা



বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
মানব-সমাজের বর্তমান সমস্যা পূরণে মানুষের পণ্ডত্বের বিকাশ নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবার প্রয়োজনীয়তা	শ্রীসুজিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	১	কবিতা	
ছ'টি কথা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত	১৪৩	ধেমুদলে লও ডাকি'	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
ফুল কোটে সে কি জানে (কবিতা)	বন্দেজালী মিয়া	১৪৪	আরো কিছু	শ্রীপ্রশান্তি দেবী
ঠক জুয়াচোর নিকটেই আছে, সাধন (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	১৪৫	পরজন্মে	শ্রীআশুতোষ সাত্তাল
আকবরের রাষ্ট্রসাধনা (প্রবন্ধ)	এস. ওয়াজেদ আলি, বি-এ, (কেণ্টাব), বার-এট-ল	১৪৭	পল্লীর ব্যথায়	শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপন্যাস)	শ্রীনন্দারাম গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৯	বিচিত্র জগৎ	
নারীর কর্তব্য (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী প্রতিভা বোস	১৫১	কাচিনদের দেশ (সচিত্র)	শ্রীমুর্শেচন্দ্র ঘোষ
পট পবিবর্তন (গল্প)	শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়	১৫৪	তোমারই (উপন্যাস)	শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়
কঠরোধ (গল্প)	শ্রীজনরঞ্জন রায়	১৫৬	বিজ্ঞান জগৎ	
তোমায়ে ঘিরিয়া (কবিতা)	শ্রীমুর্শেচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল	১৫৭	ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য	শ্রীমুর্শেচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কোন ফুলে (কবিতা)	ঐ	১৫৮	মা (গল্প)	শ্রীহুবি দেবী
ললিত-কলা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী	১৫৯	সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা	
মর্ম ও কর্ম (উপন্যাস)	ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৬২	সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণ ও বঙ্গশ্রী ; বর্তমান খাণ্ড-সমস্যা	
গান (কবিতা)	শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য, বি-এ	১৬৫	গান্ধী-জিন্মা সাক্ষাৎকার ; বর্তমান যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা	
বেয়াড়া বর্ষনের ডায়েরী (প্রবন্ধ)	শ্রীনরেশচন্দ্র পাল	১৬৬	নবগঠিত জাপ মন্ত্রিসভা ; রুশ-পোলিশ সম্পর্ক ; ফিন	
কেরানীর রবিবার (গল্প)	শ্রীঅজিতকুমার বন্দোপাধ্যায়	১৭০	মার্শাল যোমেল আইত।	
গরুড়ের আশ্রয় (কবিতা)	কাদের নওয়াজ	১৭২	পুস্তক ও আলোচনা	
			উপনিবেশ	শ্রীঅমল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়
			অধিনায়ক	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য
			বিপ্লব	শ্রীনন্দারাম গঙ্গোপাধ্যায়
			স্যান মিন্ চু-ই	সেন

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা		
(ঐতিহাসিক চিত্র)	প্রিয়দর্শী	১৭৩
আমার দেশ (কবিতা)	শ্রীনীলবতন দাশ, বি এ	১৭৪
রাজপুত্র (রূপকথা-নাট্য)	বাণীকুমার	১৭৫

ক্রিয়-সূচী

ক্রিয়-সূচী	
বর্ষার ভরা জলে—	শিল্পী—শ্রীশিশি
প্রবন্ধান্তর্গত চিত্র—	
কাচিনদের দেশ (বিচিত্র জগৎ)—	
দরবারবেশে কাচিন সর্দার ; শিশুপুষ্ঠে কাচিন সমস্যা	
কাচিন সমাধি	

বাংলার বঙ্গসমস্যা সঙ্কটে তাঁতের ও মিলের কাপড়ের জুতা

দি ক্যালকাতা ক্রেণ্ডস্ সোসাইটী
লিমিটেড্কে স্বরণে রাখিবেন

কোম
বি. বি. ৩৩১২

পল্লিতালক
বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গাগারের কর্তৃপক্ষ

কলেক্টর হোয়ার
কলিকাতা

(বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গাগার আবারের সহিত সম্প্রদিত হইয়াছে)

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের
শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্
লাইনে শিলং ঘাইবার থু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-
সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে
এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থু টিকেট্ শিলং অফিসে
পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস্

১৯, ক্রাইস্ট রো, কলিকাতা।

গ্রাম - বখের ধন

ফোন :

ক্যাল ৩৭৩৪

২ জীবন বীমা
৩৭নং ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রীট কলিকাতা

— স্থাপিত —

২৩২৩

আয়করমুক্ত শতকরা ৫ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

— শাখা সমূহ —

কলিকাতা		বাঙ্গলা		আসাম	বিহার
মাণিকতলা	ধর্মতলা	মেদিনীপুর	বাঁকুড়া	তেজপুর	পাটনা
ভ্রামবাড়ার	শিয়ালদহ	বাগিচক	বিক্রপুর	হবিগঞ্জ	মীর্জা
কলেজ স্ট্রীট	বালিগঞ্জ	শালবনী	মিরকাশীম	—	—
বড়বাড়ার	পোতা	আলমগড়া	কুশনগর	—	—
—	—	পূর্ববেতা	খুলনা	—	—
—	—	বাঁটাল	বাগেরহাট	—	—

সেন্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ স্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীমুত কালীভরন সেন।

জীবন বীমা

বর্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। একটী জীবন বীমা পত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। ‘ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স’কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবার-বর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে. সি. দাশ, বি-এসসি (ইউ. এন্স. এ.), আর. এ., চেয়ারম্যান

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্প ও উপন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দেহান্তী (সম্প্রকাশিত)	৫/-
দেহান্তী (সচিত্র ১ম সং)	৫/-
বঙ্গমায় (সচিত্র ২য় সং)	৫/-
বঙ্গমাত্রী (সচিত্র ২য় সং)	২৫/-
নানাজুরী (৩য় সং)	১/-

শ্রীমতী আশাশুভা সিংহ

সমর্পণ	১৫/-
অন্তর্যামী	১৫/-

শ্রীভারগবদ রাহা

যোগীনীর মাঠ ১৫/-

কমান্ডার অসাধারণ ক্ষমতা এই লেখকের।

এই চিত্রকর্মক কাহিনীটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

কৌতুকনাট্য

শ্রীপদ্মিনী গোখারী

চুপ্তান্তের বিচার (২য় সং) ১৫/-

ঘুমু (সচিত্র ১ম সং) ২/-

জে না রে ল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পারিশাস লিঃ- ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গল্প ও উপন্যাস

শ্রীপদ্মিনী গোখারী সম্পাদিত

মহামহত্তর—৩

বুদ্ধিগের পটভূমিকার দশ জন খাত লেখকের
লেখা বারোটি গল্পের সংকলন। প্রথম সংস্করণ
নিশেবিতপ্রকার। তৎপর হন।

ডঃ রমেশ বসুস্বায় :

"বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।"

ডঃ ভানুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :

"অতিনন্দন জনাই।"

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৫/-

শৃঙ্খল (২য় সং) ২৫/-

মনের গহনে (২য় সং) ২/-

সরোজকুমারের প্রথম নাটক

হালদার সাহেব—২

শ্রীমৎগোপাল দাস, আই-সি-এস

অনবগুপ্তিতা ২৫/-

ভারা একদিন

ভালবেসেছিল ১৫/-

গল্প ও উপন্যাস

অজ্ঞানদেবের অশ্রোই

পাণ্ডুরা স্মারক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের

বাংলা কবিতার ছন্দ

শ্রীসরোজ রায় চৌধুরীর

স্মৃতি

শ্রীতি মুখোপাধ্যায়ের

বাংলা ও বিশ্বজগতের বিভিন্ন পটভূমিকার নতুন

টেকনিকে লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীমসী

শতাব্দী প্রস্তুতমালা

শ্রীবিলাসপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাস ১/-

শ্রীবীজনাথ ঘোষ

লোকবাহুল্যের আতঙ্ক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ইস্কাইলাস ১৫/-

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আধুনিক আবিষ্কার ১৫/-

ষুদ্ধের দিনেও

"বঙ্গলক্ষ্মী"র আয়ুর্কর্ষেদীর ঔষধসমূহ

পূর্বামুদ্রণ বিপুল উপাদানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ

কবিরাজমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।

ষুদ্ধের অভ্যুত্থানে ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এ কারণ, "বঙ্গলক্ষ্মী"র ঔষধ সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্য।

অল্পমূল্যে বিপুল ঔষধ পাইতে হইলে

৭৫৫ কটন মিল, মেট্রোপলিটান ইন্ডিস্ট্রিয়াল কোং

"বঙ্গলক্ষ্মী"রই কিনিবেন।

প্রভাতের পরিচালক কর্তৃক প্রতীকিত

আয়

অকৃত্রিম আয়ুর্কর্ষেদীর ঔষধপ্রস্তুতকারক

প্রধান কার্যালয়—১১নং ক্লাইড রো, কলিকাতা। কারখানা—বরাহনগর।

১১৭-১১৮ নং মহাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রাজসাহী, ভলপাইগুড়ি, বাগেরহাট, বরিশাল, যশোর, সাধারণপুর ও খানবাড়ি।



ও মাগে
স্বপ্নের আবেশ

কো. কালিকাচর অমল

ফার্সি রস এণ্ড কোং লিঃ



কলিকাতা





AAA 988

কথা-নাস

আপনার নিকট নার্স বলিতে হাসপাতালে কার্যরত
বেত পরিচ্ছন্ন পরিহিতা একটা সুসজ্জিত দেহকরীকে
বুঝাইতে পারে ; কিন্তু পীড়িত ও আহত মৈনিক
ইহা যথেষ্ট মনে করে না—কারণ, নার্সের কোমল
হাতের পরশ তাহার আহত স্থানে প্রলেপ দেয়
এবং মাথার বালিশটাও ঠিক করিয়া রাখে। বেদনার
তীব্রতা যখন বৃদ্ধি পায় এবং বিমিত্র রক্তনী যখন
অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন এই হস্তময়ী মৃষ্টিই
তাহাকে সর্ব্বরকমে সাহায্য করে।

রক্ষক-প্রত্যাগত বীরদের জন্ত বহু সংখ্যক
নার্সের প্রয়োজন। ভারতের নারীগণ নিশ্চয়ই এই
জরুরী আহ্বানে সাড়া দিবেন। আজই তৎপর
হউন। পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই ; কারণ,
কাব্যে ভক্তি করার পূর্বে কিছুদিন শিক্ষা দেওয়া
হয়। যাহাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা
সবাসরি ভাবে গৃহীত হইতে পারেন। পূর্ব-
অভিজ্ঞতা থাকিলে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়।
সন্তোষজনক কার্য সমাপ্তির পর এককালীক কিছু
টাকা দেওয়া হয়।

সাটিকিটপ্রাপ্ত যে-সমস্ত নার্স আই. এম.
এন্. এস.-এর দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশেষ
সর্ত্তে এ. এন্. এস.-এ যোগদান করিতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত এখনই লিখুন :—লেডী
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সেন্ট জন্ এন্ড্রুসেল ডিগেড
(আপনি যে অঞ্চলে বাস করেন সেই অঞ্চলের
ভারপ্রাপ্ত) আপনি যদি ঠিকানা অজ্ঞান করিতে
অক্ষম হন, তাহা হইলে এই ঠিকানার লিখুন :—

ডাইরেক্টর জেনারেল,
ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস—নিউ দিল্লী।

ভারতবর্ষকে সেবা করিতে

এ. এন্. এস.-এ

যোগদান

অফিসিনারী নার্সিং সার্ভিস

বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ও শাড়ী

আগেকার দিনের মতই টেকসই
ও সস্তা।

কিন্তু কোন মিলের পক্ষেই আজ আর যথেষ্ট
বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
মিটাইতে পারিতেছি না।

প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বস্ত্র কিনিবেন না, যাহা আছে
তাহা দিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে
সেলাই করিয়া পরুন। এই দুর্দিনে
তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।

যদি নিত্যান্ত প্রয়োজন হয়
আমাদের অনুরোধ করিবেন।

— = বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান — =

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিনিস্ লিঃ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মানব-সমাজের বর্তমান সমস্যার পূরণে মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবার প্রয়োজনীয়তা

স্বীকৃতি দায়-৪৪০৮০৮

আমাদিগের বিচারানুসারে মানব-সমাজের বর্তমান সময়ে প্রধান সমস্যা দুইটি; যথা—

- (১) সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্তমান মহাযুদ্ধের শান্তি স্থায়ীভাবে স্থাপন করা; এবং
- (২) সমগ্র মানব-সমাজব্যাপী নানাবিধ অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিয়া মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজনে প্রাচুর্য সাধন করা।

উপরোক্ত দুইটি সমস্যা অনতিবিলম্বে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের হাহাকার ক্রমশঃ সর্বত্রই আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং মানব-সমাজের নরকত্বের অবসান ঘটিবে না।

উপরোক্ত দুইটি সমস্যা অনতিবিলম্বে পূরণ হওয়া অপরিহার্য-ভাবে প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু ঐ দুইটি সমস্যা পূরণ করিবার সঙ্কেত মানব-সমাজের বর্তমান সারথিগণের চক্ষুর সম্মুখে নাই। ঐ দুইটি সমস্যা যুগপৎ পূরণ করিতে না পারিলে কোনটাই পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। বর্তমান মানবসমাজে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান নামে পরিচিত, তাহা দ্বারা ঐ দুইটি সমস্যার কোনটাই পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। পরন্তু ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য লইলে ঐ দুইটি সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে জার্মানীর বৈজ্ঞানিকগণ ও বাহ্যপুরুষগণ গত এক শত বৎসর হইতে (প্রিন্স বিসমার্কের অন্তর্দায় হইতে) সাক্ষাতভাবে জার্মানগণের ও অত্যন্তভাবে সমগ্র মানব-সমাজের সমস্যা পূরণ করিবার জ্ঞান নানাবিধ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ও ইংরাজ রাষ্ট্র-পুরুষগণের চেষ্টার ফলে বর্তমানে যাহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা হয় তাহার কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্তমান মানব-সমাজে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান নামে পরিচিত তাহা দ্বারা আমাদিগের কথিত দুইটি সমস্যার কোনটাই যে সমাধান করা যায় না, তাহার সাক্ষ্য জার্মান ও ইংরাজ-সারথিগণের গত একশত বৎসরের চেষ্টার ফল। গত একশত বৎসরের মানব-সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, গত একশত বৎসরে আজকাল যাহাকে “ধন” বলা হয় তাহা ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মানুষের প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই অভাবগ্রস্তের সংখ্যা ও অনাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র মানব-সমাজে যে এই এক শত বৎসরে ঘেষ, হিংসা, ঘৃণা,

কলহ, মারামারি, যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও যুদ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমান মানব-সমাজ যে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

আমাদিগের কথিত দুইটি সমস্যার সমাধান করিবার পন্থা পাওয়া যায় কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ব্যাসদেবের লেখায়।

ঐ লেখা পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি তদনুসারে মানব-সমাজের বর্তমান সমস্যা সমাধান করিবার একমাত্র পন্থা—যাহাকে মানুষের পশুত্বের বিকাশ সর্বতোভাবে নিবারণিত ও দূরীভূত হইয়া সর্বতোভাবে মনুষ্যত্ব সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

ব্যাসদেবের কথানুসারে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ, যে যে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় লইলে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সন্ধান কবিত্তে হয়; দ্বিতীয়তঃ, যে যে ব্যবস্থায় ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান স্বতঃই মানবসমাজে পরিগৃহীত হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থার পরিকল্পনা স্থির করিতে হয়।

ব্যাসদেবের লেখায় মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায় সেই সমস্ত কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা দূরের কথা, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয় তাহা করিতে হইলে মনুষ্য-সমাজে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংগঠনের প্রয়োজন হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহা জগৎ বিশেষভাবে ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে সাধিত না হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্বতঃই কখনও বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। সর্বব্যাপী প্রকৃতির যে যে নিয়মে এই ভূ-মণ্ডলে আকাশ, বায়ু, বাষ্প, জল, স্থল, উদ্ভিদ, পশু-পক্ষি প্রভৃতি এবং মানুষ স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেই নিয়মানুসারে মানুষের অবয়বে যেমন পশুত্ব স্বতঃই বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার মনুষ্যত্বও স্বতঃই বিদ্যমান থাকে। মানুষের অবয়বে যেমন পশুত্ব স্বতঃই বিদ্যমান থাকে সেইরূপ মনুষ্যত্বও স্বতঃই বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু মানুষের অবয়বে পশুত্ব স্বতঃই যে রূপে প্রবল হইয়া থাকে মনুষ্যত্ব স্বতঃই সেইরূপ প্রবল হয় না। মানুষের অবয়বে পশুত্ব স্বতঃই যে রূপে প্রবল হয় মনুষ্যত্ব স্বতঃই সেইরূপ প্রবল হয় না বটে কিন্তু বিশেষ-ভাবে সংগঠন মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের আয়োজনের ফলে কোনও মানুষের যাহাতে পশুত্বের বিকাশ আসে না হইতে

পারে তাহাব ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় এবং এমন কি কোন কোন মানুষ পশুত্ব সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া নিজদিক্কে পশুত্ব-বিবজ্জিত পূর্ণ মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পাবেন। কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কাণ্ড আদৌ না করিতে পারেন কেবল মাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান না থাকিলে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব মিশ্রিত মানুষের দ্বারা মানবসমাজ পরিপূর্ণ হয়। পশুত্ববিবজ্জিত পূর্ণ মানুষের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভবযোগ্য হয়।

কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কাণ্ড আদৌ না করিতে পাবেন কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান না থাকিলে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব মিশ্রিত মানুষের দ্বারা মানবসমাজ পরিপূর্ণ হয় বটে কিন্তু তখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাণ্ড আদৌ চলিতে পারে না ও চলে না; পবিত্র প্রধানতঃ পশুত্বের কাণ্ডই মানবসমাজে চলিতে থাকে; ইহাব কাণ্ড পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব মিশ্রিত মানুষের মধ্যে স্বভাবগত পশুত্ব স্বতঃই মনুষ্যত্বের তুলনায় প্রবল হয়। উপরোক্তভাবে প্রধানতঃ পশুত্বের কাণ্ড মানবসমাজে চলিতে থাকিলে একদিকে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মাঝামাঝি ও যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া থাকে এবং অগাধিকার প্রতীতি, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়-পরিভূষণ ও জ্ঞান-তৃষ্ণার পরিপূর্ণতা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরীণ সেই প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়-পরিভূষণ ও জ্ঞান-তৃষ্ণার পরিপূর্ণতা কোনও মানুষের পক্ষে সর্বতোভাবে জুটা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কাণ্ড আদৌ না করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান না থাকিলে উপরোক্তভাবে মনুষ্যসমাজের সর্বত্র ক্রমশঃ হাজার হাজার জনসংখ্যার ভাবে উৎপত্তি হয়। ব্যাসদেবের লেখা হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনুষ্যসমাজের সর্বত্র যখন হাজার হাজার জনসংখ্যার ভাবে উৎপত্তি হয় তখন মানুষের আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—তিন শ্রেণীর কাণ্ড করা; যথা—

- (১) শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কর্তৃপক্ষের মিলিত হওয়া,
- (২) মনুষ্যসমাজের কোনও মানুষ যাহাতে পশুত্বের কাণ্ড আদৌ না করিতে পারেন, কেবলমাত্র তাহারই উদ্দেশ্যে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কর্তৃপক্ষের মিলিত হওয়া বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা,
- (৩) মনুষ্যসমাজে যাহাতে পশুত্ববিবজ্জিত পূর্ণ মানুষের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় তাহাব ব্যবস্থা করা।

আজকাল মনুষ্যসমাজে যে সমস্ত মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত মতবাদ লক্ষ্য করিলে ইহা মনে করিতে হয় যে, আজকালকার মতবাদসমূহের এই তিনটি কাণ্ডের কোনটিই সম্ভবযোগ্য নহে।

ঐ তিন শ্রেণীর কাণ্ডের কোন শ্রেণীর কাণ্ড যে সম্ভবযোগ্য নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বিচারামুসারে ঐ তিন শ্রেণীর কাণ্ডের কোন শ্রেণীর কাণ্ডই সম্ভবযোগ্য নহে বটে কিন্তু উহাদের কোন শ্রেণীর কাণ্ডই মানুষের সাধাতিবিক্ত

নহে, পরন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর কাণ্ডই মানুষের সাধাতিবিক্ত। ঐ তিন শ্রেণীর কাণ্ডকে মানুষের সাধ্যে বহিষ্ঠিত মনে করা মানব-প্রকৃতির জ্ঞান সঞ্চকে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ব্যাসদেবের উপরোক্ত কথাসমূহের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে হইলে তাহার ভাষামুসাবে মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলা হয় তাহা সর্ব প্রথমে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

ব্যাসদেবের ভাষামুসাবে মানুষের “পশুত্ব” ও “মনুষ্যত্ব” কাহাকে বলা হয় তাহার কথা অতঃপর আমরা আলোচনা করিব।

কোন ব্যক্তিবিশেষের অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা-প্রবৃত্তির নাম মানুষের পশুত্ব। মানুষের পশুত্বের অভিব্যক্তি হয় তাহাব ঘৃণা-হিংসার কাণ্ডে অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিচ্ছেদের কাণ্ডে।

মানুষের পরস্পরের ঘৃণা-প্রবৃত্তি দূর করিয়া মিলন সাধন করিবার প্রবৃত্তির নাম মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষের মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয় পরস্পরের বিচ্ছেদ দূর করিবার কাণ্ডে।

আমাদিগের বিচারামুসারে যে মিলনের কাণ্ডে কোনরূপ দলাদলি হইতে পারে সেই মিলনের কাণ্ড আপাত-দৃষ্টিতে মিলনের কাণ্ড হইলেও উহা বস্তুতঃপক্ষে মানুষের মনুষ্যত্বের কাণ্ড নহে। উহাতে বিচ্ছেদের কাণ্ড থাকে। যে মিলনের কাণ্ডে কোনরূপ বিচ্ছেদের অথবা কোনরূপ ঘৃণা-হিংসার কাণ্ড থাকে না, সেই মিলনের কাণ্ডের নাম মানুষের “মনুষ্যত্বের কাণ্ড”। সমগ্র মানবসমাজের একতায় মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অভিব্যক্তি লাভ করে।

ব্যাসদেবের কথামুসারে মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলা হয় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের “প্রবৃত্তি” কাহাকে বলা হয়, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ, মানুষের “পশুত্ব” ও “মনুষ্যত্ব” এই উভয়ই হই শ্রেণীর “প্রবৃত্তি”।

“প্রবৃত্তি” কাহাকে বলা হয় তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয় বটে কিন্তু “শক্তি” ও “কাণ্ড” কাহাকে বলা হয় তাহা জানা না থাকিলে “প্রবৃত্তি” কাহাকে বলা হয় তাহা বুঝা যায় না। ইহার কারণ, ব্যাসদেব যাহাকে শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন মানুষের অবয়বে তাহার উৎপত্তি হইলে মানুষের “প্রবৃত্তির” উৎপত্তি এবং মানুষের “প্রবৃত্তির” উৎপত্তি হইলে মানুষ তাহার প্রবৃত্তি অনুসারে কাণ্ড করিয়া থাকেন। মানুষের “প্রবৃত্তি”র কারণ তাহার “শক্তি” এবং “প্রবৃত্তির” পরিণতি হয় মানুষের “কাণ্ডে”। মানুষের “প্রবৃত্তির” উৎপত্তি না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর “কাণ্ড” হয় না এবং মানুষের “শক্তির” উৎপত্তি না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় না।

মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকেন তখন তাহার কোন “শক্তি” থাকে না। সর্বব্যাপী প্রকৃতির কয়েকটি প্রবৃত্তির কয়েকটি কক্ষে ফলে মাতৃগর্ভে মানুষের অবয়বের ও ঐ অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের উৎপত্তি হয় ও গঠন পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের অবয়বের ও তাহার ভাগসমূহের উৎপত্তির ও গঠনের পূর্ণতার কাণ্ড প্রধানতঃ সর্বব্যাপী প্রকৃতির কাণ্ডের

দ্বারা সাধিত হয়। মানুষের অবয়বের ও তাহার ভাগসমূহের উৎপত্তি ও গঠনের কাৰ্য্য পৃথক্ মানুষের নিজের কোন শক্তি অথবা প্রবৃত্তি অথবা কাৰ্য্য থাকে না।

এ অবয়বের ও তাহার ভাগসমূহের উৎপত্তির ও গঠনের কাৰ্য্য মাতৃগর্ভে যতখানি পূর্ণতা লাভ করিতে পাবে ততখানি পূর্ণতা লাভ করিবার পব চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির সূচনা হয়। মাতৃগর্ভে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির সূচনা অথবা উন্মেষ হয় বটে কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ঐ প্রয়োজনানুভূতির এমন কি শিঙজনোচিত পূর্ণতা হয় না; প্রয়োজনানুভূতির উন্মেষ হইলেই শিশু আব মাতৃগর্ভে থাকিতে পারে না; তখনই ভূমিষ্ট হইতে বাধ্য হয়। মাতৃগর্ভে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির সূচনা হইলে মাতার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতি হইতে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর চক্ষু প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতির পার্থক্য হইবার সূচনা হয়। মাতার ও গর্ভস্থ শিশুর উপরোক্ত প্রয়োজনানুভূতির পার্থক্যের সূচনা হইলে পার্থক্যের ঐ সূচনা-নিবন্ধন শিশুর পক্ষে আব মাতৃগর্ভে থাকা সম্ভবযোগ্য হয় না। ভবিষ্যৎ মানুষ শিশুরূপে ভূমিষ্ট হয়।

শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার সময়েও শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের প্রয়োজনানুভূতির শিঙজনোচিত পূর্ণতা হয় না; তখনও উহা সূচনার অথবা উন্মেষের অবস্থায় থাকে। তখনও যে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের প্রয়োজনানুভূতি শিঙজনোচিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তাহা যে-কোন শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার অবস্থা পথ্যালোচনা করিলে স্বীকার করিতে হয়।

শিশুরূপে ভূমিষ্ট হওয়ার পব শিশুর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের মুক্ত বাতাসের সহিত সংশ্লব বশতঃ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতি শিঙজনোচিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ ঐ চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিসমূহের তৃপ্তির প্রয়োজনবোধের উৎপত্তি হয়।

বাসুদেবের কথামুসারে মানুষের অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিকে মানুষের “শক্তি” বলা হয়। আর ঐ ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিসমূহের তৃপ্তির প্রয়োজনবোধকে মানুষের প্রবৃত্তি বলা হয়।

মানুষের “শক্তি” ও “প্রবৃত্তি” এই উভয়েই শিঙজনোচিত ভাবে উৎপত্তি হয়, ভবিষ্যৎ মানুষ যখন শিশুরূপে ভূমিষ্ট হন তখনও তাহা পব। মানুষের শৈশবাবস্থা হইতে যৌবন পর্যন্ত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের “শক্তি” ও “প্রবৃত্তি” এই উভয়েই স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানুষ যখন শিশুরূপে মাতৃগর্ভে থাকেন তখন তাহার “শক্তি” ও “প্রবৃত্তি” এই উভয়ের কোনটাই শিঙজনোচিত ভাবে উদ্ভূত হয় না।

মানুষের অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব শারীরিক প্রয়োজনানুভূতিসমূহের এবং ঐ প্রয়োজনানুভূতি-

সমূহের তৃপ্তিবোধসমূহের উৎপত্তি হইলে প্রথমতঃ, ঐ প্রয়োজনানুভূতি সমূহের তৃপ্তি বোধ সমূহের পূরণের জন্ত উপরোক্ত চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের অবয়বে তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী স্বতঃই কতকগুলি আবয়বিক কাৰ্য্য আরম্ভ হয়; দ্বিতীয়তঃ, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়বের ভাগসমূহ স্বতঃই তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্ত কতকগুলি পদার্থ নির্কীচন করে।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির প্রথম উৎপত্তি হয় স্বতঃই। ঐ ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তি বোধেরও প্রথম উৎপত্তি হয় স্বতঃই। ঐ তৃপ্তিবোধের উৎপত্তি হওয়ার পব চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়বংশের স্ব স্ব আবয়বিক কক্ষেরও প্রথম উৎপত্তি হয় স্বতঃই। ঐ আবয়বিক কক্ষের উৎপত্তি হওয়ার পর তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্ত পদার্থ নির্কীচনের প্রথম কাৰ্য্যও স্বতঃই হইয়া থাকে। এই চতুর্বিধ কাৰ্য্যের কোন কাৰ্য্যেই প্রথমতঃ মানুষের কোন ভাল মন্দ বিচারের কাৰ্য্য থাকে না। বিচারের কাৰ্য্য হয় ঐ চারিটি কাৰ্য্যের প্রাথমিক উৎপত্তি হওয়ার পব। কোন্ কাৰ্য্যে স্বতঃই ঐ চারি শ্রেণীর কাৰ্য্য সম্ভবযোগ্য হয় ও অনিবাধ্য হয় তাহা বুঝিতে হইলে যে যে প্রাকৃতিক কক্ষবশতঃ মানুষের মাতৃগর্ভে উৎপত্তি হওয়া ও অস্তিত্ব রক্ষা হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় সেই সেই প্রাকৃতিক কক্ষের সহিত পরিচিত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্ত, ঐ তৃপ্তিবোধানুযায়ী চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ভাগসমূহের অবয়বে স্বতঃই যে সমস্ত আবয়বিক কক্ষ হইয়া থাকে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের সেই সমস্ত আবয়বিক কক্ষকে বাসুদেবের ভাসানুসারে মানুষের “কাম-প্রবৃত্তি” অথবা “কাম” বলা হয়।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহ, তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী, স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্ত স্বতঃই পদার্থ নির্কীচনের যে কাৰ্য্য করিয়া থাকে, তৃপ্তিবোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্কীচনের সেই কাৰ্য্যকে মানুষের “ইচ্ছা-প্রবৃত্তি” অথবা ইচ্ছা বলা হয়।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহ, তাহাদের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধানুযায়ী স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্ত পদার্থ নির্কীচনের যে যে কাৰ্য্য ভাল-মন্দ বিচারপূর্বক করিয়া থাকে, তৃপ্তিবোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্কীচনের সেই সেই কাৰ্য্যকে মানুষের “ইচ্ছা প্রবৃত্তি” অথবা ইচ্ছা বলা হয় না। ঐ শ্রেণীর কাৰ্য্যকে “ইচ্ছার কাৰ্য্য” বলা হয়। বিচারের কাৰ্য্য হয় ইচ্ছার প্রাথমিক কাৰ্য্যের উৎপত্তি হওয়ার পর।

সংক্ষেপতঃ, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির নাম—“মানুষের শক্তি”; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তিবোধের নাম “মানুষের প্রবৃত্তি”; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের, স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের

পূরণার্থে স্বতঃই যে-সমস্ত আবয়বিক কর্ত্ত্ব হইয়া থাকে সেই সমস্ত আবয়বিক কর্ত্ত্বের নাম “মানুষের কাম”; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের ভাগসমূহের, স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণার্থে স্বতঃই পদার্থ নির্বাচনের যে কার্য্য হয় সেই কার্য্যের নাম “মানুষের ইচ্ছা”।

মানুষ তাহার ইচ্ছা পূরণের জগ্গ যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্য্যের নাম “মানুষের কার্য্য”।

মানুষের “শক্তি”, মানুষের “প্রবৃত্তি”, মানুষের “কাম”, মানুষের “ইচ্ছা” এবং মানুষের “কার্য্য”—এই পাঁচটি কথার অর্থ এবং প্রাথমিক উৎপত্তির ধাৰা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ পাঁচটির কোনটিরই মানুষের অবয়ব যখন মাতৃ-গর্ভে গঠন লাভ করিতে থাকে তখন উৎপত্তি হয় না। মাতৃগর্ভে মানুষের অবয়বের গঠনের যতখানি পূর্ণতা হইতে পারে ততখানি পূর্ণতা হওয়া মাত্রই মানুষ মাতৃগর্ভে পৃথক হইয়া শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শক্তির উৎপত্তি হইতে আবম্ভ করে। মাতৃগর্ভে মানুষের “শক্তি”র উৎপত্তি হয় না বটে কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শক্তির উৎপত্তি হয়। শক্তির উৎপত্তি হইলেই যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহা নহে। শক্তির বিকাশ হয় প্রবৃত্তির উৎপত্তিতে। শক্তির প্রাথমিক বিকাশকে “প্রবৃত্তি” বলা হয়। “কাম”ও এক হিসাবে শক্তির বিকাশ কিন্তু উহা শক্তির প্রাথমিক বিকাশ নহে। প্রবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশ কাম। “শক্তির” প্রাথমিক বিকাশকে যেরূপ “প্রবৃত্তি” বলা হয় সেইরূপ “প্রবৃত্তির” প্রাথমিক বিকাশকে “কাম” বলা হয়। প্রবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশকে যেরূপ কাম বলা হয় সেইরূপ কামের প্রাথমিক বিকাশকে “ইচ্ছা” বলা হয় এবং “ইচ্ছার” প্রাথমিক বিকাশকে ইচ্ছা পূরণের “কার্য্য” বলা হয়।

শিশুগণ যখন হামাঙড়ি দিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহাদিগের ইচ্ছাপূরণের “কার্য্য” আরম্ভ হয়। হামাঙড়ি দিতে আবম্ভ করিবার পূর্বে পর্য্যন্ত শিশুগণের “কার্য্যের” উৎপত্তি হয় না। শিশুগণের ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাঁহাদিগের শক্তির “উৎপত্তি” হয় এবং হামাঙড়ি দিতে পারা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তি, কাম ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

সুধু যে শিশুগণেরই শক্তি, প্রবৃত্তি, কাম ও ইচ্ছা থাকে তাহা নহে।

শৈশবে প্রথম যখন ইচ্ছার বিকাশ হয় অর্থাৎ ইচ্ছা পূরণের কার্য্য আরম্ভ হয় তদবধি মানুষ তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত আজীবন যে-সমস্ত কার্য্য করেন তাহার প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গেই সেই-সেই কার্য্যবিষয়ক শক্তি, প্রবৃত্তি, কাম ও ইচ্ছা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে।

প্রথমতঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির অর্থাৎ শক্তির উৎপত্তি হয়; দ্বিতীয়তঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির স্ব স্ব প্রয়োজনানুভূতির তৃপ্তিবোধের অর্থাৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়; তৃতীয়তঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি তৃপ্তিবোধান্বয়ী তৃপ্তি-

বোধের পূরণার্থে আবয়বিক কর্ত্ত্বের অর্থাৎ কামের স্বতঃই উৎপত্তি হয়; চতুর্থতঃ, অতর্কিতভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদির তৃপ্তিবোধের পূরণার্থে পদার্থনির্বাচনের প্রাথমিক কার্য্যের অর্থাৎ ইচ্ছার স্বতঃই উৎপত্তি হয়। ইচ্ছার উৎপত্তি না হইলে ইচ্ছা পূরণের কোন কার্য্য হইতে পারে না এবং হয় না।

ইচ্ছার উৎপত্তি না হইলে মানুষের ইচ্ছা পূরণের জগ্গ পদার্থ নির্বাচন সম্বন্ধে কোন ভাল-মন্দ-বিচার-কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ও হয় না। কাহারও আদেশ পালনের কার্য্যও প্রথমতঃ ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নতুবা আদেশ পালন করিবার কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের শক্তি, মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের কাম, মানুষের ইচ্ছা ও মানুষের কার্য্য কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের স্বৈ-প্রবৃত্তি তাহার স্বভাবগত এবং উহা অজ্ঞাত প্রবৃত্তির তুলনায় সর্বাঙ্গাঙ্গী অধিক প্রবল।

মানুষের স্বৈ-প্রবৃত্তি যে তাহার স্বভাবগত এবং উহা যে অজ্ঞাত প্রবৃত্তির তুলনায় সর্বাঙ্গাঙ্গী অধিক প্রবল, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে মানুষের পশ্চৎ যে তাহার স্বভাবগত ও উহা যে তাহার অজ্ঞাত প্রবৃত্তির তুলনায় প্রবল, ইহা প্রমাণিত হয়।

মানুষের স্বৈ-প্রবৃত্তি স্বতঃই কিরূপে প্রাবল্য লাভ করে তাহা আমরা অতঃপর ব্যাখ্যা করিব।

মানুষের “ইচ্ছা” কাহাকে বলে এবং উহার উৎপত্তি হয় কোন কার্য্যধারায় তাহা বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, স্ত্রথের ইচ্ছা মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ইহার কারণ, মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তি হয় তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির অংশের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের পূরণার্থক পদার্থ নির্বাচনের কার্য্যে। স্ত্রথের ইচ্ছা মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে বলিয়া দুঃখে স্বৈও মানুষের অবয়বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে।

ইহার কারণ—মানুষ তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি এক একটি অবয়বংশের তৃপ্তিবোধের পূরণের জগ্গ যে সমস্ত পদার্থ নির্বাচন করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থে ঐ সমস্ত অবয়বংশের তৃপ্তি হইলে মানুষ যেমন সুখলাভ করেন সেইরূপ আবার তৃপ্তি না হইলেই দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন। সুখলাভ করা যেমন মানুষের ইচ্ছার বিষয়, সেইরূপ দুঃখ-স্বৈও মানুষের ইচ্ছার একরকম বিষয়।

ব্যাসদেবের ভাষামুসারে “মানুষের কাম” ও “মানুষের ইচ্ছা”কে মানুষের প্রবৃত্তির মাত্রা বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই হিসাবে মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়—প্রধানতঃ দুইটি প্রবৃত্তিতে; একটির নাম “স্ত্রথ-প্রবৃত্তি” আর একটির নাম “দুঃখ-স্বৈ-প্রবৃত্তি”।

স্ত্রথ-প্রবৃত্তিতে ও দুঃখ-স্বৈ-প্রবৃত্তিতে যে মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তি হয় তাহা যে-কোন শিশুর চরিত্র লক্ষ্য করিলে অস্বীকার করা যায় না।

দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তির মধ্যে যে দ্বৈশ-প্রবৃত্তি থাকে—সেই দ্বৈশ-প্রবৃত্তিকে ব্যাসদেবের ভাষামুসারে “পশুত্ব” বলা হয় না। দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অথবা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধে কোনরূপ দ্বৈশ-প্রবৃত্তি থাকে না।

দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে কোনরূপ দ্বৈশ-প্রবৃত্তি থাকে না বটে কিন্তু ঐ দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তির বিদ্যমানতাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বৈশ-প্রবৃত্তি অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তির বিদ্যমানতাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বৈশ-প্রবৃত্তি যে অবশ্যজ্ঞাবী হয় তাহার প্রধান কারণ—চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন ভাগসমূহের স্ব স্ব তৃপ্তিবোধের বিভিন্নতা। যে বস্তুতে মানুষের চক্ষুর তৃপ্তিবোধের পূরণ হয় সেই বস্তুতে কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির তৃপ্তিবোধের পূরণ সাধারণতঃ হয় না। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন ভাগসমূহের বিভিন্ন তৃপ্তিবোধের পূরণের জন্য মানুষ নানা রকমের পদার্থ নির্বাচন করিয়া থাকেন কিন্তু ভ্রমহীন বিচারবুদ্ধির উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত কোন পদার্থে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি মনুষ্যাবয়বের বিভিন্ন ভাগসমূহের সর্বতোভাবে তৃপ্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। অবয়বের একটা ভাগের তৃপ্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইলে আব একটা ভাগের তৃপ্তি হওয়া সম্ভব-যোগ্য হয় না—এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়। বিশেষভাবে সচিস্তিত শিক্ষা ও সাধনার পদ্ধতি বিদ্যমান না থাকিলে এবং উহা অবলম্বন না করিলে ভ্রমহীন বিচার-বুদ্ধির উৎপত্তি স্বভাবতঃ হয় না। এই কারণে যদিও মানুষ শিশুরূপে প্রধানতঃ স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি লইয়া ভ্রমিষ্ট হয়, কার্যতঃ তাঁহার স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না; এবং ঐ স্বেচ্ছা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না বলিয়া তাঁহার দুঃখবোধ অধিকতর প্রবল হয়। উপরোক্ত কারণবশতঃ দুঃখবোধ অধিকতর প্রবল হইলে মানুষ নিজেকে দায়ী না করিয়া তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণকে দায়ী করিবার প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকেন; এবং অতর্কিতভাবে মানুষের মনে হয় যে, তিনি ছাড়া তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের সকলেবই স্বেচ্ছা পূরণ হইতেছে ও পারিপার্শ্বিকগণের সকলেই তাঁহাব তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

উপরোক্ত কার্যধারায় মানুষের জন্মগত স্বেচ্ছা প্রবৃত্তিবশতঃ শৈশবকালেই দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তি সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে উদ্ভূত হয় এবং ঐ দুঃখ-দ্বৈশ-প্রবৃত্তিবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে অতর্কিতভাবে দ্বৈশ-প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে। দ্বৈশ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইলেই দ্বৈশ-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় না। দ্বৈশ-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় দ্বৈশের কাণ্ডে।

ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে অতর্কিত ভাবে দ্বৈশ-প্রবৃত্তি মানুষের শৈশব হইতে স্বভাবতঃ প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে বলিয়া পশুত্বকে মানুষের স্বভাবগত

বলা হয়। ইহার কারণ ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে এবং সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধে দ্বৈশ-প্রবৃত্তির নাম মানুষের পশুত্ব।

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবগত, মানুষের মনুষ্যত্বও সেইরূপ স্বভাবগত। ইহার কারণ মানুষের জন্মগত স্বেচ্ছা প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃ শৈশব কালেই ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে যেরূপ দ্বৈশ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেইরূপ মানুষের জন্মগত স্বেচ্ছা প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃই শৈশব কাল হইতে দ্বৈশ-প্রবৃত্তি দূর করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে।

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবগত মানুষের মনুষ্যত্বও সেইরূপ স্বভাবগত বটে, কিন্তু পশুত্ব যেরূপ শৈশব হইতেই স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করে মনুষ্যত্ব সেইরূপ শৈশব হইতেই স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করে না। ইহার কারণ ব্যক্তিবিশেষের ও সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বৈশ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ যত প্রবল হয় ঐ দ্বৈশ প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ তত প্রবল হয় না।

ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অথবা সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে মানুষের দ্বৈশ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ যত প্রবল হয় ঐ দ্বৈশ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ তত প্রবল হয় না বটে, কিন্তু ঐ দ্বৈশ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বভাবেই বিদ্যমান থাকে। ঐ দ্বৈশ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বভাবেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া মানুষ চেষ্টা করিলে ঐ দ্বৈশ-প্রবৃত্তি দূর করিবার প্রবৃত্তিবও বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা বুঝিতে হয় যে, মানুষের পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই স্বভাবগত বটে, কিন্তু পশুত্ব স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যত্ব স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিতে পারে না ও বিকাশ লাভ করে না। মানুষের মনুষ্যত্ব বাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহাব জ্ঞান মানুষের চেষ্টা অথবা ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের পশুত্ব যেরূপ স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে মানুষের মনুষ্যত্ব যে সেইরূপ স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করে না তাহা যে কোন বালকের স্বভাব লক্ষ্য করিলে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের মনুষ্যত্ব বাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহার জ্ঞান চেষ্টা অথবা ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে মানুষের পশুত্বের কার্য বাহাতে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহাব ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ মানুষের পশুত্বই প্রবলতর এবং স্বভাবতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। পশুত্বের কার্য দূর করিবার ব্যবস্থা না করিলে মনুষ্যত্ব কোন ক্রমেই বিকাশ লাভ করিতে পারে না। পশুত্বের কার্য দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা না করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবার ব্যবস্থা করিলে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় সেই মনুষ্যত্ব অবিমিশ্র খাঁটি মনুষ্যত্ব হইতে পারে না। উহার সহিত পশুত্বের ভাণ্ডাল অপরিহার্যভাবে থাকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সহিত পশুত্বের ভাণ্ডাল থাকিলে পশুত্বই কাণ্ডতঃ প্রবলতা লাভ করে। ইহার কারণ মানুষের পশুত্ব স্বভাবতঃ তাঁহার মনুষ্যত্বের তুলনায় প্রবলতর।

মানুষের পশুত্ব স্বভাবতঃ তাঁহার মনুষ্যত্বের তুলনায় প্রবলতর বটে, কিন্তু মানুষ যতখনি উচ্চা নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উচ্চা বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

মানুষের পশুত্বের বিকাশ যাহাতে দূরীভূত হইতে ও নিবারিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা যতখনি বিশেষভাবে সাধিত না হয় তাহা হইলে মানুষের পশুত্বের বিকাশ তওয়া অনিবার্য হইয়া থাকে।

পশুত্বের বিকাশ যাহাতে নিবারিত ও দূরীভূত হয় তাহার ব্যবস্থা হইলেই পশুত্ব নিবারিত ও দূরীভূত হয় না। ব্যাসদেবের ভাষামুসারে "পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করা" আর "পশুত্ব নিবারণ করা" এই দুইটা কথা একার্থক নহে। ঘেষের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেষের কার্যে পরিণত না হয় তাহা করিতে, পারিলেই পশুত্বের বিকাশ নিবারিত হয়। পশুত্ব নিবারণ করিতে হইলে ঘেষের প্রবৃত্তি পর্যন্ত যাহাতে না থাকে তাহা করিবার প্রয়োজন হয়। পশুত্বের বিকাশ নিবারিত হইলেও পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি মানুষের থাকিতে পারে। কিন্তু পশুত্ব নিবারিত হইলে পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি পশুত্ব থাকিতে পারে না। মানুষ যতখনি মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করা যেরূপ সম্ভব হয় সেইরূপ পশুত্ব স্বভাবগত হইলেও সর্বতোভাবে নিবারণ করা এবং দূর করাও সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষ যতখনি মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহার জ্ঞান ব্যক্তিগত সাধনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত যে সাধনায় মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্বতোভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় সেই সাধনা প্রত্যেক মানুষের সাধ্যান্তর্গত নহে।

ঐ সাধনা যে প্রত্যেক মানুষের সাধ্যান্তর্গত হয় না তাহার প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) জন্মভূমির স্থানগত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ;
- (২) মাতাপিতার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যসমূহ।

ঐ দুই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সময় সময় মানুষের শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার বিঘ্ন প্রদায়ক হইয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভবযোগ্য না-ও হইতে পারে।

ব্যক্তিগত যে সাধনায় মানুষের স্বভাবগত পশুত্ব সর্বতোভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিবার ও দূর করিবার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে, সেই সাধনা অবলম্বন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না।

ইহার কারণ একদিকে পশুত্ব বাহাতে বিকাশ হইতে স্বতঃই নিবৃত্ত থাকে নিজেই তত্ত্বপনোপী করিয়া প্রস্তুত করিতে না

পারিলে পশুত্বের বিকাশ সর্বতোভাবে নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং পশুত্বের বিকাশ সর্বতোভাবে নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে পশুত্ব সর্বতোভাবে নিবারণ করা অথবা দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় না ; অতদিকে, সমাজ মধ্যে বিনা বাধায় কাহারও পশুত্বের বিকাশ সম্ভবযোগ্য হইলে প্রত্যেকেরই পশুত্বের বিকাশের আশঙ্কা থাকে।

মানুষের মধ্যে যখন পশুত্ব বিদ্যমান থাকে তখন ব্যক্তিবিশেষের অথবা সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে যেরূপ ঘেষ-প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার কোন কোন সম্প্রদায়েই প্রতি অথবা কোন কোন ব্যক্তির প্রতি অমুরাগ প্রবৃত্তিও বিদ্যমান থাকে। সময় সময় কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে অথবা সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঔদাসীন্ধ্য প্রবৃত্তিও থাকিতে পারে।

অমুরাগ-প্রবৃত্তি অথবা ঔদাসীন্ধ্য-প্রবৃত্তি ছাড়া কখনও ঘেষ-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। এই কারণে মানুষের পশুত্ব কখনও কেবল মাত্র ঘেষের পাত্র থাকে না। যেমন ঘেষের পাত্র থাকে, সেইরূপ ভালবাসার পাত্রও থাকে এবং সময় সময় ঔদাসীন্ধ্যের পাত্রও থাকিতে পারে।

মানুষের মধ্যে যখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তখন কেবলমাত্র অমুরাগের পাত্র থাকে, কোনরূপ ঘেষের অথবা ঔদাসীন্ধ্যের পাত্র প্রকৃত মনুষ্যত্বযুক্ত মানুষের থাকিতে পারে না এবং থাকে না।

উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে ইহা নিঃসন্দেহভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মানুষের পশুত্ব বাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে না পারে তাহা করা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জ্ঞান অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। উচ্চা করিতে হইলে মানুষের ঘেষের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেষের কার্যে পরিণত না হইতে পারে এবং না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। মানুষের ঘেষের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেষের কার্যে পরিণত লাভ করিতে না পারে ও পরিণত লাভ না করে তাহা ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে মানুষের সাধ্যাত্ত। ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ স্বতঃই সাধিত হয়। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ বাহাতে স্বতঃই সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা কলহ হওয়া অথবা মারামারি হওয়া অথবা যুদ্ধ হওয়া অসম্ভবযোগ্য হইতে পারে এবং মানুষের সর্ববিধ দুঃখ ও সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে নিবারিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে।

মানুষের পশুত্ব বাহাতে বিকাশ প্রাপ্ত না হইতে পারে অথবা উচ্চা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান না থাকিলে যে একদিকে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য হয় এবং অতদিকে মানুষের আকাঙ্ক্ষনীয় প্রতিষ্ঠা, ধনপ্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়ের পরিভূষণ এবং জ্ঞানবিক্রান্তির পরিপূর্ণতা অসম্ভবযোগ্য হয় তাহার যুক্তিবাদ সম্বন্ধে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় এবং বিকাশপ্রাপ্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে

প্রথমতঃ, মানুষের স্বভাবই ঘেব-হিংসা-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়; দ্বিতীয়তঃ, ঘেব-হিংসার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভব হয়; তৃতীয়তঃ, দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়; চতুর্থতঃ, মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

পরম্পরিকভাবে আমরা “ঘেব-প্রবৃত্তি” বলিয়া থাকি; পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা হিংসা-প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; অসান্ধিতে নিন্দা ও প্রতিনিন্দা করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; সান্ধিতে অথবা মুখোমুখী কথা-কাটাকাটি করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা কলহ-প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; লাঠি প্রভৃতি কোনরূপ অস্ত্রের সাহায্যে ‘না’ লইয়া এবং বিশেষ ভাবে কোনরূপ দলবন্ধনে বদ্ধ না হইয়া কেবলমাত্র হাত, পা, দাঁত ও নখ প্রভৃতির সাহায্যে ছই পক্ষের ঘাত-প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা মারামারির প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি; দলবন্ধনে বদ্ধ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে যে মারামারি হয় সেই মারামারির প্রবৃত্তিকে আমরা যুদ্ধ-প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি। “ঘেব”, “হিংসা”, “দ্বন্দ্ব”, “কলহ”, “মারামারি” ও “যুদ্ধ” কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে, ঘেব হইতে যে হিংসা, হিংসা হইতে যে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব হইতে যে কলহ, কলহ হইতে যে মারামারি এবং মারামারি হইতে যে যুদ্ধের উদ্ভব হওয়া সর্বতোভাবে সম্ভব এবং উহা যে হইয়া থাকে তাহা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে না পারে অথবা উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজে বিশেষভাবে বিদ্যমান না থাকিলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ প্রবৃত্তি ও যুদ্ধ যে অনিবাধ্য হইয়া থাকে তাহা মানবসমাজে বর্তমান অবস্থা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে না পারে অথবা উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহা কোন শ্রেণীর ব্যবস্থা যে বর্তমান মনুষ্যসমাজের কৃত্রাপি বিদ্যমান নাই তাহা কোন ঐমেই অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের পশুত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে না পারে এবং উহা যাহাতে দূরীভূত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের স্বভাবগত ঘেবের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেবের কাষে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা যে করিতে হয় তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

মানুষের স্বভাবগত ঘেবের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেবের কাষে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে শুধু যে ঘেব, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ প্রবৃত্তি অনিবাধ্য হয় তাহা নহে। মানুষের স্বভাবগত ঘেবের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেবের কাষে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে যাহা যাহা মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় তাহার কোন একটিও সর্বতোভাবে পাওয়া কোন একটি মানুষের পক্ষেও সম্ভবযোগ্য হয় না। পরন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া থাকে। কি কি যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার যোগ্য তাহা পর্যন্ত

মানুষ নির্বাচন করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন। এবং এমন কি যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষার অযোগ্য তাহা পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করেন। এক এক শ্রেণীর পদার্থকে মানুষ আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন; কিছুদিন ঐ সমস্ত পদার্থের ব্যবহার করেন; অবশেষে দেখিতে পান যে, ঐ সমস্ত পদার্থ মানুষের প্রয়োজনের তৃপ্তিসাধন করিতে অক্ষম; আবার নূতন নূতন শ্রেণীর পদার্থ মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া স্থির করা হয়; কিছুদিন পরে আবার ঐ সমস্ত ত্যাগ এবং আবার নূতনের গ্রহণ। প্রতিদিনের ক্রটির পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়েন।

আমাদিগের বিচারানুসারে মানুষের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষার পদার্থ তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা :

- (১) প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য ;
- (২) ধনের প্রাচুর্য্য ;
- (৩) ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ;
- (৪) জ্ঞানের পরিতৃপ্তি।

মানুষের স্বভাবগত ঘেবের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেবের কাষে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় উপরোক্ত চারি শ্রেণীর পদার্থের কোন শ্রেণীর পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা কোন মানুষের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও পরিতৃপ্ত হয় না। ইহার কারণ—যে কোন মানুষের যে কোন শ্রেণীর পদার্থের আকাঙ্ক্ষার সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় এবং মানুষের স্বভাবগত ঘেবের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেবের কাষে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে না থাকিলে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

মানুষ চাহেন প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য ; সমাজের প্রত্যেক যাহাতে আকৃষ্ট হন ও উৎকর্ষ স্বীকার করেন তাহা হয় জ্ঞাতভাবে নতুবা অজ্ঞাতভাবে প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। উহা আকাঙ্ক্ষার বিষয় বটে, কিন্তু যখন মানবসমাজে মানুষের পশুত্ব-প্রবণতার বাধাপ্রদায়ক ব্যবস্থার অভাব হয়, তখন প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য স্থলে অপ্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য লাভ করিতে হয়। প্রত্যেকের আকৃষ্টতার স্থলে অধিকাংশের অনাকৃষ্টতা অথবা ঔদাসীন্ধ্য দেখা দেয়। যে কনিষ্ঠ ভাই-ভগিনীগণ, সন্তানগণ ও কর্মচারীগণের স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইবার ও উৎকর্ষ স্বীকার করিবার কথা তাহার পশ্যন্ত প্রকাশ্যতঃ বিদ্রোহী না হইলেও প্রায়ঃ মনে মনে অগ্রজ, অগ্রজাব, পিতামাতার ও প্রভুর বিরুদ্ধবাদী এবং নিন্দাপ্রয়াসী হইয়া থাকেন।

ধনের প্রাচুর্য্য স্থলে ধনাভাব এবং এমন কি সর্বতোভাবে দারিদ্র্য সর্বত্র দেখা দেয়।

ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির স্থলে প্রায় প্রত্যেক মানুষের প্রায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পূর্ণ সক্ষমতার অভাবযুক্ত অথবা অক্ষমতায়ুক্ত হইয়া পড়ে।

জ্ঞানের পরিতৃপ্তির স্থলে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা অসম্ভব বলিয়া মানুষের সংস্কার হয়।

যে সমস্ত কথা ও কার্য সর্বতোভাবে কাল্পনিক ও অর্থহীন, সেই সমস্ত কথাকে জ্ঞানের কথা মনে করিয়া মানুষের পরিতৃপ্তির স্থলে অপরিতৃপ্তি অথবা বিরক্তি বৃদ্ধি পায়।

মানুষের স্বভাবগত ঘেষের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেষের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে মানবসমাজে তাহার ব্যবস্থার অভাব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঘেষ-হিংসার প্রবৃত্তি এবং দ্বন্দ্ব-কলহের কাণ্ড অনিবার্য হয়।

ঘেষ-হিংসার প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্ব-কলহের কাণ্ড আরম্ভ হইলে কাহারও প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত থাকা অসম্ভব হয় এবং ক্রমে ক্রমে অপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়। প্রকৃতপক্ষে ধনাভাব না থাকিলেও ঘেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইলে স্ব স্ব ঐর্ষ্য সঙ্কে তুলনামূলক উচ্চ-নীচভাবে উদ্ভব হয় এবং তুলনামূলক অভাববোধ অনিবার্য হয়। তুলনামূলক অভাববোধের উৎপত্তি হইলে জাঁকজমক দেখাইবার প্রবৃত্তি ও কার্য অনিবার্য হয়। জাঁক-জমক দেখাইবার প্রবৃত্তি ও কার্য আবদ্ধ হইলে নিশ্চয়ো-জনীয় ব্যয়বাহুল্য অনিবার্য হয়। নিশ্চয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য আরম্ভ হইলে ধনাভাব ও ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য অনিবার্য হয়।

ঘেষ-হিংসার প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্ব-কলহের কাণ্ড আরম্ভ হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা ও বিবাদ অনিবার্য হয়। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা ও বিবাদ হইতে থাকিলে ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের সক্ষমতার ক্ষয় এবং ক্রমে ক্রমে সক্ষমতার অভাব ও অক্ষমতার উৎপত্তি অনিবার্য হয়।

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা ও বিবাদ বিद्यমান থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বৃথিতে অথবা উপলব্ধি কবিত্তে ভ্রম হওয়া অনিবার্য হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বৃথিতে অথবা উপলব্ধি করিতে ভ্রম আবদ্ধ হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় পরিতৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না পারিলে ঐ সঙ্কে অবহেলা অনিবার্য হয়। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় অবহেলা আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান সঙ্কে দৃষ্ট অথবা যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী, তাহাকে সময় সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা অনিবার্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যখন মানবসমাজে মানুষের স্বভাবগত ঘেষের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেষের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব হয় তখন একদিকে ঘেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ যেমন মানবসমাজে ব্যাপকতা লাভ করে, সেইরূপ আবার মানুষের আকাজক্ষণীয় প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতাও মানুষের ভাগ্যে অসম্ভব যোগ্য হয়।

মানুষের স্বভাবগত ঘেষের প্রবৃত্তি যাহাতে ঘেষের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা মানবসমাজে

বিद्यমান না থাকিলে মানুষের আকাজক্ষণীয় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা যে মানুষের ভাগ্যে অসম্ভবযোগ্য হয়, আমাদেরিগের বিচারানুসারে মানব-সমাজের বর্তমান অবস্থাকে তাহার উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে।

যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক মানুষের আকাজক্ষণীয়, সেই প্রতিষ্ঠার অভাব যে বর্তমান মানব-সমাজে প্রত্যেকের বিद्यমান আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, আমাদেরিগের ঐ কথা সর্বতোভাবে নিতুল নহে; হিটলার, চার্লিল, রুজভেল্ট প্রভৃতি মানব-সমাজের সার্থিগণের প্রতিষ্ঠা লোভনীয় এবং সর্বতোভাবে দৃষ্টতামুক্ত। উহা লোভনীয় এবং সর্বতোভাবে দৃষ্টতামুক্ত কি না তৎসঙ্কে মানব-সমাজের সার্থিগণ যেরূপ নিতুলভাবে সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম, আমরা সেইরূপ নিতুলভাবে সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম নহি। আমাদেরিগের বিচারানুসারে বর্তমান মানব-সমাজে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে পোষকতা কবিবার লোক যেমন বিद्यমান থাকেন, সেইরূপ প্রত্যেকেরই প্রতিষ্ঠার বিপক্ষতা অথবা শত্রুতা কবিবার লোকও বিद्यমান থাকেন। শত্রুতাহীন প্রতিষ্ঠা যেরূপ আকাজক্ষণীয় হয়, শত্রুতায়ুক্ত প্রতিষ্ঠা সেইরূপ আকাজক্ষণীয় হইতে পারে না এবং হয় না। আমাদেরিগের বিচারানুসারে শত্রুতাহীন প্রতিষ্ঠা আজকাল কাহারও ভাগ্যে হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং ঐ কারণে আমাদেরিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের আকাজক্ষণীয় প্রতিষ্ঠা আজকালকার মানব-সমাজে মানুষের ভাগ্যে অসম্ভব-যোগ্য হইয়াছে।

ধনপ্রাচুর্য আজকালকার মানুষের ভাগ্যে অসম্ভবযোগ্য হইয়াছে এই কথাও একশ্রেণীর মানুষের মতবাদানুসারে পাগলের উক্তি বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। যখন চারিদিকে কোটি কোটি মুদ্রা ছাপাইবার কার্য চলিতেছে এবং ঐ কোটি কোটির ভাগ কোটি কোটি মানুষ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যা পাইতেছেন তখন ‘আজকালকার মানুষের ভাগ্যে ধন-প্রাচুর্য অসম্ভব’ এতাদৃশ উক্তিকে পাগলের উক্তি বলিয়া মনে করা আপাতদৃষ্টিতে অলীক নহে। আমাদেরিগের মতবাদানুসারে মুদ্রার সংখ্যাধাবা ধন-প্রাচুর্য অথবা ধনাভাব স্থির করা যায় না। ধন-প্রাচুর্য অথবা ধনাভাব স্থির কবিবার মাপকাঠি আমাদেরিগের মতবাদানুসারে প্রধানতঃ দুইটি, যথা : (১) প্রয়োজনীয় ও আকাজক্ষণীয় বস্তুর প্রাচুর্য অথবা অপ্রাচুর্য, এবং (২) ধনাভাবের সর্বতোভাবে নিবৃত্তি অথবা বিद्यমানতা। প্রয়োজনীয় ও আকাজক্ষণীয় বস্তুর প্রাচুর্য থাকিলে এবং ধনাভাবের সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হইলে মুদ্রার সংখ্যা অল্প হইলেও ধন-প্রাচুর্য আছে ইহা সিদ্ধান্ত কবিত্তে হয়। আর প্রয়োজনীয় ও আকাজক্ষণীয় বস্তুর অপ্রাচুর্য এবং ধনাভাবের বিद्यমানতা থাকিলে মুদ্রার সংখ্যা অগণিত হইলেও ধনাভাব আছে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

আজকালকার রেশনিং-এর দিনে প্রয়োজনীয় ও আকাজক্ষণীয় বস্তুর কাহারও অপ্রাচুর্য নাই—ইহা মনে কবিবার চুঃসাহস আমাদেরিগের নাই। কোটিপতিরও আজকালকার দিনে ধনাভাবের

অভাব থাকে ইহাও আমাদের মনে হয় না। আমাদের মতে তাহা। আজকালকার দিনে দরিদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহাদিগের অভাব কয়েক শত অথবা কয়েক সহস্র মূল্যের। অবশ্য ঐ সামান্য-সংখ্যক মূল্যের অভাবই তাঁহাদিগের পক্ষে খুব ভীষণ। বাঁহারা কোটিপতি, তাঁহাদিগের কয়েক শত অথবা কয়েক সহস্র অথবা কয়েক লক্ষের অভাব থাকে না বটে কিন্তু তাঁহাদিগের অভাব থাকে কয়েক কোটির। যিনি কোটিপতি তাহার ঘরে ভিখারী দরিদ্রের খাওয়ার অভাব অথবা সাধারণ বিলাসীর বিলাসপ্রব্যের অভাব থাকে না, কিন্তু তাহার মন খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কোটিপতির অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ বৈক্যপূর্ণ অধিক, দরিদ্রের অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ কখনও তত অধিক হইতে পারে না ও হয় না।

যখন প্রগতিশীল বিজ্ঞান অগণিত রকমের বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয়-পরিভূতির জগৎ উৎপাদন করিতেছে ও সরবরাহ করিতেছে তখন মানুষের ভাগ্যে আকাজক্ষণীয় ইন্দ্রিয়পরিভূতি অসম্ভবযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে—এতাদৃশ মতবাদ পোষণ করা আপাত-দৃষ্টিতে যে চঃসাহসের অথবা পাগলামীর পরিচয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের মতবাদানুসারে ঘরে এবং নিজের চাতের কাছে ইন্দ্রিয়পরিভূতির যোগ্য অগণিত পরিমাণের এবং সংখ্যার বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়সমূহ যদি ঐ সমস্ত বস্তু উপভোগ করিবার ও পরিভূতি লাভ করিবার সক্ষমতাব অভাব-যুক্ত অথবা অক্ষমতায়ুক্ত হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়পরিভূতি-যোগ্য বস্তুর সংখ্যা অগণিত হইলেও তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। আমাদের বিচারানুসারে বর্তমান মানব-সমাজের মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রায়শঃ ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিবার ও পরিভূতি লাভ করিবার সক্ষমতার অভাবযুক্ত এবং অক্ষমতায়ুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই জগৎ আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের আকাজক্ষণীয় ইন্দ্রিয়পরিভূতি আজকালকার মানব-সমাজে অসম্ভব-যোগ্য হইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা যে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তদ্বিষয়ে কোন মতবিরুদ্ধতার বালাই নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সারথিগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করা মানুষের সাধ্যের বহির্ভূত।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বৈষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কাণ্ডে অথবা দ্বৈষের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে একদিকে যেরূপ মানব-সমাজে দ্বৈষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়, সেইরূপ মানব-সমাজে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ব্যাপকতা লাভ করিলেও ঐ ব্যবস্থা সাধন করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের কোন শ্রেণীর যুদ্ধের দ্বারী ভাবের কোন শাস্তি স্থাপিত হইতে পারে না ও দ্বারীভাবে শাস্তি স্থাপিত হয় না।

মানুষের পরস্পরের যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারিত হইবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে যে মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের কোন শ্রেণীর যুদ্ধের দ্বারী ভাবের

কোন শাস্তি স্থাপিত হইতে পারে না তাহার উচ্ছল সাক্ষ্য গত আড়াই হাজার বৎসর-ব্যাপী মানবসমাজের যুদ্ধের ইতিহাস।

ঐক্যগণের অভ্যুদয়কাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত স্মরণীয়-কালের পরিমাণ প্রায় ২৫০০ বৎসর। ঐক্যগণের অভ্যুদয় হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস শৃঙ্খলিতভাবে চিত্রিত। কবিতা দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ স্মরণীয়কালে মানবসমাজের বহু জাতির উত্থান ও বহু জাতির পতন ঘটিয়াছে। যখন যে জাতির উত্থান ঘটিয়াছে, তখনই সেই জাতিকে বিজয় ও বিধ্বস্ত করিবার জগৎ তাহাব বিরুদ্ধে একটা অথবা একাধিক জাতি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং দুই পক্ষে পরস্পরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অভ্যুদয়শীল জাতি যতদিন পর্যন্ত সর্বতোভাবে বিধ্বস্ত না হইয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত ঐ অভ্যুদয়শীল জাতির বিরুদ্ধের যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে দুই পক্ষের ক্রান্তির জগৎ যুদ্ধের তীব্রতা সাময়িকভাবে নিবারণিত হইয়াছে এবং ইতিহাসে যুদ্ধের ঐ সাময়িক নিবারণকে “যুদ্ধের শান্তি” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে যখনই যে জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সেই জাতি সর্বতোভাবে পতন না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধের যুদ্ধ নির্বাপিত হয় নাই। এক ঐক্যগণ ছাড়া কোন জাতির অভ্যুদয়কাল চারি শত বৎসরের অধিক দীর্ঘতা লাভ করিতে পারে নাই। ঐক্যগণের অভ্যুদয় সাড়ে ছয়শত বৎসরের অধিক দীর্ঘ হয় নাই।

গত আড়াই হাজার বৎসর কালের মানবসমাজের ইতিহাস যে অবিরত যুদ্ধের ইতিহাস এবং ঐ স্মরণীয়কালের মধ্যে মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বৈষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কাণ্ডে অথবা দ্বৈষের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার কোনও ব্যবস্থা যে মানবসমাজে সাধিত হয় নাই—তাহা কোন ক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা দ্বৈষ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত যুক্তিবাদ হইতে নিঃসন্দেহভাবে নিম্নলিখিত ছয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ; যথা :

- (১) মানুষের দ্বৈষ-প্রবৃত্তিরই অপর নাম মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা পশুত্ব ;
- (২) মানুষের মনুষ্যত্বের তুলনায় তাহার পশুত্ব স্বভাবতঃ অধিকতর প্রবল ;
- (৩) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে বিশেষ ভাবে মানবসমাজে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে এবং স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে মানুষের দ্বৈষ-প্রবৃত্তি, হিংসা-প্রবৃত্তি, দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি, কলহ-প্রবৃত্তি, মারামারির প্রবৃত্তি এবং যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে।
- (৪) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিতে না পারে বিশেষ ভাবে তাহাব ব্যবস্থা সাধন না করিয়া যাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করিলে ঐটি মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না ; পরন্তু পশুত্বই মানুষের স্বভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে ;

(৫) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে একদিকে ঘেষ, হিংসা, হৃদ, কলহ, মরামারি ও যুদ্ধ এবং অজ্ঞদিকে, প্রত্যেক মানুষের অপ্ৰতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিভূষিত ও কু-জ্ঞান সমগ্র মানব-সমাজময় ব্যাপকতা লাভ করিয়া থাকে ;

(৬) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধিত না হইলে কোনও শ্রেণীর যুদ্ধেরই স্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না ।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তির কুফল এবং উহার বিকাশ দূর করিবার স্বকল কি কি হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে আরও পাঁচটা বিষয় পরিস্ফুট হয় ; যথা :

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধ সর্বতোভাবে জয় করিবার একমাত্র পন্থা মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধন করিতে পারা এবং করা ;

(২) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধন করিতে না পারিলে এবং না করিলে অজ্ঞ কোন উপায়ে কোন শ্রেণীর যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়ী হওয়া যায় না ;

(৩) মানুষের অপ্ৰতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিভূষিত ও জ্ঞানাভাব দূর করিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ পরিভূষিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিবার একমাত্র পন্থা মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধন করা ;

(৪) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধিত হইলে মানুষের অপ্ৰতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিভূষিত ও জ্ঞানাভাব দূর করিয়া প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ পরিভূষিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিবার ব্যবস্থা যুগপৎ সাধিত হয় ;

(৫) মানুষের পশু-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে সাধিত করিতে না পারিলে ও না করিলে অজ্ঞ কোন উপায়ে মানুষের অপ্ৰতিষ্ঠা, দারিদ্র্য, ইন্দ্রিয়ের অপরিভূষিত ও জ্ঞানাভাব দূর করিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, ধন-প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ পরিভূষিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিবার ব্যবস্থা করা কোনক্রমে সম্ভবযোগ্য নহে ।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা ঘেষের কার্যে পরিণত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা চিন্তা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, এ ব্যবস্থা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের অন্তিহের

মেরুদণ্ডস্বরূপ । মেরুদণ্ডের অন্তিহ না থাকিলে যেমন মানুষের অন্তিহ থাকা সম্ভবযোগ্য নহে সেইরূপ মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা ঘেষের কার্যে পরিণত না হইতে পারে মানব-সমাজে বিশেষভাবে তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে কোনও মানুষের পক্ষে প্রকৃত মানুষের মত জীবন ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না ।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা ঘেষের কার্যে পরিণত না হইতে পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা মানব-সমাজে বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের অবস্থা বহু পশু-পক্ষীর অবস্থার সহিত তুলনায় হীনতর হইয়া দাঁড়ায় । প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, বহু পশু-পক্ষিগণ অনাহারে অথবা অন্ধাহারে বিনষ্ট হইতে পারে না । তাহাদিগের অনাহার অথবা অন্ধাহার ঘটিতে পারে না । তাহারা জরা অথবা ব্যাধি নিবন্ধন স্ব স্ব কক্ষে অক্ষম হইতে পারে না । তাহারা পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃ বৈরীভাবে পোষণ করিতে পারে না । তাহারা পরস্পরের প্রাণ-হত্যা করিবার জন্ত কৌশল-নিরত হইতে পারে না ।

বহু পশু-পক্ষিগণের মধ্যে অনাহার, অন্ধাহার, জরা, ব্যাধি, পরস্পরের মধ্যে বৈরীভাবে, পরস্পরের হত্যা-লোলুপতা অসম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু মানুষ যখন স্ব স্ব ঘেষ-প্রবৃত্তিকে ঘেষের কার্যে হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হন, তখন মানুষের মধ্যে উহার প্রত্যেকটাই সম্ভবযোগ্য হয় ।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা ঘেষের কার্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা যে কেবলমাত্র ব্যাসদেবের গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা নহে । বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট ও নবীমহম্মদ প্রভৃতি প্রত্যেক মহামানবের বাণীতে ঘেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির সংযমের আবশ্যকতার কথা পাওয়া যায় । এই সমস্ত মহামানবের প্রত্যেকেই ঘেষ-হিংসা-প্রবৃত্তির সংযমের প্রয়োজনীয়তাকে নিজ নিজ বাণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট স্থান প্রদান করিয়াছেন ।

ঘেষ-হিংসার সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত তিন জন মহামানবের আর ব্যাসদেবের কথা প্রায় একই রকমের । ঘেষ-হিংসার সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত তিনজন মহামানবের আর ব্যাসদেবের কথা প্রায় একই রকমের বটে কিন্তু ঘেষ-হিংসার সংযম কোন্ কোন্ অমুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার সাহায্যে স্বতঃই সাধিত হইতে পারে তাহা এক ব্যাসদেবের লেখা ছাড়া আর কাহারও বাণীতে পাওয়া যায় না । তাহা ছাড়া, ব্যাসদেব ছাড়া আর তিনজন মহামানবের কথাগুলো ঘেষ-হিংসার সংযম ধর্মসাধনের, জন্ত একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় । উহা ছাড়া যে মানুষের মনুষ্যজনোচিত সাংসারিক অথবা সামাজিক অন্তিহ থাকা আদৌ সম্ভবযোগ্য নহে তাহা ব্যাসদেবের কথায় যত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তত স্পষ্টভাবে আর কাহারও কথায় বুঝা যায় না ।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তি অথবা ঘেষ-প্রবৃত্তি যাহাতে পশুত্বের অথবা ঘেষের কার্যে পরিণত না হইতে পারে মানবসমাজে

বিশেষভাবে তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ও না করিলে যেমন কোন মানুষের পক্ষে প্রকৃত মানুষের মত জীবন ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং সেই জন্ত এই ব্যবস্থা বর্তমান মানব-সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার বর্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্ত এই ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

বর্তমান যুদ্ধের স্থায়ীভাবে শান্তির কথা মানবসমাজের সারথি-গণের মুখে শুনা যাইতেছে বটে কিন্তু উহা হওয়া সহজসাধ্য নহে। এই যুদ্ধের স্থায়ী ভাবের শান্তি ত দ্বয়ের কথা, অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সহজসাধ্য নহে বলিয়া আমরা মনে করি।

আমরা কেন এইরূপ মনে করি, তাহার কথা একে একে অতঃপর আলোচনা করিব।

প্রথম আলোচনা করিব যুদ্ধের স্থায়ী ভাবের শান্তি হওয়া সহজসাধ্য নহে বলিয়া আমরা মনে করি কেন, তাহার কথা; তাহার পর এই যুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সহজসাধ্য নহে উহা মনে করি কেন, তাহার কথা।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মহা-যুদ্ধের শান্তি স্থায়ী ভাবে স্থাপন করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে না পারিলে ও না করিলে এই যুদ্ধের শান্তি স্থায়ীভাবেও স্থাপিত হইতে পারে না। সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী নানাবিধ অভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইয়াছে কেন, তাহা বন্ধন করিলে দেখা যায় যে, মানুষের প্রতিষ্ঠা প্রাচুর্য, ধন প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়-পরিভূষণ প্রাচুর্য এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য সাধন করিবার জন্ত মানব-সমাজে বর্তমান সময়ে যে যে ব্যবস্থা আছে সেই সেই ব্যবস্থার কোনটাই মানুষের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রাচুর্য সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারে না, পরন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই অদৃশ্যতা বশতঃ মানুষের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অভাবের উৎপত্তি হওয়া অনিবার্য। মানুষের প্রতিষ্ঠা-প্রাচুর্য, ধন-প্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়পরিভূষণ প্রাচুর্য এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য সাধন করিবার জন্ত বর্তমান মানব-সমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তাহা প্রত্যেকটির ভিত্তি আমাদের বিচারানুসারে দূরদর্শিতার অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থাসমূহ দূরদর্শিতার অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্তমান মানব-সমাজে কোন দেশে কোন মানুষের ভাগ্যে অসীমভাৱে প্রতিষ্ঠা, ধনপ্রাচুর্য, ইন্দ্রিয়-পরিভূষণ অথবা জ্ঞানের পরিভূষণ হইতেছে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই নিম্নতর ভাবের দারিদ্র্য অনিবার্য হইয়াছে। এই ব্যবস্থাসমূহের ভিত্তিতেই যে দূর-দর্শিতার অভাব বিদ্যমান আছে তাহা বর্তমান মানব-সমাজের সারথিগণের সর্বতোভাবে মতবাদ-সম্মত কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই ব্যবস্থাসমূহের ভিত্তিতেই দূরদর্শিতার অভাব বিদ্যমান আছে তাহা মানব-সমাজের বর্তমান সারথিগণের মতবাদসম্মত হউক আর নাই হউক এই ব্যবস্থাসমূহের আংশিক দৃষ্টতা যে তাঁহাদিগের অনেকেই স্বীকার করেন তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে। তাঁহাদিগের অনেকেই এই ব্যবস্থা-

সমূহের আংশিক দৃষ্টতা যে স্বীকার করেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহাদিগের নূতন নূতন পরিবর্তনের পরিকল্পনা। এই ব্যবস্থাসমূহের দৃষ্টতা যতপি অল্পভূত না হইত তাহা হইলে পরিবর্তিত পরিকল্পনাসমূহের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত না।

যে সমস্ত ব্যবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ এতাদৃশভাবে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী সর্বতোভাবে অভাবসমূহের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে না পারিলে ও না করিলে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী মানুষের সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে বর্তমান মহাযুদ্ধের কোন শান্তি অথবা সন্ধি স্থায়ী ভাবে স্থাপিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানব-সমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে যে সমস্ত যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সমস্ত যুদ্ধে যে শ্রেণীর অস্থায়ী ভাবের শান্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে, সেই শ্রেণীর অস্থায়ী ভাবের শান্তিও, মানুষের সর্ববিধ অভাব দূর করিবার যে সমস্ত ব্যবস্থা বর্তমান মানব-সমাজে বিদ্যমান আছে সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হইলে, সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। আমাদের বিচারানুসারে ভূমণ্ডলের ভূমি, জল ও হাওয়ার অত্যন্ত পরিবর্তন ঘটয়াছে এবং এই পরিবর্তনবশতঃ মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ববিধ প্রয়োজন নির্বাহ করিতে হইলে যে-যে কাঁচামালের প্রয়োজন, সেই-সেই কাঁচামালের প্রত্যেক শ্রেণীর ও কোন শ্রেণীর কাঁচামালের প্রাচুর্য এখন আর কোন দেশে পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

আমরা উপরোক্ত মতবাদ পোষণ করি বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের সর্ববিধ অভাব দূর করিবার যে-সমস্ত ব্যবস্থা বর্তমান মানবসমাজে বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত না হইলে বর্তমান মহাযুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তিও সাধিত হইতে পারে না।

মানুষের সর্ববিধ অভাব দূর করিবার যে-সমস্ত ব্যবস্থা মানব-সমাজে বিদ্যমান আছে সেই সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত না হইলে বর্তমান মহাযুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহা সর্বাঙ্গে বুঝিতে হয়।

মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহা জানা থাকিলে বর্তমান ভূমণ্ডলে কাঁচামালের অভাব হওয়া যে অনিবার্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান ভূমণ্ডলে কাঁচামালের অভাব হওয়া কেন অনিবার্য তাহা বুঝিতে পারিলে কেন আমাদের বিচারানুসারে বর্তমান মহাযুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপিত হওয়া সহজসাধ্য নহে, তাহা বুঝা যাইবে।

মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহার কথা আমরা অন্তঃপর আলোচনা করিব।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যাহাদিগের মতবাদানুসারে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধিবশতঃ মানুষের অভাবের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাঁহাদিগের মতবাদের সহিত আমাদের মতবাদের বিরোধিতা আছে।

মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব কেন হইতে পারে ও হয় তাহার কথা বর্ণিতে হইলে, হাওয়া, জল ও ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয় কোন কোন নিয়মে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে চলনশীলতার কৰ্ম (Dynamism), সৰ্বাবয়বিক কৰ্ম (Whole-bodied work), খণ্ডাবয়বিক কৰ্ম (Part-bodied work) এবং যোগ-বিয়োগের কৰ্ম (Work of Integration & differentiation) যে-যে নিয়মবশতঃ এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে প্রতিনিয়ত স্বতঃই চলিয়া থাকে সেই-সেই নিয়মবশতঃ হাওয়া, জল এবং ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হইয়া থাকে। হাওয়া, জল এবং ভূমির উৎপত্তির পর উদ্ভিদ এবং মনুষ্যোত্তর চরজীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। হাওয়া, জল এবং ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য না হইলে উদ্ভিদ এবং মনুষ্যোত্তর চরজীবের স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। হাওয়া, জল এবং ভূমির স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য না হইলে যেমন কোন উদ্ভিদ ও মনুষ্যোত্তর চরজীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ উদ্ভিদ ও মনুষ্যোত্তর চরজীবের উৎপত্তি না হইলে মনুষ্যজাতিরও উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। প্রত্যেক স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে চলনশীলতার কৰ্ম, সৰ্বাবয়বিক কৰ্ম, খণ্ডাবয়বিক কৰ্ম ও যোগ-বিয়োগের কৰ্ম এবং হাওয়ার ও জলের, ভূমির, উদ্ভিদশ্রেণীর, মনুষ্যোত্তর চরজীবের এবং মানুষের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন কোন নিয়মে তাহা পৰিচ্ছািত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, যে নীলাকাশে এই ভূমণ্ডলকে অণুকারে ঘিরিয়া রহিয়াছে সেই নীলাকাশের চলনশীলতার কৰ্ম (dynamicity), সৰ্বাবয়বিক কৰ্ম (whole-bodied or elliptical work) খণ্ডাবয়বিক কৰ্ম (part-bodied or parabolic and hyperbolic work) এবং যোগ-বিয়োগের কৰ্ম (work of integration and differentiation)-বশতঃ এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার (atmosphere) এবং জলের (oceans and water-এর), ভূমির (earth and land-এর), উদ্ভিদশ্রেণীর (plants and shrubs-এর), মনুষ্যোত্তর চরজীবের (animals, birds and fishes-এর) এবং মানুষের স্বতঃই উৎপত্তি হয়।

এই ভূমণ্ডলের হাওয়া, জলের, ভূমির, উদ্ভিদশ্রেণীর, মনুষ্যোত্তর চরজীবশ্রেণীর এবং মানুষের এই ছয় শ্রেণীর পদার্থের উৎপত্তির ও ঐ উৎপত্তির আয়তন পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধবিশিষ্ট হাওয়ার যে আয়তনের স্বতঃই উৎপত্তি হয়, জলের সেই

আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না; জলের যে আয়তন (area) উৎপত্তি হয়, ভূমির সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না; ভূমির যে আয়তনের উৎপত্তি হয়, উদ্ভিদের সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না, উদ্ভিদের যে আয়তনের উৎপত্তি হয়, মনুষ্যোত্তর চরজীবশ্রেণীর সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না। মনুষ্যোত্তর চরজীবশ্রেণীর যে আয়তনের উৎপত্তি হয় মনুষ্যজাতির সেই আয়তনের উৎপত্তি হইতে পারে না।

এই ভূমণ্ডলে সৰ্ববিধ উদ্ভিদশ্রেণীর প্রত্যেকটি যে যে আয়তন থাকে সেই সেই আয়তনের সমষ্টিকে উদ্ভিদশ্রেণীর আয়তন (area) বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলে যত শ্রেণীর মনুষ্যোত্তর চরজীব আছে তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটির যে আয়তন (area) থাকে সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যোত্তর চরজীবশ্রেণীর আয়তন (area) বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলে যত সংখ্যক মানুষ থাকেন সেই সমগ্র সংখ্যক প্রত্যেক মানুষের যে আয়তন (area) থাকে, সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যজাতির আয়তন বলা হয়।

এই ভূমণ্ডলের হাওয়া, জল, ভূমি, উদ্ভিদশ্রেণী, মনুষ্যোত্তর চরজীব এবং মানুষ যে যে নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন হয় সেই সেই নিয়মের সহিত পৰিচ্ছািত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যসংখ্যার উৎপত্তি কখনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় আবার কখনও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি এবং হ্রাস—এই দুইই সীমাবদ্ধ। মনুষ্যসংখ্যার উৎপত্তি স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, মনুষ্যোত্তর চরজীবশ্রেণীর, উদ্ভিদশ্রেণীর, ভূমির, জলের এবং এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তিও স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। মনুষ্যসংখ্যার উৎপত্তি হ্রাস পাইতে থাকিলে, মনুষ্যোত্তর চরজীবশ্রেণীর, উদ্ভিদশ্রেণীর, ভূমির, জলের এবং এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তি স্বতঃই হ্রাস পায়। এক শ্রেণীর পদার্থের উৎপত্তির বৃদ্ধি আবার এক শ্রেণীর পদার্থের উৎপত্তির হ্রাস—ইহা কখনও হইতে পারে না ও হয় না।

উপরোক্ত উৎপত্তির পরিমাপক (unit for measurement of the increase and decrease) তাহাদিগের স্ব স্ব আয়তন (area)। এক একটা অবয়ব যতখানি বায়বীয় (gaseous space) স্থান অধিকার করে, ততখানি বায়বীয় স্থানের নাম তাহার আয়তন (area)।

মনুষ্যজাতি যখন যে আয়তনে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, মনুষ্যোত্তর চরজীব তখনই সেই আয়তনের তিন গুণ আয়তনে, উদ্ভিদশ্রেণী মনুষ্যজাতির আয়তনের সাতাশ গুণ আয়তনে, ভূমি মনুষ্যজাতির আয়তনের দুইশত তেরাশ গুণ আয়তনে, জল মনুষ্যজাতির আয়তনের সাত শত উনত্রিশ গুণ আয়তনে এবং এই ভূমণ্ডলের হাওয়া মনুষ্যজাতির আয়তনের ছয় হাজার পাঁচ শত একষট্টি গুণ আয়তন স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কথাগুলি প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়ন-সম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তক্রমে

প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়নসম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রের কোন কথা এখন আর মানবসমাজের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়নসম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রের কোনও কথা পাওয়া যাক আর নাই যাক, প্রাকৃতিক পদার্থের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটিতে যে প্রাকৃতিক রস বিद्यমান থাকে এবং ঐ প্রাকৃতিক রসের মধ্যে যে অয়ন (অর্থাৎ work and movement) বিद्यমান থাকে এবং ঐ অয়ন যে স্বতঃই শৃঙ্খলিত নিয়মানুসারে চলে এবং উহার যে গণিত শাস্ত্র হইতে পারে এবং ঐ গণিতশাস্ত্র যে রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে অপরিসীমভাবে প্রয়োজনীয় তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। প্রচলিত রসায়নশাস্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐ গণিতশাস্ত্রের অভাব উহার অবিখ্যাসযোগ্যতার ও ভিত্তিহীন প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। মনুষ্যজাতির উৎপত্তির আয়তন যে উপরোক্ত গাণিতিক নিয়মে, মনুষ্যের চরজীবের, উদ্ভিদ-শ্রেণীর, ভূমির, জলের ও এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তির আয়তনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং প্রমাণিত হইতে পারে। উহার যে সমস্ত যুক্তি আছে সেই সমস্ত যুক্তি সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভবযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, এই সমস্ত যুক্তি দেখাইতে গেলে “প্রাকৃতিক পদার্থের প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রের” অগ্ৰস্ত কথা বলিতে হয়। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভবযোগ্য নহে।

মনুষ্যজাতির উৎপত্তির আয়তন যে সর্বদাই উপরোক্ত গাণিতিক নিয়মে মনুষ্যের চরজীবের উদ্ভিদ-শ্রেণীর, ভূমির, জলের ও এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তির আয়তনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লইলে এই ভূমণ্ডলে সমগ্র মনুষ্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় না কেন, মনুষ্যজাতির প্রয়োজন নিকাশ করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর কাঁচামাল যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে ও হয়, সেই সেই শ্রেণীর কাঁচামালের কোনটির অথবা কোন শ্রেণীর কাঁচামালের কোন প্রয়োজনীয় পরিমাণে কখনও অভাব হইতে পারে না—ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

এই ভূমণ্ডলে সমগ্র মনুষ্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের কোনটির অথবা কোন শ্রেণীর কাঁচামালের কোনও প্রয়োজনীয় পরিমাণে কখনও কোনও অভাব স্বভাবতঃ হইতে পারে না, অথচ বর্তমান সময়ে ঐ অভাব কেন সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মনুষ্যজাতির উৎপত্তির আয়তন সর্বদাই গাণিতিক নিয়মে মনুষ্যের চর-জীবের, উদ্ভিদ-শ্রেণীর, ভূমির, জলের ও এই ভূমণ্ডলের হাওয়ার উৎপত্তির আয়তনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বটে এবং স্বভাবতঃ কখনও প্রকৃতিজাত ঐ ছয় শ্রেণীর পদার্থের পূরোক্ত গাণিতিক সম্বন্ধের কোনও ব্যতিচার হয় না বটে, কিন্তু মানুষের কাণ্ডে ঐ গাণিতিক সম্বন্ধের ব্যতিচার হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

হাওয়া, জল, ভূমি, উদ্ভিদ, শ্রেণী, মনুষ্যের চর-জীব শ্রেণী এবং মনুষ্যজাতি—এই ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি,

অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় মূলতঃ কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয়। ঐ ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় যে মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় এবং কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি প্রভৃতি স্বতঃই সাধিত হয় সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যজাতির জন্য থাকিলে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব হয় এবং মনুষ্যজাতিব কোন কাঁচা মালের অথবা প্রয়োজনীয় কোনও শ্রেণীর পদার্থের কোনরূপ অভাব ঘটিতে পারে না। কিন্তু যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ ছয় শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের উৎপত্তি প্রভৃতি স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যজাতির জন্য না থাকিলে ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয় এবং ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার অবশ্যস্বাভাবী হয়।

যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে হাওয়া, জল, ভূমি, উদ্ভিদ, পশু-পক্ষী ও মনুষ্যজাতিব উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি ও বৃদ্ধি স্বতঃই সাধিত হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার হইলে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব অবশ্যস্বাভাবী হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার সাধিত হইলে যে মানুষের নানাবিধ অভাব অবশ্যস্বাভাবী হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের অবয়বে স্বভাবতঃ দুই রকম কর্ম আছে। মানুষ যখন শয়ন করিয়া থাকেন অথবা নিদ্রা যান তখন স্বভাবতঃ যে শ্রেণীর কর্ম হয়, মানুষ যখন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতি দ্বারা কাণ্ড করেন তখন সেই শ্রেণীর কর্ম হয় না। মানুষ যখন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতি দ্বারা কাণ্ড করেন, তখন মানুষের সাধাবণতঃ মনে হয় যে, তিনি নিজেই ঐ কাণ্ড করিতেছেন কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত কাণ্ডের মূলেও স্বভাবের কর্ম বিद्यমান আছে। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির মূলে স্বভাবের কর্ম না থাকিলে মানুষের ইচ্ছামত চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতিব কোন কাণ্ড করা সম্ভবযোগ্য হয় না। স্বভাবের কর্ম না থাকিলে মানুষের চোখের দৃষ্টি-সামর্থ্য, মানুষের কাণের শ্রবণ-সামর্থ্য, মানুষের পায়ের হাটবার সামর্থ্য মানুষ নিজে উৎপাদন করিতে পারেন না।

মানুষের শয়নের অথবা নিদ্রা যাওয়ার কর্মে মানুষের বিশ্রাম হয়, আর তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ প্রভৃতির কাণ্ডে তাঁহার শ্রম হয়। এই দুই শ্রেণীর কর্মের ভিত্তির সামঞ্জস্য না থাকিলে মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য হয়। ঐ দুই শ্রেণীর কর্মের ভিত্তির সামঞ্জস্য না থাকিলে যে মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য হয়, তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

প্রকৃতিজাত বিভিন্নশ্রেণীর পদার্থের দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের নিজ নিজ অবয়বের মধ্যে যেমন একাধিক শ্রেণীর স্বাভাবিক কর্ম বিद्यমান

থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যেও একাধিক শ্রেণীর প্রাকৃতিক কণ্ঠ বিদ্যমান থাকে।

মানুষের অবয়বের মধ্যস্থ ছুই শ্রেণীর কণ্ঠের ভিতর সামঞ্জস্য না থাকিলে যেমন মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়, সেইরূপ প্রকৃতিজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অবয়বের মধ্যস্থ স্বাভাবিক কণ্ঠসমূহের এবং বিভিন্নশ্রেণীর পদার্থের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যস্থিত প্রাকৃতিক কণ্ঠসমূহের সামঞ্জস্য না থাকিলে প্রকৃতিজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

হাওয়ার (atmosphere-এর) ব্যাধিগ্রস্ততায়, হাওয়া মানুষের নানাবিধ ব্যাধির কীটপুং-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং উহাতে অস্বাভাবিক রকমের উষ্ণতার ও শীতলতার পরিবর্তন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, হাওয়া স্বভাবতঃ মৃত্তিকার যে উৎপাদিকা-শক্তি প্রদান করিবার সক্ষমতায়ুক্ত হয়, হাওয়ার সেই স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়।

জলের ব্যাধিগ্রস্ততায় জলও মানুষের নানাবিধ ব্যাধির কীটপুং-পরিপূর্ণ হয়। জল স্বভাবতঃ মানুষের খাদ্য পাচনের জগ্গ যে সামর্থ্য-যুক্ত থাকে, জল ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহার সেই পাচনসামর্থ্য হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া বিপন্নীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। জলে স্বভাবতঃ মৃত্তিকার উৎপাদন-সামর্থ্য প্রদান করিবার সামর্থ্য থাকে। জল ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহা স্বাভাবিক উৎপাদন-সহায়ক-সামর্থ্য হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। জলের ব্যাধি উৎকট হইলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা ত দূরের কথা, উহার মধ্যে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-সামর্থ্য হ্রাস করিবার সামর্থ্যের উৎপত্তি হয় এবং মৃত্তিকা হইতে বিবাক্ত পদার্থসমূহ উৎপাদন করিবার সহায়ক হয়।

ভূমি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে উহার উৎপাদিকাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও উহা যাহা যাহা উৎপাদন করে তাহা অন্তর্কিতভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অপকার-সাধক হইয়া থাকে।

উদ্ভিদশ্রেণীর পদার্থ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে উহা মানুষের স্বাস্থ্যের উপকারক না হইয়া অপকারক হইয়া থাকে।

মনুষ্যজাতীয় চরজীবী ব্যাধিগ্রস্ত হইলে উহাদের স্বভাবে অধিকতর হিংস্রতার উৎপত্তি হয় এবং ঐ মনুষ্যজাতীয় চর-জীবশ্রেণীর মধ্যে যে-সমস্ত চর-জীবী মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত চর-জীবী মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে মানুষের বৃদ্ধির (অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্য-কারণ বিচারশক্তির) হ্রাস অনিবাধ্য হয়।

প্রথমতঃ, প্রকৃতি-জাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অবয়বের মধ্যস্থ স্বাভাবিক কণ্ঠ-সমূহের সামঞ্জস্য; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্নশ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যস্থিত প্রাকৃতিক কণ্ঠসমূহের সামঞ্জস্য; এবং তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থের ব্যাধিগ্রস্ততা—এই তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে বর্তমান ভূমণ্ডলে মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া কেন সম্ভবযোগ্য নহে—তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মনুষ্যজাতীয়, মনুষ্যজাতীয় চর-জীবশ্রেণীর, উদ্ভিদশ্রেণীর, ভূমির, জলের ও হাওয়ার উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, স্বতঃই কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সাধিত হয়, তৎসম্বন্ধে বর্তমান বিজ্ঞানে যে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না তাহা সর্বজনবিদিত।

প্রকৃতিজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অবয়বের মধ্যে যে কত শ্রেণীর স্বাভাবিক কণ্ঠ আছে এবং ঐ কণ্ঠসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার সঙ্কেত যে কি, তৎসম্বন্ধে বর্তমান বিজ্ঞানে যে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না তাহাও সর্বজনবিদিত।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পরের মধ্যে যে কত শ্রেণীর প্রাকৃতিক কণ্ঠ আছে এবং ঐ সমস্ত কণ্ঠের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবারই বা সঙ্কেত যে কি, তৎসম্বন্ধেও যে বর্তমান বিজ্ঞানে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, তাহাও সর্বজনবিদিত।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemist, Physicist এবং Industrialistগণ হাওয়া, জল ও ভূমির অবয়বের উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও পরিবর্তনসমূহ প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ নিয়মে স্বতঃই সাধিত হয় তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ পরিজ্ঞাত না হইয়া, হাওয়া, জল ও ভূমির অবয়বে যথেষ্ট ব্যবহার গত একশত বৎসর হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় কবিতা আসিতেছেন এবং তাহাদিগের ঐ সমস্ত যথেষ্টচাচার ফলে ভূমি, জল ও হাওয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে—ইহা আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট। ভূমি, জল ও হাওয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া একদিকে কাঁচামাল-রূপে যাহা যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহার কোনটা মানুষের স্বাস্থ্য সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার উপযোগী নহে, অল্পদিকে, সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ প্রচুর পরিমাণে কোন কাঁচামাল পাওয়া অসম্ভবযোগ্য হইয়াছে।

আমাদিগের বিচারায়ুসারে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemist, Physicist এবং Industrialistগণের অনাচার যত্নপা না চলিত এবং ভূমি, জল ও হাওয়ার অবয়বের অন্তরস্থ স্বাভাবিক কণ্ঠসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জগ্গ মানুষের যাহা যাহা কর্তব্য তাহা যত্নপা মনুষ্য-সমাজ পালন করিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশেই, সেই দেশের লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইত না কেন—সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনের দ্বিগুণ পরিমাণে কাঁচামাল অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারিত। কোন কোন দেশে প্রয়োজনের নয় গুণ পর্যন্ত পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারিত।

বর্তমান ভূমণ্ডলের জমি, জল ও হাওয়া যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এখন আর মানুষের আহা-বিহারের জগ্গ যে সমস্ত বস্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বস্তুর কোনটীরও কাঁচামালের সর্বতোভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী গুণ ও শক্তি-যুক্তভাবে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য নহে। যাহাও বা উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য, তাহাও সমগ্র মানব-সমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার যে পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণের অর্ধেক হইতে পারে না ও হয় না।

যে সমস্ত দেশে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemistry, Physics ও Industry উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে সে সমস্ত দেশের Chemist, Physicist ও Industrialist-গণের কার্যতৎপরতার ফলে সেই সমস্ত দেশে তৎ তৎ দেশীয় সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পাঁচভাগেব এক ভাগও উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং উৎপন্ন হয় না।

এখন আর সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র লোকসংখ্যার সর্ববিধ প্রয়োজন নির্বাহের জন্ত কাঁচামালের যে পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণের অর্দ্ধেকও উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য নহে কেন, তৎসম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা বলিলাম সেই সমস্ত কথা কাহারও কাহারও কাছে অবিখ্যাসযোগ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র লোকসংখ্যার সর্ববিধ প্রয়োজন নির্বাহের জন্ত কাঁচামালের যে পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই পরিমাণের অর্দ্ধেকও যে গত ১৯৩০ সাল হইতে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইতেছে না, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের প্রয়োজনানুরূপ কাঁচামাল যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্দ্ধেকও উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে না এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের হয় বেকারাবস্থা, নতুবা দারিদ্র্য, কেন অনিবাধ্য হইয়াছে, এত ঘন ঘন কেন সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধ হইতেছে এবং ইতিপূর্বে যেসকল যুদ্ধসমূহের অস্থায়ীভাবে শান্তিও স্থাপনা করা সম্ভবযোগ্য হইত এখন আর সেই অস্থায়ী ভাবের শান্তিও স্থাপনা করা কেন সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্যের ও বেকারাবস্থার প্রধান কারণ—ভূমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অভাব। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অভাববশতঃ এক একজন কৃষক যত পরিমাণের জমি হইতে উৎপাদন করিতে স্বভাবতঃ সক্ষমতায়ুক্ত সেই পরিমাণের জমি হইতে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কোন দেশের কোন কৃষক পরিবারের প্রয়োজন নির্বাহ করিবার পক্ষে প্রচুর হওয়া অসম্ভব-যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অপ্রাচুর্য্যের ফলে একদিকে প্রত্যেকের ধনাভাব অবশ্যজ্ঞাবী হইয়াছে, অত্রদিকে কৃষিকাধ্য ছাড়া অত্রান্ত প্রত্যেক শ্রেণীর কাধ্য জনসাধারণের লোভনীয় হইয়াছে এবং কৃষিকাধ্য সর্বত্র লোকসানের কাধ্যে পরিণত হইয়াছে। কৃষিকাধ্যে যতসংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্যপ্রণ কৰ্ম্মনিয়োগ

হওয়া সম্ভব, অত্র কোন কাধ্যে তত সংখ্যক কৰ্ম্মনিয়োগ হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। প্রত্যেক দেশে কৃষিকাধ্য লোকসানের কাধ্যে পরিণত হওয়ায় অধিকাংশ মানুষের বেকারাবস্থা ও দারিদ্র্য প্রত্যেক দেশে অনিবাধ্য হইয়াছে।

এত ঘন ঘন যে যুদ্ধ হইতেছে তাহারও প্রধান কারণ—আমাদিগের বিচারানুসারে জমি, জল ও হাওয়ার উপরোক্ত উৎকট ব্যাধি। প্রত্যেক দেশের রাজ্য-পরিচালকগণের অনেকেই মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, নিজ নিজ রাজ্যের কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণের অভাববশতঃ নিজ নিজ বাজ্যে কাঁচামালের অভাব ও দারিদ্র্য ঘটিতেছে। তাঁহাদিগের মতবাদানুসারে অপর রাজ্যের ভূমি ও বাজার কাড়িয়া লইতে না পারিলে নিজ নিজ রাজ্যের জনসাধারণের দাবিদ্র্য ও অভাব দূর করা সম্ভবযোগ্য নহে। এইরূপে প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতেছে। প্রত্যেক দেশেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের Chemist, Physicist ও Industrialistগণের কার্যতৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভূমি, জল ও হাওয়ার উৎকট ব্যাধিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষের দারিদ্র্যও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বীরগণের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও মারণ-যন্ত্রের আবিষ্কারও বৃদ্ধি পাইতেছে।

“ইতিপূর্বে যেসকল যুদ্ধসমূহের অস্থায়ী ভাবের শান্তি স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য হইত, এখন আর সেই অস্থায়ী ভাবের শান্তিও স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য নহে”—আমাদিগের এতাদৃশ মতবাদের কারণ দুই শ্রেণীর।

এক, আমাদিগের বিচারানুসারে ভূমি, জল ও হাওয়ার উপরোক্ত উৎকট ব্যাধির এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বেকার-অবস্থা ও দারিদ্র্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য গত যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, সেই অবস্থার তুলনায় এক্ষণে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর দলভগ্ন সৈনিকগণের কৰ্ম্মনিয়োগের ও খাজানার ব্যবস্থা করা যতখানি দুরূহ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ঐ দুরূহ আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দুই, যুদ্ধাবস্থাও অভূতপূর্ব রকমের জটিলতা ধারণ করিয়াছে। মিত্রপক্ষ বেসরূপ শক্তিশালী, অ্যাক্সিস পক্ষও এই যুদ্ধে সমান শক্তিশালী হইয়াছেন। কোন পক্ষেরই কোন পক্ষকে পরাজয় স্বীকার করান সহজসাধ্য হইতেছে না ও হইবে না।

দুই পক্ষই অতর্কিতভাবে দেখিতেছেন যে, পবাজিত হইলে স্ব স্ব জাতির অস্তিত্ব পথ্যস্ত রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং দুই পক্ষই অস্বাভাবিক বকমেব প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের চূড়ান্ত হইলে মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনের কথা জনসাধারণ বিস্মৃত হন এবং তখন এতাদৃশ অস্বাভাবিক রকমের প্রাণপণ যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। বর্তমান যুদ্ধের অভূতপূর্ব রকমের জটিলতার প্রধান কারণ দারিদ্র্যের অভূতরকমের তীব্রতা।

দলভগ্ন সৈনিকগণেব কর্মনিয়োগের ও খাজার্কজনের ব্যবস্থা করার দুরূহ প্রকৃতির নিয়মানুসারে যুদ্ধ-সাংখ্যিকগণের মন অতর্কিত ভাবে একদিকে যুদ্ধাবসান কবিবাব বিরুদ্ধে দখল করিয়া বসিয়াছে, অত্রদিকে যুদ্ধজয়ের চূড়ান্ত বার্তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভবযোগ্য হইতেছে না। কোন পক্ষের যুদ্ধজয়ের চূড়ান্ত বার্তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভবযোগ্য হইলে, জনসাধারণের বুদ্ধিপ্রাপ্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও হয়ত তাহাদিগের নিকট একটা কৈফিয়ত দেওয়া ও যুদ্ধের অবসান ঘটান সম্ভবযোগ্য হইতে পারিত। যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ

অজ্ঞান করিলে স্বতঃই তাহাকে ব্যাধিগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় এবং মানুষ কর্তব্যপারায়ণ হইলে সুস্থ ও শান্ত হইতে পারেন, সেই সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে—এই যুদ্ধের কোন পক্ষের যুদ্ধ-জয়ের চূড়ান্ত বার্তা সহজসাধ্য নহে বলিয়া—আমাদিগের বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাসবশতঃ আমরা মনে করি যে, এই যুদ্ধের অস্থায়ী ভাবের শাস্তিও সম্ভবযোগ্য নহে।

প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় এতাদৃশ যুদ্ধের শাস্তি দুই পক্ষেরই সম্মানজনক ভাবে সাধিত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় কয়েক সহস্র বৎসরের জন্ত মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তির অবসান ঘটিতে পারে; এবং তৃতীয়তঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের প্রতিষ্ঠাবিষয়ক, ধন-প্রয়োজন-বিষয়ক, ইন্দ্রিয়-পরিভূষণবিষয়ক ও জ্ঞানেচ্ছার পরিভূষণবিষয়ক অভাবের আশঙ্কা পথ্যস্ত নিবারিত হইতে পারে, তাহার কথা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের পন্থায় পাওয়া যায়।

মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পন্থা আমরা মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বর্ণনায় এই বৎসরের 'বঙ্গভূমি'র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ—এই চারি সংখ্যায় শুনাইয়াছি।

আমাদের সূত্র

১। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে কুত্ৰাপি কোন কষ্ট অথবা অভাব অনুভব করে না। তাহার যত কিছু কষ্ট তাহার কারণ, প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির বিরোধিতা করিয়া চলা।

২। প্রকৃতি সমাজের (তথাকথিত) নিম্নতম শ্রমজীবীকে যাহা যাহা দিয়াছেন তদ্বারাই শ্রমজীবী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাহার নিজ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। কৃষ্টি লাভের তারতম্যানুসারে মানুষের সংসারপালনের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ যে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান যত বাড়িয়া যাইবে তাহার তত বেশী সংখ্যক সংসারপালনের সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। আমাদের দৃষ্টান্ত, পশুপক্ষীর জীবন। যদি কৃষ্টি ব্যতীত কাহারও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব করা প্রকৃতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পশুপক্ষীর বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইত না। অত্র দিকে মানুষের বেলা মানুষ কৃষ্টি ছাড়া বাঁচিতে পারিবে না আর পশুপক্ষী কৃষ্টি ছাড়াও বাঁচিতে পারিবে—ইহা প্রকৃতির নিয়ম যদি বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিকে খামখেয়ালী বলিতে হয়।

৩। যাহাতে একমাত্র প্রকৃতির দেওয়া সামর্থ্য দিয়াই প্রত্যেক মানুষ বিনা কৃষ্টিতে তাহার শ্রম দ্বারা নিজ নিজ সংসারের অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য অর্জন করিতে পারে এবং কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন অধিকতর হয়, তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করা মানুষের সমাজে অথবা রাষ্ট্রবন্ধনে একান্ত কর্তব্য।

বঙ্গপ্রী

দ্বাদশ বর্ষ

ভাদ্র-১৩৫১

১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

ছাটি কথা

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে মাতৃভাষার স্থান অতি অল্প। উচ্চ শিক্ষার বাহন বৈদেশিক ভাষা; কাজেই ছাত্রদিগকে সমস্ত বিষয়ই বিজাতীয় ভাষায় অধ্যয়ন করিতে হয়। মাতৃভাষাকে দয়া করিয়া এক কোণে একটুখানি ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে তাহার দৈন্ত্যটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। একদিন ছিল, যখন এই ব্যবস্থা আমরা নতমস্তকে মানিয়া লইয়াছিলাম, যদিও পৃথিবীর অন্তর কোথাও এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার কখনও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। কিন্তু হাওয়া বদলাইয়াছে। এতদিনে আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি যে, মাতৃভাষা মাতৃস্তম্ভের স্তায়। মাতৃস্তম্ভ ব্যতীত যেমন শিশুর দেহগঠন হয় না, তেমনই মাতৃভাষা ব্যতীত মানসিক পুষ্টিসাধনও সম্ভব নয়। ভাষাজ্ঞানীর অমৃত উৎস-সেখানে শুষ্ক, মন সেখানে আপনার খাত আহরণে সমস্ত শক্তি ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলে। তাই এখন মাতৃভাষাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা প্রবল চেষ্টা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে এবং তাহারই ফলে বাংলা দেশে এই চেষ্টা কতকটা ফলবন্তী হইয়াছে। বেহার এবং অন্তরা প্রদেশেও যে সেই পন্থা অল্পস্বত হইবে, তাহা সূচনাও দেখা দিয়াছে।

ইংরাজি ভাষার নিগড় হইতে তরুণ মনকে কিয়ৎপরিমাণে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে কলেজে কলেজে আজকাল ছাত্রগণের নিজ নিজ মাতৃভাষার ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্র-গণ এইরূপ আপন আপন মাতৃভাষার ভাবপ্রকাশের আনন্দ উপভোগ এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যসেবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। সকলেই যে সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে করা বাতুলতামাত্র; কিন্তু তাহা হইলেও এবং বৈদেশিক পরিবেষ্টনমূলক যে কারণটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও এইরূপ সমিতি বা সন্মেল যে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের পক্ষে। কারণ, উপরে সাধারণ ভাবে যে সব কথা বলা গেল, তাহা বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বক্ষে প্রযোজ্য ত বটেই; কিন্তু তা' ছাড়া আরও কয়েকটি কারণে তাহাদের নিকট ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। প্রথমতঃ মাতৃভূমির শ্রামল অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক অবস্রাব্য রূপে কীর্ণ হইয়া পড়ে। স্তব্ধ প্রবাসীর সহস্র মাতৃভাষা-প্রীতি নিত্য আগরুক রাখিবার জন্য এইরূপ সমিতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহাপেকা আরও একটি গুরুতর কারণ আছে, বাহার জন্য সর্ববন্ধভাবে আমাদের মাতৃভাষা-প্রীতির পবিত্র দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রদেশের কল-কলেজে মাতৃভাষার শিক্ষাদান-প্রণালী

প্রবর্তিত হইলে বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী বাংলা ভাষার শিক্ষালাভ করিবার অধিকার পাইবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে এখানকার কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, যে-সকল বাঙ্গালী এই প্রদেশের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা শিক্ষাদি সকল বিষয়ে এই দেশেরই ভাষা গ্রহণ করিবেন ইহাই তাহারা আশা করেন; অবশ্য বাহারা তাহা ইচ্ছা না করেন, তাহাদের জন্য বাংলা ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাদের এইটুকু অমুগ্রহের জন্য তাহাদিগকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু ইহার অন্তরালে তাহাদের যে মনোভাবটি উঁকি মারিতেছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচিতে হইলে সজ্ঞশক্তির প্রয়োজন। বাংলার বাহিরে আমাদের এই কলেজে বাংলা-সাহিত্য-সম্মেল প্রতিষ্ঠার মূলে এইরূপ একটা উদ্দেশ্য যদি নিহিত থাকে, তাহা-হইলে নিশ্চয়ই তাহা দৃশ্যমান নয়। শুধু সাহিত্যসেবা নয়, কারণ, তাহা নিভৃত সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু সমবেত ভাবে মাতৃভাষার সেবা করিয়া যদি আমরা মাতৃভূমিকেই বেশী করিয়া ভালবাসিতে পারি, যদি এইরূপে আমাদের মায়ের সঙ্গে প্রেমের নিগূঢ় বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, তাহা হইলে এই সম্মেলপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

বঙ্গদেশপ্রীতি বাঙ্গালীর যেমন মজাগত, তেমন বুঝি ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীর নয়। বঙ্গদেশপ্রেমের বজা বাংলা দেশ থেকেই বহিতে আরম্ভ করিয়া আজ সমগ্র ভারত প্রাবৃত করিয়াছে। আর ইহার সূত্রপাতে স্বদেশ বসিতে একদিকে যেমন আমাদের স্বদেশ-মনকে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত করিয়া দিয়াছি, অপরদিকে তেমনই আবার বাংলার মাটি, বাংলার জলকে অতি নিবিড়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছি—একথা স্বীকার করিতেও আমাদের কুঠিত হইবার কারণ নাই। বঙ্গমাতার গান বাংলা-দেশকে লইয়াই রচিত হইয়াছিল। বঙ্গ আমার, জননী আমার বলিয়া আমরা মাতৃপূজার বোধন-সঙ্গীত গাহিয়াছি। তার পরে যখন রাজপুত্রের নির্ঘম খড়্গাঘাতে মাতৃ-অঙ্গ বিধগত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী যে কেমন করিয়া মায়ের ছিন্ন অঙ্গ জোড়া দিয়া আপনার পথ রক্ষা করিয়াছিল—সেই ইতিহাসও তা' বেশী দিনের নহে। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালী যেখানেই থাকুক না কেন, সে কি তার অঙ্গভূমিকে ভুলিতে পারে? তার পরে তার ভাষা। এমন নিষ্ঠি ভাষা জগতে কি আর আছে? এবং তার স্বদেশপ্রেমই বাস্তুমিতি। কত কবি কত সাধক তাহাদের স্বদেশ-রক্ত দিয়া বঙ্গবাসীর চরণ পূজা করিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই ভাষা-জননীকে ভাল বা বাসিয়া কি থাকিতে পারে? রাজনীতির দূত খুব উগ্র হইয়া তার

স্বক্ষে চাপিলেও তার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার স্বাভাবিক-প্রতিঘাতে স্বাভাবিক বধন নিশ্চেষ্ট হইতে থাকে, তখন তাহাকে এমন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, বাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমবলি নির্বাহিত হইয়া না যায়, তাহার আত্ম-মর্যাদার আঘাত না লাগে। আজিকার এই উৎসব যদি আমাদিগকে এই কথা ভাল করিয়া শ্রবণ করিয়া দিতে সাহায্য করে, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করিব।

আমি তরুণ ছাত্রদের নিকট সঙ্গীর্ণ প্রাদেশিকতা প্রচার করিতেছি না। ভারতবর্ষে আমাদের সকলেরই স্বদেশ, কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, এই কথাই আমি বলিতে চাই। হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেও আমার আপত্তি নাই, যদিও সকল প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দী ইরাজিকের স্থানচ্যুত করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমার শিক্ষার দীক্ষার আমার মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। বরং মাতৃভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি বলিয়া মায়ের ভাবাটুকুমাত্র অবলম্বন করিয়া তাহাতেই আমরা ছন্দয়ের সমস্ত ভক্তি ও প্রীতি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিব। কাহারও প্রতি আমাদের ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই। স্বদেশের তাই-বন্ধু ছাড়িয়া আমরা এখন বাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছি, তাঁহারাও আমাদের নবলব্ধ তাই-বন্ধু। “দূরকে কসেছি নিকট বন্ধু, পরকে কসেছি তাই।” একই ভারত-মাতার সন্তান আমরা—আমাদের আচারে ব্যবহারে একথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না বাই। বাঙ্গালীর একটা দুর্নীতি আছে যে, তাহারা বড় আত্মভর্য; নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া ভিন্ন প্রদেশবাসীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বাইতে পারে না। তাই যেখানেই বাঙ্গালী যায়, সেখানেই তার তার কালীবাড়ী, তার বাবোয়ারী, তার সঙ্গীতসমাজ আর তার বাংলা স্কুল। এই সব লইয়া প্রবাসে সে তার স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। ভাষা সম্বন্ধেও তাই। সিন্ধি, পাঞ্জাবি, মালভোয়ারি, ভাটিয়া সকলেই কেমন সহজেই নিজে নিজ ভাষা ভুলিয়া হিন্দীভাষা গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন। এই বিষয়েও বাঙ্গালীর অক্ষমতা প্রচুর। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে বাঙ্গালীর আত্মভর্যতা বা রাষ্ট্রিকতা প্রকাশ পায় বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। প্রকাশ পায় তার অসীম স্বাভিপ্রীতি আর তার নিজের ভাষার প্রতি প্রাণের টান। সে বাহা হউক, আমাদের কর্তব্য এই যে,

বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই রাষ্ট্রিকতার অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আমাদের এই ছাত্রসমাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠান সেই দিক দিয়া অনেক কাজ করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক প্রীতিবন্ধনের একটা সহজ উপায় পরের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রচা প্রকাশ। নিজের ভাষা ও সাহিত্য আমাদের গর্বের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরের ভাষা ও সাহিত্য অবজ্ঞার চক্রে দেখিবার অধিকার আমাদের নাই। ব্যবহারিক জীবনে আমাদের সকলকে হিন্দী এক-রকম সকলকেই শিখিতে হয়। তাহাই একটু ভাল করিয়া শিখিলে ক্ষতি কি? এইরূপ ক্রমে যদি হিন্দী-সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের ভাল ভাল জিনিস অম্লবাদ করিয়া যদি বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারি, তাহা হইলে হস্ত আমাদের পরদেশী বন্ধুদের সঙ্গে সম্প্রীতি আরও বেশী বর্ধিত হইবে এবং ইহাই যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে?

পরিশেষে তরুণ ছাত্রমণ্ডলীকে আমি আজ এই কথাই শ্রবণ করাইয়া দিতে চাই যে, প্রবাসে তাহাদিগকে যেমনই নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে, তেমনই তাঁহাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যেন তাঁহাদের কার্য-কলাপে দেশ-জননীৰ শুভ আসনে বিবাদের কালিমা পতিত না হয়। যে উত্তম, যে উৎসাহ, যে প্রেরণা লইয়া কিকিছুই ছই বৎসর পূর্বে তাঁহারা এই বাংলা-সাহিত্যসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা যেন শুধু হাসিখেলা, শুধু মিছাকথা, ছলনায় পর্য্যবসিত না হইয়া কণ্ঠের বন্ধুরূপে আপন সার্থকতা লাভ করে। তরুণেরাই দেশের ভরসা স্থল, সে কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। বাঙ্গালীর অদৃষ্টাকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, ঘরে বাইরে সর্বত্র দুঃস্বপ্নের নির্ধন পীড়নে এই দুর্ভাগ্য জাতি নৈরাশ্রের গভীর কূপে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভগ্নোত্তম, জরাজীর্ণ জাতির অন্তরে আশা ও উদ্দীপনার বাগী প্রচার করিতে আমি আজ তরুণদিগকে আহ্বান করিতেছি। ইহা যে তাঁহাদেরই কাজ। মাতৃভক্তের স্নেহকীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত আমরা। তাঁহাদের পুত্র ছন্দয়ে গোমুখী হইতে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া জাতির মানসক্ষেত্র প্রাবৃত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক। তবেই এই উৎসব, এই আয়োজন সার্থক হইবে।

ঃ ভাগলপুর কলেজের বাংলা-সাহিত্যসম্বন্ধে বাৎসরিক অধিবেশনে লেখককর্তৃক গঠিত।

কুল ফোটে—সে কি জানে।

বন্দে আলী মিয়া

শতক তাঁহার মাঝে
তুমি পূর্ববা-দাঁড়,
তোমারে যেহিরা কাঁদে
যোর বর্ণনের সাধ।

তব প্রিয় নাম 'সরি'
জাগি সারা বিভাবরী,
চেয়ে থাকি—যদি পাই
তব প্রেম-পরসাদ।

কুল ফোটে সে কি জানে
ভালোবাসে কে গো তার।
কার আঁখি হল ছল
হলো ভীক বেদনার।

হূব হতে তুমি যম
চির প্রিয়—প্রিয়তম,
তোমারে যে ভালো লাগে
সে কি যোর অপরাধ।

‘ঠক ভুরাচোর নিকটেই আছে, সাবধান !’ (৩৯)

ঈশ্বরানন্দ চক্রবর্তী

অশোকের শিলালিপি নয়, বরং একই শোকাবহই বই কি, উপরোক্ত ভাষার বা ঐ মর্মের অহুশান ইষ্টিশনে, পোষ্টাফিসে—কোথায় না দেখেছেন বজ্রীদাস বাবু? কিন্তু দেখেও যেন দেখেন নি। কিন্তু সেদিন তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেলেন।

দেখতে পেলেন যখন তাঁর চোখের উপরই কাণ্ডটা পরিদৃষ্ট হোলো। পরিদৃষ্ট হোলো কি অদৃষ্ট হোলো, চুল চিরে বলা কঠিন। প্রত্যক্ষরূপে অদৃষ্ট হোলো কি অদৃষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হোলো, হলপ করে বলা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা ধাঁধার মত।

কোথায় যেন যাবেন, কিন্তু হাওড়া ট্রেনের টিকিট-ঘরে বেজার ভীড়। কে যার তার মধ্যে, কার সাধ্য? একজন ভক্তলোক অবাচিত ভাবে এগিয়ে এসে তাঁর টিকিট করে দিতে চেষ্টা করে।

বজ্রীদাস বাবু অমানবদনে সেই পরোপকার-প্রবণ অসাধ্য-সাধকের হাতে তাঁর টিকিটের টাকা সমর্পণ করেছেন। এবং বলা বাহুল্য, টিকিট পাওয়া দূরে থাক, আর তার টিকিট দেখতে পাননি। বিনা টিকিটেই তাঁকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে।

ভারী তাক্সব বাত! লোকটা কিউ-এর মধ্যে ঢুকল তাঁর স্বচক্ষে দেখা—ভীড় ঠেলে তাকে বৃহৎ মধ্যে প্রবেশ করতে তিনি দেখেছেন—বৃহৎ থেকে নির্গমনের যে একমাত্র পথ সেখানেও তাঁর খসড়া ছিল—এর মধ্যে এবং চকিতের মধ্যে লোকটা লোপাট। কিউয়ের মধ্যে সেখানে লোকটা গেল কোথায়, তার কোনো কিউ তিনি পান না। কোম্পেনের গোড়ার Q-এর মত কথাটা তাঁর মনে প্রবল হয়ে বাজতে থাকে।

আর তার পরেই একটা নোটিশ-বোর্ডে উপরোক্ত সহস্রগুণি তাঁর নজরে পড়েছে। কিন্তু তখন আর সাবধান হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু নিজের স্বার্থরক্ষার দায় না থাকলেও অপরকে সাবধান করার দায়িত্ব অতিজ্ঞাতালব্ধ লোকের থেকেই যায়। কাজেই পাড়ার থেকে সত্ৰ আগুণ নিজের ভায়ে জীরনলালকে বোকাতে তিনি কিছুমাত্র কসুর করছিলেন না।

“এই সহরের চতুর্দিকেই বদলোক।”—বলছিলেন বজ্রীদাস: “অলিতে গলিতে পোষ্টাফিসে ইষ্টিশনে। সমস্তটার হাড়ে হাড়ে বদমাইসি! পোষ্টাফিসে বাও, কেউ না কেউ গারে পড়ে তোমার মনি-অর্ডার করে দিতে আসবে। ইষ্টিশনে গেলে তো কথাই নেই। টিকিট ঘরের কাছে বসে লোক টিকিট কেনার তালে ঘুরে, টিকিটের মত ছটকট করছে, তারা কেউ টিকিট কেনার পাত্র না। ওইরকম তার দেখাচ্ছে বটে কিন্তু কেউ তারা টিকিট কিনবে না। অস্ত্র মথলবে তারা ওং পেড়ে রয়েছে—সব আস্ত্র আস্ত্র এক একটা জোড়োর। আমি দেখে এমন কি না—দেখেই এখান থেকেই বলে দিতে পারি।” এই বলে বজ্রীদাস বাবু মুখখানা কিংকর যেন করেন।

“জোমার কোনো ভাবনা নেই মায়া।” জবাব দেয় জীরনলাল।

“না, ভাবনা নেই। কী যে বলিল। কিন্তু সত্যি আমার ভাবনা। সেহাং জোকে পাড়ারগে পেরে কখন কে ঠিকিরে দেয়। বসে সব রাধী আর ঘুরে কত কি করে ঘুরে পূর্ণ-ঘাটে। আবার গি গোছের কেউকে শুলে কি আর রুকে আছে? দেখতে না দেখতে তাকে শিকার করে’ বসেছে। ভালোর ভালোর জোকে দিদির আঁচলে কেবল পাঠাতে পারলে বাচি।”

দীর্ঘনিশ্বাস ক্যামেন বজ্রীদাস। জীরনলালকে জীরন্ত কেবল পাঠানো বাবে কি না ভেবেই হয়ত নিশ্বাসটা পড়ে।

“তুমি দেখে নিরো, কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না।” ভায়ে আশ্বাস দেয়। “অতো সহজ পাত্র আমি নই।”

“না: পারবে না। বলে তোরা’ চেরে কত বড় বড় ওস্তাদকে ওরা চরিরে খাচ্ছে। ওরা আবার পারবে না।” এই বলে পাশ্চাত্যকে ওরা কতরকম পারে তার আরো কতকগুলো দৃষ্টান্ত তিনি হাজির করেন। কেমন করে ওরা চকচকে পেতলকে সোনা বলে চালাতে আসে, দশ টাকার নোটকে চোখের ওপরে ডবোল করে’ দেখিয়ে দেয়, তিনখানা তাস ফুটপাথে বিছিয়ে কতরকম কেরামতি করে—ইত্যাদি নানাবিধ রোমাঞ্চকর কাহিনী পরস্পরার তিনি বর্ণনা করে’ যান।

জীরনলাল হাঁ করে’ শোনে। শুনে শুনে আরো হাঁ হয়ে যায়। আমার হুকার বুজে এলেও তাঁর হাঁকার বোজেনা। ও বাবা! এত ঠক জোড়োর এখানে পদে পদে? চার ধারে আসে’লার মত ঘুরে ঘুরে করছে, কোনখানে পা ফেলবার ঘো নেই! ওরে মামারে!

“শুনেছি নাকি তুলিরে-ভালিরে চা-বাগানে ধরে ধরে চালান দেয়? মা বলছিল।” বলে জীরনলাল। সন্ধ্যাধনে আমার আধখানা হলেও বোধশক্তিভে মা যে আমার কম যান না, এইটে জানাই বোধ হয় ওর উদ্দেশ্য।

“তোরা মা তো সব জানে।” বজ্রীদাস মুখ বিকৃত করেন। “সে দিত আগে। চপ্কাটলেট চা-চা খাইয়ে বাগিয়ে নিরে চা-বাগানে চালান দিত বটে। সেসব ছিল বটে আগে, কিন্তু এখনকার—‘এসব দৈত্য নহে তেমন’। এরা তাদের ওপরে যায়। এরা তোমাকে আন্ত রেখেই তোমাকে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে—গজভূক্ত কপিথ দেখেছিল? দেখিসুনি? আমিও দেখিনি, তবে শুনেছি—গজরা আর বিজাদিগ্গজরাই নাকি কেবল দেখেছে—সে ভারী ভরানক। এসব ঠক-জোড়োররা তোকে সেই কপিথ করে দেবে—চালান না দিয়েই ভোর যা কিছু সব আমদানি করে’ নেবে। তুই টেরও পাবি না। যদি পাস, পাবি অনেক পরে—কিন্তু তখন আর পেয়ে লাভ?”

বজ্রীদাসের সমস্ত মুখখানা একখানা প্রবল হয়ে ওঠে, আর বিকটে জীরনলালের এতটুকু মুখকে একবারেই সহস্রর বলে’ প্রাঙ্ক করা যায় না।

কলকাতার প্রথম ক’দিন জীরনলালের খুব ভয়ে ভয়ে কাটিল। দাঁতের বেলনে সে দেখে দেখে পা কেলেচে, কি জানি কোন

আধুনিক ঠাসীকে তুলে করুন বাড়িরে ক্যালে! চার ধার ভাকিরে ভাকিরে সে হাঁটে—ওইজাতীয় কোনো কিছু তার পিছু নিগেছে কিনা। কাকর সঙ্গে একটি কথা বলার তার সাহস হয় না। এমন কি, রাস্তার ঘাটে যে সব প্রজ্বরমূর্তিদের দেখা পায়, তাদের কাছে ফিস্ ফিস্ করতেও ভয় যায় সে। আর, প্রত্যেকদিন বাড়ী কিরে মামার কাছে তার নিরাপদ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে। ঠক্ জোড়োর ঘুরে থাক, পুলিশ-পাহারাওয়ালাকে পর্যন্ত কেমন করে এড়িয়ে সে ফিরে এসেছে—তারই বোম্বাকর করিভি!

চতুর্থ দিনে জীবনলাল ভারী গোলে পড়ল। মোড় তুল করে' রাস্তা হারিয়ে ফেলল জীবনলাল। কিন্তু কাউকে ডেকে বে পথের নিশানা জেনে নেবে তার ভরসা হয় না, কি জানি, তাদের দরায় আরো তুল পথে পা দিয়ে শেখটায় চা-বাগানেই গিয়ে পৌঁছতে হয় যদি। মা বলেছে চা-বাগানের কথা, আর মামা বলেছে টাকা বাগানোর কথা—হু'টো কথাই বলতে গেলে এক কথা—সমান ভরাবই, সামান্য বানানের হেরফের কেবল। তা, বানানের হেরফের বানানোর কোন গলদ হবে না—বেচারি জীবনলালকেই বোকা বানিয়ে ছাড়বে, যে পথ দিয়েই যাও।

এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে জীবনলাল কারো কাছে টু শক না করে' সারা বিকেলটা পথে পথেই ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তার খিদে পেয়ে গেল খুব। পকেটে টাকা ছিল, একটা খাবার দোকান পছন্দ করে ঢুক পড়ল। ঢুকে পড়ে চপ, কাউন্টে কারি কোম্পানী বত রকমের খাদ্য তার মনে ধরল, পেটে ধরাবার কাজে সে লেগে গেল।

তার ছোট্ট টেবিলটার একাই ছিল সে, কিন্তু এতক্ষণ পরে আর একজন এসে বসেছে। বসেই চায়ের কুম্ভাস দিয়ছে লোকটা।

জীবনলাল উসখুস করতে থাকে। এই অবস্থিত আবির্ভাব কোথাথেকে আবার? নিত্য শ্রমজীবীদের কেউ কিনা তাই বা কে বলবে? মামা তো বারবার করে' বলে দিয়েছেন যে, ঠক্ জোড়োর সর্বদা নিকটেই আছে, সাবধান! ফাঁক পেলে, তারা পকেট-হাততেও বিধা করে না, কোন উচ্চবাক্য না করেই হাল্কা করে' চলে যায়।

লোকটা আধাবয়সী—কেমন যেন লোকটা। জীবনলালের সামনে বসে চায়ের চুমুক মারে আর কি রকম অর্ধবিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকায়। তাক্ কবে নাকি?

জীবনলালের ভাল লাগে না, কিন্তু তখনো তার পেটের খিদে অর্ধেক যবনি—এখনই এই তোলাবাক্য ছেড়ে উঠে যায় কি করে? জীবনলাল লোকটার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেয়ে ওঠে না। ওই বটাক বেখে অক্কেপ না করা ভারী কঠিন।

"আপনার যুখ যেন ভারী চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় কখন দেখেছি আপনারক এর আগে?" চায়ের কাপ নামিয়ে লোকটা কথা পড়তে হঠাৎ।

তুনেই তো জীবনলালের ঘুরে গেছে। বখন ধারে পড়ে আলাপ-জমাতে এসেছে, তখন আর সন্দেহের বাকী নেই। একেবারে নিখাঁৎ—হুম্, তার মামার সমস্ত কথা একসঙ্গে তার মাথায় এসে বৌ বৌ করে' ঘুরতে থাকে।

জীবনলাল জলের গেলাসটা চৌ চৌ করে শেষ করে' উঠে-পড়ে। উত্তরে একটি কথাও না বলে' কাউন্টারে গিয়ে দাম দিয়ে সোজা দরজার দিকে এগোয়। যেতে যেতে মনে মনে আনন্দ "আমার যুখ আগে দেখেছি তুমি বলছ, এইবার আমার শিঠটাও তাহলে দেখো। দেখে চিনতে পারো কিনা দ্যাখো। আমার সঙ্গে চালাকি? বটে? অতো বেশি বোকা পাওনি আমার! অতোখানি পাড়ার্গেরে আমি নই!"

কিন্তু লোকটাও তার পেছনে পেছনে আসে। জীবনলাল কোনদিকে যাবে, কি করবে ভেবে পার না। ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটার দৃষ্টি হারানো কঠিন। সে ঠিক তার অম্লসরণ করছে।

জীবনলাল বৌ করে' একটা পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বসে ঠাণ্ডা হয়ে ইতিকর্তব্য ভাববার চেষ্টা করে। এদিকে সে লোকটাও পার্কের মধ্যে সে ঘিরেছে।

জীবনলাল অদূরে উক্ত অভ্যাস না দেখেই উঠে পালাবার চেষ্টা করছে, লোকটা হাত নেড়ে তাকে বাধণ করে। মাঠে: যোষণার মত অনেকটা যেন তার ইচ্ছিত।

জীবনলালকে মস্তমুগ্ধের মত বসতে হয়। লোকটা এসে তার পাশে বসে। পাশে বসে গাঢ়স্বরে জানায়: "আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে, চিনতে পেরেছি এতক্ষণে। ৮দিগম্বর চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আপনি।"

জীবনলাল প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু ওর গলা থেকে কোনো বা বেরয় না। লোকটিই বলতে থাকে:

"তাইতো ভাবছিলাম যে, কেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনার সেবেস্তার সেদিন বখন গেছি তখনই তো আপনাকে দেখেছিলাম। বেশী দিনের তো কথা নয়।"

জীবনলাল কোনরূপে "না—না—না" উচ্চারণ করতে পারে মাত্র।

কিন্তু লোকটা তার না-কারকে আমল না দিয়ে আরো নানা কথা বলে যায়:

"আমার প্রস্তাবটা কি এর মধ্যে আপনি পুনর্বিবেচনা করেছেন? আপনার বেলতলার বাড়ীটা বখন আমি কিনতে চেয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন ভেবে চিন্তে পরে আমাকে জানাবেন। আশা করি এখন আর আপনার কোনো অমত নেই।"

জীবনলাল বলতে যায়: "কিন্তু মশাই আমি তো"—৮দিগম্বর চৌধুরীর কোন দিগন্তেই যে ও নেই, এই কথাটাই জানাতে ও চেষ্টা করে।

কিন্তু ভুললোক কোন কথা শোনের না। "না, আপনার কোন আপত্তি আমি তদ্ব না। একুদ্বিই কথাটার একটা বিশদ্বি করে' কেন্দ্রতে চাই। বায়নার পাঁচশো টাকা আমার

“তোকে বার বার পই পই করে’ বারণ করে’ দিয়েছি না যে ষত

“আমি ঠিকিয়েছি কি না ঠিক করতে পারি না, তবে আমি লোকটাকে না ঠকাতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। এমন কি এ কথাও বলেছিলাম যে যদিগর চৌধুরীর কোনো কুলে কেউ আমি নই। কিন্তু লোকটা আমার কথার কর্ণপাতই করল না, আমি কি করব?”

এ সব তিনি কোন গুঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত কিংবা সাম-
নীতিক চাল হিসাবে করেন নি। বাকে সত্য বলে ভেনেছিলেন,
আরই নির্দেশের তিনি অসুসরণ করেছিলেন!—সহস্রাত এক
অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আওরকজেব জয় গ্রহণ করেছিলেন।
প্রাথমিক জীবনেই তিনি তাঁর জীবনাধর্শন নির্ধারিত করেছিলেন,
আর এই আধর্শনের উপলব্ধির জন্ত তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তির
প্রত্যেকটি রুল, প্রত্যেকটি কথাকে পরিপূর্ণভাবে কামে লাগিয়ে
গিয়েছিলেন। তাঁর সাধন সাধারণ ধরনের ছিল না। তবে তিনি

অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতেন। এ কথা তখনই বলা হয়ে যায়, যখন আমরা বলি যে, তিনি বিশ্ববিজ্ঞত সিংহবিক্রম মোগল রাজবংশের একজন বংশধর ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিশ্বয়কর শৌর্যবীর্ঘ্যসম্পন্ন বংশের লোকদের মধ্যেও তিনি সর্ক-শ্রেষ্ঠ বোচ্চাদের একজন ছিলেন। বাল্যের যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের অবস্থা যখন একান্ত সঙ্গীন, শত্রু যখন পঙ্গপাল এবং শিপীলিকার মত শাহী কোঁজকে চারিদিক থেকে ঘিরে কেলেছে; চারিদিকে কেবল অস্ত্রের ঝনঝন এবং ইস্পাতের ষণ্টা বাজিয়ে চলেছে, ঠিক সেই চরম সঙ্কটের মুহূর্তে, ডুবন্ত সূর্য্য সান্ধ্য-উপাসনার সময় জানিয়ে দিলেন। যুদ্ধের এই তুমুল কলরবে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে আওরঙ্গজেব অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন, আর একান্ত সহজ ভাবে নামাজের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার আত্মনিয়োগ করলেন; ঠিক যেমন ভাবে তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে শান্তির দিনে করতেন। উজ্জবেগ সর্দার বাদশার এই আচরণ দেখে সবিস্ময়ে চাঁৎকার করে উঠলেন “এ রকম লোকের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার অগ্রসর হওয়ার মানে হচ্ছে মৃত্যুকে ডেকে আনা।”

আওরঙ্গজেবের মনে নরপতির কি উচ্চ আদর্শ ছিল, আমরা তা দেখতে পাই তাঁর একটা পত্রে, যা তিনি তাঁর এক ওমরাহকে লিখেছিলেন, যখন এই ওমরাহ বাদশার অহর্নিশি রাজকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করার বিষয় তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আওরঙ্গজেব সেই পত্রে বলেন “বিশ্বনিরস্তা আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন দেশের জন্তু জীবন ধারণ করতে এবং কাজ করতে; নিজের জন্তু জীবন ধারণ করতে এবং কাজ করতে পাঠাননি।” আমার কর্তব্য হচ্ছে নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা না করা, সে সুখ-স্বাস্থ্য যদি আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্তু একান্ত ভাবে প্রয়োজন না হয়। প্রজাদের শান্তি এবং শ্রীবৃদ্ধি, এই হচ্ছে আমার চিন্তা এবং ভাবনার একমাত্র বিষয়বস্তু; আর এ সবকে অবহেলা করা যেতে পারে কেবল জায়বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্তু, রাজকীর শাসন অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তু, অথবা রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্তু।” শাহজাহানকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও এই আদর্শই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি পিতাকে লিখেছেন : সর্কশক্তিমান খোদা তাঁর আমানত (Trust) তারই কাছে অর্পণ করেন, যে প্রজাদের মঙ্গল সাধন করে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। জ্ঞানী লোকের কাছে এ কথা একান্ত স্পষ্ট বলেই প্রতীয়মান হয় যে, নেকড়ে বাঘ কখনও আদর্শ মেঘপালক হতে পারে না। আর তরাভূত, হুর্কলমনা মানুষ কখনও সাম্রাজ্যের গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারে না। বাদশাহীর অর্থ হচ্ছে প্রজাদের অভিভাবক্য করা। বিলাসে মগ্ন থাকাকে এবং বেচ্ছাচার করাকে রাজ্যশাসন বলা যায় না।”

... ...

একজন মুসলমান ঐতিহাসিক যিনি আওরঙ্গজেবের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, তাঁর কর্তব্য জ্ঞানের জন্তু, তাঁর আত্মসংযমের জন্তু এবং তাঁর জায়বিচারের জন্তু, তাঁর অতুলনীয় সাহসের জন্তু, তাঁর সহনশীলতার জন্তু এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তার জন্তু, তিনিই বলেছেন আওরঙ্গজেবের সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়েছে,

আর তাঁর সব প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। আওরঙ্গজেবের জীবন হয়েছে ব্যর্থতার বির্যট এক ধূঁসান্দ। তবে একথাও সত্য যে, তাঁর ব্যর্থতার মধ্যেও তাঁর বির্যটের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গৌরব এইখানে যে, স্বার্থের খাতিরে তিনি নিজের আত্মাকে কখনও প্রত্যাহারিত করেন নি; স্বার্থের খাতিরে তিনি কখনও স্বার্থের পতাকা ছেড়ে যাননি। ভারতের এই মহাকাব্য Puritan (ত্যাগী পুরুষ) সেই বিরল উপাদানে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যে-উপাদানে প্রস্তুত হন সেই সব মহামানবেরা, যারা এই পৃথিবীতে শহীদের (martyr) রক্তমাণ্ডিত মুকুট অর্জন করেন।

(পরবর্তী)

আওরঙ্গজেবের অকৃত্রিম ধর্ম এবং শরিয়েতনিষ্ঠা তাঁর রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে ব্যর্থতা আনয়ন করেছিল। তিনি হিজরীর প্রথম শতাব্দীর জীবনের তাগিদে সৃষ্ট নিয়মাবলীকে হিজরীর একাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ভিন্ন বেঠনীর মধ্যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, অবশ্যজ্ঞাবী ভাবে এসেছিল দেশের মধ্যে অসন্তোষ আর রাষ্ট্রসাধনার ব্যর্থতা, হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে হয়তো জিজ্ঞাস্যকর অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু আকবরের উদার নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যকে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সাম্রাজ্য বলে মনে করতেন। মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্তু অকাতরে তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতেন। সেই প্রাণের চেয়ে প্রিয় জাতীয় সাম্রাজ্য, হঠাৎ যখন তাঁদের মধ্যে এবং বাদশার সমধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনাবশ্যক একটা পার্থক্যের রেখা টানা হল, তখন তাঁদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়েছিল, তা সহজেই অসম্ভব করা যায়।

ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতবাদের একতার প্রয়োজন হয়তো হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে ছিল। কিন্তু সহস্রাবিক ব.সর পরে মানুষ যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখেছে, স্বাধীন মত পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে, যুগধর্মের প্রয়োজনে যখন নতুন নতুন মতবাদ পৃথিবীতে এসে দেখা দিয়েছে, এগার শত বৎসর পূর্বের পরিস্থিতি এখনকার জন্তু যে বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করেছিল সে পরিস্থিতি যখন চলে গিয়েছে, আর তাঁর যারগার সম্পূর্ণ নতুন ধরণের পরিস্থিতি এসে দেখা দিয়েছে, তার নতুন প্রয়োজন, তার নতুন তাগিদ নিয়ে সেই সম্পূর্ণ অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে একজন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যুগধর্মকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে দেশকে এবং প্রজাবর্গকে সুদূর অতীতের সেই বিগত পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্তু চেষ্টা করার মানেই হচ্ছে ব্যর্থতাকে আহ্বান করা। আওরঙ্গজেবের অতুলনীয় চরিত্রবল সত্ত্বেও তাঁর সাধনা তাই-ব্যর্থ হয়েছিল।

তার পর জীবন্ত মানুষ সব যুগেই যুগধর্মাবলম্বী। যুগধর্মের প্রকৃত প্রয়োজন যে কি, অনেক সময় হয়তো তারা তা বোঝে না, কিন্তু যুগধর্মের আহ্বান ছাড়া অস্ত্র কিছুই আহ্বানে অস্ত্র তাদের লাড় দেয় না। কোন মহাপুরুষ যুগধর্মের আহ্বান তাদের যখন শুনান, তারা সত্যই তখন জেগে উঠে, আর অসম্ভবক সম্ভব

করে তোলে। যুগধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত তারা সব কিছু দিতে প্রস্তুত হয়! বিধাহীন ভ্যাগ, নেতার প্রতি অপরিণীত ভক্তি, আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা—মামুষের শ্রেষ্ঠতম গুণনিচয় তখন তাদের মধ্যে এসে দেখা দেয়। তাদের সামবায়িক শক্তি বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে।

পক্ষান্তরে যারা মরা মানুষ জীবন্ত, তারা বাস্তব: আচার-নিষ্ঠ হয় বটে, কেন না, জীবনযাত্রার সেই হচ্ছে সহজতর পথ—life of least resistance; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু কোন ডাকেই তারা সাড়া দেয় না। যারা তাদের উপর ভরসা করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাঁদের শেষে দারুণ ব্যর্থতার—শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। আওরঙ্গজেবের অতীতমুখী মন তাঁকে এই পথেই নিয়ে গিয়েছিল, আর তার ফলে এসেছিল অবশ্যস্বাভাবী ব্যর্থতা, নিদারুণ নৈরাশ্য। মৃত্যুশয্যায় তিনি লিখেছিলেন “একা আসিয়াছিলাম, একাই চলিয়া বাইতেছি। আমি বুঝিতে পারিলাম না, কে আমি, কেন আসিয়াছিলাম, কি কাজ করিলাম—”

পক্ষান্তরে, চিরনবীন আকবরের জীবনে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক আদর্শবাহিনীর সাক্ষাৎ পাই। রাষ্ট্রের জন্ত কি করা উচিত তার সন্ধান তিনি কোন শাস্ত্রবাক্যে করতেন না, তার সন্ধান তিনি করতেন, নিজের পরিচ্ছন্ন অন্তরের উজ্জ্বল লিপিকায়; বিধিনিষেধের সন্ধান তিনি অতীত যুগের কোন শাস্ত্রব্যবস্থায়

করতেন না, তার সন্ধান তিনি করতেন, যুগের জীবন্ত প্রয়োজনের মধ্যে, যুগের কোলাহলময় দাবীর মধ্যে; সমাজজীবন, ব্যক্তিগত জীবন, রাষ্ট্র জীবন কি চায়, তার জন্ত তিনি অতীতের সমস্তার দিকে, অতীতের ব্যবহার দিকে দেখতেন না; তার জন্ত তিনি দেখতেন, বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখ-দুঃখের দিকে, তাদের অভাবের দিকে, তাদের অভিযোগের দিকে, তাদের অন্তরের চাহিদার দিকে। রাষ্ট্রকে তিনি নিজের ধর্মের কিংবা নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতেন না, তাকে তিনি সমগ্র দেশের, সর্ব ধর্মের, সর্ব সম্প্রদায়ের সামবায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতেন। সমর্থনের জন্ত প্রথমত: তিনি স্বধর্মের গৌড়া ধার্মিকদের কাছে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি এ সত্যটা বুঝে নিলে, যে, সমর্থন তিনি উচ্চাঙ্গভূতিহীন জড় প্রকৃতির আচারপন্থীদের কাছ থেকে কখনও পাবেন না; সমর্থন তিনি পাবেন, ভবিষ্যৎমুখী, উদারপন্থী, জীবন্ততত্ত্বময় লোকদের কাছ থেকে। আকবর এই শেবোক্ত শ্রেণীর লোক নিয়েই নিজের দল গঠন করলেন। দেশময় উৎসাহ এবং উদ্দীপনা এসে দেখা দিল। উপযুক্ত নেতার অধীনে প্রগতি-পন্থীদের সামবায়িক শক্তি সর্বজরী হয়ে উঠল। জাতীয়তার আদর্শ ভারতবর্ষে সর্গোব পেতে শুরু হল। চিরকালের তবে ভারতের এক আদর্শ যুগ রচিত হল—আদর্শ একজন নায়কের নেতৃত্বে। [ক্রমঃ]

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপভাগ)

(ছয়)

জীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কালো একখানা মেঘের মতো মুখ নিয়ে বিশ্বনাথ ফিবলেন। কাছাকাছি থেকে খবর নিয়ে ওনলেন ব্যোমকেশ এখনো আসেনি।

জমাাদার বললে, ম্যানেজার বাবুকে ডেকে আনব হজুর?

—থাক, দরকার নেই।

দেউড়ি পেরিয়ে, রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার ভাড়া রংমহল ছাড়িয়ে অন্ত:পুরের দিকে পা' বাড়ালেন বিশ্বনাথ। অন্ত:পুরের এই একটা জীবন—যা বিশ্বনাথের প্রায়ই মনে পড়ে না এবং বিশ্বনাথকে দেখেও মনে পড়ে না কারো। বরেন্দ্রভূমির রুদ্ধ বিস্তৃত মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়ার মতো যার ঘোড়া উড়ে যায়, আর বেসে ঘোড়ার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে যার মন, অন্ত:পুরেব একটা নিভৃত পরিবেশের আর প্রগাঢ় একটা বিশ্রান্তির মধ্যে তাকে যেন ভাবা চলে না। কাল থেকে মহাকাল পেরিয়ে চলে ক্রান্তিহীন পৃথিবী—চলে জীবন। ঘুমিয়ে পড়বার সময় নেই তার। কিন্তু বিশ্বনাথের জীবন কি পৃথিবীর মতো নিরন্তর—অথবা শূন্যলিত তার কল্পপথের সীমানা? সে জীবন উদ্ধার মতো—লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা আগ্নেয় তীরের মতো—মৃত্যুর অতলতায় যার নির্বাণ।

তবু রক্তমঞ্চের নেপথ্যে আছে অন্ত:পুর। আর সেখানে আছেন অপর্ণা।

আফ্রিকার কালো সিংহের মতো উগ্রধোঁবনা ওঁরাও মেরেদের বাহুবন্ধনে জড়িয়ে রাশির নেশা ধনীভূত হয়ে ওঠে। দেহ-বসনায় বাঁধাভাড়া বস্তা। কিন্তু এমনও সময় আসে, যখন বস্তার জল

খিতিয়ে ঘরে যায়, পঙ্কলিগুণ দেহমন মাঝে মাঝে কী একটা দাবী করে অসহায় প্রাপ্তিতে। তখন অপর্ণাকে মনে পড়ে যায়।

অপর্ণা কিন্তু অভিযোগ করেন না অমুযোগ করেন না কখনো। কলকাতায় এবং কলেজে নাগরিক জীবন কাটিয়ে ঘটনাচক্রে তিনি রায়বর্মাদের কুলবধু হয়েছেন—নি:সঙ্গ অন্ত:পুরে তাঁব একাকী দিন কাটে। বিয়ের পরেই টের পেয়েছিলেন অপর্ণা—এ তাঁব ককাল-বাসব। এখানে প্রাণ নেই, এখানে ছন্দ নেই—এখানকার জীর্ণরিক্ত প্রাসাদে প্রাসাদে শুধু মৃত অতীতের প্রেতচ্ছায়া। আর স্বামী! অপর্ণা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীর সমালোচনাব অধিকার তাঁর নেই।

বিশ্বনাথ যখন অন্ত:পুরে ঢুকলেন, তখন অপর্ণা কি একখানা বই পড়ছিলেন।

বিশ্বনাথ অন্ত:পুরের ঘরটার দিকে ভালো করে তাকালেন। আশ্চর্য, এই ক' মাসেব মধ্যেই রাশি রাশি বই কিনেছে অপর্ণা। টেবিলে, শেল্ফে, বিছানার ওপর অসংখ্য বই ছড়ানো। এত কী পড়ে অপর্ণা, এত পড়তে কেমন করে ভালো লাগে!

বিশ্বনাথ এগিয়ে এলেন—আন্তে একখানা হাত রাখলেন অপর্ণার কাঁধের ওপর। চমকে মুখ তুলে তাকালেন অপর্ণা, লুটিয়ে পড়া আঁচলটাকে বুকে তুলে নিলেন, তারপর বললেন, কে, কুমার-বাহাদুর? এতদিন পাবে কি দাসীকে মনে পড়ল?

বিশ্বনাথ কথাটাকে মনে করলেন চমৎকার রসিকতা। আকর্ষণ

বিশীর্ণ খানিকটা হাসিতে তাঁর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অপর্ণা অল্পভব করলেন, শরীরে ও মনে আশ্চর্যিক শক্তি থাকলেও বিশ্বনাথ কি অস্বাভাবিক স্থূল—কি অশোভন পরিমাণে অস্বাস্থ্যকৃত। উঁচু উঁচু দাঁতগুলো উদ্ভাসিত হয়ে যায়, গলা পর্যন্ত দেখা যায় মোটা জিতটাকে—চোখ দুটোকে কী পরিমাণে ঘোরা আর দীপ্তিহীন দেখা যায়।

বিশ্বনাথ প্রশ্নমুখে বললেন, কী বললে? দাসীকে? তুমি তো বেশ কথা শিখেছ অপর্ণা—হেঃ—হেঃ—হেঃ।

অপর্ণা বললেন, হঠাৎ এই অনুগ্রহ কেন? কোনো আদেশ আছে?

বিশ্বনাথ আবার হেসে উঠলেন, হেঃ—হেঃ—হেঃ। তাবপর কোঁচবে ওপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন অপর্ণার পাশেই। অপর্ণা বোম্বাঙ্কিত হয়ে উঠলেন না, সরেও গেলেন না। জীবন-সম্পর্কে তাঁর একটা নিবেদ এসেছে।

লোনুপভাবে অপর্ণার গুণগোল স্তম্ভব শুভ্র একখানি হাত নিজের হাতে টেনে আনলেন বিশ্বনাথ। বললেন, তুমি অমন ছাপার হরফে কথা কোয়ো না অপর্ণা, ভালো বুঝতে পারি না। আমরা চাষাভুষো মানুষ—লেখাপড়া জানিনে।

এটা বিশ্বনাথের বিনয়—বৈষ্ণবী ধরণের বিনয়। বাজকুমার কলেজে এক সময়ে তিনি বছর পাঁচেক পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। পাশ করবার জন্তে অবশ্য মনের দিক থেকে তাঁর কোনো জোরালো তাগিদও ছিল না। তাই বলে বিশ্বনাথ সত্যিই নিজের সপক্ষে এমন দৈজ্ঞ পোষণ করেন না। দেবীকোট রাজবংশ নিজেদের ছোট বলে মনে করতে জানে না—এটাকে স্ত্রীর সঙ্গে যৎসামান্য বসিকতা বলেই মনে নেওয়া উচিত।

—কী পড়ছিলে?

—বই একখানা।

—বই তো বটে, কিন্তু কী বই? উপজ্ঞাস না কি?

গভীর বিষয়ে বিশ্বনাথ স্ত্রীর মুখেব দিকে তাকালেন।—উপজ্ঞাস নয়? তবে কি ধর্মের বই পড়ছিলে! গীতা? ভাগবত? কংসবধ?

—না, তাও নয়।

—তাও নয়? তবে কী বই?—বিশ্বনাথের বিষয় ঘনীভূত হল। উপজ্ঞাস নয়, ধর্মের বই নয়, তবে আব কি পড়বাব থাকতে পারে ছুনিয়ায়? বিশ্বনাথ নিজে অবশ্য কিছুই পড়েন না, কিন্তু তাই বলে কোন খবরও তিনি রাখেন না না কি? উপজ্ঞাস আর ধর্মের বই বাদ দিলে মাত্র দুটো জিনিস বইল সংসারে—খবরের কাগজ আর হোমিওপ্যাথি।

—দেখি, দেখি বইখানা—হাত বাড়িয়ে বিশ্বনাথ অপর্ণার কোলের ওপর থেকে বইখানা নিয়ে এলেন। ওঃ বাবা, এ যে ইংরেজি। অপর্ণা কলেজে পড়েছে বটে, তাই বলে ইংরেজি বই পড়েও সে রস পায়। বিশ্বনাথ একবার সশ্রদ্ধ অভ্যস্তে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর বইয়ের লাল রঙের মলাটটির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—এ যে মস্ত দাড়িওয়ালা মাথা একটা। কার ছবি? রবি ঠাকুরের না কি?

অপর্ণার চাপা ঠোঁটের কোণ দুটো সামান্য একটু বিজ্জুরিত হল মাত্র। মুহূর্তে অপর্ণা জবাব দিলেন—না, রবি ঠাকুরের নয়।

—তবে, তবে কার?—বিশ্বনাথ এবার বানান করে বইয়ের নামটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন : প্রিন্, প্রিন্, প্রিন্ কাই-পনেস্ সফ্ মাৰ্—মাৰ্—এম্—আই—এস্—

অপর্ণা রক্ষা করলেন স্বামীকে। বললেন, থাক্, এই বেলা দুটোর সময় আব তোমাকে এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে না। এখন দয়াকিবে স্বান করতে যাও।

কথা নেই, বাতী নেই, বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ দপ দপ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খেন মনে পড়ে গেল সোণাদীঘির মেলার কথা, মনে পড়ল লাল হাবশরণের কথা, মনে পড়ল চারদিক থেকে আসন্নপ্রায় দুর্দিন আব দুর্গতির কথা। চরম অসম্মানের মধ্যে সব হারিয়ে যেতে চলেছে, তলিয়ে যেতে চলেছে দেবীকোট রাজবংশের এই ঐশ্বর্য্য—এই প্রতাপ। আর সমস্ত অপমানের মধ্যে অপর্ণাও আজ শূন্য মিলিয়েছে, বিশ্বনাথ মুখ, ইংরেজি পড়বার যোগ্যতা তাঁর নেই, এ সত্য কি তাঁর স্ত্রীও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আশ্চর্য্য, বিশ্বনাথ কি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর মাথাব ওপর ধারালো একখানা খড়্গ যে-কোনো সময়ে নেমে পড়বার জন্তে উদ্ভত হয়ে আছে? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর যথাসকল নিঃশেষে আত্মসাৎ করবার জন্তে সাপের মতো প্যাচ কষছেন লালাজী? আর মাত্র দু'ঘণ্টা আগেই তিনি রূপাপুরের কামারদের উদ্ভুদ্ধ করে এসেছেন—ভাঙতে হবে সোণাদীঘির মেলা—লাঠির মুখে ভেঙ্গে ছত্রাকার কবে দিতে হবে এবার। দেখা যাবে, ওই মেলা থেকে কত টাকা কুড়িয়ে নিতে পারে লাল হাবশরণ?

অন্তঃপুবে আসা মাত্র অপর্ণাকে দেখে তিনি কি সব ভুলে গিয়েছিলেন? তাঁর মন কি আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্তে? তাই অপর্ণার কাছ থেকে এই অবজ্ঞা—এই পুরস্কার! বিশ্বনাথ বেবিয়ে গেলেন ঘব থেকে।

বিশ্বনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন অপর্ণা। সবিষ্ময়ে বললেন, এখন আবাব কোথায় চললে? থাকে না, স্বান করবে না?

বিশ্বনাথ জবাব দিলেন না। অপর্ণা নীচবে দাঁড়িয়ে রইলেন, শুনতে পেলেন সিঁড়ি দিয়ে উদ্ভত পদধ্বনি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কাছাবীর দিকে পা বাড়াতোই মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—একটা লোক দেখা করতে চান্স হুজুর।

—কে?

—আল্কাপের দলের লোক—কী একটা জরুরি কথা বলবে।

—জরুরি কথা?—বিশ্বনাথ অকুণ্ঠিত করে বললেন, ডেকে নিয়ে এসো।

জরুরি কথা, জরুরি কথা। বিশ্বনাথের মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে যেন শব্দ দুটো অহরহন জাগাতে লাগলো। তাঁর জীবনের নির্ভতি নেই, নিঃসঙ্গতা নেই, অন্তঃপুরের জীবনে তাঁর সান্ধনা নেই—সেখানে অপর্ণাও তাঁকে ব্যঙ্গ করে। জীবনের স্রোত কোথাও তো থেমে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে পারে না, তাকে চলতে হয় অবিরাম—সংঘাতে সংকুল, তরঙ্গে ফেনিল। [ক্রমশঃ]

নারীর কর্তব্য

শ্রীমতী প্রতিভা বোস

সৃষ্টির প্রধান প্রত্যয়ে অগতির আদি পিতার সন্ত বিকশিত দৃষ্টি তাঁহার পার্শ্ববর্তীটির অঘেবণেই চকল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর সেই সম্মিলিত দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল নিখিল জ্বনের অনন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার। বিধাতা পাঠাইয়াছিলেন এাপ এবং সেই শ্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে উত্তম, বোধ, আকাঙ্ক্ষা শক্তি কোন কিছু দিতেই তিনি কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু দেখিলেন যে তাঁহার সেই দান এাপকে আতিথ্য দান করিতে পারে না, সৃষ্টিক কলচূড় গ্রহের মত উদ্যম করিয়া তোলে। তাই তিনি এাপের আতিথ্য লইয়া পাঠাইলেন নারীকে। নারীর প্রথমা প্রতিমা ও মানব-সম্ভাবনের মাতারূপে ইত্ন দিলেন তখন দেখা। ভগবানের দানের আদেশ মাথায় লইয়া নারী আসিয়াছে, তাই অগতে তাহার দানের শ্রোত চকুল প্রাণিয়া ছুটিতেছে, ছুটিবেও।—

‘দিলে তুমি দিলে, শুধু দিলে
কত পলে পলে তিলে তিলে
কত অকস্মাৎ বিপুল প্রাণে
দানের আবেণ—

* *
দানের রতন—লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
অবত্বে হেলায় *

আলস্যের ভরে ফেলে গেছি ভাষা করে
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে।”

এ দানপাত্র অবাধপিতৃদত্তা হুপ্রিয়র ভিক্ষালব বস্ততে পরিপূর্ণ নর, এ পূর্ণ আপন অন্তরের উজ্জ্বল মহিমায়।

পুরুষের মতে নারী তিরদিনই বৈচিত্র্যময়ী, রস্ভময়ী। কবি ও দার্শনিকের দল বহু চিন্তাত্তেও নারী-চরিত্রের তল পান নাই। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেও বাহির হইয়াছে, “নারীকে কে চিনিতে পারে।” কিন্তু নারী যতো বড় সমস্ভাই হটক না কেন, পুরুষ নারীকে কখনও বর্জন করিয়া চটিতে পারে নাই, পারিবেও না। বিধাতা কেবলমাত্র আপন খেয়াল চরিতার্থ করিতেই ইতের সৃষ্টি করেন নাই।

সমস্ত পুণ্যী ব্যাপিলা যে সম্ভাত ও আচার-ব্যবহারের শ্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই দেখা বাইবে যে, এই ধারায় মিশ্রিত রহিয়াছে পুরুষের শক্তির সহিত নারীর স্নেহ-মমতা, পুরুষের বুদ্ধির সহিত নারীর বোধ, করুণা। কর্ণের ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রঙ্গের ক্ষেত্রে, সকল স্থানেই দেখি যে, নারীর এই মাধুর্যই পুরুষের শক্তির প্রধান উৎস।

কিন্তু পরোক্ষভাবে এ দানেই নারীর কর্তব্য সূচায় নাই। পুরুষের সমশক্তি লইয়াও স্থানে স্থানে কুটরা উঠিয়াছে। পুরুষের শক্তি লইয়া নারীর এইরূপ একাণ আশ্রয় বহুস্থানে দেখিয়াছি। ভাস্কর্য্যচাৰ্য্য আৰ্ঘ্যভট যে শতশ্রদ্বর্ণনে আজ এইরূপ মহান খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, খনা, নীলাবতী কিসে শক্তি তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম একাণ করিয়াছেন? প্রতাপাদিত্য ও আকবরের মত সম্ভাত দেখাইবার বিরাট ক্ষেত্র লাভ করেন নাই বলিয়াই কি রাণী ভবানী ও অলম্বাবাই তাঁহাদের তুলনায় শীনশক্তি-বিশিষ্ট ছিলেন? স্বয়ং বোধবানু রামের অনাৰ্য্য জাতির সহিত যুদ্ধের তুলনায় সংহার-সম্পন্নহীন বেহলার প্রতিকুল অবহার মধ্য দিয়া যাত্রা কি মান হইয়া উঠে? প্রতেশ কেবলমাত্র ইহাই যে একের শক্তি বাহর, অপরের শক্তি অন্তরের। এ শক্তির খেলায় বৃহৎ ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিই, আমাদের সংসারের খল-পরিদঃ ক্ষেত্রেও কতরূপেই না ইহার অমোঘ প্রভাব দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের ‘দুইবোনে’ যেখিয়াছি নারীকে তিনি দুই দলে ভাগ করিয়া বসন্ত ও বর্ষা এই দুই ঋতুর সহিত তুলনা দিয়াছেন। ইন্দ্রধনুঃ রঙের রঙ্গীন

বসন্ত দেয় দেখা, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে আগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। শীতের নিম্নীতল অন্ধ হইতে নবশিক্তি এাপে প্রকৃতি আশ্রিয়া গুঠে। নবীন সম্ভার সম্মিত হইয়া রঙ্গীন বেশার মাতাল হইয়া গুঠে। নারী-প্রকৃতিতেও বসন্তের জায় এক অমোঘ প্রভাব আছে, বাহা পুরুষকে নিমেষেই উদ্বীণ করিয়া তুলিতে পারে। প্রকৃতি কোন্-পাখীর সঙ্গীতে এাপনয় হইয়া উঠিবে, তাহা যেহুপ বসন্তের অজানা নয়, পুরুষের হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে তাহা তালে তালে বাজিয়া উঠিবে তাহাও সেইরূপ নারীর অজানা থাকে না। আর যে নারীর উপমা বর্ষাকত্ব সে আপনাকে একাশিত করে আর-একরূপে। বর্ষার নবীন বারিধারার জায় উর্দ্ধ হইতে আপনকে বিস্মিত করিয়া “গ্রামল বেঘের দ্বিদ্ধ প্রসাদ” বর্ষণ করিয়া জীবনকে সে কলে শস্তে হৃদয় করিয়া তোলে। বনস্পতির পাতায় পাতায় সঙ্গীভার যে সবুজ বর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র নব দুর্বাদলেও সেই কর্ণেই লেখা পড়ে।

“একজন

উচ্চহাস্ত-অগ্নিঃসে কাল্জনের হুয়াপাত ভরি

নিয়ে যায় এাপমন হরি -

আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
দ্বিদ্ধ বাসনায়।

হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতার।”

একজনের অন্তরের ইচ্ছা বিদ্রোহের চকল সৌন্দর্য্য, আর একজনের অন্তরের কথা কল্যাণের শঙ্কুশ্রী।

এ সংসারে এ দুইয়েরই আবশ্যক আছে। প্রকৃতিতে স্বভাবৈচিত্র্য না থাকিলে তাহা যেহুপ নিরানন্দ ও মান হইয়া উঠিত, নারী-চরিত্রেও এই বৈচিত্র্য না থাকিলে তাহা সংসারকে আনন্দ দিতে পারিত না। একটানা শ্রোতে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “দুই বোনে” শশাঙ্কর জী শর্ম্মলাকে বর্ষাকত্বের সহিত উপমা দিয়াছেন, আর উর্দ্ধলাকে ফেলিয়াছেন বসন্তের দলে। কিন্তু শর্ম্মলায় সেই নিকট, সেবাময়ী শান্তচরিত্রের মধ্য দিয়াও শশাঙ্ককে আনন্দ দিবার, তাহাকে উদ্বীণ করিবার প্রয়াসকারী মূর্ত্তি মাঝে মাঝে বসন্তের সাজসজ্জা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। শর্ম্মলা সকল হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার দিক হইতে চোঁটার কোন ক্রৌ হয় নাই। তাহার সেই অক্সান্ত বর্ষার শান্তসৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে উর্দ্ধলার বাসন্তী মূর্ত্তিও তাই দেখা উর্কি দিবার চোঁটা করিতেছে। আর উর্দ্ধলার মধ্যে শর্ম্মলার যে একাণ তাহাকে ঝুঁকিয়া বাহির করিতে কাহারও বোন কট হয় না। এই বর্ষা ও বসন্ত নারীচরিত্রে সমভাবে বিরাজমান। সৃষ্টিকর্তার এ এক অপূর্ণ কোণশ।

নারীর মধ্যে আর একটা রূপও কুটরা উঠা উচিত। ইহাকে যদি স্বভূর সহিত তুলনা দিতে হয় তাহা হইলে নিদাঘ ব্যতীত অপর কিছুই সহিত বেগরা চলে না। এ নিদাঘের প্রচণ্ড গৌহ্রতাপে ভূমি চৌচির হইয়া যায়, মেরুপ্রদেশের তুহিনীতলতা বৃহত্তর উত্তপ্ত হইয়া গুঠে। জীল্যাবীর হৃদয়ের এই তাপ একদিন অপমানিত, ক্রান্ত কলঙ্কিত মারাঠাজাতিক আহত জগ্নির জায় উদ্বীণ করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা বিলম্বণ করিয়া ঐতিহাসিক গোলাইয়াছেন যে, নারীর সামান্ত ক্রোধের তাপে কত রাজা ভয়মান হইয়া গিয়াছে, কত সৈন্ত মরণার্থে ডুবিয়া গিয়াছে। এ তাপ সামান্ত নয়। প্রকৃতক্রে গ্রীষ্মের তাপ, বর্ষার দান, বসন্তের আনন্দ যেহুপ পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, নারী-হৃদয়কেও এই ভাবগুলি সেই-রূপ হৃদয় করিয়া তোলে। স্থাব, কাল, পাত্রভেদে বর্ণবর্ণা বর্ণ বর্ণ কুটরা উঠে। আমাদের শাস্ত্রকার নারীর দশরূপ করুনা করিয়াছেন। নিখিল বিধে একবার কুটপাত করিলে, এ করুনা যে কত সত্য তাহা

উপলব্ধি করিতে পারিব। মাতৃরূপে নারী আত্মদান করিতেছে, ভগ্নীরূপে স্নেহ বিতরণ করিতেছে, কালভৈরবীরূপে ক্রোধের ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়াছে, পত্নীরূপে শক্তিসংকার করিতেছে, কভারূপে চিন্তের ভাঙার উন্মুক্ত করিয়া সেবা করিতেছে।

নারীজীবনের একটা প্রধান কথাও এই “সেবা”। সেবার আত্মদান করিয়া নারী আজ যে মহান সার্থকতা লাভ করিয়াছে, আর কোন পথে সে তাহা করিতে পারে নাই। “বাকী”তে পড়িয়াছি পুরুষ শূন্য হস্তে জগৎকে দেখাইয়া সর্গকে বলে—“আমি কপ্তের চক্র”। আর নারীর সেবার হস্তের কপ্তের বৃত্ত শব্দ তাহার অন্তরের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া জগৎকে জানায় “আমি সেবার বৃত্তী”। কিন্তু জয় কাহার? ঈশ্বরের এক হস্তের বিপণায় হইতে রোগ, শোক, যন্ত্রণা প্রভৃতি পৃথিবীর বুকে অগ্নিয়া পড়িতেছে, আর অপর হস্তের অমৃতময় আর হইতে নারীর জীবনধারা গলিয়া করিয়া ধরার বক্ষে প্রবাহিত হইতেছে। আপন অন্তরই তাহার পথপ্রদর্শক ভগ্নীরূপ। তিলে তিলে বিকাশের আত্মদানে কুল কুল আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া, দুই তীরকে সেবার অমৃতময় বায়ুদিক্কে স্নিগ্ধ করিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়াই এই ধারার ধর্ম। এই শ্রোতধারার তীরের একটা ক্ষুদ্র বালুকণা উদ্ভূত হইলেও তাহাকে আপন স্নেহোদিকে অভিযুক্ত করিয়া শীতল করিয়া তোলাই তাহার কর্তব্য। হস্ততার স্নেহময়ী সেবাপরায়ণা মুক্তি, তাহার শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না করিয়া ভক্তান্ত সেবা এ স্থানে যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ফ্রায়েন্স নাইটজেলকে পাশ্চাত্য ভগ্ন যে মহান স্থানে আসন দিয়াছে, আর কোন নারী তত্ত্ব কোন গুণে সে স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন?

সকলের বক্ষেই স্নেহ, দয়া, মায়ী, প্রেম স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পুঞ্জীভূত করিয়া রাখার মধ্যেও সার্থকতা নাই—সার্থকতা—সন্তানের নিমিত্ত স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃহস্তের পীড়বধারার অবিরলভাবে করণে। হস্ততার ভক্তান্ত সেবার স্মৃতিচিহ্ন যখন আপত্তি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছিল “আমার স্বপ্ন আমি পালন করিব না?” কিন্তু সেই স্বপ্ন কি? তাহার উত্তরও তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাই

“আমরা নারী—বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু-মিত্র নাই
বরিবার ধারাসম অচেন্ত জননীপ্রেম
ঢালিয়া চল যাই।”

এ বর্ষ “রাজার প্রসাদ হইতে দীনের বৃট্টরে” সর্বত্র সমানভাবে পালনীয়। এই “সেবা”র সহিতই আর এতটা ধর্ম নারীজীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহা “ত্যাগ”। বহু শতাব্দী পূর্বে আমাদের পুরুষপুরুষ অধিগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের ও তাহাদের পুত্রের নারীগণের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল ‘ত্যাগ’। এ ভারতভূমি সে ত্যাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভোগের উপর নহে। কিন্তু ত্যাগের সে চির আজ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। আজ চতুর্দিকেই আপন আপন অধিকার বজার রাখিবার কি দুর্দম বাসনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, সকল ক্ষেত্রে হইতেই যেন ত্যাগের আদর্শ চিরতরে বিদায় লইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার এতটা ক্ষণধারা আজও অক্ষয়সলিলা বস্তুর জায় নারীটিতে অবহমানা হইয়া রহিয়াছে। অতিশক্তিশালী বৃদ্ধ বর্ষক্ষেত্রের কথা না হয় বুঝেই রহিল, অশক্তিতা অক্ষয়পুরোহিতী সামান্য নারীর মধ্যেও ত্যাগের এই ছবি কি পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে জানে না ত্যাগ কাহাকে বলে, ত্যাগ যে কত মহান, কত সাধুজীবন কাহাও তাহার অজ্ঞাত, তথাপি এই ত্যাগের কথা বিবাহ

সংসার-ভরণী চালাইয়া আপন কর্তব্য সে সম্পাদন করে। তাহার সে ত্যাগ পূর্ণতা লইয়াই তাহার নিকট ধরা দেয়।

নারী আর এক মুষ্টিতে জগৎকে আপন পরিচয় দেয়। সে মুষ্টি জননীর। কিন্তু জননীর এ মুষ্টি কেবলমাত্র স্নেহকাতরা প্রতিমাই নয়। আমাদের জগজ্জননীর যে কত রূপ। এসময় দৃষ্টি হইতে স্নেহ বাড়িয়া পড়িতেছে, বিন্দু হস্ত বরাত্তর দান করিতেছে, অপর দিকে দশভুজার দশপ্রহরণ চক্ষু মলসাইয়া দিতেছে, হাতের ত্রিশূলের সূচ্যগ্রভাগ পাগাচরী অস্থিরের বক্ষস্থল ধেব করিয়া মুক্তিককে শোণিতসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইত আমাদের নারীর আদর্শ। এই আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া, এই মুষ্টিতে যিনি সন্তানের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহার সন্তানই একদিন জগতে সর্বপরিচিতি হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সমগ্র মারাত্মকতা একদিন যাহার দত্ত মহামন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শিবাজীকে তাহার মাতার অন্তরের নারীশ্রুতি ভিন্ন আর কে পড়িয়া তুলিয়াছিল? অসংখ্য সন্তান নিত্য জন্মগ্রহণ করিতেছে, অচেন্ত মাতাও তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন, কিন্তু বিভাসাগরের স্তায় সন্তান কল্পন মথিলা জগৎকে দান করিতে পারিয়াছেন? বিভাসাগরের নামে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ শ্রদ্ধার অবনত হয়, কিন্তু তাহার ভাবের পশ্চাতে মাতার যে বিরাট অনুশ্রাবণ ছিল, যে সর্বক যে বর্ষবাপরায়ণ, সে স্নেহকাতর ছন্দ ছিল, তাহার পরিমাণ করিবে কে? নেপোলিয়ানের জীবনের প্রান্ত পদক্ষেপে তাহার মাতার প্রভাব চাক্ষুস্ম-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার জীবনের প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। “Hann that rocks the cradle rules the nation” এ সত্য তাহার জীবনে যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর কাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে?

ভারতবর্ষ আজ বয়স্ক চাহতেছে। দেশ সেবকগণের ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনিতে আজ চতুর্দিক কাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু দেশমাতার অকলের প্রোক্ত-বৃত্তও তাহার ধীরে পায়িতেন না। কেন? দেশের মাতাদের বাদ দিয়া বহুনাশিত দেশমাতার কল্পিত চরণ বন্দনার নিশ্চয় চর্চা চলিতেছে, তাই দেশমাতাও আজ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অজানতা ও কুসংস্কারের বন্ধনে আজ অসংখ্য মাতা শূন্য লত। তাহাদিগকে মুক্তি না দিলে দেশমাতার শূন্যলব্ধ পদম্বর কোনরূপে মুক্ত হইবে না। কোনরূপেই নয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“এ অত্যাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।” কিন্তু সেই জ্ঞানের আলোতে আজ পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকার বেশী—অনেক বেশী। কারণ পুরুষ সৃষ্টি নারীর হাতে—পুরুষের হাতে নয়। এ জ্ঞান আহরণ করা নারীর তাই প্রধান কর্তব্য। জাতির ভবিষ্যৎ যে তাহার হাতে।

কিন্তু নারীর এই শক্তির মূল্য কেবল মাত্র তাহার সন্তান পঠনের ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হইবেনা। তাহার আপন শক্তিকে সে আপন কাজে লাগাইয়াও সার্থক করিয়া তুলিবে। এ স্থানে বেহলার আদর্শ এক অলভ্য দৃষ্টান্ত। নারীর বহু যতনানি শক্তি ধারণ করিতে পারে অতিক্রম্য বিন্দুকে তাহার ভতথানি শক্তিকেই কাধে গ্রহণ করিয়া বেহলা মহারসী হইয়া উঠিয়াছিল। নারীর বাহুর এ শক্তি যেন পুরুষের বোধের মানবও। আমাদের উপাত্ত দেবতার এক হস্তে হিত গম্য, আর এক হস্তে ধৃত গদা। এই পদ্যই এই গদ্যকে পূর্ণতা দেয়।

শ্রীজ্ঞানমতৃকের দান জগতে অতুল। কিন্তু এ দানের পশ্চাতে রাণী রাসবিণ্ড ও যোগেশ্বরী তৈরবী-ব্রাহ্মণীর প্রভাব যে কত বৃহৎ তাহা নির্ধারণ করিবে কে? মহাভারতে দ্রৌণীদেবীর দানও কত কম নয়। পক্ষ পাণ্ডবকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন ত তিনিই। এই পক্ষজনের মধ্যে কখন যে যত্নময় হইয়া তিনি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াও মুষ্টিতে পারি না, অথচ এই দ্রৌণীকে বাদ দিয়া মহাভারত দেখিতে গেলে তাহালাল্যাকী থাকেই বা কতটুকু?

জীবনের ক্ষেত্রে পুরুষ পরামর্শ পায় নারীর নিকটে। কোন স্থানে আবাস্ত পাইলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসে তাহার পাশে। নারীও আপন করের কোমল স্পর্শে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া তোলে, তাহার ক্ষতে প্রলেপ লাগায়। এই কল্যাণী মূর্তিও পুরুষের জীবনের একটা দিককে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। নারীর প্রভাব পুরুষের উপর সানাতন নয়। নারীর মুখের একটা কথা পুরুষের জীবনকে কিরণ আনুল পরিবর্তিত করিতে পারে ‘বিষমঙ্গল’ই তাহার প্রধান নিদর্শন।

মানুষবাহ্নেই তুলের বশবর্তী, পুরুষ ও তুল করে, নারীও তুল করে। নারীর তুল পুরুষ চিরকাল সংশোধন করিয়া আসিয়াছে। এই প্রথা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে নারীরও পুরুষকে সংশোধন করিবার পূর্ণ অধিকার আসিয়াছে, সীতা রামচন্দ্রের কোন ভুল দেখিয়াছিলেন কিনা জানি না কিন্তু একথা বলিতে পারি যে কোন ভুল দেখিলে তিনি তাহা সংশোধন করিবার বিলম্ব না চেষ্টাও করিতেন না। কিন্তু বর্তমানে সে সীতা ও সে রামের যুগ নয়। পুরুষের আদর্শ আজ পরিবর্তিত; নারীর আদর্শও তাই। আজ বহুজগতের নিত্য নব চিত্র দর্শনে মনে হয় বর্তমান যুগের পুরুষের অন্তরে এতখানি শক্তি নাই যে সে আপনাকে হৃৎসংবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। নিভূর্ণ ভাবে কাজ করিতে পারে। তাই নারীকে আজ পুরুষের তুল সংশোধন করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। মুহূর্তে পুরুষ উদ্ভাস হইয়া উঠে। তাহার নেশাকুটে মন সোমার গভী ছাড়াইয়া বেগে ধাবিত হয়, তখন নারী আসিয়া শাসন-রশ্মি আপন হাতে গ্রহণ করিয়া তাহার গতিকে প্রতিহত করিয়া তোলে। কিন্তু সে তুল করিয়াছে বলিয়া তাহাকে প্রতিহত করিয়াই রাখে না, গতিতে যতি নিশাইয়া তাহাকে শান্ত, স্থল্লর করিয়া তোলে। পুরুষের তুল সংশোধন করিয়া জগতে একজন নারী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যশোবন্ত সিংহের পত্নী রাণী বিষ্ণুমতী। সমুদ্র সমরে পরাজিত পতি যখন শৃগলের স্তার দুর্গধারে আসিয়া উপস্থিত, তখন রাণীর আদেশে দুর্গধার তাহার নিকট বন্ধ হইয়া গেল। কর্তব্যকে পরিহার করিয়া স্বামী করিয়া আসিয়াছেন, আর পত্নী তাহা স্বক্ষে দেখেছেন! তাই বীররাজ্য দৃষ্টকণ্ঠে বলিলেন, ‘কর্তব্য সাধন না করিয়া যিনি করিয়া আসেন তিনি আমার স্বামী নন।’ সে দৃঢ়বরে আপন তুল বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ ক্রমা প্রার্থনা করিয়া পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। নারীর এ মূর্তিও বর্তমান যুগে একান্তভাবে কাব্য। আমাদের গণেশজননী দুর্গা কেলমাত্রা শিবের অক্ষপারিনী নহেন। কখনও তিনি শিবের ঘরণী কখনও গৃহিণী, কখনও মহিষমর্দিনী, কখনও বা শিবের বক্ষোপরিবাহিণী। এই আত্মশক্তি জননীর অশ্রু করণে নারীকেও তাই কাব্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাইতে হইবে।

তুল সংশোধনের নারীর আর একটা পথও রহিয়াছে। তাহার গাভী-মর মৌনতাও এক ব্রহ্মত্ব। এই মৌনতার ঔরাসীত অনেক ভুলকে ঘিষণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক অগ্যাচারীর কুকর্মে উত্তত হস্তকেও শিথিল করিয়া দিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

“যখন ক্রমা করে তুমি

সব অভিমান ত্যজে,

কঠিন শাস্তি সে যে

কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহে।

সেই বড়ো দুঃসহ।

এই মৌনতার ভিতর দিয়া এতটুকু ভাপ কাছুর গারে না লাগিতে দিয়া বিশৃঙ্খল হুর করার ক্ষমতার প্রকাশও কম লাগেনা। এইরূপে আর এক-দিক দিয়াও তাহার শক্তি নামের ব্যর্থকতা ছুটিয়া উঠে।

নারীর আর একটা প্রধান কর্তব্য সকল অবস্থা র সহিত মানাইয়া চলা।

এ শক্তি কেবলমাত্র তাহারই আছে। ভিলে, ভিলে, অন্তরের স্নেহস্পন্দ ক্ষণে পিতামাতা কন্তাকে অভিযুক্ত করিয়া তাহাকে বড় করিয়া তোলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে শাস্তিবিধি অনুসারে তাহাদের তাহাকে অন্তের হাতে দান করিতে হয়। বিচ্ছেদের বেদনা লইয়া সেই কন্তা সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় অন্ত এক আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়া পড়ে। এক বৃক্ষের ফল উপড়াইয়া অন্ত বৃক্ষের শোভা বর্ধনের চেষ্টে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার মাথা যে কত অসহনীয়, তাহার কাঁকং পরিচর আমরা কবীন্দ্রের “বৃ”তেই পাই। কিন্তু তাহারই মধ্যে তাহাকে অপরের গৃহাবেষ্টনীর সহিত মানাইয়া চলিতে হয়। এ ক্ষেত্রে উপমা বেওয়ার কোন আবশ্যক নাই। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই। অন্তরে বাহিরে এইরূপ মানাইয়া চলা ত অনশস্তিবিগ্ণেষ্টের কাজ নয়। নারীর মধ্যে এই ক্ষমতা যে কিরণ আছে তাহা বন্ধনচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী”তেই সব্যাক উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দেবী চৌধুরাণীর নামে ইংগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত, তাহার অধীনে ছিল শত শত পাইক বরকলা। শ্রী সিংহাসনে বসিয়া সে তাহাদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিত—কত জাঁকজমক, কত আড়ম্বর! কিন্তু এই দেবী চৌধুরাণীই যখন প্রকৃষ্টরূপে সৌম্যে অন্ধাধস্তন টানিয়া ত্রৈলোক্যের গৃহলক্ষ্যরূপে দেখা দিল, তখন পাঠকসম্প্রদায়ের অনেককেই চকু কচলাইতে হইয়াছিল—‘এই সেই কি না!’ কোথার তাহার রাণীত্ব, কোথার বা প্রভুত্ব! একমনে সে গৃহকর্মে রত। প্রমত্তবদনে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার গ্রহণ কেবলমাত্র নারী শক্তিতেই সম্ভব, এবং তাহার প্রকাশও তাহার কর্তব্য। জগতে যে অবস্থাই আহুক না কেন, প্রমত্তবদনে তাহাকে গ্রহণ করিব, ইহাতে আমরা নীচু হইয়া পড়িব না—এশক্তি কেবল মাত্র আমাদেরই মধ্যে নিহিত আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা নারীকে বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—“চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।” সেকালের কাব্য এই নারীর রূপগুণের প্রশংসা পূর্ণ। সংস্কৃতকাব্য কেবলমাত্র মালাচন্দন বনিতা দিয়াই গঠিত, এবং বনিতার স্থানই তাহার মধ্যে প্রধান, মালাচন্দনের প্রয়োজন ত তাহার সৌন্দর্যগুণের নিমিত্ত। কালিদাসের মহাকাব্যে দেখিয়াছি নারীর এইরূপ ক্ষমতা ছিল, যে তাহার নুপুর-সঙ্গত পদের এক আঘাতে অশোকবৃক্ষের দেহ পুণ্ডরিকশিত হইয়া উঠিত, এবং পুরুষ সে পদকে পূজা করিতেও ইতস্ততঃ বোধ করিত না, কিন্তু আজ সেই মালাচন্দন দিয়া ঘেরা জগতে নারী থাকিতে চায় না। সে আদর্শও আজ তাহার আকাঙ্ক্ষিত নয়—কাব্যজগৎকে সে যথেষ্ট অসুপ্রেমণা যোগাইয়া আসিয়াছে, আজ সময় আসিয়াছে বাস্তব জগৎকে অসুপ্রেমণা যোগাইবার। সংস্কৃত কাব্যে প্রধান স্থান পাইয়াই সে সন্তুষ্ট নয়।

সে পদবলিত হইতেও চায় না, মাথার উঠিতেও চায় না। সে চায় সর্বক্ষেত্রে সমভাবে কাঁচা করিবার পূর্ণ অধিকার। নারীকে বাদ দিয়া ভারতের মুক্তি যুগ্মিতে যাওয়ার সে সুত্তির আলো আজ আলোয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাই নারীর মুক্তিই আজ সর্বোচ্চ কাব্য। কবি বলিয়াছেন,

“আন উবর দেশে প্রাণবন্তা ধারা

এস উবাধু কেনে ভাল আধার কারা—”

সেই উবার বেশেই আজ নারীকে আপনাকে প্রকাশ করিতে হইবে। এ জগতের উদ্ধার ক্ষেত্রে তাহারও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন ত তাহার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গৃহাবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সে প্রয়োজন বিস্তৃত, তাহার সৃষ্টির অন্তরের বাহিরে যে আলোকিত বৃহৎ পৃথিবী পড়িয়া আছে, সেইখানে—সেই নিখিল জগতে ‘জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের নানা সংযোগ সম্বন্ধে নানা প্রবর্তন’ বিধানবৎক জাগরিত করায়, উজ্জ্বল করার ও চেতনা দেওয়ার।

পট-পরিবর্তন (৭৪)

শহরের উপকণ্ঠস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামখানার মধ্যে এক সময়ে মিস্ত্ররাই ছিল সম্পদ পৃথক; কিন্তু বর্তমানে 'পাশা উলটগা' গিরাছে। নামটা অবশ্য এখনো আছে—বিত্তবাড়ী, কিন্তু বাড়ী বলিতে আর কিছুই নাই। এককালে অল্পের মহলের যে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষগুলিতে সকলে শয়ন করিত, এখন সেগুলি নিজেরাই মাথা শুষ্কিরা, পা-হাত-পা এলাইয়া, ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়াছে। তা' ছাড়া, বংশের মধ্যে এখন শয়ন করিবার লোকেরও অভাব। মাত্র দুইটি শ্রোণী এখন বর্তমান—জলধর আর শশধর। ইহারা সগোদর ভাই। জলধর জ্যেষ্ঠ, শশধর কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের বয়স ৪০; কনিষ্ঠ তাহার অপেক্ষা ৪৫ বৎসরের ছোট।

যদিও জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ জলধর ও শশধর তাহাদের জীবনে অনেক কিছুই করিয়াছে এবং অনেক কিছুই করে নাই। বাহা করে নাই, তাহার মধ্যে তিনটা জিনিস প্রধান। তাহারো লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই, বিবাহ করে নাই এবং চাকুরী বা কোনরূপ কার-করাবার করে নাই। পৈতৃক ভূসম্পত্তির বাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাই দুই ভ্রাতার ভাগ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেই একপ্রকার তাহাদের ভরণ-পোষণ চলিয়া যায়। হয় ত ইহাদের বেশ সজলেই চলিতে পারিত, যদি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া না ফেলিত। বর্তমানে গ্রামের বাড়িতে, রেললাইনের দুইধারে যে দুইখানি বড় বাগান আছে, তাহাই মাত্র ইহাদের ভরসা। বাগান দুইখানি হইতে বৎসরে প্রত্যেকের যে ৩০০,০০০ টাকা আয় হয়, তদ্বারাই কোনরূপে উভয়ের জীবিকা নির্বাহ হয়।

বার-বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরখানা ছিল হুশ্রুশ্রুত হলবরের মত। এই সখের ঘরখানার গিরনে বর্ষগত কর্তার বহু যত্ন এবং অর্থব্যয় করিয়াছিল; তাই ঘরখানায় নিমকহারামী না করিয়া তাহাদের এই দুই বংশধরকে অসময়ে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। ঘরের মাঝ বরাবর দেবদারু-স্তম্ভের একটা পাটসন দিয়া, শু-খারটার খাকিত—জলধর; এখারটার খাকিত—শশধর। পাটসনের মাঝখানে ছোট একটা দরজা বসানো ছিল। এই দরজাটা কখনো কখনো খোলা অবস্থায় থাকিয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্প্রতি যোষণা করিত; আর তালাবদ্ধ থাকিলেই বা বাইত, উভয়ের মধ্যে সাময়িক মনোবালিঙ্গ ঘটনা হইত।

সেদিন পাটসনের দরজা খোলা ছিল। জলধর ঘরের এককোণে ঠোঙে চায়ের জল গরম করিতে করিতে খোলা দরজার কাঁকে শশধরের দিকে চাহিয়া কহিল,...

কিন্তু আগে ইহাদের আকৃতি ও বসাবস্তু একটু পরিচয় না দিলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত বোলাটে থাকিয়া যাইতে পারে; হুতরাং সেটা শুধু আবশ্যকই নয়—অভ্যাবশ্যক।

দুই ভ্রাতার মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশী না থাকিলেও, দৈহিক গঠনের পার্থক্য খুব বেশী। জলধর স্বর্ষকায়, শশধর দৈর্ঘ্যে চুড়চুড় তিন ইঞ্চি। জলধরের দেহ বেশ মাংসল, কিন্তু শশধরের দেহ শুধু হাড়ল, অর্থাৎ জর্জ-শার্শ হাড়মাড়-সার। জলধরের গৌণ-বাড়ী কামানো, মাথার ক্যাগন-করা ছোট-বড় চুল টেরি কাটা; আর লম্বা-লম্বা চুল এবং গুচ্ছগ্রন্থের প্রাচুর্য্যে মেঘাবৃত শশধরেরই মত শশধরের বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত।

শশধর একটু সাব্বিক প্রকৃতির লোক। তাহার পরণে পেরুরা। জপ-ওপ সাধু-সন্ন্যাসী, দেহ-দেবীতে ভক্তি, গীতা-পাঠ, নিরামিষ আহার প্রভৃতি লইয়া তার দিন কাটে। জলধর ও-সবের ঘোর বিরোধী। জপ-ওপের খার খারে না, সাধু-সন্ন্যাসী ও পেরুরার উপর সে ভাবন চটা এবং মাছ মাংস পিঁজাজ ভিন না হইলে তাহার খাওয়াই হয় না।

আমাদের এই কথোপকথন বলিবার অবসরে জলধরের চায়ের জল গরম হইয়া উঠিল এবং তাহাতে এক চামচ চা দিয়া সে সাপসানের মধ্যে

মানলেটের ভিন দুইটা ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, “তুই বা বাস, ঐ ঘরে মাথুব কখনো বাচে! পেট ভরে মাছ-মাংস খা, একটু কিছু কাটু বায়ুশিরির ওপর থাক, তবে ত জীবনটা শ্বেষের হবে। সন্ন্যাসীর মতো ঐ তাবো দিন কাটানো মানে পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়।”

শশধর বোধ হয় এই সকালবেলাটির মনে মনে নান জপ করিতেছিল; দান্য এই অপ্রতীকর উপদেশবাণী শুনিয়া আর্জোক্ষুট উচ্চারণে শুধু কহিল, “নারায়ণ! নারায়ণ!”

চা ছাড়িতে ছাড়িতে জলধর কহিল, “আগে নিজের মধ্যে যে আত্ম-নারায়ণ আছে, ভাল খেয়ে পোয়ে তার তোরায় কর, তারপর বাইরের নারায়ণের ভজননা করি।” বলিয়া মাখন-দেওয়া একখণ্ড রুটি মুখে বেশিয়া চিবাঁইতে চিবাঁইতে কহিল, “ভগবানকে ডাকতে হয় ত. সাধা কাপড়ে ডাকলেই ত হয়, পেরুরার তেক না হোলে বুঝি হয় না?”

শশধর মনে মনে নাম-জপ করিলেও, কথোপকথন কানে তাহার বিষ ঢালিয়া দিল, তথাপি সে বিষ হ্রস্ব করিয়া সে তাহার কাজ করিয়া বাইতে লাগিল।

মানলেটটা মুখে দিয়া জলধর আবার কহিল—“সব সহ করতে পারি বাবা, পেরুরাখারো আর ততোমী কিছুতেই সহ করতে পারি না।”

এইবার শশধর আর চূপ করিয়া থাকিতে পারিল না; কৈস করিয়া বলিয়া উঠিল—“অসহ হয় ত, এদিকে আর চেও না; দরজাটা বন্ধ করে রাখলেই পার।” বলিয়া ক্রোধান্বিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শব্দ করিয়া পাটসনের দরজাটার শিকল ও তালা লাগাইয়া দিল।

তারপর তাহার আর অপে মন বলিল না। জলধর কিন্তু চা, টোট, মানলেট প্রভৃতি লইয়া হৃন্দরূপে তাহার কাজ মন বসাইয়া দিল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে ও-ঘরে ‘ব্রেক-ফাস্ট’ সারিবার পর জলধর একটা সিগারেট হাতে লইয়া গুন-গুন গান ধরিল—‘তোমার চিনেছি চিনেছি চিনেছি—ওগো বিদেশিনী’। সেই সময়ে এ-ঘরে বিশিন ব্রহ্মগায়ী নামে গেরুরা পরা এক সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া কহিলেন—“নারায়ণ! নারায়ণ! ভাল আছে বাবা?”

শশধর শশধর পাত্ৰোখান করিয়া সন্ন্যাসীর পাদদ্বলে প্রণাম করিল; কহিল—নারায়ণের অংশসমুত আত্মার কখনো অমঙ্গল আছে বাবা? তার ওপর আপনাদের কুপা এবং আশীর্বাদ।”

সন্ন্যাসী আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন—“কারো কুপা আশীর্বাদে কিছু হয় না, বাবা; নিজের পাঠে টিকিটের ভাড়া না থাকলে পাড়ীতে উঠবে কি করে। তাই নিজের পুঁজি চাই, তপস্বী চাই। সৃষ্টিকর্তাকেও এই জগৎ তপস্বীর দ্বারা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।”

ও-ঘরে তখন জলধর ‘বিদেশিনী’কে ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে বলিল—‘ইচ্ছে করে, আমার এই সিগারেটের আভ্রন দিয়ে বহুসব ভক্তদের পেরুরা পুড়িয়ে দি।’ বলিয়া বিষাক্ত দৃষ্টিতে কটমট করিয়া এ-ঘরের দিকে বার-দুই চাহিল।

এ-ঘরে তখন শশধর ও সন্ন্যাসীর মধ্যে স্বর্ষভবের গভীর আলোচনা চলিতেছিল।

সহসা আপানের সহিত আমাদের রাজার বৃদ্ধ বাবিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়লার একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠ-বাসীরা বুকের ভয়ে ভীত হইয়া দূ-দূরত্বের পালাইতে আশ্রয় করিল। পালাইবার ভেট এ গ্রামেও আসিয়া লাগিল। কয়েকদিন হইতে পাটসনের দরজা উন্মুক্ত ছিল। জলধর এদিকে চাহিয়া শশধরকে দিচ্চামা করিল—“তুই কোথাও পালাবি না কি?”

শশধর কহিল—“আমি কোথাও যাচ্ছি না; নারায়ণের পারের তলার এটি, তাঁর পারের তলাতেই থাকবো। তিনি রাধেন, থাকবো; না রাধেন, পালিয়েও রক্ষা পাব না। তুমি কোথাও বাবে না কি?”

একটু হতাশার ঘরে জলধর কহিল—“হাতে ও আর পরসী-কড়ির কোর নেই যে, কোথাও বাব; হুতরাং এইখানেই পড়ে থাকা হাড়া আর উপায় নেই।”

ইতারই কিছুদিন পরে শশধরের নামে একখানা সরকারী চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম এই যে, রেললাইনের পশ্চিম দিকে শশধরের যে ৭০ বিঘার বাগান আছে, যুদ্ধের কাজে সরকার তাহা গ্রহণ করিবেন এবং একজন সরকার শশধরকে প্রতিমাসে দুইশত টাকা হিসাবে ভাড়া দিবেন। এই সংবাদে—শশধর নর—জলধর লাকাইয়া উঠিল এবং এই লক্ষ আনন্দের ফলে নর, হিংসার ফলে। সেই দিনই জলধর পাটিনের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং দিনকতক খুবই চেষ্টা করিয়া বোরাবুড়ি করিতে লাগিল, বাহাতে গ্রাহ্য বাগানটীও সরকারকর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার চেষ্টা সকল হইল না।

পরের মাসে শশধরের কাছে পুনরায় এই মর্মে এক সরকারী পত্র আসিল যে, তাহার জমীর উপর যে নানাজাতীয় দুইশত বৃক্ষ আছে, ঐগুলি তত্ত্বা করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কিনিয়া লইলেন এবং উহার সরকারকর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্য দুই হাজার তিনশত টাকা—জেলার কালেক্টরী হইতে যেন তুলিয়া লওয়া হয়।

এই ব্যাপারে একদিকে শশধরের আঙ্গুল ফুলিয়া যেমন কলাধাহ হইল, অপরদিকে তেমনি জলধরের আঙ্গুল চূপসাইয়া খড়কে কাটির মত হইয়া গেল।

শশধর দুই হাজার তিনশত টাকা—বাক্সে পুরিয়া মনে মনে নারায়ণকে অর্পণ করিয়া কহিল—“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!”

শশধরের কিন্তু কার বাড়িয়া গেল। মাসান্তে জেলার সদরে গিয়া ভাড়া আনিতে হয়। সাহেব-হুবার কাচের গিরা দাঁড়াইতে হয়, মাঝে মাঝে বাগান সবক্ষে সরকার বাহা আদেশ করেন, তাহা তামিল করিতে হয়। তাহার একমাথা চুল ও দাড়ি-গৌক দেখিয়া সাহেব হুবার তাহার দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকে। ক্রমে অবস্থা এমন হইল যে পেরুরা পরিধান করিয়া সাহেবদের কাছে বাওয়া খুব অসুবিধা হইল। তখন একদিন শশধর তিনটার জোড়া খোলাই বৃত্তি, লংক্লেবের পাঞ্জাবী, ভাল এলবাট হু প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। মনে মনে সেদিনেরই মত নারায়ণ অর্পণ করিয়া কহিল—“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”

তার ইচ্ছার ক্রমে ক্রমে শশধরের দাড়ি-গৌক ও গেল, হেয়ার-কাটিং সেলনের কাঁচি ও রূপের তলার পড়িয়া তাহার একমাথা ঝাড়ু-ঝাড়ু চুলও নবরূপ ধারণ করিল। সাহেবরা দেখিয়া প্রফুল্লিত হইল—“নাউ ইউ লুক্, অল্ রাইট্!”

শশধর সেদিন খোপ-দস্ত খুঁচি-চামরা-পাঞ্জাবী প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া সদর হইতে তাহার বাগানের ভাড়া আনে, সেদিন ঘরে কিরিয়া তাহার বাগ্নে সঞ্চিত ২৩০০ শত টাকার সঞ্চিত ঐ ২০০ শত টাকা মিলাইয়া এই আড়াই হাজার টাকার নোট পরিসূর্য্য ভূষিতে নাড়াচাড়া করে। নিত্য এই নাড়াচাড়া করিবার কলে বাজারের ভিন্ন ভিন্ন দোকান হইতে নানাবিধ জবা তাহার বৈরাগী-বরখানির মধ্যে আঙ্গিয়া জমিতে লাগিল; বখা,—আরনা, বৃক্স চিক্কী, কানাইবার সেট, পাখর বনানো আঁটি, রিষ্ট ওয়াচ, কাউন্টেন-পেন, চারের সরঞ্জাম, চর্চ, সিগারেটের টিন, টিকে, তামাক, গড়গড়া প্রভৃতি। এই সঙ্গে আরও আসিল—চাল, ডাল, ঘি, ময়না, ছলি, চিনি, মিহরি, মাছ, মাংস, ডিম, পোঁয় প্রভৃতি এবং তাহার সহিত আসিল একজন হিন্দুস্থানী পাচক ও একজন ভূতা। ইহার সলসলে আসিয়া শশধরের

পেরুরা, গীতা, খড়ব, কুশাসন, নারায়ণ, এবং নার-রূপ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে জ্বালা-ঠালা করিয়া ফেলিল এবং খেবে গলা টিপিয়া হজা করিল।

এদিকে যুদ্ধের ফলে এক কতকগুলি হীনপ্রভৃতি সীতাময় শৈবীর ব্যবসায়ের বার্ষিকতার জন্য জীর্ণাবারূপাশ্রয়ী সকল ব্রহ্মই হুতলা হইয়া উঠিল। চারি টাকা মণের চাউল হইল ৪০০০, টাকা এবং কোন কোন স্থলে ৭০৮০, টাকা পর্য্যন্ত। চারি আনা সেরের মিহরি হইল ২০০০, টাকা। দুই টাকা-জোড়া বৃত্তির মূল্য চড়িল ৮, টাকার। যে সাতের দান ছিল চৌদ্দ পরসী সের, তাহার দান হইল ৮, টাকা সের। একটি হুপারীর দান হইল দুই পরসী, একটি পাতি নেবুর দান হইল দুই আনা। শাকসব্জী ও ভরতীরকারী, ভেল-মুদ, মসলাপাতি প্রভৃতি সকল জিনিষের দামই ঐরূপ অসম্ভব হারে বীড়িয়া উঠিল। ককরা, কোরগীন, পিঁরিট—করীর বস্ততে পরিণত হইল। মোট কথা, জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক প্রত্যেকটি জিনিষেরই আটপন মশগুণ মূল্য বাড়িয়া উঠিল। অত্যন্ত দরিদ্র বাহারী, ভাষারা এই সাংঘাতিক আঘাতের দ্বারা খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাতারে-কাতারে, হাজারে-হাজারে, লক্ষে-লক্ষে, পঞ্চ-ষাট-ষাটে পড়িয়া মরিতে লাগিল। মধ্যবিত্তের কোন দিন অনাহারে, কোন দিন বা অর্দ্ধাহারে থাকিয়া খুঁকিতে লাগিল। জলধরও সেই মত খুঁকিতে লাগিল।

বেশের এই বোর দ্রাবন্ধের ফলে, জলধরের সব জলটুকুই শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহার আর সে টোট-মামলেট-চা-সিগারেট নাই, সে বাবুগী নাই। একখানি মাত্র শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া এবং এক সন্ধ্যা মাত্র কাঁচকলা ভাতে ভাত খাইয়া তাহার দিন কাটে। মাথার একমাথা ঝাড়ু চুল; তৈলাভাবে তাহাতে জট বাধিয়াছে। পচা নারিকেল তৈলের সের দুই টাকা, আড়াই টাকা। নাপিতের কাছে কামাইতে ও চুল ঠাট্টিতে গেলে এক টাকার কাঁচাকাঁহি ব্যয় হয়, হুতরাং একরূপ দাড়ি-গৌক জলধরের মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। জুতা-জোড়া একেবারেই তিড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কার্য চলে না। নুতন একজোড়া জুতার দাম ১০, ১০, টাকা। বিছানা-পত্র শতছিন্ন হইয়া, তোবক-বালিসের খেরো-টিকির কাটিয়া, তুলা বাহির হইয়া, সব ব্রহ্মালে পরিণত হইয়াছে। নুতন কিনিবার আর উপায় নাই, অগ্নি মূল্য। তাই সে সব ঘরের এক কোণে গাধা করিয়া রাখিয়া, একখানা মাদুর মাত্র তাহার পশা হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষই অনবধের কষ্টের মধ্যে পড়িয়া তাহার সেই নান্দন-মুহূর্ন দেহ হাড়-সার হইয়াছে।

শশধর কিন্তু খুব ভোরাজেই থাকে। যনের নুতন আনন্দ এবং উৎসাহে তাহার সেট নীর্ণ দেহে মাংস লাগিয়াছে। সর্ব্বদাই-তাহার অন্তরে ক্ষুষ্টির কোরারা ছুটিয়েছে। দুর্ভিক্ষ যেন আনীল্যাদী পুষ্প-বরূপ তাহার মস্তকে আসিয়া বসিত হইতেছে।

সেদিন জলধরের একমাত্র রিয় ও মলিন বস্ত্রখানি একেবারে কাঁদিয়া গিয়া কিস্তিহ প্রকাশ করিল। ষাষচাখানি পরয়া জলধর তাহা সেলাই করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কাপড়খানা এতই জোঁর যে তাহাতে আর সেলাই চলে না। ও-ঘর হইতে শশধর তাহা দেখিয়া কহিল—“দাদা, আমার পেরুরা ৪ খানা ত পড়েই রয়েছে; ও আমি পরিও না; পরবও না; তুমি নিজে পরতে পার।”

কিন্তু এই বোরতর দুঃখ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়িলেও শশধরের উপর জলধরের অতিমান ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তাহার সহিত হিংসার ভাণ্ড মিঞ্জিৎ ছিল। অথচ লজ্জাবিরূপের জন্য ক্রোধও একান্ত অগোচর। পেরুরা বন্দ হইবে না; সাধা কাপড় দুইখিনেই ময়লা দেখাইবে; খোপার বাড়া কাঁচিতে বিলেই কাপড় পিছু দুই আনা তিন আনা লইবে। পেরুরা হইলে ময়লা কম দেখাইবে; তা' হাড়া ঘরে একটু সাধান বসিয়া গুলেই চমকে।

হুতরাং শশধরের কথাই জলধর বলিল—“পেকরা চারখানা? তা দিতে পারিস। আর আমি তাবুদি, আমার ঠোঁটটা শুধু শুধু পড়ে থেকে ত নষ্ট হচ্ছে, ওটা তুই নে, তোর এখন খুব কাজ লাগবে।” শশধর বুঝিতে পারিল, বাবা এমনি-এমনি জাহার পেকরা চারখানা লইবে না, তাই ঠোঁট, দানের প্রত্যাহ। বাহাইউক, শশধর ঠোঁটটা লইল এবং তাহার পেকরা চারখানা জলধরকে দিয়া দিল। পেকরার সঙ্গে শশধর তাহার খড়ম জোড়াটাও জলধরকে দিল, কহিল—“শুধু পারে থাক, এটাও ব্যবহার করতে পার।”

বিভালের দিকে পেকরা পরিয়া ও খড়ম পায়ে দিয়া ঘরের সামনেকার রোয়াকে পার্শ্বচরী করিতে করিতে জলধর শশধরের উদ্দেশ্য কহিল—“তোমার গীতাখানা ত আর তুই পড়িস না; আমার দিস ত, একটু একটু পড়বো; শুধু কতকটা সময় কাটবে।” শুনিবামাত্র শশধর কুলুঙ্গী হইতে গীতাখানা বাহির করিল এবং তাহার মলাটের বহুদিন সঞ্চিত ধূলা ঝাড়িয়া জলধরের হাতে দিল। সেই সঙ্গে তাহার নাম-রূপের মালাগাছটাও দিয়া কহিল—“শুধু গীতা দিতে নেই, এটাও রাখ।”

পরদিন সকালে শশধরের ভৃত্য টেকিলের উপর একখানা ডিশে ডিমের মাংস্লেট এবং আর একখানাতে দুইখানা টোট ও দুইটা সন্দেশ এবং তার

সঙ্গে এক কাপ চা রাখিয়া যখন পুড়-পুড়ায় মাথা হইতে কলিকটা লইয়া ভাতাক সাজিতে গেল, তখন শশধর চিরঙ্গী-ক্লম হাতে আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া শুন্-শুন করে জলধরের সেই গানখানাই পাহিতেছিল—সেই, ‘তোমার চিনেছি, চিনেছি, চিনেছি—ওগো বিদেশিনী!’

ঠিক এই সময়ে বহুদিন পরে বিপিন ব্রহ্মচারী এ-ঘরে ঢুকিতে গিয়া খতমত খাইয়া গিছাইয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন—“এরা কি ঘর বদল করিল?” তখন এক-পা এক-পা করিয়া ও-ঘরের খোলা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের ভিতর তখন অনাহারক্লষ্ট, ক্রীণ দেহ জলধর একমাথা সম্রট চূণ ও একমুখ বাড়ী গেঁফ লইয়া, পেকরা পরিয়া বৃত্তিকাসনে বসিয়াছিল। তাহার এক পার্শ্বে খড়মজোড়াটি এবং অপর পার্শ্বে গীতাখানি রক্ষিত ছিল; আর হাতে ছিল—নাম-রূপের মালাগাছটি।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত বিপিন ব্রহ্মচারীর মুখ হইতে অর্ধোন্মুটে উচ্চারিত হইল—“বাপার কি?”

তাঁহার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া জলধর কহিল—“বাপার বিশেষ কিছু নয়; সংসার-নাটকের গট-পরিবর্তন!—পট-পরিবর্তন!”

বিপিন ব্রহ্মচারী হতভম্বের মত তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কণ্ঠরোধ (সম)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

প্রভাত দত্তিয়ার পালাটি ঘরের শিক্তিা মেয়ে কল্পনাকে বিবাহ করিয়া তাহার শিলভের বাগান বাড়ীতে ‘হনিমুন’ করিতে আসিয়াছেন। প্রথম মিলনের উচ্চল অঙ্গনে দুইজনে ভরপুর। সে বিবাহের যৌতুক ব মোটরগাড়ী পাইয়াছে তাহাতে উভয়ে একটা পাহাড়ের ঢালুপথে গুপ্তনামা করিতেছে। কল্পনা গাড়ী চালাইতেছে। পাহাড়ের চড়াই পথে বহুদূর গাড়ী ওঠে, উঠেইয়া ত্রেক কহিয়া দিতেছে। তারপর গাড়ী আস্তে আস্তে পিছাইয়া সমতলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। জোৎস্নাময় মধ্যরাত্রি। প্রভাত চোখ বুজিয়া ইহা উপভোগ করিতেছে। হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া কল্পনা জিজ্ঞাসা করিল—

কিসে তোমার রোমাঞ্চ হচ্ছে মিষ্টার দত্তিয়ার? ওপরে চড়াইয়ে উঠছি যখন, তখন?...না যখন পেছিয়ে এসে আস্তে আস্তে নিষর হয়ে বাচ্ছি তখন? প্রভাত উত্তর করিল—

তোমাকে আস্তে আস্তে এই চাঁদের আলোর ওপরে ওঠার আনন্দে এক রকম রোমাঞ্চ হচ্ছে...আবার নীচে নামার আনন্দে অস্ত রকম রোমাঞ্চ হচ্ছে!—ছ’ধারে ছ’ রকমের পুলক আসছে।

লাকতও পুলক?

হী। ওঠা যদি সত্যি হয় নামাও সত্যি।...জীবন নাট্যের মূল্যেই বুর্জি নাকত হক্কেই হবে।...ওঠার যদি আনন্দ হয়...তবে নামার দুঃখ কিসে?

না না, নিষর নিঃশব্দতা আমি চাই না।...বাঁচটিকে এত সহজে আমি সেবে সেবো না।...উঠবো...উঠবো।...লাকিয়ে পড়বো এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়।...লাকাত গিয়ে আমার গাড়ী ভাঙলো...পাঁচের ভাঙলো—তবু আমি লাফলাম!...কোথার তুমি?...কোথার ঘেন তুমি ভিটকে গেলে।...ওগো কোথার তুমি?

প্রভাতের কণ্ঠস্বর হইয়া আকষ্টের মতো কল্পনা হির নিঃশব্দ হইল। প্রভাত অহির হইয়া অক্টে লগিল—

তোমার কি এগিলেপ্টিক্ ফিট আছে?...আমি বাগানে গেলে দুপুরে কি সব সাহিত্য বে পড়?...সেই সব মাখার বৃত্তে থাকে!

প্রভাত বীরে বীরে তার গ্রীর মাখাটি কুপন বালিনের উপর রাখিল। তারপর বৃহৎবেগে নিজে গাড়ী চালাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

কল্প। তাহার খানার বাড়ীতে কলিকাতায়। এসাধন কক্ষ হইতে বিলাস কক্ষে আসিতেছে। কণ্ঠে বজ্রার। দুর্গত পঙ্কন দুহলর কাঁপিতেছে। সে লৌলারিত হস্তে অঙ্গনতরে কোন্ বস্রটি কাপের কাছে লইল। আয়া একটি টিপাইয়ের উপর খুমারমান চারের পেচালা রাখিয়া গেল। কল্পনা তার বাম্বীকে আকিসে কোণ করিল। উত্তর পাইল—

রঙ নব্বার!

রঙ নব্বার?...আমি তোমার পলা চিনিনে বুঝি।

তারপর বলো।...খাপ কামরায় ‘ব্রিক্’ নিয়ে চলেছি...।

চন্দননগরে চন্দ্রাম . সেখানে কনকারেল পাঁচটার বে...।

কৈ আসবার সময় সে কথা আমার বলনি তো?...সিনেবার আর বিকেলের ‘পো’তে বগের টিকিট কিনেছি যে ছ’জনের। ছালো...ছালো:...? প্রভাত আর কোনো উত্তর পাইল না। তার চোখ কপালে উঠিল। কোন দানিতে বস্রটি রাখিল, আবার তুলিল। তার হাত কাঁপিতেছে। কোন সে ডাকিল—

চন্দননগর পুলিশ?

হী বলুন, আপনি কে?

আমার পরিচয় লিখে দিন...। আমার স্ত্রী কল্পনা দত্তিয়ার কনকারেলে চলেছেন আমার মিনার্ভা গাড়ীতে।...এত মন্বর।...ডাকে কলবেন কিরতে।...আমি পছন্দ করছি না তাঁর স্বক্বার...। বেশ।

হী, আরো বেগুন...কলবেন ও রকম পান গাওয়া...।

হালো...হালো?...

চন্দননগর ট্রাণ্ডের পাশে প্যাট্রি হোটেল। সেখানে আসিয়া কল্পনা বিক্রাম ও বেশবিক্রাস করিয়া কনকারেন্সে বাইবে। তাহাকে প্রত্যাশন করিতে 'পদ্মকটা-বাণেশ্বরী' কয়েকজন বেচ্ছাসেবক ও বেচ্ছাসেবিকা হোটেলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। তারা কিছু অধীর, কারণ পাঁচটা বাজে। পুলিশটল উড়াইয়া বাক ঘুরিয়া বঙ্গমার গাড়ী গজার ধারে এই ট্রাণ্ডে উঠিল। ধামার মতো গোল চুপি মাথার চন্দননগরের একটি কালো পুলিশ হাত তুলিল। ব্রেক করিয়া উপেক্ষার সহৃদয়ি সহী আঁবা বাকাইয়া কল্পনা বলিল—

কি বিড়ম্বনা...কণ্ঠরোধের আদেশ বুঝি...এখানেও! আমি মানতে রাজী নই।

না, সরকারী আদেশ নয়...আদেশ আপনায় বাযীর।...তিনি আপনাকে কিরতে বলেছেন...আপনায় বাযীর তিনি পছন্দ করেন না...।

গাড়ী রুগে বাহিরে হইয়া গেল। চন্দননগর হইতে কল্পনা তার বাযীর আফিসে কলিকাতায় ফেরি করিতেছে। কোন ধরিত্রীকে খোদ প্রভাত। আফিসের উড়িয়া বেহারী রাধুদাস। কল্পনা তার বাযীকে না বলিয়া বেয়ারাকে বলিতেছে—

কে রাধুদাস?...পুলিশকে দিয়ে আখ্যার আটকানো অত্যন্ত ধূইতা।...যে পূর্ব এ রকম কোরতে পারে, তার ঘরে থাকা আমার চলে না।...কি মধ্যস্থতীর অসত্যতা।...রাধুদাস, পাড়ি থাকলো পুলিশের জিহবার।

মণিমা-মণিমা?...সাহেবো চন্দননগরকু বাহিরিলে।...হালো মণি মালো?...।

একখানি টেলিগ্রাফে করিয়া প্রভাত দত্তদার চন্দননগরে বাহিরে হইল।

কনকারেন্সে বসিয়াছে। মতপন্থা সতাপতির অধুরে ঐক্যতান বাদন সহ কল্পনা দত্তদারের সমাপ্তি সংগীত হইতেছে—

বায়ীনতা পণ—বায়ীনতা পণ—বায়ীনতা পণ।

তার কাছে সব তুচ্ছ, তুচ্ছ প্রেম-ঐতি-ধন-জন।

গানের আবেগে মতপন্থের আকাশ-বাতাস কম্পিত। প্রভাত পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কল্পনার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইতেছে।...হাততালির ধ্বনি চসিতেছে।...পালা শেষের ধন্বন দিতে উঠিয়াছেন অত্যাধুনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ। তিনি কল্পনার গানের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

ভাবা জুয়ার না, কি বলিয়া প্রশংসা করি...তার সংগীত আজ সভাকে শ্রাব্য দিয়াছে।...যেন মিসেস দত্তদারের আশের কথা এই বায়ীনতা...।

প্রভাত দত্তদারের কানে অগ্নি শলাকা স্পর্শ করিল—“মিসেস দত্তদারের আশের কথা এই বায়ীনতা”—এই কথাগুলি। তার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে মতপন্থার একটা কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল তরুণী পরীকে উত্তারি দিয়ে মাথা ধার...কি অসত্য এই সব নেতা।

কল্পনা দত্তদারের কানে বিদ্যুৎ স্পর্শ করিল—“মিসেস দত্তদারের আশের কথা এই বায়ীনতা” কথাগুলি। সে লাকাইয়া উঠিয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—মধ্যস্থতীর আবেষ্টনীতে কুপমণ্ডক হয়ে থাকা তার পক্ষে পোষাবে না।

...

...

...

মিসেস কল্পনা দত্তদার এখন কল্পনা দেবী নামে পরিচর দিতেছে। বাযীর কাছে কলিকাতায় নয়, এখন হুগলী জেলার বাপের বাড়িতে বসবাস। প্রমাণ হইতে মাগপুর, বোখাই, মাহারাজ—গানের জন্ত তার ডাক পড়ে। অথবা পতি। কার নামে বেশ বাতিতেছে। তার পিতামহ ছিলেন কলিকাতা সোমপট্টর অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা। এখন তার ভাই কিশোর সেই

প্রতিষ্ঠানের মালিক। দ্বিদির বিভাবুদ্ধির উপর কিশোরের অবাধ স্বত্ব। আজ রবিবার, লোকসান বন্ধ। কিশোরের একটা সভায়, পাঁচ বছরের ঘেরে 'নতুন'। শিশী আসার পর তার কাছেই থাকে। সেদিন দুপুরবেলা নিজের ঘরে কিশোরের জ্বর জমা অপেক্ষা করিতেছে। পা টিপিয়া তার জ্বর চুকিল, আন্তে আন্তে বরজার খিল দিল। কিশোর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—

দ্বিদি কোথায়?

নতুনকে নিয়ে গুলেন।

আচ্ছা দ্বিদিহে। দ্বিদি-দ্বিদিতে বত 'সান'-গজার মজলিসে বেড়িয়ে বেড়ান—কিন্তু তোমার ঐ একমাত্র নতুনকে পেলে সব ভুলে যান কেন বসন্তো?

যেহে মানুষ, পেটের যে বেই, মায়া খাবে কোথায়?

একটা দীর্ঘবাস কেলিয়া কিশোর পাশে ক্রিয়া গুলিল। অনেকক্ষণ উত্তরে নিরীক। তার জী তার পাশে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কি ভাবছো?

না:...ঘুম আসছে না।

তা নয়, ভূমি ভাবছো। কি ভাবছো বলবে?...ঠাকুর জানাই সত্যের সময় আসবেন তাই ভাবছো। আমি ঐ চিঠিখানা পড়েছি...

বেশ, তোমারই বা বিত্তে কতটুকু আর আমারই বা বিত্তে কতটুকু? বিত্তে বাদে বিত্তেবুদ্ধি আছে তার কেন এমন হয়?

কিন্তু ঠাকুরজানাই লোক খুব ভাল। ঠাকুরকি তাঁকে ছেড়ে এলেন পাঁচ বছর...তবু তিনি ঠিক কর্তব্য করে যাচ্ছেন। সেই মর্মে দেড়শো করে পাঠাচ্ছেন। তোমরা তেরং দাও কিন্তু তিনি পাঠাচ্ছেন।

একটি রোট 'হ' দিয়া কিশোর উঠিয়া পড়িল। সে নীচে নামিয়া গেল। বাহিরের বসিবার ঘরের পাশে অন্দরের সংলগ্ন 'জানাই বাঘর ঘর' নামে পরিচিত ঘরটি কল্পনা বাড়ামুচা হইতেছে তাহা দেখিতে খেল। তার মাথা একমাত্র কামাতার বসিবার জন্ত কোচ-স্টোর-টেবিল দিয়া আধুনিক ধরণে এই ঘরটি সাজাইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে আজ এ ঘরে হা এ পড়িয়াছে। উপর হইতে কল্পনা ডাকিল—

কিশোর?

আজ্ঞে।

এই চিঠির কথা আগে আমাকেই জানানো উচিত ছিল।...বেশ, কেউ যেন আমার খবর নিতে ওপরে না আসে।...আজ আমার কণ্ঠরোধ করছে সরকারী।...কল্পকল্প বিহীনলোকে লোক বাটার ভরে কল্পনা করতে চায়...অপমান করতে চায়...। কিশোরের মনে অভিমান আদিল। দ্বিদিকে সে ভয় করে। তবু সে ডাকিল—

দ্বিদি, দ্বিদি?...বাবা বলে গেছেন তিনি আমার বড় ভাই...পাঁচ বছর পরে তিনি আসছেন...আমি কি তাঁকে অপমান কোরবো?...।

খুকীকে কোলে নিয়া কল্পনা উপরে দাঁড়াইয়া ছিল। তা ক'কালে নিমাই সে বড়ের মতো নিজের ঘরে চলিয়া গেল। দ্বিদি মন্থে বরজার খিল দিল। খুকীকে আরও বুক আপটিয়া নিয়া ঘরের বিছানাটার আড়কাইয়া পড়িল। এই ঘরের বিছানাতেই সে পাঁচ বৎসর কাটাইতেছে। তখন ঘরের মধ্যে যে কিশোরের জী ছিল তাহা সে বুঝতে পারিল না। তারপর চোখের ধারা...বুক কাটা পক্ষ। সাধনা দেয় কে? পালকের উপর বিছানা করিতেছিল কিশোরের জী। সে সেখানে বসিয়াই ডুকমাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া নিয়া কল্পনা বলিল—

“বৌ ভূমি এ করে?...কি করছিলে?”

“আপনার পালকে বিছানা পাতিছিলাম...ঠাকুরজানাই আসবেন যে।” খুকীকে নিয়ে ভূমি ওঝে বাও...আমার একটু কাজ আছে।

না নিমি এও থাক।...ই নীচে পাড়ির শব্দ হোলো...ঠাকুরজামাই এনেয়েন, আমি খাবার কোরুতে যাই।

নীচে শোনা গেল—আবার কর্তব্য তেবে আমি এলাম কিশোর।

কিশোর শুধু বলিল—আমাকে সেই ফোট ভাইটাই কবিয়েন।

উত্তরে নীচের সেই ঘরে। উত্তরের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইল। তারপর সেই যে মৌন হইল তেনে পাখা নিশ্চল। ঘড়িতে বড় করটা সব বাজিয়া গিয়াছে। ছোট টেবিলটার উপর চা-খাবার সব পাড়িয়া আছে। প্রত্যন্ত দৃষ্টির পোষাক পড়িতে হাইতেছিল। কিশোর বলিল,—পোষাক পড়বেন যে?

যাই।

এখন তো ট্রেব'নেই, রাত একটা, তোর সাড়ে পাচটা ট্রেণ, বিছা খান, বাড়ী থেকে এনে দিই।

আবার কি আনবে? এই তো জলখাবার রয়েছে, এরই একটু খাচ্ছি।

কিশোরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যন্ত বলিতে লাগিল—তুমি শোওগে কিশোর, আমার তো সেই ভোরে য ওয়া।

...

...

...

কিশোর ঘরে আসিলে তার স্ত্রী বলিল—এতো খাবার কোরলাম।

কিশোর দুইখুঁস ফেলিল। তার স্ত্রী আবার বলিল—ঠাকুরকির কিন্তু ঘরের ঘোর খোলা আছে। কিশোরের হৃদয় কাটিয়া একটা শব্দ বাহির হইল—ওঃ

*

*

ইহার পূর্ব দুই বৎসরের অধিক কাটিয়াছে। একদিন কাগজে বাহির হইল—বড় সিনের ছুটিতে বন্দী রাখিয়া সম্মেলন। সভানেত্রী প্রচেষ্টা কল্পনা দেবী। স্থান ও সময় পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। উদ্বোধনগণকে আমায় অভিনন্দিত করিতেছি যে তাঁহারা এই প্রসিদ্ধ দেশসেবিকাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিতেছেন।

কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ পার্কে সভা বসিয়াছে। সভানেত্রীকে বরণ করিত উদ্ভিষ্ট একটি তরুণী বলিলেন—

দেশসেবার নতুন আদর্শ দেখিয়েছেন যিনি, ঘরবর', স্বামী, আত্মহুণ এম্ব কিছু ওপরে দেশমাতার সেবা ভাবনাে ভেতর যিনি প্রমাণ করেছেন

তাঁহাকে শুধু কি আমরা 'মার্টার' ব'লে কান্ড হবো, বীর ব'লে কান্ড হবো? না, না। তাঁকে সম্মান কোরতে হবে তাঁর পথকে বরণ কোরে নিয়ে। আমাদের এতোককে এতিয়া কোরতে হবে তাঁর পথে চলতে। মধ্যযুগীয় হিন্দু নারীর সংস্কার তাঁকে বাধা দিতে পারে নি দেশসেবার মহত্তর কাজে। ভারতের যুক্তকামী সহিবদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আর আমরা তাঁকে আমাদের একা অর্থা দান কোরে মত্ত জ্ঞান করছি। দেশের নারীর চাপে সরকার এত দিনে তাঁর ওপর থেকে বর্চ'রাখ আদেশ প্রত্যাখ্যার কোরতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর বৈদ্যতলে বসে' বাঙালার নারী-সমাজ আজ তাঁর বলি শোনবার প্রত্যাশা করছে।...

তারপর করতালির মধ্যে কল্পনার অভিতাবণ আঁত হইল। তার বৈষম্য-বেশ। সে বলিল—বন্ধুগণ, কি কল্প আপনারা আজ আমার এ সম্মান দিচ্ছেন আমি তা' বুঝতে পারছি না। আপনারা জুল কোরছেন—জুল বুঝছেন। আমিও জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটায় জুল কোরলাম। জুল ভাঙল যখন, তখন আর উপায় নেই। প্রাণের দৈবতাকে উপেক্ষা কোরে...ঘরের বিশ্বহকে বাদ দিয়ে যারা কল্পিত দেশ-বিশ্বহকে বড় কোরে দেখে, তাদের এই দশাই হয়। আপনারা সে কল্পনা-রাজ্যে বেড়াবেন না। প্রাণের রসবস্ত উপাচিত হয়... উন্নত হয়...পুষ্ট হয়...বাড়়ে, স্বাধীনতার মধ্যে। তাই স্বাধীনতা এতো রু জিনিষ। সেই স্বাধীনতা পাওয়ার মানে প্রাণকে শুকনো নয়। হিন্দু নারীর প্রাণবন্ত তার স্বামী দেবতা। আমি সেই আদর্শকে উপহাস কোরে আমার রসহীন প্রাণের রস তৈরব দীপকব জ্বালা দিয়ে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছি রসবস্তুর সন্ধানে। কিন্তু বিফল হয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমি আমার প্রাণবন্ত হতে বঞ্চিত। এতো দিনে সভাই আমার কঠোরোপ হ'ল। আ হো আমার কঠে আসবে না 'বসন্তের' লিহরণ, 'হিলোলের' মোহন পাখীরা, 'খ্রী' রূপের মধুর অনুভূতি।...আমার কঠোরোপ হয়েছে...কঠোরোপ হয়েছে...

কল্পনার পলায়ন ঘর তারি হইয়া গেল। সে আর বলিতে পারিল না—বিস্ময় পড়িল। সে বলিতে না বলিতে তরুণী সম্মানায় মলে মলে সভা ত্যাগ করিল। পরদিন দক্ষাশীল সংবাদপত্রগুলি চাপা ভাব্য সভানেত্রীর প্রশংসাই করিল। একজন বলিল—'কল্পনা দেবীর জীবন-কথা নয়-মুণ্ডে একটি পুত্র স্থাপন করিল পুরাতনের অবহেলিত অতি সত্যের স্মৃতি ভিত্তির উপর'। আর একজন বলিল—'বীথ ভাটিলে যায় হয়, বৈষম্যের আঘাতে এত কঠিন প্লাবণের বীথও ভাঙিল'। জাতীয়তাবাদী একখানি পত্রিকা বলিল—'বন্দী নারী-বজ্র পণ্ড—সভানেত্রী ভাষণে অসংগতি—'।

তোমারে ঘিরিয়া

রেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-গ্র্যাট-ল'

কোন ফুলে

তোমারে ঘিরি বড় হর বড় গান
ভিন্নদিন কোথ থাকে;
সে হর-কহরী গুজরি' কঠে—
সে গান পাখীর ডাক।

তবু কোথের অকথিত বাণী,
অশ্লীল হৃদয় দীন জানাজানি,
নীহারিতা-পথে অগ্নি হুতবানি
নয়নে নিদ্রালাী আঁতে।

বুক জুড় শুধু বাঁধিগো যেব বাগা
ভালবাসা কোথ ক'কে।

চেনা ও অচেনা
এই নিয়ে খেলি বেলা,
মানে অভিমানে
কেটে যায় সারা বেলা।

কি করিতে চাই
জানি না তাহার ভাষা,
কি লজিতে চাই—
মেটে না পাওয়ার আশা।

কোন ফুলে তোর সাজাই চরণ
কি দেব' তাই বল?
দেখতা নে কাল ধূতরা
নে এই বিবল।

ধূতুটা তোর জটার তলে
মম্বাতিতীর প্রোত চলে,
আন্থো কি সেই গজাবারি,
না, মোর নয়ন জল?
বুকের লিগার যথা আমার
হুঃখেরই চন্দন,

ভুতুর বীর অঙ্গে তাঁরে
কি দেই আভরণ?
কটি-তটে লোটে বঁহার
বস্ত্র বাধের ভাল,
প্রলয়কালের নৃত্যভালে
(নিভা) চরণ-ভাল;
কঠে বাঁহাও অশ্লীল বিশ্ব
তার চরণে তুই সঁপে দিস
জল-ময়ন, মম্ব ভাল,
বন্দ স্নিগ্ধ বসন ॥

নয়

মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একটি সূত্র দৃষ্ট হয়—“নিত্য ক্রীড়াজীবিকায়োঃ” (পা: ২।২।১৭)। পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাকারগণ ক্রীড়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—‘উদালকপুষ্পভজিকা’—যে-খেলার উদালক-পুষ্প ভাজিয়া উহার সাহায্যে আভরণ-নিৰ্মাণ ও লোফালুফি ইত্যাদি নানারূপ কৌশল প্রদর্শিত হয়। আর জীবিকার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—‘দন্তুলেখক’। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎ-কালে এক শ্রেণীর লোক দস্তুর উপর লিখিয়া বা দস্ত চিত্রিত করিয়া জীবিকা-নিৰ্বাহ করিতেন। কাশিকা-বৃত্তিতে ‘দন্তুলেখক’ ব্যতীত ‘নখলেখক’—এই অতিরিক্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। দস্তুর জায় নখের উপর লিখিবার বা নখগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত ও চিত্র-বিচিত্র করিবার প্রথাও নিশ্চয়ই তৎকালে ছিল—আর উভারই অভ্যাসে এক এক শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জন করিতেন। এখনও কোন কোন সম্প্রদায় মেহেন্দী-পাতার বসে অথবা আলতায় পা ও হাতের আঙ্গুলের ডগা ও নখগুলি বঞ্জিত করিয়া থাকেন। আর অতি-আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ দেশের নারী-সমাজেও নানারূপ nail-polish ইত্যাদি জাতীয় পদার্থের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

৯। মণি-ভূমিকা-কণ্ঠ—যশোধর বলিয়াছেন—‘মণিভূমিকা’-শব্দেব্ অর্থ ‘কৃতকুট্টিমা ভূমি’। গ্রীষ্মকালে শয়ন ও পান-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে মরকতাদি বিভিন্ন মণি-খচিত মেখে নিৰ্মাণ—ইহাই এই কলাটির বিষয়। ২

মণি-বসান মেখে গ্রীষ্মকালেই আরাম-নায়ক। খালি মেখেব উপর গ্রীষ্মকালে শোয়া-বসা ও পান-ভোজন করিতে ভাল লাগে। সেই মেখের উপর যদি আবার ফটিক, মরকত, পদ্মবাগ ইত্যাদি মণি বসান থাকে, তাহা হইলে সেই সকল শৈত্য-গুণ-কাবক মণির প্রভাবে মেখে আরও শীতল ও সুখপ্রদ হইয়া উঠে। নানাবর্ণের পাখবের মেখে, মোজাইকেব মেখে, চীনা-মাটির (পোর্সিলেন) টালি-বসান মেখে, নানা বড়ের পালিশ-করা সিমেন্টের মেখে, দেওয়াল ইত্যাদি আজকাল খুবই প্রচলিত। কিছুদিন পূর্বে সিমেন্টের উপর নানা রঙের কাঁচের টুকরা লতা-পাতা-পাখী ইত্যাদি আকারে বসান হইত। কলিকাতার জৈন মন্দিরগুলি (পবেশনাথের মন্দির ইত্যাদি) ও মারবাড়ীদিগের অনেকের বাড়ী ইহার দৃষ্টান্ত। আরও কিছুদিন পূর্বের প্রথা ছিল—মার্সেল পাথরের সজ্জিত সত্য সত্য মণি-মুক্তা-হীৰ্য্যাদি বসান। অথচ তাহাজহল এই রূপেই নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে সকল আসল মণি-মুক্তা তাহাজহলের মেখেব বা দেওয়ালে

১ কুট্টিম—বাঁধান মেখে। এখন যেকোন সিমেন্ট, মোজাইক বা মার্সেল প্রস্তর দিয়া মেখে বাঁধান হয়, তৎকালে সেইরূপ মরকতাদি মণি-দ্বারা চঙ্কর বা ঘবের মেখে বাঁধান হইত। গ্রীষ্মকালে উহাতে শোয়া-বসা-পান-ভোজনের সময় প্রচুর আরাম পাওয়া বাইত।

২ “মণিভূমিকা কৃতকুট্টিমা ভূমিঃ। গ্রীষ্মে শয়নাপানকার্ণ তস্তাঃ মরকতানিভেদেন করণম্”—জয়মঙ্গল।

আর বসান নাই। আসল মণি-মাণিক্য-মুক্তাগুলি উঠাইয়া লইয়া তাহাদিগের স্থানে ঝুটা পাথর আর কাঁচ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেকালের অনেক হিন্দু দেবমন্দিরেও এ প্রকার মণি-মুক্তার কাজ ছিল। বর্করের অভ্যাচারে ও বিলুপ্তি ও লোভীর লোলুপতার, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকটা কালের করাল প্রভাবেও আজ আর সে সকলের চিরুমাত্রও দৃষ্টগোচর হয় না। কবিরাজ রাজশেখর বলিয়াছেন যে—সে কালের রাজা-কবিগণের সভায় এক হস্ত উচ্চ মণি-মুক্তা বসান একটি করিয়া বেদী থাকিত। তাহার উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত হইত। উহার উপর রাজা উপবেশন করিতেন। সভায় কাব্যের আলোচনা ও বিচার হইত—উপযুক্ত কবিগণ সম্মান ও পুরস্কার লাভ করিতেন। মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে অলকাপুরীস্থিত বাপীর সোপানপথ মকরত-খচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৩

৩ তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“ঘরের মেখে মণিময় করিবার অর্থাৎ মুক্তা বা মরকতাদি মণি-দ্বারা শীতল মেখে তৈয়ার করিবার শিল্প,—মর্ম্মর প্রস্তরের মেখে সকলেই দেখিয়াছেন—সেই দৃষ্টান্তে মণির মেখে বুঝিয়া লইতে হইবে”। ৫

৪ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“মণি অর্থাৎ প্রস্তর। তদ্বাচ্য চহব, পিণ্ডিকা, প্রতিমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করণ”। ৫

৫ সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“প্রস্তর হইতে মূর্ত্তি প্রভৃতির নিৰ্ম্মাণ, ভাস্করবিজ্ঞা”। ৬

৬ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—“গ্রীষ্মকালে শয়ন, উপবেশন ও পান-ভোজনাদির জন্ত চঙ্করকে যে মরকতাদি মণিদ্বারা সুশোভিত করা হয়, তাহাকে মণিভূমিকা-কণ্ঠ বলে। বিবিধ-বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পুষ্প, ফল ও পত্রাদির অঙ্কন প্রস্তুত করত চঙ্করে সন্নিবেশ করা”। ৭

১০। শয়ন-রচনা—টীকাকার বলিয়াছেন—যিনি শয়ন করিবেন, শীত-গ্রীষ্মাদি কাল-ভেদানুসারে তাঁহার অঙ্গুরাগ-বিবাগ, উদাসীনতা ইত্যাদি মনোগত অভিপ্রায়ানুযায়ী ও আহাবের পরিণাম বশতঃ শয্যা-বচনার কৌশল।

৩ “মধেসভং চতুস্তম্ভাস্তরা হস্তমাত্রোৎসেধা সমণিভূমিকা বোদিকা”—কাব্যমীমাংসা, রাজশেখরকৃত, দশম অধ্যায় (রাজচর্যা কবিচর্যা), ববোদা, ২য় সং, পৃ: ৫৪।

“বাপী চান্ধিন্ মরকতানিলাবস্ত্রসোপানমার্গা”—মেঘদূত।

৪ কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৬৪।

৫ শিল্পপুস্তাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৬। বেদান্তবাগীশ মহাশয় এ স্থলে ‘মণি’ অর্থে মূল্যবান প্রস্তর বা বস্ত্র না বুঝিয়া মর্ম্মরাদি সকল প্রকার প্রস্তরই বুঝিয়াছেন। আব ‘ভূমি’ অর্থে কেবল ‘মেখে’ না বুঝিয়া প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি অর্থও কবিয়াছেন। কিন্তু টীকাকারের অর্থ যে অঙ্করূপ তাহা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এ মতে ‘মণি’ অর্থে মরকতাদি ও ‘ভূমি’ অর্থে বাঁধান মেখে (কুট্টিম)।

৬ কঙ্কিপুরণ, পৃ: ২৩। ইনি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুগামী ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

৭ কৌমুদী, পৃ: ২৮

টীকাকারের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শয্যা-রচনার কৌশল ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রয়োজন। দেশের আবহাওয়া ও প্রথা, সময়ের গতিক ও লোকের রুচি ভেদেই বিছানার নানাভাবে পাতা হইয়া থাকে। আর যিনি শয়ন করিবেন, তাঁহার মনোভাবের উপরও বিছানার পাতা অনেকটা নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, আহারের পরিণাম বৃক্ষিয়ার শয্যা বচনা করা উচিত।

কোন দেশের আবহাওয়া শীতল, কোন দেশের নাতিশীতোষ্ণ, কোন দেশের উষ্ণ, আবার কোন দেশের বা অত্যুষ্ণ। এ কারণে দেশভেদে শয্যা ভিন্নরূপ হইতে বাধ্য। শীতপ্রধান দেশে লেপ-তোষকেব বাতলা, নাতিশীতোষ্ণে সাধাবণ বিছানা, উষ্ণদেশে শীতলপাটি, আবার গ্রীষ্মবর্ষ দেশে খালি মেঝের উপরই শয়ন করার প্রথা দৃষ্ট হয়। আবার যে দেশ গ্রীষ্মকালে উষ্ণ, শীতকালে শীতল, সে দেশে শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে শয্যা রচনা করিতে হয়। শীতের সময় লেপ, গ্রীষ্মে শীতলপাটি আর বসন্তে সাধাবণ ভাবে বিছানা পাতিতে হয়। আবার কোন দেশের লোক পালকের নরম বিছানা পছন্দ করেন, কোন দেশের বা সাধাবণ তুলার বিছানা, কোন দেশের বা শক্ত কাঠের উপরই লোকেরা শয়ন অভ্যস্ত। আবার ব্যক্তিগত ভাবেও দেখা যায় যে—কোন ব্যক্তি দেহতাত পুরু নরম গদীতে না শুইলে ঘুমাইতে পারেন না, আবার কেহ বা ফুটপাথে সিমেন্টের উপর বা লোহার বেঞ্চে শুইয়াও অঘোরে নিদ্রা ঘাইতে পারেন। কেহ শুষ্ককেন্নিড শুকোমল পুষ্পাচ্ছাদিত শয্যায় শয়নে আবার পাটয়া থাকেন। কেহ বা পুষ্পগন্ধের মধ্যে শুইয়া নিদ্রা ঘাইতে পারেন না—মস্তাদি আমিষগন্ধ ব্যতীত তাঁহার নরমে নিদ্রা আসে না। আবার দেখুন, যাহার মন বেশ প্রফুল্ল আছে, তাহার নৈরূপ শয্যায় শ্রীতির উদ্বেক হইবে, কোন কারণে যাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেপক বিছানা তাঁহার কখনও পছন্দ হইবে না—কিছুতেই হইতেও পারে না। আবার যিনি উদাসীন, তাহার নিকট সকল প্রকার শয্যাই সমান। আনও একটি কথা,—যদি গুরুপাক আহার করা হইয়া থাকে—প্রচুর পরিমাণে মস্ত-মাংস-লুচি-পোলাও ইত্যাদি খাওয়া হয়—তাহা হইলে পুরু বিছানায় শুইলে যেন শয্যাকর্ষক উপস্থিত হয়। সে ক্ষেত্রে বরং ঠাণ্ডা মেঝের শুইলে গাত্রদাহ হয় না। পক্ষান্তরে, যিনি পবিত্রিত আহার করিয়া শয়ন করেন, তাহার পুরু বিছানায় বেশ সহজে নিদ্রা আসে। উত্তমরূপে মনোমত কবিতা বিছানা পাতিবার কৌশল সত্যই একটি বিশিষ্ট কলা। মনের মত বিছানায় শুইলে যে আনাম পাওয়া যায়, তাহাতে মনটি প্রফুল্ল থাকার বেশ অনিচ্ছা হইয়া থাকে। শবীরের ক্লান্তি দূর হইয়া দেহ মন দুইই বেশ স্বচ্ছন্দ হয় ও পবিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণে বিছানার পাতিবার কৌশল কলা-তিসাবে আমাদিগের সকলেরই জানা থাকা উচিত। টীকাকার এই কথাগুলিই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।

৮ “শয়নীয়স্ত কালার্কেয়ঃ রক্তবিরক্তমধ্যাহ্নাতিপ্রায়াদাহাব-পরিণতিবশাক রচনম্”—জয়মঙ্গল।

কাহারও কাহারও মতে—ইহার মধ্যে খাট-পালক তৈয়ারী করার কৌশলও অন্তর্ভুক্ত।

৭ তর্কবত্ত মহাশয়ের মতে—“অম্বরজ, বিরক্ত ও উদাসীন পাত্র ভেদে ও কাল ভেদে বিভিন্ন প্রকার শয্যা রচনা কথন।” ১০

৮ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“খাট, পালক, তক্তাপোশ প্রভৃতি শয়নীয় দ্রব্য নির্মাণকরণ” ১০

৯ সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরই অনুগামী—“খট্টা প্রভৃতি শয়নের উপকরণ নির্মাণ করিবার ব্যবসায়” ১১

১০ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—শয়নকারীর তৎকালিক মনের ভাব বৃক্ষিয়া যে শয্যা বচনা করা হয়, তাহা। শীত গ্রীষ্মাদি ভেদে ও আহারের তারতম্যানুসারে রক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ এই এই তিনপ্রকার শয্যা রচনা কথন। (এগুলির ঠিক অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারি নাই) ১২

১১ উদক-বাজ—টীকাকার বলিয়াছেন—জলে মূবজাদি যন্ত্রেব বাজেব কাগ বাজ সৃষ্টি করা ১৩

জলেব উপর কবতল-পুঠেব আঘাত কবিতা মৃদঙ্গ-মূবজাদি ঢকা-জাতীয় বাজনার বোলের মত আওয়াজ বাতিব কবিতা কৌশল। অথবা নানা আকারেব জলপাত্র জলে ভরিয়া তাহা-দিগের গাত্রে কৌশলে আঘাত-পূর্বক নানাকপ স্তমিষ্ট স্বর বাতিব কবাব কৌশল। বর্তমানে ইহাবট নাম ‘জলতবঙ্গ’। সাধাবণত ধাবণা আছে যে, ফ্রাঙ্কলিন নামক কোন একজন বিদেগী সঙ্গীতজ্ঞ জলতবঙ্গের আবিষ্কারক। কিন্তু এই কলাটির বিবরণ পাঠ কবিলে সে ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা বুঝা যায়।

৭ তর্কবত্ত মহাশয়ের মতে—“জলে কবতাদিনাদি কবিতা তাহা হইতে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজকনি উৎপাদন” ১৪

৮ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“জলে কোন পাত্র বাগণা কিংবা পাত্রে জল রাখিয়া নানা ভাগে বাজ কবণ। পাত্রগণ বোধ হয় জলতবঙ্গ নামক উদকবাজ অবগত আছেন” ১৫

৯ সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“জলে বাজ বাদনের কৌশল” ১৬

“শীতগ্রীষ্মাদি কালভেদের অনুসারে বক্ত (অম্বরগ-সম্পন্ন) বিরক্ত (বিবাগ-সম্পন্ন—তৃদ্ধ) ও মধ্যম (অম্বরগ বা বিবাগহীন—উদাসীন) অভিপ্রায় বশতঃ ও আহারের পরিণাম বৃক্ষিয়া শয্যা রচনা করা, অর্থাৎ শয়নকারীর তৎকালিক মনের ভাব বৃক্ষিয়া তদনুসারে শয্যা প্রস্তুত করা”—৬ম ভাগ পালের সংস্করণ।

৯ বঙ্গবাসী সং, কামহুত্র, পৃঃ ৬৪

১০ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

১১ কঙ্কিপুত্রাণ, পৃঃ ২৩

১২ কৌমুদী, পৃঃ ২৮। আমরা সবিস্তার টীকাকারের আশ্রয় বিবৃত করিয়াছি।

১৩ “উদকে মৃদঙ্গবদ্যাত্মম্”—জয়মঙ্গল।

১৪ বঙ্গবাসী সং, কামহুত্র, পৃঃ ৬৪

১৫ শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

১৬ কঙ্কিপুত্রাণ, পৃঃ ২৩

৩ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—“জলভরঙ্গাদি বাস্ত অথবা জলে মৃদঙ্গাদি বাজের স্থায় বাস্ত করি” ১৭

১২। উদকঘাত—হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎকৃষ্ট জলধাবা ত্যাগ—ইহাই টীকাকারের মত ১৮

পিচকারী ব্যবহার না করিয়া কেবল দুইটি করতলের সাহায্যে ‘এপরের গাত্রে জল ছিটাইবার কৌশল। সাধারণতঃ, জলাশয়ের নানাবিধ সময় জলক্রীড়ার অঙ্গরূপে এই কলাটির প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শুধু দুইটি হাতের সাহায্যে এমন কায়দায় জল ছড়িতে পারা যায় যে, সেই জলধারা পিচকারী হইতে নির্গত জলধারার মত উচ্চামত উপরে নিয়ে সম্মুখে বা পশ্চাতে যে দিকে ইচ্ছা পড়িতে পারে। এই ছিটান জলধারার স্থিরতা বা স্থায়িত্ব ও বেগ বহু অধিক হইবে, বুঝা যাইবে যে কলাটি ততই সুন্দররূপে শাসিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে—নানারূপ কায়দায় পিচকারী দেওয়া ও জলের ফোয়ারা তৈয়ারী করাও এই কলাব অন্তর্গত। মতান্তরে, ‘জলস্তম্ভ-বিজ্ঞা’ও ইহার অঙ্গ।

১৩ তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“কবতলময় পিচকারীর মত কবিতা নানার দ্বারা অঙ্গের গাত্রে জলক্ষেপ। এই নিষ্কৃষ্ট জলধাবার দ্বিবিধক্যতা বেগাবিক্য বা দূরগামিত্বের তারতম্যে এই শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থিতি হয়” ১৯

১৪ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“প্রাচীন পুস্তকে উদকঘাত শব্দে ‘জলস্তম্ভ-বিজ্ঞা’ এইরূপ অর্থ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দ্রুপদ্রোণ জলস্তম্ভ-বিজ্ঞা জানিতেন, তবলে তিনি দ্রোণায়ন হুদে লুকাণিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন উদকঘাত শব্দের অর্থ কোন অর্থ আমরা জানি না। জলময় জাহাজের বস্তু ভেদনকারী ইহা নৈবটী এক্ষণে জলস্তম্ভ-বিজ্ঞার অনুকরণ কথিত থাকে মাত্র” ২০

১৫ সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি ন্যায় করিয়াছেন—“মহাভারতে দ্রুপদ্রোণ জলস্তম্ভে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, কথিত আছে, ইহা সেই জলস্তম্ভ রচনাব কৌশল, প্রাচীন পুস্তকে এরূপ বর্ণিত হয়” ২১

১৬ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—“হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎকৃষ্ট জলধাবা ত্যাগ” ২২

১৭ মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণের অনুবাদে দৃষ্ট হয়—“হস্ত ও যন্ত্রদ্বারা উৎকৃষ্ট ও অবকৃষ্ট উদকধারা ত্যাগ। (ইহাকে কচিং জলস্তম্ভ নামে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সম্ভবণ দেওয়া ও মনোযোগজন্য বিশেষ পটুতা লাভ করা” ২৩

১৭ কৌমুদী, পৃঃ ২৮

১৮ “হস্তযন্ত্রমুস্তৈকদৈবস্তাডনম্। তত্শ্রুতং জলক্রীড়াম্”

—জয়মঙ্গলা।

১৯ .বঙ্গবাসী সং কামহৃত, পৃঃ ৬৪

২০ শিল্পপুস্পাঞ্জলি, পৃঃ ৬

২১ কঙ্কিপুত্র, পৃঃ ২৩

২২ কৌমুদী, পৃঃ ২৮

২৩ কামহৃত, মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, পৃঃ ৮৮, ৮৯

১৩। চিত্র যোগ—‘চিত্র অর্থে নানা-প্রকার। যোগ—উপায়। নানা ব্যাখ্যাতা নানা ভাবে এই কলাটির অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। টীকাকার-বিশেষের বলায়ছেন—নানা প্রকারে পরের দৌর্ভাগ্য সম্পাদন, একেশ্বর-পলিতীকরণ ইত্যাদি ব্যাপার। ঈর্ষ্যাবশে ও পরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল উপায় প্রযুক্ত হইত। এই সকল বিচিত্র যোগের কথা মহর্ষি ‘ঔপনিষদিক’ অধিকরণে বলিবেন বলিয়া টীকাকার উপসংহার করিয়াছেন। ‘কৌচুমার-যোগের’ অন্তর্ভুক্ত এইগুলি হইতেই পারে না; কারণ কুচুমার এগুলির উল্লেখ করেন নাই আর একারণেই ইহার পৃথক উল্লিখিত হইয়াছে ২৪

প্রচলিত বাঙ্গালা-ভাষায় যাহাকে বলে ‘ঔষধ কবা’ বা ‘গুণ করা’—এ কলাটি তাহারই প্রাচীন রূপ মাত্র। কোন একটি বয়স্ক স্ত্রীলোক পতিপ্রেমে বঞ্চিত। অথচ তাহার নবীন সপত্নী পতিব প্রেমে ধরা। ঈর্ষ্যাবশিতা অধিকবয়স্ক সপত্নী এমন ঔষধ প্রয়োগ করিল, অথবা একপ তুচ্ছ-তাক মন্ত্র-তন্ত্রাদি প্রয়োগ করিল যে—পতিস্বখে অধিনী তরুণী সুন্দরী সপত্নীও অকস্মাৎ পতির বিষ-নয়নে পড়িল—পতি আর তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল না—পতিব সহিত তাহার বিচ্ছেদ সজ্জাটিত হইল ২৫ এইরূপ দুর্ভাগ্যের উদয় করিয়া দেওয়া নাম ‘দৌর্ভাগ্যকরণ’। আর ‘একেশ্বর-পলিতীকরণ’ হইতেছে—একটি ইন্দ্রিয়ের হানি ঘটান, যথা অন্ধ কথিত দেওয়া, পাগল করিয়া দেওয়া, পুঙ্খমুখে হানি করা। এগুলি প্রায় ঔষধ-প্রয়োগেই ঘটয়া থাকে ২৬ টীকাকার বলিয়াছেন—ঈর্ষ্যাবশে, অথবা পরকে প্রতারিত বা জ্ঞান কবিবার উদ্দেশ্যে এই সকল ‘ঔষধ করা’ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া কাল চুল সাদা করা, সাদা চুল কলপ ইত্যাদি দিয়া কাল করা, তামাকে সোনা করা, অদৃশ্য হইয়া যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার—বাস্তব পর্বে চক্ষুতে ধোঁয়া লাগে—সে সকলও ইহার অন্তর্গত ২৭ নানারূপ দ্রব্যগুণে এ সকল কাণ্ড সাধিত হয়। কামহৃতের ‘ঔপনিষদিক’ অধিকরণে (৭ম অধিকরণে) চিত্রযোগের অতি বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার কুচুমারের প্রসঙ্গ অবতারণিত করিয়াছেন। ‘কুচুমার’ নামক মহর্ষি কামশাস্ত্রের একজন প্রাচীন একদেবী আচার্য—বাংলায়নবও পূর্ববর্তী। তিনিই প্রথম ঔপনিষদিক অধিকরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে

২৪ “নানাপ্রকারদৌর্ভাগ্যেকেশ্বরপলিতীকরণাদয়ঃ, ঈর্ষয়া পবতিসন্ধানার্থাঃ। তানৌপনিষদিকে বন্ধাতি। এতে চ কৌচুমারযোগেষু নাস্তত্ত্বজ্ঞাতি পৃথগ্ভক্তাঃ, কুচুমারেন তেদামমুক্ত-ধ্বং”।—জয়মঙ্গলা।

২৫ এই প্রকার ব্যাপারের নামই ‘গুণ’ করা।

২৬ এই সকল ব্যাপারের নাম ‘ঔষধ’ করা। প্রায় গুণ করা বা ঔষধ করার মূল হেতু—ঈর্ষ্যা।

২৭ এইরূপ ব্যাপারের নাম ‘পবতিসন্ধান’ বা পরের চোখে ধূলা দেওয়া—ধোঁয়া লাগান। এইগুলি ঈর্ষ্যামূলক নাও হইতে পারে। ভেদকি দেখানই ইহাদের উদ্দেশ্য।

সকল ঔষধের কথা বলেন নাই, সেইগুলিই ‘চিত্রযোগে’র অন্তর্গত।
কুচুমার-কথিত যোগগুলি ২১ সংখ্যক কলায় ‘কৌচুমার-যোগ’
নামে আখ্যাত হইবে।

৬/তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“বিবিধ প্রকার মন্ত্র-তন্ত্র এবং ঔষধ
যাহার দ্বারা যুবাকে অসুস্থাসঙ্গে অশক্ত করা যায় এবং কৃষ্ণ কেশকে
শুভ্র কেশে পরিণত করা যায় ইত্যাদি ঔপনিষদিক অধিকরণে বিবৃত
হইবে, কিন্তু কুচুমার-যোগ মধ্যে এসকল অন্তর্ভুক্ত হয় না” ১২৮

৭/বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“অদ্ভুত কাণ্ড প্রদর্শন।
ইহা একপ্রকার বাজী” ১২৯

২৮ বঙ্গবাসী সং কামমুদ্রা, পৃ: ৬৪

২৯ শিল্পসুপ্তাঞ্জলি, পৃ: ৬

৮/সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“বোধ হয় ভোজবাজী” ১৩০

৯/কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—“প্রচলিত ভাবার ইহাকে
ঔষধ করা বলে...এটি কামশাস্ত্রের প্রয়োগ-বিশেষ” ১৩১

৩০ কঙ্কিপূরণ, পৃ: ২৩

৭/বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও সমাজপতি মহাশয় যে কামমুদ্রের
টাকা দেখেন নাই—তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহা-
দিগের মতে—চিত্রযোগ নানারূপ অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন—ভেলুকি,
ভোজবাজী, ভানুমতীর খেল ইত্যাদি। কেমিক্যালের সাহায্যে
যে সকল ম্যাজিক দেখান হয়, সেগুলিও এই কলাটির অন্তর্গত
হইতে পারে।

৩১ কৌমুদী, পৃ: ৩১

[ক্রমশঃ

মর্শ ও কর্ম (উপন্যাস)

নয়

চিকিৎসায় যা কিছু সম্ভব, করা হ’ল। অকাতবে অর্থব্যয়
ক’রে অস্ত্রান্ত পরিশ্রম ও শুজ্জা ক’রে বিকাশ হরিনাথ বাবুর সেবা
ক’রলে কিন্তু পাঁচ দিন কোনও মতে টিকে থেকে শেষে হরিনাথ বাবু
মারা গেলেন।

প্রথম অজ্ঞান হওয়ার পর ক্রমে ব্যাধি একটু উপশম হবার
রকম হ’য়েছিল, কিন্তু জ্ঞান আর তাঁর হ’ল না, কাউকে একটিও
কথা ব’লে বাবার অবসর তিনি পেলেন না।

শ্রদ্ধ হ’য়ে বাবার পর ক্রমে তাঁর টাকা-কড়ি খবরাখবর ক’বা
হ’লে যা’ দেখা গেল তাতে সবাই মাথা ঘামাত দিয়ে ব’সলো।

মেসোম’শায় নিজে কিছু ব’লে যেতে পারেন নি। তাঁর
কাগজপত্র ঘেঁটে এবং তাঁর মুহুরীর কাছে অল্পসন্ধান জানা গেল
যে, তাঁর মক্কেলদের কাছে তাঁর পাওনা ছিল পাঁচ ছ’ হাজার, কিন্তু
অল্প মক্কেলদের তাঁর কাছে পাওনাও প্রায় সেই পরিমাণ। লাইফ
ইন্সিওরেন্সে তাঁর পাওনা হবে মাত্র হাজার আষ্টেক। বিকাশ সব
চেয়ে স্তব্ধ হ’য়ে গেল এই দেখে যে, হরিনাথ বাবু বিস্তর দেনা
ক’রেছেন। তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল
কিন্তু তার কতক তিনি অল্প টাকায় পেড আপ ক’রেছেন আর
বাকীগুলি থেকে ধার ক’রেছেন এত যে তা’ থেকে পাওয়া যাবে
মাত্র আট হাজার টাকা। তা ছাড়া বাইবেও তাঁর দেনা দেখা
গেল বিস্তর। মক্কেলদের অনেক টাকা তাঁর হাতে আসতো, তার
হিসাব-নিকাশ ক’রে দেখা গেল যে তা’ থেকেও তিনি বিস্তর ধার
নিয়েছেন। তা’ ছাড়া মহাজনের কাছেও টাকা ধার ক’রেছেন।
এ সব দেনা হ’য়েছে দুই বৎসরে।

সমস্ত ব্যাপারটা বিকাশের চোখের সামনে স্পষ্ট হ’য়ে উঠলো।
এ দুই বৎসর হরিনাথ বাবুর আর ক্রমাগত কমে এসেছে। সঞ্চয়
তিনি কোনও দিন করেন নি, যখন যা পেয়েছেন হাত খুলে খরচ
ক’রেছেন—অর্থাৎ খরচ ক’রতে দিয়েছেন অল্পপূর্ণা দেবীকে।
আর যখন কমে গেল তখন অল্পপূর্ণার ব্যয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে

ডাঃ ব্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কমেনি, ফল কথা আর কমবার খবরও তিনি জানতেন না।
তখনও চাইবা মাত্র বা না চাইতেই মেসোম’শায় তাঁকে টাকা
দিতেন ঠিক আগের মতই। আর তিনিও খরচ ক’রতেন অকুণ্ঠিত
প্রাচুর্যের সহিত।

হরিনাথ মূর্খ ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, উপার্জন থেকে
এই ব্যয়ভার বহন করবার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু অল্পপূর্ণাকে
তিনি জানতেন—জানতেন যে, অল্পপূর্ণার অযাচিত-দান ক্ষুদ্র ক’রলে
তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগবে। অভাবের নিঃশ্বাস মাত্র তাঁর গায়
লাগলে তাঁর যে হুঃখ হবে তা’ নিবারণ করবার একটা দুঃখ
প্রতিজ্ঞা নিয়ে অভাব ও আগামী হুঃখের সমস্ত আঘাত হরিনাথ
পেতে নিয়েছিলেন নিজের বুক, ভবিষ্যতের দিকে চাইতে সাহস
করেন নি, বর্তমানে এ বিপদ কিসে ঠেকান যায় তাই হ’য়েছিল
তাঁর এক চিন্তা।

এই সব কথা স্পষ্ট হ’য়ে উঠলো বিকাশের চিন্তে। এখন
সে বুঝতে পারলো কেন হরিনাথ একলা অন্ধকার ঘরে ব’সে
থাকতেন সন্ধ্যা বেলায়।

ভারী হুঃখ হ’ল তার—আগে কেন সে এ কথা বোঝে নি।
তবে হয় তো সে তার উপার্জনের ভরসা দিয়ে মেসোম’শায়ের
হুঃখিত্য বরাহ কমাতে পারতো। চাই কি অল্পও দুঃসাহসিক
চেষ্টা ক’রে এত উপার্জন ক’রে তাঁকে দিতে পারতো যাতে তাঁর
জীবন হয়তো এত শীঘ্র নষ্ট হ’ত না।

যা’ হ’ক, মোটের উপর দেখা গেল, সব দেনা-পত্তর দিয়ে খুয়ে
হরিনাথের রাঁচীর বাড়ীখানা থাকে, আর থাকে কিছু ভূসম্পত্তি,—
দেশে ও রাঁচীতে যার পরিচয় বা পরিমাণ বিকাশ কিছুই জানতে
পারলে না। তার খবর জানে শুধু অনন্ত—কিন্তু সে নীরব!

বিকাশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে মেসোম’শায়ের কিছুই সে
ক’রতে পারেনি; কিন্তু যে কঠোর ব্রত নিয়ে তিনি শেষ জীবন
কয় ক’রেছেন তার উদ্ভাষন যতদূর সাধ্য সে নিজে করবার চেষ্টা
ক’রবে। যতদূর তার সাধ্য—অল্পপূর্ণার অস্বাভাব—কোনও কিছু

অভাব যেন কোনও দিন না হয়, এই হবে তার জীবনব্যাপী সাধনা। মেসোম'শায়ের আশীর্বাদ তার মনে হ'ল, ভরসা হ'ল সেই আশীর্বাদ নিয়ে সে তাঁর পরিবারকে অন্ততঃ আনন্দ দান ক'রতে পারবে।

তাই বিকাশ তার মাসিমাকে বললে, “চলুন মাসিমা, আমার সঙ্গে ক'লকাতায় আমার কাছে। মেসোম'শায় গেছেন, আমি আপনাদের সন্তান, অযোগ্য হ'লেও আপনাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে। চলুন।”

মাসিমা কেঁদে বললেন, “যাব কোথায় বাবা? খাব কি? কেমন ক'রে চলবে সংসার?”

“সে ভার আমার মাসিমা। আপনাদের আশীর্বাদে সে ভার বইবার শক্তি আমার আছে।”

“কিন্তু কেমন ক'রে যাই বল। এত বড় সংসার, এতগুলি আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে”—

“ক'লকাতায়ও আপনাকে আশ্রয় ক'রে বারা থাকবার তারা থাকবে, আপনাই সংসারে। আমি বলি এ বাড়ীখানা বেচে ফেলে যে টাকা হবে তাই নিয়ে ক'লকাতায় চলুন, আপনাব আশীর্বাদে যাতে আপনার কোনও কষ্ট না হয় সে উপায় আমি ক'বতে পারবো।”

এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে মাসিমার সময় লাগলো। তাঁর এতদিনকার সাধের ঘরবাড়ী ছেড়ে যেতে তাঁর প্রাণ আবার নূতন কবে স্বামীর বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হ'লেন।

কিন্তু বাগড়া দিলে অনন্ত। সে বললে, “জ্যেঠাম'শায়ের এত বড় নাম, এতখানি সম্মান—এ বাড়ীখানা বেচে নিঃশেষ ক'রে দিতে সে কিছুতেই দেবে না। এ ওজুহাত যখন বিশেষ টেকবার সম্ভাবনা রইল না, তখন সে স্বমুষ্টি প্রকাশ ক'রে বললে, এ বাড়ী তো জ্যেঠাম'শায়ের একার নয়—যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, তাতে তার ও বসন্তের অর্ধেক ভাগ, তাদের সম্মতি ছাড়া এটা বেচা হ'তে পারে না।

কথাটা শুনে মাসিমা সিংহীর মত গর্জে উঠলেন, বললেন, “এটে, অংশ আছে ওর। যখন ওর বাপ এসেছিল এখানে, তখন সে ছিল নেংটে ভিখারী। দেশের সম্পত্তি সব লাটে উঠিয়ে তিনি এসেছিলেন দাদার ভাই হ'তে। তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'বেছি, তার ছেলপিলেদের মানুষ ক'রেছি—ওকে সব বিষয়ে কড়া ক'রে রেখেছি—এখন বলে কিনা ওর সম্পত্তি। কাগা-কডিও পাবে না ও—বেচে ফেল বাড়ীখানা, দেখি ও কি ক'রে। অংশীদার ঘুচিয়ে দাও।”

বিকাশ কিন্তু বাগড়াটা চাপা দিলে। সে উকীলদের কাছে গুনলে যে, বাড়ীতে তার মাসিমার শুধু জীবন-স্বত্ব। তিনি মায়া গেলে পাবে তাঁর দৌহিত্র অমল। মাসিমার দান-বিক্রীর অধিকার নেই, কাজেই তিনি যেচলে বাড়ীর দাম হবে না। তাই বাড়ী বেচবার কথা একেবারে চাপা দিয়ে সে বাড়ী ভাড়া দেবার প্রস্তাব করলে।

অনন্ত বললে, “ভাড়া দেওয়া চলবে না। আমার ক'লকাতার জল সইবে না। আমি এখানদেই থাকবো।”

বিকাশ এইবার মুখ ফুটে কথা কইলে, বললে, “থাকবেন যে থাকবেন কি? এতদিন তো একপরস্পা রোজগার করলেন না, এখানে চলবে কিসে? বরং ক'লকাতায় গিয়ে একটা রোজগারের চেষ্টা করুন। এখন তো আর মেসোম'শায় নেই যে অটেল টাকা এনে দেবেন।”

খুব তীব্র দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চেয়ে অনন্ত বললে, “কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। দেড়শো টাকার মাইনের কেরানী হ'য়ে মাথা কিনে বসেছেন। ফের অমন কথা বলবি তো তোর মুখ ভেঙে দেবো, জানিস?”

বিকাশের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো, সে আত্মসংবরণ করতে পারলে না, ভকুটি ক'রে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে বললে, “মুখ ভেঙ্গে দেবেন? পারবেন? সে শক্তি আছে আপনার?”

অনন্ত তেড়ে-ফুঁড়ে গেল বিকাশকে মারতে। তার গাল লক্ষ্য ক'রে অনন্ত যে ঘুসি তুলেছিল, বিকাশ তাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অনন্তের দুই হাত ধরে তাকে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে কেলে দিলে করাসের উপর।

অনন্ত দেখলে, আর অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। বিকাশের বলিষ্ঠ বাহুর কাছে তার আফালন শুধু লাঞ্ছনার আমন্ত্রণ। তাই যদিও তার লেগেছিল খুব অল্পই, তবু সে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলে, যেন বিকাশ তার হাড়গুলি একদম চূরমার ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে।

বিকাশ ঘুণায় মুখ কিরিয়ে চলে গেল। মাসিমার কাছে গিয়ে বললে, “থাক গে মাসিমা এবাড়ী, আপনি চলুন।”

দশ

ক'লকাতায় গিয়ে বিকাশ একশো টাকা ভাডায় একখানা বাড়ী নিলে। মাসিমাকে আনতে গিয়ে দেখলে যে, তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে এবং নাতি-নাতনী ছাড়াও এলো বসন্ত, গীতা এবং অনন্তের বড় ছেলে। সে ভেবেছিল এরা সব অনন্তের সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু না এরা মাসিমাকে ছাড়ে, না মাসিমা ছাড়েন এদের।

মেসোম'শায়ের মৃত্যুর পূর্বে আবেগের মুখে বিকাশ মাসিমা ও তাঁর পরিবারের সমস্ত অভাব দূর করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর মাথা ঠাণ্ডা হ'তেই এ দায়িত্বের কথা মনে হ'তে তার বুক কেঁপে উঠলো। সে ভাবলে যে, তার পক্ষে এই হাতী পোষার চেষ্টা একটা দুঃসাহসের কাজ। হরিনাথবাবুর পরিবারের স্বচ্ছলতার ভিতর বারা মানুষ, তাদের খুব বেশী কষ্ট সহিতে বলতে সে পারবে না। অথচ এই বৃহৎ পরিবার ক'লকাতায় রেখে পালন করবার শক্তি তার নিতান্ত অপ্রচুর। তার স্থায়ী আয় মাসে দেড়শো টাকা। ফটকায় তার যে দশ হাজার টাকা লাভ হ'য়েছিল তার আট হাজারের বেশী খরচ হ'য়ে গেছে মেসোম'শায়ের চিকিৎসায়, শ্রাদ্ধে আর তাঁর পরিবার ক'লকাতা আনতে। তার হাতে এখন আছে মাত্র হাজার দু'শেক।

তবু বিকাশ বললে, কোনও চিন্তা নেই, একটা উপায় হবেই। তার মনে পড়লো মেসোম'শায়ের শেষ আশীর্বাদ। মনে হ'ল, যে মহাপ্রাণ ধনী পরিজন ও দরিদ্রের সেবায় মিঃস্ব হ'য়ে সংসার

ভাগ্য ক'বে গেছেন, তাঁর আশীর্বাদ কখনও নিফল হবে না, হতে পারে না। তাঁর পরিবারকে অন্ততঃ আনন্দ বিতরণ ক'বাব শক্তি সে পাবে।

ভেবে চিন্তে সে গেল আবার পাটের কাটকাব বাজারে। 'ব্রোকারের কাছে খবরাখবর নিয়ে জানলে যে বাজার এখন বড় খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না। যতীনবাবু, যিনি তাকে প্রথম এ বাজারে নামান, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন, "খবরদার বিকাশবাবু, এখন ছোঁবেন না পাট। একটা প্রকাণ্ড জুয়াখেলা শীগগির হবে বোধ হচ্ছে। এখন কাজ করতে পারবে শুধু বড় বড় কুমীপেগা—চুণো-পুঁটির ও বাজার থেকে তফাৎ থাকাই ভাল।"

ভডকে গেল বিকাশ এ খবর শুনে। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে সে সামান্য এক হাজার বেল বেচতে অর্ডার দিয়ে এলো ব্রোকারকে। একটু পরেই ব্রোকার বললে, "বেচা হয়েছে।" কি হয় না হয় ভাবতে ভাবতে বিকাশ অফিসে গেল।

আজই তাব ছুটি ফুরিয়েছে, আজই সে প্রথম অফিসে এলো। তার বাবার একটু পরেই আফিসের একটা চাপবর্শী তাব কাছে একখানা কাগজ নিয়ে এলো। সেটা পড়ে বিকাশ লাফিয়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি একটা সই ক'বে দিয়ে সে কাপতে কাপতে আবার সে কাগজখানা পড়তে লাগলো।

সে যখন কাছে ভর্তি হয় তখন ছয় মাসের জগা প্রোবেশনাব বা শিক্ষানবীশরূপে তাকে নেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল যে ছয় মাস পরে তাকে একটা স্থায়ী চুক্তি ক'বে ঢাকনী দেওয়া হবে। মেসোমশায়ের ব্যাধি ও মৃত্যুর গোলযোগে বিকাশের পেয়াল ছিল না যে তাব ছয় মাস পূর্ণ হ'য়ে গেছে এখন তাব স্থায়ী চুক্তির জগা সাহেবের কাছে একটু গদ্বব করা দরকাব।

এই কাগজে সে দেখতে পেলো যে তদ্বিবেব অভাবে তাব কোনও ক্ষতি হয় নি। তাকে আড়াই শো থেকে পাচ শো টাকাব গ্রেডে পাচ বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত করা হ'য়েছে।

এ খোস খবরটা মাসিমাকে জানাবার জগা উৎসাহে অর্দাব হ'য়ে আফিসের ছুটি হ'তেই সে একখানা ট্যাক্সী ভাড়া ক'বে চ'লে ব'সলো।

চ'লতে চ'লতে তার মনে হ'ল যে এ "কন্ট্রাক্টটা যখন হ'লই তখন মিছামিছি কাটকার বাজাবে কাজটা না ক'রলেই হ'ত! কে জানে কত টাকা লোকসান দিতে হবে তাতে।

তারপর তার উল্লাস হঠাৎ ছায়াছন্ন হ'য়ে উঠলো তাব মেসো-মশায়ের কথা ভেবে। যিনি তাঁর এ উন্নতির সংবাদে সব চেয়ে খুসী হ'য়ে তাকে আশীর্বাদ ক'রতেন তিনি আজ নেই। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস কেলে সে মরণ ক'রলে তার রোজগারের দেড় শো টাকা পেয়ে তিনি কি আনন্দ কি কৃতার্থতা দেখিয়েছিলেন। সে তো অবসর পেলো না তাঁর সে আনন্দ বাড়াবার। আর, দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে সে ভাবলে, তার এ উন্নতির সংবাদ নিয়ে সে যদি মেসো-মশায়কে ব'লতে পারতো যে আমার বা কিছু সবই আপনার, তবে

কি মেসোমশায় আপনাকে হৃদয়স্তার অমন কীণ করতে পারতেন? না অত শীঘ্র মাথা যেতেন? . . ."

তাব সেই দেড় শো টাকা মেসোমশায় সত্যই খরচ করেন নি। তাঁর ডয়ার খুঁজে বিকাশ দেখতে পেয়েছিল একখানা স্পন্দন্ত এলবামে তিনি এঁচে রেখেছিলেন সে নোট কয়খানা যটোয়াফের মত ক'রে, তার উপর লেখা ছিল, "বিকাশের দেওয়া উপহার ১৫০০"!

বাড়ী এসে যখন সে খবরটা দিলে তখন সবাই বললে 'বেশ', মাসিমাও বললেন, 'বেশ', কতকটা আসান হবে তোব, কিন্তু তেমন উল্লাস ক'বলে না কেউ। গভীর বেদনার সঙ্গে সে কল্পনা করতে লাগলো কি আনন্দ ক'বতেন তাঁর মেসোমশায় যদি তিনি এ খবর শুনে পেতেন।

সব চেয়ে অসহ্য হ'ল তার গীতার কথা। তার মাইনে বাড়াবার খবর পাবার পর গীতা এসে তাকে বললে, "বিকাশ দা' আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি কথা?"

"খাক, নাই বললাম, হয় তো তুমি বলবে জ্যাঠামী ক'বছি।"

বিকাশ একটু লঘু স্বরে বললে, "তা' অবিশ্যি বলবো, কিন্তু তাই বলে কথাটা শুনলে হানি কি?"

"বলছিলাম কি? মাইনে বাড়লে বলে তুমি সাত তাড়া গল্পড আবার বাড়াব সবাব জগে প্রজেক্ট আনতে চুটো না। মিছা-মিছা টাকা খরচ কেন ক'ববে? অমন রোজগাব যে জ্যাঠামী'শায় ক'রতেন, সব কোথায় গেল দেখলে তো? তুমিও সেই ভুলটা ক'বো না। বাড়তি টাকাটা বেখে দিও ব্যাঙ্কে।"

"দেখ, তোব একখাটা জ্যাঠামীরও ওপরে উঠেছে, এ বেশক ডেপোনা! বলেই হয়ত গল্পড হ'য়ে বললে, "আব দেব একটা কথা তুই সর্কদা মনে রাখিস। মেসোমশায় মাহুগ ছিলেন না, দেবতা—দধাটিব মত ত্যাগী। তাকে কোনও দিক দিয়ে খাটো ক'রে বা তাঁব কাজের উপর কোনও সমালোচনা ক'রে কোনও কথা অন্ততঃ আমার কাছে তুই বলস না—আমি তাঁর নামে এমন কোনও কথা কোনও দিন শুনতে চাই না।"

গীতা আর কিছু না ব'লে চ'লে গেল।

এই বোল বছরের মেয়েটার এতটা ষ্টুটায় সে ভয়ানক বিবক্ত হয়ে গেল। গীতা বা' বললে সে ছাঁকা সত্যি কথা, বুদ্ধিমানের যুক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ উপদেশ সে তাকে দিতে আসে কি সাহসে? আব তা' ছাড়া যতই বুদ্ধিমানের যুক্তি হ'ক, তার কথা মানবার উপায় বিকাশের নেই। মাসিমা চিরজীবন মেসোমশায়ের রোজগারের সব টাকা খরচ করে এসেছেন। অনন্ত অবশ্য তাঁর কাছ থেকে অনেক টাকাই নিয়ে খরচ ক'রেছে, কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে ছাড়া যতই বুদ্ধিমানের যুক্তি হ'ক, এখন তাঁকে বিকাশ কোন প্রাণে বলবে যে, আমার এই সামান্য আড়াই শো টাকা আপনি খরচ ক'রতে পারবেন না। এই সামান্য টাকা খরচ ক'রে তাঁর কোনও তৃপ্তিই হবে না, কিন্তু তার যা সাধ্য তা সে ক'বে মাসিমার অভিশপ্ত জীবনে তৃপ্তি দেবার জগা।

বিকাশ স্থির করলে গীতার স্বেচ্ছিক যুক্তি সে শুনবে না, তাব মাইনের সব টাকাই সে মাসিমাকে দেবে। তিনিই সব খরচ করবেন। ভাবলে এই গীতা মেরেটার মনে কৃতজ্ঞতা নেই এক ফোঁটা। মাসিমার অপব্যয়ের কথা সে তোলে কিসে? গীতার সাদী জামা গয়নার যে বাহুল্য সে যে সেই অপব্যয়েরই ফল।

মাস কাবার হাব আগুই বিকাশের হাতে এসে পড়লো অনেকগুলি টাকা।

একদিন যতীনবাবু তাকে বললেন, “দেখলেন তো বিকাশবাবু, বা’ বলেছিলাম তাই। বড় বড় ব্যবসায়ীরা মিলে ভড় ভড় করে বোজ পকাশ সাত হাজার গাঁইট বেচে দামটা কি ভীষণ নানিয়ে দিয়েছে! সাথে আমি আপনাকে এই বাজাবে খেলতে বাধ্য করেছিলাম।”

বিকাশ হেসে বলল, “আমি কিন্তু আপনাব পবামর্শ মানিনি যতীন বাবু—আমি বেচেছিলাম এক হাজার গাঁইট।”

“বেচেছিলেন? তবে তো কেলা মেবে দিয়েছেন! গাঁইট পছন্দ দশ টাকা—দশ হাজার টাকা পেয়েছেন তা’ হলে।”

হেসে বিকাশ বললে, “তা’ পেয়েছি।”

“খুব জোব কপাল আপনাব। ফাটকাব বাজাবে আপনি ছুঁলেই দেখছি টাকা আসে।”

“তাই দেখছি। শুধু ফাটকা নয়—একবার বেস খেলেছিলাম, তাতে পেয়েছিলাম একদানে এক হাজার।”

“বটে। বেশ। কিন্তু কপালের উপর খুব বেশী ভরসা করবেন না। লক্ষ্যী যে কখন হাসান কখন বাদান তাব সিকানা নেই। এখন যখন আপনাব দিন চলছে ভাল, তখন এ টাকাটা দিয়ে ইমফ্রভমেন্ট ট্রাষ্টেব নতুন স্বীমে খানিকটা জায়গা কিনে ফেলুন।”

যতীনবাবু সেই দিনই বিকাশকে নিয়ে গিয়ে ইমফ্রভমেন্ট ট্রাষ্টেব দশ কাঠা জমী কিনিয়ে দিলে। বিকাশ আট হাজার টাকা নগদ দিলে, বাকীটা কিস্তীবন্দী কবে নিলে।

বাড়ী ফিবে সে ছ’ হাজার টাকাব নোট মাসিমাব হাতে দিলে।

মাসিমা আশ্চর্য হ’য়ে বললেন, “ছ’ হাজার টাকা পেলি কোথায় বে?”

“ছ’ হাজার নয় মাসিমা, পেয়েছি দশ হাজার—আট হাজার টাকায় দশ কাঠা জমী কিনেছি আর এ ছ’ হাজার বাড়ীতে এনেছি।”

মাসিমা বললেন, “বেশ করেছিস।” তা রেখে দেগে।

বিকাশ বললে, “আমি রেখে দেবো কি মাসিমা? আপনি রাখুন, আপনি খরচ করবেন। ভেবেছেন আমি খরচের ঝক্কি পোহাতে যাব?”

মাসিমা এইবারে হেসে বললেন, “পাগল ছেলেব কথা শোন! ঠিক তোব মেসোর ছবি। তা’ বেশ। ও গীতা, এ টাকাগুলো তুলে রাখ তো মা।”

গীতা এলো, মাসিমার হাত থেকে ছ’ হাজার টাকাব নোট নিয়ে গেল, অত্যন্ত অগ্রসর চিলে। একটা ক্লিষ্ট অগ্রসর দৃষ্টি ছেনে গেল বিকাশের দিকে।

বিকাশেব মনটা খুসী হ’ল এই ভেবে যে, এটা গীতার সেদিনকার জ্যাঠামীব খুব মুখেব মত জবাব হ’ল।

গীতা এব শোধ তুললে পরেব দিন বিকাশের হাত দিয়েই। ওই ছ’ হাজার টাকাব বেশীভ ভাগই সে মাসিমার কাছে নিয়ে কিনলে গয়না—বেশীভ ভাগ তাব নিজের আব কিছু স্মারলীব।

গয়না কিনে খুব খুসী মনে হাসতে হাসতে সেগুলো বগন গীতা সিন্দুকে তুলছে তখন বিকাশ এসে বললে, “আমাব কাছে যে বড় লেকচার ঝাড়ছিলি পরসার অপব্যয় না করতে, এখন তো টাকা আসতেই তুই দিব্যি মোটা টাকা বাজে খরচ কবিয়ে ছাড়লি গীতা।”

গীতা হেসে চোখ ঘুবিয়ে বললে, “তা কি কবো? তুমি যখন টাকাব হাবিবলুটই দেবে তখন আমি যা পাবি ঝুড়িয়ে নেবো না? জান তো? মেয়ে মানুষ বোজগাব কবে না, তাবা এমনি কুড়িয়ে বডমানুষ হয়।”

গীতাব উপর হ’ল বিকাশেব দাবণ ঘূণা। কি ছোট মন, কি নীচ, কি স্বার্থপর মেয়েটা! আবাব মু’ মুখে কী বুলি তাব? বিকাশেব টাকাব জন্ম কী দবদ!

সুবোধ চাটাজীব কথাটা মনে হ’ল মনে, ‘সখেব দবদী।’ সে কথা বিকাশেব সম্বন্ধে পাটে না, পাটে গীতাব সম্বন্ধে।

[ক্রমশঃ

গান

আমাব ফুলে গাঁথা মালা
তুমি নিলে,
তোমাব ফুলে আমাব ডালা
ভরে’ দিলে।

এই যে দেওয়া, এই যে চাওয়া,
এরই মাঝে পরম পাওয়া,
তাইতো স্নেহে আকাশ ছাওয়া
মোর নিখিলে।

তোমাব যখন হারাই আমি,
আমাব তুমি ডাকো,
তোমাব ভুলে থাকি যদি,
তুমি ভোলো নাকো।

ত্রিঅর্জিত ভট্টাচার্য্য, বি-এ,

এই যে ভোলা, এই যে ডাকা,
এরই মাঝে ভাবলো ফাকা
ভাল-বেতালের স্বপ্নে মাথা
সুবেব মিলে।

বেয়াড়া বর্মণের ডায়েরী

ঐনরেশ চন্দ্র পাল

এক

বক্তব্যের চেয়ে ভূমিকা লিখি করিয়াছি নেহাৎ দ্বারে ঠেকিয়া।
নহিলে G.B.S.-এর অল্পকাল করিবার কোন অভিপ্রায়ই ছিল না।
মূল গোপন করিতে পারিলেই মৌলিক হওয়া যায়। কিন্তু
করিতে পারিলে ত! এই স্বাক্ষরাক্ষর লেখনীনিঃসৃত, সেই
C.B.M. Joad মহাশয় পারেন নাই। তাঁহার নাকাল হওয়ার
ইতিহাস তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। সমালোচক ও তাঁহাদের
গুণচরদের শকুনিষ্ট সন্ধানী আলোর মত চরাচর খাঁটিয়া
কিরিতেছে। সাহিত্যের রাজপথে চোরাই মালের কারবার কোন
কালেই সহজ ছিল না। এখন ত অলি-গলিও আর নিরাপদ নয়।
সুতরাং বামান্ন চন্দ্র ধরা পড়িবার আগেই কবুল খাইতেছি।
সততার সূন্যের আশায় মৌলিকতার মোহ কাটাইলাম।

অপ্রত্যাশিতভাবে কিঞ্চিৎ মাল হস্তগত হইয়াছিল। কাঁচা
মাল অবশ্য ডায়েরীপর্বীজাকারে ভবিষ্যৎ সাহিত্যমহীকতের
স্বমহতী স্তম্ভ সন্ধাননা। আমি ত একেবারে লাকাইয়া উঠিয়া-
ছিলাম। এবার আমার পায় কে? সাহিত্যিক হইবার সাধ
আছে, খসচ করনা আমাকে ছুঁইয়াও যায় নাই। এদিকে নিজের
জীবনটি এমন গম্ভীর-বে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বাড়াইয়া
ওড়াইয়া গল্প বানাইবার আশা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি। এমন
সময় দিন এই সুযোগ। বৃষ্টিতে পারিলাম সম্ভাবে সাধুভাবে
জীবন ব্যয় করিলে ভগবান একভাবে না একভাবে পুরস্কার দিয়া
থাকেন। হরি হে, তুমিই সত্য। প্রচুর মাল-মশলা ত হাতের
কাছে কাইয়া দিলে, এবার সাহিত্য-সৌধ গড়িয়া তুলিতেই যা
কেরী। কিন্তু ঠাকুর, সমালোচককে কি তুমিই ঠেকাইতে পারিবে।
বলি ধরা পড়? ভাবিয়া, হরিবে বিবাদ উপস্থিত হইল। শেষে
কবুল খাইয়া ঠিক করিলাম।

ব্যাপারিনা এই। আমার এক বন্ধু গৃহশিক্ষকতা করিতেন।
অসম-সম্রাটের বাড়াইবার জন্ত নয়, পড়ার খরচ চালাইবার
জন্তও নয়। এ ছিল তাঁর একমাত্র পেশা এবং ক্রমে হইয়া
উঠিয়াছিল অক্লান্ত নেশা। সন্ততি নেশা এবং পেশা শুদ্ধ
লোকান্তরিত হইয়াছেন। স্বর্গে নরকে যেখানেই যান, ছাত্রছাত্রী-
দল নিশ্চয়ই জুটাইয়া লইবেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনবৎসরাধিক কাল
মহামান্ন সম্রাটের অধিষ্ঠিত ছিলেন, অল্পদিন হইল মুক্তি পান।
অবশ্য আতিথ্য হইতে ভক্তি নহে। রাজার অতিথিশালা হইতে
একেবারে খাস অতিথিশালায় অর্থাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত
হইয়াছিলেন মাত্র। সেখানেই ধীরে ধীরে জীবনদীপ নিব্বা
গেল। খবর পাইয়া আমার কর্ণধূল হইতে আসিয়া পৌছিয়া-
ছিল। সামান্য জিনিষপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া আবার স্বস্থানে
কিরিয়াছি। সঙ্গে বন্ধুর একখানা ডায়েরী।

স্বল্প পশ্চিমাঞ্চলের নীতিমুত্ৰ সহর। কার্যক্ৰমে দিনপাত
করি। প্রথমে শুণু বীষার লগলগী করিতাম। তারপর পাঁচ
সাতটা কোম্পানীর জিনিষপত্র একত্রী নিই। তাহাতেও
শানার না দেখিয়া হোমিওপ্যাথী ধরিয়া। কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের
বিনিময়ে প্রথমে খান পাঁচেক বই ও তুফের বাক্স, পরে একটি
উপাধি সংগ্রহ করিয়া সকাল সন্ধ্যা রোগীর দ্রুত ধর্ম দিয়া থাকি।

কিন্তু কপালে করলাভাঙ্গা! অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে,
এখন বহুবিধ প্রাইভেট মাষ্টারী সূত্র করিতে হইয়াছে।

অলস মধ্যাহ্নে ডিসপেন্সারী নামলাহিত অখণ্ডসমাকুল (নীচের
তলার কতকগুলি আন্তাবল) ককে বসিয়া আনমনে ডায়েরীর পাতা
উন্টাইতেছিলাম। অকস্মাৎ এক জায়গায় চোখ ঠেকিয়া গেল—
আমার নামে লেখা একখানা চিঠির নকল। নকলখানি পড়িয়াই
আমার চিঠির বস্তার সন্ধানে গেলাম। চিঠি জমাইবার আমার
বাতিক আছে। বাক্স-পেটরায় স্থান হইতে ছিল না বলিয়া শেষ-
কালে বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু ও হরি, আমার
অল্পপছন্দের 'ও কাগজের হুম্ম্যতার সুযোগে হিসাবী গৃহিণী
তাহা সওয়া ন' আনা সের দরে কাবাড়ীর নিকট বিক্রী করিয়া
ফেলিয়াছেন। নিরাশ হইয়া কিরিয়া আসিয়া আবার ডায়েরীতে
মনোনিবেশ করিলাম। যখন বন্ধু উক্ত পত্র দেন, আমি সঙ্গে
সঙ্গেই জবাব দিই, কিন্তু পত্রোক্ত ব্যাপারের শেষ পরিণাম কি
হইয়াছিল তিনি লিখেন নাই।

চোখের স্রুখে যেন বায়োম্পোর ছবি ভাসিয়া বাইতেছে,
একের পর এক, অবিচ্ছিন্ন, অমলিন। কি প্রগাঢ় ভালবাসাই
ছিল আমাদের। কিশোর বয়সে তাঁহাকে কত যে প্রেমপত্র
লিখিয়াছি, মনে হইলে হাসি পায়। গৌরবর্ণ, গোলগাল নাহস-
ছত্বে চোখ। আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে কোন অঙ্গে
তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, অথচ সব মিলাইয়া এক অপূর্ণ
আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন বন্ধুর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত
আকর্ষণ চোখ দু'টিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ইদানীং শীর্ণ
হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষের দীপ্তি যেন
একটু অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ হইতে স্বপ্নালুভাব
কাটিয়া গিয়া এক বুদ্ধু তীব্রতা বিকীর্ণ হইত।

চালচলন কথাবার্তা সবই ছিল অদ্ভুত ধরণের। চরিত্র আরও
চমকপ্রদ। অথবা হয়ত নিবিষ্ট চিত্তে দীর্ঘকাল দেখিলে জগতের
সবকিছু অনন্তসাধারণ মনে হয়। যাই হোক, একই মানুষের
মধ্যে যুগপৎ এত বিভিন্ন বিপরীতমুখী ভাবের সমাবেশ হইতে
পারে, তাহা তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইত।
ভাল যে সে ভালই, মন্দ যে, সে শুধু মন্দ—এই বকম অতিশয় সরল
ধারণা যাহাদের, তাঁহার পরিচয় পাইলে তাঁহার বিশ্বাসপন্ন হইতেন।
উচ্চ আদর্শ, মহৎ কন্দের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয়
বার বার পাইয়াছি অথচ এমন ব্যবহারও দেখিয়াছি, যাহাকে
সুজ্ঞানযত্না না বলিয়া উপায় নাই। বাল্যকালে এক সম্মানী
সম্প্রদায়ের আওতার বাড়িয়া উঠাতে ত্যাগ-বৈরাগ্য-সংযমের
মাহাত্ম্যবোধ তাঁহার রক্তধারায় মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে
সাধারণ মানুষের মত ভোগলিপ্সাও ছিল বেশ প্রবল; অথচ
ভোগের কোন সুযোগই উৎসাহিত হয় নাই। একদিকে মনের মধ্যে
শ্রেয়: ও প্রেয়ের বন্দ; অন্যদিকে অদ্ভুত বুদ্ধি—পরম্পরবিরোধী
এইসব প্রবৃত্তি ও অবস্থার চাপে তিনি এক বিচিত্র জীব পরিণত
হইয়াছিলেন। আমার মনে হইত, কালক্রমে বাক্য আসিলে
যদি তাঁহার শরীর দ্রুত হইয়া পড়ে, তবে শরীর প্রায়বোধক চিত্তের

আকার লইয়া তাঁহার মানসিক ব্যাকুল জিজ্ঞাসার বখাত্ত্ব প্রতীক হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহা আত্মবিরোধ-কমতা থাকায় তাঁহার যন্ত্রণা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। স্বল্প সৌন্দর্য্যবোধ ও সাহিত্য-প্রীতির সঙ্গে নানারকমের স্থূল আসক্তি আসিয়া জুটিয়াছিল। এই ভাবে নানা অকৃত্রিম তৃষ্ণা, বিপরীত ঘটনা ও অসীমাসিত জিজ্ঞাসার ঘাত-প্রতিঘাতে বাত্যাভ্যাদিত তরলীর মত টলমল করিতে করিতে অকস্মাৎ মৃত্যুর অভলে তলাইয়া গেলেন। জীবনসমুদ্রে যে উদ্ভাস্ত পথিক দিশা হারাইয়াছিল, জীবন হইতে অধিকতর রহস্ত-মর মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সে কি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে?

তিন

ডায়েরী ত' নয়, যেন বিধস্ত জীবনের Lumber-room. সমস্তই যেমন এলোমেলো অগোছালো, তেমনি বিচিত্র। আমি ত তাঁহার স্বভাব জানিতাম স্তব্ধাঃ বিম্বিত হইলাম না। কোন কাজেই শেব পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকা তাঁহার ধাতে ছিল না। গীতাপাঠ, ব্রহ্মচর্য্যপালন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, পলিটিক্স এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রশংসনীয় অনেক ব্যাপারে প্রবল উৎসাহে ঝাঁপ দিতেন কিন্তু কোথাও শেব রক্ষা করিতে পারিতেন না। পড়াশোনা লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খান দুই চার উপজ্ঞাস ব্যতীত আর কোন কিছুই শেব পর্য্যন্ত পড়েন নাই। তবু, মলাট-লইয়া কারবার হইলেও একরকমের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিক তদ্ব্যবহার-বলে চিন্তাশীল বিদ্বান্ বলিয়া লোকের মনে ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতেন। তাঁর স্বাভাবিক অস্থিরতার পরিচয় পাইতেছিলাম ডায়েরীর পাতার পাতায়। এলোমেলো, অসংলগ্ন ও অসমাপ্ত অবস্থায় হইলেও মালমশলা এত বেশী যে 'দ্রুদশখানা টুইশন বথ' মহাকাব্য লিখা যাইতে পারে। এই সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আর এক সম্ভাবনাও আমার মনে উঁকি দিতেছিল।

নূতন লেখকের লেখা বৃহত্তর সাহিত্যসমাজে যে পরিমাণে অবজ্ঞাত হয়, পরিচিত মহলে তদধিক কৌতূহল উদ্দীপ্ত কবে। মুষ্টিমেয়ের আগ্রহে অপরিমেয়ের অবহেলা শোবাইয়া যায়। কিন্তু বন্ধুত্বল চাকল্যসৃষ্টি সব সময়ে সুবিধাজনক হয় না। এই ডায়েরীতে বেসব ব্যাপার দেখিতেছি, গল্প সাজাইয়াও যদি নিজের নামে চালাই, তবে শুধু কাল্পনিকতার দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। অপাণ্ডক্তের হওয়া অনিবার্য্য। বলা বাহুল্য, প্রায় সবই যৌন ব্যাপার। তবে শুধু তাই নয়। তাহা হইলে সাহিত্যের উপাদান বলিতাম না। "Sails of his ship were filled with every wind that blew"—জীবনসমুদ্রে যে দিকে বত হাওয়া বয় সব একসঙ্গে আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র তরলীর ক্ষুদ্রতর পালে লাগিয়াছিল। মন্দ মধুর হওয়া এবং নির্ভরম বন্ধা—সব।

বিভূতিবাবুর 'নীলাঙ্গুরী' উপজ্ঞাসের নায়কটিও প্রাইভেট টিউটার কিন্তু কত তদ্যৎ। আজকাল ত অনেক গল্পের নায়কই তাই। অধ্যয়নকক্ষ মিলনকক্ষে পরিণত। কিন্তু উপাদানের বা উপলক্ষ্যের জন্ত নব্বু বিভূতিবাবু লেখার অসামান্যতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে আমার কিছু বলিবার থাকিতে পারে না—বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য

সমালোচক তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। তবে নায়কটির দূর্ব্বতম প্রতিধ্বনিও বাস্তব জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যে মনন-শীলতা, স্বল্প রসাত্মকতা তাঁহার মধ্যে পাই, তাতে তাহাকে স্পর্শ-সুকুমার কবি মনে হয়। চিন্তায় যে শুচি শুভ্র অনবস্ত শালীনতা বহিয়াছে, তাহা পবনসংবত ভদ্রমনোবৃত্তির পরিচায়ক। মাহুকের মধ্যে অহুক্ষণ যে পণ্ড জাগ্রত, তাহার অস্তিত্বই সে অবগত নয়। আবার কেমন রসিক, প্রত্যুৎপন্নমতি। বখাসময়ে বখা-স্থানে ওজন করিয়া লাগসই কথাটি তৎক্ষণাৎ বলা, কখনো বোচাল না হওয়া, কোন অবস্থাতেই অপ্ৰস্তুত না হওয়া—চিন্তায় তদ্র, বাক্যে-কর্ণে ধীর, আচরণে সংবত, একাধারে কবি দার্শনিক বিচক্ষণ এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আমি ত দেখি নাই। অবমানিত, অল্পের জন্ত আত্মবিরোধী, চাকরের অধম বলিয়া গণ্য টিউটার-শ্রেণীর মধ্যে ত' দূরের কথা, অনেক উচ্চ স্তরেও বোধ করি এমন অন্তরে-বাহিরে স্রমাজ্জিত মহাপুরুষের সংখ্যা আড়ালে গোপা যায়। তা ছাড়া মহাপুরুষের মনেও কাদার ছোপ কিছু না কিছু লাগে। নীলাঙ্গুরীর নায়ক যেন একেবারে মালিন্য-মুক্ত। হয়ত বিভূতি-বাবুর সেইরকম অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র এই অসাধারণত্ব সত্ত্বেও এত জীবন্ত যে, মনে হয় নামে মডেল, বসাইয়া তিনি ছবি আঁকিতেছেন। কিন্তু আঁধারশই এরকম নয়। কেরানী মজুর ইত্যাদির জীবন যেমন নানাদিক হইতে সাহিত্যের মাল-মশলা যোগাইতেছে, টিউটার নামধেয় ক্রমবর্ধমান মনুষ্যসমাজের জীবনে সেইরকম উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দেখিতে পাই লেখকগণের একই ঝোঁক। তাহারা কোনরকমে ছাত্রী-মাষ্টারের বিবাহ দিতেই ব্যস্ত। জ্ঞান দরকার, বিবাহের চেয়ে বড় ও ছোট এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অনেককিছু ইহারের ভাগ্যে ঘটে।

আমাব বন্ধুর মধ্যে এই দুলভ শুচিতা ছিল না। সম্পদ যথেষ্টই ছিল কিন্তু দৈন্ত ছিল তার বেশী। বিভূতিবাবুর লেখনী অমর হউক। তাঁহার নিকট সর্ব্বিনয় প্রার্থনা—তিনি এমন একটি চরিত্র আঁকুন বাহার মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে কিন্তু দৌর্ব্বল্যও আছে, জীবনযুদ্ধে যে শুধু ভাগ্যবিড়ম্বনায় নহে, নিজ দোষেও পরাজিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমরা দেখিব, character is destiny (চরিত্রই ভাগ্যবিধাতা)।

ডায়েরী মাত্রই বোধ হয় অল্পবিস্তর এই ধরণের। স্যামুয়েল পীপ্‌স (Samuel Pypse)এর ডায়েরীর কথা সর্ব্বজনবিদিত। এমন যে আমিয়েল (Amiel) তাঁহার জর্ণালেও একটি অবৈধ প্রণয়কাহিনী আছে।

কথার কথা আসিয়া পড়ে। কলেজ ছাড়ার পর হইতে মা সর্ব্বস্বতীকে তাকে তুলিয়া রাখিয়াছি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মারফত এই অভিযোগ শুনিতে পাই, বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার বান ডাকিয়াছিল; এখনও তাহাতে তেমন ভাটা পড়ে নাই। অনেক ভাবিয়াছি কিন্তু অশ্লীলতা সত্বেও মন স্থির করিতে পারি না। মোহিতবাবু "সাহিত্যে অশ্লীলতা" পড়িয়া আরো ঘূলাইয়া গিয়াছি। অশ্লীল নামে কুখ্যাত খান হুঁচার বাংলা বই পাইলে পড়িয়া দেখি। কিন্তু নিজের কিনিবার পয়সা নাই। কিনাইতে

পারি—এতদূরে এমন লোকও নাই। যারা পরসা খরচ করিতে পারে, তারা স্বভাবতই ঠাণ্ডা জিনিষ না কিনিয়া এমন বই কিনিতে চায়, যাহা বার বার পড়িবার প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, ইংরেজীতে যেমন, বাংলা সাহিত্য এখনও তেমন বে-আকর্ষক হইতে পারিয়াছে কি? দেশী ছবিতে যখন এখন পর্যন্ত চুম্বন চলে নাই, হয়ত দেশী উপভাস আরও দু'এক ধাপ অগ্রসর হইলেও বিদেশী বিবস্ত্রতা হইতে বেশ দূরেই আছে।

'হয়ত', বলিয়াছি নাও হইতে পারে। কারণ প্রগতির বাড় বড় বাড়। ধাঁ করিয়া বাড়িয়া যায়। কোন দেশে যখন নূতন কিছু আরম্ভ হয়, তাহার বিকাশে যথেষ্ট সময় লাগে। অল্পকাল যখন তাহার অনুকরণ হয়, তখন তার সিকি ভাগও লাগে না। অনুকরণকারীরা ধাপে ধাপে ত অগ্রসর হয় না—এক লক্ষ ফলটা পাড়িয়া লয়। দৃষ্টান্ত জীলোকের ভোটাধিকার। বিলাতে সাফাজিট আন্দোলন কম বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নাই। এদেশে জীলোকের ভোটাধিকার প্রায় বিনা আন্দোলনে শাসনবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্য জীবনচরিত ও আত্মজীবনীতে যেমনধারা নগ্নতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার কাছে ঘেঁষিবার সাধ্য এখনো অনেকদিন আমাদের হইবে না। বিজ্ঞতকীর্তি বারম্বার কথা না হয় উত্থাপন নাই করিলাম। অনেকে পরসা কামাইবার জন্ত জরীল কাহিনী নিজের নামে প্রচার কবে—অভিজ্ঞতা না থাকিলেও গল্প বানাইয়া কবুল খায়। (যৌন শাস্ত্রেব বইতে যে ধবণেব আত্মকাহিনী থাকে, তাহা বোধ হয় অধিকাংশই এইরকম)। সেই সবও ছাড়িয়া দিতেছি। অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ লোক—ইসাডোর ডানকান প্রভৃতিও আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু জগৎখ্যাত ছিত্রাশেষী জি. বি. এস. নিজের যে প্রাকবিবাহ যৌন অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়াছেন (Frank Harris কৃত জীবনী স্রষ্টব্য), তাহার ও অন্যান্য ওয়াইল্ডের জীবনী লেখক Frank Harris যে আত্মকথা লিখিয়াছেন, ইথেল ম্যানিন, জর্জয়ব প্রকৃতির যে সব স্বীকারোক্তি আছে, এমন কি প্রসিদ্ধ যুক্তিজীবী (Rationalist) C. E. M. Joad নিজের 'যুক্ত দেখি' গোছ আত্মজীবনীতে (Belligerent autobiography) নিজের যৌন-জীবন সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা এদেশের কোন বিখ্যাত লোক করিতে পারিবে না। (ওদেশেও এ সব কবুল খাওয়ার রেওয়াজ অল্পদিন হইল বাড়িয়াছে মনে হয়। বারম্বারের সম-সাময়িক মহাপুরুষস্বরূপ ওয়ার্থসওয়ার্থ এক অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন এবং সারা জীবন কপটতার আবরণ পরিয়াই কাটায়াছিলেন। বৈধদিন হয় নাই, মহাপুরুষের মুখোশ খসিয়াছে। যে প্রণয়িনী ও ঔরসজাত কন্যাকে ত্যাগ করিয়া কবিবর পালাইয়া আসিয়া-ছিলেন, তাহাদের বিবরণ জানা গিয়াছে)। আমাদের দেশে নবীন সেনের "আমার জীবনে" বিবাহবহির্ভূত প্র্যাটোনিক প্রেমের একটা ইঙ্গিত যেন ছিল। বলিয়া মরণ হইতেছে। তবে ইহার সঙ্গে বিশেষ লেখকের সোজাস স্বীকারোক্তির তুলনাই হইতে পারে না। পাকিস্তানের আত্মকথার আত্মগানির্পূর্ণ যে উল্লেখ আছে,

তাহা ধর্মব্যবহার মধ্যেই নয়। জগৎহরলাল আপন জীবন-কথায় যৌনজীবন সম্বন্ধে প্রায় নীরব।

এই নীরবতার জন্ত অবশ্য কোন নালিশ নাই। নগ্নতার কোন সাহিত্যিক মূল্য আছে কি না তাহাও এ স্থলে বিচার্য্য নহে। আমার বক্তব্য এই ছিল যে, আমার বন্ধুর ডায়েরীতে যাহা আছে, তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলে একেবারে অপাঙ্কত্ব হইতে হয়। সুতরাং শুধু যে সত্যতার খাতিরে পরধন আত্মসাৎ করিলাম না, ইহা বলিলে সত্যতারই অপলাপ হইবে।

চায়

ভূমিকা আর শেষ হইতেছে না। বাংলা বলিতে পাইনা বহুকাল। এই বিশ বৎসর পোটের মধ্যে যাহা জমিয়া আছে, সব একসঙ্গে ঠেলিয়া উঠিতে চায়। তাই গল্প লেখার অছিলায় যেন কাগজের সঙ্গেই গল্প করিয়া চলিয়াছি। এদিকে গল্পটি যে মন্থর প্রবন্ধের রূপ ধরিতেছে সে খেয়াল নাই।

বন্ধুর ডায়েরী হইতে যে ঘটনাটি উপহার দিতেছি, তাহাও সব চেয়ে নির্দোষ। এই রকম গল্প আমি পড়িয়াছি অনেক। বাংলা দেশেব প্রায় অর্ধেক গল্পের নায়ক নায়িকাই ত শিক্ষক ও ছাত্রী। তবু লিখিতেছি কেন? এই জন্ত যে এই প্রথমবা এমন একটি প্রণয় কাহিনী পাইলাম, যাহা সত্য ঘটনা বলিয়া আমি মানিতে বাধ্য। আমার বন্ধুমল ধারণা বাস্তব জীবনে গল্পের মত কিছু ঘটে না। মধ্যবয়স অনেকদিন 'পার হইয়াছি' কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতব কোঁতল থাকা সত্ত্বেও কল্পনাকালে ঘরে বাহিরে কুত্রাপি নাটক-নভেলের মুখর (demonstrative) প্রেম চাক্ষুষ কবি নাই। ভালবাসা সম্বন্ধে কথা কহিতে হয়, ইনাইয়া বিনাইয়া নানাছাদে প্রেম নিবেদন করিতে হয়, ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটু বিসদৃশতা লুকাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের, জীব নামে লেখা, যেসব পত্র ইদানীং বাহির হইয়াছে, তাহাঁদের সাজায্যে আমার কথা স্পষ্ট করিতে পারিব। জীব নামে লেখা কবির পত্র;—বিজ্ঞাপন পড়িয়াই উত্তেজিত হইয়া অর্ডাব দিলাম। বই আনাইয়া দেখি—না ভাল একটা সন্ধান, না কিছু। ছত্রিশখানা পত্র কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা ভালবাসার কথা কোথাও কি থাকিতে নাই! সন্ধানটা মামুলীর চেয়েও মামুলী—ভাই ছোট বউ, ভাই ছুটি। কিন্তু নাই থাকিল মুখরতা। এই পত্রগুলি পাঠে মনে হয় না কি যে প্রতিছন্দ্রে আত্মসম্মতিত প্রেমপাত্র উপচাইয়া পড়িতেছে—কুলপাত্রিনী সুরমুনী যেন শতধারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সংসারকে পূণ্যান্নান করাইতেছেন। জীবনে ত এই, কিন্তু কল্পনায়? শেষের কবিতার অতি সুন্দর মাদক মনো-বিলাস। মামুলিগুলি যেন জন্ম হইতেই কথার মারপ্যাচ অভ্যাস করিয়াছে।

যাহা বলিতেছিলাম। যেহেতু মাষ্টার ছাত্রীর প্রেম এই পশ্চিমাকালে এখনও দৃষ্টিকটু ব্যাপার, সেইজন্ত গল্পের আবরণেও ঐ ঘটনাগুলি নিজের নামে চালাইবার লোভ সঞ্চার করিলাম। আড়ালে আড়ালে লোকচক্ষুর অন্তরালে ব্যাপার বোধ করি

সর্বত্রই সমান কিন্তু শিক্ক, ছাত্রীর প্রেম বা বিবাহ এখনও এদিকে খেলাখুলিভাবে পাও ফের হইরা উঠে নাই। হিন্দী উর্দু গল্প উপজ্ঞাসে বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু কই বিশ বৎসরের মধ্যেও ত এই লক্ষ্যবিন্দু লোকের নগরে এমন বিবাহ চোখে পড়িল না। অথচ টিউটার-ব্যাধি এখানে বাংলার চেয়ে কম ব্যাপক নয়। অথবা হয়ত বাংলা দেশেও গল্পেই শুধু হয়, জীবনে হয় না। কলিকাতা হইতে আগত বন্ধুরা যে সব রোমাঞ্চকর গল্প বলেন, সংবাদপত্রে বাহা মাঝে মাঝে পড়া যায়, তাহা বোধ হয় ব্যতিক্রম মাত্রই। সত্য হইলে যে তেমন আপত্তি আছে তাহা নয়। প্রেমজ বিবাহ প্রচলিত হইলে অভিভাবকেরা অন্ততঃ কষ্টাদায় ও বরপণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন (এক বন্ধু বলেন, তিনি টুইশনের জন্ত গেলেন বাড়ীর কর্তা গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহিত জানিতে পারায় অল্পদিন পরেই তাহার সেই কাজ যায়)।

তবে একটা কথা। সাহিত্যে আজ চলিলে জীবনে কাল চলিবে। সাহিত্য ও জীবন, পরস্পর-নিয়ামক। লেখকেরা হয়ত আজ শুধু নিজের অতৃপ্ত ভোগলিপ্সাকে শাস্ত করিবার উপায় খুঁজিতেছেন, কল্পনায় ধ্যান করিয়া হৃদের সাধ ঘোলে মিটাইতেছেন। ক্রমে এই রকম লেখার ফল কলিবে। সাহিত্যে যে আকাঙ্ক্ষা ভাবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, কালে তাহাই সমাজ-জীবনে রক্তমাংসের মূর্ত্তি ধরে। সাহিত্যের দ্বারা সমাজের এই ভোলবদল সহসা হয় না বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে যে হয়, তাহার প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। ইহা ভাষা বদলের দৃষ্টান্তমাত্র। ভাববদল তার পরের ধাপ।

আগে বলিয়াছি আমি মাঝে মাঝে টুইশনি করি। বাংলা দেশ হইতে আগত একটি মেয়ে অল্পদিন পরীক্ষার আগের দিন পনেরো, আমার কাছে পড়িয়াছিল। এদেশে চোখ বলসানো বৎ দেখি নিটোল স্বাস্থ্য দেখি, দীর্ঘায়ত পালোয়ানি চেহারা দেখি কিন্তু এমন স্নিগ্ধ লাভণ্য দেখি না। মেয়েটি তব্বীও ছিল না, শিখরদশনাও নয় পকবিধাধরটর ত নয়ই। কিন্তু শ্রামা বটে। বাংলা মাংয়ের শ্রামলতারই প্রতীক। এমন নয়ন জুড়ানো সজল স্তকোমল আভা বহুকাল দেখি নাই। রোদের চশমা (sunglass) চোখে লাগাইয়া দেখিলে যেমন চরাচর বড় স্নিগ্ধ লাগে, তাহার দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইলে সবকিছু তেমনি কোমল ঠেকিবে, মনে হইত। সেই লাজনব্রা কিশোরীই কিন্তু একদিন আমার পিলে চমকাইয়া দিল।

অনেকদিন আগেই পড়ানো শেষ হইয়াছিল। বিকালের দিকে খেলার মাঠে পায়চারী করিতেছি, দেখি রাণী আমারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু একি! সঙ্গে দুই মিলিটারী যে! দম্ভর মত বিস্মিত হইলাম। বাপ, মা, মেয়েকে চোখে চোখে রাখেন, একেলা বাহির হইতে পারে না। আমার মনে পড়ে, পড়ানো বন্ধ হওয়ার দিন সাতেক পরে তাহার সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হইয়াছিল। দুই একটা কথা হইয়াছে কি না হইয়াছে, এমন সময় থমথমে মেঘের মত মুখ রাণীর বাবা উপস্থিত। আমার নমস্কার গ্রাহ্যই করিলেন না। মেয়েটিকে থমক দিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। বুঝিলাম পড়াইয়াছি ত

পড়াইয়াছি, এখন আর পরিচয় রাখা চলিবে না। প্রায় পঞ্চাশ হইলেও আমি যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহাতীতভাবে বৃদ্ধ নহি—এই-জন্ত বোধকরি পড়াইবার সময় একটি ছোট্ট মেয়ে কামরায় উপস্থিত থাকিরা পাহারা দিত।

সেই রাণী আসিতেছে হু'জন মিলিটারীর সঙ্গে। কাছে আসিলে দেখিলাম পুরুষই বটে তবে বড় ছেলে গোছ পুরুষ। একজনের চেহারার সঙ্গে রাণীর এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য যে মনে হইল বুঝি তাই বোন। ভাবিলাম, হবেও বা, আমি ত আর ওদের সকলকে চিনি না। কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিলাম।

ততক্ষণে তাহার একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। রাণী পরিচয় করাইয়া দিল—

মাষ্টারমশায়, ইনি আমার বন্ধু সুবিমল চৌধুরী আর ইনি...।
আর ইনি! আমার কানে আর কিছুই গেল না। বন্ধু! এ যে দম্ভর মত উপজ্ঞাসের ভাষা।

কিন্তু এবারও ভুল বুঝিয়াছিলাম। জানিতে পারা গেল উপজ্ঞাস টুপজ্ঞাস কিছু নয়। শুধু ঐ ভাষাই। ছেলে বেলা দুজন একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে। বাপ মা, বহুদিন দেখিরা দেখিরা শেষ-কালে সন্দেহ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেয়েটির যে নিশাপ মুখচ্ছবি, তাহাতে অতিবড় সলিলচেতারও সন্দেহ, পরাক্রান্ত হইতে বাধ্য। কিন্তু বন্ধু! বুঝিলাম উপজ্ঞাস জীবনে প্রবেশ না করিলেও, উপজ্ঞাসের ভাষা চোঁটে আশ্রয় নিয়াছে। আবার ভাবিলাম সেই ভাষা। অনুকমার চেয়ে বন্ধুতে জ্বাকামি অনেক কম। কথাটি এক অনিশ্চিত বিধাগ্রস্ত সখ্যকে শুধু রূপ দেয় নাই, মূল্যও চুকাইয়া দিয়াছে। কথাটাই দাম। আর কিছু দিতে হইবেনা।

কিন্তু সকলেই এই অবস্থায় ত নয়। সকলেরই সজাগ-দৃষ্টি বাপ মা নাই, সকলের জীবনধর্মের তাড়নাও সমান নয়। তাই দেখিতে পাই, দুই একটি করিয়া বৃত্তজ্ঞবী মনোবিলাসী “সোসাইটি”তে শিক্ষাদানের অছিলায় নাসিকাগ্র ভাগ চুকাইতেছেন এবং তাহার ফলে উদ্ধার উদ্ধকন, কেরোসিন, লেক এবং সিনেমার তারকাবিত্ত অবস্থার উদ্ভব হইতেছে।

বাহা বলিতেছিলাম—দূর ছাই, আচ্ছা গেরোর পড়িয়াছি যাহোক! এখন প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিলেই বাচি।

দুইটি নামকরণ করা চাই। বন্ধুর নাম ব্যোমকেশ বর্ষণ—ডাক নাম বড়ু! তিরিকী মেজাজের জন্ত আমরা বলিতাম বৈয়্যোড়। গল্পের নাম? গল্পের নাম—কি রাখি বলুন ত? বৈয়্যোড় ত কিছু বলিয়া যান নাই। ভাবিতেছিলাম, আজকালকার ফ্যাশনমত সংস্কৃত অথবা বাংলা কবিতাংশ বসাইয়া দিব। বাংলার চেয়ে সংস্কৃতের দিকে ঝোঁক বেশী, কারণ সংস্কৃত প্রায় কিছুই জানি না। যে শ্লোক মনে পড়িতেছে, তাহার ভিন্ন চতুর্থাংশ ত ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। পাছে বাকীটুকুও হাড়ছাড়া হয়, তাই আমার অধিকার ঘোষণা করিতেছি। যাহাদের গরজ আছে, তাহারা জানিয়া রাখিলে ভাল হয় যে “দ্বিরাশ্চর্য্যঃ—” শ্লোকের চতুর্থ-পাদ আর বেওরাশি মাল নহে।

গল্প? সে হবে এখন পরে।

কেরাণীর রবিবার—একটা দিনের মত দিন। দেবব্রত শনিবার অফিস ক'রে সন্ধ্যার বাড়ী ফিরতে ফিরতে চিন্তা করে। অফিস সেই ক্লাইভ স্ট্রাটে, আর দেবব্রত থাকে হাতীবাগানে, মনের আনন্দে দেবব্রত মেছোবাজার কলুটোলার ভেতর দিয়ে হেঁটে কলেজ স্ট্রাটে এসে পড়ে, যতই কষ্ট হ'ক কাল রবিবার সমস্ত মজুরী পুথিয়ে যাবে। দেবব্রত মনে মনে ভাবে, বড়লোকের বড় বড় পাটির চেয়ে কেরাণীর রবিবার কোন অংশে কম নয়। অফিসের বড় বাবু, ছোটবাবু, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সব মনে করেন—কেরাণী, তবেই আর কি? তার স্ত্রুহুঃখ রোগ শোক বলে কোন জিনিষ নেই, যেন সে স্ত্রী-এর দম দেওয়া পুতুল। কি আশ্চর্য্য! বড়লোকদের কি Superiority of Complex, যে হেতু সে ৭৫ টাকার কেরাণী, বড় বাবুদের কাছে তার জীবনের কোন মূল্য নেই কি ধারণা! তারও স্ত্রী আছে, একটি আদরের শিশু-সন্তান আছে আর সব চেয়ে বড় কথা এখনও যৌবন তাব কানায় কানায়। বড় বাবুর আর কি, চারটে বাজতে না বাজতে বাড়ীতে দৌড় মারবেন, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরাবেন; যত বিপদ দেবব্রতের বাবার সময় বলে যাবেন—ওহে, ঘোষ, আহকের ২নং ফাইলের সেই এ্যাকাউন্টসটা একেবারে শেষ কবে যাবে, কাল বড় সাহেবের কাছে পেশ করতে হবে। তুলোনা, একটু থেকে থেকে শেষ করে দিও। কতক্ষণই বা লাগবে, তোমরা ইয়.ম্যান, তোমাদের বয়সে আমরা, বুঝলে কি না ঘোষ—বলে হে: হে: করে হেসে বার হয়ে গেলেন।

অফিসে বহু কেরাণী। সুনীল আছে, বাগচী রয়েছে, ঠাকুরা মিত্রের ভাল লোক বলে খ্যাতি আছে, কিন্তু সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেড়ে বেটাকেই ধর। কি কুক্ষণেই দেবব্রত বি-কম পাশ করেছিল, আজ বেশ উপলব্ধি করে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘর ঢুক বললেন—তোমাদের মধ্যে আজ কে 'ওভার ডিউটি' করতে রাজী?

বাগচী তাড়াতাড়ি বলে—শ্রাব দেবব্রত ঘোষ রাজী, সে খুব খুশী মনে ডিউটি করবে। তার কোন কাজ নেই।

উ: কি আর বলবে! যখন বাঙ্গালীর ছেলে, চাকরী কবেই খেতে হবে আর ৭৫ টাকার ওপরই নির্ভর করছে স্ত্রী আর পুত্রের ভাব, তখন চোখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত দেবব্রত অফিসে থাকে; সকলে বলে—দেবু regular—কখনও লেট হয় না, সব চেয়ে আগে আসে।

মনে মনে হাসে দেবব্রত। কেরাণীর জীবন, তোমরা অফিসাররা কি বুঝবে, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মিটে পাখার বাতাসের লোভে দেবু কেরাণী ছুটে আসে। তাই সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখার তলায় থাকে। সত্যি ঠিকই বলে তার স্ত্রী অরুণা, যে, দেবব্রতকে পাখার পর তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। দেবব্রত ভাবে কেরাণীর ঘোড়া রোগ। কি তুলই করে গেছেন বাবা বিবাহ দিয়ে।

কলেজস্ট্রাটের মোড়ে এসে দেবব্রত অফিসের চিন্তা রেখে ফেলবার চেষ্টা করে। আর না, কেরাণীর অফিস তো আছেই, রোজ সেই একঘেয়ে কলুর বলদের মত জীবন। কোন রকমে

আটটার স্থান করে ছুটি ভাতে ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, দেবী হয়ে বাচ্ছে বলে অরুণাকে কত বাক্যবাণে বিদ্ধ করে কড়া কড়া কথা গুলিয়ে দেয়। কিন্তু কি ধীর কি শান্ত, অরুণার রাগ বলে কোন জিনিষ নেই, বেশ হাসি মুখে বলে—একটু বসে বসে খাও, আলুর তরকারী এই হয়ে এল।

তার উত্তরে রেগে দেবব্রত বলেছে—হ্যাঁ, তোমার বাবার জমিদারি, বসে বসে খাচ্ছি এর পর চাকরী গেলে খাইও বসে বসে।

বান্ধাবর থেকে অরুণা উত্তর করে—সকলের অফিস বেলা দশটায়, তোমার পোড়া অফিসের বেয়াদু টাইম কেন বলত?

দেবব্রত নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করে। কানির হাওয়ার জন্তে সে একঘণ্টা আগে যায় অথচ তার স্ত্রী তার স্বামীপুত্রের স্ত্রুখের জন্ত হু বেলা এই দারুণ গরমে হাঁড়ি ঠেলছে। মনে মনে ভাবে দেবব্রত—কি স্বার্থপর পুরুষ জাত—লজ্জার যেন সে মিসে যায়। অনেকবার দেবব্রত অফিস থেকে ফিরে এলে অরুণা অসুখবোধ করেছে—চল না গো, একটু বেড়িয়ে আসা বাক্—ঘোড়ার ডিম, একা একা কি ভাল লাগে?

দেবব্রত ক্লান্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাতুর পেতে মেঝেবে গা এলিয়ে দিয়েছে, হাতে তালের পাখা, সমস্ত শরীরে তার ক্লান্তি, বলে—পাগল হয়েছ? কেরাণীর স্ত্রীর আবার হাওয়া খাওয়া কি? তার চেয়ে পতি-দেবতাকে পাখার বাতাস কর, পুণিা হবে।

এক এক সময় অরুণা রেগে যায়—ভাল হবে না বললে দিচ্ছি, বার বাব সেই হাড় জ্বালানি মাংস পোড়ানি কথা কেরাণী কেরাণী—পাখার বাতাস খেতে খেতে দেবব্রত বলে—অজ্ঞায় কিছু বলেছি?

অরুণা বলে—তা হ'ক, কেরাণী কেরাণী করতে পারবে না—দেবব্রত বলে—মিথ্যে লুকিয়ে লাভ কি বল?

অরুণা বলে—আর ঐ ক্যাথিসের জুতো, ছাতা বগলে—হুঁচোখে দেখতে পারি না—ও কাজ ছাড়।

দেবব্রত বলে—পাগল হয়েছ, তুমি ক্ষেপেছ? কেরাণীর স্ত্রুহুঃখ, রোগে, শোকে, ঝড়, বৃষ্টি, রোদে ঐ একমাত্র সদল ছাতাটি আর ক্যাথিসের জুতোটি।

নাঃ, কাল রবিবার, অফিসের চিন্তা নেই ওপরওয়ালাদের বকুনি রক্তচক্ষু নেই, সহকর্মীদের বিদ্রূপ নেই, এ যেন ভিত্তির একঘণ্টার জন্ত হুমায়ূনের বায়গার আগ্রার বাদসা হওয়া।

কাল বেলা পর্যন্ত সে ঘুমবে, বেলী বেলা হলে অবশ্য অরুণা রাগ করবে। ঠেলে ডাকবে—ওগো, ওঠ, ওঠ, ৯টা বাজে, বাবা: লোকে এত ঘুমতেও পারে? থোকাকে একটু পড়াবে, বাজার যাবে, রান্না হতে যে বেলা দুটো বাজবে?

দেবব্রত হাই তুলবে, আড়মোড়া ভাংবে, একটু রাগ দেখিয়ে বলবে—এমন করছ যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে—কেরাণীর রবিবার, একটু বেলা করে ঘুমব তাতো বো নেই। তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে কেন? তোমার স্বামীর চেয়েও কি সংসারের কাজ বড়? ছুটির দিনও তোমার পাওয়া যাবে না?

অরুণার মুখ লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ উঠবে, হুঁকর গালে টোল খেয়ে যাবে, বলবে—ছি ছি, খোকা বড় হয়েছে, ফুলে ভর্তি হয়েছে তোমার এখনও—

রবিবার কেরাণীর দাড়ি কামাবার দিন। দেবব্রত হস্তায় একদিন দাড়ি কামায়—যুদ্ধের বাজারে ব্রেডের বা দাম, রোজ কামান অসম্ভব। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কামাবে, খোকা এসে খানিকটা বিরক্ত করবে, মুখে সাবান মাখবে, অরুণা বকুনি দেবে—বাবা, যা সময় নিচ্ছ দাড়ি কামাতে, তাতে ঐ সময়ে জগতের বড় বড় কাজ করা চলে।

হেসে দেবব্রত বলবে—আমার দরকার নেই অতো বড় বড় কাজ করে। কেরাণীর আবার বড় কাজ, কি যে বল তুমি।

বেলায় বাজারে যাবে সে। অল্পদিন তো মাছ খাবার উপায় নেই অকিসের জন্ত—মাছ কুটতে কুটতেই সময় হয়ে যায়। তারপর আছে এক মুখরা ঝি—দশটা কথা শোনায়। কিন্তু আজ রবিবার, দেব কেরাণী কাকেও পরওয়া করে না। রুই মাছ কিনবে, পরিষ্কার ঝোল হবে, কৈ মাছ নেবে বাল হনুদের জন্ত, চিংড়ি মাছের মনু, অরুণা চমৎকার রাঁধে, আর শেবপাতে দৈ, সন্দেশ আর বোঁদে। বাসু আবার কি চাই? হ্যাঁ, কলাপাতা সঙ্গে নেবে, তা হলেই নেমস্তন্ন, নেমস্তন্ন atmosphere হবে সাথে মনীষীরা বলে গেছেন—“মনটাই সব”।

অরুণা বাজার দেখে মুখটা হাঁড়ির মত করবে, দশটা কথা শোনাবে কিন্তু তাতে কি? জীবী কাছে বকুনি খাওয়ায় একটা অনাবিল আনন্দ আছে—যা বাগচী, সুনীল, সময় ব্যাচিলাব হয়ে বোঝে না, শুধু হিংসাই হবে।

কি হয়েছে, দমকা খরচা হয়েছে তো? কেরাণীর জীবনে ধাব দেনা অর্থকষ্ট আছে, থাকবেও। একটা রবিবার, হস্তায় মাত্র একটা দিন, তাও আবার কেরাণীর। এতো আর বোজ নিত্যা নয়, অল্প দিন তো সাদাসিধে ভাবে কাটে। ৬ টা দিন তো বন্ধ অকিসের কাজে, হস্তায় ১ টি দিনও যদি জীবী-পুত্র প্রভৃতির দিকে উৎসর্গ না করা গেল তো এ জীবনের দাম কি? বাজুক বেলা ১টা, ওখানেই তো জীবনের আনন্দ। একটা দিন সে খাঁচার পাখীর মত মুক্ত, এখানে তার ভয় দেখাবার কেউ নেই, আজ সে কাউকে পরওয়া করে না—“I am the monarch of all I survey.”

বৈচিত্র্যহীন জীবনের একটি দিনের জন্ত যেন হৃদয়:পতন। হৃদয়:পতনের একটা অঙ্গরূপ আবেশ আছে, মধুর আমেজ আছে, যা একমাত্র দেবব্রতই বোঝে। আজ রবিবার, সকলে বিলাসের প্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, সমস্ত সহর উৎসবে নাচেছে, আর যত দোষ দেবব্রতের বেলায়; কারণ সে গরীব, সে ১৫ টাকার কেরাণী। আরে বাপু চুরী করা পরগা নয়, ঠকিরে লাভ করা নয়, রীতিমত ‘hard earned money’—একান্ত নিজের, তাতেও জবাবদিহি! বড় লোকদের এতই অসহ্য যে একজন গরীব আনন্দ করতে পারবে না। দাসিক সম্প্রদায় এত দূর বার্ষিক! মাহুৎব মাহুৎবকে দাবিয়ে রাখা নির্ধ্যাতন করার উপাহরণ বোধ হয় আর কোথাও নেই?

বেশ করে একঘণ্টা ধরে সে স্থান করবে সাবান মেখে কলের তলায়। রগড়ে রগড়ে ৭ দিনের জমা পুরু ধুলোওলো গা থেকে তুলবে। হায়! এমন অকিস যে নিজের সুখ-সুবিধার দিকে দেখলেও সহস্ত জবাবদিহি। কেরাণী! তবে আর কি? পরিষ্কার থাকাত তার অধিকারের বাইরে!

অরুণা তাড়া দেবে—ওগো, ছুটো বাজল, রাগা তৈরী, বাবা: স্থান করতেও এত সময় লাগে?

দেবব্রত গা রগড়াতে রগড়াতে বলবে—তাড়া দাও কেন বল তো? রবিবারের দিনটা আজ,—পরমানন্দে স্থান করছি, তাতেও বাধা। নাঃ, নিজের জীবী যদি এতদূর অবুধ হয়, চলে কি করে?

আজ কোন কথা দেবব্রত শুনেবে না। অরুণা, খোকা সকলকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসবে। অরুণা রাগ করবে, কিন্তু দেব কেরাণী আজ কাকেও ভয় করে না। সে বলবে—রাগার জিনিষগুলো হাতের কাছে নিয়ে এস, সব একসঙ্গে বসা থাক। নিজের জীবী-পুত্র নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসবার অধিকার তাও কি আমার নেই?

এ যেন নেমস্তন্ন—মিঠে পান কিনে নিয়ে এসেছে—জীবীর সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে দেব অকিস, চুঃখ-কষ্ট সব ভুলে যায়। মনে করে তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। অনেক ভগ্নতা করে সে অরুণার মত জীবী পেয়েছে। ভগ্নবান একটা দিক পুথিরে গিয়েছেন। আজ সে রাগার স্বাদ পাচ্ছে—অল্প দিন তার খেয়ালই থাকে না, সে হাস খাচ্ছে, না ভাত ডাল খাচ্ছে। দেব কেরাণীকে পায় কে? মিঠে পানের সঙ্গে একটি সিগারেট ধরিয়ে ঢেকুব তোলে, নিজেকে মনে করে একটা কেঁট-বিষ্ট। অরুণা বলে—ওগো, পেট ভরল তো?

দেবু টান দিয়ে বলে—পেট খুব বেশীই ভরেছে, ভর হচ্ছে—পেটে এখন ভালমন্দ সহিলে হয়।

অরুণা রেগে যায়, হাত ধুতে ধুতে বলে—তোমার জীবনে কখনও উন্নতি হবে না। কেরাণী কেরাণী করে যে নিজেকে এত ছোট করে রাখে, ভগ্নবান তার কখনও ভাল করেন না!

দেবব্রত হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে—তুমি অকিসে যাও, দেখো সেখানে লেখা আছে বড় বড় অক্ষরে Babu Debabrata Ghosh, Accounts' clerk. আমাদের বুকে Mr. হবারও উপায় নেই, ওটা আমাদের ওপরওয়ালাদের একচেঁটে। অর্থাৎ কেরাণী is equal to কুকুর-বেড়াল, ভদ্র লোক হবার চেষ্টা কেন? আমরা যদি ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করি, Mr. লিখি, আমাদের শান্তি ভোগ করতে হবে।

অরুণা এবার সত্যি সত্যিই রেগে উঠে বলে—বাড়ীতে আমরা স্বাধীন, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, এটা অকিস নয়।

ঝি এসে উপস্থিত হয়—একে মুখরা ঝি, তার ওপর এত বেলায় রবিবারের ভালমন্দ খাওয়ার জন্ত হুঁচকার থানা বাসন বেশী মেখে সত্যি মুখর হয়ে উঠেছে। স্বাক্ষর দিয়ে ভাঙ্গা গলায় বলে ওঠে—আমার পোষাবে না মা বলে দিচ্ছি। একে এত বেলা,

তারপর এত বাসন আমার গতরে পোবার না, আপনারা অস্ত্র কি দেখুন।

চটে ওঠে দেবব্রত। হতে পারে সে কেরানী, নিজের বাড়ীতে সে যাই হ'ক অস্ত্রত বিব রনিব। সে উত্তর দেয়—মিছি মিছি টেটিও না কি। একদিন রবিবার না হয় বেলাই হয়েছে, আর না হয় দু' এক থানা বাসন বেশী, হয়েছে, তাতে অস্ত্র চটবার কি আছে? অস্ত্র দিন যখন এর আধখানা বাসন থাকে, তখন তো বল না যে 'আপনাদের বাড়ীতে কাজ কম।' মাইনে পাও না? অমনি কাজ করছ? না আমার মাথা কিনেছ?

অরুণা এসে বাধা দেবে—ছি ছি এ সব কি-চাকর, এদের মধ্যে তুমি কেন? ছোট হয়ে যাবে যে? বা বলবার আমি বলব।

কি ততক্ষণে মণিবের তাড়া খেয়ে কলতলায় গিয়ে বসেছে। কির সাড়া-শব্দ নেই দেখে দেবব্রত বলে—দেখ অরুণা, অফিসের বড় বাবুয়া যেমন তাড়া দিয়ে আমাদের মেকদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, তেমনি এদেরও মেকদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। দেখ, এখন কেমন চুপটি করে কাজ করছে?

খোকার চোখে ষুম নেই। বারান্দার দেশলাইয়ের বাক্সগুলো জড় করে "কু ক্যাক, ক্যাক" করে রেল গাড়ী খেলছে। দেবব্রত ডাকে—'একটু শোবে এস বাবা, শরীর ভাল হবে।'

খোকা উত্তর দেয়—তোমরা ঘুমাও বাবা, আমার রেলগাড়ী এখন খুব জোরসে চলছে, লাহোর এসে গেছে কি না?

বিছানার ওরে দেবব্রত ঘামছে, বার বার অরুণাকে ডাকে—কৈ গো, না, রবিবারও তোমায় পাওয়া যায় না, সাথে বলে কেরানীর জীবন।

অরুণা কাপড়গুলো পাট করে রাখছে—শুকিয়ে গেছে। কির আজ বেশী কাজ, কিছু ব্লেনই তেড়ে উঠবে। স্বামীর কঠোরব শুনে পাখা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। হাওয়া কর'তে থাকে, কখন বা স্বামীর গিঠের ঘামাচি মেরে দিতে থাকে। দেবব্রত মাঝে মাঝে অরুণার হাতখানি নিজের বুকের কাছে টেনে নেয়, আবার তাড়া খেয়ে ছেড়ে দেয়। কি করছ? কি ঘোরায়ুঁরি করছে খোকা দেখছে, দিন দিন তুমি—

দেবব্রত মনের হুংখে বলে—কেরানীর তাড়া খেয়ে খেয়ে জীবন

গেল। যবে বাইরে সব জারগার তাড়া। এই যদি তোমার স্বামী বড় অফিসার কি ব্যারিষ্টার হ'ত, দিতে পারতে এমন তাড়া? হায়রে দেবু কেরানী!

অরুণা চাপা গলায় বলে—কি ছেলে মানুষ তুমি! আমি বুঝি তাই বলুম! বলে স্বামীর মাথায় হাত বুলাতে থাকে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে আসে। হঠাৎ অরুণা বলে—চল, আজকে সিনেমা দেখে আসি।

দেবব্রত বলে, সিনেমা, না ওখানে আমরা যাব না। আমাদের সিনেমা বড় লোকদের নিয়ে, সেখানে চাই কোট, হ্যাট, প্যাণ্ট, ড্রিং রুম, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট সিগারেট, বড় বড় পার্টি, ডিনার, লাঞ্চ—সেখানে আমাদের বড় বেসামান মনে হবে, যেন আমরা গরীব কেরানী বলে আমাদের ব্যঙ্গ করছে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গরীবদের, আমাদের সিনেমায় কোন স্থান নেই। ওটাও বড়লোকদের এক চটে। তার চেয়ে চল 'নির্মি-বিলি পার্কে থানিকটা বেড়িয়ে আসা বাক, ভগবানের রাজ্যে খোলা হাওয়ার যাবার অধিকার কেরানীরও আছে।

অরুণা বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল। খোকাকে সাজিয়ে নি। আমিও শাড়ী বদলে নি, চল, তাই বেড়িয়ে আসা বাক।

হাতীবাগানের একটি ছোট বাড়ীর কাছে আসতেই দেবব্রতর চমক ভাঙে। কড়া নাড়তে থাকে, ডাকে—অরুণা, অরুণা দোর খোল।

খোকা দৌড়ে আসে, দোর খুলে বলে—বাবা তুমি এসেছ? কলতলায় মা-মণি পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে, কপাল কেটে ভীষণ রক্ত পড়ছে, খুব চিৎকার করছে মা-মণি যন্ত্রণায়। উঠতে পারছে না।

দেবব্রত বলে—তোমার মা-মণির এত লেগেছে? চমৎকার! চমৎকার! যেখানে ভগবান গরীব কেরানীকে ব্যঙ্গ করে সেখানে এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? মানুষ মানুষকে ব্যঙ্গ করলে সহ্য করা যায় কিন্তু ভগবানও যদি ছোট-বড় বিচার করেন, সেখানে—

সহস্র অভিমানে চোখের জল ঠেলে আসে দেবব্রতর—হায় বে! কেরানীর আবার রবিবারের স্বপ্ন!

গল্পে আমন্ত্রণ

কাদের নওরাজ

কাতর স্বরে তোমার ডাকি,
নারায়ণেই বহন করি

এস আমার গল্প পাখি।
ধরা তোমার "বিনতা" মা,
হুংখে যে তার আর সহ না
খুঁচাও যেমন কীদন তাহার
অবতরণেই তাও আমি।

আসে প্রলয় আকাশপথেই,
ছুটছে রণ-ক্ষেত্র 'পরেই
নর-শোণিত খরস্রোতেই।
বাঁচাও মরে নিখিল-শরণ।
হাত-উজল উজল নয়ন—
বীরক দেখাও ধরার পরেই,
আনো আনো শান্তিবানী।

সুধায় মরে প্রাণ যে শিশুর,
হুং নহে গো খুঁশ শুধু দাও,
কোথায় আছ আজকে 'বিহুর'!
ধরায় যদি-কালিন্দী মাঝ
কালিয়া-নাগ বয় যদি আজ
বিদায় কর বল যে তাহার
রাখালেরই রাজার আমি'।

সাপের পিছে পাঠাও নকুল,
ধানের চেয়েও অধিক যে চাই
বুনো ওল আর বাঘা উঁকুল,
পাখিতেই চানুক হানো,
শান্তি আনো, শান্তি আনো;
এস গল্পে ধরায় 'পরেই
ডাকে তোমার সকল প্রাণী।

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

একম পক্ষ

বৎসরাজ উদয়ন অবজ্ঞারাজপুত্রী বাসবদত্তাকে বিবাহ করবার পর নূতন রাণীকে ছেড়ে আর এক তিল সময়ও কাটাতেন না। দিন-রাত তিনি অস্ত্রপুর্বেই থাকতে আরম্ভ করলেন—রাজকাধোর দিকে তাঁর আর মোটেই দৃষ্টি রইল না। এ অবস্থায় মহামন্ত্রী যোগন্ধরায়ণের উপরই রাজ্যভার এসে পড়ল—আর প্রধান সেনাপতি ক্রমধান এই কাজে তাঁকে যতটা সম্ভব সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু যোগন্ধরায়ণ যত বড়ই কূটবুদ্ধি মন্ত্রী আর ক্রমধান যতই সাহসী সেনাপতি হোন না কেন, তাঁরা ত রাজা নন কেউই। প্রজারা তাঁদের শাসনে অবশ্য বেশ ভুঞ্জেই ছিল, আপদে বিপদে অভিযোগ জানালে সুরিচারও পেত ঠিক, তবু তারা চাইত রাজা নিজে রোজ এসে সিংহাসনে বসুন, নিজের কাণে প্রজাদের সব অভাব-অভিযোগ শুনে বিচার করুন, মন্ত্রী-সেনাপতিরা রাজাব সহকারী হ'য়ে রাজকাণ্ডে সহায়তা করুন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একটি দিন এক ক্ষণের তবও রাজাব দর্শন মিলবে না—রোজ রোজ মন্ত্রী-সেনাপতির সামনে গিয়ে হাত ছোঁড় ক'বে দাঁড়াতে হবে—এই ব্যাপারটাই ক্রমশঃ প্রজাদের কাছে হ'য়ে উঠতে লাগল অসহ্য। ধীরে ধীরে তাদের ভিতর একটু অসন্তোষের মুহু গুঞ্জন দেখা দিল। তখন চতুর মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ বললেন—গতিক সুরিধার নয়; এবার মহারাজ উদয়নকে যে কোন কৌশলে অস্ত্রপুর্বের আওতা থেকে রাজসভায় টেনে বার ক'রে আনতে হবে, না হ'লে প্রজাদের অসন্তোষ ক্রমে বিদ্রোহে পরিণত হ'তেও হয়ও বিশেষ দেরী হবে না।

এই ভেবে তিনি একদিন গভীর ব্যস্তিতে সেনাপতি ক্রমধানকে নিজের বাড়ীতে ডেকে আনলেন। নিশ্চিন ঘবে দুই বন্ধু মুখোমুখি ব'সে অনেক ক্ষণ ধ'রে রাজ্যের হিত-চিন্তায় নানারকম পরামর্শ করতে লাগলেন।

যোগন্ধরায়ণ বললেন—‘শোন বন্ধু ক্রমধান! আমাদের মহারাজ পাণ্ডবদের বংশধর। কুলক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র সম্রাট হওয়াই তাঁর শোভা পায়। কিন্তু সে দিকে তাঁর মোটেই দৃষ্টি নেই—উলটে আজ ক' বছর ধ'রে তিনি প্রজাদের কাছেই অদৃষ্ট হ'য়ে পড়েছেন। আমাদের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে মেয়ে-মহলে আছেন—নাচ-গান নিয়ে। কখনও যদি বাইরে বেরোন ত সে কেবল মৃগয়ায় যাবার জন্তে। আমবা অবশ্য যথাসাধ্য রাজকাণ্ডে চালাচ্ছি—কিন্তু লক্ষণ বেশ দেখা যাচ্ছে যে প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। অতএব, বন্ধু! এমন একটা ফন্সী খাটো দেখ, যাতে ক'রে এই পর্দানবী রাজাটিকে আবার লোক-সমাজে টেনে বার করা যায়। শুধু তাই বা কেন, পিছু-পিছুতের আমলে যেমন সমস্ত পৃথিবী তাঁদের শাসনে ছিল, ঠিক তেমনই ইনিও আবার যাতে সমাগরা ধরার আধিপত্য ক্রিবে পান, তাঁর ব্যবস্থা করা দরকার’।

ক্রমধান শুনে বললেন—‘মস্ত্রিবর! আমার মাথার ফন্সী আসে

কম। গায়ের জোরে যতটা হয়, তা আমি প্রাণ-পণেও করতে রাজি। কিন্তু ফন্সী ত কিছুই বুদ্ধিতে যোগাচ্ছে না। তবে যদি বলেন ত একবার অস্ত্রপুর্বে ঢুকে গিয়ে মহারাজের হাত ধ'রে টেনে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিই’।

যোগন্ধরায়ণ শুনে হেসে বললেন—‘তা তুমি পার বন্ধু! কিন্তু অস্ত্রপুর্বে ঢুকবে কি ক'রে? এ ত আর প্রজোতের সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ নয় যে মবিয়া হ'য়ে অস্ত্র চালাবে। যখন দেখবে যে অস্ত্রপুর্বের দোরে প্রমীলার রাজ্যের মত নারী-বাহিনী সশস্ত্র দাঁড়িয়ে, তখন তাদের সঙ্গে লড়াবার মুখ থাকবে কি তোমার’?

সেনাপতি সবিস্ময়ে মন্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে একটু লজ্জিতভাবে বললেন—‘তাই না কি! কি আপদ! মেয়েদের সঙ্গে লড়াব কি! ছিঃ!’

যোগন্ধরায়ণ—‘তবেই বোঝ ভায়া! ব্যাপারটা কতদূর যোরাহ হ'য়ে উঠেছে। দেখ বন্ধু, এরকম সোজা চালে রাজা মাত হবেন না। খুব সম্ভবপণে ঘুঁটি চালতে হবে, যাতে আনাদের বল না মারা যায়’।

ক্রমধান—‘শুনি মস্ত্রিবর! আপনার চালটা কি রকম’?

যোগন্ধরায়ণ—‘দেখ সেনাপতি! মহারাজের সমাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য পাবার পথে দুটি কাঁটা এতদিন ছিল। একটি তার আপনি উঠেছে—বুঝতেই পাবছ এটি উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেন প্রজোত—নূতন বাণীব বাবা। তিনি এখন আর মহারাজের শত্রুতা কববেন না—এটা নিশ্চিত। আর একটি কাঁটা বাকী আছে—সোটি মগধরাজ দর্শক*। তাঁকে কোন রকমে মহারাজের সঙ্গে কোন একটা সম্বন্ধে বাঁধতে পারলেই নিশ্চয় কাজ হাসিল হবে। শুনেছি তাঁর একটি ভগিনী* আছেন পবমা সুন্দরী—নাম তাঁর পদ্মাবতী। তাঁর সঙ্গে আমাদের মহারাজের বিয়ের ঘটকালিতে নাম্ব ভাবছি’।

এই সময় ক্রমধান খুব উদ্গ্রীব হ'য়ে ব'লে উঠলেন—‘হা হা! ঠিক ঠিক। তা’ ছাড়া আমি আরও শুনেছি যে পদ্মাবতীকে যিনি বিবাহ কববেন, তিনি হবেন রাজচক্রবর্তী। তবে মস্ত্রিবর। একটা মস্ত্র সমস্তা! মহারাজ আমাদের বাসবদত্তাকে যে বকম ভালবাসেন, তাতে এরকম সতীনের মুখে নিজেব আদবের ছোট বোনটিকে স'পে দিতে মগধরাজ রাজী হবেন কেন? আপনাব ঘটকালি সকল হবার ত কোন সম্ভাবনাই দেখছি না’।

যোগন্ধরায়ণ মুহু হেসে উত্তর কবলেন—‘বন্ধু! সোজা আদুলে কি আর যি উঠবে? একটু কৌশল করতে হবে। মহারাজকে

*মহাকবি ভাস তাঁর ‘স্বপ্নরাসবদন্ত’ নাটকে বলেছেন—পদ্মাবতী মগধরাজ দর্শকের ভগিনী। পক্ষান্তরে, ক্ষেমেন্দ্রের ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’ ও সোমদেবের ‘কথাসরিৎসাগরে’ পাওয়া যায় যে পদ্মাবতী মগধাধিপতির কন্তারকন। কথাসরিৎসাগরে মগধেশ্বরের নামও দেওয়া আছে—‘প্রজোত’। খুব সম্ভবতঃ ইহা ভুল। কারণ, দর্শক ও পদ্মাবতী ভ্রাতা-ভগিনী। দর্শকের পিতার নাম ছিল—অজাতশত্রু বা কুনিক (খ্রী: পৃ: ৫৫৪—৫২৭)।

কোন চলে অস্ত্রপুর থেকে একবার সরিয়ে দিতে হবে। তারপর রাণীকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে। শেষে রাণীবাসস্থানে আগুন লাগিয়ে মহারাজকে জানাতে হবে যে নতুন রাণী হঠাৎ আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। এ শুনে মহারাজ হতাশ হ'য়ে অগত্যা রাজকাৰ্য্যে মন দেবেন। আর এদিকে রাণীর পুড়ে মরার খবর আগুনের মতই ছ-ছ ক'রে চারদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়বে। এমন মুখরোচক সংবাদ মগধরাজের কানে পৌঁছাতেও দেবী হবে না। তখন অবসর বুঝে মহারাজকে রাজী করিয়ে আমি যদি মগধরাজের কাছে কথাটা পাড়ি, সে অবস্থায় ত আর মগধরাজ আমাদের মহারাজের মত সুপাত্রকে কিবিয়ে দিতে পারবেন না।

কুমধানু মাথা চুলকে বললেন—‘তা বটে! কিন্তু একটা কথা কি জানেন মন্ত্রিবর! এত বড় একটা হুঁসাহসের কাজ কবাবাটা কি ঠিক হবে?’

যৌগন্ধরায়ণ—‘কেন হবে না শুনি? তবে শোন সেনাপতি। আমি এর আগেই মগধরাজের কাছে গিয়ে পদ্মাবতীকে চেয়েছিলুম মহারাজের জন্তে। তাতে মগধরাজ কি উত্তর দিয়েছিলেন—শুনবে?’

কুমধানু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—‘তাই না কি! কি—কি উত্তর দিয়েছিলেন?’

যৌগন্ধরায়ণ—‘বললেন তিনি—“তোমাদের বংশরাজ্য বাসবদত্তাকে বড় ভালবাসেন। পদ্মাবতীকে আমি তাঁর হাতে দিলেও তিনি বাসবদত্তার ভালবাসাতেই মুগ্ধ থাকবেন—পদ্মাবতীর দিকে একবারও ফিরে চাইবেন না। পদ্মাবতী আমার আদবেব ছোট বোন—তাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তাকে এভাবে বাবজীবন অশুখী আমি কি ক'বে কবি? ঈশ্বর না করুন, যদি কোন দিন বাসবদত্তার কিছু মল হয়, তখন আপনার কথা বিবেচনা ক'রে দেখব।” এখন দেবী বাসবদত্তা পুড়ে মবেছেন এই সংবাদ

চারদিকে একবার রটাতে পারলেই মগধরাজ আমার প্রত্যাশে রাজী হবেন। আর বিয়ের পুর ত বাসবদত্তাকেও এনে হাজির ক'রে দেব। ছুই রাণী ও সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য হাতে পেল। তখন আমাদের মহারাজও এ বড়বস্ত্রের জন্ত আমাদের উপর বিরক্ত হবেন না—এটাও ঠিক।’

সেনাপতি বললেন—‘কিন্তু একটা ভয়! হঠাৎ বাসবদত্তার মৃত্যুর সংবাদে মহারাজের মনে এমন আঘাত লাগতে পারে, যাতে তাঁর জীবন-সংশয় পর্যন্ত হ'তে পারে।’

যৌগন্ধরায়ণ—‘আরে পাগল না কি! মহারাজ যে আমাদের বীরের বংশ—নিজে বীর! স্ত্রী-বিয়োগে মারা পড়ে না বীর। রামচন্দ্র কি সীতাকে হারিয়ে হা-হতাশ ক'রে মারা গিছিলেন, না শত্রু-বধের জন্তে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন যুদ্ধে। দেখে সেনাপতি! এতে শেষে ভালই হবে।’

কুমধানু—‘আমি দালা! তোমার মত অত বুদ্ধি ধরি না। তবে দেখো শেষটা যেন না পস্তাতে হয়।’

যৌগন্ধরায়ণ—‘হাঁ একটা কথা! রাণীকে আমাদের বড়বস্ত্রের দলে নিতে হবে। তিনি হয় ত সতীনের আশঙ্কার একটু মনে কষ্ট পাবেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী ও পতিব্রতা। স্বামীব ভাবী মঙ্গলের জন্তে সাধী নারী এটুকু আত্মদান করবেন বৈ কি! আর রাণীর ভাই গোপালকে আমাদের দলে নিতে হবে। তা হ'লে উজ্জয়িনীরাজ, তাঁর রাণী আর ছেলের কাছ থেকে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকবে না।’

কুমধানু—‘তবে গোপালকে অবিলম্বে ডেকে পাঠান মন্ত্রি-ম'শায়। তাঁর যদি এতে মত থাকে, তবে কাজ আবস্ত হোক।’

যৌগন্ধরায়ণও ‘আচ্ছা।’ ব'লে সে রাজ্যের মত পরামর্শ শেষ করলেন।

[ক্রমশঃ]

আমার দেশ

শ্রীনিলাস দাশ, বি-এ

আমার দেশের সূর্য্যকিরণ ছড়ায় কত স্বর্ণবেণু,
মাঠে মাঠে ধেমু চরায় বাজিয়ে রাপাল মোহন বেণু।
কান্তারে কোটে নানাবিধ ফুল, গন্ধে মাতার প্রাণ;
বনে বনে শ্রামা দোয়েল কোয়েল বুলবুলি করে গান।

আমার দেশের ফুলে ফুলে মধু, ফলে ফলে রস শাঁস;
সরোবরে কেলি করে পানকোড়ি চঞ্চল আর হাঁস।
কর্ণা হেথায় চর্ষে উছলি শিলার বকে লুটে!
সিঁড়ুর ডাকে উত্তরোল নদী লহরী তুলিয়া ছুটে।

আমার দেশের স্তনীল গগন মেঘের মিনার গড়ে,
ধূসর পাচাড় শিখরে তুহার তুহার-কিরীট পরে।

হীরা-পাথর ভ্রোতিসম নভে লক্ষ তারকা জলে;
বনানীর বৃকে ভ্রোছনাধারায় আলোছায়া-খেলা চলে।

আমার দেশের দীর্ঘতরাজ জল বাবোমাস ফুলীতল,
ভ্রমরে ডাকিয়া মধু করে দান বিকশিত শতদল।
তেশান্তবের মাঠের মধ্যে বটের শ্লিষ্ট ছায়া,—
প্রান্ত পাথকে আদরে ডাকিয়া জুড়ায় কান্তকারা।

আমার দেশের ডাই-ভগিনীর বৃকভরা প্রীতি স্নেহ,
জায়া-জননীর মায়ী-ভালবাসা-ভুলিতে পারে না কেহ;
এ দেশের বৃকে জন্ম আমার তারই কোলে যেন মরি;
এ দেশের ঘরে আসি যেন ফিরে জনম জনম ধরি।

[প্রথম পর্ব]

...সঙ্গীত-সুত্রপাত...

[মায়ের কোলে বসে তোমরা রাজপুত্রের গল্প শুনেছ। তোমরা যখন এই রাজপুত্রের কথা শুনে, তখন মনে হ'বে—তার সঙ্গে তোমাদের কত চেনা। সে যে চিরকালের নিত্যদিনের রাজপুত্র। রাজপুত্র লেখাপড়া করে, কাজে মেতে ওঠে, আবার তার পড়ার শেষে ছুটিও মেলে। সেই ছুটির মধ্যে সে এমন বীরের খেলা খেলে, যে খেলার সে সংসারটাকে চিনে নিতে পাবে। মৈত্রেয়ীর খোঁজ নিতে কি তোমাদেরও সাধ যায় না? —সেই তেপান্তরের মাঠ, সেই সাত-সমুদ্র তেরো নদী, সেই মায়াবতী, সেই রাজকন্যা, —সব গোড়াকার আর সব শেষের রূপ-কথা তো এই!...

তোমরা তৈরী হ'য়ে নিয়েছ? রাজপুত্রের সঙ্গে তোমরাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে এসো...ঐ শোনো...

(রাজপুত্র ও সঙ্গীদ)—গান

ওরে—রে—রে ভাই!

ছুটির বাঁশীর সুর নীল-গগনে,
বনে বনে আর বাতাসে বাতাসে পাহাড়ে নির্ঝরে
মনে মনে।

ছাড়া পাখীর মত আনন্দে,
আমার পরাণ আজি নেচে করে,—
সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দেবো ঘুরে—
প্রবাল-ধেরা শ্রামল দীপের কোণে।
অসীমকালের রাজটাকা ভালে, (তোমার)
অগম-পথে কে লীপটি জালে!
কেন এ বাঁধন তবে—যুক্তি পেতেই হ'বে,
চকলতা জাগে ক্ষণে ক্ষণে।

রাজপুত্র। সত্যি কথা। আর সোনার খাঁচার পোবা পাখীর মত প'ড়ে থাকতে মন চায় না—মাধব!—পুঁথির পড়া সার ক'রেচি—এবার বেরিয়ে পড়তে চাই। চাই ছুটি।

মাধব। বলো কি—বন্ধু!—এ-সাধ আবার কেন? রাজপুত্রের বাইরে বেরোনা মানেই তো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো!—ওতে অনেক বিপদ! পথ-ঘাটের সঙ্গে তোমার কতটুকু চেনা আছে?

রাজপুত্র। চেনা কর্তেই তো সব ছেড়ে বেরোতে চাই।

মাধব। পথে যদি বাধা আসে?

রাজপুত্র। সব বাধা চুম্বার করে দোবো। তেপান্তরের মাঠ দেখে রাজকুমার কখনো কবে না, সাতলসুদ্র তেরো নদী সে পার হ'য়ে যায়। পথে চলার ভয় রাজপুত্র জানে না।...তাই আমার পণ—দৈত্যকে করবো জয়, রূপোর কাঠিতে চুম্বাডানো রাজকন্যাকে জাগাবো সোনার কাঠি ছুইয়ে, তাকে করবো উদ্ধার...সারা পৃথিবীকে নোবো চিনে।

মাধব। মহারাজের মত থাকবে? বিশেষ রাণীমা-র?

রাজপুত্র। মত তাঁদের দিতেই হ'বে...এ-বে চিরদিনের নিয়ম। রাজপুত্রকে এই রাজ্যটুকু মধ্যে বেঁধে রাখবে কে? জানো না—রাজপুত্র একলা দাঁড়িয়ে কি পণ করে?

মাধব। কথাগুলো আমার কেমন কেমন লাগচে—রাজ-কুমার! ঘরের এই আরাম—এই আমোদ—

রাজপুত্র। থামো! অনেকদিন পণ্ডিতরা আমাকে তুলিয়েচে—পুঁথি মুখস্থ করিয়ে, আর নয়! আমার মন আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে।

মাধব। সর্বনাশ! এমন আরামকেও ঠেলে কেলেতে সাধ যায়?

রাজপুত্র। হ্যা গো হ্যা! মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকলে কি চলে? সমস্ত কুড়ুমির বেড়া ভাঙতে হ'বে। রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা কি জানো না?

মাধব। কি—আবার!

রাজপুত্র। শোনো—তবে!

(রাজপুত্র ও সঙ্গীদ)—গান

মায়ের আঁচল নয় বীরের ছায়া!

সোনার খাঁচার মত ঘরের মায়া।

অলস খেলাধানি—

ভাঙিতে হ'বে জানি,—

হানিতে হ'বে নিতি বাধারি কায়া।

গুরুম'শায় হিতৈষী। আরে—চূপ—চূপ! তোমাদের এতো উল্লাস কিসের?—মহারাজীর মন খুব খারাপ!

মাধব। কেন—গুরুম'শায় হিতৈষী ঠাকুর?

হিতৈষী। জানো না? মহারাজ যে রাজকুমারকে পৃথিবী বেড়াতে পাঠাচ্ছেন! যাত্রার আরোজন সব ঠিক!

মাধব। অ্যা—বলেন কি—গুরুম'শায়! তা' হ'লে নিতান্তই যাত্রা কর্তে হবে?

হিতৈষী। হ্যা—স্বয়ং মহারাজের ইচ্ছা—

মাধব। কিন্তু এতো শীগ'গির কেন? রাণীমার মনটা একটু ভালো হ'লে না হয়...

রাজপুত্র। মাধব, ঘরের কোণে লক্ষীর নিরীহ বাহন পেঁচাটি হ'য়ে বসে থাকতে চাও কেন?—গুরু হিতৈষী, আমি গোড়া থেকেই জানি—বাবা আমাকে দেশ বেড়াতে পাঠাবেন। আমিও প্রস্তুত।

মাধব। কিন্তু মহারাজীর মনটা যে বড়ই খারাপ!...ঐ যে রাণীমা!...দেখচো—সুখখানা বেন কান্না-কান্না ভাব!

রাজপুত্র। মাধব! ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে তোমার একজা ভয় কেন?

মাধব। ভয়...ভয় আবার কিসের! কিন্তু মন উত্তলা...রাণীমা যে কান্নাচ্ছেন।

রাজপুত্র। তুমিও যে কাঁদতে ব'সে গেলে! ছিঃ! স'রে যাও, মাকে আমি বুঝিয়ে বলছি!...মা—তোমার চোখে জল কেন?

রাণী। বাছা—তুই নাকি আমাকে ছেড়ে দেশ বেড়াতে যাবি?—

রাজপুত্র। সব রাজপুত্ররই তো যাব—মা! মায়ের আঁচল ধ'রে ঘরে ব'সে থাকলেই কি মানুষ হওয়া যায়?

রাণী। বলিস্ কি রে। তুই যে আমার ননির পুতলি, স'সারের তুই কি জানিস্—বাছা! তোকে কোন্ প্রাণে নানান বিপদের মুখে ছেড়ে দোবো?—

রাজপুত্র। যাব বিপদ নেই—তা'র ভরসাও নেই মা! নান্নসের শিক্ষা ঘরে ব'সে কি হয়? মা-গো—তুমি তো জানো,—রাজপুত্রর কখনো হার মানে না। আমি দেখতে চাই—নানা রাজ্য—নানা দেশ—নানা মানুষ—কত আনন্দের মেলা!

রাণী। ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে কি আনন্দ মিলবে? রূপকথা প'ড়ে প'ড়ে এই সব কল্পনা ক'রে বেখেচিস্ বুঝি? গুরুমশায়, রাজকুমারকে স্তব্ধ দিয়ে মানুষ ক'রে না তুলে, তাকে কেবল রূপকথা আর ইজ্ঞাকালের গল্প পড়িয়েচো? ওর মাথা গেছে ধারাপ হ'রে।

হিতৈষী। মহারাণী, আগে সব পাঠ শেষ ক'রে—তবে রূপকথার গল্প পড়ানো হয়েছে। সে-পড়া রাজপুত্রের খেলা।

রাণী। এ যে সর্বসম্মত খেলা! ও কি শেষে রূপকথার রাজপুত্র হ'তে চায়? সোনার মাণিককে আমার পথের ধূলোমাটিতে ছেড়ে দোবো?

মাধব। আমিও তাই বলি—রাণীমা! রাজকুমার আমার কথা কানেই তুলচে না।

রাজপুত্র। থামো—মাধব!...মা, আমি রাজার ছেলে: আমি যদি ঘরে ব'সে থাকি—লোকে নিন্দে করবে। তুমি ভাবচো কেন? আমি দৈত্য জয় ক'রে ঘুমন্তপুরী থেকে রাজকন্যাকে ঘরে নিয়ে আসবো। নইলে কিসের রাজপুত্র আমি?

রাণী। না: তুই বুঝবি না যে মায়ের প্রাণ! যাই মহারাজের কাছে! তিনি যদি আমার কথা রাখেন! কুলদেবতার পূজো সাজাই গে—আরতির কাজল দোবো তোর চোখে পরিয়ে—দেবতাকে মনের কথা জানাবো—তখন বাইরের টানে তোর আর মন তুলবে না! মা-কে কাঁকি দিয়ে ছেলে চলে যাবে ঘর ছেড়ে! দেখি—কেমন ক'রে বাস?

রাজপুত্র। মা—আমি বাবোই যাবো! কেউ আমাকে ধ'রে রাখতে পারবে না।

রাণী। বুকেছি—তোর ঘরের মধ্যে অকচি হয়েচে—তাই অজানা পথের দ্ব:খ-কষ্ট সেধে নিতে চাস্।

রাজপুত্র। হ্যাঁ মা: সেই আমার সঙ্গ!... কি রকম ভা' ক'বে?

(রাজপুত্র ও সঙ্গীদল)—গান.

যদি পথে আসে বন-গহন—

অগম-সাগরে ঢেউয়ের রণ—

একাকী—একাকী

নব পথ আঁকি—

যেতে হ'বে ঘুরে রাখিতে পণ।

কালো পাথরের ভাঙি জুড়ি—

পাহাড়ে কাটায়ে চলবো ছুটি।

ভাঙিতে—গড়িতে

লবো শেষে জিতে—

জয়ধ্বজার ঢাকি' গগন।

রাণী। না—না, তুই কিছুতেই শুনবি না রে। শুণ্ডো মতা-দেবতা—আমার ছেলেকে ঘরে বেঁধে রাখো—বাঁধন করো আরও শক্ত—সমারোহ ক'রে তোমার পূজো দোবো!

রাজপুত্র। যতই পূজো দাও—সে বাঁধনে আমাকে বাঁধতে পারবে না, মা!

রাণী। ওরে বাছা আমার—অমন নিষ্ঠুর কথা আর শোনাস্ নি!

রাজপুত্র। আমি রাজপুত্র—আমি কি মা-র আঁচল-ধরা ছুঁধের ছেলে? গুরুঠাকুর—আমাদের যাত্রার আর কত দেবী?—

হিতৈষী। বোধ হয় আর বেশী দেবী নেই—মহারাজের তাই ইচ্ছা! চলো—আমরা পাঠাগারে একবার যাই—দরকারী পুঁথি-পত্ৰগুলো গুছিয়ে নিতে হ'বে। পথে অনেক কাজে লাগতে পারে!

রাজপুত্র। চলুন—গুরুদেব! আয়োজন করিগে! মা-র কান্নায় রাজপুত্র কি ভোলে?—পাহাড়-চুড়া কি স্বর্ণকে ধ'রে রাখতে পারে? মেঘের জল কি মেঘের বাঁধন মানে? মাধব!

মাধব। অ্যা—।—। কি বন্ধু?

রাজপুত্র। তুমি আমার সঙ্গী হ'বে তো?—

মাধব। অ্যা—হ্যাঁ—অ্যাঁ তা' ছাড়া—আর উপায় কি! যেতেই হ'বে—আমি যে তোমার বৃনস্ত!

রাজপুত্র। তা' হ'লে চল এমো!

মাধব। চলো...চ—লো...হ্যাঁ—কি বলি—চ—লো...ঐ—যে মহারাজ আসছেন! একবার—দেখা ক'রে ব্যাপারটার ভালো-মন্দ চুল চিরে বিচার ক'রে... তারপর না হয়—যা হোক একটা...

রাজপুত্র। না মাধব—এখন নয়...যাত্রার সময় দেখা করবো। এমো!—

[রাজপুত্র মাধবের হাত ধ'রে টানতে টানতে প্রস্থান করলে—তারের শিঁছু শিঁছু হিতৈষী ঠাকুরও চললো...]

—রাণা প্রবেশ করলেন]

রাণা। রাণী—কাঁচো কেন?

রাণী। ছেলেকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোই কি ভা' হ'লে ঠিক করলে—মহারাজ?

রাজা। রাজকুমারকে দেশভ্রমণে পাঠাতেই হ'বে, নইলে তা'র শিক্ষা বাকী থেকে যাবে। 'তোমার কান্না শোভা পায় না, রাণী! বই পড়ে বা' শেখা যার—রাজপুত্র পণ্ডিত গুরুর কাছে সব শিখেছে। এখনো অনেক শিখতে হ'বে, অনেক দেখতে হ'বে। এই পৃথিবীটাকে সে ভালো ক'রে জাহুক। আহুয়ে বাছা হ'রে ঘরে থেকে সে কি করবে?—

রাণী। ঘরের বাইরে কত বিষ—কত আগুন! অতটুকু ছেলে—এতো বড় পৃথিবীকে জানবার কি দরকার?—সেইজন্তে এই কষ্ট সেধে নিলেই কি জীবনে খুব দাম মিলবে? তোমার কি তাই শারণা?—কুমারকে নানা বিপদ, নানা লোভের মাঝখানে যেতে দিতে আমার মন চায় না। বাইরের জগতের ওপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই।

রাজা। সাহসের শিক্ষা ঘরে ব'সে হয় না—রাণী! মানুষের জীবন যদি চিরকালের হোতো—তা' হ'লে আমরা ছেলেকে ঘরের মধ্যে আদরে, যত্নে বসিয়ে রাখতে পারতুম। সে যদি নিজে মানুষ হ'য়ে না ওঠে, কে তাকে রক্ষা করবে? বাপ-মার রোহ জীবনের হাজার চুঃখ, অনিষ্ট, অমঙ্গল বা মন্দকে ঠেকিয়ে রাখ'বার জন্তে ছেলের চারধারে দেওরাল খাড়া করতে পারে, কিন্তু সে-রোহ ছেলের চারপাশে একটা ভুলের জগৎ সৃষ্টি করে—সে জগৎ সত্য নয়। আমাদের মৃত্যুর পর রাজপুত্রকে লাখে লাখে প্রজার ওপর ব'সে রাজ্য চালক হ'বে—একলা। তখন তা'কে চিনে নিতে হ'বে প্রকৃত বন্ধু কে!

রাণী। তবে এই সমস্ত পণ্ডিত ম'শায় এতোকাল কি শিক্ষা দিলে?

রাজা। শিক্ষা ঠিকই দিয়েচে—সেই চিরকালের একঘেয়ে শিক্ষা। এখন গুরুম'শায় আর পুথির ওপর চ'টে গিয়ে সরস রূপকথা আর মনোহর ইঙ্গজালের গল্প পড়তেই রাজপুত্রের খুব আনন্দ। তাই আমার ইচ্ছা—রূপকথার রাজপুত্র আর সত্যিকারের রাজপুত্রের মধ্যে কি প্রভেদ—সে জাহুক!

রাণী। সে কি! আবার রূপকথার দেশের খোঁজ নেবার জগে কুমার ছেলেমানুষ হ'তে চায় না-কি?

রাজা। একেবারেই নয়...পুথির পাঠ আর অভিজ্ঞতার পাঠ এক জিনিস বলা যায় না। প্রথমেই আমাদের শক্ত মাটির 'পরে অনিশ্চিত হ'রে পাঁড়াতে হ'বে—এই হোলো ঠিক রাজ্য, তারপরে সেই মাটির ওপর ছড়াতে হ'বে আরও নরম মাটি, সেই মাটিতেই ফুল ফুটে ওঠে। কোমল ফুলের বৃকে কঠিন পাথর-কুঁচি বিছিয়ে দেওয়া নয়, কিংবা ভারী একটা পাথর চাপিয়ে দেওয়া নয়!

রাণী। বরলুম—কিন্তু মানুষের জীবনে একথা খাটে না। আমাদের বলা, রাজন—আমাদের ছেলের দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে এ-র কি যোগ আছে?

রাজা। কুমারের জন্ম সত্য আর অলীকের মধ্যে যে সেতু তৈরী করবে—সেই সেতু আমাদের গ'ড়ে দিতে হবে—এই ছেলেরই মুখ চেয়ে। মানুষের জীবনই তেমনি একটি সেতু, বা' সত্য আর আর মিথ্যার মাঝখানে পাতা রয়েছে।...এই যে রাজকুমার, সহচর মাধব আর অধ্যাপক হিতৈবী!

[যাত্রার বেশে রাজপুত্র—মাধব ও হিতৈবীর প্রবেশ। মাধবের কাঁধে একটা বড় পোঁটলা ও হিতৈবীর বগলে ও কাঁধে দস্তুরের বোকা]

রাণী। বাছা আমার—! সত্যিই কি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়'বি?

রাজপুত্র। হ্যাঁ মা, আমি প্রস্তুত হয়েছি। এবার তোমার আশীর্বাদ চাই!

রাণী। এই বিদায় দেওয়া যে কত কঠিন!

রাজা। জানি তুমি মা—কিন্তু রাণী তুমি, একথা মনে রেখো! রাজপুত্রকে বৃকে তুলে নিয়ে তার মাথার কল্যাণ-হাত বুলিয়ে দাও! ওর সাহস বা উৎসাহ চোখের জল কেলে কেড়ে নিয়ো না!

রাজপুত্র। মহারাণী—মা—আমি খুসি-মনে যাবি, বিশ্বস্ত অমুচরেরা আমার সঙ্গী, আমার শিক্ষক আর বড় মাধব আমার কাছে কাছে থাকবে।

রাণী। বুঝেছি বাছা। তোমাকে ধ'রে রাখতে চাই না। মহারাজের সাধ—তুমি দেশের হ'বে—দেশের হ'বে। আমি ভয় ক'রে আর অকল্যাণ করবো না—কপালে দোবো ষেতচন্দনের তিলক, ষেত উকীষে পরাবো ষেতকরবীর গুচ্ছ, কুলদেবতার আরতির কাজল দোবো তোমার চোখে পরিবে—পথে দৃষ্টির বাধা কেটে যাবে।...সব বেঁধে নিয়েছ? কিছু নিতে ভুল হয় নি তো?

রাজা। অতো সব বোকা কিসের?

হিতৈবী। আজ্ঞে মহারাজ, এ-সব পুঁথি—ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুচরিত, স্বাস্থ্যভঙ্গ, মানচিত্র...

মাধব। আর আজ্ঞে, এ-সব ধাবারের পুঁটলি—এইগুলোই আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকারে লাগ'বে, তাই বোকাটা একটু ফুলে কেঁপে উঠেছে।

রাণী। কুমার, এই সোনার মোহরগুলো আমি জমিয়েছি, তুমি রাস্তায় খরচ করবে—এই নাও! আর শোনো, তোমরা তোমাদের রাজপুত্রের ওপর বিশেষ মনোযোগ রেখো! এতটুকু ভুল যেন না হয়!

হিতৈবী। মহারাণী, কোনো ভাবনা নেই! রাজপুত্র পরম জ্ঞানী হ'রে ফিরবে।

মাধব। কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি হ'বে না—রাণী-মা! আপনার দিব্যি! কুমারকে আমি আরও ভারী—আরও ঘোটা ক'রে ফিরিয়ে আনবো।

রাণী। সেইটেই খুব বেশী দরকার মাধব! দেখো : রাজপুত্র সন্মুখের মাছ, বুনো চামরী গায়ের ছুধ, মায়ারুদ্ধের কল, কলকে ফুলের মধু—এ-সব যেন না খায়! এ সমস্ত জিনিসে কুমারের বড় লোভ। হ্যাঁ : বেশী ক'রে শোবাক-আবাক নেওয়া হয়েছে?

হিতৈবী। সমস্ত রকম সজ্জা! হ্যাঁ—তা'—কোনো ক্রটি নেই—মহাদেবী!

রাণী। আমি নিজের হাতে তিন বাগে ছত্রিশটি উত্তরীয়ে যে চিকন তুলে দিয়েছিলুম—তোমার ব্যবহারের জন্তে—বৎস, সেগুলো কোথায়?

রাজপুত্র। এই যে মা! কিন্তু আমি শুনেছি যে রাজপুত্র—বাইরে যখন যায় সে সময়ে তার সাজের বাহার থাকে না। সে যদি সঙ্গে নেয়, তা' একটিমাত্র উত্তরীর—ইন্দ্রধনু রঙের। রূপকথার ভো এ সমস্ত কিছুই পড়িনি। রাজপুত্র পক্ষীরাজের পিঠে চলে—ঘন ঘনের মধ্য দিয়ে, খাড়া পক্ষীরা রাজ্য কেটে, ভীষণ বড়-জল মাখার ক'রে—তেপান্তরের মাঠ পার হয়, বড় বড় নদ-নদী সাতারে পেরিয়ে যায়, আবার সামনে পড়ে অন্তল সমুদ্র—তরী বেয়ে কূলে গিয়ে পৌঁছোয় সে, শেষে পাড়ি দেয় রাক্ষস-পুরীর দুর্গ-দ্বারে। কিন্তু রাজপুত্রের বেশ-ভূষা এতো কাণ্ড ক'রেও একেবারেই মলিন হয় না।

মাধব। আচ্ছা, এতো কাণ্ড না ক'রেও রাজপুত্রের বন্ধুদেরও কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় কি? কেন না আমার দু'টি মাত্র জামা, এইটিই বা একটু ভালো। তাই বলছিলাম এই পোষাকটা নষ্ট হ'য়ে গেলে প্রাণে বড় কষ্ট পাবো!

রাজা। আর দেবী কোরো না! শুভযাত্রার সময় হ'য়ে এসেছে। সজ্জা হবার আগেই বাজা করো!

রাণী। যোজ খবর পাঠিয়ে দূত-মুখে, হংস-মুখে, কপোত-মুখে! আশীর্বাদ করি পথ শুভ হোক! হ্যা, দেবতার নির্দোষ কূলে নাও—উত্তরীরে খুঁটে বেঁধে রাখো। এসো, এসো! হ্যা—হ্যা: তোমরা মকরমুখ আর বৈষ্ণব-বড়ি নিয়েছ তো?

রাজা। ওঃ—নারী—নারী—দুর্কলা নারী! তোমরা কিছুতেই মন শক্ত করতে পারো না!

হিতৈষী। মহারাজ, যাদের এই ভালোবাসা, এই আনন্দ-যন্ত্রের চেয়ে কি জগতে আর কোনো জিনিস বড় আছে?

রাজা। জানি। কিন্তু ছেলেকে সত্যিকারের মানুষ ক'রে তুলতে হ'লে মা-কে হ'তে হবে কঠিন। মা-র আশীর্বাদে সন্তানকে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারবে না।

রাণী। মঙ্গল শাপ বাজাও! (শঙ্খধ্বনি)

রাজা। বাজাও ভেরী—!

সকলে। শুভ হোক—শুভ হোক—শুভ হোক পথ!

(ভেরীনাদ)

[সম্মেলক গান]

রাজপুত্র যার যার যার রে—

সোনার নায়ে।

চলো তরী ঐ শান্ত বায়ে।

বিধাতারি বর গলার মালা, (তা'র)

আশা-অভর নিয়ে রচা ডালা,

অকাল রয় তা'র গোপন কুণে,

শক্তি যে বৃকে তার রয় লুকায়ে।

• • •

[রাজপুত্র ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। কত দেশ-দেশান্তর ঘুরে সে এসে পড়লো এক বিচিত্র দেশে—বেখানে বাধা নেই, বন্ধ নেই—যেন কিম্বদন্তি-পড়া চৈতন্যর রাজ্য। সেই দেশে চোখে পড়ে দু'টি মাত্র পথ: একটি কাঁটার আর পাথরে

ভরা,—অপরটি ফুল-বিছানো। সকলে পড়লো সমস্তার: কোন্ রাজ্য তা'রা বেছে নেবে!] •

[ফুলকী-ভালে সঙ্গীত—

হিতৈষী। রাজকুমার, দেশ-দেশান্তর তো অনেক ঘুরলে, এমন বিচিত্র দেশ কখনো দেখেছ?

রাজপুত্র। নতুন দেশই তো দেখতে সাধ ছিল, গুরু হিতৈষী!—এখানে বাধা নেই, বন্ধ নেই! কি বলো মাধব?

মাধব। হ্যা—যেন কিম্বদন্তি-পড়া রাজ্য—কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকচে,—গা-টাও একটু-আধটু হুম্ হুম্ ক'রে উঠচে!

হিতৈষী। কেন—ভূত-পতঙ্গীর দেশ বলে তোমার মনে হ'চ্ছে নাকি? ভূত তাড়বার আমি মন্তর জানি। কিন্তু এই দেশে দেখতে পাচ্ছি—দু'টি মাত্র রাজ্য। একটি কাঁটার আর পাথরে ভরা, আর একটি ফুল-বিছানো রাজ্য মাটির পথ।—এখন মহাসমস্তা, কোন্ পথে আমরা চলবো?

[সঙ্গীত-বৈচিত্র্য—মৃগশৃঙ্গ ও অণ্ড ইঙ্গিত—

মাধব। সত্যিই তো, মাথা গুলিয়ে যাবার যোগাড়—আমরা এলুম কোথায়?

রাজপুত্র। হ্যা, কোথায় এসেছি আমরা? নাম-না-জানা দেশ!—আপনি বললেন, গুরু হিতৈষী—আমরা এক বস্তার মধ্যে একটা গায়ে এসে পৌঁছুবো কিই?—এখন দেখুন, আমরা পথ হারিয়েছি!

হিতৈষী। পথ হারিয়েছি! তা'হলে প্রমাণ নিতে হ'বে পুঁথি থেকে! আমাদের এখন ভূ-পরিচয়ের মানচিত্রটা দেখতে হ'লে, এতে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য-নগর, পথ-ঘাটের নিখুঁৎ-নক্সা আঁকা আছে। ভয়-ভাবনা নেই—পুঁথি সহায়।

মাধব। হ্যা, গুরুমশায়, বুঝিছ দোড়টা! আমি আগেই বলছিলাম—আমরা ঠিক রাজ্য না খ'রে বেচাল হ'য়ে পড়ছি!—

হিতৈষী। সকল দেশের সেবা পণ্ডিতরা মিলে সারা পৃথিবীর যে নক্সাটা তৈরী করেছেন, তা'র ওপর বিশ্বাস না রেখে, তোমার ছেলেমানুষী কথায় বিশ্বাস করতে হ'বে—বলতে চাও, মাধব?

মাধব। গরীবের কথা কি না!—তবে আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে—খুব ভালোই হোতো!—

হিতৈষী। কেন—বলোতো?

মাধব। কারণ—আমি একপোবার এ-রকম রাজ্যের পায়ে হেঁটেছি—কি দিনে—কি রাতে।

হিতৈষী। সে-রকম রাজ্য চলার কোনো দাম নেই, কারণ তোমার গতির কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকে না।

মাধব। বাই বলুন—গুরুমশায়, মানচিত্রের নক্সা দেখে অঙ্ক ক'রে কি রাজ্য মাপা যায়? কে জানে—কোন্ হুলোর ঘোরে এসে পড়েছি?

হিতৈষী। তা'বার কি আছে? সামনে মাত্র দু'টি রাজ্য, এখানে আমাদের তাই বেছে নিতে হ'বে।

মাধব। বলুন—একটি রাস্তা বেছে নোথো। এটাকে কি ঠিক রাস্তা বলা যায়? এই রাস্তা দিয়ে মাহুঘের চলাচল আছে ব'লে তো মনে হয় না! যেন একটা গোলকধাঁসী, অঁকাবাঁকা, ঠিক যেন মাহুঘ-এর কঁাদ, কঁটা-গাছে ভরা, পাথর-কুটিতে অরোজরো! এ দিকের রাস্তাটাই—রাস্তা, এটেতেই আমরা চলবো। পারে চলার পথ—একেবারে সোজা চ'লে গেছে, যেন একটা লাল সরলরেখা, কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! এই রাস্তার বাজা করলে নিশ্চয় আমরা কোনো একটা বড় নগরে পৌঁছে যাবো।—

রাজপুত্র। মূর্খ তুমি! ঐ রকম সাজানো ফুল-বিছানো পথ দেখলেই সকলের ইচ্ছে হয়—ঐ পথেই হাঁটি। কিন্তু এ রাস্তার চলার লোভ ছাড়তে হবে। জানো না, সমস্ত গয়েই বলা আছে—দেখতে ভালো রাস্তাগুলো বিপদ এনে দেয়? এ-সব রাস্তা কোনো ভীষণ রাক্ষস বা দৈত্যের দুর্গপূরীতে নিয়ে যাবার ফাঁদ! পথিকরা সেখানে বেই পৌছোয়, অমনি তাদের পেটে পুতে রাক্ষসটা এক ভিলও বিধা করে না। এ পথ—বিপথ। আর কঁটার ভরা দেখতে খারাপ রাস্তাগুলো পরীদের বাগানে কিংবা বড় বড় রাজবাড়ীতে পৌঁছে দেয়, যেখানে রাজকন্ডারা মালা গাঁথে রাজপুত্রদের অপেক্ষার ব'সে থাকে!

মাধব। তুমি বা বলচো, হয়তো সত্যি হ'তে পারে। কিন্তু বন্ধু ও গল্পকথার বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়—ঐ বিল্লী রাস্তাটা বিল্লী, আর ঐ সুল্লী রাস্তাটা সুল্লর! প্রাণ গেলেও ঐ থোয়া-ভরা রাস্তার হাঁটতে পারবো না!

রাজপুত্র। ভীষণ তুমি! তোমরা চিরদিনই বাধা-ধরা রাস্তা দিয়ে চলবে জানি! সাহস নেই তোমাদের। কিন্তু রাজপুত্র ও রাস্তার চলে না। আমি যাবো ঐ পাথুরে পথ ধ'রে!

হিঁতবী। রাজকুমার—থামো—থামো! দিক তুল হ'রে গেছে—দাঁড়াও—ভূগোল দেখে ঠিক করি—মানচিত্রে নগর উপনগরের নক্সা দেখি—কোন রাস্তার চলা উচিত—তার পরে—

রাজপুত্র। না, না, আমাকে ছেড়ে দাও!

মাধব। ওরে বাবা—বিপথে কেমন ক'রে যেতে দোবো?

হিঁতবী। যেহেঁ নো রাজকুমার—চিরচলার পথে চলাই ভালো।

রাজপুত্র। ও কথার আমার মন তুলবে না! আমি যাবো! তোমরা থাকো ব'সে।

[রাজপুত্র ছুটে বেরিয়ে গেল]

মাধব। শুনে নো! চললো ছুটে? রাজপুত্র হ'লেই কি এমনি সাহসের বড়াই করে থাকে?...আরে—কে আসচে ঐ বাডা পথটা দিয়ে? কোনো রাজকন্তে নাকি? রাজপুত্রকে ডাকি—! ও বন্ধু—বন্ধু!

[রাজকন্যা রজা—বনফুলের চড়া ক'রে মাথার বহরা ফুলের মঞ্জরী হুলিয়ে—কাণে হুঁচি কড়ির কুম্ভিকা হুলিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। হুই হাতে শাপের আকারে লতার প্যাঁচ...গলার বড় বড় প্রবালের হার।

রজা। কাক্ ডাক্কেন? তোমরা বুদ্ধি পথ হারিয়ে

কেলেহ? এখানে বে আসে—তোমাদের মত সকলেই দিশেহারা হ'রে যার!

মাধব। হ্যাঁ, তাইতো ঘটছে আমাদের বরাতে! কিন্তু আমার বন্ধুটি বে দিশেহারা হ'রে ছুটে চলেচে—ঐ যোরালা রাস্তাটা দিয়ে! সেইরকম আমরা বড় ভাবনার প'ড়ে গেছি!

রজা। যার বা' রাস্তা—বে যার তা'কে যেতে দাও! মুখ্য বার—তা'রাই ভাবে। যদি ভালো চাও, তোমরা চ'লে এসো আমার সঙ্গে!

মাধব। কেন বলো দেখি? চেনা নেই, শোনা নেই—হঠাৎ এ আপ্যায়নের মানে কি? রাক্ষসপূরীতে নিয়ে যাবে নাকি? খুব মারা-বিচ্ছে শিখেছ, বা' হোক!

রজা। তুমি তো ভারী বোকা দেখ'চি! লোকের ভালো করতে গেলে মন্দ হয়! আমাদের মত বড় বাড়ী এই পথের পারে, সেখানে গেলে আদর-বড়ই পাবে!

মাধব। তাই নাকি? সত্যি বলচো? তা' তোমায় দেখে অবিশ্বাস করতে মন চাইচে না! কিসেতে প্রাণ আইটাই করচে, তা' হ'লে দানাপানির লোভে তোমার সঙ্গে যেতেই হোলো! দেখো—শেষে যেন না প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়!

রজা। না গো না! হ্যাঁ: তুমি নাচ'তে গাইতে জানো তো? আমার স্বামী বড় আমোদ ভালোবাসে।

মাধব। ওঃ—তোমার স্বামী আছে নাকি? বেশ, বেশ! আমি নেচেকুঁদে তা'কে আমোদে হারুতু ব'ধিয়ে দেবো।

রজা। কি রকম?

মাধব। যেমন—আমার একটা মন্ত শুণ...

গান

অতি বড় সেয়ানা

এই আমি গো একটা!

ভর যদি আসে কাছে মারি তিন গাঁটা।

যবে বৃষ্টির প্যাঁচ বাড়ি পটকার গিত,

ঘূরণাক্ খার বত রাস্কল দৈতা,

তিন হুঁকে তিন লাকে করে দিই চ্যাপটা।

(হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ—গোগ গো-গোগ গো-গোঃ)

রজা। বাঃ বাঃ! তুমি তো বেশ মজাদার লোক! শুকনো আসর বেশ রসালো করতে পারো, দেখছি! এসো এসো! রাস্তার দো-মাথার ব'সে কাণে কলম শুঁজে পুঁথি হাঁটকাডে—ঐ প্রবীণ পাকাটি কে? তোমার সঙ্গী ভে? ওকেও ডাকো না, আসুক!

হিঁতবী। না, আমি এ যারগা ছেড়ে এক পা'ও নড়'বো না। মানচিত্র দেখে রাস্তা ঠিক কর'বো—তবে উঠ'বো। তোমরা বে রাস্তাতেই যাও, এখানে এসে সকলকেই ঠেকতে হবে!

মাধব। তা' হ'লে থাকো—আঁক্ কসো আর জহুলে বাডাস যাও!

গান
 বোম্ বোম্ বোম্
 পাগলা ভোলার চর,
 হুম্ হাম্ হুম্
 করবে ঝাড়ে ভর।
 খাও তুতের কিল্
 ধরবে পেটে খিল্
 শিতে কোঁকো ব'সে—
 ভরবে না উদর।
 (না-না-না—আ-আ-আ-আ)

[রাজপুত্র রূপকথার পড়েছে যে কাঁটা-পথে গেলে পরীর রাজ্যে পৌঁছানো যায়। তাই সেই রাত্তা ধরে রাজপুত্র খোড়ায় চড়ে চলেছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ঘন বন পার হ'য়ে—কোন অজানা দেশের খোঁজে। সে আঁকা-বাঁকা পথ চলতে চলতে এধার-ওধার কেবল চেয়ে দেখে—কোথায় মায়ার খেলা। কিন্তু পথের খবর পাওয়া যায় না। রাজপুত্র দেখে—চারদিকে বন। দূরে রাখাল হাঁকে—তা'র বাঁশী বাজে, কাঠুরিয়া বেন কোথায় কুঠার হেনে গাছের ডাল কাটে—চোখে পড়ে না। শেষে রাজপুত্র এসে পড়লো এক সবুজ বনের কাছে। সেখানে দেখা গেল—একটি সরু পথ। পথের ধারে ঘাস উঠেছে—গাছের ছায়ার তলায়, তারই পাশ দিয়ে নেচে চলেছে—একটি ছোট্ট তরুতরে নদী। সেই নদীর বাঁকে একখানি কুঁড়েঘর। কুঁড়ের বেড়ার ওপর ছিলে কুম্ভকোলতা, শোনা বাদে—মৌমাছিদের গুজন। বকুল-তলার ছায়ার ব'সে কে যেন গুণ্ গুণ্ সুরে গান গেয়ে চক্কা কাটছে। হঠাৎ রাজপুত্রের আগে কিসের গন্ধ, কা'র বাঁশী ভেসে এলো। রাজপুত্রের আশা—হয়তো সে বা' চায় তাই পেয়েছে। এই কুঁড়েঘর—এ বকুলতলা।...]

[মুহূর্তে—সঙ্গীত...

রাজপুত্র। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ঘন বন পার হ'য়ে চলেছি কোন অজানা দেশের খোঁজে। কিন্তু কোথায় পরীরাজ্য, কোথায় রাজ-প্রাসাদ? আঁকা-বাঁকা রাস্তা—এধার-ওধার চেয়ে দেখছি—কোথার-বা মায়ার খেল চিবুকে ঘাস, কোথার-বা মরীচি-মায়ার বাড়ী?

[একটি গান ভেসে এলো]

মারাবিনী। (গান)

সবুজ এ-বন বৃগনাভি-গন্ধে ভরপুর।
 রাজপুত্র আর তুমি বাও কতদূর!
 কেতেতে নেই চাব তবু এই ভরা যে কসল,
 মুকিরে কোথায় বাজার রাখাল
 বাঁশীটি উতল,
 কাঠুরিয়া কুঠার হানে পড়ে নাকো চোখে,
 অলিমালা ভোলে নিতুই গুজন মধুর।

তরুতরে এ' নদীর বাঁকে আছে কুঁড়েখানি—
 কুম্ভকোলতা ছিলে সেখা'

মিতেছে হাতছানি,
 বকুলতলার ছায়ার ব'সে

চক্কা কাটে মেরে,
 গুণ্ গুণিরে মায়াবতী তুলচে

মায়ার সুর।

রাজপুত্র। কোন মারাবিনী গান গেয়ে ঠিকানা জানিয়ে দিলে আমাকে?—সত্যিই তো—এই নদীর বাঁকে কি চমৎকার কুঁড়ে ঘরটি!... এ যে ব'সে কে? এ কি মায়াপরী?

পথধাত্রী। কে আসে গো—কে আসে?—এজ্ঞা গো নবীন—এসো আমার কুঁড়েঘরে! কতকাল আমি এখানে একলা ব'সে গান সাধি—আর চক্কা কাটি, কেউ আসে না। রাজপুত্র-দের পারে পথের কাঁটা ফোটে, তাই আর আসতে পারে না তা'রা।—আমার বড় হুঃখ—বড় হুঃখ! তুমি কি রাজপুত্র?

রাজপুত্র। ঠিক চিনেছি তো তুমি! আমিও তোমাকে চিনেছি। আমি এসেছি, তোমার হুঃখ ঘুচিয়ে দোবো। আজ্ঞা বাহুকরী—বাহুর মায়ার এতোদিন বাঁচিয়ে রেখেছ কোন মন্ত্রের গুণে?

পথধাত্রী। বাহুর মায়ার আবার কি? এমন ক'রে এই মায়ার কেন বাঁধা পড়ে আছি—তুমি বুঝি সেই মায়ার কথাই কুঁড়ের বলচো?

রাজপুত্র। বা-ই বলো—আমি এই পাতার কুটারটি দেখেই চিনতে পেরেছি—জেনেছি—এখানে কোনো মায়াপরী থাকে! পথের পাশে নদীর ধারে ঘাটের ওপরটিতে এই কুঁড়েঘর—চাপা আর বকুল গাছের ছায়ার। বেড়া বেয়ে অপরাধিতা ফুল ফুটেচে। হুয়ারের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শম্ভুচক্রের আল্পনা। এ সব দেখেও আমার ভুল হ'বে? নিশ্চয় তুমি মায়াপরী! রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে—এবার তোমার সব মায়াজাল ছিঁড়ে দোবো।

পথধাত্রী। এমন তো অদ্ভুত কথা কখনো শুনি নি! বলচো কি রাজপুত্র? আমি মারাবিনীও নই—পরীও নই!

রাজপুত্র। ওঃ—আমার মন ছলনা করচো? তা'করো, এ-মন টলবে না। এখন কি করতে হবে বলো? দৈত্য জয় করতে হবে? মারতে হবে রাক্ষস? যক্ষকে বুড়ে হাবিরে তার সমস্ত ধন-দৌলত তোমার হাতে তুলে দিতে হ'বে? তোমাকে বাহু ক'রে রেখেছে এই রকম মারাবুড়ির সঙ্গে সাক্ষি? বলো—কি করলে তুমি মুক্তি পাবে? আবার কিরো পাবে তোমার আসল রূপ? উঠবে ফুটে যেন নির্মাল্যের ফুল! হাতে শালা শাঁখ, গলার পদ্মবীজের মালা, পরণে লালপেড়ে শাড়ী!

পথধাত্রী। আর সেদিন কি হবে না, রাজপুত্র!

রাজপুত্র। তবে আমি কিসের রাজপুত্র!—তোমার ওপর কোনো ডাকিনী, যোগিনী, শিশাচ কি রাক্ষসের যে মায়ার ঘিরে রয়েছে—সে ভাঙতেই তো এখানে আমার আসা! আমি তোমাকে কোঠাবাড়ী বানিয়ে দেবো গজদন্তের দেপরাণ দিয়ে!

শাঁখের শুঁড়ের মেঝেটি হবে। দুধের ফেনার মত শাদা, যুক্তোর বিহীন দিয়ে তার কিনারার একে দোবো পড়ের মালা।...আমার কথা শুনে হাস্‌চো? আমি সব পারি—আমি রাজপুত্র।

পথধাত্রী। গল্পে তুমি এ-সব কথা পড়েছ? তাই এই ভুল বক্‌চো—বারংবার। আমি পথের ধারে থাকি একলা, দুখিনী আমি। সংসারটা কি—চিনতে পারলে—ও-সমস্ত মিথ্যে কল্পনা তোমার মাথায় আর বাসা বাঁধবে না। এসো ঘরের ভেতর! কিদে পার নি? রাজ্য হেঁটেচো!—সামান্য হুঁচকি ফল আছে, তাই খাও! আমি গরীব—কেদী কিছু নেই।

রাজপুত্র। আমাকে ছলো—ছলো—কত ছলনা জানো, দেখবো আমি—বাহুকরী! কিন্তু আমি তোমার নকল রূপ খসিয়ে দোবোই। সেইদিন তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে আমার স্বপ্নের রাজকন্ডার কাছে।

পথধাত্রী। সে তো আশার-মত আশা! রাজপুত্রকে রাজ-কন্ডাব কাছে নিয়ে যাবো বৈ কি!

[এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়লো]

রাজপুত্র। কে দবজার ঘা' দেয়? রাজপুত্র ভেগে বয়েছে, তর নেই?

পথধাত্রী। কে রে?

রাখাল। স্বরজা খোলোগো বুড়িমা! আমি রাখাল ছেলে!

পথধাত্রী। কেনরে? কি বলচিস?

রাখাল। এখানে কোনো রাজপুত্র এসেচে?

পথধাত্রী। কেন বল দিকিনি!

রাখাল। খবর পেলুম গো! আমি রাজপুত্র দেখতে এয়েচি।

পথধাত্রী। আর আর ভেতরে আর!

রাজপুত্র। তুমি রাখালছেলে...বে মাঠে বটের ছায়ার বঁসে বাঁধী বাজার?

রাখাল। হ্যাগো : ও কে, বুড়িমা? ওই কি রাজপুত্র?

পথধাত্রী। হ্যা, রাজপুত্র।

রাখাল। রাজপুত্র! সত্যি সত্যি? এই রাজপুত্র? তুমি মনুষ্যপত্নী নায়ে চ'ড়ে এসেচো? আগে লোক পিছে লম্ব কই? ডাইনে-বাঁয়ে বাজনা-বাঁজি কই?

রাজপুত্র। রাজপুত্র যখন রাজকন্ডাকে উদ্ধার করতে দৈত্য জয়ে বেহোর, তখন সে একলা হাতে পথ। তুমি রাখালছেলে কি না, তাই জানো না!

রাখাল। তোমার কাছে সাত রাজার ধন মাদিক আছে?

রাজপুত্র। সেই খোঁজেই তো বেরিয়েছি!

রাখাল। সে কি গো, তোমার কাছে রতন নেই? তবে কেন রাজপুত্র?

রাজপুত্র। রতন আছে অনেক। চাই একটা রতন? নেবে? এই নাও, একটা সোনার মোহর।

রাখাল। আমার দিলে? সত্যি তা' হ'লে তুমি রাজপুত্র! কিন্তু এখানে তো তোমার আর থাকা ভালো নয়। আমি শুনে এলুম বনের ধারে বঁসে—কাঠুরেগুলো বৃষ্টি কর্‌চে, বল্‌চে তা'রা—'রাজপুত্র গেচে মারাবুড়ির বাড়ী, তাকে আমরা ধরবো'। তাই না শুনে আমি রাজপুত্র দেখতে ছুটে আস্‌চি।

পথধাত্রী। তা' হ'লে তো আর রক্‌ নেই! রাজপুত্র, আর নয়! ও লোকগুলো ছবমন, পরসার জন্তে সব কর্‌তে পারে!

রাজপুত্র। যে আসে আসুক, রাজপুত্র ডরার না। আসুক দৈত্য, আসুক রাক্ষস! তাদের পথের সামনে তুমি আগুনের পাঁচিল তুলে দাও!

(দূর থেকে শিঙার আওয়াজ)

পথধাত্রী। জীবনটা রূপকথা নয়, রাজকুমার! রাখাল বাদের কথা বললে—তা'রা লোভে প'ড়ে মাছ খুন করে। কত সোনারচাঁদ কুমার পথ হারিয়ে ওদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। পালাও—পালাও, এখানে আর নয়!...ঐ বৃষ্টি শিঙা বাজ্‌চে! আমার কথা রাখো' রাজপুত্র! প্রাণ বাঁচাও!

রাজপুত্র। রাজপুত্র আমি! আমি বীর কি না—পরখ কর্‌তে চাই!

পথধাত্রী। এ কি পাগল! তা'রা দূরে রয়েছে, এখানে পালাও!

রাখাল। হ্যা : হ্যা তাই চলো! তোমাকে আমি দৈত্য-পূরীতে নিয়ে যাবো, আমি সোজা রাজ্য জানি।

রাজপুত্র। দৈত্যপূরী? সে কোথায়? রাজকন্ডা সেখানে বন্দী হ'বে আছে বৃষ্টি?

রাখাল। তা' জানিনি। তুমি যাবে? আমরা রাজ্য জানি। দৈত্যের বউ-রজা খুব খাওরাতে ভালোবাসে। যাবে তো চলো!

(শিঙা ক্রমোচ্চ)

পথধাত্রী। তাই ভালো! আমিও সঙ্গে যাবো। রাজপুত্রকে দেখে আমার মারা জেগেছে। ওকে বাঁচাতেই হবে!

রাজপুত্র। জানি, তুমি আমাকে বাঁচাবে। আরও জানি, তোমার জন্তে শেবে আমার রাজকন্ডার দেখা পাবো।

রাখাল। এসো গো ঈগৃগির এসো! শিঙে শুন্তে পাচ্‌চো? ঐ এলো, ঐ এলো এগিরে!

রাজপুত্র। চলো, কোথায় দৈত্যপূরী! দেখাও পথ!

[এর পরেই দৈত্যপূরীতে গিয়ে আমরা পৌঁছুবো। রাজপুত্র সেখানে উপস্থিত হ'লেই আবার গল্প আরম্ভ করা যাবে।]

ধেমুদলে লও ডাকি'

সাঁঝের সোনালি স্বপ্নে শিহরে দিবসের আলো-আঁধি,
হে রাখাল তব বেণুটি ঝাঝাও, ধেমু দলে লও ডাকি' ।
জামল ফুগের পেলব পরশে
মাভিল ধে-মন মধুর হরবে,—
গৃহপথ পানে মধুর তানে তাহারে টানিবে না কি ।
হে রাখাল, তব ধেমুদলে তব বেণুরবে লও ডাকি' ।
দূরে ভাটিনীর কল্লোল কীদে মুরছি' তটের তলে ।
ওপারের গ্রামে বিদায়-বাকুল শব ধেরা-তরী চলে ।
তমাল-কুঞ্জে অঞ্চল টানি'
ঘনালো ছারায় কালো মায়ানানি,
কদম্ব-বনে উদাস পবন শিশিরের কণা মাখি' ।
হে রাখাল, তব বেণু-মিঃবনে ধেমুগণে লও ডাকি' ।

ঐশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

অসহায় রাতি বিরলীর তানে আকাশে গুমরি' বাজে ।
চকিত আলোর জোনাকী চমকে বিজল তিমির মাঝে ।
দীপ্তিতে কমল মুদিল নয়ন,
পাছ খুঁজিছে সুপ্তি-শরন,—
শূভ্র-পথের ক্লাস্তি টানিয়া ফিরিছে নীড়ের পাখি ।
হে রাখাল, তব বেণুরবে তব ধেমুদলে লও ডাকি' ।
তোমার চোখের সীমানা ছাড়ারে ধেমু চরে হেথা-হোথা,—
একা ফিরিবার সাধ্য কি তার, পথ খুঁজে পাবে কোথা ?
তোমার আঁখির উজল কাজলে
তার জীবনের আভ্রয় বলে ।
তাই বেলাশেষে একান্তে এসে বেদনার ওঠে হাঁকি' ।
হে রাখাল, তব ধেমুসবে তব বেণুরবে লও ডাকি' ।

আরো কিছু

ঐপ্রশান্তি দেবী

আরো কিছু কাছে এসো, বাগরের শরনে,
চেরে থাক উৎসুক ঘননীল নয়নে ।
জ্যোৎস্নার বরণে,
আঁকা ওই শাড়ীখানি থাক তব পরণে ।
সজ্জিত স্তম্ভের আজিকার লগনে
বক্সিস ফুটু আঁকা প্রেম-স্বপনে,
কুহুম রচনে,
অধরের মধু বেন সজ্জিত গোপনে ।

রাত্রির নীরবতা ঘিরে আছে ছ'জনে,
পাশাপাশি মোরা ধৌহে রত প্রেম-কুজনে,
লাজাকরণ আননে
প্রণয়ের অঞ্জন রূপায়িত নয়নে ।
কাছে এসো আরও কিছু পাশাপাশি শরনে,
আপনা হারাতে চাই মিলনের লগনে,
মধুময়ী স্বপনে,
রাঙারে উঠুক রাতি স্বর্গের বরণে ।

পরজন্মে

পল্লীর ব্যথায়

ঐআশুতোষ সান্যাল

ঐরাইহরণ চক্রবর্তী

জানি না আবার এই ফুল'ভ জনম
হবে কি না এ স্তম্ভের ধবধব 'পবে
কোনো দিন । উচ্ছলিত এই মনোরম
জীবনের সুখ-রস পরিতৃপ্তি ভরে
করিব কি পান আর ?—কে দিবে উত্তর ।
এমনি তুলসীমঞ্চ সন্ধ্যাদীপ জ্বালা,
বৃহ্মণ্য শঙ্খধ্বনি,—বিল্লী কলধ্বন,—
মৃত্তিকার গৃহখানি নিস্তর নিরালা,—
ভাবি মনে মিলিবে কি কঁড় এব পর ?
তুমিও কি এইরূপ সর্গকর্ণশেষে
বিধারি' জ্বর-কৃষ্ণ অলকের ধর,
শিতমুখে সর্কোতুকে লেখা বিবে এসে
বাসকশস্যার ? সান্ত্র নিশার তিমিরে
মুগল ছদর-স্পন্দ বাজিবে কি ধীরে ?

বিত্রোহী মোর চেতনা, বার্ষ পরাজয়-
অর্ধলোভ চারিদিকে করিছে হুঙ্কার ;
দেবতা পলার ত্রাস সব করি' জয়,
আমরা মাছুষ নহি—বার্ষের বিকার ।
কুহুর শৃগাল আজ টানিতেছে শব,
অশানে মাছুষ নাই করিবে যে তাড়া,
কহোব প্রতীক্ষা নিয়ে পড়ে আছে সব,
বকুহীন বাকবের চোখে অজ্ঞাধারা ।
মৃত যারা মুক্ত আজ অনলে মলিলে—
পেটের আলার কতু নাহি দিবে প্রাণ,
বহু গৃহী ভক্ত হয়ে লক্ষান মলিলে
অপাত্রে অস্থানে হায় পড়ে র'ল দান ।
'ওরে নাই', 'ওরে নাই' গেল গেল পণ
যারা আছে ধরে রাখ—দাঁচুক জীবন ।

কাচিনদের দেশ

ক্রীমরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের সময় কাচিনদের দেশে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলাম বলিয়া তাহাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। কাচার-কুতলা পর্বতমালায় দুর্গম ও দূরারোহ ক্রোড়দেশে এই পার্বত্য সম্প্রদায় বাস করে। আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী আরণ্য এলাকায়ও আমরা কাচিনদিগকে দেখিতে পাই যেতে কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত বাসস্থান দেখিতে হইলে এবং কাচিনত্ব পূর্ণরূপে অবগত হইবার কামনা করিলে আনানিগকে ব্রহ্মের উত্তর সীমান্তের নিবিড় অরণ্যাবৃত পর্বতাকর্শ অঞ্চলে গমন করিতে হইবে।

আমরা মান্দালয় হইতে উত্তর-শান-ট্রেটস নামক শান-সম্প্রদায়-অধ্যুষিত রাইসমুহের ভিতর দিগা কাথা নামক নগরে পৌছিয়াছিলাম। মান্দালয় হইতে কাথা ইরাবতীকে স্টিমারযোগে ভ্রমণের শ্রুতি আমাদের মনসপটে চিরকাল আঁকিত হইয়া থাকিবে। কাথার অনতিদূরে চীনসীমান্তের সন্নিকটবর্তী ভানো। কাথার আমরা জলপথ পরিত্যাগ করিয়া রেলপথে মিংকিনা বা মিরিংকিনিয়া যাই। মধ্যে যোগোয়াং নামক স্থানে একদিন ছিলাম। কাচিনদের বেশ কাথা হইতে আরম্ভ বলিলে ভুল হয় না। কাথাবাসী কাচিনদিগকে “কাথা কাচিন” বলা হয়। কাথা হইতে প্রত্যেক ষ্টেশনে কাচিনকুলী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আরোহীদিগের মধ্যেও কাচিনের সংখ্যা কম নয়। মিরিংকিনিয়া বা মিংকিনা শব্দের অর্থ বড় নদীর নিকটবর্তী নগর। কাথা-কাচিনদিগকে “চিংপ”ও বলা হয়। সমগ্র কাচিন সম্প্রদায়কেও চিংপ বলা হইয়া থাকে। চিংপ শব্দের অর্থ মানুষ। কাচিনদের মধ্যে একটা প্রচলিত প্রাচীন—চিংপ মাত্রই মানুষ কিন্তু সকল মানুষ চিংপ নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপনাদিগকে সর্বপ্রথম, স্রষ্টার সর্বাঙ্গের অঙ্গস্বরূপে বলিয়া মনে করে—এই সত্য সংশয়হীন।

কাথা-কাচিন, মার-কাচিন ও খাছুকাচিন—কাচিনদিগকে এই তিনটা উপসম্প্রদায়ের বিভক্ত করা হইয়া থাকে। প্রথম কাথা-কাচিন, মধ্যে মার-কাচিন এবং সর্বশেষ বা কাচিনদের দেশের সর্বোত্তর সীমায় খাছুকাচিনগণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। “চিংপ” শব্দটি চৈনিক বলিয়া আমাদের বিবাস। কাচিন সম্প্রদায় বোঙ্গোলীর বা ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা ইহাদের আকৃতি দেখিলে বেশ বুঝা যায়। নৃত্যবিশ্ব বা জাতিহৃৎবেত্তা পণ্ডিতগণের মতে কাচিন জাতির পূর্বপুরুষেরা ছয় অতীতে তিব্বত হইতে ব্রহ্মের উত্তর সীমান্তে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। লিহু, নাং প্রভৃতি পার্বত্য সম্প্রদায়গণও চিংপ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। পার্বত্যের ভিতর লিহু ও নাংগপ দুর্গম পার্বত্য এলাকা হইতে নিরবর্তী প্রান্তরে প্রায়ই অবতরণ করে না, কাচিনগণ ফুলির বা অন্য কোন কাজ করিবার জন্য ব্রহ্মের অন্তর্গত অংশে দলে দলে আসিয়া থাকে। পরে দৃঢ়বেহ লিহু ও নাংদিগকে ব্রহ্মের সৈন্যদলে ভর্তি করিবার জন্য যে চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও কতকটা কৃতকার্য হইয়াছে। ব্রহ্ম-ভ্রমণের সময় সৈনিক সার্জে সজ্জিত লিহু ও নাংগপ আমাদের অন্তরে এবং কোঁতুলস জাতের করিয়াছিল। যেমন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আফ্রিদি, কাকির প্রভৃতি নতাত্মিক সম্প্রদায়ের বাসস্থান, তেমনই তাহার পর্বতাকর্শ উত্তর-পূর্ব সীমান্তও বহু বিচিত্রাকৃতি পার্বত্য জাতির অধিবাস-স্থান। তবে নৃত্যবেত্তা পণ্ডিতদের পক্ষে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষা উত্তরপূর্ব সীমান্ত গভীরতর গবেষণার ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের বিবাস। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অত্যন্ত উন্নত কিন্তু ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত অতিশয় উর্বর।

রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে যোগোয়াং হইতে মিরিংকিনিয়া বাওয়া আশৌ সহজ ছিল না। যাপনসড়ল ভ্রমণাব্যবহীন লিহু, খানারী ভিতর দিগা অগ্রসর হইতে হইত। মিংকিনিয়া ঐ নদীর জিলায় খেড়কোয়ার্টারে

পরিপতি পাওয়ার এবং রেলপথ অবধি হওয়ার পর হইতে ভ্রমণকারীদের পক্ষে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ নাই বলিলেই হয়। আমাদের এক প্রবীণ বন্ধু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই পথে গিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতি পদে পদে বিপদের যে কাহিনী আমরা শুনিয়াছিলাম; তাহাতে রেলপথ না থাকিলে এই পথে আসিবার সাহস আমাদের কখনই হইত না। ঐ বন্ধুকে বহুবার ব্যাঙ্গের দ্বারা বিপর হইতে হইয়াছিল। স্নানিতে বস্ত্রাবাস বিবৃত করিবার পর চতুর্দিকে অগ্নি আলিঙ্গা রাখিতে হইত।

আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন রেলপথ স্থাপিত হওয়ার মাত্র পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেও বর্ষার উত্তরাংশের অধিকাংশ স্থানে তখনও সভ্যতার আলোক .



ব্রহ্মের দেশে তরুণ কাচিন সর্দার

দেখা দেয় নাই। অবশ্য এখনও এমন জায়গা আছে বাহ্যিক সভ্যজগতের বাহিরে বলা চলে। মিরিংকিনিয়া পর্যন্ত সভ্যতার প্রোভ প্রবাহিত বলিলে ভুল হয় না। পরে দুর্গম নিসর্গের দৃক যে প্রবেশ পরিতুষ্ট হয় তাহাই প্রকৃত কাচিনদের দেশ। রেঙ্গুন হইতে মিরিংকিনিয়ার দূরত্ব প্রায় ৭ শত মাইল। মিরিংকিনিয়া হইতে ৩০ মাইল দূরে মালিহকা ও নমাই-নদী সন্নিবিষ্ট হইয়া ইরাবতী নাম ধারণ পূর্বক দক্ষিণে আগাধিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশকে অভিব্যক্তি করিয়াছে বলিলে অত্যাধিক হয় না। ব্রহ্মদেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি ইরাবতী নদীর নিকট কতখানি দৃশ্য, তাহা ঐ নদীর কবে যে কোন

যোগে ভ্রমণ করিলে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। ইরাবতীর উত্তর তীর শোভিত করিয়া যে অগণিত প্যাগোডা নির্মাণের প্রতীকরূপে শাশ্বতগৌরব বৃদ্ধিতে দণ্ডায়মান, উহারাই ব্রহ্মদেশীয় বিভিন্ন সংস্কৃতির অভিনবভূমি বলিলে ভুল হয় না। রেলপথ প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ব্রহ্মের ব্যক্সা-বাগিয়া কিতোরের একমাত্র উপায় ছিল ইরাবতীকে বাহিত নানাজাতীর নৌকা। রেলপথ প্রসারিত হইলেও ইরাবতীর গুরুত্ব হ্রাস হয় নাই। আজিও ইরাবতীই ব্রহ্মের ক্ষেত্রসমূহকে পশ্চিম সম্পর্কে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে এবং উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ প্রকৃতি পণ্য ইহার বন্ধ দিয়াই একস্থান হইতে অন্তস্থানে নীত হইতেছে।

মালিহকা ও নমাই নদীর সঙ্গমস্থলের পর যে প্রদেশ আমরা প্রাপ্ত হই, উহার অধিকাংশই দুর্গম বটে কিন্তু নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই সকল স্থান সভ্যভ্রমণের অজ্ঞাত ছিল বলা চলে। কেবল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উড্‌ওয়ার্প এবং মেজর ম্যাক-এগার কর্তৃক এক প্রকার অভিযান এই প্রদেশেও রহস্ত জানিবার কণ্ঠ অন্বেষিত হইয়াছিল। উহারাই আসাম-নীমান্তের সাক্ষিরা নামক স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের বন্ধ দিয়া কাম্পতিশান উপত্যকার আগমন করিয়াছিলেন। এই উপত্যকাটি মালিহকা হইতে ২ শত মাইল দূরে বিস্তারিত। এইস্থানে বলিলে অশ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কাচিনদের দেশে হকা বলিলে নদী, জুপ বলিলে সঙ্গমস্থল এবং বুস বলিলে পাহাড় বুঝায়।



শিতপুর্বে কাচিন-ভ্রমণ

আজকাল মিরিংকিরা হইতে ৫৭ মাইল দূরবর্তী তিরাংহকা পর্যন্ত মোটরযোগে যাতায়াত চলে। দু'ঘণ্টা মাইল। আমরা যখন গিয়াছিলো তখন মোটর সার্ভিস প্রবর্তিত হইয়াছে মাত্র। আমরা সেই স্থানটিকে তিরাংহকা বলিতেছি—মালিহকার সহিত যেখানে তিরাংহকা বা তিরাং নদী মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতেও এমন একটি পথ আছে যাহার উপর দিয়া আরও কিছুদূর পর্যন্ত মোটর চালান চলিতে পারে। সাধারণতঃ সুপ্রাচীন নামক স্থানটি পর্যন্ত এই জাতীয় বান বাইরা থাকে। সুপ্রাচীন একটা বুস বা পাহাড়ের নাম। সেই পাহাড়ের উপর সুপ্রাচীন নামক লোকালয়। ইহাকে নাগরিক এবং সামরিক উভয় প্রকার বলিত বলা চলে। উক্ত ৫৭ মাইল মোটরে ভ্রমণ করিবার সময় পার্শ্বভাষ্য প্রকৃতির যে অপকল্প রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল তাহাকে শান্ত-লক্ষ্য না বলিয়া ভীমকান্ত বলিলেই বোধ হয় ভাল হয়। সমগ্র পথটিই নিবিড় বনানীর বন্ধে বিসর্পিত বলিয়া যাপনসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে কিন্তু বাঁহারা মোটরযানে বান, তাঁহাদের সেরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। বেশবতী পার্শ্বভাষ্য শ্রান্তবতীর সহিত সঙ্গত প্রায়ই হইয়া থাকে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়—যে গহনাবৃত গিরিরূপের মহাসম্মেলন অন্বেষিত হইতেছে। একদিকে মালিহকা, অন্যদিকে নমাই নদী, মধ্যে মালকাচিনদের দেশ। ত্রিকোণাকৃতি বলিয়া মালকাচিনদের বাসভূমি এই অঞ্চলটিকে 'ট্রি মাহল' বা ত্রিকোণাকার ক্ষেত্র আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মালিহকার সহিত তিরাংহকার সঙ্গমস্থলকে তিরাংজুপ বলা হয়। আমরা তিরাংজুপ নামক স্থানটিতে পৌঁছবার পূর্বে নজপজুপ নামক একটি জায়গার কাছে মিনিট হিলাম। এখানে মিলিটারী বা সামরিক পুলিশের একটি থানা আছে এবং ডাকঘরও রহিয়াছে। আমাদের কয়েক মিনিট থাকার উদ্দেশ্য—সেই ডাকঘরে পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। উত্তরই দুর্গমভর প্রদেশে পত্র প্রেরণের সুযোগ আর নাও মিলিতে পারে। নজপজুপ হইতে তিরাংজুপের দূরত্ব ১২ মাইলের বেশী নয়। পূর্বে এই সকল অরণ্যাবৃত ও পর্বতাকর্ষ প্রদেশে আদৌ পথ ছিল না। মাত্রাজ পাণ্ডোনীর নামক সৈন্যসংগ্রহ অস্ত্রপতি দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন নামক সেনাদলের দ্বারা পথ সর্বপ্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। শস্ত্রের সাহায্যে পথ প্রস্তুত না করিয়া নিবিড় বনানীর ভিতর আগাইয়া বাইবার কোন উপায় তাহাদের ছিল না। এই প্রদেশে বৃক্ষ ও ব্রততীর একরূপ প্রাচুর্য্য যে পদে পদে বাধা পাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়াক্ষিত না হইয়াও থাকা যায় না। বিশাল বনস্পতির বন্ধকে অকাণ্ডকার অঙ্গরয়ের দ্বারা জড়াইয়া দিয়াছে বিরাট ব্রততীওলি—একরূপ বৃক্ষ প্রত্যেক পদক্ষেপেই নেত্রপথে পতিত হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সেনাদলকে সেই রজ্জ্বব্রতিত জালের দ্বারা বিচালিত অগণিত লতাকে কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল।

নানীশ্রকার বিরল ও বিচিত্র বৃক্ষলতার বিস্ময়কর বিকাশস্থল বলিয়া বহু উদ্ভিদবৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই দেশে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য আসিয়া থাকেন। পথে এইরূপ একাধিক পণ্ডিতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধান ও অন্বেষণের পর লইয়া এই গহনাবৃত দুর্গম গিরিরাজ্যে অগ্রসর হইবার উপায় নাই বলিয়া এক একজন পণ্ডিতকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাঁহারা শক্ত নহেন, তাহারাজ্য বুদ্ধিতে পারেন এই গিরি ও গহনের দেশে নিঃসর্গের কত ভ্রষ্টেত গভীর রহস্ত লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই রহস্ত ভেদ করিবার জন্য পান্ডিত্য পণ্ডিতবিশ্বকে বেকায় আনাবার প্রয়াস করিতে দেখাযাই, তাহা আমাদের কাছে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে। বাঁহারা বৈজ্ঞানিক নহেন, শুধু কবি বা ভাবুক, তাহাদের বিকটেও কবিতা নাই। বাসস্থল এই দেশ একান্ত চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। মিরিংকিরা হইতে আগাইয়া বাইবার সময় আরণ্য ও পার্শ্বভাষ্য প্রকৃতির অপূর্ণ বৃদ্ধি পর্যন্ত দ্রষ্ট

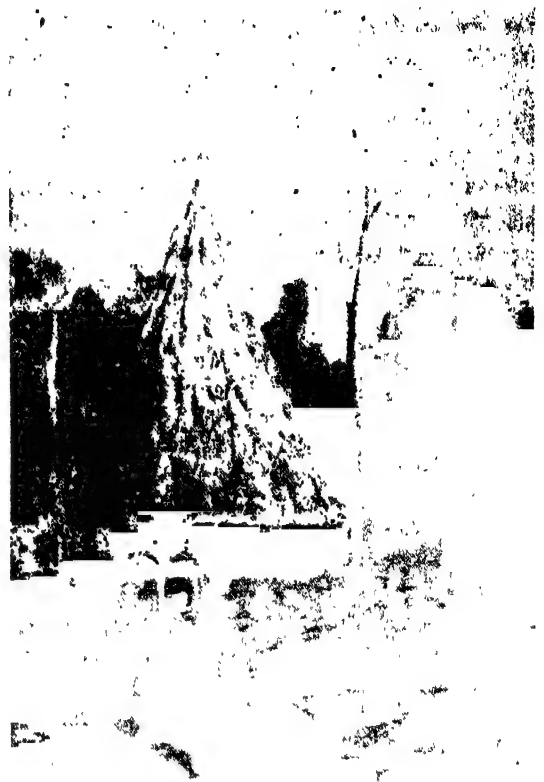
পাশে দেখিতে দেখিতে মনে হইবে, হুন্সর হ্রদ ও পতীর কবিরে পূর্ণ একখানি কমরীর কাণ্ড পড়িতে পড়িতে চলিয়াছি। নানা বর্ণরংগে রঞ্জিত আরণ্য পুষ্পপুঞ্জ এবং অপরূপ রূপাঙ্গর প্রজাপতিগুলি স্বভাবের সবুজ শোভাকে শত গুণ অধিক মনোহারা করিয়া তুলিয়াছে।

পথ কিছুদূর যালি নদীর তীরে তীরে আগাইবার পর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। আমরা তিরাংজুপ নামক স্থানে রাজিবাংসের পর বধন প্রভাতে পুষ্পগন্ধশোভিত শতবিহগকাকলী-মুগ্ধরিত পথে পুনরায় যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল স্থিতি বা সমাধি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পার্বত্য প্রকৃতি পরম পুরুষের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। প্রজাপতিগুলিকেও পুষ্প বলিয়াই মনে হয়। বিহঙ্গম ও পতঙ্গসদৃশের কুলন ও ভ্রমরকে প্রকৃতিদেবীর কঠোরচিত্ত বন্দনা-সম্মতি বলিয়া বোধ হয়। পুষ্পপুঞ্জের হৃদয় হৃদয় ধূপের কাজ করে। অরুণ-কিরণোজ্জ্বল ধরণীকে তখন বন্দনগীতি-মন্ত্রিত মহান মন্দির বলিয়া মনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই প্রভাতের স্মৃতি আমাদের চিত্তপটে চিরদিন অক্ষয় রেখার আঁকা থাকিবে বলিলে একবিন্দুও অতিরঞ্জন হয় না। প্রকৃতির সেই সর্বোচ্চ পরিচরণ মুক্তি থাকে। বর্ণনা সহজ নহে, উহা অমূল্যের সাহায্যে উপলব্ধির উপযোগী।

আমাদের পথটি উত্তরে অগ্রসর হইলেও পার্বত্য উপত্যকাটি পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া অসংখ্য বেগবতী প্রোতবতীকে মালিহকার সহিত সম্মিলনে সহায়তা করিতেছে। এই সকল জলধারার দ্বারা মালিহকা পুষ্টি হইয়াছে, হুতরাং ইহারা ইরাবতীর আগের অস্তম হেতু বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। এই পার্বত্য প্রদেশের সবুজে প্রবাহিত শত শত সলিলধারার সম্মেলনই ব্রহ্মের প্রাণধরুণ ইরাবতী, সে বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। দুইদিকে পাহাড়, মধ্যে উপত্যকা, উপত্যকার কূকে নৃত্য-নিপুণা নটীর স্তায় প্রোতবিনী। স্থানে স্থানে সেতুর সহায়তার প্রোতবিনী পার হইতে হয়। এক এক জায়গায় বেতের সেতু। এই সেতুগুলি পার্বত্য জাতিদের শ্রুত। অবশ্য এই সেতু শুধু মানুষের পদব্রজে পার হইবার জন্য। আমরা সাইমনহকা নামক নদীর উপর যে বেতের বিরচিত সেতুটি দেখিয়া-ছিলাম, উহা আমাদের মনে অতীতের লচমনখোলের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিয়া-ছিল। সেতুটির উপর দিয়া আমরা হাঁটিয়া নদী পার হইয়াছিলাম। সমুখে নিবিড় অরণ্যাদি ভৈরব গাভীয়ে মণ্ডিত হইয়া দগ্ধমান, নিম্নে সাইমনহকা শিখাণ্ডসমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে কল-কল করে, তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে লঘমান লৌহসেতু দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই এখন আর ব্যবহৃত হয় না। পথে প্রত্যেক লম্বা মাইল অন্তর ট্রেকিং বাংলা রহিয়াছে। এই বাংলাগুলি সাধারণতঃ উচ্চস্থানে রচিত রহিয়াছে। যেন দূর হইতে দেখা যায়। বাংলার বারান্দার দাঁড়াইলে পথের পাশে বা পুরোভাগে প্রসারিত পার্বত্য প্রকৃতির কিছুদূর দৃষ্ট হয়। মোটের উপর এই বিশ্রামগৃহগুলির নির্মাণ স্থান নির্বাচনের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কাদরাং ইয়াং নামক স্থানের ট্রেকিং বাংলাটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল।

আমরা বধন ঐ বাংলাতে পৌঁছিয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, সূর্যোদয়ের সমুদ্রের কাননকুন্ডলা শৈলমালার পশ্চাতে অস্তরগরে অস্তরণ করিতেছেন। পূর্বদিকে কয়েকটি শাখাপুত্র বৃক্ষ সমাধিস্থ পশ্যাপ্তর জায় দাঁড়াইয়াছিল। পার্বত্য জাতিরা বাংলার পার্বত্য স্থানগুলির জল কুবির্য করিবার জন্য কাটা কাটা করিয়াছিল। এই সকল পশ্যাপ্তর কুবির্য করিবার পদ্ধতি আদৌ প্রশংসনীয় নহে। এইরূপ অবাধ্য প্রাণীতে নাপা, কুঠী প্রভৃতি আসাদের আদিবাসী জাতিকেও চার-আবাক রুজিতে দেখা যায়। অন্তঃবিহ রক্তমাংসরঞ্জিত রঞ্জিরেখা বাংলার পার্বত্য অঞ্চল হানটির কূক বিকৃত হইয়া উঠকে হুন্সরতর

করিয়া তুলিয়াছে। নিম্নে ছায়াঙ্কর উপত্যকার কূক একপ্রকার বিদ্যবতরা



কানিন সমাধি

পার্শ্বীয় পরিবাণ্ড বলিয়া মনে হয়। যেন কি নিবিড় রক্ত সেখানে লুকাইয়া আছে। সাধ্যসূত্রের রঞ্জি মালিকাচিনকের বাসস্থান টিরাংল নামক ত্রিকোণাকৃতি প্রদেশটির উপর পড়িয়া উহাকে মারাপুরীতে পরিণত করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। বাংলার বারান্দার দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে আমাদের মনে হইয়াছিল—যেন আমরা কোলাহলমুগ্ধরিত কর্মরত হইতে চুরে কোন বস্ত্রের কর্মনার দেখে কোন অপরাধ রহস্যরাজ্যে আসিয়াছি। সভ্যজগতের সহিত যেন আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। পুরোভাগে প্রসারিত ভাঙিত তার আমদিককে যেন অকস্মাৎ জানাইয়া দিল সভ্যজগতের সহিত আমাদের সখ্য এখনও শেষ হয় নাই। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘীর পদক্ষেপে নামিয়া আসিয়া পর্বত, অরণ্য, উপত্যকা সকলকেই নিবিড় তিমির-মবনিকার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যা-দিক, কেবল একটা কাঠ-ঠোকা পার্শ্ব বন্যার কূক-কোটর হইতে কাতর কঠে কান্নার কাহে কি যেন কহিতেছিল। অকস্মাৎ বৃক্ষাশা ভাঙিয়া পড়ার মত একপ্রকার শব্দ সেই তরতাকে পতীরতর করিয়া তুলিল। বাংলার রক্তকটর বিকট হইতে বাহা জানিলাম ভাঙতে বুঝা গেল, শাখাপুত্র বা বানরপুত্র শাখাসূত্রের বন্ধে রাজিবাংসের ব্যবহা করিবার ব্যতীতর সুর সুর শাখার ভাঙিয়া পড়িবার হেতু হইয়া থাকে।

সেই বাংলাতে রাজিবাংসের পর আমরা বধন আসিয়া উঠিয়া পুনরায়

বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছি, তখন চতুর্দিকই পার্শ্বপ্রান্তিক পত্তী কুহেলিকার আবৃত দেখি। নিরন্তর হইলাম। সমুদ্রশিলে বীণাবাদীর মত সেই কুহেলিকার ভিতর বড় বড় বৃক্ষের ও শৈলসমূহের শীর্ষগুলি দেখা যাইতেছে। একপ্রকার কর্কশ কঠোর আমরা স্তনিতে পাইলাম। বাংলা-রক্ষক বলিল, উহা একজাতীয় বানরের চাঁৎকার। নানা প্রকার বানর এই অঞ্চলের অরণ্যে অবস্থান করে। কুহেলিকা কিরূপ পরিমাণে কাটিয়া গেলে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন মাঘমাস। সূর্য্যদেব আকাশের অধিকতর উজ্জ্বল উজ্জ্বল হইলে কুহেলিকা কাটিয়া গিয়া প্রকৃতির স্রীতিকর মুক্তি পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়া তুলিল। নিরন্তরকিরা হইতে এসারিত এই পথের পাশে আমরা যখন ১ শত ১৭ মাইল আসার নিদর্শন দর্শন করিলাম, তখন আমাদের মোটরখানি এই প্রধান পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি পাশাপথে আগাইয়া চলিল। এই পথ ১৭ মাইল দূরবর্তী হুপ্রাবুম পধ্যন্ত গিয়াছে। স্থানটিকে হুপ্রাবুমও বলা হয়। বুম অর্থে পাহাড়— তাহা পূর্ব্বেরি বলা হইয়াছে। পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই স্থানটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমরা এই স্থানে একমাস অবস্থান করিয়া পার্থক্য প্রবেশ পরিদ্রবণ করিয়াছিলাম। আমাদের কতিপয় বন্ধুর আহ্বানে আমরা গিয়াছিলাম। বন্ধুদের অধিকাংশই সার্ভেবিভাগের কর্মচারী। ঐ সময় এই আশা ও পার্শ্বতা প্রদেখে সার্ভে চলিতেছিল। আমাদের দুই একজন বন্ধু মিণিটারী বা সাময়িক কর্মচারী ছিলেন। আমরা হুপ্রাবুম হইতে কোট হার্ডিনামক স্থানে গিয়াছিলাম। ইহাই আমাদের ভ্রমণের সর্বোত্তম সীমা। কয়েক মাইল অন্তর ট্রেজিং বাংলা থাকার জন্য নিরন্তরকিরা হইতে কোট হার্ডিনাম পর্যন্ত পরিদ্রবণ আমাদের পক্ষে সেরূপ অসুবিধাজনক হয় নাই। এই প্রদেখে অবস্থানকালে আমরা এই পথে তিনবার যাত্রায়াত করিয়াছিলাম। মাঘর প্রথমে আসিরা চৈত্রের শেষে আমরা কাচিনদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া সাবিয়া হইরা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম।

সার্ভে বিভাগের বন্ধুদের সহিত ভ্রমণের সময় কতিপয় কাচিন পন্নীতে কাচিন সর্দারবিশেষের গৃহে আমাদেরকে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। এই নিষিদ্ধ বন্যার দেশে প্রায় বারমাসই বর্ষা থাকে বলিয়া আমাদেরকে মধ্যে মধ্যে অসুবিধার পড়িতে হইয়াছে—এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। বন্ধুগণ এবং কাচিন সর্দারগণ আমাদের সুবিধার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টাই করিয়াছেন। এই সত্যও পত্তী কুহেলিকার সহিত আমরা স্বীকার করিতেছি। আমরা মোটরযোগে এই প্রদেখে পৌঁছিবায় পর কাচিন অস্থির ও চৈনিক চালক-চালিত অশ্বতরগণের সহায়তার কাচিনদের দেশের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণের সময় মার ও খাতু উভয় শ্রেণীর কাচিনদের সঙ্গেই বিশিষ্টার হুযোগ আমাদের হইয়াছে। মধ্যে নাং, লিহু ও দাক প্রভৃতি পাণ্ডিত্য সম্পন্নদের বরনারী দেখিবার সুবিধা আমরা পাইয়াছি। স্মিত-মুখ দীর্ঘদেহ নাংগ সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। মস্তকস্থ মূল কেশগুচ্ছ ইহাদের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। লিহুরা শিকারী সম্প্রদায়। ইহার বিবাক্ত ভীয়ে সহ্যভার টাঙ্কিন প্রভৃতি বস্ত্র পশু শিকার করে। লিহুদের বিচিত্র পরিচ্ছদ বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

কোন কাচিনপন্নী ট্রেজিং বাংলা বা বিশ্রামবাসের নিকটে থাকিলে আমরা সন্ধ্যার বা প্রাতে তথায় গমন করিয়া পত্তীবাসীর আচার-ব্যবহার মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিলাম। প্রত্যেক পন্নীতে কয়েকটি করিয়া সার্বজনীন গৃহ নির্মিত রহিয়াছে। স্বয়ং পরিবার এই সকল গৃহে একত্র অবস্থান করে। একটি মৃত প্রস্তুত কক্ষের ভিতর বিরা এই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহের চারিদিকে প্রচুর স্থান আছে। প্রবেশ করিবার কক্ষ, বালকবালা, শূকর ও সোয়গ এই চারিটি বস্ত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই চারিটি জিনিষ পাশাপাশি বিরাচিত রহিয়া এক বিচিত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয় না। বৎসরে বালকবালা খেলা করে,

সেখানে দুই একটি কুকুর থাকিবেই। দেখিলে মনে হয়, বেশ কুকুরগুলি কোনকালেই কামড়ায় না। এই 'চাও' আখ্যায় অভিহিত সারসেমুখগুলি সত্য সত্যই (অত্যন্ত শ্রেণীর সারসেমুখের তুলনায়) শাণ্ড-বৎ। কুকুরগুলি দেখিতে সেরূপ ক্ষমতা না হউক, বল নয়। ভ্রমণের বিষয় কাচিনরা এই পরম বন্ধুগণকে মারিয়া খাইতে কণাখাত্তও কুঠী বোধ করে না। কুকুর ভক্ষণের প্রথা মারকাচিনদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। আমরা তাহাদিগকে এই গৃহিণী প্রথার বিরুদ্ধে বহু কথাই বার বার বলিয়াছিলাম। সর্দারবিশেষকে অসুযোগ করিয়াছিলাম, এই জঘন্য প্রথার বিরোধ সাধনের জন্য প্রবল প্রয়াস করিতে। এই প্রথা এখনও আছে কিনা কে জানে।

কাচিন রমণীরা স্বামী ও পুত্রজ্ঞানের পরিচ্ছদ আপনাই বরণ করে। বীণ ও কাঠের তৈয়ারী আদিব চরকা ও তাঁত আজিও চলিতেছে। বরন ব্যাপার হস্ত ও পদ উভয় অঙ্গের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। মোটর উপর কাচিন নারীদের বহন-নৈপুণ্যের প্রমাণ না করিয়া থাক। যায় না। বরন সম্পর্কীয় সকল ব্যাপার নারীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ইহা চাড়া অত্যন্ত গৃহকর্মও আছে। হস্তরাং কাচিন রমণীর কর্ণকুলতা বা পরিভ্রমণারগতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। জঙ্গল হইতে কাঠ, জলাশয় হইতে জল আনিয়া রন্ধন করা—শিশুকে স্তন্য পান করান প্রভৃতি কার্য ইহাঃ একটির পর একটি এমন ভাবে সাধন করে যে, আমাদেরকে বিস্মিত হইতে হয়। সর্বকিনীট শিশুটিকে স্তন্য দিয়া কোন জোঁট পুত্র বা কস্তার উপঃ তাহাকে দেখিবার ভার স্তন্য করা হয় এবং জননী বরন ব্যাপৃত হন। সকল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু কাজ আর কাজ। এইরূপ কর্মকণ্ডার জীবন ব্যাপন করিতে হয় বলিয়া কাচিন কামিনী আপনাদিগকে ভাগ্যহীনা ভাবেন—এইরূপ ধারণা যেন কেহ না করেন। তাহাদের হাঙ্গামী মুখ আনাইরা যেন—অন্তরে তৃপ্তি বিরাচিত রহিয়াছে। কাচিন কামিনীদের কঠোর কর্মের মধ্যেও হাস্তোচ্ছল মুখ স্রবণ করিলে আমাদের মস্তক আশ্চর্য প্রকাশ অবনত হয়।

প্রত্যেক কাচিন পন্নীতে আমরা একটি করিয়া চীনা দোকান দেখিয়াছি। পত্তীবাসীদের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেক পদার্থই এই দোকানে পাওয়া যায়। শুধু প্রয়োজনীয়ই বা বল কেন, বালকবালিকার খেলিবার জিনিষ এবং বস্ত্রদের মধ্যে বস্ত্রও এই সকল চৈনিক দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে। বীণ, বালকবালিকার ক্রীড়া করিবার হাতখড়ি, কালি, কাগজ, বাতি, টিনে রক্ষিত মংলা, বিস্কুট, লেজেন্ড প্রভৃতি মিষ্ট্রবা, টিনে রক্ষিত কল, তার, পেরেক, চর্চ, ব্যাটারি, কার্পাসপ্রস্তুত বা রেশমী কাপড়, এমন কি হুমবাগী হ্যাট পর্যন্ত এই চীনাখান-পরিচালিত পণ্যশালায় পাওয়া যায়। টিনে রক্ষিত মস্ত, মাংস, কল—এই সব জিনিষ ইউরোপীয় অফিসার বা ভ্রমণকারীদের জন্য সন্দেশ নাই। কচিং কোন পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে হুজুক সৌখীন কাচিন এই সকল জিনিষ কিনে। এই অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়ী চীনরাই। শুধু এই অঞ্চলই বা বল কেন, আমরা ব্রহ্মার সর্বত্রই এবং মালয়েও চীনা দোকানদার-বিশেষকে সর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইতে দেখিয়াছি। যেমন আমাদের দেশে মার্কোমারী, তেমনই ব্রহ্ম ও মালয়ে চীনা দোকানী। বর্তমান বুদ্ধ পরিবর্তন আনিয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা যে সকল পণ্যের নাম উল্লেখ করিলাম, চীনা ব্যবসায়ী তাহাদিগকে অশ্বতরপুত্র চাপাইরা নিরন্তরকিরা হইতে আনিয়াছে।

আমাদের সঙ্গে কয়েকজন কাচিন অস্থির ছিল। ইহাদিগের কাণ্ডাবাদী দেখিবারও আমরা কাচিনদের মধ্যে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। বাঁপের পায়ে রন্ধন—বাঁপের পায়ে চরের জন্য গরম করা প্রভৃতি স্তনিলে অনেক বিস্মিত হইতে পারেন কিন্তু কাচিনরা নিতাই বাঁপের তৈজসপত্র পান-ভোজন সম্পর্কীয় সকল কার্য সম্পন্ন করে। বাঁপের চোলের ভিতর জল ভরিয়া সেই জল ঐ পাত্রেরি ফুটাইয়া লওয়া—বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। চোড়াটির দুইটি ভাগ থাকে। লম্বা অংশটি ল

দুটাইবার কাজে ব্যস্ত হই এবং ষাটো অংশট পানপানের কাজ করে। এই বাঁশের কেঁটালির কোন অংশই আগুনে পুড়িয়া যায় না। অবশ্য এই প্রদেশের বাঁশগুলি খুবই শক্ত এবং অগ্নিতে স্থাপনের প্রাণীটির ভিতরেও কৌশল আছে। আমরা সিকিমের লেপকবাড়ের মধ্যেও কখনো নির্মিত পাণ্ডে রত্নানি করার প্রথা প্রচলিত দেখিয়াছি। লেপকবাড়ের ভিতর বাঁশের বাগপক্কর ব্যবহার আমরা দেখিয়াছি। কাচিমের জীবনেও বাঁশের স্থান

অনেকটা ঐরূপই। ভারতের পূর্বোক্তর প্রান্তের প্রত্যেক পার্শ্ববর্তী জাতিদের ভিতরেই আমরা নান্য প্রকার কার্যে বাঁশ ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। বাঁশের গৃহে বাস, বাঁশের পাত্রে রন্ধন—বাঁশের শস্যের শরন, বাঁশের ট্রাকে রন্ধন, বাঁশের বাঁয়ে সকল বস্তু সংরক্ষণ—বাঁশের সাহায্যে ব্যক্তিরকে কাচিমের জীবনের পথে এক পাও চলিতে পারে না বলিলে অত্যাধিক হয় না।

[ব্রহ্মণ:

তোমারই (উপভাস)

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

সতী কাঁদল না কিন্তু হুলেখার কথার প্রতিধ্বনি ওর মনকে টুকরো টুকরো করে দিল। বার বার ওর মনের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করল হুলেখার শেষ কথাটি “আজ আমার বিবাহবাড়িকো নয়, বিবাহের প্রথম নতুন বাড়িকো।”

ভাগ্যের এইটাই সব চেয়ে বড় কথাখাত। এ রকম যে একটা কিছু হবে—সতী জানত। প্রথম থেকেই। প্রথম যেদিন হাঁসপাতাল থেকে ফিরে কথাটা সতী শুনল, সেদিনই ওর মন অশুভ ছায়ার কাল হ'য়ে উঠল, ভাল লাগল না হুলেখার জীবন নিয়ে এ অভিনব কৌতুক। আশঙ্কায় আশঙ্কায় ওর মন ঝাঁক খেল। অশুভের দরজার দরজার মনের ভয়ের ভাগটা প্রবল হ'য়ে কেবল শব্দে শব্দে ওকে ভয় দেখাতে লাগল, বলতে থাকল, এ আর না—হয় না, হয় না। হুলেখা ওর সব চাইতে আপন, ওর ব্যাখ্যাটাই তাই সব চেয়ে মনে লাগে; নিজের হারিয়ে যাওয়া দিনের স্বপ্ন ছিল হুলেখার নতুন জীবনের নতুন বাঁধার ভায়ে ভায়ে। সতী ভেবেছিল সেই স্বপ্নের রেশ টেনে নিজের জীবনের ভালো ভবিষ্যতটাকে সেনে নেবে। আজ সেই স্বপ্ন পেল ছিঁড়ে।

হুলেখা নিশ্চল পাথরের মতন; মাঝে মাঝে নিখাসের ক্ষীণ শব্দ। সতী মাথার পাশটিতে বলে আছে। ওর ভাবনার সীমা নেই।

নিজের বেদনার দিদি কেঁদেছিল, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছুই, তাই আজকের দিনে হুলেখার এক বড় আঘাতও ও কাঁদল না। কেঁদে মনকে হালকা করার মধ্যে হুলেখা সুখী আছে। হাসতে হাসতে তাকে বরণ করার মাঝে আছে আলা। আজ তাই কান্নার চেয়ে বেশী কিছু চাই, বড় কিছু চাই, শক্ত কিছু চাই। নীরবে সহ্য করার মধ্যে আছে সেই শক্তি।

দিদি আর তাই কাঁদবে না।

বাইরের পৃথিবী তেমনি নিরুপ, তেমনি শুষ্ক...হুলেখার এই অভিলাষের মাঝে সতীর জীবনের আর একটি বড় গেরিয়ে গেল। বর্ষার বরিষণ শেষ হল।

নিজের ভাগ্যের বিড়ম্বনার আর সে কাঁদবে না।

ভারপর আরও বছর কেটে গেছে।

হুলেখার প্রথম বিবাহবাড়িকার কথাগুলো জীবনের ওপর একটা আলার জাল বিছিয়েছে। সেদিনের রাতের নীরবতার প্রতিবিম্ব পড়েছে দিদির জীবনে।

সতীর আজকের জীবনে তাই শীতের ঘন ক্রাস। বাইরেও কঠিন আবহাওয়া, বা দেখা যায়, ভেদ করা যায় না, ভেতরে ওর অন্তর নৃত্য, বা দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

কিন্তু তবু ওর আশা আছে। আজকের জীবনটা ওর সত্যি বিচিত্র। শোকের আঘাতে শরীর ভেঙেছে, মন শক্তি হারিয়েছে, কিন্তু আশাপথ হারাননি। একদিন কিছু ঘটবে, হ্রাসের আবরণ ছাঁবে, এই পরিহাসের মধ্যে আছে নতুন আশার আলো—এই রকম তার মনের গোপন কথা।

জীবনটা বার বার শক্ত আঘাত হেনেছে, মন বার বার তাকে সেনে নিয়েছে, আজ মূল্যবোধ চোখ বহর জীবনের কাছে সতী শত শত আঘাত পেয়েছে, মন তাই ওর রূপ বদলেছে। জীবনটা শক্ত, কঠিন, কিন্তু তাকে সমানে সমানে বরণ করে নেবার শক্তিও বিন্দু বিন্দু করে জমা হয়েছে সতীর মনে। জীবনটাকে ও জীবন দিয়ে চিনেছে, প্রাণ দিয়ে জেনেছে, মন দিয়ে সেনেছে। আজ জীবনটা ওর কাছে ঠিক রহত নয়, পরিচিত পরম পুঙ্খ।

ও জানে, তার কঠিন আভরণের নীচে আছে নরম প্রাণ, তার আঘাতের মধ্যে আছে প্রতিঘাতের শক্তির আচুর্ধ্য। তার নিতম্বতার মধ্যে আছে সহ্য করার ক্ষমতা।

সতীর দৃষ্টিভঙ্গি তাই নিজের কাছে যেমন সহজ, অন্য সকলের কাছে তেমনি বিচিত্র।

ও হল বাতবের আকারে বহুদূরার সর্বসহ্য রূপ।

অচল অটল মহান।

এতদিন ও ছিল স্থির আসে দেবতার মতন একলা, আজ হুলেখার ভাঙা জীবনে সতী নেমে এসে সেজু হ'য়ে। নিরন্তর আশীর্বাদ মাথার নিয়ে ওদের দু'জনের শুভ দৃষ্টির মাঝখানে ও হল দেবতার শুভদৃষ্টি।

বিকলটা আজ বিবাদের রান ছায়ার অন্ধকার। তিনতলার দক্ষিণ চাওয়া ঘরের বায়নার ঝাড়িয়ে জ্যোতি লাগ আকাশের দিকে তাকিয়ে তাই অনুভব করছে। মনে ওর গভীর বেদনার একটা প্রলেপ, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সমানভাবে কাঁদছে।

রাত্তার লোক চলাচলের একটা গোলমাল আছে, কিরণজালার চিংকার আছে, আরও পাঁচ রকম শব্দের প্রতিধ্বনি আছে, সব মিলিয়ে একটা প্রচুর আর্দ্রনাথ। সবাই মিলে বিদ্রোহ করে আজ জ্যোতির ভগ্ন মনে ছেঁদা করবে। ঘরার আজ কেন এমন বিবাদের ছায়া? জ্যোতি তাই ভাবছে।

তার মা অস্থির, অর্ধনিবৃত্তি চোখ দু'টি অশ্রু কাকে যেন খুঁজছে—যে নেই, কি যেন চাইছে—যা পাচ্ছে না। আর কম, ভাতারের হল সবল করার ওপর দিয়েছে, মনটা সেই অশ্রুপাতে ছুঁকল।

“তার মূলের চেহারা তোল খেয়েছে মর্দভদ্র কোন বেদনার। উদ্ভাপের চাইতে অশ্রুতাপের প্রভাব বেশী, রোগের ব্যর্থতার চাইতে মনের বেদনার আঘাতের চিক্ণ স্পষ্ট।” মা ত' মা নয়—বেদনার সৃষ্টিকর্তা ছায়া।

“জ্যোতি”...অশ্রুট ডাক।

জ্যোতির তরঙ্গ দুটে পেল, দুটে এল' ঘরে। কি মা? বলে বল পড়ল মাথার ঠিক পাশটিতে। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, কট হচ্ছে? উত্তর না দিয়ে মা বললেন, কি ভাবছিল? বাইরে বুঝি অন্ধকার নাথাকে, ঘরের বাতি জ্বলো না কেন?

জ্যোতি বলতে পারল না যে মনটা তার ঠিক এই কারণে বেহুয়া। বাইরের পৃথিবীর বুকে নেবে আসা রান ছায়া দেখতে দেখতে ঠিক এই কথাই সে ভাবছিল।

জালিয়ে দেবো আলো।

“না থাক,” আপন মনেই না বলে চলেন, এইটাই ত’ হল পুরুষামুহুরে মেয়েদের কাজ। বাইরের ভিত্তি আলোকে পুরুষ বখল কড়া নাড়ে, মেয়েরা তখন প্রদীপ জ্বলোনাথ বাজিরে তাকে ঘরে তুলবে। ঘরের প্রদীপ জ্বলবে বোঁ, বাইরের অন্ধকার সরাবে পুরুষ, এই ভাবে চলবে পৃথিবী, তাছাড়া সবই ব্যতিক্রম। আনিয়ে আলব আলো।

থাক না না আজ, শরীরটা ভোমার ভাল নেই।—জ্যোতি জোর করেই শুয়ে রাখতে চায় মাকে। সংসারের অকল্যাণ হ’বে বলে টলতে টলতে উঠে ঠাড়ালেন। সক্তি নেই, তবু সক্তি আছে, ক্ষমতা নেই, তবু দায়িত্বের কোথা আনও মাথা থেকে নামলো না।

ঘরের আলো জ্বল’না, দেবতার চরণতলে প্রদীপ জ্বল’।

ক্ষণে মনে কেঁপে কেঁপে শুভা প্রদীপলিখা মার মনের কোণে কোণে ছুঁয়ের লিখা জালিয়ে তোলে। প্রদীপের ভিত্তি লিখার আছে অন্তিমত সূর্যের শেষ রশ্মিটা ছড়ানো। আলোক নয়, অলক। নারীর সঙ্গরণ দৃষ্টি।

মার মন উতলা। মনের কানায় কানায় পুঞ্জীভূত বেদনার গুরু গম্বীর নিদাশ। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে মনের বন্ধ ছুরার খুলবেই, তুলবেন না কোন কথা। তুলবেন কেমন করে? সেই বোল বড় বরষ থেকে আজও পঞ্চাঙ্গ ছেলের এতোকটা কথা তার নিজের মনের প্রতিধ্বনি, প্রত্যেকটি মুহূর্ত নিজের হাতে গড়া, তার এতোক দিনটির ইতিহাস মার নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত।

এই ত সেদিনের কথা, পূর্ণিমার পূর্ণ বিকাশ হল রাত্রির শেষ প্রহরে। তারের আলো জ্বলার কোরে ছেলে এলো খুলেন চোড়ে, লীলা কিশোরের

চকল হাসিটা নিজের চোঁটের কোঁচন নিয়ে। সেদিন ছিল যুবক-ভিখি। মেয়ে বলে থাকত ‘রাবী’ কি পুনিমা, ছেলে বলে নাম রাখত জ্যোতি। সে যে ঘরেরও জ্যোতি, বাইরেরও জ্যোতি।

জ্যোতি আল’ ভাঙনের লীলা-খেলা আর আল’ সঙ্কর সীমা। ও বেন বস্তার প্রবল স্রোতে ভেসে আসা আশীর্বাদী মূল। তারপরে মার জীবনে কত বড় এল’, শ্রোত বয়ে গেল, কিন্তু জ্যোতির এতোকটা মুহূর্তের মধ্যে মা সব সরে গেলেন।

জ্যোতি বড় হল। প্রথম ফুলে বাবার দিন কি বটা, পাগলীর জটা ছাড়া দোহেতও অত গোলমাল নেই। দিনে দিনে জ্যোতি বড় হল, জ্যোতির প্রহর শুনে শুনে মার সময় কাটল। ফুল থেকে হাই ফুলে, সেখান থেকে কলেজে, কলেজ থেকে বিয়ে।

বিয়ে...জ্যোতির বিয়ে, ভাবতেও মার হাসি পায়। এইটুকু জ্যোতি তার আবার বিয়ে। এই ভাবনার ফুটি পূর্ণচ্ছেদ পড়ত ‘তাহলে সেই পূর্ণচ্ছেদের বেদনার মধ্যে যে তীব্রতা থাকত তাও হরত’ সহ করা সহজ হত।

কে ভানত’ এই ঘিরের মধ্যেই আছে মার মনের সব চাইতে বড় আঘাত, সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

মা আধোছায়া অন্ধকারে জ্যোতির হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে, জানলার পানে চেয়ে থাকেন, মনে মনে জাঁকতে থাকেন ঘিরের রাত্রের দিনটিকে, নতুন করে— শুধু সেই দিনটিকে। তারপরের দিনগুলো ফুলে গেলেই ভালো হয়, তাই অকারণে বার বার সব চেয়ে আগে মনে পড়ে যায়। সে দিনগুলো সব চেয়ে বেদনাময়, তাই সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে।

[ক্রমশঃ]

শ্রিত্তান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিস

পরমাণুর ভাঙ্গনের কাহিনী অতি বিচিত্র। প্রধানতঃ এই কাহিনী অকলঙ্কসেই গন্ত অর্জনশীল পদার্থ-বিজ্ঞান অতিক্রান্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তর এই উভয়ের সাধনাই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। এদিকে পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ ক’রে ভেতরকার খুঁচিমাটি ব্যাপারগুলির রহস্য উন্মোচনে আশ্রয় চেষ্টা, তদ্বিধে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকে ভিত্তি ক’রে দেশ, কাল এবং সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ নির্ণয়ে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। উভয় প্রচেষ্টাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে আমরা শুধু ক্ষুদ্রের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা সম্পর্কেই আভাসদানে অগ্রসর হয়েছি।

পরমাণু ক্ষুদ্র হলেও সসীম পার্শ্বঃ সূত্রাৎ ওর বিভাজ্যতা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। আমরা ভাবতে পারি যে, কোন পরমাণুই বস্তুতঃ নিরন্তর নয়, পরন্তু এমন সকল সুক্ষ্মতর কণাখারা গঠিত যারা পরমাণুয়ের মতই স্বতন্ত্র কারবারী, যারা পরমাণুয়ের মধ্যে কিছু না কিছু দূরত্বের ব্যবধান বলার রেখে স্বাধীনভাবে কিংবা পরমাণুয়ের আকর্ষণের অধীন হয়ে যোয়া বেয়া বা ছুটোছুটি করে এবং কলে হরত কেউ কেউ কখনো কখনো পরমাণুর পৃষ্ঠতল ক’রে আপনা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে, বার বার আমরা এখনো ভাবতে পারি। আমরা ই সকল পুঁদে কণার সামান্যতা সন্দেহও আমরা দাঁড়া পক্ষপাতি করতে পারি। হরত পরমাণুর ভেতর শুধা বিচিত্র সাজে সেজে

সাজেছে এবং ওদের সংখ্যা ও সাজ পরমাণু ভেদে একটু একটু ক’রে কলে যাচ্ছে। কিংবা হয় ত এই ক্রম পরিবর্তন এমনভাবে সংঘটিত হচ্ছে যে, তার ক্ষেত্রে—একটা নির্দিষ্টসংখ্যক পরমাণুর ব্যবধান পেরিয়ে যাবার পর—আবার পুরানো সাজের ঘটাই পুনঃ পুনঃ কিরে আসছে, এবং কলে যে সকল নতুন নতুন পরমাণু গড়ে উঠছে, তাদের বর্ধ হবহ এক না হলেও আপেক্ষিক পরমাণুরই অনুরূপ।

এ সকলই আশ্চর্য মাত্র। কিন্তু এইরূপ কল্পনাই বিশেষ সম্বন্ধ লাভ করলো ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ বিভিন্ন পরমাণুর বর্ধ সঙ্কে তার প্রত্যাবর্তী নিয়ম (Periodic Law) প্রণয়ন করলেন। কথাটা এইঃ আমরা বর্তমানে ৯২ রকমের মূল পার্শ্বের, সূত্রাৎ ৯২ রকমের ৯২টি পরমাণুর খবর জানি। এর মধ্যে সব চেয়ে হালকা হলো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং সব চেয়ে ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণু। এখন এই সকল পার্শ্বকে, ওদের পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে, পর পর সাজিয়ে লিখলে এবং ১, ২, ৩ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যাধার পর পর চিহ্নিত করলে নিম্নোক্ত টেবলটা পাওয়া যায়ঃ

১। হাইড্রোজেন (১)

২। হিলিয়াম (২)

৩। লিথিয়াম (৩)

৪। বেরিলিয়াম (৪)

৫। বোরন (৫)

৬। কার্বন (৬)

৭। নাইট্রোজেন (৭)

৮। অক্সিজেন (৮)

১। স্লোনিম (১০)	
১০। নিরম (২০)	১৩। পঙ্ক (০২)
১১। সোডিয়ম (২০)	১৭। স্লোনিম (০৫)
১২। ম্যাপেনসিয়ম (২০)	১৮। ক্যালিয়াম (০০)
১৩। এলুমিনিয়াম (২৭)	১৯। পোটাসিয়াম (০১)
১৪। লিথিয়াম (৭৮)	২০। ক্যালিয়াম (০০)
১৫। ক্যালিয়াম (০১)	২১। স্লোনিম (০৫)

এখানে পরমাণুর টেবলের মাত্র ২১টি মূল পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে। ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি এখানে বিশেষ অর্থপূর্ণ। ওদের বলা যায় পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number)। ব্রাউন্টের অন্তর্গত ১, ৪, ৭ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি বিভিন্ন পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Atomic weight) নির্দেশ করেছে। হাইড্রোজেন-পরমাণুই সবচেয়ে হালকা, হুতরাং ওর গুরুত্বকে ১ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। টেবল থেকে দেখা যায় যে, হিলিয়ম-পরমাণুর গুরুত্ব, ওর ৪ গুণ, লিথিয়াম-পরমাণুর ৭ গুণ, এইরূপ। প্রত্যেক পরমাণুর গুরুত্বকে আমরা এখানে পূর্ণসংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করেছি, কিন্তু স্থল পরিমাপে ওদের অনেকের বেলাতেই কিছু না কিছু ভ্রান্ত্যংশের অস্তিত্ব ধরা পড়ে; তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা ঐ সকল ভ্রান্ত্যংশ অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারি।

রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ৩, ১১, ১৯ এই সংখ্যাগুলি পদার্থগুলির (অর্থাৎ লিথিয়াম, সোডিয়াম ও পোটাসিয়ামের) ধর্মের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। আবার ৪, ১২, ২০ সংখ্যাগুলি পদার্থগুলির (বেরিলিয়াম, ম্যাপেনসিয়াম ও ক্যালিয়ামের) ধর্মের মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্তমান। ৫, ১৩ ও ২১ নম্বর-সংখ্যেও ঐ কথা। মোটের ওপর সাতটা করে পরমাণুর ব্যবধান পেরিয়ে গেলে কির কির প্রায় একই প্রকৃতির ও একই ধর্মবিশিষ্ট পরমাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই নিয়মকেই আমরা প্রত্যাবর্তী নিয়ম বলেছি। নিয়মটা অল্প আগাগোড়া—টেবলের এ প্রান্ত হ'তে ও প্রান্ত পদার্থ সমভাবে প্রযোজ্য নয়, তবু একটা ঘোঁটামুটি নিয়ম বটে। হুতরাং ব্যাপারটাকে আকর্ষণ বল উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই নিয়ম ইঙ্গিতে এই কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, কোন পদার্থের পরমাণুই একেবারে নিরৈক নয়, পরন্তু পরমাণুর ভেতর গঠন-বৈচিত্র্য রয়েছে; মনে হয়, যেন পরমাণু মাত্রই একই জাতীয় কতকগুলি স্থল স্থল কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং ঐ সকল কণার সংখ্যা ও বিভাজন এক এক পরমাণুর পক্ষে এক এক রকমের হলেও, কোন একটা পরমাণু থেকে সাতটা পরমাণুর ব্যবধান পেরিয়ে গেলে আবার আগেকার বিভাজনেই পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এর বহু পূর্বে (১৮১৫ খৃঃ) প্রাইট এই মত প্রচার করেছিলেন যে, সকল পরমাণুই মূল উপাদান হাইড্রোজেন পরমাণু। এরূপ অনুমানের পক্ষে কারণ ঘটছিল এই যে, তখনকার দিনে পরমাণুদের ওজন সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে নির্ণীত হ'তে পারেনি, ফলে প্রায় সকল পরমাণুর ওজনই—হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের মাপকাঠিতে—এক একটা পূর্ণসংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট হতো। এর থেকে এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে, হাইড্রোজেন-পরমাণুই গোটা কতক করে হল বিধবার ফলে অজ্ঞাত পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে, যথা—১৪টা হাইড্রোজেন পরমাণু জোট পাকিয়ে গড়ে তুলেছে নাইট্রোজেন-পরমাণুকে, ১৩টা গড়েছে অক্সিজেন পরমাণুকে, এইরূপ। পূর্ণোক্ত টেবল থেকে এইরূপই প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু স্থল পরিমাপের ফলে যখন বহু পরমাণুর গুরুত্ব ভ্রান্ত্যংশের অস্তিত্ব ধরা পড়লো তখন প্রাইটের মত টিক্কা না। তবু এই মত থেকে এইরূপ একটা সম্ভাব্য সূত্রিত হলো যে, যদি একই প্রকারের কতকগুলো কতকগুলো কণা নিয়ে বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি হ'লে থাকে, তবে ঐ সকল কণা হাইড্রোজেন-পরমাণু থেকে সৃষ্টতর।

মোটের ওপর, সেকেন্ডের নিয়মের মত, প্রাইটের মতও পরমাণুর বিভাজ্যতার এবং ভেঙেবার গঠন-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দান করেছিল।

এই ইঙ্গিত আরো স্পষ্টরূপে পাওয়া গেল আলোকরশ্মির বর্ণরঞ্জ এবং বর্ণালীর বৈচিত্র্য থেকে। বর্ণরঞ্জের বর্ণনা এইরূপ। সূর্যের যেত্রাংশ যখন একটা ছাড়ের কলম বা অন্য কোন বিকোণ কাচ তেজ করে বেরিয়ে আসে তখন ওর ভেতর নানারঙের রশ্মি দেখতে পাওয়া যায়। এই রশ্মিগুলিকে সাধা সেরালের ওপর ফেললে রশ্মিগুলি মত একটা রঙিন চিত্র ছুটে ওঠে, যার রঙগুলি পরস্পরের গা বে'বারে'ব করে অবস্থান করে। এই চিত্র-পটকে বলা যায় বর্ণরঞ্জ (Spectrum)। এই রঙিন চিত্রের এক প্রান্তে থাকে লাল এবং অপর প্রান্তে থাকে ভারলেট রঙ। উভয়ের মধ্যে থাকে হলধে, সবুজ, নীল ক্রমে মানা রঙের মাজের ঘটা। বর্ণরঞ্জের ব্যাখ্যা দান করেন সর্বপ্রথমে নিউটন। এর মূল কথা এই যে, ঐ রঙিন রশ্মিগুলি সকলেই সূর্যের সাধা আলোতে বিভাজন ছিল। বস্তুতঃ সাধা আলো একটা মূল রঙ, নয়—কোন রঙই নয় পরন্তু ঐ সকল লাল, নীল রশ্মিগুলি পরস্পর মিলে মিশে সাধা আলোর সৃষ্টি করেছে। সূর্য্য রশ্মি যখন সূর্যের ভেতর কিবা হাওয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় তখন সকল রঙের সকল রশ্মি একই বেগে (সেকেন্ডে এক লক্ষ হিরিশী হাজার মাইল বেগে) ছুটে থাকে। তখন আলোটা থাকে সাধা। কাচের কলমে ঢুকতেই ওদের বেগের মাত্রা প্রত্যেকের পক্ষেই একটু করে আলাদা হয়ে যায়। ফলে রশ্মিগুলি বিভিন্ন দিকে চলতে শুরু করে ও স্বা'টার শলার মত ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারকে বলা যায় আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)। কলম থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে আবার ঐ ব্যাপার ঘটে, এইরূপে বর্ণরঞ্জের উৎপত্তি হয়।

প্রায় হতে পারে, সূর্য্যরশ্মির বদলে যদি চাঁদের আলো, নক্ষত্রবিশেষের আলো অথবা এই পৃথিবীরই বিভিন্ন উজ্জ্বল পদার্থের আলো কাচের কলমের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে সবার বর্ণরঞ্জেই কি একই রঙের মাজ দেখতে পাওয়া যাবে? এর উত্তর—না। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বর্ণরঞ্জের রঙের বৈচিত্র্য নির্ভর করে, যে উজ্জ্বল পদার্থের আলো বিশ্লেষণ করা যায় তার প্রকৃতি বা ধর্মের ওপর। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম থেকে আরম্ভ করে পূর্ণোক্ত টেবলের প্রত্যেক মূল পদার্থকে জলন্ত অবস্থার এনে কাচের কলমের সাহায্যে ওর রশ্মিগুলির বিশ্লেষণ ঘটালে পাওয়া যায় এবং ফলে যে সকল বর্ণরঞ্জের উৎপত্তি হয়, দুইদিকের সাহায্যে ওদের পৃথকপৃথকরূপে পরীক্ষা করতে পারা যায়। এর জন্য কাচের কলম ও দুইদিকের সমন্বয়ে যে যন্ত্র নির্মিত হয়, তাকে বলা যায় বর্ণবীক্ষণ-যন্ত্র (Spectroscope)। বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন যে, বিভিন্ন পদার্থের বর্ণরঞ্জের চেহারা বিভিন্ন প্রকারের। মানুষের আঙ্গুলের ছাপ প্রত্যেকের পক্ষে আলাদা রকমের, তাই ছাপগুলির চেহারা দেখে আমরা মানুষ চিনতে পারি। সেইরূপ বর্ণরঞ্জের চেহারা দেখে বৈজ্ঞানিকগণ অনায়াসে বলে দিতে পারেন যে, যে উজ্জ্বল পদার্থের রশ্মিগুলি থেকে ঐ বর্ণরঞ্জের উৎপত্তি তা' মূল পদার্থ না বৌগিক পদার্থ এবং বৌগিক পদার্থ হ'লে কি উপাদানে গঠিত। এইরূপে সূর্য্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের মূল উপাদানগুলি জানতে পারা গেছে এবং দেখা গেছে যে, যে সকল পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন নক্ষত্রগণ রচিত হয়েছে তা'র অধিকাংশই পৃথিবীতে বিভাজন।

অল্প গ্যাসের বর্ণরঞ্জে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এই যে, ওদের রঙিন রেখাগুলি সৌরবর্ণরঞ্জের রঙগুলির মত প্যাম্পের গা বে'বারে'ব করে অবস্থান করে না, পরন্তু জানালার পরস্পরের মত ওদের পরস্পরের মধ্যে অল্পবিস্তর দূরত্বের ব্যবধান বর্তমান। এক্ষেত্রে এই সকল বর্ণবর্ণরঞ্জকে বর্ণরঞ্জ না ব'লে বর্ণালী (Line Spectrum) বলা হয়। সাধারণতঃ

বর্ণালীর ভেতর বহু সংখক উচ্চল রেখা দেখা যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওদের বিভিন্ন স্রোত বাপড়াদি গোছের। বস্তুতঃ জানাশার পর পর শিকড়গুলির মত এই সকল রেখা সমভাবে বিস্তৃত নয়, পরস্পর কোন স্থানে অত্যন্ত ঘন সরিকট আবার কোন স্থানে অত্যন্ত কীক্ কীক্। অল্পমাত্র সোভিয়ৎ বাস্পের বর্ণালীতে শুধু একটিনাত্র (বা পাশাপাশি অবস্থিত) দুইটি মাত্র হলুৎ রেখা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য গ্যাসের বর্ণালীতে বহু রেখা বিস্তারিত।

এর থেকে বোঝা যায়, এক এক রকমের পরমাণু এক এক শ্রেণীর রশ্মি বিকিরণ করে। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ হচ্ছে রশ্মিগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের বিভিন্ন রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র বাই কল্পক রশ্মিগুলির উৎপত্তি স্থল যে পরমাণু এবং পরমাণুর প্রকৃতি ভেদে যে, এক এক শ্রেণীর রশ্মি উৎপন্ন হয় এইটাই হলো

বড় কথা। এর সঙ্গে এই ইজিতও পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক পরমাণুরই এক একটা বিশিষ্ট গঠন রয়েছে এবং এই গঠন প্রণালীর ওপরেই নির্ভর রশ্মি-গুলির বর্ণ বৈচিত্র্য নির্ভর করে। মোটের ওপর, বর্ণ বিকিরণ জ্ঞাপারও এই মতই সমর্থন করে যে, পরমাণু বিভাজ্য এবং তার ভূত ভূত অংশগুলি বিনা সালে সম্মিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে নানা কারণে মিশ্র হতে পারে। আরো বুঝতে পারা যায় যে, পরমাণুর ভেতরকার সাজসজ্জা এবং অন্যান্য অজানা ব্যাপারগুলির সঙ্গে ওর থেকে নির্গত বর্ণালীর সাজের ঘটার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য হলো এই সকল রেখা-বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেক পরমাণুর ভেতরকার খবর জানতে পারা যায় কি? এই ধাঁড়ালো বৈজ্ঞানিকের বিচার বুদ্ধির সামনে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পদার্থের অনুসন্ধান পথ নির্ণয়োদ্দেশ্যে একটা মন্তব্যও এম।

[ক্রমশঃ]

মা (পর)

ঐচ্ছবি দেবী

গোষ্ঠাগ্রি। নিবাসী শ্রমজীবী হারাণের জীবন নিত্যন্ত দারিদ্র্যে ঢাকা। চুক্তিকে, ম্যালেরিয়ায় যুড়িয়া এসে ধীরে ধীরে শ্রাস ক'রে নিচ্ছে তার সমস্ত আশ-সম্বন্ধকে।

কাঁধাতুড়ি দিয়ে হারাণ কি ক'রে এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণ পাবে ও আহাৰ্য্যের যোগাড় করবে তার বাস্তবিক ও অসম্ভাবিক নানা চিন্তার জাল হঠাৎ মন সা'র ডাকে ভিন্ন হ'য়ে গেল। বিনয়নন্দন বচনে যতই সে তার কাছে কাকুতি মিনতি করুক না কেন, মহাজন মদন সা জানিয়ে খেল, এই মাসেই যেন সে অল্পটুকু চেষ্টা করে। পিছন দিয়ে হারাণের স্ত্রী কিরণ তার রোক্তমান শিশু পুত্রকে তার শুক শুক দু'টি মুখে দিয়ে মদন সা'র কথা শুনে যেন শিউরে উঠলো।

দুখে মদন মানুষ কুল কিনারা পায় না, চারিদিকের হতাশা মানুষের মধ্যে তখন ক্রোধের সঞ্চার করে, সেই ক্রোধ আবার প্রকাশ পায় নিরীহদের উপর। ক্ষুধার আঁলার শিশুটি কেঁদে উঠল, হারাণ তার রোগ-জরুর খুঁজ আরও বিকৃত করে ছেলে ও স্ত্রীকে নির্ধনভাবে গালাগালি করতে লাগলো, যেন তারাই তার এই দুঃখের জন্ত একমাত্র দায়ী। এমন সময়, "কৈ গো, কেন লো, আজও তোমাদের মত হলো না"—বলতে বলতে পাড়ার ক্ষেত্রমাসী এসে উপস্থিত হ'ল।—"আমার তো অমত নাই, ঐ হারাণ-জান্নার জেদ; নিজেও মরবে, ছেলেটাকে রাখবে," বলে হাঁপাতে লাগল হারাণ।

কিরণ মাতৃহৃদয়ের সমস্তখানি করুণা দিয়ে ছেলেটিকে আরও নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরল। ক্ষেত্রমাসী পানের রসে মুণ্ডা সরস করে এলো, "ছেলেটাকে কি তুই মেরে ফেলবি? দেখতো, এই কদিনেই কেমন রোগী হয়ে গেছে। তার বাড়লোক, তোদের স্বজাতি, নিতে চাচ্ছে, তাদের কাছে ছেলেটা হুখে থাকবে, ওর মজল কি তুই চাস না?"

কিরণ ছেলের দিকে একবার স্নেহমুগ্ধ বুলিয়ে নিয়ে দেখল, স্ত্রী ছেলেটা কি রোগী হয়ে গেছে, আজ সমস্ত দিনের মধ্যে ছেলেটাকে এককোটা দুখ সে নিতে পারে নাই। আজ আর বছর পূর্ণ হয়ে গেল, এই অসহায় সন্তানকে এই দুঃখের পৃথিবীতে টেনে এনেছে, কিন্তু কোনদিনই তো তাকে পেট ভরে দুখ নিতে পারে নাই। অসহায় শিশুটি কতরকমের ক্ষুধার আঁলার চাঁৎকার করে উঠেছে, কোনবার শুক মাইটা; কোনবার জল দেওয়া কেন তার মুখে দিয়ে এই বিস্ময়কর ছোট্ট সন্তান সে প্রবঞ্চনা করেছে। নিজের এই অসহায় অবস্থার কথা যেন তাকে প্রবলভাবে মাড়া মিল, আপনি হ'তে তার দু'চোখ হতে জল করে পড়ল। পতীর দুঃখে সে মনে মনে জানাল, ঐবার তাকে যদি কৃপা করে ছেলে দিলেনই, তবে তাকে একশিল্পু আহাৰ্য্য দেবার অসহায় দিলেন না কেন?

ঐক্য ধরেছে দেখে ক্ষেত্রমাসী তার আনন্দ গোপন করে বলল, "নৌ, কীদিস্ না, তোর বুকের বাধা কি আমি বুঝি না। কিন্তু কি করবি বল, যে দিনকাল পড়েছে, তা—কি গিয়েই বা ছেলেকে বাঁচাবি, আর কি দিচ্ছেই বা রুগ্ন শাবিকে দাঁড় করাবি। ঐ হারাণ বাঁচুক, দিন আহুক, আবার তোর কোল জোড়া হয়ে মাগিক আসবে। আচ্ছা! আজ থাক, এই টাকা দুটো দিয়ে পেলান, ছেলেটাকে ভাল কোরে খাওয়া, আদর-বন্দ কর, দু'দিন পরেই না হয় ছেলেকে দিয়ে আসবি।"

*

*

আজ ক'দিন হ'ল কিরণ ছেলেটাকে দাসগিরির কোলে তুলে দিয়ে শূন্য হৃদয়ে টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে। ছেলেটি যেন তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়ে গেছে, চলবার শক্তি তার নাই। পাড়ার চরণকে দিয়ে গোপীর পথ ও আহাৰ্য্যদ্রব্য কিনে আনিয়েছে। হারাণকে খেতে দিচ্ছে, অনশনের তীব্র আঁলার নিজে খেতে গিয়েছে, পরস্পরেই গুণ্য সম্ভাবনিকীর টাকার আহাৰ্য্যের কথা স্মরণে পড়েই আহাৰ্য্য দ্রব্যগুলি যেন বিবাক্ত হয়ে গেছে, দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছে, খাওয়া তার হয় নি। এমনকি করে অস্ত্রাণীর আহাৰ্য্য নাই, নিদ্রা নাই, কেবল ছেলের চিন্তা। খালি শোনে ছেলের অশ্রুট কাকলি, বাতাস যেন তার কাশে ছেলের কাশা নিয়ে আসে, ঘরে কোন লজ্ব হলেই যেন সে তার ছেলের পা ফেলার শব্দ শোনে। রাতে সে ছেলের শব্দ দেখে, ঘুমের ঘোরে শূন্য বুকের বিষম ব্যাথা জেগে কীদ্বতে থাকে নিভৃত ব'সে,—একা...অন্ধকারে।

কতদিন কতবার সে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়ে কাঙাল মরনে ছেলেটাকে দেখতে গিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে দাসদাসীদের কাছ হ'তে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। তারা কি তার মাতৃ-হৃদয়ের খবর রাখে? আজ সে তার রুগ্ন, শক্তিহীন দেহটাকে টেনে নিয়ে কোন মতে সকলের সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ছেলের ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—তার থোকা কি হৃদয় হয়েছে, মোটা হয়েছে, নুতন মাকে আঁদর করে চুমো খাচ্ছে, অশ্রুটভাবে মা, মা করছে। এ দৃশ্য সে যেন সহ্য করতে পারল না, দুটি তার কাপসা হয়ে এলো, চারিদিকে অন্ধকার জ'মে উঠলো যেন তারাই হ'য়ে। লজ্ব শুনে দাসগিরি, চাকর-দাসীকে ছেঁকে বাইরে গিয়ে ডিঘারীকে ডিতরে দেখে সকলকে গালাগালি করতে লাগল। মাঝে ফিরে গেলে কিরণ নিজের ছেলেকে দেখতে এসে সকলের দেওয়া চোর অপবাদ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার পথ ধরল। তখনো তার শূন্য হৃদয়ের মাতৃশব্দ ডাক-ভেসে উঠে—“থোকা...থোকা।”

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণ ও বঙ্গভ্রী

বিগত ২২শে জুনের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণাদেশে যে সমস্ত আরও উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লইয়া ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবী জানাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশে ১৯৪৩ সালে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করা হইয়াছে, তদপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগ কম কাগজ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে; এবং গত ১২ই জুন হইতেই ইহা বলবৎ হইতে আনস্ত হইয়াছে। মাত্র ত্রিশ ভাগ কাগজ ব্যবহারে দেশের শিক্ষা ও কার্যধারা যে স্থাপ্ত হইতে চলিয়াছে, সেই দিকে গোড়াতেই যদি সরকারপক্ষ দৃষ্টি না দেন, তবে এক বিষম বিপদায়ের সৃষ্টি হইবে। বিভালয়সমূহে কাগজভাবে বহু প্রকার হইতেই ছাত্রদের লিখিবার কাগজ ও পত্রীকাসমূহ কমিতে আনস্ত হইয়াছে, বর্তমান আদেশে তাহা একরূপ বন্ধ হইতেই গিয়াছে। সাময়িক পত্রীকাসমূহও আজ সেই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, যাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে আমরা নিজেরাও আজ জড়িত।

গত দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা যে আদর্শে পথে চলিয়া আসিতে-ছিলাম, বর্তমান কাগজ-নিয়ন্ত্রণে তাহা ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। কোন কোন অমুঠান ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানুষের পন্যাব নিবারণ হইয়া ধনপ্রাচুর্ষ্য সাধিত হইতে পারে, কোন কোন পদ্ধতিতে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্কতোভাবে পূরণ হইতে পারে, এবং কি কি অমুঠানের অবলম্বনে মানুষের অলস ও বেকার হাবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্মব্যস্ত ও উপার্জনশীল জীবন বাপন করা সম্ভব,—বিগত শুদীর্ঘকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বঙ্গভ্রী তাহা জনসমাজের চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে। বর্তমানে বিশ্বযুদ্ধের বিধংসতার মধ্যে তাহা অপরিহার্যতা এমন কি ইউরোপীয় সংস্কৃতিও যথেষ্ট প্রবুদ্ধ শক্তিতে স্বীকার করিয়া লইবে—ইহা আমরা স্বতঃই মনে করি। কিন্তু সাম্প্রতিক সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণাদেশ তাহা আজ ব্যাহত করিয়া দাড়াইয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন-বেদ প্রচাবে বঙ্গভ্রী এতকাল যে আকারে চলিয়াছিল, আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া বঙ্গভ্রীকে পূর্বায়তন বজায় রাখিতে আদেশ দিয়া সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করিবেন।

বর্তমান খাণ্ডসমস্তা

যুদ্ধের গোড়া হইতেই খাণ্ডসমস্তা গুরুতর আকার ধারণ করিল। বর্তমানে তাহা আরও কঠিন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিগত ১৩৫০ সালে বাংলার উপর দিয়া যে ভীষণ ভূমিকম্প বহিয়া গেল, তাহা আজও চিত্তে ভীতির সঞ্চার করে। পুনরায় কলিকাতা ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি ও মহামারী প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি বাংলা পরিভ্রমণ করিয়া জীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও জীযুক্ত হৃদয়নাথ কুন্তল বাংলার পুনর্ভূমিক সম্পর্কে এক যুক্ত-বিত্তি

দিয়াছেন। তাহা হইতে স্বতঃই জনসাধারণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলার লাট বাহাদুর স্তার কেসী এক বেতার-বক্তৃতায় অবশ্য '১৩৫১ সাল ভূমিকম্প হইতে মৃত' বলিয়া দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু যে পরিমাণে খাণ্ডমূল্য পুনরায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও ভিখারীর আর্ন্তনাদে দেশ ভরিয়া উঠিতেছে—তাহাতে স্বভাবতঃই বাংলায় (আগামী) পুনর্ভূমিক রেক্ষাপাত করে না কি?

শুধু বাংলা বলিয়াই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই জীবন-যুদ্ধ সমস্ত আরও দিশাহাব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পিছনে ভাগ্য-বিধাতার ইঙ্গিত কতটা আছে জানি না, কিন্তু বস্তুতাত্ত্বিক ভিত্তিতে যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইতেছে এই যুদ্ধের বীভৎসতা। পিঠা ভাগের মতো মার্জার ও কপি চূড়ামণির বিরুদ্ধরোবে পৃথিবীর সমস্ত পিঠা বিলুপ্ত হইয়া চলিতেছে, শূন্য মরিতেছে গৃহস্থ। যতদিন এই যুদ্ধ রহিয়াছে, ততদিন না এত নারকীয় অগ্নি-শিখা পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইতেছে,—ততদিন এই খাণ্ডসমস্তার বিন্দুমাত্র সমাধান ঘটিতে পারে না। বাব বাব ভূমিক আসিবে, বার বার লক্ষ লক্ষ লোক মানুষের লাঞ্ছনা কুড়াইয়া অনাহারে বৃদ্ধকায় তিলে তিলে কঙ্কালসাব হইয়া মরিবে। ইহা হইতে পথিভাগ পাইতে হইলে যে মানবীয় প্রীতিভ্রান ও সতনশীল আত্মনিষ্ঠা আবশ্যিক, তাহা আজ পৃথিবীর মাটি হইতে বিসর্জিত হইয়াছে। বিনা বিচারে স্নাজ তাই বাংলা মরিতেছে, পৃথিবী এক বস্তাব শ্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহা নিষ্পত্তি কে করিবে? কে ইহার সমাধান হইয়া বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের জনপ্রাণী আবাব শুধেব অন্ন ভোগ করিয়া সাবলীল হাশ্বে মুগ্ধ হইয়া উঠিতে পারিবে? সে-দিন কি বহু দূবে?

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার

বিগত লাহোর অধিবেশনে মুসলীম লীগ কাউন্সিল লীগ-সভাপতি মিঃ জিন্নাকে গান্ধীজীব সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইবার জন্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। মিঃ জিন্না আশ্বাস দিয়াছেন যে, সম্ভাব্যজনক মীমাংসার জন্ত তিনি চেষ্টার ক্রটি করিবেন না।

গান্ধীজীব সহিত ইতিপূর্বেও কয়েকবার মিঃ জিন্নাব আপোষ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কেহই কিছু একটা সম্ভাব্যজনক মিলন-সন্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মিঃ রাজগোপালা-চারীর পাকিস্তান-স্বীকৃতিতে মূল ভিত্তি করিয়া আসন্ন আলোচনার প্রয়াস। কিন্তু যেখানে সমগ্র দেশের প্রযুক্ত মতবাদ অঙ্কের মতো পিছনে চাপা পড়িয়া আছে, সেখানে এই বিচ্ছিন্ন কুক্ষিগত 'দফা' সৃষ্টির সত্যই কোনো বৃহত্তর সার্থকতা আছে কিনা, তাহা একমাত্র আগামী ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা গান্ধীজী। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার তাঁহার এই প্রয়াস স্বাভাবিক। কিন্তু তথাকথিত 'স্বাধীনতা' বলিতে কি বুঝি? পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন স্বাধীন দেশসমূহ আজ যে ধংসোন্মত্ততার পরিচর

দিয়া ক্ষুধা-ভুজা-আহার হইতে সমগ্র জনসমাজকে যন্ত্রণাবিকৃত করিয়া মাতিতেছে, ইহাই কি স্বাধীনতাভোগের উৎসারিত রূপ ? আশা হয়ত স্তিমিত আলোক-রশ্মির গায় ভবিষ্যতের গভে জ্বরের মতো ক্ষীণ প্রাণে নড়িতেছে, কিন্তু ভরসার পথ কর্তৃকাকীর্ণ। তথেষ্ট ভ্রাতৃশনে প্রাণ বলি হইয়া চলিয়াছে, ভ্রণের মূলে বিক্রীত হইতেছে মানুষের জীবনসত্তা, যুদ্ধভাত বস্ত্রবস্ত্রিত ডুমি প্রতি-হিংসার মুখোশ আঁটিয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে। ইহাই কি স্বাধীনতা ভোগের আনন্দ ? গান্ধীজীর আবদ্ধ স্বাধীনতা অথবা স্বাধীন ভাবত কি রূপ পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইবে, তাহা অবশ্য তাঁহাবই বিচার্য বিষয়, কিন্তু বর্তমান বিধে স্বাধীনতার রূপ যে দিকে চলিয়াছে, তাহা যে অন্ততঃ ভাবত চাহে না, ইহা নিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ, চুক্তি বা 'প্যাক্ট' কবিয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও মিলনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ বহিয়াছে কিনা তাহাও বিচার্য বিষয়। অন্ততঃ কালের গতিপথে তাহার ফলপ্রসূতাব সাক্ষ্য ইতিহাস অজ্ঞাবধি কোথাও দিতে পারিয়াছে বলিয়া আমাদের দাব্য নাহি। বথের চাকায় ধূলি হইয়া নামমালায় চিত্তমুগ্ধ হইয়া ওঠা সহজ বটে, কিন্তু অদ্বৈত বিভূতিক লাবণ্যবিভার শাশ্বত কবিতা রাখার নিঃস্বতা পদে পদে। অন্ততঃ পৃথিবীর ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাব বার ইহারই নিদর্শন দেখিতেছি। আসন্ন চুক্তি-প্রয়াস কি তাহা হইতেও মহত্তর কিছু ?

মিঃ জিন্না গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন, আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে তাঁহার নিজ বাসভবনে গান্ধীজীকে তিনি অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। এই প্রস্তুতির দ্বাবপ্রান্তে আমরা উপবোধ প্রাপ্তিই মাত্র গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎ তুলিয়া ধরিতে চাই।

বর্তমান যুদ্ধ ও শাস্তির লক্ষ্য

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে আবহু করিয়া চার বৎসর এগার মাসের যুদ্ধে জার্মানী গোড়াব দিকে যে দানবীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, সে বিজয়রথচক্র আজ মগ্ন হইয়া গিয়াছে বলিলে কম বলা হইবে। সর্বত্রই আজ জার্মানীর অশ্রুবিধা স্ফুটিত হইতেছে। মিএপক্ষ ক্রমাগত আজ বিভিন্ন বণ-ক্ষেত্রে তাহাব শৌণ্যবীর্ঘ্যের পরিচয় দিয়া চলিয়াছে। সাম্প্রতিক গত এক মাসের যুদ্ধে দেখা যায় :

ফরাসী রণাঙ্গন

মিত্রপক্ষীয় দ্বিতীয় আর্মি কর্তৃক নর্মাণ্ডি অভিযানের বৃহত্তম পরিকল্পনায় ১৬ই জুলাই তাবিধ এক্ষোয়ে অধিকৃত হয়। জেনাবেল ব্রাডলী ও জেনারেল মণ্টগোমারি এবং কানাডিয়ান টহলদারী সৈন্যবৃন্দের সাজোয়া বাহিনী ও সৈন্যসমাবেশ শরুসৈন্যকে পর্য্যদন্ত করে। তৎপর হইতে ক্রমিক পদ্ধতিতে সেণ্টলো, কঁয়ে, কঁইসি, কাউটাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া এভেব্রি, এক্ষোয়ে ও ভিলার্স বোকেজ পর্য্যন্ত আমেরিকান বাহিনীর অপূর্ণ দক্ষতায় মিত্রপক্ষ ভয়লাভ করে।

রুশ রণাঙ্গন

অপর দিকে রুশ বণক্ষেত্রে লালকোজের অক্সান্ত অগ্রগতি

জার্মান ঘাঁটিকে সর্বত্র পর্য্যদন্ত করিয়া চলিয়াছে। বিগত ১৬ই জুলাইয়ের পর হইতে অজ্ঞাবধি গ্রেনো, পকভ, লুবলিন হইতে আবহু করিয়া আজ প্রায় খাস জার্মানীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া লালকোজ আঘাত জানিয়াছে—যে আঘাত অতি সহজে ফিরাইয়া দিবার মতো শক্তি জার্মানী আজ সত্যই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ইতালী রণাঙ্গন

হেমান ইতালী বণক্ষেত্রেও পঞ্চম আর্মির লেগহর্ন দখল করা হইতে শুরু করিয়া জার্মান সৈন্যের যথেষ্ট বাধাদান সত্ত্বেও আমেরিকান বাহিনীর কারমা, সেবতাবলো, স্যাস্তোনাকো প্রভৃতি অঞ্চল বিজয়ের বার্তাসমূহ চক্রশক্তিকে ক্রমাগত ঘায়েল করিবারই ইঙ্গিত করে। তাহাব বিরুদ্ধে উৎসারিত চক্রশক্তির অভিযান সম্প্রতি একরূপ পবিত্র হই হইতেছে না।

ইতিমধ্যে জার্মানীর বহুপ্রচলিত উদ্ভূত বোমাব আক্রমণ সমগ্র লণ্ডন-প্রাণভূমিতে যে ভীতির সঞ্চার করে, তাহাও গ্রহীতব্য। এ সম্পর্কে রুটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্লিল সম্প্রতি কমন্স সভায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়—গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রায় দুইমাস ধরিয় জার্মানী বুটেনেব উপর অনান ৫৩৪০ টি উদ্ভূত বোমা নিক্ষেপ করিয়া ৪৭৩৫ জন বুটেনবাসীকে নিহত, প্রায় ১৪ হাজার লোককে আহত এবং প্রায় ৮ লক্ষ গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে; ফলে প্রায় দশলক্ষ লোক লণ্ডন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু মিঃ চার্লিল এই বিরাট ধ্বংস-কাণ্ডের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন জার্মানীতে কমপক্ষে ৪৮ হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করিয়া।

ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে ক্রমাগত পর্য্যদন্ততার মধ্যে জার্মানীর সম্প্রতি প্রধান লক্ষ্য হইতেছে একমাত্র বুটেনেব ক্ষতি সাধন করা। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানী হইতে যে গৃহযুদ্ধ ও হিটলাবেব প্রাণনাশ-প্রচেষ্টার সংবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা তাহাব সার্থকতা কতদূর অগ্রসর হইবে, সে বিষয় চিন্তা-সাপেক্ষ। জার্মানীর গৃহযুদ্ধের মূলে দেখা যায়, এই দীর্ঘ-কালের যুদ্ধ-মরণমুগ্ধীতাব মধ্য হইতে সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণ মুক্তপক্ষ-বিশঙ্গমের মতই একটা অমূল্য স্বস্তি চায়। হিটলাবেব প্রাণনাশ-প্রচেষ্টার মূলে এই স্বস্তিপ্রয়াসই প্রচলিত কি না, সে সম্বন্ধেও ভাবিবার আছে।

জাপানী যুদ্ধ

এদিকে চীন ও ভারত-ব্রহ্ম যুদ্ধে যথেষ্ট বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও গত জুলাই পর্য্যন্ত জাপানকে বহুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, যাহার ফলে দক্ষিণ চীন, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে জেনারেল তোজোর পদত্যাগ জাপানী রাষ্ট্রতন্ত্র ও রণনীতিতে এক নূতন আকার ধারণ করাইয়াছে। জার্মানীর মত জাপানেও আজ চারিদিক হইতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বস্তি প্রত্যাশায় চিত্ত হ্রদিয়া উঠিয়াছে জনসাধারণের।

বিস্তৃত এই যুদ্ধ-বাতাসতার মধ্যে শুধু জার্মান ও জাপানী নাগরিকবৃন্দই নয়, সমগ্র পৃথিবীর চিত্তই আজ একটা আও কল্যাণ।

ও শাস্তির প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই শাস্তি আনিবে কে? জল সেচন করা সম্ভব হইবে কেমন কবিয়া এই অগ্নি-প্রবাহে? সম্প্রতি যি: চার্কিলের যুদ্ধ-বিবৃতি হইতে দেখা যায়: জাৰ্মানীকে ঘায়েল করিতে পারিলে জাপানকে পরাজিত করা বিন্দু-মাত্রও কষ্ট-সাপেক্ষ নয় এবং ক্রমাগত যুদ্ধের যথাসম্ভব শীঘ্র অবসানই আশাশ্রয়। এ বিষয়ে মতবৈষম্য না থাকিলেও যুদ্ধের দ্বারা যে যুদ্ধের কখনো শাস্তি হওয়া সম্ভব নয়, তাহা সৰ্ব্বথা অনস্বীকার্য। এই যে চতুর্দিকে আজ মূঢ় উন্মত্ততা, বিজাতীয় রোষে জাতি-স্বাতন্ত্র্যেব ধ্বংসাত্মকী উল্লঙ্ঘন, অগস্ত অগ্নিগাহে শ্রামলভূমি শিবা-সঞ্চারিত মহাশ্মশান—ইহা কি শুধু বোঝায়িত আক্রমণের দ্বারাই প্রশমিত হওয়া সম্ভব? আমরা তাহা মনে করি না।

ইতিমধ্যে “যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা”র সত্বেব দফা কোষ্ঠী লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পরিকল্পনা শুধু মাকড়সার মতো জালই প্রসারিত করিতেছে, কার্যকারিতা আজও দেখা দেয় নাই। যুদ্ধ প্রশমিত হইলেই যে পৃথিবীতে শান্তি ছায়া নামিবে, তাহা অসম্ভব: ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত কোনো দিন দৃষ্ট হয় নাই। ঋণকালের বিবর্তি-প্রশান্তিতে আবার নতুন সাজোয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার শুরু হইয়াছে নতুন আক্রমণ। পৃথিবীর ইতিহাসে বাবংবাব ইহাই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। “পরিকল্পনা”কে কেন্দ্র করিয়া নেতৃবৃন্দ এমনও আশ্বাস দিতেছেন যে—এইখানেই চিবকালের মতো যুদ্ধ-নিবসন। কিন্তু তাহাব সম্ভাব্যতাও এখনও চিন্তারাজ্যেব সন্দেহাঙ্কলে নিহিত। যতদূর না মানুষ পরস্পর-সৌহার্দ্য প্রযুক্ত হইতেছে, একজনকে দিয়া আব একজনকে স্বীকার কবিয়া লইতেছে—ততদিন পর্যন্ত সত্যকাব শাস্তি স্বপ্ন দেখা অসম্ভব মাত্র। যুদ্ধেব দীর্ঘতা আজ পর্যন্ত তো কম দূর প্রলম্বিত হয় নাই, কিন্তু ‘পরিকল্পনা’-অনুসৃত সেই শাস্তির সূচনা কোথায়? নেতৃবৃন্দ তাহা বলিতে পারেন কি?

সংবাদ

নব-গঠিত জাপ-মন্ত্রিসভা

সম্প্রতি জাপ-প্রধান-মন্ত্রী জেনাবেল তোজো পদত্যাগ কবিয়াছেন। প্রকাশ, উপযুগপতি সাময়িক বিপর্যয়ে তোজো মন্ত্রিসভাঙ্গী অপযশভাজন হইয়া পড়ে এবং জনসাধারণ মন্ত্রিসভাব উপর বিশ্বাস হারায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা হইতে ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যা উপলব্ধি হয়। ১৯৪২ সালে দক্ষিণ সমুদ্রে দ্রুত জয়লাভের সময় জাপ নৌ-বিভাগ অষ্ট্রেলিয়াকে পান্টা আক্রমণের ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের সুযোগ হইতে মিত্রপক্ষকে বঞ্চিত করার জন্য অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের এক পরিকল্পনা করিয়াছিল; এবং আমেরিকাকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিবার জন্য জাপ নৌ-বিভাগ ঐ সময় আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে বিমান আক্রমণ চালাইবারও এক পরিকল্পনা করে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তোজো এই পরিকল্পনায় বাধা দিয়া বলেন: এইরূপ আক্রমণ পরিচালনার মতো জাপানের শক্তি নাই।—গত দুই বৎসরের এই ঘটনা হইতে স্মৃক কবিয়া ১৯৪৩ এর সেলোমন দ্বীপাঞ্চলের যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক

জাপানের পরাজয়ের সূচনা পর্যন্ত জেনাবেল তোজোর দায়িত্ব এবং সমরনীতি সম্পর্কে সৈন্ত ও নৌ-বিভাগের মধ্যে ক্রমাগত: মতানৈক্য ও বিবোধই তোজোর পদত্যাগ ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কারণ। জাপানী বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় সমর পরিষদের আন্তর্জাতিক সমস্যা গবেষণা ব্যুরোব ডিরেক্টর ওয়াং পোং সেন উপরোক্তরূপ মন্তব্য করেন। বর্তমান নব-গঠিত মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য হইতেছে—পূর্বোক্তরূপ আত্মসম্মতীয় বিরোধ দূর কবিয়া এক যুদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের দ্বারা সমর ও শাসনতান্ত্রিক কার্য পরিচালনা করা। বর্তমান নব-গঠিত মন্ত্রিসভায় আছেন:

জেনাবেল কুনিয়াকি কায়সো (প্রধান মন্ত্রী), এডমিরাল মিৎসুমাসা ইয়োনাই (সহকারী প্রধান মন্ত্রী), মামোকু সিগেমিৎসু (পববার্ষিক ও বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সচিব), কিঙ্কু মার্শাল সুগিয়ামা (সমর সচিব), এডমিরাল মিৎসুমাসা ইয়োনাই (নৌ-সচিব), সিগিও ওদাচি (স্বরাষ্ট্র সচিব), সোতারো ইসিওয়াতা (অর্থ সচিব), হিরোমাসা মাৎসুমাকো (বিচার সচিব), হিসতাদা হিবোস (জন-কল্যাণ সচিব), হারুসিগু নিনোমিয়া (শিক্ষা সচিব), জিজিরো ফুজিওয়ারা (সমরোপকরণ উৎপাদন সচিব), তোসিও সিমাদা (কৃষি ও বাণিজ্য সচিব), ইয়োনেন্ড মায়েদা (যানবাহন সচিব), চু জি মাচিদা, হিদিও কোদামা ও তাকেতোবা ওগাতা (বাহু সচিব)।

তোজো-মন্ত্রিসভাব অধিকাংশ মন্ত্রীই বর্তমান মন্ত্রিসভার বহাল আছেন।

রুশ-পোলিশ সম্পর্ক

সম্প্রতি মস্কো রেডিও কর্তৃক সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যুদ্ধ বিজয়ের পথে পোলাণ্ডের এলাকার স্বীয় শাসন প্রবর্তনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা সোভিয়েট গভর্নমেন্টের নাই। সোভিয়েট কম্যাণ্ড ও পোলিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকিবে, সে সম্বন্ধে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সহিত সোভিয়েট গভর্নমেন্ট একটি চুক্তি সাধনের সঙ্কল্প কবিয়াছেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধে কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে এবং পোলাণ্ডের মিত্র-জনসাধারণকে জাৰ্মান কবলমুক্ত করার আগ্রহেই লালফোজ পোলাণ্ডের এলাকার যুদ্ধ চালইতেছে। আলোচ্য সম্পর্ক বিষয়ে ক্রেমলিনে মার্শাল ষ্ট্যালিনের সম্মুখে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সাক্ষিত চুক্তি-পত্রে যে দশটি ধারার অবতারণা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ধারা হইতেছে—পোলাণ্ডের যে সমস্ত স্থান সাময়িক তৎপরতাব এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত স্থানে সোভিয়েট প্রধান সেনাপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন। পোলাণ্ডের জাৰ্মান কবলমুক্ত অঞ্চলে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি কর্তৃক পোলিশ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এক পোলিশ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোনো অঞ্চলে সাময়িক তৎপরতা শেষ হইলে পর পোলিশ কমিটি তথাকার অসাময়িক ব্যাপারের পূর্ব দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। পোলাণ্ডে সোভিয়েট বাহিনীর লোকগণের বিচারের ক্ষমতা

সোভিয়েট কমান্ডেব হস্তে থাকিবে; এবং পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর লোকগণের বিচার পোলিশ সামরিক আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে।

চুক্তির উপসংহাব এখনো অসম্পূর্ণ বহিরাছে।

ফিল্ড মার্শাল রোমেল আহত

বিগত ৩০শে জুলাই নর্মান্ডি স্থল মার্কিন প্রথম আর্মির হেড

কোয়ার্টার হইতে জানান হইয়াছে যে, মিত্র সেনার হস্তে বন্দী একজন জার্মান ক্যাপ্টেন বলিয়াছেন—নর্মান্ডির যুদ্ধে জেনারেল রোমেল আহত হইয়াছেন। যে গাড়ীতে করিয়া তাঁতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে সরাইয়া লওয়া হইতেছিল, উক্ত গাড়ীখানি পশ্চিমঘে উল্টাইয়া যায়, ফলে জেনারেল রোমেলকে প্রায় ছয় ঘণ্টাকাল অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়িয়া থাকিতে হয়। তাঁহার অবস্থা গুরুতর।

পুস্তক ও আলোচনা

উপনিবেশ : শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্‌ সন্স, কলিকাতা। দাম ১।০ মাত্র।

উপনিবেশ সেই স্তবেব উপন্যাস, যাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারা দণ্ডিত হয়, হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়, বিজ্ঞানী মন দিয়া খুঁজিতে হয় ইত্যাব সারবস্তু; সাদা চোখে চিত্ত-বিনোদনের উপাদান খুঁজিতে যাওয়া মূর্থতা। সেই সাহিত্যই সংসাহিত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যে সাহিত্যে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে এই মাটির পৃথিবী। 'উপনিবেশ' সেই সাহিত্যে উত্তীর্ণ—“পৃথিবী বাড়িতেছে। নদীর মোহনায় মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে, আব ক্রমে ক্রমে সেই স্তবেব উপব দিয়া স্মরণরস প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।”

এমনি করিয়াই পৃথিবী বাড়িয়াছে, বাড়িতেছে। কত লোক আসিয়াছে, আসিতেছে, যাইতেছে। জোহান, ডিস্তা, কেরামদি, মর্গমোহন, বলরাম, গঞ্জালেস প্রভৃতিও এই ক্রমবর্ধমান পৃথিবীর পথে উপনিবেশ সন্ধানী জনযাত্রী। লেখক তাঁহার স্বভাবস্বলভ প্রাঞ্জল ভাষায় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে গ্রন্থের কাহিনীটিকে এমন প্রাণবন্ত রূপ দিয়াছেন, যাহা বাংলাব সংসাহিত্য-গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ একটা স্থান পাইবার যথার্থই অধিকারী। নারায়ণবাবুর সার্থক সৃষ্টি উপনিবেশ।

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

অধিনায়ক : শ্রীস্বধীরজন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্‌ সন্স, কলিকাতা। দাম—১ টাকা মাত্র।

স্বধীরজন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। সাময়িক বিভিন্ন পত্রে ছোট গল্প লিখিয়া ইতিমধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁহার নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থের নায়ক মানবেন্দ্র জাতীয়তার মধ্যে দীক্ষিত। রবীন্দ্র-আদর্শে উজ্জ্বল সে। জীবনের উদ্দেশ্য তাহার পতিতোদ্ধার—দেশের সেবা। কিন্তু পিতা সমরেন্দ্রনারায়ণ রক্ষণশীল অভিজাত সমাজের মানুষ; অভিজাত্যের সংরক্ষণই তাঁহার ধর্ম। পিতা-পুত্রের মূল ঘর্ষ

এইখানেই। এই ঘর্ষ-বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করিয়াই মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।—নাটকীয় বিত্বাস ও ভাবামাধুর্য্যে বইখানি যথার্থই সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে। নবীন নাট্যকাবের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

বিপ্লব : শ্রীবগ্নজিৎকুমার সেন প্রণীত গল্পগ্রন্থ। উষা পাবলিশিং হাউস, ৯০, লোয়াব সাকুলার বোড, কলিকাতা। দাম—১.৫০।

বাংলা দেশে আজ সব দিক থেকে যে প্রচণ্ড সামাজিক ও বাস্তবিক বিপ্লব আসন্ন হয়েছে, বগ্নজিৎবাবুর গ্রন্থে তার অপূর্ণ বাস্তব-চিত্র রূপ পেয়েছে। তাঁর দৃষ্টি বাস্তববাদী, বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ ও নিপুণ—কিন্তু নির্ঘম ও 'সিনিক' নয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গভীর সহানুভূতির মিলনে গল্পগুলি অভিনব হয়েছে। সাংপ্রতিক যুগের নবস্বপ্ন-কথাসাহিত্যে তাঁর 'মহামুহূর্ত্ত' গল্পটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা-সাহিত্যের অগতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে এটি আসন দাবী করতে পারে।

'বিপ্লব' বইটি যারা পড়বেন, তাঁরাই দাবী করবেন, বগ্নজিৎ বাবুর লেখনী একান্তভাবে বহুপ্রসবিনী হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রান মিন্‌চু-ই : শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সেন চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত। চাইনিজ মিন্ট্রি অফ ইন্‌ফরমেশন, ২৯নং ষ্টাফেন কোর্ট, কলিকাতা।

চীন-বিপ্লবের অগতম নেতা ও চীন-সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সান ইয়াং-সেন ১৯২৪ সালে কুয়োমিনটাঙের (চীনের জাতীয় দল) পুনর্গঠনের জগ্‌ উক্ত দলের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিয়া ক্যানটনের কোয়াংটুং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলিই শ্রান মিন্‌চু-ই বা জনসাধারণের তিন নীতি বলিয়া পরিচিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বক্তৃতাগুলি চীনের জাতীয় সংগঠনশক্তির মূলে এক অপরিহার্য্য সম্পদ। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বাবু অত্যন্ত সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর চোখে গ্রন্থখানি তুলিয়া ধরায় তিনি প্রশংসাজনক হইয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখা কর্তব্য।

শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

বাংলায় লেখা—

বা ল্মী কি রা যা য় ৭

[মূল ও সরল টিপ্পনসহ ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে]

প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা এবং সম্পূর্ণ ৬০ খণ্ডের
মূল্য একত্রে—পঞ্চান্ন টাকা মাত্র।

গ্রাহকগণের চাহিদা অনুযায়ী পৃথক পৃথক
খণ্ড অথবা সম্পূর্ণ খণ্ড একত্রে সরবরাহ
করা হইয়া থাকে।

সফঃস্বল গ্রাহকবৃন্দকে ভিঃ পিঃ যোগে বই পাঠান হয়।
ভিঃ পিঃ মাণ্ডল স্বতস্ত্র।

জনাবেল ম্যানেজার

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্, লি.

৩৬ অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের খেল ধূল চাই-ই...



শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে চ'লে প্রত্যহ
ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা চাই ই। খেলা
মাঠে ব্যায়াম, বিস্তৃত ছাওয়া ও সুধোর
আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা
দম্পদ। সেই সঙ্গে ভাল আহাৰ্য্যও চাই।
পুষ্টিকর খাতে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও
দৃষ্টি করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও
বাড়ায়।

চি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য

চি-ই

স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে

মাতৃদুগ্ধ অনুরূপ

শিশুদের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ। কিন্তু ১৭৩-
কারিতার 'ভিটা-মিল্ক'
অনুরূপ। ইহা খাটো পুষ্টিগুণ
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত।
প্রচুর ভিটামিন
সন্তানের স্বাস্থ্য, শক্তি
এক লাভগোচর পুষ্টি
বিকাশের হস্ত।

তাহাকে নিয়মিত 'ভিটা-মিল্ক' খাইতে দিন।

ভিটা-মিল্ক

বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা

ন্যাশনাল মিউচুয়াল লাক্সারী



সেমন সুন্দর দেখায়!

ঠিক এই কথাই আপনিও
বলবেন যখন আমাদের গেঞ্জী
ব্যবহার করবেন।

দ্রুপ্তে সেমন সুন্দর, ব্যবহারে সেমনি
আরামদায়ক অথচ বেশ টেকসই ও সস্তা।
আমাদের তৈরী “সানসাইন” ও
“এভারবিউটি” গেঞ্জী সত্যি
হাতুলনীয়। দুঃখের বিষয় বর্তমান
মুন্দের বাজারে আমরা বিশেষ চেষ্টা
করেও ফ্র্যাগণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে
মেটাতে পারছি না।

বীণা প্রিন্সিপাল ও ইণ্ডিয়ান লি:
নতুনশালি বন চার্টার্ড জা লন, ঢাকা, কলিকতা।

জাপানী প্রচারক দল বুলি আওড়ায়,—“আমরা ভারতকে মুক্ত করব।” যে-জাতের স্বাধীনতা বলতে নিজেদের দেশে কল্পিনকালেও কিছু নেই তাদের মুখে এ বেশ খাসা প্রতিশ্রুতি! ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন চায়। এমন একটা দেশের সহায়তা লাভের প্রয়োজন তার নেই যে-দেশের সামরিক নেতৃবৃন্দ এশিয়ার জাতি সমূহকে মুক্ত না করে বরং পদানত রাখতে চায়।

জয়ের মারফতে

... স্বাধীনতা



1019

১৫

১৫

কেন ৩ল

ডাম কমিক্যাল





শ্রীমতী বঙ্গ

৩৬

২ম. ২ল. বঙ্গ ২৩ বিঃ দি.
কলিকাতা



যুদ্ধ-প্রভেদী

সেবারতে প্রত্যেক নারীই গৌরব অমুভব করে—
যুদ্ধ-সময়ে ইহা আরও গৌরবময়। পীড়িত ও
আহত সৈনিকগণ স্বস্তি ও যত্নগার পার্থক্য কি তাহা
সেবাকার্যের ফলেই পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে।
এই স্বস্তি ও যত্নগা জীবন ও মৃত্যুর সমান।

এই মহৎ কার্যের জন্ত আরও অনেক নার্সের
প্রয়োজন। বিলম্ব না করিয়া অদ্যই যোগদান
করুন। পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই; কারণ,
কার্যে ভর্তি কবাব পূর্বে কিছুদিন শিক্ষা দেওয়া
হয়। *যাহাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা
সরাসরি ভাবে গৃহীত হইতে পাবেন। পূর্ব-
অভিজ্ঞতা থাকিলে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়।
সন্তোষজনক কার্য-সমাপ্তির পর এককালীন কিছু
টাকা দেওয়া হয়।

সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত যে-সমস্ত নার্স আই. এম্. এন্.
এস্.-এব দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশেষ
সর্ত্তে এ. এন্. এস্.-এ যোগদান করিতে পাবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত লিখুন :—

লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট,

সেন্ট জন্ এন্ড্রুস ব্রিগেড।

এনং গভর্নমেন্ট প্রেস, কলিকাতা।

আপনাব যদি ঠিকানা পাঠিতে অসুবিধা হয়

তাহা হইলে এই ঠিকানায় লিখুন :—

ডাইরেক্টর জেনারেল,

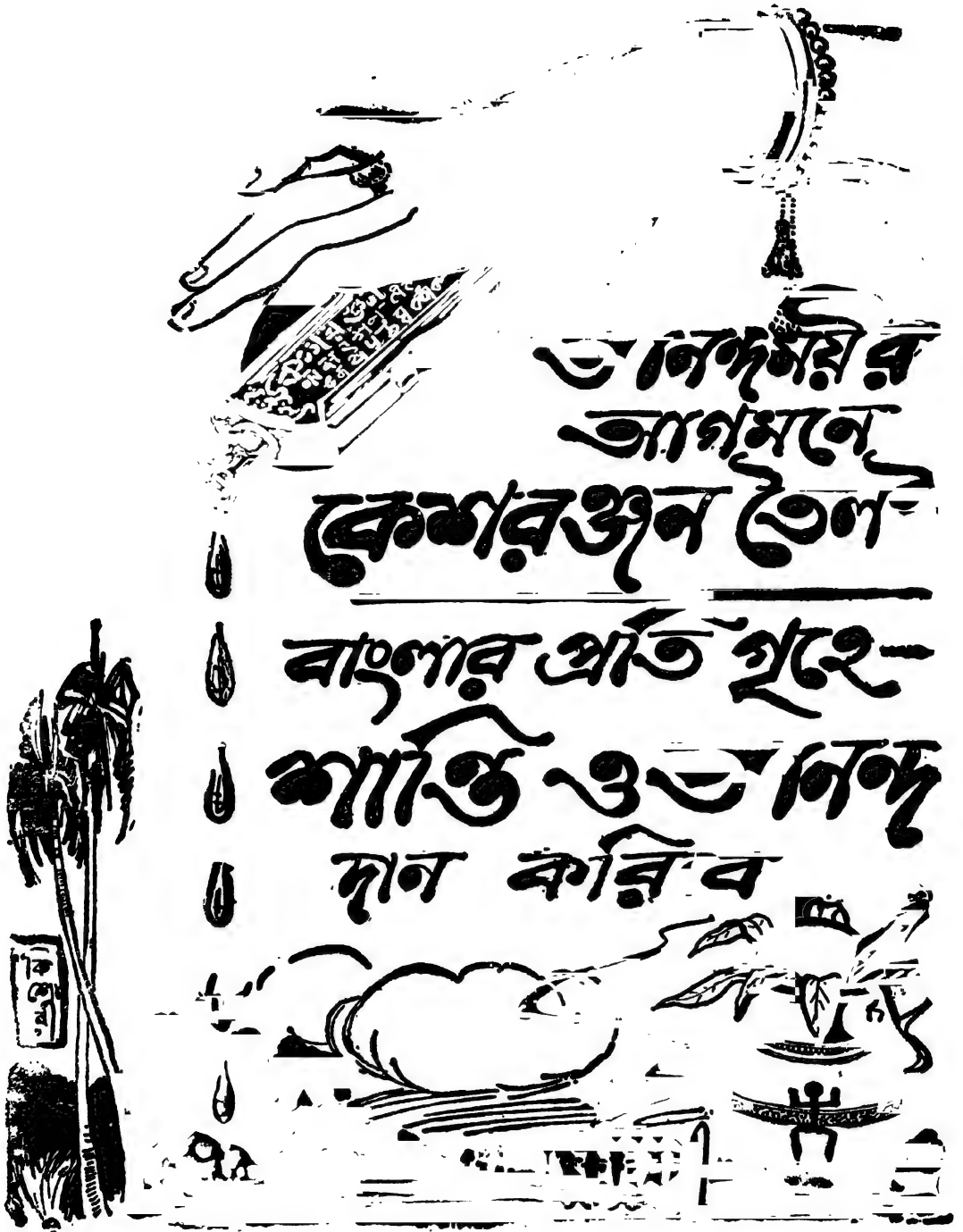
ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস—নিউ দিল্লী।

ভারতবর্ষকে সেবা করিতে

এ. এন্. এস.-এ

যোগদান করুন।

অক্জিনারী নার্সিং সার্ভিস,





শারদোৎসবের আনন্দ

পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হইলে প্রয়োজন
স্বল্প গন্ধাধিবাসিত অভিজাত প্রসাধনী

অঙ্গবাসনে

অগুরু □

অমুরাধা

ইরা □ গৌরী

মন্দিরী

কেশদংস্রার

ক্যাস্কারাইডিন □ ক্যাস্টর অয়েল

□

লোটাস কোকোনাট অয়েল

গাত্রমার্জনে

গোল্ডেন স্মাগলউড

□

গ্লিসারিন

বেঙ্গল বেঙ্গল

কলিকাতা • নাহোর বোম্বে

গভর্ণমেন্টের নির্দ্ধারিত দরে বীজ বিক্রয়ের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে।
ক্যাটাগোরি ভিত্তি পত্র লিখুন।

জাতীয় বই
জাতীয় বই
জাতীয় বই

কলেজ ট্রাট মার্কেট
কালিকাতা

দি
বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কমার্শিয়াল এণ্ড আর্টিষ্টিক প্রিন্টারস্,
শেপনার্স এণ্ড একাউন্টবুক মেকার্স

প্রোঃ এ. সি. মৈত্র এণ্ড সন্স,
কন্ট্রাক্টর এণ্ড কমিশন এজেন্টস্,

১২ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল ২১২৮

THE NEW INDIAN GLASS WORKS (Calcutta) LTD.

*Factory :—2, Church Road, Dum Dum Cantonment
and
101/1, Ultadanga Main Road.*

OFFICE :—7, Rawdon Street, Calcutta.

Manufacturers of all kinds of BOTTLES both narrow and
wide-mouth, stoppered and screw-caps

NEUTRAL GLASS A SPECIALITY

ADRENALINE and VACCINE FILES and TUBES
are manufactured from absolutely neutral glass.

For Particulars Apply to the Head Office of the Company.



এম বি প্রকাশনা ২৩

সন ২৩ গ্রাণ্ড সন অব লেটে বি. প্রকাশ

একমাত্র গিফি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাণ

১২৪ ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২৪ ১২৪-১

১২৪ ১২৪-১

বঙ্গ-বিজ্ঞান-বিশ্ব-বিন, ১৩৫১

হাইকোর্ট শাখা
১নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট
(কলিকাতা)

FIRE

MARINE

THE
Concord
OF
India

মিঃ বি. সেন, এটর্নি-এ্যাট-ল মহোদয়ের
সহযোগিতায় শীঘ্রই খোলা হইবে।

INSURANCE COMPANY LIMITED.

(Incorporated in India)

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

পোস্ট বক্স-২৪০৩ টেলিগ্রাম "লেনদেন" কলি:

Accident

Fidelity

8, CLIVE ROW, CALCUTTA.

বাংলার বস্ত্র-সমস্তার সঙ্কটে তাঁতের ও মিলের কাপড়ের জন্ম

দি ক্যালকুলা ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি

লিমিটেডকে অরণে রাখিবেন

পরিচালক

ফোন

বি. বি. ৩৩১২

বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগারের কর্তৃপক্ষ

(বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে)

কলেজ স্কয়ার

কলিকাতা

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলে.
খানি তৈল

ব. ব. ক. ক. ক. ক.

মিল-২৪৬, আ পার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বঙ্গলক্ষীর ধুতি ও শাড়ী

আগেকার দিনের মতই টেকসই
ও সস্তা

কিন্তু কোন মিলের পক্ষেই আজ আর যথেষ্ট
বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
মিটাইতে পারিতেছি না।



প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বস্ত্র কিনিবেন না, যাহা আছে
তাহা দিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে
সেলাই করিয়া পরুন। এই ছদ্দিনে
তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।
যদি নিতান্ত প্রয়োজন হক
আমাদের অনুরণ করিবেন।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ———

বঙ্গলক্ষী কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

১১, ক্রাইভ রো, কলিকাতা

PENMAN'S

INK

Shoe POLISH



Shulla

পাচ - রূপসী!



স্বাস্থ্যসিদ্ধ
সোহাগ সিন্দুর
নারীর দেহ মন
পবিত্রতর করে!



গুহ এণ্ড - দাদা

কলিকাতা



মণ্ডোষ বিস্কিট কো.

৮ মুক্তিগা স্ট্রীট কলিকাতা

বেঙ্গল ব্যাংক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২, ক্লাইভ ৰো, কলিকাতা

মূলধন

অধিকৃত	২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা
বা	১২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা
গ্রহীত ...	১২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা
আদায়ীকৃত ...	৭,০০,০০০ লক্ষ টাকার অধিক
কার্যকরী তহবিল	৮৫,০০,০০০ লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে বাৰ্ষিক শতকরা

১০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা
হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডাইৰেক্টর—এম. এম.

, এম-এল-সি (ক্যাল),
এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), চাৰ্জড সেক্রেটারী।

গ্রাম-বখের ধন

ফোন :

ক্যাল ৩৭৩৪

২ জীবন বীমা

৩৭নং ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতা

—স্থাপিত—

১৯২৯

আয়করমুক্ত শতকরা ৫৭ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

শাখা সমূহ —

কলিকাতা	বাঙ্গলা	আসাম	বিহার
মাণিকতলা	মেদিনীপুর	হেজপুর	পাটনা
শ্রামবাগার	বালিচক	হবিগঞ্জ	রাঁচী
কলেজ স্ট্রীট	শালবা		
বড়বাড়ার	আলমগার		
	গড়বেতা		
	ঘাটাল		
	বাকুড়া		
	বিষ্ণুপুর		
	মিরকাচী		
	কুশনগর		
	খুলনা		
	বাগেরহাট		

সেন্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ স্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুত কালীচরণ সেন।

জীবন বীমা

বর্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্ম সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। একটী জীবন বীমা-পত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। ‘ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স’কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবার-বর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে. সি. দাশ, বি-এসসি (ইউ. এস. এ.), আর. এ., চেয়ারম্যান

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট
শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা
আসিবার থ্রু টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের
১১নং ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা
রিটার্ন টিকেটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ
রসিদের পরিবর্তে পাণ্ডুতে টিকেট পাওয়া যায়।
এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।



দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(আ সা এ) লি মি টে ড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস

, ক্লাইভ রো, কলিকাতা



শ্রীমৎ
শ্রীমৎ



বঙ্কো. স্মৃতি অয়েট

ফ্রান্স রস্ এণ্ড কোং লিঃ



কলিকাতা

ন্যায্য পারিশ্রমিকে

এবং

অল্প সময়ে

সর্বপ্রকার ব্লক

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ

ও

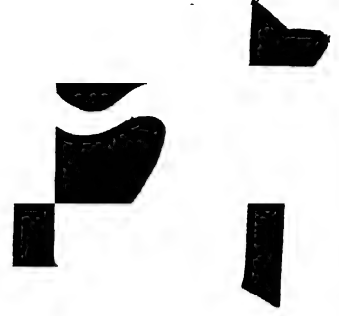
আধুনিক ডিজাইন

রিপ্রোডাক্সন

সিণ্ডিকেট

৭১, বর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

দার্জিলিং



তুবোধ ব্রাদার্স

দার্জিলিং : : কলিকাতা

Telegram :—HOLSELT1.

Estd. 1922.

সত্যিকারের ভাল

চা

পাইতে হ'লে

খোঁজ করুন—

বি. কে. সাহা ও ব্রাদার্স

—লিঃ—

প্রসিদ্ধ চা - বিক্রোতা

মকঃবলবানী পাইকারগণের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস—৫নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ২৪৩৩

ব্রাঞ্চ—২নং লাল বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪২১৬

বাংলা র গো র ব

বাঙ্গালী র নিজ স্ব

আর. সি. রোজ

নম্র

সুমন্থুর গন্ধ-সৌরভে

গন্ধ নম্র

জগতে অভুলনীর

মূল্য—ভিঃ পিঃ মাওলসমেত ২০ তোলা

১ টিন ৩৮/০ ; ২ টিন ৬০ মাত্র।

ক্যালকাটা স্নাক ম্যানুফ্যাক্ কোং

১৩৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

মডেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪ সাল।

হেড অফিস—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

পৃষ্ঠপোষক—মহারাজা অফ সারগুজা (সি. পি.)।

চেয়ারম্যান—মিঃ এস্. কে. চক্রবর্তী, বি-ই, ড্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার ও কন্ট্রোলার।

গত ৩০ বৎসর যাবৎ দেশের সেবায় নিয়োজিত।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—আধ—

বালিগঞ্জ (কলিকাতা), কাটিহার, ঝঞ্ঝারপুর (বিহার), অম্বিকাপুর (সি. পি.)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ আর. এন্. মুখার্জী, এম-এ, বি-এল।

মদনানন্দ ট্যাবলেট

আয়ুর্বেদোক্ত “মদনানন্দ বোদক” সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও পৌরুষহীনতার বহুশতাব্দী-প্রচলিত ঔষধ রসায়ন। তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে Vitamin ও Calcium সহযোগে নির্দিষ্ট মাত্রার Tablet আকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। “মদনানন্দ ট্যাবলেট” সার্বিক দুর্বলতা ও পৌরুষহীনতার অস্বাভাবিক মর্যাদা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অশ্বপী ও Dyspepsia দূর করিয়া ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার ক্ষমতা উৎকর্ষ আর নাই। নৃতন রক্ত ও বীজ তৈরি করিয়া ও হুমিত্রা আনয়ন করিয়া ইহা স্ত্রীপ্রায় দেখে নবজীবন সকার করে। ইহার কীচা “মদনানন্দ” সেবনে উপকার পান নাই, তাহার একবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রস্তুত “মদনানন্দ ট্যাবলেট”-এর নমুনা ব্যবহার করিয়া দেখুন—নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।

ছোট শিশি (৩২ ট্যাবলেট) ১/- ডাকঘর ১০। বড় শিশি (৮০ ট্যাবলেট) ২/- ডাকঘর ১০।

ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট

আয়ুর্বেদোক্ত “ভাস্কর লবণ”-এর নাম এবং গুণের সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। “ভাস্কর লবণ”-এর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করেণ্ডি অক্সিজেনবর্ধক এবং পাচক ঔষধের সংমিশ্রণে, নির্দিষ্ট মাত্রার ট্যাবলেট-আকারে “ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট” সর্ববিধ অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, Dyspepsia, বৃক্ণালা করা, টোমা চেতুর উঠা, পেটে বায়ু হওয়া ও বহুজন্ম-জনিত কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগে অস্বাভাবিক মর্যাদা মর্যাদা ট্যাবলেট-আকারে প্রস্তুত বলিয়া ব্যবহারেরও অত্যন্ত সুবিধাজনক। খাইতে সুখ হওয়ার শিশুরাও আশ্রয়ের সহিত গ্রহণ করিলে। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে সকলেই নব জীবন লাভ করিবেন। “ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট” বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ Digestive Tonic.

ছোট শিশি (৩২ ট্যাবলেট) ১/- ডাকঘর ১০। বড় শিশি (৮০ ট্যাবলেট) ১/- ডাকঘর ১০।

বিজ্ঞা অফিস পোষ্টেল ও প্যাকিং-এর জন্য ১/- আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে উক্ত প্রকার ট্যাবলেটের নমুনা পাঠান হয়।

বিবৃত্ত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। সর্বত্র উক্ত কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

এজেন্ট—

দিল্লী আয়ুর্বেদ ফার্মেসী

৮০, ভাবনাগার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ও ১২, আন্ততোর মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

—গ্যালী স্টোয়ার্স—গোধোলিয়া, বেনারস।

BHARAT AYURVED LABORATORY

P. B. 158
DELHI

Telegrams :
JIBANTARI

The Arya Insurance Co., Ltd.

Telephone :

Head Office : 15, CLIVE STREET,
CALCUTTA.

Calcutta 788.

Branch & Organisation Offices :

LAHORE : LUCKNOW : PATNA : MADRAS : SYLHET
BENARES : PABNA : RAJSHAHI : Etc.

Convincing Figures Showing March of Progress

	1939	1941	1943
1. Business in force Exceeds	Rs 15,01,300/-	Rs. 37,10,900/-	Rs. 60,00,000/-
2. Life Fund	„ 1,63,400/-	„ 6,00,000/-	„ 12,27,200/-
3. Govt. Securities	„ 1,97,100/-	„ 4,03,200/-	„ 9,11,500/-
4. Annual Premiums	„ 83,000/-	„ 2,03,000/-	„ 3,31,000/-

G. C. PAL, B. L., General Manager.

বাঙ্গালীর সংগঠন-প্রতিভার প্রতীক

“দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লি মিলিটেড”

পৃষ্ঠপোষক :— ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মানিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস আই।

“আর্থিক উন্নতির পরিচয়”

(৩০. ১২. ৫০ বাংলা পর্য্যন্ত)

আদার্কীকৃত মূলধন

৬,৭৮,২৮০/-

আমানত

৮৮,৩৮,৮৭২৮৭৮০ পাউ

কার্যকরী তহবিল

১,৩০,৬৮,৮৮২৮৭৮০ পাউ

রেজিঃ অফিস—আখাউরা

চীফ অফিস—আগরতলা

(বি. এণ্ড এ. রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা টেট)

—কলিকাতা অফিস—

৬ নং ক্লাইভ স্ট্রীট ও ২০১ নং হারিসন রোড।

সাফল্যের সহিত শ্রীহুত শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য

আশ্চর্য্য বনৌষধি

হিমালয়ের দিবা বনৌষধি “জয়ন্ত” হস্তে ধারণ করিলে ‘ধারণাশক্তি’ বেজাধীনরূপে বর্দ্ধিত হয়। প্রমেহ, পুরুষত্ব-হীনতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া ধারণাশক্তি বেজাধীনরূপে স্থায়ী করিতে “জয়ন্ত” অদ্বিতীয় ও অব্যর্থ। বতস্প “জয়ন্ত” হস্তে ধারণ করা থাকিলে ততক্ষণ কোন-মতেই ‘শক্তি’ হ্রাস হইবে না। এই অদ্ভুত ঔষ্যগুণ দর্শনে মুগ্ধ হইবেন। কখনও ব্যর্থ হয় নাই। ইহার দ্বারা আপনি স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।

মূল্য—৪।০ টাকা, ডাকবায় ১০ আনা।

—ঠিকানা ইংরাজীতে লিখিবেন—

HIMALAYASRAM

POST BOX 172 DELHI

Commercial Credit Company

Head Office :

Chandpur, Tipperah

Calcutta Office :

25, SWALLOW LANE, CALCUTTA.

Civil and Military Suppliers and Contractors.

Proprietors :

Messrs. A. R. GUHA ROY,

B. K. BRAHMACHARI

and P. C. SEN.

চা

সকল উৎসবেই প্রয়োজন

না যে কে র চা

গন্ধে অতুলনীয়

স্বাদে অনুপম

বর্ণে অনবদ্য

নায়েক টী মার্ভ

২৭, শশিকৃষ্ণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চণ্ডীচরণ নায়েক

প্রসিদ্ধ রং, সিমেন্ট ও লৌহ-ব্যবসায়ী

১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং যাইবার থু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থু টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস্

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শ্রাব্দীয় অ ভিনন্দন

দেশের অর্থ নৈতিক মেরুদণ্ড বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন উহার কিয়দংশ সাহায্য করিয়া আমরা জাতীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টায় যাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য পাইতেছি—তাঁহারা আমাদের শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

মিঃ এন্. বি. ঘোষদাস্তিদার,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

হেড অফিস—

৩১, ম্যান্ডো লেন, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৬৯২

কৃষ্ণচন্দ্র
এম. চঞ্জী ব্যাংক
সি.মি.সি.

একটি প্রগতিশীল নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

বঙ্গলক্ষ্মী সোণ ওয়ার্কস্



হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাথা—দু'রকমের সাবানের জুই

“বঙ্গলক্ষ্মী” প্রস্তুত।



“জাতীয় উন্নতির মূল—আর্থিক উন্নতি”

দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে
ব্যবসায়, বাণিজ্যে

ও

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর।

এদের বাঁচিয়ে রেখে সুপ্রতিষ্ঠিত
করিতে ও উন্নতির পথে এগিয়ে
দিতে এ বা দেশের আর্থিক
ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে—

একমাত্র বিপুল অর্থসঞ্চতিসম্পন্ন
সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক

দ ডিউলি: ব্যাঙ্ক লি:

হেড অফিস : ভবানীপুর—কলিকাতা।

শাক্তদীক্ষা মহোৎসবে—

সজ্জা-ভূষণের আয়োজন

এবারেও বিপুল।

শাড়ী : ব্লাউজ
ছেলেমেয়েদের রকমারী পোষাক

পূজার নাজানা
পূর্বাঙ্গে সান্নিধ্য নাপুণ্য।

কালালয় লিঃ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ফোন : ৬৪২ বড়বাজার।



যুদ্ধের দিনেও

“বঙ্গলক্ষ্মী”র আয়ুর্বেদীয় ঔষধসমূহ
পূর্বামুরূপ বিশুদ্ধ উপাদানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ
কবিরাজমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।
যুদ্ধের অজুহাতে ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করা হয় নাই।
এ কারণ, “বঙ্গলক্ষ্মী”র ঔষধ সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্য।

অল্পমূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে হইলে

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মেট্রোপলিটান ইঞ্জিওরেন্স কোং

“বঙ্গলক্ষ্মী”রই কিনিবেন।

প্রত্নতির পরিচালক কর্তৃক প্রাপ্ত

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্বেদ ওয়ার্‌স

অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধপ্রস্তুতকারক

প্রধান কার্যালয়—১৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। কারখানা—বরাহনগর।

শাখা—৮৪নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, বাগেরহাট, বরিশাল, যশোর, যাদারীপুর ও ধানবাদ।

শাস্ত্রদীক্ষ

নিবেদন—

“তোমার পূজা তুই আপনি নিয়ে

ফিরিস্ ঘরে ঘরে

চিগ্ময়ী মা তাই কি আসিস্

মুগ্ময়ী রূপ ধ’রে ?”

দিকে দিকে আজ দেবী লক্ষ্মীর আগমনী বিঘোষিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ বিজয় বোধন। বিশ্ববিধাতার অর্চনায় উন্মেষিত যখন সম্ভ্রান্তের চিত্ত তখন একদিকে জ্বলিতেছে মহাযুদ্ধের নারকীয় অগ্নিশিখা, অত্মদিকে বুদ্ধিস্কিত জন-গণের ক্ষুধার্ত আর্তনাদে কাঁপিয়া উঠিয়াছে মহাকাশ। দুর্গতিনাশিনীর আবির্ভাবকে আজ আরাধনা করি সকল চিন্তে, সকল চিন্তায়, সকল কার্যে। বরণ করি সেই চিগ্ময়ী মায়ের মুগ্ময়ী রূপকে, ধ্যান করি তাঁর চরণারবুন্দ, যার অমৃত পরশে বিশ্ব আবার পাবে মুক্তির আনন্দ, ক্ষুধার্ত পাবে তার সুখের অন্ন। —বন্দে মাতবম্।

ইউনিয়ন মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১১৫ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।



N. C. SHAW & CO.,

123, Canning Street,
Calcutta.

শিল্পসম্ভারে পূর্ণ



বর্ণ-রুমাল বিচিত্র

কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া'র সিডিউলভুক্ত
উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ডি রে স্টর বর্গ

- ১। মিঃ জে. সি. বার-এট-ল ডিহপুর্ন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা বর্পো-
রেশন; ডিরেক্টর, আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।
- ২। খানবাহাদুর এম. এ. মোমিন, ডিরেক্টর, নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ; আয়াহান
সি-আই-ই ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।
- ৩। মিঃ জি. ভি. সোয়াইকা প্রোগ্রাইটর, সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানিঞ্জিং ডিরেক্টর,
সোয়াইকা কোমকেন্স এক্স মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা
ফার্টিলাইজার লিঃ; সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এণ্ড বাণিস
কোং লিঃ প্রভৃতি।
- ৪। মিঃ এন. সি. চন্দ্র ডিরেক্টর, আশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ; বাগদী কটন
মিলস্ লিঃ; গ্রিপেন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ; মহালক্ষ্মী কটন
মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
- ৫। মিঃ বি. সি. ঘোষ বট্টোলার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স
সোসাইটি লিঃ।
- ৬। মিঃ এস. দত্ত, ডিরেক্টর, এইচ. দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ; রামচন্দ্রপুর্ন টা কোং
লিঃ, ব্রিটিশ ডিস্ট্রিবিউটর্স লিঃ প্রভৃতি।

আদায়ীকৃত মূলধন	৯,২৫,০০০	টাকার উর্দ্ধে
মজুত তহবিল	১,১০,০০০	" "
কার্য্যকরী তহবিল	১,৫০,০০,০০০	" "

নগদ টাকার পরিবর্তে আমাদের গ্যারান্টি-পত্র সর্বত্র গৃহীত হয়।

অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল এবং ইন্সিওরেন্স পলিসি প্রভৃতির উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

অল্প পারিশ্রমিকে বিল, চেক, ছুটি ও ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম আদায় করা হয়।

এতদ্ব্যতীত অসংখ্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হেড অফিস—
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা



জে. এন্. সেন, বি-এ,
এক্স-আর্-ই-এস (লণ্ডন)
জেনারেল ম্যানেজার

লক্ষ্মীর বার্তা ভিন্ন কল্যাণময়,
 দুঃখের আশ্রয়ে আনে আনন্দের জয়।
 সঞ্চয়ের অর্থ্যাত্মকে অর্জনা তাঁর,
 দেশে দেশে শ্রুতি স্তুতি দেবী কমলার।

অর্থগুণুতা আর অর্থ সঞ্চয় এক বস্তু নয়।
 সঞ্চয়ের পথে যাদের প্রশান্ত দৃষ্টি,
 লক্ষ্মীর-কল্যাণ-আশীষ তাদেরই শিরে।

বিদ্যোৎসাহ পল্লি
 কাং. ১৬ %
 লি কাতা।

শ্রী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৩১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলি: ১১২২, ১১২৩

ভিন্ গাঁয়ের মোমাছির। এলো আমাদের গাঁয়ে,
এ-ফুলের ও-ফুলের পরাগ এনে সঞ্চয় করুলো
মোচাকে। ভবিষ্যতের দিনে তাদের আহার
হোল আমাদের গাঁয়ের পরাগ, আর আমাদের
গাঁয়ের মোমাছির। তাদেরই কাছ থেকে কি
পেলো...?.....ইতিহাস লিখে রেখেছে তার
ইতিবৃত্ত। আমাদের দরকার সঞ্চয়ের...দরকার
পরিবার প্রতিপালনের।

—শাখাসমূহ—

দক্ষিণ-কলিকাতা, উত্তর-কলিকাতা
বহুবাজার, বড়বাজার, বেহালা,
বাটানগর, বাউশীলা,
বজ্রজ, কাশিলা:

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ সুধাংশু বিশ্বাস, বি-কম

ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার :

মিঃ সুশীল সেন, বি-এ



নগে প্রনাথের -

হিমকল্যাণ

শরৎ আসে তার রূপ সস্তার নিয়ে, প্রকৃতিদেবী সঙ্গে
এক অপরূপ সাজে, শবৎ স্বপ্নমার এই ত্রিভুজ আবেষ্টনীর
মাঝে আপনার গৃহকে আনন্দ-মুগ্ধ করে তুলুক—
ভেষজ-বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর হিমমিষ্ট
হি ম ক ল্যা ণ ।



হিমকল্যাণ ও য়াকস • কলিকাতা

“এসো গো শারদ-লক্ষী
এসো শুভ্র মেঘের রথে
এসো নির্মল নীল পথে
ধৌত শ্রামল আলো বল-মল
বন গিবি পূর্বতে।”

শবতেব সবুজ আমন্ত্রণের মধ্যেও স্তনতে পাওয়া যাচ্ছে ভূঁখা-
বাংলার ক্ষীণ ও তীব্র আর্দ্রত্ব। মন্থস্তরের রক্ত-নিশানের
ঝলকানি দিকে দিগন্তরে। মরণ-শীল বাংলার কঙ্কালের রোমে
রোমে সবুজ ধাতু শীর্ষে সোনালী ধাতুর আভাষ। তবুও এবার
প্রায় সকলেব চোখেই নিরাশার আভাষ; এই আভাষই
জানিয়ে দিচ্ছে বাঁচবার পন্থা। পুত্র, কন্যা ও পনিবারকে
ভুক্তির করাল হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে চাই সঞ্চয় এবং এই
সঞ্চয়শীল হ'তে আপনাকে সাহায্য করবে :—

ভাওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১১৫নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ রথীন কর—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

“শিশু ও রোগীর সম্বল
‘সুপার বালি’ এনেছে মণ্ডল”

মণ্ডলের সুপার বালি

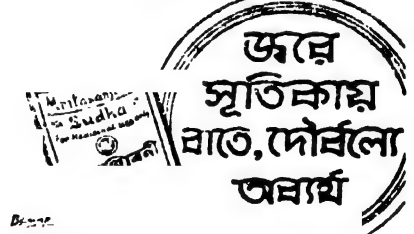
ইহা বহুল পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ-বিশিষ্ট, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য।



সর্বজনসমাদৃত ও ডাক্তারগণ
কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।



ইহার শক্তি এলোজিক
দুর্বলকে বল দেয়
মৃতকে প্রাণ দেয়
মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত হয়



ফার্মাসী লি

ব্রাহ্ম ও এজেন্সি ভারতের সর্বত্র

আমরা নাম মাত্র খরচায়

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে

এবং

শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন

স্থানে সর্বদা পৌছাইয়া দিয়া থাকি।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(সংশ্লিষ্ট) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

দি কলকাতা প্রাইভেট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

—হেড অফিস—

২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

এই কোম্পানী ইংরাজি ১৯৪০ সনের আইনানুসারে
ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট সিকিউরিটি জমা দিয়াছে।

ডিরেক্টরগণ সকলেই সজ্জাত এবং উচ্চপদস্থ।

উক্ত কোম্পানীতে ২৫০ হইতে ৫০০ টাকা পর্যন্ত
বীমা গ্রহণ করা হয়। প্রিমিয়াম অত্র কোম্পানী
চইতে কমই হইবে।

সজ্জাত অর্গেনাইজার এবং একেট আবশ্যক।

বীমাকর্ষিগণকে সর্বদাই বিশেষ সুযোগ সুবিধা

দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ পি. সি. দাস

স্বামীজির যোগবল !

বিশ্ববিশ্রুত বৈদাস্তিক, স্বামী প্রেমানন্দজীর
প্রদর্শিত “যোগসাধন”-প্রণালীতে আপনার ভূত,
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আশ্চর্যরূপে অবগত হউন।
যোগশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া বহু সজ্জাত ও
উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অস্বাচিতভাবে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।
বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে এই আশ্চর্য্য কমতার বিষয়
আলোচিত হইয়াছে। ১৯১৬ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠান
সাধারণের শ্রদ্ধা ও সমাজভূতি লাভ করিয়া আসিতেছে।
৫টি প্রমুখ উত্তরের জন্ত ২১, বর্ষকল গণনা—১ বৎসরের
শুভাশুভ গণনা ৫, জন্ম-পত্রিকা—সমস্ত জীবনের ফলা-
ফল ৬, জন্ম বিবরণ বা অল্পমান বয়স ও পত্র লিখিবার
সঠিক সময় লিখিবেন।

প্রফেসর এস. এন. বসু, বি-এ,

২৩৩, আপাত চিংপুর রোড, নাগবাজার, কলিকাতা।

সুবারবন্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

CAL. 4861.

শাখাসমূহ—বরাহনগর, আলমবাজার। B. B. 4326, B. B. 4366.

দমুদম, টালা, দেওঘর (S. P.). B. B. 3879.

উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক।

সর্বনিম্ন ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল।

আডিবাঃনের প্রথম অধ্যায়

চিত্র ভগ্নে সব পর্যায় সূচনা করার মত
কথানি ছবির কথা জ্ঞানিয়ে রাখছি!

আগমন প্রতিময়

চিত্র-ভগ্নে

৮ল. ৮ল. বে. নও ডায়াল

অভিযোজনা :

অশোককুমার—নাসীর



অম্বাঙ্কন

আডিবাঃন

পরিষ্ঠান

অভিযোজনা :

অভিযোজনা :

অশোককুমার—বীণা—নাসীর

পাহাড়ী সায়ন—অম্বাঙ্কন

চিত্র-ভগ্নে

পবিত্র-প্রেম-আপনারা দেবী

অভিযোজনা :

বনমালা—উল্লাস

চিত্র-ভগ্নে

কলিঙ্গা

চিত্র-ভগ্নে

মতন

অভিযোজনা :

অভিযোজনা :

রমলা

অম্বাঙ্কন—অম্বাঙ্কন



কানুন • গীত • জীবন

অভিযোজনা :

জনপ্রিয় তারকামণ্ডল

চিত্র-ভগ্নে

লোডি ডাঙার

অভিযোজনা :

মমতাজ শাহি—উল্লাস

পরিবেশনাঃ—কা পূ র ণ দ লি মি টি

N O E N J O Y M E N T
can be C O M P L E T E
Without F U L L C O V E R
on your life !

An “EQUITABLE” Policy
Provides Exceptional
Protection.

INDIA EQUITABLE
Insurance Co. Ltd.,
CALCUTTA.

এই নাটকগুলো শুধু অভিনয়ের জন্য নয়—গল্প-উপন্যাসের মতো পাঠ করার জন্যও রচিত।
—শুধু পাঠের জন্য নয়—অভিনয়ের জন্যেও নাটকগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখতে বলি।



শ্রীসরোজ রায়চৌধুরীর শ্রীপরিমল গোস্বামী রচিত শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
হালদার সাহেব ২- দুখু ২- দুখান্তের বিচার ১০ বিশেষ রজনী ২-
আম ও কল্লের কথানি উপহাসের শ্রেষ্ঠ নমুনা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত সদ্য প্রকাশিত
বৃহৎ উপন্যাস
স্বর্গাদপি গরীয়সী ৪-
নীলাঙ্গুরী ৩- হৈমন্তী ৩-
চৈতালী ৩- বরষাত্রী ২১০
বর্ষায় ৩-

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪-
ডঃ শ্রীলীলকুমার দে
অন্ততনৌ (কাব্য) ২-

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর সদ্য প্রকাশিত
স্মৃতি ২১০ শতাব্দীর অভিশাপ ২১০
শৃঙ্খল ২১০ মনের গহনে ২১

শ্রীপরিমল গোস্বামীর সদ্য প্রকাশিত
ট্রামের সেই লোকটি (২৫ খানি কাটুন শোভিত) ২-
ক্যামেরার ছবি (১৬ খানি আর্ট প্লেটস) ৩-

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত যুগের মহাগ্রন্থ
মহামন্ত্রস্তর ৩

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস রচিত
অনবশুভিতা ২১০
তারি একদিন ভালোবেসেছিল ১০

১৯৪০-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে দেখা দশ জন কথাসিঙ্গীর যারোটি
অবিস্মরণীয় গল্প। এই বইয়ের বাস্তবতা সর্বত্র স্বীকৃত।
ঐতিহাসিক—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :
মহামন্ত্রস্তর বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।
ডঃ হামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন :
এই সাহিত্যিক গ্রন্থটিকে আমি অভিনন্দন জানাই।

শ্রীতারাপদ রাহা রচিত
ষোগিনীর মাঠ ১১০

জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যাণ্ড পারিশাস লিঃ—১১২, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা



ভারতের সব ইম্পাত ব্যবহারকারীদের
উদ্দেশ্যে আমাদের শারদীয় অভিনন্দন !



টাটা

টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টীল কোং লিমিটেড্ কতক প্রচারিত
হেড সেল্‌স অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলার অতীতম চিন্তাশীল সাহিত্যিক
মিঃ এস্. ওক্সফোর্ড আলি, বি-এ
(কেটাব), বার-এট-ল প্রণীত বইগুলি পাঠ করুন—
প্রবন্ধ-সাহিত্য— ১। প্রাচ্য ও
প্রতীচ্য, ২। ভবিষ্যতের বাঙ্গালী,
৩। জীবনের শিল্প, ৪। ALIGHAR
MEMORIES & PERSIAN BOQUET,
৫। আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা (বহুত)।
গল্প ও নাটক— ৬। ভাঙ্গাবানী,
৭। গুলদাস্তা, ৮। মাণ্ডুকের দরবার,
৯। দরবেশের দোস্তা, ১০। সুলতান
সালাদীন (নাটক)।
শিশু-সাহিত্য— ১১। গ্রাণাভার
শেষ বীর, ১২। বাদশাহী গল্প,
১৩। গল্পের মজলিস।
কলিকাতার যে কোনো সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত—

ন্যায়দর্শনম্ (২য় খণ্ড)

৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় প্রকাশিত হইল

সম্পাদক

পণ্ডিত হেমন্তকুমার তর্কতীর্থ

ভাষ্য, বার্তিক, তাৎপর্যটীকা, বৃত্তি,
পাদটীকা প্রভৃতি সহ

এই সুদূর্লভ সংস্করণ সংগ্রহ
করিতে আজই তৎপর হউন

মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং
হাউস্ লিমিটেড,

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ইণ্ডো কমা সিসিয়াল ষ্টো স

হেড অফিস—৭৭১, ক্লাইভ স্ট্রীট—কলিকাতা।

ফোন—বি বি ৫৬৪৩

ক্যাঙ্কট্রী—৭২, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

গভর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কন্ট্রাক্টরস্।

আমরা

ওয়েইং স্কেল, তারের জাল, কোলাপ্সিবল ও রট
আয়রণ গেট্ প্রোল, রেলিং এবং নানাপ্রকার
মেসিন ও মেসিনের অংশ তৈয়ার করিয়া থাকি।

কোলিয়ারী, চা-বাগান, মিল ও মিউনিসিপালিটীর

সব প্রকার অর্ডার সরবরাহ করি।

আমরা আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করি।



অস্বাস্থ্যের আতঙ্ক!

অনেকেই খুব ভয় পান। ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে এক শিশি “কিউরল” কাঁচ রাখুন। রোগের সূত্রপাত হইতে “কিউরল” ব্যবহার করলে কোড়া, গলাফোলা প্রভৃতি রোগে আর অস্বাস্থ্যের করিবার প্রয়োজন হয় না। আলা-বয়রা সঙ্গে সঙ্গেই উপশম হয় ও অল্পদিনে রোগ নির্মল হয়।

“কিউরল”

গাংগাফোড়া হইতে প্রস্তুত অশেষ গুণসম্পন্ন ঔষধ—প্রতিষেধক ও পচননিবারক। কাটা, ছেড়া, আঘাত লাগা, মচকানো, ব্যাধা, কোড়া, হাজা, আঙ্গুলফোড়া, ফোলা, গলাফোলা (mumps) ও সকল প্রকার বাতের মন্ত্রণার ন্যায় কাজ করে। ডাক্তারগণ সর্বদাই ইহা ব্যবহা করেন।



মোহা বুটেরা ডি-ল্যুকা

লুকা ডা

জাতীয় সৌভাগ্যের



জীবন্ত প্রতিক

বাঙালীর জাতীয় জীবনে দাশ ব্যাঙ্কের অভ্যুদয়, ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্যস্বাভাবিক ভবিষ্যৎব্যবহারই অনিন্দ্য বিধান।

বৈজ্ঞানিক সংগঠন-পদ্ধতি এবং সুশৃঙ্খলিত-সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ।

বাঙালীর যুগযুগান্তব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক সবল, সফল এবং সার্থক।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবেরও সাধা নাই যে, আগ্রহিত বাঙালীর জাতীয় সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ এই অপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির অগতির পন্থা প্রতিরোধ করে।

বস্তুতঃ দেশবাসীমাত্রেই বিশ্বাসভাজন কর্তব্যবীর আলোমোহন দাশের সিদ্ধহস্ত-পরিচালনার গুণে, সুদক্ষ, কর্তব্যপ্রাণ কর্মস্থলের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও সেবাপরায়ণতার ফলে এবং আপনাদের অটল বিশ্বাস ও অব্যাহত সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ব্যাঙ্কিং জগতে বাঙালীর বুদ্ধি, অধিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত, সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

—দাশ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয়—

বৎসর	আগাগ্রী মূলধন	ডিপোজিট
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস)	১৯৪০—৩,০২,০০০/- উর্কে	১০৫০/- উর্কে
ডিসেম্বর ...	১৯৪০—৫,৭২,০০০/- ”	৩,১৯,০০০/- ”
ডিসেম্বর ...	১৯৪১—৮,১৮,০০০/- ”	২৪,৮২,০০০/- ”
ডিসেম্বর ...	১৯৪২—৯,৪৭,০০০/- ”	৪০,০০,০০০/- ”
জুন ...	১৯৪৩—১০,০০,০০০/- ”	১,১০,০০,০০০/- ”

ডাইরেক্টর বোর্ড :

কর্তব্যবীর আলোমোহন দাশ,
চেয়ারম্যান ;

মিঃ ত্রিপতি মুখার্জী,
ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ ;

মিঃ বিমলাপতি মুখার্জী ;

মিঃ নরসিংহ পাল ;

মিঃ শিশিরকুমার দাশ ।

দেশবাসী মাত্রেই

বিশ্বাসভাজন

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা



বয়সের নজর আছে! খেতেও জ্ঞান, - দিতেও জ্ঞান

তাই বেয়াই এবার পূজার তত্ত্বে যত খাবার পাঠাইয়াছেন—সবগুলিই
ভীম নাগের

ভীম নাগের সন্দেশ

পূজা-পার্বণে ও উৎসব-ানে
অপরিহার্য

চিরদিনই অপরাজিত ও অপরাভেক্ষ

ভীম নাগের ঘি'এর খাবার

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়
বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়।

পূর্বাঙ্কে অর্ডার দিলে ও অগ্রিম পাঠাইলে সর্বত্রই পাঠান হয়

ভীম নাগ

৬ ও ৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোন : বি, বি, ১৪৬৫

৬৮, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
ডবানীপুর।
ফোন : পি, কে, ১১৭৭।

৪৬, ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা।
ফোন : বি, বি, ৩৩৭৮

এর ডেঙ্গে আর কি প্রমাণ চাই ?

No. 97347.



28th May 1944.

R.V. BRIGGS & CO. LTD.

ANALYTICAL CONSULTING AND TECHNICAL CHEMISTS

TELEGRAPHIC ADDRESS
ANALYTICAL CALCUTTA
Telephone No. 2224 Calcutta

3 & 4, GARSTIN PLACE
CALCUTTA

DIRECTORS:
JAM. BARTLETT F.R.S.E., F.R.S.M.
R.V. BRIGGS F.R.C.
G.J. BRIGGS F.R.C.

POST BOX NO. 278

22

Certificate of Examination

We hereby certify that a sample of BARLEY, contained in an original 1 lb. tin, SUBMITTED to us on the 27th March 1944 by Messrs THE NEW STANDARD BARLEY MANUFACTURING CO., 105 Cotton Street, Calcutta, has been examined with the following results:-

MICROSCOPIC EXAMINATION:

Origin of Starch ... Barley.

CHEMICAL EXAMINATION:

Water	7.01 %
Fat	1.86 %
Protein	8.42 %
Fibre	0.10 %
Ash	1.32 %
Carbohydrates (Starch etc)	81.30 %
			<u>100.00</u>

Odour & Taste ... Good and fresh
Acid Value of fat.. ... 20.1

REMARKS: In our opinion the above described sample of Barley is pure and of good quality.

[Signature]
Director.

INFORMATION ACCOMPANYING SAMPLE:

Label on container:

- SUN -

BARLEY POWDER

* (picture of Sun)

The New Standard Barley Manufacturing Co.

INDIA.

24

‘সান বার্লি’ কেনাই তো ভালো !

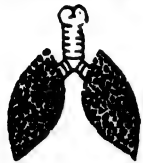
For Quality Printing And Prompt Delivery

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE Ltd.

STANDS FOR !!!

90, LOWER CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA

ফুসফুস সাবধানে রাখুন



"শঙ্কর"
মার্কা



স্বাস্থ্য, শক্তি

হাঁসানি, ইনফ্লুয়েঞ্জা
সবকিছু ফুসফুস
সংক্রান্ত ব্যাধির
প্রাথমিক ওষধ

লেমিচুরা

শিশু ও রোগীর পক্ষে
একমাত্র নিষেধক পথ্য

প্রস্তুতকারক

এন. সি. গুই

অফিস-২০৬, কলকাতা স্ট্রীট, প্রামাণী বাজার
কলকাতা

NAP

—বাচি

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত

শাদাকালো (টকি নাটক)—২৥০

শ্রীঅর বিন্দু-প্রসঙ্গ—১৥০

সূর্যামুখী (কবিতা)—০২৥

যে কোনো প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য

**SAVE TO
EARN**



**EARN TO
SAVE**

MERCANTILE EXCHANGE BANK Ltd.,

P-7, Mission Row, Extn. CALCUTTA.

Phone: CAL. 3839.

Branch: RANAGHAT.

Managing Director: Mr. J. N. Sen.

বিষয় - সূচী — পূর্ণাঙ্গ হু ব্ তি

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কপাস্তর (গল্প)	শ্রীনবেন্দ্রনাথ শিত্র	২৭১	ডাবউইন	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	
তোমাবই (উপন্যাস)	শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়	২৭৩	পরলা এপ্রিল	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	
নবীন ঘোষাল (গল্প)	শ্রী অসমন্ত মুখোপাধ্যায়	২৭৬	গান	শ্রীআভা দেবী	২৭২
পুস্তক ও আলোচনা		২৭৮	সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা		২৮০
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	শ্রীঅমল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়		আবাহন ;		
গল্পের মজলিশ			মহাযুদ্ধের গতিপথে—		
বানশাঠী গল্প	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য		সোভিয়েট-কমানিয়ান যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ; রুশ-ফিন সন্ধি ;		
Racial History of			পোলিশ সমস্তা ; বুলগেরিয়ার অবস্থা ; আলোচনা ;		
India	শ্রীঅমল্যভূষণ সেন		গান্ধী-জিন্না আলোচনা ; বোম্বাই বিক্ষোভের তদন্ত		
মাটির পৃথিবী	শ্রীরণজিৎকুমার সেন		কমিশনের রিপোর্ট ।		

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও দেশবাসী সর্বসাধারণকে
আমাদের শারদীয় প্রীতি-সন্তোষণ জ্ঞাপন করি ।

চিত্র-সূচী

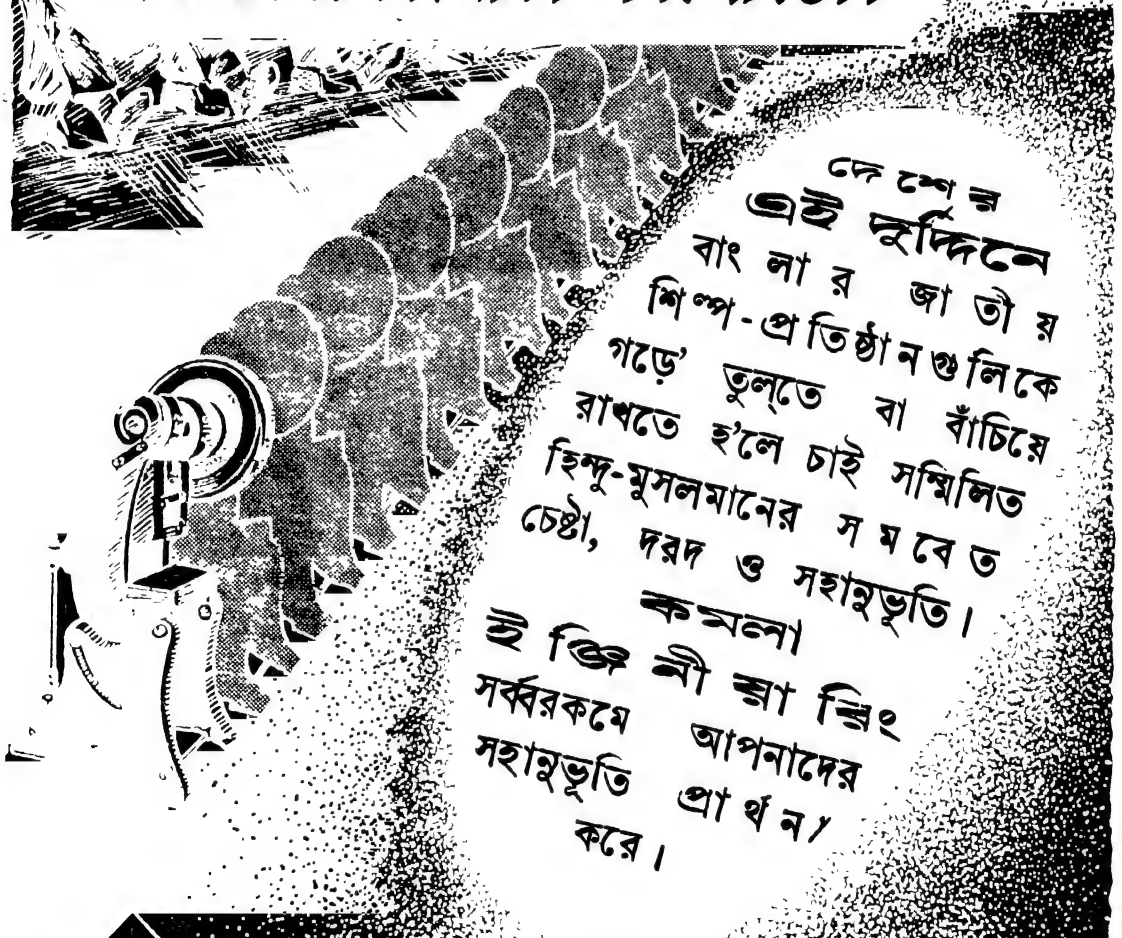
চিত্রবর্ণ—	পদধ্বনির প্যাচ :	২৪৭
হন-গৌরী	শিল্পী—শিবপদ ভৌমিক	ছাদে কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে, তারই আঁচল ওটা । এতেই ভয় পেলে ?...
একবর্ণ—		বাড়ী নিশ্চিহ্ন । হঠাৎ পাশের ঘরে মেজ ঠাকুরঝি হৈকে উঠলেন, “কে ‘নাচের’ কব্যাট খুলছে রে ? কে— অনুতপ্ত হয়ে নতুন দিদিমা বললেন, ‘ভুল করে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়েছি’...”
প্রবন্ধাস্তর্গত চিত্র—		
ইউরোপীয় শিল্পে ক্রমোন্নতি :	২০৭ প্রেমের ফাঁদ :	২৬১
ম্যাডোনা ; হোলী ক্যামিলী (মাইকেল এঞ্জেলো) হোলী		তিন বন্ধুতে বসে জুতা পালিশ করছে...
ফ্যামিলী (গোয়া) ; যিশুখৃষ্ট কর্তৃক মহাজনদের বিতাড়ন ;		মেয়েটি চমকে...কেন ?
নাবী (অজন্তা) ।		“বাবা, আমি আরেকজন ভ্রলোককে নিয়ে এসেছি ।”

ইন্সটিটিউট টি কে :
৪, বাজা উ ডমন্ট স্ট্রীট, কলি:

২ চরা ও পাহাড়ী যারদারগানের
একমা নির্ভরযোগ্য ডিউটান



TRIUMPHANT MARCH



দে শে র
এই দুদিনে
বাংলা র জাতীয়
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে
গড়ে তুলতে বা বাঁচিয়ে
রাখতে হ'লে চাই সম্মিলিত
হিন্দু-মুসলমানের সমবেত
চেষ্টা, দরদ ও সহানুভূতি।
কামলা

ইঞ্জিনিয়ার্স
সর্বরকমে আপনাদের
সহানুভূতি প্রার্থন।
করে।



KAMALA ENGINEERING WORKS

SPECIALISTS IN PUNCHING PRESS & SHEET METAL DIES

14, HALSI BAGAN ROAD, CALCUTTA.

PHONE

38536

FOR A FLAVOUR THRILL,



LORD TEA CO.

H.O. 137, CANNING STREET.

SALE DEPOTS.— *12, CLIVE STREET &
SEALDAH MARKET. (1st FLOOR)*

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার নাম এবং উহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম

স্বীকৃতি দায়ী চরিত্র

প্রবন্ধের পরিচয়—

আমাদিগের এই প্রবন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি প্রবন্ধমালায় অংশ
মাত্র।

উক্ত প্রবন্ধমালায় নিম্নলিখিতক্রমে পাঁচটি প্রবন্ধ থাকিবে,
যথা :

- (১) বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্তার নাম এবং উহা
সমাধানের সঙ্কেতের নাম
- (২) মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার
সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা
- (৩) মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠনের
মূল নীতি-সূত্র (fundamental principles)
- (৪) মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন
সাধন করিবার পবিকল্পনা (plan)
- (৫) মনুষ্য-সমাজের বর্তমান অবস্থার উহা সমস্তা-সমাধানের
সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা।

এই প্রবন্ধমালা ভারতীয় স্ববিগণের লেখাসমূহের বিভিন্ন
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে। যাহা ভারতীয় স্ববিগণের
লেখ্য বিবন্ধ অথবা যে সমস্ত কথা ভারতীয় স্ববিগণের লেখ্য
পাওয়া যায় না সেইরূপ একটি কথাও এই প্রবন্ধমালায় স্থান
পাইবে না।

প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য—

বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্তার সমাধান কবিত্তে হইলে যে যে
প্রণালী সংগঠনের প্রয়োজন হইবে সেই সেই শ্রেণীর সংগঠনের
মুখ্য পরিকল্পনা মানবসমাজে সমুখে উপস্থিত করা আমাদিগের
এই প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধমালায় পাঁচটি প্রবন্ধে
যে যে নাম লেখা হইয়াছে সেই সেই নাম হইতে আমাদিগের
প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য কি কি তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদিগের এই প্রবন্ধের বক্তব্যের বিষয় প্রধানতঃ আদি
প্রবন্ধ

১। প্রথম বক্তব্য—

- (১) সমস্তা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ; যথা :—
এক—সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্তমান মহাবুদ্ধি।

দুই—সমগ্র মানবসমাজব্যাপী দারুণ অভাব।

মানুষের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষণীয় তাহা কোন শ্রেণীর কোনটি
পাওয়া কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের মনে যে অবস্থার
উদ্ভব হয় সেই অবস্থার নাম (মানুষের অভাবের অবস্থা অথবা)
মানুষের “অভাব”।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয় মূলতঃ সর্বসমেত ছয় শ্রেণীর। এই
হিসাবে মানুষের অভাবও মূলতঃ সর্বসমেত ছয় শ্রেণীর হইয়া
থাকে।

মানুষের ছয় শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার বিষয়ের নাম—

- (১) ধন, (২) স্বাস্থ্য, (৩) সম্মান,
(৪) প্রতিষ্ঠা, (৫) পবিত্রত্ব, (৬) জ্ঞান (অর্থাৎ বুঝিবার
শক্তি)।

মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাবের নাম—

- (১) ধনাভাব অথবা দারিদ্র্য ;
(২) স্বাস্থ্যভাব অথবা ব্যাধি ;
(৩) সম্মানাভাব অথবা অসম্মান ;
(৪) প্রতিষ্ঠাভাব অথবা অপ্ৰতিষ্ঠা ;
(৫) পবিত্রত্বের অভাব অথবা কু-তৃপ্তি ,
(৬) জ্ঞানাভাব অথবা কুজ্ঞান।

(২) প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর
আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে অভাব ষৎপদোন্নতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৩) আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তা
অসংখ্য। আপাতদৃষ্টিতে সমস্তার সংখ্যা অসংখ্য হইলেও বস্তুতঃ
পক্ষে সমস্তার সংখ্যা দুই শ্রেণীর। দুই শ্রেণীর সমস্তার সমাধান
হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর সমস্তার সমাধান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

২। দ্বিতীয় বক্তব্য—

(১) বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাবশতঃ বর্তমান মনুষ্য-
সমাজ শাস্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে বাসের অযোগ্য হইয়াছে।

(২) বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার সমাধান সাধনে
বিলম্ব হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে বাসের
অযোগ্য হইবার আশঙ্কা আছে।

(৩) অনতিবিলম্বে সমস্তার সমাধান হওয়া একান্তভাবে
প্রয়োজনীয়।

৩। তৃতীয় বক্তব্য—

(১) বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার সমাধান করিতে হইলে মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ এবং মানুষের সর্বশ্রেণীর অভাব যাগাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার সমাধান করিতে হইলে সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা এবং সর্বশ্রেণীর অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক ভাবে সাধন না করিয়া যুগপৎভাবে সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

৪। চতুর্থ বক্তব্য—

(১) সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ এবং সর্বশ্রেণীর অভাব যুগপৎভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যুগপৎভাবে সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাগাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহাব ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাগাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রকৃত অবসান সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং হইবে না।

(৩) সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যাগাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন না করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্তমান মহাযুদ্ধের অবসান সাধন করা বিপজ্জনক। দুঃদর্শী ও দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত কোন মানুষের উহা চেষ্টা করা উচিত নহে।

৫। পঞ্চম বক্তব্য—

(১) সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতিতে শত্রুতা ও মিত্রতা, লাভ ও লোকসান, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য, ব্যাধি ও ব্যাধিহীনতা, সম্মান ও অসম্মান, ধনাভাব ও ধনপ্রাচুর্য্য, প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি ও অপরিতৃপ্তি, বিচারশীলতা ও বিচারহীনতা যুগপৎভাবে ঘটিতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতি বর্জন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতিতে শত্রুতা, লোকসান, অস্বাস্থ্য, ব্যাধি, অসম্মান, ধনাভাব, অপ্রতিষ্ঠা, অপরিতৃপ্তি, ও বিচারহীনতা অসম্ভবযোগ্য হয় এবং যে সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র মিত্রতা, লাভ, স্বাস্থ্য, ব্যাধিহীনতা, সম্মান, ধনপ্রাচুর্য্য, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি এবং বিচারশীলতা অবশ্যস্বাভাবী হয় সেই সমস্ত কার্য্য-পদ্ধতির ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

৬। ষষ্ঠ বক্তব্য—

(১) মানবসমাজের বর্তমান অবস্থায় সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা বাহাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহা করিতে হইলে—

প্রথমতঃ—প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে ব্যাধির আরাম হইতেও পারে, এবং নাও হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রচলিত ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে মানসিক স্বাস্থ্য ও শাস্তি বজায় থাকিতেও পারে এবং নাও থাকিতে পারে। উহাতে মানুষের বিচারহীনতা অনিবার্য্য হয়।

তৃতীয়তঃ—প্রচলিত শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যপদ্ধতি, বিচার-পদ্ধতি, শাসন-পদ্ধতি, ও সামাজিক ব্যবহার-পদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহা প্রত্যেকটিতে মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্মান বজায় থাকিতেও পারে এবং নাও থাকিতে পারে। উহাতে শত্রুতা অনিবার্য্য হয়।

চতুর্থতঃ—প্রচলিত কাঁচা-মাল-উৎপাদন-পদ্ধতি বাণিজ্য-পদ্ধতি, শিল্প-পদ্ধতি এবং চাকুরী-পদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহার প্রত্যেকটিতে মানুষের ধনাভাব ও প্রতিষ্ঠার অভাব নিবারিত হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ—প্রচলিত সহর নির্মাণ-পদ্ধতি, সহর আলোকিত করিবার পদ্ধতি, ময়লা পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি, তাপ ও শীতলতা নিয়ন্ত্রিত করিবার পদ্ধতি, যাতায়াত সাধন করিবার পদ্ধতি, আদৌদ-প্রমোদ-পদ্ধতি এবং খেলা-ধুলা-পদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহার প্রত্যেকটিতে মানুষের স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি সাধন করা ও বজায় রাখা সম্ভব-যোগ্য হইতেও পারে এবং নাও হইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ—প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে মানুষের বিচারশীলতা নষ্ট হওয়া এবং বিচার-হীনতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

সপ্তমতঃ—বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করিয়া শাস্তিপ্রার্থী হইতে বাধ্য করিবার এবং পরাজিত পক্ষের শ্রাবণা ও অনুবিধা সর্বতোভাবে বিচার না করিয়া শাস্তি-সত্ত্ব স্থির করিবার পদ্ধতি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। উহাতে মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

৭। সপ্তম বক্তব্য—

(১) সর্বশ্রেণীর যুদ্ধের ও অভাবের আশঙ্কা বাহাতে যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহাব ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে যাগাতে মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্ববিধ অভাব এবং তাহাদের কারণসমূহ যুগপৎভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

(২) যাগাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তির ও তাহার কারণসমূহ সর্বতোভাবে মনুষ্যসমাজ হইতে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহাব

ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধের আশঙ্কা সর্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা কখনও সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

(৩) যাহাতে সর্ববিধ অভাবের ও তাহার কারণসমূহ সর্বতোভাবে মনুষ্যসমাজ হইতে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে মনুষ্য-সমাজের অভাবের আশঙ্কা সর্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না। অভাবের আশঙ্কা দূরীভূত ও নিবারিত না হইলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

৮। অষ্টম বক্তব্য—

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধ-প্রবৃত্তির যে সমস্ত কারণ অভিযুক্তি লাভ করে সেই সমস্ত কারণের মূল কারণ—মানুষের ঘেব (অর্থাৎ ঘৃণা ও পরজীকাতরতা) ও হিংসার (অর্থাৎ পরের অনিষ্ট সাধনে নিঃসঙ্কোচ ও কুঠাঙ্গীন হওয়ার) প্রবৃত্তি।

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর অভাবের যে সমস্ত কারণ অভিযুক্তি লাভ করে সেই সমস্ত কারণের মূল কারণ—জমি, জল, হাওয়ার এবং মানুষের অবয়বের পূর্ণাবয়ব কার্যের (অর্থাৎ অণুকারের কার্যের) ও খণ্ডাবয়ব কার্যের (অর্থাৎ সূত্রাকারের কার্যের) অসামঞ্জস্যের অবস্থা।

৯। নবম বক্তব্য—

(১) মনুষ্যসমাজে বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধপ্রবৃত্তির কারণসমূহ যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সমর-বলের প্রসাবতা সাধন করিয়া মনুষ্য-সমাজে শান্তি স্থাপনের অথবা শান্তি রক্ষার পবিকল্পনা বর্জন করিতে হইবে। সমর-বলের প্রসাবতা সাধন করিলে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি অথবা যুদ্ধ-প্রবৃত্তির কারণসমূহ কখনও দূরীভূত অথবা নিবারিত হইতে পারে না। পবস্ত, উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) মনুষ্যসমাজে বর্তমান অবস্থায় সর্ববিধ অভাবের কারণসমূহ যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসমূহ ও অবাধে খনিজ পদার্থের উত্তোলন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসমূহের প্রত্যেকটি এবং অবাধে খনিজ পদার্থের উত্তোলন প্রত্যেক শ্রেণীর অভাবের কারণের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

১০। দশম বক্তব্য—

(১) মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তির ও সর্ববিধ অভাবের কারণ সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার একমাত্র পন্থা—মানুষের সর্ববিধ পশুত্ব (অথবা পশুপ্রবৃত্তি) সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার এবং মনুষ্যত্ব সর্বতোভাবে বিকশিত করিবার ব্যবস্থা যাহাতে যুগপৎভাবে সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) মানুষের প্রবৃত্তি যে শ্রেণীর হইলে মানুষের কার্য-প্রবৃত্তি ঘেব-পরায়ণ (অর্থাৎ অপরের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ ও পরজীকাতরতা-পরায়ণ) এবং হিংসাপরায়ণ (অর্থাৎ অপরের অনিষ্ট সাধনে কুঠা ও সঙ্কোচাঙ্গীন) হইয়া থাকে সেই শ্রেণীর প্রবৃত্তিকে ‘মানুষের পশুপ্রবৃত্তি’ অথবা পশুত্ব বলা হয়।

পশুত্ববশতঃ মানুষের শত্রু-মিত্রভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং মানুষ বৈরিতা সাধক মিলন ও অমিলনের কার্য (অর্থাৎ দলাদলির কার্য) করিয়া থাকেন।

(৩) মানুষের প্রবৃত্তি যে শ্রেণীর হইলে মানুষের কার্য-প্রবৃত্তি ঘেবপরায়ণ অথবা হিংসাপরায়ণ হইতে পারে না ও হয় না এবং মানুষের বৈরিতা-সাধক দলাদলির কার্য সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, সেই শ্রেণীর প্রবৃত্তিকে মানুষের ‘মনুষ্যত্ব’ বলা হয়। মানুষের ‘মনুষ্যত্ব’ বিকশিত হইলে কাহারও সহিত তাঁহার অমিলনের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। প্রত্যেকের সহিত তাঁহার মিলনের প্রবৃত্তি বিকশিত হয়।

(৪) মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তির ও সর্ববিধ অভাবের কারণের আদি কারণ মানুষের ‘পশুপ্রবৃত্তি’।

১১। একাদশ বক্তব্য—

(১) মানুষের পশুত্ব ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি সর্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা বর্তমান মনুষ্যসমাজের বিধাস। এতাদৃশ বিধাসের কারণ—মনুষ্য-স্বভাব সন্থকে বর্তমান মনুষ্যসমাজেব জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমবৃদ্ধতা। বস্ততঃ পক্ষে উহা অসম্ভবযোগ্য নহে।

(২) প্রথমতঃ, মানুষের ইচ্ছা যাহাতে অতিক্রিত না হয়; দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছা পূরণের পদার্থ নির্বাচন যাহাতে অতিক্রিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচার-প্রসূত না হয় ও ভ্রমহীন বিচারপ্রসূত হয়; তৃতীয়তঃ, ইচ্ছা পূরণের পদার্থ-সমূহেব কোনটার যাহাতে কোনরূপ অভাব না হয় ও প্রাচুর্য্য থাকে; চতুর্থতঃ, ইচ্ছা পূরণের কার্য-পদ্ধতি যাহাতে অতিক্রিত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচার-প্রসূত না হয় ও ভ্রমহীন বিচার-প্রসূত হয়—এই চারিশ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলে—মানুষের সর্ববিধ ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবগম্যবী হয়।

(৩) মানুষের সর্ববিধ ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিতে হইলে এই ভ্রমগুলের স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থ সন্থকে ও মনুষ্য-স্বভাব সন্থকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিভুলতা ও সম্পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। এই ভ্রমগুলের স্বভাবজাত কোন পদার্থ সন্থকে অথবা মনুষ্য-স্বভাব সন্থকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমপূর্ণ হইলে মানুষের পশুত্ব দূর করা অথবা নিবারণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

১২। দ্বাদশ বক্তব্য—

(১) এই ভ্রমগুলের স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থ সন্থকে ও মনুষ্য-স্বভাব সন্থকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিভুলতা ও সম্পূর্ণতা সাধন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা বর্তমান মনুষ্যসমাজের

বিশ্বাস। এতাদৃশ বিশ্বাসের কারণ, পদার্থ-বিজ্ঞানে নিভুলভাবে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর দর্শন ও অধ্যয়ন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সেই শ্রেণীর দর্শন ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বর্তমান মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানের অভাব।

(২) মানুষের ‘পশুত্ব’ যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে এই ভূমণ্ডলের স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে ও মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শ্রেণীর নিভুলতা ও সম্পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই শ্রেণীর নিভুলতা ও সম্পূর্ণতা ভারতীয় ঋষিগণের লেখায় পাওয়া যায়।

(৩) ভারতীয় ঋষিগণের লেখায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শ্রেণীর সম্পূর্ণতা আছে তাহা বর্তমান মনুষ্য-সমাজ সর্বতোভাবে বিম্বিত হইয়াছেন। এই বিম্বতির কারণ ভারতীয় ঋষিগণের লেখা ভাষা সম্বন্ধে মানুষের বিম্বতি।

১৩। ত্রয়োদশ বক্তব্য—

(১) মানুষের সর্ববিধ ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার এবং ‘মনুষ্যত্ব’ সর্বতোভাবে বিকশিত করিবার ব্যবস্থা যাহাতে যুগপৎভাবে সাধিত হয় তাহা কবিবাব একমাত্র পন্থা—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠন করা।

(২) কোন একটি দেশের অথবা কোন একটি শ্রেণীর মানুষের ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা কবিত্তে হইলে, একদিকে সমগ্র মানবসমাজে প্রত্যেক দেশের, অতীতের এই দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

(৩) মানুষের ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূর করিতে অথবা নিবারণ করিতে না পারিলে তাহার প্রকৃত ‘মনুষ্যত্ব’ কখনও বিকশিত হইতে পারে না ও হয় না। মানুষের ‘পশুত্ব’ যাহাতে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বৎসঙ্গে সংগঠন সাধিত না হইলে কোন মানুষের ‘পশুত্ব’ দূরীভূত অথবা নিবারিত হওয়া অসম্ভবযোগ্য হয় এবং পশুত্বের বৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়।

১৪। চতুর্দশ বক্তব্য -

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের পশুত্ব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠন করা সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা বর্তমান মনুষ্য-সমাজের মনে হইতে পারে ; কিন্তু ঐরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(২) মানুষের ‘পশুত্ব’ যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় এবং মনুষ্যত্ব যাহাতে সর্বতোভাবে বিকশিত হয় তাহার সংগঠন মনুষ্যসমাজে এক সময়ে কার্য্যতঃ সাধিত হইয়াছিল এবং ছয় হাজার বৎসর আগে পর্য্যন্ত উহা সমগ্র মানবসমাজে সর্বতোভাবে বিস্তারিত ছিল—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

(৩) মানুষের ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইবার সংগঠন কি পদ্ধতিতে, সাধিত হইয়াছিল—তাহা জানিতে পারিলে ঐ সংগঠনের বাস্তব বিস্তারিততা যে সর্বতোভাবে বিশ্বাস-যোগ্য এবং উহা সাধন করা যে আধুনিক কালেও সম্ভবযোগ্য, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

১৫। পঞ্চদশ বক্তব্য—

(১) মানুষের ‘পশুত্ব’ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করিতে হইলে, এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্বভাবজাত পদার্থ সম্বন্ধে, মনুষ্য-স্বভাব সম্বন্ধে এবং সংগঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরোক্ত সম্পূর্ণতা সাধন করিবার একমাত্র পন্থা—ভারতীয় ঋষিগণের লেখার সাহায্য লওয়া।

(৩) মানুষের ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হইবার সংগঠন কোন শ্রেণীর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলে, মানবসমাজের পক্ষে কি প্রকারে ভারতীয় ঋষিগণের লেখা ভাষা সম্পূর্ণভাবে বিম্বিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে—তাহা বুঝা সম্ভবসাধ্য হয়।

(৪) ভারতীয় ঋষিগণের লেখার ভাষায় নিভুলভাবে প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হইলে, অধুনা ঐ ভাষায় প্রবেশের জ্ঞান যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই পদ্ধতি যাহাতে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং তাহাদিগের কোন লেখা যাহাতে কাঙ্ক্ষাকারের শৃঙ্খলাগত সম্বন্ধসূচক অবাস্তব কোন অর্থে গৃহীত হইতে না পারে, তাহাব ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

১৬। ষোড়শ বক্তব্য—

(১) মানুষের পশুত্ব সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার সংগঠন কবিত্তে হইলে, ঐ সংগঠনের ফলে প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত পশুত্ব দমন করিবার প্রবৃত্তি, শক্তি ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন ও করেন এবং কোন মানুষের যাহাতে কোন শ্রেণীর পদার্থের অভাব না হইতে পারে—তাহার দিকে লক্ষ রাখা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(২) প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত ‘পশুত্ব’ দমন করিবার প্রবৃত্তি, শক্তি ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন ও করেন তাহা করিতে হইলে মানুষ যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত ‘পশুত্ব’ দমন করিবার প্রবৃত্তি, শক্তি ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন ও করেন তাহার ব্যবস্থা যেমন করিতে হয় সেইরূপ আবার মানুষ যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে ‘মনুষ্যত্ব’ অর্জন করিবার শক্তি, প্রবৃত্তি ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন ও করেন তাহার ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয়।

১৭। সপ্তদশ বক্তব্য—

(১) সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত ‘পশুত্ব’ সর্বতোভাবে দূর করিতে ও

নিবারণ করিতে পারেন তাহার সংগঠন সাধিত হইলে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষের না হইলেও অধিকাংশ মানুষের পণ্ড-প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

(২) অধিকাংশ মানুষের পণ্ডপ্রবৃত্তি সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হইলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ হওয়া অথবা কোন শ্রেণীর অভাব হওয়া অসম্ভব হয়।

(৩) মনুষ্যসমাজে অভাব হওয়া অসম্ভব হইলে মানুষের ঐশ্বর্য ও সর্ববিধ সুখের বৃদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

(৪) মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মানুষের অস্বাভাবিক অভাব হওয়া অনিবাধ্য—এতাদৃশ যে মতবাদ বর্তমান মনুষ্যসমাজে প্রচলিত আছে, সেই মতবাদ মানুষের স্বভাব ও স্বভাবজাত পদার্থ-সমূহের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যু-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-পূর্ণতার পরিচায়ক।

১৮। অষ্টাদশ বক্তব্য—

দার্শনিক ভাষায় বর্তমান মনুষ্যসমাজেব সমস্যা নাম—“মনুষ্যের অভাব” এবং সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের সঙ্কেতের নাম “মানুষের পণ্ড সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন”।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা সমাধানে আমাদিগের প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজেব সমস্যা অত্যন্ত জটিল। মানবসমাজেব গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে এতাদৃশ জটিলতার পরিচয় আর কখনও পাওয়া যায় না।

সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী জল, স্থল ও আকাশের এতাদৃশ যুদ্ধেব কথা যে ইতিহাসে পাওয়া যায় না তাহা কেহ অস্বীকার কবিত্তে পারেন না।

খাদ্য ও অন্নাচ্ছ প্রয়োজনীয় জীবের যে শ্রেণীর অভাব এবং দুস্তার বিনিময়ে জীবের যে শ্রেণীর দুঃখাপ্যতা আজকালকাল মনুষ্য-সমাজে দেখা দিয়াছে, সেই শ্রেণীর অভাব ও দুঃখাপ্যতাব কথা আর কখনও শুনা যায় নাই।

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় ভূমণ্ডলেব প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবন যেক্রপ বিপদসঙ্কুল হইয়াছে সেইক্রপ বিপদসঙ্কুল প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবনে আর কখনও হয় নাই।

— সাময়িক বিভাগের যুদ্ধোজ্জনবশতঃ কাহার কখন বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া অনিশ্চিত বাসস্থানের তলাসে বাহির হইতে হইবে, তাহার যে শ্রেণীর ত্রাস এই যুদ্ধে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, সেই শ্রেণীর ত্রাসের কথা মনুষ্যসমাজে আর কখনও শুনা যায় নাই।

উপরোক্ত অবস্থার বিচার করিলে বর্তমান মানবসমাজের সমস্যা যে অভূতপূর্ব রকমের জটিলতাময়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না।

মানবসমাজের বর্তমান সমস্যা যে অভূতপূর্ব রকমের বিপদসঙ্কুল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ কবা যায় না বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান সাধিত না হইলে এই সমস্যা যে-শ্রেণীর ভীষণতায়ুক্ত ও বিপদসঙ্কুল হইবার আশঙ্কা আছে তাহার তুলনায় বর্তমান অবস্থার ভীষণতা ও বিপদসঙ্কুলতা অনেক কম।

অদূর ভবিষ্যতের অবস্থা কতদূর ভীষণ ও বিপদ-সঙ্কুল হইতে পারে তাহার অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। উহা অনুমান করিতে হইলে এতাদৃশ ভীষণ যুদ্ধের ও সর্বব্যাপী অভাবেব যুগপৎভাবে প্রাদুর্ভাব হওয়া কোন কোন কারণে ও কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহা বস্তুত করিতে হয়।

কোন কোন কারণে ও কি কি প্রকারে এতাদৃশ সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলে এই সমস্যা কতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পারে, তাহা নির্ধারণ কবা যায় এবং তখন এই সমস্যার সমাধান যে কতদূর দুরূহ, তাহাও বুঝা যায়।

মানবসমাজেব সমস্যা যতই দুরূহ হউক না কেন, জান-বিজ্ঞানেব সম্পূর্ণতা সাধিত হইলে কোন শ্রেণীর সমস্যাই সমাধান করা মানুষের অসাধ্য নহে। কিন্তু জান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা না থাকিলে অনেক শ্রেণীর সমস্যার সমাধানই মানুষের অসাধ্য হয়।

বর্তমান যুদ্ধের ও অভাবেব যুগপৎভাবে প্রাদুর্ভাব হওয়া কোন কোন কারণে ও কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবং এই সমস্যার সমাধান অদূর ভবিষ্যতে সাধিত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, এতৎসম্বন্ধীয় কোন কথাই প্রচলিত জান-বিজ্ঞানেব দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না।

একে ব্যাধি হ্রুতর, তাহার পর আবার চিকিৎসক ও ঔষধ দুঃখাপ্য—এই কারণে বর্তমান সমস্যা চিন্তাশীল মানুষের বিশেষ চিন্তার বিষয়।

প্রচলিত জান-বিজ্ঞানের দ্বারা মানবসমাজেব বর্তমান সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া ইহা সমাধানের জন্য আমরা যে সঙ্কেতেব কথা বলিতেছি, সেই সঙ্কেত অপরিহার্য-ভাবে প্রয়োজনীয়।

বর্তমান মনুষ্যসমাজে এতাদৃশ অভূতপূর্ব রকমের মহাযুদ্ধের ও সর্বব্যাপী অভাবেব যুগপৎভাবে প্রাদুর্ভাব হওয়া কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইতে পারিয়াছে তাহার বস্তুত করিতে বসিলে দেখা যায় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজে স্বাভাবিক অথবা ধনগত অথবা পরিতৃপ্তিগত অথবা সম্মানগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত (relating to stability) অথবা জ্ঞানগত কোন শ্রেণীর অভাব বাহাতে কোন

দেশের কোন মানুষের না ঘটিতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ বাহাতে ঐ ঐ বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রাচুর্য উপভোগ করিতে পারেন তাহা করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠন যখন বিদ্যমান থাকে এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তিগতভাবে যখন নিজ নিজ সর্ববিধ অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টাশীল হন, তখন সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ সংসারে প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষণীয় (অর্থাৎ স্বাস্থ্যগত, ধনগত, পরিতৃপ্তিগত, সম্মানগত, প্রতিষ্ঠাগত এবং জ্ঞানগত) পদার্থের সর্বতোভাবে প্রাচুর্য বিদ্যমান থাকে। তখন শত্রুতামূলক এতাদৃশ যুদ্ধ ত দূরের কথা, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অমিলনের চিহ্ন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না, পরন্তু সর্বতোভাবে আন্তরিক মিলন পূর্ণভাবে দৈনন্দিন্যমান থাকে।

এতাদৃশ অভূতপূর্ব রকমের মহাযুদ্ধের ও সর্বব্যাপী অভাবের প্রাকৃত্য হওয়া কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইতে পারে তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসারের সর্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূর্ভিত ও নিবারণিত হয় এবং বাহাতে সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য সর্বতোভাবে সুনিশ্চিত হয় তাহার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও ব্যক্তিগত চেষ্টা বর্তমান পর্যন্ত মানব-সমাজে বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্যন্ত কোন দেশের কোন সংসারে কোন শ্রেণীর অভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অমিলনের প্রবৃত্তিও থাকিতে পারে না এবং থাকে না।

সমগ্র মানবসমাজের কোন দেশের কোন সংসারে কোন শ্রেণীর অভাব বিদ্যমান নাই, সমগ্র মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অমিলনের প্রবৃত্তি নাই, সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসারে প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে প্রাচুর্য আছে, এবং সমগ্র মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রত্যেকের মনে পরস্পরের সঙ্গে আন্তরিক মিলনের প্রবৃত্তি আছে—এইরূপ অবস্থা যখন মানবসমাজে দেখা দেয়, তখন সমগ্র মানবসমাজ স্বতঃই সর্বতোভাবে স্বাধীন উপভোগ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শাসন-কার্য্যেব প্রয়োজন কমিয়া যায়।

যখন সমগ্র মানবসমাজ স্বতঃই সর্বতোভাবে স্বাধীন উপভোগ করিতে থাকেন এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শাসন-কার্য্যের প্রয়োজন কমিয়া যায়, তখন বিশেষভাবে সতর্ক না হইলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কার্য্য-পরিচালকগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা-প্রবৃত্তির হ্রাস ও আশ্রয়-প্রমোদ প্রবৃত্তির আধিক্য উদ্ভূত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কার্য্য-পরিচালকগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা-প্রবৃত্তির হ্রাস ও আশ্রয়-প্রমোদ-প্রবৃত্তির আধিক্যের উদ্ভব হইলে সমগ্র মানবসমাজের মিলিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনে শাসন-কার্য্যে শিথিলতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

সমগ্র মানব-সমাজের মিলিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শাসনকার্য্যে শিথিলতার উদ্ভব হইলে সমগ্র মানবসমাজের মিলিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিনাশ হওয়া এবং প্রত্যেক দেশে পৃথক পৃথকভাবে দেশীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। প্রত্যেক

দেশে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে ঘেঁষ-হিংসার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে ঘেঁষ-হিংসার উদ্ভব হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকৃতির উদ্ভব হওয়া এবং প্রত্যেক দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঘেঁষ-হিংসার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকৃতির ও ঘেঁষ-হিংসার উদ্ভব হইলে মানুষের জ্ঞানগত ও স্বাস্থ্যগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞান-গত ও স্বাস্থ্যগত অভাবের উদ্ভব হইলে পরিতৃপ্তিগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত ও পরিতৃপ্তিগত অভাবের উদ্ভব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঘেঁষ-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত ও পরিতৃপ্তিগত অভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘেঁষ-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে ধনগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। ধনগত অভাবের উদ্ভব হইলে সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের উদ্ভব হইলে মারামারি প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে, জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত, ধনগত, তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় অনিবার্য্য হয়। জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত, ধনগত, তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয়। মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্য-জাতির মধ্যে প্রথম যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন উহা খুব ব্যাপক অথবা তীব্র হয় না। মনুষ্যজাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জ্ঞানগত, স্বাস্থ্যগত, ধনগত, তৃপ্তিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত অভাবের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ক্রমশঃ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। সর্বশ্রেণীর অভাবের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যত বৃদ্ধি পায়, মনুষ্যজাতির যুদ্ধের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা তত বৃদ্ধি পায়।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে সর্বতোভাবে দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান কখনও মানুষের হিত সাধন করিতে সক্ষম নহে এবং যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আশ্রয় করিলে পদে পদে নানা রকমের বিষ অনিবার্য্য হয়, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হয়। মনুষ্যসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতাদৃশ অবস্থাকে “জ্ঞানগত দারিদ্র্য” অথবা “কু-জ্ঞানের অবস্থা” বলা যাইতে পারে।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষের শরীর পাশবিক বলের ব্যবহারের প্রবৃত্তিযুক্ত, ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্য করিবার অক্ষমতায়ুক্ত, মন সর্বদা চাকল্যযুক্ত এবং বুদ্ধি প্রায়শঃ বিচারশক্তিহীনতা অথবা মতবাদ-প্রবণতা অথবা সংস্কার-প্রবণতা অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচার-শীলতায়ুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থা সত্ত্বেও মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কি অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া শরীরের পাশবিক বলের সামর্থ্যের বিদ্যমানতাবশতঃ

নিজেকে স্বাস্থ্যবান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানগত দারিদ্র্যবশতঃ চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত মানুষের স্বাস্থ্যের এতাদৃশ অবস্থাকে তাঁহার স্বস্থ অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের স্বাস্থ্যের এতাদৃশ অবস্থাকে “স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য” অথবা “স্বাস্থ্য-ব্যর্থির অবস্থা” বলিতে হয়।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন ‘ধন’ বিষয়ে, মানুষ ‘মুদ্রা’কে ধন বলিতে আরম্ভ করেন এবং মুদ্রার সংখ্যাচার্য্য ধনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া থাকেন। মুদ্রার বিনিময়ে আহাৰ্য্য ও বিহারের অভীষ্ট দ্রব্যসমূহের অনেক দ্রব্য আদৌ অথবা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভবযোগ্য না হইলেও মুদ্রা থাকিলেই মানুষ নিজেকে ধনী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধনবিষয়ে জ্ঞানগত দরিদ্রতা নিবন্ধন কাঁচামাল-উৎপাদনের যে সমস্ত পদ্ধতি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির এবং জল ও হাওয়াব স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার শক্তির ক্ষমতাবী এবং অস্বাস্থ্যকর কাঁচামালের উৎপাদক, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিল্পকার্য্যের, বাণিজ্যকার্য্যের এবং চাকুরীর যে সমস্ত পদ্ধতিতে ঐ ঐ বিষয়ক শ্রমিকগণের ও অজ্ঞাত কৃষিকগণের ধনাভাব, স্বাস্থ্যভাব, তৃপ্তির অভাব, সম্মানভাব এবং প্রতিষ্ঠার অভাব অনিবার্য্য হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করেন এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের ধন-বিষয়ক এতাদৃশ অবস্থাকে “ধনগত দারিদ্র্য” অথবা “মজ্জাগত অসাধুতা” অবস্থা বলিতে হয়।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা বিষয়েও মানুষের বুদ্ধি বিপণীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। বাহা বাহা মানুষের উত্তেজনা সাধন করে তাহাতে যে পরস্পরেই বিবাদ অনিবার্য্য তাহা বিম্বৃত হইয়া—উত্তেজনায় পদার্থকে মানুষ পরিতৃপ্তিব পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বাঁহারা কপটতা, মিথ্যাকথা, প্রতারণা ও মানুষের মধ্যে দলদলি সাধন করিবার শিরোমণি হইয়া দলপতি হইতে পারেন তাঁহারা সমাজের কোন কোন অংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। বাঁহারা বস্তুতঃ পক্ষে জনসাধারণের দাসত্ব করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং বিশ্বাসঘাতক কণ্ঠচাীর মত নিজ নিজ দায়িত্ব বিন্যস্ত হইয়া নিজদিগকে জনসাধারণের সেবক মনে না করিয়া জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও জনসাধারণের সংষ্টি অর্জন করিবার পরিবর্তে অসংষ্টির বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও নিজদিগকে সম্মানভাজন বলিয়া মনে করেন এবং সমাজের একাংশ তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

বাঁহারা জুয়াচুরী, শঠতা, মিথ্যাকথা ব্যবহার করিয়া এবং মানুষের শরীরের, মনের ও বুদ্ধির সর্বনাশকর দ্রব্যসমূহের সর্বনাশকরভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া কতিপয় লক্ষসংখ্যক মুদ্রাৰ্জন করিতে পারেন তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার ফলে মানুষের মধ্যে ঘে,

হিংসা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যাব্যবহার, বন্দকলহ প্রভৃতি অনিবার্য্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার সেবা করিয়া এবং ঘেব-হিংসার বৃদ্ধি সাধন করিয়া বাঁহারা মুদ্রাৰ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

বাঁহারা শিক্ষার নামে শিশুগণের ভগবানের সেওয়া বিচারশক্তিকে বিচারহীন মতবাদ মুখস্থ করিবার শক্তিতে ও সংযমশক্তিকে উত্তেজনাশক্তিতে পরিণত করিয়া থাকেন এবং শিশুগণকে মানুষ করিবার পরিবর্তে অমানুষ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

বাঁহারা মানুষের চিকিৎসার নামে কার্য্যতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এমন কি সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকেন তাঁহারা পর্য্যন্ত সমাজের একাংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

মানুষের ধর্ম্মের নামে বাঁহারা মানুষের বুদ্ধিকে বিচারশক্তিহীন সংস্কারবিষ্ট করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে অক্ষম করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, পিতামাতার সেবা ও মানুষের আহাৰ্য্যের ও বিহারের পদার্থসম্ভারের অর্জন হইতে বিরত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে পদার্পণ দিয়া থাকেন, এবং মানুষ ছোট, বড় ও জাতিহীন প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়া মানুষের মধ্যে ঘেব-প্রবৃত্তির বর্দ্ধন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও সমাজের একাংশের শ্রমভাজন হইয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠা বিষয়ে—মানুষের বাস আজ একস্থানে, কাল অপূর্ণ হানে; মানুষের জীবিকার্জনের ব্যবসায় আজ একটা, কাল আর একটা; আজ সম্মানিত, কাল অসম্মানের যোগ্য; আজ পরম বন্ধু কাল পরম শত্রু; আজ উল্লেখযোগ্য ধনী, কাল দেউলিয়া ও পথের ভিখারী; আজ স্বাস্থ্যবান, কাল মৃত্যুর কবলে—এইরূপ ভাবেব অস্থির অবস্থা চলিতে থাকে অথচ মানুষ এই অবস্থার পরিহাস বুঝিতে পারেন না।

অভাবসমূহের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাজক্ষণীয় বিষয়ে কোন্ কোন্ শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয় তৎসম্বন্ধে যে বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপ্ত করা হইল, সেই বিবরণের সহিত বর্তমান মানবসমাজের অভাবের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান মানবসমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর আকাজক্ষণীয় বিষয়ে দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়াছে।

* “অভাব” ও “দারিদ্র্য”—এই দুইটি শব্দ সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ দুইটি শব্দ সর্বতোভাবে একার্থক নহে।

বাহা বাহা পাওয়া মানুষের অভীষ্ট এবং প্রয়োজনীয় তাহার কোনটা পাওয়া কষ্টকর অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের অভাবের উদ্ভব হয়। দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে বাহা বাহা পাওয়া মানুষের প্রয়োজনীয় তাহা মানুষ বুঝিতে অক্ষম হন এবং বাহা বাহা পাইলে মানুষের অপকার হয় তাদৃশ পদার্থসমূহ মানুষ পাইবাব জন্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। মানুষের দারিদ্র্যের অবস্থার তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় কি কি তাহা তিনি নিতুলভাবে নির্ধারণ করিতে পারেন না। ঐ কারণে যে সমস্ত পদার্থ মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া

মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাজক্ষণীয় বিষয়ে উপযুক্ত শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে যুগপৎভাবে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী তীব্র যুদ্ধসমূহ অনিবার্য হইয়া থাকে।

মহাযুগসমাজের দারিদ্র্য ও ব্যাপক যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। একটীর উদ্ভব হইলে আর একটীর উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয়।

মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর আকাজক্ষণীয় পদার্থের প্রাচুর্যের অবস্থা এবং মানুষের পরস্পরের অকৃত্রিম মিলন-প্রবৃত্তির অবস্থা হইতে মনুষ্য-সমাজ যে উপরোক্ত পরিবর্তনধারার সর্ব-বিষয়ক দারিদ্র্যের এবং সর্বব্যাপী যুদ্ধ-প্রবৃত্তির অবস্থায় উপনীত হয় সেই পরিবর্তনধারা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উহা সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং কোনক্রমে অস্বীকারের যোগ্য নহে।

প্রাচুর্যের ও মিলন-প্রবৃত্তির অবস্থা হইতে যে যে পরিবর্তন-ধারার মনুষ্য-সমাজ সর্বতোভাবে দারিদ্র্য ও সর্বব্যাপী তীব্র যুদ্ধের অবস্থায় উপনীত হয়, সেই সেই পরিবর্তন-ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সর্বশ্রেণীর অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয় এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য হয়।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, নানা রকমের অভাবে জর্জরিত না হইলে, এইরূপ অভাবের মধ্যে অথবা এতাদৃশ অপমানের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার তুলনায় মরিয়া যাওয়া বরং ভাল—এতাদৃশ মনোভাবের উদ্ভব না হইলে, যে কাণ্ডে নিজের সম্মানসম্মতির ও আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ, ঘববাড়ী ও বাসস্থান পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে পারে সেই কাণ্ডে মানুষের মন প্রবৃত্ত হইতে পারে না ও হয় না।

ঐকদিগের অভ্যুদয়কাল হইতে গত আড়াই হাজার বৎসরের পৃথিবীর যে ইতিহাস পাওয়া যায় সেই ইতিহাসে যে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা আছে সেই সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেকটীর কারণ কি কি হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেকটীর মূল কারণ হয় তৃপ্তিগত-অভাব নতুবা সম্মানগত অভাব নতুবা প্রতিষ্ঠাগত অভাব নতুবা ধনগত অভাব।

থাকে সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ ব্যবহার করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন। যে সমস্ত পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ তাহার দারিদ্র্যের অবস্থায় ব্যবহার করেন বলিয়া দারিদ্র্যের অবস্থায় মানুষের স্বাস্থ্য অকালে ভয় হয়, অথচ ঐ পদার্থসমূহ যে মানুষের স্বাস্থ্যের অপহারক তাহা মানুষ বুঝিতে পারেন না। দারিদ্র্যের অবস্থায় যে সমস্ত বিপরীত পদার্থ মানুষের অভিলাষের বিষয় হয় সেই সমস্ত বিপরীত পদার্থ পর্যন্ত মানুষের পাওয়া কষ্টসাধ্য এবং সময় সময় অসাধ্য হয়।

মানুষের অভাবের অবস্থায় স্বাস্থ্যের অপহারক কোন পদার্থের কথা উদ্ভব হয় না। বাহা বাহা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে যে যে পদার্থ মানুষ পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন তাহার কোনটাব অভাবের নাম “মানুষের অভাব”।

কোন দেশের সমগ্র জাতির কোন না কোন শ্রেণীর অভাবের তীব্রতার উদ্ভব না হইলে—যে কোন শ্রেণীর যুদ্ধ-প্রবৃত্তির অথবা যুদ্ধের উদ্ভব হইতে পারে না ও হয় না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে এবং ঐ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

সর্বশ্রেণীর অভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ও যুদ্ধের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয়, এই কথা হইতে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ও যুদ্ধের উদ্ভব হয় কেন—তাহা বুঝা যায় বটে; কিন্তু, যুদ্ধ ও অভাব ব্যাপকতা লাভ করে কেন, তাহা বুঝা যায় না। যুদ্ধ ও অভাব ব্যাপকতা লাভ করে কেন—তাহা বুঝিতে হইলে অভাবের উৎপত্তি হয় কেন এবং অভাব হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে এবং কেন, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

অভাবের উৎপত্তি হয় কেন এবং অভাব হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন—এই দুইটা বিষয়ের সন্ধান করিতে পারিলে প্রথমতঃ, যুগপৎভাবে সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধের উদ্ভব ও সমগ্র মানবসমাজব্যাপী অভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছে কি প্রকারে এবং দ্বিতীয়তঃ, অদূর ভবিষ্যতে, বর্তমান মানবসমাজের সমস্তার সমাধান না হইলে, এই মানবসমাজ কোন শ্রেণীর বিপদ-সঙ্কল অবস্থায় উপনীত হইতে পারে—এই দুইটা বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝা হইবে।

মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা না বুঝিতে পারিলে মানুষের দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা বুঝা যায় না। ইহার কারণ—অভাবের তীব্রতার অবস্থা-বিশেষ দারিদ্র্যে পরিণত হয় এবং অভাবের উদ্ভব না হইলে দারিদ্র্যের উদ্ভব হইতে পারে না।

অভাবের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা না বুঝিতে পারিলে যেমন মানুষের দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা বুঝা যায় না—সেইরূপ আবার মানুষের সর্বতোভাবে প্রাচুর্য সর্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে কি প্রকারে তাহা না বুঝিতে পারিলে, মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয় কেন ও কি প্রকারে তাহা বুঝা যায় না। উহার কারণ—মানুষের প্রয়োজনীয় ও অভীষ্ট পদার্থসমূহের অভাবের নাম তাঁহার অভাব।

মানুষের সর্বতোভাবে প্রাচুর্য সাধিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে কি প্রকারে, তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য বাহাতে সর্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় তাহা করিতে হইলে মানুষের স্বাস্থ্য বাহাতে সর্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোনক্রমে কোনরূপ স্বাস্থ্যগত অভাবের উৎপত্তি বাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সর্বোত্তম সাধন করিতে হয়। মানুষের শরীর, ইঞ্জিনসমূহ, মন ও বুদ্ধি যতদূর মনুষ্যোচিতভাবে বজায় থাকে তাহা হইলে মানুষ বজায় থাকেন;* মানুষ বজায় থাকিলে মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য সাধন করিবার কথা উঠিতে পারে ও উঠিয়া থাকে।

*“মানুষ বজায় আছেন”—ইহা মনে করিতে হইলে প্রথমতঃ চাই মানুষের প্রাণবায়ুর প্রবাহ; দ্বিতীয়তঃ, চাই মানুষের শরীরের, ইঞ্জিনসমূহের, মনের ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থা; তৃতীয়তঃ, চাই

মানুষই যদি বজায় না থাকেন, তাহা হইলে মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য সাধন করিবার কোন কথা উঠিতে পারে না। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য সাধন করিবার প্রথম সোপান—মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য বাহাতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হয় এবং কোন শ্রেণীর স্বাস্থ্যগত অভাব বাহাতে কোনক্রমে উদ্ধৃত হইতে না পারে ও না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য বাহাতে সাধিত হয় তাহা করিবার দ্বিতীয় সোপান—মানুষের ধনগত প্রাচুর্য বাহাতে সর্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর ধনগত অভাব বাহাতে কোনক্রমে উদ্ধৃত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। মানুষের প্রাণ বজায় রাখিবার জন্ত আহার-বিহারাদি যে সমস্ত কার্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত কার্যের জন্ত যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত সামগ্রীকে “ধন” বলা হয়। ধন-গত প্রাচুর্য মানুষের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের প্রাণ রক্ষিত হইলেই যে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি মনুষ্যোচিতভাবে রক্ষিত হয় তাগ নহে। কিন্তু মানুষের প্রাণ রক্ষিত না হইলে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির এমন কি অবয়ব পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য নহে। কায়েই মানুষের স্বাস্থ্য বক্ষা করিতে হইলে সর্বাপেক্ষে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করিতে হইলে মানুষের প্রাণ রক্ষা করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে একদিকে জল বায়ু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং অঙ্গদিকে যে সমস্ত সামগ্রী মানুষের আহার-বিহারাদির জন্ত একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত সামগ্রীর প্রাচুর্য রক্ষা করা অপরিহার্যভাবে আবশ্যকীয়। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মানুষের ধনগত প্রাচুর্য বাহাতে সর্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর ধনগত অভাব বাহাতে কোনক্রমে উদ্ধৃত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা—মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য বাহাতে সাধিত হয় তাহা করিবার দ্বিতীয় সোপান।

মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত কার্য-শক্তি, কার্য-প্রবৃত্তি ও কার্য। ঐ তিনটা যুগপৎ যত্নপি মনুষ্যোচিত ভাবে বজায় না থাকে তাহা হইলে বাস্তব: মানুষের অবয়ব বিজ্ঞান থাকিলেও মানুষ বজায় আছেন ইহা মনে করা চলে না। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মনুষ্যোচিত কার্য-শক্তি, কার্য-প্রবৃত্তি ও কার্যের অভাব, মানুষের মনের মনুষ্যোচিত স্থিরতার অভাব, মানুষের বুদ্ধির মনুষ্যোচিত বিচার-শক্তির অভাব এবং এমন কি মানুষের মনুষ্যোচিত শরীরের অভাব সস্বৈর কেবলমাত্র অস্বাভাবিক রকমের বক্ষু:স্থল ও বাহ, অথবা অস্বাভাবিক রকমের ভুড়ি, অথবা অস্বাভাবিক রকমের লীর্ণতায়ুক্ত মানুষের আকৃতি থাকিলেই মানুষ বজায় আছেন—ইহা মনে করা চলে না।

মানুষের সর্ববিধ প্রাচুর্য বাহাতে সাধিত হয় তাহা করিবার তৃতীয় সোপান—মানুষের প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত এবং সম্মানগত প্রাচুর্য বাহাতে সর্বতোভাবে বজায় থাকে এবং প্রতিষ্ঠাগত হউক, তৃপ্তিগত হউক অথবা সম্মানগত হউক, কোন শ্রেণীর অভাব বাহাতে কোনক্রমে উদ্ধৃত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠাগত প্রাচুর্য সাধিত না হইলে তৃপ্তিগত প্রাচুর্য সাধিত হইতে পারে না এবং তৃপ্তিগত প্রাচুর্য সাধিত না হইলে সম্মানগত প্রাচুর্য সাধিত হইতে পারে না।

প্রতিষ্ঠাগত প্রাচুর্য বলিতে বুঝায় মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকাকর্জনের বৃত্তি, অবস্থা (ধনগত, কর্মগত ও জ্ঞানগত) এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে স্থায়িত্ব। আজ এক রকমের স্বাস্থ্য, কাল আর এক রকমের স্বাস্থ্য; আজ এক স্থানে বাস, কাল আর এক স্থানে বাস; জীবিকাকর্জনের জন্ত আজ এক রকমের বৃত্তি, কাল আর এক রকমের বৃত্তি; আজ ধনী, কাল দরিদ্র, আজ অতিরিক্ত কর্মে ব্যস্ত, কাল বেকার অথবা অলস; আজ বিদ্যাচর্চায় নিরত, কাল বিদ্যাচর্চায় অক্ষমতা—এতাদৃশ অস্থায়ী অবস্থার নাম প্রতিষ্ঠাগত অভাব।

যুগপৎভাবে, শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আরাম, মনের স্থিরতা ও শান্তি, বুদ্ধির ধীরতা ও বিচারশক্তি রক্ষিত হইলে মনের যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সেই অবস্থার নাম তৃপ্তি। মানুষের যখন জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হয় তখন ঐ চারিটির (অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির) যে কোন একটার আরাম হইলেই মানুষ তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন। বস্তুত: পক্ষে যুগপৎভাবে চারিটির আরাম না হইয়া কোন একটার আরাম হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহা তৃপ্তির অবস্থা নহে; উহা “উত্তেজনার অবস্থা”। ঐ-জাতীয় তৃপ্তির সহিত বিবাদ অস্বাদী ভাবে জড়িত। বাহা প্রকৃত তৃপ্তি তাহার সঙ্গে বিবাদ থাকিতে পারে না ও থাকে না।

প্রচলিত ভাষায় একজনের সহিত আর একজনের তুলনামূলক উৎকর্ষকে অথবা উৎকর্ষকে সম্মান বলা হয়। আমরা যাহাকে সম্মানগত প্রাচুর্য অথবা সম্মানগত অভাব বলিয়া থাকি তাহার “সম্মান” প্রচলিত ভাষায় “সম্মানের” সহিত সর্বতোভাবে একার্থক নহে। আমাদের লেখায় সম্মানশব্দে একজন মানুষের অবস্থার সহিত আর এক জন মানুষের অবস্থার কোন তুলনার কথা থাকে না। ইহাতে থাকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিনের অবস্থার তুলনা। পূর্ববর্তী জীবনের অবস্থার তুলনায় পরবর্তী জীবনের অবস্থা যখন সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন মানুষ সম্মানের বোণা হইয়া থাকেন।

মানুষের প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত এবং সম্মান-গত প্রাচুর্য যুগপৎভাবে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মানুষের ধন-গত প্রাচুর্য না থাকিলে বেকরপ তাঁহার পক্ষে প্রাণ রক্ষা করা অথবা তাঁহার শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের এবং বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ আবার মানুষের প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য না

থাকিলে তাঁহার শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির কৰ্ম-ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের স্বাস্থ্য সৰ্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে হইলে সৰ্ব্ব-প্রথমে যেরূপ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করা এবং শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির অবয়ব রক্ষা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার ঐ শরীর প্রভৃতির কৰ্ম-ক্ষমতা রক্ষা করাও অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

কাজেই, মানুষের স্বাস্থ্য-গত প্রাচুর্য্যের জগ্গই তাঁহার প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মানুষের প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত অভাব বাহাতে কোনক্রমে উদ্ধৃত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা মানুষের সৰ্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য বাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিবার তৃতীয় সোপান।

মানুষের সৰ্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য বাহাতে সাধিত হয়, তাহা করিবার চতুর্থ সোপান—মানুষের জ্ঞান-গত প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোন শ্রেণীর জ্ঞান-গত অভাব বাহাতে কোনক্রমে উদ্ধৃত না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা। মানুষ তাঁহার মনুষ্যোচিত শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধির বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা তাঁহার মনে বাহা বাহা অৰ্জন করিয়া থাকেন তাহার প্রত্যেকটাকে এক এক বিষয়ক মানুষের এক একটা জ্ঞান বলা হয়। মনুষ্যোচিত শরীর, অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ, অথবা মন, অথবা বুদ্ধি না থাকিলে মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা মানুষের মনে বাহা বাহা অৰ্জিত হয় তাহার কোনটাকে মানুষের “জ্ঞান” বলিয়া অভিহিত করা চলে না। উহার প্রত্যেকটা হয় অজ্ঞান নতুবা কুজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

মানুষের স্বাস্থ্যগত, ধনগত, প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য এবং ঐ ঐ বিষয়ক অভাবের নিবারণ সাধন করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর যে যে বিজ্ঞা অৰ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই শ্রেণীর সেই সেই বিজ্ঞা সৰ্ব্বতোভাবে অৰ্জন করিতে পারিলে জ্ঞানগত প্রাচুর্য্য সাধন করা হয়।

জ্ঞান-গত প্রাচুর্য্য সাধিত না হইলে মানুষের স্বাস্থ্য-গত অথবা ধন-গত অথবা প্রতিষ্ঠা-গত অথবা তৃপ্তি-গত অথবা সম্মান-গত প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না।

মানুষের সৰ্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ, সৰ্ব্ববিধ স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সৰ্ব্ববিধ স্বাস্থ্যগত অভাব বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হইতে পারে ও হয়; দ্বিতীয়তঃ, সৰ্ব্ববিধ ধনগত প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সৰ্ব্ববিধ ধনগত অভাব বাহাতে

সৰ্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হইতে পারে ও হয়; তৃতীয়তঃ, সৰ্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত ও সম্মানগত প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সৰ্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠাগত, তৃপ্তিগত, ও সম্মানগত অভাব বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হইতে পারে ও হয়; চতুর্থতঃ, সৰ্ব্ববিধ জ্ঞানগত প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে ও হয় এবং সৰ্ব্ববিধ জ্ঞানগত অভাব বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হইতে পারে ও হয়—এই চারিটা কার্য্য যুগপৎভাবে সাধন করিবার সংগঠন করা এবং ঐ সংগঠন অনুসারে কার্য্য-পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত চারিটা কার্য্য বাহাতে যুগপৎভাবে সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার সংগঠন করিতে না পারিলে ও না করিলে এবং ঐ সংগঠন অনুসারে কার্য্য-পরিচালনা করিতে না পারিলে ও না করিলে মানুষের সৰ্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের অভাবের উদ্ভব হয় কেন তাহা বুঝিতে হইলে ইহা মনে রাখিতে হয় যে, মানুষের সৰ্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ, সৰ্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে সাধিত হয় এবং সৰ্ব্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সৰ্ব্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হয় তাহার সংগঠন করা, দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত সংগঠন অনুসারে বাহাতে কার্য্য পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত সংগঠনের অথবা সংগঠনানুসারে কোন কার্য্য-পরিচালনার কোনরূপ ক্রটি হইলে মানুষের অভাবের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

মানুষের অভাবের উদ্ভব হয় কেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে সংগঠন পরিচালনার কার্য্য কি কি তাহা বিশদভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ—সংগঠন-পরিচালনার কোন একটা কার্য্যে ক্রটি ঘটিলে মানুষের অভাবের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সংগঠন-পরিচালনার কার্য্য কি কি তাহা আমরা বৰ্ত্তমান বিশদভাবে আলোচনা করিব। এখানে উহার বিশদ আলোচনা নিম্নয়োজনীয়।

মানুষের সৰ্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সৰ্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে উপরোক্ত সংগঠন-পরিচালনায় যে সমস্ত কার্য্য প্রধানভাবে সাধন করিতে হয় আমরা এখানে কেবলমাত্র সেই সমস্ত কার্য্যের আলোচনা করিব। মানুষের সৰ্ব্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সৰ্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে তাহার সংগঠন পরিচালনা-কার্য্যে কোন কোন কার্য্য প্রধানভাবে সাধন করিতে হয় তাহা জানা থাকিলে মানুষের অভাবসমূহের ও দারিদ্র্যের উদ্ভব হইবার প্রধান কারণ কি কি তাহা বুঝা যায়। মানুষের অভাবসমূহের ও দারিদ্র্যের উদ্ভব হইবার প্রধান কারণ কি কি তাহা বুঝিতে পারিলে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্তার (অর্থাৎ সমগ্র ভূ-মণ্ডলব্যাপী যুদ্ধের ও সমগ্র মানব-সমাজব্যাপী দারিদ্র্যের) কারণ কি কি তাহা বুঝা যায়। বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্তার কারণ কি কি তাহা

বুঝিতে পারিলে, অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্তার সমাধান না হইলে বর্তমান মনুষ্য-সমাজ কোন অবস্থায় উপনীত হইতে পারে তাহা বুঝা যায়।

মানুষের সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে মানুষের সর্ববিধ অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

মানুষের সর্ববিধ অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে সতর্কতা প্রধানভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা :

- (১) মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয় বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;
- (২) জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিষয় বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;
- (৩) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিষয় বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, মানুষের সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ, মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের এবং জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিষয় বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য কোনক্রমে সাধন করা সম্ভব-যোগ্য হয় না। মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে মানুষের স্বাস্থ্যের এবং জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিষয়সমূহ যে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিষয়সমূহ বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক না হইলে মানুষের ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। জল ও হাওয়ার যে শক্তি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে, উহাদের সেই শক্তি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তিও রক্ষা করিয়া থাকে। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি রক্ষিত না হইলে কোন কৃত্রিম উপায়ে স্বাস্থ্যকর কাঁচামালসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষ তাঁহার খাওয়ার জন্ত, পানীয়ের জন্ত এবং অস্ত্রাস্ত্র ব্যবহারের জন্ত যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করেন তাহার প্রত্যেকটির কাঁচামাল জমি হইতে অথবা জমির অস্তিত্ববশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত শস্ত, শাকসব্জী, ফলমূল, পশুর মাংস, ডিম্ব, মৎস্ত প্রভৃতি মানুষ খাটরূপে ব্যবহার করেন তাহার প্রত্যেকটি হয় সাক্ষাৎভাবে জমি হইতে নতুবা জমির অস্তিত্ববশতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। পানীয়ের জন্ত বাহা বাহা ব্যবহৃত হয় তাহার প্রত্যেকটি হয় জমিজাত দ্রব্য হইতে নতুবা জমির অস্তিত্ব বশতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। খনিজপদার্থ, মুক্তা, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিও হয় জমি হইতে নতুবা জমির অস্তিত্ব বশতঃ উৎপন্ন

হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। স্বাস্থ্যকর কাঁচামালসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবসাধ্য না হইলে কোনও শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কাঁচামাল ও শিল্পজাতমাল না হইলে কোন বাণিজ্য-কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাঁচামাল উৎপাদন-কার্য্য, শিল্পজাত মাল উৎপাদন-কার্য্য এবং বাণিজ্য-কার্য্য সম্বন্ধসাধ্য না হইলে ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। যখন ইহা স্পষ্ট যে, জল-হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তি এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি অটুট না থাকিলে স্বাস্থ্যকর কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব-যোগ্য হয় না, স্বাস্থ্যকর কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য না হইলে স্বাস্থ্যকর শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, কাঁচামাল ও শিল্পজাত মাল না হইলে বাণিজ্য-কার্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং কাঁচামাল উৎপাদন-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্য না হইলে ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তখন ইহা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তি এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি অটুট না থাকিলে মানুষের ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।

প্রথমতঃ, স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য ও ধনগত প্রাচুর্য্য সাধন করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সর্বতোভাবে সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না ; এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয়, জল ও হাওয়ার স্বাস্থ্যকর শক্তির বিষয় এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিষয় সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রাচুর্য্য ও ধনগত প্রাচুর্য্য অল্প কোন প্রকারে সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না—এই দুই কারণে মানুষের সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য সাধন করিবার প্রধান প্রয়োজনীয় উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিষয় দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য ; যথা :

- (১) মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয় দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য ;
- (২) হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিষয় দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য ;
- (৩) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিষয় দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিষয় দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্য্য করিতে হইলে কোন কোন বিষয়ে প্রধান ভাবে সতর্ক হইতে হয়, তদ্বিষয়ে আমরা অভঃপন্ন আলোচনা করিব।

মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয় দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কাণ্ডে কোন কোন বিষয়ে প্রধান ভাবে সতর্ক হইতে হয়—তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মানুষের “স্বাস্থ্য” কাহাকে বলে এবং “মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয়” হয় কি হইলে—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বের অণুকারের গমনসমূহের (Elliptical movements-এর) এবং স্নাত্বাকারের গমনসমূহের (Linear movements-এর) সমতার অথবা সামঞ্জস্যের নাম মানুষের “স্বাস্থ্য”। মানুষের অবয়বের উপরোক্ত দুই শ্রেণীর গমনের

(movements-এর) অসমতার অথবা অসামঞ্জস্যের নাম “স্বাস্থ্যের বিঘ্ন”।

“মানুষের স্বাস্থ্য” ও “স্বাস্থ্যের বিঘ্ন” কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে “মানুষের অবয়বের গমন,” “অণুকারের গমন,” “সূত্রাকারের গমন,” “অণুকারের গমন ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য,” “অণুকারের গমন ও সূত্রাকারের গমনের অসামঞ্জস্য”—এই পাঁচটি কথার অর্থের সহিত পরিচিত হইতে হয়।

মানুষের জীবদশায় তাঁহার অবয়বে সর্বদা বিবিধ শ্রেণীর গমন (movements) বিद्यমান থাকে। মানুষ কোন শারীরিক অথবা মানসিক কার্যই করুন, অথবা বিশ্রাম করুন, অথবা শয়ন করুন, অথবা নিদ্রিত হউন, তাঁহার জীবদশায় তাঁহার অবয়বস্থ উপরোক্ত বিবিধ শ্রেণীর গমনের কখনও সর্বতোভাবে বিরাম সম্ভবযোগ্য হয় না। প্রাণবায়ুর অবসান হইলে সর্ববিধ গমনের বিরতি হইয়া থাকে।

মানুষের কার্যসমূহ প্রধানভাবে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত। এক-শ্রেণীর কার্য স্বতঃই হইয়া থাকে, আর একশ্রেণীর কার্য মানুষ তাঁহার বিবিধ ইচ্ছা পূরণের জ্ঞা করিয়া থাকেন।

মানুষের কার্যসমূহ হয় তাঁহার শরীরের দ্বারা নতুবা ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা নতুবা মনের দ্বারা নতুবা বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয়।

মানুষের প্রত্যেক কার্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।

মানুষের প্রত্যেক কার্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার নাম “অবয়বের গমন”।

মানুষের যে সমস্ত কার্য শরীরের দ্বারা স্বতঃই সাধিত হয় সেই সমস্ত কার্যের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ শরীরের সর্বাংশে ব্যাপকতা লাভ করে। মানুষ যখন নিদ্রিত হন অথবা শয়ন করেন, তখন সাধারণতঃ তাঁহার অবয়বে শরীরের দ্বারা স্বতঃই কতিপয় কার্য সাধিত হইয়া থাকে। মানুষের শয়ন করিবার ও নিদ্রার সময় শরীরের দ্বারা যে সমস্ত কার্য সাধিত হয় সেই সমস্ত কার্যের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ শরীরের সর্বাংশে ব্যাপকতা লাভ করে এবং শরীরের অণুকারের দ্বারা অণুকারের হইয়া থাকে।

মানুষের কার্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া সর্বাণুব্যাপী অণুকারের হইয়া থাকে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার নাম “অণুকারের গমন”।

মানুষ তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের জ্ঞা যে সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্য—তাঁহার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়। মানুষের ইচ্ছা অতিক্রান্ত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হইলে মানুষের ইচ্ছা-পূরণের পদার্থ-নির্ধারণ ও ইচ্ছা-পূরণের কার্যপদ্ধতি-নির্ধারণ সাধারণতঃ ভ্রমপূর্ণ হইয়া থাকে। মানুষের কার্যপদ্ধতি যখন ভ্রমপূর্ণ হয়, তখন মানুষ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কার্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া হয়, সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ অবয়বের

এক একটা অংশে মাত্র ব্যাপকতা লাভ করে এবং এক একটা ইন্দ্রিয়ার (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা প্রভৃতির) আকার ধারণ করে।

এক একটা ইন্দ্রিয়ার আকারকে সূত্রাকার বলা হয়।

মানুষের কার্যবশতঃ তাঁহার অবয়বে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া খণ্ডাবয়বব্যাপী সূত্রাকারের হইয়া থাকে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার নাম “সূত্রাকারের গমন”।

মানুষের ইচ্ছা যখন নির্ভুল বিচারের দ্বারা গঠিত হয়, তখন তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের পদার্থ এবং ইচ্ছা-পূরণের কার্যপদ্ধতিও নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হয়। ইচ্ছা, ইচ্ছা-পূরণের পদার্থ এবং ইচ্ছা-পূরণের কার্য-পদ্ধতি কি প্রণালীতে নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করিতে হয়, তাহা যখন মানুষ শিক্ষা করিতে সক্ষম হন, তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্যসমূহের প্রতিক্রিয়া যাহাতে খণ্ডাবয়ব-ব্যাপী ও সূত্রাকারের না হইয়া সর্বাণুব্যাপী অণুকারের হয় তাহা করিতে মানুষ সক্ষম হইয়া থাকেন।

মানুষের অবয়বের সূত্রাকারের প্রত্যেক গমন যখন অণুকারের গমনে পরিণত হয় এবং অবয়বের মধ্যে যখন কোন সূত্রাকারের গমন বিद्यমান থাকে না তখন মানুষের অবয়ব যে অবস্থায় উপনীত হয়, মানুষের অবয়বের সেই অবস্থার নাম—“অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য-অবস্থা” অথবা “মানুষের সমতার ও স্বাস্থ্যের অবস্থা”।

মানুষের অবয়বের সূত্রাকারের প্রত্যেক গমন যখন অণুকারে পরিণত হইতে অক্ষম হয় এবং অবয়বের মধ্যে যখন পৃথক পৃথক ভাবে অণুকারের গমন ও সূত্রাকারের গমন বিद्यমান থাকে তখন মানুষের অবয়ব যে অবস্থায় উপনীত হয়—মানুষের অবয়বের সেই অবস্থার নাম—“অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা” অথবা “মানুষের অসমতার ও স্বাস্থ্যের বিঘ্নের অবস্থা”।

মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কার্যপদ্ধতি যাহাতে অতিক্রান্ত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হইতে না পারে ও না হয় এবং ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে ও হয় তাহার ব্যবস্থা থাকিলে মানুষের অবয়বের অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্যাবস্থা অথবা মানুষের সমতার ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অবশুস্তাবী হইয়া থাকে।

মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কার্য-পদ্ধতি অতিক্রান্ত অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হইলে মানুষের অবয়বের অণুকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্যাবস্থা অথবা মানুষের অসমতার ও স্বাস্থ্য-বিঘ্নের অবস্থা অনিবার্য হয়।

মানুষের অবয়বের অণুকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থার উৎপত্তি হইলে মানুষের শরীরস্থ রস ও রক্ত তেজের সহিত সর্বতোভাবে মিলিত থাকিতে পারে না। মানুষের শরীরস্থ রস ও রক্ত তেজের সহিত সর্বতোভাবে মিলিত না থাকিলে মানুষের চাক্ষু্য, ভ্রম এবং ক্রমশঃ নানা ব্যাধি অনিবার্য হয়।

খাদ্য অথবা পানীয় অথবা ব্যবস্থার কোন সামগ্রী অথবা জীবিকাজ্ঞানের কোন কার্য অথবা মানুষের সহিত কোন ব্যবহার অথবা যে স্থানে বাস করা যায় সেই স্থানের জল-হাওয়া উত্তেজক অথবা বিবাদ-আনয়ক হইলে মানুষের অবয়বের অণুকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা অথবা মানুষের অসমতা ও স্বাস্থ্য-বিঘ্নের অবস্থা অনিবার্য হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের সর্ববিধ বিঘ্ন যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয় তাহা করিতে হইলে চারি শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

প্রথমতঃ—মানুষের ইচ্ছা, ইচ্ছা-পূরণের কোন পদার্থ, ইচ্ছা-পূরণের কোন কার্য-পদ্ধতি যাহাতে অতিক্রান্ত ভাবে অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইতে পারে ও না হয় এবং যাহাতে ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহার ব্যবস্থা—

দ্বিতীয়তঃ—মানুষের কোন খাদ্য অথবা পানীয় অথবা ব্যবহারের কোন দ্রব্য অথবা কোন ঔষধ অথবা কোন ব্যবহার যাহাতে উত্তেজনা অথবা বিবাদ-আনয়ক না হইতে পারে ও না হয় তাহার ব্যবস্থা ;

তৃতীয়তঃ—মানুষের জীবিকাজ্ঞানের কোন কার্য অথবা আমোদ-প্রমোদের কোন কার্য অথবা খেলাধুলার কোন কার্য যাহাতে কোনক্রমে উত্তেজনা অথবা বিবাদ-আনয়ক না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;

চতুর্থতঃ—মানুষ যে যে স্থানে বাস করেন সেই সেই স্থানের কোন অংশের জল অথবা হাওয়া উত্তেজনা অথবা বিবাদ-আনয়ক যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের সর্বাসঙ্গীন স্বাস্থ্যের যে কোনরূপ বিঘ্ন হইতে পারে না তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হইতে হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তি এবং ঐ শক্তির বিঘ্ন কাহাকে বলে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বে যে রূপ অণুকারের গমন ও সূত্রাকারের গমন বিद्यমান থাকে, হাওয়ার অবয়বে এবং জলের অবয়বেও সেইরূপ অণুকারের গমন ও সূত্রাকারের গমন বিद्यমান থাকে।

নীলাকাশের অণুকারের বিद्यমানতা বশতঃ হাওয়ার ও জলের অবয়বে অণুকারের ও সর্বাবয়বিক গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যস্বাভাবী হয়।

ভূমণ্ডলস্থ উদ্ভিদ ও চরজীবগণের বিद्यমানতা বশতঃ হাওয়ার ও জলের অবয়বে সূত্রাকারের ও অণুাবয়বিক গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যস্বাভাবী হয়।

মানুষের অবয়বে যে রূপ অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা ও অসামঞ্জস্য অবস্থা বিद्यমান থাকে,

হাওয়ার অবয়বে এবং জলের অবয়বে সেইরূপ অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা ও অসামঞ্জস্য অবস্থা বিद्यমান থাকে।

হাওয়ার অবয়বের এবং জলের অবয়বের অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহাদিগের স্ব স্ব স্বাস্থ্যকর শক্তির উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে।

হাওয়ার অবয়বের এবং জলের অবয়বের অণুকারের গমনের ও সূত্রাকারের গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহাদিগের স্ব স্ব স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্নসমূহের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

মানুষের কার্যের দৃষ্টতা ছাড়া অল্প কাহারও কোন কার্যে হাওয়ার অবয়বের অথবা জলের অবয়বের অণুকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা বন্ধও উৎপন্ন হইতে পারে না।

মানুষের যে সমস্ত কার্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ ভেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, মানুষ যদ্যপি সেই সমস্ত কার্য করেন তাহা হইলে সেই সমস্ত কার্যবশতঃ হাওয়ার এবং জলের অবয়বের অণুকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের “অসামঞ্জস্য অবস্থা” উদ্ভব হইয়া থাকে।

হাওয়ার অথবা জলের অবয়বের অণুকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের “অসামঞ্জস্য অবস্থা” উদ্ভব হইলে উহাদের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার শক্তি এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি রক্ষার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ অসামঞ্জস্যের অবস্থা বৃদ্ধি পাইলে, হাওয়া এবং জল এই উভয়ই, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার স্থলে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি রক্ষা করিবার স্থলে উহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়া থাকে।

হাওয়া ও জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, মানুষের যে সমস্ত কার্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ কোন অংশের ভেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য মানুষ যাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন তাহার ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে হাওয়ার এবং জলের স্বাস্থ্যকর শক্তির বিঘ্ন হওয়া অনিবার্য হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কার্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে “জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি” এবং “ঐ শক্তির বিঘ্ন” কাহাকে বলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মানুষের অবয়বে, হাওয়ার অবয়বে এবং জলের অবয়বে যে রূপ ‘অণুকার গমন’ ও ‘সূত্রাকার গমন’ বিद्यমান থাকে, জমির অবয়বেও সেইরূপ ‘অণুকার গমন’ ও ‘সূত্রাকার গমন’ বিद्यমান থাকে।

নীলাকাশে অণ্ডাকারের বিজ্ঞমানতাবশতঃ জমির অবয়বে অণ্ডাকারের ও সর্কীবয়ব গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

ভূমণ্ডলস্থ জল, হাওয়া, উদ্ভিদ ও চরজীবী এবং জামির অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থসমূহের বিজ্ঞমানতাবশতঃ, জমির অবয়বে সূত্রাকারের ও খণ্ডাবয়ব গমনের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

মামুঘের হাওয়ার ও জলের অবয়বে যেরূপ অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের ‘সামঞ্জস্য অবস্থা’ ও ‘অসামঞ্জস্য অবস্থা’ বিজ্ঞমান থাকে, জমির অবয়বেও সেইরূপ অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা ও অসামঞ্জস্য অবস্থা বিজ্ঞমান থাকে।

জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের সামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে।

জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা হইতে তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন-সমূহের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে।

মামুঘের কার্যের দুইটা ছাড়া অল্প কাহারও কোন কাণ্ডে হাওয়ার অবয়বের অথবা জলের অবয়বের যেরূপ অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না এবং হয় না—সেইরূপ মামুঘের কার্যের দুইটা ছাড়া অল্প কাহারও কোন কাণ্ডে জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না ও হয় না।

মামুঘের যে সমস্ত কার্যে জমির অবয়বস্থ তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, মামুঘ যতৃপ্তি সেই সমস্ত কার্য করেন—তাহা হইলে, সেই সমস্ত কার্যবশতঃ জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে।

ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে খনিজ পদার্থের উত্তোলন, ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে জমির বক্ষে যান-বাহনের প্রচলন, ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে জমির বক্ষে কৃষি কার্যের প্রবর্তন, ভ্রমপূর্ণ পদ্ধতিতে জমির বক্ষে শিল্পকার্যের প্রবর্তন, জমির অবয়বের অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের অসামঞ্জস্য অবস্থার কারণ হইয়া থাকে।

জমির অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের ‘অসামঞ্জস্য অবস্থা’ উদ্ভব হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

জমির অণ্ডাকার গমনের ও সূত্রাকার গমনের ‘অসামঞ্জস্য অবস্থা’ বৃদ্ধি হইলে প্রথমতঃ, জমিজাত দ্রব্যসমূহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ, ভূমি হইতে কোন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা অসম্ভব হয়। তখন মামুঘের প্রাণ ধারণ করা পর্য্যন্ত অসম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন বাহাতে সর্কীবোভাবে ধ্বীকৃত ও নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, মামুঘের যে সমস্ত কার্যে জমির অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার

রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে সেই সমস্ত কার্য মামুঘ বাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন তাহার ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বিঘ্ন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

মামুঘের সর্কীবোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে কি প্রকারে—তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মামুঘের সর্কীবোভাবের প্রাচুর্য্য বাহাতে সাধিত হয় তাহা করিতে হইলে, ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়; যথা :

- (১) মামুঘের ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের কোন পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কোন কার্যপদ্ধতি বাহাতে অতিক্রান্তভাবে অথবা ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইতে পারে ও না হয়, এবং বাহাতে ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা ;
- (২) মামুঘের কোন খাণ্ড অথবা পানীয় অথবা ব্যবহারের কোন দ্রব্য অথবা কোন ঔষধ অথবা কোন ব্যবহার বাহাতে উত্তেজনা অথবা বিবাদ-আনয়ক না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা ;
- (৩) মামুঘের জীবিকাজ্ঞানের কোন কার্য অথবা আমোদ-প্রমোদের কার্য অথবা খেলাধুলার কোন কার্য বাহাতে কোনক্রমে উত্তেজনা অথবা বিবাদ-আনয়ক না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা ;
- (৪) মামুঘ যে যে স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানের কোন অংশের জল অথবা হাওয়া উত্তেজনা অথবা বিবাদ-আনয়ক বাহাতে না হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা ;
- (৫) মামুঘের যে সমস্ত কার্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য কোন মামুঘ বাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন—তাহার ব্যবস্থা ;
- (৬) মামুঘের যে সমস্ত কার্যে জমির অবয়বস্থ কোন অংশের তেজ তাহার রসাংশ হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য মামুঘ বাহাতে করিতে না পারেন ও না করেন—তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত হইলেই যে মামুঘের সর্কীবোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে—তাহা নহে ; মামুঘের সর্কীবোভাবের প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে, ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রয়োজন হয়।

মামুঘের সর্কীবোভাবের প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রয়োজন হয় বটে ; কিন্তু ঐ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, অজ্ঞাত কোন শ্রেণীর ব্যবস্থায় মামুঘের সর্কীবোভাবের প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে না।

এ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থার কোন একটি শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাব হইলে, যুগপৎভাবে ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থাই অভাব হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক হয়।

সংগঠনের যে সমস্ত দৃষ্টান্তবশতঃ মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত দৃষ্টান্তের মূল কারণ—এ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাব। এই হিসাবে, এ ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাবকে মানুষের সর্ববিধ অভাবের সংগঠন-গত কারণসমূহের মূল কারণ বলা যাইতে পারে।

মানুষের “অভাবের” কারণ যেরূপ ছয় শ্রেণীর, মানুষের “দারিদ্র্যের” কারণও সেইরূপ ছয় শ্রেণীর। যে সমস্ত সংগঠন-গত কারণে মানুষের অভাবের উৎপত্তি হয়—সেই সমস্ত সংগঠন-গত কারণ যখন অত্যধিকভাবে তীব্র হয়—তখন, মানুষ সর্ববিধের “দরিদ্র” হইয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত ছয় শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের মূল কারণ :

- (১) অত্যধিক ভাবে এবং ভ্রমপূর্ণ বিচারের দ্বারা, মানুষের ইচ্ছা-গঠন করিবার এবং ইচ্ছাপূরণের পদার্থ ও ইচ্ছাপূরণের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবার অবস্থা ;
- (২) উত্তেজনা ও বিবাদ-আনয়ক খাজ, পানীয় ও অজ্ঞাত ব্যবহার্য সামগ্রী ব্যবহার করিবার এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারে উত্তেজনা ও বিবাদ উদ্ভব করিবার অবস্থা ;
- (৩) জীবিকাক্ষণের, আমোদ-প্রমোদের ও খেলাধুলার কার্যে উত্তেজনা ও বিবাদের অবস্থা ;
- (৪) মানুষ যে যে স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানের জল ও হাওয়ার উত্তেজনা ও বিবাদ উদ্ভব করিবার অবস্থা ;
- (৫) যে সমস্ত কার্যে হাওয়ার এবং জলের অবয়বস্থ প্রত্যেক অংশের তেজ তাহার রসায়ন হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, মানুষের সেই সমস্ত কার্য করিবার অবস্থা ;
- (৬) যে সমস্ত কার্যে জমির অবয়বস্থ প্রত্যেক অংশের তেজ তাহার রসায়ন হইতে পৃথক্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, মানুষের সেই সমস্ত কার্য করিবার অবস্থা।

অভাবের ও দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিলে, অভাব হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে—তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিলে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও মানুষের অভাব অথবা দারিদ্র্য ব্যাপকতা লাভ করে কেন,—তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। যাহা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ তাহাই মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের ও মানুষের দারিদ্র্যের ব্যাপকতার কারণ।

যে ছয় শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ—সেই ছয় শ্রেণীর অবস্থা সাক্ষাৎভাবে বর্তমান সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী যুদ্ধ ও সমগ্র মনুষ্য-সমাজব্যাপী অভাব অথবা দারিদ্র্যের কারণ।

যে ছয়শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ, সেই ছয়শ্রেণীর অবস্থা যে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সর্বত্র বিद्यমান আছে—তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

যুদ্ধ চলিতে থাকিলে যে ছয়শ্রেণীর অবস্থা মানুষের দারিদ্র্যের কারণ, সেই ছয়শ্রেণীর অবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রত্যেক যুদ্ধের পরে, মনুষ্যসমাজের অবস্থা প্রত্যেক যুদ্ধের পূর্ববর্তী মনুষ্যসমাজের অবস্থার তুলনায় যে অধিকতর খারাপ হয়, তাহার কারণ—যুদ্ধ চলিতে থাকিলে মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যের কারণ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের দারিদ্র্য অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যেক যুদ্ধের পরে, মনুষ্যসমাজের অবস্থা, এ যুদ্ধের পূর্ববর্তী মনুষ্যসমাজের অবস্থার তুলনায় যে অধিকতর খারাপ হয়,—তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। উহা মনুষ্যসমাজে গত আড়াই হাজার বৎসরে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে সেই সমস্ত যুদ্ধের প্রত্যেক যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান সময়ে যে যুদ্ধ চলিতেছে সেই যুদ্ধবশতঃ মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যের কারণগুলি কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রত্যেক দেশের মানুষগুলি কোন্ শ্রেণীর উত্তেজনা ও বিবাদে কোন্ শ্রেণীর আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন, ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশের জল ও হাওয়া ক্রমেই কিরূপে মানুষের স্বাস্থ্য-নাশ-সাধক হইয়া পড়িতেছে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি কিরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—তাহা আমরা সমাজের এক অঙ্গকায়ের কোণে বসিয়া লক্ষ্য করিতেছি বলিয়াই আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্তার সমাধান না হইলে, মনুষ্য-সমাজ ক্রমে ক্রমে যে বিপদসঙ্কুল দারিদ্র্যের অবস্থার উপনীত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়, তাহার তুলনায় বর্তমান দারিদ্র্যের অবস্থা অনেক কম।

মনুষ্য-সমাজের বর্তমান সারথিগণের কর্ণে ও হৃদয়ে উপরোক্ত কথা উপনীত হইবে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিচারামুসারে, যে নিয়মে বিশ্বের এই আকাশ, জল, স্থল এবং চরাচর জীবগণ স্বতঃই উৎপন্ন, বর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকেন, সেই নিয়মামুসারে, মানবসমাজের বর্তমান সারথিগণের কৃত কণ্ঠের হিসাব-নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। যে মানুষগুলির সাহায্যে তাহাদিগের কৃত কর্ত্ত্বসমূহ চলিতেছে, যে মানুষগুলি তাহাদিগের অমুগত ও শরণাগত—সেই মানুষগুলি কি অবস্থার উপনীত হইয়াছেন, সেই মানুষগুলির ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে চলিয়াছে, তাহা সর্বব্যাপী ঐ নিয়মের নিয়মামুসারে মানব-সমাজের বর্তমান মহাসারথিগণ বিচার না করিয়া আর বেশী দিন উদাসীন থাকিতে পারিবেন না, ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত।

বর্তমান মানব-সমাজের সমস্তার সমাধানে আমাদের এই প্রবন্ধ অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়, ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের সিদ্ধান্তের কারণ পাঁচ শ্রেণীর ; বহা :

- (১) বর্তমান মানবসমাজের সমস্তা সমাধান করিতে হইলে, মনুষ্য-সমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহা করা অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজনীয়।
- (২) মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার পন্থা একাধিক হইতে পারে না এবং একাধিক নহে। ঐ ব্যবস্থার পন্থা কেবলমাত্র একটি।

- (৩) মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার পন্থা, বর্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-সমূহের জ্ঞানভাণ্ডারে পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসমূহের ব্যবহাবে মানুষের পরস্পরের যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ও মানুষের দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য। এই সমস্ত প্রয়োগের কোনটির দ্বারা যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও দারিদ্র্য দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য নহে।
- (৪) মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও সর্বশ্রেণীর অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার যে একটীমাত্র পন্থা আছে, সেই একটীমাত্র পন্থার সন্ধান পাওয়া যায়—ভারতবর্ষের ঋষিগণের সূত্র, মন্ত্র, কারিকা ও শ্লোকময় লেখ্য। ভারতবর্ষের ঋষিগণের লেখা ছাড়া ভারতবর্ষের অথবা ভূমণ্ডলের আর কাহারও কোন লেখ্য ঐ পন্থার সন্ধান আদৌ পাওয়া যায় না।
- (৫) ঐ পন্থার সন্ধান পাইতে হইলে, ভারতবর্ষের ঋষিগণের লেখা যে পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করিতে হয়, ভারতবর্ষে বসবাস না করিলে, সেই পদ্ধতি শিক্ষা করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং হয় না।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমস্ত সমাধানের কোন যুক্তিপূর্ণ কথা কোন ভারতবাসীর মুখে যদি শুনা যাইত, তাহা হইলে আমাদের এই প্রবন্ধের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সন্দেহহীন হইতে হইত। ভারতবাসীগণ যাহাদিগকে মহাত্মা অথবা মহাত্মার অনুচর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মুখে ভারতবর্ষের সমস্ত সমাধানের কোন কোন কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমস্ত সমাধানের কোন কথা শুনা যায় না।

আমাদিগের মনে হয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত সমাধান না

হইলে যে, কোন একজন ভারতবাসীর অথবা কোন এক প্রদেশের ভারতবাসীর সমস্ত সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে—তাহা ভারতবর্ষের ভাবুকগণের অনেকেরই এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসীর অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত সমাধান না হইলে যে, কোন প্রদেশ-গত অথবা ব্যক্তিগত সমস্ত সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে—সেইরূপ সমগ্র মানবসমাজের সমস্ত সমাধান না হইলে সমগ্র ভারতবাসীর অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের বিচারানুসারে, উপরোক্ত সত্যটা না বুঝিয়া, সমগ্র মানব-সমাজের সমস্ত সমাধানের কথা চিন্তা না করিয়া, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা আলোচনা করিলে পরোক্ষভাবে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং মানুষের পশুত্বের অথবা পশু-প্রবৃত্তির উদ্ভব সাধন করা হয়। যে ভারতবর্ষ একদিন পবিত্র ঋষিগণের পবিত্র চিন্তার উদ্ভব-ক্ষেত্র হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষে মানুষের পশুত্ব সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার মন্ত্র জাগ্রত হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষে ঋষিগণ মানুষের এক-জাতিত্ব ছাড়া দেশগত জাতিবোধে সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন দেখিলে আমরা প্রাণে নিদারুণ ব্যথা পাই; কিন্তু আমাদের ব্যথায় কেহ কর্ণপাত করেন না, আমাদের ব্যথা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমস্ত সমাধানের কোন যুক্তিপূর্ণ কথা যাহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা ভারতবর্ষে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও মুখে শুনা যায় না বলিয়া, আমাদের সিদ্ধান্ত—বর্তমান মানব-সমাজের সমস্ত সমাধান আমাদের এই প্রবন্ধ অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের প্রবন্ধমালার এই প্রথম প্রবন্ধের আঠারটি বক্তব্য-বিষয়ের বিবরণ ও যুক্তি ইহার পর প্রকাশিত হইবে। [ক্রমশঃ]

“শ্রীদুর্গাপূজা”র প্রয়োজনীয়তা

গত বৎসরের ৮পূজার সংখ্যায় আমাদের এই প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, এখনও ঐ প্রবন্ধ আমরা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই। এই সংখ্যা লইয়া দুই সংখ্যায় উহার পুনরাবৃত্তি স্থগিত রাখিয়াছি। ঐ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। কতদিনে ঐ ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভবযোগ্য হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

শ্রীদুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তায় আমাদের বক্তব্য প্রধান-ভাবে চারি শ্রেণীর, যথা :

- (১) পূজা ও দেব-দেবীর পূজা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতাব একটি অংশ ;
- (২) যে সমস্ত কার্য বর্তমান মানব-সমাজে “পূজার” নামে প্রচলিত, সেই সমস্ত কার্যের প্রত্যেকটি প্রকৃত “পূজা” সন্দেহ অজ্ঞতার পরিচায়ক ;
- (৩) বাহা বাহা এক্ষণে ‘বিজ্ঞান’ নামে প্রচলিত, তাহার প্রত্যেকটি প্রকৃত বিজ্ঞান সন্দেহ অজ্ঞতার পরিচায়ক ;
- (৪) বাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নামের যোগ্য, সেই বিজ্ঞান মানব-সমাজে প্রচলিত থাকিলে কোন মানুষের কোন শ্রেণীর অভাব অথবা দুঃখ থাকিতে পারে না।

বাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নামের যোগ্য, সেই বিজ্ঞান মানব-সমাজে বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ অভাব ও সর্ববিধ দুঃখ বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়—তাহা ব্যবস্থা করিবার সংগঠনের পরিকল্পনা নির্ধারণ করা সম্ভব-যোগ্য হয়।

বাহা বিজ্ঞান নামে বর্তমান মানবসমাজে প্রচলিত, তাহার দ্বারা একটি মানুষেরও সর্ববিধ দুঃখ সর্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এই কারণে বাহা বিজ্ঞান নামে বর্তমান মানবসমাজে প্রচলিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-নামের অযোগ্য।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ অভাব ও সর্ববিধ দুঃখ বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হয়, তাহা ব্যবস্থা করিবার সংগঠনের পরিকল্পনা নির্ধারণ করা যে মানুষের সাধ্যাত্ত, তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সংগঠন কি কি প্রকারে করিতে হয়—তাহা আমরা উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

পূজা ও দেব-দেবীর পূজার সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার সন্দেহ কি—তাহা আমরা এখনও দেখাই নাই। উহা দেখাইবার ইচ্ছা আমাদের আছে।

জা গৃ হি

দুর্গা দশপ্রহরগধারিণী

গানীকুমা

হে দেবি—তোমাতে অর্চনা করি কত শত উপচারে,
সাজাই মন্ত্র, সাজাই তন্ত্র নানামতে ভাবে ভাবে,—
পূজা-আবতির করি সমারোহ,
বলি-উপায়নে সাধি অবরোহ,
শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাকা-নির্নায়ে ভক্তির অভিনয়ে—
মৃদুরী মাতা চিন্ময়ী-রূপে রাজো কি মর্ত্যলয়ে ?

শক্তির আরাধনা ক'রে তবু হয়েছি শক্তিহারা,
বীৰ্য্যহীনের লাহুনা শিরে—বাসভূমি হোলো কারা ।
পরাবীনতার কশাঘাত সতি'
কুত্র পুরাণ কোনমতে বহি,
অবমাননার ধূলি গারে মাখি' চলেছি দ্রুত পথে—
দলিত পিষ্ট হৃদয় আতত প্রবলের জয়রথে ।

সে যে কোন্ এক বিশ্মিত দিনে জাগিলে জ্যোতির্ময়ী,
মিলিত শক্তি-সাধনে দেবেরে করছ দৈত্যজয়ী ।
অপরূপ রণচণ্ডী মুরতি
ধনিলে গো—তমোঙ্কপিণী নিয়তি,
শত প্রহরণে সিংহবাহনে রাজিলে সংহারিকা,—
দহে অরিকূলে তব ত্রিনেত্রে জলংবহ্নিশিখা ।

মহামানবের অকাল-বোধনে হয়েছ আবির্ভূতা,
অর্ধি-হরণে শক্তি-প্রেরণা দিয়েছ শৈলমুতা ।
হাব্যেছি মোরা সে-নিষ্ঠা-বল,
অবিধ্বাসে যে হৃদয় বিকল,
তোমার নিধান তুলিয়া, জননী, দর্পের অভিমানে
সাধি ভীকৃতার গ্লানি এ-জীবনে মিথ্যার সন্ধানে ।

ভেঙেছি আমরা রৈত্রী—তোমার নির্দেশ নাহি মানি,
স্বার্থেব হীন সংঘাত জাগে হিংসা-গরল আনি.'
প্রতিশোধ তুমি করো মা শোধান,
শিখাও আবার শক্তি-বোধন,
তোমার রাজ্যে করুণা তোমার জাগুক্ মুরতি ধবি,
ঘচাও ভাঙ্কি, শাস্তির স্রুধাধারা বর্ষণ করি' ।

তব আশাস-বাণী মন্ত্রিত যুগ-যুগান্ত-পারে—
দানব-উৎপীড়নে তুমি, দেবি, রাজিবে যে বাবে বাবে ।
অক্ষয় মৌরা শক্তি-পূজনে
তাই কি বিষম হও আগমনে,
নব চেতনায় জাগাও আবার নিজিত সন্ধানে,
মুক্তির ভেরী উঠুক ধ্বনিয়া তব জাগরণ-তানে ।

অগ্নিলোচনা জাগো রুদ্রাণী দুর্গা স্বভগ আনে',
শত্রু-দহন করো মহামায়া—দাস্ত-শোচনা হানে ।

শিব ও অশিব দুই হাতে গরি
নৃত্য করো মা কপালিনি অহি,
ধরো নৃসিংহ-মূর্ত্তি—নাশিতে পর-লোলুপের দলে,
স্বর্গ-মুক্তি-বরদা ভাঙো মা বন্ধন-শৃঙ্খলে ।

ত্রিগুণ-সাম্য-প্রকৃতি সগুণা রাখো এই ধরণীয়ে,
সচেতন-চিন্ময়রূপে বহো কুংকর জগৎ ঘিরে ।

নিগুণ চৈতন্য-স্বভনে
শক্তির লীলা-রূপ-ব্যঞ্জনে
ত্র্যম্বিকুণী বাক-স্বরূপিণী তুমি মা সরস্বতী ।
স্থিতি-কাল-চারী শক্তি-ঐ লক্ষী বিষ্ণু-সতী ।

কুত্র-বনিতা দুর্গা তুমি গো সংহারে লীলাময়ী,
তুমি মা অনির্বচনীয় পরব্রহ্ম-মহিবী অরি ।

কুমারে অজ্ঞের করো বরদানে,
গণদেবে রাখো সিদ্ধি-বিধান,—
তোমার আরতি—রাষ্ট্র-সমাজ-ভবন-পালন-নীতি,
তব আরাধনা শিখায়, জননি, দিনবাগনের রীতি ।

তব মহিমার কল্যাণী-রূপ উদ্ভিত মন্মথ হবে—
তোমারি অংশ-সমুতা নারী সস্তা চিনিবে তবে ।
বিশ্বজননি, তব বৈভবে
স্বরূপ জানিয়া—নব গৌরবে
রমণী যে হবে প্রকৃত জননী আদর্শ গরীয়সী,
বীরপুত্রের লালনে আবার প্রাচী হবে মহীরসী ।

কৌমারী-রূপ-ধারিণী পুরমা তুমি গো অনির্বচনা !
তোমার ধারণা-ধ্যানে লভি যেন কস্তা স্তম্ভলা ।
বিলাস-ব্যাসন দূর করো মা গো,

প্রাচ্যের মনোমন্দিরে জাগো,
ছিন্ন করো মা মোহ-আবরণ জাগাও অরুণ-জ্যোতিঃ !
দেশ-মাতৃকার ভালো ও মন্দে রাখো মা অমিত মতি ।

হে চাক্র-পূর্ণ-সোম-শিখরিণী—এসো মা ক্ষেমকরি !
তোমার চরণ-মঞ্জীর-তালে উঠুক ধরণী ভরি' ।

প্রাচী-দিগন্তে জাগুক্ আবার
জীবন-তপন মহামহিমার,
বরাভয়ে তব পাই যেন দেবি, তরুণ প্রবল প্রাণে !
প্রসন্ন-মুখে চাহো অধিকা তোমার স্তবন-গানে ।

হে মহাশক্তি—রাজো তুমি দেবি—মোদের ভুবন-মাঝে,
যুগ-পুঞ্জিত আধার নাশো মা জ্যোতিঃ-অবিহন সাজে ।

তোমার জয়ের মস্তের গুণে
অক্ষয় শর দাও ভরি' তুণে,
যেন অঙ্গদ-মণিকুণ্ডল যতক তৃণ ধূলি—
তোমার স্নেহের আদেশ মানিয়া জাগি স্রবুণ্ডি তুলি' !

মর্মে মর্মে উঠুক বাজিয়া তোমার মাঠে-বাণী,
কীকার ভাষণ, হে দেবি, লইব জীবনে জানি'।

ক্লিষ্ট আকাশে আলোকের মালা

বিকশিয়া তোলে জাগরণ-পালা,

এনে দাও বশ-বিজ্ঞা-কীর্তি-শক্তি-অর্থ-আয়!

বিষ-জঙ্ঘর ভ্রবনে বক্ ভব নিঃশ্বাস-বায়ু।

হীন বন্ধন-ভঞ্জন-করা কৃপার প্রসাদী-দানে—
সত্যরূপে মা জাগাও ভারতে জড়-অবসানে।

নমি গো হৃদয়-কাষ-ভয়নি,

নমি গো চণ্ডি রিপু-নিহ্নদনি,

শুভ-দর্শন দিবে, সুখাময়ি, দশভুজা-রূপে কবে।

সিংহবাহিনী জাগ্রতা হও প্রাণের আকুল স্তবে।



বঙ্কশ্রী

দ্বাদশ বর্ষ } আশ্বিন : শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৫১ { ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

যে অনন্ত কথা তুমি আমার মধ্যে রক্ষা করিয়াছ এবং প্রতিনিয়ত জাগ্রত করিয়া তুলিতেছ, যে ভাষায় সেই অনন্ত কথা আমার ঐ ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের প্রাণে জাগিয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ ভাষা আজ আমার প্রাণে জাগ্রত কর মা। আমার মধ্যে যত কিছু দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং রাগ ও ঘৃণার প্রমত্ততা বিद्यমান রহিয়াছে, তাহা আজ দূরীভূত হউক। তুমি যে আমাদের সর্বসাধারণের মাতা এবং তোমার সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষটি যে এক মাতার সন্তান, সেই ভাবে আমি যেন প্রবুদ্ধ হই এবং ঐ ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া যেন আমি রাগ, ঘৃণা, হিংসা, অভিমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সকলকেই প্রকৃত ভ্রাতা ও ভগ্নীর মত প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিতে পারি।

আমার এই আকাঙ্ক্ষারূপী রাজসিকতার মধ্যে যেন তোমার ঐ সাধ্বিকতা অটুটভাবে মিলিত থাকে।

* * * * *

কি করিয়া পরের দুঃখ দূর করা যায়, কোন্ উপায়ে পরের সুখ বাড়ান সম্ভব হয়, তাহা বলিবার জন্ত অস্থিরতা দূর করার প্রয়োজন আছে, ইহা যখনই মনে জাগিল, তখনই বুঝিলাম যে, অস্থিরতা দূর করিতে হইলে আমার অস্থিরতা আসে কেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমার অস্থিরতা আসে কেন তাহা যখন খুঁজিতে আরম্ভ করি, তখন দেখিতে পাই যে, আমি যখন বুদ্ধ ও মরণের জন্ত প্রস্তুত হইতে চাই, তখনই আমার অস্থিরতা সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায় আর বাকী সব সময়েই অস্থিরতায় আকুল হইয়া পড়ি। বার্কক্যের জন্ত যখন হতাহত অথবা মরণের ডাক উপস্থিত হয়, তখনও আমার অস্থিরতা পূর্ণভাবে বিद्यমান থাকে। এক কথায়, যখন দুর্ভবুদ্ভি ও দুঃস্থ ইচ্ছা আমাকে ডুবাইয়া দেয়, তখনই আমার অস্থিরতা জাগে। যখন আমার প্রাণের মধ্যে বুদ্ধির ও ইচ্ছার উৎস কোথায় তাহার সন্ধান-প্রবৃত্তি জাগে, তখন আব আমার অস্থিরতা থাকে না।

আমি সব সময়েই এইভাবে মজগুল থাকিতে চাই, কিন্তু তাহা পারি না। কেন পারি না—তাহার ভাবনা লইয়া অনেক দিনের অনেক সময় কাটাইয়াছি। পরিশেষে বুঝিয়াছি, বুদ্ধি ও ইচ্ছার উৎস যথাক্রমে শিব ও দুর্গা। শুনিয়াছি, তাঁরা যেমন আমার অবয়বের মধ্যে আছেন, সেইরূপ উন্মুক্ত আকাশের সর্বত্রই বিद्यমান আছেন।

“দেহস্থাঃ সর্ববিদ্যাস্ত দেহস্থাঃ সর্বদেবতাঃ।

দেহস্থাঃ সর্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে।”

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পদচিহ্ন-দর্শন

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ছেলেবেলায় ‘আনন্দমঠে’ পড়িয়াছিলাম—‘১১৭৬ সালে খ্রীস্ট-কালে পদচিহ্ন গ্রামে একদিন রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল।’ মনে হইয়াছিল, বাংলা দেশের কোথাও বৃষ্টি সত্যি পদচিহ্ন নামে একটি গ্রাম আছে। একটু বড় হইলে বুঝিয়াছিলাম, পদচিহ্ন নামটি কাল্পনিক, বাস্তব জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। পরিণত বয়সে বৃষ্টিতে পারিয়াছি—পদচিহ্ন নামটি কাল্পনিক নহে, কিন্তু উহা দর্শন করিতে হইলে চাই সাধকের ধ্যানদৃষ্টি, ঋষি-কবির দিব্যানুভূতি।

যাঁহাব অস্তর মখিত করিয়া সেই মর্গভেলী ক্রন্দন ধনিত হইয়াছিল—‘কোথা মা কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি’,—ঐরাধিকার অস্ত্রহীন বেদনায় যে সাধক কবি আপনার বিপুল ব্যাথা কে অমুভব করিয়া বলিয়াছিলেন,—‘বঁধু গিয়াছে, বন্দাবনও গিয়াছে, চাহিব কোন্ দিকে’?—তাঁহারই ধ্যানদৃষ্টিতে প্রকট হইয়াছিল বর্ডেম্বা-শালিনীবঙ্গ-জননীর দীনী ত্রীণীনা মূর্তি! তিনি দেখিয়াছিলেন, বাংলার মন্দিরে মন্দিরে ভগ্নস্তূপ, শিলাখণ্ডে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের নিদর্শন আছে, কিন্তু বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত। তাই এই আত্মবিস্মৃত স্বধর্ম-ভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে আত্মসম্বুদ্ধ করিতে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষিত করিতে, তিনি তাঁহাব অপূর্ব মনীষা ও লোকোত্তর প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি মূল প্রেবণা ও সাহিত্য-সাধনাব মূল উৎস ছিল—এই পদচিহ্ন-দর্শন।

বঙ্কিমের এই পদচিহ্ন-দর্শন শুধু একটি দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ইহা দৈব নির্দেশ! আচাধ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় একদিন গভীর ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন—

‘কপিলদেবপ্রিয়া জায়শাস্ত্র-প্রসূতি তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা আব কতকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া নীচাত্মকবণবতা থাকিবেন?’

ইহাই পদচিহ্ন-দর্শনের প্রথম অধ্যায়। এই অধ্যায়েব নাম বিষাদ-যোগ। কবি ভাষায় বলিতে গেলে

‘হেবি’—তুমি সাক্ষ্যনেত্রে, অবনত শিরে,

পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী!

ভগ্নস্তূপে শিলাখণ্ডে বিনষ্ট মন্দিরে

খুঁজিছ পুত্রের কীর্তি অতীত কালিনী।’

(অক্ষয়কুমার বড়াল, ‘বঙ্গভূমি’)

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একদিন গভীর বেদনার সহিত বলিয়াছেন—‘যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধ-চরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচাধ্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।’

‘মাকে জানিবার, চিনিবার, বুঝিবার জন্ত মাতৃভক্ত সন্তানের

মূলে আছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়, ধর্মজিজ্ঞাসাও নয়,—মাতৃ-জিজ্ঞাসা, আর এই মাতৃজিজ্ঞাসার মূলে আছে আত্ম-জিজ্ঞাসা। যে মাকে চেনে না, সে নিজেকে চিনিবে কেমন করিয়া?

সুতরাং এই ‘পদচিহ্ন-দর্শন’ ও ‘বঙ্গদর্শন’ একই বস্তু। ‘বঙ্গদর্শন’ স্থূল চোখে নয়, ত্রিকালদর্শী ঋষির দৃষ্টিতে,—যে দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও অনাগত এক সঙ্গে ধরা পড়ে। সর্বাসঙ্গসম্পন্ন সর্বাভবণভূমিতা জগদ্ধাত্রী, অন্ধকার-সমাহুতা কালিমাময়ী কালী ও বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী দশভুজার মধ্যে বঙ্গজননীর ত্রিমূর্তি-দর্শন—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরই দিব্যদর্শন।

এই ‘পদচিহ্ন-দর্শনের’ প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—গৌরবময় অতীতের উপর অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। সাধনা—ভক্তি অর্থাৎ দেশমাতৃকায় পরমা অমুরক্তি। ফল—সর্বাসঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

এই সর্বাসঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে। এইজন্ত ‘কৃষ্ণ-চরিত্র’কে অমুশীলন বা ধর্মতত্ত্বের ‘শারীরক ভাণ্ড’ বলা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানা উপজ্ঞাসে ত্রীকৃষ্ণ-কথিত নিষ্কাম কর্ণ-যোগের আদর্শ ব্যাখ্যাত। বাংলা দেশের একজন মনীষী* এই গ্রন্থত্রয়কে বলিয়াছেন, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী’। ‘ত্রী’ নামটির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। বেদপাঠে অধিকারের মূলে আছে বৈদিকী দীক্ষা। এই ত্রয়ীতে অমুপ্রবিষ্ট হইতে হইলেও সর্বাগ্রে আবশ্যক তাত্ত্বিকী দীক্ষা। এই দীক্ষার ফলে হয় মৃন্ময়ী বঙ্গ-জননীর মধ্যে চিন্ময়ী জগজ্জননীর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যে মন্থের ধ্যানে এই দিব্যানুভূতি লাভ হয়, উহাই স্বয়ংপ্রকাশ ‘বন্দে মাতবম্’ মন্ত্র। মন্ত্রসিদ্ধির মূলে আছে মন্ত্রার্থ-চিন্তন।

তাই বলিতেছিলাম, এই পদচিহ্ন-দর্শনের মূলে আছে দৈবী প্রেরণা। ঐতিহাসিকের গবেষণা, নৈয়ায়িকের সূক্ষ্ম বিচার, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধিৎসা, পাণ্ডিত্যের বহুশ্রুত স্বকলহ এখানে ব্যর্থ। আমাদের দেশের ঋষি আত্মদর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—‘আত্মাকে মেধার দ্বারা লাভ করা যায় না, পাণ্ডিত্যের বা তর্কযুক্তির দ্বারাও লাভ করা যায় না। আত্মা ষাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই আত্মদর্শনের অধিকারী হন, তাঁহার নিকটেই আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশিত করেন’। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দিব্য দর্শন সম্বন্ধেও আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়—দেশমাতৃকা ষাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই এই পরমা দৃষ্টি লাভ করেন, তাঁহার নিকটেই এই সর্বার্থসাধিকা দেবী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন সকালে ব'সে খবরের কাগজ প'ড়ছে বিকাশ, এখন সে কাগজে খেলার খবর ছাড়া বাজারদরগুলোও পড়ে—কিন্তু তার বেশী নয়, তার সামনে এসে দাঁড়াল স্ত্রবোধ।

তাকে চেনা যায় না।

সেই সোঁখান বাবু স্ত্রবোধ কি এই? আধময়লা একখানা ধুতি, হাতকাটা একটা জামা, এলোমেলো চুল, না-কামান খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায়' এক জোড়া ধূলিমলিন নাগরা জুতো—একে দেখে কে বলবে যে এক বছর আগে এই ছিল তাদের হাট্টেলের প্রসিদ্ধ বাবু—যার প্রসাধনে রোজ লাগতো এক ঘণ্টা, আর সত্য যার খেদমৎ ক'রতে সারাদিন হস্ত দস্ত হ'য়ে বেড়াত।

বিকাশ উঠে এগিয়ে বললে, “আম্রন স্ত্রবোধদা! কি ব্যাপার? কবে এলেন রাজসাহী থেকে?”

স্ত্রবোধ একটা চেয়ারে ব'সে পকেট থেকে বের ক'রলে দেশলাই এবং বিড়ি।

আরও চমকে উঠলো বিকাশ—স্ত্রবোধ খায় বিড়ি! হাট্টেলে থাকতে যখন তার নিজের রোজগার ছিল না এক পরস, তখন সে খেতো দামী সিগারেট আর বালানখানার শ্রেষ্ঠ তামাক। এখন সে পুলিশের ডেপুটি-সুপারিন্টেন্ডেন্ট—সে খায় বিড়ি!

বিড়ি ধরিয়ে স্ত্রবোধ বললে, “রাজসাহী থেকে এসেছি অনেক দিন—আমার খবর জান না? কাগজে পড় নি?”

কাগজে আবার বিকাশ কবে কি প'ড়ে থাকে? সে বললে “না ভাই, কি হ'য়েছে?”

“বিশেষ কিছু নয়, চাকরীটা গছে।”

চমকে উঠলো বিকাশ—এ খবরটায়ও বটে, আর এত বড় একটা নিদারুণ খবর ব'লতে স্ত্রবোধের এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখে ততোধিক!

সে বললে, “সে কী? কি হ'য়েছিল?”

“বেশী কিছু নয়, হরিপুরের হাট আর শজু সা'র চালের গুদাম লুট হ'য়েছিল, তাতে আমি একটু সাহায্য ক'রেছিলাম। এই সামান্য কাজের জন্য পুলিশের লোকের চাকরী যায় তুনেছ কখনও?” ব'লে স্ত্রবোধ হাসলে।

ক্রমে সে সব কথা প্রকাশ ক'রে বললে।

“উত্তর বাঙ্গলার অনেকটা জায়গায় দারুণ বজা হ'য়ে লোকের যে দারুণ কষ্ট হ'য়েছে তার কতক খবর কাগজে অবিশ্রু দেখেছ। কিন্তু যা হ'য়েছে তার তুলনায় কাগজের বর্ণনা একেবারে কিছুই নয়। হাজার হাজার লোক রেলের লাইনে, পথে ঘাটে প'ড়ে আছে—বৃদ্ধ, যুবা, নারী, শিশু—তাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাবার নেই, পরবার ছেঁড়া নেকড়াও অনেকের একটি বই হুটি নেই। জল নেবে গেছে, যাদের ঘরদোর কিছু আছে, তারা সেই বিধ্বস্ত স্ত্রুপের মধ্যে ফিরে গেছে, যাদের নেই তারা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে।

বজার জল নেমে যাবার পর আমার উপর ভার হ'য়েছিল একটা অংশের চুরী-ডাকাতি নিবারণ করবার। চুরী-ডাকাতি হ'ছিল কিছু, আর হরণ সস্তাবনাও ছিল বিস্তর।

হরিপুর গ্রামটা বজার খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, আর সেখানকার শজু সা'র গোলায় বিস্তর ধান মজুদ ছিল। অগ্নিমূল্যে ধান-চাল বেচে শজু সা' প্রচুর টাকা রোজগার ক'রছিল।

পাশে একটা গাঁয় বেতে হ'য়েছিল আমার। সেখানে দেখলাম ককালসার বুদ্ধিমান নর-নারী পথের ধারে প'ড়ে বা বেখানে পাচ্ছে পেটে দিয়ে কোনও মতে জালার নিবৃত্তি করেছে। তাদের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেলো।

আমি তাদের সব কথা শুনে চটে' মটে' একটা যুবককে বললাম, “এত বড় জোয়ান ছোকরা, খেতে না পেয়ে হাঁউ হাঁউ ক'রে কেঁদে মরছে শুধু, কিছু ক'রতে পার না?” কাতরভাবে সে বললে, “কি ক'বব ভজুর?”

“কেন, ধান-চাল কি দেশে নেই? ঐ তো শজু সা'র গোলা বোঝাই—প্রতি হাটে তো দেখি চাল ধরে না।”

“কিছু সে ধান কেনবার পরস কোথায়? ধারও তো কেউ দেয় না ভজুর।”

“তাই কী? তাই প্যান প্যান ক'রে কাঁদবে শুধু? ক্ষিদের পথে প'ড়ে মরবে শুধু—সামনে অত ধান চাল থাকতে। মানুষ ন'স তোরা, শক্তি নেই হাতে? লুটে নিতে পারিস না?”

“লোকগুলো এটাকে পরিহাস মনে ক'রে হাসলে। একজন হেসে বললে, “তা হ'লে আপনিই তো ধ'রে জেলে পাঠাবেন আমাদের।”

“আমি বললাম, “তা পাঠাব। এখন শুকিয়ে পচে মরবার চেয়ে তা ভাল নয়? জেলে গিয়ে খেতে তো পাবি।”

ব'লে আমি চ'লে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন প্রবীণ ইন্সপেক্টর, আবও সব পুলিশের লোক। ইন্সপেক্টর বাবু বললেন, “এ সব কথা এদেব বললেন স্ত্র, এতে কি অনর্থ হয় দেখুন। এরা dangerous লোক।”

আমি ঘুরে বললাম, “কী হবে? লুট হবে। তাই তো চাই গোলা বোঝাই ধান নিয়ে মহাজন টাকা গুনবে এই এত বড় দুর্দিনে, আর এরা শুকিয়ে ম'রবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কিছুই হবে না। এ লোকগুলো যদি মানুষ হ'ত তো হ'ত, এরা গল্প।”

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম, আমার কথায় কাজ হ'য়েছে। পরের হাটে হরিপুরের হাট থেকে লোক এসে আমাকে খবর দিলে—হাটে ধান-চাল লুট হচ্ছে'। আমি খুসী হ'লাম যে মানুষগুলো গল্প হ'য়ে যায় নি একেবারে। ছুটে গেলাম হাটে।

ইন্সপেক্টর বাবু'র আদেশে তখন কনেষ্টবলেরা লাঠি নিয়ে আক্রমণ ক'রছে। অপর দিকে লোকের হাতেও ক্রমে লাঠি উ'চিয়ে উঠছে দেখা গেল।

আমি গিয়ে লাঠিচাঞ্চ বন্ধ ক'রে দিয়ে বললাম, ‘মারধোর যদি কেউ করে তবে তাকে গ্রেপ্তার করুন, আর দু'সের চাউলের বেশী যদি কেউ নেয় তাদের ধরুন, বাদবাকী যতদূর পারেন নাম লিখে নিয়ে ছেড়ে দিন।’

ইন্সপেক্টর বাবু বললেন, “আমি তা পারবো না স্ত্র—আমার duty—”

ইনস্পেক্টর বাবু পোষ্ট অফিসের বারান্দার বহু কনেষ্টবল ঘেরা হয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন—

আমি মুখ খিঁচিয়ে বললাম, ওঃ ! ভারী নিমকহালাল ডিউটি-বাজ এসেছেন ! ডিউটি ক'রবে তো এখানে ব'সে আছ কেন ? নিরপরাধ কনেষ্টবলদের মার খেতে না পাঠিয়ে নিজের যাও ভীড়ের মধ্যে—সাহস থাকে লড়াই করগে। ওই দেখছ এক হাজার লোক ? ওরা কেপে উঠলে পঞ্চাশটা কনেষ্টবল কি করতে পারবে ? আমি সবইনস্পেক্টরকে বললাম, “যাও, আমি যা বললাম কর গে।”

আমার এক কথা দেখতে দেখতে হাটময় রটে' গেল। সব চাল লুট হয়ে গেল, শব্দ সা'র গোলা শব্দ হ'য়ে গেল।

প্রায় একশো লোক গ্রেপ্তার ক'রে চালান দিলাম আমি। তারা হয় মারপিট করেছে, না হয় চার-পাচ সেব চাল নিয়েছে প্রত্যেকে !

বলা বাহুল্য, আমার এ কীর্তি চাপা রইল না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট হ'জনে ছুটে এলেন সেখানে।

আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে, আমার সামান্য পুলিশ ফোর্স নিয়ে আমি দাঙ্গার এঁটে উঠতে পারবো না বলেই একরূপ ক'রেছি। এতে ক্ষতি কিছু হয় নি,—একশো লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, আর সাতশো লোক প্রত্যেকে দু'সের ক'বে চাল নিয়ে স্বেচ্ছায় ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছে। ইচ্ছা কবলেই তাদের ধরে আনা যাবে যে কোন দিন !”

ইনস্পেক্টর বাবু আমান উপর বাগে ফুলছিলেন। তিনি আমায় সব কীর্তিকাহিনী বেশ ফরাস্ত ক'রে প্রকাশ কবে দিলেন। আমিই যে উদ্ভেজন দিয়ে এই লুটীটা কবিয়েছি সে কথা তিনি বিস্তর অতিরঞ্জন ক'রে বললেন।

বাংলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ ক'বে বললেন যে, আমার বিরুদ্ধে শুধু ডিপার্টমেন্টাল নয়, কোর্জদারী প্রসিডিও হবে।

আমি শাস্তভাবে বললাম, “আমি তার জন্ত প্রস্তুত।”

সুপারিন্টেন্ডেন্টের রক্ত হ'য়ে গেল বিশেষ গবম, সে বললে, “you're a rebel, a Gandhi-ite swine !”

আমার মাথায় বক্ত চড়ে গেল, আমি বললাম, “shut up you son of a bitch”

“সুপারিন্টেন্ডেন্ট তেড়ে এলো”—

সুবোধ হো হো ক'রে হেসে বললে, “ওই আধবুড়ো ভুঁড়িয়ালটা তেড়ে মারতে এলো কি না সুবোধ চাটুজ্জেকে, স্পদ্ধা ভেবে দেখ ভাই !”

“তার ঘৃণি ঠেকিয়ে তাকে শক্ত গোটা তিনেক লাগাতেই বাহাদুর রক্তাক্ত হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়লেন মাটিতে।”

“তারপর কিন্তু কোর্জদারী আর গড়াল না। ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারীর ফল যা হবে তা জানি, কাজেই তার আগেই আমি রিজাইন করলাম। কিন্তু তাতে ওরা শুনিলে না। আমাকে সশপেও ক'রে এনকোয়ারী চালালে। আমার কাছে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগলো, চার্ক দিয়ে, explanation চেয়ে, তাগিদ

দিয়ে—আমি সেগুলো সব টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে কেললাম, হাজিরও হ'লাম না। তার পর ক'র্তার আমাকে ডিসমিস ক'রে শাস্ত হলেন।”

সমস্ত কাহিনী শুনে বিষয়ে স্তব্ধ হ'য়েছিল বিকাশ। তার চোখে সুবোধ হঠাৎ একটা মহীয়ান বীরশ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। সে চক্ষুময় হয়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। সে বললে অবশেষে, “এখন কি করছেন তা' হ'লে ?”

“সেইখানেই কাজ করছি। আমার সেই কীওয়ার করেকদিন পরই দেখলাম এখান থেকে ‘সঙ্ঘট ত্রাণ’ করবার কাজ নিয়ে বুড়ি উৎসাহী যুবক গিয়ে সেখানে নামলেন। তাঁদের দলে ভিড়ে গেলাম। সেই থেকে তাদের সঙ্গে কাজ করছি।”

বিকাশ চোখ দু'টো আরও বড় করে চেয়ে রইল সুবোধের দিকে ; একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে, “তারপর আপনার জীবন কি ব্যবস্থা করছেন ?”

সুবোধ বললে, “সেটা এখনও ঠিক করিনি। সে এখন দাদার কাছে আছে। এখনকার কাজ তো শেষ হোক, তারপর ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।”

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু বিকাশ।

সুবোধ তারপর বললে, “এখন কাজের কথা বলি, বার জন্ত তোমার কাছে এসেছি ! আমি এসেছি আমাদের কাজের জন্তে কিছু টাকা তুলতে। হাজার দশেক টাকা আমি নিয়ে যাব এই আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার তাতে সাহায্য করতে হবে তিন প্রকারে। টাকা দিতে হবে, টাকা তুলতে হবে, আর খেলতে হবে।”

বিম্বিত হয়ে বিকাশ বললে, “খেলতে হবে মানে ?”

“আমি আই, এক-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে গোটা দুই এক্সিবিসন ম্যাচের বন্দোবস্ত করেছি। তাতে তোমার খেলতে হবে।”

বিকাশ বললে, “বেশ, খেলব, আর একটা চাদার বই আমার কাছে বেখে যান, যতদূর পারি টাকা তুলতে চেষ্টা করব।”

হেসে সুবোধ বললে, “আর নিজের টাকা ?”

বিকাশ শুকমুখে বললে শুধু, “দেব। এক সঙ্গেই সব দেব।”

সুবোধ চলে গেল। অনেকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল বিকাশ।

একটা কথা তার মাথার ভেতর বন্ বন্ করে বাজতে লাগল —“সুখের দরদী !”

হাঁ, এ কথা বিকাশকে সুবোধের বলবার অধিকার ছিল।

সুবোধের প্রাণে যখন দরদ জেগে উঠল, দরিদ্র বস্ত্রাঙ্গীড়িতদের জন্তে, তখন সে তার দরদকে শুধু বাক্যে বা তর্কে পর্যাবসিত হতে দেয় নি। সে করেছে কাজ। আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে সে সেই কাজে।

আর বিকাশ !—দশ হাজার টাকা মাত্র চাই আজ, তার জন্তে সুবোধ আজ ধারে ধারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। সে দশ হাজার টাকা বিকাশ একাই দিতে পারত ! পারেনি। দেবার প্রতি-জ্ঞাও দিতে পারেনি। কেন না, ওই দরিদ্র, ক্ষুধিত, গৃহহারাের জন্ত তার সে দরদ নেই। সুবোধ তার জীবন কথাও ভাবেনি,

চাক্রে ভাসিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হইনি। বিকাশের জ্বী নেই, বাপ, না বা নিকট আত্মীয় বলতে গেলে কেউ নেই, তবু সে পারে না স্ত্রীবোধের মত সর্ব্ববিধ বিলিয়ে আন্তের সেবা করতে। কেন না, তার মাসীয়া আছে, তার পরিজন আছে, তাদের অজস্র বাহ্যিক খরচ সে কমাতেও পারে না।

নিজেকে তার একটা কেঁচোর মত মনে হল স্ত্রীবোধের এই মহীয়ান আত্মত্যাগী আদর্শের পাশে। মনটা তার ভারী অবসর হয়ে গেল।

মনে পড়ল তার সেদিনকার প্রতিজ্ঞার কথা। নিজের জগৎ সামান্য গ্রোসাচ্ছাদন মাত্র রেখে তার যথাসর্ব্ববিধ দরিদ্রের সেবার জন্য বিলিয়ে দেবার যে স্বপ্ন সে করেছিল, সে শুধু কল্পনাই বয়ে গেল। তারপর অনেক টাকা সে রোজগার করেছে। সবই সে খরচ করেছে, কিন্তু দরিদ্রের সেবায় নয়। সম্পদের বিলাস ও খেলায় যেটাবার জন্তে।

এখনও সে ভেবে দেখলে—পারে না সে স্ত্রীবোধের মত আত্মত্যাগী হয়ে তার সর্ব্ববিধ দিয়ে দরিদ্রের সেবা করতে। মেসোম'শায়ের স্মৃতি, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিবাদভরা হৃদয়গ্রস্ত মুখখানি তার পথ আগলে বসে আছে। মাসীমার প্রতি অভ্যাগ্ন কর্তব্যবোধ তাকে বেঁধে ফেলেছে। তাকে সে যে আশ্বাস দিয়ে তার ঘাড়ে নিয়ে এসেছে, সে আশ্বাস, সে প্রতিজ্ঞা সে ভাঙতে পারে না। একি শুধু কর্তব্যবোধ না কাপুরুষতা? এই কি তার কর্তব্য? তার মনে পড়ল হিতোপদেশের কথা

“দরিদ্রান ভর কোন্তের মা প্রযজ্জ্বরে ধনম্।

ব্যথিতস্ত্রোবধং পথ্যং নীরোগস্ত কির্মোষধিঃ।”

কর্তব্য তার কোন্‌খানে? কোন প্রতিজ্ঞা তার বড়, সে কথা নির্ণয় করতে তার কষ্ট হল না। কিন্তু সেই কর্তব্য করবার শক্তি বা সাহস তার নেই।

স্ত্রীবোধ ঠিক বলেছিল। সে সখের দরদী, সে হৃদয়ঙ্গ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠল। আপিসে গিয়ে সে তার কাজ ক'রে গেল অশ্রুমনস্ক ভাবে। বিকেলের দিকে বতীন বাবু এলেন তার কাছে। অশ্রু কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে সে বতীনবাবুকে বললে, “হু’ হাজার টাকা ধার দিতে পারেন আমাকে?”

বতীনবাবু বললেন, “পারব না কেন? কিন্তু হঠাৎ আজই আপনার টাকার দরকার হল কিসে? কি মতলব করেছেন শুনি? আর বাই করুন, এখন আর ফাটকার বাজারে যানেন না, অতি লোভে শেষে তাঁতী নষ্ট হবে।”

হেসে বিকাশ বললে, “না, ফাটকা খেলব না। অশ্রু কাজ আছে।”

বতীন বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপিস ফেরবার পথেই স্ত্রীবোধকে তা পৌঁছে দিয়ে তার মনটা একটু সুস্থির হল।

তারপর স্ত্রীবোধের হয়ে তিন দিন উপরো উপরি তিনটে ম্যাচ খেলে আর হাজার তিনেক টাকা চাঁদা আদায় করে দিয়ে সে তার অমৃতপু চিন্তকে কতকটা সুস্থ করলে।

বিকাশের কাছে টাকাগুলো পেয়ে স্ত্রীবোধ উল্লসিত হয়ে বললে, “বা: grand! বাহাঃ হু’মি। তুমি একাই পাঁচ হাজার টাকা দিলে আমার। এ না হলে দশহাজার টাকা তুলতে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেত। তুমি wonderful!”

বিকাশ আন্তরিক লজ্জার সহিত বললে, “ও কথা আপনি আমার বলে লজ্জা দেবেন না স্ত্রীবোধ না। এমনিই লজ্জার মরে যাচ্ছি। এর চেয়ে ঢের বেশী করা আমার উচিত ছিল।”

স্ত্রীবোধ বললে, “তুমি জান না তুমি কতবড় বাহাঃ হু’মি। আমি সেটা জানতে পেরেছি সম্প্রতি, অনেক মোটা মোটা পেটওরালা পুরাণো বন্ধুদের কাছে ঘোরাকেরা করেছি। তাদের এক একজনের কাছে হু’শো টাকার চেক বেব করতে আমার মুখে রক্ত উঠে গেছে! আর তুমি একেবারে দিয়ে দিলে হু’ হাজার টাকা। কিই বা রোজগার তোমার।”

স্ত্রীবোধের প্রশংসা ও সমাদরে তার মনের গ্লানি অনেকটা মিটে গেল। অনেকটা আত্মপ্রসাদও সে লাভ করল। শেষে স্ত্রীবোধ বললে, “মনে রেখো ভাই। এই টাকা পেয়ে আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ—grateful—

হাত জোড় করে বিকাশ বললে, “ও কথা বলে আর আমার লজ্জা দেবেন না।”

“না না লজ্জা দেবার জন্ত ও কথা বলছি না। কৃতজ্ঞতা—gratitude কথাটার definition জান? Gratitude is a lively sense of benefits to come. কাজেই বুঝতে পারছ আমার কৃতজ্ঞতার মানে। ভবিষ্যতের অনেক আশা রাবি, এর পরে যখন দরকার হবে, হাত পাতব তোমারই কাছে।” বলে সে হেসে উঠল।

বিকাশও হেসে বললে, “আমি সেটা আমার অধিকার বলেই দাবী করব।”

এর পর সে যখন বাড়ী ফিরল তখন তার মনটা খুব হালকা—উল্লসিত।

পথে চলতে চলতে সে তখন কল্পনা করতে লাগলো অনেক কিছু! আরও কত টাকা সে দেবে স্ত্রীবোধকে—কত সে চিরদিন ব্যয় করবে দরিদ্রের সেবার, তার কল্পনার বিভোর হয়ে বিকাশ বাড়ী ফিরলো।

[ক্রমশঃ

গান

শখনাদ ঘারে মুক্তি উচ্চাবে,
পূর্ববে জলে নব ভাতি!
কর পার প্রাণ, আর কীনে দান,
সত্য, ঈশ্বর পথের সাথী!

মরু-মেরুর পারে সাগরে কান্তাবে
জীবন করে জয় মরণে মাতি!
পূর্ব পাশে নারী আসে কলুহারী
মুক্ত-ধারা বেন গলা!

ত্ৰিপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সরার জঙ্কালে বহায় কঙ্কালে
জীবনী-শোণিত সুখ-ভরজা!
বির নাহি মানে, শকা নাহি জানে,
উঠেছে মহাদেশ একটা হয়ে জাতি!

পশ্চিমবঙ্গের নদীরা অঞ্চলের লোকেরা চিরকালই রঙ্গরস—
বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা ছিল বঙ্গভূমির মধ্যে রঙ্গরসের রঙ্গভূমি।
ভাঁড়-বিধূবকের দল সভ্যটিকে ইতম্ব প্রভৃতি
করিয়া রাখিত। এই সভার কবি ভারতচন্দ্রও প্রধানতঃ রঙ্গরসের
কবি ছিলেন। তাঁহার লেখনীতে কল্প রসের চিত্র ভেদমন কুটিত
না। তিনি যখনই স্ববোগ পাইয়াছেন তখনই একটু রঙ্গলীলা করিয়া
লইয়াছেন। অন্নদাশঙ্করে তিনি গোড়া হইতেই শিবকে
পাইয়াছেন। শিবের আচরণ লইয়া রঙ্গলীলা দেখানোর পদ্ধতি
সাহিত্যে আগে হইতেই প্রচলিত ছিল।

শিব বিবাহ করিতে গিয়াছেন। পরণে বাঘের ছাল সাপ
দিয়া বাঁধা। 'কেশব কোতুকী বড়' কোতুক দেখিবার জন্ত কেশব
গরুড়কে ইঞ্জিত করিলেন, অমনি গরুড়ের ভীতিপ্রদর্শনে সাপগুলি
শিবদেহ ছাড়িয়া পলাইল। শিবের বাঘছাল খসিয়া পড়িল—শিব
হইলেন নিগম্বর! ষাণ্ডড়ী মেনকা ও এয়োরী লজ্জায় প্রদীপ
নিভাইয়া দিল। 'দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।'

কিন্তু তাহাতেও সমস্তার সমাধান হইল না—'শিবভালে চাঁদ
অগ্নি আলো করে তার।' *

নারদ সাহস পাইয়া এখন কোতুকের মাত্রা বাড়াইবার জন্ত কোন্দল
বাধাইবার উদ্দেশ্যে নখে নখে ঘষিতে লাগিল। 'এক ঠাঁই এত
মেয়ে দেখা নাহি যায়।'—কাজেই এ লোভ কি সংবরণ করা যায়?
নারদ বগড়া বাধাইয়া দিল।

অনাঙ্গ-নিধন শিব শুধু অমর নহেন—তিনি অজরও। কবি
রঙ্গরস-স্বষ্টির জন্ত তাঁহাকে করিরাছেন বুড়া।

আমার উমার দন্ত মুকুতা-গঞ্জন,
বায় লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন।
উমার বদনচাঁদে পরকাশে ঝাকা,

বুড়ার বিকট মুখে দাড়িগোঁপ পাকা।

এ সমস্ত রঙ্গরস জমাইবার শুৎকালস্বলভ চেষ্টা।

উমাকে পাইয়া শিবের আনন্দের অবধি নাই। শিবের বিবা-
হের বোঁ-ভাত ভাত দিয়া হইবে না—হইবে সিদ্ধি দিয়া। সভা
দেহত্যাগ করার পর শিব আর সিদ্ধি খান নাই। তিনি নন্দীকে
আদেশ দিলেন—'অন্ন করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বারো। ধুত্বার
ফল ত্যজ বস্ত্র দিতে পার।—কুসী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি বত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোঁট তারি মন্ত।' বিশ্বকর্মা এই বিবাহে নুতন
ঘোঁটলা-কুঁরা বোঁতুক দিয়াছেন। তাহাতেই সিদ্ধি ঘোঁটা হইল।
কিন্তু সেবে কুশ্কিল হইল—'বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাঁকিরের
কিসে?' বাঘছালে ত আর ছাঁকা ঝার না।

অজ্ঞাবের সংসারে বাংলা দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল
লাগিয়াই আছে। কবি এই লৌকিক ধারা অবলম্বন করিয়া

* বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলে ব্যাপারটা আরো কুসৃতিকর করিয়া
লিখিয়াছেন;

হাসি বলে শূলপাশি আইয়ো ভাণ্ডিতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াইব লটো হরে।

দেখিয়া আমার ঠাম আরোর উড়িবে ঝাণ্ড
লজ্জা পাইয়া লবে রাবে ঘরে।

নারদের সাহায্য না লইয়াও হরগৌরীর মধ্যে কোন্দল বাধাইয়া দিয়া
করতালি দিয়াছেন। গৌরী-বলিতেছেন—
ভগ্নের না দেখি সীমা রঙ্গ ভূতোধিক।

কহসে না দেখি ~~ভগ্নের~~ ~~বল~~।

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরুড়ী।

রসনা কেবল কথা সিদ্ধকের কুঁজি।

বুড়া গরুড়ী দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়া।

খুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধিলাড়ু।

তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।

তবে ঘোরে অলক্ষণা কন কি কারণ।

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।

তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল কেটে।

যের অন্ন নাই, গণেশ গজ বদনে চারি হাতে খায়, কার্তিক জয় মুখে
খায়, কেমন করিয়া শিবের মুখে গৌরী অন্ন যোগান। গৌরীর
টিটকারিতে শিব রাগ করিয়া বাহির হইলেন। শিবের বাণিজ্য
নাই, চাষ নাই, রাজসেবা তিনি জানেন না। তাঁহার সম্বল ভিক্ষা।
বৃদ্ধকাল আপনার, নাহি জানি রোজগার, চাষবাস বাণিজ্য-ব্যাপার।
সকলে নিগুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্ব লয়, নাম মাত্র রহিয়াছে সার।
শিব রাগ করিয়া ভিক্ষার বাহির হইলেন। পাগলা ভোলাকে
লইয়া পথের রঙ্গচিহ্নারা রঙ্গ করিতে লাগিল—

কেহ বলে অই এল শিববুড়া কাপ।

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।

কেহ বলে জটা চৈতে বার কর জল।

কেহ বলে আল দেখি কপালে অনল।

কেহ বলে ভাল করি শিষ্টাটি বাজাও।

কেহ বলে দমক বাজায়ে গীত গাও।

কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।

ছাই-মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।

কেহ আনি দেয় ধুত্বার ফুল-কল।

কেহ দেয় ডাঙ-পোস্ত আকিঙ্গ গরল।

কিন্তু কেহই এক মুঠা অন্ন দেয় না। কোথা হইতে দিবে?
ভবানী শিবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত বিশ্বের সমস্ত অন্ন সংগ্রহ
করিয়াছেন। লক্ষ্মীর ঘরেও অন্ন নাই। শিব তখন বলিলেন—

গুমান হইল গুঁড়া, না মিলিল ক্ষুদ-কুঁড়া

ফিরিহু সকল পাড়াপাড়া,

হাভাতে যতপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,

হেদে লক্ষী হৈল লক্ষীছাড়া।

কত সাপ আছে গায়, হাভাতেই নাহি খায়,

গলে বিষ সেহ নাহি বধে।

কপালে অনল জলে, দেহ না পোড়ায় বলে,

না জানি মরিব কি ঔষধে।

অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্তনের জন্তই শিবের এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি
করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু—অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কালে-অন্নের ভরে—
এই ব্যাপার লইয়া কবি যথেষ্ট রঙ্গ-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিবের পালা শেষ করিয়া কবি ব্যাসকে লইয়া পড়িয়াছেন।

ব্যাসের বে রূপবর্ণনার দ্বারা কবি ব্যাসের কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেই রঙ্গের ইঙ্গিত আছে—

দাঁড়াইলে জটাতার, চরণে লুটায় তাঁর, কঙ্কলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু, পাকা গোপ পাকা দাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি, চলনে

কতক আঁটুবাঁটু।

কপালে চড়ক ঘোঁটা, গলে উপবীত ঘোঁটা, বাহমূলে শশ্ব-চক্র রেখা।

সর্বাস্থে শোভিত ছায়া, কলিযুগ-বাঘ-খাবা, সারি সারি

হরিনাম লেখা।

ব্যাস বড়ই হরিভক্ত—কাশীতে আসিয়া সংকীৰ্ত্তন করিয়া বেড়ান।

হরি ছাড়া উপাস্ত আর কেহ নাই—ইহাই প্রচার করেন। সেই

সঙ্গে শিবের নিন্দা করেন—তাহার ফলে “ভুক্তভক্ত কণ্ঠবোধ

ব্যাসের হইল।” বিষ্ণু আসিয়া বুঝাইয়া গেলেন—“শিব পূজা না

করিলে মোর পূজা নয়।” বিষ্ণুর কৃপায় শিব কণ্ঠস্থ ফিরিয়া

পাইলেন। এইবার ব্যাস হইলেন—পরম শৈব। আর হরির

নামও করেন না। “ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হোক পরিণাম।

অজ্ঞাবধি আর না লইব হরিনাম।” শিব ব্যাসের ভেদজ্ঞানে

বিরক্ত হইয়া তাহার অন্ন বন্ধ করিয়া দিলেন। বুড়াকে সকলেই

ভিক্ষা দিতে আসে—কিন্তু ‘হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়।’

তিন দিন ধরিয়া বুড়া উপবাস করিয়া রহিল। কাশীতে ভিক্ষা না

পাইয়া ব্যাস অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা দেখিলেন—

ব্যাস অভিশাপ দিয়া চলিয়া যায়—তিনি কাশীতে থাকিতে বুড়া

ব্যাস অজ্ঞাভাবে মারা যায়। তখন তিনি মোচিনী মূর্তি ধরিয়া

গৃহলক্ষ্মীরূপে ব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিব বৃদ্ধ

স্বামিরূপে গৃহে ছিলেন। তাঁহার সতিত ব্যাসের বিতর্ক হইল।

তাহার ফলে শিব আত্ম-প্রকাশ করিয়া ব্যাসকে তর্জ্ঞন করিয়া

কাশী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ব্যাস শিবের উপরও চটিয়া

গেলেন। তিনি হবিহব দুইজনকেই ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার

উপাসনার সঙ্কল্প করিলেন এবং নূতন কাশী বচনার জ্ঞাত উদ্যোগ

করিলেন। কিন্তু গঙ্গা না হইলে ত’ কাশী হয় না। ব্যাস গঙ্গার

শরণ লইলেন। গঙ্গা ব্যাসকে ভৎসনা করিয়া শিবনিন্দা কবিত্তে

নিবেদন করিল এবং ব্যাসের সঙ্গে ঘাইতে অসম্মত হইল। ব্যাস

তখন গঙ্গাকে গণিকা ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি কবিল।

“আমি যাবে প্রকাশিহু আমি যাবে বাড়াইহু সেহ মোবে

ভুজ করি কহে।

মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গে প্রহার করে এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

ব্যাস গঙ্গার কাছে তিরস্কৃত হইয়া বিষকথাকে শ্রবণ করিলেন।

বিষকথা শিবহীন কাশী গড়িতে চাহিল না। ব্যাস তাহাকে দূর

করিয়া দিলেন। তারপর ব্যাস ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা

বলিলেন—

জানেন অন্তরবাসী শঙ্কর গোসাঁই,

তার সঙ্গে তোর বাদ ইথে আমি নাই।

ব্যাস ফাঁকিরে পড়িয়া তখন অন্নপূর্ণাকে শরণ করিলেন। তিনি

অন্নপূর্ণার কৃপার জ্ঞাত উপস্থায় বলিলেন। অন্নপূর্ণা পতি পুত্রদের

পরিবেষণ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্যাসের আচ্ছাদনে তাঁহার

ভাবান্তর হইল। একে ব্যাস শিবের সঙ্গে বাদ করিয়া নূতন কাশী

রচনা করিতে চায়, তাহাতে অসম্মত আছেন। তিনিও ব্যাসের উপর রাগিয়া গেলেন। তারপর তিনি জরতী বেগ ধরিয়া ব্যাসকে ছলনা করিতে চলিলেন।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী,

ডানি হাতে ভাদালড়ি বাম কক্ষে বুড়ি।

কাঁকর মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি,

হাত দিলে ধূলা উড়ে বেন কেয়া কাঁদি।

ডেবুর উকুন নিকি করে ইলিবিলা,

কোটি কোটি কাণ কোটারির কিলবিল।

কোটারে নখন ছুটি মিটি মিটি করে,

চিবুকে মিলিয়া নালা ঢাকিল অধরে।

বাতে বাঁকা লর্ক অজ পিঠে কুঁজ ভায়,

অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ণসার।

উকুনের কাষড়েতে হইয়া আকুল

চক্ষু মুদি হুই হাতে চুলকান চুল।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—বল দেখি বাছা কোথা মরিলে সজোমুক্তি লাভ করিব?

ব্যাস বলিলেন—“বুড়ি যদি থাকে বুড়ি হেথা বাস কর,

সজোমুক্তি হবি যদি এইখানে মর।”

ঝগড়া করিতেই বুড়ী আসিয়াছিল। সে রাগিয়া বলিল—

তোমর মনে আমি বুড়ী এখন মরিব,

সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব।

উচ্চগ বিকারে মোর পড়িয়াছে হাঁত,

অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত।

বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শন মুড়ি,

বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি।

শিরশ শূলে চক্ষু গেল কুঁজ হৈল কুঁজ,

কতটা বয়স মোর যদি দেখ শ্রুজে!

কান কোটারিতে মোর কান হৈল কালা,

কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জালা।

এই বলিয়া জরতী ক্রোধভরে চলিয়া যান। ব্যাসদেব ধ্যানে

বসিলেন—তাঁহার ধ্যান এখন অন্নদারই ধ্যান। কাছেই

জাতীকে আবার ফিরিতে হইল! আবার তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন—এখানে মরিলে কি হইবে বলিলে? ব্যাস তাঁহার

কথাবই পুনরাবৃত্তি কল্পিলেন। বধিরতার ভান করিয়া অধীরা হইয়া

জরতী চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধ্যানের বলে আবার কিম্বিত

হইল—এইদগ বার বার কিরিয়া জরতী একই কথা জিজ্ঞাসা

করেন। ব্যাস কুপিত হইয়া বলিলেন,—“বিরক্ত করিল মাশী কিছু

নাহি বোধ, ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাশের কুহরে। পদ্বিত হইবে

বুড়ী এখানে যে মরে।” এইবার অন্নদার অতীষ্ট পূর্ণ হইল।

“তথাস্ত বালিয়া দেবী কৈল অন্তর্ধান।”

এই উপাখ্যানটির মূলে গভীর তথ্য নিহিত আছে সত্য, কিন্তু

আগাধোদ্ধা রঙ্গরসের ভঙ্গীতেই ইহা রচিত। কোন ভাষ্যের সন্ধান

না করিয়াই রঙ্গ সাহিত্য হিসাবে ইহা উপভোগ্য।

বিভাঙ্গনের বহু স্থলেও কবি রঙ্গরসের অবতারণা করিয়াছেন।
স্বন্দরকে দেখিয়া পুরনারীরা আশ্চর্য। কবি তাহাদের সম্বন্ধে
রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—

স্বন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী থসিয়া,
ভাবত কহিছে শাড়ী পরলো কসিয়া।

মালিনীর আকৃতি ও চরিত্র বর্ণনায় কবি যথেষ্ট রঙ্গরসের
পরিচয় দিয়াছেন। স্বন্দর মালিনীর হাবভাব দেখিয়াই তাহার
চরিত্র অনুমান করিয়া লইয়াছে। সে তাই ভাবিল—

মাসী বলি সোধোন করি আমি আগে,
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় জাগে।

কবি কড়ির গুণ গাহিয়া বলিয়াছেন—
কড়ি কটকা চিড়া দই বড় নাই কড়ি বই কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
কড়িতে বড়ার বিয়া কড়িলোতে মরে গিন্না কুলবধু কড়ি পেলে ভুলে।

এই কড়ি যোজ্ঞারের জন্ত মালিনী কত চলনাচাতুরীর সৃষ্টি
করিতেছে—বিশেষতঃ মালিনীর বেসাতি-ব্যাপারের বর্ণনা
বেশ কৌতুকবহু। এই রঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়া হীরার চরিত্রটি
চমৎকার ফুটিয়াছে। অজ্ঞভাবে তদ্রূপ স্বন্দরের কাছে হীরার
চলনাময় এ আচরণ কৌতুকের বস্তু।

সে টাকা কাঁপিতে ভরি, রাঙা তামা বারি করি,
হাটে যায় বেসাতির তরে।

চলে দিয়া হাতনাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া,
লোকানী দোকান ঢাকে ডরে।

তাড়াইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর।
বদি দেখে আঁটা আঁটি কালিয়া ভেজায় মাটি সাধু হয়ে বেণে হয় চোর।
রাঙা তামা মেকি মেলে রাশিতে মিশায় ফেলে বলে বেটা নিলি বদলিয়া
কালি কহে কোটালেরে বাণিরারে ফেলে ফেরে কড়ি লয় দৃষ্টান্তে গণিয়া
দর করে এক মূলে জুখে লয় হুঁনা তুলে ঝগড়ায় কড়ের আকার।
পণে বড়ি নিরুপণ কাহনেতে চারিণ-টাকাটায় সিকার স্বীকার।
একপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট বাঁকা মুখে কথা কয় চোখা
স্বন্দর ওলান বোজা তবু নহে মুখ সোজা যাবত না চোকে লেখা জোখা।
দিয়াছে যে কড়ি তার ষিগুণ ওনার তার স্বন্দর রাখিতে নাহে হাসি।
ভারত হাসিয়া কর এই যে উচিত হয় বুনিয়ের উপযুক্ত মাসী।

বিজ্ঞা ও মালিনীর কথোপকথনে ও রঙ্গরসের ছড়াছড়ি। বাহুল্য
ভরে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল না।

স্বন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শনের মধ্যে কৌতুকের অপপ্রয়োগই
আছে। কোটালের নারীবেশ ধারণ এবং চাতুরী করিয়া স্বন্দরকে
ধরিয়া ফেলার বর্ণনায় কবি যথেষ্ট রসিকতা দেখাইয়াছেন। এখানে
রসিকতা-বেশ স্ক্রটিসম্মত হয় নাই। পুরনারীগণের পতিনিকা
আপ্নাগোড়া কৌতুক রসেরই রচনা। একালে হান্তরস পুষ্টির সব
চেয়ে বড় উপাদান ছিল অঙ্গীল ইঙ্গিত। ইহাতে তাহার অভাব
নাই। দোয়াত কলম সারস্বত সাধনার অঙ্গ। ইহা আমাদের
কাছে পবিত্র ব্রহ্ম। এই দোয়াত কলম লইয়া নোংরা রসিকতা
এ যুগের কোন পাঠক সহ্য করিবে কি?

মানসিংহ ভবানন্দের অতিথি লইলেন। দাক্ষণ বড় বৃষ্টি আরম্ভ

হইল। মানসিংহের সঙ্গে লোকেরা বড় বিপদে পড়িল। কবি ইহাতে
রঙ্গরসের অবসর পাইলেন। তিনি তাহাতে আমোদ পাইয়া লিখিলেন—

ফেলিয়া বন্ধুক জামা পাগ তলবার,
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সঁাতার।
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার,
তল গেল মাল মাতা উরুহু বাজার।
ঘাসের বোঝায় বসি যেসেড়ানী ভাসে,
যেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাসে।
কাঁদি কহে যেসেড়ানী হায়রে গোসাঁই,
এমন বিপাকে আর কতু ঠেকি নাই।
বৎসর পনেরো বোল বয়স আমার,
ক্রমে ক্রমে বদলিহু এগার ভাতার।
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আসিয়া,
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবায়া।
ডুবে মরে যুদঙ্গী মুদঙ্গ বুকে করি,
কালোয়াত ভাসিল লাউ বুকে ধরি।

পাতশার সঙ্গে ভবানন্দের তর্কবিতর্ক হিন্দু-মুসলমানের আচার
আচরণ লইয়া রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দাস্তবাহর
আক্ষেপও তাহাই। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটাইয়া কবি
কৌতুক অনুভব করিয়াছেন।

ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত,
বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত।
অরের খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত,
ও তোর মাতারি তুই উহারি যে পুত।
কুপী ভারি গিলাইব হারামের হাড়,
ফতমা বিবির আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়।
যুবতী সত্বেলী বান্ধী ধারয়া পাছাড়ে,
বেহৌস হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে।

ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা কবি বিবিদের দুর্গতির কথা বলিয়া খুবই
আনন্দ পাইয়াছেন। ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা কবি
রস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভবানন্দ দিল্লী হইতে রাজস্বের কারমান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।
কাহার ঘরে আগে বাইবেন—তাশা লইয়া দুই রাণী সতীনে
কলহ। ইহাতে রঙ্গরস প্রচুর। কবি বলিয়াছেন—

দু' সতিনে কন্দল নইলে রস নহে,
দোব গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে।
বড় রাণী চন্দ্রমুখী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—

তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে,
আটে পটে দড় সেই সেই দড় হবে।
দড় বেলা জানিয়াছ কত ঠাট করি,
ধরিতে না হইত প্রভু আনিতেন ধরি।
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুরা,
হারারে যৌবন আমি হইয়াছি দুরা।
সুরা যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি,
দুরা যদি চিনি দেয় নিম হন জিনি।

ভারত চক্রে বেরোয়া উপমায় হিন্দুর পরম পুণ্যকর্ম যজ্ঞাভিতির
যে হৃদিশা হইয়াছে, তাহার তুলনায় দোহাত কলমের অদৃষ্ট ভালো।
পুন্নারীদের পতিনিলায় ভারতচন্দ্র নিজের সহযোগী রাজ-
কর্মচারীদের লইয়াই ব্যঙ্গ বিক্রপ করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বোধ
হয় এই অংশ বারবার শুনিতে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেখাই—
একজন রামা বলিতেছে—

রাজ সভাসদ পতি বৈভববৃত্তি করে,
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘবে।
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ,
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উষন।
চতুর্মুখ খাইতে বলে শুনে দুখ পায়,
বজ্রের পড়ক চতুর্মুখের মাথায়।
আব নারী বলে সই এত শুনি ভালো,
ঘড়েল পতির জ্বলে আমি চৈতন্য কালো।
রাত্রিদিন আটপার ঘড়ি পিটে মবে,
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাল না কবে।

অনিশ্চিত (৭৪)

অন্ধকার প্রান্তর মধ্য পথে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে।—শীতের
রাত্রি—সমস্ত জানালা বন্ধ, তথাপি একটা জানালা খুলিয়া দিলাম,
নিঃসঙ্গতাব চেয়ে নৈশ হিম ভাল। মুক্তপথে আলোর রেখা
অন্ধকার প্রান্তরে বিদ্যুতের মত দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল।

বৃহৎ কামরাটার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি একা, পাশের কামবায়
অভিভাবক আছেন।—কিন্তু যত রাত্রি বাড়ে তরও বাড়ে—
আগ্রহভরে অপেক্ষার আছি, যদি কেহ আসে। দূরবর্তী ট্রেনের
আলো দেখিলে উৎসাহ করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, লোকজন
দেখিলে সাহস হয় কিন্তু কেহ এগাড়ীর দিকে আসে না। যাত্রী-
সংখ্যাও বড় কম। বোধ হয় শীতের জন্ত।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা, জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে একটা ট্রেনে গাড়ী থামিল, তখন রীতিমত ক্রুদ্ধ
হইয়া আছি, স্তব্ধ জানালা খুলিলাম না—নিঃফল প্রতীক্ষায়
কোন লাভ? নিশ্চয় আজ রাত্রি সমস্ত ভ্রম মহিলা ধর্ম্মদট
করিয়াছে—কেহই যরের বাহির হইবে না।

হঠাৎ সজ্ঞাবে দুয়াব খুলিয়া গেল, একটা রীতিমত যাত্রীদল,
অনেক লোকজন, মালপত্র, গোলমাল, কতক গাড়ীর ভিতরে
উঠিল, কতক গেল পাশের কামবায়।

একজনের জন্তে অপেক্ষার ছিলাম—উঠিলেন পাচজন।
একটি বধু, দুইজন প্রবীণ, দুইটা অর্ধ বয়সী ঝি।

মান্বের বেশিটায় আমি ছিলাম। সম্মুখের বেঞ্চে বধুটি বসিল,
পিছনের বেঞ্চে গৃহিণী দুইজন। সন্দের দুইটা ভ্রমলোকও গাড়ীতে
উঠিয়াছিল—প্রতি বেঞ্চে সমস্ত বিছানা পাতিয়া দিয়াছে,—বাক্স,
ডেস্ক, ঝড়ি চালারী—কতক উপরের বাকে এবং কতক বেঞ্চার
তলায় রাখিয়া দিল, চারিদিক একবার বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিল,
হিসাব মিলাইয়া শেষে কুলী বিদায় করিয়া নিজেরা নামিয়া গেল।

রাত্রি নাহি পোহাইতে দু বড়ি বাজার,
আপনি না পারে আরো ঈধুকে খেদার।

কবি নিজেকেও এই পরিহাস হইতে রেহাই দেন নাই। তিনি
যে কামশাস্ত্রবিদ্য কবিতার কথা এখানে বলিয়াছেন—সে কবি তিনি
নিজে ছাড়া আর কেহ নয়।

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে,
কহিলে বিরস কথা সরস বাধানে।
পেটে অন্ন তেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে,
চালে খড় রাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সাঝে।
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার,
কত মতে করে রতি বলিহারি তার।
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ী না পড়ি কতু,
কেবল কাব্যের গুণে বিহারেন প্রভু।

সেকালের রঙ্গবসিকতা এইরূপই ছিল। বর্তমান যুগের মার্জিত
কচি প্রবৃত্তির পক্ষে রস উপভোগ করা দূরে থাকুক, এ সমস্ত
সহ্য করাই কঠিন। সে যুগের পাঠকদের বিচারে এই সমস্তই
প্রথম শ্রেণীর রস-সাহিত্য।

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

তখন উঠিল আব একজন, ই্যা ভ্রমলোক বটে।—দামী
ভ্রমলোক, যেমন বেশভূষা তেমনি চেহারা—সম্ভ্রান্ত ধনী বটে।
পিছনের বেঞ্চেব পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পিসীমা, আব
কিছু দরকার আছে, তোমাদের?”

পিসীমা উত্তর দিলেন, “না।”

“সরকার দেখে যাবে সব ট্রেনে, নিশ্চিত হয়ে যুঁয়োও ভোর
অবধি; মার কোঁটোটা ঠিক আছে তো?”

“আঃ অবু, ঠাণ্ডা লাগাস নি যা।”

ভ্রমলোক আর একটু অগ্রসব হইয়া আসিল, বৌকে সম্বোধন
করিয়া মুদ্রস্থরে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কিছু?”

অর্দ্ধাবগুণেনেব মধ্য হইতে প্রায় অক্ষুটস্থরে জবাব হইল, “না।”

“পানের ডিবেটা দাও না।”—

বৌ মাথা হেঁট করিয়া বেঞ্চার তলা হইতে একটি চতুষ্কোণ
হ্যাণ্ডেল দেওয়া সব্‌চে বয়েব বেতের সাজি টানিয়া বাহির করিল,
তাব ভেতর হইতে একটা বড় রূপার ডিবা লইয়া হাত বাড়াইল,
ভ্রমলোক সেটি লইয়া নামিয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চূপ করিয়া বসিয়া নবাগত সঙ্গীদগকে
দেখিতেছি।—ইহাবা যেন ট্রেনের যাত্রী নয়—এ যেন ঠিক ঘব
সংসার। এত জিনিস-পত্র সঙ্গে বহিয়া যাতায়াত করে? লখা
বেশিটায় মা পিসীমার দুইটি বিছানা স্তব্ধকির উপরে বেঞ্চ-মাণের
পুরু তোষক, চেউ বুনানি সাদা চাদর, প্লেন ঝালর দেওয়া ডবল
বালিশে সাদা তোয়ালে, সাদা ওয়াড় দেওয়া ছোট পাতলা লেপ।
দুইজনের পরণে গরদের ধুতি—ধূসর রংয়ের আলোয়ান! মা
আলোয়ানের তলা হইতে একটা বড় চক্‌চকে পিতলের কোঁটা
পিসীমার হাতে দিলেন! পিসীমা সেটি বালিশের পাশে রাখিয়া

দিলেন, তারপর হু' চারটি মুহূর্তের কথা শোনা গেল—শেষে দুইজনে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

যি দুইটি এতক্ষণ ইহাদের কাজে নিযুক্ত ছিল। এবার তাহা বা সেই বেকের সম্মুখে নীচে মেজের উপর নিজেদের বিছানা করিল, তাদেরও সতর্কতা ত্যাগ, চাদর বালিশ এবং একখানা বড় লেপ। হু'জনার পরগেই ধোপদস্ত কাপড় সেমিজ মোটাজামা এবং আলোয়ান। সাধারণ বিয়েদের মত অকারণ চাকল্য কিম্বা কৌতূহলপরায়ণা নয়—একটিও বৃথা বাক্য শোনা গেল না এতক্ষণের মধ্যে।

গাড়ীর ভিতর গভীর নিস্তব্ধতা। দিবিয়া বড়টির দিকে চাহিলাম। স্থিরভাবে বসিয়া সে আলোটার দিকে চাহিয়া আছে, বড় স্বন্দর চেহারা। যেমন কাস্তি তেমনি লাবণ্যমণ্ডিত মুখ—নামটা মাধুরী কিম্বা লাবণ্যপ্রভা হইবে বোধ হয়। কাণে ভীষা ইয়ারি ছলিতেছে, গলায় হু' তিনটি হাব—পাথর বসানো তাবিজ, উপর হাতে মণিবন্ধে সর্ক সর্ক চুড়ি এবং ভড়োয়া বালা। পাচটি পাথর বসানো আংটি উভয় হাতের মধ্যমা অনামিকা এবং কনিষ্ঠায়। জরিপাড় শান্তিপুরী সার্ভী ... সবজ ফ্লানেলেব হাতকাটা জামা পরা একখানি সিঙ্কের মত মিহি ঘন লাল রংয়ের সোনালী বন্ধা ও পাড় দেওয়া শাল গায়। ধনীগ্রহজনোচিত বেশ ভূষার কোন ক্রটি নাই, কিন্তু মুখখানি বড়ই স্নান।

শুধু বৌ নহে—দলটিব প্রত্যেকেব সবকাব মশাই পবিচায়ক নালিক হইতে গৃহীণীষয়, দাসীষয় প্রত্যেকেব মুখই বিষম বিষম। ইহাদের প্রতি কথায় চলা ফেবায় আসন্ন একটা আশঙ্কাব ভাব—একটা দারুণ দুর্ভাবনাব নিস্তেজ নিরুৎসাহ আবহাওয়া সকলকে ঘিঘিয়া বাখিয়াছে—নিতান্ত না বলিলে নম্র-এমনি ভাবে হু' একটা কথা বলা।

কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশন আসিয়া পড়িল—এখন আব দেখি না কোন ষ্টেশন, নাম কি ষ্টেশনেব, কেন না আব আমি অপেক্ষমানা নহি। বড়টির সঙ্গে আলাপ কবিত্তে ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে নীতব বিষম মুখ দেখিয়া আর চেষ্টা করিলাম না। নিশ্চিন্ত মনে শয়নেব উদ্যোগ কবিলাম—ভাল একখানা বই আনিয়াছি, এবাব সেটা পড়িব।

আলোব দিক হইতে বিষাদিত চোখ দুটি ফিরাইয়া সে আমাব দিকে চাহিল—জিজ্ঞাসা কবিল, “শোবেন আপনি?”

“ই্যা আব বসে কি হবে—আপনি শোবেন না?”

“শোব পবে—ঘুম পাছে না। আপনি ঘুমেবেন, আমি একা জেগে বসে থাকবো?” বলিয়া একটু হাসিল—যেমন মৃদু মিষ্ট কণ্ঠস্বর—তেমনি সে হাসি।

নিজের বিছানার একাংশে সে বসিয়া আছে তেমনি—বিছানা ববং সকলের চেয়ে ভাল। পুরু তোষক—পুরু নবম পৌষলী বুনা নি দুধুগুড় চাদর—কুঞ্চিত ঝালব দেওয়া বালিশেব ওয়াড—ফিকে হলদে তোয়ালে—তোয়ালের ধাবে ধারে ঘন সবজ কাপড়ের মধ্যে গোলাপী ফুল। একটি অত্যন্ত পুরু সবজ চেককাটা কালো মসৃণ কবল বালিশের কাছে ভাঁজ করা—এ হেন বিছানায় ঘুম আসে না চোখে?

“শোব না? কি করবো তবে?”

“কেন? গল্প করি হু'জনে। আপনাব খুব ঘুম পেয়েছে?” ঘুম পাউয়াছে সত্য—তার চেয়ে লোভনীয় গল্প করা। বলিলাম—“তা বেশ—আমি রাজী।”

“আপনাব নাম কি ভাই?”

নাম শুনিয়া ভারী ধূসী। “আমাব নামে আপনাব নামে ভারি মিল—প্রায় একই মানে।”

“কি নাম আপনাব?”

স্বনীতি—হু' জনাব নামে সু—

“স্বনীতি? আমি ভেবেছিলাম মাধুরী কি লাবণ্য।”

“বেন আপনি অমন ভাবলেন?”

“আপনাকে দেখে—অমন স্বন্দর মুখ।”

“ছাই স্বন্দর”—স্বনীতির মুখে সেই বিষম ছায়াটি দেখা দিল।

“তবু আমাব চেয়ে আপনাব নাম ভাল।”

“নিজের নাম কাবো ভাল লাগে না—পরেবটা খাপাপ হলেও মিষ্টি—কেমন না?” স্বনীতি ঈষৎ হাসিল। হাসিলে তাব মুখেব স্নানমাটা সবিয়া যায়।

সে সত্যি—কিন্তু নাম মিলেছে আপনাব সঙ্গে,—সত্যিই আপনি স্বনীতি।

“আমাব চেয়ে আপনাব নাম উঁচু ধবণেব।”

“আপনাব নাম মিষ্টি বেশী।

মাথা নাড়িয়া স্বনীতি বলিল—নাঃ কক্থনো না।”

“ফুল কি নিজের গন্ধ বুঝতে পারে?”

“আপনাব কথা বলছেন?”

“না না আপনাব—”

“আমাব?” স্বনীতি একটু চুপ কবিয়া বহিল, পবে বলিল—

“আপনাকে দেখতে আমাব এক বোনেব মত।”

“কোথায় বাপেব বাড়ী?”

“কবিদপুবে বাপেব বাড়ী, বড় যেতে পাউনে—বহুবে এক আধ বাব দেখা সাক্ষাৎ হয়।”

“কষ্ট হয় না আপনাব?”

কষ্ট আর কি, অভ্যেস হয় যায় না? তা ছাড়া বাপ মা মেয়েকে খণ্ডব ঘব ছাড়া কবতেও চান না। আমি গেলে এদিকে অচল—বোঝেন, তাই তাবাও আসেন কখনো কখনো।

“আপনি গেলে এদিকে অচল কেন?”

“শান্তদীরা ছাড়তে চান না।”

সে তাঁদেব দোষ নয়—আপনাব দোষ! আমাবি তো মনে হচ্ছে ছাড়বো কি করে আপনাকে, তবু কতক্ষণেব দেখাই বা?

আমাব পবিচাসে স্বনীতির মুখ স্নান হইয়া গেল—বলিল, “ভোব হলে কে কোথা চলে যাব—হয়তো কোনদিন দেখাও হবে না।”

“মনে যদি ভালবাসা থাকে—নগর দেখা হবে—আমাব হু'জনেই এই বাংলা দেশের। আপনি যাচ্ছেন কোথা?”

“কলকাতা।”

“এঁরা কে?”

“শান্তদী—পিস শান্তদী।”

তারপরে আমাদের আলাপেরূপ নানা পথে বহিতে লাগিল, নিজের ছেলেবেলার কথা—পিতৃালয়ের কথা—কত ছোট ছোট কাহিনী সে সব কথার আদি অন্ত নাই। এই অল্পকালের মধ্যে দুইজন দুইজনের পরমাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছি, কোন শুভ মুহূর্তে এক জনের সঙ্গে দেখা হয়—যাহাকে কিছুই বলিতে বাধে না।

শান্তী একবার মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—অ বোমা, এবারে কিছু খাও—খেয়ে শোও, শবীব তো ভাল নয়—অস্থির করবে।

‘কবে না—ঘুম পাচ্ছে না আমার’—

‘তবে কিছু খাও—আসবাব সময় কিছুই তো মুখে তুললে না—খাবারের ঝুড়িটি’—

‘সে আছে এখানে আমার বেকের তলায়—কিন্তু এত রাত্তিরে আমি কিছু খেতে পারবো না।’

পিস্, শান্তী দুঃখিত ভাবে বলিলেন—‘খাবার দিকে কোন দিন বা তোমার মন ? ধরে বেঁধে না খাওয়ালে—’

শান্তী ততোধিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন—‘মনে নেই সখ—কোন কিছুই ভাল লাগে না।’

তারপর আবার দুইজনে লেপ মুড়ি দিলেন। কিছু বিখ্যাত হইয়া ভাবিতেছি—সখ নেই কেন ? যতটা আলাপ পণ্ডিত হইয়াছে, চারিদিকে তো মহা সুরের লক্ষণ স্নানীতিব—তবে এ কথার অর্থ কি ? এবং ব্যাপাবটাই বা কি ? এদেব গোষ্ঠীশুদ্ধ এক ভাব কেন ?

‘একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না—ঠিক যেন আপনার নিজের বোন বলছে।’

‘কি কথা ?’

‘কিছু দিই না গেতে আপনাকে ? অন্ততঃ একটু মিষ্টমুখ, অনেক বকম মিষ্টি আছে, কচুবী, ভাল পুখী—আবো কি কি বাড়ীর তৈরী সব—আমি যা যা ভালবাসি, তাই তৈরী করিয়ে এনেছেন—আপনি ভালবাসেন না ও সব ?’

‘বাসি বৈকি—নিশ্চয় বাসি। কিন্তু আমাবো সঙ্গে ছিল খাবার, আপনি আসবার একটু আগেই খেয়েছি। কাজেই আমি এখন আর কিছুই পারবো না—তাব চেয়ে বরং পান দিন—পান নেই আমার।’

স্নানীতি আর একটা নকসাকবা রূপার ডিবে বাহির করিল—ডিবাটির দুই খোলে সাজা পান এবং চূর্ণ সমভাগ করিয়া একটা আমাকে দিল—অপরটি নিজে রাখিল ! দুইটি ছোট ছোট কোটা বাহির করিয়া বলিল—‘একটা স্নানীতি, একটা জন্ম পশ্চিম থেকে আনানো, কোনটা দেবো ? কোনটা ভালবাসেন ?’

‘একটাও নয়—আমি খাই না ওসব।’

‘একটুখানি খেয়ে দেখুন—সরষের মতন একটু, পান মিষ্টি লাগবে—জন্ম থাকবে—স্নানীতি দি।’

নাছোড় স্নানীতি, আমার পানে স্নানীতি দিবেই। কিন্তু কোন ক্ষতি হইল না—ভালই লাগিল স্নানীতি স্নানীতি স্নানীতি !

গাড়ী তেমন ছুটিতেছে—তেমনি আমরা আলাপ করিতেছি, স্নানীতি কোন কথা আমার কাছে গোপন করিল না, এমন সরল

মধুর স্বভাব দেখি নাই। স্বামী চিঠি পাইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সুরোগ হয় না। স্নানীতি তো যায় না কোথাও। স্বামী রাগ করিয়া বলে, তোমার ভারি অদ্ভুত সখ—শেষে একবার মফঃস্বল গিয়া আটদিন রহিল এবং আটদিনে আটখানা চিঠি লিখিয়াছিল।—সত্যি দিদি, শেষে শান্তী একদিন বলিলেন, “হয়েছে কি বোমা তার ? রোজ একটা চিঠি লিখছ কেন ? না লোক পাঠিয়ে খবর নোবো ? ভাবনা ধরছে বড়—”

স্নানীতি হাসিতে লাগিল, বলিল, “সে চিঠি কি তেমন হয় ? জোর কবে লেখা শুধু শুধু—অনেক দূরে গেলে যেমনটি ? আপনি যা বলছেন—”

স্বামীব নামটি সে বানান করিয়া বলিয়াছে। স্বামী অবিনাশ মিত্র জমিদার, মায়ের এক সন্তান। প্রকাণ্ড বাড়ীতে স্নানীতি একটা মাত্র বো—সকলের অত্যন্ত আদবেব। কাজ নাই কর্তব্য নাই সঙ্গী নাই সাথী নাই, কোথাও যাওয়া আসা নাই। প্রাচীন ধর্মেব সম্ভ্রান্ত ঘর। তবু শান্তী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন কর্তব্যচারীদের বাড়ীর মেয়েরা সদাসর্বদা স্নানীতির কাছে আসিবে।

এ পর্যন্ত স্নানীতির কোন সময়ের মধ্যে কোন দুঃখের ছায়াটি ধরা পড়ে নাই। কথায় কথায় আমিও ভুলিয়া গিয়াছি জিজ্ঞাসা করিতে ইহাদের এই দুঃখ-বিষমতার কারণটি কি।

স্নানীতি উঠিয়া বেকের উপর দাড়াইয়া বাকের উপরকার একটা বাস্তু খুলিয়া ছোট একখানা খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল, বাস্তু বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিয়া বলিল—আপনার ঠিকানাটি লিখে নি, শেষে ভুলে যাব। মাথা কুটে মরলেও আর পাব না—

মাথা কুটে হবে কেন, বালাই ! লিখে নিন না।

আমাব ঠিকানা লিখিয়া লইল। বলিলাম, “আপনার ঠিকানা দিন—পৌছে চিঠি লিখবো, কে আগে লেখে দেখবো।”

“না এখন না”—বলিয়া হাসিল, সেই বিষম হাসি।

ঈষৎ অভিমান করিয়া বলিলাম—ও ! আমার চিঠি চান না কি ?

“চাই দিদি চাই, চিবকালই চাই”—বলিয়া চূর্ণ করিয়া বহিল।

“তবে আমায় ঠিকানা দেবেন না কেন ?”

স্নানীতির মুখ গম্ভীর দেখাইতে লাগিল, স্থির চক্ষে আবাব আমাব দিকে চাহিয়া বলিল—কেন কলকাতা যাচ্ছি জানেন ?

না, কেন যাচ্ছেন ?

ডাক্তার দেখাতে—

কি অস্থখ ?

স্নানীতি একবার শান্তীদীপ দ্বারের দিকে চাহিল, একবার উচ্চ নেত্রে আলোটার দিকে চাহিল, সেই দিকে চাহিয়া বলিল—আমাব ছেলোপলে হয় নাই কিছু, প্রায় পঁচিশ বছর বয়েস হলো, তাই ডাক্তার দেখাতে যাওয়া হচ্ছে।

তাব জন্ম ডাক্তার দেখানো কেন ? হয় হবে—না হয় না হবে।

আপনি জানেন না দিদি—একবার থামিয়া একটু মুহ নিশ্বাস ফেলিয়া স্নানীতি বলিল—এঁরা খুব নামী ঘর। বংশে আর কেউ নেই। আমার সম্ভ্রান্ত না হলে বংশ থাকবে না, তাই—

কি তাই ?

—যদি ডাক্তার বলে ছেলে শিলে হবে না আমার, তবে—

—তবে কি ?

—আবার বিয়ে করবেন।

—বিয়ে করবেন ?

—হ্যাঁ, উপায় কি ? ছেলে চাই যে, বংশের নাম রাখা হবে না ?

সুস্থিত হইয়া গেলাম, এত বড় একটা আঘাত পাইব মনে করি নাই। স্ত্রীতির মৃথের দিকে চাহিয়া আঘাতটা শতগুণে যেন বাজিতে লাগিল। ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, আপনি বারণ করবেন না ?

বারণ করবো ? কেন ? যে বংশের যে নিয়ম, আমার শ্বশুরেরও সতীত ছিলেন।

শ্বশুরী আপনাকে ভালবাসেন না ?

বাসেন, সবাই বাসে।

তবু বিয়ে দিবেন ওরা ?

ওরা কি করবেন ?

তা বটে। বাঙ্গালী মেয়েদের অর্দ্ধশত নানা রকমে ভাগ্যের সহিত বাধা। জিজ্ঞাসা করিলাম, “এতদিনে ওদের এ বুদ্ধি হলো কেন ?”

“এতদিন যোগ-যজ্ঞ-হোম করেছেন—তাবিজ-কবচ যে বা বলেছে কিছু বাদ নেই। বিয়েটা তো সত্যিই কারু ইচ্ছে নয়। এখন সবাই বলছে পঁচিশ বছরের পরে আর ছেলেপিলে হয় না বড়। তাই চলেছেন শেষ চেষ্টা কবতে। লোকে বলে ডাক্তারী চিকিৎসা করে অনেকের নাকি অনেক বয়েসে ছেলে হয়েছে।

“আপনার স্বামী বিয়ে করতে পারবেন আপনাকে ফেলে ?”

“ফেলবেন কেন ? যেমন আছি তেমনি তো থাকবো। ছেলের জন্তেই যে বিয়ে—সে না করলে হবে কেন ? মন তো কারুই ভাল নেই এতে”—

সেই এক কথা, এক স্তর। বিবাহ অনিবার্য। তাহার প্রতি-কূলে অন্তরূপ কেহ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। হিন্দুর বংশরক্ষা-কারীর কাছে আবাব তুচ্ছ এক মানবীয় স্বত্ব-হুঃখের কথা কি ?

অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, “যদি ডাক্তার বলে সন্তান হবে—

“একটা সময় ঠিক করে বলবে তো ? সেই সময় অবদি দেখবেন।”

যদি কোন অস্বথ-বিস্ত্রথ থাকে, যার জন্তে ছেলে হচ্ছে না—

তা হলে চিকিৎসা হবে।

স্ত্রীতিও উহাদের দলে। অনাগত ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে সব বাধা-ধরা আছে !

ট্রেন দাঁড়াইল। একটা মাঝারী স্টেশন, তত রাত্রেও পান চা সিগারেট খাবার—ডাক-হীক তেমনি চলিয়াছে। অবিনাশ মিত্র দেখা দিল এবার—দরজার দাঁড়াইয়া একবার গাড়ীর মধ্যে দেখিয়া লইল, পরে উঠিয়া স্ত্রীতির কাছে আসিল, বলিল—ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ কেন ?

স্ত্রীতি উত্তর দিল—সব জানালা বন্ধ, ঠাণ্ডা কোথায় ?

গাড়ীর ভিতরেই ঠাণ্ডা, দেখি চাবি—স্ত্রীতি আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিল। অবিনাশ চাবি লইয়া বাকের উপরকার একটা ট্রাক খুলিয়া একটি খয়েরী রংয়ের ফুলহাতা পশমী জ্যাকেট বাহির করিয়া স্ত্রীতিকে দিয়া বলিল—‘পর শীত গীর—পর—ভারি অসাবধান তুমি, শেষ রাত্রে মাথের হিম লাগানো ভারি অজ্ঞায়।’

স্ত্রীতি জামাটি পরিল। স্বামী বলিল—বসে আছ কেন ? শোও—ঘুমিয়ে পড়—রাত জেগো না। গাড়ীতে থেয়েছ ত ? খাবার সঙ্গে ছিল না তোমার ? আসবার সময় তোমাব খাওয়া হয় নি দেখলাম। এক পেয়ালা চা খাবে ? আনবো ?

‘না—না, বার বার এসো না তুমি, ঠাণ্ডা লাগে না ? যাও, শোওগে—’

‘বাচ্ছি, তোমার শরীর ভাল নেই—না ? কেমন দেখাচ্ছে যেন—’। ‘বেশ ভাল আছি, ঐ ঘণ্টা পড়লো—’

‘পরের স্টেশনে চা আনিবে দেবো—নিয়ো কিন্তু—’

বই পড়িবার ভাণ করিয়া দম্পত্যের কথাবাত্তা শুনিতেছি। কত ভাল বাসিয়াছি স্ত্রীতিকে—সেটা বুঝিলাম—যখন প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হইল। অবিনাশ সম্ভ্রান্ত ভদ্র, কিন্তু ব্যাপারটা জানিবাব পর হইতে লোকটার উপর দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এত মায়া স্ত্রীতির উপর—তবে কেন আবাব বিবাহ করিতে চলিয়াছে ? স্ত্রীতিব চেয়ে সন্তানই যদি তোমাব বেশী কাম্য—তবে কেন এ বাহ্যিক অভিনয় ? তোমাব দরদ স্ত্রীতির মনে ঠাই পাইবে কেন ?

যত পাণী—যত অপবাবী হও না কেন—ত্রে আর্ন্তকূল তিলক-গণ, ত্রে হিন্দু বংশাবতঃসর্বগ !—পুত্রমুখ দর্শন মাত্র পাখা মেলিয়া সাঁ করিয়া উড়িয়া সপ্ত স্বর্গে গিয়া পৌছিবো। এবং যত পুণ্যবান হও—যদি সন্তান লাভ না কর—কপাৎ করিয়া পুণ্যম নরকে পতন। স্ত্রীর সন্তান যেমন করিয়া হোক—চাই-ই-চাই।

দারুণ বেদনায় মন ভরিয়া গিয়াছে। শুধু হুঃখ নয়—একটা নিষ্ফল ক্রোধ—নিস্তক হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। হয়তো স্ত্রীতি কিছু বুঝিল—কিন্তু বুঝিল না। স্বামী নামিয়া গেলে সেও শুইল।—মৃদুস্বরে দুইবার ডাকিল—‘দিদিমণি—ও দিদি-ভাই, ঘুমিয়েছেন ?’ কোন উত্তর না পাইয়া চুপ করিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখি—প্রায় প্রভাত—শিয়ালদহের আর দেবী নাই—দুই দিকের স্টেশনগুলিতে আগত শিয়ালদহের স্পষ্ট লক্ষণ। স্ত্রীতি বেশ-বাস ঠিক করিয়া বসিয়া জানালা-পাথে বহির্দৃশ্য দেখিতেছিল। শ্বশুরীও উঠিয়া বসিয়াছেন। যিহেরা নিঃশব্দে বিছানা জড়াইতেছে।

আমি উঠিলে স্ত্রীতি একটু হাসিয়া বলিল—‘এবার তো নামবো, কখন উঠে বসে আছি, আপনার ঘুম আর ভাঙ্গে না—একবার ভাবলাম ডাকি, সাহস পাইনি—আর একটু আগে উঠতেন যদি—তবু তো কথা বলতে পারতাম—’

শিয়ালদহ, মধুরগতিভরে ট্রেন থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে

সরকার একদল কুলী লইয়া গাড়ীতে উঠিল। অবিনাশ জানালার ওপাশ হইতে ডাকিল—তোমরা নেমে এসো—

খাণ্ডুড়ী বলিলেন—‘বৌমা, তুমি আগে নাহো—’

সুনীতি আমার হাত ধরিল—‘তু’টি চক্ষু তার জলে ছল-ছল, আমি বলিলাম—‘চিঠি চাই—চিঠি লিখবেন কিন্তু, তুল হয় না বেন—আমি আশা করে থাকবো—’

‘হ্যাঁ দিদি, ঠিকানা নিয়েছি তো। যদি ডাক্তার বলে,—আশা দেয়—তবে আমার ঠিকানা দিয়ে আপনাকে চিঠি দেবো, সব জানাবো। আর যদি—তা না হয়—না হয় যদি,—তা হলে আর চিঠি লিখবো না।’

বলিয়া মুখখানি নীচু করিয়া চক্ষের জল গোপন করিল। পরে মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া শালখানি গায়ে জড়াইয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিল। অবিনাশ হাত বাড়াইয়া বাস্তভাবে স্ত্রীর হাত ধরিল—বলিল—‘বড্ড ভিড়—এইদিকে এসো—’

যখন উহারা সকলে নীচে সমবেত হইল—ও গাড়ী হইতেও লোকজন জিনিষপত্র কম নয়—সংখ্যা মিলাইয়া দেখিবার জন্ম প্র্যাটিকরমে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইল,—ভীড়ও সাংঘাতিক,—

সেই সময়ে একবার সকলের দিকে প্রথর দিবালাকে চাহিয়া দেখিলাম। সকলের মুখেই এক আশু আশঙ্কা—একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ এবং ঘোর চিন্তা-বিবাদের ছায়া ঘনায়মান। বেন একদল অপরাধী চিরনির্কাসন-বাত্তার চলিয়াছে।

চলিতে চলিতে সুনীতি একবার পিছন কিরিয়া চাহিল—আমাকে দেখিতে পাইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না—আমি অনেক পিছনে,—ভিড় একটু কমিলে তবে নামিয়াছি। আজ সকালে প্র্যাটিকরমে সুনীতির দলের মত বিশিষ্ট দল একটুও নামে নাই। ঐ তার শালের কিনারা এক এক বার দেখা যায়।—কিন্তু শেষে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল—আর দেখা গেল না।

ইতার পরে বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। সুনীতির চিঠি পাই নাই।—কি বলিয়াছে ডাক্তার? অথবা সুনীতি আমাকে তুলিয়া গিয়াছে। কে কোথায় এক রাত্রে দেখা গাড়ীর আলাপ মনে করিয়া রাখে!—ঠিকানা জানি না যে একটা চিঠি দিব। আজও কিন্তু সুনীতিকে তুলিতে পারি নাই, সেই সন্দেহ বিবরণ মুখখানি প্রায়ই মনে পড়ে।

ইউরোপীয় শিল্পে ক্রমোন্নতি

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, এম-এ

পাশ্চাত্য জগতে গ্রীকরীতির শিল্পচর্চাই পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় শিল্পকলার মূল উৎস হিসাবেই বহিয়া গিয়াছে। গ্রীক শিল্প ছিল নগ্নতার পক্ষপাতী—কেত কেত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীক শিল্পে স্থূল ভোগবাদের প্রাধান্যই লক্ষ্যত হয়। দেহের প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধনার্থে শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই সেখানে নগ্নমূর্তি রচনা ও নগ্নচিত্র অঙ্কন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচ্য শিল্পের মত কোন উচ্চতর অন্তরঙ্গ ভাবাদর্শের উপর গ্রীক শিল্পকলা প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই গ্রীক শিল্পে বহুদিক দিয়াই অন্তরের বৈচিত্র্যকে এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করা হইয়াছে।

গ্রীক শিল্প এবং তাহার ক্রমোন্নতির গতিরেখাটি একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুসরণ করিলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, উহার মাঝে ধর্মাদেশের অভাববোধ বহিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু রুচিবোধ যে একেবারেই অল্পীল ও কুৎসিত, তাহা স্বীকার করা চলে না। ঈশ্বরের একটি অমূল্য দান এই মানবদেহ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ কামনা চরিতার্থ করিবার বিষয়বস্তুই নহে, দেহের প্রতিটি অঙ্গে বহিয়া গিয়াছে সত্যসুন্দরের রূপসৃষ্টির উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য্যবোধ ও স্বর্গীয় স্বপ্নমা। মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, তখনকার শিল্পের পরিচ্ছদ-বাহুল্যের সহিত গ্রীক শিল্পের নগ্ন আদর্শবাদের অসামঞ্জস্যই বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক জীবনে এক আশাতীত পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়া গেল, তেমনি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে সর্বত্রই একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দিল। তখন হইতে শিল্পে আবার স্বল্প পরিচ্ছদের প্রচলন হইল। নগ্নতা

তখন অল্পীলতাও অসংযমের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল—আবার পদিচ্ছদবাহুল্যও অসংস্কৃতির পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইল।



ম্যাডোনা

গ্রীক শিল্পের নগ্নবাস যে কেবলমাত্র শিল্পকে আশ্রয় করিয়াই কাস্ত হইয়াছিল তাহাই নহে, তাহা জাতীয় জীবনেও একটি বিশেষ



হোলি ফ্যামিলি (মাইকেল এঞ্জিলো)

চাপ বাখিয়া গিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনের সঠিত শিল্পকলার যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বহিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না, তাই মধ্যযুগে গীকশিল্পের নগ্নবাদের আদর্শ আর সামাজিক জীবনে পাত্রীদের অনুশাসন মানুষের দৈনিক জীবনে এক আদর্শ-সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই যুগের শিল্পেও এই সংঘাতের অনুরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এ্যাপোলো, ভেনাস প্রভৃতি যে সমস্ত বর্মণীয় মূর্তিগুলির সন্ধান আমরা বোনক শিল্পে দেখিতে পাই, উহা গ্রীক আদর্শের অমূল্যবোধই সৃষ্ট হইয়াছিল, মধ্যযুগের পর ইউরোপীয় শিল্পে যে যুগের সূচনা হয়, তাহাকে আমরা বিনেসাঁস যুগ বলিতে পারি। এই যুগে আবার মধ্যযুগের ধর্মভাব একেবারেই নিশ্চর হইয়া গিয়া শিল্পে আবার বাস্তব ভোগবাদ প্রবর্তিত হয়। র্যাফেল, মাইকেল এ্যাজিলো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ এই যুগের। ইহারা আবার শিল্পের বহিঃপ্রবর্তিত্র্য ও ঐশ্বর্যপ্রকাশের প্রচেষ্টার দ্বারা ভোগবাদের মূল ধারাটি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে র্যাফেল-অঙ্কিত চিত্রে যে কেবল মাত্র বাস্তবের প্রতিচ্ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে, উহাতে কোন গভীরতর ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ আদৌ পায় নাই। একথা বলা চলে না। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন, র্যাফেলের মাতৃমূর্তির চিত্রে শুধু একটি হৃৎপৃষ্ঠ বর্মণীর ক্রোড়ে একটি শিশুকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। এই অভিমত মানিয়া লইলে শিল্পীর প্রতি অথবা অবিচারই করা হইবে। ‘ম্যাডোনা’ চিত্রখানি একটু অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, চিত্রখানিতে বিশ্বমাতার একটি স্নিগ্ধ স্নেহময়ী মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রোড়লগ্ন সন্তানের চোখে-মুখে শুধু যে শিশুসুলভ লালিত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নহে, মাতৃহৃদয়ের স্নেহময়ী কোমল

অঙ্কে বসিয়া পরম বিশ্বাসে তাহার হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিয়াছে—সকল অভাববোধ তাহার দূর হইয়া গিয়াছে। ম্যাডোনো চিত্রের সুসংস্কৃত রুচিসম্মত পরিচ্ছদও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আবার মাইকেল এঞ্জিলো-অঙ্কিত ‘পবিত্র পরিবার’ চিত্রে আমরা যে কেবল মাত্র বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই তাহাই নহে, চিত্রখানি এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুবসন্ত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। গোয়া-অঙ্কিত ‘পবিত্র পরিবারের’ চিত্রখানিতে আরও উচ্চাদর্শের ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরিচয় আমরা পাই। মাতার যে চিত্র রহিয়াছে ‘তাহা পাখিবকে অতিক্রম করিয়া অপার্থিবের কল্পনাই বহিয়া আনে—শিশু দু’টিকে যে ভাবে আঁকা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের দেবশিশু বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। তাই বিনেসাঁস যুগের শিল্পীরা কেবল মাত্র শিল্প রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার ভিতর দিয়া একটি অন্তরঙ্গ গভীর ভাবকে প্রকাশ করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। র্যাফেলের ‘শীতকাল মতাজনদের বিতাড়ন’ চিত্রে আমরা তাহার মুখে একটি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই। র্যাফেল যে কেবল মাত্র গ্রীক আদর্শই যথাযথ অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে—চিত্রে এমন একটি আন্তরিক অনুভূতির স্পর্শ বুলাইয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত আলোখ্যানি বর্ণে, ভাবে, রূপে-বসে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ এই বৈশিষ্ট্যের জগাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বরমাল্য তাহার কণ্ঠেই অর্পিত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে তাব ধর্মপ্রবণ স্থান বিনেসাঁস যুগে ছিল না বলিলেই চলে—ভোগবাদ ও প্রকৃতিবাদই তখন প্রবল হইয়া-দুখা



হোলি ফ্যামিলি (গোয়া)

দিয়াছিল। ইহার পর আমরা দেখিতে পাই চিত্রে আলোছায়ায় অলঙ্কার প্রচলিত হইতেছে—ব্যঙ্গকৌতুকের চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, শিল্পের রস প্রবাহ ক্রমে সংস্কৃত হইয়া একটু উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর পথে অগ্রসর হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে জাপানীশিল্পী-অঙ্কিত বহুচিত্র ইউরোপে প্রচলিত হয়। এই সমস্ত চিত্রে কোন বিষয়বস্তু খুঁটিনাটি আদৌ অঙ্কিত হয় নাই। কয়েকটা নিপুণ বোথার টানে আর কয়েকটি বিচিত্র বর্ণের সুসঙ্গত পবিবেশে অজানার আভাসই দেওয়া হইয়াছে। এই সময় ইউরোপে একদল 'চায়াবাদী' শিল্পীসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ইহাদের মত, যখন আমরা কোন একটা দৃশ্য লক্ষ্য করি তখন তাহা কখনও আংশিক ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্বত দেখিতে গিয়া টুকবা টুকরা পাখ দেখি না, অবশ্য দেখিতে গিয়া কোন বিশেষ গাছ লক্ষ্য করি না—তখন আমাদের দৃষ্টির সামনে কতকগুলি বিভিন্ন বর্ণস্তরই প্রতিভাত হয়—এই স্তব পর্ধ্যায় কতকগুলি হালকা আব কতকগুলি গাঢ়বর্ণের সমাবেশ মাত্র। তাই তাঁহারা বলিলেন, এই বর্ণস্তরগুলিকে যথাযথভাবে অঙ্কিত করিতে পানিলেই চিত্র সার্থকতা লাভ কবে। শিল্পেব বখচক্র অনাদিকাল হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাব শেষ নাই, ইহার বিবাম নাই। যেদিন শিল্পেব এই নব নব রূপসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী ক্লাস্ত হইয়া পড়িবে, সেইদিনই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পেব দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব, শিল্পী কেবলমাত্র ভাববৈচিত্র্য খাব অঙ্গসৌষ্ঠব ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহিতেছেন না।—শিল্পে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে 'গতিবেগ'। স্তবৎ চিত্রশিল্পে আব এক নুতন ধাব উদ্ভব হইয়াছে। ভাবতীর ভাস্কর্য্যেও আমরা



বীণথুষ্ট কল্লুক মহাজনদের বিভাড়াণ

ইহার সন্ধান পাইয়া খোদিত চিত্র বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দেখিতে পাই, সেখানে আমরা এই গতি-ভঙ্গিমার সুন্দর প্রকাশ দেখিতে পাই।

ইউরোপীয় শিল্প-গণ আবাব এই গতিকে প্রকাশ করিবাব জন্ত এতদূব অগ্রসব হইয়াছেন যে, অশ্বের হৃদমনীয় গতিকে প্রকাশ করিতে গিয়া চাবি-খানির স্থলে কুড়িটি পদ সংযোজনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নৃত্যেব চিত্রে চঞ্চল গতিভঙ্গিমা ও প্রাণ-চঞ্চলতাকে স্থপরিফুট করিতে গিয়া এমন আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, যাঁহাকে বর্ণক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখাও মুশ্কিল। বস্ত্রমাণে শিল্পেব এতদূব উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, তাহাব বস উপলব্ধি করা সাধাবণের দৃষ্টিতে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানের সাহিত্যে যেমন আব সম্পৃষ্টভাবে ভাব-প্রকাশের বাঁতি নাই, শিল্পেও তাহাবই অনুকরণ হইয়াছে।



নারী (অজ্ঞতা)

এখনকার কোন চিত্র বা ভাস্কর্য্য ভাল করিয়া অনুসরণ করিতে হইলে, সর্বপ্রথম জানিতে হইবে কোন শ্রেণী শিল্পী কোন ধাবাব অনুসরণে এবং কি আদর্শের উপর তাহাব বিষয়বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিকতম চিত্রশিল্পে যে একশ্রেণীব অতিবাস্তব ধাবাব চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তাহা সাধাবণের নিকট যেমন উদ্ভট, অসঙ্গত, তেমনি হুবধিগম্য। এই চিত্রগুলিতে কেবলমাত্র মানবচিত্তের উদ্দাম অঙ্গের ভাবধাবাব রূপই ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এশিয়ার শিল্প-কলা লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই মানবের দেহরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিবাব

প্রচেষ্টা বড় একটা হয় নাই। জাপানী ও চৈনিকশিল্প যে আদর্শের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতেও কোন মূর্তিকে বসনহীন করিবার প্রয়োজন কোথাও ঘটে নাই।

সামাজিক জীবনে বাহা ঘটিয়াছে, সেই অতি সাধারণ বিষয়-বস্তুগুলি উচ্চতর আদর্শ ও অল্পপ্রবেণায় উদ্ধৃদ্ধ শিল্পকলায় কোথাও স্থানলাভ করে নাই। ভারতবর্ষের রূপশিল্পে আমরা স্থানে স্থানে অর্দ্ধনয়ন নরনারীমূর্তির সন্ধান পাই বটে, তবে শিল্পী সেখানে মাংসল ইন্দ্রিয়গ্রাস্ত ভোগবাদকে প্রতিপাল্য করিয়া কোথাও মূর্তি রচনা করেন নাই। দৈন্য প্রথায় বসনভূষণের ব্যবহারের রীতিটি সেই সময় কেমন ছিল তাহারই আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। ঐগৃহে ও অজস্র অর্দ্ধনয়ন নারীমূর্তি যে রূপটি আমরা দেখিতে পাই তাহার পরিচ্ছদ ও পরিধান-ভঙ্গী তখনকার প্রচলিত রীতির পরিচায়ক মাত্র। এই চিত্র ও মূর্তিগুলির মুখে উদ্ভাসিত অস্ত্রের স্তম্ভভাব ভাববাক্তনা ও স্বর্গীয় স্তম্ভার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, সৃষ্টির মূলে নয়চিত্র আঁকিয়া ভোগম্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টা ইহাতে

নাই। অর্দ্ধনারীমূর্তি বা নেপালের পুরুষপ্রকৃতির মূর্তিতে আমরা যে নয়রূপের সন্ধান পাই উহাতে পুরুষের পৌরুষ ও নারীর মৌনমধুর রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে ভারতবর্ষের সর্বসাধনার মূলে যেমন ছিল বাহা দৃষ্টিগোচর নহে তাহারই আরাধনা, অপরদিকে শিল্পীও এমন কিছুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল বাহা অরূপ। ভারতের শিল্পে অপসরী, নাগনাগিনী, যক্ষিনী, নর্তকী প্রভৃতি মূর্তি ও চিত্রে যে নয়তা দেখান হইয়াছে তাহা যেমন পবিত্র, তেমনই সুন্দর। ভারতের যে ইন্দ্রিয়বাদ আমরা দেখিতে পাই তাহা এই সুললিত ইন্দ্রিয়ভোগ নহে, তাহা অতীন্দ্রিয়—আমাদের এই চর্যচর্য কোনদিনই শ্রেষ্ঠ দাবী করিতে পারে নাই—কারণ মনের মন এবং এই চোপের চোখই এ-দেশে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। তাই ভারতে স্রষ্টি ও ভাগবতীলীলার আদর্শ যে-অর্দ্ধনয়ন চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে, সভ্যতার কুঁচুরাঘাতে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায় নাই। দেবতার বাসগৃহের অলঙ্কার হইয়াই মন্দিরগাড়ে স্থান পাইয়া আসিতেছে।

বাহির বিশ্ব (গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

সনাতন আপন হাবা হয়ে চেয়ে থাকে।

ময়ুরাক্ষীকে দেখে আসছে কবে কোন অজানা দিন থেকে জানে না, ওপাবের খয়রাকুড়ীর শালবনেব সাবি, কাছিমের পিঠেব মত ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে আকাশেব পানে, বিস্তৃত নদীর রূপালী বালিশাশির মাঝে বয়ে চলেছে শীতের কাজলধাবা, ময়ূরের চোখের মত নীল। অদূরে ছপূরের কপিশ বৌদ্রতপ্ত আকাশের নীচে দাড়িয়ে বয়েছে নীলাভ পর্বতশ্রেণী, আকাশেব মাঝে বাতাসেব আনাগোণা।

ছাতিম গাছটার নীচে বসে থাকে সনাতন।

চোখ দুটো দিয়ে খুঁজে চলে কোন হাবাখাজ্যেব সীমাবেধ।

ভাগুর বনেব সীমাবেধা ছাড়িয়ে বায়নি কোথাও। মুখযে পাড়ার সরুপথটা বুদ্ধিকে বাঁচিস্তিব কালো বেড়া, কাকব ভবা সরুপথটার উপর লুটিয়ে পড়ে বাশবনেব পাতাগুলো, সেয়াকুল গাছেব কোনে বাগানের নীচেটা বোকাই। রাস্তার বাঁকে দেখা যায় বাঁক-ছিন্ন মলিন তালাই, কালিমাখা চাড়ি বয়ে চলেছে সাওতালেব দল।

এই তার জগৎ, এই তার সীমাবেধ।

আজ মনে হয় সনাতনের গতজীবনের কথা।

সে অনেক দিনকার কথা নয়—মনে হয় যেন সবে কাল—

মল্লিক পাড়াব নীরব রাস্তাটা বায়ুনমাসীর বাজখাই গলার শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। ছেলের দল যেদিকে পারল দৌড়। সনাতন হাতের ভাস্কাটা ফেলে দিয়েই ছুট।

বায়ুনমাসী যমের কাছে কৈকিয়ৎ তলব করে চলেছেন—“অত লোক মরছে, ও আটকুড়োর পুত্রা মরে না কেনে? একি কানা হইচ?”

সনাতন আব সকলে তখন অনেক দূরে—পালপাড়ার নদীর ধারে আমবাগানটায়। ছায়াময় আমবাগানে গায়ের কোলাহল পৌছে না, বাঁচবার এ একটা সহজ সরল পন্থা।

• সনাতন সচকিত হয়ে ওঠে—“ওই!”

খিল্ খিল্ করে হাসতে থাকে কুসুম—“হাঁ-তো ভুললই!”

—“হ্যাঁ পেট্টী!—দেখিস্ যেন আবার বলে দিস্ না মাকে?”

সনাতনেব কথায় হাসতে থাকে কুসুম। “বুঝি পাঠশালা পালিয়ে—” কথাটা শেষ হয় না কুসুমের। ঘাড় নাড়ে সনাতন।

পাঠশালা ভাল লাগে না। একপাল ছেলে গাদাগাদ কবে বসে ক্যাল ব্যাল কবে গবমে। চোখের সামনে দিয়ে অমন ছপূর বৈকাল পার হয়ে যায়,...এটা সহিতে পারে না সনাতন, রোজই ঘুমন্ত পণ্ডিত ম'শায়েব নাকের উপর দিয়ে বার হয়ে আসে। নির্জন নদীতীরেব বাগানটা তাকে ডাক দেয় হুঁহাত দিয়ে। থ' থ' বিকম্পিত কাশবন মৌন গুঞ্জন তুলে মন তার উতলা করে তোলে।

কুসুমের ডাকে তার চমক ভাঙল—“ওপারের বনে পিয়াল।”

পিয়াল পেকেছে, পত্রহীন গাছের মাথায়—থোকাং থোকাং। চলে হুঁজনে, উত্তপ্ত বালিশাড়ির বৃকে পায়ের ছন্দ তুলে চলে তারা হুঁজনে—!

তাদের ছোট বাড়ীখানায় আজ যেন সনাতন আগন্তুক।

সারা আকাশ বাতাসে শোনে কার স্তব্ধ মিনতি? বাঁশগাছের কম্পিত শাখাপ্রশাখার মর্মরে প্রফুটিত হয় কার ক্রন্দন ধ্বনি। বাড়ীখানায় সে থাকতে পারে না। কত লোকের ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠস্বর! সনাতনকে উদ্দেশ করে কে যেন কি বলে! সনাতনের হৃদয় নাই।

হীরাবব রূপের আকাশে সাগা মেঘের শীর্ণভেলা, শরতের নির্মূল নীল আকাশ, গড়ের কালো জলে সাপলা-ফুলের অমলিন হাসি। দূরদিগন্তে অগস নয়নে চেয়ে থাকে সনাতন।

মাকে নিয়ে বার হ'ল ওরা, সনাতন চলে পিছু পিছু। তার মুখে আজ কথা নেই, হারিয়েছে সে তার গতিবেগ।

চিতায় তুলে দিল ওরা, সনাতন যেন স্বপ্ন দেখছে। বাগানের প্রান্তে ছাতিম তলায় চিতার লেলিহান শিখায় সনাতনের সংসারের ক্ষীণ বন্ধনসূত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে লালভ পিঙ্গল শিখাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

ওপারের বনভূমিতে নেমে এল সন্ধ্যা। অস্পষ্ট অন্ধকারে রাতের বাতাস যেন নদীর চবে কাকে খুঁজে মরে, পায় না; বুক দীর্ণ করে বার হয় দীর্ঘশ্বাস। চিতাব আঙুন ম্লান হয়ে আসে।

“চল, ঘরে যাবে না—!”

কার করম্পর্শে সনাতনের চমক ভাসল! কুশুম!

কথা না বলে ধীরে ধীরে পথ ধরল।

সে রাতে ঘুমতে পারে না। সাবা দেহমন বিজ্রোহী হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশে শতক তারার রোশনী! কন্ডলের রোয়াগুলো তিরস্কাব কবে তাকে। তুই একা!

এ পৃথিবীতে তার কেউ নাই—! আজ সে একা! একা! চঞ্চলভাবে দাঁওয়ায় পাথচরী করে সনাতন!

—“ঘুমোওনি—?”

কুশুমের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে এসে সনাতনের সামনে বসল। কোন নিশাচর পাখী আর্ন্তক্রন্দন ধ্বনিতে গণনা করে গেল বাতের প্রহর। রাত শেষ হয়ে এল।

কথা কও! কথা কও! নীরব বাত্রির হল নব জাগরণ।

কুশুমের বাড়ী থেকে বের হয়ে চলে সনাতন লক্ষ্যভ্রষ্টের মত! নিজের জনহীন বাড়ীটায় ঢুকতে সাহস হয় না! মা কোথা গেছে বাইরে হয় তো ও-পাড়ায়। এখনি এসে পড়বে। কিন্তু আসে না। হয় ত পথ ভুলে গেছে কোন দূরে। ওই লালমাটির দেশে হুমকা—রাণীপাথর—আবও, আবও অনেক দূবে...ওই নীল ছায়াময় পাগড়গুলোর ওপারে! দুপূর্বের রোদে সমাধিস্থ যোগীর মত নিঃস্ব হয়ে বিজ্ঞান কবে পাগড়গুলো! ওর ও-দিকে!

শ্রামরায়ের মন্দির প্রান্তনে জমেছে তীর্থকামীদের জনতা। বিশাল চত্বর নহবৎখানা সব ভরে গেছে, বাইরে এখানে ওখানে লোক আর ধরে না। গোষ্ঠের মেলা এবার নাকি বেশ ভরে বসেছে। সনাতনের অবসর নাই। কলসী করে জল তুলছে নদী থেকে—বাগা যরে। চাকরি নেহাৎ মল্ল নয়; দিনগুলো চলে যায় কোন রকমে।

শত শত লোকের মাঝে সনাতন অবাক হয়ে গল্প শোনে। এখানটা নাকি ভাল নয়! এর চেয়ে ঢেব বেশী শ্রমের ঠাঁই আছে। কত ভাল! কি-পুরী-নাকি! খুব বড় মন্দির, সমদ্র—আকাশের মত চেউ!

একজন বাবাজী গল্প করে কলেবরের শিবমন্দির মাঠেব।

বিশাল উঁচু মন্দির! আর বাগান—ফুলে ফুলে আলো হয়ে

রয়েছে! কোন স্তম্ভের কাহিনী খণ্ডগিরি! হুর্গম পর্বত—ওমনি নীল রঙ...ছায়া মাখান পাগড়!

কি একটা শহর—শিউড়ী! লাল রাস্তার ছদিকে কেমন সারি সারি পাকা বাড়ী। কত লোকজন! রেলগাড়ী।

কথাগুলো উদ্গ্রীব হয়ে শুনে যায় সনাতন! সে...হ্যাঁ সে যাযেই!

“...এই সোনা, এ্যাই!”

ভাতে জল দিতে হবে বোধ হয়। ব্যাটা ঠাকুরটা চোখ বুজে চীৎকার করছে, চোখ বুলে গুলির নেশা নষ্ট করতে রাজী নয়।

সনাতনকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়।

দলে দলে যাত্রীরা আবাব মোট ঘাট বেধে রওনা হয়। শীতের দিন মাঠে আধপাকা ধানগাছের মাথায় থানের মজরী লুটিয়ে পড়েছে, লাল রাস্তার ছদিকে নিশিলের বন! বেগুন গাছগুলো হুইয়ে গেছে ফলের ভারে!

বাবাজী আশ্চর্য হয়ে যান বুদ্ধাবনের কঠোর। “বাবি তুই?”

ঘাড় নাড়ে সনাতন! সে চলে যাবে এখান থেকে। এখানে সে আর থাকবে না। কেমন পাগড় ঘেরা পথটা দিয়ে দূরে—বহু দূরে চলে যাবে সে। পুরীর সমুদ্র ধার! খণ্ডগিরি...পাগড়ে ঘবে ছোট নদীটাব ধাবে কেমন ছবির মত স্তম্ভের জায়গা!

সে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে এখান থেকে! সারা দেশে-দেশে।

বাবাজী হাসেন—শান্ত স্নিগ্ধ হাসি। তার পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত কবেন।

“এখন না—পরে। কেমন?”

অগত্যা ঘাড় নাড়ে সনাতন! বড়োর সাগা দাঁড়ি লুটিয়ে পড়েছে বৃকের উপব। কাঁধে ডোবাকাটা থেরোটো নিয়ে লাঠি হাতে পথ ধরেন!

তার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে সনাতন।

পালপাড়ার নীববতা ভঙ্গ করে একদিন কয়েকটা ঢোল-কাশির সম্মিলিত শব্দ। একটা কোলাহল, বাইরে থেকে কয়েকটা গাড়ীতে করে কয়েকজন লোকজনও এল! সনাতনও গিয়েছিল, যেতে হয়েছিল তাকে। কুশুমের বিয়ে হয়ে গেল! দিবি হাসি মুখে সকলকে প্রণাম করে কেমন গাড়ী চড়ে শওর বাড়ী চলে গেল আর পাচজনের মত! সিউড়ী থেকে রেল চড়ে না কি যেতে হবে ঐ দিকে। তাবা চলে গেল!

ক্লান্ত দ্বিপ্রহর ম্লান হয়ে আসে, সারাটা আকাশ বাতাস যেন কঁদে চলেছে। হলদে বোধ শয়ন বিছায় নিস্তব্ধ গ্রামের ছায়ায়! মা-হাবা গোরখসের চীৎকার ভেসে আসে কোন স্তম্ভের বাতাসে! আকাশটা কেমন থমথমে, ওরা চলে গেল এতক্ষণ অনেক দূরে! হিংলে নদী পার হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সনাতনের কাঁধে মন বসে না।

কুহেলীমাথা রাতের আধারে ফুটে ওঠে ম্লান তারকার কাঁদন-ভরা চাহনি। পাখীরা শান্ত আকাশ কলববে ভরিয়ে তুলে চলে গেল ওপারের বনসীমায়। ময়ূরাক্ষীর বালুচক-নামে রাতের অন্ধকার। শাল জললটা শাখা-প্রশাখা মেলো জড়িয়ে ধরে ঘন কুয়াসার স্তবক।

বাইরের পথ ডাক দেয় সনাতনকে! ব্যাকুল তার স্তর! সামনে আকাশ জোড়া অন্ধকার, পথ সে চেনে না! নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে ওঠে তার অন্তরাঙ্গা—ওগো মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, আমার চলবার পথে আলো দেখিয়ে দাও!

শালবনে মাভামাতি লেগেছে খ্যাপা বাতাসের, রাতের আঁধারে শাখাশ্রয়ী বিহঙ্গের দল ঝটাপীটে করে, কে যেন মুখ খুবড়ে পড়ে শক্ত গ্রানাইট পাথরের বুকে। বাব কতক ঝটপট কবে শেষ হয়ে যায়। চঞ্চু বেয়ে গড়িয়ে পড়ে হুঁ এক ফোঁটা রক্ত। সব শেষ!

সে আজ অনেক দিনের কথা।

তাবপব চলে গেছে কয়েকটা বছর! মুক্তি সে পায়নি, দেয়নি তাকে! মন্দিরের একমাত্র কাজেব লোক ছিল সেই। এত কম মাইনেতে সারাদিন প্রাণপাত করে কেউ শ্রম করত না।

রামদাস ঠাকুর তার কথায় প্রতিবাদ করেন, “মন্দিবেব শিস্যবা কেউ ছেড়ে যেতে পারবে না?”

সনাতন বলতে ছাড়ে না—“কিন্তু”।

বাধা দেন বামদাস বাবাজী, “এব কৈকিয়ং দেব ধর্ম্মেব কাচে সনাতন!

মন্দিবেব ধর্ম্ম নষ্ট করা মহাপাপ! এবপব আর কথা চলে না, ধীবপদে সনাতন বার হয়ে আসে। দোলমঞ্চের পাশ দিয়ে সাণা অন্তর তাব হাতাকাব কবে।

তবে কি যাওয়া হবে না, মুক্তি কি তাব মিলবে না ঠাকুর। .. কোন সাড়া নাই।

তার ছোট্ট আকাশে টিপ পরিয়ে দেয় কোন না-দেখা বাতের ঘুমপাড়ানী মাসী, কাব স্তবেলা বাণীর আলাপনে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়ে ধড়ফড় করে বাইবে বার হয়ে আসে।

চাঁদ উঠেছে, ময়ুরাক্ষী বালুচবে লুটিয়ে পড়ে বিধবাব হাসিব মত মলিন চাঁদের আলো, তাভাতাভি কবে একটা পুটলি বেঁধে নিয়ে সে বার হয়ে আসে। সে চলে যাবে—তাকে ডাক দিয়েছে আভাল থেকে হাতছানিতে!

কিন্তু যাওয়া তার হয়নি। কি যেন একটা ক্ষণিকের উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসেছিল। আবার সকাল হ'ল। ভার্ণব বনের আকাশ বাতাসে বাইরের কাব ডাক এ'ল তাব কানে।

কিন্তু যাওয়া তাব হ'ল না। সে যাবে—যখনই চোক।

* * *

সে আজ অনেক দিনের কথা! কেটে গেল সংখ্যাগীন বছবেব আনাগোনা। ময়ুরাক্ষী ওপারেব বনভূমিতে রূপ বদলাব কতবার—ছাতিম গাছের পাতায় এল কত বছরেব নিমগ্ন, তাব খবর সনাতন বাখেনি।

এদিকটার নদীর ভাঙ্গন ধবেছে। পালপাভাব আমবাগান সব কোনদিন ধরে মুছে গেছে। অমন বাগানটা—সেখানে আজ চলে ময়ুরাক্ষীর জলধারা। মন্দিরটা হয়েছে জীর্ণ হতে জীর্ণতব।

লোকের ভক্তি কমেছে বই বাড়েনি।

জীর্ণ শব্দেব সনাতনের আর খাটবার সামর্থ্য নাই। বাবাজীও মরে গেছে। এসেছে এক নূতন সেবাইং। ছোকরা বয়েস। সেবাইং চটেই আগুন—কখন একটা কালো কুকুর

টকেছিল, দেখেনি সে। সেবাইং গর্জন করে: “দূর করে দাও বুড়োকে ঐ কুকুরের সঙ্গে! দিনরাত কেবল ঝিমুবে আর ভোগ বসাবে!”

সত্যিই কিছুদিন থেকে সনাতনের কায করবার শক্তি কমে এসেছে। সেবাইং কথায় কথায় কাল খাড়েন, “দূর করে দাও বুড়োকে!” কায করবার চেষ্টা করলে জীর্ণ হাড় ক'খানা মটমট করে, কখন অচল হয়ে যাবে একেবারে। দীর্ঘ আশী বছর ওরা কায করেছে, এবার চায় বিশ্রাম।

নদীতে এসেছে বর্ষার জলধাবা। তরতর করে স্থির নিষ্পন্দ গতিতে তাল দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলে নীচেব দিকে। শিউড়ী নাকি এরই ধাবে। আরও কত সহর! কালো হেলেপড়া আকাশেব সীমা স্পর্শ করে খয়রাকুড়ীর সজল বনভূমি। বৃষ্টির জল রচনা করে তার চোখে নীলাঙ্গন। মাঝে মাঝে বনভূমি মুগরিত করে ভেসে আসে ময়ূরের ডাক—কেউ...কেউ...।

নিষ্পন্দ কাশবন কাঁপে বরষার বাতাসে থর থর কবে মেঘ-মুদঙ্গব তালে তালে। বুড়োব চোখে সব কিছু ঘোলাটে হ'য়ে আসে। সে যদি চলে যেত গাড়ীতে করে অনেক—অনেক দূরে পূর্বাব সমুদ্রের ধাবে, খণ্ডগবির নিষ্কজন পাহাড়ে—!

বুড়োব শিশুমন ব্যর্থ হতাশায় গুমরে ওঠে। রাতের আঁধারে জীর্ণ দেহখানা টেনে নিয়ে চলে মন্দিবেব পানে। বৃষ্টির তলে সারা গা মাথা ভিজে একসা হ'য়ে গেছে। বুড়োর খেয়াল নাই। জীতে কাঁপছে!

বাইবে থেকে কষ্টস্বব গুনতে পায় সেবাইংয়ের। “তাকে মন্দিরের সীমানায় দেখলে আমাব একদিন কি তারই একদিন। দূব ক'রে দেবে তাকে—”

সনাতন দাঁড়াতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়ে সেইখানে। মন্দিবেব দরজা বন্ধ। ইয়া তার কোন দরকাব নেই এখানে! সে এতদিন পব মুক্ত। অদূবে জীর্ণ বকটার বসল! আকাশে অবছে বধাব বারিধাবা। ভিজে কললটা জড়িয়ে ব'স থাকে।

অন্ধকার! সারা পৃথিবীটা পাক খায় তাব চোখের সামনে। উদ্ভব দাস,—গোষ্ঠের মেলা, কত লোকজন, পুরীর বিশাল নীলাভ সমুদ্র, আকাশ ছুঁয়ে আসছে ডেউএর রাশি। সিউড়ী—মস্তবড় সহর—বুড়োর হুঁচোখ যেন ঠিকরে বা'র হবার উপক্রম। গলার কাছে কি একটা দলা পাকিয়ে আসে! মাথাটা হুঁহাত দিয়ে চেপে ধরে প্রাণপণে!

চোখের সামনে দস্তুর পারাবার!...রাত হ'য়ে আসে। অনেক রাত। অন্ধকারেব শেষ নাই।

—আলো! কোন বাহুমন্ত্রে আবার ফুটে উঠেছে আলোর রেখা, হুঁচোখ বলসে যায়। কাব ডাকে সনাতন ধড়মড় করে উঠে বসে। বাইরের আকাশ আলোর ভরে গেছে। সেই হারাণ বাবাজী! শুভ শঙ্ক বয়সের ভাবে মাথাটা বুকের উপর হুইয়ে পড়েছে, মুখে তার স্নিগ্ধ মধুর হাসি। —‘চল, যাবে না!’

কথাটা বিশ্বাস কর্তে পারে না। সে আজ মুক্ত! সামনে তাদের পথ উঁচু-নীচু! নীল পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে চলেছে! বেউড় বাশবনের নীচে বয়ে চলেছে পাখরের বৃকে নাচতে নাচতে স্বচ্ছ জলধারা।

পাহাড়ী ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস ভরপুর। সনাতন এগিয়ে চলেছে! নীচের দিকে দেখা যায়—পাহাড়ের ফাঁকে বন-ভূমির অন্তরালে সাদা সাদা বাড়ীর আঁকব সহর।

আনন্দে নেচে ওঠে তার প্রাণ—সহর! ... সিউড়ি নয় ত! কেমন পাকা বাড়ীর পাশ ছুঁয়ে রাস্তাগুলো চলেছে...

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সনাতন। কতক্ষণ ছিল জানে না। পিছন ফিরে দেখে—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নাই! কোথায় সে চলে গেছে।

পিছু পিছু ছোটো সনাতন! পাহাড় চড়াই-উৎরাই ভেসে। বনভূমির মাঝ দিয়ে সে উন্মত্তের মত চলেছে। চলেছে ত চলেছেই।

পাহাড়েব অন্তরালে সূর্য কখন ডুবে গিয়েছিল জানে না। প্রাণপণে ছুটে চলেছে সনাতন। চীৎকার করে—‘কোথায় এগো কোথায় তুমি!’

সাদা মেলে না! কণ্ঠস্ব প্রতিকর্ষিত তোলে আকাশ বাতাসে।

গভীর বাগী বাতাসে বাতাসে ভেসে ওঠে কার স্তব্ধ ক্রন্দন-ধ্বনি। চলেছে সনাতন। এ পাশে কারা যেন হাসছে!

হাসছে তাকে দেখেই। অশরীরী আত্মাবল ঢল চোখেব সামনে অন্ধকারে ছায়ামূর্তি হয়ে তাকে ভয় দেখায়! অন্ততব করে

সর্বাস্তে তাদের উচ্চ নিশ্বাস। ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে। সারা বনভূমিতে চলেছে উত্তাল বাতাসের উদ্‌দাম-মৃত্যু।

—‘আলো—আলো—’

চারিদিক থেকে ভেসে আসে কাদের অট্টহাসি। নৈশ আকাশ-বাতাসে ওঠে অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ।

কোনদিকে কি হয়ে গেল, জানে না! পাখরে হোচট খেয়ে ঠিকরে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে! চলেছে নীচের দিকে! বেউড় বাশের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সারা গা রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে! বনভূমির অন্ধকার কে বেন হ’হাতে ছিটিয়ে দেয় সারা আকাশ-বাতাসে।

উন্মত্ত বনানীর বনম্পতিদের মাঝে ওঠে, ভীতির স্পন্দন!! রাতের মায়ায় পৃথিবী আজ কিপ্ত।

ঝড় চলেছে

আবার সকাল হয়। দিনকরমত ভাণ্ডির বনের ছায়া বেখায়, নদীর বালুচরে কাশবনে দেখা দেয় দিনের সূর্যের বন্দনা। আবার পৃথিবীর হয়েছে নব-জাগরণ!

বৃষ্টির জলে সারা গা খান খুয়ে মুছে গেছে! এখন জল জমে রয়েছে ঠাঁই। কাল রাতের বষণ চিত্র।

পাড়ার লোক জড় হ’য়ে পড়েছে! ... জীর্ণ রকটার চারি পাশে ভীড় করে। বৃদ্ধ সনাতনের দেহটা পড়ে রয়েছে জীর্ণ চালাটার নীচে।

সে আর নেই। চলে গেছে বহু দূরে তার মুসাম্মির আত্মা। আর কোন দিন ফিরে আসবে না ভাণ্ডির বনের সীমাবেধায়—ময়ূরাক্ষীর বালুচরে খয়রাফুড়ীর শালবনের সীমানায়!!

সে আজ বহু দূরেব পথ হারাণ পথিকদের সঙ্গী।

দুটী ঘুম

কাদের নওয়াজ

শরতের মিঠি বোদে, দুটী ঘুম
উড়ি উড়ি ডাকে,
বৃকে বৃক্ দেয় কত, মুখে মুখ
ব্লাইতে থাকে।
আগডালে ব’সে
কতু ডানা ঘষে,
কতু গাব্ গাছে গিয়ে
রবির আলোকে,
গাব্ গুবাগুব্ দোহে
বাজায় পুলকে।
এ দিকেতে কবি,
শরতের ছবি—
আঁকি হুদে, যতবার
বীণাটা তাহার,
মাধিবারে চায়, তার,
ছিঁড়ে বাবে বার।

হেরি হুদ্দিন,
ছিন্ন এ বীণ
কবিরে প্রবোধ দিয়ে
দুটী ঘুম পাখী,
ঘু-ঘু রবে স্তব্ধ ধবি’
গাহে থাকি থাকি।
তাহাদের সনে,
গুঞ্জরণে—
শরতের আবাহনী গাঠিল ভ্রমর,
বিস্তিত কবি, শুধু নয়নে বাদর—
খরিল, হুদয় গেল ব্যাখায় ভরি
ছিন্ন বীণাটা র’ল ধূলার পড়ি।

মা নহে—মহাশ্মশান

খান মোহাম্মদ মোছলেহউদ্দিন

হুদ্দিন বড় আজি

ভারত মায়ের মন্দিরে উঠে বিপদ শব্দ বাজি’।
পূজারীর বেশে পূজা-অরি এসে ছয়ায়ে দিচ্ছে হানা—
রক্ষা তাহার নিদ্রা কাতর জাগনি উন্মেষণা,
ভারত মায়ের সন্তান মোরা হিন্দু মুসলমান,
একই বৃকের স্তম্ভে মোদের বাড়িয়াছে দেহ-প্রাণ।
ভাই ভাই আজ রক্ত-পিয়াসী—স্নেহ দয়া মায়ামীন,
একের বৃকেতে ছুরি বসাইতে অস্ত্রের কাটে দিন।
আত্মকলহ, ঘৃণা-বিষ-বায়, স্বার্থের সংঘাত,
করেছে ভাগ্যা-আকাশে কৃষ্ণ-বজ্রার ছায়াপাত।
সবাই চাহিছে নিজের দাবী করিতে সম্পূরণ—
নিজের দাবীটি পূরণ করিতে অপর উৎপাড়ন।
এই নিরে হায় হাসি কান্নায় ঘৃণা আর অভিমান,
ইরত হুদ্দিন পরেই দেখিব মা নহে—মহাশ্মশান।

থিয়োরীর মরীচিকা

ঐবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

থিয়োরীর যুগ শেষ হয়ে আসছে। The will-to-power is stronger than any theory. শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এক একজন শক্তিমান মানুষের অজুলিহেলনে সব কিছু চলছে! পাটি প্রোগ্রাম সবই গোঁপ হ'য়ে পড়েছে। কংগ্রেস মানে গান্ধী, জাফানী মানে হিটলার, পাল'মেন্ট মানে চাঞ্চিল, চীন মানে চিয়াংকাইশেক, রাশিয়া মানে ষ্ট্যালিন! একটা কাটা-ছাটা আদর্শের ছাঁচে রুঢ় বাস্তবকে ঢালাই করা সম্ভব নয়। থিয়োরীর কোনো দাম নেই—এমন কথা বলছিলেন। বড়ো বড়ো সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে মতবাদের দাম নিশ্চয়ই আছে। গ্রামের লোকেরা মতবাদ বা থিয়োরী নিয়ে অতশত মাথা ঘামায় না। গান্ধীজী ১৭/৪২ তারিখের হরিজনে ঠিকই লিখেছিলেন, The people do not weigh the pros and cons of a problem. They follow their heroes. সহরের লোকেরা থিয়োরীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হোলেও বেশী দিনেব জগ্না নয়। রুসোর Contract Social, মাক্সের Communist Manifesto হাজার হাজার মানুষকে মাতিয়েছে! কিন্তু একটা সময় এলো যখন রুসোর Rights of Man-এর থিয়োরী তার আকর্ষণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো। আজ Contract of Social নিয়ে কত মানুষ মাথা ঘামায়? অথচ রুসোর আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের মতো একটা যুগান্তকারী আন্দোলনের স্রষ্টা আর সেই আন্দোলনকে দিখিজরী করবার জগ্না সহস্র সহস্র ফরাসী নাগরিক অকাতরে জীবন বলি দিয়েছে।

মাক্সের উপরে বিশ্বাসও আজ চোখের সামনে হ্রান থেকে হ্রানতর হ'য়ে যাচ্ছে। খাউ ইনটাবল্যাশনালের সমাদ বিসের ইঙ্গিত করছে? মাক্সের World Revolution-এব স্বপ্ন আজ পরিণতি লাভ করেছে কোন্‌খানে? Spengler বলছেন: But, as belief in Rousseau's Rights of Man lost its force from (say) 1848, so belief in Marx lost its force from the World War...রুসোতে বা মাক্সে বিশ্বাসের এই দান-তার পিছনে কোনো আত্মোপ নেই, আছে ক্লাস্তি। কোনো থিয়োরীর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ শেষ পর্যন্ত হর্যাব হয়ে যায়। থিয়োরী দিয়ে বাস্তবকে শাসন করবার মূঢ়তা কেবল আধুনিকতাব বৈশিষ্ট্য নয়। প্রেটো নিজের আদর্শ দিয়ে সিবারিকউজকে (Syracuse) রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, নগরীর রূপান্তর ঘটেনি, অবনতি ঘটছিল। থিয়োরী-পাগল জ্যাকবিন্স সাঁমোয় এবং স্বাধীনতার আদর্শের দ্বারা উদ্ভুদ্ধ হ'য়ে ফরাসী দেশকে উদ্ধার করলো, কিন্তু আর্থীর হাতে শেষপর্যন্ত ঢলে গেল ফ্রান্সের ভাগ্য।

জনগণের অধিকারকে কাগজে-কলমে স্বীকার করা এবং জাতির সত্যিকারের জীবনে জনগণের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা ঠিক এক কথা নয়—the rights of the people and the influence of the people are two different things. The more nearly universal a franchise is, the less becomes the power of the electorate. ভোটাবিকারক ব্যাপকতর করা মানে ভোটদাতাদের ক্ষমতাকে ক্রমশ: হ্রাস ক'রে

দেওয়া। রাষ্ট্র খাতায় পত্রে আমাকে যতই অধিকার দিক না, টাকা না থাকলে সে অধিকার অর্থহীন হ'য়ে থাকবে।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তিমান পুরুষেরা টাকার সাহায্যে রেডিঘো আর সংবাদ-পত্র জনসাধারণের মত গড়বার এই ছ'টো যন্ত্রকেই অধিকার করে। একদিকে তারা নিজেদের অনুকূলে জনসাধারণের মতকে গ'ড়ে তোলে—আর একদিকে চাকরী দিয়ে, পিঠি চাপড়িয়ে এবং আরো নানা উপায়ে এমন একদল মানুষ তৈরী ক'রে, যারা হবে নিজেদের ছায়া এবং প্রতিধ্বনি। বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতৃগণের চিন্তা-বিনোদন করে, কেঁদে গায়ের পোষাক ছিঁড়ে ফেলে, ভয় দেখিয়ে উপটোঁকনের সাহায্যে এবং সর্বোপরি টাকার সহায়তা নিয়ে জনসাধারণের চিন্তাজয়ের চেষ্টা সিসারোর এবং সিঙ্গারের রোমে আমবা দেখতে পাই। সেখানে ভোজ দিয়ে নির্বাচনকারীদের হাত করবার কথা আমরা ইতিহাসে পাঠ করি। ভোট পাওয়ার জগ্না সীজারকে প্রচুব অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অনেক টাকা তাঁব ধাব হ'য়ে যায়। গলদেশ (Gaul) জয় কোরে তবে তিনি বক্ষা পান। অনেক টাকা তাঁব হাতে আসে। সিঙ্গার যে টাকা জমিয়েছিলেন—সে টাকা আনন্দ পাওয়ার জগ্না নয়, মনিব্যাগের সোপান বানিয়ে শক্তির শিখরে উঠবার জগ্না। এখানে সিঙ্গার আব সিসিল রোডসের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

গোমেব ফোরামে (Forum) জনসাধারণকে একত্র জড় করা হতো। সেই সমবেত জনতাকে লক্ষ্য কোরে বাগ্মীর নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে বক্তৃতা করতেন। জনতাকে চোখের সামনে দেখা যেতো। শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের চোখ এবং কান দুয়েরই উপরে গিয়ে পড়তো বাগ্মীর প্রভাব। আধুনিক ইঙ্গ-আমেরিকান রাজনীতিতে জনসাধারণের মনকে ছোঁয়ার প্রধান বাহন হচ্ছে সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্রকে বাহন ক'রে প্রত্যেকটি মানুষকে রাজ-নীতিব ক্ষেত্রে সক্রিয় ক'রে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে বিংশ-শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। মানুষ এখন মানুষের সঙ্গে কথা বলে না। প্রেস এবং তার সহকর্মী রেডিঘো মহাদেশের পর মহাদেশকে ক্রমাগত বাণীর পর বাণী শোনাচ্ছে, সমগ্র জাতির জাগ্রত চেতনায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একই মন্ত্র পরিবেশন করছে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বকীয়ত্ব হারিয়ে ফেলে কিসেব যেন ছায়া হ'য়ে যায়।

যুদ্ধে বারুদ যে কাজ করে—প্রেস সেই কাজ করে! কামানের মতো সংবাদপত্রও যুদ্ধ জিতবার একটা প্রধান অস্ত্র। পুস্তিকার পর পুস্তিকা, সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্র ক্রমাগত তোমার মনের দরজায় ধাক্কা মারছে—যা সত্য তার বিকৃত রূপকে তোমার সামনে পরিবেশন করছে, যা মিথ্যা তাকে সত্য বলে তোমার মনের সামনে ধরছে। একই কথা ক্রমাগত পড়তে পড়তে শেষে মন স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে, যে নাটকের অভিনয় হ'য়ে চলেছে—অনাসক্ত সমালোচকের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখবার শক্তি শেষ পর্যন্ত থাকে না। নর্থ ক্লিফের মতো বহু সংবাদপত্রের এক একজন সম্পাদকারী খবরের কাগজের ছবি, টেলিগ্রাম এবং সম্পাদকারী প্রবন্ধের চাবুক ব্যবহার ক'রে হাজার

হাজার পাঠক-পাঠিকাকে ক্রীতদাসের মত চালিয়ে নিয়ে যায়। Spengler ঠিকই লিখেছেন; Democracy has by its Newspapers completely expelled the book from the mental life of the people. গণতন্ত্রের কল্যাণে মানুষের এখন মনের জীবন থেকে গ্রন্থ নির্বাসিত হয়েছে। গ্রন্থের স্থান নিয়েছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র পাঠ ক'রে রাতারাতি মানুষ সবজান্না হ'য়ে যাচ্ছে। আর এই সব সবজান্না কথায় কথায় অতিমানুষদের মুণ্ডপাতি করে। গ্রন্থের জগতে সত্যের নানাদিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যেখানে বেছে নেবার, প্রশ্ন করার অবসর আছে। কিন্তু বই পড়বার লোক এখন অল্পই। অধিকাংশ লোকেরই মনের জীবনের দৌড় খবরের কাগজ পড়া পর্য্যন্ত। সাধারণ লোক নিজের নিজের পছন্দমতো একখানি কাগজ পড়ে। হাজারে হাজারে এই সব কাগজ মুজা-যন্ত্রের গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়ে হকারের মারকং প্রতিদিন সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছে। উৎসুক পাঠক-পাঠিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রতিটী লাইন গলাধঃকরণ করে, খবরের কাগজে যা কিছু বেরায় তারা সর্কাস্তঃকরণে তা সত্য ব'লে মনে নেয়, সম্পাদকের কথাগুলো সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের মগজকে কি এক বাহু-মস্ত্রে আবিষ্ট করে রাখে। সংবাদপত্রে শুধুই কি রাজনৈতিক প্রবন্ধ? সেখানে আরো কতরকমের রোমাঞ্চকর খবর! সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনকাহিনী, খেলার চিত্তাকর্ষক বিবরণ, যুদ্ধবিগ্রহের চমৎকার সাজানো সংবাদ—পড়তে পড়তে মন সব-কিছু ভুলে যায়। সংবাদপত্রের তুলনায় গ্রন্থ নীরস। সংবাদপত্র এসে সত্য সত্যই মানুষের গ্রন্থ পড়ার অভ্যাসকে কমিয়ে দিয়েছে।

Spengler বলছেন: What is truth? অর্থাৎ সত্য কি? তারপরেই বলছেন: For the multitude, that which it continually reads and hears. অর্থাৎ জনসাধারণ যা সব সময়েই শোনে এবং পড়ে তাই তাদের কাছে সত্য। বর্তমানের চুড়ায় দৌলুমান যে সত্য ব্যক্তিগত নয়, সাধারণের তা মুদ্রাস্থেরই সৃষ্টি! সংবাদপত্র যাকে সত্য বলে চালাতে কৃতসংকল্প, তাই সত্য! What the Press wills is true. ছাপার হরকে যা প্রকাশ পায়, হাজার হাজার লোকের কাছে তা ছুই আর ছুইয়ে চারের মতোই সত্য। আর ছাপার হরফগুলো তাদেরই আজাবহ ভূত্য, যাদের টাকা আছে। এই শক্তিমান লোকগুলিই জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। জনগণের মনকে এরা যে মূর্তি দিতে চায়, সেই মূর্তি দিচ্ছে ছাপার অক্ষরকে সহায় কোরে। গণতন্ত্রের কণ্ঠে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determined) বাণী—সে তো শূন্যগর্ভ একটা কথা মাত্র। আসলে মানুষগুলো হাজার হাজার নর্থক্লিকের মতো এক একটা মানুষের দ্বারা চালিত হয়ে চলেছে আগেকার যুগের ক্রীতদাসের মতো।

খবরের কাগজ যে-হেতু যুদ্ধজয়ের একটা অমোঘ অস্ত্র, সেই হেতু বিপক্ষকে এই অস্ত্রপ্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা রণকৌশলেরই একটা প্রধান অঙ্গ। যবনিকার আড়ালে লোকচক্রুর অগোচরে শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রবল সংঘর্ষ চলেছে প্রেসকে টাকা দিয়ে কে কত কিনতে পারে এই নিয়ে। পাঠক

জানতেও পারলো না—তার সংবাদপত্র কখন মালিক পরিবর্তন ক'রে স্বর বদলিয়ে ফেলেছে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে তারও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। স্পেন্সার লিখেছেন: এখানেও টাকারই জয়জয়কার—টাকা বাধ্য করে স্বাধীন আত্মাগুলিকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বস্ত্র হ'তে। No tamer has his animals more under his power, খবরের কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ লিখে, মন-গড়া সংবাদ ছাপিয়ে পাঠকদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায়। এমন ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায় যে,, তারা দরজা জানালা ভেঙ্গে চারিদিকে একটা হলুদুল বাধিয়ে দেবে। আবার খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগকে একটু টিপে দিয়ে উগ্রস্ত জনতাকে শাস্ত করাও কিছু কঠিন কাজ নয়। সংবাদপত্রসেবীরা হচ্ছে—এই বাহিনীর সেনানায়কের দল, পাঠক-পাঠিকারা হচ্ছে সাধারণ সৈনিক। যেমন প্রত্যেক সেনাবাহিনীতে, তেমন এখানেও সৈনিকেরা চোখ বুজে অন্ধের মত উপরকার নির্দেশ অমুসরণ করে;—লড়াই বে লক্ষ্য নিয়ে চলেছে—যুদ্ধের পরিকল্পনা—এ-সমস্ত পরিবর্তিত হ'য়ে যাচ্ছে সৈনিকের অগোচরে। কোন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পাঠক বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—তা সে জানে না, তাকে জানবার অবসর দেওয়াও হয় না! A more appalling caricature of freedom of thought cannot be imagined. চিন্তার যে স্বাধীনতা—তার কি সর্বনেশে প্রহসন। এখন টাকাওয়ালা লোকেরা সংবাদপত্রকে বাহন ক'বে তার দ্বারা মানুষকে যে-ভাবে ভাবাতে চায়, তাকে সেই ভাবেই ভাবতে হবে। তবুও সে মনে করে স্বাধীন মন নিয়ে ভাবছে! আগে মানুষ স্বাধীনভাবে ভাবতে সাহসই করতো না, এখন সাহস করে, কিন্তু পারে না।

প্রেস তার সর্বনেশে নীরবতা দিয়েও সত্যকে হত্যা করতে পারে। গণতন্ত্র কথা বলবার স্বাধীনতা সবাইকে দিয়েছে কিন্তু প্রেস কারো কথা ছাপবে কি ছাপবে না—সে প্রেসের মস্তিষ্ক। প্রেস যে কোন সত্যকে কান্দিকাঠে পাঠাতে পারে। তার জন্য দরকার বেশী কিছু নয়, শুধু মোনাবলখন করে থাক। সত্যকে কাগজে জায়গা না দিলেই হোলো। সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকারা আসলব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলো না। গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তার এবং অমুভূতির প্রকাশ—রেডিয়ার মধ্যে, সংবাদপত্রের মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি। সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে ক্রাউকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না। প্রতিবন্দীরা টাকার সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে পাঠকপাঠিকাদিগকে বিপক্ষ-দল থেকে ভাঙিয়ে এনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিমাতে নিজের অমুকুল তৈরী করতে। আগেকার রাজারা অনিচ্ছুক প্রজাদের বাধ্য করতো সৈনিকের কাজ করতে। এখন আর তার দরকার নেই। লোকদের দিয়ে বন্দুক ধরাতে চাও? উপায় খুব সোজা। দেহকে চাবুক মারবার প্রয়োজন কি? তাদের আত্মাকে চাবুক হানো। লেখো গরম গরম প্রবন্ধ, বের করো টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম, ছবি পেরে ছবি। দেখবে প্রবন্ধ, টেলিগ্রাম, ছবি অদ্ভুত কাজ করেছে। লোকেরা বন্দুকের ভয় চাঁৎকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, চারিদিকে মার, মার কাট কাট. রব উঠেছে। উত্তেজিত

জনগণ নেতাদের বাধ্য করেছে লড়াইয়ের আন্তরিকতা পাইতে।

গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে এত লাফালাফি করেছে---সর্বসাধারণকে ভোটাধিকার দাও বলে এত কলরব তুলেছি, মুদ্রাস্ফোরণ স্বাধীনতা বলতে ভাবাবেগে নেচেছি---কিন্তু, হায়রে, কোথায় তার পরিসমাপ্তি! কিন্নর 'Government of the people, for the people, by the people.' মর্থের শৃঙ্খলযুক্ত নব মানবের স্বপ্ন! মিলের 'Liberty' বিশ্বকে গণতন্ত্রের নতুন ছাঁদে যারা রূপান্তরিত করতে চেয়েছে, তাদের আদর্শকে ধূলিসাৎ কোরে জীবনের রথ উধাও হয়ে ছুটে চলেছে; জনগণ আজ পৃথিবীর কতিপয় শক্তিমান পুরুষের উদ্দেশ্যনিষ্ঠ যন্ত্রমাত্রে পর্যাবসিত? জনসাধারণের চিন্তা, স্মরণ্য কাজ আজ লোহার শৃঙ্খলে বাধা! ডিক্টেটরেরা সেই চিন্তা এবং কথাকে যেরকম রূপ দিতে চায়, ঠিক সেই রকমের রূপ তাদের নিতেই হবে। জনগণ যাতে মানুষ না হয়ে ব্যক্তিবিশেষের ছায়ায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যাবসিত হয় তার জগৎ, কেবলমাত্র তারই জগৎ men are permitted to be readers and voters. রাজদণ্ড এবং রাজমুকুট যেমন শূণ্যগর্ভ একটা মহিমায় পর্যাবসিত হয়েছে---আসলে রাজার হাতে যেমন কোনো ক্ষমতাই নেই, তেমনি সর্বস্বত্বাধারের অধিকার কথাটাও আজ একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিংশ শতাব্দীর পালার্মেন্টগুলি নাকি জনগণের অধিকারের প্রতীক। কিন্তু আসলে পালার্মেন্ট হচ্ছে একটা চৌকীদার-সমিতি, বড়ালোক-দের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য চৌকী দেওয়া হচ্ছে পালার্মেন্টের কাজ—Spengler-এর ভাষায় a solemn and empty pageantry.

ইলেকশনের এই যে ফার্স—এ ফার্স একদা রোমেও অভিনীত হয়েছিল। টাকা যাদের আছে তাদের স্বার্থেই জগৎ টাকা এই অভিনয়ের আয়োজন করে। ইলেকশনের এই বিবর্ত প্রতশন-গুলোর অভিনয় হচ্ছে কিন্তু জনগণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে। সমস্ত খেলাটার পিছনেই পূর্ব পরিকল্পিত একটা কারসাজি রয়েছে।

Spengler বলছেন: চরমপন্থী (অর্থাৎ বিপ্লবী) আদর্শবাদী দলগুলো যে অর্থ-শক্তির হাতে শেপথ্যস্ত ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়ায়, টাকাওয়ালাদের টাকার খেলায় দাবার বোড়ে হয়ে যায় তার আসল কারণ এখানেই। বড় লোকেরা তাদের শত্রু কাগজে কলমে, কিন্তু তাদের আসল আক্রমণ চলে পুরুত পাণ্ডা, দেশাচার, ভাতির ঐতিহ্য—এসবের উপরে। Spengler লিখেছেন: Fifty percent of mass-leaders are procurable by money office,...and with them they bring their whole party, অর্থাৎ জনসাধারণের নেতা যারা—তাদের শতকরা পঞ্চাশ জনকে টাকা দিয়ে কেনা যায়, চাকরি দিয়েও কেনা যায়। তারা যখন ভাগে দলগুচ্ছই ভাগে।

টাকা বুদ্ধিবৃত্তির মূল কুঠারঘাত করে। সর্বসাধারণকে লেখাপড়া শিখিয়ে এবং ভোটদানের স্বযোগ দিয়ে ডিমোক্রাসি শেপথ্যস্ত টাকার ফাঁদে পড়ে নিজের গলায় নিজেই ফাঁস দেয়। জনশিক্ষা এবং ভোটাধিকার মানুষের মনকে মুক্তি না দিয়ে তাকে হুচ্ছেত শৃঙ্খলে বেধে ফেলে। Spengler লিখেছেন: Through money, democracy becomes its own destroyer, after money has destroyed intellect. টাকা যখন বুদ্ধিকে ডোবালো তখন টাকার হাতে পড়ে গণতন্ত্র আপনার গলায় আপনি ছুঁবি বসালো। মানুষ দেখলো আইডিয়া দিয়ে বাস্তবকে ঠেকানো যায় না। শক্তিকে কেবল শক্তি দিয়েই উন্মূলিত করা যায়, কোনো খিয়োরী দিয়ে নয়। তাব মনের মধ্যে জেগে উঠলো একটা ব্যাকুল কান্না, অতীতের যে সকল মতও আদর্শ আজও বেঁচে আছে তারই জগৎ ব্যাকুল কান্না। টাকা, টাকা, টাকা শুনে শুনে মানুষের বান কালাপালা হয়ে গেছে। মুক্তির আশায় তারা দৃষ্টি নিম্নে প কবছে সত্যের, অসত্যের, শোষণের চিরন্তন আদর্শগুলির প্রতি! এরা হয় তো প্রাণকে মুক্তি দিতে পারে। সময় আসন্ন বলে মনে হয় যখন কাকনপূজাকে মানুষ আদর্শ হিসাবে আমল আর দেবেনা, সহরে মগজের বুদ্ধি ও আধিপত্য যে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তিকে চেপে রেখেছে—তার কলধ্বনি আবার বেজে উঠবে মানুষের মনের গভীরে।

মহাকাল

শ্রীশতদল গোস্বামী

মানুষের শব্দ-দেহে স্তম্ভীকৃত হতেছে পাথড় :

আকাশে বিমান-সারি দলবদ্ধ উড়ে চলে যায়,

যাতাসে ছড়ায় বিগ, ওঠে তাই তীব্র হাঙ্গার—

ধ্বংসের সোপানে বসে মহাকাল পাখা ঝটকায়।

কামানের গর্জনে কাঁপে পৃথিবীর কম্পিত প্রহর

ধ্বংসস্তুপে ছাই হল অতীতের কত ইতিহাস,

বীভৎস, কুৎসিত মৃত্যু নৃত্য করে মাথার উপর

মানুষের অস্তিম-খাসে ভারাক্রান্ত হ'তেছে আকাশ।

ধ্বংসের দামামা বাজে আসে ঐ অভিশপ্ত দিন

কবরে ঘুমায় কত সৈনিকের বিকৃত কংকাল,

পাণ্ডুর বিবর্ণ সূর্য চিরতরে হয়ে যাবে লীন

ধ্বংসের সোপানে বসে হট্টগলি হাসে মহাকাল।

এই ঘরের প্রত্যেকটি দেয়াল—এই বাড়ীর জানলা আর দরজা—এখানকার সমস্ত কিছু মীরা-কে যেন হিলে তিলে শেখ করে দেবে? সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ওর চার পাশে কোন অশরীরীর স্পষ্ট ইঙ্গিত মীরা-যেন ধোঁমকূপ দিয়ে অনুভব করে। আজকাল অনেক সময় মনে হয় ও আর বাঁচবে না।

অমলেন্দু মাঝে মাঝে বড় বেশী বিচলিত হয়। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—মীরার শরীরে ভাঙন ধরেছে। সারা মুখে নেমে এসেছে উগ্র কাঠিন্য। ওর চেহারার সমস্ত জোলুব পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, অথচ মীরাকে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না।

মীরা, কি হয়েছে তোমার? অমলেন্দু স্নেহে চিজ্ঞাসা করে।

কই কিছু না তো।

কিন্তু তোমার শরীর—

মীরা হাসে, আঃ রাখ শরীর, তুমি তো কেবলই আমার শীর্ণ হ'য়ে যেতে দেখছ, অথচ নিজের শরীর কি হয়ে যাচ্ছে সে খবর লাগে? দেখ না আয়নার—

স্বামীকে এমনি করে এড়িয়ে যেতে মনে মনে মীরার একেবারেই ভাল লাগে না। এক একবার সমস্ত জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মীরা সামলে বাধে। তার মনের এ দুঃসহ দৈন্ত্য বোধ হয় কোন দিনও সে অমলেন্দুকে জানাতে পারবে না।

শরতের অসহ গভীর রাত্রে মীরার ঘুম ভাঙে। অতি সন্তপণে—পাছে আবার অমলেন্দুর ঘুম ভেঙে যায়—মীরা বাবান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাতাস ভরে গেছে বজনীগন্ধার গন্ধে। একটা মিষ্টি আমেজ সব কিছু ভুলিয়ে দেয় যেন। তারাতারা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার বড় বেশী বাঁচতে ইচ্ছে করে। নিজেকে অনেক বড়ো করে দেখে ও—প্রাণপণে বাড়িয়ে দেয় মনের প্রসাব—মন থেকে মুছে ফেলতে চায় সমস্ত ব্যাপারটা! অমলেন্দুর অতীতের ওপর, অমলেন্দু-অতীতের আনন্দ-উজ্জ্বল দিনগুলির ওপর একটা রুঢ় কৃষ্ণ আবরণ টেনে ফেলে মীরা শান্তির নিশ্বাস ফেলতে চায়।

কিন্তু তার সতর্ক চেষ্টা বহুব্যব ব্যর্থ হয়েছে। নিজের মনকে বুকিয়ে বুকিয়ে আজ ও অবসর। নিজেকে সামান্য দিয়ে ও কতবাব বলেছে, হয়তো এ বাড়ীর দোষেই ওর এই জ্বালাময় বিকৃতি। বাড়িটা বদলালে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আজ মীরা স্পষ্ট বুঝেছে, আয়ত্তের বাইরে তার মন।

শরৎ-রাত্রির শান্ত হাওয়ার বার কয়েক কপালের ওপর এসে পড়ল কয়েকটা এলোমেলো চুল। এতক্ষণ মীরা ভুলেই গিয়েছিল যে, গভীর রাত্রে বাবান্দায় ও একা। হয়তো এই বাবান্দায় একদিন অতসী আর অমলেন্দু দাঁড়িয়েছিল। ওর কি খুব গা ঘেঁসে ছিল? অমলেন্দুর হাত স্পর্শ করেছিল কি অতসী-ব অঙ্গ? কি কথা বল ছিল ওর? হয়তো অমলেন্দু খুব আস্তে আস্তে বলেছিল, তোমাকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে পারি না—যেমন মীরাকে প্রায়ই বলে। তার উত্তরে কি বলেছিল অতসী? অমলেন্দু-ব চোখ দুটো কি আবেশে অপক্লপ হয়ে উঠেছিল—প্রেমের কথা

বলতে গেলেই যেমন হয়ে ওঠে? মীরার সারা মন জ্বালাময় দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বাঁছে—ওর চৈতন্য কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মাথাটা হুঁহাতে চেপে ধরল মীরা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর ঘাড়ের ওপর পড়ল কার নিঃশ্বাস। চমকে ফিরে দেখে অমলেন্দু দাঁড়িয়ে।

এসেছ? অমলেন্দুকে আঁকড়ে ধরল মীরা।

কখন উঠে এলে তুমি।

এই তো এখনি।

মীরার মাথার হাত বুলোতে বুলোতে অমলেন্দু বলল, আমার ডাকলে না কেন?

দেখছিলাম আমার অল্পপঙ্কতি তুমি বৃষ্টিতে পারি কিনা—বাগা কি ঘুম তোমার! আমি ঘুমিয়ে থাকলেও বৃষ্টিতে পারি তুমি পাশে আছ কি নেই—তুমি আমার একটুও ভালবাস না, না?

পাগলী! অমলেন্দু মীরার মাথাটা বুকে চেপে ধরে।

না—না—না, আর কেউ কোথাও নেই, কেউ কোনদিন ছিলও না, মিথ্যা অমলেন্দুর অতীত, মিথ্যা অতীতের অস্তিত্ব, মীরা মনে মনে বলে উঠল, শুধু সে আর অমলেন্দু। জন্ম-জন্মান্তর তারা দু'জন ঠিক এমনি করেই কাটিয়েছে একসঙ্গে—এমনি কণ্ঠেই কালের স্রোতে ভেসে ভেসে এসেছে তারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। কেউ কখনও আসেনি তাদের মাঝে—কেউ ভাগ নেয়নি তাদের পাওনা থেকে—ঈশ্বর, এই কথাটা এক মুহূর্তের জন্তে শুধু বিৎসার করতে দাও!

চল মীরা শুয়ে পড়ি, রাত অনেক হল।

না না, ওগো! আব একটু থাকো, খাটে গেলেই তো ঘুমিয়ে পড়বে, মীরা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল অমলেন্দুকে।

না না, মীরা আমার ঘুম পায়নি একটুও, বেশ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা যাক।

আচ্ছা, মীরা বিড় বিড় কবে বলে উঠল, বিয়ের আগে, মানে অনেক আগে তুমি এই বাবান্দায় দাঁড়িয়েছ, না?

হ্যাঁ, কতবাব!

আর কে ছিল সঙ্গে? মীরা হঠাৎ বলে বসল।

আবার কে থাকবে? আমি একা, অমলেন্দু হাসল, তখন তো আর তুমি ছিলে না মীরা।

আঃ, মীরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল।

বেশ, অনেকক্ষণ চুপচাপ।

ওগো!

বল, অমলেন্দু মুহূর্তের বলল।

তুমি আমার কখনও ভাল বুঝে না? মীরার কণ্ঠের কাঁপছে। না গো না।

আমি যদি তোমায় কখনও ভাল বুঝি?

তা হ'লেও না।

তাই যেন হয়, শোন লক্ষ্মীটি, জীবনে যদি কোনদিন আমি তোমায় ভাল বুঝি, তখন তুমিও যেন আমার ভাল বুকে বুঝে সরিয়ে দিও না, দয়া করে আমার ভাল ভেঙে দিও—বল দেবে?

হ্যাঁ, অমলেন্দু বলে। সে মোটেও আশ্চর্য্য হয় না। এমন পাগলের মত কথা, বিয়ের পর থেকেই মীরা মাঝে মাঝে বলে।

ঠিক বলছ ? মীরার চোখ জলে উঠলো উৎসাহে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

বাচলাম—চল এবার শুয়ে পড়ি।

ওরা বিছানায় এল। কিন্তু কিছুতেই মীরার চোখে ঘুম আসতে চায় না। ওর কেবলই হচ্ছে কন্ট্রোল অতসীর কথা জানতে। কিন্তু কি ভাবে অবতারণা করা যায়? অমলেন্দু যদি বুঝতে পারে তার দৈহিক, তা হ'লে মীরা মুখ লুকোবে কোথায়?

আজ্ঞা দেখ, মীরা অমলেন্দুর আরো কাছে সরে এল, —ওউ বারান্দায় অতসী কখনও দাঁড়িয়েছিল?

হ্যাঁ, অনেকবার।

তুমি পাশে ছিলে?

হ্যাঁ।

খুব কাছাকাছি ছিলে বুঝি? তোমার হাত অতসীর কাঁধে ছিল?

অনেক দিনের কথা, ঠিক মনে নেই মীরা, যতটুকু মনে আছে সমস্তই তো তোমার বলেছি।

একটু দেখ না গো মনে করে? অতসীর সঙ্গে তুমি কোন ঘরে ব'সে বেশী গল্প করত?

সব ঘরে, আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতো, সব সময় আসতো কি-না।

রাস্তিরেও আসতো?

হ্যাঁ, তবে থাকতো না বেশীক্ষণ।

ওর বাড়ীর লোক কিছু বলতো না?

না, কারণ, অমলেন্দু হাসলো, পাত্র হিসেবে আমি তো কিছু খাবার ছিলাম না, আর আমাদের বিয়ের সমস্তই তো ঠিক ছিল।

তখন যদি তোমার জীবনে আমি আসতাম, আমার নিষ্ঠুরের মত ফিরিয়ে দিতে তো?

সে কথা আজ কেন মীরা? তোমাকে পেয়ে যে আমার নতুন জন্ম হয়েছে, মনে করো অতসী ছিল আমার গত জন্মেও সঙ্গিনী—

কেমন করে ভাববো।

মীরা, অমলেন্দু একটু চমকে ওঠে যেন, তবে কি সন্ধ্যা এসেছে তোমার মনে? সত্যি করে বলো, তুমি কি কিছুতেই ভুলতে পারছো না?

তুমি কি ভাবে আমাকে? মীরা ভয়ানক ক্ষেপে উঠলো অকস্মাৎ, আমি এত নীচ—এত হীন? এতটুকুও প্রসার নেই আমার মনের? আমি তোমাকে সময়ে—অসময়ে নানা প্রশ্ন করি; কারণ, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের প্রত্যেকটি কথা জানতে চাই—বেশ, আর কিছু কখনও জিজ্ঞাসা করবো না—

রাগ কর কেন মীরা? তোমাকে আঘাত দেবার জন্তে তো আমি কিছু বলিনি। ঠিকই তো, আমার জীবনের সমস্ত কথা তুমি ছাড়া আর কেই বা জানতে চাইবে!

হ হ করে মীরার চোখ ঠেলে জল ঝরে। শরতের তরল

অন্ধকারভরা নিভৃত মন্ডর রাত বেড়ে চলে। বাতাসে কিসের আমেজ!

অথচ আশ্চর্য্য লাগে মীরার!

আজকের আকাশেও শরতের তেমনি বিপুল সমারোহ—বাতাসের ঢেউএ ঢেউএ নীড় রচনার তেমনি আয়োজন। সেই-সব অমুভূতিশীল দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি ক্ষণে ক্ষণে মীরার মনে বলসায়—যখন তাদের বিয়ে হয়নি। প্রত্যেক মুহূর্তকে মীরা যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে পারতো। তীক্ষ্ণ প্রাণময় অমুভূতি তার সারা অস্তর ছেয়ে ছিল। সেই দিনগুলির কথা বারে বারে স্মরণ করে মীরা, তার মনের রূপ প্রাণপণে পাল্টে দিতে চায়।

অমলেন্দুর কণ্ঠস্বর যেন তার কাণে ভাসে, দেখুন, মানুষের তখন বাঁচতে হচ্ছে করে, যখন সে আপনার প্রকাশ দেখতে পার অপণে ভেতব।

মীরা মুচকী হেসে বলতো, আপনার বাঁচতে হচ্ছে করছে না কি?

হ্যাঁ, অমলেন্দু সটান উত্তর দিত, কাণে নিজের প্রকাশ দেখেছি।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেয়ে মীরা ফস করে কথা ঘুরিয়ে নিত, কী বিজ্ঞী গরম পড়েছে আজ ক'দিন থেকে—

কথাটা বোড় ফিরিয়ে দিলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

মীরা মাথা নীচু করতো।

মীরা একদা ভেবেছিল, অমলেন্দুকে ফিরিয়ে দেবে। তাব কেবলই মনে হ'ত, অমলেন্দু তাকে বড় বেশী বাড়িয়ে দেখেছে এবং একদিন তার সে ভুল খান খান হ'য়ে যাবে। কিন্তু একদিন অর্থাৎ মীরা যেদিন অকস্মাৎ নিজেকে আবিষ্কার করল, সেদিন সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো, অমলেন্দুকে ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়।

নিজেকে যখন আবিষ্কার করা যায়, তখন দেখা যায়—বাইরেও এসেছে পরিবর্তন। পৃথিবীর আলোয়, আকাশে, হাওয়ায় কিসের সূচনা উপলব্ধি করা যায় যেন। সকলকেই সব কিছুকেই ভাবী ভালো লাগে। কিন্তু নিজের পুরন পবাজের কথা ভেবে মীরার লজ্জার অবশি রইলো না।

তবু অমলেন্দুকে মুক্ত করার চেষ্টার জটীল সে করে নি। কারণ, নিজের সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞী সংশয় মীরার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কোন পুরুষ কোনদিনও তাকে নিয়ে স্ত্রী হতে পারবে না। নিজেকে একটু অসাধারণ ব'লে মনে হ'ত মীরার। একটা অদ্ভুত অসামঞ্জস্য সব সময় তার মনকে ঘিরে থাকতো। তাই ইতিপূর্বে ভাবপ্রবণতার সাড়া কখনও তার বিশ্লেষণী নীরস মনকে নাড়া দিতে পারে নি। মীরার ভয় ছিল, এই বিশ্লেষণী মন একদিন নিশ্চয়ই অমলেন্দুর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। শাস্তির কথা ভেবে, মঙ্গলের কথা ভেবে মীরার মনে হরহিঁচল সবে যাওয়াই সমীচীন।

দেখুন, মীরা বলেছিল, আজ আপনার মনে হচ্ছে আমাকে
।য়ে আপনি স্বামী হবেন, কিন্তু একটা কথা আপনার স্নেহে
রাখা প্রয়োজন—

বলুন।

আমার চরিত্রে একটা অদ্ভুত নির্ভর স্বার্থপরতা আছে,
আমি যখন আপনার খুব কাছে কাছে থাকব, তখন আপনার
মুহূর্তগুলি কি অশান্তিময় হ'য়ে উঠবে না?

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে অমলেন্দু উত্তর দিয়েছিল,
আমরা কেউ ছেলেমানুষ নই, পরস্পরকে আমরা বুঝছি সম্পূর্ণ
রূপে—আপনাকে জানবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই বুঝছি,
অশান্তি কোনদিনও আমাদের বিচলিত করবে না। আপনার
চরিত্রের যে-দিকটার কথা ভেবে আপনি শঙ্কিত হচ্ছেন—আমি
যদি বলি আপনার ওইদিকটাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে
—আপনার যা'কিছু সবই মজলময়, কল্যাণময়—

আজ আপনি একথা বলছেন, কিন্তু—

বললাম তো, যে-বয়সে মানুষ মোহে মেতে ওঠে, আমরা
ছ'জনেই সে-বয়স পার হয়ে এসেছি, স্তব্ধতা শঙ্কা করবেন
না।

তবু, আপনি আর একবার ভাল ক'বে ভেবে দেখুন!

ভেবে দেখবার আব কিছু নেই।

এমনি কবেই ওরা পরস্পরের কাছে এসেছিল! ওরা স্বপ্ন
দেখেছিল ব্যাপক গভীর জীবনের। ওরা পূর্ণ কবেছিল
দৈনন্দিন ধরাধরা জীবনে সৃষ্টি করবে নতুন। মীরা বুঝল,
বাধা দিয়ে মহাজীবনের এ মহাসূচনাকে হত্যা করা যোগ্য তার
আব নেই।

অকস্মাৎ কিসের সাড়ায় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিন্ বিন্ করে
উঠল। মীরার সমস্ত বিশ্লেষণ, সমস্ত সচেতনতা একে একে
গেল মিলিয়ে। অসহ ভাবাবেগে আর ছুরস্ত উচ্ছ্বাসে তার
মুহূর্তগুলি গান গেয়ে উঠল। আব সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, সে
যেন নতুন মানুষ হ'য়ে উঠেছে।

সাধারণত যে বয়সে আসে প্রাণময় উচ্ছ্বলতা—জীবনের
কারিগ্য সচেতনতা নিয়ে আসে না, মীরা সে-বয়স পার হয়ে
এসেছে ব্যাপক গাভীর্ঘ্যে। তার বয়সী অগ্ন্যস্ত্র মেয়েরা যখন
বিহুনি ছলিয়ে খেলে বেড়াতে, মীরা তখন, চুপ করে ব'সে কি
যেন ভাবত। সব সময় সে চাইত প্রচুর নিঃশব্দতা। অনেক সময়
তাব মনে হ'ত আর সব মেয়েদের মত কেন প্রাণ খুলে ছুটো-
ছুটি করে বেড়াতে পারে না সে? তার বয়স বেড়ে উঠল
কিন্তু সে স্বভাবের কোন পরিবর্তন হল না। মীরার হৃদয়ের
কোন বৃত্তি বোধ হয় স্তব্ধ ছিল। বয়সের পরিবর্তন তাকে
কখনও নাড়া দেয় নি, কোন বসন্ত সাড়া জাগায় নি মনে।
সব ক্ষেত্রেই তার নিজেকে মনে হ'ত ব্যতিক্রম। তাই
বৎসর তার মনে হয়েছিল সংসারের দীপ স্তম্ভ ক'রে কখনও
সে জালিয়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু অমলেন্দু তার সে-ভুল
ভেঙে দিল। এইবার মীরার মনে হল অমলেন্দুর সঙ্গে তার
আরও অনেক আগে আলাপ হল না কেন! তাহ'লে তার

অতীতের অনেক বসন্ত অমন ক'রে বিকলে বয়ে যেত না।
অতীতের প্রাণহীন দিনগুলির জন্তে মীরা সর্বপ্রথম দুঃখ করল
অমলেন্দুর সঙ্গে আলাপ বন হবার পর।

বিয়ের আগে একদিন অমলেন্দু বলেছিল, আপনাকে একটা
কথা জানানো আমার একান্ত প্রয়োজন।

বলুন।

একথা আরো আগে আপনাকে বলা উচিত ছিল, বলি নি
ইচ্ছে ক'রেই, কারণ তখন আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ-গতি
আজকের মত সঠিক এবং স্থির ছিল না।

বলুন, কি বলবেন, অত ভূমিকা কেন?

না না, আপনার কাছে ভূমিকার কি-ই বা প্রয়োজন,
একটু থেমে অমলেন্দু বলেছিল, অতসী ব'লে একটি মেয়েকে
প্রথম বয়সে আমি ভালবেসেছিলাম।

কিন্তু সে কথা আমাকে বলা কেন? এ তো স্বাভাবিক
আর আমার কাছে আপনিই বড়ো, আপনার অতীত নয়,
কাঁজই ওকথা আর নয়—

মীরা, সত্যিই তুমি মহৎ—অমলেন্দু ব'লে ঘেলেছিল
অকস্মাৎ।

*

*

তারপর একদিন ওদের বিয়ে হল।

বিয়ের পর মীরা এমন একটা সংসারে প্রবেশ করল,
যেখানকার সমস্ত ভার পড়ল তার ওপর। অমলেন্দুর আর
কোন আত্মীয় ছিল না। বিয়ের পর নতুন সংসারে প্রবেশ
করেই মীরার সর্বপ্রথম মনে হ'ল এখানে ঠিক এমনিভাবে
আর একজনের আসবার কথা—সে অতসী! অতসীর সঙ্গে
কেন অমলেন্দুর বিয়ে হল না? সে কেমন দেখতে ছিল?
অমলেন্দুকে সে কি মীরার চেয়ে বেশী ভালবাসতো?
অমলেন্দুর জীবনে মীরা হল না কেন একমাত্র মেয়ে?

মীরার অন্তরের কোন কোণে অতৃপ্তির একটা কাঁটা বিঁধে
রইল যেন!

অতসীর সঙ্গে তোমার কেন বিয়ে হল না? মীরা
অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করেছিল।

টাইকয়েডে সে মাথা যায়।

একটু হেসে মীরা বলেছিল, সে আমার চেয়েও স্নান ছিল,
না?

না, না।

তোমাকে সে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসতো?

তোমার চেয়ে বেশী ভাল আর কে আমার বাসবে।

বিয়ের আগে অতসীকে এতটুকুও স্থান মীরা দেয়নি, কিন্তু
বিয়ের পর সে-ই তার কাছে হ'য়ে উঠল সব চেয়ে বড়ো। আর
মীরার মনে হল তার পাওনা থেকে অনেক গ্রহণ করেছে অতসী।
মীরার জীবনে আস্তে আস্তে কোথা দিয়ে নেমে এল ধমধমে
অন্ধকার। বিয়ের আগে সে-ব্যাপারটা তার কাছে ছিল অতি
তুচ্ছ, বিয়ের পরে তাই হ'য়ে উঠল সর্বপ্রধান।

অমলেন্দুকে সে কেবল প্রাণ করতে আরম্ভ করল—অত্যন্ত

তুচ্ছ সামান্য প্রশ্ন। তবু অতসীর সম্বন্ধে মীরার কৌতুহল দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। তার মনে হল অমলেন্দুর কাছ থেকে পরিপূর্ণ কিছুই সে পায় নি।

দেখ মীরা, একদিন অমলেন্দু বলল, কেন তুমি আমার কেবলই প্রশ্ন কর? আজ আমার অতীতের কথা ভেবে কেবলই আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠি তোমার কাছে, ভাবি কেন অতসী এসেছিল আমার জীবনে? অতীতের কয়েকটা জ্বালাময় পাতা নিঃস্বরের মতো আমি পুড়িয়ে দিতে চাই—অথচ বারে বার প্রশ্ন করে কেন আমার তুমি সে-পীড়াদায়ক স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দাও?

গভীর ৩য় মীরা বলেছিল, তোমার অতীতের সমস্ত কথা আমার বলা উচিত নয় কি? তোমার প্রতিদিনের ইতিহাস আমি জানতে চাই।

নিশ্চয় তোমার জানা উচিত। কিন্তু শুধু অতসীর কথা তুমি কি কিছুতেই ভুলে যেতে পাব না মীরা? আজ তোমায় পেয়ে আমি যে নূতন মানুষ হয়ে উঠেছি—আমার নতুনত্বকে তুমি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করো। একদিন তুমিই তো বলেছিলে, আমিই তোমার কাছে বড়ো।—আমার অতীত নয়।

সেকথা মানি, কিন্তু তুমি আমার ভুল বোঝ কেন? তোমার অতীত আজও আমার কাছে বড়ো নয়—শুধু জানতে চাই তোমার কথা।

আমার কথা জানো, কিন্তু মনে করো অতসী কোনদিনও ছিল না—একমাত্র তুমিই আমাকে নতুন কবে গড়েছ—

বেশ, অতসীকে ভুলে যাবো আমি, মীরার চোখেব কোনে কি জল চিক্‌চিক্‌ করে উঠল?

ভুলে যেতে চাইলেই যদি ভুলে যাওয়া যেত তা'হলে বাঁচতে পারত মীরা। অমলেন্দুকে সে কথা দিয়েছিল অতসীকে ভুলে যাবে। আজ মীরার নিজের কাছেই কথাটা শোনায় লঘু পরিহাসের মতো। 'অথচ কেনই বা পারছে না ভুলতে? মীরা অনেক সময় নিজেকেই প্রশ্ন করে। তারপর অনেক বকম ক'রে নিজেকে বোঝায় ও। অমলেন্দুর সঙ্গে অতসীর যাই থাক না কেন, বিয়ে তো হয় নি। বিয়ে পর মানুষের হয় নতুন জন্ম। এখন আর কেউ কোথাও নেই—শুধু মীরা আর অমলেন্দু। তবু কিছুতেই মন মানতে চায় না মীরা। বড় দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল বেচাবী—তার যেন কোন শক্তির আর নেই—কোন অদৃশ্য শক্তির অসহায় ক্রীড়নক হয়ে উঠল সে বা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক; মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটাকে মনে মনে কিছুতেই গ্রহণ করে নিতে পারল না।

অতসীর সম্বন্ধে মীরার কৌতুহল এখনও মিটল না, বং বেড়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। অথচ অমলেন্দুকেও প্রশ্ন করবার উপায় নেই, ভয় পাচ্ছে ধরা পড়ে যায়। উঃ, মীরা মরে যায় লজ্জায়—যদি তার এ মনোভাব কোন দিন ধরা পড়ে অমলেন্দুর কাছে? আশ্চর্য্য্য করতে হবে তাহলে মীরাকে। অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করতে না পেরে মীরা গুমরে গুমরে জ্বলতে লাগল। এমন করে চেপে রাখলে কিছুতেই সে বাঁচতে পারবে না। তার চেয়ে

মীরা ঠিক কয়ল লঘু পরিহাসের ছলে নিবৃত্ত করবে তার কৌতুহল।

কি একটা কারণে সেদিন দুপুরে অমলেন্দু বেরুতে পারে নি। খুসী হল মীরা। দুপুরে অমলেন্দুকে বড়ো একটা কাছে পাওয়া যায় না। আর সে দুপুরটাও ছিল চমৎকার। দেখতে দেখতে শরতের শাদা আকাশে ঘন হয়ে এল কালো মেঘ। এলোমেলো হাওয়ার মাতামাতিতে মধুর হল মধ্যাহ্ন।

চল বেড়িয়ে আসি, অমলেন্দু বলল।

এখনি বৃষ্টি আসবে যে—

আম্বক না, হাত ধরাধরি করে বেড়াবার এই তো সময়।

একটু হেসে খুব হাসা সুরে মীরা বলল, অতসীর সঙ্গে বেড়াতে বুঝি?

কতবার! আরও হাসা করে বলল অমলেন্দু।

হাত ধরে বুঝি?

হ্যাঁগো, অমলেন্দু মীরার আরও কাছে সবে এল।

বাস্তব মতো বাজল কথাগুলো মীরার কানে। ঠিক সেই সময় বৃষ্টি নামল খুব জোরে। মেঘের গর্জনে আর বিদ্যুতের বলকানিতে মেতে উঠল দিগন্ত। কিন্তু গুম হয়ে গেল মীরা। সেই মুহূর্তে পৃথিবীটা কেটে চৌচির হয়ে গেলেও সামান্যতম স্পন্দনও জাগতো না মীরার বুকে।

সেই রাত্রে যখন অনেকক্ষণ অবধি কিছুতেই মীরার ঘুম এল না, তখন নিজেকে সন্তোষান্বিত করে মীরা মনে মনে বলে উঠল, শোন মীরা, দোষ তোমার, তুমি অমলেন্দুকে ভালবাসতে পারছো না, তাই তোমার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে অতসী। কে অতসী? কেউ নয়, কিছু নয়। নূতন দৃষ্টি কোন দিয়ে দেখেছ তুমি অমলেন্দুকে, তোমার মতো ভাল বাসতে আর কোন মেয়ে পারে না। হিঃ মীরা, আজ তোমারই ভালবাসায় ধরেছে ভাঙন, তাই রাত্রিদিন অতসী পাঁড়া দিচ্ছে তোমায়। ভালবাসো—আরো ভালবাসো, দেখবে তোমার সেই ব্যাপক গভীর ভালবাসার তীব্র তরঙ্গে ভগ্নখণ্ডের মতো ভেসে যাবে অতসী!

লজ্জায় মীরা মুগ্ধ লুকালো অমলেন্দুর বুকে।

পর্বদিন ঘুম থেকে উঠেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মীরা। ছুটে ছুটে সংসারের কাজ করতে লাগল। আরও অনেক বেশী করে অমলেন্দুর দেখা শোনা করতে লাগল।

আজ তুমি কিছুতেই অফিস যেতে পাবে না, ঠিক বেরুবার সময় মীরা আদ্যার ধরে বসলো।

কেন, কি হল তোমার?

আমার ইচ্ছে, আজ এক মিনিটের জন্তেও তোমায় কাছ ছাড়া করবো না।

বেশ, তবে যাবো না অফিস, অমলেন্দু ব'সে পড়ল চেয়ারটায়।

অনেকক্ষণ গল্প ক'রে কাটাল ওরা। আজ যেন ওদের কোন দায় নেই, কাজ নেই। হাসিতে আর সজীব কথার মুহূর্ত অতিবাহিত হ'তে লাগল।

চল মীরা ছবি তুলিয়ে আসি, অমলেন্দু প্রস্তাব করলো।

বেশ তো, কতদিন আমরা ছবি তোলাই নি।

মীরা এতক্ষণ নিজেকে মার্তিরে রেখেছিল নানা কথায়। ছবি তোলার কথায় আবার ওর সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল। ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো মাথাটা। কিছুতেই মীরা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না!

অতসীর সঙ্গে তুমি কখনো ছবি তুলিয়েছিলে?

হ্যাঁ, অমলেন্দু হেসে উঠলো, এক মজা হয় সেবার, ছবি তুলিয়ে ফেরার পথে অতসী বলেছিল, আজ আমাদের সহকর্মে একেবারে পাকা হ'য়ে গেল, আমি ছাড়া অন্য কাউকে তুমি আর বিয়ে করতে পারবে না, আমি ম'রে গেলেও না। আমি বললাম, যদি করি? ও বলেছিল, তাহলে আমি আসবো তোমার স্ত্রীর পেটে, কুরে কুরে খাবো তাকে—

য্যা! চীৎকার করে উঠলো মীরা।

তুমি অমন করছ কেন? অমলেন্দু লক্ষ্য করলো মীরার সমস্ত মুখ কাগজের মতো সাদা।

না না কিছু না, মীরা হাসল শুক প্রাণহীন হাসি।

দিন কয়েক পর সংবাদ পাওয়া গেল মীরা সন্তানবতী।

অমলেন্দুর যত্নের ক্রটি নেই। একটা অভিজ্ঞ ঝি রেখে দিয়েছে সে। প্রায়ই ডাক্তার আসে। কিন্তু কিছুতেই কিছু খেতে চায় না মীরা।

কেন খাও না মীরা? বড় স্নেহময় কণ্ঠস্বর অমলেন্দুর।

আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা

(চেষ্টা)

প্রগতিপন্থীদের ভাগ্যে সাধারণতঃ যা ঘটে, আকবরের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আচারপন্থী, লিখিত শাস্ত্র-বাক্যের পূজারী আলেম বা পুরোহিতসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁকে ভৌবনব্যাপী সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। আমরা বর্তমান সন্দেহের গোড়ার দিকে এ বিষয়ের আলোচনা করেছি। আলেমদের ষড়যন্ত্র শেষে যে দেশব্যাপী এক অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল সে কথাও বলেছি। কর্তৃকুশল আকবর সে বিপ্লবকে সহজেই দমন করেছিলেন। আলেমদের বাড়াবাড়ি সাময়িকভাবে সংযত হয়েছিল।

আলেমদের প্রভাব কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি। অল্প জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব এবং আধিপত্য অপ্রতিহতই থেকে যায়। তাঁরা যখন বুঝলেন যে, বাহুবলের সাহায্যে আকবরকে দমন করা অসম্ভব, তখন তাঁর রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে, তাঁর বিভিন্ন প্রগতিমূলক সংস্কারের বিরুদ্ধে, তাঁর ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ এবং কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে তাঁরা উগ্র এবং ধারাবাহিক প্রচার-কার্য চালাতে লাগলেন, আর এই অপকর্ম সাধনে, আলোকের শত্রুদের সনাতন অল্প কুৎসা-কীর্তন, মিথ্যাভাবণ এবং অজ্ঞার অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতে লাগলেন। আবুল ফজল তাঁদের জঘন্য কর্তৃপন্থতীর বিবদ বর্ণনা “আকবর নামায়” দিয়েছেন। বাদশা কোন প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করলেই, তাঁরা তারদ্বারা চীৎকার করে

ওগো, আমার একেবারেই ক্রোধে পার না, বড়ো ভয় করে, কান্না পায় খালি।

এ সময় অমন হয়, অমলেন্দু যেন কত বোঝে তুমি কিছু ভেবনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাত্রে ভয়ে মীরা চীৎকার করে ওঠে, ওগো অতসী এসেছে, গলা টিপে ধরেছে আমার, উঃ—

মীরা, মীরা—ব্যস্ত হয়ে ওঠে অমলেন্দু। রাত-জাগা পাখী ডাকে। নিভৃত মন্দির মধ্যাহ্নে মীরার গা ছম ছম করে। সব সময় কে যেন পা টিপে টিপে চলে ওর সংগে। মীরা কেবলই একা থাকতে চায় আর কি যেন ভাবে সারাক্ষণ। একটা বিস্ত্রী অস্থিতি ওকে পেয়ে বসেছে। সত্যিই কেউ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে আর ও বহন করে বেড়াচ্ছে তাকে! সেই অদেখা শত্রুকে মীরা অহুভব করে নিজের মধ্যে। ভয়ে ও অজ্ঞানের মতো হস্টেঁষায়। রাত্রে ও যেন কাকে দেখতে পায়। কোন অশরীরী ওকে নিরন্তর ভয় দেখিয়ে কেবল। মাঝে মাঝে ভারী কান্নার ভেঙে পড়ে মীরা।

বিকট হাসির শব্দে অমলেন্দু ছুটে এল মীরার ঘরে। বিমূঢ় বিন্মিত বিচলিত হ'য়ে ও লক্ষ্য করলো, মীরার চুল আলুথালু, দৃষ্টি গোলাটে আর ও ছুটে ছুটে কাকে যেন ধরবার চেষ্টা করছে।

অমলেন্দুকে দেখে ম'রা বলে উঠলো, অতসী এসেছে আমার পেটে, কুরে কুরে খাচ্ছে আমায়, ওকে ধরবো—আমি ওকে ধরবো, হাঃ হাঃ হাঃ—মীরা আঁকড়ে ধরলো অমলেন্দুকে।

আকাশে মেঘের সমারোহ। শরতের পৃথিবীতে কি বিপুল রহস্য।

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

উঠতেন, সম্রাট মুসলমানদের ধর্মে হস্তক্ষেপ ক'রেননি। এইভাবে তাঁরা বাদশাকে জনসাধারণের চক্ষে ধন্বদোস্তরূপে চিত্রিত করিতে লাগলেন, আর নিজাদের চিত্রিত করতে লাগলেন, ধর্মের নিঃস্বার্থ রক্ষকরূপে। কেবল তাই নয়, তাঁরা ভক্তদের মধ্যে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, বাদশা ঈশ্বরত্বের দাবী করেছেন, কমসে কম তিনি নিজেকে একজন পয়গম্বর বলে মনে করেন, দুই শিয়াদের মতবাদের তিনি সমর্থন করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আলেমদের অক্লান্ত প্রচারকার্যের ফলে অল্প জনসাধারণের মধ্যে আকবরের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের ভাব তৃণের আগুনের মত দেশময় ধূমায়িত হ'তে লাগলো। এই রকম চাপা আগুন অনেক সময় বিষম অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে থাকে।

আকবর একান্ত সজাগ বুদ্ধি এবং দৃবদশী বাদশা ছিলেন। তিনি সহজেই বুঝলেন, এক রাজ্যে দুই রাজার হুকুম চলতে পারে না। হয় ধর্মের কর্তৃত্ব তাকে গ্রহণ করিতে হবে, না হয়, ধর্ম-রাজকেরা রাষ্ট্রের আধিপত্য তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেন। বলা বাহুল্য, আকবর প্রথমোক্ত পন্থাই অবলম্বন করলেন। ঐতিহাসিক Lane Poole লিখেছেন : He (Akbar) found that the rigid Muslims of the Court were always casting in his teeth some absolute authority, a book of tradition, a decision of a canonical divine, and like Henry VIII he resolved to cut the

ground from under them ; he would himself be the head of the Church, and there should be no Pope in India but Akbar,”

এখানে অবশ্য একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, Henry VIII অসুবিধাজনক বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্তই রোমের পোপকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে সে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন ; আর আকবর আলেমদের তথাকথিত অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন রাজ্যে শৃঙ্খলা আনবার জন্তে, অস্ত্রবিপ্লবের মূলোৎপাটন করবার জন্তে, আর সাম্রাজ্যকে উচ্চতর, ব্যাপকতর, উদারতর নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে ।

১৫৮০ খৃঃ অর্ধে জুম্মা প্রার্থনার দিনে মহামহিম ভারতসম্রাট কতেপুর শিকরীর জামে মসজিদের প্রচার-বেদিকায় গিয়ে দাঁড়াইলেন । ভারতের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এ এক অতুল্যপূর্ণ ঘটনা—কোন সম্রাট কোন দিন প্রচার-বেদিকায় দাঁড়ান নি । রাষ্ট্রের জ্ঞায় ধর্মের ব্যাপারেও যে তিনি সবার উপরে, একথা অতি স্পষ্ট ভাষায় আকবর সকলকে সেদিন জানিয়ে দিলেন । বক্তৃতাশ্রমকে তিনি সেদিন বলেন, “খোদা আমাকে বাদশা বানিয়েছেন, তিনি আমাকে জ্ঞানে বিভূষিত করেছেন, সাহস এবং শক্তি দান করেছেন । আমার অন্তরকে তিনি সত্যের প্রেমে ভরপুর করেছেন ।”

এই ঘটনার অল্পকাল পবেই আকবর তাঁর সমর্থক আলেমদের বিধান-সম্মিলিত এক ফরমান জারী করেন । সেই ফরমানে তাঁকে ধর্ম সম্পর্কীয় মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারীরূপে ঘোষণা করা হয়, আর এই ভাবে ধর্ম সম্পর্কীয় কলহকে রাষ্ট্র থেকে বিদূরিত করা হয় । ফরমানের স্বাক্ষরকারীরা বলেন, জ্ঞানিষ্ঠ নরপতির ধর্ম-সম্পর্কীয় ক্ষমতা বা অধিকার মোজতাহিদ বা শাস্ত্রবিশারদ মহা-পণ্ডিতদের চেয়ে বেশী । সত্যরূপ যদি এমন কোন ধর্মসমস্তা উপস্থিত হয় যা নিয়ে মোজতাহিদদেরা একমতে পৌছতে অক্ষম হন, সেরূপ অবস্থায় সম্রাটের সিদ্ধান্তই ভারতীয় মুসলমানদের জন্ত চূড়ান্তরূপে গণ্য হবে । যারা সম্রাটের সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে তারা বিচারালয় এবং খোদার কাছে দণ্ডনীয়রূপে গণ্য হবে !” এই বিধানের সাত্যে আকবর ধর্মের বিধি-নিষেধকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তাগিদ মত পবিচালিত করতে থাকেন ।

সাতবট

নীহারিকার পরমাণুপুঞ্জ আলোকময় এক নক্ষত্রলোকের সৃষ্টি না করে ছাড়ে না । কালের প্রবাহ দুর্নিবার ভাবে সেই পথেই তাদের পরিচালিত করে । পার্শ্বত্যাগ নিবারণীর উদ্দাম লক্ষ্যবিন্দু জ্বলাশয়ে এসে বিশ্রাম নেবার জন্ত নয় ; ছুঁবার গতিতে অসীম সমুদ্রের দিকেই সে চলতে থাকে । কবির প্রাণের ভাবের উৎস কোন অপকৃপ ছন্দর কোন মধুর রাগিণীর সৃষ্টি না করে শাস্ত হয় না । শেকস্পীয়ারের ভাবের উৎস মিয়াদা, জুলিয়েত এবং ডেসডিমোনার সৃষ্টি করেছিল ; হ্যামলেট, ম্যাকবেথ এবং লিয়ারকে রূপ দান করেছিল । আকবর ছিলেন জীবনের শিল্পী ; রাষ্ট্র-শিল্পে তিনি ছিলেন শেকস্পীয়ার । আলোকসাম্রাজ্য স্বজনী শক্তির দুর্নিবার প্রেরণা তাকে রাষ্ট্র-সৃষ্টির উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিল । গোড়ার অবচেতনার ইঞ্জিতে, পরিণত

বয়সে জাগ্রত চেতনার নির্দেশে, ধীরে ধীরে, একান্ত সন্তর্পণে কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে, অবিরাম ভাবে তিনি এক আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে বাচ্ছিলেন—যে রাষ্ট্রে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসীক প্রভৃতি সকলেরই স্থান হবে ; যে রাষ্ট্রকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই নিজের রাষ্ট্ররূপে গণ্য করতে পারবে, যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের স্বর্থ-সুখ, অভাব-অভিযোগের খবর নেবে ; যে রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রবাসীর জন্ত সেবা এবং সাধনার প্রেরণা যোগাবে ; যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে সকলেই একান্ত আপন জন বলে ভাবে এবং দেখতে পারবে ; যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা নাগরিক দেশের সকলকে একই খোদার সেবক, একই আদর্শের সাধক, একই পথের পথিকরূপে গণ্য করতে পারবে । এই অপূর্ণ স্বপ্নই আকবরের সমস্ত কাব্যকে, সমস্ত সাধনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল ।

অন্তরের এই দুর্নিবার স্বজনী শক্তির তাড়নায় আকবর আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি রচনার ব্যাপারে লিখিত শাস্ত্রবাক্য ছেড়ে নূতন জগতে অগ্রসর হয়েছিলেন, টীকাকারদের টীকা-টীপনী ছেড়ে নূতন পথ ধরেছিলেন, ইউরোপের তিনশত বৎসর পূর্বে ভারতের ব্যবহারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে ক্রমবিকাশের উচ্চতম স্তরে, Legislation-এর পর্ষায়ে উন্নীত করেছিলেন । বিশ্বের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে আইন-কানুন রচনা করেছিলেন । কোন জাতি বা শ্রেণীকে তার সাধনার মঙ্গলময় প্রবাহ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি । তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন সংস্কার, বিভিন্ন ব্যবহারিক বিধি-নিষেধ কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্ত রচিত হয় নি, সর্বজাতির, সর্বসম্প্রদায়ের মঙ্গলের আদর্শই তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র সাধনায় ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বয়কর এক বিপ্লবের আমদানী করেছিলেন ।

সাধারণ রাজনীতিকদের মধ্যে, আজকালকার গণতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী কর্তব্য এবং চিন্তাধারার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় । স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সব লোক কোন বিষয়ে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখেন না, সে ভাবে দেখবার ইচ্ছা তাঁরা পোষণ করেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিও রাখেন না । তাঁরা পরস্পরবিরোধী কর্তব্যের অবলম্বন করে চলেম, পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার অনুসরণ করেন, কেন না সে ভাবে কাজ করলে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করা সহজ হয়, মানুষকে সহজে প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করা যায়, আকবর সে শ্রেণীর লোক মোটেই ছিলেন না । তিনি যা করতেন গোদায় উদ্বেগে করতেন । খোদার নির্দেশ স্পষ্ট করে অন্তরে অনুভব করে তবে তিনি কর্তব্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতেন । আর তাই তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঐক্য, তাঁর কর্তব্যধারার মধ্যে একটা প্রবাহ-সম ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায় । অন্তরের নির্দেশে, অন্তরদেবতার আদেশে তিনি যেসব সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন, যেসব বিধি-নিষেধ রচনা করেছিলেন, তাঁর দার্শনিক মন সে-সবের মূল উৎসের সন্ধান না করে থাকতে পারে নি । আর তাঁর চূর্ণত কর্তব্যশলতা সেই উৎসকে ভারতের জীবন ক্ষেত্রে সঞ্চারিত না করে স্থির থাকতে পারে নি । [ক্রমশঃ]

অন্ধরের সীমানা ছাড়িয়ে 'বাইরে' কয়েক পা আসতে না আসতেই নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ। তুলে গেলেন আজ সারাদিন তাঁর খাওয়া হয়নি, ঘোড়ার পিঠে তীব্র চাবুক বসিয়ে ঘূর্ণির মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। কিসের একটা অভ্যস্ত তীব্র বেদনাবোধ যেন অস্ত্র সমস্ত অল্পভূতি-গুলোকে তাঁর আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। লালাজীর সেই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঙ্গবিশ্ব হাসি, বিনয়-বিগলিত কথার ভঙ্গিতে উদ্ভূত অবজ্ঞা, চারিদিক থেকে ঘনিষ্ঠে আসা সংকটের কবাল ছারামূর্তি—কোনটাই তাঁকে এত শীর্ণ আর সংকুচিত করে দেয়নি। রূপাপুরের কামারেরা হাতিয়ার ধরেছে—এই সোনাদীঘির মেলায় লালাজীর সঙ্গে সত্যিকারের একটা শক্তিপারীক্ষা হয়ে যাবে। তার জন্তে দেবী-কোট রাজবাংশ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু অপর্ণা?

একথা সত্যি, তাঁর বিরুদ্ধে অপর্ণার অভিযোগ অনেক আছে। তাঁর নিজের জীবন এত বহিঃস্থী যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপর্ণার অভাব কখনো তাঁকে পীড়া দেয় না। ওঁরাও মেয়েদের বলিষ্ঠ গঠিত দেহে যে প্রথম যৌবনের আগুন জ্বলে—সে দীপ্তি অপর্ণার কোথায়? সত্যি কথা, অপর্ণাকে তাঁর মনে থাকে না। কিন্তু তাই বলে কোন্ অধিকারে অপর্ণা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে পারে, ব্যঙ্গ করতে পারে তাঁর নিরক্ষরতাকে? আর সত্যিই তো তিনি মূর্খ নন। মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়ে অপর্ণা হয়তো বুঝতে পারে, তিনি পায়ের না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! তাঁর অমিত পৌরুষ—তাঁর শক্তি—

কিন্তু দাঁড়াও! বিশ্বনাথের মনের মধ্যে কে যেন প্রচণ্ডভাবে একটা ধমক দিয়ে তাঁর চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিল। পৌরুষ আর শক্তি। যার জমিদারীর একখানার পর একখানা মহল দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়, লাটের খাজানা দেবার জন্ত ঘোড়ার সহিস রামমুন্সের লালার বংশধরের কাছে গিয়ে থাকে নতজাহু হয়ে দাঁড়াতে হয়, তার শক্তি আর পৌরুষ! তার দাম কী! তার মূল্য কতটুকু!

তা হলে—তা' হলে অপর্ণার এই ব্যঙ্গের পেছনে তার কি কোনো ইঙ্গিত আছে? কোনো কটাক্ষ কি আছে এই দুর্বলতাকে লক্ষ্য করে? অপর্ণা কি সত্যিই ভেবেছে, যেদিন সব দিক থেকে মৃত্যু আর পরাজয় নেমে আসবে বিশ্বনাথের জীবনে, সেদিন সে আবার বিজয়িনীর মতো ফিরে যাবে তার মাষ্টারীর জীবনে? এতবড় অপমান সহবার আগে—

বিশ্বনাথ একবার খেমে দাঁড়ালেন।

মতিয়ার পেছনে পেছনে ছারামূর্তির মতো অমুসরণ করে আসছিল, বিশ্বনাথ তাকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি খেমে দাঁড়াতেই সংকোচে নিবেদন জানাল—হজুর, বাগীজী বললেন—

বাগীজী! তুমি চোখে আগুন বধন করে বিশ্বনাথ মতিয়ার দিকে তাকালেন। ঝড়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস। বিশ্বনাথের পায়ের চটাজোড়ার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মতিয়া জানাল—বাগীজী বললেন, চান করে—

—নাঃ, বা তুমি সামনে থেকে। হন হন করে এগিয়ে গেলেন

বিশ্বনাথ। মতিয়ার ভারী বিষয় বোধ হল—হজুরের আজকে এত সংঘম কেন। ওই চোখের দৃষ্টি তো তার চেনা। কারণে অকারণে ওরা বধন ধক ধক করে উঠেছে, তখনই হুঁচার যা জুতো ধপাধপ তার পিঠে এসে পড়েছে। রাগের ওপরে অনেক জিনিস-পত্র যেমন আছড়ে ভেঙে ফেলে বিশ্বনাথের কোপটাও সেই রকম মতিয়ার পৃষ্ঠের ওপরেই প্রশমিত হয়ে থাকে। আজ যেন তার ব্যতিক্রম ঘটল।

বিশ্বনাথ রংমহলে যাওয়ার জন্তে পা' বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু মনে পড়ে গেল, আর একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে এসে বসে আছে। আর একটা লোক! একটা গভীর বিরক্তিতে জ্ব হুঁটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল—একটি মুহূর্ত এরা কি তাঁকে ভাবতে দেবে না, আত্মগোপন করতে দেবে না নিজের নিভৃত অবকাশের মধ্যে? কে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে সবই অসুস্থমান করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। যেচে কেউ খাজনা দিতে আসেনি, অপ্রত্যাশিত সুসংবাদও বয়ে আনেনি কেউ। হয়তো ফরিদাদ, হয়তো হাতে-পায়ে ধরে কোনো একটা কিছু মাপ করিয়ে নিতে চায়—নয় তো কোন হুঃসংবাদ। কোনো মহাজনের তাগিদদার হওয়াও বিচিত্র নয়। একবার মনে হল লোকটাকে পত্রপাঠ বিদায় দেবার কথা। কিন্তু নাঃ—ও পাপ একেবারে মিটিয়ে দেওয়াই ভালো।

যে এসেছিল, কাছারীবাড়ীর দাওয়ার নীচে ছারায় বসে একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো সে তখন জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে। তার শরীর দুর্বল—রাত থেকে যে জরটা ধরেছে এখনো ছাড়েনি। অসহ্য বোত্রে আর দমকা হাওয়ার উড়ে আসা রাশি রাশি ধুলোকে—প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তার গুণে গুণে আসতে হয়েছে; যতবার কাশি এসেছে, ধুলোর সঙ্গে মিশে মিশে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়েছে, মুখ মুছতে গিয়ে ময়লা চাদরের প্রান্তটা তার রক্তে রাঙা আর আঠালো হয়ে গেছে। লোকটা আর কেউ নয়—কালীবিলাস কুু।

দাওয়ার নীচে মূর্তির মতো বসে আছে কালীবিলাস। ক্লান্ত নিশ্বাসে বুকটা খর খর করে কাঁপছে, জিভটা আপনা থেকেই বাইরে বুলে নেমেছে। দেউড়ির দারোয়ানটা অনেকক্ষণ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাকে; কী একটা প্রশ্ন জাগছে তার মনে, কিন্তু কাছে এসে কিছু বলতে পারছেন না। চোখ দুটো যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে কালীবিলাসের, প্রাণপণে মেলে রাখবার চেষ্টা করছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। শুধু একবার স্বপ্নের মতো কাছারীবাড়ি, ফাটলধরা দেউড়ি, দেউড়ির দরজায় পা-ভাঙ্গা একটা সিংহ, অস্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত তুল্লা যেন ভিড় করে ভেঙে পড়েছে কালীবিলাসের সর্বাঙ্গে—তাকে তলিয়ে নিতে চায়, তাকে যেন আর জাগাবে না। আচমকা মনে হল, সামনে অনেকগুলো ঝাড়-লঠন, অনেক লোকের কোলাহল। যাত্রার আসর বসেছে নাকি! হ্যাঁ, যাত্রাই তো! বিস্মিত কালীবিলাস দেখতে পেল, বহুদিন পরে আবার অধিকারী ম'শাই নেমেছেন গান

গাইতে। পরনে গেকরা পোষাক, মাথায় গেকরা পাগড়ি; তাঁর ভেজস্বী ভারী মুখখানা ঝড় লঠনের আলোয় জল জল করে জলছে। বেহালার ছড়ে তীক্ষ্ণ আর্ন্তনান বাজছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে তাঁর কণ্ঠ :

"দিন এসেছে ডাক এসেছে

আজকে মায়েঃ শেষ বলি,

কে দিবি আর মায়েঃ পায়ে

রক্তজবার অঞ্জলি।"

আশ্চর্য্য! কী অদ্ভুত গলা খেলছে অধিকারী মশাইয়ের। যতদিন কালীবিলাস তাঁর দলে ছিল ততদিন তাঁকে এমন প্রাণ দিয়ে গান গাইতে সে তো শোনে নি। কি আশ্চর্য্য সুর, কী আশ্চর্য্য গলার কাজ। এমন কবে বেহালা বাজাচ্ছে কে? কালীবিলাস লোকটার দিকে তাকালো, তার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অপূর্ণ বেহালা বাজিয়ে চলেছে সে—যেমন গান, তেমনি তার বেহালার ঝংকার।

"কে দিবি আর মায়েঃ পায়ে রক্তজবার অঞ্জলি"—কথা আব সুরের অপরূপ সমন্বয় হয়েছে। অধিকারী মশাইয়ের মুখখানা জলছে, একটা আশ্চর্য্য জ্যোতি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। কালীবিলাসের ভালো লাগতে লাগলো—অদ্ভুতভাবে ভালো লাগতে লাগল। আকস্মিক একটা আনন্দেব জোয়ার যেন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। কিন্তু আনন্দ-তরঙ্গের দোলায় বুকের ভেতর এত জ্বালা করে কেন, এমন ভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কেন? অধিকারী মশাই কি এবার তাঁর দিকে তাকালেন? গানের সুরটা কী খেমে গেল? বেহালার সুরটাও কি আর শোনা যায় না?

—কে তুমি, কী চাও?

কে জিজ্ঞাসা করছে? অধিকারী মশাই কি তাকে চিনতে পারছেন না? পাঁচ বছরেই তিনি কি তাকে ভুলে গেলেন? বাজার আসরটা আর দেখা যায় না কেন? মুহূর্তে সব যেন গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? সে কোথায়? বুকের মধ্যে সেই তীব্র জ্বালাটা বড় বেশি স্পষ্ট, নিঃশ্বাস নিতে বড় বেশি কষ্ট হয়।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে? কী হবে আবার? কালীবিলাসের ঘুম পেয়েছে, বড় বেশি ঘুম পেয়েছে। আর সে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না, তাকাতে চায়ও না। এই ঘুমটা তার অত্যন্ত ভালো লাগছে। কে তাকে ব্রজহরি? ভূষণ? নাঃ, সে ওদের দলে আর যাবে না! বেজাটা ছোট লোক, অধিকারী মশাইকে নিন্দে করে, কু-কথা বলে। তার চাইতে এখানে ঘুমোনোই ভালো—ঘুমটি বেশ জমে এসেছে। আর সে সাড়া দেবে না, চোখ মেলেও তাকাবে না। না—না—না

বিষনাথ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, লোকটা কে? অমন করছে কেন?

য্যোমকেশ কালীবিলাসকে চিনতেন। বললেন, এ তো ব্রজ শালেশ দলের লোক, কালী কুণ্ড। কী বলতে এসেছে কে জানে।

এতদূর হেঁটে এসে বোধ হয় তুরগাণ হয়ে পড়েছে—তাই—কিন্তু, একি! মরে গেল নাকি লোকটা?

—মরে গেল!—বিষনাথ বললেন, সে কি কথা! মরে যাবে কেন?

মতিয়া বুকে পড়ে একবারটি পর্য্যবেক্ষণ করলে কালীবিলাসকে। তারপর পেছনে সরে গেল। বললে, হাঁ, হজুর, একদম মরে গেছে। মুখের ভেতর এক চাপ রক্ত জমে রয়েছে।

বিষম-ব্যাকুল চোখে কালীবিলাসের চিরনির্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিষনাথ। মরে গেল, এত সহজেই শেষ হয়ে গেল সমস্ত! এই কি মানুষের জীবনের মূল্য!

ব্রজহরির আলুকাপের দল ততক্ষণে খেয়া পাড়ি দিয়ে মামুদ-পুন্দের টাল ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে গেছে।

সাত

কুমার বিষনাথ চলে যাওয়ার পর লাল হরিশরণ এসে বসলেন বাইরের গলীতে। বেলা অনেক হয়েছে, এ সময়টা হরিশরণ ওপরের মহলে গিয়ে বিশ্রাম করেন। কিন্তু আজ আর তিনি ওপরে গেলেন না। রামদেইয়া গড়গড়া সাজিয়ে নিয়ে এল। মোটা গির্দা বালিশটা তেলান দিয়ে নিজের ভেতরেই ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন হরিশরণ।

কাজ—কাজ—কাজ। পনেরো বছর বয়সে তিনি ব্যবসাতে ঢুকছিলেন, আজ তাঁর বয়স সাতান্ন। বেয়াদিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে নিজেই টের পাননি তিনি। খ্যাতির দিকে লোভ ছিল না, প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না। টাকা চাই, ব্যবসাকে বড় করা চাই। বিষ্ণুশরণ লাল যা রেখে গিয়েছিলেন, তাতে দিন চলে যেত—হয় তো ভালোই চলে যেত। কিন্তু হরিশরণ বাঙালী জমিদারের ছেলে নন, বাপ-ঠাকুরদার সম্পত্তিকে হুঁশাতে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নবাবী করবার মনোবৃত্তি তাঁর নয়। তা যদি হত—তা হলে শৃঙ্গদন্তের বোঝা নিয়ে আজ তাকে কুমার বিষনাথের মতো মহাজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত ঋণের প্রত্যাশার।

কুমার বিষনাথ!—লালাজী করুণার হাসি হাসলেন।

কী মূল্য অহমিকার, কতটুকুই বা দাম অর্থহীন আত্মমধ্যাদার! বিদ্রোহী প্রজার ঘরে আগুন লাগানো? তার বাড়ীর মেয়েদের টেনে এনে কাছারীর পেয়াদার হাতে সমর্পণ করা? কী লাভ হয় তাতে? মামলা হয় মোকদ্দমা হয়, নিজের জেদের খেসারত দিতে হয় অনাবশ্যক অপব্যয় করে। শুধু কী তাই? একজন বিদ্রোহী প্রজাকে সায়ের্তা করতে গিয়ে দশজন বিদ্রোহী হয়; ফুলঙ্গকে ইন্ধন দিয়ে জ্বালায়ে তোলা হয় সর্বগ্রাসী বিশাল আগ্নে-কুণ্ড, সেই আগুন একদিন এসে নিজেকেই গ্রাস করে বসে। লাল হরিশরণ ইতিহাস পড়েননি—কিন্তু লোকচরিত্র তিনি জানেন। ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কারে অগ্ন্যযাত করতে করতে সেই অগ্ন একদিন প্রতিহত হয়ে আসে—লাগে নিজের গলাতেই। অত্যাচারের রূপটা স্পষ্ট হয় যত বেশী—বিদ্রোহের রক্তবীজ ততই বেশী পরিমাণে বংশবিস্তার করে। এ কথা আজ কুমার বিষনাথকে দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেখতে পান। বিষনাথের প্রজারা ঘরবাড়ি

ছেড়ে পালায়, তারা খাজানা দিতে চায় না, তারা কুবক ইউনিয়ন গড়ে তোলে, মামলা-মোকদ্দমা করে তাঁর বখাসকর্ষক আজকে বেতে বসেছে। আর তাঁর এলাকাতে বারা কুবক ইউনিয়নের পাণ্ডা, তাদের খাজানা তিনি মাগ করেছেন—বিনা সেলামীতে জমি বিলি করে দিয়েছেন। গ্রামে টিউব-ওয়েল বসিয়েছেন, স্কুল খুলে দিয়েছেন। ফল কি দাঁড়িয়েছে? হরিশরণ আবার হাসলেন। আজ তিনি একজন আদর্শ জমীদার, গরীবের মা-বাপ তিনি। গরীবেরা তাঁর জমীদারীকে বলে রামরাজ্য।

আর অহমিকা? পাঁচ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটা আজো যেমন উপভোগ্য তেমনি উপদেশ্য বোধ হয়।

একটা ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার, কত টাকা মাইনে পায় সে? তিন শো, চার শো, পাঁচ শো, ছয় শো? ঠিক জানেন না তিনি। মনে আছে ইনকাম-ট্যাক্সের দরবার করতে তাঁকে নিজেই যেতে হয়েছিল তার কাছে। চলনে বলনে পুরো সাহেবী ধাঁচ লোকটাব, চিবিয়ে চিবিয়ে বিলেতী কায়দার কথা বলে, আর পাইপ খায়। লালাজীকে সামনের চেয়ারে বসতে বলা তো দূরের কথা, চোখের কোণে ভাল করে তাকিয়ে অবধি দেখিনি। তারপর খাতাপত্র নিয়ে তাব সে কি গর্জন আর হুজুর! যেন গভর্ণমেন্টের টাকা আত্মসাৎ করবার জন্তে দুনিয়াশুদ্ধ লোক মুখিয়ে বসে আছে, আর যেমন করে হোক এই সমস্ত হুর্জনেদেব সাংযস্তা সে কববেই—এই তাব ব্রত।

প্রচুর গালাগালি এবং তর্জন হজম করেও লালাজী একটিও কথা বলেন নি, তাঁর মুখের একটি বৈখ্যবৎ স্থানচ্যুতি ঘটেনি। অথচ ইচ্ছে কবলে তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন যে, পাঁচশো টাকা মাইনের একটা ইনকামট্যাক্স-অফিসারকে চাকর বেখে তিনি জুতো বুকশ করতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি বলেন নি। বং যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, মহামতিমাধিত হুজুর কুপা না করলে তাঁকে সগোষ্ঠী উপোস করতে হবে, ভাসতে হবে অকুল পাথাবে। অতএব—

সময়বিশেষে আবসোলাও পার্থী হয়, স্তত্রা; তিনি যত শান্তি-বারি মেচন করছেন, মহামতিমাধিত হুজুর দড়ি গিটেব মতো ভিজে ভিজে তত বেশী শক্ত আর জটিল হয়ে উঠেছেন। বাশি বাশি অপমান হজম করে কঠিন আর কালো মুখে বেরিয়ে এসেছেন লালাজী। শুধু ইনকামট্যাক্স অফিসের কম্পাউণ্ড পার হওয়ার পরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—‘লাট বন্ গিয়া শালা গুয়ারকা বাচ্ছ!’

তার হুঁবছর পরে ছোটলাট যখন সত্যিই জেলা সফরে আসেন, তখন লাটসাহেবের খানাত্তে লালাজীরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মাথায় জরীর পাগড়ি আর দিল্লীর বহুমূল্য আচকান পড়ে যখন লালাজী টি-পাটির তাঁবুর সামনে নামলেন তাঁর অকথ্যক বড় ক্রাইস্‌লার থেকে, তখন সর্বপ্রথমই চোখে পড়েছিল স্তত্র পরে দূরে দাঁড়িয়ে সেই ইনকামট্যাক্স-অফিসার। তার মুখে সে পাইপ নেই, সে সিংহগর্জনও নহ্ন। স্নান, বিষ্ণ এবং ভীত তার চোখের দৃষ্টি, সেই সঙ্গে একটা অক্ষম লোমুপতা—বেশ বোঝা যায়, এখানে ঢোকবার

বোগ্যতা সে অর্জন করেন। তাঁবুর সামনে বেশী পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত চেয়ার আর টেবিলের সারি, বাশি বাশি ফল, ফুল আর বিলাতী স্নখাত্তের সমারোহ। ‘তীরের কাকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে সে দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ফেলেছে—স্বাণেই বতটুকু হয়। তার আশে-পাশে আরে’ দু’চারজন তার সগোষ্ঠীর দেখেই সাব্দনা।

লালাজী নেমে কার্ড বার করলেন, তকমা আঁটা চাপরাঙ্গী সেলাম করে পথ দেখিয়ে দিলে। ভেতরে ঢুকবার আগে লালাজী একবার পেছন ফিরে তাকালেন হুজুরের দিকে। হুজুর তাঁকে চিনেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। পলকে তার মুখের চেহারা বদলে গেল, পকেট থেকে ক্রমাল বের করে কপালটা মুছল একবার, তারপর বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালাজী সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

কিন্তু কাজ—কাজ—আর কাজ। কোনো অপমান কোনো দাস্তিকতা কাজের পথ থেকে তাঁকে ফেরাতে পারেনি। টাকা চাই, যেমন করে হোক বড় হতে হবে। এই বোধটা যদি মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে না থাকত, তা হলে ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে ওভাবে তোসামোদ না কবে পাঁচহাজার টাকা বার্ষিক খবচ বাঁচাতে পারতেন না তিনি।

বাইরে বেড়ে চলেছে বেলা। আর অনেককণ আগেই বিদায় নিয়ে গেছে প্রসাদাকাজীর দল। গডগড়াব নল থেকে এখন আর ধোঁয়া ওঠে না, অশ্রমনস্বভাবে সেটাকে পাশে সরিয়ে রাখলেন লালাজী। সত্যি, অনেক করলেন তিনি জীবনে। আর অনেক না করলেই কি পাওয়া যায় অনেক? সেদিন ইনকামট্যাক্স-অফিসারকে খোসামোদ করতে হয়েছিল বলেই পরে বাংলার গবর্নর এসে স্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তাঁব প্রাসাদেব।

কিন্তু আর নয়—এবাব বিশ্রাম করা প্রয়োজন। ঐখ্য শুধু তো অর্জনের জগেই নয়, তাকে তো ভোগ করতেও হবে। বয়স অবগু কিছু বেশি হয়ে গেছে, তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আনন্দসন্তোগের স্পৃহাও তাঁর নেই, চরিত্রে নিষ্ঠার মূল্যও তিনি জানেন। কিন্তু তিনি এবাবে বিশ্রাম করবেন আর ভোগ কববেন তাঁব না প্রাপ্য, তাঁর রাজমর্যাদা। কুমারদহ ফাঁকির ওপর দিয়ে ব্যবসা চালিয়েছে অনেককাল, গায়ের জোবে আদায় করেছে সেলাম, আদায় কবেছে সেলামী। কিন্তু আর সে সুযোগ তাদের দেওয়া চলবে না। সোনাদীঘির মেলা তাব প্রথম পর্যায় মাত্র। রামসুন্দর লালা যে একদিন কুমারদহের বাজবাড়ীতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করতেন, এই সত্যকে মুছে ফেলতে হবে, এই কলঙ্কে আর সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে আত্মপ্রকাশের অবিকার দেওয়া চলবে না।

রামদেইয়া?

জী!

রামদেইয়া সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরের ঘুননী থেকে এক গোছা চাবি বের করে লোহার সিদ্ধকটা খুলে ফেললেন লালাজী। তারপর বার করে আনলেন এক ভাড়া নোট আর কতকগুলো কাগজ। বললেন, একটু বেকতে হবে, কুমারদহ যাব।

রামদেইয়া কোনো প্রশ্ন করল না, কোঁতুলও জানাল না। সে এটুকুই জানে যে, হরিশরণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি কিছুমাত্র আলস্য বা আরামের দিকে জরুপ করেন না। শুধু ভিজ্ঞানভাবে যেন নিজের এ সম্পর্কে কৌ কৰ্তব্য সেটা জানবার জন্তেই বললে—জী?

বড় ঘোড়াটা ঠিক আছে?

—জী হাঁ।

—কেমন চলবে? জোর কদম?—লালাজী চোখ উদ্বীপ্ত হয়ে উঠল: কুমার সাহেবের ঘোড়াটার চাইতে আবো জোরে ছুটেতে পারবে তো?

—কুমার সাহেবের ঘোড়া? জু কুঞ্জন করে চিন্তা করতে লাগল রামদেইয়া। না হজুর, অত ছুটেতে পারবে না। ওটা খেলোয়াড় ঘোড়া, বহুং তাকং।

—তা হলে কুমার বাহাদুরের এখনো কিছু কিছু আছে যা আমার নেই! হরিশরণ হঠাৎ সর্কোতুকে হেসে উঠলেন, হাঁ হাঁ আছে বই কি! ওই দারুণ বোতল। আমার সাধ্য নেই—ওখানে তাঁর সঙ্গে পান্না দিতে পারি। সাহেব-মেমদের বহুং দারু খাইয়েছি কিন্তু মহাবীবজীর দখায় ওই হারামী চিজ খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন।

রামদেইয়া অন্তরুণ পরে যেন একটা ভালো কথা বলবার স্রবোগ পেল।

—ও বড় শরতান চিজ হজুর। মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়।

—হঁ, সে তো কুমার বাহাদুরকে দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু—কিন্তু লালাজী নিজের মধ্যেই আবার তলিয়ে গেলেন: ঘোড়াটা অত জোরে চলতে পারবে না সত্যিই?

রামদেইয়া নিরাশভাবে মাথা নাড়ল।

না:। এবার একটা কাম করুন না হজুর। কলকাতা থেকে বড় একটা ওয়েলার কিনে আনুন, আমি তালিম দিয়ে তাকে ওই ঘোড়ার চাইতে আচ্ছা করে দেব।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে পরে। কিন্তু—কিন্তু লালাজীব চোখ আবাব প্রদীপ্ত হয়ে উঠল: ঠিক হয়। তুই হাওয়া গাড়ীটাকেই বার করতে বলে দে।

হাওয়া গাড়ী? এবারে রামদেইয়াও যেন বিম্বিত হয়ে উঠল: হাওয়া গাড়ী নিয়ে যাবেন কুমারদয়? রাস্তা যে ভারী খারাপ হজুর, গাড়ী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

বরবাদ হয়ে গেলে দোসরা গাড়ী কেনা যাবে। তুই গাড়ী বার করতে বল, আমি জামা-কাপড় পরে আসছি। আর আর—লালাজী হঠাৎ হাসলেন: একটা হাত্তয়ারও সঙ্গে নই, কি জানি, রাজারাজড়ার ব্যাপার!

—হাত্তিয়ার? পিস্তল?

—হঁ।

রামদেইয়ার চোখ বিফারিত হয়ে উঠল কপালে: হাত্তিয়ার কি হবে হজুর?

কাজে লাগতে পারে হয় তো।

সারাসারী? হাঙ্গায়া? জমি নিয়ে কোনো গোলমাল

হয়েছে নাকি? উত্তেজিত ও সম্ভব রামদেইয়া যেন প্রশ্নের পর প্রশ্নবাহ বর্ষণ করতে লাগল: তাঁ হলে হজুরের বাওয়ার দরকার কি? বরকন্দাজ থাক, লাঠি থাক থানায়, একটা খবর দেই। আমরা—

হরিশরণ প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন এইবারে।

না, না, ওসব কিছু করতে হবে না। আমি যা বলি তাই শুনে যা খালি। হাওয়া গাড়ী বার করতে বল। আর আমি একাই যাব, সঙ্গে যেতে হবে না কাউকে।

নোট আব কাগজপত্রগুলো মুঠো করে নিয়ে হরিশরণ অন্তরেব দিকে অগ্রসর হলেন।

মোটর লালাজীব আছে বটে, আশে পাশেও চলে, কিন্তু কুমারদেইয়ার রাস্তা এত দুর্গম যে সে পথে মোটর চালানো প্রায় অসম্ভব। গোকুর গাড়ির কল্যাণে রাস্তার সর্কাসে রাশি রাশি গর্ত; প্রতি পদে তার ভেতরে আটকে যেতে পারে মোটরের চাকা। মাঝে মাঝে সে গর্ত এত গভীর যে তাতে বহরের প্রায় হ'মাস কাদা জমে থাকে। এন্টেল মাটির সে কাশা আঠার মতোই শক্ত—গরুর গাড়ীর চাকা আঁকড়ে ধরে, বলদের পা একবার তাতে পড়লে টেনে তোলা যায় না। তা ছাড়া রাস্তার দু'পাশে নয়ানজুলি, পথ তৈয়ারী করবার সময় লোকাল বোর্ড ওখান থেকে কেটে কেটে মাটি তুলেছিল। খানিকটা যোল! আর অপরিচ্ছন্ন জল জমে রয়েছে, নয়ানজুলিতে উঠছে কাদার একটা দুর্গন্ধ। মোটরের চাকা একটুখানি বেশামাল হয়ে গেলে সোজা ডিগবাজী দিয়ে ওই জলের মধ্যেই আশ্রয় নিতে হবে।

অসম্ভব বন্ধুর পথে ক্রমাগত ঝাঁকুনি খেতে খেতে লালাজীব মোটর এগিয়ে চলল। পাঁচ মাইল পথ যেন পঁচিশ মাইলের চাইতেও দুর্গম হয়ে উঠেছে। মোটরের শব্দে দু'পাশের মাঠের গরুর দল চকিত হয়ে উঠল; কেউ কেউ বা উদ্ধ্বাসেই ছুটেতে সুরু করে দিলে। বাইরে থেকে রাশি রাশি ধুলো এসে পড়তে লাগল লালাজীব মুখে। তার পর আরো খানিকটা এগিয়ে আম বাগানের মধ্য দিয়ে একটা বাক নিয়ে গাড়ি ঢুকল কুমারদয়।

দু'পাশে ভাঙা বাড়ী ঝুঁকে পড়েছে, জলা আমার বনের মধ্যে মজা দীঘির বুকের ওপর অন্ধকার ছায়া নেমেছে। মোটরের আবির্ভাবে এই দিন দুপুরেই কোথা থেকে হুটে! প্যাচা উড়ে গেল। কচুরী পানার স্তরের ওপরে বসে যে সালন্দ গোথুর নিজের একরাশ নীল ডিমের পাহাবা দিচ্ছিল—চট করে জলের তলার লুকিয়ে গেল সে। চোখে পড়ল রায় বন্দ্যোদয়ের ভাঙা দেউড়ি। রামচন্দ্র রায় বন্দ্যায় আশে যাকে বলত সিংহস্বার। সিংহস্বারে পাখরের সিংহ এখনো বীরবিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের রঙ মলিন আর বিবর্ণ, একটা দাঁড়িয়ে আছে তিন পায়ে তার লেজটাও খসে পড়েছে; আর একটার মাথাই নেই, শুধু তার গলায় কোলানো কেশরগুচ্ছের ওপর কোলাহল করছে দু'তিনটি চড়াই পাখী। দেউড়ীর সামনে মোটরটা থামতেই চড়াই পাখীরা উদ্ধ্বাসে পালিয়ে গেল।

অন্ত:পুরের দোতলাতে জানালাব সিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেম অপর্ণা। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে প্রসারিত—বেখানে নীলের

বিস্তৃত পটভূমিতে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, উড়ছে শঙ্খচিল। মনটা মুক্তি চায়, উড়তে চায় ওই শঙ্খচিলের মতো। কিন্তু সে মুক্তি নিতে হলে বিলাতী বইয়ের 'নোরার' মতো বেরিয়ে পড়তে হয়, আইরীশের মতো উদ্ভুদ্ধ হয়ে উঠতে হয় ব্যক্তিগতত্বের অনুপ্রেরণায়। কিন্তু অত শুলভ রোমান্স অপর্ণার নেই। কী চমৎকার কলেজ-জীবন কেটেছে কলকাতায়। শীতের দীর্ঘ নিচায় পর থেকে পাহাড়ের গুহা থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে ক্ষুধার্ত আর বিশালকায় অজগর—তেমনি প্রকাণ্ড এক ভূখা মিছিল প্রসারিত হয়ে গেছে হারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোব থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রীট পর্যন্ত। ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে জয়ধ্বনি তুলে বেবিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা ছাত্রতরঙ্গ। মিশল সেই বিরাট মিছিলের সঙ্গে। সকলের পুরোভাগে রক্ত-পতাকা বয়ে অপর্ণা। একটা লালমুখ সার্জেন্ট মোটর সাইকেল থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল ফুটপাথে—অত্যন্ত সন্নিগ্ধ আর সঙ্কিত চোখে লক্ষ্য কবতে লাগল এই বিরাট জনযাত্রাকে। তারপর ওয়েলিংটনে জনসভা। নতুন মুক্তি নতুন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দিয়েছে মানবতার উদয় দিগন্তে।

আশ্চর্য—সেই অপর্ণা আজ কুমার বিশ্বনাথের স্ত্রী। কুমার বিশ্বনাথ—সামন্ততন্ত্রের আত্মঘাতী ধ্বংসসূচী। তার সঙ্গে অপর্ণাকে আজ মানিয়ে নিতে হয়। কিন্তু শুধু মানিয়ে নেওয়ার কাজই অপর্ণার নয়। জয় করতে হবে বিশ্বনাথকে, তাঁকে নামিয়ে আনতে হবে তাঁর ত্রুতের মধ্যে। অপর্ণা সেই দিনেব প্রতীক্ষায় আছে। সম্রাটের ঔদ্ধত্য রাজশক্তির একটা দৃঢ় কঠোর মহাদাবোধ বহন করে বিশ্বনাথ তাঁকে এগনো উপেক্ষা করে চলেছেন, অস্বীকার করে চলেছেন। এই পবিবাবে অস্তঃপুঙ্কাদেব যে প্রাণহীন বিলাস মূল্য পুরুষাত্মকমিক ধরে নির্ধারিত হয়ে এসেছে, সেই মূল্যই পেয়েছে অপর্ণা। কিন্তু সম্রাটের সাম্রাজ্যে আজ ডাঙন ধরেছে। তাকেও নেমে আসতে হবে, কিন্তু কোথায়? সম্রাট আব সর্বস্বতার মধ্যে কোনো মাঝামাঝি স্তরভেদ নেই—তার শক্তি ভর্তুকির আর প্রচণ্ড—শুধু সে শক্তি প্রকাশের প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু সম্রাটের পরিবর্তনও একদিন আসবে—অপর্ণা আছেন তারই প্রতীক্ষাতে।

মোটরের শব্দে অপর্ণার চমক ভাঙল। কে এল? পুলিশের লোক নয় তো? বিশ্বনাথ সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত

নয়। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। অপর্ণা ডাকলেন, মতিয়া।

মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

মোটরে কে এলো দেখে আর তো।

মোটর? মতিয়ার মনও শঙ্কিত আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। দ্রুতগতিতে নেমে গেল সে।

আর ওদিকে লালাজী দেউড়ি পার হয়ে ঢুকলেন সোজা কাছারী বাড়ির মহলে। কালীবিলাসের মৃতদেহের সামনে বিশ্বনাথ সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হরিশরণ সেখানেই দর্শন দিলেন এসে। চমকে ফিরে তাকালেন বিশ্বনাথ।

বাম রাম।

রাম রাম। বিশ্বনাথ সবিষ্ময়ে বললেন, এ কি লালাজী?

হী, জজুরের টাকাটা দেবার জন্তে—

এই সময়ে, এত কষ্ট করে! কথাটা বলতে গিয়ে সৌজন্তের চাইতে সন্দেহই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল বিশ্বনাথের গলায়। এর পেছনে হরিশরণের কোনো রকম একটা চাল নেই তো? অথবা সোনালীঘির মেলাটা যত তাড়াতাড়ি বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেই আশাতেই?

বিশ্বনাথের দৃষ্টির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েই যেন কথা বললেন লালাজী। অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে বললেন, হী—যখন জরুরি দবকার। আমবা তো গোলাম—মনিবের স্ত্রিখেটা সবসময়েই নজর রাখতে হয়। কিন্তু একি ব্যাপার? এ লোকটা কে পাড়ে আছে এগানে?

অসীম বিবিক্তিতে ভ্র কুঞ্চিত হবে বিশ্বনাথ বললেন, কে জানে, ঠিক বুঝতে পারছি না। কি একটা খবর দিতে এসেছিল আলকাপের দল থেকে—

আলকাপের দল! লালাজীর ভাবান্তর ঘটল। বিচক্ষণ আর তীক্ষ্ণ চোখ গিয়ে পড়ল কালীবিলাসের মৃত্যুপাণ্ডুর আর রক্ত কলঙ্কিত মুখের ওপর। লোকটাকে চিনেছেন তিনি। সমস্ত মনটা চমকে উঠল, মনে হল।

বিশ্বনাথ বললেন, থাক, ওপরে চলুন।

লালাজীর কণ্ঠস্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না। তেমনি শান্ত কোমল গলাতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ চলুন। [ক্রমশঃ]

বিদ্যাপতি

এক

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আদ্যম উৎস। ভগীরথ যেমন মহাদেবের ভট্টাঙ্গালব্ধ ভাগিরথীকে সাধারণ ব্যবহারের সমতল ভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ইঁহারও সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সংস্কৃত পুণ্য, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের সূদূর বেষ্টনী হইতে মুক্তি দিয়া নবজাত প্রাণেশিক ভাবের উজ্জ্বলিত, কুগল্যাবী প্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত জনসাধারণ ও কাব্যরসিকের মনে প্রেমাসুভূতির যে আবেগ যুগ-যুগান্তর হইতে সঞ্চিত হইয়াছে, বিরহ-মিলন, নান-অভিমান, হাসিকান্নার যে নিবিড় আবেশ অপর্ণ ইন্দ্রজাল বরন করিয়াছে, ইঁহার সেই সনাতন হৃদয়-লীলার সহিত বৃন্দাবন লীলার সংযোগের পথ প্রদর্শক। 'দেবতার প্রিয় ও

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়ের দেবতা' করিয়া ধর্মসাধনার মধ্যে কেমন করিয়া সহজ রসমাধুর্য ও সৌন্দর্য্যবোধের স্ফূরণ করিতে হয়, ইঁহাদের কবিতার তাহা প্রথম পরিষ্কৃত। তাই ইঁহার যে বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার আবেশন কেবল একটা বিশেষ ধর্মমতের গভীর মতো সীমাবদ্ধ নহে, মানবের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্তি ও বিখ্যাসের উৎস শুকাইয়া গেলেও এই কবিতার কোন ক্ষতি হয় নাই। অন্তরের স্বতঃউৎসারিত অক্ষুণ্ণ নির্ভর এই শুদ্ধ খাতে প্রবাহিত হইয়া ইঁহার ক্রান্তিল সরসতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী যেন স্বর্ণ ও মণ্ডোর হাতে অক্ষর মিলনের চিত্রকল্প এক রাগরক্ত রাধীবন্দন পরাইয়া দিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী যখন সংস্কৃতের গভী হাড়াইয়া প্রাণেশিক ভাবের

আলোচ্য বিষয় হইল, তখন ইহার একটা গভীর প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটয়াছে। অলৌকিকতার পরিমণ্ডলে জাতি, ভক্তি ও সম্মুখে অবস্থিত সংস্কৃত শ্রোকের আবেগহীন শিল্প-সৌন্দর্য্য ও চন্দ্রোপাভীর আচ্ছাদনে হৃদয়ত এই ঐশী প্রেম প্রাচীন মৈথিলী ও বাংলার স্পর্শে যেন নূতন প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল, নূতন আবেগে মগ্নস্পর্শী ও নূতন গতিভঙ্গীতে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। নারক-নারিকার রূপ-বর্ণনা ও তাহাদের মনোভাবের স্তর-নির্দেশে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতি অমুহুত হইলেও, বাস্তব প্রতিবেশের সম্পর্কে বাস্তব অনুভূতির স্পর্শে এই প্রেমের মধ্যে বিস্তর রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে; পুরাতন ভাব নূতন ভাবের আত্মপ্রকাশের তাগিদে যেন নব উপলব্ধির প্রবল প্রেরণা অনুভব ও অগ্রসর ও অগ্রসর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে রূপায়িত করিয়াছে। বিভাগ্যতির কবিতায় এই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ রূপ প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছে। বিভাগ্যতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে কে অগ্রবর্তী তাহা অনিশ্চিত। তবে বিভাগ্যতি যে বৈক্যব সংস্কৃতির প্রাচীন ধারার সহিত আরও প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা বলা যাইতে পারে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ প্রথম অংশে পুরাতন কাব্যরীতিকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাকার করিয়া রাখাফুকের প্রেমকে ইতর কলহ ও পূর্বরাগ বর্জিত লেখুণ্ডতার অবস্থিতি প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছে। শেষের দিকে কবি কৃষ্ণকে উদাসীন্তে অবিলম্বিত রাখিয়া রাখার প্রণয়কাজকে বিরহবেদনা ও বাৎসল আত্মনিবেদনের দ্বারা মার্জিত ও বিশুদ্ধ করিয়া আবার সনাতন ভাবমাধুর্য্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। স্তবরাং এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বিভাগ্যতির সহিত তুলনায় বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাথমগত আংশিক ও অসম্পূর্ণ ইহাই অনুমান হয়। বড়ু যেন মহাজন-নির্দিষ্ট মূল শ্রোত চাড়িয়া এক অবাধ্য, আভিজাত্য মধ্যাহীন শাখাপথে তাহার কল্পনার তরলীকে বাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; শেষ পর্যন্ত প্রবাহের অনিবার্য্য আবর্ষণে নৌকার মুখ ফিরাইয়া আবার বৈক্যব ভাবধারার সাগরসঙ্গমে অজ্ঞাত তীর্থ-যাত্রীর সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বৈক্যবকাব্যের এই পরিবর্তনের পূর্বসূচী ভাবান্তরের পূর্বেই কবি জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ লক্ষিত হয়। জয়দেব অশ্রুত সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই কাব্য সম্পূর্ণরূপে গীতি-ধর্ম্মী। সংস্কৃতকাব্যের অনিচ্ছাসিদ্ধ, স্তরের অনুরূপ সুরগাভীর্ষ্য জয়দেবের কাব্যে শ্রোকের বন্ধন ও ভাবের সংঘর্ষ ছিঁড়িয়া বিগলিত হৃদয়বেগের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গে নৃত্যহেমে বহিয়া গিয়াছে। ললিতশব্দ বিভাস, চন্দ্রোপাভী ও আকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ প্রেমের ইন্দ্রজালনিবৃত্ত আদর্শ পটভূমিকার রচনা—ইহাই জয়দেবের মৌলিক সৃষ্টি। তাহার কাব্য ভাবগভীরতা অলঙ্কারবাহুল্যের প্রাধিক্রমের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে; শব্দকল্পার সময় সময় অর্থসজ্জিতকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতে হৃদয়ের গভীরতা হইতে উৎসারিত আবেগের কোন মগ্নস্পর্শী অভিযুক্তি আমাদের মনকে অভিভূত করে না—সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতরসে ভাসিতে ভাসিতে আমরা যেন অসহায় ভাবে এক অস্পষ্ট মোহাবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করি। তাহার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় উক্তি

‘সরগল খণ্ডনং মম শরঙ্গ মণ্ডনং
দেহি পদপদ্মব মুদারং’

যেন নিজ অপকৃপ সঙ্গীত গুণনের অন্তরালে পুরাতন আধ্যাত্মিকতা ও নূতন সৌন্দর্য্যপিপাসার মধ্যে এক অসীমায়িত আদর্শ-সংঘাতকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

দুই

বিভাগ্যতি ও চণ্ডীদাস জয়দেবের এই নূতন প্রকাশভঙ্গী, এই হৃদয়কোমল প্রহণ করিয়া তাহাতে ভাবগভীরতার সংযোগ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে ‘গীতগোবিন্দ’র কয়েকটা অংশের চমৎকার ভাবানুবাদ পাওয়া যায়।

বিভাগ্যতি ও সাধারণভাবে তাহার দ্বারা প্রভাবিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে পুরাতন ভাবধারার মধ্যে বড়ু গভীর ভাবাবেগ সংক্রান্ত করা সম্ভব ইহার তাহা করিয়াছেন। চৈতন্যভক্তের যুগের নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভাব-ভগ্নতা, বৈক্যব রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণের পূর্বাভাস ইহাদের রচনার কিছু কিছু পাওয়া যায়; তবে ইহা প্রতিভার পূর্বসংস্কারের প্রমাণ না পরবর্তীকালের সংধারণ ইহা মতভেদের বিষয়।

বিভাগ্যতি ও চণ্ডীদাস বৈক্যবসাহিত্যের প্রত্যেক রূপেই পর্যন্ত যুগের নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন—তাঁহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এই প্রতিনিধিফলক মধ্যাহার অন্তরালে অনেকটা আত্মগোপন করিয়াছে। ইহাদের নামের চারিদিকে অনেক মধুর পরিচয়। অনেক কবিত্বশক্তি কিংবদন্তী ভড়িত হইয়াছে। মাধুর্য্য বিহের পর রাখাফুকের ভাবসম্মিলনের দ্বারা এই দুই ভক্ত কবির গজাভীরে মিলন ও অজ্ঞানলব্ধ প্রেমালিঙ্গনের কাহিনী কবি-কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। বৈক্যবসাহিত্যে ইতিহাস শুধু বাহা ঘটনাতে তাহারই অনুবর্তী নহে, আদর্শ হৃদয় ও সত্যের নীতি অনুসারে বাহা ঘটনা উচিত ছিল তাহারই প্রকটীকরণ। চৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থসমূহে তথ্যবিস্তৃতি এই নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারক্রমে এই ভক্তজনগণিত ও অন্তরপ্রেরণাপ্রণোদিত মিলনের কোন সমর্থক প্রমাণ নাই। তথাপি এই সমস্ত কল্পনাবিলাস বাহু দিয়াও বিভাগ্যতির বহির্জীবন আমাদের নিকট অনেকাংশে স্থাপিত। বৈক্যব-কবীগোষ্ঠীতে তাহার জন্ত যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটা অনন্ত-সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকুই তাহার মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বিভাগ্যতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একেবারে অবিদ্যমান বৈক্যব প্রতিবেশ হইতে তাহার কাব্যপ্রেরণা ক্ষুদ্রিত হয় নাই। তাহার ধর্ম্মমত যে কি ছিল তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। মহাসমোপাধার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে পঞ্চাঙ্গাসক স্রিয়াবান্ মৈথিল জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। খাঁটি বৈক্যবের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে অজ্ঞাত বৈক্যবকবির দ্বারা পূর্ণভাবে রাখাফুকাইয়া বর্ণিত দাবী করেন। এ প্রেরের মীমাংসার যথেষ্ট উপাদান না থাকিলেও, তাহার পদাবলীর প্রমাণে বলা যায় যে তাহার ভক্তি শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু ও রাখাফুকা প্রভৃতি সমস্ত দেব-দেবীর উপরই প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই সমস্ত কবিতাতে আন্তরিকতার স্তরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। চৈতন্যভক্তের বৈক্যবকবির যে রূপ আত্মবিশুদ্ধ, একনিষ্ট ভক্তাবস্থার সহিত রাখাফুকের উপাসনায় ত্রুটি হইয়াছেন, তাহাদের প্রেমের মাধুর্য্যের অনুধাবন করিয়াছেন, বিভাগ্যতির ক্ষেত্রে সে রূপ অপ্রত্যক্ষ নিষ্ঠার নিদর্শন মিলে না। তাহার উদার ধর্ম্মবৃত্ত ভগবানের সমস্ত রূপের নিকট প্রভা ও প্রণত জ্ঞাপন করিয়াছে—তাহাতে সাম্প্রদায়িক সন্ধার্পণ ও তীব্রতা উভয়েরই অভাব। তিনি যখন রাখাফুকের প্রেমের মাধুর্য্য আবাদন, সেইরূপ মহাদেবের খেয়াল ও পাগলামীতেও স্নেহ কৌতুক অনুভব করিয়াছেন, আবার কথিতলিপ্রা, লোচনিত্র মহাকাশীয় যুক্তিরও ভগ্নাবহ মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈক্যবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্বে, এচও সর্বগ্রাসী ভক্তপ্রাণের বেগ ইহাতে সঞ্চারিত হইবার পূর্বে, ইহা একজন বিদগ্ধ, চতুর, রাজসভার আবেষ্টনে বদ্ধিত কবির কল্পনাকে কল্পে প্রভাবিত করিয়াছিল, চৈতন্যদেবের দীক্ষিত খাঁটি বৈক্যবকবির সহিত তাহার রচনার স্তরের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির এক প্রভেদ, বিভাগ্যতির কবিতা (যদি তাহার আসল কাব্যতা পৃথক করা সম্ভব হয়) আমাদের এই কৌতুকল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করতে পারে।

বাংলার জাতীয়তার ধারা

শ্রীমতী অমিয়া বসু, বি-এ, বি-টি

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর আমায়ের দেশে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হয়। দেশকে শাসনাধীন করিতে ইংরাজের আরও অনেক সময় লাগিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইংরাজ তৎপানীতন দিল্লীর বাহাদুরের নিকট হইতে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার “বেঙ্গালী” সনন্দ অর্থাৎ রাজস্ব আদায়, বেঙ্গালী মোকদমার ব্যবস্থা, শাসন বিভাগ এবং বাংলার নবাবের নিকট হইতে “নিজামত” অর্থাৎ কৌশলারী বিভাগের ব্যবস্থার কাজের ভার লাভ করিল। ইংরাজ শাসন উক্ত সনন্দ লাভের পর হইতে আরম্ভ হয়। তারপর বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেল বিভিন্ন পন্থা—দমন-নীতি, বক্তৃতামূলক সন্ধি প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব বিস্তার করে। রায়পুর, মারাঠী, শিখ, বাখান নৃপতিগণ কোম্পানীর সঙ্গে কখনও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সন্ধিতে পড়িয়া ইংরাজের বক্তৃতা স্বীকার করে। ইংরাজ নির্বিবাদে অপ্রতিহতভাবে ভারত শাসন করিতে লাগিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য বাৎসরিক কিছু অর্থ ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করে। সরকারের কাজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চতুর ইংরাজ কোম্পানীর কাজের সুবিধার জন্য ভারতবাসীদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে লাগিল। এতদনুসারে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেটিন্স আমলে পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যবস্থানুসারে নতুন ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ভারতবাসীদের পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এই বিষয়ে বিভিন্নমতাবলম্বী দুটি পন্থিত দলের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাদের বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক সর্বজন-বিদিত। এই দুই দল—Anglicists এবং Orientalists বলিয়া পরিচিত। যথাক্রমে প্রথম দলের জয়লাভ হয়। উক্ত দলের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজকার্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রচলন হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অবধি প্রসার সহজ হইয়া গেল। ইংরাজ ভারতের কৃষ্টি বিজয় করিল (cultural conquest), ইংরাজের ভারত বিজয় পূর্ণ হইল।

পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও বিজ্ঞান চর্চা ভারতে নবমুগের দৃষ্ট করিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনা পড়িয়া রাজা রামমোহন রায় বাখানতার উপাসক হইলেন। ব্যক্তিগত জাতিগত ও বাখানতা লাভ করিবার জন্য তাঁহার মনে উচ্চাকাংক্ষা জন্মিল। রাজার বহুমুখীন প্রতিভা ছিল। মান্য সংস্কার স্বারা সুশৃঙ্খল দেশকে আন্দোলিত করিলেন। রাজা রামমোহন ইলেন নব্য ভারতের প্রবর্তক।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ দেশে বিলাতী ভাবাজ্ঞের একদল ইংরাজী নবিশের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। বহু মহাশয় তাঁহার আকর্ষণীয়ভাবে তৎপানন্তন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অকণ্টে বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরকালে তিনি ইংরাজী সভ্যতার মোহাজির হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন, এমন কি শেষকালে ইংরাজ বিধেয়ী হইয়া পড়িলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ। লর্ড ডালহৌসীর শাসন বিদ্রোহের অন্ততম কারণ। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ, রাজ্যবিস্তারনীতি ও বিবিধ সংস্কার দেশে চাকলা উপস্থিত করে। তদুপরি সিপাহীদের মধ্যে “কার্টিজের” (Cartridges) ঘটনা। বিদ্রোহে দমন করিতে ইংরাজ রাজসন্ত্রস্তির অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, অমানুষিক অত্যাচার সঙ্ঘ করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ জয়লাভ করে। বিদ্রোহান্তে ভারতের শাসননীতি আতুল পরিবর্তিত হইল। কোম্পানীর শাসন শেষ, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ভারতশাসন হইলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজী জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারত শাসন কার্যে, এই মর্মে এক ইত্তাহার জারী করেন। দেশে মহানন্দ। ভারতবাসীর

জয়লাভে দেশ সুখরিত। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর মনের অন্তরালে একটি সশর উপস্থিত হয়—ইংরাজ রাজসন্ত্রস্তির অজের নহে। ইংরাজ-জাতিও ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। দেশে বিবিধভাষায় স্থাপিত হয়। ইংরাজ সরকার শাসনকার্যে ভারতবাসীদের বৎসারিত রাজ্যের অধিকারও দিতে লাগিল।

কলিকাতাতে জমিদারগণের উত্তোপে British Indian Association স্থাপিত হয়। অতি সত্তর্পণে এই সমিতি দেশের অভাবের কথা লাট দরবারে উপস্থিত করিত। সংবাদ-পত্রসেবা হরিশচন্দ্র মুখার্জী ও কৃষ্ণদাস পাল এই সমিতিতে যুক্ত ছিলেন। অভঃপর সাধারণের জন্য “অনুত বাঙ্গার পত্রিকা”র শিশির ফুমার বোধ Bengal National League স্থাপন করেন। League বেশী-দিন টিকিল না। পরে বাংলার রাষ্ট্রগুরু হুয়েন্ড নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যারিষ্টার আনন্দ মোহন বসু Indian Association প্রতিষ্ঠা করেন। হুয়েন্ড নাথ এই সমিতির অধিবেশনে ভারতের আহ্বান করিতেন। আমেরিকার বাখানতার ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লব, ইতালীর বাখানতা, আরলণ্ডের সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিয়া ভারতের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক বাকবিকৃতি ছিল। দিভিল মার্টিস হইতে বিভাডিত অধ্যাপক হুয়েন্ড নাথের ছাত্রবহুল তখন একাধিপত্য ছিল। তাঁহার সম্পাদিত “বেঙ্গলী” ও মতিলাল বোধের “অনুত বাঙ্গার পত্রিকা” ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের “আনন্দমঠ” ও কবি হেমচন্দ্রের জাতীয় কবিতা বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত করে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম। প্রথম অধিবেশনে বম্বেতে সভাপতি হইলেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হুয়েন্ডনাথ, আনন্দমোহন বসু-বৎসরাবধি কংগ্রেসসেবা ছিলেন। উভয়েই কংগ্রেসের সত্যনৈত্ব করিয়াছেন। জন্ম হইতে ১৯১৯ সন পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত অভিজাত মস্ত্রদায়ের নেতৃত্বে। কংগ্রেস দেশের ব্যবস্থার হ্রস্ব দৈর্ঘ্য আবেদনপত্রে ভারতসরকারকে জানাইত। কংগ্রেসের তখন ছিল ভিক্ষাবৃত্তি (mendicant policy)।

বিংশতাব্দীর প্রারম্ভে ঘটনাক্রমে বাংলা দেশে জাতীয়তার আন্দোলন অন্তর্যামিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ করিলেন। সমবেত কণ্ঠে বাঙালী তাঁহার প্রতিবাদ করিল। বাংলার প্রতি জনপদে প্রতিবাদ সজ্জা হয়। বাঙ্গালীর আবেদন, প্রতিবাদ ইংরাজ সরকার অগ্রাহ্য করে। এই অপমান ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর অসহিষ্ণু হইল। হুয়েন্ডনাথের গুজবিনী বক্তৃতা, বিপিনচন্দ্রের বাগ্মীতা, রবীন্দ্রনাথ-বিজ্ঞানজ্ঞানের সজ্জা, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও মৌলভী লিলাকৎ হোসেনের প্রচার, বরিশালের অধিনীকুমারের কল্পনিষ্ঠা ও অরবিন্দের প্রাণস্পর্শী রচনা বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করে। বাংলার জাতীয় জীবনে উদ্বোধনার সৃষ্টি হয়। সেই যুগে বাংলার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় নিখিল ভারতে। বঙ্গভঙ্গ রহিত করা ই বাঙ্গালীর সঙ্কল্প হইল। এই সঙ্কল্প হইতেই বঙ্গদেী আন্দোলনের উদ্ভব। বঙ্গ ব্যাবচ্ছেদ্য রহিত না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালী বিলাতী পন্থা “বরকট” করে এবং বঙ্গদেী গ্রহণ করিবে। বাঙ্গালীর যথেষ্ট মৃত্যুকাটা তাঁতের ব্যবস্থা হইল। বাঙ্গালী মাঝেমাঝের মিহিবস্ত্র ছাড়িয়া বঙ্গদেী মোটা ধুতী শাড়ী পরিধান করিল। বঙ্গদেশজাত বাণিজ্যের প্রতি বাঙ্গালীর আসক্তি হইল। ইহার ফলে বাঙ্গালীকে বঙ্গদেী বস্ত্র স্রবণার্থে করিবার জন্য বঙ্গদেী কটন মিল স্থাপিত হয়। বিলাতী বরকট আন্দোলন তীব্র বেগে চলিতে লাগিল বিশেষতঃ বরিশালে। অধিনীকুমারের অঘমা উৎসাহে, ব্যক্তিগত প্রভাবে বরিশালে ইংরাজ শাসন অঙ্গল হইল। অধিনীকুমারের অনুযতি ভিন্ন বঙ্গ বাজিষ্ট্রেট সাহেবও এক টুকরা বিলাতী কাপড় বাজারে কিনিতে

পারেন নাই। কলিকাতাতে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের একলক্ষ টাকা দানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অরবিন্দ বরোদাকলেজের সহকারী অধ্যাপকতা ত্যাগ করিয়া বিনাবৈতনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীর মাতৃভাষার উৎকর্ষের জন্য কান্দীশবাবাজীর মহারাজা মণীন্দ্রনাথের বদান্ততার ফলে কলিকাতাতে বঙ্গীরাহিত্যগরিবদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্থিলনী আহত হয়। গভর্ণমেন্ট অধিবেশনের প্রাকালে বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' বে-আইনী ঘোষণা করেন। কিন্তু সরকারের হুকুম অমান্য করিয়া সহস্রকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বরিশালের আকাশ বাতাস সুখরিত করে। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে খেজাশেবকগণের শোণিতধারা বরিশালের রাস্তা ঘাট রঞ্জিত করে, হুসেস্ত্রনাথ প্রেস্তার হন। অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। বিপ্লব বাঙ্গালীর প্রাণে আন্তর্য জ্বলিল।

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে দাদাভাই নোবাজীর পৌরহিত্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেস সংগঠিত শিল্পপ্রদর্শনীতে বিলাতীগণের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়াতে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে মতবৈধ হয়। বিপিনচন্দ্র, মতিলাল, অখিনীকুমার, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দ উক্ত বিজ্ঞাপনের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরিষেবে শিল্পপ্রদর্শনী বন্ধ করিলেন। নেতৃবৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হইলেন, প্রদর্শনী বন্ধকটওয়ালারা চরমপন্থী (Extremists) এবং হুসেস্ত্রনাথ প্রভৃতি নরমপন্থী (Moderates)। ১৯০৭ সনে সুরাটে কংগ্রেস। নরমপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি প্রস্তাব করেন কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীগণ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করেন। নরমপন্থীগণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিতে সুরাটে যজ্ঞতন্ত্র বা দক্ষযজ্ঞ হয়। কংগ্রেসসম্মেলন গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। তদবধি চরমপন্থীগণ কিছুকাল কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। পুনর্মিলন হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে অধিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে।

বাংলাতে ইতিমধ্যে এক চাক্ষুশ্যকর ঘটনা ঘটে। কলিকতার উপকণ্ঠে মণিকতলাতে বোমা প্রস্তুত ও গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বড়দস্তার জন্য অরবিন্দ, তাঁহার অনুজ বারীন্দ্র প্রভৃতি করেকজন প্রেস্তার হইয়া আলিপুর আদালতে অভিযুক্ত হন। আসামীগণের কৌশলী ছিলেন চিত্তরঞ্জন। বহুদিন মানলার গুনানির পর অরবিন্দ থালাস পাইলেন বটে কিন্তু বারীন্দ্র প্রভৃতির দীপান্তর হয়। কারাক্ষের অন্তরালে অরবিন্দ সাধনাতে সমাহিত থাকিতেন। মুক্তিসাধনের কিছু পর তিনি রাজনীতি বর্জন করিয়া যোগসাধনার জন্য পণ্ডিত্যের যাত্রা করেন। অ.৩৩ সেখানে অববিন্দ ধ্যানস্থ, যোগাধিষ্ট। একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক বাধীনতা লাভের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। রুশিয়ার নিহিলিষ্টদের মত দেশে গুপ্তগতি স্থাপন করে। হিংস্র নীতিতে স্বরাজ লাভ সমিতির উদ্দেশ্য। এই সব বিপ্লবী যুবকদের বোমা, রিকলবায়ে অনেক ঘদেদী ও বিদেশী রাজকর্মচারী আহত ও নিহত হন। বড়ব্রহ্মচারী-গণ অচিরেই অবরুদ্ধ হন এবং কঠোর দণ্ড ভোগ করেন। এই যুবকদের পালা শেষ হইলে ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ১৯০৮ সনের তিন আইন-মুসারে হঠাৎ গভর্ণমেন্ট বাংলার নেতা অখিনীকুমার, ব্রহ্মকুমার প্রভৃতি বরজবন্ধে বিভিন্নভাবে নির্বাসিত করে। ১৯১০ সনে ভারতসম্মেলন পক্ষ

জর্জের আগমনোপলক্ষে নির্বাসিতগণ মুক্তিলাভ করেন, বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয়।

বিপ্লব মহাব্যুৎসবের সময় লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে দেশের শাস্তিরক্ষার Rowlat Act দমননীতি মূলক বিধান প্রবর্তন করিতে সমর্থ ভারতে অসন্তোষের বহিঃ অলিঙ্গা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পাঞ্জাবে অবস্থা গুরুতর হইল। সামরিক আইন পাশ ও আলিগড়রাবারের নৃশংস অত্যাচার। Rowlat Act-এর ফলে বাংলার অগণিত যুবক পুনরায় অন্তরীণে আবদ্ধ হয়। ১৯১০ সনে শাসনপদ্ধতিতে "মস্ট্রেণ্ড-চেমসফোর্ড সংস্কার" প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই সংস্কার প্রত্যাখ্যান করে। তারপর মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২১ সনে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাত্মার নির্দেশমত শত শত বাঙ্গালী নরনারী আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করে। বাংলার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রধান "অসহযোগী" হইলেন। অতুল ঐশ্বর্য, হোগাবিশ্বাস, আইন বাবদ ত্যাগ করিয়া দেশসেবাতে আত্মনির্গোপ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের অতুলনীয় ভাগে বাঙ্গালীর প্রাণ স্পন্দিত হইল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে তাঁহার গঠিত স্বরাজ্যদল বারংবার গভর্ণমেন্টকে পরাজিত করে। অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সংযম, কুক্ষসাধন জীবন সফ্যায় চিত্তরঞ্জনের সহিবে কি? আন্তে আন্তে শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল। ১৯২৪ সনে দার্কিংলিং-এতে চিত্তরঞ্জন মহাপ্রাণ করেন।

চিত্তরঞ্জনের পর মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত দেশপ্রিয় বটলমোহন বাংলার রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। তিনিও চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। আবার বাংলার নূতন বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। অসহযোগ আন্দোলনে অনেক যুবক যুবতী বিবাস হারাইল। গুপ্ত বড়দস্ত চলিল। বিপ্লবীদের জ্বলিতে অনেক ইংরাজ রাজকর্মচারীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। সরকারের কড়া শাসন চলিল। বিপ্লবী-গণকে দমন করা হইল। বটলমোহন আইন অমান্য করার অপরাধে বহুবার দণ্ডিত হন এবং রীতিতে অন্তরীণ অবস্থাতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর সুভাষচন্দ্র হইলেন বাংলার নায়ক। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘই তাঁহার মতবৈধ হইল। কর্তৃপক্ষের নীতি তিনি নির্বিকারে গ্রহণ করেন নাই, বিবেক বুদ্ধি হইল অন্তরায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করেন। বাঙ্গালীর আপনার জন সুভাষচন্দ্র। তাঁহার প্রতি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আচরণে বাঙ্গালী বিপ্লব হইল এবং অনেকটা কংগ্রেস-প্রীতি কমিল। বলিতে কি বাঙ্গালাদেশে অধুনা সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের পর কংগ্রেস হীনপ্রভ হইয়াছে। এদিকে বাংলা হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক বাঙ্গালী কংগ্রেস ছাড়িয়া হিন্দু মহাসভাতে যোগদান করেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান হয় নাই। অনেক কংগ্রেস কন্থা বর্তমানে ভারতরক্ষা আইনে কাগজকড়। সরকারের দমন নীতিতে বাংলার রাজনৈতিক জীবন অচল নিষ্পন্দ। কিন্তু বাঙ্গালীর মনে প্রাণে যে দেশাশ্রয়বোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা নিঃসূল করা অসাধ্য। বাংলার জীবনধারা অজ্ঞানসলিলা কল্লুর মত প্রবাহিত। বাঙ্গালী তাঁহার অতীত গৌরব কিরাইলা আনিতে চেষ্টে। বাঙ্গালীর আশা, সাধনা পূর্ণ হইবে। বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে।

বন্ধু (পর্ব)

ঐন্দ্রেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—“আচ্ছা, রোজ দুপুরে বসন্তদা” এদিক পানে একলাটি কোথায় যাব জানিস ?”

—“না, আমিও তাই ভাবি।”

“চল না একদিন পিছু পিছু দেখি কোথায় যাব,—বাঁবি ?”

একমিনিট চুপ করে থেকে মিস্টু সন্মতি দেয়, “বাবো।”

তাই হ’ল একদিন। প্রায়ের শেষে ছোট নদী ইচ্ছামতী। ওপার জুড়ে কচি ধানের ক্ষেত। আকাশের সোমাতরা নীল সবুজের রেখা। তারই বিজ্ঞান কূলে গিয়ে দাঁড়াল বসন্তদা। খালি গা, খালি পা; ধীরে ধীরে নদীর পায়ে নরম ঘাসের উপর সে বসল। নদীর মাঝখানে দিয়ে একটা মোটর লঞ্চ ছুটেছে, তারই ডেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ে এপারে। নিশ্চয়ই দুপুর। দুপুরে কাছ কেউ কোথাও নেই। পাথরের মত নিখর হ’য়ে বসন্তদা বসে আছে। অনুরে ছোট একটা জংলা গাছের ঝোপ। আর তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর কদমের চারা, তপ্ত হাওয়ার ঝুলছে।

“এ যে অশ্বান ?” মিস্টু আঁৎকে উঠল।

অরুণ মিস্টুর বামহাতে চট্ট করে ছোট একটুখানি চিম্টি কেটে বললে, “চুপ।”

বসন্তদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ঐ বনভাস্টার দিকে। সেখান থেকে খানিকটা দূরে ইষ্টিমারের বাতীরের ওঠানামার সুর পথ। তারই একশ্রান্তে ট্রেন-ঘরের চালার এককোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরুণ আর মিস্টুর গোটা পা বেরনা হ’য়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে অবসরভাবে বসন্তদা উঠে দাঁড়াল। কাপড়ের আঁচল থেকে কী যেন সে ঘের করে ধীরে ধীরে সেই ঝোপের ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে চলল সেই ছোট কদমগাছটার তলায়। আর তাকে দেখা গেল না। একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে আবার পথ ধরল বসন্তদা। সেই জাঁগ চালা-ঘরটার ভাঙা বেড়ার কোল ঘেঁষেই রাত্তা। একেবারে ঘরের কাছটার এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বসন্তদা। মিনিটখানিক সেখানে দাঁড়িয়ে আবার সে কিরে চাইল নদীর পানে।

ঘরের ভিতর মিস্টু নড়তে-চড়তেই খুঁট করে কী একটু শব্দ হল। অরুণ দ্রুততে জোর করে মিস্টুর মুখ চেপে ধরলো। সর্বনাশ ! একটিবার বসন্তদা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে ? তার বুকের ভেতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে নাক-মুখ চেপে ধরতেই মিস্টুর এলো একটা প্রবল হাঁচি। সঙ্গে সঙ্গে অরুণের গা দিয়ে দর দর করে ঘাম বেরোতে লাগল ভরে।

“কে ?”—বাইরে থেকে বসন্তদা হাঁকলো, “কে ঘরের মধ্যে ?”

—“আমরাই।”

মুখ কাচুমাচু করতে করতে মিস্টুকে সামনে রেখে সতরে অরুণ এসে বসন্তদার সামনে দাঁড়াল। বসন্তদার চোখে জল। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে সে কঁদেছে। চট্ট করে দ্রুততে চোখ মুছে মুছে ফেলল বসন্তদা। অবসন্ন হয়ে প্রশ্ন করলো, “তোরা ! তোরা এখানে কী করছিলি রে ?”

কণ্ঠধরে অনেকখানি সাহস কিরে এল অরুণের মনে। বললে, “রোজ রোজ আমাদের লুকিয়ে এই দুপুরে তুমি এখানে কেন আস বসন্তদা ?”

বসন্তদা এবার কঁদে ফেলল—শিশু যেমন করে আঁসুল হয়ে কঁদে, তেমনি করে। মিস্টু ত অথাক। বসন্তদার চোখে জল।—আশ্চর্য।

বসন্তদা আরও সামনে এসে দাঁড়াল। ডান হাতখানি মিস্টুর আর বাম হাতখানি অরুণের কঁধের উপর এক সঙ্গে রেখে ওদের দুজনকেই একেবারে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললে, “বোস।”

সবাই বসে পড়লো সেই রাত্তার ধারে। ট্যাক থেকে বের করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলো বসন্তদা। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে তাই টানলো।

তারপর ধবা গুলার কলসো, “তোদের মনে আছে, চকোভদের পাঠশালায় পড়ত একটি ডেল ? ছোট ফুটবুটে, মাথাতরা কঁকড়া কালো চুল ? দুই দুই চোখ আর মিষ্টি চেহারা ?”

—“কোরকের কথা বলতো ? বা-রে, মনে নেই ! এই শু মদিন এই জাহাজ-ঘাটারই সে এসে নামলো আমাদের সাথে ; আমরা কিরতিলাম মাসোবাড়ী থেকে আর ওরা সব আসছিল কোলকাতা হ’তে দেশে। লকের ভেতর “কুকীজ” কিনে খেলায় আমরা সবাই।”—এক নিঃশ্বাসে মিস্টু বলে ফেলল।

প্রায় সাথে সাথেই অরুণ বললে, “আপনাকে সে খুব ভালবাসে, না বসন্তদা ?”

সজল চোখে বসন্তদা জিজ্ঞাসা করলো, “সে কোথায় জানিস ?”

অরুণ বললে, “না তো !”

মিস্টু বললে, “তার তো অহুখা।”

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বসন্তদা বললে, “হাঁ, কিন্তু অহুখ তার ভাল হয়ে গেছে।”

—“সত্যি ?” শব্দের নিঃশ্বাস ফেলে মিস্টু প্রশ্ন করল।

অরুণেট বসন্তদা বললে, “সত্যি, আর কোনও দিন তার অহুখ করবে না, সে আর বেঁচে নেই।”

ইলেকট্রিক তারের স্পর্শের মত অরুণ আর মিস্টু দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। বিবল হয়ে তারা তাকিয়ে রইল বসন্তদার পানে।

উদাসদৃষ্টি আকাশের পানে মেলে বসন্তদা আবার বললে, “আজ একমাস।”

অথাক হয়ে ওরা বসে রইলো। কোন প্রশ্ন পরীক্ষা করতে পারলো না। বসন্তদা আঁসুল দিয়ে সেই শীর্ণ কদমগাছটার পাশে দেখালো। বলল, “দেখবি ?”

কী যে বলবে ওরা কিছুই স্থির করতে পারছিল না। স্রুণ্ড ততে বসন্তদা উঠে দাঁড়াল। বললো, “চল।”

কাছে গিয়ে সবাই দেখতে পেল নদীতটের এক অংশে একটা অনতি-পুরাতন স্থাপন। দক্ষগাছের পোতাক্যেরক আখোড়া শাখা, একরাশ কালো অঙ্গার, একটা ভাঙা মাটির কলসীর ছড়ানো টুকরো আর কতকগুলি অর্ধদ্রব বালির খণ্ড চারদিকে ছড়ানো। জলের একেবারে কিনারায় একপ্রহর ভিন্ন মাহুর আর পরিত্যক্ত বালিশ-বিছানা তখনো রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কুঁচুত হ’য়ে আছে। সেই দক্ষ অঙ্গারমাটির উপর কে ছড়িয়ে রেখেছে একমুঠো সজকোটা সাপা বেলকুল। হাত তুলে বসন্তদা বললে, “দেখেছিস ?”

চোখ তুলে চাইল ওরা দুজনেই। কদম গাছটার সামনের অংশের কতকগুলো পাতা পুড়ে খাঁক হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে অরুণ আর মিস্টু সেই দিকে চেয়ে ছিলো, হঠাৎ হাত ধরে টান দিয়ে বসন্তদা বললে, “চলে আর।”

অরুণ আর মিস্টুর মুখে কথা নেই। বিসর্ঘ দৃষ্টিতে ওরা দুজনেই বসন্তদার মুখের দিকে চাইল। ধীরে ধীরে একেবারে তার পারের কাছটিকে গিয়ে দাঁড়ালো। রান হেসে বসন্তদা বললে, “কী ?—ভয় করছে ?”

মিস্টু কোন কথা বললে না। অরুণ বললে, “এখানে এসে একলা একলা নিরালার বসে কী হুখ তুমি পাও বসন্তদা ?”

“হুখ ?” বসন্তদা একটু হাসলো। বলিল হাসি। বললে, “আমাকে যে আসতেই হয় এখানে।”

“কেন ?”—একসঙ্গে দু’জনারই প্রশ্ন করে।

“ওর সঙ্গে যে আমি কথা কই এখানে এসে। একদিন আমি কথা না

কইলে ওর চলে না। আজ না এলে কাল অমুখ্যোগ দেয়, কত অভিমান করে, কাদে—

—বলে কি বসন্তদা! “তবে না বললে কোরক বেঁচে নেই।”

“নেই-ই ত।”

—“তবে কেনম করে সে তোমার সঙ্গে কথা কর বসন্তদা?”

“যেমন করে তোরা আমার সঙ্গে বলিস।”

“খেৎ অরুণ প্রতিবাদ করে। “মরা মাহুব বুঝি কথা কইতে পারে?”

“কথা কি আমরা যুগ দিয়ে কই রে পাগল?” বসন্তদা জবাব দেয়,

“কথা কই আমরা মন দিয়ে, শুনিও মন দিয়ে; মন আছে বলই না কথা।”

অরুণ বা মিটু দুজন্য একজনও বসন্তদা'র কথা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। কী কথা যে বলে বসন্তদা! সাথে কি আর পাগল বলে স'ই।

“কী কথা ও বলে বসন্তদা?” আবার ওরা প্রশ্ন করে।

“সে অনেক কথা।” বসন্তদা জবাব দেয়। “পাঠশালা'র কথা, ওর মায়ের কথা, ভাই-বান্ধবের কথা, আমার কথা, ভোদের কথা, সবাইর কথা। আমার পেলে ভারী খুশী সে। আমি এসে ডাকলেই সে সুনতে পায়। একেবারে আমার কাজখানটিতে এসে গুটিহুটি হয়ে বসে।”

মিটু বসন্তদা'র অতি কাছে এসে বলে, “আমরা ডাকলে সে সুনতে পাবে বসন্তদা?”

—“নিশ্চয়।”

—“ডাকবে?”

—“ডাকো।”

—কই, সুনতে পেল কই?”

“পেরেছে, ঐ ত ভোদের ডাকে সে সাড়া দিচ্ছে, বলছে, আর অরুণ, আর মিটু,—

“কই আমরা ত সুনতে পাচ্ছি না”।

“মন দিয়ে-ইলে কি সে কথা শোনা যায় রে?” উদাস দৃষ্টিতে বসন্তদা জবাব দেয়।

“তুমি যে ফুলগুলি ছড়িয়েছ বসন্তদা, তা'দের গন্ধ পাচ্ছে কোরক?”

“নিশ্চয়ই। ওই ত চার ঐ ফুল। রোজ এই গন্ধ পেতে সে ভালবাসে।”

“তোমার যেমন কথা। মন দিয়ে বুঝি কথা কওয়া যায়, গন্ধ পাওয়া যায়?” অরুণ জিজ্ঞাসু চোখে বলে।

“যায় না?”—বসন্তদা অকস্মৎ যেন অতি সজ্জিত হয়ে ওঠে।

“নিশ্চর যায়। শোন তবো”—

সেইখানে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে সবাই বসলো। বসন্তদা বলে চললো,—

“আমি তখন চোটি। পাঠশালায় আমার সব চেয়ে আপনার ছিল একটা ছোট বেলে। যেমন হোগা, তেমনি দুর্বল। সমপাত্রীরা আর সবাই তাকে বিদ্রোপ করে বলত ‘জাংলা’। পাঠশালা'র ভেলেরা বারা বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসত, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে তারা খেত। ওর বাপ মা ছিল গরীব, ওর পক্ষে রোজ রোজ খাবার নিয়ে আসা তাই সম্ভব হোত না। উপহাসের কটনি খোঁচায় আহত হ'তে হ'তে সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরত। আমার ত জানিসই, কিছুই নেই কোন কালে কেবল খিদেটা চাড়া; ওর সুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমি বুঝতে পারতাম ওর খিদে পেরেছে। পাঠশালা পানিয়ে ওকে নিয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী বাগানে বাগানে কিরতাম। খেজুর রসের হাঁড়ি, কলার কাঁদি, পেয়ারার কাঁড়ি পেড়ে এসে ওকে খাওয়াতাম।

এখনি করেই কিছুদিন কাটলো। এক মিনিট ওকে না দেখে আমি থাকতে পারতাম না, সেও পারত না আমাকে না হলে। রাত নেই, দিন নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, আমি আর সে দুজন্য কোথায় না গিরেছি—

কী না করেছি, কত কথাই না বলেছি?”—বসন্তদা একটা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসন্তদা আবার বললো :

“সেদিন শনিবার। পাঠশালায় আসিনি সে। সারা আকাশ মেঘে ঘুমিয়ে হ'য়ে আছে। ভীষণ হাওয়া বইছে; মনে হচ্ছে একুণি স্তম্ভনক ঝড় উঠবে। হস্ত দত্ত হ'য়ে এমনি দুপুরে হঠাৎ বন্ধ এসে হাজির। ব্যাপার কি?—সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে সে বললে, আজ তার জন্মদিন। তার মা কোন মতে যোগাড় করে দুখানি সন্দেশ তাকে খেতে দিতেছিলো। তারই একখানা সে কলার পাতার মুড়ে এতদূর ব'য়ে এনেছে আমাকে খাওয়াতে। সন্তর্পণে তাই খুলে সে আমার হাতে দিল। আমি বহুক্ষণ থেলাম, সে অপলক হাসি-হাসি মুখখানি করে আমার সুখের পানে চেয়ে রইল। চোখের এমন খুসী আর আমি কখনও দেখি নি।

তারপর গলাগলি দুজন্য বেরিয়ে পড়লাম। হাওয়া তখন দস্তুরমত মেতে উঠেছে। ঝড় এল বলে। তবু তারই মধ্যে সারা দুপুরটা দুজন্য এক সাথে কত জারগারই না ঘুরে বেড়লাম। সন্ধ্যার একটু আগে এল প্রশ্নল তুফান। বাতাসে আর বৃষ্টিতে হুটি যেন একাকার হ'য়ে গেল। দৌড়াতে দৌড়াতে বন্ধকে বললাম, “আজ আর এতটা পথ ঠেঙিয়ে বাড়ী যাওয়া তো'র হবে না ভাই”—

বন্ধু জবাব দিলো, “নিশ্চয়ই হবে, আজকের দিনে মাকে ভেড়ে আমার থাকতে নেই। যেতেই হবে আমাকে।”

“একটু পরেই ঝড় অনেকটা কমে এল। বন্ধু বিদায় নিল, বলল, “আসি ভাই, কাল আবার আসব।” মনে নিষেধ থাকলেও মুখে তা বলতে পারলাম না। জন্মদিনে ওকে ওর মায়ের বুক থেকে আলাদা করে রাখি কি ব'রে!

এগিরে দিয়ে গেলাম চাটুয়াবাড়ীর শেষ সীমানার লম্বা শিমুল গাছটার তলা পর্যন্ত। সেখানটার এসে বন্ধু বলল—এবার সে একলাই যেতে পারবে। তখন রাত হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; তাইই মধ্যে দুই বন্ধু অজ্ঞাকারের ভেতর দিয়ে দুই বিপরীত পথে চলে যাওয়া হ'য়ে গেলাম।

অনেক রাত অবধি ঘুম আসছিল না। বিছানার ওয়ে চোখ বুঁজে জেগে ছিলাম। ভাবছিলাম বন্ধুর কথা। একলাটি সে বাড়ী পৌঁছাতে পেরেছে তো?

অনেক রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম দেখছিলাম কুটকুটে জোলাস্রার আকাশ সাধা হয়ে গেছে। সেই বুড়ো শিমুলগাছটা দিয়ে আম চলেছি। পেছন থেকে কে এসে আমার হাতখানি চেপে ধরল। ফিরে চেয়ে দেখি, বন্ধু। ব্যাকুল চোখে সে আমার বলে, “চলে যাচ্ছি কি না, তাই দেখা করতে এলাম।”

“চলে যাচ্ছিস! কোথায়?”

“যেতেই হবে, তাই বিদায় নিতে এসেছি ভাই”—

শব্দ দেখতে পাচ্ছি তাকে। সেই কুণ্ডিত কালো চুল, জুইমী তরা হাসি। সন্নহে তার গায়ের চাঁত বুলতে বুলতে জিজ্ঞাসা করলাম, “কোথায় যাবি ভাই?”

• “অনেক দূর। কৌতুক'র হাটে সে জবাব দিলো।

“তবু বল না শুনি।” কী যেন অনেকখানি সে বললো, ঠিক মনে নেই। শেষে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে কী তার কামা। জলতরা হুট বড় বড় চোখ মেলে সে বললো, “সব রেখে গেলাম এইখানেই, যেখানে বা ছিল, কেবল এটি জিনিষ কোথায় লুকিয়ে রেখে যাব বুঝতে পাচ্ছি না।

“কি জিনিষ তাই?”

একটু থেমে তেমনি সহর পল্লার বন্ধু বললো, “এই যে এইটুকু!”

কি যেন অতি সম্বর্ণণে সে আমার হাতে মিল। তেমনি সবসময়ে অভিজ্ঞতের মত হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করতে করতে আমি বললাম, “কি দিলি ভাই?”

মধুর হাসিতে মুখখানাকে আলো করে বন্ধু বললে, “আমার মন। এইটুকুকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে পালাবার আবার উপায় নেই। একলাই আমি বাব।” নিত্যকার মত হাত ছুটি বাড়িয়ে আমার গলার জড়িয়ে সে বললে, “খুব যত্ন করে তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিও কিন্তু, একভিলও যেন হারান না। বল, হারাবে না, ভুলে যাবে না আমাকে?”

মুন্দের মত বললাম, “কখনো না—”

“আর যদি না ফিরে আসি কোনদিন, তবুও না!”

“না।”

“তোমার মৃত্যুর মধ্যে আমাকে বেঁধে রেখে আমি চললাম, মনে রেখো।” দুচোখ জলে ভরে আসে; কাঁঠর গলার বললাম, “না গেলেই কি নয়?”

“না, এ পাঠশালায় আর আমি পড়ব না। বই খাতা, কালি, বলম সবই ত রইলো, আমি চললাম”—

নিমেষে সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। শুভ্র চাঁদের উপর একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া পড়ল সেই মুহূর্তে। কিছুকালের জন্য সবই অন্ধকার হয়ে গেল। চাঁৎকার করে ডাকলাম, “বন্ধু! বন্ধু!”

ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড় করে বিজানার উপর উঠে বসলাম। আলোটা ছেলে ভাগ করে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। বুঝলাম অনেক রাত অবধি জেগে মাথাটা ঘেঁটেই গরম হয়ে উঠেছে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘুমোতে ব্যক্তি, হঠাৎ দরজার কে ধাক্কা মারলো। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। দোর খুলতেই দেখি বন্ধুর মা আলো হাতে দাঁড়িয়ে। ভরে উত্তেজনার ঠক ঠক করে কাঁপছে।

“এত রাতে হঠাৎ আপনি?” অতি কষ্টে প্রশ্ন করলাম। খপ করে সে আমার ধরে ফেললো। বললে, “বাবা, বড় বিপদ। শীগগির একবার এসো।”

উদ্ভ্রাণে ছুটে ছুটে ভাঁদের বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল হয়ে গেছে। দৌড়ে ঘরে ঢুকেই দেখি, তার অনেকক্ষণ আগাই বৃত্ত। এসে বন্ধুকে তার জন্মদিনের শেখ অলীকসিঁদ দিয়ে জন্মের মতন ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে। নিশ্চল পাখাদের মত সেই প্রাণহীন আধেবোজা চোখ দুটির পানে নিশ্চর হয়ে চেয়ে রইলাম। গুর মা আহুড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। সে কারা শুনেতে না পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অত্যাগীরা মা ভ্রূসৃষ্টি হয়ে কাঁদছে আর বলছে, “এই ত একটু আগে তুই ছিলি রে বাবা, এই মধ্যে কোথায় গেলি রে তুই, আজ যে তোর জন্মদিন—আজকের দিনে যে মার কোল ছাড়া হ’তে নেই রে, হ’তে নেই”—

একটা ঢোক গিলে বসন্ত দা টাঁক হাতড়িয়ে আর একটা বিড়ি বের করলো।

“কি হ’লে তোমার বন্ধু মরল বসন্ত দা?” অভিজ্ঞতের মত প্রশ্ন করলো মিষ্ট আর অল্প।

“সে কথা আমি কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনেছি, রাত ন’টার তার স্বর হয়। বারোটায় আঙনের মত দাঁট দাঁট করে সেই অনীকসিঁদ খসখস শরীরে অলে ওঠে। রাত তিনটার মাঝর রক্ত উঠে, সে অজ্ঞান হ’লে পড়ে। এর আগে পর্যন্ত গুর মা বিশেষ কিছু বুঝতে পারেনি। সারারাত জেগে মাথার জলপটি আর হাওরা দিয়েছে সে। অচৈতন্য হ’লে আমার খবর দিতে আসে।”

মিষ্ট জিজ্ঞাসা করল, “তারপর?”

“তার কয়েক দিন পর একদিন সক্যার একটু আগে পুকের ঘাটে চুপ করে বসে কত কি ভাবছি। একটু আগে এক পলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিলে লতাশাঠার কেনন একটা গন্ধ চারদিকে। বিবর মনে বন্ধুর কথাই

বারে বারে মনে আসছিলো সেদিন, হঠাৎ মনে হলো কে যেন অতি নিকট হ’তে আমার নাম ধরে ডাকলো। চমকে উঠলাম। চারদিকে চেয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। আমার সেই ডাক।

“কে?” প্রশ্ন করলাম।

“আমি, চিনতে পারছো না?”

“কে তুমি?”

“বন্ধু—”

“বন্ধু! কোথায় তুমি?”

“এই ত!”

মনে হল—মনের মধ্যে তার সজীব বৃষ্টি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নিশ্চিৎ করে বসতেই সে বললে, “চকল হ’চো না বন্ধু! খসো, শোন! বুকের উপর হাতখানা রাখ ত! বুঝতে পারছ আমাকে? এই যে আমি এসেছি—”

“কোথায় তুমি?” প্রশ্ন করলাম।

“এই ত তোমার মনে—”

“কি চাও তুমি?”

“কিছু না, তোমার সঙ্গে ছুটো কথা আছে।”

—“বলো।”

—“কেমন আছ তুমি?”

“ভাল না।”—

“বুকের মধ্যে যেন কার অতি করণ উচ্চ নিঃশব্দ হঠাৎ করে ওঠে।”

“আমার মাকে দেখেছ?”

“তোজই ত দেখতে পাই থাকে—”

“খুব কাঁদে আমার জন্য, না?”

স্পষ্ট শুনলাম—বুচাপা আর্জিনাদে আমার বুকের মধ্যে উদ্ভাসিত হ’লে কে কাঁদছে।

—“তুমি কাঁদছ?”

—“হ্যাঁ,।”

—“কেন?”

—“যে কারণে তুমি আমার জন্য কাঁদ, আমার মা আমার জন্য চোখের জল ফেলে।”

—“আমাদের ছেড়ে তোমার কষ্ট হয়?”

—“হয় না?”

—“তবে ছাড়লে কেন?”

কোন উত্তর পেলাম না এবার।

—“আসতে ইচ্ছা হয় আমাদের মধ্যে?”

—“হয় না?”

—“তবে এসো না কেন?”

এবারও নিরুত্তর। বানিকক্ষণ সমস্তই নীরব। যেন নিঃশব্দ পর্যন্ত পড়ে না।

—“বলিনি? আমার মনটুকু রেখে গেলাম তোমার মনে। মুখের কথা শেষ হয়ে যাবে জানতাম, তাই মনের মধ্যে সব কথা আজীবন জাহরে রেখে গিয়েছি,—ভাল করি নি?”

—“নিশ্চয়ই, মনের মধ্যে ডাকলেই তোমার পাব কি বন্ধু?”

—“পাবে। যখন ডাকবে তজুগি। জানি আমি হারিয়ে যাব, তাইতো মনকে নিঃসই তিল আমার সব চেয়ে বেশী ভর, সেটুকু কার কাছে রেখে যাই; তোমার হাতে দিয়ে তবেই না আমি নিশ্চিন্ত হ’তে পেরেছি। ওটুকু তুমি চিরকাল তোমার মধ্যে আগলে রেখো। রাখবে তো?”

—“রাখবো।”

দিনে রাতে এমনি ক'রে রোজ সে আমার মনের মধ্যে আসতো। আমার সাথে কথা কইত! অভিজ্ঞতের মত ঘটীর পর ঘটী বসে আমি তাই শুভতাম। আমার কথা তাকে বলতাম। বৈচে থাকতে তার যে সজ্ঞ আমার সব চেয়ে বেশী ভাল লাগতো, মরার পরও মন দিয়ে সেই হারানো মমতার রস আমি অন্তরের মধ্যে ভোগ করতাম। আমার নাগরী খাওয়া ছিল না। সময় অসময় ছিল না। সবাই ভাবলো আমাকে ভুতে পেরেছে। ওষার দৌরাছোর ভয়ে দেশছাড়া হ'রে অনেকদিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। পনেরো বৎসর পরে আবার দেশে ফিরে আসি। কারণ ছিল অব্যাহি কিংবাবার—

“—কী কারণ?” মিস্টু বিশ্বাস পুলকে জিজ্ঞাসা করে।

—“মুন্ডেরে গজার ভঁরে একলা ব'সে আতি একদিন। বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে। অনেক ঘুর দিয়ে একখানা পালাতোলা নৌকা গজার উষ্মল স্রোতে ভেসে চলেছে। পশ্চিমা মাঝিদের কী একটা করণ গানের স্বর উদাস হাওয়ার ভেসে আসছে। তন্নর হ'য়ে শুনিছি সেই গান;—হঠাৎ দেখতে পেলাম বন্ধুকে। আবার আমার মনের কোণায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনরূপ ভূমিকা না ক'রেই এবার এসে বসে :

“আর কতদিন এখানে থাকবে?”

“জানি না”

“আমি জানি”

“কী জানো?”

“বেশী দিন নয়”

“কিসে বুঝলে?”

“তোমার যে বিয়ে।”

বিয়ে?—আমার বিয়ে? হোঃ হোঃ করে খুব খানিকটা উচ্চহাসি হেসে উঠলাম। আবার সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস।

“তোমার আত্মীয়েরা উঠে পড়ে লেগেছেন”

“বেশ ত, তোমার ত আনন্দের কথা,

“কখনো না, আমার হিঁসে হয়। তোমার মনে আর কেউ এসে জুড়ে বসবে, আমি থাকব কোথায়?”

“না, বিয়ে আমি করব না”

“তার চেয়ে আমার মন আমি কিরিয়ে নিতে চাই বন্ধু।”

—“কিরিয়ে নেবে?”

—“হাঁ”

—“কেন?”

“তোমার আর তোমার বন্ধনদের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি বিশ্বর মত। তার ত আমাকে বুঝতে পারে না। অথচ আমার জন্ত এই অশেষ কষ্টের তাগী হয়েছ তুমি”

—“বেশ ত, হয়েছি বেশ করেছি, তবু তুমি থাকবে।”

“না, তা হয় না বন্ধু! তোমাৎ মায়ের খবর রাখ কি?”

—“না।”

—“কতদিন?”

“অনেকদিন”

“তোমার জন্ত ভাবনার তিনি শাশালগী। কালই তুমি চলে যাবে এখান থেকে। তোমার না দেখলে তিনি বাঁচবেন না। সত্যি যাবে তুমি, তিন সত্যি হইল, সেই ভোট বেলার তিন সত্যি। এবার আমি চললাম, আর আমার দেখতে পাবে না।

অকস্মাৎ নিমেষমধ্যে সমস্ত বৃকথানা যেন একেবারে খালি হ'য়ে গেল। মুহূর্ত্ত কে যেন সমস্তটুকু হ্রস্বক একটান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

আত্মনাশ ক'রে দুই হাতে বুক চেপে ধরে আমি ডাকলাম, “বন্ধু! বন্ধু!” উত্তর পেলাম না।

পরদিনই বাড়ী ফিরে এলাম। মায়ের অবস্থা দেখে অনেককণ কঁদলাম। আমাকে নিয়ে তিনিও সান্নাঘাত কেনে কেনে কাটালেন। রাজ্যের ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে আমার দীর্ঘজীবনের কামনা জানাতে জানাতে বিবন শ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন তিনি।

ঘরে ঘরে মা ভাল হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু আমার ভাল চিরজন্মের মত কেড়ে নিয়ে গেল সেই বন্ধু। সেই শূণ্য হৃদয় আজও আমার পূর্ণ হল না। তারপর এই অনন্ত শূন্যতার মাঝে হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম : তোমাদের সাথী কোরক'কে। ঠিক সেই চোখ, সেই মুখ, সেই রুই, যী মাখানো হাসি; সেই সকৌতুক সম্ভাতিত আনন্দ। এক নিমেষে মন আমার নেচে উঠল। শুভতে পেলাম সে বলছে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ ত, বুঝি বন্ধু এসেছে।

কোরক'কে দেখতাম চাটুযোদের প্রাচীন সেই শিরুল গাছতলাটার উপর কী ভাব মাঠা, সেই বাগানে বাগানে ফুল চুরি করবার কি অকুরন্ত আনন্দ, আমাকে পেয়ে কি তার অপরিমীম সাধনা। মৃত্যুর সময় এক পলকের জন্তও তার কাছছাড়া হইনি। শেষ মুহূর্ত্তে সে আমার হাত ছ'খানি তার বুকের উপর চেপে ধরে বললে, “বসন্ত দা! মরতে আমার একটুও ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয় আরও দুদিন তোমার কাছে থাকি—বৈচে থাকি আরও কিছুদিন। তা যদি পারতাম। পার বসন্ত দা আমার বাঁচাতে?” অবিকল সেই হারানো বন্ধুর মত তার আকুলতা। মরণের কোলে বসে জীবনের জন্ত সেই অসহায় কান্না!

ডাক্তাররা তখন অস্ত্রিজন দিচ্ছে। একটু পরেই সব শেষ হয়ে গেল। যাবার পূর্বে সেও তার কাল কাল ক'রে চাওরা চোপ ছুটির ভেতর দিয়ে তার মনকে চিরদিনের জন্ত আমার মর্মে মধ্য দান ক'রে গেছে। সেই মনের কথাই ত আজ আমি শুনি! বন্ধু আমার কাছে আরও কিছুকাল থাকতে চেয়েছিলো। সে কথা মিথ্যা হয় নি। সে থাকবে চিরকাল আমার কাছে কাঁচে, আমার অন্তরের মধ্যে।”

বলতে বলতে বসন্তদা'র কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। আর কিছুই সে বলতে পারলো না। ছোট শিশুর মত অবোধ কান্নার তার সমস্ত বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। অপ্রসিক্ত কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, “আর আমি?—আমি কি একটা মানুষ? তাই না পাড়ার লোকে আমার পাগল বলে। বলে, লম্বাছাড়া, বখাটে, আর বজ্জাত। আমার তোরা ভর করিস, সবাই আমার পাশ কাটিয়ে চলে, কিন্তু বন্ধু আমার একতিল ঘুণা করে না। চিরজীবন সে আমার ভালবাসে, জানিস?”

মিস্টু এসে বসন্তদা'র চোখ দু'টো নিজের হাতে বুছিয়ে দিলো। বলল, “মনের মধ্যেই সে যখন রয়েছে, তখন এত দূরে এসে এই ছ'পুয়ের রোদে এই ঋণানের মাঝখানে বসে কথা না কইলে কি তোমার চলে না বসন্ত দা?”

ধরা গলার বসন্ত দা' জবাব দিলো,—“কি জানিস? মনটাকে ত বৈধে রাখতে পেরেছি তার। পারিনি কেবল দেহটাকে। অথচ ওটার উপরেই ছিল সব চেয়ে বেশী মারা; সেই মারার শেষ চিহ্ন এই মাটিতে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাই ত' এগনকার এই পোড়া মাটি আমায় অমন ক'রে টেনে আনে। যা ধরে রাখতে পারিনি তার মমতা যা ধরে রেখেছি তার চাইতেও যে কত বেশী, তাহেয় বসন্তদা'র মত বড় হ'লে তোরাও একদিন তা বুঝতে পারাব।”

বলতে বলতে আঁধারের মত বসন্তদা' উঠে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওরা দু'টিতে ওর পিছু পিছু চলতে লাগল। একটু পরেই আর বসন্তদা'কে দেখা গেল না।

খেয়ালী লোক, কোনদিকে না কোনদিকে হয়ত নির্জীবনে স'রে পড়েছে।

বঙ্গভী : অধিন, ১৩৫৬



কুলে কুলে ঘুরি,
কোথা এ মাধুরী,
কোথা এই ভ্রাম-ছায়া !

বঙ্গ স্ত্রী : আখিল, ১৩৫১



ফসল বুঝি এলো এবার
বসুন্ধরার বুকে !

वाणीकुमार

মাধব। নাঃ! কোনো ফলই হোলো না, রাক্ষসটা আমাকে খর্ব্বোর মধ্যেই আনে না।—বৃষ্টি, শুধু কচি কচি জীব ও পল্লব করে।—
 রোজ—এই রক্ষম হাঁউ হিউ ক'রে গেলে নাকি!... [খাঙ এসে পৌঁছলো]

—ঐ—ঐ—খাবার আসচে—। ওরে বাবা—বা' ভাবচি তা' তো নয়—! ব্যাপারখানা কি। আহা-হা-কী মিষ্টি গন্ধ। কিদে চন্ চন্ ক'রে বেড়ে মাথার চ'ড়ে যাচ্ছে।—ওঃ—সামান্য দায়।—ঐ বলসানো হরিণটার মাংস খেতে না পেলে—হরতো কিদের চোটে গন্ধ শু'কুতে শু'কুতেই দম খেরিয়ে বাবে...

রাক্ষস। বেশ গন্ধ—নয়?—আচ্ছা, তোমাকে এক টুকরো হাড় দোবো এখন।—চুঁসিকাটির মত চুঁসলেই—বাব পাবে বেজার!—দে' দে'—রক্তা—দে'।—ওরে—রক্তা—খাসা—খাসা—

মাধব। খাসা নয়—খাসা!

রক্তা। বেচার! মুখ থেকে লালু ঝরচে।—না—না আমি লুকিয়ে শুকে কিছু চালানু করি—খেয়ে বাঁচুক—নইলে লোভে লোভেই মারা পড়বে। [চুপি চুপি সামান্য খাচ্চা চালিয়ে দিলে]

মাধব। আঃ—রক্তারাগী—তুমি যেমনি রূপসী—তেমনি দয়ালু! রাক্ষসী হ'লে কি হয়। হাড়বাহনরী তোমার কেউ হোতো বোধ হয়। তা 'না' হ'লে এ-তো! আঃ—তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। আর কী মিষ্টি। তোমার জর হোক—ভালো হোক—ভালো হোক! আঃ বাঁচলুম! কি মধুর।

রাক্ষস। কি হে—মেথো। এমন স্বিমিরে পড়লে কেন? মাথা নৌচু ক'রে ব'সে আচ্ছ কেন বলোতো? চুপুটি ক'রে ব'সে শুধু মুখ চোকাতেই জানো। কিছু মজার কথা শোনাও, বাই আর হাসি। (বিকট হাসি)

মাধব। আঃ—!—হাসিবো—না—হাসাবো—যাই করি, দম আটকে যাচ্ছে—

রাক্ষস। কী হয়েছে?

মাধব। কিছু না—কিছু না—

রাক্ষস। কি গিলে কেলেলে হে? চুঁরি ক'রে কিছু খাচ্চো বুঝ?

মাধব। আঃ—না—না—ঐ হৃগন্ধ হাওয়া চিবুতে চিবুতে ঢাক্‌গ্রার তাল পাকিয়ে আটকে গেছে! এক গেলাস জল—জল। দম বন্ধ হয়ে আসচে—! জ—ল।

রক্তা। তুমি এতো কড়া হ'লে কি চলে? বাড়ীতে লোক এসেছে—সে খেই হোক—একে অন্তত একটু সরবৎ খেতে দাও। তোমার ভাগ মারা বাবে না।

রাক্ষস। আচ্ছা—দাও। (রক্তা একপাত্র কলের রস দিলে)

রক্তা। এই নাও—চোখ কাণ বুজে—চোঁ চোঁ ক'রে...

মাধব। আঃ...আঃ...! কী উদার মন! আঃ! কলের রস বুঝি! আঃ—মধু—মধু।

রাক্ষস। হ'বে না? আমার নিজের বাগানে যে সব ফল ফলে... তারই রস।

মাধব। এবারে বুঝছি...যে খার সে সুখী। তোমার মত সুখী কেউ নেই।

রাক্ষস। বলো বলো...আমি সুখী-সুখী। খাও দাও...থাকো সুখে... হাসো গাও। হা-হা-হা-হা-হা!

[দৈত্যপুরীর বন্থমে ভাব-প্রকাশক সঙ্গীত...হঠাৎ রাক্ষসের আনন্দ-উচ্ছ্বাস]

রাক্ষস। আরে-রে-রে-রে-রে-রে!—হুঁঃ!—ভোজনই চ'চ্ছে জীবনের আসল মজা! এই তো ছুপুরবেলার ভোজ...আজকে আমার রাতের ভোজের ব্যবস্থাটা বেজার পোড়ের খুব জম্‌কালো—তেমনি রসালো। (বিকট হাসি)—হা-হা-হা-হা-হা-হা—।

মাধব। আঃ-আঃ—বা' ভাবচি তাই না কি? এবার আমার দিকে নজর হরতো! সাক্ষ্যভোগে আনন্দেরই পেতে পূর্ব। মতলব খারাপ!—যেখো

রাক্ষসন'নাই, তুমি বুঝি জানো না—এই রক্তা হে-টে—হে-টে হে-টে আমি একেবারে মরো মরো—গারে খুলো লেগে লেগে লে-পে—আমার মাংস হে-তো হাকুচ্ হ'রে গেছে। দেখচো না—একেবারে মাসুকের বোণাই আমার চেহারা নয়—

রাক্ষস। কি—একমুখে ছু' কথা? মেরে ফেলবো—হী!

রক্তা। যাকগে যাক—খাওরা-দাওরা করলেই ও ঠিক হ'রে বাবে।

ভাবছো কেন?

মাধব। আঃ—আঃ!—আমাকে কেটে ঐ রাক্ষসী রক্তা রাঁধুনী কালিরা বানাবে নাকি? দেখি—তোমাদের ভোজন তো শেষ হয়েছে—এবার—আমার—

রাক্ষস। তোমার কি হে—বোঁটে মনিষ্যি—আঃ? হটুটু ক'রো কেন? কিদে পেরেছে? এই নাও—এই হাড়টা কড়মড়িয়ে চিথিরে খাও—জিবে রস পাবে।

মাধব। ওরে বাবা—বড্ড যে আদর!

রাক্ষস। খাও-দাও, হাসো গাও, আমোদ করো।

(স্বরে) বত পারো তত খাও,

হেসে নাও...হেসে নাও,

—গাও না হে—তুমি তো ভাড়া। (হাই-এর হৃষিক) আঃ-আঃ-আঃ—যুম পেরেছে! তুমি গাও, আমি ঘুমাই।

মাধব। অগত্যা! কি করি।

গান

বত পারো ততো খাও,

হেসে নাও, হেসে নাও।

সুখ সুখ শুধু সুখ—

নেই দুখ নেই দুখ—

নেচে কুঁদে মেতে বাও।

(রাক্ষসের হলো বাড়িলের ঝগড়ার মত নাক ডাকার শব্দ)

...ঘুমিয়েচে নাকি। বিবাস নেই! গেয়ে যাই! আর খাবার হল ক'রে নাচের ভঙ্গী সাধি।

গান

কাটুন্ কুটুন্—

টুকি-টাকি—কুটু কুটু!

চাখি-চুখি—চুমচুম...

বাহা পাই মুখে লুঠ।

মাংসের চমচম

পেটে পুরি হরদম্—

লাগ্‌ ধুম্‌ লাগ্‌ ধুম্—

বুম্‌-বুম্‌-বুম্‌-বুম্—

বত চাও—তত পাও।

ধূব-ধূব-ধূব খাও।

ঘুম্‌ ঘাও, ঘুম্‌ ঘাও!

(সুখ বুজে)—উউউ-হ'হ'হ'—হহহ-হহহ

[মাধব নাচতে নাচতে লুকিয়ে দেখতে লাগলো...কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্র একটি ছোট তলোয়ার-হাতে হৃকারে ছাড়তে ছাড়তে সেখানে এসে ছুটে চুকলো।]

রাজপুত্র। হারে-রে-রে-রে-রে-রে! এইতো দৈত্যপুরী!

মাধব। (ভয় পেয়ে) ওরে বাবারে—গেছিরে—মাগো-খাখাগো—খাখার খাখাগো—খাখার খাখার খাখার খাখাগো—ওগো—সাগপুত্র মগো—বড্ড খেরেছি গো—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই কি ক'র। আঁ! ঝু! ধর! রাজপুত্র!

সকলে—গান

ও-ও-ও ! গিরিশিখর জল !

কে করেছে পাগল তোর—

কে করে চকল !

কল-কল হেসে,

ঝল-ঝল বেশে,

নীলের কোলো শ্রামল করিস্

অলকা-অকল ।

আর আর নিয়ে আর রত্নীন্ বাসর-ফুল ।

বরণ-মালা গেঁথে মোঝো সাজিরে দোঝো চুল ।

রাজার কুমার কই,

পথ চেয়ে যে রই,

আন্ রে ময়ূরপঙ্খা-নায়ে দৈত্যজরীর দল ॥

অলকারাজ । এ কি রকম ধারা ? তোরা রাজকন্তা, তোদের কি কোনোকালেই জ্ঞান হবে না ? বিয়ে হবে কেমন ক'রে ? রাজপুত্র যে এসেছে ।

প্রথমা । আসে আহুক—আমার কি !

দ্বিতীয়া । ডাক্তে ভান্লেই আসে !

তৃতীয়া । রাজপুত্র এসেচে বাবা ? আমার বিয়ে হবে ? কত ভালো ভালো কাপড় পরবো, কত গয়না—মণ-মুক্তা-সোনা হীরে-সোনার চতুর্দোলায় চড়ে বেড়াবো । পরবো ময়ূরপাখার চূড়া । কেমন হবে !

প্রথমা । আহা সাধ দেখে ম'রে যাই ।

অলকারাজ । চুপ কর—লোক বলে, বড়ো অলকারাজের তিনটি মেয়ে আছরে গোপালী, যেন তাদের বিবি ।

তৃতীয়া । কে বলে এত বড় কথা ? তুমি তাদের মাথা নাওনি কেন ?

দ্বিতীয়া । তা' কেন ? আমার তো শুনেচে মজা লাগে ।

তৃতীয়া । আমরা তিন খোন্ তো এক রঙের সাজে একই রকম সাজি না ।

অলকারাজ । তা সাজিস্ না জানি, পাছে মতের মিল হ'য়ে যায় !

তৃতীয়া । কে আসচে—দেখো দেখো ! কি হুল্লর রাজপুত্র !

প্রথমা । দেখে তো চমক লাগে না !

দ্বিতীয়া । আহা—যেন ধ্যানের দেবতা !

অলকারাজ । রাজপুত্র আসছে । তোরা সাবধানে কথা বলিস্ । আমি যাই অত্যাধনা ক'রে আনি গে ।

সঙ্গীত-দোলা

তৃতীয়া । ও কে...হরিণশিকারী নাকি ?

অলকারাজ । চুপ-চুপ ! রাজপুত্র । বাগত, বাগত- রাজকুমার !

[রাজপুত্রের প্রবেশ]

রাজপুত্র । জরতু অলকারাজ ! হুল্লরী রাজকন্তাদেরও অভিনন্দন দিচ্ছি ।

তৃতীয়া । চোখের সামনে দেখলেই সব ধরা পড়ে । রাজপুত্রটা পাগল ধরণের !

অলকারাজ । চুপ কর দুই মেয়ে ! ..রাজকুমার, আমার তিনটি কন্তাই যেন তিনটি লক্ষ্মী প্রাণমা ! রূপে গুণে তিনজনই সমান । এইটি আমার বড়-মেয়ে, লবঙ্গলতা । এইটি মোঝো, আলোকবীণা । আর ঐটি ছোট, অনঙ্গমঞ্জরী । কোনটিকে তুমি বরণ করতে চাও ?

রাজপুত্র । সেই তো সমস্তা, অলকারাজ ! তবে আমি পুঁথি প'ড়ে জানি যে, রাজার কন্তাদের মধ্যে ছোট রাজকন্তাই সকলের চেয়ে রূপসী আর ভালো হয় ।

প্রথমা । এমন বোকার মত কথা কখনো শুনেছিস্ ?

দ্বিতীয়া । মিথো ধারণা ! সব ভুল ভেঙে যাবে ।

অলকারাজ । চুপ কর বলচি । রাজকুমার, তুমি ঠিক বলেছ ! পুঁথিতে, গল্পে, ঐ কথাই পণ্ডিতরা বলে বটে ! আর আমার এই ছোট মেয়ে...(আতে) এই মেয়েরাই বিধী মেজাজ, ঝগড়াটে । এইটের বিয়ে হ'য়ে গেলেই নিশ্চিৎ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজপুত্র, ঐ কন্তাটি আমার খুব ভালো ।

পঞ্চদ্বাত্রী । রাজকুমার ! কথা দিয়ে না !...কোন মেয়ে তোমার ভালো—তা'র পরীক্ষা দিতে হবে—অলকারাজ !

অলকারাজ । কে ?

রাজপুত্র । পঞ্চদ্বাত্রী মারাভতী পরীক্ষাতা ।

পঞ্চদ্বাত্রী । শোনো রাজপুত্র ! তোমার ভুল হ'চ্ছে ।

রাজপুত্র । প্রমাণ কি ?

পঞ্চদ্বাত্রী । প্রমাণ চাই ? দেখো কি তা' হ'লে । সৃষ্টি করি মারা-কানন—দেখবে চেয়ে নাগ-বাহুকী, আসবে ছুটে কৌসকৌসি...কীরের বাট ধরবে মুখে—সে কোন্ রাজকনো ?

প্রথমা । না—গো—না মারাভুড়ি—আমি পারবো না ।

দ্বিতীয়া । আমি পারি—রাজপুত্র আমারকে যদি বাঁচাতে ছোটো ।

তৃতীয়া । বাঁচায় অমনি সকলে ! শেষে নিজে পালিয়ে বাঁচে । আমরা রাজকন্যা—সাপের মুখে কীর ধরতে তো জন্মাইনি, মারাভুড়ি ?

পঞ্চদ্বাত্রী । রাজপুত্র, শুনলে কথা ?

রাজপুত্র । শুনেছি—মারাভতী, আমার রাজকন্যার সরল বিশ্বাস নেই ।

পঞ্চদ্বাত্রী । তা' হ'লে আমার হাতেই সব ব্যাপারটা ছেড়ে দাও । দেখো, রাজকন্তারা, যখন আমরা এই রাজবাড়িতে ঢুকছি, শুনতে পেলুম, তোমাদের পোষা তিনটা আশুরের জীব-জন্তু তাদের বন্ধ খাচা থেকে পালিয়েচে ।

প্রথমা । আমার রূপসী বান্দর !

দ্বিতীয়া । আমার শুকপাখী !

তৃতীয়া । আমার ধরণোস !

পঞ্চদ্বাত্রী । অশুভেরগুলো ভরে কেঁদেই অস্থির, পাছে তা'রা কঠিন শাস্তি পায় !

তৃতীয়া । তাদের মেয়ে কেলা উচিত । বাবা উচিত কি-না বলো ?

প্রথমা । তাদের ভাড়িয়ে দিলেই হ'বে । এর বেশী কিছু দরকার নেই ।

দ্বিতীয়া । আহা—না না । ও-রা গরীব লোক । একটা পণ্ড কি পক্ষীর জন্তে ওদের এতো শাস্তি দেওয়া কি যায় ?

পঞ্চদ্বাত্রী । রাজপুত্র, এখন তোমার কি মত ?

রাজপুত্র । আমার রাজকন্তার প্রাণে দয়া-মাতা নেই ।

পঞ্চদ্বাত্রী । বাঘো । রাজকন্তারা, শোনো । আমরা এখানে যখন আসছি, সেই সময় 'আমার বা' সবল ছিল সেই সমস্ত পরমা-কড়ি রাজার বাগানে প'ড়ে গেছে । সেগুলো কি ক'রে ফিরে পাবো ?

তৃতীয়া । নিজে তুমি খোঁজো গে বাও ।

প্রথমা । আমি বাগানের মালীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি...তা'রা খুঁজে আহুক ।

দ্বিতীয়া । কোথায় তুমি ফেলেছ ? আমাকে নিয়ে চলো—আমি তোমার সঙ্গে খুঁজে দেখবো !

পঞ্চদ্বাত্রী । রাজপুত্র, কি তোমার মনে হ'চ্ছে ?

রাজপুত্র । আমার রাজকন্তার হৃদয় বলে কোনো বস্তাই নেই ।

পথধাত্রী। আহা! এখন শোনো! রাজকন্ডার তন্ত্রে রাজ-
কুমার তিনটি উপহার এনেছে। একটি মানিক, একটি পুঁথি, আর একটি
ফুল। কোন রাজকন্ডাকে কি উপহার দিলে মনের মত হ'বে রাজপুত্র
সে ঠিক করতে পারছে না। কন্ডারা তোমরা ইচ্ছামত উপহার বেছে
নাও।

তৃতীয়া। আমি নোবে। এই মানিক।

প্রথমা। আমি নোবে। এই পুঁথি।

দ্বিতীয়া। আমি নোবে। এই ফুল।

পথধাত্রী। রাজপুত্র সব শুনে সব দেখলে। যে মানিক
চাইলে, সে ছোট কন্ডা, সে খুঁজছে সন্দের বাহার। যে পুঁথি চাইলে—সে
বড় রাজকন্ডা, সে খুঁজছে কথার ঝড়ি। যে ফুল চাইলে—সে মেথো
রাজকন্ডা, সে সকল ফুলের দেখতে চায়। সে চায় সুগন্ধ, সে চায় রূপ, সে
চায় কোমলতা, চায় মধু। এখন তোমার কী বক্তব্য বলো?

রাজপুত্র। তুমি আমার চোখ কুটরে দিয়েচো। আমার খুব শিক্ষা
হয়েছে, জেনেছি—রূপকথার সঙ্গে জীবনের কোনো মিল নেই। সেই
রাজকন্ডাই আমার বধু বাঁর নাম আলোকবীণা—এই দ্বিতীয়া।

অলকারাজ। ধন্ত ধন্ত রাজপুত্র! আমার দ্বিতীয়া কন্ডাই আমার
মুহুটমণি! তুমি যোগ্য বরণে হুখী হও। বেলে উঠুক মঙ্গলশব্দ।

[সঙ্গীত...শব্দ]

দুত। মহারাজাধিরাজ!

অলকারাজ। সংবাদ!

দুত। বিচিত্ররাজ্যের রাজা আর রাণী আসছেন।

রাজপুত্র। আমার বাবা—আমার মা!

অলকারাজ। কি আনন্দ! মহারাজ মহারাণীকে সমানরে আহ্বান
করবে।

[সঙ্গীত-বিলাস]

* *

[সকলের কণ্ঠে গানের ঢেউ উঠলো]

(গান)

রাজকুমারের বামে শোভে রাজকন্ডা।

বাইলো বকুলমালায় গন্ধের বস্তা।

সাতভাই চম্পার অনো মিলন-বাসরে,

পারুল বোনে ডেকে আনোগো আদরে,

সাজাক ফুলের মেলা কুসুমবধা।

অলকারাজ। এসো, এসো বন্ধু, এসো বিচিত্ররাজ! তোমার কুমারকে
লাভ ক'রে আমি খুশি হ'য়েছি।

রাজা। আমারও সৌভাগ্য অলকারাজ! তোমার মধ্যমা কন্ডা
গুণবতী, রূপবতী। রাণী, তুমি তখন ভয় করেছিলে...আজ দেখচো,
তোমার কুমার কঠিন সত্যের পরিচয় পেয়ে মানুষ হ'য়ে উঠেছে।

রাণী। আমার পরম আনন্দ যে শেষরক্ষা হয়েছে। কুমার!

রাজপুত্র। মা! আশীর্বাদ দাও।

রাণী। জীবনে তুমি হুখী হও, বৎস।

রাজপুত্র। মা, তোমরা কেমন ক'রে জানলে, আমি অলকা-রাজ্যে
এসেছি?

রাণী। আমরা কি চুপ্ ক'রে বসেছিলাম, বাবা। আমরা
তোমাদের পিছে পিছে এসেছি। পথে গুরুহিতৈবীর সঙ্গে দেখা হ'তে
জানতে পারি, তুমি রাক্ষসপুরীতে গেছ। তারপরে বোঝ পাই, তুমি
এসেছ এই রাজ্যে।

রাজপুত্র। গুরুহিতৈবী কোথায়?

রাণী। ঐ যে তিনি।

রাজপুত্র। গুরুঠাকুর!

হিতৈবী। তোমার জন্মে আমার মৌরব। আমি জানি, তুমি পথ
কেটে যেখানে যাবেই। তাই আমি পরীক্ষা করবার জন্যে, পথের ধারে
ব'সে তোমাকে শুধু আশীর্বাদে পর আশীর্বাদ ক'রে গেছি। ফলও
পেরেছে। অমঙ্গল একেবারে তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে।
ঐ যে দুই মহারাজ আসছেন এখানে।

রাণী। মহারাজ শুভনু। রাজপুত্র এখন অনেক শিখেছে।

রাজা। কুমার, এবার তোমার শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে। সত্যকে চিন্তে
পেরেছ, আমার বিশ্বাস। কত বিষয় কত বাধা পেরিয়ে যেতে পারলে তবে
জ্ঞানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সে তুমি বুঝতে পেরেছ নিজের অভিজ্ঞতা
থেকে। তোমার বধুলাভ আজ সার্থক হোক। আশীর্বাদ আমার—এই
সংসার-সমুদ্রের ঢেউ কাটিয়ে সুখে জীবনপথে চ'লে যাও। স্বর্গ হ'তে নন্দন
বনের বাতাস ব'য়ে আনুক। সুখ দুঃখ যেন তোমাদের এড়ু হ'রে না ওঠে,
তোমাদের চারি পাশে সুখ দুঃখের হবে নৃত্য। কিন্তু তাদের হেলান পা
হ'য়ে যাবে—এ শুধু ভবসাগরে ঢেউখেলা।

হিতৈবী। আজ আনন্দ—আজ আনন্দ—শুধু আনন্দ! আমার
শিক্ষার আজ কি ফল—যেখেন কি হে মাধব! দুটো কথা কও!

মাধব। এই আনন্দ মেলায় কথাতো বলী। সুখের আর শেষ নেই।

ওগো ভেলেমেরেরা ছোট ছোট চুলবুলে হাত তুলে তাই তাই দাও তালি—
দাও তালি...

(সুরে)

দাও তালি তাই তাই তাই—রে

নাই নাই ছুখ নাই নাই—রে

নাচো সব খেই খেই খেইয়া

হাসি বত বাবু গান হইয়া

এ মেলায় তোমাদের চাইরে।

...তোমরাই সকলের আশা-ভরসা। রূপকথার মত তোমাদের জীবন
সুখের হোক। তোমরাই কবির সেরা গৌরব। মনের গুপ্ত ভাগ্যের
জয় হোক। তোমরা আমাদের রাজপুত্র আর রাজকন্ডার মত সদাশুখী
হও। শুভে পাচো—কি আনন্দের ঢেউ উঠেছে...রাজপুত্রের অভিনন্দন!
আমরাও গাই তোমরাও গাও।

[সমবেত গান]

ভ্রামল কানন সাজলো ফুলে

তোমার রাণীগীতে।

বেণু বাজে বেণু বাজে...

তোমার স্তম্ভ ঐ নাচের ভঙ্গীতে।

দেহো পলক ভরি'

নাও বিবাহ হরি'

কোটাও আনন্দ-মহরী,—

ভালে রণ-জয়ের তিলক শোভে,—

আলোক-বীণা বাজাও বাজাও আশের সঙ্গীতে।

[সঙ্গীত-সমারোহ]

*

*

রাজপুত্র বা' শিখেছিল, সবস্তুই বই-এর পাতা থেকে, এবার তার
শিক্ষা হোলো পৃথিবী ঘুরে। জীবনে কি সত্য কি মিথ্যা—চিন্তে পারলে।

[সমাপ্ত]

বাসবদত্তার স্বপ্ন

হুই

ক্রমধানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মন্ত্রিবর যোগেশ্বরায়ণ উজ্জয়িনীতে গোপনে দূত পাঠিয়েছিলেন—প্রজ্ঞাতের বড় ছেলে গোপালককে কোশাধীতে নিয়ে আস্তে। দূত গিয়ে রাজকুমারকে জানালে যে—‘আপনার আদরের ছোট বোন আমাদের নতুন রাণীমা—দেবী বাসবদত্তা অনেকদিন বাপের বাড়ীর কোন খবর না পেয়ে বড়ই ভাবছেন, আপনি একবার সময় ক'রে যত শীগ্গির পারেন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি একটু স্থস্থির হইতে পারেন’।

গোপালক এই শুনে তখনই বেরিয়ে পড়লেন দূতের সঙ্গে। কোশাধীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পথের মাঝে যোগেশ্বরায়ণ গোপালককে আটকে ফেলে বললেন—‘কুমার! আমিই দেবী বাসবদত্তার নাম ক'রে কোশলে আপনাকে এখানে আনিয়েছি—বিশেষ দরকারে। আপনি কিন্তু এজন্তে কিছু মনে করবেন না। কাবণ, আমি জানতুম—এ ছাড়া অণ্ড কোন উপায়ে এত তাড়া-তাড়ি আপনাকে এ রাজ্যে আনা সম্ভব হ'ত না’।

গোপালক একটু মুহু হেসে বললেন—‘আবার কি ফক্কী আঁটছেন মন্ত্রিবর! আপনার পাল্লায় পড়লেই ভয় হয়—কখন কি ভাবে অপ্রস্তুত হ'তে হয়’।

যোগেশ্বরায়ণ—‘না না, সে সব ভয় নেই। তবে একাজ আপনার পরামর্শ ও অমুমতি ছাড়া হ'তেই পারে না। তা কুমার! এখন আপনি রাজবাড়ী যান। তবে একটি অমুরোধ—সেখানে কারুর কাছে—আমার এসব কথা জানাবেন না যে আমিই মিথ্যা ছলে দূত পাঠিয়ে আপনাকে আনিয়েছি। আজ রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ রইল আমার কুটারে। তবে একটু বেশী রাতে—রাজবাড়ীর খাওয়া দাওয়া চুকলে কাউকে না জানিয়ে চুপি-সাদে আমার ওখানে গিয়ে পারের ধুলো দেবেন। সাবধান! একথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। বিশেষ দরকারী গোপনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে’।

গোপালক মন্ত্রিবরের কথা শুনে প্রথমটা একটু বিস্মিত হ'লেও যোগেশ্বরায়ণের কথায় একবাক্যে রাজি হলেন। কেন না প্রধান মন্ত্রীর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছিল—তাঁর পূর্বের আচরণে। তাঁর অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল আর অসামান্য প্রভুভক্তি দেখে গোপালক বুঝেছিলেন যোগেশ্বরায়ণ একটা ক্ষণজন্মা লোক—তাঁর দ্বারা তাঁর বোন বা ভগিনীপতির কোন অনিষ্ট কোন দিনই হ'তে পারে না।

হুজনে সাদর আলিঙ্গন ক'রে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

এদিকে গোপালক রাজবাড়ীতে এসে ঢুকতেই উদয়ন তাঁকে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বাসবদত্তা বতটা অবাক তার চেয়েও বেশী আনন্দিত। রাণী-রাণী হুজনেরই মুখে এক প্রশ্ন—‘দাদা, আপনি এমন সময় হঠাৎ কি কারণ? সব ভাল ত’?

গোপালক হাসি চেপে বললেন—‘হাঁ, হাঁ, সব ভাল—সব ভাল। হাঁরে দত্তা! তাঁর বুঝি আর আমাদের জন্তে মন কেমন করে না—এই নতুন সঙ্গীটিকে পেয়ে। তা ব'লে আমরা ত আর তোকে ভুলতে পারি নি। তাই অনেকদিন না দেখার মন কেমন করছিল। ভাবলুম—যাই, একবার কয়েকদিন কোশাধী বেড়িয়ে আসি। যেমন মনে হওয়া, অমনি চলে এলুম। কি বলিস্! কিছু খারাপ করেছি কি’?

বাসবদত্তা একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন—‘সে কি দাদা! এতে আবার বলবার কি আছে! তা যখন এসেছ—এবার আর শীগ্গির যেতে দিচ্ছি না।’

গোপালক—‘তুই ত ব'লে খালাস—‘যেতে দেব না;’ কিন্তু আমার নতুন জামাইবারুটি ত তা বলতে পারেন না। তিনি নিশ্চয় মনে করেছেন—‘বেশ ছিলুম হুজনে নিরিবিলি, কোথা থেকে এ শুকনো আপদ্ এসে জটল? কি বলেন, মহারাজ’!

উদয়ন বিশেষ লজ্জিত হ'য়ে—‘আঃ! কি যে বলেন আপনি! নিন এখন রসিকতা রাখুন। বিশ্রাম ক'রে স্নান-আহারের ব্যবস্থা করুন’—এই কথা বলতে বলতে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ দিনের পর মহারাজ উদয়নকে রাজসভায় ঢুকতে দেখে মন্ত্রীরা সব তটস্থ—বিস্ময়ে অবাক! প্রজারা এভাবে আচম্কা মহারাজের দর্শন পেয়ে আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। কেবল মন্ত্রিবর যোগেশ্বরায়ণ সেনাপতি ক্রমধানকে চোখের ইসারায় জানালেন—‘কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।’

দুপুরবেলা স্নান-আহার সেরে ও তারপর একটু ঘুম দিয়ে বিকালে গোপালক বেড়াতে বেরলেন। বেড়াতে বেরিয়েই তিনি বুঝলেন যেন কোন একটা কারণে রাজ্যে কিরকম ছন্ন-ছাড়া ভাব এসেছে। অথচ এর কারণ তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রজারা যে রাজার উপর অসন্তুষ্ট তা ঠিক নয়—অথচ সবাই যেন কেমন মন-মরা!

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরে তিনি বোনের নিজের হাতে তৈরী নানাবকম খাবার খেয়ে খুব তৃপ্ত হ'লেন। তিনি অস্ত্রের মতই, পেট ভ'রে সব খেলেন—যোগেশ্বরায়ণের বাড়ী গিয়ে এখনি যে আবার খেতে হবে—এ ভাবটাও যাতে প্রকাশ না হয়—তার জন্তেই তাঁকে এ-কৌশল করতে হ'ল।

খাওয়া-দাওয়ার পর গান-বাজনা-নাচের আসর কিছুক্ষণ চলল। তারপর গোপালক জানালেন যে—সেদিন অনেক পথ এসে তিনি বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি একটু সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে চান।

তাঁর কথায় রাজা-রাণী শশব্যস্তে তাঁর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। গোপালক তাঁর ঘরের সোপান প্রদীপটি নিবিয়ে দিয়ে পালকে উঠে শুলেন চান্দর গায়ে দিয়ে। একটু বাদেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু হ'ল। ঘরে যে চাকর ছিল, কুমার ঘুমিয়েছেন বুঝে সে দোরটি আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ রাজা-রানীও গুতে গেলেন। বাড়ীর অস্ত্রাস্ত্র সব লোক ঝি-চাকর সকলে একে একে খাওয়া দাওয়া সেয়ে যে যার জায়গার গিয়ে গুল। রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে মাঝ রাতের প্রহর বেজে উঠল। রাজবাড়ী তখন নিশ্চল।

এদিকে গোপালক একটুও ঘুমান নি। চারদিকের কোলাহল খেমে যেতেই তিনি আস্তে আস্তে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। গায়ে একটি দুর্ভেজা লোহার বর্ম প'রে তাব উপর তাঁর পোষাক পরলেন। তাঁর এক হাতে রইল খোলা তরোয়াল আর কাঁকালে বইল একখানা ধারাল ছোরা।

এই ভাবে সাজগোজ ক'রে একখানা কাল রং-এর চাদরে আপাদ-মস্তক ঢেকে তিনি প্রহরীদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লেন বাজ-প্রাসাদ থেকে। যোগন্ধরায়ণের বাড়ীর দোরে সঙ্কেতমত টোকা মারতেই মহামন্ত্রী নিজে দোর খুলে দিলেন।

হু'জনে মন্ত্রণাগারে ঢুকে দেখলেন যে—সেনাপতি কুমথান আগেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কেউ সেখানে নেই।

তিনজনে মুখোমুখী হ'য়ে বসবার পর যোগন্ধরায়ণ খুব ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে কথা পাড়লেন—‘কুমার! আজ আপনার কাছে যে প্রস্তাব করতে চলেছি, তা শুনেই আপনি প্রথমে হয়ত’ স্তম্ভিত হ'তে পারেন। এমন কি আমার উপর আপনার বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণাও জন্মতে পারে। কিন্তু আমার অহুবোধ—আপনি আমার সব কথা না শোনা পর্য্যন্ত আমাকে বাধা দেবেন না বা উত্তেজিত হবেন না। তা হ'লে সব কাজ পণ্ড হবে।’

গোপালকও সকালের ব্যাপার থেকেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়েছিলেন। এখন ত' তিনি আর ধৈর্য ধরতেই পারলেন না—ব'লে উঠলেন—‘দোহাই আপনার মন্ত্রিবর! আর অন্ধকারে বাধ'বেন না। মনের কথা খুলে বহুন—ভাবনায় আমার বুক ধড়কড় করছে।’

তবুও যোগন্ধরায়ণ ইতস্ততঃ করছেন দেখে তিনি বিশেষ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন—‘কি ব্যাপার বলুন ত! আজ কানা-ঘুঘোর যা শুনলুম সারাদিন, তাতে মনে হ'ল রাজার আর প্রজাদের উপর তেমন টান নেই—রাজকাৰ্য্যেও বিশেষ অবহেলা দেখাচ্ছেন বিয়ের পর থেকে। এসব ত ভাল কথা নয়। তা প্রজারা কি তাঁর উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে? কোন রকম বিদ্রোহ শড়ম্বরের আভাস পেয়েছেন না কি?’

কুমথান আর থাকতে না পেরে সদর্পে ব'লে উঠলেন—‘তা হ'লে ত ভাল ছিল। প্রজাদের বিদ্রোহ বা শত্রুর আক্রমণ হ'লে ত কিছুদিন উত্তেজনার খোঁরাক মিলত। এ যে ব'সে ব'সে সর্বান্তে বাত ধরবার যোগাড়। তাই ভেবেছি—আমরাই বিদ্রোহ করব!’

কণিকের মধ্যে গোপালকের মুখের ভাব কঠিন হ'য়ে উঠল। তিনি তাঁর পোষাকের মধ্যে তরোয়ালখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধ'রে বললেন—‘ঠাই নাকি সেনাপতি! তাই আমাকে ডেকেছেন বৃষ্টি বাইরে থেকে আপনাদের সাহায্য করতে! তা বড় ভুল বুঝেছেন আপনারা!’

এই ব'লে যোগন্ধরায়ণের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বিম্বনে কথা হারিয়ে কেঁললেন। মন্ত্রিবর হাসি-হাসি-মুখে তাঁর খোলা বুক সামনে পেতে দিয়ে বললেন—‘মহারাজ উদয়নের বিরুদ্ধে যোগন্ধরায়ণ বা কুমথান বড়ব্ব্ব করতে পারে—এ সন্দেহ আপনার মনে জাগ'বার আগেই আপনার হাতেব ঐ তরোয়ালখানা আমূল এই বৃকে বসিয়ে দিন বন্ধ! বিনা প্রতিবাদে আমরা বৃক পেতে দিছি!’

স্তম্ভিত গোপালকের অবশ হাত থেকে তরোয়ালখানা বন্ঝন ক'রে মাটিতে খ'সে প'ড়ে গেল—মুখ দিয়ে তাঁর একটিও কথা বেরুল না। তিনি শুধু মন্ত্রী আর সেনাপতির দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন।

তখন যোগন্ধরায়ণ খেমে খেমে একটু একটু ক'রে তাঁকে তাঁর মনের কথা জানাতে লাগলেন—কি রকম কৌশলে তিনি দেবী বাসবদত্তাকে কিছুদিনের ভুলে মহারাজের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে পদ্মাবতীর সঙ্গে মহারাজের বিয়ে দিতে চান।

গোপালক স্তম্ভে স্তম্ভে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ'ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি তিনি একটিও কথাব প্রতিবাদ না ক'রে সব ধীরভাবে শুনে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢেকে তিনি ভাব'তে লাগলেন। যখন মুখ থেকে হাত তিনি সরালেন, তখন তাঁর মুখে স্নান হাসি, কিন্তু চোখে জল। তিনি বললেন—‘মন্ত্রিবর! আমি আপনার কথায় সম্মতি দিলাম।’

হঠাৎ কুমথান তাঁর সেই পুরাণে আপত্তি তুললেন—‘সবই ত ভাল! কিন্তু দেবীর আগুনে পুড়ে মরার খবর কানে পৌঁছুলে রাজা যে শোকে মারা যাবেন না—তার ঠিক কি!’

যোগন্ধরায়ণ—‘আরে, তোমার মাথায় কি কিছু বুদ্ধি আছে। পত্নী-শোকে কোন বীরপুরুষ কখনও মরে না। বিশেষ আমাদের মহারাজের ‘চক্রবর্তি-যোগ’ আছে। সেটা ফল'বার আগেই তিনি কখনও মরতে পারেন না। তারপর আর এক কথা! তিনি যখন দেখ'বেন যে দেবীর বড় দাদা তাঁর আদরের ছোট বোনটির এরকম শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর খবর জেনেও খুব বেশী দুঃখিত হন নি, তখন চালাক তিনি, ঠিক বুঝে নেবেন—ভিতরে কোন একটা রহস্ত নিশ্চয়ই আছে! তারপর পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর একবার মুখোমুখি দেখা করিয়ে দিতে পারলেই বাকী শোকটুকু ভুলতে কতক্ষণ লাগ'বে?’

গোপালক—‘ঠিকই বলেছেন, মন্ত্রিবর! এখন জানতে পারি কি আপনার কার্য্য-পদ্ধতি কি রকম হবে?’

যোগন্ধরায়ণ—‘শুনুন কুমার! শোন কুমথান! মগধ-রাজ্যের ও কৌশাধী-রাজ্যের ঠিক সীমানার গায়ে কৌশাধীর একটা গ্রাম আছে—তার নাম লাবণক। তার পাশেই মস্ত বড় বন। আমি মহারাজের মনে বিশ্বাস জন্মাব যে ঐ বনে অনেক রকম শিকারের পশু পাওয়া যায়। শুন'লেই মহারাজ যুগয়ায় যেতে প্রস্তুত হবেন। কুমারের উপর ভার রইল—দেবীকে একটু নাচাতে হবে, যাতে তিনি মহারাজের সঙ্গে যেতে চান। তিনি যদি নাছোড়বান্দা হ'ন, মহারাজের এমন সাধ্য হবে না, তাঁকে

এখানে রেখে যান—আর তাঁকে কাছ-ছাড়া করতেও চাইবেন না মহারাজ। তারপর লাবাংকে উপস্থিত হ'য়ে যখন তাঁবু গাড়া হবে, তখন মহারাজ মুগ্ধা নিয়েই বাস্তু থাকবেন। সেই অবসরে কুমার দেবীকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলে তাঁকে কিছুদিন আত্মগোপন করবার পরামর্শ দেবেন। অবশ্য এটো কাজে আমিও কুমারকে যতটা পারি সাহায্য করব। দেবী মহাবাজের যে বকম হিত-চিন্তা করেন, তাতে এ স্বার্থত্যাগ তিনি নিশ্চয়ই করতে রাজি হবেন—এ ভরসা আমার আছে। তারপর তাঁকে একবার

রাজি করতে পারলেই আমি নিজে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে ছদ্মবেশে মগধের রাজকুমারী পদ্মাবতীর কাছে রেখে আসব—যাতে তাঁকে কোন হুমি ভবিষ্যতে না স্পর্শ করতে পারে। ইতিমধ্যে সেনাপতি রাণীর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে রটিয়ে দেবেন—আগুন দেবী পুড়ে মরেছেন। তারপর যা ঘটবার আপনি ঘটবে।

গোপালক ও কুম্ভান্ন রাজি হওয়ায় সে রাতের মত মন্ত্রণা-সভা ভঙ্গ হল। [ক্রমশঃ

ললিত-কলা

দশ

১৪। মাল্যগ্রন্থন-বিকল্প—যশোধব টীকায় বলিয়াছেন—“মাল্য মুণ্ডমালা ইত্যাদি দেবতার পূজার নিমিত্ত নানাবিধ নেপথ্য; তাহাদিগের গ্রন্থন-বিচিত্র কৌশল।

‘মুণ্ডমালা’ বলিলে আজকাল মা কালী-বলয় শোভমান অস্ত্রগণের মুণ্ডে গাথা মালাই বুঝায়। কিন্তু টীকাকারের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে মুণ্ডমালা দেবতার পূজার্থ নিমিত্ত পুষ্পালঙ্কার-বিশেষ—হয় ত প্রতিমার শিরোভূষণ মাল্য বা ঐরূপ কিছু।

ষষ্ঠসংখ্যক কলার অন্তর্ভুক্ত ‘কুম্ভ-বলি-বিকারের’ ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়াছেন—উহা শিবলিঙ্গাদির পূজার্থ নানাবর্ণ কুম্ভম গ্রহণ-পূর্বক ভাগে ভাগে স্তরে স্তরে নানা আকৃতিতে সাজাইবার কলা-কৌশল। ফুলগুলি স্তবে স্তরে সাজান হইবে—উহাতে সূত্র-সংযোগ থাকিবে না—তবে বিনা সূত্রে গাথা চলিতে পারে। কারণ সূত্রসংযোগ ঘটিলেই উহা গাথা হইল। আর সূত্রে গাথা ক্রিয়াটি ‘মাল্যগ্রন্থন’ নানক আলোচ্য কলাটির অন্তর্গত। সূত্রে না গাথিয়া বিনা সূত্রে গাথিলে বা স্তরে স্তরে সাজাইলে উহা আলোচ্য কলাটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পূর্বোক্ত কুম্ভ-বলি-বিকার কলার মধ্যে পড়িবে।

পরবর্তী কলা শেখবকাপীড়-যোজন-সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়, তাহা টীকাকারের বচন উক্ত কথায় পরে সবিস্তারে দেখান হইবে। কেবল এইটুকু এ প্রসঙ্গে সূচিত করা যাইতেছে যে, পরবর্তী কলাটিতে মাত্র দুই শ্রেণীর বিশিষ্ট মাল্যের উল্লেখ আছে। তাহাদিগের গ্রন্থনের অংশটি এই চতুর্দশ-সংখ্যক কলার অন্তর্গত কেবল যোজন-কৌশলটি পঞ্চদশ-সংখ্যক কলার মধ্যে পড়ে।

১ “মাল্যানাং মুণ্ডমালাদীনাং দেবতা-পূজনার্থং গ্রন্থনবিকল্পা ইতি”—জয়ম।

৩ মহেশপালের সংস্করণের অনুবাদ “মাল্য—মুণ্ডমালাদি, তাহার বচনাবিশেষ। দেবতা-পূজাদির জন্তু মাল্যালঙ্কার গ্রন্থন-বিশেষ। বিনা সূত্রের হার ইত্যাদি”—পৃঃ ৮০

অনুবাদক—“বিনা সূত্রের হার”—এ অর্থ কোথা হইতে পাইলেন, বুঝা যায় না। বস্তুতঃ, বিনা সূত্রের হার মাল্যগ্রন্থন নহে—কুম্ভ-বলি-বিকার মাত্র।

২। বঙ্গজী শ্রাবণ, ১৩৫১, ‘ললিত-কলা’ প্রবন্ধে উষ্টব্য।

৩ তর্করত্ন মহাশয় আলোচ্য কলাটির বিশেষ বিবরণ দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন—“বিবিধ প্রকার ‘মালা গাথা’ শিল্প”। ৩

৪ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও প্রায় নীরব—নানাপ্রকার মালা বা হার প্রস্তুতকরণ”। ৪

৫ সমাজপতি মহাশয়ও অমুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—“মালা গাথিবার বিচিত্রতা ও কৌশল”। ৫

৬ কুম্ভচন্দ্রের মতে—“মুণ্ডমালাদি রচনা। দেবতা-পূজার জন্তু মাল্যালঙ্কার গ্রন্থন-বিশেষ। বিনা সূত্রে হার গাথা”। ৬

১০। শেখরকাপীড়যোজন—টীকাকার বলিয়াছেন—ইহাও গ্রন্থনের প্রকারভেদ। তবে যোজনটি কলাস্তব। অর্থাৎ এই কলার মধ্যে গাথার অংশটি চতুর্দশ-সংখ্যক ‘মাল্যগ্রন্থন-বিকল্প’ কলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নতুন হইতেছে—গাথার নহে—যোজনে অর্থাৎ বিশিষ্ট আকারে বিরচনে। আর এই যোজন অংশটি পঞ্চদশ-সংখ্যক কলার মধ্যে পড়ে।

শেখবক—শিখাস্থানে ঝুলাইয়া বাথিবার মত করিয়া পরিধান করা হয়। আপীড়—কাটি দিয়া মণ্ডলাকায়ে গ্রথিত—শিরেবেষ্টন-রূপে পরিধান করা হইয়া থাকে। শেখবক ও আপীড় উভয়ই নানা-বর্ণের পুষ্পদ্বারা বিচিত্র হয়। যোজন—বিবচন। অবশ্য পূর্বেই ‘মাল্যগ্রন্থন’ বলা হইয়াছে; তদনুসারে শেখবকাপীড় বলিলেই বুঝা যাইত যে—শেখবক ও আপীড় গ্রন্থন। কিন্তু পুনশ্চ অধিকন্তু যোজন (অর্থাৎ বিবচন) শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে—এ কলাটির প্রতি সমাদর দেখাইবার উদ্দেশ্যে। তৎকালে শেখবক ও আপীড় নাগরক (বারু) দিগের অত্যন্ত আদরের প্রধান বেশাজ ছিল। ৭

৩ কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৪

৪ শিল্প পুস্তাঙ্কলি, পৃঃ ৬

৫ কল্পিপুরাণ, পৃঃ ২৪

৬ কৌমুদী, পৃঃ ২৮

৭ “গ্রন্থনবিকল্প এবায়ম্; কিন্তু যোজনং কলাস্তবম্। তত্র শেখবকস্ত শিখাস্থানেহবলম্ব্যাসেন পরিধাপনাং, আপীড়স্ত চ মণ্ডলাকারেণ গ্রথিতস্ত কাঙ্ছিকাযোগেন পরিধাপনাং; নানাবর্ণ-ঐক্যে পুষ্পবিরচনং যোজনম্। পুনর্বিবচনবচনমাদ্যর্থম্। তদুভয়ং নাগরকস্ত প্রধানং নেপথ্যঙ্গম্”—জয়ম্। কেহ কেহ—“বিবচনং

চতুর্দশ-সংখ্যক কলার সহিত পঞ্চদশ কলার সাম্য—উভয়েবই মধ্যে মালা-গাঁথার কৌশল বর্তমান। আর আগেরটি হইতে পরেরটির ভেদ—আগেরটিতে যে কোন আকারে মালা গাঁথিলেই হইল—পরেরটিতে মালা দুইটিমাত্র বিশিষ্ট আকারে সাজাইয়া গাঁথা প্রয়োজন। ইহারই নাম যোজন অর্থাৎ বিরচন। আরও একটি ভেদ এই যে, মালাগ্রন্থন-কলায় মুখ্যতঃ দেবতা-পূজার্থ মালালঙ্কার বা পুষ্পসজ্জা গাঁথিবার কৌশলে নিম্নাণ করিতে হয়; পক্ষান্তরে, শেখরকাপীড়যোজন দেবপূজার অঙ্গভূত নহে—প্রধানতঃ নাগরক (অর্থাৎ বাবুদিগের) বিশিষ্টপ্রকার পুষ্পসজ্জা-বিধান মাত্র। আর ষষ্ঠ-সংখ্যক কলা—কুম্ম-বলি-বিকা-ব—সুত্রদ্বারা না গাঁথিয়া কেবল স্তরে স্তরে ভাগে সাজাইয়া অথবা বিনা স্ত্রে গাঁথিয়া নানাবর্ণ পুষ্প-দ্বারা দেবপ্রতিমাদি বৈশবিধান অথবা দেবমন্দিবাদি শোভা সম্পাদন।

৩তর্কবদ্ধ মহাশয়ের মতে—“শিখাস্থানে দোতলামান মালা শেখরক, মণ্ডলাকারে শিরোবেষ্টন-মালা আপীড়, এই দ্বিবিধ মালাদ্বারা নাগরকে সজ্জিত করাই একটা শিল্প।” ৮

৩বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপী পাগড়ী ও তাহার অলঙ্কার প্রস্তুতকরণ।” ৯

৩সমাজপতি মহাশয়েব মতে—“শেখর (শিরস্তাণ টুপী) ও তদীয় অলঙ্কার প্রস্তুতের প্রণালী।” ১০

যোজনং, ও ‘পুনবিরচনবচনম্’ ইত্যাদি দেখিয়া অনুমান করেন—টীকাকারের মতে—“শেখরকাপীড়বিবচনযোজনম্’ পাঠ। আবাব কেহ বা বলেন—না, বিরচন আর যোজন একার্থক—যোজনেব বাখ্যা—বিরচন। মতেশচন্দ্র পালের সংস্করণে অনুবাদ—“এটিও গ্রন্থন-বিশেষ; কিন্তু যোজনাকরণ কলাস্তর। শিরোভূষণের জায়,—অর্থাৎ সিঁথি, পানফুল, তারা, প্রজাপতি ইত্যাদির জায়, সমান ভাবে শিখাস্থানে পরিধাপনযোগ্য শেখরক এবং মণ্ডলাকারে কাঙ্ক্ষিকাসাহায্যে (ক্ষুদ্র চাঁচাড়া ইত্যাদির সহিত) পবিধানযোগ্য আপীড় নানাবর্ণে পুষ্পদ্বারা বিরচিত করা। এ-দুইটি নাগবেব প্রধান নেপথ্য্য। টুপী, পাগড়ী ইত্যাদি অলঙ্কারকরণ।”— পৃ: ৮৯-৯০।

দ্রষ্টব্য :—শেখরক—শিখাস্থানে পবিধানযোগ্য—সিঁথি, প্রজাপতি ইত্যাদি ত’ শিখাস্থানে পবিধানের যোগ্য অলঙ্কার নহে—এগুলি প্রায় সিঁথির উপর পরা হয়। অতএব, উক্ত অনুবাদ টীকা-সম্মত নহে। শেখরক—ঘাড়ের কাছে (শিখাস্থানে) দোহল্যমান মালা, ঝুমকো, pendant গোছেব। আপীড়—গুরু চ্যাচাড়া দিয়া গোলাকারে গাঁথা মালা, যা মাথার চারদিকে পরা যায়, ফুলের টায়রা বা মুকুট, chaplet. কাঙ্ক্ষিকা—বোধ হয় কাঙ্ক্ষিকা, কাটি, বা চ্যাচাড়া।

এস্থলে ‘যোজন’ শব্দটির অর্থ ঝুমকা বা মুকুটের মত দুইটি বিশিষ্ট আকারে বিরচন, ইহাই টীকা-সম্মত অর্থ, শরীবে যোজন নহে, কাবণ, উহা ১৬ সংখ্যক নেপথ্য্যপ্রয়োগ কলার অন্তর্গত।

৮ কা: স্ত: বঙ্গবাসী, পৃ: ৬৪-৬৫

৯ শিল্পপুস্তাকালি, পৃ: ৬

১০ কঙ্কিপুবাণ, পৃ: ২৪

৩কুম্মদেব সিংহের মতে—“টুপী পাগড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করণ এবং পুষ্পদ্বারা মস্তকভূষণ প্রস্তুতকরণ।” ১১

১৬। নেপথ্য্যপ্রয়োগ—টীকাকারের অর্থ—“দেশ-কাল-অনুযায়ী শরীর-শোভার্থ বস্ত্র-মালা-ভাষণ ইত্যাদি দ্বারা শরীর মণ্ডিত করণ।” ১২

‘নেপথ্য্য’ শব্দের অর্থ সাজসজ্জা, বেশ-ভূষা, পোষাক ইত্যাদি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানাবিধ বেশ, পুষ্পাদির মালা ও স্বর্ণ-মণি-মুসাদির অলঙ্কার ইত্যাদি পরিধানের কৌশল এই কলাটির অন্তর্গত।

বদমকে অভিনয়ার্থ বস্ত্রাবতরণের পূর্বে নট-নটীগণেব আত্যাধ্য-শোভা বিধানের প্রয়োজন হইত। এই আত্যাধ্যাভিনয়ও নেপথ্য্য-প্রয়োগ কলাব অন্তর্গত। যাহাব যেরূপ ভূমিকা, তাহার তদনুরূপ বেশ পরিধানই সম্ভব। এই বেশ যেখানে করা হইত, বঙ্গগ্রন্থেব সেই স্থানেব নামও ‘নেপথ্য্য’। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় ‘নেপথ্য্য’ অর্থে বেশ-ভূষা বড় একটা প্রচলিত নাই। তাহাব পরিবর্তে ‘সাহাবর’ (green room) অর্থই অধিক প্রচলিত।

মতান্তরে, বঙ্গমঞ্চ-নিম্নাণও এই কলাব অন্তর্ভুক্ত।

৩তর্কবদ্ধ মহাশয়ের মতে—“দেশ-কাল ও পাত্র বিবেচনায় উপযুক্ত বেশ-ভূষা ও তাহাব সন্নিবেশ।” ১৪

৩বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“বস্ত্রবচনা, অভিনেতাঙ্গিকে সাজান তাহার উপকরণ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।” ১৫

৩সমাজপতি মহাশয়েব মতে—“অভিনয়েব উদ্যোগ করণ, অভিনেতৃ-বিভূষণ প্রভৃতি এই শিল্পের অঙ্গ।” ১৬

৩কুম্মদেব সিংহের মতে—“দেশ-কাল ও পাত্রভেদে বস্ত্র-লঙ্কারাদি ধারণ (শরীরেব শোভায়)।” ১৭

১১ কৌমুদী, পৃ: ২৮-২৯

যাহাবা টুপী, পাগড়ী ইত্যাদি অর্থ কবিগাছের, তাহাবা বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ও কথাটিতে পুষ্পরচিত শিরোভূষণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে—অল্প পদার্থ-নির্মিত শিরোভূষণের কথা ইহাতে বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে টুপী, পাগড়ী বলিলে পুষ্প-নির্মিত শিরোভূষণ বুঝায় না—এ কারণে এক্ষণ অর্থ সম্মত মনে হয় না।

১২ দেশকালোপেক্ষা বস্ত্রমালাভরণাদিঃ শোভার্থ শরীরস্য মণ্ডনাকাবা: (জয়ম্)।

১৩ অভিনয় চতুর্বিধ—আঙ্গিক, বাচিক, আত্যাধ্য ও সাঙ্গিক। এতন্মধ্যে আত্যাধ্যাভিনয়, নেপথ্য্যপ্রয়োগেব অন্তর্ভূত। কাঙ্গী-সংস্করণ, ভরত-নাট্যশাস্ত্রেবও ২ অধ্যায়ে আত্যাধ্যাভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৩ কা: স্ত: বঙ্গবাসী, পৃ: ৬৫।

১৫ শি: পৃ: ৬

১৬ কঙ্কিপুবাণ, পৃ: ২৪

১৭ কৌমুদী, পৃ: ২৯

৩বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও ৩সমাজপতি মহাশয়, নেপথ্য্য-প্রয়োগ কলাটিকে কেবল বঙ্গ-সম্বন্ধীয় নেপথ্য্য-বিধানের কৌশলরূপে ব্যাখ্যা

১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ—টীকাকার মতে হস্তিদন্ত-শঙ্খাদি-দ্বারা নিশ্চিত সজ্জার্থ কর্ণভরণ-বিশেষ। ১৮

হস্তিদন্ত ও শঙ্খ নিশ্চিত শাখা, কানৈব গহনা, আঙুটি, সেক্টিপিন ও অত্রাঙ্গ নানারূপ খেলার জিনিষ আজকালও খুবই প্রচলিত। প্রাচীনকালেও হস্তিদন্ত ও শঙ্খ-রচিত কানবালা, কানিফুল ইত্যাদি কাণের গহনা ব্যবহৃত হইত—এই সকল অলঙ্কার প্রায়ই লতাপত্রাকাষে নিশ্চিত হইত; এই কাষে ইহাদিগেব নাম 'কর্ণপত্র'—পত্রাকৃতি কর্ণভরণ। হস্তিদন্তের মতই দুর্দ্ধবল তাল-পত্রাদি-দ্বারাও এইরূপ নানাবিধ অলঙ্কার নির্মাণ করিয়া পরিধান করিবার প্রথাও এককালে এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল। আবাব কাহারও কাহারও মতে—চন্দ্রনাডি-দ্বাৰা আকর্ণ কপালে লতা-পত্রাদি রচনা এই কলার অন্তর্গত।

৩তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“হস্তিদন্ত ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্বাৰা পত্রাকৃতি কর্ণভরণ বচনা” ১৯

৩বেদান্তবাগীশ মহাশয় নূতন রকমের অর্থ করিয়াছেন—“পূর্বকালে জীলোকৈবা মুগমদ-চন্দ্রনাডি তিলকশ্রেণী ধারণ করিত, তাহাই কর্ণপত্রভঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইত। যে নারী এই কাষে কুশলা, সেই নারীই পূর্বে বাজমহিষীগণেব নিকট সৈরিক্ত্রী নামক দাসীপদ প্রাপ্ত হইতেন” ২০

৩সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুসরণে বলিয়াছেন, “পূর্বকালে কামিনীগণ তিলক রচনা করিতেন। যাহা তিলক বচনা করিয়া দিত, তাহাদিগকে এই বিজ্ঞা শিখিতে হইত” ২১

৩বেদান্তবাগীশ ও সমাজপতি মহাশয়দ্বয়ের অর্থ সমর্থনযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, চন্দ্রনাডি-দ্বাৰা তিলক-বচনা—পঞ্চন-সংখ্যক কলা ‘বিশেষকচ্ছেত্রে’র অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব, কর্ণপত্রভঙ্গ পৃথক কলা—ইহা শাখারী প্রভৃতিব জীবিকা।

১৮। গন্ধযুক্তি—টীকাকার ইহার সহক্ষে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। এই কলাটির বিস্তৃত বিবরণ গন্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়, আব ইহার প্রয়োজনও সকলেব নিকট সুবিদিত। ২২

গন্ধ—গন্ধদ্রব্য, চন্দন-অশ্রু ইত্যাদি। গন্ধযুক্তি—গন্ধ-যোজন—নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য-নির্মাণের কৌশল। এসেন্স, গন্ধতৈল, যো, ক্রিম, কস্মেটিক ইত্যাদি একরূপে বা রূপান্তরে চিরদিনই বর্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে।

করিয়াছেন! কিন্তু ‘নেপথ্য’ অর্থে কেবল বঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় বেশভূষা নহে। নেপথ্য—বেশ (ভূষা)। উহা অতি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। বঙ্গমঞ্চের বেশ-নির্মাণ, নেপথ্য-প্রয়োগেব একদেশ, অঙ্গভূত মাত্র।

১৮ “দন্তশঙ্খাদিভিঃ কর্ণপত্রবিশেষা নেপথ্যার্থাঃ”—জয়ম।

১৯ কাঃ স্তঃ, বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫।

২০ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৬

২১ কঙ্কিপূরণ, পৃঃ ২৪

২২ “বশান্ত্রবিহিতপ্রকা প্রতীত-প্রয়োজনা”---জয়ম।

৩তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, “পাকাচুলের ‘কলপ’ স্তগন্ধ দ্রব্য নির্মাণ ইত্যাদি গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। বৃহৎ-সংহিতা ৭৭ অঃ গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তাহাব মর্মার্থ এই যে, একলক্ষ চূয়ন্তর হাজার সাতশত কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী এই গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। ইহা কল্পনা নহে,—বৃহৎসংহিতা দেখ, কোন গন্ধেব কত ভাগ মিলাইয়া এই গন্ধ-সমুদ্রের স্রষ্টি তাহার পরিষ্কার হিসাব পাইবে। এই প্রকাণ্ড বিলাসের ক্ষেত্রে আমাদের পরাধীনতার বীজ নিহিত হয়” ২৩

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চুলে কলপ লাগাইবার কৌশল, বা গন্ধদ্রব্য ওঙ্গ্রে অমুলেপনের কৌশল, অষ্টম কলা দর্শনবসনাসঙ্গরাগের মধ্যে পড়িবে। কিন্তু কলপ বা গন্ধদ্রব্য নির্মাণেব কৌশল আলোচ্য কলার অন্তর্গত।

৩বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে, “নানাপ্রকার স্তগন্ধ প্রস্তুত করণ” ২৪

৩সমাজপতি মহাশয়ের মতে, “গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতেব প্রণালী” ২৫

৩কুমুদচন্দ্র সিংহেব মতে—“যথাসাধু নানাবিধ গন্ধদ্রব্য করণ” ২৬

১৯। ভূষণযোজন—যশোধব বলিয়াছেন,—“ইহা অলঙ্কার-যোগ। অলঙ্কার-যোগ দ্বিবিধ—(১) সংযোজ্য ও (২) অসংযোজ্য। সংযোজ্য—কঙ্কিকা, ইন্দ্রচ্ছন্দ ইত্যাদি—যাহা মণি-মুক্তা-প্রবালাদি-যোগে যোজিত হয়। আব অসংযোজ্য—কটক-কুণ্ডলাদির রচনাই যোজন। এই দুই প্রকাষে ভূষণ-নির্মাণের কৌশলই নেপথ্য-বিদ্যার অঙ্গ। শরীরে ভূষণ-যোজন এই কলার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। কাষণ, ‘নেপথ্য-প্রয়োগ’ নামক কলাটির দ্বাৰাই উহার সিদ্ধি হইতে পাবিত” ২৭

মুগ্যতঃ অলঙ্কার দুইশ্রেণীর—(১) একপ্রকার যাহা সূত্রে বা তারে গাথা যায়, যথা মণি-মুক্তা-প্রবালাদির মালা, কণ্ঠহার (কঙ্কিকা) বা কালেব চন্দ্রহার (ইন্দ্রচ্ছন্দ) ইত্যাদি। কিছু কিছু জড়োয়া গহনাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। আর একপ্রকাষ, যাহা গাথিয়া নির্মাণ করা যায় না, কিন্তু সোনা-রূপা ইত্যাদি ধাতু গালাইয়া নির্মাণ করিতে হয়, যথা—তাগা, বাজু (কটক), কুণ্ডল ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীব অলঙ্কারের যোজন অর্থ—সূত্রে বা তারে যোগ বা গ্রথন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীব অলঙ্কারের পক্ষে যোজন অর্থ নির্মাণ। মোটের উপর, এস্থলে এই দুই শ্রেণীর অলঙ্কার নির্মাণের সাধাবণ নামট ‘যোজন’। যোজন অর্থে—শরীরে

২১ কাঃ স্তঃ, বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫

২৪ শিঃ পুঃ, পৃঃ ৬

২৫ কঙ্কিপূরণ, পৃঃ ২৪

২৬ কৌমুদী, পৃঃ ২৯

২৭ “অলঙ্কারযোগঃ স দ্বিবিধঃ। সংযোজ্যঃ সংযোজ্যতঃ তত্র সংযোজ্যস্ত কঙ্কিকেন্দ্রচ্ছন্দাদেমণিমুক্তাপ্রবালাদিভিঃ যোজনম্। অসংযোজ্যস্ত কটককুণ্ডলাদেঃ বিরচনং যোজনম্। তদুভয়ং নেপথ্যম্; নতু শরীরে ভূষণযোজনম্। তস্ত নেপথ্যপ্রয়োগ ইত্যনেনৈব সিদ্ধব্যাং”—জয়ম।

অলঙ্কারের যোগ নহে—কারণ, তাহা ‘নেপথ্য-প্রয়োগ’ কলার অন্তর্গত—ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।

৩তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“মুক্তাবলী প্রভৃতি বন্ধনযুক্ত অলঙ্কারে মণিযোজনা, বলয়, মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার নির্মাণ ও তাহার বিজ্ঞাস”।

৬বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“অলঙ্কার নির্মাণ ও তাহার গ্রন্থনাদি। নির্মাণকাব্যটি এক্ষণে শ্যাক্তার হস্তে এবং গ্রন্থন-কাব্যটি পাটওয়ারদিগের হস্তে আছে”।

৭সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“অলঙ্কার-নির্মাণ-পদ্ধতি”।

৮কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—“অলঙ্কার প্রস্তুত করণ এবং তাহার প্রয়োগ। যশোধর ইহা দ্বিবিধ বলিয়াছেন, যথা—(১) সংযোজ্য—মণি-মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠহার, চন্দ্রহারাদি প্রস্তুত করা (জড়াও কাজ) এবং (২) অসংযোজ্য—অর্থাৎ কেবলমাত্র স্বর্ণ দ্বারা কটক-বলয়াদি প্রস্তুত করা”।

২০। ঐন্দ্রজাল—টীকাকারের মতে—“ইন্দ্রজালাদিশাস্ত্র-কথিত যোগসমূহ। সৈন্ত-দেবালয়াদি-দর্শন-হেতু আপনাকে বশীভূত বোধ করা”। ৩২

‘ঐন্দ্রজাল’ বলিতে বুঝায় ‘ভানুমতী’র খেল বা ‘ভোজবাজি’। ইন্দ্রজাল প্রভৃতি তত্ত্বে ইহা বর্ণনা আছে বলিয়াই ইহার নাম ঐন্দ্রজাল। মন্ত্র-তন্ত্রাদির সাহায্যে লোককে বোকা বানাওয়া শূন্তে বুদ্ধি নানারূপ অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার দেখানই ইহার কাজ। আজকাল হিপটিজম, মেস্‌মেরিজম ইত্যাদি সম্মোহন বা বাত্বিদ্ধার প্রভাবে বহুলোককে একসঙ্গে বশীভূত করিয়া যে সকল বাত্ব দেখান হয়—সেগুলিকে ইন্দ্রজাল বা ঐন্দ্রজাল বলা যায়। কেহ কেহ বিশ্লেষণপ্রকার মায়া দেখাইবার কথা বলিয়াছেন।

মায়াবি-কর্তৃক মায়া-প্রদর্শন ভাবতের একটি অতি পুরাতন ক্রীড়া। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ‘পরমেশ্বর মায়া-দ্বারাবল্লভপতা প্রাপ্ত হন’, ‘মায়ী এই বিশ্ব ইহা হইতে সৃষ্টি করেন ও অপব তাহাতে মায়া-দ্বারা সন্নিবদ্ধ’ ও ‘মায়া—প্রকৃতি, মায়ী—পরমেশ্বর’ ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, স্বপ্ন মায়া-মাত্র। গোড়পাদ-কারিকায় বলা হইয়াছে, সৃষ্টি স্বপ্ন-মায়া-তুল্যা। ৩৩

৩২ “ইন্দ্রজালাদিশাস্ত্রপ্রভবা যোগাঃ। সৈন্তদেবালয়াদি-দর্শনান্ধারাবিশ্রামপনার্থঃ”—জয়মঃ। “সৈন্ত ও দেবালয়াদি দেখাইয়া অহমুখ (বোকা) করিয়া ও বিশ্বয় উৎপাদন করিয়া দেওয়াই উহার প্রয়োজন”—৬মহেশচন্দ্র পালের অনুবাদ। অহমুখ বা বিশ্বাস-অর্থে আহামুখ করা—এ অর্থ কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। আমাদের বোধ হয় টীকাকারের অভিপ্রায়—যাহাতে অহমুখবোধ বিলোপ হয় এরূপ বিশ্বয়ের উদ্দেশ্য—বিশ্বয়ে আমি-জ্ঞান পথান্ত হারাইয়া ফেলা।

৩৩ “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ ঈয়তে”।

“অমায়ারী সৃজতে বিশ্বমেতত্ত্বাংশচাণ্ডো মায়য়া সন্নিবদ্ধঃ।” (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০)

“মায়াস্ত প্রকৃতিং বিভ্রামায়িনস্ত মহেশ্বরম্” (শ্বেত, ৪।১০)

“মায়ামাত্রস্ত” (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩)

আচার্য্য শঙ্কর জগতের মিথ্যাই প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বহুস্থলে মায়া-মায়াবি-দৃষ্টান্তের উপলব্ধি করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রজ্জু-মায়াবি (Famous Indian Rope Trick) বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন।

কোন এক মায়াবী আকাশে সূত্র নিক্ষেপ করিয়া তদবল্বনে আয়ত-হস্তে শূন্তে উঠিল ও চক্ষুর অগোচরে গমন করিল। পরে অদৃশ্য থাকিয়া যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইল ও অনন্তর পূর্ববৎ অখণ্ড শরীবেই পুনরুত্থিত হইল ইত্যাদি।

পুনশ্চ—যে সূত্র আকাশে নিক্ষেপ হয় ও তাহাতে যে উঠে—এতদুভয়-ব্যতিরিক্ত পরমার্থ-মায়াবী যে সে ভূমিতেই মায়াহীন হইয়া অদৃশ্য অবস্থায় বর্তমান থাকে ইত্যাদি। ১৩৪

শ্রুতিব কথা—ইন্দ্রই মায়াবী; এই ইন্দ্র কে? শ্রুতির উত্তর তিনিই পরমেশ্বর। আর প্রকৃতি তাঁহার মায়া।

‘ইন্দ্রজাল শব্দের মুখ্য অর্থ—ইন্দ্রের (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) জাল অর্থাৎ—মায়াজাল-সদৃশ—এই প্রবন্ধ। ৩৫

এ বিশ্ব-প্রপঞ্চ পরমেশ্বর-কর্তৃক অধিষ্ঠিত মায়ারূপা প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন—অতএব মায়াময় ইহাই ইন্দ্রজাল-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মায়াময় প্রপঞ্চের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যত কিছু ভেল্কি বা ভোজবাজি তাহাদিগকেও গোঁণভাবে ‘ইন্দ্রজাল’ আখ্যা দেওয়া অমৌক্তিক হইতে পারে না।

মায়া বা ইন্দ্রজালের অপব নাম শাশ্বরী। ৩৬ শব্দের নামে অনুর এইরূপ ভোজবাজি বা ভেল্কি দেখাইয়া, সুরাস্বর-নরের অগ্রহা হইয়াছিলেন। মায়াবলে তিনি অদৃশ্য থাকিতে পারিতেন। পরিশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কল্পিণী-গর্ভজাত তনয় প্রহ্লাদকে শৈশবে মায়াবল্বনে অপহরণ করিলে উক্ত প্রহ্লাদের হস্তেই শব্দের মৃত্যু হয়। ইহাই পৌরাণিক কথা। এই জাতীয় শাশ্বরী মায়াকে দৈত্যমায়া বা আগ্রবী মায়া (Black Art) বলা হয়।

মহাকবি কালিদাস ‘মিথ্যা’ অর্থ বুঝাইতে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে ‘মায়া’-পদের প্রয়োগ করিতেছেন।

“স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিবরৈক্যকল্পিতা (গোড়পাদকারিকা ১।৭) [৩৪ “ন হি মায়াবিনঃ সূত্রমাকাশে নিক্ষিপ্য তেন সাযুধ-মারুহ) চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশঙ্খিঃ পতিতঃ পুনরুত্থিতঃ তৎকৃত-মাদ্যাদিসত্ত্বচিন্তামাদ্যাদবো ভবতি। সূত্র-তদাকৃষ্টাত্যামন্তঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোহ-দৃশ্যমান এব স্থিতঃ”।—শাঙ্করভাষ্য গোড়পাদকারিকা ১।৭।

৩৫ ইদি (পরমেশ্বরে) রন = ইন্দ্র—পরমেশ্বর। পরমেশ্বর নিজ মায়া বা প্রকৃতি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব বিশ্বের পারমার্থিক সত্তা নাই উহা মায়িক—ইন্দ্রের জাল (মায়া) মাত্র। এই বিশ্ব যেমন পরমার্থ সং নহে, তেমনি ভেল্কিতে প্রদর্শিত বস্তু (যথা—সূত্রাবল্বনে শূন্তে উত্থানাদি) ব্যাবহারিক জগতের বস্তুর মত সং নহে—পরন্তু প্রাতিভাসিক। এই কারণে মুখ্য ইন্দ্রজাল-স্বরূপ এই বিশ্বের তুল্য বলিয়া ভেল্কিকেও গোঁণভাবে ইন্দ্রজাল বলা হইয়া থাকে।

৩৬ “মায়া তু শাশ্বরী—অমরকোষ

ইন্দ্রজাল প্রয়োগের স্রবিত্ত ও বিষয়কর বিবরণ দৃষ্ট হয়—
 ত্রিহরর রত্নাবলী-নাটিকায় চতুর্থাঙ্কে দৃষ্ট হয় যে এক ঐন্দ্রজালিক
 বৎসরাজ উদয়ন ও তদীয় মহিষী বাসবদত্তা ও সভাসদবর্গের সম্মুখে
 ময়ূরপুচ্ছ ভাসিত করিয়া দেখাইতেছেন—ঐ দেখ পদ্মাসনে ব্রহ্মা,
 ঐ ইন্দ্রশেখর শঙ্কর, ঐ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, ঐ ঐবাবত
 পৃষ্ঠে দেবরাজ ইত্যাদি। ইহার পরেই রাজাস্তঃপুরে যে অগ্নি
 লাগিল তাহাও ঐ ঐন্দ্রজালিকের ভেলকি—যথার্থ অগ্নি নহে। ৩৭
 ‘ঐন্দ্রজাল’ শব্দটি ‘ইন্দ্রজাল’ শব্দ হইতেই নিম্পন্ন। অর্থ
 একই।

৩৮ তর্করত্ন মহাশয়ের মতে “ইন্দ্রজাল বিজ্ঞান প্রভাবে বিবিধ
 প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন”

৩৯ বেদান্তবাগীশ—“ভোজবাজী”।

৪০ সমাজপতি—৩৯ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুগামী।

৪১ কুমুদচন্দ্র সিংহ—“ইচ্ছা প্রসিদ্ধ (magic)” ৩৮।

২১ কৌচুমার যোগ—যশোধর বলিয়াছেন—“এইগুলি—
 স্তম্ভগন্ধরগাদি কুচুমার-কথিত, উপায়ান্তর-দ্বারা যাগ সিদ্ধ হয় না,
 তাহার সাধনোপযোগী ব্যাপার” ৩৯।

কুরূপা বা কুংসিতকে সুরূপা বা সুন্দরী কবিতা দেখান, আবাব
 সুরূপাকে কপহীনা করিয়া দেওয়া, বার্কিক্য-জবাকে জয় করা,
 বিরক্তকে অনুবক্ত করা সৌভাগ্য বর্দ্ধন ইত্যাদি যে সকল বিষয়
 অজ্ঞ কোন উপায়েব অসাধ্য—তাঁহা সাধনের মূল উপায় কুচুমার

৩৭ “স্বপ্নো হু মায়া হু”—শাকু (৬৯)

“এষ ব্রহ্মা সর্বোজ্ঞে” ইত্যাদি বহুবলী (৪১১১)

রত্নাবলীৰ এই চতুর্থ অঙ্কটি ইন্দ্রজালেব মতিমায় পবিপূর্ণ।
 সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে ইন্দ্রজালের একপ বিষয়কর বর্ণনা আব
 কোথাও দৃষ্ট হয় না।

৩৮ কাঃ স্তঃ বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫। শিঃ পৃঃ ৬। কঙ্কিপূরণ পৃঃ
 ২৪ কৌমুদী পৃঃ ২৯

৩৯ “কুচুমারশ্রেণিতে স্তম্ভগন্ধরগাদয় উপায়ান্তরাসিদ্ধসাধনার্থাঃ”
 জয় মং। “কুরূপাকে সুরূপা করিয়া দেখান, সুরূপাকে অকুরূপা
 করিয়া দেখান, বিরক্তকে অনুবক্ত করা ইত্যাদি। যাগ অজ্ঞ

(বা কুচুমার)-নামক কামশাস্ত্রের এক অতি প্রাচীন আচার্য্য-
 কথিত এই সকল গোপনীয় যোগ।

কুচুমার কামশাস্ত্রের একদেশী আচার্য্য তিনি কেবল ঔপনিষদক
 অধিকরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। ঔপনিষদক অধিকরণে নানা
 প্রকার ঔষধ করণের উপদেশ আছে।

৩৮ তর্করত্ন মহাশয়ের মতে “কুচুমার-কথিত স্তম্ভগন্ধরগাদি যোগ
 সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিব উপায়-প্রয়োগ” ৪০।

৩৯ বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র-
 সঙ্গত নহে—“নানাপ্রকার লিপিক্রিয়াকে কৌচুমার যোগ বলে।
 ইতব ভাষায় যাহাকে জাল বলে, পূর্বে তাহাই কৌচুমার শব্দে
 অভিহিত হইত। এটি বড় অসাধু জীবিকা। ইহাকে তন্ত্র-জীবিকা
 বলিলেও বলা যায়” ৪১

৪০ সমাজপতি মহাশয় অজ্ঞভাবে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের
 অনুসরণ করিয়াছেন—“জাল করিবার উপায় শিক্ষা” ৪২

৪১ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় ৩৯ মহেশচন্দ্র পালের অনুসরণে বলিয়া-
 ছেন—কুচুমার একজন কামশাস্ত্রবেত্তা পাণ্ডিত। ইহার উপদেশা-
 নুসারে কুরূপাকে সুরূপা করিয়া এবং সুরূপাকে কুরূপা করিয়া
 দেখান এবং অনুবক্তকে বিবক্ত ও বিরক্তকে অনুবক্ত করা যায়” ৪৩।

[ক্রমশঃ

উপায়েব অসাধ্য, তাহার সাধনই ইহার প্রয়োজন। ইচ্ছা ঔপ-
 নিষদিক প্রকরণে বক্তব্য। (অসাধ্য সাধনার্থ তিলককরণাদি)
 —৩৯ মহেশচন্দ্র পালের অনুবাদ।

৪০ কাঃ স্তঃ বঙ্গবাসী, পৃঃ ৬৫।

৪১ শিঃ পৃঃ, পৃঃ ৭। স্পষ্টই বুঝা যায় যে ৩৯ বেদান্তবাগীশ
 মহাশয় যশোধর টাক। না দেখিয়া সম্পূর্ণ আন্ধাভেই এই বিবরণটি
 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুচুমারের যথার্থ পরিচয় না জানা থাকায়
 তিনি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

৪২ কঙ্কিপূরণ, পৃঃ ২৪

৪৩ কৌমুদী, পৃঃ ২৯

দুর্গতি মাঝে এস মা দুর্গে

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

প্রলয়ঙ্করী তিমির রাত্রি নেমেছে ধরণী তলে,
 বিষ ব্যাপিয়া সৃষ্টিবিনাশী প্রলয়বহ্নি জ্বলে।

এবার সবার মরণোৎসব,

অর্ন্তকণ্ঠে ওঠে কলরব ;


আজি এ-শাস্তানে বোধনের দিনে জাগো মাতা দশভূজা,
 শব-সাধনার তুবিব তোমার সঁপিয়া ব্যথার পূজা।

হস্তে তোমার বরাভয় ল'য়ে এস মাগো অধিকা,
 দুর্গত তব ভক্তের ভালে এঁকে দাও জয়টিকা।

মঙ্গলকর-পরশে তোমার

ঘুঁচাও অশিব অন্তঃসবার ;—

মহামারী আর অন্নভাবের অন্তরে করিয়া জয়
 দুর্গতি মাঝে এস মা দুর্গে নাশিতে দৈন্তভয়।



পাড়ামিনির

সাঁও

শ্রীমেনবাবা ঘোষজায়া—

“টুক টুক টুক—টুক টুক টুক”

দুয়ারে ভঙ্গ-দস্তব মুহু মুহু টোকাব শব্দ হোল। আফ্রিক শেষ করে নতুন দিদিমা আসনে বসেই লণ্ঠনের আলোয় কি একটা বই পড়ছিলেন। শব্দ শুনে পিছনের দুয়ারেব দিকে চেয়ে বললেন, “কে?”

আস্তে আস্তে দুয়ার ফাঁক করে একটি কিশোর মুখ দেখা দিল। চোখ কঁচকে সলজ্জ ভাঙে কিশোর বললে, “আসতে পাবি?”

বই বন্ধ কবে নতুন দিদিমা স্নেহময়-কণ্ঠে সাগতে বললেন, “সন্ত? আসে তুমি? এস এস—”

মস্ত বাড়ী। খুড়ি, জ্যাঠাই, ভাস্কর-পো, ভাস্কর-কি, দেব-পুত্র, দেবকল্যা, জায়েদের নাতি নাতিনী, সব নিয়ে নতুন দিদিমার বহু পবিত্র। নিজেব পূজাপাঠ, ছানচড়া ও বালা বালাব সময়টুকু বাদ দিয়ে, বাকী সময়টুকু ঐ ছোটদের সঙ্গে গল্প শুজব, ঝগড়া তর্ক, আড়িভাব নিসেই কাব কাটে। তবু ছোটব নালাশ কবে, তারা নাকি ইচ্ছামত ভাবে নতুন দিদিমাব সঙ্গে গল্প-কবাব সন্মোগ পায় না। কাজেই অবকাশ পেলেই নতুন দিদিমা ছোটদের হাতে আত্ম-সমপাণের জগা প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

নাতি সন্ত ঘবে ঢুকল। সলজ্জমুখে অনুযোগেব স্ববে বললে, “বাবাঃ, বিকেল থেকে তিনবাব এসে ফিবে গেছি। একবাব চোখ বুজে আঙুল গুণছিলেন, আব ছুঁবাব ঠুঁও কবছিলেন!”

অর্থাৎ—নাতি প্রবরের ভাগ্যমানে স্বাগত সম্ভাষণেব বিষয় উৎপাদক সাক্ষাফিক! লজ্জিত হয়ে দিদিমা বললেন, “অপরাধ স্বীকার কবছি! তিনবাব এসেছিলে? কই পায়ব শব্দ তো পাউনি।”

বিজয়ী বীরের মত উৎফুল্ল মুখে নাতি বললে, “ভঁ হঁ বুঝুন, কেমন নিঃশব্দে আসি যাই! টের পান নি ত?”

যেন টের না পাওয়ায় দিদিমার একটা মস্ত যুদ্ধে হার হয়ে গেছে।

দিদিমা স্নেহে হেসে বললেন, “অশ্রমনক হয়ে থাকলে আমার কান বিধাসঘাতকতা করে ভাই। থাক, এখন খবর কি বল? এগজামিন মাথায় মাথায়, পড়াশুনা বেশ মন দিয়ে করছ ত?”

“নিশ্চয়। আজ সাবা ছুঁপূর পড়েছি। বিকেলে বেড়িয়ে এসে সাবা সন্ধ্যা পড়েছি। এবার একটু গল্প করতে এলুম। কি পড়ছেন?”

পাঠ্য পুস্তকে উগ্র উত্তেজনার উপকরণ যথেষ্ট ছিল। সে জগৎ আফ্রিক শেষ করে সে আসন ত্যাগ কবাব জন্ম সয়নি, সেখানে বসেই নতুন দিদিমা উগ্র কৌতুহলে বই খুলেছিলেন। নাতির প্রশ্নে উৎসাহেব সঙ্গে বললেন—“বিলিহী ভূতের গল্প! উঃ সন্ত, এবা সব কি ভয়ানক জ্যাস্তো জ্যাস্তো ভূত! আমাদের দিশি লোকেবা মবে আবার জন্মগ্রহণ কবাবাব সন্মোগ পায়,—যে তাদেব অনিষ্ট কবেছে, তাবই ছেলে হয়ে জন্মায়, মেয়ে হয়ে জন্মায়। তাবপর বাপ-মায়ের শাবীরিক, আখিক দণ্ড করিয়ে বোগে ভুগে ভুগে অকালে মবে গিয়ে, বাপ-মাকে শোকে ভাসিয়ে প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু বিলিহী প্রেততত্ত্বের আইনে ছুঁবাব জন্মাবাব সন্মোগ নাই। তাই প্রেতাচ্ছা হয়ে সাংঘাতিকভাবে অনিষ্টকারী প্রতিহিংসা সাধন করে। কি নৃশংস সে প্রতিহিংসা! এগজামিন শেষ হলে বইটা পোডো।—”

সন্ত বইটা উল্টে পাল্টে দেখে বললে—“Ghost Stories?”

আচ্ছা পডব। কিন্তু এদিকের খবর শুনেছেন?”

সব দিকের সব খবর বাহির থেকে সংগ্রহ কবে এনে নতুন দিদিমার কাছে রিপোর্ট করায় এবং সেগুলো নিয়ে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতে গবেষণা করায় এদের একটা আশ্রম আছে। নতুন দিদিমাবও অবশ্য দৌরল্যেব অন্ত নাই, এমন কি বড় জায়েদের কাছে বকুনি খেয়েও তাঁর চৈতন্য হোত না যে—ছোটদের “ছোট” মনে রেখেই চলা উচিত। ছোটদের তিনি অবজ্ঞা করা দূরে থাক, বরঞ্চ স্নেহেব শ্রদ্ধা কবতেন। এমন কি তাদের যুক্তি-বিচারসহ কথা শুনে খুব ভক্তিভরে তাদের শিখ্যাত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতেন।

সুতরাং এদিকের খবরের সংবাদে সসম্মত চাবদিক নিরীক্ষণ কবে বললেন, “কোন্ দিকের?”

ব্যগ্র উত্তেজনায় সন্ত বললে, “কাল রাতে ফের ডাকাতি হয়ে গেছে পাশের বেলগায়ে। বাড়ীর লোকদের তারা মেয়ে কেটে

জখম করে বহু টাকার গহনা-পত্র লুটে নিয়ে গেছে। এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে গেছিল। ডাক্তার এতক্ষণে সেসব সেলাই-দোঁড়াই কবে ফিরে এল। বললে, “ভজন পুরুষ মানুষ অব একজন মেয়ে মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে গেছে।”



• ছাদে কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে, তারই আঁচল ওটা।
এতেই ভয় পেলে ?

একে সর্বনাশ! জার্মান-যুদ্ধ—(জাপান তখনও নীলব) তাব উপর সে বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৭ সালে এ অঞ্চলে ধান বা অন্না ফসল রুটির অভাবে ভালরূপ হয় নাই। খাদ্যাভাবে চৈত্র মাস থেকেই চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। ক্রমে আশপাশের পল্লী অঞ্চলে প্রথমে চুরী তারপর ঘন ঘন ডাকাতি শুরু হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতদল গভীর রাত্রে হানা দিয়ে গৃহস্থদের ধন-প্রাণ লুণ্ঠন করছে। গ্রামে গ্রামে আতঙ্ক-উদ্বেগে সকলে সশঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

হাটে বাজারে অন্ধরে বাড়িরে সর্বত্র চলছে চুরি-ডাকাতিব সংবাদে অন্দোলন। স্কুলের ছেলেরা ভজুক নিয়ে মাতামাতি করছে সব চেয়ে নির্ভাবনায় এবং সব চেয়ে প্রবল উত্তেজনে।

সন্ত স্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিক দিতে প্রস্তুত। বিউদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণে এবং রাস্তায় বেপরোয়া ভাবে সাইকেল চালিয়ে নিরীহ পথিকদের আহত করতে তার সমকক্ষ স্তম্ভকে উড়ান। কিন্তু চোর ডাকাত এবং স্ত্রীতব নামে তার স্নায়ুগুলী হুর্দল হয়ে পড়ে। অতএব নিজের অন্তরাষ্টাগত প্রবল দস্যভীতি ব্যাবিটা দিদিমায়ে-দের ঘাড়ে চাপিয়ে কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করার চেষ্টায় বেচারী মহা-উৎসাহে দিদিমায়েদের মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব দিদিমাকে শোনানো হয়েছে, এবার নতুন দিদিমার পালা।

ডাকাতির সংবাদের চেয়েও বিলাতী-ভূতের জমকালো কৃতিত্ব-

গৌরব তখন নতুন দিদিমার মগজ অধিকার করে রয়েছে। তবু দুঃসংবাদে হুস্ফিষ্টা প্রকাশের চেষ্টায় বললেন, “এতগুলো চুরি-ডাকাতি নিরীহে হোল, পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। চৌকিদারগুলোই বা করছে কি ?”

“চৌকিদার ?”—চোখ কুঁচকে বিজ্ঞপের হাসি হেসে সন্ত বললে, “চোর ডাকাতরা এসে উৎপাত করলে তাদের দেখা পাওয়া যায় না! চোরেরা চলে গেলে তারা সেজে গুজে লাঠি লঠন নিয়ে অলস মন্থর গমনে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়—তারা আসবে কি করে? তাদের হাত বোঁড়া ছিল—তারা ‘পগুগ’ বাঁধছিল। ভাগ্যে আমাদের গ্রামে ডিফেন্স পাটি তৈরী হয়েছে, তাই চোব-ডাকাতরা এত চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না। শুনেছেন ত? প্রতিবাত্রেই ডিফেন্স পাটির লোকেরা আদাড়ে পাদাড়ে গুপ্তভাবে অনেক রকম লোককে চলা ফেরা করতে দেখেছে। তাড়া পেলেই তারা ছুটে পালায়।”

কথাটা শোনা গেছে বটে। রাত্রে প্রহরা দেবার সময় পুকুরের ওপাড় থেকে, বন-বাদাড়ের নিরাপদ অন্তরাণ থেকে, দেববাণীর মত অদৃশ্য-মানুষের কণ্ঠস্বরে উক্ত রক্ষীদলকে শাসিয়ে বলা হচ্ছে, “দেব একদিন কেটে কুচিয়ে—” ইত্যাদি। তবু রক্ষীদল হটে নি। গমন উৎসাহে প্রহরা কার্যে রত আছে।

নতুন দিদিমা বাগ কবে বললেন, “গভর্ণমেণ্টের উচিত চৌকিদার, পুলিশ সবাইকার মাইনে কেটে নিয়ে ডিফেন্স পাটিকে দেওয়া। ওবা যখন কর্তব্য পালন করতে পাববে না, তখন মাইনে নেবে কোন্ অধিকারে?”

ঠাৎ গুমট ভেঙ্গে ভ ভ শব্দে এক বলক দম্কা বাতাস দক্ষিণের গোলা জানালা দিয়ে ঘুরে ঢুকলো। সন্ত জানালার পাশে খাটে বসেছিল। জানালার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ কবে ঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বললে, “ওকি? ওকি?”

তৎক্ষণাৎ জলন্ত লণ্ঠনটা নতুন দিদিমা জানালার কাছে তুলে ধরলেন। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল জানালার উর্দাংশে, ছাদের আলিসা থেকে বিলম্বিত একটা কাপড়ের আঁচল হাওয়ার ধাক্কায় ঝটপট করছে। আর কোথাও কিছু নাই।

সন্ত চোখ কপালে তুলে সেই দৌহুলামান অঞ্চলপ্রাপ্ত নিবীক্ষণ করছে।

ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না। ভয় জিনিষটাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়। ভৎসনার সুরে নতুন দিদিমা বললেন, “ছাদে কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে, তারই আঁচল ওটা। এতেই ভয় পেলে?”

লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে সন্ত বললে, “তাই ভাল! আমাঙ্ক ভয় হয়েছিল, চোর না ভূত।”

তারপর প্রসঙ্গ পাণ্টাবার জন্ম ঢোক গিলে কৌতুহলভরে বললে, “আচ্ছা, বনবাদাড়ের কাছে এঘরে রাত্রে একা থাকতে আপনার ভয় করে না? ধরুন—‘সাপোজ’ যদি এই দিক দিয়ে ডাকাত এসে আপনার জানালায় উঁকি দেয়?”

নির্বিকার মুখে গভীর অবজ্ঞাভরে নতুন দিদিমা বললেন,

“তা হলে জানব সে ডাকাতটি সম্ভাব্য ছাড়া আর কেউ নয়। তুমি ছাড়া আর কে এই অথোত্তে পথে বসিকতা করতে আসবে?”

জানালার বাহিরে অন্ধকারের দিকে সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিক্ষেপ করে সন্ত বললে, “আমি? না, না—আমি নয়। কিন্তু সখি বলুন তো এ ঘবে একা থাকতে আপনার ভয় করে না, একটুও না?”

স্মিতহাস্তে নতুন দিদিমা বললেন, “তোমার ভয় দেখাবার মতলব হয়েছে, নয়? কিন্তু না ভাই ওটা কোর না। জানো ত আমি ব্লাড প্রেসারের আসামী। দৈবাৎ ঈদ্রর ছুটাছুটির শব্দে তন্ত্রা ভেঙে গেলে ধাঁ করে মাথার রক্ত চড়ে যায়। তাবপব সারা রাত আর কার সাধ্য আমায় ঘুম পাড়ায়? হাটের প্যালপিটেশন বেড়ে যায়! তখন সব ছেড়েছুড়ে নিয়ম পালন, ঔষধ সেবন, চূপচাপ শয়ন ইত্যাদি বহু ছরকট ভোগ করতে হয়।”

তার কথা বলবাব সঙ্করুণ ভঙ্গি দেখে সন্ত সকৌতুকে হেসে উঠল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে খাবার জগা ডাক এল। কাজেই গল্প স্থগিত রেখে উঠে যেতে হোল। যাওয়ার সময় নতুন দিদিমা পুনশ্চ বললেন, “জাখো, পাশের ঘবে এখন মেজ ঠাকুরঝি থাকেন, অতএব আমি কাউকে ডরাই না। ত্যাদ্ভামি কবতে যদি আস, ঠেকে ডেকে জাগিয়ে দেব। জানো ত উনি একাই একশো। দুইটু মি কব তো ধবে এমন ঠেড়িয়ে দেবেন যে টেব পাবে?”

“মেজ ঠাকুরঝি” দিদিমাকে সন্ত একটু ভয় করে চলে। কারণ তাঁব সঙ্গে প্রতিরন্দ্বিতা কবতে হলে বেশ একটু গায়েব জোব চাই। কিন্তু আসন্ন ম্যাট্রিকেব তাভায় এবং ম্যালেবিয়ায় ভুগে সন্ত এখন কিংব কাহিল।

খতমত খেয়ে সন্ত একবাব দাঁড়াল, তারপব একটু হেসে চলে গেল।

রাত দশটা।

বাড়ীর সব দুয়ারে খিল বন্ধ হয়েছে। বহু পবিবাবেব বাড়ী। বাহিবে যাবার দুয়ার উত্তব-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে সবুন্ধ সাতটি! পশ্চিমের দুয়ারের পাশেই মেজ ঠাকুরঝির ঘব। পশ্চিমের দুয়ার বন্ধ কবে জলযোগ সেবে পাশাপাশি ঘরে নতুন দিদিমা ও তাঁব মেজ ঠাকুরঝি শুয়েছেন।

কিন্তু বিলাতী ভূতব আকর্ষণীশক্তি প্রবল। ব্লাড প্রেসারের আসামীকে তাবা রেহাই দেয় না। প্রত্যেক ভূতটি মন্ত বৈজ্ঞানিক, মন্ত দার্শনিক। এই অশরীরী দল ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে এনে দস্তবমত ডাকটিকিট মেবে পোষ্টাকিস মাবকং শরীরী মানুষকে চিঠি পাঠায়—“খবরদার, রাত বারটার পর অমুক নিজ্জন রাস্তায় চলাফেরা করে সেখানকার অদৃশ্য অধিবাসীদের বিরক্ত কোর না।” ইত্যাদি ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! হয় ত সত্য, হয় ত মিথ্যা—তবু বর্ণনার বাহাহরীর কাছে আত্মঘাতী হতে কৌতুহল জাগে!

বিছানায় শুয়ে গীতা পাঠ কবতে কবতে নতুন দিদিমার স্বন্ধে পুনরায় বিলাতী ভূতব আবির্ভাব হোল। খুলেন ফের ghost-stories! তাবপব তন্ময় হয়ে চলল পঠন!

বাড়ী নিশুতি। হঠাৎ পাশের ঘবে মেজ ঠাকুরঝি হেকে উঠলেন, “কে ‘নাচের’ কপাট খুলছে রে? কে—?”

উক্ত ‘নাচের কপাট’ অর্থাৎ পশ্চিম দ্বার ঠিক মেজ ঠাকুরঝির ঘরের পাশে। সে কপাট খুলে বেব হলেই দু’দিকে দু’টো রাস্তা পাওয়া যায়। একটা গেছে সদরের দিকে, একটা খিড়কীর দিকে। খিড়কীর কপাট খুলে বেব হলে বন-বাদাড়; এবং পাঁচ হাতের মধ্যে নতুন দিদিমার সেই পূর্বোক্ত বাস্তারন।

হঠাৎ ঠাকুরঝির হাঁক শুনে নতুন দিদিমার চমক ভাঙল। পড়া বন্ধ করে কান খাড়া করলেন। শুনলেন উঠান থেকে চাপা গলায় অস্পষ্টভাবে কে কি বললে। উত্তবে মেজ ঠাকুরঝি আরো জোরে হেকে বললেন, “কে বে, কে? সাড়া দিস না কেন?”

সন্তব এক মামা অগ্ন ঘব থেকে উচ্চকণ্ঠে বললে, “সন্ত এদিক দিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। কপাট বন্ধ দেখে ফিরে গেল।”

আকস্মিক তপ্রাভঙ্গে বিরক্ত হয়ে মেজ ঠাকুরঝি বললেন, “সন্ত? তা সাড়া দিলে না কেন? কে, কে, কবছি—তবু সাড়া নাই। এত রাতে এদিক দিয়ে কোথা যাচ্ছিল?”

মামা জবাব দিলেন, “কি কবে জানব?”

“জিজ্ঞেস কর না—”



বাড়ী নিশুতি। হঠাৎ পাশের ঘবে মেজ ঠাকুরঝি হেকে উঠলেন, “কে ‘নাচের’ কপাট খুলছে রে? কে—”

“চলে গেছে।”

নতুন দিদিমা হুশিস্তা বোধ কবলেন। রাত ন’টার পব জেগে থাকা সম্ভব নিয়ম নয়। এখন দশটার পর তার এমন

গুপ্তভাবে গতিবিধির অর্থ? এত রাতে সে খিল খুলে কোথা যাচ্ছিল? খিড়কির দিকে? নতুন দিদিমার জানালার উদ্দেশে?

দিন ছপরে চুপি চুপি পিছন থেকে এসে হঠাৎ কানের কাছে “গাঁক” করে চৌচিয়ে উঠে নতুন দিদিমাকে চমকে দেওয়া, অজ্ঞানত্ব হয়ে ঘাটে নামবার সময় পাশের ঝোঁপ থেকে মাছধরা ছিপ বাড়িয়ে নতুন দিদিমার মাথার কাপড়ে বঁড়িশি বেঁধা—এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে বলে ওঠা—“আমি মাছ ধরতে এসেছি। যে মাছ হবে, সে আমার বঁড়িশিতে গেথে আপনা আপনি উঠে আসবে, এর জন্তে আমি দায়ী নই—” ইত্যাদি তুষ্ট রসিকতা সম্বন্ধ স্বভাবসঙ্গত। সে হেন সন্ত সন্ধ্যায় ইঙ্গিত করে এত বাত্রে যখন নিশুতি পুবার ছয়ারের খিল খুলতে গেছে এবং জববদস্ত মেজ দিদিমার—অর্থাৎ তার মায়ের পিসিমার সাড়াপেয়ে শশবাস্তে যখন চম্পট দিয়েছে, তখন তাব মন্তব্য স্পষ্টই বোকা যাচ্ছে। ভয় দেখাবার দুস্তরুতি ওর ঘাড়ে চড়েছে সন্দেহ নাই।



অমৃতপ্ত হয়ে নতুন দিদিমা বললেন, ‘ভুল করে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়েছি...’

এদিকের খিড়কির ছয়ার বন্ধ থাকলেও ওদিকেও আর একটা খিড়কির ছয়ার আছে। হয়ত ওদিক দিয়ে আবার সে আসবে।... আশঙ্ক, একটা পনের বছরের নাতিব বান্দামিকে বেশী খাতিব করা মুর্খতা! জাগরণে ভয় নাস্তি—খানিক ভেগে থেকে বই পড়া থাক।

নতুন দিদিমা ফের পড়ায় মন দিলেন। এগারটা—বারোটা—ক্রমে একটা বাজল। দূরে গ্রাম্য চৌকিদার দীর্ঘ বিলম্বিত সুরে হাঁক দিল—“হো—ও—ও—ও হো:!”

নাঃ, আর রাত জাগা ঠিক নয়। সকালে উঠতে হবে। কিন্তু চমৎকার কোঁড়হলোদীপক গল্প! নাম “Footstaps”

অর্থাৎ পদধ্বনি। জাতাজের এক নাবিক মরে ভূত হয়ে প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত উপরগুলার পিছু পিছু পদধ্বনি করে ঘুরছে। উপরওলা লোকটি এক সময় ইতর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্ত উক্ত নাবিকের কজাকে অসং পথে নিয়ে গেছিলেন। স্কাভে দিকারে উন্নত হয়ে নাবিকটা নৃশংশ অত্যাচার করে মেয়েকে হত্যা করে। কিন্তু উপরওলাকে তখন শাস্তি দেবার সুযোগ পায় নি। রুদ্ধ আক্রোশ মনের মধ্যে পুবে রেখে জাহাজ চালাচ্ছিল। হঠাৎ ধমুঙ্কার হয়ে নেপলসের কোন সূদূর হাসপাতালে মারা গেছে।

কিছুদিন পরে দেশে ফিরে সেই উপরওলা যুবক বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছেন,—এমন সময় পিছনে লেগেছে সেই ভূত! ভাবী বধূর সঙ্গে দেখা করে গভীর রাতে যুবক বাড়ী ফিরছেন, এমন সময় নির্জন পথে পিছনে পদধ্বনিত হ’তে লাগল “মুস্—মুস্—মুস্—”

প্লট জমাট হয়ে উঠেছে। এখন পড়া বন্ধ করে নিদ্রার চেষ্টা অনিদ্রাব জেদকে উল্কে দেওয়া মাত্র।—তারপব কি ঘটে, সেটা জানা চাই আগে।—

কিন্তু ও কি? জানালার বাইবে নির্জন খিড়কির দিকে ও কিসের শব্দ?

নতুন দিদিমাব কান সতর্ক হয়ে উঠল। ঐকান্তিক চেষ্টায় শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি বাইরের শব্দ অমুভব করবার জন্ত মনঃসংযোগ করলেন। হাঁ ঠিক,—ভুল হয় নি। এবড়োখেবড়ো মাটিব উপর দিয়ে, জুতা পায়ে থেমে থেমে,—অতি সন্তপণে কেউ জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। জুতার স্পষ্ট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—“মুস্—মুস্—মুস্।”

কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ছাড়া কেউ সে পথে আসে না। তাবা এলেও অত সন্তপণে আসবে না, জুতা পায়ে দিয়েও আসবে না। এ তাহলে—

কিন্তু ভূতের পদধ্বনি পড়তে পড়তে মাথা গরম হোল নাকি?

সজোবে মাথা কাঁকিয়ে, তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। অমুভব করলেন ব্রাহ্মণওলা উত্তোজিত হলে উঠেছে, ধমনীতে রক্তশ্রোত দ্রুত বইছে। কান গরম হয়ে উঠেছে। হৃৎপিণ্ড দশদে লাফাচ্ছে!

রুদ্ধশ্বাসে কান খাড়া করে শুনলেন—জুতার শব্দ থেমে থেমে অধিকতর নিকটবর্তী হচ্ছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে শোনা যাচ্ছে—“মুস্—মুস্—মুস্—”

নিঃসন্দেহে মাছুষ! এবং সে ব্যক্তি সন্ত ছাড়া আর কেউ নয়!

সবলে আভ্যন্তরিক চাকল্য দমন করে,—অকুতোভয়ে দৃঢ় আদেশবাজক স্বরে নতুন দিদিমা বললেন, “জাখো, সাবধান করে দিচ্ছি। ভয়-টয় দেখাবার চেষ্টা কোর না।”

মুহূর্ত্তে জুতার শব্দ স্তব্ধ। দু’ মিনিট পরে কে যেন অধিকতর সন্তপণে জুতা চেপে ফিগ্র পদে দূরে গেল। তারপর স্পষ্ট—হুড়-হুড় শব্দে ছুট!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দিদিমা লুপ্তন নিবিয়ে এবাব ঘুমাতো বাধ্য হলেন।

পরদিন দুপুরে, ওদিকের মহলের বারেন্দায় সন্ত চেয়ারে বসে, যুদ্ধের খবর নিয়ে প্রবল বিরুদ্ধে তার সেজ মাসিমার সঙ্গে তর্ক করছিল। নতুন দিদিমা বারেন্দায় ঢুকে বিনা বাক্যে কাছে গিয়ে উত্তমরূপে তার কর্ণ মর্দন করে ভৎসনার স্বরে বললেন, “কাল রাত দেড়টার সময় আমাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিলে।”

সন্ত ভাবাচাচাকা খেয়ে বললে, “আমি? আমি তো যাঁই নি।”

নতুন দিদিমা সন্ধ্যার ব্যাপার ও রাত দশটার ঘটনা-চক্রের যোগাযোগ বিবৃত কবে, পদার্থ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, “মেজ ঠাকুরঝির বকুনি খেয়ে তখন দে ছুট! তারপর রাত দেড়টার সময়, জুতো পায়ে সাবধানে, হাঁট-হাঁট, পা-পা করে ফের গেছিলে ত? আমি টের পেয়ে বললুম—জাখো সাবধান কবে দিচ্ছি।”

বাস্ অম্মি পা চেপে চেপে পিছু হটে গিয়ে, ভাবপর হুড়হুড় শব্দে ছুট! এখন ভালমানুষ সেজে আমি তো যাঁই নি।”

সন্তর সেজ মাসিমা হতভম্ব হয়ে সমস্ত শুনে সবিস্ময়ে বললে, “সন্ত বিকালে বেড়িয়ে ফেরবার সময় ভুল করে চায়ের দোকানে সাইকেল ফেলে এসেছিল। বাবার বকুনি শুনে ভেগে উঠে, রাত দশটার ঘুম-চোখে সেটা আনতে ছুটেছিল। পশ্চিমের দ্যাব বন্ধ দেখে ফিরে এসে এদিকের দ্যাব দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখুনি সাইকেল এনে ফের শুয়ে ঘুমায়। আর জাগে নি। তা ছাড়া বাবা বাড়ীতে আছেন, ও কোন সাহসে আপনাকে ভয় দেখাতে যাবে? না কাকিমা, আপনাব ভুল হয়েছে। বাক দেড়টার সময় সন্ত মোটে যায় নি।”

সেজ মাসিমার সত্যনিষ্ঠায় তাব কাকিমার অর্থাৎ সন্তর নতুন দিদিমার অগাধ শ্রদ্ধা। বিশ্বয়স্তুভিত সন্তর দিকে চেয়ে অধিকতর বিশ্বয়বিমূঢ় হয়ে বললেন, “ও রাত দেড়টায় ওখানে যায় নি? তাহলে কে গেছিল যে? আমি যে স্পষ্ট জুতোর শব্দ শুনেছি। হাঁ নিশ্চয় সে মানুষ! সত্যি সন্ত যায় নি? ঠিক ত?”

বিস্তর সন্তর ও অসন্তর—সন্তাবনার তর্কের পর অনিশ্চিত রূপে প্রমাণ হোল সন্ত রাত দেড়টায় মোটে ওদিকে যায় নি। তার সেজ মাসিমা সে সময় তাকে গাট নিদ্রামগ্ন দেখেছে।

বিপন্ন বিব্রত হয়ে নতুন দিদিমা নিজের ঘরে ফিবলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, ঘরের পিছনে যে স্থানে জুতাব শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেই স্থানটা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করত্রে লাগলেন।

না, ভুল নয়। ভুল নয়। চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ লতা গুণ্য মাড়িয়ে

মাড়িয়ে কে বা কারা ঘরের পিছন দিয়ে বহবার যাতায়াত করেছে বটে! ওই তো তাদের স্পষ্ট পায়ের দাগ! ওই তো দলিত তৃণগুন্মের উপর, এবং ধূলার উপর স্পষ্ট জুতাব দাগ!

তবে?—

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, গভীর রাতে পড়াশুনার মাঝে মাঝে হঠাৎ চমক ভেঙে থিড়কির দিকে নানা রকম মুহূ শব্দ তিনি কদিন থেকে শুনেছেন বটে। কুকুর বিড়াল যাতায়াত করছে ভেবে সেগুলো গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু এ পদচিহ্ন ত কুকুর বেড়ালের নয়। তারা তো জুতাও পরে না।

নতুন দিদিমা বিষ্ময়ে নির্বাক! চারিদিকে উঠল হৈ চৈ।

খবর পেয়ে ডিকেল পার্টির ছেলেরা ছুটে এসে জানালে, কাল রাত দুটার সময় পাহারা দিতে এসে তারা পাশের ঘাটে সিন্ধু কাদামাখা জুতাব দাগ দেখেছে। দাগগুলো বাইরের রাস্তা থেকে এসে পুকুরের গর্ভ দিয়ে এই দিকে এসেছে এবং ফের ফিৎ গেছে। কিছু পরে অল্প পথে পাহারা দিতে গিয়ে তারা এক ব্যক্তিকে জুতা পায়ে দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। রক্ষীদল তাড়া করায় সে এক পাটি জুতা ফেলে অন্তর্ধান করেছে। জুতাটা বাটার রবার সোলার।

পরীক্ষা করে দেখা গেল এ জুতাব দাগও সেই রবার সোলার। মাপও এক!

নতুন দিদিমা নত শিরে নিশ্চুপ!

সন্ত এসে বিজ্ঞভাবে ঘাড় মুখ নেড়ে বললে, “হঁ হঁ দেখুন! বোজ চোবেয়া স্বযোগ খোঁজবার জন্ত আনাগোনা করছে,— সাংঘাতিক তালকানা মানুষ আপনি। ভেগে থেকে শব্দ পেয়েও লক্ষ্য করেন নি! কাল সন্ধ্যায় গল্প করতে কবতে ভাগ্যে ওদিকে আপনাব মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তাইতো পদধ্বনিতে মোহিত হলেন। আষ হু চার দিন আসতে আসতেই তারা বাড়ীতে ঢুকে পড়ত, সব চুরি করে নিয়ে যেত। আমি করলুম উপকার—আর আমাকেই দিলেন চোবের মার!”

অমৃতপু হয়ে নতুন দিদিমা বললেন “ভুল করে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়েছি, এখন ভুল প্রমাণ হওয়ায় বিবেক আমাকে কি শাস্তি দিচ্ছে বোঝাতে পারব না। সিন্দিয়ারুলি বলছি সন্ত, আই বেগ ইওর পার্ডন!

বিজ্ঞরী বীবের মত হান্স্টাংফুল্ল মুখে সন্ত বললে, “তাহলে এবার হাবলেন ত?”

সনিশ্বাসে নতুন দিদিমা জবাব দিলেন, “মর্থাস্তিক ভাবে! সর্কাস্তঃকরণে বলছি সন্ত বাবুর জয়! উঃ, পদধ্বনির প্যাচে পড়ে এমন বিজ্ঞী ভুল মানুষকে কবে!”



চৈতন্যযুগে নবদ্বীপের শ্রীগৌরাক্ষকে কেন্দ্র করিয়া মৃতপ্রায় বাঙালীর একবার যুগান্তের জড়তা হইতে যে চৈতন্যোদয় হইয়াছিল তাহাকে প্রথম জাগরণ ধরিলে বলিতে হইবে 'বঙ্গদর্শন'ের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া দ্বিতীয় নবজাগরণ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রবল এবং পরিপুষ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোহ বঙ্কিমচন্দ্র যে শাণিত অন্ধ্রে ছেদন করিয়া ভিত্তিভ্রষ্ট বাঙালীকে আত্মস্থ হইবার শিক্ষা ও সুযোগ দান করিয়াছিলেন তাহার নাম 'বঙ্গদর্শন'। পৃথিবীর অজ্ঞাত যেমন, তেমন বাংলাদেশেও, এই কাজ এই দ্বিতীয় দফার সাহিত্যের মারফতেই হইয়াছিল। সে সাহিত্যের মূল শ্রষ্টা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার আধার ছিল 'বঙ্গদর্শন'—সুতরাং 'বঙ্গদর্শন' শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বঙ্কিম তথা 'বঙ্গদর্শন'ের কীর্তির যথাযথ পরিমাপ করিতে হইলে সেই সময়কার বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থা এবং পরিবেশেরও যথাযথ অনুধাবন করিতে হইবে। সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থার কথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রিক অবস্থাও কম শোচনীয় ছিল না। 'বঙ্গদর্শন'ের "পত্র সূচনা"তে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়কার শিক্ষিত ও কৃত-বিত্ত বাঙালীদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

...ইংরাজিয়ার কৃতবিত্তগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের বোধ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রই হয় ত বিভ্রান্তিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, বাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে বাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালার গড়িয়া আত্মবিস্ময়নার প্রয়োজন কি?...

লেখাপড়ার কথা দুই থাকুক, এখন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙালীর হয় না। বিভ্রান্তালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকচার, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উত্তরপক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজীভেই হয়, কখনও বোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন বাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালীর হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উত্তরপক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালীর পত্র লেখা হইয়াছে। আমরা গেরু এখনও ভরসা আছে যে, অগোণে দুর্গোৎসবের সম্রাণি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

...এক্ষণে আমাদের ভিতরে উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহনশীলতা কিছু মাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিত্ত লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দ্বন্দ্বের দৃষ্টি নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিত্তদিগের কোন দ্বন্দ্বের দৃষ্টি নহে। এই সহনশীলতার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্ভ্রান্ত প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উত্তর শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে ...সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাতত্ত্ব। হুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিশ্রাস্যকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না।

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। বাংলা সাময়িক

পত্রের সহিত তাঁহার সংযোগ দীর্ঘকালের। নিতান্ত কিশোর বয়সে সাহিত্য-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি পত্র-গুণের মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা, একটি কবিতা, উক্ত পত্রিকায় বাহির হয়, তখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস। মাত্র দুই দিন বৎসর সাময়িক পত্রে হাত পাকাইয়া, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লর্ক-প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ললিতা-মানস'এর মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বঙ্গবীণাপাণির সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত হইতে দেখি। পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত *Indian Field* নামক দাপ্তরিক পত্রে ইংরেজীভাষায় তাঁহার সাহিত্য-সাধনা পুনরায় আরম্ভ হয়, *Rajmohan's Wife* নামক উপন্যাস সেখানে ধারাবাহিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পর বৎসরই (১৮৬৫) আত্মস্থ বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী', তাহার পর বৎসর (১৮৬৬) 'কপালকুণ্ডলা' এবং তাহারও তিন বৎসর পরে (১৮৬৯) 'যুগলিনী' প্রকাশ করিয়া বিমাতার সাময়িক পরিচর্য্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকেন।

কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। একটি সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে মাসে মাসে জড়তাগ্রস্ত বাঙালী পাঠকের মনের দ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে না পারিলে যে উপরে বর্ণিত শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হইবে না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করিলেন। কিন্তু তখন তিনি ডিপুটি-গিরি চাকুরির ধাক্কায় বারুইপুর, আলিপুর আর রাজসাহী ছুটোছুটি করিয়া ফিরিতেছেন, শরীরও তাঁহার ভাল যাইতেছিল না, ফিরিয়া ফিরিয়া ছুটি লইতে হইতেছিল। যদিও তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে বহরমপুরে বদলি হইয়াছিলেন কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার অবকাশ পান নাই; ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন হইতে এই অবকাশ কতকটা মিলিল। আর মিলিল রামদাস সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সবকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত কৃতবিত্ত লেখক ও মনীষীসম্প্রদায়ের সহযোগিতা। এই সকল সুযোগ ও সুবিধার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্র 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি (১২৭৯, ১লা বৈশাখ) বঙ্গদেশে আত্মপ্রকাশ করিল।

'বঙ্গদর্শন'ের পূর্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য মাসিকপত্র হিসাবে কেবলমাত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ও 'রহস্য-সম্বর্ভের' নাম করা যাইতে পারে। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং (কিছুদিনের জন্ত) উৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় শেখোক্ত পত্রিকা দুইটি সাময়িক পত্র জগতে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। প্রাচীন ও সমসাময়িক গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যবিচার অর্থাৎ বাহাকে সাহিত্য-সমালোচনা বলা হয়, এই দুইটি মাসিক পত্রিকাতেই তাহার সূত্রপাত। নানা সচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও ইহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাহা করিলেন তাহা বাংলাদেশে অকৃত-পূর্ব। তিনি স্বয়ং "পত্রসূচনা"য় প্রতিজ্ঞা দিলেন :

আমরা এই পত্রকে হুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিতে বর

করিব।...এই পত্র আমরা কৃতবিশ্ব সন্তোষের হস্তে, আরও এই কামনার সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহার ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ রূপে ব্যবহার করুন। বাঙালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিভা, কল্পনা, লিপিকোশল এবং চিন্তাৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উজ্জ্বল বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক হুশিক্ষিত বাঙালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠ্যযোগ্য হইলে সাধরে গ্রহণ করিব। এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জ্ঞাত বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই। আমরা কৃতবিশ্ব-দিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠ্যযোগ্যতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। বাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। বাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারও উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সম্ভব না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিজ্ঞা করিতেন যে পালন করিয়াছিলেন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের বিবিধ উক্তি তাহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার ‘রামতল্লাহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ পুস্তকে লিখিয়াছেন :

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিস, ইহা বাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সে রূপে ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, বাহা প্রকাশ মাত্র বাঙালির ঘরে ঘরে ছান পাইল। তাঁহার সকলি যেন চিন্তাৎকর্ষ, সকলি যেন মিলিত। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের দ্যায় লোক-চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে ‘বঙ্গদর্শন’ের আবির্ভাবকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আশিরা বাঙালীর দ্বার একেবারে লুট করিয়া লইল। একে ত তাঁহার জ্ঞান মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়লগ্নের পড়ার শেষের জ্ঞান অপেক্ষা করা আরো বেশী দুঃসহ হইত।...আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে স্থলীকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত ‘করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অভূতি, ভোগের সঙ্গে কোতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।—জীবনস্মৃতি

শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এদেশকার দিনের সর্বপ্রধান মনোবোনের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্গবাসীর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রজন্মের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশে উদ্ভিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অজ্ঞগত কেন এমন একটি অপূর্ণ আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? যুরোপের দর্শন, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে বাহা পাওয়া যায় না, এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অভ্যর্থনায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বঙ্গকাল পরে প্রাপ্তের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রত্যেককে পূর্বের মধ্যে আনিয়া আমাদের পূর্বকে উৎসব উদ্ভল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন যতদূর কৃষ্ণ রাজ্য

করিতেছিলেন। বিশ পঁচিশ বৎসরকাল দ্বারী সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার হুহুর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দোভা করিয়া তাঁহাকে আমাদের কৃপাবন-ধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের পূর্বে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের ঘেরকে সূর্য্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালী পুরুষকে একটা উজ্জতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি বহুমুখি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অসুপম নূতন আনন্দের আশা দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলাভাষার ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এতক বুঝিয়াছে যে, ইংরেজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যেক দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান দ্বারী সাহিত্য বাহা কিছু তাহা বাংলাভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।—‘শিক্ষা’

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রজন্মের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সঙ্ঘর্ষে দেখিয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই হ্রস্ব, কোথায় গেল সেই বিজয়বস্ত্র, সেই গোলবকাগলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন প্রথম বর্ষার মত “সমাগতো রাজবহুস্তরতধ্বনিঃ।” এবং সুবলদ্বারে ভাববর্ণের বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পাশ্চিমবাহিনী সমস্ত নবী-নিধিরূপী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপদ্রাও, কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিক জাগ্রত প্রজন্ম-কলরবে সুর্য্যিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

...আজ বাংলাভাষা কেবল দূত বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্তপ্রদাতা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি স্বার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাত প্রায় ঘরের ঘারেই কলিয়া উঠিতেছে।—“আধুনিক সাহিত্য”

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমের একজন স্নেহাস্পদ বন্ধু ছিলেন; পুরাতন-পর্য্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ের শেষ বৎসরটি একরকম তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন :

বঙ্গদর্শন পড়িয়া বাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাংলাভাষার সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম ভাষার বা সাহিত্যের দ্বারিয়ার অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল, বঙ্গ মানুষ আনিয়াছে—বাংলাসাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।—‘প্রবীণ’—১৩৫৫

বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত (১৩১১ বঙ্গাব্দ) হরি-মোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গভাষার লেখক’ পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার “পিতা-পুত্র” নাম দিয়া যে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন তাহাতে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের সামান্য ইতিহাস আছে। তাঁহার মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার বিভাসাগরী-রীতি ও আলালী-রীতির সমন্বয়-সাধন করিবার চেষ্টাতেই ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ করেন। তিনি বলিতেছেন :

মধ্যবর্তী ভাষা-প্রচারের হুচনা হইতেই “বঙ্গদর্শন” প্রচারের হুচনা আরম্ভ হইল। কত দিন কত জননা চলিতে লাগিল। শেষে কলকাতা

লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খ্রীষ্টান ব্রজনাথ বসু প্রকাশকল্পে বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন।

লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।

- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- জগদীশনাথ রায়।
- তারাশ্রম চট্টোপাধ্যায়।
- কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
- রামদাস সেন।
- এবং • অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) উপরের প্রচারপত্রে বিজ্ঞাপিত বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেন হইতে "সাপ্তাহিক সংবাদবহু ব্রজনাথ বসু কর্তৃক" প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন সাহিত্যের আসর সরগরম। ঐতিহাসিক রামদাস সেনের বিরাট লাইব্রেরিও বঙ্কিমচন্দ্রের কাজে লাগিল। পূর্বোক্ত সাহিত্য-দৃষ্টকরেরা তো সেখানে ছিলেনই, রমেশচন্দ্র দত্তও আসিয়া সেখানে জুটিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ('মানস' চৈত্র ১৩২১) এখানেই তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং তাঁহারই উৎসাহে রমেশচন্দ্র বঙ্গবীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভূদেবের উপদেশ, রামদাস সেন প্রভৃতির সহায়তায় 'বঙ্গদর্শন' সূত্রপাতেই যে শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল, বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব। 'বঙ্গদর্শন'ের লেখকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমণ্ডলী বঙ্কিম-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শন'ের সহায়তায় তাহার ধীরে ধীরে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্রজ সঙ্গীবচন্দ্র এবং শিব্যস্থানীয় হরপ্রসাদও (শাস্ত্রী) এই গোষ্ঠীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্র্যধর্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-স্বলভ গাষ্ঠীয়া লইয়া জনতা হইতে তিনি এতকাল দূরে থাকিতেন। সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। দান্তিক এবং অহঙ্কারী বলিয়া তাঁহার নিন্দা ছিল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমের এই অসামাজিক প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কারণ, তিনি নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই বঙ্গসাহিত্যের তথা দেশের দুর্দশা ঘুচাইতে চাহেন নাই, গোষ্ঠীপন্থিতে বিভিন্ন লেখকের ক্ষমতামু-যায়ী ক্রমান্বয়ে ও উপদেশ দিয়া তাঁহাদের সকলের সাহায্যেই জাতির ভাগ্যপরিবর্তনে বঙ্কিমরিকর হইয়াছিলেন। এই সামাজিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়াছিল বলিয়াই তিনি মাত্র চার বৎসর কালের মধ্যেই (এই চার বৎসরই তিনি সম্পাদক ছিলেন) বাংলা সাহিত্য ও দেশকে একশত বৎসরের গতি ও উন্নতি দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন স্নকৌণলী সেনাপতির মত বঙ্গবাহীরা বিচ্ছিন্ন সেবকসের 'বঙ্গদর্শন'ের বুহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না

পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া একদিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্ধদিকে অস্বাভাবিক মোহজাত পাশ্চাত্যের অমুকরণপ্রতিব বিকল্পে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বমধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'ের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচাবেব বিদায় পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোচ্ছাদের কাল।

আবজ্ঞনা দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহার বহুবিধায়ী ও নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। বক্তব্য এক্ষেত্রে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাতেও তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। স্বীয় স্বভাব-ধর্ম প্রত্যক্ষ পলিটিক্সকে বাদ দিয়া চলিলেও যে তিনি একান্ত ভাবে তাহা বর্জন করিতে পারেন নাই 'সাম্য' প্রভৃতি রচনায় তাহার পরিচয় আছে। 'বঙ্গদর্শন'ের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তির চমৎকāv বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে মিলিবে। আমি এখানে অংশতঃ তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

বাংলাকে কেহ প্রজ্ঞাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজী পণ্ডিতেরা বর্ষ্যর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা বাইতে পারে, সে কথা তাহাদের ঘণের অগোচর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমান [ও] খ্যাতির সজ্জাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিচ্ছিন্নতার অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনায় শিক্ষাগর্ব্বের বঙ্গভাব্য প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই প্রজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা দৌলদার প্রেম মনুষ্য ভক্তি বদেশাসুরাগ, শিক্তি পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনসম্বল সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাব্য হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম দৌত্যগার্ব্ব সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে অপূর্ব লক্ষ্মী প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অল্প কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাব্য যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাব প্রকাশে নিবৃত্ত করা বাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আশঙ্কা করা বিশেষ কষ্টভার্য কার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং বন্ধ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনায় অন্তর্বিহিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সন্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিগ্রহে হুলত খ্যাতি লাভের প্রলোভন সন্মরণ করিয়া, অশান্ত বহু অপ্রতিহত উত্তমে দুর্দশ পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ সাহায্যের কর্ম। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিশ্চিত হয় না, তখন আপনাকে নিরন্তরতে বদ্ধ করা মহাসম্ম লোকের দ্বারাই সম্ভব। বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাব্যকে যে প্রজ্ঞা অর্পণ করিয়াছেন, অজ্ঞেও তাহাকে সেইরূপ প্রজ্ঞা করিবে, ইহাই তিনি

প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ন অভ্যাস বশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ দ্বন্দ্বলেনা করিতে আসিত, তবে বন্ধন তাহার প্রতি এমন দৃষ্টবোধ করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

সবাসাতি বন্ধন এক হস্ত গঠন কার্যে ও এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি আলোইরা রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভয়রাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বন্ধন একাকী গ্রহণ করিতেই বঙ্গ-সাহিত্যে এত সফল এমন ক্ষমতা পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

...মনে আছে, বঙ্গদর্শনে বধন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শব্দে সংখ্যা অল্প ছিল না। কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাধীন হন নাই। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপায় তাহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শব্দে বাহু হইতে তিনি অনায়াসে নিজের করিতে পারিতেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অগ্নানুযোজ্য বস্তুকে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনদিন তাঁহাকে রথবেগে ধর্য করিতে হয় নাই। বন্ধন সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। সাহিত্যের যেখানে বাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনায় বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। বিপন্ন বস্তুর আশ্রয়ে যেখানেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে সেইখানেই তিনি অগ্নির চতুর্ভুজ মূর্তিতে রূপ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কেবল অস্তর দিতে, সান্ধা দিতে, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন ধাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সারথী স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশাথে বঙ্গদেশকে অত্যাতিপূর্ণ স্ততিযাকো নিরন্তর প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বন্ধনের বাণী কেবল স্ততিবাদিনী ছিল না, খড়গধারিণীও ছিল। সাহিত্য-বাহারী বন্ধন, দক্ষিণে বায়ে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালনা করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল।

এই সবাসাতি, দৃষ্টবোধতা, কর্মযোগী, খড়গধারী, দর্পহারী, মহারথী বীরশ্রেষ্ঠ বন্ধনচন্দ্র যেন বঙ্গসাহিত্য-রূপ তরঙ্গীর 'বঙ্গদর্শন' রূপ হাল ধরিয়া বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে হৃৎযোগের বিভীষিকাময় সমুদ্রে পার করাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটা সামান্ত সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নূতন কাব্যধারার প্রবর্তন করিয়া সার্থক হইয়াছিল, বন্ধনচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বাংলার কথা-সাহিত্যকে সজীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন'ের আবির্ভাবে সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্য। বস্তুত, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'সর্বভাষ্যকারী'; 'বিবোধ-সঙ্গ্রহ', 'সোমপ্রকাশ', 'রহস্য-সম্ভ', ও 'অবোধ-বন্ধু' প্রভৃতি পূর্বগামী সাময়িক-পত্রে যে সম্ভাবনার আশুিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ ও সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ ও তথ্যের সমষ্টি মাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক যোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শন'ই সেই সত্য সর্বপ্রথমে প্রচারিত হইল।

প্রথম সংখ্যা হইতেই 'বঙ্গদর্শন' আপন প্রতিষ্ঠা সগৌরবে অর্জন করিল। বাংলাদেশের বুদ্ধু পাঠক সম্মুখের অকস্মাৎ

চর্য-চোধ্য-লেখ-পেয় ভূরিভোজনের উপকরণ পাইয়া বিস্ময়ে ও আশ্চর্য্যে নতিস্বীকার করিল। বন্ধনচন্দ্র পুরা চার বৎসরকাল চাকুরী বজায় রাখিয়াও উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত মাসে মাসে 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে তাঁহার মত প্রতিভা-শালী ব্যক্তির পক্ষে বরাবর সাময়িক পত্র পরিচালনের এক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে বিরাগ ও বিরক্তি আসিয়া উৎসাহের স্থান অধিকার করিল, তিনি ভরা যৌবনেই বঙ্গদর্শনকে একরূপ তত্যা করিলেন। তাঁহার উৎসাহের অভাবের জন্য চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে থাকে; কাঁটালপাড়ায় 'বঙ্গদর্শন'ের নিজের ছাপাখানা হওয়াতেই অল্প পরিচালনার অভাবে গোলযোগ ঘটিতে থাকে এবং কোনও রকমে ১২৮২ সালের চৈত্র পঞ্চম পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বন্ধনচন্দ্র ব্যবসা করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সেরূপ প্রবৃত্তি ও সংস্কারও ছিল না। তিনি আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য এই কঠিন কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন, দিগ্ভ্রান্ত বাংলা সাহিত্যে দিগ্ভ্রান্তের জগী 'বঙ্গদর্শন'ের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহা যে অনন্তকাল মাসে মাসে নিয়মিত বাহির হইবে না, একথা তিনি নিজেও জানিতেন। তাই প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় 'পত্র-সূচনা'য় লিখিয়াছিলেন :

আমাদিগের পূর্বতনরা এক এক বার অকালগর্জন করিয়া, কালে লর-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অণুটো যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিশ্চল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের কণিক জীবনও নিশ্চল হইবে না। যে সকল নিরমের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্ত কণিক পত্রেরও জন্ম, জীবন, সামাজিক নিয়মাবলি, মৃত্যু ঐ নিয়মাবলি, জীবনের পরিণাম ঐ অদ্বৈত নিরমের অধীন। কালপ্রাপ্তে এ সকল জলবুধ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালপ্রাপ্তে নিয়মাবলি জলবুধ বরূপ ভাঙ্গিল, নিরমবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লগ্নে আমরা পরি-তাপমুক্ত বা হান্তান্ন হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিশ্চল হইবে না।

বন্ধনচন্দ্রের জীবনীকার ভ্রাতৃপুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে খুব সম্ভব অবস্থাতেই বন্ধন-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বিলম্বপ্রাপ্ত হয়। প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যা হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল। চার মাসের মধ্যেই গ্রাহক সংখ্যা দেড়গুণ এবং পরে ত্রিগুণ হইয়াছিল। বন্ধনচন্দ্র যখন উহা বন্ধ করিলেন তখন গ্রাহক-সংখ্যা যোলশত। 'বঙ্গদর্শন'ের এই অকাল মৃত্যুতে সমসাময়িক সাহিত্যরসিক সমাজে একপ্রকার হাহাকাব উঠিয়াছিল। 'বান্ধব' 'আধ্যদর্শন' প্রভৃতি সহযোগী মাসিক পত্রিকাগুলি সম্ভবে বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাব কামনা করিয়াছিলেন। বন্ধনচন্দ্র স্বয়ং চতুর্থ বর্ষের চৈত্রসংখ্যায় শেষে অর্থাৎ তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'ের উপসংহারের পূর্বেই এই সকল মন্তব্যের এইভাবে জবাব দিয়া রাখিয়াছিলেন!—

বধন বঙ্গদর্শন প্রকাশ্যে হয়, তখন সাধারণের পাঠ্যব্যয় অল্প উন্নত সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে ভাব্য সাময়িকপত্রের অভাব নাই। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।...বধন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমন সফল করি নাই যে, বর্তমান বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।...

এই সঙ্গে তিনি পাঠকবর্গকে একটি আশাসও দিয়াছিলেন—

বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমন অজ্ঞকার করিতেছি না। এরোজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্ততঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার কারণ সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেন ('আমার জীবনে') হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('নারায়ণ' পত্রিকায়) ও শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('বঙ্কিম-জীবনী'তে) আত্মীয়-বিরোধ, স্বাস্থ্যহানি, বঙ্কিম প্রভৃতি নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এক সেকলের কোনটাই একমাত্র কারণ হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিল্প-প্রতিভার পক্ষে এই ধরনের নিয়ম মাসিক একঘেয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও সার্থকভাবে বৈদ্যদীন পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। চতুর্থ বৎসরের পত্রিকা তাঁহার যত্নের অভাবে যখন নিরস হইল তখনই তিনি মনস্থির করিয়া থাকিবেন। তিনি "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" নিবন্ধে লিখিয়াছেন—

এবং বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ বন্ধ করি নাই, এবং মন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই।

সুতরাং 'জলবৃদ্ধ জলে মিশাইল'। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'ের স্ব স্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন।

'বঙ্গদর্শন'ের দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই কাঁঠালপাড়ায় "বঙ্গদর্শন-যন্ত্র" স্থাপিত হয় ও সেখান হইতেই পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে হারাগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন, চতুর্থ বৎসর হইতে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ভার গ্রহণ করেন। সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইবার কালে বেকার হইয়া পড়েন। ছাপাখানার কাজও প্রায় বন্ধ থাকে। প্রধানত সঞ্জীব-চন্দ্রের ও ছাপাখানার বেকারত্ব ঘটাইবার জন্য পূর্বা এক বৎসর পরে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'ের গৌরব ইহা লাভ করে না।

পুনঃপ্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন'ের প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই বঙ্কিম-চন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' শীর্ষক নিবন্ধে লিখিয়াছেন :

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্ত আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমন প্রীতি জন্মিগছে যে, বঙ্গদর্শন দেশের এরোজন আছে। এরোজন আছে বলিয়া ইহা পুনর্জীবিত হইল। বাহা এক জনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, বাধ্য ও জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব সম্ভব। এই জন্ত আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কাণ্ড পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব বিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও লক্ষণই গোড়া হইতেই দেখা গেল না। সঞ্জীবচন্দ্র অলস শিথিল প্রকৃতির লোক ছিলেন! কিছুদিন পর তাঁহার নানা শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, প্রবন্ধ নির্বাচনেও শৈথিল্য দেখা গেল। বঙ্কিমচন্দ্র অসুযোগ করিয়া পত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কোনও ক্রমে দুই বৎসর (১২৮৪ ও ১২৮৫) 'বঙ্গদর্শন' সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনে বাতির হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র একাদিক্রমে আটচল্লিশ মাস পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, চল্লিশ মাসেই সঞ্জীবচন্দ্রের দম ফুটাইয়া

গেল। এবারে আর কেহ কোন কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দাখিল করিলেন না। পূর্বা এক বৎসর বন্ধ থাকিয়া আবার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শন' তৃতীয় দফা বাহির হইতে লাগিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত দেড় বৎসর বা আঠার মাস বাহির হইয়া ইহা আবার বন্ধ হইল। এইকাল পর্যন্ত কাঁঠালপাড়া "বঙ্গদর্শন-যন্ত্র"রও অস্তিত্ব ছিল না, ১২৮৮ সালের ছয় মাস ইহা জনসন প্রেসে ছাপা হইতে থাকে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে অর্থাৎ ছয়মাস বাদ দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাতেই চতুর্থ দফা 'বঙ্গদর্শন' ৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাগী প্রেস হইতে শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক মুদ্রিত ও উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন কোনও মাসের কাগজই সময়ে বাহির হয় না, দুই মাস, তিন মাস এমন কি ছয় মাস পরেও তাহা বাহির হইয়াছে। ১২৮৯ সালের চৈত্র পর্যন্ত এই অবস্থা।

ইহার পর বঙ্গদর্শনের ইতিহাস বড় করুণ, বড় শোচনীয়। সঞ্জীবচন্দ্র হাল ছাড়িয়া দিলেন। ১২৯০ সালের আশ্বিন পর্যন্ত কোনও পত্রিকা বাহির হইল না। ৯২ নং বউবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের মালিক অঘোরনাথ বরাট শেষ পর্যন্ত প্রকাশক হইয়া ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে পঞ্চম দফা 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন। কোনও সম্পাদকের নাম রহিল না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পরিচালক হইলেন এবং চন্দ্রনাথ বসু অন্তরালে থাকিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন ইহার কাহিল অবস্থা। কার্তিক হইতে মাঘ পর্যন্ত চারি সংখ্যা এই ভাবে বাতির হইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রথম পর্যায় একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

বঙ্গদর্শন মোট ১০৬ সংখ্যা অর্থাৎ ১০৬ মাস বাহির হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ৪৮, সঞ্জীবের সম্পাদনায় ৫৪ এবং অঘোরনাথ বরাটের হাতে ৪—মোট ১০৬। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে হতাশ হইয়া দেখাওনা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন তাহা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে জানা যায়, ১২৯০ সালের মাঘ মাসেই পত্রটি লিখিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

শ্রীচরণেষু,

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন। যে মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘসংখ্যা তিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্র পাঠমাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি—তাৎ ২১শ ফেব্রুয়ারী, খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বঙ্গসাহিত্যের আকাশে যে জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল ১২৯০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে নানা ভাগ্য-বিপর্যায়ের ও হাত বদলের (সম্পাদক, মালিক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, ছাপাখানা সর্ববিষয়ে) মধ্য দিয়া তাহা অন্তমিত হইল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' নব পর্যায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইতিহাস। পূর্বাতন পর্যায় বঙ্গদর্শনের মোট ১০৬ সংখ্যার লেখক ও প্রবন্ধাদি বিস্তৃত পরিচয়ও স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

আমরা বাঙ্গালীরা অভিমানের দ্বারা উপাসক, এমনিধারার একটা দুর্নাম দেশী এবং বিদেশী উভয় মহলেই প্রচলিত আছে। বাড়াবাড়ি কোন জিনিষেরই ভাল নয়, এ কথাটা অত্যন্ত পুরাণে হলেও সত্য। কাজেই আমরা যদি অতীতকে নিয়ে সত্য সত্যই অত্যধিক মাতামাতি করে থাকি, তাতে লজ্জা পাওয়ার কারণ আছে, বিশেষ করে সে মাতামাতির ফলে যদি বর্তমানের চিন্তা আমাদের মন থেকে বিদায় গ্রহণ করে বা গোঁহীন লাভ করে। কিন্তু তাই বলে যাঁরা অতীতকে মন থেকে ধুয়ে মুছে শুধু বর্তমানকে নিয়েই মেতে উঠতে চান, তাঁদের সে চেষ্টাকেও আমরা ভাল মনে অভিনন্দন জানাতে পারি না। কারণ একেও আমরা আর এক রকমের একটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে করি।

কিন্তু ইদানীং এই শ্রেণীর একটা মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর যাঁরা পাণ্ডা তাঁরা প্রাক্‌সমর কালটাকে অর্থাৎ গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ববর্তী ইতিহাসকে কথায় ও কাজে একেবারে অস্বীকার করে চলতে চান, যেন এই অস্বীকারের দ্বারা তার প্রভাবটাকেও তাঁরা এড়িয়ে চলতে পারবেন। কিন্তু তা যে সম্ভবপর নয়, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বর্তমানকে খতিয়ে দেখলেই তা' তাঁদের কাছে ধরা পড়তে বাধ্য।

অতীতকে প্রয়োজন বর্তমানকে বোঝবার জন্তে, অতীতের ক্রটি-বিচ্যুতির কারণ থেকে বর্তমানকে শুধু নেওয়ার জন্তে এবং অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কারের তিমিরাত্মকে অতীতের জ্ঞানোন্মূল্যশালাকার দ্বারা দূরীভূত করার জন্তেই। বর্তমান অনেক সময় তার অতিসান্নিধ্যের জন্তেই আমাদের নিরপেক্ষ বিচারণার অন্তরায় হয়ে ওঠে। তখন অতীত হয় অপরিহার্য বর্তমানকে ব্যাখ্যা করার কাজে। কুসংস্কার নিবারণে অতীতকে কী ভাবে ব্যবহার করা চলে তার একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। মাথার উপরে বেগীকে একটা কায়েমী স্বস্থ দিয়ে চীনারা যে দাসত্বের চিন্তাকেই কায়েম করে রেখেছিল, এ কথাটা তারা ভুলে গিয়েছিল অনেক দিন আগে। ফলে বেগীটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের পক্ষে একটা ধর্ম-প্রতীক। বেগীর বোঝাটা যে আদতে একটা কলঙ্কের বোঝা এ কথা বুঝতে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল ইতিহাসবোধে। ইতিহাস না থাকলে ধর্মের এ শেকল-কাটা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হত কি না এবং হলেও তার জন্তে কত মণ তেল পোড়াতে হত, সে তর্ক এখন না তোলাই ভাল।

রামমোহন সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে অতীতের ওকালতি করার কোনই প্রয়োজন হত না, যদি অতীতের প্রতি বর্তমানের খোটাটো সদাসর্বদা সঙ্গীন তুলেই না থাকতো। এ উদ্ধত সঙ্গীন যে আমাদের সকলেরই মনে অল্প বিস্তার কাজ করেছে, তার প্রমাণ রামমোহনের বেলাতেই মিলে। অতিব্যাপক রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দৃষ্টি ও অনগ্রসাধারণ মনীষাসম্পন্ন এত বড় একজন শক্তিমান পুরুষ সম্বন্ধে আমরা তাঁর দেশবাসীরা এতই কম জানি যে, তা স্বীকার করতেও আমরা কুঠা বোধ করি নে। আমাদের কাছে রামমোহনের যে পরিচয়, তা প্রধানতঃ সতীদাহনিবারক ও ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক হিসাবে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, বিচিত্র কর্মধারা আর প্রথম সমুন্নত ব্যক্তিত্বের ধোঁয়াধবর আমাদের মধ্যে খুব বেগী

লোকে রাখেন না—এ কথা বললে বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য করা হবে না। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের বিরাগ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে এ কথাও অস্বীকার করা চলবে না যে, রামমোহনের ঐ অপরিচিতির জন্তে তাঁরাও খানিকটা দায়ী। মাহুয রামমোহনের বদলে দেবতা রামমোহনের যে বিগ্রহ তাঁরা দেশবাসীর কাঁধে চাপাতে চেয়েছেন তার প্রতিক্রিয়ার ফলে মাহুয রামমোহনও আমাদের মন থেকে মুছে যেতে বসেছিলেন।

ধর্মের সংকীর্ণতা ও অতিশ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি থেকে অনেকাংশে মুক্ত আধুনিক মন রামমোহনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে অচিরেই যে তিনি তাঁর দেশবাসীর অন্তরে তাঁর সত্যকার আসনটিতে প্রতিষ্ঠিত হবেন, এ ভরসা আমাদের আছে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর রণক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার ভাগ্য হস্তান্তরিত হয়। রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭২ সালের ২২শে মে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পনের বৎসর পরে। এই রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের ফলে ও দেশীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার সঙ্গে একটা প্রবল বৈদেশিক কৃষ্টির সংঘাতে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তারই ফল রামমোহন। তাঁর জীবন ও কর্মকথা আলোচনা করলে এ কথা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার এক সমন্বয়ী রূপই তাঁর সমগ্র জীবন, তাঁর চিন্তা ও কর্মের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাজেই রামমোহনকে বুঝতে হলে যেমন তখনকার দেশীয় সমাজ ও সভ্যতাকে বোঝার প্রয়োজন আছে, তদানীন্তন বিলাতী সভ্যতা ও সংস্কৃতির তত্ত্ব সন্ধান করার প্রয়োজনও তার থেকে কম নয়। অধিকন্তু এই উভয় সভ্যতা প্রবল স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যে কিরূপ একটা সমন্বয়ে পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তার স্বরূপটা সম্বন্ধেও আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক। এইদিক দিয়ে রামমোহনকে বিচার করা করলে সে বিচার অসম্পূর্ণ হবে বলেই আমরা মনে করি।

কিন্তু রামমোহনের সমগ্র জীবন আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এখানে আমরা তাঁর কর্মজীবনের একটা মাত্র দিক সম্বন্ধে আলোচনা করব। সে দিকটা হচ্ছে তাঁর সংবাদপত্রের পরিচালনার দিক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এতে ব্যবহৃত উপকরণগুলো আমার স্বগবেষণা-লব্ধ নয়। যারা এ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন, তাঁদের নিকটেই উপকরণগুলোর জন্ত আমি স্বামী অগাস্ট নান্না কর্মক্ষেত্রে তাঁর যে অনগ্রসর ব্যক্তিত্বাত্ম্য ও ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে আমরা বিম্বিত হই, সংবাদপত্র-পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁর সেই সকল বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

সংবাদপত্রের পূর্বকথা

কোন দেশেই সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়, ভারত-বর্ষেও নয়। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রপ্রকাশের প্রথম গৌরব ইংরেজদের প্রাপ্য। ১৭৮০ সালের ২৯শে জাহাঙ্গীরী মিঃ হিকি (Mr. Hickey) 'বেঙ্গল গেজেট' নাম দিয়ে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বেঙ্গল গেজেট'ই ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র। কিন্তু তদানীন্তন সরকারের

বিরূপতা এই পত্রিকাখানার দীর্ঘজীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের পত্নী ও অল্প কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করার অভিযোগে দু'বছরের মধ্যেই পত্রিকাখানার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন ছিল না সত্য, কিন্তু হাতে ক্ষমতা থাকলে তার প্রয়োগের বাধা কোন দিনই হয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বোধ হয় কথাটা স্পষ্ট হবে। বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের কিছুদিন পরে 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' (বেঙ্গল জার্নাল) নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানার সম্পাদক ছিলেন মিঃ উইলিয়ম ডুয়েন (Mr. William Duane)। মিঃ ডুয়েন ছিলেন আইরিশ-আমেরিকান। তাঁর কাগজে তিনি কিছু আপত্তিকর লেখা প্রকাশ করেন বলে তাঁকে ১৭৯৪ (১৭৯১?) সালে গ্রেপ্তার করা হয়। আপাততঃ এর মধ্যে এমন কিছু অভিনবও নাই, যাতে এ ব্যাপারটা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একে স্মরণীয় কবে রেখেছে মিঃ ডুয়েনের গ্রেপ্তারের নাটকীয়ত্ব। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল স্যার জন শোয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডুয়েনকে গবর্ণমেন্ট হাউসে নিমন্ত্রণ করেন। মিঃ ডুয়েন উৎফুল্ল মনে যখন গবর্ণমেন্ট হাউসে ঢুকলেন, তখন কয়েকজন সৈন্য এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং জোর করেই তাঁকে কেল্লায় ধরে নিয়ে যায়। তারপর একেবারে শব্দীবে ইংলণ্ডে পৌঁছে তবে তাঁর বন্ধনমুক্তি।

যা' হক সংবাদপত্রের পায়ে শেকল পরাতেও খুব বেশী দেরী হয় নাই। ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলি (Richard Colley Wellesley, Earl of Mornington) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন এবং এক বৎসর যেতে না যেতেই ১৭৯৯ সালের ১৩ই মে তারিখে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সন্মোচন করার জন্য বিধান প্রবর্তিত করেন। তাঁর বিধান অনুসারে সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য সমস্ত বিষয় প্রকাশের পূর্বে গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়। এ বিধান ভঙ্গের সাজা ছিল ইউরোপে নির্বাসন। তখনকার দিনে সমস্ত সংবাদপত্রই ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হত বলেই বোধ হয় এই বন্ধনের বিধান করা হয়েছিল। এই সময়টা ইংরেজদের অত্যন্ত দুর্দিনের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কা সামলাতে তাদের প্রাণ ওঠাগত, প্রাচ্য ভূখণ্ডে তার অধিকারগুলি নেপোলিয়নের কবলিত হওয়ার আশঙ্কায় সে সম্ভব। একদম অবস্থায় সম্পাদকদের ইচ্ছামত মত প্রকাশের অধিকার থাকাকাটা বোধ হয় তিনি নিরাপদ মনে করেন নাই! তখনকার সম্পাদকেরা ভাষা প্রয়োগ সঙ্কে একটু বেপরোয়া ছিলেন—এও নাকি তাঁর ঐরকম আইন প্রবর্তনের একটা কারণ। যা'হক লর্ড ওয়েলেসলির বিহিত সংবাদপত্রের এই বন্ধন তাঁর পরিবর্তীদের আমলেও কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই, বরং লর্ড মিটোর (১৮০৭-১৩) আমলে তা দৃঢ়তরই হয়েছিল। পূর্বা ১৯ বৎসর পর ১৮১৮ সালের ১৯শে আগষ্ট, লর্ড হেস্টিংস (Earl of Moira ১৮১৩-২৩) সংবাদ, প্রবন্ধ বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষার জন্য দাখিলের দায় থেকে সম্পাদকদের অব্যাহতি

দেন। কিন্তু তিনি নির্দেশ দেন যে, গবর্ণমেন্টের কার্যের নিষ্ফল এবং দেশবাসীদের মধ্যে ধর্ম সঙ্কে কোনরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি কিংবা অল্প কোনরূপ বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে—এরূপ কোন লেখা বা সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত না হয় সে সঙ্কে সম্পাদকেরা যেন হুঁসিয়ার থাকেন।

লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রের বন্ধন শিথিল করে খুব প্রশংসার কাজ করেছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর আমলেই যখন আবার সেই বাধনকে শক্ত করে আটার প্রচেষ্টা দেখি, তখন তাঁর সিদ্ধি সঙ্কে মুখর হয়ে উঠতে স্বভাবতঃই সন্মোচন আসে। অল্পরূপ সন্দেহও যে মনে না জাগে তা নয়। লর্ড ওয়েলেসলির প্রবর্তিত বিধান ভঙ্গ করলে, তার জন্য শুধু ইউরোপীয়ানদেরই সাজা দেওয়া চলতো, ফিরিজি বা দেশী সম্পাদকের সাজার কোন ব্যবস্থা ঐ বিধানে ছিল না। কাজেই তাঁদেরও বিধানের প্যাচে আটকাবার অভিসন্ধি থেকেই সামান্য কিছু দিনের জন্য বাধনটাকে তিনি আলগা কবে দিয়েছিলেন। পরে দেশী ও বিদেশী সব সম্পাদকই যাতে আটকে পড়েন, সেইরূপ আইন প্রবর্তিত করেন। এর পর সংবাদপত্রের জন্য যে এই নব বন্ধনের সৃষ্টি হলো, তার স্বরূপ সঙ্কে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

বাংলা সংবাদপত্র

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সাহেবরা শ্রীরামপুর থেকে 'দিগদর্শন' (The Digdarsan or Magazine for Indian Youths) বা দিগদর্শন (অর্থাৎ যুব-লোকের কার্য সংগৃহীত নানা উপদেশ) নামে একখানা বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এইখানাই প্রথম প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্র। মিশনের প্রস্তাব অনুসারে এই পত্রিকাতে রাজনীতি সঙ্কে কোন আলোচনা থাকত না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হ'ত। প্রত্যেক প্রবন্ধ ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই লিখিত হ'ত এবং সামান্য-সামান্য পৃষ্ঠায় ছাপা হ'ত। ইংরেজী প্রবন্ধ থাকতো বা দিকের পৃষ্ঠায়, আর বাংলা প্রবন্ধ ছাপা হতো ডানদিকের পৃষ্ঠাতে। প্রথম সংখ্যাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি ছিল—আমেরিকার দর্শন বিষয়ে (of the Discovery of America), হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ (of the Limits of Hindoosthan), হিন্দুস্থানের বাণিজ্য (of the Trade of Hindoosthan), বেলুনদ্বারা সাদলার সাহেবের আকাশ গমন (Mr. Sadler's Journey in a Balloon from Dublin to Holy head), বিস্ময়জনক পর্বত বিষয়ে (of mount Vesuvius)। এর ভাবার সামান্য একটু নমুনা নীচে দিলাম :—

“এইরূপ হৃৎকি বস্তুমিতে ও হিন্দুস্থানের অল্প অল্প ভাগে কখন কখন হইয়াছিল। সন ১৭৭০ সালে বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অতি বোর হৃৎকি হইয়াছিল, তৎকালে নবাব ও অজ্ঞান ভাগ্যবান লোকেরা দরিদ্র লোকদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের ভাগ্যের শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল।

ইহাতে অনেক দুঃখিলোক জীৱনোপায়-প্ৰত্যাশাতে তৎকালীন ইংলণ্ডীয়দেৱেৰ প্ৰধান বসতিস্থান কলিকাতাত আহিল।" ইত্যাদি।

এই কাগজখনা তিন বৎসৰ স্থায়ী হৈছিল। তাৰপৰা এৰ প্ৰকাশ বন্ধ হ'ব লাগিল।

বাংলা ভাষাৰ প্ৰকাশিত প্ৰথম সংবাদ-পত্ৰ কি, তা নিয়ে পণ্ডিতদেৱ বাণবিতণ্ডাৰ পৰিসমাপ্তি আজও হয় নাই। কাজেই আমাদেৱে মত অধ্যবসায়ীৰ সে সন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নহ'ব, নিৰাপদও নয়। পণ্ডিতদেৱ এই বিতণ্ডা চলেছে দুই-খানা সংবাদ-পত্ৰকে কেন্দ্ৰ কৰে। একখানা 'বাক্সাল গেজেট' আৰু দ্বিতীয় হ'ল 'সমাচার-দৰ্পণ'। এই দুইখানা সাপ্তাহিক পত্ৰই অতি সামান্য কৰ্মদিনেৰ ব্যৱহাৰে প্ৰকাশিত হয়, কিন্তু কাৰ আবিৰ্ভাব আগে তাৰ মীমাংসা আজও হয় নাই। তাৰ একটা কাৰণ হ'ল 'বাক্সাল গেজেট'ৰ কুলজীৱ অভাৱ। এ পৰ্য্যন্ত অধ্যবসায়ীদেৱে সৰ্ব্ব পৰিশ্ৰমে তাৰ একখানা সংবাদ-পত্ৰ সন্ধান মিলে নাই! তা' ছাড়া সমসাময়িক লেখা থেকৈ তাৰ সন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতেও অসঙ্গতি থাকে জন্ত কোন স্থিৰ সিদ্ধান্তে পৌছানো মুশ্বিল হয়ে গৈছে। এমন কি, কে যে কাগজখনা প্ৰকাশ কৰিছিল—গঙ্গাকিশোৰ ভট্টাচাৰ্য্য না হ'বকুমাৰ বাৰ সে সন্ধেও জোৰ কৰে বলাৰ মত প্ৰমাণ পণ্ডিত ব্যক্তিদেৱ হাতে থব বোশী কিছু নাই। কিন্তু 'সমাচার-দৰ্পণ' সন্ধে তথ্যেৰ এৰূপ অপ্রভুলতা নাই। কাজেই তাৰ প্ৰকাশ-কাল প্ৰভুতি সন্ধে পণ্ডিতোৰ স্থিৰ সিদ্ধান্তে এসে গৈছে। তা থেকৈ জানা যায়, 'সমাচার দৰ্পণ' প্ৰকাশিত হৈছিল ১৮১৮ সালেৰ ২৩শে মে, ১২২৫ সালেৰ ১০ই জ্যৈষ্ঠ শ্ৰীৰামপুৰ থেকৈ। কাগজ-খানা বেৰিয়েছিল শ্ৰীৰামপুৰেৰ পাদৰী জে, সি, মাৰ্শম্যানের সম্পাদনায়। অনেকেই মনে কৰেন যে, 'সমাচার-দৰ্পণ'ই বাংলা ভাষাৰ প্ৰথম সংবাদ-পত্ৰ। 'বাক্সাল গেজেট' যদি এৰ পৰে প্ৰকাশিত হয়ে থাকে, তবে তাৰ প্ৰকাশ যে 'সমাচার-দৰ্পণ' প্ৰকাশেৰ একপক্ষ কালেৰ মধ্যেই হৈছিল—তা বিশ্বাস কৰবাৰ মত কাৰণ আছে। আৰ 'সমাচার দৰ্পণেৰ পূৰ্বে এ প্ৰকাশিত হয়ে থাকলেও, তাৰ প্ৰকাশকাল সম্ভবতঃ একপক্ষকালেৰ পূৰ্ববৰ্তী নয়। যা হ'ক বাংলা ভাষাৰ প্ৰথম সংবাদ-পত্ৰ হিচাবে 'বাক্সাল গেজেট'ৰ দলটি যদি নাও টিকে, তবুও বাক্সালী পৰিচালিত বাংলা সংবাদ-পত্ৰেৰ আদি পুৰুষ হিচাবে তাৰ গোঁৱৰ ক্ষুণ্ণ হওয়াৰ কোনই সম্ভাবনা নাই। প্ৰসঙ্গতঃ এ কথাটোও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতাত যে ছাপাখানা 'বাক্সাল গেজেট' মুদ্রিত হ'ত, ৰামমোহন বাৰ তাৰ অঙ্গতম মালিক ছিলেন। এই সময় সংবাদ-পত্ৰেৰ প্ৰতি গবৰ্ণমেণ্টেৰ মনোভাব যে কিৰূপ ছিল তাৰ একটা আভাস পাওয়া যাবে জে, সি, মাৰ্শম্যানের একখানা পত্ৰ থেকৈ। এই পত্ৰখনা ডক্টৰ জৰ্জ মিথ নামক এক ব্যক্তিকে লেখা। এই পত্ৰে তিনি লিখেছিলেন :—

The English journals in Calcutta were under the strictest surveillance and many a column appeared resplendent with the stars which were substituted at the last moment for the editorial remarks and through which the censor

had drawn his fatal pen. কলিকাতাত ইংৰেজী কাগজ-গুলিৰ ওপৰ থব কড়া নজৰ ৰাখা হতো। সংবাদ-পত্ৰগুলিৰ অনেক জন্তই তাৰকা-চিহ্নিত হয়ে বেৰ হ'ত। যে সব সম্পাদকীৰ মন্তব্যেৰ মধ্যে সেলৰ শেখ যুহুৰ্ত্তে তাঁৰ নিৰ্মম কলম চালান্তে, তাৰকা চিহ্নগুলি তাৰেৰ পৰিবৰ্ত্তনৰূপ দেওয়া হ'ত।

ৰামমোহন ও সংবাদ-পত্ৰ

ৰামমোহন ৰংপুৰেৰ সৰকাৰী চাকৰী থেকৈ অবসৰ নিয়ে ১৮১৪ সালে (মতান্তৰে ১৮১৫) কলিকাতাত আসেন এবং এইখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস কৰতে আৰম্ভ কৰেন। এই সময় থেকৈই তাঁৰ সত্যিকার কৰ্ম-জীৱনেৰ সূত্ৰপাত হয়।

১৮২১ সালেৰ ১৪ই জুলাই তাৰিখে "সমাচার-দৰ্পণ" পত্ৰিকাৰ একজন পাত্ৰী একখানি পত্ৰ প্ৰকাশ কৰেন। এই পত্ৰে তিনি প্ৰস্তুতছিল হিন্দুদেৱ বেদান্তাদি-দৰ্শন শাস্ত্ৰেৰ অৰ্বোক্তিকতা প্ৰমাণিত কৰাৰ প্ৰয়াস পান এবং তাঁৰ পত্ৰেৰ উত্তৰ আহ্বান কৰেন। ৰামমোহন বাৰ 'শিবপ্ৰসাদ শৰ্মা'—এই ছদ্মনামে ঐ পত্ৰেৰ জবাৰ 'সমাচার-দৰ্পণেৰ' সম্পাদকেৰ নিকট পাঠান। কিন্তু সম্পাদক তাঁৰ পত্ৰখনা প্ৰকাশ কৰেন না। কৈকিয়ৎ স্বৰূপ তিনি ১লা সেপ্টেম্বৰে 'সমাচার-দৰ্পণে' লেখেন—

"শ্ৰীযুত শিবপ্ৰসাদ শৰ্মা প্ৰেৰিত পত্ৰ এখানে পহঁছিয়াছে। তাহা না ছাপাইবাৰ কাৰণ এই যে, সে পত্ৰে পূৰ্বপক্ষেৰ সিদ্ধান্ত ব্যতীৰিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে! কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত কৰিয়া কেবল বড়দৰ্শনেৰ দোষোদ্ধাৰ পত্ৰ ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবাৰ বাধা নাই অন্তথা সৰ্বসমেত অন্তত ছাপাইতে বাসনা কৰেন তাহাতেও হানি নাই।"

'সমাচার-দৰ্পণে' উত্তৰ ছাপা না হওয়াতে ৰামমোহন ১৮২১ সালেৰ সেপ্টেম্বৰ মাসে, "The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun. ব্ৰাহ্মণ সেৱাৰি। "ব্ৰাহ্মণ ও মিসনৰি সন্বাদ" নাম দিয়ে একখানা কাগজ প্ৰকাশ কৰেন। এই কাগজে তিনি মিশনাৰিদেৱ মত থণ্ডন কৰতে আৰম্ভ কৰেন। এই কাগজেৰ সম্পাদক হন "শিবপ্ৰসাদ শৰ্মা" ছদ্মনামে ৰামমোহন নিজেই। এই কাগজ প্ৰকাশেৰ কাৰণ সন্ধে ৰামমোহন The Brahmunical Magazine-এৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণেৰ ভূমিকায় নিজে বা লিখেছেন, নিয়ে তা উদ্ধৃত কৰে দেওয়া গেল :—

The Brahmunical Magazine was commenced for the purpose of answering the objections against the Hindu Religion contained in a Pengualee Weekly Newspaper, entitled "Samachar Darpan", conducted by some of the most eminent Christian Missionaries, and published at Shreerampore. In that paper of the 14th July 1821, a letter was inserted containing certain doubts regarding the Sastras, to which the writer invited any one to favour him with an

answer, through the same channel. I accordingly sent a reply in the Bengalee Language, to which however, the conductors of the work calling for it refused insertion; and I therefore formed the resolution of publishing the whole controversy with an English translation in a work of my own "The Brahmunical Magazine....."

"কয়েকজন বিশিষ্ট খৃষ্টান মিশনারী দ্বারা পরিচালিত ও শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একখানা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। তার উত্তর দেওয়ার জন্ত "দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন" আরম্ভ করা হয়। সমাচার-দর্পণের ১৮২১ সালের ১৪ই জুলাইয়ের সংখ্যায় প্রকাশিত একখানা চিঠিতে শাস্ত্র সন্থকে কতকগুলি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এই সংবাদপত্রের মারফতই তার জবাব দেওয়ার জন্ত পত্রলেখক আমন্ত্রণ করেন। আমি তদনুসারে বাংলাভাষায় একটা উত্তর লিখে পাঠাই। কিন্তু যে কাগজের পরিচালকেরা উত্তর চেয়েছিলেন, তাঁরাই এই জবাব ছাপতে অসম্মত হন। কাজেই আমি সমস্ত বাদানুবাদ ইংরেজী অনুবাদসহ আমার নিজের কাগজ "দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন" প্রকাশ করার সংকল্প করি।"

এই কাগজখানার এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অল্প পৃষ্ঠায় তার ইংরেজী অনুবাদ থাকত। মনোজ্ঞ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন চরিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই কাগজ খানার মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ৪টি সংখ্যার ইংরেজী অংশ এবং তিনটি সংখ্যার বাংলা অংশ ছাড়া এ পর্যন্ত তার আর কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। তা ছাড়া এই কাগজ ধারাবাহিকরূপেও প্রকাশিত হয় নাই। এর প্রথম সংখ্যায় খৃষ্টান পাদবীর পত্র ও তার ইংরেজী অনুবাদ এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তার জবাব প্রকাশিত হয়। এর পর ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া কাগজের ৩৮শ সংখ্যায় মিশনারীরা এর এক প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। রামমোহন তাঁর কাগজের তৃতীয় সংখ্যায় ওর জবাব দেন। তারপর প্রায় দু'বৎসর চূপচাপ। সহসা আবার বেদ ও বেদপন্থীদের প্রতি নানা অভিযোগ করে মিশনারী প্রেস থেকে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং খৃষ্টান পাদবীর এই পুস্তিকাখানা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। রামমোহন এর জবাব দেওয়ার জন্ত দু'বৎসর পরে 'দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন' ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যার ভূমিকায় তিনি বলেছেন:—"Notwithstanding my humble suggestions in the third number of this magazine, against the use of offensive expressions in religious controversy, I find, to my great surprise and concern, in a small tract lately issued from one of the missionary presses and distributed by missionary gentlemen, direct charges of atheism made against the doctrine of the Vedas, and undeserved reflections on us as their followers. This has induced me to

publish, after an interval of two years, a fourth number of the Brahmunical Magazine.

"এই কাগজের তৃতীয় সংখ্যায় আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, ধর্ম সম্পর্কিত বিতর্কে যেন গ্রন্থিকর উক্তি প্রয়োগ করা না হয়। কিন্তু আমি দেখছি যে, সম্প্রতি কোন মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত ও মিশনারীদের দ্বারা বিতরিত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বৈদিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে নাস্তিকতার অভিযোগ করা হয়েছে এবং বেদের অনুগামী আমাদের সন্থকে অবাক্তিত মন্তব্য করা হয়েছে। এতে আমি বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়েছি। এর ফলে আমাকে দু'বৎসর পরে ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করতে হচ্ছে।"

ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনের অষ্টম সংখ্যাগুলি প্রকাশের বি উপলক্ষ্য ছিল এবং কতদিন পরে পরেই বা সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, সে সন্থকে এ পর্যন্তও সঠিক কিছুই জানা যায় নাই।

ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিনের প্রথম তিন সংখ্যার ইংরেজী অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশের উদ্দেশ্য সন্থকে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছিলেন,..... the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years. During that long per od of the Hindoo community (to whom the work was particularly addressed and, therefore, printed both in Bengalee & English) have made up their mind that the arguments of the Brahmanical magazine are un-answerable; and I now republish therefore, only the English translation, that the learned among Christians, in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the Subject.

"আমার কাগজের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পর দু'বৎসর হতে চলেছে, কিন্তু এখনও কেউ ওর কোন জবাব দেয় নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের (তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রধানত: ও কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই জন্তেই ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতে তা মুদ্রিত হয়) মনে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে যে, ব্রাহ্মণসেবধির যুক্তি অখণ্ডনীয়। এখন আমি কেবল ওর ইংরেজী অনুবাদ পুনরায় প্রকাশ করছি।- ইউরোপ ও এশিয়ায় শিক্ষিত খ্রীষ্টানগণ এই বিষয় সন্থকে যাতে তাদের মত স্থির করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এর পুন: প্রকাশ।"

প্রবন্ধের অতিবিস্তৃতির ভয়ে এখানেই দাঁড়ি টানতে হলো।

'ব্রাহ্মণসেবধি' পরিচালনায় রামমোহন যে শাস্ত্রজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, স্পষ্টবাদিতা, স্মৃতি ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, এও পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা সে সন্থকে আলোচনা করব। তার পরবর্তী দুটি প্রবন্ধে রামমোহনের বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সদ্বাক্যকৌমুদী' এবং ফার্সী সাপ্তাহিক পত্র 'মীরাজ উলআখবার' সম্বাদ আলোচিত হবে। রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও জন্ত বিরূপ দৃষ্টির সঙ্গে লড়েছিলেন, সর্বশেষ প্রবন্ধে তার একটা বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস পাব।



প্রেমের ঝামেলা

দীপকবরাম চক্রবর্তী



নানা ভঙ্গীর দৃষ্টি আছে,—দৃষ্টিভঙ্গী জিনিসটা কিন্তু তাদের থেকে আলাদা। কালিদাসের কালের কটাক্ষ এখনো দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেফাসেব দৃষ্টিভঙ্গী আর নেই। দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়, বদলাতে বাধ্য।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীরও তারতম্য আছে। আপনার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। আপনি যাকে গোকুল দেখছেন, আমি তাকে গুরুবৎ দেখতে পারি। আপনার চোখে যে শস্ত্র ছাড়া কিছু না, আমি তাকে শিষ্যস্থানীয় দেখি—আপনি যাকে গোলালু দেখছেন, আমার কাছে তা শাঁকালু। বস্তুত: জিনিসটা হয়তো একরূপই থাকে, কিন্তু দেখবার দোষে (কিম্বা গুণে) বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর মজাই এই।

প্রেমে পড়াটাও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। তা ছাড়া কি? এক দৃষ্টিতে যেটা প্রেম, অজ্ঞ দৃষ্টিতে (এবং অন্যের দৃষ্টিতে) সেইটাই শয়তানি। আবার বই, কাপড়, প্রেম, খানা-ডোবা এ-সবই পড়বার জিনিস বটে, কিন্তু এদের প্রত্যেকের পাঠ আলাদা। কিন্তু পাঠে আলাদা বলে ভ্রম হলেও আসলে আলাদা নয়, এইখানেই দৃষ্টিভঙ্গীর মারপ্যাচ।

কটাক্ষ কালো চোখে এবং কটী চোখে সমান মারাত্মক হতে পারে—সব সময়েই মারাত্মক হতে পারে—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর রঙ, ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে—তা কি পূর্বরাগে, কি অমুরাগে আর কি অন্তরাগে, আর কিবা ঘোরতর রাগে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই ছলনায় একটু আগে যা প্রেমে পড়া বলে বোধ হয়েছিল, একটু পবেই তাকে প্যাচে পড়া বলে জ্ঞান হয়। তার প্ররোচনায় মুহূর্ত্ত পূর্বের 'লায়ন' পরমুহূর্ত্তে পলারনে পরিব্রাজ্য পেতে চায়। পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেও পরিত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিহাস এই গল্পের নায়ক লোকনাথের অদৃষ্টে ঘটতে দেখা গেছিল।

লোকনাথ, জয়কেষ্ট আর বনমালী—তিন বন্ধুতে বসে জুতো পালিশ করছিল—তাদের সাক্ষ্যভ্রমণের পূর্বাতাস।

হঠাৎ লোকনাথ দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বলে উঠল, “নাঃ, জীবনটা দেখছি বুখাই গেল। কিছু হোলো না।”

আর একমাস ধরে প্রভাহ সন্ধ্যার ঠিক বেলবার মুখেই এই মন্তব্য ওর মুখে শোনা গেছে। ওর বন্ধুরা শুনেছে, কোনো প্রশ্ন

তোলেনি। কিন্তু আজ জয়কেষ্টের অসহ্য বোধ হোলো। সে বলে উঠল, “কেন এই বুটপালিশটা কি এতই ধারাপ?”

জুতোর পালিশটা সে-ই কিনে এনেছিল।

“জুতোর পালিশ নয় মূর্খ, বুকের মালিশ। প্রেমের কথা হচ্ছে। প্রেমে না পড়তে পারলে জীবন ব্যর্থ। বেঁচে লাভ?” জবাব দিয়েছে লোকনাথ।

“প্রেমে পড়াকে আমি অধঃপতন মনে করি।” এই বলে জয়কেষ্ট নিজের জুতোর ফের মনোযোগ দিয়েছে।

“রোজ তিন জনে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে যে কী হয়? কেন, একসঙ্গে না বেরুলে কি চলে না?” বনমালী কিছু অন্য কথা এনে ফেলেচে, “কেন, আলাদা আলাদা বেরুলে হয় কী? তা হলে আমরা নিজের নিজের ভাগ্য পথক করে দেখতে পারি।



তিনবন্ধুতে বসে জুতা পালিশ করছে:

একসঙ্গে জাহ্নবী-বাটীরে, কারো ভাগ্যেই কোনো কল হর না বধন দেখা যাচ্ছে।”



মেয়েটি চমকে.....কেন ?

বনমালীর কথাটা লোকনাথের থেকে অল্প শোনালেও এবং একটু বক্তা শোনালেও, আসলে দুটো কথাই এক কথা। দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক—কিন্তু উদ্ভাব্য এক।

জয়কেষ্টের নজর কিন্তু জুতোর দিকেই বেশি। তবু সে আবার ঘাড় তুলল। তুলে বলল, “তার মানে ?”

“তার মানে আমি বলছি, আজ আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি না। আজ আমি একলা একলা বেড়াব। এবং আজ থেকে প্রত্যহ। এমন কি, যদি দরকার হয় আমি অল্প মেসে সীট নিতেও প্রস্তুত আছি।” এই কথা বলেছে বনমালী। “তোমাদের সঙ্গসঙ্গে আমি যারা গেলাম।”

“ওনুহ ? ওনুহ ওর কথা ?” জুতো ছেড়ে দিয়ে জয়কেষ্ট লোকনাথের মুখের দিকে তাকালো। “ও আমাদের জয়েন্ট কেমিলি ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যেতে চায়। ওনুহ তো। তুমি তো একটু আগে প্রেমের কথা বলছিলে। ওর কথার নিশ্চয়ই তোমার প্রেমে আঘাত লেগেছে। প্রাণে খুব ব্যথা পেয়েছ আশা করি।”

“আমাদের অভ্যন্তরীণ বোধ হচ্ছে ও পীড়িত হবে না—ভাব

করবার মত কিছু যেন পেয়েছে মনে হচ্ছে।” লোকনাথের সন্দেহ হর।

“পেয়েছিই তো” জয়কেষ্ট জোর গলায় তাহির করে। “সেই জগুই তো তোমাদের ল্যাঞ্জে বেঁধে নিয়ে ঘুরতে রাজি নই। তোমরাও আমাকে তোমাদের ল্যাঞ্চার বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। একমাস হোলো আমরা কলকাতার এসেছি। দেশের এক কলেক্ট থেকে একসঙ্গে পাস করে’ বেরিয়েছি। এখানে এসে একবার উঠেছি, এক পোষ্টগ্রাফুরেট ক্লাসে ভর্তি হয়েছি—একসঙ্গে মিলে কলকাতার এক একটা রাস্তা পঞ্চাশবার করে’ চষেছি। একত্র সিনেমাতেও গেছি। কিন্তু খুব হয়েছে, আর না! এবার আমি মুক্তি চাই।...আমার মনের মত চমৎকার একটি মেয়ে আমি খুঁজে বার করব; এমন একটি মেয়ে—সে যেমন স্মার্ট ডেইলি আপ টুডে। তোমাদের আড়াআড়ির থেকে, তোমাদের বিধ-দৃষ্টির আড়ালে একলা আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাব। ঘুরব, বেড়াব, এমন কি একসঙ্গে সিনেমাতেও যেতে পারি।”

“চাল মারা হচ্ছে ? তাই না ?” জয়কেষ্ট তথাপি একটু আশার দোলায় দোলে। বনমালী সত্যিই তাদের সঙ্গ ছাড়বে—সে যেন ভাবতে পারে না। “মেয়ে অতো সস্তা নয়।” সে বলে। হয়তো বা বনমালীকে নিরস্ত করতে চায়।

“চাল কি ডাল এখনই দেখতে পাবে।” এই বলে জুতা পায়ে দিয়ে বনমালী বেরিয়ে চলে গেল তৎক্ষণাৎ। কিরেও তাকালো না।

জুতো পালিশ মূলতুবি রেখে জয়কেষ্ট চুপ করে’ রইলো। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুলল তারপর :

“আচ্ছা, কী হয় মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে’ বলা তো ? আমি তো কোনো লাভ দেখি না। সবাই মেয়ে মেয়ে করে’ হন্দ হচ্ছে—একটা মেয়ে পেলে যেন হাতে স্বর্গ পার! আমি তো ভাই এর কিছু বুঝি না। সত্যি বলতে, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সেদিন একটা মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে গেছলাম—এমন কিছু না, তবে সে যা এক কাণ্ড হোলো—”

“আমি জানি !” বলল লোকনাথ, “আমি তো কাছেই ছিলাম। মেয়েটা বলল, আপনি কিরকম ভঙ্গলোক মশাই ? চেনা নেই, শোনা নেই—গায়ে পড়ে কথা কইতে এসেছেন। এমন বেরাদপি করলে আমি একুণি টেচিরে লোক জড়ো করব।”

“ওরেব্বাবা ! এখনো আমার বুক কাঁপছে।” জয়কেষ্ট শিউরে উঠল। “জুতো পায়ে খটখটিয়ে চলা কলকাতার এসব মেয়েরা কী রে !”

“বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে বার।” লোকনাথ বলে। বলে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে : “তবু ওদের পারের তলার পড়ে থাকাও ভালো। নইলে বুকের ফুটপাথ তো কাঁকা।”

“বুকেছি ! তোমাকেও ব্যারামে ধরেছে।...তুমিও আমাদের ছেড়ে বাবে। তুমিও লাগা দিয়ে বাবে আমাদের প্রাণে। তবে কেন আর অনর্থক তোমার বিরহবরণ সঙ্গ করার জন্ত পড়ে থাকা। আমিই বরং আগে বিনার হই।”

এই বলে' পালিশের কাজ আর না বাড়িয়ে জুতো পারে
জরকেষ্ট বিদার নিয়ে গেল।

“তুমি! তুমিও গেলে! তুমিও গেলে অবশেষে!” তিরোহিত
ছারার দিকে তাকিয়ে লোকনাথ বলে উঠল: “হাও। আমি
একাই থাকব! আমার জীবন তো ব্যর্থই গেছে! আমি আর
কোথার বাব?”

লোকশূত্র ঘরে লোকনাথ একাই পড়ে থাকল। একটা বই
নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। একলা একলা বেড়াতে কি
ভালো লাগে? কী হবে বেড়িয়ে? কোথায়ই বা বেড়াবে!
বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে সে পড়ে
বইল।

আধঘণ্টা ঐ ভাবে পড়ে থাকার পর হঠাৎ তার মনে হোলো
কড়িকাঠের চেয়ে অধিকতর রমণীয় কলকাতার কি কিছু নেই?
পথে-বাটে ইতস্ততঃ সর্বত্রই যাদের ছড়ানো দেখা যায়—তাদের
ভুলনার কড়িকাঠ কোন্ হিসেবে অধিকতর দর্শনীয়? এবং
বাংলায়? হতে পারে তারা গারে পড়তে গরাজি। কিন্তু
চোখে পড়তে তো তাদের আপত্তি নেই। চোখে দেখাটাই কি
কম হোলো? পাবার সাধ না করে, কেবল চোখে চোখে, স্বাদ
পাবার বাধা কি?

ইতাকারে আত্মজিজ্ঞাসার আপন মনে সহস্রর লাভ করে'
সেও বেরিয়ে পড়ল। যদিও তার একটা জুতো তখনো অপালিশ
থেকে গেছল, তবুও সে ঝিখা করল না। এক পাটি জুতোর
চাকচিক্যই পদমধ্যাদার পক্ষে যথেষ্ট বলে' তার মনে হোলো।
তা ছাড়া চেহারাটা তার একটু বকবকে ছিল—দুটো পাটিই
মুখের মতন নাই বা হোলো—কতি কি?

সন্ধ্যা হয় হয়, লোকনাথ বেরিয়েছে। সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন,
চারিদিকের এত লোকের মধ্যে অনাথ বালকের মত চলেছে
লোকনাথ। রাস্তাগুলোও হেঁটে হেঁটে ওর মুখস্থ হয়ে যাওয়া—
তাদেরও কোনো পদস্থতা ছিল না। কোনো কোণেই কোনো
বিষয়ের অপেক্ষা বা রহস্তের হাতছানি নেই তার পথে।

অভ্যেস হয়ে যাওয়া একটা চায়ের দোকানে সান্ধ্য চা পান
গেরে—জিসঙ্কার নিত্যকর্ম সেরে নিয়ে—ফের সে পা বাড়িয়েছে—
নিরুদ্ধেশের পথে না হলেও নিরুদ্ধেশের পথে। কিন্তু এবার সে
যেন উৎসাহজনক কিছু দেখল। একটা তরুণী চলেছিল তার
আগে আগে। সুবেশিনী।

পা চালিয়ে লোকনাথ তার পাশাপাশি পৌছল। পৌছে
দেখল তার দৃষ্টিভঙ্গী নেহাৎ ভুল বাংলার নি। এক একটি মেয়ে
আছে, যে-কোনো কোণ থেকে, এমন কি পেছন থেকেও, যাদের
একটুখানি কেবল কাণের পশাদ্ভাগে দেখলেই মনে হয় যে, মেয়েটি
সুন্দর—তারপর সামনে এসে দেখে সে ধারণা বদলাবার কোনো
কারণ দেখা যায় না, এ মেয়েটি সেই বিরলগোত্রীদের অন্ততম।

কিন্তু কি করে' কথা পাড়া যার? মস্ত বড় সমস্যা। একটু-
খানি ইতস্ততঃ করে লোকনাথ বলে' উঠলো আপনা থেকেই—
“কোথাও বাচ্ছেন বুঝি?”

মেয়েটি চমকে গিয়ে কিয়ে তাকালো—“হ্যা—কেন?”

“ভাবছিলুম যে আপনি বোধ হয় আমার পথেই চলেছেন
—তাই—তাই জিজ্ঞেস করলুম।” লোকনাথ জড়িয়ে জড়িয়ে
বলল: “তাই ভাবছিলুম যে একটুখানি হয়ত আমরা একসঙ্গেই
যেতে পারি, অবশি—যদি আপনি কিছু না মনে করেন।”

“তা, চলুন না, আপত্তি কি!” মেয়েটি বলল: “আপনি কোন্-
দিকে যাবেন?”

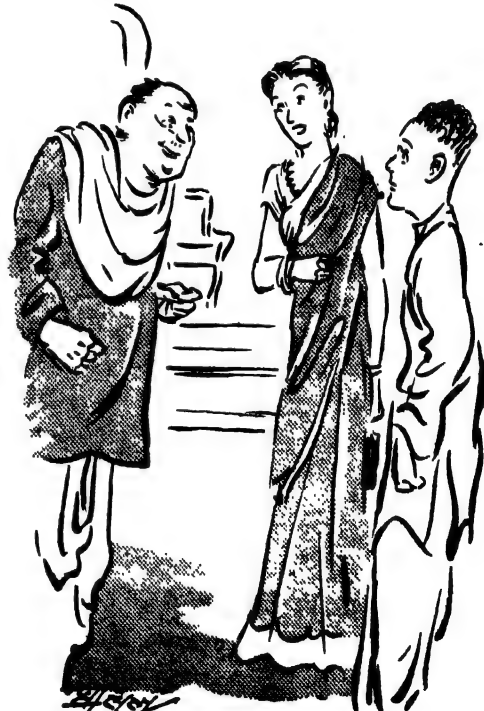
“আমার—আমার কোনো গন্তব্য স্থান নেই। এমনি
বেরিয়েছি।” লোকনাথ জানাল।

“তা, বেশ তো।” মেয়েটি হাসল।

মেয়েটির কোনো ঝিখা দেখা গেল না। লোকনাথের একটু
কেমন কেমন ঠেকলেও সে তেমন আশ্চর্য্য হোলো না। তার সঙ্গ
তার বন্ধুদের কাছে অস্বস্তি বলে' মনে হলোও মেয়েদের কাছে অস্বস্তি
নাও হতে পারে। তা ছাড়া, প্রথম দর্শনেই যে সব দুর্ঘটনা ঘটে
বলে' শোনা যায়, তার সবই তো একেবারে মিথ্যে নয়—তার
সবটাই যে মিলিটারী লরীর মুখোমুখি ঘটে, তা নাও তো হ'তে
পারে। মেয়ে এবং মিলিটারী লরীতে অপমৃত্যু এবং প্রেমে
কিছু কিছু মিল থাকলেও—অন্তথাও কি তেমনি নেই? আর,
সবে তো এখন দর্শনের প্রথম অধ্যায়!

আলাপের প্রথম ফাঁড়াটা কাটিয়ে, এবং জরকেষ্ট সুলভ
কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে লোকনাথ এবার আরো একটু
সাহসী হোলো। বলল: “চলুন না, কফি হাউসে যাওয়া থাক।
আপনার আপত্তি আছে?”

“না, ধন্যবাদ। কফি আমি খাই না।”



“বাবা, আমি আরেকজন তরুণীকে নিয়ে এসেছি।”

“আপনার হাতে যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে—ঘণ্টা দুয়ের অবসর থাকে যদি—তাহ’লে একটা সিনেমার টিনেমার গেলো কেমন হয়?” লোকনাথ আরো একটু এগোলো।

“অনর্থ কেন পরস্য নষ্ট করবেন?” বলল মেয়েটি।

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে লোকনাথ ভেবে পেল না। প্রেমে পরস্য খরচ আছে—স্বত্বপাত্রেও আছে, স্বচন্দ্রেও আছে—সুচিকান্তরূপে তো রয়েছেই—এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কথাটা বাছলামাত্র। তার উত্তর দেওয়া বাহুল্য বিবেচনা করে লোকনাথ নিকন্তর হয়ে রইলো।

“তার চেয়ে আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে এক পরস্য খরচ নেই। মেয়েরা আছে, গান আছে,—সময়টা আপনার বেশ আনন্দে কাটবে।... যাবেন?” মেয়েটি একটু খামল: “অবশিষ্ট ঘণ্টাখানেক নষ্ট করবার মতো সময় যদি আপনার থাকে।”

“আপনার সঙ্গে যাওয়াটা কি সময় নষ্ট করা?” লোকনাথ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে: “কী যে আপনি বলেন?”

লোকনাথ মেয়েটির সাথে সাথে চলে। ভাবতে ভাবতে চলে। কবি যে বলে গেছেন, প্রেমের ফাঁদ ভুবনে পাতা—কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে-না। ফাঁদ তো পাতাই রয়েছে, সাহস করে পা দিতে পারলেই হয়—পদস্থলনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হবে। প্রেম সব সময়েই নিপাতেন সিদ্ধ। কখনো ছেলের দিক থেকে, কখনো বা মেয়ের দিক থেকে। কিন্তু সর্বদা যারা উঠে পড়ার তালে থাকে সেই সতকরা কখনো প্রেমে পড়তে

পারে না। যতই তাবে ততই লোকনাথের ঘোমাঞ্চ হয়। অতাবিত্ত ভাবে এবং কত সহজে সে প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে।

আরো একটু চলবার পর তারা একটা খামুগলা বাড়ীর সামনে এল। মেয়েটি তাকে নিয়ে ঢুকল ভেতরে।

প্রকাণ্ড হলু ঘরের মত। বিস্তার বেশি পাতা। কিন্তু তার বেশির ভাগই ফাঁকা পড়ে আছে। সামনে একটুখানি থিয়েটারের ঠেজের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে একটিমাত্র অভিনেতা—যদি তিনি অভিনেতাই হন। নাটকটা যে কী, লোকনাথ আন্দাজ পেল না। তবে অভিনেতার দাড়ি আছে, বেশ পাশিশ করা দাড়ি, এটা তার নজরে পড়ল।

দর্শক সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জন কুড়ি লোক ইতস্ততঃ বিকিপ্ত হয়ে বসে। বৃদ্ধ ভঙ্গলোকটি বলছিলেন—

“আজকালকার ছেলোদের মধ্যে কুচি নেই—সিনেমার কুচি। আগে আমাদের সমাজের প্রত্যেক অধিবেশনে লোক ধরত না—এখন তাদের ধরে ধরে আনতে হয়...”

এমন সময়ে মেয়েটি গিরে সেই বক্তৃতা দাতাকে সম্বোধন করল,—“বাবা, আমি আরেকজন ভঙ্গলোককে নিয়ে এসেছি।”

“বেশ করেছ মা। ঠিক সামনে নিয়ে এসে বসো—ওই ধারটায়—যেখানে আরো দু’জন ভঙ্গলোক বসে আছেন।” তিনি প্রসন্ন হান্তে বলেন।

সম্মুখীন হয়ে সেইখানে বসতে গিয়ে লোকনাথ হাঁ হ’য়ে গেল। যে লোক দু’জন ফাঁক হয়ে মাঝখানে তার জায়গা করে দিল, তারা আর কেউ না—বনমালী আর জয়কেষ্ট।

লোভীর অভিযোগ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

লোভে পাপ—সত্য কথা, যদি পাপ হয় সমাজস্বেচ্ছাচার এবং বিধি-নিষেধের স্বৈচ্ছাকৃত ব্যত্যয়ে। তেমন পাপে কিন্তু মৃত্যু হয় না। আদালতে মিথ্যা মামলার অর্থ সঞ্চয় করলে দোষের পুষ্টি হয়। আইনের কবলে না পড়লে, অজ্ঞানে অর্থ সংগ্রহ, অনেক মানুষকে জীবনের শেষের দিকে গণ্যমাত্র করে। এমন বহু লোক সকল সমাজে বিদ্যমান। অনেক ধন-ভাণ্ডারের বুনীয়াদ পরীক্ষা করলে, তার সম্ভ্রান্ততা ঈর্ষার কারণ হ’তে পারে না।

সম্ভ্রান্ততত্ত্বগুণানং যৎ স্তং শাস্ত্যেতৎসাম।

কুন্তন্তু ধনলুপ্তানাং ইত্যেতৎশচ ধাবতাম।

শিক্ষালয়ের নীতি-হিসাবে স্তম্ভ। কিন্তু সংসারে যশ, মান, বচন এবং অর্থের পশ্চাদ্ধাবন না করলে, ঐ তিনটি পদার্থ মিলে না। জোগাড়ের জয়।

আমি অস্ত্র বলছি মিথ্যা অভিযোগী, সত্য ঘটনার কাঠামোর মিথ্যার রূপ দেয়। আমি এ শ্রেণীর কতক প্রকার নালিসের বিবরণ দেব।

যে অর্থ দেওয়ানী কোর্টে আদায় হ’তে পারে, সে অর্থ

কোজদারী মামলার চাপে উত্তরল করার জন্য অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা রুজু করে। যদি সে নালিসের বিবরণের মধ্যে মিথ্যা আরোপ না থাকে, এমন অভিযোগকে মিথ্যা বলা যায় না। মকেলের নষ্ট দ্রব্য উদ্ধারের বাসনা, উকীলের ভ্রম, এবং একটু ফাটকাবাজীর ফলে এমন নালিস কাছারীতে আসে। দেওয়ানী মামলা করতে গেলে বত টাকার দাবী, সেই অল্পপাতে কোর্ট কি দিতে হয়। যার টাকা উদ্ধার হচ্ছে না, তার পক্ষে আবার ঘরের অর্থ সরকারকে দিয়ে নষ্ট অর্থ উদ্ধারে দ্বিধা স্বাভাবিক। তারপর দেওয়ানী মামলার অসাধু দেনাদার বিচলিত হয় না। ডিক্রী হ’লেও কিস্তিবন্দী চলে। ডিক্রীজারী হাদ্দামা এবং বন্ধাট। কিন্তু কোজদারী মামলা ভীতিপ্রদ। উত্তমর্ষ একবার চেষ্টা করে জেলের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে। একজন ধনী কোজদারী উকীল সবচেয়ে কু-লোকে বলত যে, তিনি কোজদারী কাছারীতে বসে, দেওয়ানী মামলা বুঝেই অধিক অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

কিন্তু ঠিক যথার্থ বিবরণে প্রথম দিনেই হাকির এ প্রকর নালিসের দরখাস্ত ডিসমিস করেন। তার সংবাদ বিবাকীর কাছে পৌঁছায় না, স্তম্ভর তার প্রাণে প্রত্যাশিত আশা জন্মায়

পারে না। তাই অভিযোগে বাতী একটু রসান দেয়। অনেক কথা বলে না কিবা ছ' একটা নতুন অসত্য কথা বলে।

ধরুন কলিকাতার কাপড়ের পাইকারী বাজারে, নগদ বিক্রী মানে কোন ক্ষেত্রে পনেরো দিনের ডিউ। অর্থাৎ ক্রেতা যদি পনেরো দিনের মধ্যে প্রাপ্যগণ্ডা চুকিয়ে দেয়, সে কিছু ব্যাজ বা কমিশন পায়। পনেরো দিনের দিন দাম দিলে নির্দিষ্ট দাম দিতে হয়। তার পরে দিলে ক্ষয় দিতে হয়। একে ব্যবসা জগৎ নগদ বিক্রী বললেও, আইন তা' বলে না। ক্রেতার উপর দাবী রাখবার জন্য পূর্বে পাইকারী হৌগুলাদের মুজুকী ক্রেতার কাছে এক পত্র লিখিয়ে নিত। তার মর্ম্ম এই যে দাম চুকিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত মালের স্বত্বস্বামি বিক্রেতারই অক্ষুর থাকবে। বলা বাহুল্য এ সর্ন্ত নিরর্থক। কারণ ডিউতে মাল বেচার মানে, ব্যবসায়ী মাল বেচে বিক্রেতার দাম চুকিয়ে দেবে।

এই সর্ন্ত নিয়ে পুলিশ কোর্টে বহু মামলা হয়েছে। ভয়ে সাধু ব্যবসায়ী দেনা মিটিয়েছে। কিন্তু যে অসাধু বা হার দেনা দেবার সম্মতি নাই, সে শেষ অবধি লড়াই ক'রে অব্যাহতি লাভ করেছে। তার পরেই ইন্সপেক্টরী কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে তার সকল দিক মুক্ত। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত মিথ্যুক বা অসাধু নয়।

এইরকম ঘটনার চরম দৃষ্টান্ত পূজার বাজারের জুয়াচোর। এক অসাধু ব্যবসায়ী একটি গণেশের মূর্তি এবং সিঁড়র লাগানো ঘট-স্থাপন ক'রে খানকতক খেড়ুয়া-মোড়া খাতা কিনে দোকান খুলে বসতো। ডিউতে মাল কিনে তাড়াতাড়ি লোকসানে কম দামে কাপড় বেচে বিক্রেতা ব্যবসায়ীর দেনা মেটাতে। তারপর আবও মাল নিত। এই রকমে খুব চালাও কারবার ক'রে বাজারের অনেক মাল ধারে কিনে পূজার পরই গণেশ উটে দোকান বন্ধ করত। এক মাসের মধ্যে এই রকমে হাজার কতক টাকা উপার্জন করা সম্ভব হত।

এমন লোক চলতিভাবে জুয়াচোর। আইনের খুব ক্ষম বিচারে সে জুয়াচোর প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু যাব গেছে তার পক্ষে কাজ ক্ষতি ক'রে, উকীলের ফি দিয়ে, সেই ক্ষম বিচার যে সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, সে মালমসলা সংগ্রহ করা কঠিন। এসব জুয়াচোরদের শাস্তি দেবার কত চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আইনের মোচকোফেরে তারা অনেকেই অব্যাহতি লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন চেষ্টা ক'রে অর্থব্যয় ক'রে ফরিদাণী অসাধু ব্যবসায়ীকে টাকার চার আনা ছ'আনা দিয়ে মেটাতে বাধ্য করেছে।

এক শ্রেণীর অপরাধ আছে যার উৎপত্তি ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের লোভে। মোটামুটি বাদে কাপ্তেনী কারবার বলা হয় এ অপরাধ তাকে মৌজদারীর রূপ দেয়। বহু পূর্বে কলিকাতায় বিদেশী জাহাজের কাপ্তেন, মালিক, নাবিক প্রভৃতি চীনা বাজার, চান্দনী ও মার্কেটে বাজার করতে যেত। তাদের কাছে ভাগা ইংরাজি বলে এক শ্রেণীর দোকানদার বধা ইচ্ছা অসম্ভব দরে সাধারণ দেশী জিনিস বিক্রয় করতো। একটা বানর ছানার কুড়ি টাকা সাধারণ দর ছিল। তিন টাকার কাকের বাচ্চা, ছটাকার

মাটির আঁজালী পুতুল ইত্যাদি কারবারকে বলা হ'ত কাপ্তেনী কারবার। শীতকালে তখন প্রায়ই বুকের জাহাজ বা ম্যান-অফ-ওয়ার আসতো। সেই মানোয়ারী গোরাগা সবাই কাপ্তেন নামে অভিহিত হ'ত। দোকানদার তাদের ডাকতো—কাপ্তেন সাব, টেক্ টেক্ টেক্ নোটেক্, নোটেক্, একবার তো নী। অর্থাৎ নাও না নাও একবার তো দেখো। রাধাবাজারের মোড়ে এক মদের দোকানে মদ খেয়ে তারা লালবাজারে হরোড় করত। একটা হ'তাকৈ গদায় যত ঘুরিয়ে একবার এক কুলির মাথার মেঝে অমৃতপ্ত হয়ে মানোয়ারী গোরা তার মুখচূষন ক'রে তাকে পাচ টাকা বখসিস দিয়েছিল। এ সব কাপ্তেনী কারবার বেশী ঘটতো শীতকালে বড়দিনের ছুটিতে।

বলছিলাম কাপ্তেনী কারবারের কথা। ইংরাজী প্রবচন সর্বনাশের তিনটি কারণ নির্দেশ করে—মদ, মদন ও দ্ব্যতক্রীড়া। এক একটি ধনী লোকের হেলে ঘোবনেই প্রথম দুটির কবলে পড়ে। স্নেহময়ী মা বা পিসীমার কাছে যে অর্থ পায়, বিলাসিতার অমিতব্যয়িতার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় না। তখন তাকে বেন-ডেন-প্রকাণে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

কলিকাতার কুহানে এক প্রৌঢ় কুসুম্য থাকে। তারা ছাওনোটের দালাল। অকস্মাৎ কুসুম্য অর্থের অনটন পড়লে তারা ভীষণ ক্ষুদ্রে টাকা ধার ক'রে দেয়। যত টাকা ধার হয় তার অধিক টাকার ছাওনোট লিখে দিতে হয়। এই টাকা—ধারের লোভের উপর কর্ত্ত দিয়ে, অর্থ উপার্জনে লোভীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ ভাবে এমন ধার দিয়ে অর্থ উদ্ধার করতে সময় সময় কষ্ট পেতে হয়। তাই কারবারের মধ্যে অপরাধের উপকরণ সন্নিবিষ্ট হলে আদায়ের পথ স্তগম হয়। নাবালকের ছাওনোট তমস্কক, মর্টগেজ প্রভৃতি কোনো দলিল দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু মিথ্যা প্রলোভনে অর্থ সংগ্রহ ফৌজদারী অপরাধ। তাই একশো টাকার ছাওনোটে ধনীর নাবালক তরুণকে চল্লিশ টাকা দেবার সময়, মহাজন (!) তার কাছ থেকে একটা মিথ্যা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়—যাতে ঋণ-দাতা বলে যে তাব বয়স উনিশ বছর ছমাস অতএব সে সাবালক। সময় থাকলে, অধিক টাকার কারবারে কাপ্তেন তরুণ পুলিশ কোর্টে এফিডেভিট করে। এরও প্রকার-ভেদ আছে। সম্পত্তির মালিক সাবালক হলে, তাকে দিয়ে এক সম্পত্তি হুবাহর বন্ধক দেওয়ানো হয়। দ্বিতীয় বন্ধকী পত্রের সম্পাদনের সময় সে একটা এফিডেভিট দেয় যে তার সম্পত্তি দায়হীন, অর্থাৎ পূর্বে বন্ধক দেওয়া হয় নি। এই স্বীকারোক্তি কাল হয়। তার ফলে যে ধার নেয় সে ফৌজদারী মামলায় পড়ে।

বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর জুয়াচোর আছে, যারা ঋণ-দাতাকে এই রকম স্বীকারোক্তিতে প্রবঞ্চনা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করে। একজন এই প্রকারে একটা সম্পত্তি আঠারো বার দায়হীন বলে বন্ধক দিয়েছিল। এটনী এবং উকীলরা এই সব বন্ধকী দলিল লেখে। তাদের মধ্যে অনেকে প্রবঞ্চিত হয়। আমার সম-ব্যবসায়ীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে—ব্যবহারবৃত্তি নোবল।

কিন্তু সত্যের অমুরোধে বলতে হয় যে সকল এটর্নী ও উকীল সাধু প্রকৃতি নয়।

এই বাস্তবিক জুয়াচুরির উপর মামলার রূপ দিয়ে, কাপ্তেনী কারবারের দেনদার ও পাওনাদার উভয়ে কাপ্তেনী চিটিংবাজী করে। লোভী উভয় পক্ষ। পাওনাদার ফৌজদারী কোর্টে অভিযোগ করে যে নাবালক সন্তু কুমার আপনাকে সাবালক বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে মবলগ্‌ তিনশ টাকা ছাণ্ডালোটে ধার করেছে। সত্য কথা জানলে বাদী টাকা ধার দিত না। এ অর্থ আদালতের সাহায্যে উদ্ধার হয় না। অতএব হজুর প্রতিবাদীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া আইনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আজ্ঞা হয় ইত্যাদি।

যুবকের বিধবা মা, স্নেহময়ী পিতৃশ্রম, বিরক্ত খুড়িমা সবাই এক জোটে বাছাকে কারাগার হ'তে বাঁচাবার জন্ত, গভনা পত্র বিক্রয় করে দেনা চোকায়। অমৃতপু সন্তু কুমার সাতদিন ঘাপটি মেরে ঘরে থাকে। তারপর বন্ধু বণ্টু এসে আবার তাকে ফুসলে বিরহিণী শ্রীমতী চলচ্চিত্রের শাস্তিকুঞ্জে নিয়ে যায়।

মিথ্যা চেকে টাকা ধার করা জুয়াচুরি। অনেক সময় লোকের হঠাৎ টাকার দরকার হ'লে সে বন্ধু বান্ধবের কাছে গিয়ে বলে—ছুটা বেজ্ঞে গেছে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। আমাব এই একশো টাকার চেক রেখে একশ নগদ টাকা দাও। কাল সকালে ব্যাঙ্কে পাঠালে চেক কাশ হবে।

জগতে এমন ঘটনা প্রায় ঘটে। বহু লোক ঘরে সামান্য মাত্র অর্থ রাখে। সব টাকা থাকে ব্যাঙ্কে। স্ত্রতরাং হঠাৎ রোগে শোকে মানুষকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

এই রকম ঘটনাকে আদর্শ ক'রে অনেক জুয়াচোর পরিচিতকে প্রবঞ্চিত করে। যার ব্যাঙ্কে মাত্র ষাট টাকা আছে, সে বন্ধকে বলে, আমার পরিবার পীড়িত। ব্যাঙ্ক বন্ধ। সেখানে আমার যথেষ্ট অর্থ আছে। আপাততঃ একশো দশ টাকা দাও। এই চেকখানা কাল দশটার সময় ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিও, তোমার টাকা পাবে। অবশ্য পরদিন ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দেয়, টাকা নেই দেবে কোথা থেকে। এ প্রস্তাবনা আইনের চক্ষে—চিটিং।

যেখানে লোভী দুজনেই পাপী, সে ক্ষেত্রে এই চিটিংয়ের আইনের কাঠামোয়, কাপ্তেনী লেন দেন হয়। ধনী ব ছেলে ঐ রকম বাজে একশো টাকার চেক দিয়ে ঋণ-দাতার কাছে ৮০ টাকা নেয়। চেকের তারিখ সাতদিন পিছিয়ে দেয়। সাত দিনের দিন টাকা দিতে না পারলে, উত্তমর্গ চেক ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে, ডিজনার করিয়ে নেয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কাছে চিঠি নেয় যে চেকদাতার টাকা নাই, তার কাছে চাওগে—রেফার টু ডায়র। তারপর সে পুলিশ কোর্টে কেশ ক'বে। তখন মুক্ত আত্মীয় ঋণের পাই পয়সা মায় স্তম ও খরচ চুকিয়ে দেয়।

এ সব ক্ষেত্রে মিথ্যা অভিযোগের উপকরণ বাদীর হাতে জুগিয়ে দেয় বিবাদী। উভয়েই জায় ও ধর্মের চোখে পাপী। কিন্তু কাছারীর পক্ষে এ জুয়াচুরির মূলে পৌঁছান অনেক সময় কঠিন কাজ।

এতাবৎ আমি অর্থলোভের কথা বলেছি এবার অতীতের একটি মামলার কথা বলব। মন্তব্য অনাবশ্যক।

আমি তখন তরুণ। কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ বংশের একটি যুবক আমার চক্ৰিশ পরগণার এক মহকুমায় নালিশ রুজু করার জন্ত নিযুক্ত করতে চান। আমি যে ফী চাইলাম দিতে চাহিল। মোকদ্দমা কি?

সে তার এক সহিসকে দেখিয়ে বললে, বেচারী সেই ছোট সহরে বিবাহ করেছে। তার খন্তর পক্ষের লোক স্ত্রীকে আটকে রাখছে, স্বামীগৃহে আসতে দিতে চায় না। স্ত্রী বোড়শী!

আমি বললাম, এ সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্পত্তি না থাকলে হাকিম মা-বাশের হেপাজত হতে মেরেকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে চান না! অবশ্য যদি মূলে কোনো অবৈধ ব্যাপার থাকে, তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা।

ভ্রলোক বললে—স্ত্রী আসতে সম্মত। কারণ সে স্বামী চায়। তার মা তাকে অন্যের সঙ্গে নিকা দিতে চায়। মেরেটি পালিয়ে আসতে পাবেনা অথচ স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অমুরক্ত।

কথাবার্তী যখন চলছিল, পত্নী-প্রাণ সহিস হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কোঁতুল হ'ল। সামান্য অর্থে স্থানীয় উকীল পাওয়া যায়! আমাকে অত টাকা দেবার কারণ কি? বিশেষ সে-যুগের সহিসের বেতন ছিল মাসে সাত টাকা।

ভ্রলোক বললে—আপনার বাপ-মায় আশীর্বাদে কিছু পয়সা আমি খরচ করতে পারি। বলুন তো কেশববাবু এটা ধর্মের কাজ কি না? হানিফা ছ'পুরুষ আমাদের চাকুরী করে। তার স্ত্রীর অন্তের সঙ্গে নিকা হবে? কি কেলঙ্কারী।

আমি বললাম—বালাই ষাট। সীতা সাবিত্রীর দেশে এমন এমন দুর্ঘটনা ঘটতে দেওয়া উচিত না। তবে বলে রাখি মামলা একদিনে শেষ হবে না।

—কুছ পরোয়া নাই। টাকা সঙ্গে যাবে না।

অবশ্য এই রকম সুবুদ্ধি সর্বজনীন হ'লে উকীল মোক্তার সমৃদ্ধ হয়। ভ্রলোকের প্রশংসায় প্রাণ গলে গেল! তবু কিন্তু ফৌজদারী উকীলের মন এক একবার আমার কি, আমার কি, বললে একটা কুংসিত সন্দেহকে চাপা দেবার জন্ত।

মহকুমার হাকিম ছিলেন শিক্ষিত ইংরাজ। ইনি পরে লাট সাহেব হয়েছিলেন। দরখাস্ত পেয়ে তিনি বললেন—কাল আপনি এগারোটার ট্রেনে আসবেন। আমি থানার বড় দানোগাকে দিয়ে কাল মেয়েটিকে হাজির করাব।

আমি এ-সব ক্ষেত্রে যা হয় তা বললাম। তার মা-বাপ শিথিয়ে দেবে মিথ্যা বলতে। কারণ হজুরের নিজের দেশের প্রবচন—রক্ত ভলের চেয়ে গাট।

সাহেব বললেন সে ভয় নাই। আমি তাকে আমার খাস কামরায় রেখে দেব। তার দুষ্টির মাঝে থাকবেন আপনি আর আমি।

হাকিমকে ধন্তবাদ দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আমার বিজয়-হাসি প্রতিফলিত হ'ল বড় লোকের চেলের মুখে।
সহিসেব সেই এক ডাব—যুক্তপাণি, নীরব।

পরদিন-নাতিদের দরখাস্ত শোনা শেষ ক'রে, হাকিম খাস-
কাছরী গেলেন। তখন চাপরাসী আমার বললে—সাহেব
সোনার দিয়া।

যরের এক কোণে একটা রঙীন কাপড়ের পুঁটলি। তার উপর-
প্রান্ত হতে দুটা চকল মকরী আঁখি এবং বাঁশীর মত নাকের
আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

সাহেব হেসে বললেন—এই বাণিল হালিমা বিবি। আমি
তার মুখে তার গল্প শুনেছি। আপনি শুনুন।

সাহেবের করুণ আহ্বানে যুবতী উঠে দাঁড়ালো, টেবিলের
নিকট এলো। এক কথায় হালিমা স্তব্ধ।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন—হানিক টোমারা খসম।

হালিমা মুহূষ্মরে বললে—নেহি হজুর।

তার পিতা নিকটের গ্রামের পাটের কলে কাজ কর্ত। হানিক
তার মাকে ফুসলে পরসা দিয়ে ভালো কাপড় দিয়ে মেয়েটিকে
কদিন বাবুর বাগানে নিয়ে গিয়েছিল।

—টোমারা এ রেশমী কাপড়া কোন্ ডিয়া।

সলজ্জ হালিমা কথার উত্তর দিল না। সাহেব তাকে নির্ভয়
হতে বলেন। উকীল বাবুর কাছে লজ্জা নাই।

হানিমা চকিতনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে মাটির দিকে
চাইল। তার পর তার চক্ষু ভরে জল এল।

অনেক সাপ্তাহার পরসে বাকী গল্পটুকু বললে। বাবু তাব
সঙ্গে হানিকের নামে মাত্র বিবাহ দিয়ে, নিজের উপপত্নী হিসাবে
বাখতে চেয়েছিল। তাকে কিছু গহনা দিয়েছিল। তাব মার
সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল—হালিমার নামে কলিকাতায় বাতী কিনে
দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি সেই পুরাতন কাহিনী। একদিন তাব পিতা
সন্দেহ ক'রে হানিককে নিজের বাড়ীতে ধরেছিল। সে প্রাণভয়ে
পালিয়েছিল। তারপর এই মিথ্যা মামলা।

সাহেব বললেন—আমার বিশ্বাস বাবুর ধারণা মেয়েটি আমার
কাছে বলবে—হানিক তার স্বামী, সে তার কাছে যাবে। কিন্তু
আমি তাকে জেরা করে অভয়লান করে সত্য ঘটনা জেনেছি।

আমি আর কি বলব? এর একমাত্র বিচার ফল—দবখাস্ত
নাকোচ। আমার ভয় হচ্ছিল হানিক এবং বাবু মিথ্যা অভিযোগের
দায়ে অভিযুক্ত হবে।

সাহেব বললে—এখনও শেষ হয়নি। হালিমার জননীর ডাক
পড়লো। সাহেব তাকে বললেন—তুমি হাজতে যাবে। তুমি
মেয়েকে ধারাপ করছ।

অবশ্য মাতা পুত্রীর বৌদ্ধ ক্রন্দনে সে অব্যাহতি লাভ করলে।
তার পর পিতার পালা। হানিক এবং বাবুর উপর মামলা করলে

তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে। সে মেয়েকে যত্নে রাখবে উপযুক্ত
পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ লেবে।

তাদের প্রত্যেককে ধমক দিয়ে সাহেব স্ব স্ব স্থানে ফেরত
পাঠালেন। হানিককে শালা বডমাস বলতে হাকিমের শঙ্কা
হ'ল না। তারপর আমার পালা।

লজ্জার আমার কষ্টরোধ হচ্ছিল। বুক পকেটের নোটের
তাড়া বৃশ্চিক হয়ে বন্ধে হল কোটোচ্ছিল।

আমি কোনো প্রকারে মুহূষ্মরে বললাম—আমি হুঃখিত।

সাহেব বললেন—আপনি কেমন ক'রে জানবেন? কিন্তু
আপনি শিক্ষিত যুবক, আমাব সম্বন্ধে। আপনার সমাজের
প্রতি কর্তব্য আছে।

—অবশ্য।

আপনাকে কে নিযুক্ত করেছে?—বাবু?

আমি বললাম—দয়া কবে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাদের
বৃত্তির নিয়ম—

—আচ্ছা! আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। কিন্তু
যদি—বাবুর সাক্ষাতের সুযোগ পান, তাকে বলবেন, যতদিন
আমি এ জেলায় থাকব, সে যেন এদিকে না আসে।

আমার সাহস হল না, এ কথার প্রতিবাদ করবার।
আধ্যাত্মিক দীনতার অমুভূতি আমাকে লজ্জা দিচ্ছিল। হুর্কল
বেরছিল কি জানি হাকিমের কি মনে হল। তিনি হেসে বললেন—
আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না।

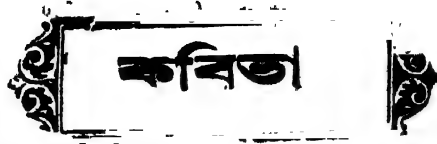
আমি মাত্র 'থ্যাক ইউ' উচ্চারণ কবতে পেরেছিলাম।

তারপর সেই হাকিমের কাছে আমি একটা বড় মামলা
জিতেছিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার এক বাগান-পার্টিতে সেই
সাহেবকে দেখেছিলাম। সেই সপ্তাহের শেষে তিনি অল্প এক
প্রদেলে লাটসাহেবী করতে যাবেন। একজন বড় সাহেবকে
ধোরে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম। হুঁচার কথার পর এই মামলার
কথা বললাম। সাহেব কপালে তর্জনী ঠুকে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ
ঐ রকম একটা মামলার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আপনাকে
কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না। তারপর সাহেব হেসে বললেন
—আমি কত বোকা।

আমি বললাম—গবর্ণরগিরি যদি তার কল হয় তো চালাক
হবার আবশ্যক কি?

আমি অত্মাপি সে বাবুটিকে আর দেখিনি—অন্ততঃ চিনতে
পারি নি। কে জানে আজ তার চরিত্র কি? স্বন্দরীয় লোভ
এমন মিথ্যা অভিযোগের কারণ হয়। তার বহু দৃষ্টান্ত আমি
জানি।



উদ্ধৃতির প্রতি গোপীগণ

গোপীদের প্রতি উদ্ধৃতি

ঐদিলীপকুমার রায়

(কীর্তন)

মধুরায় মণি শ্রামলের দীনা গোপীদের কথা মনে কি পড়ে—
 যারা ছিল তারা চরণ-নলিনা, তুলিত ভুবন বাঁধীর স্বরে ।
 প্রিয় পরিজন স্তম্ভ সাধ যারা আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে,
 গৃহ থেকে যারা ছিল গৃহহারা তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে ?
 বলো ওগো সখা বলো তারি কথা, আমাদের কথা বোলো না তারে
 কী হবে বলিয়া ? ফুল বরা ব্যথা ফুলফোটা করে বুঝিতে পারে ?
 অবলার বলো কী আছে দিবার ? রূপ তো শিশির বালুকাচরে :
 নয়ন-নদীর টেউগুলো তার চরণ-সিঁধু খুঁজিয়া মরে ।
 বৃন্দাবনের আছে হার শুধু যখন সে-ও তো ব্যথায় কালো,
 ব্রজের বাসর রাস রস মধু রচিত তাহারি মায়ারী আলো ।
 সে রতিন মায়ার মধুরায় শুনি নব নব প্রেমে নিতি নিবরে
 পেয়ে নব-উছল। সুরধনী সুরহারাদের মনে কি পড়ে ?
 যার আছে ধন ধনী নাম তারি শক্তি বাহার সেই তো বলী ।
 আমাদের শুধু আছে আঁখিবারি নাহি তো আমরা কথা কুশলী ।
 নাই কিছু তবু যারা দিতে চায় অকারণে মন কেমন করে
 হেন গোপীদের আজ মধুরায় বারেকো তাহার মনে কি পড়ে ?
 প্রাণ চায় দিতে কুলেরে বিদায় কেন চায় বলো কেন কি জানে ?
 যে-নিষ্ঠুর চিত্তেরে ছেড়ে যায় তারি পানে ধাই কিসের টানে ?
 পলকে যে ভোলে কেন তারে কতু পারি না তুলিতে পলক তরে ?
 সে চির উদাসী জানি, বলো তবু গোপীদের তার মনে কি পড়ে ? *

(*ঐমন্তাগবত—দশমস্কন্ধ—৪৭ অধ্যায়)

শ্রামলের প্রেমে বাহারা বিভোর তুলি' স্তম্ভ সাধ প্রিয় স্বভবে
 তাহারেই শুধু জানে চিতচোর ধন তাহার তিন ভুবনে ।
 আশার চমকে যে আলোক জলে সে-বীপনে পথ বার না দেখা :
 যে-প্রদীপ জলে নিরাশা অতলে সে দেখায় তার চরণ রেখা ।
 দান করি' তারে কে পেয়েছে কবে যোগেবাগে ধরা দেয় না বঁধু :
 মিলে কি তাহারে শুধু নাম জপে না ঝরিলে সেখা হৃদয়-মধু ?
 কে বলে তোমরা দীনা ভিখারিণী গরবিনী যারা লভিয়া তারে ?
 দেববল্লভে নিল যারা কিনি' দেবতুল'ভ দুর্ভাগিনী ?
 ছাড়ি' কুল বরি' অকুল তারণ জীবনে মরণ বাসিলেভালো
 তারে বিনা গণি' আধার ভুবন নাই পেলে তার আলোর আলো
 কে বলে কলংকিনী তোমাদের শ্রণয় বাদের প্রেমল বাঁধা ?
 তারি সহচরী হয়ে সহজের সখীস্বর হ'ল বাদের সাধা ।
 তারে জানে যারা স্তম্ভের কারণ সাবধানে চায় শরণাগতি
 নহে তারা তার আপন তেমন যেমন তোমরা লো চিরসতী !
 পূজারী সে জানে মন্ত্র শ্রুতি প্রার্থী সে জানে কৃতজ্ঞতা,
 জ্ঞানী জানে তার জ্যোতি নিরবধি প্রেমিকা তাহার প্রাণের কথা ।
 সে কথা তাহারে বলি' হরি তারি প্রেমে কিরে পার আপন স্তম্ভ,
 অভিসারিকার তরে অভিসারী নহিলে যে তার মিটেনা স্তম্ভ ।
 হেন শ্রামলের যারা বরণীয়া নমি আমি তাদের চরণে—
 তম্বু মন যারা তাহে নিবেদিয়া ফুল হয়ে কোটে কাঁটার বনে । *

(*ঐমন্তাগবত—দশমস্কন্ধ—৪৭ অধ্যায়)

কে বলে রে মায়ার খেলা

ঐশ্বরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

কে বলে রে মায়ার খেলা ছায়ার আলোড়ন,
 সে জানে কি মায়ের বুকে কিসের আলাপন ?
 পিতৃস্নেহের গভীরতা,
 কোন অসীমের দেয় বারতা,
 ধন ধরা লভি' এদের চরণ পরশন ।

নয়ন' মায়ার মরীচিকা যুগ-তুফান ভরা,
 ছল চাতুরী প্রবঞ্চনা এই নিয়ে এই ধরা ।
 অন্তরে তার ফল্গুধারা,
 কোন অমৃতের দেয় ইসারা,
 পাষণ্ড বৃকে অর্ঘ্যধারা মানে না বন্ধন ।

স্বর্গে যদি স্তম্ভ থাকে সে স্তম্ভ মোর মায়ের বুকে,
 হেথা হাসি কান্না দোলায় বড় ঋতু দোলায় স্তম্ভে
 চাহি' প্রিয়ার মুখের পানে
 সন্ধ্যাতারা মধুর গানে
 এই ধরণীর 'পরে করে অমৃত সিঞ্চন ।

বর্ষা-সন্ধ্যা

কালো মেঘখানা জল দিয়ে দিয়ে ঝেঁপেছে সরে,
কিছুটা কাঁকা।
সে কাঁকার পাশে এখানে ওখানে কতনা মেঘ—
আকাশ ঢাকা।
কালো মেঘ-তলে লম্বা কাঁকার ঝিক্‌ঝিক্‌ করে
শাদা ও সোনা।
বেন কালো শাড়ী, তাহাতে উজল রঙ্গিন হলুদ
পাড়টি বোনা।
স্বর্ঘ্য কোথায় ভূবে ভূবে বার মেঘের আড়ে,
বার না জানা।
মেঘ-অরি-দলে করিতে ভ্রম নরনে তাহার
আগুন হানা।
দক্ষিণে হেরি সাদাটে ধোঁরাটে থাকে থাকে ফোলো
মেঘের দল।
মাথার উপর হেঁড়া মেঘগুলা বড়ই কাতর
রিক্ত-জল।

ঐশ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মেঘ সরে যায়, পিছে হেসে উঠে দশরী তিথির
আধেক চাদ
আকাশ ছাঁকিরা তুলেছে মাদিক জালসম ওই
মেঘের কাঁদ।
তপনের সোনা ম'রে ম'রে বার, মেঘ স'রে স'রে
তাহারে ঢাকে।
মেঘের চলন, আলোর মরণ চাদের কিরণ
ঘটিতে থাকে।
চেয়ে চেয়ে দেখি অবাচ্‌ হইরা জীবনের গতি
আকাশ জুড়ে।
নারিকেল পাতা মেঘ-লোকে দোলে, কচুপাতা নড়ে
নিকটে দূরে।
আমার জীবন এ বৃকে ছলিছে পাতার সঙ্গে
মেঘের সাথে।
বিশ্বলীলার সাথে সাথে প্রাণ তাল দিয়ে দিয়ে
তর্কে মাতে।

পিতৃযজ্ঞ

বংশের আদি মাতা পিতাগণে
প্রণতি জানাই পায়।
গঙ্গাসাগরে করি তর্পণ
গোমুখী ভেদি তা বার।
পুণ্যপুত্র—হে স্বর্গবাসী—
ভক্তি ও পূজা করি, ভাসবাসি,
তোমাদের দীন সন্তান করি
বন্দনা কবিতায়।
তোমাদের স্নেহ শুভ আকাঙ্ক্ষা
বংশ লতিকা ধরে'
স্বরভির মত নামিরা এসেছে
য়েথেকে এ বৃক ভরি।
এ তৃণ ফুলের পারিজাত সনে—
আছে সংযোগ জানি আমি মনে।
তোমাদিগে আমি পরশ করিতে
হরিরে পরশ করি।
সৃষ্টির সেই আদি হতে এই
সুদূর বর্তমান।
এনো তোমাদের অমৃতের ধারা
পাই তার সন্ধান।
সব্বদ্ব্য এইমনি সুখ দুখ ব্যথা,
এই প্রতীক্ষা এই ব্যাকুলতা,
করেছ ধরার এই মধুবিব
আমাদের মত পান।

ঐকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হর-পার্বতী সম পবিত্র
ছিলে এসে ধরাগার,
নব নব আভিজাত্য দিয়েছ
বংশ মর্যাদায়।
ধর্মনিষ্ঠ উন্নত গুণি,
জ্ঞানী, তেজস্বী, বিপ্লব কুটি,
শেলে আনন্দ শিবের সেবার
জীবের শুভ্ৰধার।
তোমাদের কাছে এক হয়ে গেছে
নর আর নারায়ণ,
শ্রষ্টা এবং সৃষ্টির সেধা
হয়েছে সম্মিলন।
পিতৃলোকের অমৃতের হ্রদে
গঙ্গা মিশিল আসি' হরিপদে,
আমি নর বটি—জেনেছি আমার
দেবতার পর ন'ন।
কত সভ্যতা ভাঙিল গড়িল
যুগ ও যুগান্তর!
হেরেছ তোমরা সহ করেছ
কত মহাস্তর।
যায় নি শুকায় তোমাদের ধারা,
বিপর্যয়েতে হয় নাই হারা,
ফলে বিস্তৃত শাখা প্রশাখা
বৃহৎ বৃহত্তর।

শুধু তুমি—শুধু আমি দুইজন

বন্দে আলী মিয়া

মোর কামনার রূপ ধরে তুমি
দেখা দিলে প্রিয়তম,
রাতের স্বপন ফুল হয়ে আজ
কোটে অন্তরে মম,
দখিণ বাতাসে রাঙা পথ-ধূলি
সহসা বেন রে উঠেছে আকুলি,
নরন সলিল আজিকে আমার
হলো মধু মনোরম ।

মনের ময়ূর পাখনা মেলিয়া
উড়ে যায় নীল নভে,
রূপ বসন্তে জাগিল জীবন
গুঞ্জন-কলরবে ।
শুধু তুমি-শুধু আমি দুইজন
চোখে চোখে চেয়ে থাকি অমুখন,
অমুখ্যাগে রাঙা মোদের ভুবন
সুন্দর অমুখম ।

দর্পচূর্ণ

শ্রীআনন্দের সান্ত্বনা, এম-এ

তোমায়ে ছাড়িয়া যবে উঠিবারে চাই,
বারবার আছাড়িয়া শুধু প'ড়ে বাই
অসহায় বলহীন শিশুর মতন
ভূমিতলে ! হে ঈশ্বর, মোর আশ্বাসন,
শূন্যগর্ভ অহমিকা—অজ্ঞভেদী আশা,
স্পর্ধানীল—অবদিত মোর সর্বনাশা
এ আশ্বস্তায় আর কীণ বাহ-বল
অবিশ্রান্ত করি' চূর্ণ দেখাও কেবল
এ-দাস তোমার অণু হ'তে অনীড়ান্
বিশ্বসৃষ্টিমাঝে ! প্রভু সর্বশক্তিমান,
আরো দাও দেখাইয়া কৃত্ততা আমার,
ব্যর্থতার সুরে ভরি' দাও বীণা-তার
হৃদয়ের ! ধীরে ধীরে দৃপ্ত মোর শির
তব পদ-প্রান্তে প'ড়ে হোক চিরস্থির !

প্রভুর করুণা কতখানি পেলে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তপে জপে আর ধ্যান ধারণায় যাপিয়া হাজার দিন
মাঠে মন্দিরে প্রতিমা সাজারে বাজারে ভাবের বীণ,
বারোমাস ধরি' তেরো পার্বণে উৎসব করি' তুমি
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি ।
ভক্তভাবুক বারে বারে এসে শুনাও তোমাবে গান,
কত অবতার বন্ধে ধরেছ তীর্থে করিয়া স্নান ।
উপনিষদের জননী এবং গীতার ধাত্রী তুমি,
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি !
জড়বাদ আর মার্যবাদ হ'তে মুক্ত হবার তরে
এত যে দারুণ সাধনা করেছ লক্ষ বছর ধরে,
কি ফল লভিলে কহিতে পারো কি ? এই হৃদিনে তুমি
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি !
মহিমা তোমার চির সমাহিত বিদেশীর অভিহানে
গরিমা তোমার ভুবেছে সাগরে লাহুনা অপমানে ।
তব জীবনের আগ্নেয়গিরি—পড়েছে তুবারে ধূমি,
প্রভুর করুণা কতখানি পেলে আমার জন্মভূমি !

ঘরের বাঁধন ভাঙলি মিছে

আপনারে তুই আপন ভুলে খুঁজিস্ ভোলানাথে,
সেই ভোলা যে তোর মাঝে ভাই ছিলে ভবেরসাথে ।
ঘরের বাঁধন ভাঙলি মিছে,
অশান সাধন করিস কি যে ।
কুহেলিকার ময়ূর গিছে
ভুলের কুসুম গাঁথে ।

তোর ঘরে সে অরূপ হয়ে রূপের রসে রয়,
মায়ার খেলার খেলুছে সে জন, মায়ার বাঁধন নয় ।
অগমলীলা চলছে প্রাণে,
যেজন প্রেমী সেইতো জানে
বেহুল হয়ে বাহির পানে
ছুটিস্ দিখল যাতে ।

শ্রীপতির হৃদয়-জাগরণে কারণ সবচেয়েই জন্মের বড়তরফটাই এখন বহর করে বাণ্ডী বইয়ের কপড়ার প্রাণ হান দখল করেছিল। অত কোন তুচ্ছ বুদ্ধিগতি নিয়ে কপড়ার আঁত হলেও কলহটা তুলু হলে উঠত সেই প্রাণতন এক অসামান্যের মতনিকো।

হেমাজিনী বলতেন, 'তোমার জন্মই তো এমন হোল, দিনরাত কেবল খাই খাই, 'নাও নাও' করেই তো বাছাকে তুই ভিটেভাড়া করলি, না হ'লে এমন ভরা সংসার এমন কতি কতি হলে সেয়ে কেলে কেউ বিধাঙ্গি হয়ে পথে বেয়োর? এই কি তার বিধাঙ্গি হওয়ার বসন?'

পূর্ববৎ সন্ন্যাসী জীবন নিত, 'বর' যে সে কার জন্ত চেড়েছে সে কথা বেশকিছু লোক জানে, সত্যনিম তো কেবল এই বস্ন দিয়েই বউয়ের এটা ভালো না ভটা খারাপ, খাওয়ার জিনিস দেখলে জিত দিয়ে জল পড়ে, পর-পূর্ব দেখলে চোখের পলক পড়ে না। সত্যনিম হরও বা মানুষে মূখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে না, খাওয়াই হয়ে তুমি তাই করেছ। বেয়োর মরে খাই। এখন বস্ন জপ না কানে, বস্নের সাথে বর কর না তেলে নিয়ে? আমিই যদি তাকে বরভাড়া ক'রে থাকি, বেশ করেছি উচিত করেছি।

হেমাজিনী প্রতিবাদ করে বলতেন, 'এসব কথা আমি বলেছি? তোমার নিজের মনে আছে পাণ, আর কখনো জিজ্ঞাস আবার মানে, হে ভগবান, হে আকাশের চক্ৰ সৃষ্টি তোমারই সাকী।'

সন্ন্যাসী এর পর হঠাৎ একটু হাসত, 'খাক, খাক, তাদের চেয়েও বড় সাকী আছে আমার হুঁট কান, শুধু যদি নিজের কানে না শুনতাম।'

হেমাজিনী এক মুহূর্ত্ত অবাক হয়ে পূর্ববৎ মূখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। স্বপ্নভার মাঝখানে কঠক নীচ পর্দার মাঝে এমন ময়ূর করে একটু হাসবার অপূর্ণ কৌশল শুধু যে তিনিই জানেন না তাই নয়, সন্ন্যাসী ছাড়া আর কাউকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে তিনি দেখেনও নি। কিন্তু না দেখলে হবে কি, এটুকু তাঁর বৃত্তে থাকি থাকত না যে এই এককোটা হাসির কাছে তাঁর সমস্ত ক'বাকালো কটুবাক্যই নিতান্ত জোলা এবং হাস্যকর হয়ে গেছে।

কিন্তু হুঁট একটু বহর ঘুরে আসতে না আসতেই স্বপ্নভার বিবরটা বদলাতে শুরু করল। শ্রীপতির কথা প্রায় ওঠেই না। সন্ন্যাসী আলকাল বলে, 'লজ্জা করা উচিত। আবার বাবা হাত তুলে হুঁটের তব এক সন্ধ্যা জোটে। এর পরও জোটে বৈলে স্বপ্নভার কহতে আসতে আমি তো পারতুম না। একবার ভেবে দেখতুম এতখানি পলার জোর কার ভাতের জোরে।'

কথাগুলি হেমাজিনীর বুক গিরে বাজে। একমুহূর্ত্ত তিনি যেন কথা খুঁজে পান না। তারপর আবার শুরু করেন, 'খাক বড়লোক বাবার বড়ই আর করিসনে, মাস জন্তে পাঠার তো লম্বা টাকা, তাতে তোমার আর হোর ছেলে বেয়েরই মুলোর না, তা আবার জন্তে খাবে। কত বড় জন্তর কত বড় বিবেচনা তোমার বাপের। ও পর পাড়ার গিরে করিল, আমার কাছে করতে আসিল না। আমি আমার বাবী-বউয়ের ভিটার থাকি। তাঁরা বা রেখে গেছেন তাতেই আমার চলে। তোমার বাপের ধরতে তুইই খাস আর কেউ তা খা পায়ও ঘোঁর না।'

বাবী-বউয়ের সম্পত্তি হিসাবে বিধা তিন চারেক ধনী জমি, বাড়ীর লাগা একটা বীলখার এদের আছে। বান বা পাণ্ডা বায় তাতে মাত্র বছরের মাস দুই আড়াই খার, আর বীল খারের বীল বিক্রি করেও সামান্য কিছু হয়। না হ'লে কেবল সন্ন্যাসীর স্বাধী হীরালাল খোসের প্রেরিত লম্বা টাকার চারিটি ছেলেদের এবং দুটি ছোলাকের চলবার কথা নয়। সন্ন্যাসী তা বাখে। সত্যি কহতে কি বহুশ পিতা তাঁর সবচেয়ে যে এমন অধিবচক এবং কৃপণ হকম তা সে খারখার আঁকতে পারে সি। পাছে সে আঁকত টাকা খাবী করে, কিংবা ছেলে-মেয়ে গিরে হুঁটার মাল বাপের বাড়িতে

আসবার ইচ্ছা জাগায় সেই ভয়েই যে তার বাবা এই বহর করেছেন মধ্য একবার এসে বোঝাট পূর্য্য করেন নি তা সে জানে। এর জন্তে বাপকত সে কমা করে না। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে অন্য যে হুঁট একজন আত্মীয়-বহন আছে তাঁদের সঙ্গে কল্যাণ দেখা সাধ্যাং কি চিঠিপত্রের বিধির হলে বাপের স্বরধীনতা সে নির্বনভাবেই সকলের কাছে প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু হেমাজিনীকে বোটা দেওয়ার সময় এই লম্বা টাকাই হাজার টাকার কাজে আসে। আর এই সব কথা প্রায়ই তোলে খাওয়ার সময় সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেয়ে, সন্ন্যাসী ছেলে মেয়েদের লাইরে খাইয়ে দিলে বোলা দুটা আড়াইটের হেমাজিনী বহন হাবিত করতে কলবেদ; সন্ন্যাসী, যেন সেই সময়টার দিকে তাক করে থাকে। এমন দিন খুব কমই যায় যেদিন ভাতের পাখরে হেমাজিনীর চোখের জল পড়ে না।

সন্ন্যাসী নির্বিকারভাবে নিজের এই নির্বনতা উপভোগ করে। তাঁর কথার স্বাভাবিক হেমাজিনীর মত মানুষেরও যে চোখ গিরে জল বেয়োর, এ লেন সন্ন্যাসীর এক পরম কুতিষ। যে ক্রুর ভাগ্য তার সঙ্গে নিজের খেলা খেলছে তার প্রতিনিধি যেন সমস্ত একমাত্র হেমাজিনী। সমস্ত জ্ঞাত সমস্ত অবিচারের প্রতিশোধ হেমাজিনীকে নির্ঘাতনের দ্বারা যেন নিরুত্তর হবে। আর যদি কোন দোষ তাঁর নাও থাকে, এই তো বৃষ্টি যে শ্রীপতিরই না হেমাজিনী, যে শ্রীপতি চারটি শিশুসন্তান আর নিসংহার দুকটী স্ত্রীকে এমন ক'রে কলে রেখে বেরিয়ে যেতে পারে।

কী এমন পাণ করেছে সন্ন্যাসী যে তার জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ হয়ে গেল? এ প্রশ্নের জবাব যে-ভাবেই হোক শ্রীপতির না হেমাজিনীর কাছে থেকেই সন্ন্যাসী আদায় করে ছাড়বে। কেন না শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস ক'রে এর কোন উত্তর মেলে নি। সম্প্রতি এক দেবরকে সঙ্গে ক'রে শ্রীপতির আশ্রয় পূর্য্য সন্ন্যাসী খাওয়া ক'রেছিল। বাবীর সহ্যে বাধা সবেও তাঁর পায়ের উপর মুখ রেখে সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস ক'রেছিল, 'সত্যি ক'রে আমার গা হুঁয়ে বল, কি দোষে তুমি বর ছাড়লে? কী দোষ দেখলে তুমি আমার?'

মাথামুড়ে, কথার বস্ন পরে শ্রীপতি তার কিছুদিন আগে সন্ন্যাসী নিয়েছে। সন্ন্যাসীজনেচিত শাস্ত কঠে এবং স্নিহহাস্তে সে জবাব দিয়েছিল, 'তোমার তো কোন দোষ নেই সন্ন্যাসী।'

"তবে না যে বলেন আমার স্বভাবচরিত্রে তোমার সন্দেহ এসেছিল। বল, তোমাকে ছাড়া এমন কোন পুরুষের সঙ্গে—"

শ্রীপতি জবাব দিয়েছিল, 'ছিঃ, মার খারগা অভ্যস্ত তুল।'

সন্ন্যাসী কিছুটা আশাবিহীন হয়ে বলেছিল, 'তবে? টাকা-পয়সা জিনিস-পত্রের জন্ত তোমাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছি বলেই কি—কিন্তু সে তো তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্ত, তোমার সংসারের জন্ত। আচ্ছা, তুমি কিরে চল। আমি আর কোন কিছু যদি তোমার কাছে চাই। তুমি শুধু কিরে চল।'

শ্রীপতি তেমনি স্নিহহাস্তে বলেছিল, 'এ তোমার অভ্যস্ত ছেলেনামুয়ের মত কথা হোল সন্ন্যাসী। সংসারী মানুষ তো ওসব চাইবেই। তুমি নিশ্চিত খেক, আমি যে সংসার ত্যাগ করেছি সে তোমার কোন দোষ নয়। কোন সাংসারিক কারণেও নয়।'

"তবে কেন তুমি এমন ক'রে চলে এলে?"

"সে কথা বুঝবার সময় তোমার এখনো আসেনি সন্ন্যাসী।"

হুঁসহ ক্রোধে সন্ন্যাসীর সমস্ত গা জলে গেছে, 'বেশ তো, আমার সেই বৃত্তে পারার সময় পড়তই না হয় তুমি অপেক্ষা করতে।'

'তুমি খেঁচা লাগাছ, সন্ন্যাসী, কিরে খাও? সংসারের কার জন্ত কে অপেক্ষা করতে পারে?'

কিন্তু কারো না কারো জন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া সন্ন্যাসীর আর হুঁট কি বিধিরেই সরমাকে? কিরে এসে সন্ন্যাসী শান্ততার সঙ্গে আর এক সেট

করুণা করেছিল। তার আর কোন আশ্রয় নেই। শুধু জিজ্ঞাসা, তার কোন শত্রু নেই, শুধু হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু মনে হাজার হাজার ধাক্কা লাগলেও চরিত্র বঁটা আর নাহয় স্বপড়া করে কাটাতে পারে না। বরং পরম শত্রু নিজের পায়ের পর পায়, বহুরের পর বহুর একত্র বসবস করে হ'লে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে তার সঙ্গেও শত্রুতা ছাড়া আর এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে; হেমাঙ্গিনী আর সরসার মধ্যেও তেমন একটা সম্পর্কের সূচনা দেখা বাজিল। ইতিমধ্যে দেখে যাওয়া যায়। অত্যন্ত বড় বাড়িতে লাগল, দুজনায় মধ্যে স্বপড়াও শুরু হতে শুরু হল। স্বপড়ের বাঁশ এবং ভিটা-বাটার গাছপালা বিক্রির টাকার সঙ্গে বাণেশের দেওয়া চপটাকা ভাতা যোগ করেও এখন হেলেনের-জন্মের সামনে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন সরসার দুটি পেল হেমাঙ্গিনীর ওপর, কী প্রয়োজন আছে এই প্রোচা ক্রীলোকটির বেঁচে থাকবার? সরসার হেলেনেরের মূখের প্রাণে ভাগ বসানো ছাড়া সংসারে বেঁচে থেকে সে আর কোন কাজটা করবে? আর যদি বাঁচবার এত সাইই থাকে, অত কোথাও গিয়ে বাঁচুক না? হেমাঙ্গিনীর ভরীপতি আছে, বোনপো আছে, সেখানে গিয়ে কাটবে আরেক না দু'মাস?

সরসা একথা পরামর্শমূলক হেমাঙ্গিনীকে দিন দুয়েক বলতে গেল। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কোন পা বাঁচবার লক্ষণ দেখা যায়নি। আরও একদিন প্রত্যহাল ভুলতেই হেমাঙ্গিনী স্বপড়িয়ে উঠলেন, "আমি যে তাঁর দু'চক্ষের কাঁটা ভাতো অনেক দিন থেকেই জানি। একবেলা যে একমুঠো হবিড়ি করি ভাত হোর প্রাণে পর না। কেমন বাব অত কোথাও? আমি কি তাঁর খাই না পরি?"

সরসা কিছু বলবার আগে জবাব দিয়েছে কণা, সরসার বহুর ঘণ্টকের ঘরে, "পোন না, ঠাকুরসার কথা পোন, বলে একমুঠো হবিড়ি করি। রোজ টুনি মেলে মেলে তুমি যে আশ্রয়ের ক'রে চাল নাও, তা কেন আমরা আর দেখি না?"

সরসা বুঝ টিপে হেসেছে, "তুই চুপ কর কণি।"

"হ্যাঁ না, সজ্জি। আমি রোজ দেখি।"

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ বিষয়ে অবাক হ'য়ে রইলেন, তারপর জবাব দিয়েছেন, "তা তো দেখছিই। সাপের পেটে সাপ ছাড়া আর কি হবে? কখনো ঘেরকে শিখিয়ে না দিয়ে নিজেকে বললেই হ'ত।" কণার কথার সরসা মনে মনে যে একটু লজ্জিত না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর নিখুঁত অপব্যবহারে সেই লজ্জা ক্রমে রূপান্তরিত হ'তে সময় লাগেনি, "শিখিয়ে দিয়েছি? বেশ। হাজারবার শিখাব। তোমার সঙ্গে হ'ল থাকো, না হ'ল চলে যাও। হেলেনেরের কিছু শেখাতে হয় না। ওরা যা দেখে তাই বলে।"

সে-দিনই রাতে আবার এই বাণীরা নিয়েই স্বপড়া বাঁধল। শোরগোল আগে হাড়ি ছুঁড়ে খেঁড়ে কোথেকে একমুঠ বই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে জল খেতে বসলেন হেমাঙ্গিনী। সরসা দেখে বলল, "তবে যে বিকালে কলসেন, খই ফুরিয়ে গেছে। খাব খাব বলে হেলেনটা অত কাঁদল, একটা কিছু তার হাতে দিতে পারলাম না। দিনেই হোত একমুঠ বই তাকে।"

হেমাঙ্গিনী খই শুক বাঁটটা বহুর একবার থেকে আর একবারে ছুড়ে ফেলে দিলেন, "খা, খা, প্রাণের সাথ বিটরে খা।"

কোত দুঃখে হেমাঙ্গিনীর মন এলো না। কেবলি মনে হ'তে লাগল—আর কেন। কিসের মায়ার তিনি এখানে পড়ে আছেন? তাঁর হেলে সংসার জাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও তো সমস্ত বহুর সঙ্গে পড়ছে। তিনি না বুঝে এই সব শক্তিশালীত্বের আশ্রয় মনে ক'রে নিখুঁত মায়ার আশ্রয় হ'য়ে রয়েছেন। অতঃপর কেউ তাঁর নয়? এই দুঃখের সংসারে কারো জন্যই কিছুমান আশ্রয় হেমাঙ্গিনী অনুভব করছেন না। বরং তাঁর আশ্রয় হ'তে যাওয়া এখন নিজের বাড়ীতেই গুরু উপোষ ক'রে করতে হবে।

বেদন সরসা কেবলি তাঁর হেলেনেরের দল। সাপের পেটে আর কতকগুলি সাপ এসে জেরেছে।

ভোরে উঠে তিনি পাড়ার ফেললেন। সন্ধ্যারের বাকি পিঠি গুটাই সম্বরণী। একই বহুরে বই হ'য়ে এই প্রবে তাঁরা দু'কোণের। এ পাড়ার উঁকেই হেমাঙ্গিনী একমাত্র শ্রমচার খাই মনে করেন। আর খাইকেই তিনি চিনেন। সাক্ষ্যে বহুর, অন্যভাবে শিশু ক'রে তাঁর ছুড়ি নেই।

হেমাঙ্গিনী কেঁদে কলসেন, "আজ দু'দিন হ'য়ে আমার মনো উপশাস যাচ্ছে বিস্তার না। শত্রুরা আমাকে না খাইয়ে খাইয়েই মারবে।"

কলকাতা থেকে বিস্তার দিন করেক আগে ছুটি নিয়ে এসেছিল অর্জুন। সমস্ত শুনে সে বলল, "আমার কথা শুনবেন খুঁড়ি না? তাহ'লে হয় তো একটা ব্যবস্থা হ'তেও পারে।"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "শুনব বাবা শুনব। তুই যা আমাকে করতে বলিস তাই করব।"

বিস্তার একটু ভেবে বলল, "তাহ'লে আর দেরি নয়। চলুন আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায়। সেখানে শিখিরপুর কলসে আমি ধানের কাজ করি তাঁরা এক অন্যথ-আশ্রয় খুলছেন। মা-বাপ হারা ছোট ভোট হেলেনেরের সেখানে খেতে পরতে দেওয়া হয়। তাদের শুদ্ধাশ্রয়ের জন্য একজন খুব ভয়বহুর বহুর। ক্রীলোক ওরা খুঁড়িছেন। আপনাকে সেখানে আমি ঠিক ক'রে দেব। খোঁজা পোঁজা করে সাইনেও পাবেন পনের বিশ টাকা। আপনার কোন ইচ্ছাও করবার কিছু নেই, কেন সম্ভাব্য কাজ, তাড়াহুড়ি আমিই তো আছি।"

হেমাঙ্গিনী শুকখণ্ড বললেন, "তাই নিয়ে চল বাবা, এই শত্রুপুরীতে আর নয়।"

তবু বাণীর সময় জোখ দিয়ে জল ফেলল হেমাঙ্গিনীর। খাবী-বহুরের ভিটে কেড়ে এই যে নিত্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাকে বেরতে হোল, এর মধ্যে পরামর্শের অবমাননার কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। পূর্ববহুর সঙ্গে তিনপনেরে উঠলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সে বাড়ির বের ক'রে ছাড়ল। বাণীর সময় তিনি সরসাকে বলে গেলেন, "এবার শিটেছে তো মনের সাথ? আমার চেলেকে ভিটা ছাড়া ক'রেহিস, আজ অব্যাহত করলি। এবার মনের স্বখে থাক একেবার হয়ে। যা খুশী তাই করতে পারবি, কেউ খাবা দেবে না। কিন্তু আকাশে এখনো চন্দ্র খুঁড়ি ওঠে, তারাই সাক্ষী থাকবে। যে আশার আশাকে তাড়ালি সে আশার বেন ছাই পড়ে, চাই পড়ে, ছাই পড়ে।"

আজই পাড়ী ঘরবার জন্য বৌকায় করে বেতে বেতে হেমাঙ্গিনীর মনে হ'তে লাগল সমস্ত পৃথিবী বেন পুড় হ'য়ে গেছে। কোন আশ্রয় নেই, খাব নেই জীবনে।

মাসখানেকের মধ্যে দুইতক চরম রূপ গ্রহণ করল। চালের বন বাট টাকা সমস্ত টাকা; তাও সর্বত্র পাওয়া যায় না। বহুরে সোনা রূপ, সন্ধ্যা বা অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রি করে কাল পর্যন্ত চলেছে। খাবা বই বই কিছু বলতে আর নেই বহুর। তবু সরসা কারে ওঠে মাতী হাড়ি ছুঁড়িওনি মেড়ে কেড়ে কেড়ে, মনের ভুলে কোথাও যদি কিছু যেনে থাকে।

এই সময় গোষ্ঠী অকস্মেৎ শিকল এসে গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধে বহুর জরীর আছে। হেলেনেরের কলসের টিকির উঠল, খা, খা, খোঁজা শিখির, টাকা এসেছে। পড়ি কি বহুর ক'রে বই হেরে তাড়াহুড়ি-কেনে এসে সরসা। "বাবা টাকা পাঠিয়েছে খুঁড়ি?"

হ্যাঁ, সরসার দ্বারা সর, টাকা পাঠিয়েছেন হেমাঙ্গিনী। দুইট টাকা বহুর

করায় ক'রেছেন। টাকাটা সেই ক'রে রেখে জড়াজড়ি হুপসেবার নিয়ে পড়তে কলম রাখা।

দেশের অবস্থার কথা সব হেবাদিনী শুনেছেন। অব্যাহ আঙ্গুরের একটি হেসে ঘেঁষে ঠাঁকে ক'রের কাগজ পড়ে শোনায়। তার কুখ টিক সরবার বড় হেসে খোকনের মত। সরবা আর তার হেসেখেকের কথা ভেবে চোখে দুব ছর না হেবাদিনীর। মাইনে পেরেই সবুজ টাকাটা তারের মত তিনি পাঠিয়ে দিলেন। হেবাদিনীর মত ভালো মেই। তার ওখানে কোন বসন্তই লাগে না। তিনি থিতুকে ব'সে কয়েক দিনের মধ্যেই আরও কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সরবা যেন হেসেপুলে নিয়ে সাবধানে থাকে। কোন চিন্তা ভালো বেল না করে সরবা। হেবাদিনী বেঁচে থাকতে সরবার জর কিসের?

হেবাদিনীর এমন স্নেহ আর গভীরতা সরবার কাছে অসম্ভবিত। এই টাকা করায় যা পেলে হেসেপুলে নিয়ে উৎসাহ করা হাড়া আর সরবার মজিদ বড়ি ছিল না। সবুজ রাত আর সকাল হুতাকার খাটাবার পর এককণে একই নিশিত বোধ করল সরবা। কিন্তু এমন নিরুদ্বেগ করায় মধ্যে হঠাৎ হুপসের একটি লাইন তার কানের ভিতর থেকে উঠল এবং তার আঙুর সম্পূর্ণ মধুর ঠেকল না। হেবাদিনী বেঁচে থাকতে সরবার জর কিসের? এ যেন হেবাদিনী নয়, সরবার বাবা আবেকার সেই শ্রীপতির গন্ধ। এই বুড়ো বসে অব্যাহ আঙ্গুর হুড়ি টাকা মাইনের হাড়টি নিয়ে কী এমন পোষণ হেবাদিনী, যাতে তিনি মন্তোরাতি শ্রীপতি হয়ে উঠতে পেরেছেন?

তোমারই (চ'রাস)

শ্রীঅলক। মুখোপাধ্যায়

হুর্কল মন সবল চিত্র আঁকে, গরীবের সংসার, অর্থের অভাব, অনর্থের প্রাচুর্য। আজ চাল নেই, কাল জ্বলের মাইনের টাকা নেই, পরণ্ড বাজারের পরসা নেই—এমনি হাজার রকম অভাব, হাজার রকম অনটন, কিন্তু তার মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে ঐ ছেলে জ্যোতি। ওকে কেন্দ্র করেই সংসারটা ঘোরে, কাজেই ওকে নিয়েই সকলের ভাবনা। একদিন ও বড় হবে, দশজনের একজন হবে—এমনি ছিল আশা। দারিদ্র্যের প্রাবনে ভেঙে যাওয়া ওদের সংসারের স্তব্ধের উজ্জান বইবে এই আশাটিকে সহজ প্রাণশক্তি দিয়ে ঘিরে; জ্যোতি বড় হয়ে উঠল, শুধু বয়সে নয়, বাইরের পৃথিবী, বন্ধু মহল, অধ্যাপকদের মনে এবং গোলামীর কাঠগড়ার।

দেখতে দেখতে আয়ের টাকাও ওর ঘরে এল খলে ভোরে। সকাল বিকাল সকলের মনে চমক লাগিয়ে ও গোলামী করতে গেল সাহেব বাড়ীতে। কোন এক বড় সাহেবী ব্যবসাদারের দোকানে ও মাথো এবং ওর কর্মশক্তির উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল ইউরোপীয় অ্যান্ড্রাস্ট্রাক্ট প্রেড পল্লোরতি হবার সঙ্গে সঙ্গে। জ্যোতি দাসের শৃঙ্খলটা পরল ভালো করেই, লোকে বাহবা দিল, বললে বাঙালীর ছেলে সাহেবী প্রেডে চাকরী! মেয়ের বাবা, মামা, কাকার নিলেমের ডাক ছাড়লেন, দাম উঠল হাজার পঁচিশ। সাহেবী দোকানের চারশো টাকা পাত্রোমহলে বাট গুণ হয়ে উঠল, সঙ্গে গাড়ী এক চারতলা বাড়ী। সব এড়িয়েই অনিতা এল, টাকাতু রথে নয়, ঘোঁষনের রঙ মাথানো সোঁন্দর্যের চকমকি আলোয় চোখ ধাঁড়িয়ে। প্রাণপণ চেঁচা করেও বাকে পাওয়া গেল না, বিনা পণেই তার ভবিষ্যৎ গেল বিকিয়ে।

অনিতাকে প্রথম দেখার দিন থেকেই মার মনে একটা গোপন আশা বাধল বাসা। অনিতা কল্যাণীরূপে এসে সংসারের লক্ষ্যের আসন কায়ের করবে, মনে মনে এই আশাটা জলে উঠে অস্ত্র সব কথাকে কলসে দিল।

দেখার দেখতে দ্বিদের দিন এল এগিরে। সানাই বাজল,

বাড়ীতে বাড়ীতে গেল চিঠি, মেয়েদের মনে লাগল নানান পঙ্কের নেশা, মুখে মুখে নানান রূপ নিয়ে নানান কথা ছুড়িয়ে পড়ল। কেউ বললে—অনিতা জিন্দল, কেউ বললে জ্যোতি। বন্ধু মহলে চাকল্য সব তাতেই বেশী প্রবল হল, অমন স্মন্দরী স্ত্রী কারো হয় নি। কিন্তু মজা এই যাকে ঘিরে এত চাকল্য সেই জ্যোতিই রইল নির্ঝাঁক। মুখে মুখে ওদের বয়সের হিসাব হল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের হিসেবটা রইল বাকী। সব মিলিয়ে জ্যোতি অবলম্বন করলে ট্রিষ্ট নিউট্রালিটি, ফলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে রইল মিষ্টিরিয়াস।

সানাই বাজল, নানান রকম লোকের ভিড়ে বাড়ীটা একটি রাতের জন্তে সগর্বে উঠল হেসে। বাইশ বছরের ছেলে একটি দিনের জন্তে পর হয়ে গেল জামাই সেজে। আলোর কমলে ফোটা মুখের ওপর বড় বড় সাদা চন্দনের ফোঁটা গেল মিলিয়ে, লাল ফোঁটা পেল লজ্জা। মাসী মামীর দল থেকে কে বেন ঐ ব্যাপার দেখে বললে, “দরামদার ফোঁটা গেল যে হাড়িয়ে, লাল চন্দনের ফোঁটাই না হয় দাও আরও দু'একটা বেশ ভান্ন করে, নইলে এত চন্দন, এত আরোজ্ঞন, কিছুই বোঝা বাবে না।

দরামদার সগর্বে বললেন, সত্যি। ওর মামাতবোন বললে, বোল না অমন করে, অমন কথায় মাথাটা ওর যাবে গুলিয়ে।

জ্যোতি কিন্তু মাসীর কথাই মনে মনে ভাবছে। সত্যিই ত', এত আরোজ্ঞন, এত চন্দন, কিন্তু বোঝা ত গেল না। বোঝা বাবে কি করে, বোঝা যে ওর মনের পরদার পরদার সোনালী দাগ কেটেছে। ওর বোঝা যে ওর ভালবাসার বোঝা, পাঁচটি বছর যাকে প্রত্যেকটি দিনে ভালবাসার নতুন দানে বোড়পচায়ে পূজা করেছে সেই পূর্ণিমাকে ও ভুলবে কেমন করে।

জ্যোতি আজকের দিনের অপরিমিত আরোজ্ঞনের মধ্যে আর পাঁচজনের অপরিমিত আনন্দের মধ্যে দেখতে গেল পূর্ণ জ্যোতিয়ার নিশ্চুপ কলোল। আকর্ষ্য মেয়ে পূর্ণিমা, পাঁচ বছরের বেন

তাকে বোঝা গেল না, আজকের নতুন জীবনের প্রারম্ভেও তার বোঝা মন থেকে নামিল না ! ওর মনে একটা ভয় আজ আবার নতুন করে নিজেকে প্রসারিত করলে। সত্যি কি পূর্ণিমা ওর মনে ওর জীবনে বোঝা করেই রইলো ?

শাঁখের শব্দটা ওর কানের কাছেই বেজে উঠল। মামাত বোন ভয়ানক দুই, বললে, মহাশয় কি জীমতির পণ করেছেন ? সব ত কলির সন্ধ্যা, কলিটি যখন ফুল হয়ে ফুটেবে, রজনী—গন্ধা হয়ে তখন ত তাহলে আর মহাশয়কে পাওয়াই যাবে না ! জ্যোতি ম্লান দৃষ্টিতে একবার খালি চাইল, কোন কথা বললে না। বলতে পারত, “মায়া মনটা মরিচীকার পেছনেই শুধু ছুটেছে, স্নান হয়ে পড়বে যখন, তখন কি হবে উপায় তাই ভাবছি।” এ কথা বলে ও মায়ার আনন্দের অবগুণ্ঠনখানাকে লুণ্ঠন করতে পারলে না।

শাঁখ বাজল, মেয়েরা দিল উলু, মাকে প্রণাম করে জ্যোতি উঠে দাঁড়াল, বললে, ‘যাই মা বো আনতে ?’

দয়াময়ী কোন কথা বললেন না, হির দৃষ্টিতে চাইলেন ছেলের দিকে।

ভাবছেন কি ? কি হল ? কেমন হল। ঠিক না ভুল ! সুখী হবে ত ?

বাক্সা শুধু জীবনের নয়, দুঃখেরও।

তার পরের দিনগুলো বাদ দেওয়াই ভাল। দুর্বল মন মার, কি করে তবু ভোলা যায় যা তোলা আছে মরমের মজার মজার ...যরখানা ধ্যানে বসেছে। দয়াময়ী আর জ্যোতি দুজনে দুদিক দিয়ে মনের ভাজ তুলছে, একজন অতীতের দিনগুলো উল্টে পালটে, আর একজন বর্তমান আর ভবিষ্যতের হিসেব নিয়ে।

বাইরে আলোর দীপ্তি গেছে কমে, শীতের কুপণ রাত্রি নামছে বীরে বীরে।

কি ভাবছ মা ? জ্যোতি বললে, রোগা শরীর নিয়ে অত ভাবলে শরীরটা যে যা থাকবে।

দয়াময়ী হাসলেন, বললেন, “যা খাবার জায়গা কৈ জ্যোতি ? যা পাবার তাত অনেক আগেই পেয়েছি।”

ধামান যাবে না মাকে, মনকে নাড়া দিয়েছে আজ চার বছরের প্রত্যেকটি দিনের কথা—প্রহরে প্রহরে রূপ বদলে যে সব কথা নতুন আঘাত হেনেছে। যারা আঘাত দেয় তারা ভুলে যায় কিন্তু যারা পায় তারা ভোলে না, এমন বিচিত্রই আঘাতের দেওয়া নেওয়ার ধারা।

দয়াময়ী বলতে আরম্ভ করেন, জ্যোতি, কতরাত কতদিন ভেবেছি, অনিতাকে নিয়ে মন আমার কত নতুন খেলাই খেলেছে কিন্তু নতুন পথ কৈ ? তোর জীবনের রথ অচল হয়ে আছে এ কি আমি জানি না।

কি যে বাজে বকছ মা, জ্যোতি অজবনব হয়ে হতে নিজেকে

সামলে নিয়ে বললে, কি যে ভুলি বল আমি কিছু বুঝেই উঠতে পারি না।

‘বুঝে কি করে’ দয়াময়ী বলেন, ‘তোমার মনে যে বোঝা তার আদে ও আমার বোঝার ভুলের দোষ। অনিতাকে ভুল বুঝে ছিলাম, ওর আসল পরিচয়টাকে নিজের মনের করনায় থেকে ফেলেছিলাম। ও বা তা ত’ আমি দেখিনি, আমি বা চেয়েছিলাম, বার বার সেই রূপেই ওকে মনে এঁকেছিলাম, ওকে মনে মনে গড়েছিলাম ঠিক তেমনি ভাবে যেমন ভাবে ওকে ঠিক মানায়। করনায় আলোয় ওকে উজ্জ্বল করে সন্ধ্যাপনে ওর আগনে শুকে বসিয়েছিলাম, কিন্তু ওর তা সইল না।’

দয়াময়ী বলে চলেন, আমার করনাকে আমার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ও চূর্ণ করে দিলে নিজের পূর্ণতার অহঙ্কারে। ঘর ভাঙল, সংসার ভাঙল, ভাঙল জীবনের রথ, ধামল গতি, হারাল পথ, সব বিপথে গিয়ে হল বিকল। তাই ত’ ভারছি জ্যোতি, দয়াময়ী কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে আরম্ভ করেন, জীবনের কবেকার ছোট্ট একটা ভুলের বোঝা আজ যে এমন ভাবে অসহ্য হয়ে উঠবে তা ত’ পারি না ভাবতে ! কি ভুলই করেছিলাম তোর জীবনের পূর্ণিমাতে করনায় অহঙ্কার দিয়ে আড়াল ক’বে ? তার জন্তে ভগবানও বৃষ্টি কমা করলেন না, অমৃতাপে আমার জীবন গেল, তা যাক, কিন্তু আমার শেষের সঙ্গেই যে তোব জীবনের আরম্ভ তা ভুলি কেমন করে ! স্মৃতিতেই আমার ভুলেব বোঝা, পথ চলাব কেমন ক’রে ? তাই বলছি জ্যোতি, তুই আবার নতুন করে চন্দন পুর, নতুন সুরে সানাই বাজুক, নতুন সুরে জীবনটা পূর্ণ হ’ক, নতুন মাহুকের চরণম্পর্শে সংসারটা নতুন করে বাঁচুক—পূর্ণ হ’ক, আমার ভুলের বোঝা চূর্ণ হ’ক। পাচজনের নিম্নেতে কটু কথায় হ’ক আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত !

দয়াময়ী চুপ করলেন। সমস্ত আকাশ বাতাস তখন করছে দয়াময়ীর কথার প্রতিধ্বনি, জ্যোতির মনে কে যেন বলে চলে, “আমার করনায় যে ছিদ্র ছিল, তোর মধ্যে তা থাকবে না। নতুন সুরে বাঁধ বাঁগা, দুঃখের বাঁধ ভেঙে আশ্রুক তোর জীবনের কল্যাণী, বইয়ে দিক প্লাবন, ঘুচিয়ে দিক যত গ্লানি, আমার ঠাকুর ঘরের প্রদীপ শিখা নতুন প্রাণে দিক পূর্ণ করে ! আহ্বান করুক সে সন্ধ্যার আশীর্বাদ, বিশ্বের পথিক পুরুষকে দিক সংসারের স্নিগ্ধ ছায়া, সভক্তিতে তোকে দিক প্রণাম, নিক দেবতার আশীর্বাদ কুড়িয়ে কাজে কর্দে।...

তোর মনের মতন কল্যাণীকে নিয়ে আর, তোর ভালবাসার স্রোতে সে আশ্রুক হেসে, আমি মরবার আগে তাকে বরণ করে নি, বুঝিয়ে দি সংসারের বোঝা, হাতে ভুলে দি তোদের জীবনের সোনার চাবি।

দয়াময়ী আবার বলতে আরম্ভ করেন—স্নান দেহ, পরিষ্কার আমার মন, সামনে দেখতে পাচ্ছি তারার তারার আমার বাবার আহ্বান, ডাক আসছে বার বার, বার বার আমার ঠাকুর ডাকে

দিয়েছিল কিরিত। আমার মনের কোথা হালুকা না হ'লে আমার ওপরের পথে পড়বে কাঁটা, তোর জীবনের পরক অশান্তির ওপর পা ফেলে আমি চলব কেমন করে। এ পায়ের পথ যেমন তোর আশার, তোর মুখ চেয়ে সহজ হল, ওপরের পথ তেমনি তোর শান্তির ছায়ায় ঝিক হ'ক। আমার সসারের ঠাকুর বড় অভিমानी, কল্যাণী পূজো না পেলে তার মান ভালে না। সে বৈ আমার পাগল ঠাকুর, নিজেকে দিয়ে যে পূজো, সে পূজো না পেলে তার মন ভাঙে না। স্বভাব তার মন্দ, কঠিন তার অভিমান, গলবস্ত্র না হ'লে তার মান ভাঙে না, সন্ধ্যার শ্রোক না পড়লে তার ঘুম আসে না। এমনই দুটু সে, আদর করে মিষ্টি, কথা না বললে সে ধায় না, আজ ভাবছি তাই, তোর জীবনে নতুন করে কল্যাণীর ছায়া না পড়লে আমার সেই পাগল ঠাকুরকে দিয়ে যাব কার হাতে।

আবহাওরা হালুকা করবার জুড়েই জ্যোতি বলে, আমার সঙ্গে ত তার বেজার মিল, তোমার দুটু ঠাকুরটি ত' তা' হ'লে ঠিক আমারই মতন। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো বাপু, তোমার ছোয়া না পড়লে আমার দিনের কাজে ফাঁক থেকে যায়। যেন দোল পূর্ণিমাতে তিথিমতে রঙের বারণ।

দরাসী তারই রেশ টেনে বলেন, ঠিক তাই, আমার ঠাকুর তোর রূপের আড়ালে বসী, স্বভাবটা ঠিক তোরই অম্লকরণে, তাই ত' পারিনি তোর মনটাকে জানতে। মনে তাই ত' আমাব ভাবনা, তোদের দু'জনের সেবার ফাঁক থাকতে দিলে মন মানবে কেন? এমন লোক চাই যে জানবে খালি তোদের দু'জনকে। তোদের দু'জনকে নিয়ে হবে তার প্রহরে প্রহরে লুকোচুরী খেলা। তোর সেবার মাঝে তাঁর পূজো, তোর রূপের আড়ালে তাব দৃষ্টি। এমন কাউকে চাই—যে বলতে পারবে, 'যাও দুটু, অভিমান বৃষ্টি তোমার ওপর করতে পারি না?' কোথায় আছে আমার সেই মেয়ে, যে স্বামী রূপে দেখবে ঠাকুরের দীপ্তি, যে স্বামীর হাসিতে দেখবে আমার মদনগোপালের মনচোবা রূপ। তাকে না পেলে আমার ত চলবে না—আমার যাবার বেলার সব ঠাকুরকে একলা ফেলে যাব' কেমন করে? আমি যে দেখতে পাচ্ছি তাদের আঁধার করা অভিমानी ছবি! সৃষ্টি তাদের অন্ধকার, প্রদীপ জালাবে কে?..

জ্যোতি শুদ্ধ। ভ্রমহারা রাতের তারার মতন শুধু শুনছে। মার চোখের তলার জমে ওঠা বড় বড় ফোঁটা অন্ধকারে দেখা যেত না, যদি না সামনে জল-জলে তারার প্রতিবিম্ব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত।

ঐনিতাকে ঘিরে, এই যে অহুতাপে জীবনের অল্পপরমাণু পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে, এটা কার দোষ, কার ভাগ্যের লীলা খেলা?

মা বা চেয়েছিলেন ও নিজের ত চেয়েছিল তাই! তবে দু'জনকার চাওয়া কোর ব্যর্থ হ'ল একজনকার হার্ষের অন্ধকারে? এ কোন পাণের প্রায়শ্চিত্ত?

আজ তাকে কেন্দ্র করে এই যে অনিশ্চয়তা ঘুরছে বিজীবিজী-ময় রূপ নিয়ে এ কার পাণে? আজ জ্যোতিরও চাঁৎকার করে বলতে ইচ্ছে হ'ল, 'হতভাগী এমনি ক'রে নিজেকে নিয়ে ক'রে হারালি?'...

বাইরের রাত্রি শীতে আলোড়িত, সেও নিজেকে হারিয়েছে নিশ্চরতার মধ্যে। খুঁজে মরছে কাকে, চাইছে বেন কিন্তু চারিদিকে তার ঐ একই সুর, নেই, নেই, নেই...

জ্যোতির মন তখন ছুটে চলেছে, মার কথাগুলো একেই পায় পায়... নিশ্চর ঘরখানায় কার কথার প্রতিধ্বনি... নতুন ঘরে বীণা, নতুন সুরে সানাই, নতুন মাঝবের চরণধ্বনি, ঠাকুরের মীন ভাড়াবার জন্তে সন্ধ্যার শ্রোক... প্রদীপ... নতুন জীবন... মানবী...

কোথায় পাবে তাকে?

আজকালকার নকল যুগের মানুষ—শুধু মনের বাইরে নয়, ঠাকুরকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ঘরের বাইরে। প্রদীপ অন্ধহেলার ঠাকুরের চরণ ছেড়ে উঠে গেছে টেবিলের ওপর, সন্ধ্যা ঘরের অন্ধকারে পা টিপে টিপে না এসে, চায়ের আসরে আসে রঙে রঙে নেশা ধরিয়ে। এমন দিনে কোথায় সেই কল্যাণীর ছায়া, কোথায় তার আভাষ?...

কোথায় সেই নববধু? কোথায় সেই মানবী? ঘরে সর্ব্বথ লুকিয়ে আছে দেবতার ছন্দে ছন্দে, বার ঐ ঘুমিয়ে আছে সর্ব্বস্তর প্রাণে, বার প্রদীপ ঘুমিয়ে আছে নিজের মনের গহন কোণে? বার হাতের ছোঁয়ায় আছে পৃথিবীর সব অশান্তির শেষ, বার মুখের কথায় আছে মধ্যম মীড়ের মুর্ছনা, বার দৃষ্টিতে আছে ভালবাসা, আছে সন্ধ্যার বিখজোড়া বৈশিষ্ট্য। বার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে আছে নব প্রভাতের প্রথম কথাটি,—বার নামে আছে প্রথম রেখার কোমল দোলা, বার অভিমানে আছে অন্তর্মিত সূত্রের শেষ রশ্মির গোপন কথাটি। কোথায় আছে সেই মানবী?

জ্যোতির ভাবনা থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য, স্নেহা ওর মনটিকে এমন করে রাঙিয়ে দেবে? মার মনের কথা ও মনে মনে মিলিয়ে নিল স্নেহাখার মাধুর্যের সঙ্গে। স্নেহাথাকে কল্পনা করে যে ভাষা ছুটে চলে, তারই প্রতিধ্বনি ওর মার কথায়।

পাশের ঘরের প্রদীপটা নতুন আলোকে নতুন জ্যোতিতে জ্বলে উঠল...

স্নেহাথাকি নতুন ক'রে তাকে আলিয়ে দিল?

(কবিশ:)



নবীন ঘোষাল লোকটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। সে যে কাজ উচিত মনে করিবে, তাহাতে সে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিবে; কিন্তু যে কাজ সে উচিত মনে করিবে না, তাহাতে মারামারি কাটাকাটি করিয়াও কেহ তাহার নিকট হইতে একটি পাই পয়সাও বাহির করিতে পারিবে না।

নবীনের পৈতৃক বাড়ীখানা একান্তই শ্রীহীন ও ভান্সাচোরা ছিল বটে কিন্তু নগদ টাকার সে না কি কুমীর ছিল। সংসারে কেহই তাহার ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইলেও এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। কেহ বিবাহের কথা বলিলে বলিত—“বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই। বিবাহ না করিয়াও যখন চল্লিশ বৎসর কাটিয়াছে, তখন বাকী জীবনও কাটিয়া যাইবে।” ভয়জনীর্ণ বাড়ীখানার মেরামতের কথা কেহ তাহাকে বলিলে নবীন বৃদ্ধ-মানের মত মাথা নাড়িয়া উত্তর করিত—“প্রয়োজন নাই; এই বাড়ীতেই থাকার ত কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।” কিন্তু নবীনের নাকের উপর একবার ছোট একটা ব্রণ হইয়াছিল; হয় ত তাহাতে একটু চূণ লাগাইয়া রাখিলেই সারিয়া যাইত; কিন্তু নবীন ব্যস্ত হইয়া কর্ণেল নলীফায়া নামে এক সাহেব ডাক্তারকে ‘কল’ দিয়া সর্ব্ব্বকমে ২৩৭১/১৫ ব্যয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পাডাব যুবকের দল কিছুদিন আগে একটা লাইব্রেরী করিবার জন্ত তাহাব কাছে কিছু চানার জন্ত আসিলে নবীন কহিয়াছিল—“লাইব্রেরীর কোন প্রয়োজন নাই।”—সুতরাং চারিগুণ পয়সাও তাহাব তাহার নিকট হইতে চান্দা আদায় করিতে পারে নাই। এই প্রকারেই নবীন ঘোষাল তাহার দিন কাটাওয়া আসিতোছিল এবং ভবিষ্যত হয় ত এইভাবেই কাটাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাব স্থির সংসার-সাগরে তরঙ্গ তুলিল—তাহার ভাগিনা আসিয়া। ভাগিনার নাম—হরিশ। হরিশ তাহার অপেক্ষা আট-দশ বৎসরের ছোট।

হরিশ চতুর লোক; আসিয়া কহিল—“সংসারে একলা থাকাটা ভাল নয়, আপদ আছে, বিপদ আছে, কিছু ত বলা যায় না। তাই ভাবলুম, আমার ও ত কোন কাজকর্ম নেই, মামাব কাছেই গিয়ে থাকি।”

নবীন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল—“ঠিক কথাই বলেছ, আপদ আছে, বিপদ আছে। তা, তুমি এসে ভালই কবেছ হরিশ।”

সুতরাং হরিশ মামার কাছে দিব্যি থাকিয়া গেল এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই দিব্যি পাডার লোকের সঙ্গে ভাব-সাব করিয়া ফেলিল।

একদিন কালীচরণ নামে হরিশের এক বন্ধু হরিশকে কহিল—“মামাটিত টাকার কুমীর, বাড়ী-খানার ত ভান্সা-চোরা অবস্থা। বোলে-বুঝিয়ে একটু মেরামত-টেরামত কোরে ফেল না; ওর অবর্ত্তমানে সবই ত তোমার।” হরিশ কহিল—“মাথা-পাগলা গোছের লোক জান ত! মতলব খাটিয়ে সবই করাতে হবে, তবে—ধীরে ধীরে, অর্থাৎ ক্রমশঃ।”

ইহার কয়দিন পরেই হরিশ তাহার এখানকার নূতন বন্ধুদের লইয়া কি-একটা পরামর্শ করিল। এবং তাহার পরই মামার

কাছে আসিয়া কহিল—“একটা ভরানক স্ত্র-খবর শুনে এলুম, মামা।”

নবীন জিজ্ঞাসা করিল—“কিসের স্ত্র-খবর?”

প্রফুল্ল বদনে হরিশ জানাইল—“সরকার থেকে তোমার নাকি এবার ‘রাষ্ট্র বাহাদুর’ টাইটেল দেবে?”

প্রথমটায় আশ্চর্য্য, তারপর একটু আশায় এবং আনন্দে নবীন কহিল—“কোথা থেকে শুনলি?”

“শুনলুম, খুব ভাল লোকের মুখ থেকে। রমেনের ভগ্নীপতি হরিদাস বাবু, তাঁর এক মাসতুতো ভাই লাট-নগরে খুব উঁচু পোটে কাজ করেন, তাঁর কাছ থেকেই খবরটা পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, কালীবাবুও বলছিলেন, সে-ও নাকি কোথেকে খবরটা পেয়েছে।”

নবীনেব প্রফুল্ল মুখখানা নীরব রহিলেও, সংবাদটায় তাহার অন্তর-মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। কিন্তু খবরটা সত্য না মিথ্যা? কথাটাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার ভঙ্গা হইতেছে না। তবে একথাটাও তাহার মনে হইতেছিল যে, এ সব সংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না। তবুও এই স্ত্র-খবরের বোল আনা আনন্দটুকু যেন নবীন ইচ্ছাসংগে লইতে পারিতেছিল না।

হরিশ মাতুলের ‘হার্ট’এ ইনজেকশন দিয়া চলিয়া গেল, এবং ইহাব ফলাফলেব জন্ত নবীনের প্রতি লক্ষ্য রাখিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে দোতালার জীর্ণ বারান্দায় একখানি অতি পুর্বাতন আরাম কেরামায় বসিয়া নবীন ভাবিতেছিল—“অসম্ভব কিছু না; হ’তে পারে; বরঞ্চ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রতনেই রতন চেনে। সরকারের কাছে কি কারো গুণ চাপা থাকে! আমি না হয় আজকালকার ইংরেজী লেখাপড়াটাই শিখিনি, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি আমার যা আছে, তেমন আর কটা লোকের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়! রায় বাহাদুর—রায় বাহাদুর টাইটেলটা আমাব মত গুণী লোকেরই পাওয়া উচিত। খবরটা সত্যি বলেই ত মনে হচ্ছে। কালীচরণও তা’ হ’লে কথাটা শুনেচে। কালী চরণ খবরটা কোথা থেকে শুনেল? নিশ্চয়ই ভাল জায়গা থেকে শুনেচে। কালীচরণটাকে বরাবরই আমি ঘুণা করি; কিন্তু লোকটা আসলে ভাল। হ্যাঁ, ভাল বই কি, খুবই ভাল; নিশ্চয়ই ভাল; আমিই হয়ত ওকে ঠিক বুঝতে পারিনি।”

নবীন ধীরে ধীরে উঠিল; পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়াইয়া এক-পা এক-পা করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; তারপর মন্ডর গতিতে কালীচরণের বাটর দিকে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যা বহুকণ উৎরাইয়া গিয়াছিল। কিছু আগে নবীন ঘোষাল কালীচরণের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কালীর বন্ধুরা আসিয়া তাহার বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইয়াছে এবং হাসি-তামাসার মধ্য দিয়া নবীন ঘোষালের সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছে।

নীলরতন হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—“তা হোলে তোমার ওযুখে দেখছি ফল ধরচে।”

হরিশ কহিল—“সেরা ওষুধ লাগিয়েছি, ফল ফলাতেই হবে।”

রমেশ কহিল—“কি রকম অদ্ভুত স্বভাব বাবা! একটা সামান্য ভ্রমের জন্তে তিন চারশো টাকা ব্যয় কোরে ফেললে, কিন্তু লাইব্রেরীর চাঁদার জন্ত তিনটে পরস্যাও আদায় করতে পারা গেল না।”

বিগিন কহিল—“এদিকে সেই আদ্যিকালের অ-ভব্য বাড়ী-খানা ভেঙ্গে পড়েচে, তা কিছুতেই মেরামত করবে না; বসবে প্রয়োজন নেই।” “কোনটা যে ওর ‘প্রয়োজন’—আর কোনটা ‘অপ্রয়োজন’—তা বোঝা শক্ত।”

কালীচরণ কহিল—“মাথা খারাপ আর কি! এ একরকমের পাগল।”

রাত দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ বৈঠক চলিল; তারপর যে যাহাব বাড়ী চলিয়া গেল। হরিশ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, মাতুল গুণ-গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু অশ্রুদিন এ সময়ে নবীন প্রায় আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়ে।

পরদিন মামা-ভাগিনাতে কথা হইতেছিল।

নবীন কহিল—“টাইটেলের সনদখানা যেদিন পাওয়া যাবে, সেদিন তোমার হাতে শ’ আড়াই টাকা দোবো, তোমার বন্ধুবান্ধবদের ভাল করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে; কি বল?”

হরিশ কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, নবীন পুনরায় কহিল—“আজ্ঞা, রাহবাহার কথটা, নামের গোড়ায় ব্যবহার করলে ভাল শোনাবে, না—শেষে?”

“কতক গোড়ায়, কতক শেষে, যেমন সকলে করে থাকেন; যেমন—রায় নবীন চন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর।”

“না—না, সকলে যা করে, তা করা হবে না; আমি একটু নতুন রকম করব।”

তা হোলে কি আপনি নামের মাঝখানে বসাতে চান—অর্থাৎ জীনবীন চন্দ্র রায় বাহাদুর ঘোষাল?”

নবীন একটু মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল—“ওটা শুনে ভাল হবে না,—না? যাক—এ বিষয়ে একটু ভাল কোবে ভাবতে হবে।”

“আপনাকে কিন্তু ভাল একটা দরবার-সুট তৈরী করাতেই হবে, মামা, কারণ...”

“কারণটা আর আমায় বলতে হবে না। দরবারী পোষাক একটা নিশ্চয় প্রয়োজন; সুতরাং এ একটা করাতেই হবে। যেটা প্রয়োজন, সেটা করতেই হবে।...হ্যাঁ, ভাল কথা; ওদের লাইব্রেরীর জন্য যে টাকা নিতে এসেছিল আমার কাছে, তখন দিই নি; দেখচি—ওটার প্রয়োজন আছে বটে। কাল পচিশটা টাকা ওদের দিয়ে এস।”

হরিশ না হইয়া আর কেহ হইলে, হাসি চাপিয়া থাকা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইত।

* * *

ডিসেম্বর মাস। এবার প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে; সকলেই এবার শীতে কাঁতর, কিন্তু নবীনের সেদিকে ভ্রক্ষেপও নাই।

নবীন কাঁতর বটে, বরঞ্চ খুবই কাঁতর, কিন্তু সে কাঁতরতা শীতের জন্ত নহে; তাহা রায়-বাহাদুরী পাইবার কাঁতরতা। দিনরাত সে অস্থির চিন্তে অপেক্ষা করিতেছে, কখন তাহার শুভসংবাদ সরকারী ভাবে তাহার কাছে আসে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতেছে, কোন সংবাদই আসিতেছে না। নবীনের আহায়ে স্পৃহা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই,—চকিশয্যটা তাহার মন ‘রায় বাহাদুর’ খেতাবের জন্ত অস্থির হইয়া আছে।

এমন সময় হরিশ একদিন সংবাদ লইয়া আসিল, কহিল—“যুদ্ধ বেঁধেছে বলে এবার বছরের গোড়ায় খেতাব দেওয়া বন্ধ থাকুলো, ছ’মাস পরে খেতাবের লিষ্ট বার করা হবে।”

খুব মন-মরা হইয়া নবীন জিজ্ঞাসা করিল—“তাই না কি?”

“হ্যাঁ। তবে, তোমার নাম উঠেছে, সে খবরটাও পাকাপাকি পাওয়া গেল।”

খুব উৎসুক-আনন্দে নবীন কহিল—“পাওয়া গেল? কোথেকে পেলি?”

অতঃপর কার কাছ থেকে পাওয়া গেল, কি সূত্রে পাওয়া গেল—প্রভৃতি শুনিয়া নবীন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। হরিশ কহিল—“কিন্তু সকল যে রকম বলচে, তাতে তোমার একটা কাজ করা বিশেষ দরকার; এবং সেটা এই ছ’মাসের ভেতরেই কবে ফেলতে হবে। নতুবা....”

“কি বল ত?”

“এই পুবাণো ধ্যাড়-ধেড়ে বাড়ীটিকে একটু মাল্লবের মত কোরে ফেলতে হবে। একজন রায় বাহাদুর যে বাড়ীতে থাকবেন, সে বাড়ী.... বুঝছ না?”

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নবীন কহিল—“যে বাড়ীতে একজন রায় বাহাদুর থাকবে, সে-বাড়ী.....ঠিক ঠিক—সে বাড়ী একটু দেখতে শুনে ভাল হওয়ারই প্রয়োজন বটে; খুবই প্রয়োজন। বাড়ীটা একেবারেই ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে!”

হরিশের ইনজেক্সনের ফল এইবার ফলিতে সুরু করিল। তিন মাসের মধ্যে এবং তিন-তিরিক্কে নয় হাজার টাকা ব্যয়ে নবীন ঘোষালের সাত-পুরুষের জরা-জীর্ণ বাড়ীখানা নবীন রূপ পাইয়া বাস্তা আলো করিয়া দাঁড়াইল। ভাঙিয়া-পড়া সেই বাড়ী যে এইরূপ হইবে, ইহা পূর্বে কেহ আশা করিতে পারে নাই। সকলেই মনে-মনে ইঞ্জিনীয়ারের কৃতিত্বের কথা বলাবলি করিতে লাগিল। খড়-খড়ি, সার্সি, ঝিল-ঝিল, নতুন ফ্যাসানের বারান্দা, ফটক, পোর্টিকো, বাথরুম, সজ্জিত দেওয়াল-গাত্র প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া সাবা বাড়ী যেন হাসিতে লাগিল। ফটকের গায়—বাড়ীর নামের ট্যাবলেট বসিল। ইলেকট্রিক, রেডিও, টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবস্থারও কোন ক্রটি রহিল না; একে একে সকলই হইল। ভাল ভাল সবরকম কার্ণিচারে নতুন বাড়ীর সবদিক ভরিয়া উঠিল। নীচের তলার হলঘরের দুই পাশে দুইখানা সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘর; এ পাশের খানা নবীনের নিজের, ও-পাশেরখানা হরিশের। হরিশের বৈঠকখানা সকাল-সন্ধ্যা তাহার বন্ধুবর্গদ্বারা মুখরিত থাকে। এই সকল দেখিয়া নবীন মনে মনে কহে—‘একজন রায়বাহাদুরের পক্ষে এ সবেরই প্রয়োজন আছে

বটে !' হরিশ মনে মনে ভাবে—‘এতদিনে ইন্জেক্সনের পূর্ণ ফল পাওয়া গেল।’

এ দিকে ছয়মাস কটিতে আর বিলম্ব নাই। অধীর আশা-উৎকণ্ঠার নবীনের দিন কাটিতে লাগিল। এইবার কবে হয় ত একদিন তাহার নামে সরকারী বিধি আসে। হয় ত এই সপ্তাহের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে। আজ আসিল না, হয় ত কাল আসিবে। নবীন আর দিন কাটে না। আজ বুধবার; আজ হয় ত ঠিকই আসিবে—ঠিকই কিন্তু—

কিন্তু—কিন্তু—কিছুই আসিল না। যথাসময়ে গেজেটে খেতাবের লিষ্ট বাহির হইল; নবীন নাম তাহার মধ্যে নাই। বহুবার দেখা হইল—নাই—নাই; কোথাও নবীন নাম নাই। নবীন এ ধাক্কা আর সামলাইতে পারিল না; শয্যা গ্রহণ করিল।

তিনমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। নবীন এবার অবস্থা শোচনীয়! তাহার আহাৰ নাই, নিদ্রা নাই; কখন যে কোথায় থাকে তাহারও কোন ঠিক নাই। হয় ত তিনদিন ধরিয়া ঘরের মধ্যেই থাকে, একদণ্ডের জন্ত বাহির হয় না; ‘আবাব হয় ত’ তিন দিন ধরিয়া পথে-পথেই ঘুরিয়া বেড়ায়। পথের যাত্রার সহিতই

দেখা হয়, তাহাকেই আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—‘কোন খবর এল আমার?’

হরিশ মামার জন্ত প্রথমটার ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে এক্ষণে কবিরাজী চিকিৎসা করা হইতেছে। কবিরাজ নানা প্রকার ঔষধের সহিত ‘মধ্যম-নারায়ণ’ তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করাইতেছে; কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইতেছে না।

সেদিন সাবানদিনের পর অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নবীন ব্যস্ত হইয়া হরিশকে জিজ্ঞাসা করিল—‘কোন খবর আসে নি?’

হরিশ তাহার হাত ধরিয়া কহিল—‘খবর আসবে; অত ব্যস্ত হতে আছে কি? চলুন, স্নান করে খাওয়া দাওয়া করবেন, চলুন।’ নবীন সজোবে তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার বাহির হইয়া গেল এবং পোষ্টাফিসে গিয়া পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল—‘আমার সবকারী চিঠি এসেচে কি?’ দিনে বিশবার করিয়া নবীন এইরূপ পোষ্টাফিসে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে। পোষ্টাফিসের পিয়ন হইতে ডাকবাবু পর্যন্ত সকলের কাছেই নবীন ঘোষাল অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই সকলে বলাবলি করে—‘ওই রে বায়বাহাদুর আসচে।’

নবীন ঘোষালের এই দুর্দশা চক্ষে দেখা যায় না; দেখা উচিতও নয়। স্তবরাং এইখানেই এ-কাহিনীর শেষ করা ভাল।

পুস্তক ও আলোচনা

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : এম. ওয়াজেদ আলী, বি-এ (কেণ্টাব) বার-এ্যাট-ল। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১।০ মাত্র।

ওয়াজেদ আলী সাহেবের নতুন করিয়া পবিচয় দেওয়া নিম্নরোজন। তাঁহার সাহিত্য বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি শুধু রূপকারই নন, পণ্ডিতও বটে। সেই পাণ্ডিত্যের রসসৃষ্টি ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’। বিভিন্ন কালের মন্বন্তরায় রূপায়িত ইহার প্রাণবন্ত। গ্রন্থের ‘সাকী ও কবি’, ‘পটভূমিকা’, ‘মুক্ত মানব’, ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’, ‘পাহাড় ও প্রান্তর’, ‘বাংলার প্রকৃতি’ প্রভৃতি চিত্রপটগুলি শুধু ভাবে ও ভাষায়ই অনবদ্য হয় নাই, ললিত প্রাণ-শীলতায়ও অপূর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে। ওয়াজেদ আলী সাহেবের কবিত্বময় মনের পরিচয় তাঁহার ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’।

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়

গটল্লের মজলিশ : ৫০ } শিশু-গল্পিকা
বাদশাহী গল্প : ৫০ }

এম. ওয়াজেদ আলী, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এ্যাট-ল। আগুতোব লাইব্রেরী, কলিকাতা।

ওয়াজেদ আলী সাহেব শুধু গল্পলেখক মহেন, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং দার্শনিকও। বুদ্ধিজীবী মন লইয়া একদিকে তিনি

যেমন শিক্ষিত সর্বসাধারণের জন্ত তথ্যপূর্ণ রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন, অগাদিকে দরদী শিল্পকুশলতায় তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন শিশুদের গল্প-সাহিত্য। ইতিপূর্বে তাঁহার ‘গ্রাণ্ডার শেষ বীর’ বাংলার শিশুজীবনে যে উদ্দাম প্রবাহ আনিয়াছিল, আলোচ্য গ্রন্থ দুইটিতেও সে প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সত্যিই যেন বাদশাহী যুগে বসিয়া বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছি। ভাষায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে ও আবহ প্রকাশভঙ্গিমায় গ্রন্থ দুইখানি সুলভতম হইয়াছে। শিশুদের মন স্বভাবতই আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কাহিনীগুলির পরিচয়ে।

প্রাচ্য

Racial History of India—শ্রীচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক বিজয়কৃষ্ণ ব্রাদার্স, ৮১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য ৫ টাকা। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী একজন প্রতিভাবান লেখক। অল্পরূপ বিষয়-বস্তু লইয়া তিনি আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে হিন্দুজাতির উৎপত্তি ও গঠন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এক কথায় পুস্তকখানিকে প্রাচীন ভারতের মূল্যবান তথ্যাদির আধার বলা বাইতে পারে।

শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

মাটির পৃথিবী : উপন্যাস শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য।
এছ কুটীর, কলিকাতা।

প্রকৃপ্ত জীবনধারার আমাদের বর্তমান সমাজ দাঁড়াইয়া আছে। শোভনশীলতা আর অর্থনৈতিক বিকৃকতার পাশাপাশি বিরুদ্ধবাহী ঘন্থে জীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে মানস-পৃথিবী। সেই জীবনের স্পষ্ট প্রতীক দেখিতে পাই আলোচ্য গ্রন্থের সূশাস্ত সেনকে। স্বল্প বেতনের কেরাণী ; সাংসারিক পরিবেশ আরও ক্ষুদ্র। ইহারই মধ্যে মানুষ হইয়া বাঁচিবার হুনিবার প্রচেষ্টা সূশাস্তের। সূক্ষ্ম মনে আসে তার বিচার, আসে দ্বন্দ্ব ; স্থূল মনে আসিয়া আঘাত করে প্রেম, জাগিয়া ওঠে আদর্শের ক্ষুধা। ইহারই মধ্যে পাশাপাশি যোগ ভাগ্য মিনতি আর স্প্রীতির সাথে, হারামো দিনের স্ববোধদা আর তাঁর আশ্রমের সাথে। ঘাত-প্রতিঘাতমূলক বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়া কাহিনী সন্দ্বতম রূপ পাইয়াছে। তবু, এ কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, লেখকের কাহিনী ও রচনার আবহ গতিককে মাঝে মাঝে আসিয়া ব্যাহত করিয়া দাঁড়াইয়াছে ভাবার অদৃঢ়তা।

অনিলবাবু উপন্যাস লিখিতে জানেন, 'মাটির পৃথিবী' তাহারই সাক্ষি দেয়।

শ্রীবর্ণজিৎকুমার সেন

ডারউইন : শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস-সি।
প্রকাশক : পূর্বাশা, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী চার্লস ডারউইন। আধুনিক যুগের চিন্তাধারায় যারা বিপ্লব ঘটাইয়েছেন, ডারউইন সেই ক্রান্তিকারী পুরুষদেব অগ্রণী। বিশেষ সৃষ্টিবাদ (Theory of special creation)-কে অস্বীকার কবে তাঁর বিবর্তন-নীতি প্রাণী ও প্রাণবিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। প্রচলিত ধর্মসংস্কারের বিকল্পে তিনি বিদ্রোহী, নিভীক ও হুঃসংগী বিজ্ঞানী।

বিস্মৃত গবেষণা ও আলোচনার ফলে ডারউইনিজম যথেষ্ট পরিত্যক্ত এবং সংশোধিত হলেও তাঁর ওপর ভিত্তি কবেই আধুনিক বিবর্তনবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে। এই বিরাট পুরুষের চিন্তা ও গবেষণার সংকিপ্ত এবং সূক্ষ্ম পরিচয় এই ছোট বইখানির মধ্যে

পাওয়া যায়। অনিলবাবু জীব-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ছাত্র, বাংলা সাময়িক পত্রে তাঁর বহু সুলিখিত মূল্যবান প্রবন্ধ পড়ে আনন্দ পেয়েছি। এই বইখানিও তাঁর সাহিত্যিকর্মী রচনাভির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে—সামান্য টেকনিক্যালিটিজ সত্ত্বেও কোথাও ছুর্কাধ নয়—সরস ও হৃদয়গ্রাহী। Popular science-এর এইজাতীয় বই বাংলায় বিরল বলেই অনিলবাবুর গ্রন্থখানির মূল্য আরো বেশি এবং এই সাধুপ্রচেষ্টার জন্তে প্রকাশককেও ধন্তবাদ জ্ঞানাই।

ছাপা ও বানান ভুলগুলি সম্পর্কে আরো একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পয়লা এপ্রিল : কানাই বসু প্রণীত গল্পসমষ্টি।
গুপ্তদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স কলিকাতা। দাম—দুই টাকা মাত্র।

১৩৪৮ হইতে '৫০ সাল পর্যন্ত যে-সমস্ত গল্প বঙ্গশ্রী ও ভারতবর্ষ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি সঙ্কলিত। কানাই বাবুর ভাষা সাধারণ পথ দিয়া চলাফেরা করিলেও গল্পের অবতারণায় পাঠককে খুসী করে। 'সট ষ্টোরি' বা ছোট গল্প বলিতে বাহা বুঝায়, পয়লা এপ্রিলে তাহার সৌকুমার্য রক্ষা পাইয়াছে বলা চলে। তবে 'বড়বাবু'শীর্ষক গল্পটি ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যেও বৃহত্তর স্পর্শলাভে 'সট ষ্টোরি'-ধর্মের খানিকটা আইন ভঙ্গ করিয়া কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কানাই বাবু গল্প বলিতে জানেন, যে গল্পে হাসি, অশ্রু ও সমস্তাব একত্র সংমিশ্রণে আমাদের পারিপাশ্বিক সমাজচিত্রই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও আমাদের অনুযোগ আছে। গ্রন্থখানি মাঝে মাঝে অহেতুক মুদ্রাপ্রমাদে হোঁচট খাইয়াছে ; এবং দ্বিতীয়তঃ দেড়শো পৃষ্ঠার পয়লা এপ্রিলের পূর্বাঙ্কে অন্ততঃ একটা একত্রিশে মার্চের সংযোগ থাকা শোভন ছিল, যাহাকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে 'সূচীপত্র' নামে অভিহিত করা যায়। ভবিষ্যতে আরও সুচিন্তিত গল্প দাবী করি কানাই বাবুর কাছে।

শ্রীবর্ণজিৎকুমার সেন

গান

শ্রীআভা দেবী

ডাক দিয়েছে এই সকালে এতাত হাওয়া

কিরে গেছে তারা সবাই আমার শুধু

হয়নি বাওয়া।

অনেক দিনের তারা সাখা,

ছিল প্রাণের মাতাবাতি,

কালের তুলে তাদের পানে হয়নি চাওয়া।

ঐ যে তারা গগণ কোণে :

ভীড় করে আজ আমার মনে—

হুঃ রয়েছে তবুও গান হয়নি বাওয়া ;

ভুলেছিলাম তাদের কথা,

ছিল না তারা কোন বাখা,

হুঃ হোল আমার আমার তরী বাওয়া।

সান ব্রকপ্রসঙ্গ ও আনোচনা

আবাহন

মায়ের আবির্ভাবের দিন আজ সমাগত। ঘরে ঘরে স্মৃতি-মুখর আজ বাংলার সন্তানেরা। দুর্গতিনাশিনীর কল্যাণস্পর্শে পুঞ্জীভূত এই দুঃখ যাতনার অবসান হউক। বড় দুর্দিন, বড় দুঃসময়ের দুঃসহ তাপ। মা ভিন্ন কে নিবারণে এই দুর্কিসহ বহুনা, কে দিবে এই মৃত্যু-আহবে জীবন-সঞ্জীবনী? একদিকে, বোধনের শব্দনাশে বিঘোষিত আজ মায়ের আহ্বান, অগ্নিদিকে জৈবভাঙনার উদ্ধত অগ্নি; ভ্রাতৃকলহ আর হানাহানি, অগ্নে অগ্নে শক্তি পরীক্ষার বিজয় অভিযান; দুর্ভিক্ষ-মহামারী আর হাহাকাব। মা ভিন্ন কে ওনাইবে আজ আশার বাণী, কে বহাইবে জীবনে আনন্দের রসধারা?...মিথ্যা আড়ম্বরের মোহে মাকে ডাকিবার আজ দিন নয়; মনের পশুত্বকে আজ বলি দিতে হইবে, সমগ্র মনুষ্য সমাজের সম্প্রদায়গত প্রভেদের অত্যাচার দূর করিতে হইবে, অখণ্ড মানব-সমাজের পরম্পরের মধ্যে মানবতাজাত

প্রাকৃতিক সন্ধুত্ব আগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, মানুষের সর্ববিধ দুঃখ সর্বতোভাবে দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া মহাশক্তির পায়ে আত্মাকে নিবেদন করিতে হইবে, তবেই হইবে প্রকৃত শান্তিপূজা, মাতৃবন্দনা। কোথায় সেই ভক্তির উৎস, কোথায় সেই চিত্ত-নিবেদনের অজস্রতা? দেশ ও জাতির অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ চিন্তের দ্বার হইতে আজ এই মনুষ্য বিঘোষিত হউক :

এস মা, নবরাগরঙ্গিণী শান্তিবিধায়িণী, দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণী, শিবে সর্কার্থসামিকে, ধাত্রী-ধরিত্রী ধনধান্যদায়িকে, অম্বর-মর্দিনী, চারুচন্দ্রভালিকে, এস মা, দূর কর শিবাভীতি, লোকভীতি; দূর কর জয়া ব্যাধি আর পশুত্বের ছায়া। বল দাও, বীৰ্য্য দাও, শক্তি দাও,—দাও ভক্তি আর মুক্তির আনন্দ; তোমার কোটি কোটি সন্তানের কণ্ঠে সার্থক কর' মা তোমার অমৃত বন্দনা। গ্রহণ কর' অন্তরের ভক্তি প্রগতি।

মহাযুদ্ধের গতিপথে

সোভিয়েট-রুমানিয়ান যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি

সম্প্রতি রুমানিয় মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে বলিয়া বুখারেষ্ট বেতারে রাজকীয় ঘোষণায় বিবৃত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়া গেল। যুদ্ধবিরতির সত্তাবলী এইরূপ :

(ক) রুমানিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ও স্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মিত্রপক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জার্মানী ও হান্সারীয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, এবং একত্রীকৃত সৈন্যদল নিয়োগ করিবে। রুমানিয়ান স্থলবাহিনী, নৌ ও বিমান বাহিনীর যুদ্ধ সোভিয়েট হাই-কমান্ডের পরিচালনাধীন থাকিবে।

(খ) রুমানিয়ান এলাকার জার্মানী ও হান্সারীয় সকল সশস্ত্র সৈন্যকে অন্তরীণ করা হইবে বলিয়া রুমানিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছে। পূর্বোক্ত দুইটি দেশের নাগরিকবৃন্দকেও অন্তরীণ করিতে হইবে।

(গ) সামরিক প্রয়োজনে রুমানিয়ার মধ্য দিয়া সোভিয়েট ও অন্তর্গত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা অবাধ চলাফেরা করিতে পারিবে। জল, স্থল, বিমান পথে মিত্রপক্ষীয় সোভিয়েট সৈন্যদের চলাফেরার জন্য রুমানিয়াকে নিজ ব্যয়ে সর্বপ্রকার যানবাহন ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(ঘ) ১৯৪০ সালের জুন মাসে রুশ-রুমানিয়ান চুক্তি দ্বারা রুমানিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে সীমানা নির্ধারিত হইয়াছিল, উহা পুনরায় বলবৎ হইবে।

(ঙ) সোভিয়েট ও অন্তর্গত মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবন্দী, অন্তরীণ নাগরিক ও অন্তর্গত যে সকলকে জোর করিয়া রুমানিয়ার লইয়া আসা হইয়াছে, রুমানিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিবে এবং তাহাদিগকে মিত্রপক্ষীয়

(সোভিয়েট) হাইকমান্ডের হাতে অর্পণ করিবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ না করা পর্যন্ত রুমানিয়া নিজ ব্যয়ে পূর্বোক্ত যুদ্ধবন্দী, অন্তরীণ ও সকল অপহৃত ব্যক্তিগণের যত্নাদি করিবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে খাদ্য যতটা প্রয়োজন, পোষাক ও ঔষধপত্রাদি সরবরাহ করিবে। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য রুমানিয়াকে নিজ ব্যয়ে যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

রুশ-ফিন সন্ধি

ষ্টকহলম হইতে ২রা সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে বিশ্বজুড়ে জানা গিয়াছে যে, ফিনিশ মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং জার্মানদগকে অবিলম্বে ফিনল্যান্ড ত্যাগ করিবার জন্য ফিনিশ গভর্নমেন্ট নির্দেশ দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ অরণ থাকিতে পারে, ১৯৪১ সালে জার্মানীর সহিত ফিনিশের চুক্তি হইয়াছিল সামরিক ভিত্তিতে, রাজনীতি-মূলক নয়। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিল রুশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যান্ড যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে। কিন্তু ফিনকে যথেষ্টরূপে সাহায্য করা জার্মানীর সত্ত্ব ছিল না। সম্প্রতি যুদ্ধের পরিবর্তিত গতি দেখিয়া ফিনিশ প্রধান মন্ত্রী মঃ হাক্কেলেন ফিনিশ জাতির উদ্দেশে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন : জার্মানীর পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ জার্মান সৈন্যই এখন আর বিশ্বাস করে না যে, তাহাদের জয় হইবে। অতএব জার্মান-ফিনিশ সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায় সূত্র হইয়াছে।—সামরিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার এবং শান্তির জন্য জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হওয়ার ফিনিশ গভর্নমেন্ট পুনরায় গত ২৫শে আগষ্ট ষ্টকহলম হইতে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোভিয়েট উহার উত্তরে

দাবী করে যে, ফিনিশ গভর্নমেন্টকে সরকারীভাবে ঘোষণা করিতে হইবে যে, তাঁহারা জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন এবং জার্মানীর নিকট দাবী করিতে হইবে যে, দুই সপ্তাহের মধ্যে ফিনিশ রাজ্য হইতে জার্মানসৈন্য তাহাকে সরাইয়া লইতে হইবে। ফিনিশ গভর্নমেন্ট জার্মানদিগকে তাহাদের সৈন্য সরাইয়া লইতে বলিয়াছেন; জার্মানী উহাতে রাজী হইয়াছে।

সম্প্রতি ফিনল্যান্ড হইতে দ্রুতগতিতে জার্মান অপসারণ চলিতেছে।

পোলিশ সমস্যা

সম্প্রতি সোভিয়েট-পোলিশ সম্পর্ক লইয়া লণ্ডনের রাজ-নৈতিক মহল অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকার মতে ঐ সম্পর্ক 'ওয়ারশ'তে যুদ্ধমান পোলিশ সৈন্যগণকে সাহায্যদানের সমস্তার সহিত শোচনীয়ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে।' এই সমস্যা সম্পর্কে পোলিশ-প্রধানমন্ত্রী মি: ইডেনের সহিত আলোচনা করেন। সমস্তার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ: ওয়ারশ'র যুদ্ধাঙ্গণকে যে সকল ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমান, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ দিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সকল বিমানের জন্ত রাশিয়ায় ঘাঁটি দিতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন। ওয়ারশ'তে পোলিশ সৈন্যাদ্যক জেনারেল বণের প্রস্তাবানুসারে জার্মান অবস্থানের বিরুদ্ধে ভারী বোমাক বাহাতে ব্যবহার করা যায়, এবং সেই সঙ্গে সরবরাহ দেওয়া যায়, তজ্জন্ত আমেরিকানরা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নিকট বিমান নামাইয়া তৈল লইবার সুবিধা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' প্রভৃতি পত্রিকা বলিতেছে, সোভিয়েট এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। সোভিয়েট এইরূপ যুক্তি দেখায় যে, প্রথমতঃ, ওয়ারশ'তে অভ্যুত্থান যথাকালে করা হয় নাই, তাহার ফলে লালকোজের সাহায্যদানের ষ্ট্র্যাটিজি ব্যাহত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই অসময়েব অভ্যুত্থানের জন্ত সোভিয়েট দায়ী নয়। সোভিয়েট মনে করে যে, ওয়ারশ'র যুদ্ধাঙ্গণ লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্নমেন্টের আদেশ পালন করে, কিন্তু ঐ পোলিশ গভর্নমেন্টকে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট স্বীকার করেন না।

ডেলি হেরাল্ডের মতে—ঘাঁটি দিতে সোভিয়েট অস্বীকার করার বিমান তৎপরতার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়াছে, এবং লোক হতাহতের সংখ্যাও ইতিমধ্যে বেশী হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্নমেন্ট লুবলিনস্থিত পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সহিত সহযোগিতা স্বরূপে মাশাল ষ্ট্যালিনের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠাইতেছেন; তাহার চূড়ান্ত খসড়া শেষ হইয়াছে। এই কারণে বর্তমান মতান্তরে রাজনৈতিক মহল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। পোলিশ মুক্তি কমিটির পররাষ্ট্র বিভাগের পরিচালক মঃ মোরাভস্কি বলেন যে, ঐক্য স্থাপনের জন্ত কমিটি লণ্ডনস্থ প্রধান মন্ত্রী মঃ মিকোলাইজিককে পোল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছেন। মঃ মোরাভস্কি এই বলিয়া চাকল্য সৃষ্টি করেন যে, পূর্বে প্রুশিয়ায় ভার পোলেরা গ্রহণ করাব পর জার্মানগণকে সেখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

বুলগেরিয়ার অবস্থা

রয়টারের বিগত ২৪শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ—বুলগেরিয়ার আর্থিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করিয়াছে। ম্যাসিডোনিয়া এবং থ্রেস-এ গত তিন বৎসর কাল যাবৎ যে নৃশংস অত্যাচার অল্পশ্রুতি হইয়া আসিতেছিল, তাহার অবসান আসন্ন হইয়াছে, এবং বুলগেরিয়া কম্যাণ্ড ঐ সব এলাকা হইতে অন্যান্য ১১ ডিভিসন সৈন্য অপসারণের এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই সব সৈন্য বন্ধনস্থিত জার্মান সৈন্যদিগকে সাহায্য করিতেছিল। সম্প্রতি বুলগেরিয়ার সহিত কি সর্বো সন্ধি হইতে পারে, মিত্রপক্ষ সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। বুলগেরিয়া বর্তমানে নিরপেক্ষ থাকিতে প্রয়াসী। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ: বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ বাগ্রিয়াখোভ পদত্যাগ করিয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বুলগেরিয়া কঠোর নিরপেক্ষতানীতি অবলম্বন করিবে। জার্মানী যদি কোনো অশ্রুবিধাব সৃষ্টি করে, তবে জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে। যুদ্ধ হইতে বুলগেরিয়ার সরিয়া দাঁড়াইবার নীতি গভর্নমেন্ট অনুমোদন করিয়াছেন। এদিকে মস্কো বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, রুশ সরকার বুলগেরিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন এবং রুশিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান—মস্কোর বুলগেরিয়ান দূতের হাতে রুশ সবকারের এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় বুলগেরিয়ায় নিরপেক্ষতানীতি যে কতদূর কাঙ্ক্ষ্য-করী হইবে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহল সন্দেহই সন্দেহান।

যুদ্ধের গতিপথে জার্মানীর সামনে আজ এক বিঘন পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্মানীর যে ভুল হইয়াছিল, বর্ণনীগতিতে সেই ভুলের বাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, বর্তমান যুদ্ধের গোড়া হইতেই হের টিটলার সে বিষয় সতর্ক হইয়া জার্মান-বাহিনীকে একাধিক ঝণক্ষেত্রে নিয়োজিত না রাখিয়া বৃহৎ শক্তিতে ক্রমাগত অগ্রগতির পথে চলিয়াছিলেন। কিন্তু আফ্রিকা ও নাৎসীবাহিনীর বিপর্যয়ের পর দক্ষিণ ইতালীতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ হইতেই তাঁহার সেই ঝণপরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বসিল। পূর্বের বাতাস এখানে আসিয়াই যেন একটা আকস্মিক ঘূর্ণিবাতায় পাক খাইয়া গেল। ১৯৪০ সালের জুন হইতে ফ্রান্সে জার্মানীর যে দৌত্য চলিয়াছিল, হেনাবেল আইসেনহাওয়ারের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতিক মিত্রবাহিনীর ক্রম-অভিযানের ফলে আজ তাহা পর্য্যদন্ত হইতে চলিয়াছে। ফ্রান্সের পূর্ণাধিকারের দিন আজ আর দূরে নয়। ইহা ছাড়া সমগ্র ইউরোপ ও বন্ধনে সম্প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে যুদ্ধ আঁকু হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মাথা তুলিতে যাইয়া কোনো বিশেষ নিরাপদ ব্যুহে প্রত্যাবর্তনের পথই খুঁজিতে হইতেছে জার্মানীকে। এদিকে ইতালী ঝণক্ষেত্রে আজ আর তাহার বিন্দুমাত্রও স্থিতি

নাই। যুসোলিনীর পতন এবং জার্মানীতে পলারনই তাহাব প্রত্যক্ষ উদাহরণ বলা যায়।

ইতালীর পর রুম্যানিয়াকে নিয়া অনেকখানি ভয়সা ছিল হিটলারের। রুম্যানিয়ার খনিজসম্পদে সমরায়োজন পরিপুষ্ট ছিল জার্মানীর। কিন্তু ভাগ্যশ্রোত এমনই প্রবাহিত যে, সেই রুম্যানিয়া আজ শুধু হাতছাড়াই হয় নাই, সোভিয়েটের সাথে যুদ্ধ-বিবর্তিত চুক্তিতে আজ সে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছে। এদিকে বুলগেরিয়া নিরপেক্ষতামূলক যুদ্ধবিবর্তিত জগৎ উত্তোষী। গ্রীক-দেশপ্রেমিকও ইত্যবসরে প্রযোগ বৃথিয়া নাংশীকবল-যুক্ত হইবার আয়োজন করিয়াছে। তুরস্কের সংলগ্ন সমগ্র গ্রীকসীমান্তে তথাকার দেশপ্রেমিকদের এক বিবর্তিত কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া একটি বিশ্বস্ত সংবাদও ইহাবই মধ্যে আমরা পাইয়াছি।

এদিকে রাশিয়ার লালফৌজের কাছে আজ বিপর্যয়ের অন্ত নাই জার্মানীর। ফিল্ম্যাণ্ড ছিল তার অগ্রতম অবলম্বন। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিল—রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগতঃ যুদ্ধ-বিবর্তিত-বস্তার মধ্য দিয়া জার্মানী রাশিয়ায় এক কায়মীশক্তি লইয়া দাঁড়াইতে পাড়বে। কিন্তু দেখা গেল—সাময়িক তথা ভৌগোলিক অবস্থায় ফিনিশকে ষষ্ঠেরূপে সাহায্য করা জার্মানীর সম্ভব নয়। সম্প্রতি রাশিয়ার সাথে ফিনিশের নবতম সাময়িক চুক্তিতে ফিল্ম্যাণ্ড, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইয়াছে। ফিনিশ প্রধান মন্ত্রী মঃ হাক্কেলেনের এক বেতার বক্তৃতায় স্পষ্ট বোঝা যায়—জার্মানীর পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত খাবাপ হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ জার্মানসৈন্যই এখন আব বিশ্বাস করেন না যে, তাহাবা বিজয়লাভ করিবে। অত্ৰাদিকে মিত্রবাহিনী আজ একরকম জার্মানীর ষারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডও সম্প্রতি ভিতরে ভিতরে বন্ধন-মুক্তির প্রত্যাশায় নড়িয়া উঠিয়াছে। জেনাবেল আটসেন-হাওয়ার এক ষাগী প্রসঙ্গে তাহাদের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের মুক্তির দিন আসন্ন। বর্তমান আবহাওয়ার দিক হইতে কথাটা যে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে ভুল নাই। হিটলারের কণ্ঠ আজ একরকম নিস্ত্র হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে দেখা যায়—মিত্রবাহিনী খাস জার্মানীতে রোয়েংজেন গ্রাম দখল করিয়াছে। তা ছাড়াও আকেনের দক্ষিণপূর্বে ও সিগফ্রীড্ লাইনের পশ্চিমে কয়েকটি জার্মানসহর ইতিমধ্যে অধিকৃত হইয়াছে।

এদিকে আসামব্রহ্ম বণাজন সম্পর্কে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশিত যে সমস্ত ঘটনাবলী আমরা পাইতেছি, তাহাতে জাপানের বিপুল শক্তি যে ক্রমশঃ নির্বীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

স্মরণে থাকিতে পারে যে, ১৯৪২ সালে মিত্রপক্ষ বর্ধা ত্যাগ করেন। “আমরা আবার ত্রক্ষে ফিরিয়া যাইব” বলিয়া জেনারেল ষ্টীলওয়েস তখন যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা একরকম বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। উত্তর ত্রক্ষে দশ সহস্রাধিক বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান পুনরায় অধিকৃত হইয়াছে—বাহার ফলে প্রায়

কুড়ি হাজার জাপানীর প্রাণনাশ ঘটে। লুপ্ত সময়সম্ভার সচ মিত্রসৈন্য সম্প্রতি আবার ত্রক্ষে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইতেছে।

এই দুর্দর্শ দেশ দুইটির আকস্মিক এই দুঃস্থতার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—বিস্মৃক দেশগুলির উপর দমননীতি চালাইয়া কখনও কোনো শক্তি একচ্ছত্র হইয়া দীর্ঘ দিনের স্থিতি লইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুযোগ আসিলেই বিজিত দেশ আবার বিজয়দর্পে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। এমনি করিয়াই আজ যে ক্রমাগত পাণ্ডা আক্রমণ শুরু হইয়াছে, তাহার কাছে জাপান কিংবা জার্মানীর সিংহ-বিক্রম আজ আর দুঃসাহসীর জয়যাত্রায় ভীমমূর্ত্য তুলিবার মতো সঙ্গতি-সার্থক নয়।—সর্বত্রই আজ মিত্রপক্ষের আশু জয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা

বিগত আগষ্ট মাসেব মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে মিঃ জিন্নার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাত ও হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী সম্পর্কে আলোচনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু মিঃ জিন্নার আকস্মিক অন্তঃস্থতার জগ্ন উক্ত সময় সাক্ষাৎ-আলোচনা বন্ধ থাকে। সম্প্রতি মিঃ জিন্নার পুনর্নির্দেশ অনুযায়ী গত ৯ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে গান্ধীজী তাহার সতিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে ক্রমাগতঃ কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহাদের আলোচনা চলিতেছে। আলোচনা বিষয় সাংবাদিক মহলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বোম্বাই বিক্ষোভের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

গত ১৪ই এপ্রিল তাবিখে বোম্বাই ডকে যে বিক্ষোভ হইয়া গিয়াছে তাহাব কারণ অনুসন্ধানের জগ্ন বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্মার লিওনার্ড ষ্টোন, প্যাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ এস, বি, ধারেল এবং রিয়ার এডমিরাল সি, এস, হল্যাণ্ডকে লইয়া একটি কমিশন ২রা মে তাবিখে নিযুক্ত করা হয়। কমিশন ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বহু নথিপত্র পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি কেবলমাত্র বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়াছেন। আমরা রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,কর্তব্যের গাফিলতি এবং বিচ্যুতি উভয় প্রকাব ভ্রম প্রমাদের জগ্ন বোম্বাইতে চরম দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অগ্নিব বিপদ সঙ্কেত ধ্বনি যখন আলেকজেন্দ্রিয়া ডকে জাপান করা হয় তখন বেলা ২—১৬ মিঃ! অতঃপর কণ্টোল ক্রমে যখন সংবাদ পঠান হয় তখন অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ... যে সংবাদ পাঠান হয় তাহাতে অতি সাধারণ ধরণের অগ্নিকাণ্ড বলিয়া মনে হয় প্রথমে কেহই অবস্থা গুরুতর বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ... বেলা ২-২৫ মিঃ সময় হাঁগুয়ান আর্শি অর্ডান্স কোরের ক্যাপ্টেন ওবাঠ জাহাজের উপর যান। তিনি জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারের সতিত দেখা করেন এবং গুরুতর অবস্থাব কথা জানান এবং জাহাজখানাকে ডুবাইয়া দেওয়ার জগ্ন বলেন। তিনি নাকি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, জাহাজে যে পরিমাণ বিক্ষোভক পদার্থ আছে তাহা বিক্ষোভিত হইলে সমস্ত ডক পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। ..



নৃত্যকুশলা ছায়া-
চিত্রশিল্পী শ্রীমতী
সাধনা বসুর অনিন্দ্য-
সুন্দর অভিনয় ও
নৃত্য পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে তাঁহার
অঙ্গের নিখুঁত বক ও
উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে ;
এবং আমাদের গর্ব
এই যে, প্রতি রাতে
নিয়মিত ওটীন ক্রীম
বাবতাবের ফলে তাঁহার
নিখুঁত বক ও
উজ্জ্বল বর্ণ এখনও
অক্ষয় আছে ।

OATINE CREAM is indispensable for
my toilet. I have been using it for a
long time, and find it delightful,
and extremely necessary to preserve
a perfect skin.

Sadhona Bose



(Oatine CREAM for nightly
massage
SNOW for daily
protection

বাংলার

লক্ষ্মী শ্রী

ফিরিয়া আসুক ।

লক্ষ্মী ঘি

বঙ্গপ্রা

মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ



শিশুদের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ অমৃতের ন্যায়
অনুরূপ। কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং পুষ্টি-
কারিতায় 'ভিটা মিল্ক' মাতৃদুগ্ধেরই
অনুরূপ। ইহা খাঁটি গো-দুগ্ধ হইতে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত এবং ইহাতে
প্রচুর ভিটামিন বিদ্যমান। আপনার
সন্তানের স্বাস্থ্য, শক্তি
এবং লাবণ্যের পূর্ণ
বিকাশের জন্য

তাহাকে নিয়মিত 'ভিটামিল্ক' খাইতে দিন।

ভিটা-মিল্ক

বিশুদ্ধ·পুষ্টিকর·স্বস্বাদু

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ • কলিকাতা





ফেমিন সুন্দর দেখায়!

কিন্তু এই কথাই আপনাকে
বলবেন যখন আপনি দেখেন
একজন নারীকে।

এই যেমন একজন নারীকে
আপনার মনে পড়বে যে
আপনার 'সানসাইন' -
এভারবিউটি - এই যেমন
আপনার মনে পড়বে যে
এই যেমন একজন নারীকে
আপনার মনে পড়বে যে

বীণা হোর্স য়ারী ইণ্ডিয়া লি:
৭, শশীভূষণ চ্যাটার্জী সেন, টালা, কলিকাতা।



যুদ্ধকালে পীড়িত ও আহতদের সেবা করা ব্যতীত উৎকৃষ্ট কার্য আর কি থাকিতে পারে? পীড়িত ও আহত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে এই কোমল ও পটু হস্তের সেবার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষিত নার্মেব সাহায্য ব্যতীত ডাক্তারগণ এবং তাহাদের বিজ্ঞান উভয়ই কগীদের জায় অসহায় হইয়া পড়ে।

বর্তমানে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইছে এবং এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্যের জন্ত বহু সংখ্যক মহিলা প্রয়োজন।

তাহাদের জন্ত যুদ্ধজয় নিশ্চিত, তাহাদিগকে সেবা করা, জন্ত বিধা এবং স্বেচ্ছাচ পনিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হউন।

পূর্ব-অভিজ্ঞতান প্রয়োজন নাই; কারণ, কার্যে নিয়োগ করার পূর্বে কিছুদিন শিক্ষা দেওয়া

হয়। যাহাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা সবাসবি ভাবে কার্যে গৃহীত হইতে পারেন।

পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকিলে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়।

সন্তোষজনক কাণ্ড-সমাপ্তির পব এককালীন কিছু টাকা দেওয়া হয়।

সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত যে সমস্ত নার্স আই. এম্. এন.

এস্.-এর দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশেষ সর্তে

এ. এন্. এস্.-এ যোগদান করিতে পাবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত লিখুন :

লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সেন্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেড।

নং গভর্নমেন্ট প্রেস, কলিকাতা।

আপনি যদি এই ঠিকানা অসুস্থকান করিতে অক্ষম

হন, তাহা হইলে এই ঠিকানায় লিখুন :

ডাইবেস্টর জেনারেল,

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, নিউ দিল্লী।

ভারত

সেবা করিতে

এ. এন. এস.-এ

যোগদান করুন।

অক্সিজেনারী নার্সিং সার্ভিস.

বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ও শাড়ী

আগেকার দিনের মতই টেকসই
ও সস্তা

কিন্তু কোন মিলের পক্ষেই আজ আর যথেষ্ট
বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
সমটাইতে পারিতেছি না।

প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বস্ত্র কিনিবেন না, যাহা আছে
তাহা দিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেল
সেলাই করিয়া পরুন। এই দুদ্দিনে
তাহাতে লঙ্ঘিত হইবার কিছু নাই।
যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়
আমাদের অনুরোধ করিবেন।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গী কটন মল্‌স্‌ লঃ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বঙ্গশ্রী-বিজ্ঞাপনী—কার্তিক, ১৩৫১

বাংলা র গৌরব
বাঙ্গালীর নিজস্ব

আর. বি. রোজ

নস্তু

সুমন্থর পাক-সৌরভে

পাক নস্তু

জগতে অভুলনীর

মূল্য—ভিঃ পিঃ মাণ্ডলসমেত ২০ তোলা

১ টিন ৩/০ ; ২ টিন ৬/০ মাত্র।

ক্যালকাটা স্নাক ম্যানুফ্যাক্ কোঃ

১৩৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

FIRE

MARINE

THE

Concord

OF

India

INSURANCE COMPANY LIMITED.

(Incorporated in India)

Accident

8, CLIVE ROW, CALCUTTA.

শিল্প-সস্তারের পূর্ণ

III



বর্ণ-সুসমাস বিচিত্র

দ্রি
বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কমার্শিয়াল এণ্ড আর্টিষ্টিক প্রিন্টারস্,
ষ্টেশনার্স এণ্ড একাউন্টবুক মেকার্স

প্রোঃ এ. সি. মৈত্র এণ্ড সন্স,
কন্ট্রাক্টর এণ্ড কমিশন এজেন্টস্,

১২ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল ২১২৮

THE NEW INDIAN GLASS WORKS (Calcutta) LTD.

*Factory :—2, Church Road, Dum Dum Cantonment
and
101/1, Ultadanga Main Road.*

OFFICE :—7, Rawdon Street, Calcutta.

Manufacturers of all kinds of BOTTLES both narrow and
wide-mouth, stoppered and screw-caps

NEUTRAL GLASS A SPECIALITY

ADRENALINE and VACCINE FILES and TUBES
are manufactured from absolutely neutral glass.

For Particulars Apply to the Head Office of the Company.



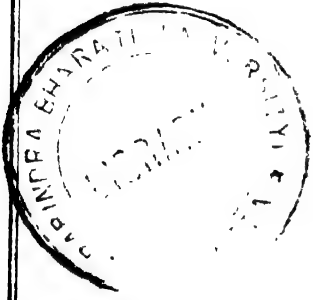
Two points are
VITAL

- SAFE
- PROFITABLE

Bank with
SREE BANK LTD

3-1, BANKSHALL STREET, CALCUTTA

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের
শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্
লাইনে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-
সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে
এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থ্রু টিকেট্ শিলং অফিসে
পাওয়া যায়।



দি ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস্

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

আমরা না মাত্র খরচায়

আপনার পার্শেল ইত্যাদি

শিয়ালদহে এবং শিয়ালদহ হইতে

কলিকাতার যে কোন স্থানে

সর্বদা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি।

হাইকোর্ট শাখা
নং ওল্ড পোস্ট অফিস ষ্ট্রীট
(কলিকাতা)

দি

কমার্শিয়াল ক্যারিয়ারিং

কোং (বেঙ্গল) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটান ইলিকট্রেল হাউস

১৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অঃ বি.সেন, এটর্নি-এট-ল মহোদয়ের
সহযোগিতায় শীঘ্রই খোলা হইবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লি

হেড অফিস :

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

পোস্ট বক্স—২৪০৩ টেলিগ্রাম “লেনদেন” কডি:

মদনানন্দ ট্যাবলেট

আয়ুর্বেদোক্ত “মদনানন্দ মৌদক” মূলপ্রকার ভ্রূসলতা ও পৌষ্কণীনশয় বহুশাখী-প্রচলিত শ্রেষ্ঠ রসায়ন। তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে Vitamin ও Calcium সহযোগে নির্দিষ্ট মাত্রায় Tablet আকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। “মদনানন্দ ট্যাবলেট” স্নায়বিক দুর্বলতা ও শুক্রহীনতার অস্বাভাবিকতা, অসীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্বল ও Dyspepsia দূর করিয়া ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার সার উপকার নাই। নুতন রক্ত ও বাহ্যিক স্থিতি করিয়া ও হৃদিত্রা আনয়ন করিয়া ইহা মূলপ্রায় বৈজ্ঞানিক নবজীবন সঞ্চার করে। যাহারা কঁচা “মদনানন্দ” সেবনে উপকার পান নাই, তাহারা একবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রস্তুত “মদনানন্দ ট্যাবলেট”-এর নমুনা ব্যবহার করিয়া দেখুন—নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।

ছোট শিশি (৩২ ট্যাবলেট) ১/- ডাকবায় ১০। বড় শিশি (৮০ ট্যাবলেট) ২/- ডাকবায় ১০।

ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট

আয়ুর্বেদোক্ত “ভাস্কর লবণ”-এর নাম এবং গুণের সহিত মনেই পরিচিত আছেন। “ভাস্কর লবণ”-এর সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি অম্লশক্তিবদ্ধক এবং পাচক গুণধারি সংমিশ্রণে, নির্দিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট-আকারে “ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট” সর্ববিধ অসীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, Dyspepsia, বৃক্মালা করা, চোঁয়া চেঁকুর উঠা, পেটে বায়ু হওয়া ও বদহজম-জনিত কোষ্ঠাঘটিতা ইত্যাদি রোগে অস্বাভাবিক মনোবোধ। ট্যাবলেট-আকারে প্রস্তুত বলিয়া ব্যবহারেও অত্যন্ত সুবিধাজনক। বাহ্যিক সুবাস ২৩ বা শিশুরাও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে সকলেই নব-জীবন লাভ করিবেন। “ভাস্কর লবণ ট্যাবলেট” বর্তমান যুগের মনঃপ্রদ Digestive Tonic.

ছোট শিশি (৩২ ট্যাবলেট) ১০/- ডাকবায় ১০। বড় শিশি (৮০ ট্যাবলেট) ১৪/- ডাকবায় ১০।

দিল্লী অফিসে পোস্টেজ ও প্যাকিং-এর জন্য ৮/- আনার টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে উত্তর অকার ট্যাবলেটের নমুনা পাঠান হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। সর্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

এজেন্ট—

দিল্লী আয়ুর্বেদ ফার্মেসী

৮০, শ্রীমবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ২২, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

কল্যাণী স্টোরে—গোখোলিয়া, বেনারস।

BHARAT AYURVED LABORATORY

P. B. 158
DELHI

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থু টিকেট
শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাওয়া যায় এবং শিলং হইতে কলিকাতা
আসিবার থু টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের
১১নং ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা
রিটার্ন টিকেটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ
রসিদের পরিবর্তে পাণ্ডুতে টিকেট পাওয়া যায়।
এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(আ সা ম) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস্

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা



বঙ্কো :  ক্যাচ অয়েল

ফ্রান্স রস্ এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মূলধন			
অধিকৃত	২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা
বিলকৃত	১২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা
গ্রহীত	১২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা
আদায়কৃত	৭,০০,০০০ লক্ষ টাকার অধিক
কার্যকরী তহবিল	৮৫,০০,০০০ লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে বার্ষিক শতকরা

১০% টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইয়াছে :

এ পর্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা
হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন্. এন্. মুখার্জী, এম-এস-সি (কাল),

এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), চার্টার্ড সেক্রেটারী।

অলঙ্কার বিচিত্রা

MBS



অলঙ্কার নির্মাণে — চিত্রাইসের
মৌর্য, মল্লার্য আর এন-
বর্ণের লিঙ্গভাই আমাদের
পৈতৃক। আমাদের লোকের
শিল্প কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র
নির্মিত স্বর্ণের বা মাটির কাল
কাসের অলঙ্কার ও রৌপ্যের
মাসের সর্বত্র বিক্রয়ার মূল্য
থাকে এন- অর্থাৎ বিশেষ করে
সমস্ত পদ্ধতিতে বহু জিনিষ তৈয়ারী
করিয়া দেওয়া হয়। স্বর্ণের অলঙ্কার
অর্থাৎ চি পি জাকে পুড়ান
হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্তে
নতুন অলঙ্কার পাওয়া যায়।
কাজের তুলনায় বহুদূর দলভ
এন- সর্বত্রই অলঙ্কারের
বিক্রয় পাওয়া থাকে।

এম বি সর্বকার ২৩ মঃ

সন এও গ্রাও সনস অব লেট বি. সর্বকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাণ

১২৪ ১২৪-১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

(ফোন নং ১৭৩৩)

(মাসিক বিজ্ঞাপনী)

জীবন বীমাপত্র

বর্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। একটি জীবন বীমা-পত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। ‘ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স’কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবার-বর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে. সি. দাশ, বি-এসসি (ইউ. এন্ড. এ.), আর. এ., চেয়ারম্যান

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গলক্ষ্মী সোণ ওয়ার্কস্



হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাথা—ছ’রকমের সাবানের জুড়ি

“বঙ্গলক্ষ্মী” প্রশস্ত !

আডিবাদের প্রথম সংখ্যায়

চিত্র জগতে সব পর্যায় সূচনা করার মত
কথানি ছবির কথা জনিয়ে রাখছি!

আগমন প্রতিফল

চিত্রজগতের

চল. চলবে নও ছায়া

শ্রেষ্ঠাংশ :

অশোককুমার—নাসীম



অমায়িক

শ্রেষ্ঠাংশ :

অশোককুমার—বীণা—নাসীম



পরিষ্কার

শ্রেষ্ঠাংশ :

পাহাড়ী সাখাল—অঞ্জলি

সাতকমল
কলামনিবে

পবিত্র-প্রেম-আপনা দেও

শ্রেষ্ঠাংশ :

বনমালা—উল্লাস

কোমল
আঁচ

কলিঙ্গা

শ্রেষ্ঠাংশ :

রমণী



মতন

শ্রেষ্ঠাংশ :

স্বর্ণলতা—ওয়াশি



কালুণ্ড • গীত • জীবন

শ্রেষ্ঠাংশ :

জনপ্রিয় তারকামণ্ডলী



লোডি ডাঙার

শ্রেষ্ঠাংশ :

মমতাজ শান্তি—উল্লাস

গ্রাম—বৈখের ধন

ফোন :

ক্যাল ৩৭৩৪

২ জবাদা ব্যাংক

—স্থাপিত—

১৯২৯

৩৭নং কলিকাতা কলিকাতা

আয়করমুক্ত শতকরা ৫ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

কলিকাতা		শাখা সমূহ —		আসাম	বিহার
		বাংলা			
মাণিকভাঙ্গা	ধর্মভাঙ্গা	মেদিনীপুর	বাঁকড়া	তেজপুর	পাটনা
শ্রীমহাজার	শিয়ালদহ	বালিচক	বিষ্ণুপুর	হবিগঞ্জ	রাঁচী
কলেজ ষ্ট্রীট	বালিগঞ্জ	শালবর্ণী	মিরকাঁদৌম		
বড়বাজার	পোস্তা	আলমগড়া	কুম্ভনগর		
		গড়বেতা	খুলনা		
		ঘাঁটাল	বাগেরহাট		

সেন্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে

সর্ব প্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীমুত কালোচরণ সেন।



ভ্রামনা গ.

বিশুদ্ধ · স্বাদু · রুচ্য

স
ন্দে
শ

৬-৮, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ১৪৬৫

৬৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর

ফোন—সাঁউথ ১১৭৭

৪৬, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ৩৩৭৮

আশ্চর্য্য বনৌষধি

হিমালয়ের দিব্য বনৌষধি “জয়ন্ত” হস্তে ধারণ করিলে ‘ধারণাশক্তি’ স্বচ্ছাধীনরূপে বর্জিত হয়। প্রমেহ, পুরুষত্ব-হীনতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া ধারণাশক্তি স্বচ্ছাধীনরূপে স্থায়ী করিতে “জয়ন্ত” অধিতীয় ও অব্যর্থ। যতক্ষণ “জয়ন্ত” হস্তে ধারণ করা থাকিবে ততক্ষণ কোন-মতেই ‘শক্তি’ হ্রাস হইবে না। এই অমূল্য ঔষধাণ্ড্য দর্শনে মুগ্ধ হইবেন। কখনও ব্যর্থ হয় নাই। ইহার দ্বারা আপনি স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।

মূল্য—৪।০ টাকা, ডাকবায়।০ আনা।

—ঠিকানা ইংরাজীতে লিখিবেন—

HIMALAYASRAM

POST BOX 172 DELHI

ন্যাশ্য পারিশ্রামিকে

এবং

অল্প সময়ে

সর্বপ্রকার রক

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ

ও

আধুনিক ডিজাইন

রিপ্রোডাক্সন

সিঙ্ক্রিট

৭।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

যে সব বই একই সঙ্গে পাঠতৃষ্ণা মেটায় এবং বাড়ায়!

শ্রীমরোজকুমার রায় চৌধুরী

ক্ষুধা ২।০ শৃঙ্খল ২।০
শতাব্দীর অভিলাষ ২।০
হালদার সাহেব (নাটক) ২।০
ঘরের ঠিকানা (যন্ত্রস্থ) ২।০

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ড্রামের সেই লোকটি ২।০
ছদ্মস্তরের বিচার ১।০
ক্যামেরার ছবি ২।০

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত

মহা মনস্তর

দ্বিতীয় মুদ্রণ, মূল্য ৫।০

শ্রী বভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪।০

শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্বপ্নাদপি গরীয়সী ৪।০
নৌলাঙ্গুরীয় চৈতালী ৩।০
বর্মায় শারদায় ২।০
হৈমন্তী বসন্তে ৩।০
বরষাত্রী ২।০

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আধুনিক আবিষ্কার ২।০

ডঃ প্রমথ নাথ রায়

নিরালস্য (ছোট গল্প) ২।০

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস

অনবগুপ্তিতা ২।০ তারি

একদিন ভালবেসেছিল ১।০

ডঃ স্থণালকুমার ঘো

অত্মতনী (কাব্য) ১।০

শ্রীতারাপদ রাহা

যোগীনীর মাঠ ১।০

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১।০ নূতন অধ্যায় ১।০
সমর্পণ ১।০ সমী ও দীপ্তি ১।০

শ্রীমতী রেণু মিত্র, এম-এ লিখিত

রবীন্দ্রনাথের ঘরের বাইরের

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী লিখিত ভূমিকা
সম্বলিত, সর্বত্র প্রসংশিত।

অরুণি : একরূপ একখানি প্রথম শ্রেণীর
সমালোচনা গ্রন্থ সুধীসমাজে সমাদর
লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

জে না রে ল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পারিশাস লিঃ—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গশ্রীর নিবেদ

“বঙ্গশ্রী”র বার্ষিক মূল্য সভাক ৩০ টাকা। বামাসিক ৩০ টাকা।
ভিঃ পিঃ খরচ বহুতর। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮/০ আনা। মূল্যাদি—
কর্ণাধার, বঙ্গশ্রী, C/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায়
পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে “বঙ্গশ্রী”র বর্ধারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে
গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট
দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। দেবস্তের ক্ষু
ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৩ নিবন্ধমানবলী

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে “বঙ্গশ্রী” প্রকাশিত হয়।
যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে
দ্বিতীয় ডাক-ঘরে অহুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আশাশ্রিত মাসের
২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য
থাকিব না।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও
পরিবর্তনের নির্দেশ না আসিলে পরবর্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে
কাণ্ড করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ৫
তারিখের মধ্যে জানানো দরকার।

শুদ্ধের দিনেও

“বঙ্গলক্ষ্মী”র আয়ুর্বেদীয় ঔষধসমূহ

পূর্বামুরূপ বিশুদ্ধ উপাদানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ

কবিরাজমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।

শুদ্ধের অজুহাতে ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এ কারণ, “বঙ্গলক্ষ্মী”র ঔষধ সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্য।

অল্পমূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে হইলে

“বঙ্গলক্ষ্মী”রই কিনিবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মেট্রোপলিটান ইন্সওয়েন্স কোং

প্রভৃতির পরিচালক কর্তৃক প্রাপ্তি

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্বেদ ওয়ার্কস

অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধপ্রস্তুতকারক

প্রধান কার্যালয়—১২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। কা.খানা—বরাহনগর।

শাখা—৮৮নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, রাওসাহী, জলপাইগুড়ি, বাগেরহাট, বালিশাল, হাশোহর, মাদারীপুর ও ধানবাদ

For Quality Printing And Prompt Delivery

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE Ltd.

STANDS FOR !!!

90, LOWER CIRCULAR ROAD,

CALCUTTA



বঙ্গী



[১২শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা]

[কাঙ্ক্ষিক-১৩৫১

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা নাম			বীরেন্দ্র (গল্প)	— শ্রী অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,	
এবং উহা সমাধানের সংকেতের নাম	শ্রী সচিদানন্দ ভট্টাচার্য ১৭			এম্-এস্-সি	৩১০
বিজয়া (কবিতা)	— শ্রী দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৩		অনাগত (গল্প)	— শ্রী অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩১১
বিজয়ার প্রলাপ (প্রবন্ধ)	— শ্রী চরিত্রদত্ত ২৮৪		বায়ু-পরিবর্তন (নক্সা)	— শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়, এম্-এ	৩১৩
ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পবাণিজ্য ও			অন্নদামঙ্গলে মানসিংহ-ভবানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্র-প্রসঙ্গ		
অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)			(প্রবন্ধ)	— শ্রী কালিদাস রায়	৩১৪
— শ্রী যশীজ্ঞমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬			সন্ন্যাস ও শ্রেষ্ঠা (উপন্যাস)	শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১৭
মর্শ ও কর্ম (উপন্যাস)	— ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৯০		আকবরের বাহুসামান (প্রবন্ধ)	এম্ ওয়াজেদ আলি,	
ললিত-কলা (প্রবন্ধ)	— শ্রী অশোকনাথ শাস্ত্রী ২৯৫			বি-এ (কেণ্টাব) বার-এট্-ল	৩২০
সৃষ্টি-রহস্য (একাঙ্কিকা)			শিশু-সংসদ—		
— অধ্যাপক ডাঃ নৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস,			উদয়ন-কথা	— প্রিয়দর্শী	৩২২
এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি ২৯৯			সৃষ্টি বুঝি হয় অবসান (কবিতা)	— শ্রী প্রিয়লাল দাস	৩২৩
বিচিত্র জগৎ—			তোমারই (উপন্যাস)	— শ্রী অলকা মুখোপাধ্যায়	৩২৪
কাচিনদের দেশ (মচিত্র)	— শ্রী স্বরেশচন্দ্র ঘোষ ৩০১		কাব্যকথা ও কালিদাস (প্রবন্ধ)		
শব্দের রাগি (কবিতা)	— শ্রী নীলরতন দাশ, বি-এ ৩০৫			— শ্রী দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩২৬
বায়ুর গুণ (প্রবন্ধ)	— শ্রী প্রভাসচন্দ্র পাল, প্রকৃত্ততত্ত্ববিদ ৩০৬		সঙ্গীত ও স্বরলিপি		৩৩২
পিতৃ-পরিচয় (গল্প)	— শ্রী জনরঞ্জন রায় ৩০৭		গান রচনা :	বাণীকুমার,	
নিপী (গল্প)	— শ্রী রমেন মৈত্র ৩০৭		স্বরলিপি :	অনিল দাস ও বিমলভূষণ	
ত্রাণ-সমিতির একটি নারী (গল্প)	শ্রী সত্যী কুমার নাগ ৩০৮			[পর পৃষ্ঠায়	

বাংলার বঙ্গ-সমস্যা সঙ্কটে তাঁতের ও মিলের কাপড়ের জগ

দি ক্যালকাতা ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
লিমিটেড্কে স্মরণে রাখিবেন

পরিচালক

ফোন
বি. বি. ৩৩১২

বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গাগারের কর্তৃপক্ষ

(বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গাগার আদায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে)

কলেজ স্কয়ার
কলিকাতা

বিষয়-সূচী — পৃষ্ঠাঙ্ক বৃত্তি

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা			বিজ্ঞান জগৎ		৩৪১
কব্ধি	— শ্রীবীণা সেন, এম-এ	৩৩৩	ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য (প্রবন্ধ)		
অনধিকারী	— শ্রীকৃষ্ণদরজন মল্লিক	৩৩৪		— শ্রীস্বরেজনাথ চট্টোপাধ্যায়	
গান	— আব্বাস উদ্দিন আহম্মদ	৩০৪	সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা (সচিত্র)		৩৪৩
মরণ-বাসর	— শ্রীনবুলেশ্বর পাল, বি-এল	৩০৫	ইউরোপীয় যুদ্ধের গতি ; আসাম-প্রবন্ধ রণাঙ্গন ;		
‘অনন্ত-যাত্রা’	— শ্রীবিমল রায়	৩০৫	স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাচীন ; তপশীল-চিন্তা-		
“যাযাবর মন ভোলে পথচলা”	— শ্রীআশা সান্যাল, বি-এ	৩০৫	সম্মেলনে ডাঃ আশ্বদকর ; গান্ধী-জিন্না		
মায়ামৃগ (নাট্যরাসিকা)	— বাণীকুমার	৩০৬	আলোচনার বার্থতা ; পরলোকে খ্যাতনামা		
গণকলা, বর্ধককলা ও নবকলা			মার্কিন রাজনৈতিক ওয়েগেল উইকি ;		
(সচিত্র প্রবন্ধ)	— শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৩০৮	পরলোকে সত্যোন্মোচন।		

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও দেশবাসী সর্বসাধারণকে
আমাদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি।

চিত্র-সূচী

দ্বিবর্ণ চিত্র—		গণকলা, বর্ধককলা ও নবকলা—	৩৩৮
মেঘের ‘পরে মেঘ জমেছে	ফটো— শ্রীগোবিন্দচরণ বসু	উড়িয়ার চিত্রকলা ; বারলাকের ‘এঞ্জেল’ ;	
দিনের শেষে সন্ধ্যা-তিমির (একবর্ণ চিত্র)	ঐ	কার্লোয়াটেব পট ; নেপালের গ্রাম্যকলা।	
প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রাবলী :		সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা -	৩৪৩
কাচিনদের দেশ (বিচিত্র জগৎ) —	৩০১	মার্শাল চিয়াং কাউসেক ; গান্ধীজি ;	
তিনজন মাক্র-কাচিন মোট পিঠে জড়িয়া পথ		মিঃ জিন্না ; উইগেল উইকি ;	
চলিয়াছে ; নৃত্যরত কাচিন তরুণদল ;		সত্যোন্মোহন রায়।	
বয়সনবাপুত্র কাচিন কামিনী।			

ইন্দির যাত্রা কো:
৪, রাজা উদ্‌য়নট ষ্ট্রীট, কলি:

২ চরা ও পাইকারী হাট্‌দারগানের
এ-মাস নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান



ফোন—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫

গ্রাম—“এরিওপ্লাটস্”

বেঙ্গল শেয়ার

সিঙি কট্ লিঃ

ষ্টক্ ও শেয়ার ব্যবসায়ের ভারতের বৃহত্তম

—মৌখ প্রতিক্রিয়া—

হেড অফিস—১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

শাখা ও এজেন্সি—এলাহাবাদ, বোম্বে, বেনারস, ভাগলপুর, বাঁকুড়া, দিল্লী, ঢাকা, লাক্ষো,
মুঙ্গের, ময়মনসিংহ, পাটনা ও রাঁচী।

—মূলধন—

অনুমোদিত—

২৫,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত—

১৮,০০,০০০ টাকা

আদায়ীকৃত—

১০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে

আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি, টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও লাভজনক
উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।

ভাল সুদে “স্থায়ী আমানত” গ্রহণ করি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের “মাসুলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” পাঠ করুন।
বিনামূল্যে নমুনা-সংখ্যা পাওয়া যায়।

বিস্তৃত ও সরল
ভিত্তিনী
বঙ্গীয় সংস্করণ
ব্রাহ্মায্যাণ

৬০ খণ্ডে সমাপ্ত

প্রতি খণ্ডের মূল্য—এক টাকা মাত্র।

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

লক্ষ্মীর বার্তা ভিন্ন কল্যাণময়,
দুঃখের আশ্রমে আনে আনন্দের ফল।
সকলের অর্ঘ্যভায়ে অর্জনা তাঁর,
দেশে দেশে শুনি স্তুতি দেবী কমলাকর।

অর্থগুণুতা আর অর্থ সঞ্চয় এক বস্তু নয়।
সঞ্চয়ের পথে যাদের প্রশান্ত দৃষ্টি,
লক্ষ্মীর কল্যাণ-আশীষ তাদেরই শিরে।

দি মোটো পাল্টে
হাট ওবেহ কাং জি %
কলিকাতা।



বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার নাম এবং উহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম

স্বীকৃতিদায়ক ও প্রচলিত

“বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার নাম এবং উহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম”—শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় আঠার শ্রেণীর। যে আঠার শ্রেণীর কথা এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়, সেই আঠার শ্রেণীর কথা আমরা গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি।

আমাদিগের ঐ আঠার শ্রেণীর কথা প্রধানতঃ পাঁচটা বিভাগে বিভক্ত, যথা :

- (১) বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের মূল সমস্তা-নির্ধারণ-সংক্রান্ত কথা ;
- (২) সমস্তা-সমাধানের গুরুত্ব ও হুরুত্ব-সংক্রান্ত কথা ;
- (৩) সমস্তা-সমাধানের সঙ্কেত-নির্ধারণ-সংক্রান্ত কথা ;
- (৪) সমস্তা-সমাধানের সঙ্কেত কাণ্ডে পরিণত করিবার সংগঠন ও পরিকল্পনা-নির্ধারণের হুরুত্ব-সংক্রান্ত কথা ;
- (৫) সমস্তা-সমাধানের জ্ঞান প্রয়োজনীয় বর্জন-সংক্রান্ত কথা।

আমাদিগের আঠার শ্রেণীর বক্তব্য বিষয়ের পাঁচটা বিভাগেব এক একটি বিভাগের বক্তব্যেব বিবরণ ও যুক্তি আমরা অতঃপর ক্রমে বিবৃত করিব।

(১)

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের মূল সমস্তা-নির্ধারণ-সংক্রান্ত কথার বিবরণ ও যুক্তি

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের মূল সমস্তা-নির্ধারণ-সংক্রান্ত কথার বিবরণ ও যুক্তি প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর আলোচনায় বিভক্ত করা হইবে, যথা :

- (১) মানবসমাজের সমস্তাসমূহের মূল সমস্তার নাম ;
- (২) অভাব-সমস্তা ও বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্তার প্রাধান্তের যুক্তি ;
- (৩) মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবিভাগ ;
- (৪) বর্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থা সঙ্কে নিঃসন্দেহভাবে যুক্তি ;
- (৫) মনুষ্যসমাজের অভাব-সমস্তার ও বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্তার সর্বতোভাবে সমাধানের সম্ভবযোগ্যতা সঙ্কে যুক্তি।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তা অসংখ্য। ঐ অসংখ্য সমস্তাসমূহের মূল কারণ “অভাব-সমস্তা”। অভাব-সমস্তার সমাধান হইলে বর্তমান মনুষ্যসমাজের অগ্রগতি প্রত্যেক সমস্তার সমাধান স্বতঃসিদ্ধ হয়। উহা হয় বটে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে অভাব-সমস্তার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং অভাব-সমস্তার সমাধান না হইলে বর্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এই কারণে অভাব-

সমস্তা যেরূপ বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের একটি মূল সমস্তা, সেইরূপ বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্তাও বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহেব একটি মূল সমস্তা।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন সমস্তাসমূহের মধ্যে অভাব-সমস্তা ও বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্তাকে মূল সমস্তা বলিয়া ধরিতে হয় কেন তাহার যুক্তি দেখান “অভাব-সমস্তা ও বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্তার প্রাধান্তের যুক্তি”—শীর্ষক আলোচনার অভিপ্রায়।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজ তাহার অভাবের অবস্থার শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের অভাবেব অবস্থার শেষ সীমানার নাম মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থা। মনুষ্যসমাজ তাহার অভাবের অবস্থার শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিচারানুসারে সর্বোপরি অভাব-সমস্তার সমাধান হওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বর্তমান মনুষ্যসমাজের কর্ণধার যে শাসক-সম্প্রদায়, তাহার মনুষ্যসমাজে যে উল্লেখযোগ্যভাবে অভাব-সমস্তা বিদ্যমান আছে—তাড়াই স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন না। প্রত্যেক দেশে প্রতিবৎসর যে যে বাৎসরিক শাসন-বিবরণী প্রকাশিত হয়, ঐ সমস্ত শাসন-বিবরণী পাঠ করিলে প্রত্যেক দেশের শাসকসম্প্রদায়ের মতবাদানুসারে প্রত্যেক দেশেই ঐশ্বর্য্য অগ্রগতি লাভ করিতেছে—ইহা মনে করিতে হয়। এই কারণে মনুষ্যসমাজের কোথাও যে কোনরূপ ঐশ্বর্য্য অগ্রগতিলাভ করিতেছে না—পরন্তু মনুষ্যসমাজের সর্বত্রই যে দারিদ্র্যেব প্রাধান্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয়।

“মনুষ্যসমাজেব বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবিভাগ” বিষয়ে এবং “বর্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থা সঙ্কে নিঃসন্দেহতার যুক্তি” বিষয়ে আলোচনা করিবার অভিপ্রায়—বর্তমান মনুষ্যসমাজে যে দারিদ্র্যাবস্থা প্রাধান্ত হইয়াছে এবং কোন শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য প্রকৃত ভাবে অগ্রগতি লাভ করিতেছে না—তাহা দেখান।

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের সমাধান করিতে হইলে মানুষের অভাব-সমস্তার ও যুদ্ধ-সমস্তার সমাধান করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু বর্তমান মনুষ্যসমাজের নীতিবিদগণের মতবাদানুসারে মানুষের অভাব-সমস্তার ও যুদ্ধ-সমস্তার সর্বতোভাবে সমাধান করা কখনও সম্ভব-যোগ্য হয় না। এই কারণে—মানুষের অভাব-সমস্তা ও যুদ্ধ-সমস্তার সর্বতোভাবে সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যাত্তরিত ও সম্ভবযোগ্য, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হয়।

“মনুষ্যসমাজের অভাব-সমস্তা ও যুদ্ধসমস্তার সর্বতোভাবে সমাধানের সম্ভবযোগ্যতা সঙ্কে যুক্তি” বিষয়ে আলোচনার অভিপ্রায়—মানুষের অভাব-সমস্তা ও যুদ্ধ-সমস্তা সর্বতোভাবে

সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যান্তর্গত ও সম্ভবযোগ্য—তাহা দেখান।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের মূল সমস্যার নাম

আমাদিগের মতে সমগ্র মানবসমাজের বর্তমান সমস্তাসমূহের মূল সমস্যা দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তির সমস্যা এবং
- (২) সমগ্র মানবসমাজব্যাপী দারুণ অভাব-সমস্যা।

আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র মানবসমাজের বর্তমান সমস্যা অসংখ্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র মানবসমাজের বর্তমান সমস্যা অসংখ্য, তথাপি আমাদিগের বিচারানুসারে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে অগ্ৰাগ্র সমস্তার প্রত্যেকটির সমাধান স্বতঃই অবশ্যজ্ঞাবী হয়। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে অগ্ৰাগ্র সমস্তার প্রত্যেকটির সমাধান স্বতঃই অবশ্যজ্ঞাবী হয় বলিয়া আমরা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্তাকে বর্তমান মানবসমাজের একমাত্র সমস্যা বলিয়া মনে করি।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে যে অগ্ৰাগ্র প্রত্যেক শ্রেণীর সমস্তার সমাধান হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয় তাহা দেখাইতে হইলে “বর্তমান যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্যা” ও “অভাব-সমস্যা”—এই দুইটি কথায় আমরা কি কি বুঝি তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয়।

বর্তমান যুদ্ধ নিবৃত্তি-সমস্যা

সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্তমান যুদ্ধের শান্তি স্থাপন করিবার কার্যে যে সমস্ত শক্ত প্রস্তু আছে সেই সমস্ত শক্ত প্রস্তুকে আমরা যুদ্ধ-সমস্যা বলিয়া অভিহিত করি।

অভাব-সমস্যা কথাটির অর্থ

সমগ্র মানবসমাজব্যাপী বর্তমান অভাবসমূহ দূর করিবার কার্যে যে সমস্ত শক্ত প্রস্তু আছে সেই সমস্ত শক্ত প্রস্তুকে আমরা অভাব-সমস্যা বলিয়া অভিহিত করি।

বর্তমান মানবসমাজের সমস্তাসমূহের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ নিবৃত্তি-সমস্যা ও অভাব-সমস্তার প্রাধান্যের যুক্তি

বর্তমান মনুষ্যসমাজে যত শ্রেণীর সমস্যা আছে সেই সমস্ত সমস্তার মধ্যে, আমাদিগের বিচারানুসারে, প্রধান সমস্যা—“বর্তমান যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্যা” ও “অভাব-সমস্যা”।

আমাদিগের বিচারানুসারে মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের কোনটির অভাবের উদ্ভব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ-কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে ঈর্ষ-কলহের কার্য চলিতে আরম্ভ করে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ-কলহের কার্য চলিতে থাকিলে মানুষের অভাব ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি লাভ করে। মানুষের অভাবসমূহের

ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারির ও যুদ্ধের কার্য চলিতে আরম্ভ করে।

মানুষের অভাবসমূহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি যত অধিক হয় মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি তত অধিক হয়।

মানুষের অভাবসমূহের উদ্ভব না হইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি না ঘটিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে না; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইলে মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত হইতে পারে না। মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা না হইলে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

উপরোক্ত যুক্তিবাদ যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ঐ যুক্তিবাদ কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত যুক্তিবাদানুসারে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধের ব্যাপকতার ও বৃদ্ধির প্রধান কারণ মনুষ্যসমাজের মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা; মনুষ্যসমাজের মারামারির ও যুদ্ধের সূচনার প্রধান কারণ—মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির প্রধান কারণ—মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি; মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ ও কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধির প্রধান কারণ—মানুষের বিবিধ শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব।

উপরোক্ত যুক্তিবাদ অনুসরণ করিলে আমাদিগের বিচারানুসারে তিন শ্রেণীর সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়, যথা :

- (১) মানুষের বিবিধ শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব মনুষ্যসমাজে মারামারি হওয়ার ও যুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ;
- (২) মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি যখন মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত অধিক হয় তখন মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বপ্রকার অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পন্থা স্থির করিতে না পারিলে এবং ঐ পন্থানুসারে কার্য করিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে—অন্ত কোন উপায়ে মনুষ্যসমাজের মারামারি ও যুদ্ধ দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও হয় না।
- (৩) মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি যখন মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত অধিক হয় তখন উহা দূর করিবার ও নিবারণ করিবার প্রধান পন্থা—মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বশ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা।

মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বশ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-সাধন করিতে পারিলে একদিকে যেমত মনুষ্যসমাজের মারামারি ও যুদ্ধ করা নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় সেইরূপ আবার মানুষের ও মনুষ্যসমাজের অজ্ঞাত সর্বশ্রেণীর সমস্তা দূর করা এবং নিবারণ করাও স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার কারণ মানুষের কোন শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের কোনরূপ অভাবের উদ্ভব হইলে, ঐ অভাব দূর করিবার কার্যে যে সমস্ত শক্তি প্রেরণের উদ্ভব হয় সেই সমস্ত প্রাণকে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের “সমস্তা” বলা হয়। মানুষের ও মনুষ্যসমাজের “সমস্তা” কাকে বলে—তাহা বুঝিতে পারিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বশ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে মানুষের অথবা মনুষ্যসমাজের কোন শ্রেণীর সমস্তার উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বশ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-সাধন করিতে পারিলে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের মারামারি, যুদ্ধ ও সর্ববিধ সমস্তা দূর করা ও নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বশ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-সাধন করা সহজ-সাধ্য নহে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় কিয়দূর অগ্রসর হইতে না পারিলে উহার পরিকল্পনা অথবা সংগঠন নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহার পরিকল্পনা ও সংগঠন নির্ধারণ করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে নানা রকমের শক্তি প্রেরণের সমুখীন হইতে হয়। এই হিসাবে উপরোক্ত পরিকল্পনা ও সংগঠন নির্ধারণ করিবার কার্যকে একশ্রেণীর “সমস্তা” বলিতে হয়। মানুষের সর্বশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের সর্বশ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে “অভাব-সমস্তার-সমাধান” করিবার কথা বলিতে হয়।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের অভাব-সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের মারামারি, যুদ্ধ ও সর্ববিধ সমস্তা দূর করা ও নিবারণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়। উহা স্বতঃসিদ্ধ হয় বলিয়া যখনই মানুষের অথবা মনুষ্যসমাজের কোন শ্রেণীর সমস্তার উদ্ভব হয় তখন ঐ সমস্তার সমাধান করিতে হইলে অভাব-সমস্তার সমাধান করিবার জগৎ প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই কারণে অভাব-সমস্তাকে মানুষের ও মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর অবস্থার সর্বশ্রেণীর সমস্তার প্রধান সমস্তা বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়।

অভাব-সমস্তা মানুষের ও মনুষ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর অবস্থার সর্বশ্রেণীর সমস্তার প্রধান সমস্তা বটে, এবং অভাব-সমস্তার সমাধান না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর সমস্তার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মারামারি ও যুদ্ধের ব্যাপকতা যখন সমগ্র ভূমণ্ডলে আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলময় হয় তখন এ যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্তার সমাধান করিতে না পারিলে অল্প কোন ক্রমে অভাব-সমস্তার সমাধান করা

সম্ভবযোগ্য হয় না। একদিকে অভাব-সমস্তার সমাধান করিতে না পারিলে যুদ্ধনিবৃত্তি-সমস্তার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং অল্প দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্তার সমাধান করিতে না পারিলে অভাব-সমস্তার সমাধান করা সম্ভব-যোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে, মারামারির ও যুদ্ধের ব্যাপকতা যখন সমগ্র ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলময় হয়, তখন মানুষের অথবা মনুষ্য-সমাজের সমস্তার সমাধান করিতে হইলে যুগপৎভাবে যুদ্ধ-নিবৃত্তি সমস্তার এবং অভাব-সমস্তার সমাধান করা অপরিহার্য-ভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

বর্তমান মহাযুদ্ধ সমগ্র ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলময় ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজের প্রধান সমস্তা—“বর্তমান যুদ্ধ-নিবৃত্তি-সমস্তা” ও “অভাব-সমস্তা”। যুগপৎভাবে ঐ দুইটা সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে বর্তমান মনুষ্যসমাজের অজ্ঞাত প্রত্যেক সমস্তার সমাধান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে ও হইবে।

বর্তমান মনুষ্যসমাজে অভাবের বিদ্যমানতা বিষয়ে মতবাদ

বর্তমান মনুষ্য-সমাজের অবস্থা সর্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও বর্তমান মনুষ্য-সমাজের সর্ববিধ সমস্তার সমাধান করিতে হইলে যুদ্ধ-সমস্তার ও অভাব-সমস্তার যুগপৎ সমাধান করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়, তথাপি ঐ উভয়বিধ সমস্তাকে বর্তমান সমস্তাসমূহের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ধরা চলে না। বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তাসমূহের একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ—মানুষের ও মনুষ্যসমাজের অভাবগততা। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মানুষের বিবিধ শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব না থাকিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি হইতে পারে না; মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি না ঘটিলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে না; মানুষের পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার ও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইলে মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা হইতে পারে না। ঐ হিসাবে মনুষ্যসমাজে মারামারির ও যুদ্ধের সূচনা দেখিলেই ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে মানুষের বিবিধশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাবের উদ্ভব হইয়াছে।

মনুষ্যসমাজে মারামারি ও যুদ্ধ বিদ্যমান থাকিলে মানুষের বিবিধশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাব বিদ্যমান আছে ইহা বিচার-ানুসারে বুঝিতে হয় বটে এবং ঐ হিসাবে বর্তমান মনুষ্যসমাজে যে বিবিধশ্রেণীর অভাব বিদ্যমান আছে তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না বটে কিন্তু বর্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশেই এমন একদল মানুষ আছেন যাহারা মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থের অভাবে বিদ্যমানতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহাদের অনেকেই প্রত্যেক দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক দেশের বাৎসরিক শাসন বিবরণে ইহারা মানুষের ঐশ্ব্যের উন্নতির কথা শাসিতগণকে শুনাইয়া থাকেন।

ঐ সমস্ত বাৎসরিক শাসন-বিবরণ লক্ষ্য করিলে ইহা মনে করিতে হয় যে কোন দেশেই মানুষের অভীষ্ট পদার্থের অভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদ্যমান নাই; পরন্তু প্রত্যেক দেশেই ঐশ্বর্য্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদ্যমান আছে।

আমাদিগের বিচারানুসারে শাসকবর্গের উপরোক্ত বাৎসরিক শাসন-বিবরণ জ্ঞান-গত দারিদ্র্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মনুষ্যসমাজে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ঐ তিন শ্রেণীর অবস্থার নাম—(১) মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থা, (২) মানুষের অভাবের অবস্থা এবং (৩) মানুষের দারিদ্র্যের অবস্থা। আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজ মানুষের চরম দারিদ্র্যের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেক শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে 'চরম দারিদ্র্য উপনীত হইয়াছেন।

আমাদিগের উপরোক্ত বিচার যে যুক্তি-যুক্ত তাহা দেখাইতে হইলে প্রথমতঃ মানুষের অভাবের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ, মানুষের স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা সম্বন্ধে; তৃতীয়তঃ, মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের ও শারীরিক স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা সম্বন্ধে; চতুর্থতঃ, মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের ও ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা সম্বন্ধে; পঞ্চমতঃ, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ও মানসিক স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা সম্বন্ধে; ষষ্ঠতঃ, মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্যের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা সম্বন্ধে, সপ্তমতঃ, মানুষের স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যভাবে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে; অষ্টমতঃ, মানুষের ধনের ও ধনাভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; নবমতঃ, মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠার অভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; দশমতঃ, মানুষের তৃপ্তির ও তৃপ্তির অভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; একাদশতঃ, মানুষের সম্মানের ও সম্মানভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; দ্বাদশতঃ, মানুষের জ্ঞানের ও জ্ঞানভাবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে; ত্রয়োদশতঃ, মানুষের অভাব যে চয় শ্রেণীর অতিরিক্ত হইতে পারে না তাহার যুক্তি সম্বন্ধে, চতুর্দশতঃ, মানুষের অভাবাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে; পদদশতঃ, মনুষ্যসমাজের ও মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে; এবং ষোড়শতঃ, মনুষ্যসমাজের ও মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে—আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

মনুষ্যসমাজের ও মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বর্তমান মনুষ্যসমাজ এবং প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দ্বিগ্ন হওয়া যায়।

আমরা অন্তঃপরে ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত যোলটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

মানুষের অভাবের শ্রেণী-বিভাগ

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের অভাব অসংখ্য শ্রেণীর। কিন্তু ঐ অসংখ্য শ্রেণীর অভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের অভাব অসংখ্য শ্রেণীর বটে, কিন্তু নাস্তবিক পক্ষে উহা অসংখ্য শ্রেণীর নহে। মানুষের অভাব কত

শ্রেণীর হইতে পারে ও ইহা থাকে তাহা বিচার করিতে বসিলে দেখা যায় যে, মানুষ যাহা যাহা পাইবার অভিলাষ করেন তাহার কোনটি না পাইলে মানুষ অভাব অনুভব করেন এবং সেই হিসাবে মানুষের অভাব সর্বসমেত ছয় শ্রেণীর হইতে পারে ও ইহা থাকে। কোনও মানুষের অভাব ছয় শ্রেণীর অধিক হইতে পারে না। মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাবের নাম—

- (১) স্বাস্থ্যভাব;
- (২) ধনাভাব;
- (৩) প্রতিষ্ঠাভাব;
- (৪) তৃপ্তির অভাব;
- (৫) সম্মানভাব;
- (৬) জ্ঞানভাব।

কোনও মানুষের অভাব যে ছয় শ্রেণীর অধিক হইতে পারে না তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দ্বিগ্ন হইতে হইলে মানুষের স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞান এই ছয়টি কথাই কোনটাতে কি ব্যাখ্যা তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা

মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থার নাম মানুষের "স্বাস্থ্য।"

মানুষের শরীরের মনুষ্যোচিত অবস্থার অথবা ইন্দ্রিয়ের মনুষ্যোচিত অবস্থার অথবা মনের মনুষ্যোচিত অবস্থার অথবা বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাব হইলে মানুষের স্বাস্থ্যের অভাব হয়। শরীরের হইউক, অথবা ইন্দ্রিয়ের হইউক, অথবা মনের হইউক, অথবা বুদ্ধির হইউক—এই চারি শ্রেণীর যে কোন একটি শ্রেণীর মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাবের নাম মানুষের "স্বাস্থ্যভাব।"

মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থা এবং মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাব কাহাকে বলে তাহা আমরা ইহা পূর্বে বিবৃত করিব।

মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক

স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা

মানুষের মস্তিষ্ক, মুখ, স্বক, কণ্ঠ, হস্ত, বুক, পেট, পদ প্রভৃতি শরীরের অঙ্গসমূহ যখন সুব্যবস্থিতভাবে (well proportionate) বিদ্যমান থাকে তখন মানুষের শরীরের মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য) বজায় আছে ইহা বুঝিতে হয়। যখন মানুষের মুখ, তাহার মস্তিষ্ক অথবা স্বক অথবা কণ্ঠ অথবা হস্ত অথবা বুক অথবা পেট প্রভৃতির তুলনায় যেমানান হয় তখন মানুষের শরীরের মনুষ্যোচিত অবস্থা বজায় নাই—ইহা বুঝিতে হয়। মানুষের শরীরের কোন একটি অথবা একাধিক অঙ্গ অঙ্গ কোন একটি অথবা একাধিক অঙ্গের তুলনায় যেমানান হইলে মানুষের শরীরের "স্বাস্থ্যভাব" ঘটিয়াছে—ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবে সংজ্ঞা

মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ ও লিঙ্গ প্রভৃতি

ইন্দ্রিয় যখন সমান ভাবে কার্যক্ষম থাকে এবং যখন একটা অথবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতা জগজ্জা ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার তুলনায় অসমান হয় না তখন মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য) বজায় আছে ইহা বৃদ্ধিতে হয়। মানুষের সর্ববিধ ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতা সমান না হইলে কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের কার্যব্যস্ততা বেশী হওয়া এবং কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের কার্যব্যস্ততা অল্প হওয়া অনিবার্য হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্যব্যস্ততার বকম বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য বটে কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্যব্যস্ততার পরিমাণ বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য নহে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্যব্যস্ততার পরিমাণ বিভিন্ন হইলে মানুষের মনুষ্য-স্বভাববিকল্প ও পশুস্বভাব-সম্মত উচ্ছ্রাণতা অনিবার্য হয়। মানুষের মনুষ্যস্বভাববিকল্প ও পশুস্বভাবসম্মত উচ্ছ্রাণতাব উদ্ভব হইলে তাঁহা ইন্দ্রিয়-সমূহের মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্য) বজায় নাই ইহা বৃদ্ধিতে হয়।

মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবের সংজ্ঞা

মনেব স্থিরতা থাকিলে উহা মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য) বজায় আছে—ইহা বৃদ্ধিতে হয়। মনে অস্থিরতা থাকিলে উহা মনুষ্যোচিত অবস্থা বজায় নাই ইহা বৃদ্ধিতে হয়।

মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবের সংজ্ঞা

বুদ্ধির বিচাশক্তি থাকিলে উহা মনুষ্যোচিত অবস্থা (অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্য) বজায় আছে—ইহা বৃদ্ধিতে হয়। বিচাশক্তি স্থলে মতবাদপ্রবণতা অথবা সন্দেহপ্রবণতা বিজ্ঞান থাকিলে বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থা বজায় নাই—ইহা বৃদ্ধিতে হয়।

মানুষের স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যভাবের শ্রেণীবিভাগ

“শরীরের স্বাস্থ্য”, “ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য”, “মনেব স্বাস্থ্য” এবং “বুদ্ধির স্বাস্থ্য” এই চারিটা কথার কোনটিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের স্বাস্থ্য চারিশ্রেণী, যথা :

- (১) শরীর-গত স্বাস্থ্য ;
- (২) ইন্দ্রিয়-গত স্বাস্থ্য ,
- (৩) মন-গত স্বাস্থ্য , এবং
- (৪) বুদ্ধি-গত স্বাস্থ্য ।

মানুষের স্বাস্থ্য যেকোন চারিশ্রেণীর সেইরূপ মানুষের স্বাস্থ্য-ভাবও চারিশ্রেণীর, যথা :

- (১) শরীর-গত স্বাস্থ্যভাব .
- (২) ইন্দ্রিয়-গত স্বাস্থ্যভাব ,
- (৩) মন-গত স্বাস্থ্যভাব ; এবং
- (৪) বুদ্ধি-গত স্বাস্থ্যভাব ।

মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাবের সংক্ষেপে যাচা যাচা জানিবার প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, মানুষের চারিশ্রেণীর স্বাস্থ্যের প্রত্যেক শ্রেণীর স্বাস্থ্য মনুষ্যোচিত অবস্থায় বজায় থাকিলে মানুষের

স্বাস্থ্য বজায় থাকে। কোনও একশ্রেণীর স্বাস্থ্যের মনুষ্যোচিত অবস্থার অভাব হইলে মানুষের চারিশ্রেণীর স্বাস্থ্যের অভাব হয়।

মানুষের ধন ও ধনাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের প্রাণ বজায় রাখিবার জন্ত আহার বিহারাদির যে সমস্ত কার্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত কার্যের জন্ত যেসমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই-সমস্ত সামগ্রীকে “ধন” বলা হয়। ঐ সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন অমূল্য প্রাচুর্যের নাম “ধন-প্রাচুর্য”। ঐ সমস্ত সামগ্রীর কোনও একটার অভাব হইলে মানুষের ধনাভাব হইয়া থাকে।

মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাভাবের সংজ্ঞা

মানুষের প্রতিষ্ঠা বলিতে বুঝায়—মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকা-জনের বৃত্তি, ধনগত অবস্থা, মানুষের কর্মগত অবস্থা, মানুষের জ্ঞানগত অবস্থা এবং মানুষের পবন্যের মধ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে স্থায়িত্ব। আজ এক রকমের স্বাস্থ্য, কাল আর একরকমের স্বাস্থ্য ; আজ একস্থানে বাস, কাল আর একস্থানে বাস ; জীবিকা-জনের জগা আজ একরকমের বৃত্তি, কাল আর একরকমের বৃত্তি ; আজ ধনী, কাল দরিদ্র , আজ অতিবিক্ত কর্মে বাস্ত, কাল বেকার অথবা অলস . আজ বিদ্যাচর্চায় নিরত, কাল বিদ্যাচর্চায় অক্ষমতা ; আজ বদ্ধ, কাল শত্রু ; এতাদৃশ অস্থায়ী অবস্থার নাম “প্রতিষ্ঠাগত অভাব”।

মানুষের তৃপ্তি ও তৃপ্তির অভাবের সংজ্ঞা

যুগপৎভাবে শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আরাম, মনের স্থিরতা ও শান্তি, বুদ্ধির ধীর্ঘতা ও বিচাশক্তি রক্ষিত হইলে মনের যে অবস্থার উদ্ভব হয়—সেই অবস্থার নাম “তৃপ্তি”। মানুষের যখন জ্ঞানাভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হয় মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে মানুষ তাঁহা শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির যে কোন একটার আরাম হইলে তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই চারিটা অংশের যুগপৎভাবে আনাম না হইয়া কোন একটা অংশের আরাম হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থা তৃপ্তির অবস্থা নহে ; উহা “উত্তেজনার অবস্থা”। ঐজাতীয় তৃপ্তির সহিত বিবাদ অসঙ্গী ভাবে জড়িত। যাহা প্রকৃত তৃপ্তি তাহার সঙ্গে বিবাদ থাকিতে পারে না ও থাকে না। মানুষের উত্তেজনার অবস্থা তাহার তৃপ্তির অভাবের অবস্থা।

মানুষের সম্মান ও সম্মানভাবের সংজ্ঞা

মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাবের স্থলে ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য লাভ করা এবং নিয়মিত ভাবে ঐ ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্যের বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলে মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হন, সেই অবস্থার নাম “মানুষের সম্মানেব অবস্থা”। মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাব দূর করা সম্ভব হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য লাভ করা সম্ভব হয়। প্রচলিত ভাষায় এক জনের সম্মতি আর একজনের তুলনা-মূলক উৎকর্ষকে অথবা উচ্চপদকে সম্মান বলা হয়। আমরা

যাহাকে “সম্মান” বলিয়া থাকি, সেই “সম্মান” প্রচলিত ভাষার ‘সম্মানের’ সহিত সর্বতোভাবে একার্থক নহে। আমাদের লেখায় ‘সম্মান’ শব্দে একজন মানুষের অবস্থার সহিত আব একজন মানুষের অবস্থার কোন তুলনার কথা থাকে না। ইহাতে-থাকে মানুষের স্ব স্ব জীবনের বিভিন্ন দিনের অবস্থার তুলনা। মানুষ যখন স্ব স্ব জীবনে ক্রমিক উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং পূর্ববর্তী জীবনের অবস্থার তুলনায় পরবর্তী জীবনের অবস্থা যখন সর্বশ্রেণীর প্রাচুর্য্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন মানুষ সম্মানের অবস্থায় উপনীত হয়। কোন মানুষ যখন স্বীয় জীবনে ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য্য বিষয়ে ক্রমিক উন্নতি লাভ করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহার সম্মানাভাব হইয়া থাকে।

মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানাভাবের সংজ্ঞা

মানুষ তাঁহার মনুষ্যোচিত শরীর, মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয় মনুষ্যোচিত মন ও মনুষ্যোচিত বুদ্ধির বিভিন্ন কাষ্যেব দ্বারা তাঁহার মনে বাহ্য বাহ্য অজ্ঞান করিয়া থাকেন তাহার প্রত্যেকটাকে এক এক বিষয়ক এক একটা ‘জ্ঞান’ বলা হয়। মানুষের স্বাস্থ্য-গত, ধন-গত, প্রতিষ্ঠা-গত, তৃপ্তি-গত ও সম্মান-গত প্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে এবং ঐ ঐ বিষয়ক অভাবের নিবারণ সাধন করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর যে যে বিজ্ঞা অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই শ্রেণীর সেই সেই বিজ্ঞা সর্বতোভাবে অজ্ঞান করিতে পারিলে জ্ঞানগত প্রাচুর্য্য সাধন করা হয়। উপরোক্ত কোন শ্রেণীর বিজ্ঞার কোনরূপ অভাব হইলে মানুষের জ্ঞানাভাব আছে, ইহা বুঝিতে হয়। কোন মানুষের মনুষ্যোচিত শরীরেব অথবা মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয়ের অথবা মনুষ্যোচিত মনের অথবা মনুষ্যোচিত বুদ্ধির অভাব হইলে তাহার জ্ঞানাভাব হওয়া অনিবাধ্য হয়।

মানুষের অভাব যে ছয় শ্রেণীর অতিরিক্ত হইতে পারে না—তাহার যুক্তি

মানুষের স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, তৃপ্তি এবং জ্ঞান এই ছয়টা কথার কোনটীতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব ব্যক্তিগত জীবনে বাহ্য বাহ্য পাইবার অভিলাষ করেন—তাহার প্রত্যেকটা উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থেব কোন না কোন এক শ্রেণীর পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের কোন অভিলাষ উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর পদার্থেব বহির্ভূত হইতে পারে না। কোন মানুষের কোন অভিলাষ উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর পদার্থের বহির্ভূত হইতে পারে না বলিয়া কোন মানুষের অভাব উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর বহির্ভূত হইতে পারে না ও হয় না। আপাত দৃষ্টিতে মানুষের অভাবের সংখ্যা যতই হউক না কেন, কোন মানুষের অভাব উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর বহির্ভূত হইতে পারে না বলিয়া মানুষের অভাব ছয় শ্রেণীর ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অভাবাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থার পার্থক্য

মানুষের অভীষ্ট পদার্থের শ্রেণীবিভাগানুসারে মানুষের অভাব যেরূপ ছয় শ্রেণীর হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অভাবের মাত্রাব (অর্থ্য তীব্রতার) শ্রেণীবিভাগানুসারে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর অভাব প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

(১) অভাব ও (২) দারিদ্র্য। মানুষের যেরূপ স্বাস্থ্যভাব ঘটতে পারে সেইরূপ আবার স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য ঘটতে পারে। ধনাভাব যেরূপ ঘটতে পারে সেইরূপ আবার ধন-গত দারিদ্র্যও ঘটতে পারে। প্রতিষ্ঠাভাব যেরূপ ঘটতে পারে সেইরূপ আবার প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্যও ঘটতে পারে। সম্মানাভাব যেরূপ ঘটতে পারে, সেইরূপ আবার সম্মান-গত দারিদ্র্যও ঘটতে পারে। তৃপ্তির অভাব যেরূপ ঘটতে পারে সেইরূপ আবার তৃপ্তিগত দারিদ্র্যও ঘটতে পারে। জ্ঞানাভাব যেরূপ ঘটতে পারে সেইরূপ আবার জ্ঞানগত দারিদ্র্যও ঘটতে পারে।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তা কি কি তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে যেরূপ “অভাবসমস্তা” কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়, এবং অভাবসমস্তা কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে যেরূপ মানুষের অভাব কয়শ্রেণীর হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার মানুষের অভাবের অবস্থা ও দারিদ্র্যের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি কি তাহাও স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানবসমাজের আধুনিক প্রত্যেক প্রচলিত ভাষায় “অভাব” ও “দারিদ্র্য” এই দুইটা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের ভাষা সশব্দে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ দুইটা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না, এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া কোনক্রমে সম্ভব নহে।

মানুষের ভাষাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান জানিতে হইলে প্রথমতঃ, মানুষের শব্দশক্তি, দ্বিতীয়তঃ, মানুষের শব্দপ্রবৃত্তি, তৃতীয়তঃ, মানুষের শব্দমিশ্রণশক্তি ও প্রবৃত্তি, চতুর্থতঃ, মানুষের কথার পদ-গঠনশক্তি ও প্রবৃত্তি, পঞ্চমতঃ, মানুষের বাক্যগঠনশক্তি ও প্রবৃত্তি স্বতঃই কোন্ কোন্ নিয়মে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যধারায় উদ্ভূত হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা নির্ধারণ করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। আধুনিক মানবসমাজে যাহা ভাষা-বিজ্ঞান বলিয়া প্রচলিত আছে, সেই তথাকথিত ভাষা-বিজ্ঞানে উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় কথার কোন শ্রেণীর কথা পাওয়া যায় না। মানুষ তাঁহার বাক্যে যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটি মূলতঃ মানুষের স্বাভাবিক শক্তি বশতঃ স্বতঃই প্রকাশিত হয় এবং সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটাব এক একটা স্বাভাবিক অর্থ মৌলিকভাবে বিদ্যমান থাকে। ভাষা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধিত না হইলে মৌলিকভাবে মানুষের কথাসমূহের কোনটির কি স্বাভাবিক (inherent) অর্থ তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। আধুনিক মানবসমাজে উপরোক্ত শ্রেণীর ভাষা-বিজ্ঞানের অভাব-বশতঃ মানুষের কথার অর্থনির্ধারণ যথেষ্টাচাষ করা হয় এবং ঐ কারণ বশতঃ, “অভাব” ও “দারিদ্র্য” এই দুইটা শব্দের অর্থের পার্থক্য যে কি কি তাহা আধুনিক মানবসমাজের পক্ষে সঠিকভাবে স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

ভাষাবিজ্ঞানানুসারে মানুষের অভাবের অবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে বাহ্য বাহ্য পাওয়া মানুষের অভীষ্ট ও প্রয়োজনীয় তাহার কোনটা পাওয়া কষ্টকর অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের

অভাবের উদ্ভব হয়। ভাষাবিজ্ঞানমুসারে মানুষের দারিদ্র্যাবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হইলে কোন কোন পদার্থ মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তাহা মানুষ নির্ধারণ করিতে অক্ষম হন। যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করিলে মানুষের মনুষ্যোচিত অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং পাশবিক অবস্থার উদ্ভব হয়, সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যের অবস্থায় স্বাস্থ্যজনক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেসমস্ত পদার্থ মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত পদার্থ মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যের অবস্থায় ব্যবহার করেন বলিয়া মানুষের দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি বিপরীত হয়, মন অস্থির হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ অক্ষম হয় এবং শরীর অকালে জরাগ্রস্ত হয়। মানুষ তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থায় অনিষ্টজনক পদার্থ-সমূহ ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীর অকালে নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু তথাপি যে-সমস্ত পদার্থ মানুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থ যে মানুষের অনিষ্ট-জনক তাহা মানুষ বুঝিতে পারেন না। মানুষের দারিদ্র্যের অবস্থায় যে সমস্ত বিপরীত পদার্থ তাঁহার অভিলাষের বিষয় হয় সেই সমস্ত বিপরীত পদার্থ পৃথক পাওয়া কষ্টসাধ্য এবং সময় সময় অসাধ্য হয়।

মানুষের অভাবের অবস্থায় স্বাস্থ্যের অপহারক কোন পদার্থ মানুষের অভিলাষের বিষয় হয় না।

যাহা যাহা মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান প্রয়োজনীয় তাহা কোনটার অভাবের নাম—“মানুষের অভাবের অবস্থা”।

যে সমস্ত পদার্থ মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত পদার্থের নির্ধারণে অক্ষমতাবশতঃ যাহা যাহা মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত পদার্থকে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার পদার্থ বলিয়া স্থির করা এবং সেই সমস্ত পদার্থের কোনটির অভাব হওয়ায় নাম মানুষের “দারিদ্র্যাবস্থা”।

মানুষের অভাবের অবস্থা অথবা দারিদ্র্যের অবস্থা যখন না থাকে তখন তাঁহার প্রাচুর্যের অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

মানুষের প্রাচুর্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য

যাহা যাহা মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান প্রয়োজনীয় তাহা প্রত্যেকটি প্রচুর পরিমাণে ও অনায়াসে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইলে মানুষের প্রাচুর্যের অবস্থার উদ্ভব হয়।

মনুষ্যসমাজে প্রাচুর্যাবস্থার উদ্ভব হইলে অধিকাংশ মানুষের ব্যর্থ অথবা অকাল বান্ধব ঘটতে পারে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষ সর্বতোভাবে স্বাস্থ্য, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ মানুষেরই বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত হওয়া অথবা অহঙ্কারী হওয়া অথবা সংস্কারপ্রবণ হওয়া অথবা মতবাদ-প্রবণ হওয়া অথবা বিচারবিশ্লেষণহীন হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তেজনা-প্রবণ অথবা সমতার অভাবযুক্ত হইতে পারে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্লাস্তিহীন সমানভাবে কার্যক্ষমতায়

হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই মন অস্থিরতায়ুক্ত অথবা স্থিরতার অভাবযুক্ত হইতে পারে না; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মন স্থিরতায়ুক্ত এবং সর্ববিধ বিষয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত ও একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি কোন রূপে বিরক্তিকর হওয়া অথবা ঔজ্জ্বল্যের অভাবযুক্ত হওয়া অথবা বিশৃঙ্খল অঙ্গসমাবেশযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি প্রীতিকর, ঔজ্জ্বল্যযুক্ত, এবং সুব্যবস্থিত অঙ্গ-সমাবেশযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই নির্ধন হওয়া অথবা ধনাভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই ধন-প্রাচুর্যযুক্ত ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে অপ্ৰতিষ্ঠিত হওয়া অথবা প্রতিষ্ঠার অভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টিযুক্ত হওয়া অথবা সন্তুষ্টির অভাবযুক্ত হওয়া অথবা অতৃপ্তিযুক্ত হওয়া অথবা তৃপ্তির অভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে সর্বতোভাবে তৃপ্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে নিজে অসম্মানযুক্ত অথবা সম্মানের অভাবযুক্ত মনে করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই নিজেকে প্রত্যেক বিষয়ে সর্বতোভাবে সম্মানযুক্ত মনে করিয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে কু-বিশ্রাম হওয়া অথবা বিচার কোনরূপ অভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিষয়ে সর্বতোভাবে বিধান হইয়া থাকেন।

মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য

মনুষ্যসমাজে দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হইলে অধিকাংশ মানুষেরই সর্বতোভাবে স্বাস্থ্য অথবা দীর্ঘ-যৌবন অথবা দীর্ঘজীবন উপভোগ করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই নানারূপ ব্যাধির যন্ত্রণায়, অকালবান্ধবের অক্ষমতায় এবং অকালমৃত্যুর শোকে জর্জরিত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু, অধিকাংশ মানুষই বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত, অহঙ্কারী, সংস্কার-প্রবণ, মতবাদ-প্রবণ, এবং বিচার-বিশ্লেষণহীন হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়সমূহের ক্লাস্তিহীন সমানভাবে কার্যক্ষমতায়ুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই উত্তেজনা-প্রবণ ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই মনের স্থিরতায়ুক্ত হওয়া অথবা একনিষ্ঠতায়ুক্ত হওয়া অথবা দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মন অস্থিরতায়ুক্ত ও স্থিরতার অভাবযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতির প্রীতিকরতা, ঔজ্জ্বল্যযুক্ততা এবং সুব্যবস্থা অঙ্গসমাবেশযুক্ততা অসম্ভব হইয়া থাকে; পরন্তু অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি হয় ভীতিকর নতুবা বিরক্তিকর নতুবা ঔজ্জ্বল্যের অভাবযুক্ত নতুবা বিশৃঙ্খল অঙ্গসমাবেশযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অধিকাংশ মানুষেরই ধনপ্রাচুর্যযুক্ত হওয়া অথবা ঐশ্বর্যশালী হওয়া অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই যে সমস্ত সামগ্রী

মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে সেই সমস্ত সামগ্রীকে মানুষের শরীর প্রভৃতির স্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং নির্ধন অথবা ধনাভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন, অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠ অথবা প্রতিষ্ঠার অভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে সর্বতোভাবে তৃপ্তিযুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়, পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে অসন্তুষ্টিযুক্ত অথবা সন্তুষ্টি অভাবযুক্ত অথবা অতৃপ্তিযুক্ত অথবা তৃপ্তি অভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই কোন বিষয়ে নিজেকে সম্মানযুক্ত মনে করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অসম্মানযুক্ত অথবা সম্মানের অভাবযুক্ত মনে করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তখন অধিকাংশ মানুষেরই প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের সর্বতোভাবে বিত্তা অর্জন করা অসম্ভব হয়; পরন্তু অধিকাংশ মানুষই যে যে কাষ্যপন্থা অবলম্বন করিলে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যভাবযুক্ত হওয়া অথবা অস্বাস্থ্যযুক্ত হওয়া অবশ্যস্বার্থী হয় সেই সেই কাষ্যপন্থার বিত্তাকে প্রকৃত বিত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং সেই সেই কাষ্যপন্থার বিত্তা অর্জন করিয়া থাকেন।

মনুষ্যসমাজে যখন সর্বতোভাবে দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হয় তখন মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির যে যে অবস্থা প্রকৃত বিচারমুসারে উহাদের প্রত্যেকটাব অস্বাস্থ্যের অথবা স্বাস্থ্যভাবে অবস্থা, সেই সেই অবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ উহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধন বিষয়ে যে যে অবস্থা প্রকৃত বিচারমুসারে মানুষের নির্ধনের অথবা ধনাভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ ঐশ্বৰ্য্যের অথবা ধন-প্রাচুর্য্যের অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মানুষের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যে যে অবস্থা প্রকৃত বিচারমুসারে মানুষের অপ্রতিষ্ঠার অথবা প্রতিষ্ঠার অভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ বিচিত্রতাময় ও গৌরবের অবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মানুষের তৃপ্তি বিষয়ে, যে যে সামগ্রী ও আচরণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের অতৃপ্তির অথবা তৃপ্তির অভাবের উদ্ভব করিয়া থাকে, সেই সেই সামগ্রী ও আচরণকে অধিকাংশ মানুষ তৃপ্তির সামগ্রী ও আচরণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানুষের সম্মান বিষয়ে, যে যে অবস্থা বা ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মানুষের অসম্মানের অথবা সম্মানভাবের অবস্থা, সেই সেই অবস্থা ও ব্যবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ সম্মানের অবস্থা ও ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানুষের বিত্তা বিষয়ে, যে যে বিত্তা মানুষের কুবিত্তা ও বিত্তাভাবের পরিচায়ক সেই সেই বিত্তাকে অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত বিত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মনুষ্যসমাজে যখন সর্বতোভাবে দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হয়—তখন অধিকাংশ মানুষের মনুষ্যোচিততাবের জীবন বজায় থাকা অসম্ভব হয়।

মানুষের বুদ্ধি যতদূর বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত না হইয়া অবিচারিতভাবে সংস্কার ও মতবাদসমূহকে শিরোধার্য্য

করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, মানুষের মন যতদূর একনিষ্ঠ ও ধীরতায়ুক্ত না হইয়া সর্বদা দোহুলায়মান ও চঞ্চল হয়, মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ যতদূর কার্য্যকারণের শৃঙ্খলামুসারে মানুষের অভাব-নিবারক কাষ্য করিবার অথবা পদার্থসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতায়ুক্ত না হইয়া অক্ষমতা অথবা ক্ষমতার অভাবযুক্ত হয়, এবং মানুষের শরীর যতদূর মনের তৃপ্তির উৎপাদক না হইয়া ভীতি-সঞ্চারক হয়—তাহা হইলে মানুষের অবয়বে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলেও যে মানুষের মনুষ্যোচিততাবের জীবন বিজ্ঞমান থাকে না তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়। যেসমস্ত কারণে মানুষকে পশু মনে না করিয়া মানুষ বলিয়া অভিহিত করা হয় সেই সমস্ত কাণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

- (১) মনুষ্যোচিত বুদ্ধি ;
- (২) মনুষ্যোচিত মন ;
- (৩) মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয় এবং
- (৪) মনুষ্যোচিত চেহারা।

মানুষের অবয়বে যে যে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও চেহারা বিজ্ঞমান থাকে তাহার কোনটি যতদূর কোন মানুষের কোনও কারণে মনুষ্যোচিত মনে করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয় এবং পশুর বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সহিত একভাবে বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে—এ মানুষকে যে মনুষ্যাবয়বযুক্ত পশু বলিতে হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

মনুষ্যসমাজে যখন সর্বতোভাবে দারিদ্র্যাবস্থার উদ্ভব হয়, তখন স্ব স্ব স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, সম্মান ও বিত্তা বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ বিপণীত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু উঁহারা যে ঐ ঐ বিষয়ে বিপণীত বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছেন তাহা অধিকাংশ মানুষ বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাকেন।

তখন, স্বাস্থ্য বিষয়ে, মানুষের শরীর পাশবিক বলের ব্যবহাবে শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হয়; ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কাষ্য করিতে ক্রান্তিযুক্ত ও অক্ষমতায়ুক্ত হয়, মন সর্বদা প্রত্যেক বিষয়ে দোহুলায়মানতা ও চঞ্চলায়ুক্ত হয়; বুদ্ধি সর্বদা প্রত্যেক বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তিহীন হইয়া কখনও বা অবিচারিত সংস্কারের বশীভূত হয়, আবার কখনও বা অবিচারিত মতবাদের বশীভূত হইয়া ভ্রমপূর্ণ বিচারশীলতায়ুক্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভাবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মনুষ্যোচিত অবস্থার বিরুদ্ধতা ও অভাব সত্ত্বেও মানুষ তাঁহার শরীরের পাশবিক বলের বিজ্ঞমানতা বশতঃ নিজেকে স্বাস্থ্যবান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানগত দারিদ্র্যবশতঃ চিকিৎসকগণ পথ্যস্ত মানুষের স্বাস্থ্যের এতাদৃশ অবস্থাকে তাঁহার স্বস্থ অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

তখন ধনবিষয়ে মানুষ “মুদ্রাকে” ধন বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন এবং মুদ্রার সংখ্যাদ্বারা ধনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া থাকেন। মুদ্রার বিনিময়ে আহাৰের ও বিহারের অভীষ্ট দ্রব্যসমূহের অনেক দ্রব্য আর্শে অথবা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব-যোগ্য না হইলেও মুদ্রা থাকিলেই মানুষ নিজেকে ধনী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধনবিষয়ে জ্ঞানগত দারিদ্র্যতা নিবন্ধন কাঁচামাল

উৎপাদনের যে-সমস্ত পদ্ধতি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির এবং জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার শক্তির ক্ষয়কারী এবং অস্বাস্থ্যকর কাঁচামালের উৎপাদক, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিল্পকার্যের, বাণিজ্যকার্যের এবং চাকুরীর যে-সমস্ত পদ্ধতিতে ঐ ঐ বিষয়ক শ্রমিকগণের ও অজ্ঞাত কৃষিগণের ধনাভাব, স্বাস্থ্যভাব, তৃপ্তির অভাব, সম্মানভাব এবং প্রতিষ্ঠার অভাব অনিবার্য হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করেন এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তখন পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা বিষয়েও মানুষের বুদ্ধি বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যাহা যাহা মানুষের উত্তেজনা সাধন করে তাহাতে যে পরক্ষেপেই বিষাদ অনিবার্য তাহা বিন্যস্ত হইয়া উত্তেজনার পদার্থকে মানুষ পবিত্রত্বের পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহারা কপটতা, মিথ্যাকথা, প্রতারণা ও মানুষের মধ্যে দলাদলি সাধন করিবার শিল্পোপায় হইয়া দলপতি হইতে পারেন তাহারা সমাজের কোন কোন অংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যাহারা বস্তুতঃপক্ষে জনসাধারণের দাসত্ব করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর মত নিজ নিজ দায়িত্ব বিন্যস্ত হইয়া নিজদিগকে জনসাধারণের সেবক মনে না করিয়া জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও জনসাধারণের সমুদ্রিত অর্জন করিবার পরিবর্তে অসমুদ্রিত বুদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন—তাহারাও নিজদিগকে সম্মানভাজন বলিয়া মনে করেন এবং সমাজের একাংশ তাহাদিগকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাহারা জুয়াচুরী, শঠতা, মিথ্যাকথা ব্যবহার করিয়া এবং মানুষের শরীরের, মনের ও বুদ্ধির সর্বনাশকর দ্রব্যসমূহের সর্বনাশকর ভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া কতিপয় লক্ষ সংখ্যার মুদ্রার্জন করিতে পারেন, তাহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলার ফলে মানুষের মধ্যে ধৈর্য, হিংসা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যা ব্যবহার, ধন্দ্ব-কলহ প্রভৃতি অনিবার্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত আইন ও শৃঙ্খলাই সেবা করিয়া এবং ধৈর্যহিংসার বুদ্ধিসাধন করিয়া যাহারা মুদ্রার্জন করিতে পারেন, তাহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাহারা শিক্ষার নামে শিশুগণের ভগবানের দেওয়া বিচাৰ-শক্তিকে বিচারহীন মতবাদ মুগ্ধ করিবার শক্তিকে ও সংযম-শক্তিকে উত্তেজনা-শক্তিতে পরিণত করিয়া থাকেন এবং শিশুগণকে মানুষ করিবার পরিবর্তে অমানুষ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও সমাজের একাংশ সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যাহারা মানুষের চিকিৎসার নামে কাণ্ডাত্ত: মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এমন কি সময় সময় প্রাণ পর্যন্ত হত্যা করিয়া থাকেন তাহাবা পর্যন্ত সমাজের একাংশের সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

মানুষের ধর্মের নামে যাহারা মানুষের বুদ্ধিকে বিচারশক্তিহীন সংস্কারাবিষ্ট করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে অক্ষম করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, পিতা-মাতার সেবা ও মানুষের আহারের ও বিহারের

পদার্থসম্ভারের অর্জন হইতে বিরত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, এবং মানুষ ছোট, বড় ও জাতহীন প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়া মানুষের মধ্যে ঘেবপ্রবৃত্তির বন্ধন করিয়া থাকেন—তাহারাও সমাজের একাংশের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠা বিষয়ে—মানুষের বাস আজ একস্থানে, কাল অপূরণে; মানুষের জীবিকাকর্জনের ব্যবসার আজ একটা, কাল আর একটা; আজ সম্মানিত, কাল অসম্মানের যোগ্য; আজ পরম বন্ধু, কাল পরম শত্রু; আজ উল্লেখযোগ্য ধনী, কাল দেউলিয়া ও পথের ভিখারী; আজ স্বাস্থ্যবান, কাল মৃত্যুর কবলে—এইরূপ ভাবের অস্থির অবস্থা চলিতে থাকে, অথচ মানুষ এই অবস্থার পরিহাস বৃক্ষিতে পারে না।

মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্ত যে-সমস্ত বিজ্ঞা প্রচলিত থাকে তাহার কোনটা মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যভাব, অথবা ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যভাব, অথবা মনের স্বাস্থ্যভাব, অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্যভাব, অথবা ধনাভাব, অথবা প্রতিষ্ঠাভাব, অথবা তৃপ্তির অভাব, অথবা সম্মানভাব দূর করিতে অথবা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। কোন শ্রেণীর অভাব দূর করা ও নিবারণ করা তাহা দূরের কথা, মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার যে-সমস্ত বিজ্ঞা প্রচলিত থাকে সেই সমস্ত বিজ্ঞাব প্রত্যেকটিতে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর দাবিদের উদ্ভব হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়। এই সমস্ত বিজ্ঞাব প্রত্যেকটিতে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্যের উদ্ভব হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয় বটে কিন্তু মানুষ ঐ সমস্ত বিজ্ঞার কুফল ধারণা করিতে অক্ষম তন এবং সম্ভবমেব সহিত ঐ সমস্ত বিজ্ঞাকে এক একটি “বিজ্ঞান” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের দরিদ্রতা দূর সম্পর্কে

নিঃসন্দ্বিগ্নতার যুক্তি

“বর্তমান মনুষ্যসমাজের অভাবের বিজ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ে মতবাদ” শীর্ষক আলোচনায় আমরা যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মতবাদানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজ মানুষের চরম দারিদ্র্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেক শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে চরম দারিদ্র্য উপনীত হইয়াছেন।

“মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য” শীর্ষক আলোচনায় মানুষের প্রাচুর্য্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত কথার কোনটা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অবস্থার যে যে বৈশিষ্ট্য থাকিলে মানুষ প্রাচুর্য্যের অবস্থায় আছেন বলিয়া মনে করা যায় সেই-সেই বৈশিষ্ট্যের কোনটা যে বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন মানুষের অবস্থায় দেখা যায় না, তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

শরীরের অঙ্গসমূহের যে শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য, সুব্যবস্থিত সমাবেশ ও প্রীতিকরতা থাকিলে এবং যে শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্যের অভাব, সমাবেশের অভাব ও প্রীতিকরতার অভাবশূন্য হইলে মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে করা যায়—অঙ্গসমূহের

সেই শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য, সুব্যবস্থিত সমাবেশ ও প্রীতিকরতা অথবা সেই শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্যভাবশূন্যতা, সুব্যবস্থিত সমাবেশাভাবশূন্যতা ও প্রীতিকরতা অভাবশূন্যতা বর্তমান মনুষ্যসমাজেব কোন দেশেব কোন মানুষের শরীরে দেখা সম্ভবযোগ্য নহে ও দেখা যায় না।

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের যে শ্রেণীর সমানভাবেব অক্লান্তিকর কার্যক্ষমতা থাকিলে এবং অক্ষমতার অভাব হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আছে বলিয়া মনে করা যায় ইন্দ্রিয়সমূহেব সেই শ্রেণীর কার্যক্ষমতা ও অক্ষমতার অভাব বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

মানুষের মনের যে শ্রেণীর স্থিরতা ও একনিষ্ঠতা থাকিলে এবং যে শ্রেণীর অস্থিরতার ও দোহুল্যমানতার অভাব হইলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আছে বলিয়া মনে করা যায়, মনের সেই শ্রেণীর স্থিরতা ও একনিষ্ঠতা এবং অস্থিরতার ও দোহুল্যমানতার অভাব বর্তমান মনুষ্যসমাজেব কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

মানুষের বুদ্ধির যে শ্রেণীর বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তি থাকিলে এবং যে শ্রেণীর সংস্কারপ্রবণতার ও মতবাদপ্রবণতার অভাব হইলে মানুষের বুদ্ধির স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আছে বলিয়া মনে করা যায় বুদ্ধির সেই শ্রেণীর বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং সেই শ্রেণীর সংস্কারপ্রবণতার ও মতবাদপ্রবণতার অভাব বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে এবং নাই।

শরীরেব ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির যে শ্রেণীর মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য বজায় থাকিলে এবং যে শ্রেণীর পশুজনোচিত স্বাস্থ্যের অভাব হইলে মানুষের মনুষ্যোচিত স্বাস্থ্য বজায় আছে বলিয়া মনে করা যায় স্বাস্থ্যের সেই শ্রেণীর মনুষ্যোচিত অবস্থা এবং পশুজনোচিত অবস্থার অভাব বর্তমান মনুষ্যসমাজেব কোন দেশেব কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে এবং নাই।

আহাৰ ও বিহারের সামগ্রীসমূহের যে শ্রেণীর প্রাচুর্য, স্বাস্থ্যজনকতা ও তৃপ্তিজনকতা থাকিলে এবং যে শ্রেণীর প্রাচুর্যের অভাব স্বাস্থ্যজনকতার অভাব ও তৃপ্তিজনকতার অভাব না থাকিলে মানুষের ধনপ্রাচুর্য আছে বলিয়া মনে করা যায় আহাৰ ও বিহারের সামগ্রীসমূহের সেই শ্রেণীর প্রাচুর্য, স্বাস্থ্যজনকতা ও তৃপ্তিজনকতা অথবা সেই শ্রেণীর প্রাচুর্যের অভাবশূন্যতা, স্বাস্থ্যজনকতার অভাবশূন্যতা ও তৃপ্তিজনকতার অভাবশূন্যতা বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন সংসারে থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

ধনতৃষ্ণা স্বত্বকে যে শ্রেণীর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির অভাব থাকিলে, মানুষের ধনপ্রাচুর্য আছে বলিয়া মনে করা যায়—ধনতৃষ্ণার সেই শ্রেণীর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অভাব বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

প্রতিষ্ঠা, অপ্রতিষ্ঠার অভাব; তৃপ্তি, অতৃপ্তির অভাব, সম্মান, অসম্মানের অভাব, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের অভাব যে শ্রেণীর হইলে,

মানুষের প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য, তৃপ্তির প্রাচুর্য, সম্মানের প্রাচুর্য ও জ্ঞানের প্রাচুর্য আছে বলিয়া মনে করা যায়—সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠার অভাব, তৃপ্তি ও অতৃপ্তির অভাব, সম্মান ও অসম্মানের অভাব, জ্ঞান ও অজ্ঞানের অভাব—বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের থাকা সম্ভবযোগ্য নহে ও নাই।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের উপরোক্ত অবস্থা বিচার করিলে মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের বর্তমান অবস্থাকে যে প্রাচুর্যের অবস্থা বলা চলে না—তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

শরীরের যে শ্রেণীর স্বাস্থ্যভাব থাকিলে মানুষকে শারীরিক স্বাস্থ্যভাবযুক্ত বলিতে হয়; ইন্দ্রিয়সমূহের যে-শ্রেণীর স্বাস্থ্যভাব থাকিলে মানুষকে ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যভাবযুক্ত বলিতে হয়; মনের যে-শ্রেণীর স্বাস্থ্যভাব থাকিলে মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্যভাবযুক্ত বলিতে হয়; বুদ্ধির যে শ্রেণীর স্বাস্থ্যভাব থাকিলে মানুষকে বুদ্ধির স্বাস্থ্যভাবযুক্ত বলিতে হয়; শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির সেই শ্রেণীর স্বাস্থ্যভাব নাই এমন একটি মানুষ বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং পাওয়া যায় না।

ধনের, প্রতিষ্ঠার, পরিতৃপ্তির, সম্মানের এবং জ্ঞানের যে শ্রেণীর অভাব থাকিলে মানুষকে ধনাভাব-যুক্ত, প্রতিষ্ঠাব অভাব-যুক্ত, পরিতৃপ্তির অভাব-যুক্ত, সম্মানের অভাব-যুক্ত এবং জ্ঞানের অভাব-যুক্ত বলিয়া মনে হয়—ধনের, প্রতিষ্ঠার, পরিতৃপ্তির, সম্মানের এবং জ্ঞানের সেই শ্রেণীর অভাব নাই—এমন একটি মানুষ বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না এবং পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞানবিষয়ে বর্তমান মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের উপরোক্ত অভাবের অবস্থা বিচার করিলে বর্তমান মনুষ্যসমাজের এবং মানুষের বর্তমান অবস্থাকে যে অভাবের অবস্থা বলা অনিবার্য হয়—তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

উপরোক্তভাবে বিচার করিলে, বর্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যে সর্বশ্রেণীর অভাবের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের—প্রত্যেক মানুষ যে কেবলমাত্র সর্বশ্রেণীর ‘অভাবের’ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা নহে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই ‘দারিদ্র্যের’ চরম অবস্থায়ও উপনীত হইয়াছেন। ইহার কারণ তিন শ্রেণীর—

প্রথমতঃ, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ যদিও অভাবেব চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি অধিকাংশ মানুষ নিজ নিজ অবস্থা যে কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন;

দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞান বিষয়ে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন সেই সেই আদর্শ বস্তুতঃ পক্ষে স্বাস্থ্যভাব, ধনাভাব,

প্রতিষ্ঠাভাব, পরিতৃপ্তির অভাব, সম্মানভাব এবং জ্ঞানভাবের আদর্শ;

তৃতীয়তঃ, স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তি, সম্মান এবং জ্ঞান-বিষয়ক প্রচলিত আদর্শে উপনীত হইবার জন্য প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে যে কার্য্য-পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই সেই কার্য্য-পন্থায় কু-স্বাস্থ্য, কু-ধন, কু-প্রতিষ্ঠা, কু-তৃপ্তি, কু-সম্মান এবং কু-জ্ঞান হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

“অভাবাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থার পার্থক্য”-শীষক আলোচনায় এবং “মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য”-শীষক আলোচনায় মানুষের দাবিদ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা বিচার করিয়া দেখিলে উদ্দেশ্য কোনটা স্বীকার না করিয়া পাবা যায় না; এবং তখন বর্তমান মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন,— তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

মানুষের অভাবসমস্তার সমাধানের

সম্ভবযোগ্যতা।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার নাম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে যে কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা হইতে তিনটি কথা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা :

(১) বর্তমান মনুষ্যসমাজ দাবিদ্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে :

(২) বর্তমান মনুষ্যসমাজের দাবিদ্যের সাফাৎ কারণ মানুষের ছয় শ্রেণীর অভাব।

(৩) বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার সমাধান করিতে হইলে যুগপৎভাবে যুদ্ধ-সমস্তার ও অভাব-সমস্তার সমাধান করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধ-সমস্যার ও অভাব-সমস্যার সর্বতোভাবে যুগপৎ সমাধান সম্ভবযোগ্য হইলে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান স্বতঃসিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু যুদ্ধ-সমস্যার অথবা অভাব-সমস্যার সর্বতোভাবে সমাধান করা কাৰ্য্যতঃ সম্ভবযোগ্য কি না তদ্বিষয়ে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সন্দেহ আছে। যদি ঐ দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান কাৰ্য্যতঃ সম্ভবযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ঐ দুই শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান হইতে পারে—তাহা বলিয়া কোন ফলোদয় হইতে পারে না। এই কারণে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমস্যার এবং অভাবসমস্যার সর্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত কি না—তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন হয়।

ঐ দুই শ্রেণীর সমস্তার কোন শ্রেণীর সমস্তাই সর্বতোভাবে সমাধান করা সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা প্রচলিত মতবাদ। প্রচলিত মতবাদানুসারে “মানুষ থাকিলেই মানুষের পরস্পর যুদ্ধ এবং মানুষের অভাব বিজ্ঞান থাকি অপরিহার্য্য হয়”।

ভারতীয় ঋষিগণ মানুষের পরস্পরের মধ্যের যুদ্ধ ও অনা-সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন সেই সমস্ত কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ ও অভাব অনিবার্য্য নহে। যে যে

নিয়মে এই ভূমণ্ডলের আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, উদ্ভিদশ্রেণী ও চরজীবশ্রেণী স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে—সেই সেই নিয়মে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং অভাবের আশঙ্কা স্বতঃই উৎপন্ন হয়। সেই সেই নিয়মে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং অভাবের আশঙ্কা যেমন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধশক্তি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি এবং অভাবাশঙ্কা সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার শক্তিও স্বতঃই উৎপন্ন হয়। মানুষ যতপি ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এবং সজ্জগত সংগঠনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের মধ্যের যুদ্ধশক্তি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি এবং অভাবাশঙ্কা সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার স্বাভাবিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রবৃত্তান্বিত হন, তাহা হইলে মানুষের স্বাভাবিক যুদ্ধশক্তি ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি এবং অভাবাশঙ্কা সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়। ভারতীয় ঋষিগণের কথানুসারে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল যে যে নিয়মে স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মানুসারে মানুষের জগৎ দুই পন্থা স্বতঃই উন্মুক্ত থাকে। বিচার করিয়া কাণ্য করিলে মানুষ যেমন তাঁহার সর্ববিধ সমস্যা সর্বতোভাবে সমাধান করিয়া সর্বতোভাবে সুখ-শান্তি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, সেইরূপ আবার বিচার করিয়া কাণ্য না করিলে মানুষের সর্ববিধ দুঃখের ও অশান্তির পন্থা স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় ঋষিগণের কথা আদাম এবং ইভের সুশোভিত ফলফুলভবা নন্দনকাননের কথার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। মানুষের পক্ষে ঐ ভূমণ্ডল যেকোন নন্দন কানন সদৃশ হইতে পারে, সেইরূপ আবার অবিচারিত সৌন্দর্য্যের মোহে লালনাপ্রবোধিত হইয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলে কণ্টকাকীর্ণ নরকসদৃশও হইতে পারে।

অভাব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে যে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ-সমস্যার সমাধান স্বতঃই হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা আমরা “বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্তার সমস্তার মধ্যে যুদ্ধসমস্তার ও অভাবসমস্তার প্রাণাত্মক যুক্তি”-শীষক আলোচনায় দেখাইয়াছি। “মানুষের অভাবসমস্তার ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি না হইলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং মানুষের অভাবসমস্তার ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি ঘটিলে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধের আশঙ্কা অনিবার্য্য হয়”—ঐ দুইটি সত্য বৃদ্ধিতে পাবিলে অভাব-সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমস্তার সমাধান যে স্বতঃই অবশ্যজ্ঞাবী হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অভাবসমস্তার সমাধান করিতে পারিলে যখন মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমস্তার সমাধান স্বতঃসিদ্ধ হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, অভাব-সমস্তার সমাধান মানুষের সাধ্যান্তর্গত হইলে দুই শ্রেণীর সমস্তার সমাধানই মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতীয় ঋষিগণের মতবাদানুসারে “মানুষ” যতপি ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা এবং সজ্জগত সংগঠন দ্বারা মানুষের অভাবাশঙ্কা সর্বতোভাবে দূরীভূত

ও নিবারণিত করিবার স্বাভাবিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার জ্ঞান প্রযুক্তশীল হয় তাহা হইলে মানুষের অভাবাশঙ্কা সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হওয়া অবশ্যসম্ভাবী হয়।”

যে-শ্রেণীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা এবং সম্মত সংগঠন দ্বারা মানুষের অভাবাশঙ্কা সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হওয়া অবশ্যসম্ভাবী হয় সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা এবং সম্মত সংগঠন যে-শ্রেণীর পরিকল্পনায় স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে ও হয়—সেই শ্রেণীর পরিকল্পনার কথা আমরা “মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠনের মূল নীতিসূত্র”—শীর্ষক এবং “মানুষের পশুত্ব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা”—শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে আলোচনা করিব। মানুষের অভাব-সমস্তার সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যাস্তর্গত তাহা ঐ দুটি প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

মানুষের ইচ্ছা কয় শ্রেণীর হইতে পারে ও হয় এবং মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে কোন কোন শ্রেণীর পদার্থের প্রয়োজন হইতে পারে ও হয় তাহার বিচার করিলেও মানুষের অভাব-সমস্তা সর্বতোভাবে সমাধান করা যে মানুষের সাধ্যাস্তর্গত তাহা বুঝা যায়। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যাস্তর্গত হইলে যে মানুষের অভাবসমস্তা সর্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যাস্তর্গত হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহার কারণ—মানুষের ইচ্ছাপূরণের অসাধ্যতা ও দুঃসাধ্যতা হইতে অভাবের উৎপত্তি হয় এবং সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইলে অভাব-সমস্তার উদ্ভব হইতে পারে না।

মানুষের অভাবের মূলতঃ ছয় শ্রেণীর, মানুষের ইচ্ছাও সেইরূপ মূলতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা :

- (১) স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা,
- (২) ধনগত ইচ্ছা,
- (৩) প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা,
- (৪) তৃপ্তিগত ইচ্ছা,
- (৫) সম্মানগত ইচ্ছা, এবং
- (৬) জ্ঞানগত ইচ্ছা।

এই ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যাস্তর্গত।

এই ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যাস্তর্গত বটে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবের চেষ্টায় কোন মানুষের পক্ষে সর্বশ্রেণীর ইচ্ছা ত দূরেন কথা—নিজের কোন একটি শ্রেণীর ইচ্ছাও সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কোন একটি মানুষের কোন একটি শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা বাহ্যেও সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সেই ব্যবস্থার সন্নি

পরিচিতি হইতে পারিলে, কোন একটি মানুষের কোন একটি শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে কেন যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা বাহ্যেও সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা বুঝা যায়।

ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা বাহ্যেও যুগপৎভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহা করিতে না পারিলে অথবা না করিলে যে কোন এক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না—ইহা সাধারণ বিচারবুদ্ধি অনুসারেও অস্বীকার করা যায় না। ধনগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত অথবা তৃপ্তিগত অথবা সম্মানগত অথবা জ্ঞানগত কোন একটি ইচ্ছার পূরণ না হইলে যে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আবার মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে শরীরের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যগত ইচ্ছার এবং অন্যান্য পাঁচ শ্রেণীর ইচ্ছার পূরণ করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা যুগপৎভাবে বাহ্যেও পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা করিতে না পারিলে কোন এক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না বটে কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা বাহ্যেও সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা করিতে পারিলে ছয় শ্রেণীর ইচ্ছাই যুগপৎভাবে এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়। স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্বতোভাবে বাহ্যেও পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে মানুষের অন্ত কোন শ্রেণীর ইচ্ছাই সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা কোন ক্রমে সম্ভবযোগ্য হইতে পারে না ও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা বাহ্যেও সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে, মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যগত পূরণ করিবার এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, সেই স্বাভাবিক শক্তি বাহ্যেও সর্বতোভাবে বজায় থাকে এবং কোনক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাহা করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

যে যে নিয়মে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল স্বতঃই উৎপন্ন ও বক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মের সন্নিহিত হইতে পারিলে দেখা যায়, এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কার্য আছে।

এ দুই শ্রেণীর কার্যের এক শ্রেণীর কার্যের নাম সর্বাণ্ব-বিক কার্য এবং অপর শ্রেণীর কার্যের নাম অণুগণবিক কার্য। সর্বাণ্ববিক কার্য সর্বদাই অণুকারের অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারের (Elliptical) হইয়া থাকে। সর্বাণ্ববিক কার্যের একমাত্র কারণ ভূমণ্ডলের উপবিভাগে নীলাকাশের বিজ্ঞানমিতা। ভূমণ্ডলের উপবিভাগে নীলাকাশ অণুকারে অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারে বিজ্ঞানমিত আছে বলিয়া এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের, স্থলের,

উদ্ভিদশ্রেণীর এবং চরজীবশ্রেণীর অবয়বের প্রত্যেক অংশে ও প্রত্যেক পূর্ণাংশে অণুকারের অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকারেব সর্বা-বয়বিক কণ্ঠ সর্বদা বিদ্যমান থাকে। অণুকারের অথবা অখণ্ড-মণ্ডলাকারের সর্বাবয়বিক কণ্ঠ সর্বদা উক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া অধোদিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে।

খণ্ডাবয়বিক কাণ্ড প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর আকারের হয়। খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের এক শ্রেণীর আকারের নাম ছত্রাকার— (lineal or umbrella-like), আর অপন শ্রেণীর আকারের নাম সূত্রাকার (linear)। খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :—

- (১) জলের, স্থলের, উদ্ভিদশ্রেণীর ও চরজীবশ্রেণীর অবয়বের গুরুত্ব (weight) এবং
- (২) চরজীবশ্রেণীর খণ্ডাবয়বসমূহের (অর্থাৎ ঢক্, কণ্, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বদা, মাংস, বক্ত ও চৰ্মসমূহের) বাসায়নিক ও আবয়বিক কাণ্ড। ছত্রাকার ও সূত্রাকার খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডসমূহ সর্বদা অধঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হয়।

এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে যে প্রধানতঃ উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কাণ্ড বিদ্যমান আছে, তাহা আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের বিভিন্ন অবস্থার সচিহ্ন পরিচিত হইতে পারিলে কোন ক্রমে অস্বীকার কবিত্তে পারা যায় না।

এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কাণ্ড বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ দুই শ্রেণীর কাণ্ডের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর আকার (অর্থাৎ অণুকার, ছত্রাকার ও সূত্রাকার) কত্ৰাপি বিদ্যমান থাকে না। স্বভাবতঃ এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কাণ্ড বিদ্যমান থাকিলেও কেবলমাত্র অণুকার অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকার বিদ্যমান থাকে। ইহার কারণ স্বভাবতঃ খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডসমূহ সর্বাবয়বিক কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ জলে, স্থলে, উদ্ভিদ-শ্রেণীর অবয়বে, এবং চরজীবশ্রেণীর অবয়বে যে সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কাণ্ড হইতে পারে ও হইয়া থাকে সেই সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের বেগ অথবা পরিমাণ কখনও সর্বাবয়বিক কাণ্ডের বেগ অথবা পরিমাণের তুলনায় অধিক হইতে পারে না। স্বভাবতঃ য সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কাণ্ড হইতে পারে ও হইয়া থাকে সেই সমস্ত খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের বেগ অথবা পরিমাণ কখনও সর্বাবয়বিক কাণ্ডের বেগ অথবা পরিমাণের তুলনায় অধিক হইতে পারে না ও অধিক হয় না বলিয়া স্বভাবতঃ খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডসমূহ সর্বাবয়বিক কাণ্ডে পরিণতি লাভ কবিত্তা থাকে এবং এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কাণ্ড বিদ্যমান থাকিলেও কেবলমাত্র অণুকার অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকার বিদ্যমান থাকে। উদ্ভিদশ্রেণীর ও চরজীবশ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রাকৃতিতে যে অণুকার বিদ্যমান

থাকে তাহার প্রধান কারণও উপরোক্ত সর্বাবয়বিক কাণ্ডের এবং খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের সমতা।

এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশেব সর্বাবয়বিক কাণ্ডের ও খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের সমতা স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু মনুষ্যশ্রেণীর ভ্রমে খণ্ড-বয়বিক কাণ্ডসমূহের বেগ ও পরিমাণ সর্বাবয়বিক কাণ্ডসমূহের বেগ ও পরিমাণের তুলনায় অধিক হইতে পারে। খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডসমূহের বেগ ও পরিমাণ সর্বাবয়বিক কাণ্ডসমূহের বেগ ও পরিমাণের তুলনায় অধিক হইলে উহাদের সমতার অভাব হয় এবং তখন এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে দুই শ্রেণীর কাণ্ড ও তিন শ্রেণীর আকার পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্যমান থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে সর্বাবয়বিক কাণ্ডের ও খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের সমতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে মাত্রায়েব শব্দবের, ইন্দ্রিয়-সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাভাবিক পূর্ণ কবিবাব ও স্বাস্থ্য বক্ষা কবিবাব শক্তিয়ুক্ত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, এই ভূ-মণ্ডলেব আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে সর্বাবয়বিক কাণ্ডের ও খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের সমতা বিদ্যমান থাকিলে জল ও ভূমি স্বতঃই সর্বাধিক পরিমাণের (of maximum intensity) উৎপাদিকশক্তিয়ুক্ত হইয়া থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলেব আকাশ-বাতাসের জলের ও স্থলের কোন অংশে সর্বাবয়বিক কাণ্ডের ও খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের সমতার অভাব হইলে আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে মাত্রায়েব শব্দবের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য-ভাব পূর্ণ কবিবাব ও স্বাস্থ্য বক্ষা কবিবাব শক্তি-বিহীন হইয়া থাকে এবং স্বাস্থ্য নষ্ট কবিবাব শক্তিয়ুক্ত হইয়া থাকে। আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের কোন অংশে সর্বাবয়বিক কাণ্ডের ও খণ্ডাবয়বিক কাণ্ডের সমতার অভাব হইলে, জল ও ভূমি স্বতঃই ক্ষীণ উৎপাদিকশক্তিয়ুক্ত হইয়া থাকে। জল ও ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকশক্তি ক্ষীণ হইলে ঐ জল ও ভূমি কোন পদার্থে মাত্রায়েব প্রয়োজননিবাহের উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে অক্ষম হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ যে যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত পদার্থের কোনটা মাত্রায়েব শব্দবের অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্য সর্বতোভাবে বক্ষা কবিবাব শক্তিয়ুক্ত হয় না। জল ও ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি ক্ষীণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে জল ও ভূমি হইতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন সেই সমস্ত পদার্থে মাত্রায়েব সর্বাধিক স্বাস্থ্যের ক্ষয়-কারক হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলেব আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশেব সর্বাবয়বিক কাণ্ড, খণ্ডাবয়বিক কাণ্ড, দ্বিবিধ কাণ্ডের সমতা, এবং দ্বিবিধ কাণ্ডের সমতার অভাববিষয়ক উপরোক্ত কথাগুলি বর্তমান মানবসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্থান পায় নাই। উপরোক্ত কথাগুলি বর্তমান মানবসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্থান

পায় নাই বলিয়া ঐ কথাগুলি যে ভ্রমযুক্ত অথবা নিস্প্রয়োজনীয়, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণ বিচারবিলম্বের বুদ্ধির দ্বারা বিচার কবিয়া দেখিলেও ঐ কথাগুলির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বিচারানুসারে ঐ কথাগুলি এত প্রয়োজনীয় যে, বর্তমান মনুষ্যসমাজের দারিদ্র্যাবস্থার প্রধান কারণ ঐ কথাগুলির বিমূর্ত্তি।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের প্রত্যেক অংশে স্বতঃই সর্বাণ্যবিক কার্য, খণ্ডাণ্যবিক কার্য এবং ঐ দ্বিবিধ কার্যের সমতা বিদ্যমান থাকে বলিয়া আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে মানুষের শরীরের ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাব্যবস্থার পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার শক্তি স্বতঃই বিদ্যমান থাকে। আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যাব্যবস্থার পূরণ কবিবার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার শক্তি স্বতঃই বিদ্যমান থাকে বলিয়া স্বাস্থ্যগত সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত—ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। স্বাস্থ্যগত সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত—ইহা স্বীকার কবিলে মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছাই সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। ইহাব্যবস্থা, মানুষের স্বাস্থ্যগত সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধন কবিত্তে পাবিলে স্বতঃই মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ কবিবার ব্যবস্থা সাধিত হয়।

মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছার প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের অভাব-সমস্তার সর্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত এবং সম্পূর্ণ সম্ভবযোগ্য।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলের ও স্থলের কোন অংশে যতদূর সর্বাণ্যবিক কার্য অথবা খণ্ডাণ্যবিক কার্য অথবা সর্বাণ্যবিক ও খণ্ডাণ্যবিক কার্যের সমতা স্বতঃই বিদ্যমান না থাকিত এবং ঐ দ্বিবিধ কার্যের কোনটিই অভাব হওয়া অথবা ঐ দ্বিবিধ কার্যের সমতার অভাব হওয়া যদি স্বভাবের নিয়ম হইত তাহা হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিতে হইত; পবন, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সর্বাণ্যবিক সম্ভবযোগ্য নহে—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হইত।

মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত বটে, কিন্তু মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছার সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃই কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছার সর্বতোভাবে পূরণের জগৎ মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা এবং সম্মুখিত সংগঠন অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছার সর্বতোভাবে পূরণ কবিবার ব্যবস্থা করিবার বিচ্ছিন্ন স্বভাবজাত কোন বিষয় থাকিতে পারে না ও থাকে না বটে; কিন্তু মানুষ যতদূর ঐ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনা অর্জন না করেন এবং সম্মুখিত সংগঠন না করেন তাহা

হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছার সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন মানুষের কোন কার্যবশতঃ যাহাতে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশে স্বভাবজাত সর্বাণ্যবিক কার্যের ও খণ্ডাণ্যবিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব না ঘটতে পারে তদ্বিষয়ে প্রধান ভাবে ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাব্যবস্থা—এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশে স্বভাবজাত সর্বাণ্যবিক কার্যের ও খণ্ডাণ্যবিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব ঘটিলে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা অথবা সম্মুখিত সংগঠনের দ্বারা কোন দেশের কোন মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের অখণ্ডতা নিবন্ধন উহাদের কোনটির কোন অংশে স্বভাবজাত সর্বাণ্যবিক কার্যের ও খণ্ডাণ্যবিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব ঘটিলে, সমতার ঐ অভাব সমগ্র ভূ-মণ্ডল-ময় ব্যাপ্তিলাভ কবিয়া থাকে; ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের স্বভাব-জাত সর্বাণ্যবিক ও খণ্ডাণ্যবিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব ঘটিলে আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ মানুষের স্বাস্থ্যাব্যবস্থার পূরণ করিবার ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার স্বাভাবিক শক্তিস্থান হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার শক্তিস্থান হয় এবং ভূ-মণ্ডলের, জলের ও স্থলের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে; ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ মানুষের স্বাস্থ্যাব্যবস্থার পূরণ করিবার শক্তিস্থান হইলে অথবা ভূ-মণ্ডলের, জলের ও স্থলের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বাস্থ্যাব্যবস্থার ও ধনাভাব হওয়া অনিবার্য হয়।

ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোনও এক অংশে উহাদের স্বভাবজাত সর্বাণ্যবিক ও খণ্ডাণ্যবিক কার্যের সমতার অভাব হইলে, সমতার ঐ অভাবের ব্যাপ্তি সমগ্র ভূ-মণ্ডলময় হওয়া এবং প্রত্যেক দেশের মানুষের স্বাস্থ্যাব্যবস্থার ও ধনাভাব হওয়া অনিবার্য হয় বলিয়া মানুষের কোন একশ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যেকোন এক শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে যুগপৎভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহাব্যবস্থা করিতে হয়—সেইরূপ আবার, কোন একটা দেশের কোন একটা মানুষের কোন একটা ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা কবিত্তে হইলে—সমগ্র ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে যুগপৎভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

আধুনিক মানবসমাজের এক শ্রেণীর মতবাদানুসারে মানুষ অসংখ্য শ্রেণীর সামগ্রী উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং মানুষের উপভোগ-ইচ্ছাসমূহের পূরণ করিতে হইলে অসংখ্য শ্রেণীর সামগ্রীর প্রয়োজন হয় বলিয়া মানুষের ধনগত ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদের মতবাদ উহার বিরোধী।

আমাদিগের বিচারানুসারে যে-সমস্ত সামগ্রীর কাঁচামাল এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং যে-সমস্ত সামগ্রী শিল্পকাৰ্য্যেব সহায়তায় মানুষ তাঁহার শরীর অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা মন অথবা বুদ্ধিদ্বারা ব্যবহার-যোগ্য করিতে সক্ষম নহেন সেই সমস্ত সামগ্রী কোনটা মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পাবে না ও হয় না। ইহাব কারণ—প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব ইচ্ছাব গণ্ডী অনুসারে অভীষ্ট সামগ্রীসমূহের গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; কামেব গণ্ডী অনুসারে ইচ্ছার গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; প্রবৃত্তিব গণ্ডী অনুসারে কামেব গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তিব গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। আকাশ-বাতাস, জল ও স্থলের সহিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিব সংশ্লিষ্ট হইতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিব শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-সমস্ত সামগ্রীর কাঁচামাল এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং যে-সমস্ত সামগ্রী শিল্পকাৰ্য্যেব সহায়তায় মানুষ তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করিতে সক্ষম নহেন, সেই সমস্ত সামগ্রীর কোনটা যে মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইতে পাবে না ও হয় না, তাহা সাধারণ বিশ্লেষণ-বুদ্ধির দ্বারা বিচার্য্য করা যায় না।

আধুনিক মনুষ্যসমাজে অভাবসমস্তার সর্বতোভাবে সমাধানের সম্ভবযোগ্যতার বিরুদ্ধে আব এক শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে। ঐ শ্রেণীর মতবাদানুসারে মনুষ্যসমাজেব লোকসংখ্যা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের আহার-বিভাবের সামগ্রীসমূহ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই পরিমাণেব অল্পাদিক অভাব হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

আমাদিগের বিচারানুসারে উপবোক্ত মতবাদও সমর্থনযোগ্য নহে। আকাশ-বাতাসেব অথবা জলেব অথবা স্থলেব কোন অংশের সর্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কাৰ্য্যেব সমস্তার অভাব না ঘটিলে আকাশ-বাতাসের অথবা জলেব অথবা স্থলেব স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তিব ক্ষীণতা ঘটিতে পাবে না। আকাশ-বাতাসেব অথবা জলেব অথবা স্থলেব স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তিব ক্ষীণতা না ঘটিলে এই ভূমণ্ডলের মনুষ্যসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় না কেন, মানুষের আহার-বিভাবেব জগা যখন যে যে সামগ্রী যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পাবে ও প্রয়োজন হয় সেই সেই সামগ্রী সেই সেই পরিমাণেব কখনও কোনরূপ অভাব হইতে পাবে না।

• যে যে কাৰণে এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী, এবং মনুষ্যশ্রেণী ও মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিভাবাদির ইচ্ছা স্বতঃই উৎপন্ন ও বক্ষিত হয়, সেই সেই কারণের সহিত পরিচিত হইতে পাবিলে দেখা যায় যে,

* উদ্ভিদশ্রেণীর আয়তন—এই ভূ-মণ্ডলে সর্বাধ উদ্ভিদশ্রেণীর প্রত্যেকটীর যে যে আয়তন থাকে, সেই সেই আয়তনের সমষ্টিকে উদ্ভিদশ্রেণীর আয়তন বলা হয়।

“মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণীর আয়তন”—এই ভূ-মণ্ডলে যত শ্রেণীর মনুষ্যের চর-জীব আছে তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটির যে আয়তন

আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল উৎপন্ন না হইলে উদ্ভিদশ্রেণীর ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন হইতে পারে না; উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন না হইলে, মনুষ্যশ্রেণী উৎপন্ন হইতে পারে না; মনুষ্যশ্রেণী উৎপন্ন না হইলে মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিভাবাদির ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে না। আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল উৎপন্ন হইবার পর উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন হয় বলিয়া আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল যত অধিক আয়তনে (area) উৎপন্ন হইতে পারে ও হয়, উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী তত অধিক আয়তনে * (area) উৎপন্ন হইতে পারে না ও হয় না। উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী উৎপন্ন হইবার পর মনুষ্যশ্রেণী ও তাহার আহার-বিভাবাদির ইচ্ছা উৎপন্ন হয় বলিয়া উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী যত অধিক আয়তনে উৎপন্ন হইতে পারে ও হয় মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিভাবাদি ইচ্ছার সামগ্রীর আয়তন তত অধিক হইতে পাবে না ও হয় না।

যে যে কারণে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল, উদ্ভিদশ্রেণী ও মনুষ্যের চর-জীবশ্রেণী, এবং মনুষ্যশ্রেণী ও মনুষ্যশ্রেণীর আহার-বিভাবাদির ইচ্ছা স্বতঃই উৎপন্ন ও বক্ষিত হইয়া থাকে—সেই সেই কাৰণের কাৰ্য্য উপবোক্ত নিয়মে সর্বদা আবদ্ধ থাকে বলিয়া আমাদিগের বিচারানুসারে সর্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কাৰ্য্যেব সমস্তাব কোনরূপ অভাব মনুষ্যেব দ্বারা সাধিত না হইলে মানবসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, মনুষ্যজাতির আহার-বিভাবেব প্রয়োজন নির্বাহ করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর কাঁচামাল যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে ও হয়, সেই সেই শ্রেণীর কাঁচামালের কোনটাব অথবা কোন শ্রেণীর কাঁচামালের কোন প্রয়োজনীয় পরিমাণেব কখনও কোনরূপ অভাব হইতে পাবে না।

মনুষ্যজাতির আহার-বিভাবাদির ইচ্ছাসমূহ পূরণ করিবার জগা যে সমস্ত কাঁচামাল যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই কাঁচামালের সেই সেই পরিমাণেব অভাব যে, আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের সর্বাবয়বিক ও খণ্ডাবয়বিক কাৰ্য্যের সমস্তাব কোনরূপ অভাব না হইলে ঘটিতে পারে না তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার আব একটা পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতি অনুসারে তিন শ্রেণীর বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়, যথা :

(১) প্রত্যেক মানুষের আহার-বিভাবাদির ইচ্ছাপূরণের জগা যে যে সামগ্রী যে যে পরিমাণে প্রতি বৎসরে প্রয়োজন হইতে পারে সেই সেই সামগ্রী সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন কাৰ্য্যে হইলে কত আয়তনে জমি, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ক্ষীণ না হইলে, প্রয়োজন হইতে পারে—সেই আয়তনের পরিমাণ ;

যা কে সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যের চর-জীব শ্রেণীর আয়তন বলা হয়।

“মনুষ্যজাতির আয়তন”—এই ভূ-মণ্ডলে যতসংখ্যক মানুষ থাকেন, সেই সমগ্র সংখ্যক প্রত্যেক মানুষের যে আয়তন থাকে, সেই আয়তনের সমষ্টিকে মনুষ্যজাতির আয়তন বলা হয়।

- (২) মানুষের আহার-বিহারাদির ইচ্ছাপূরণের যে যে সামগ্রী প্রতিবৎসর প্রয়োজন হয় সমগ্র ভূ-মণ্ডলে সেই সেই সামগ্রীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার যোগ্য জমির আয়তনের পরিমাণ ;
- (৩) সমগ্র মনুষ্যসমাজের লোকসংখ্যার পরিমাণ ।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের মনুষ্যসংখ্যার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার আহার-বিহারাদির ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য সর্বসমেত যখন যে আয়তনের জমির প্রয়োজন হইতে পারে ন্যূনপক্ষে তাহার নয়গুণ আয়তনের জমি সর্বদাই এই ভূ-মণ্ডলে বিদ্যমান থাকে ।

এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জল, ভূমি, উদ্ভিদশ্রেণী, মনুষ্যোত্তর চর-জীবশ্রেণী এবং মনুষ্যশ্রেণী যে যে কারণবশতঃ স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয় সেই সেই কারণের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ কারণসমূহের শৃঙ্খলাবদ্ধ চল-নীলতার বিদ্যমানতা বশতঃ মনুষ্যশ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যা কখনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, আবার কখনও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । মনুষ্য-শ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস এই দুইই সীমাবদ্ধ ।

উপরোক্ত কারণের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে আরও দেখা যায় যে, মনুষ্য শ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যাব হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত আকাশ-বাতাসেব, জলের, স্থলের, উদ্ভিদশ্রেণীর এবং মনুষ্যোত্তর চর-জীবশ্রেণীর উৎপত্তির আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হওয়া অনিবার্য্য হয় । মনুষ্যশ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যা স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মনুষ্যোত্তর চর-জীবশ্রেণীর, উদ্ভিদশ্রেণীর, জমির, জলভাগের এবং আকাশ-বাতাসের উৎপত্তির আয়তন স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যশ্রেণীর উৎপত্তির সংখ্যা স্বতঃই হ্রাস পাইতে থাকিলে মনুষ্যোত্তর চর-জীবশ্রেণীর, উদ্ভিদশ্রেণীর, জমির, জলভাগের এবং আকাশ-বাতাসের উৎপত্তির আয়তন স্বতঃই হ্রাস প্রাপ্ত হয় । এক শ্রেণীর পদার্থের স্বাভাবিক উৎপত্তির বৃদ্ধি আন অল্প এক শ্রেণীর পদার্থের স্বাভাবিক উৎপত্তির হ্রাস—ইহা কখনও হইতে পারে না ও হয় না ।

যে যে কারণ বশতঃ এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ, স্থলভাগ, উদ্ভিদশ্রেণী, মনুষ্যোত্তর চর-জীবশ্রেণী এবং মনুষ্যশ্রেণী স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই কারণেব সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যজাতি যখন যে আয়তনে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, মনুষ্যোত্তর চর-জীবশ্রেণী তখনই সেই আয়তনের তিন গুণ আয়তনে, উদ্ভিদশ্রেণী মনুষ্যজাতির আয়তনের সাতাশ গুণ আয়তনে, ভূমি মনুষ্যজাতির আয়তনের দুইশত তেতাল্লিশ গুণ আয়তনে, জল মনুষ্যজাতির আয়তনের সাতশত ঊনত্রিশ গুণ আয়তনে এবং এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস মনুষ্যজাতির আয়তনের ছয় হাজার পাঁচশত একষট্টি গুণ আয়তনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

মানুষের অভাব-সমস্তার সর্বতোভাবেব সমাধানের সম্ভব-

যোগ্যতা বিষয়ে যে যে কথা উপরে বলা হইয়াছে, সেই সেই কথা হইতে পাঁচ শ্রেণীর কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা :

- (১) মানুষের ছয়শ্রেণীর ইচ্ছা যাহাতে সর্বতোভাবেব পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর অভাব-সমস্তার কথা উঠিতে পারে না ; ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইলে স্বতঃই মানুষের অভাব-সমস্তার সর্বতোভাবেব সমাধান করা হয় ।
- (২) মানুষের ছয় শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করিবার প্রথম ও প্রধান সোপান মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা । মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় ; মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না ।
- (৩) এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগেব অথবা স্থলভাগের কোনও অংশের সর্বাবয়বিক কার্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্যের সমতার অভাব না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা সর্বতোভাবেব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় ; এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসেব, অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন একটা অংশের সর্বাবয়বিক কার্যের সমতার অভাব হইলে মানুষের স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা তা' দূরের কথা স্বাস্থ্যগত প্রয়োজন পর্যন্ত আদৌ পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না ।
- (৪) এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের সর্বাবয়বিক কার্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্যের সমতা বিদ্যমান থাকা—যে যে নিয়মে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ।
- (৫) যে যে নিয়মে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাস, জলভাগ ও স্থলভাগ স্বতঃই উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, সেই সেই নিয়মের কোনরূপ ব্যতিচার যদি কোন মানুষ না করেন তাহা হইলে অল্প কোন কারণে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা স্থলভাগের কোন অংশের সর্বাবয়বিক কার্যের ও খণ্ডাবয়বিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব হইতে পারে না ও হয় না ।

প্রথমতঃ, মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য ছাড়া এই

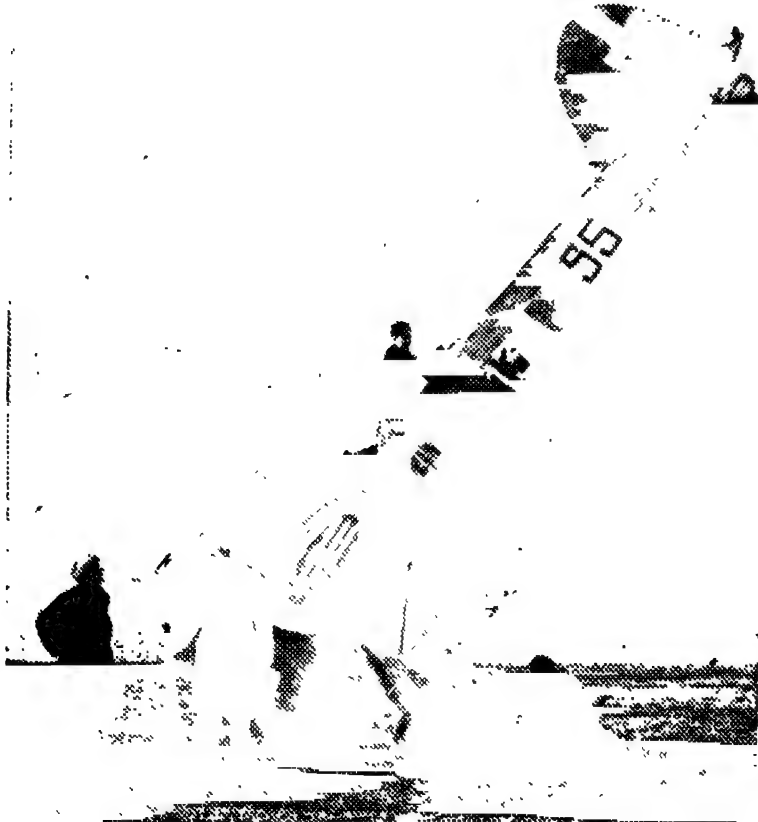
ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশের সর্বাধিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব হইতে পারে না এবং কোন মানুষ যত্বপূর্ণ প্রকৃতিবিকল্প কোন কার্য না করেন তাহা হইলে এই ভূ-মণ্ডলের আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের কোন অংশের সর্বাধিক ও খণ্ডাবিক কার্যের সমতার কোনরূপ অভাব হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের সর্বাধিক ও খণ্ডাবিক কার্যের সমতার অভাব না হইলে মানুষের সর্ববিধ স্বাস্থ্য সর্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয়।

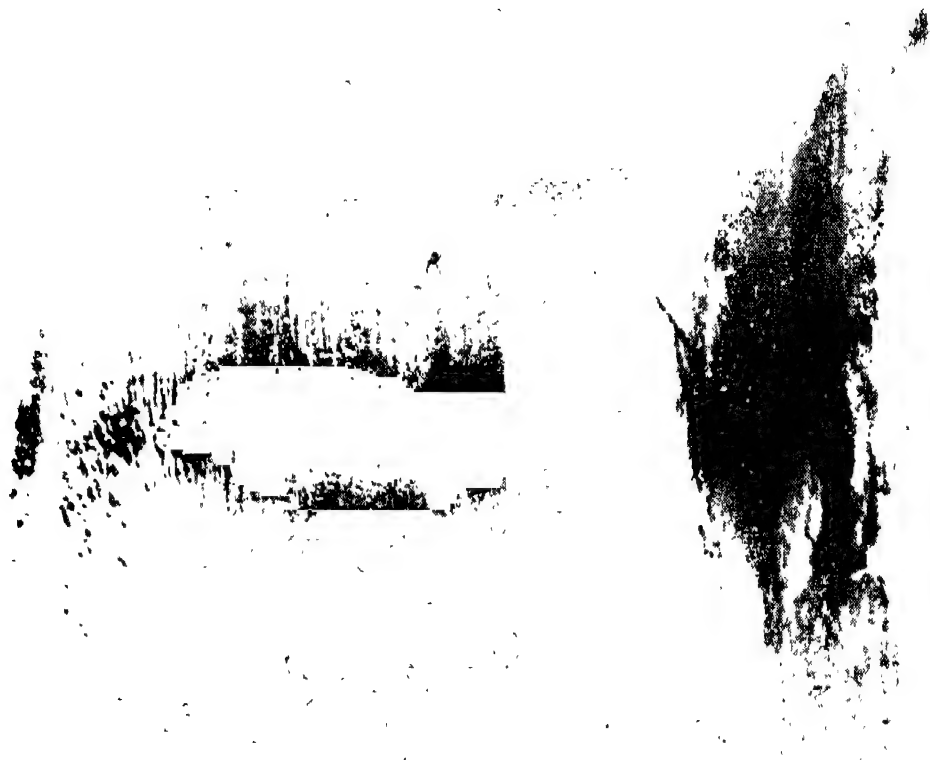
তৃতীয়তঃ, মানুষের সর্ববিধ স্বাস্থ্য সর্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইলে মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয়।

চতুর্থতঃ, মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে স্বতঃই মানুষের অভাব-সমস্তা সর্বতোভাবে সমাধান করা হয়।

উপরোক্ত এই চারিশ্রেণীর যুক্তিবলে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের অভাব-সমস্তা সর্বতোভাবে সমাধান করা মানুষের সাধ্যাস্তর্গত ও সম্ভবযোগ্য।



বিধ্বস্ত বিমান



বঙ্গশ্রী

আদ্যম বর্ষ

কার্তিক, ১৩৫১

১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মাতৃপূজার লগ্ন হয়েছে শেষ,—

পূজাপ্রাপ্ত মৌন নীরব, বন্দনা নিঃশেষ ;

বেশ-চণ্ডীর মন্ত্র-গীতালি বাতাসে হয়েছে হারা,

পঞ্চপ্রদীপে ঘুতালোকছটা আঁধারে ডুবিয়া সারা ।

জনসমাবেশ কল কলরব নীরব হয়েছে আজি

বাজে না শব্দ, শুভ মঙ্গল বাত গুঠে না বাজি'—

সবার অশ্রুজলে

মাটির প্রতিমা বিদায় নিয়াছে নিশীথে নদীর তলে,

মুক্তিকা বাহা ধুয়ে গেছে তাহা, বর্ণ গিয়েছে গলি'

মাটির যেটুকু, মাটি হয়ে গেছে—সোণা বাহা আছে লি' ।

জননী নহে ত স্ময়,

এই স্বদেশেরই মাটির নাঝারে মা'টি মোর অক্ষয়,

সম্মানে তাই মুক্তিকা ছানি' মাকে দিতে চায় রূপ

মাটির দেউল যত্নে-বেড়িয়া জ্বলে সে গন্ধপুপ

জন্মের মাটি, মরণের মাটি, সারাজীবনের মাটি

এ মাটিরই মহাপ্রসাদের কণা সকলে নিয়েছে বাটি' ;

সবার মাঝারে সকলের ল'য়ে জননী লভেছে রূপ

ধূলার ধূসর মরু-সংসারে বিচিত্র অপরূপ ।

অসুরদলনী বেশে

তাই দশহরা দুর্গাতিহরা দুর্গা ঠাঁড়ালো এসে ।

আজিকে চিনেছি ঠিক

এ মনোহরী কস্তুর লাগি' আমি যে পৌত্তলিক !

কোটি রূপ আর লক্ষ আকারে বিধে বিকাশ যার

নব নব রূপা মায়াবী বহু কি সত্যই নিরাকার ?

যেটুকু পেরেছি, বাহা ফুটিয়াছে সপ্ত ভুবন ভরি'

আকাশে, চন্দ্রে, সাগরে গিরিতে দিবা আর বিভাবরী,

কূলে ও অকূলে, অনলে অনিলে, ব্যোমে আর চরাচরে

সব ঠাঁই ভরি' রূপের মুকুল ফুটে আছে ধরে ধরে ।

মাটি আছে তাই আকাশ সাগর দুলিতেছে তারে ঘিরে

অরূপ আসিয়া রূপে হ'ল হারা, রূপ ভাগে-হুটি তীরে ।

আলো-আঁধারের জানা-অজানার খুঁজে নাহি পারে পাই,

আকারে বিকশি সে রূপের শলী একবার ছুঁয়ে বাই ।

বাহার বেড়াবে কুচি

রূপাতীত রূপ আঁকিয়া কিরি গো,—রং দেই আর মুচি ।

যে মাঝার পট মাটি ছিল কাল, দশমী লগনে গলি'

বিসর্জনের প্রান্তে আজি তা আলোকে উঠেছে জলি'

যে মলিন কালো ধূলার ঝাঁড়াল কালোবর্ষি ছিল বাঁচি ;

সে কুহেলীজাল ছিন্ন আজিকে, সত্যকে জানিয়াছি ।

অশ্রুমোচন তুলি'

মাহুদের মাঝে যে দেবতা আছে তাহে লই বুকে তুলি' ।

প্রতি মানবেরে প্রণতি জানাই, প্রতি ঠাঁই রাখি নতি

আজি শুভদিনে সকল সৃষ্টি লভুক পরমা গতি ।

বৈরিতা নাই কারো সাথে আজ বিরোধ কাহারো সনে

বিশ্ব মানব-মনের পরিধি ছুঁয়ে বাই মনে মনে ;

নিখিলের মাঝে যে আছে যেথায় কাবো সাথে ঘেঁষে নাই

মিলিত মানবে পঙ্কি-মানব নিঃশেষ করে বাই

নবীন আলোকে নতুন উষায় চাহি সব মুখে মুখে

জনে জনে আজ কনি কোলাকুলি, ভালোবাসি বুকে বুকে ।

একেব লাগিয়া অপবেব স্নেহ-অশ্রু-সলিলে ভিজি'

নবীন সাম্য জন্ম লভুক নব মমতার বীজে ।

তাঁহেই জয়গান আজি বিজয়ার উৎসবরূপে গাই,

আত্মীয় সাথে আত্মা মিলায়ে বিধে মিলিব ডাই ।

—মাহুদ আজিকে মিলন লভুক—শক্তি, আত্মা, বল,

নব জ্ঞানালোকে ফুটুক তাহার সাধনার শতদল ;

সাহিত্যে আর শিল্পে লাগুক নবীন আলোর ছোঁয়া

তার সংসার-তপোবন হোক শান্তি-সলিলে ধোয়া ;

যজ্ঞ-বিনাসী তাড়কা নিধনে জাগুক শক্তিদর

রক্ষ-বিনাশী রাম লক্ষণে ভরে যাক তার দর ।

অনাথেরা আজি আশ্রয় পাক, অন্তচিরা হোক শুচি

নিঃশ্র আজিকে জাহ্নুক তাহারে বিশ্ব নিয়াছে খুঁজি,

অত্যাচারের হোক অবসান উৎপীড়নের জয়—

করিব শপথ, আজি হ'তে যেন পৃথিবীতে নাহি হয় ।

কামনা জিনিয়া নিকাম হোক সত্যের পরিচয়

মরজগতের নিষ্ঠুর রণে মাহুদের হোক জয় ।

আজিকে বাহার আমাদের মাঝে আছে, অগ্নি বাহা নাই

সবারই আত্মা হউক তৃপ্ত আর কিছু নাহি চাই ।

আজ বিজয়া দশমী। তিন দিনের অহোরাত্রব্যাপী আনন্দোৎসবের পর আজ অন্তরের কিয়দংশ শূন্য মনে হচ্ছে—মনটা যেন “ফক্ ফক্” করছে। কিন্তু এখনও আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব অনুভূত হয় না। সে-আনন্দের জের আবার সন্ধ্যা থেকে উথলে উঠবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আনন্দাশ্রয়ী বিগলিত হ'বে। এই ভাব আমাদের চিরান্তক, আমাদের মজাগত। মায়ের আগমনের মাসাধিক পূর্বে থেকেই আমরা তাঁর প্রতিমাদর্শনের প্রতীক্ষায় আনন্দ অনুভব করি। বালক-বালিকাগণ প্রথমতঃ নূতন বস্ত্র ও নূতন পাছকা পাবার আশায় উৎসাহিত হয় এবং প্রাপ্তিমাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এ-আনন্দ নিরঞ্জন পর্যাপ্ত স্থায়ী হয়। যারা আত্মীয়স্বজনবিরহিত হয়ে চাকরী উপলক্ষে বিদেশে থাকেন, তাঁরা স্ব স্ব ভবনে আস্বাদ আশায় ও মিলনপ্রতীক্ষায় আনন্দিত হ'ন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। কেউ কেউ দীর্ঘ অবকাশলাভে আনন্দিত হ'ন এবং কেউ কেউ স্থান-পরিবর্তনের (change) আনন্দ লাভ করেন। পুজাবিকাশের পূর্বে কেউ কোথাও বাইরে যাবেন কি না—কোন স্থানে যাবেন—বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে এই প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয়। ভিক্ষা বাদের জীবিকা অথবা বর্তমান দুর্দিনে যাবা বাধ্য হ'য়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে, তা'রাও অধিক পরিমাণে ভিক্ষালভের আশায় আনন্দিত হয়। বৈদিক দিগেই ত'ক, মাগের আগমন উপলক্ষে একটা টানা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হ'লেও ভাড়াবিস্তারী পন্থায় সে স্রোত বহিতে থাকে।

মা! শব্দে তোমার দশভূজা মূর্তির আবির্ভাবে আপামর সাধারণ বাঙ্গালীর প্রাণে পরম আনন্দের উচ্ছ্বাস আসে। যারা বাঙ্গালার বাইরে থাকেন তাঁরাও সমবেতভাবে বিদেশে পুজা আয়োজন করেন এবং উৎসবের ও পূজার আনন্দে মগ্ন হ'য়ে যান। এ-পূজার আনন্দ বিশ্বব্যাপী বা ভাবতথ্যাপ্য না হ'লেও বঙ্গব্যাপী, সে-বিসয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মা, এ-বস্তুসংগত আনন্দ দুঃখ মিশ্রিত। যাবা অনগনে বা অর্ধাঙ্গনে বসবেব অসিদ্ধাংশ দিন যাপন করে, যাবা পুরুষজাগকে পেট ভরে আহার দিতে অসমর্থ, লজ্জানিবারণে ভক্ত সামাজ্য আচ্ছাদন সংগত কববার ক্ষমতা যাদের নাই, তা'রা পুজার সময়ে নূতন বস্ত্র কোথা থেকে সংগ্রহ করবে, বিশেষতঃ, যখন বস্ত্রের মূল্য পূর্বাগেক। চতুর্দশেরও অধিক? কেবল বস্ত্রের মূল্য নয়, এমন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য নাই—যার দাম চতুর্দশের অধিক বেড়ে উঠে নি। যারা ক্ষুধার আহার জটীতে পারে না, রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অক্ষম, যা'দের অল্প, শীর্ণকায়, ব্যাধিজর্জরিত সন্তানগণ হয় ক্ষুধার ভাড়নায়, নতুবা ব্যাধিজর্জরিত কখনো জনকজননীর হৃদয়ে নিরন্তর কঠিন শেলাঘাত করছে, তা'রা নূতন বস্ত্র সংগ্রহ করবে কিভাবে? তা'দের প্রাণে আনন্দ আসবে কেমন করে মা?

আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী শাসনকর্তারা অনেক জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে Standard price বেধে দিয়েছেন, কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশতঃ যে-জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা'ই বাজার থেকে উবে যাচ্ছে; ৪৫ গুণ অধিক দাম দিতে না পারলে তা' বাজারে পাওয়া যায় না। আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মূল্যনিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যবিপণনের “Black Market” সৃষ্ট হচ্ছে। দৃষ্টির হয়ত, ভুল আছে এবং দুর্ভাগ্যও আমাদের, কিন্তু, কারও বুদ্ধির বা কণ্ঠকোশলের দোষ আছে কি না সে-বিচার আমাদের সাধ্যাতীত হ'লেও, দোষ বা ত্রুটি তোমার অবদিত নয়। সময়ে তুমি অবশ্য এর বিচার করবে।

গত বৎসর বাড়লায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে কালকবলিত হ'য়েছে, জিনিসনি, এ-কথা ত তোমার বিদিত—তোমার দৃষ্টির অন্তরালে ত সংসারে কোন ঘটনা সজ্জাটি হয় না। যে-দেশের উৎপন্ন শত্রুজাত সমগ্র পৃথিবীর খাদ্যসমতা-সমাধানে সক্ষম, সে-দেশে দুর্ভিক্ষ! সে-দেশের লোক অনাহারে মরে! এদিকে শুনি, কষ্টপক্ষ কষ্টক সংগৃহীত ও বস্ত্রের কোন কোন স্থানে রক্ষিত রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য পচিয়া পুতিগন্ধময় ও বিষবৎ আহারের অমুপযোগী হওয়াতে প্রকৃত আবর্জনার মত আবর্জনা-রূপে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। আরও শুনি যে, যথাকালে এই পূর্বা-সংকীর্ণ খাদ্যগুলি বস্ত্রবাহারে লোককণ্ড অনেক পরিমাণে নিবারিত হ'ত। এ-বিষয়েও যদি কারও বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির দোষ বা অদূর-দর্শিতা অথবা নিকরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিচার তুমিই করবে মা—এ-বিচার আমাদের হৃদিকাব বহির্ভূত।

এ-দুর্দিন কেবল বস্ত্রের নয়, কেবল ভাতের নয়; সমগ্র পৃথিবীতে একটানা নিব্বারণীকৃত নত এই দুর্দিনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, যদিও নিয়ন্ত্রণবিধির তাবতম্য অমুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর উৎকটোর তাবতম্য পবিদৃষ্ট হয়। কারণের অনুসন্ধান করতে গেলে মকলের কাছে একই উত্তর পাওয়া যায়—বর্তমান বিশ্ব-ব্যাপী সংগ্রাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যে সমরানল প্রজলিত হ'য়েছিল, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্যতঃ নির্দোষ হ'লেও তার ক্ষুণ্ণ-বশেষ জায়াণীকৃত অস্ত্রবে বস্ত্রনান ভিল এবং সে-সমর-প্রসূত কৃ-ফলের তিক্ত আহার রসনা থেকে নিরাকৃত না হ'তে না হ'তে প্রবৃদ্ধিত হ'য়ে বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করেছে এবং তার লেলিহান জিহ্বা সনস্ত জগতে প্রসারিত হয়েছে। পূর্বযুদ্ধের ফল ভারতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করলেও সে-যুদ্ধ তার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়নি, কিন্তু বর্তমান সময়ে তার বস্ত্রের কিয়দংশ আক্রান্ত হ'য়েছিল এবং নিপক্ষবাহিনী এম্বাণ তার দ্বারের অনতিদূরে অবস্থান করেছে। লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক সৈন্য ভারতবর্ষের তীব্র অঙ্গে উপনীত হ'য়েছে। তাদেরও স্থানীয় সৈন্যগণের অশন-বসনাদির সরবরাহকল্পে কষ্টপক্ষ একরূপ ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত, এমন কি দিশাহারা হ'য়ে পড়েন যে, বেচারি দেশবাসীগণের পানে ভাল করে তাকাবারও অবকাশ পেলেন না। আইন-কানুনে শৃঙ্খলে তা'রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, না খেয়ে মরলেও তাদের মুখ ফুটে কথা বলবারও উপায় নাই। তা' যদি থাকত, দেশে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকত এবং তারা না খেয়ে মরত না এবং সঞ্চিত খাদ্য পশুপাখি হ'য়ে আবর্জনারূপে নিক্ষিপ্ত হ'ত না। অতিথি-

সংকার ভারতবাসীর ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট; যে বিদেশীয় সৈন্য-বাহিনী ভারতরক্ষার জন্য উপস্থাপিত, তাদের আমন্ত্রণ ও উপস্থিতি অথবা সময়-প্রচেষ্টা ইচ্ছামূলক হ'ক না হ'ক, তাদের যথোচিত সংকারের জন্ত ভারতবাসী স্বার্থভ্যাগে পরাধীন হ'ত না, কিন্তু, হাত তুলে কিছু দেবার অধিকার বা সামর্থ্য কি তার আছে? অবশ্য কর্মকর্তাদের বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির দোষে যদি কোন কাণ্ড-বিশৃঙ্খলা ঘটে তার জন্য দায়ী যিনিই হ'ন, ফলভোগ করে সেই হেচারাগণ।

এইরূপ যুদ্ধের সূত্রপাত হয় কিসে? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যে এর উদ্দেশ্য নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য, কারণ যে-দেশে এ-যুদ্ধের সূত্রপাত সেই ভাষাণী স্বাধীন দেশ। কেউ কেউ বলতে পাবেন যে, পররাষ্ট্রবাসী স্বাভাবিক কল্যাণ বা উদ্ধারের নিমিত্ত এ-যুদ্ধের আয়োজন, কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্যের ভিত্তি স্বভাবের প্রতি সহায়ত্বিত ও প্রেম। বার হুদয়ে এই ভিত্তি স্থাপিত, সে কি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যেতে এবং লক্ষ লক্ষ নারীকে পতিপুত্রহীনা বা পিতৃভাতৃবিহীনা করিতে প্রয়াসী বা অভিলষী হ'তে পারে? কোটি কোটি নরনারীর দ্বারা একটি সমগ্র জাতি গঠিত হয়। যে জাতির মঙ্গল কামনা করে, জাতি-ভুক্ত প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ তার কাম্য এবং প্রত্যেকের অর্থ বিষয়ে, বাসস্থান বিষয়ে ও খাদ্য বিষয়ে স্বাধীন ও সন্তোষ লাভ তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এতদ্বিষয়ে যখন স্বদেশজাত দ্বন্দ্ব দ্বারা সকলেব স্ববিধি অভাবের পূরণ অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন বিষয়গুলি জটিল সমস্যা পরিণত হয়। সুতরাং বলতে হয় যে, খাদ্যসমস্যা এই যুদ্ধে মূলভূত, অন্ততঃ, অজ্ঞান অথবা প্রধানতম কারণ। কিন্তু, বয়স্কন এ-বিষয়ে অবগত হ'লেন? বয়স্কন এই সমস্যা-সমাধানের প্রবৃত্তি উপায়-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে চিন্তা করেন? তারা এই যুদ্ধের প্ররোচক বা নিয়ন্ত্রক, এ-চিন্তা কি কালের মস্তিষ্কের প্রবেশদ্বারে আঘাত করেছে? এই উপায় নির্দ্ধারণে উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়মতিতা তাঁদের আছে কি না, এরূপ প্রশ্নের উত্থাপন প্রথমতঃ আমাদের অধিকার বর্ধিত, দ্বিতীয়তঃ অশোভন। অধিকন্তু, তাঁরা এমন আত্মাভিমানী যে, কোন বিষয়ে অপবেদ সাহায্য বা উপদেশ গ্রহণ করতে গেলে তাঁদের ভাষা-মধ্যাদায় আঘাত লাগে। শুনা যায় যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রশ্নে বলা বিষয়ে চীনের সাহায্যপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের হস্তচ্যুত হ'ল, আর এখন “ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরবাব” ব্যবস্থা হ'য়েছে। এরূপ ব্যবস্থা যে রহ ক্লেমসাধ্য এবং বহু ব্যয়সাধ্য তা বলা নিশ্চয়োজন। এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের স্বতঃই উদ্ভব হয়: যখন জাপান, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি “গালে চড় মেঘে কেড়ে নিলে,” তখন কি, মা, তোমার বাহনের জাতি “নাকে সরসের তেল দিয়ে” নিভৃত গহ্বরে নিহিত ছিল? চারিদিক থেকে রক্ত শোষণ করে যে রক্তগণের ও রক্ত-কাণ্ডের বিধাতৃবর্গের পেট ভরানো হয়, তাঁদের কর্মদক্ষতা কি তত্ত্বের পর্দাবসিত হ'য়েছিল। কতরাং হয়ত উত্তর করবেন যে, জাপান বিশ্বাসঘাতকতা করে রক্তার্থে নিয়োজিত নৌবহর ধ্বংস করায় সিঙ্গাপুর প্রভৃতির রক্ত অসম্ভব হ'য়েছিল। জাপানের যুদ্ধ-

পরিকল্পনা ত অবিরত ছিল না, তবে বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত প্রস্তুত হ'ওনি কেন?

যুদ্ধ-সমাধানের জন্ত এখন বোধ হয়, সকলেই উদ্বেগী, কিন্তু হেঁদে পড়বার সম্ভাবনা থাকলেও কেউ সহজে মচকাতে চায় না। অধিকন্তু, কর্তাদের অবস্থা ‘সাপের ছুঁচো গেল’ মত হ'য়েছে, কারণ, খাদ্যসমস্যার সমাধান না হ'লে যুদ্ধসমাধানে স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হ'বে না—এটুকু তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

এই মহাসময়ের জন্ত দায়ী কে? সকলেই একবাক্যে বলবেন,—হিটলার। জাপানকে স্বীয় মতালম্বী করে প্রাচ্যেও তিনি যুদ্ধ বিস্তারিত করেছেন। স্বদেশের খাদ্যসমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে যদি তিনি এরূপ উৎকট পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, যদিও সে-উদ্দেশ্যকে মন্দ বলা যায় না, তথাপি বলতে হ'বে যে, প্রথমতঃ, তিনি অহুদার, স্বার্থপর ও স্বকীয়দৃষ্টি; সমস্ত জগতের খাদ্যসমস্যার সমাধানকে দৃষ্টিপথে রাখা উচিত ছিল; দ্বিতীয়তঃ, সে-সমাধানকল্পে তিনি যে-উপায় অবলম্বন করেছেন তা নৃশংস এবং সর্বতোভাবে নিন্দনীয়—দানবের উপযুক্ত। এই বিরাট যুদ্ধের জন্ত যে-পরিমাণে ধনসম্পদ ও লোকসংখ্যায় আসছে, যথার্থ-রূপে নিয়োজিত হ'লে তাঁদের সহায়তায় প্রচুর খাদ্যের উৎপাদন এবং খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভব হ'ত। হিটলারবৃদ্ধিত মহা-সমর কেবল স্বদেশের খাদ্যসমস্যা-সমাধানমূলক নয়, পরন্তু, ঈর্ষ্যা-মূলক, দুরাকাজ্জামূলক।

দানবদলনি! কয়েক বৎসর বিজ্ঞান দিনে তোমার চরণে কাতর প্রার্থনা করছি যে, এই দানবকে শাসন কর, কিন্তু তুমি কর্ণপাত করছ না কেন মা? জানি, ইচ্ছাময়ি, তোমার ইচ্ছা না হ'লে, সময় উপযুক্ত বিবেচিত না হ'লে তুমি কোন কার্য কর না, কিন্তু, মা, অনাহবে মৃত্যুবরণী মানুষের আর্ত, ক্ষীণ প্রার্থনা, পহিহার, সন্তানহারা নারীর করুণ রোদন, অসহায় রোগীর কাতর অমুযোগ যে আমাদের সন্তিস্তার সীমা অতিক্রম করেছে। আমাদের শক্তির, আমাদের বৃত্তির, আমাদের অমুভূতির সীমা আছে যে মা! পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করতে ভিক্ষুকের লজ্জা হয় না। মায়েব কাছে সন্তান, প্রয়োজন হ'লে, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ক'বে থাকে। তাই, যখন সমগ্র পৃথিবী এই দানবের নৃশংস কখনীতির ফলে ভয় ও প্রপীড়িত, তখন আবার প্রার্থনা করি—

দেবি প্রপন্নর্ভিহরে প্রসীদ

প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্

ভূমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।

তুমি যে নিখিল বিশ্বের জননী! তোমা ভিন্ন কে বিশ্ব রক্ষা করবে, কে বিশ্বের দুঃখ মোচন করবে? নির্ধ্যাতিত সন্তান যে, মা বলেই কাঁদে। বৎসরান্তে যখন তোমার পুনরাগমন হবে, তখন যেন এ-সকল করুণ দৃশ্য আর দেখতে না হয় মা।

তোমার পাগল ছেলে “ধান ভানতে শিবের গীত” অনেক গেয়ে গেল মা! কিন্তু, পাঠক-পাঠি পাগল কমা করুন আর নাই করুন, তুমি তাঁকে কমা করবে নিশ্চয়। পায়ে বাধ মা! আনন্দময়ি, বিশ্বের আনন্দবিধান কর মা!

ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

ঐযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের নূরু আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব ও প্রতিপত্তি পরিকল্পিত ও পরিচালিত আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় চুক্তি করার ও স্বীকৃতি-সম্মতির সন্ধি-বন্ধনীয় বজ্রবন্ধনে আট-পৃষ্ঠে বাঁধবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। ভারতসম্রাটের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব ভারতকে সাম্রাজ্যের সভ্যতায় “পূর্ণ পরিভোষের” (Full satisfaction within the Empire) প্রলোভন দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতসচিব আমেরী সাহেব বিলাতে রপ্তানী-আলোচনা সভার (Institute of Export) এক অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির ধারার ইঙ্গিত করিয়াছেন! এই অধিবেশনে কলিকাতার খেতাজ-পরিচালিত সংবাদপত্র ‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্যার এলফ্রেড্ ওয়াটসন্ সাহেব “যুদ্ধান্তে ভারতের সহিত বাণিজ্য” শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দূরদর্শী প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা স্যার এলফ্রেড্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষ ও চীনে বিপুল পরিমাণে বিক্রয়-ক্ষেত্র হইবে,—যদি উভয় দেশের জীবনযাত্রার ধারাকে উন্নত করা যায়। এই ‘যদি’ অবশ্য একটি বিবম ‘যদি’।

স্যার এলফ্রেড্ উদার হৃদয়ে উপদেশ দিয়াছেন যে, ভারতে প্রবাসী বৃটনকে ভারতবাসীকে তাহার সমকক্ষ (equal) এবং নিজেকে অভ্যাগত (guest) মনে করিতে হইবে। তিনি ভারতবর্ষে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বজাতীয়েরা যুদ্ধোত্তর ভারতে এমন কোন বিশেষ অধিকার আকাজকা করিবেন না,—যাহা অজ্ঞ উপভোগ করে না। সুসমাচার সন্দেহ নাই। ভারতের কর্ণধার হুনা সাম্রাজ্যবাদী আমেরী সাহেবও বন্ধ বিতৃত করিয়া উদাত্ত-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার দেশবাসীকে এখন হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে, যুদ্ধ-পূর্বে বৃটেনের বহির্বাণিজ্য, যে সকল প্রধান প্রধান পণ্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল, যুদ্ধান্তে প্রায় সমস্ত জাতিই সেই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে; সুতরাং তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে এবং উৎপাদন-কুশলতার তাঁহারা যে বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তৎপ্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে হইবে; ব্যয়সাধ্য মুখ্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত (Installation of capital plant) করিতে হইবে; এবং অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বিক্রয়-কৌশল (salesmanship), বিশ্বাসযোগ্য সত্যতা (Reliability) এবং মাল প্রদানের কিপ্রকারিতার (promptness of delivery) উপর নির্ভর করিতে হইবে। বস্তস্ত, পরস্পর সাহায্যকারী পরিচর্যা (Co-operative service) দ্বারা প্রত্যেক দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যোগাইতে হইবে।

আমেরী সাহেবের মতে ভারতের সম্পর্কে এই নীতি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, একটি বিশাল শিল্পাত্মক দেশে রূপান্তরিত হইবার উপযোগী কাঁচামাল, তড়িৎশক্তি এবং লব্ধকূলতা প্রচুর পরিমাণে ভারতে প্রস্তুত (Latent) রহিয়াছে।

আর্থিক উন্নতির দ্বারা জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার নিমিত্ত সর্বপ্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণ প্রত্যেক দেশভক্ত ভারত-বাসীর একান্ত কাম্য। ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই আকাজকা পরিপূরণের কালে ভারতের আমদানী বাণিজ্যে প্রবৃত্ত পরিবর্তন ঘটবে। বৃটিশ বহির্বাণিজ্যের পক্ষে এই পরিবর্তন প্রতিকূল হইলেও, পরিতাপের বিষয় নহে। পরন্তু, অস্ত্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অগ্রাধি এই পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, সর্বোৎসাহে সম্যক্ সম্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে।

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারতবাসীর আশা-আকাজকার সহিত সঙ্কল্প সহযোগিতা করিবার প্রথম ও প্রধান সূত্র হইবে ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টাসম্বৃত মূল ও স্থূল কলকারখানার যন্ত্রপাতি, কলকল্লা ও সামগ্রিক সম্ব্যবহার। তৎপরে, ভারতের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ বিশিষ্ট ভোগ্য ও ভোজ্যদ্রব্যের (Consumers' goods) সম্ব্যবহার। এই কার্য্যবাহ, ভারতকে বৃটেন যে পরিমাণ সঙ্কল্পমতর সহিত শিল্পোন্নয়নের সাহায্য করিবে, ভারতের সহিত বাণিজ্যে ও তাহার তদনুরূপ সাফল্যলাভ ঘটবে! যেক্ষেপেই হউক, ভারত যে বৃটেনের মূলধন ও পণ্যের সুরক্ষিত বিক্রয়-ক্ষেত্র, এ-ধারণা সম্মলে বজ্জন করিতে হইবে। এবিষয়ে বৃটিশ প্রভুত্বের নিদর্শন মাত্র থাকিবে না,—না প্রচ্ছন্ন, না প্রকাজ। এ যেন ভূতের মুখে রামনাম! এ দরদর এ-সঙ্কল্প সহযোগিতার আশ্বাসবাণীর নিগঢ় কারণ কি?—উদ্দেশ্যই বা কি?—তাহাই আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে।

আমেরিকার সহিত ইংল্যান্ডের এখন অত্যন্ত সম্প্রীতি। এই প্রণয় জাতিস্ব অপেক্ষা যুদ্ধের প্রয়োজন এখন অত্যধিক। মার্কিনের ইজারা-ঋণ সাহায্য ব্যতীত বৃটেনের যুদ্ধোত্তম বর্তমানের পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এই সূত্রে যুদ্ধোত্তর ব্যয়সা-বাণিজ্যের পরস্পর-সাপেক্ষ পরিচালনা হেতু, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সম্মতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারত ইজারা-ঋণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতবাসীর নির্দ্বিধাতিশয্যে মার্কিনের সহিত ভারতের একটি সরাসরি চুক্তি অপরিহার্য্য হইয়াছে। মার্কিন ভারতে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে, ইজারা-ঋণ-আফিস খুলিয়া বসিয়াছেন। ভারতের সহিত ভারতের কল্যাণার্থ নিষ্পার্থভাবে শিল্প-বাণিজ্যে সহযোগিতা করাই মার্কিনের এখন প্রকাশ্য নীতি। আটলান্টিক সন্দেশের সহিত ইহার কোন মুখ্য অথবা গোণ সংযোগ আছে কি না, তাহা এখন প্রচ্ছন্ন। স্বার্থ-সংগ্রহে হউক, অথবা নিষ্পার্থ পরহিতৈষণা হেতু হউক, আজ যেখানে যুক্তরাজ্যের একাধিপত্য, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্য-বিস্তারের ফলে, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও যে বৃটেনের, আধিপত্য না হইবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ধর্ম হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাস্তি।

যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার-প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে, যুদ্ধ-পরিহিত্তি, যুদ্ধের বিরূপ অবসান ঘটবে তাহার এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রভৃতি শক্তিশালী দেশসমূহের আর্থিক, অর্থনৈতিক

এবং শুকসংক্রান্ত নিয়ম-নীতির উপর। এই নিমিত্ত এখন হইতেই, প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে, কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সম্পর্কে, সর্বপ্রথমেই উদ্বোধনযোগ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের সমবায় প্রচেষ্টা। সম্প্রতি বিলাতে প্রখ্যাতনামা অর্থ-নীতিবিদ লর্ড কীনেস্ যুক্তরাজ্যের তরফ হইতে একটি আন্তর্জাতিক নিকাশ-নিষ্পত্তি-সম্মিলন (International Clearing Union) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান কায়া করিবে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের শীর্ষ একক “ব্যানকর” (Bancor) দ্বারা। বৃটিশ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার এবং তৎসাহায্যে সহযোগী দেশ-সমূহে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারার সমুন্নতি সাধন। মার্কিনেও ইহার অনুরূপ পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিয়াছেন,—রাষ্ট্র কোষাগারের কর্মসচিব মিঃ মর্গেনথো। এই পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের শীর্ষ একক “ইউনিটাস্” এবং কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের নাম, আন্তর্জাতিক স্থৈর্য্যসম্পাদক ভাণ্ডার (International Stabilisation Fund); ইহার উদ্দেশ্য, ভাণ্ডারের সভ্যশ্রেণীভুক্ত দেশসমূহের মুদ্রাপ্রকরণের স্থৈর্য্য-সম্পাদন এবং ইহা সাধিত হইবে ভাণ্ডার কর্তৃক একটি নির্ধারিত হারে সভ্য-তালিকাভুক্ত দেশসমূহের মুদ্রাপ্রকরণের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা। ভাণ্ডারের সম্মতি ব্যতীত কোন মুদ্রাপ্রকরণের হারের পরিবর্তন ঘটিতে পারিবে না। কদাচিৎ কোন চরম পরিস্থিতি হেতু প্রচলিত বিনিময়-শাসনের (Existing exchange control) পরিহার ঘটিতে পারিবে কিন্তু ভাণ্ডারের সম্মতি ব্যতীত নূতন শাসনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একই,—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের সমবায় সাধনপূর্বক বিনিময়-হারের স্থৈর্য্য সম্পাদন। আন্তর্জাতিক মুদ্রাপ্রকরণের বিনিময়-হার স্থিতিশীল হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য দৃঢ় হয়। কিন্তু প্রবলের সহিত দুর্বলের সংযোগে দুর্বলেরই হানি ঘটে, সুতরাং এই সমবায় সম্পাদিত হইলে, পরাধীন ভারতের যে বিশেষ সুবিধা হইবে না, তাহা নিশ্চিত। কেন, তাহা বলিতেছি।

এই সমবায়ের সঙ্গে সঙ্গে লর্ড কীনেস্ একটি আন্তর্জাতিক পণ্য-ভাণ্ডার (International Commodity Pool) প্রতিষ্ঠার কল্পনা পরিপুষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং কাঁচামালের একটি সমষ্টিগত মজুত সংস্থান প্রথা (A system of reserve Pools) প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন মার্কিনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ হারবার্ট ফিস্। এই আন্তর্জাতিক প্রত্নত্বের (International Authority) অধিকার হইবে উৎপাদন, অবশ্য প্রয়োজনানুযায়ী; প্রতিপক্ষের মূল্য প্রদানের সামর্থ্যানুযায়ী নহে। প্রধানতঃ কাঁচামাল সরবরাহকারী ভারতের পক্ষে এই প্রস্তাব সঙ্কট-সঙ্কুল। মার্কিনের জাতীয়-সম্পদ-পরিকল্পনামণ্ডলী (National Resources Planning Board) এবং অর্থনৈতিককল্যাণ সম্পাদকমণ্ডলী (Board of Economic Welfare) কিছুদিন হইতে একটি আন্তর্জাতিক উন্নতিবিধায়িনী সমিতি (International Deve-

lopment Corporation) এবং আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নতিবিধায়িনী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টায় নিয়ম আছেন। এই সকল পরিকল্পনার বিচার-বিবেচনার নিমিত্ত অচিরে ওয়াশিংটন নগরে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক বসিবে। সম্প্রতি মার্কিনের ভার্জিনিয়া নামক স্থানে জগতের খাদ্য সরবরাহ (Food Supplies) সম্পর্কে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধাবসানের প্রথম বৎসরে বহন-শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির (Textile Supplies) বটন সম্পর্কে আর একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকও অনতিবিলম্বে ওয়াশিংটন নগরে মিলিত হইবে।

ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়কে এই সকল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গৃঢ় উদ্বেগ, বিশেষ যতপূর্বক, অনুধাবন করিতে হইবে। কোন আন্তর্জাতিক কল্পনা কিংবা বন্দোবস্তে ভারত-বাসীর বিরাগ নাই, যদি উহা তাহার অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। ভারতের অবস্থা ও ব্যবস্থা, শিল্প-সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহের অবস্থা ও ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের জনসাধারণ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সমাজ। ভারতের শিল্প-প্রচেষ্টা এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই। অর্থনৈতিক আন্তর্জাতীয়তা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জায় শিল্প-সমুন্নত দেশের পক্ষে হিতকর; এবং ইহা একরূপ স্বার্থ-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল, বাহা ভারতের জায় অসমুন্নত দেশের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। ভারতে এখনও আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রবল। “ভারতীয় প্রতিনিধি” নামে যে সকল মহোদয় এই সকল আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তাঁহারা ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি নহেন; সুতরাং স্বাধীনভাবে ভারতের স্বার্থের অমুকুল মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা বৈরুপ উপদেশ লাভ করেন, তাহাওই প্রতিধ্বনি মাত্র করেন। তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ভারতের জন-মত এবং বিশেষতঃ বণিক সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ না করিয়া, এই সকল আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ সমীচীন হইবে না। আমলাতান্ত্রিক শাসনভঙ্গ ভারতীয় স্বাধীন জনমতের অপেক্ষা রাখেন না। সুতরাং ভারতবাসীকে এই সকল আন্তর্জাতিক সলাপরামর্শ সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের জাতীয় অর্থ ও স্বার্থের প্রতি এই সকল আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধের প্রবন্ধকদের দৃষ্টি “ধাত্রীমাতা” পুতনার দৃষ্টির জায়! নামে আন্তর্জাতিক হইলেও, কার্যতঃ এই সকল বৈঠক ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবে প্রভাবাধিত হইবে।

যুদ্ধের তাগিদে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ এখন বহুলাংশে সমভাবেপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু, এই উভয় স্বার্থ সমর্থনী নহে। বাণিজ্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রাচ্যের বিক্রয়ক্ষেত্রে, উভয় স্বার্থই সম-ভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদগ্রীব। অজ্ঞাত সাপেক্ষ (Reciprocal) বাণিজ্য-অঙ্গীকার-নীতি যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক মূলমন্ত্র। গত এপ্রিল মাসে রাষ্ট্র-সচিব কর্ডেলহাল্ আমেরিকান কংগ্রেসকে জানাইয়াছিলেন যে, এইরূপ ত্রিশটি চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং আরও তিনটি দেশের সহিত এই

সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। অজ্ঞাত সাপেক্ষ বাণিজ্য-চুক্তি আইনের (Reciprocal Trade Act) প্রসার সংকল্পে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধোত্তর জগৎপী-অর্থনৈতিক-পুনর্গঠনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, যুক্তরাষ্ট্রকে এখন হইতেই জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। গত মে মাসে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্মিলিত জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ব্যতীত যুদ্ধে বিরতি স্থায়ী না হইতে পারিবে না। তাহার সহকারী মিঃ সামনার ওয়েলেসও অর্থনৈতিক আক্রমণের (Economic Aggression) নিষ্পত্তি করিয়া বলিয়াছেন, “আমাদের দেশ ও কংগ্রেসের সম্মুখে প্রশ্ন এই যে, আমরা কোন্ নীতি অবলম্বন করিব? ১৯২২ এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক আক্রমণ-নীতি, অথবা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সহযোগ (Corporation) নীতি?” তিনি বলিয়াছিলেন “আমরা, বৃটেন এবং প্রায় অজ্ঞাত প্রত্যেকটি দেশ অকুণ্ঠিত স্বার্থপরতা-কল্পিত অর্থনৈতিক আক্রমণ-দোষে দুষ্ট হইয়াছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশ্রয়-মূলক গুরু-প্রশমন- (Preferences) ইতিহাস, অর্থনৈতিক আক্রমণের ইতিহাস।”

মার্কিনের এই বসন্তাতার উদ্দেশ্য কি? আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণ, অথবা নিছক পরার্থ-পরতা? সম্ভ্রুতি মার্কিন-পরিচালিত বিশিষ্ট পত্রিকা “কার ইষ্টার্ন সার্ভে” একটি প্রবন্ধে ভারতের সহিত মার্কিনের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যসম্ভাবনার আলোচনা করিয়াছেন। এই পত্রিকা বলিতেছেন, “যুদ্ধের পূর্বে মার্কিন রপ্তানী ব্যবসায়ীরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বৃটিশ-প্রতিষ্ঠান-পরিবেষ্টিত ভারতীয় ব্যবসা কেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, এবং ভারতীয় বিক্রয়-ক্ষেত্রে স্বল্প-মাত্র কাংখাবো হুই ছিল। এখন অবস্থা যুদ্ধকালীন চুক্তিগুলি যুদ্ধের পবেও সংরক্ষিত ও বিস্তৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দৃষ্টগোচ্রে। ইতিমধ্যে উক্ত দেশের দরদৃষ্টিসম্পন্ন কারবারীরা ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যসম্পর্কের সুযোগ-সুবিধার আলোচনা করিতেছেন। বর্তমানের পরিণত যুদ্ধোৎসাহ-কারবার হইতে ইচ্ছাদের উৎপত্তি হইবে না। ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার উদ্ভব হইবে, ভারতে বিলম্বিত শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র-মূল কলকারখানায় ব্যবস্থা যত্নপাতি ও শিল্পসংক্রান্ত কাঁচামালের প্রবর্তন হইবে। ভারতে মার্কিন মালের যুদ্ধকালীন আমদানী বিশেষতঃ মূল ও মূল দ্রব্যসামগ্রীর (Capital goods) প্রচলন, শান্তিকালে মার্কিন ব্যবসায়ের প্রধান প্রবর্তনের কার্য করিবে। কলকারখানার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাব-পূরণ ও বিস্তারসাধন হেতু, মার্কিন সাজসরঞ্জামের জোগানও ঐ কার্যে প্রচুর সাহায্য করিবে। “মার্কিন যন্ত্রপাতি” এখন ভারতের প্রধান অবলম্বন। ইতিমধ্যে মার্কিনের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রেরিত মার্কিনের রপ্তানী পণ্যের একুশ মূল্য হইয়াছিল—৩৭৮ মিলিয়ন (নিযুত) ডলার; অর্থাৎ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় নয়গুণ অধিক। এই পণ্যের অধিকাংশই অবশ্য ইজারা-ধর্মী অন্তর্ভুক্ত; তথাপি, বাণিজ্য-পণ্যের পরিমাণ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের ইঙ্গা অবিলম্বিত নহে যে, যুদ্ধোত্তর ব্যবসায়ের

বিপুল বিস্তার সাধন ব্যতীত বৃটেনের জীবন-যাত্রা নির্বাহের উন্নতদ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারেনা; এবং বৃটেনের জায় মার্কিনও যুদ্ধোত্তর তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যকে যথাসাধ্য বিস্তৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প। বৃটেনের প্রশ্রয়মূলক গুরু-প্রশমন-নীতির প্রতি মার্কিনের সহকারী রাষ্ট্রসচিবের তীব্র কটাক্ষ হইতে ইহা অসম্ভব করা কঠিন নহে যে, যুদ্ধোত্তর মার্কিন অটোরা নীতির পরিবর্তন কামনা করিবে। ইহা দিবালোকের জায় স্পষ্ট যে, যুদ্ধোত্তর ভারতের বিক্রয়-ক্ষেত্র লইয়া বৃটেন ও মার্কিনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটিবে। চল্লিশকোটি অধিবাসী সমন্বিত বিশাল ভারতের বিক্রয়-ক্ষেত্র প্রথমে বৃটিশ, পরে বৃটিশ ও জাপানী এবং গত যুদ্ধের সূচনা হইতে বৃটিশ ও জাপানী-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আয়ত্বাধীন হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধের ফলে—ইজারা-ধর্মী বিধানের প্রভাবে, ভারতের বিক্রয়-ক্ষেত্রে মার্কিনের প্রসার-প্রতিপত্তি সম্ভ্রুতি ক্রমবর্ধমান। এই বৃদ্ধির পরিণত একাধিপত্যে পর্য্যবসিত না হয়, তৎপ্রতি বৃটেনের শোন দৃষ্টি স্বাভাবিক। জলুম-জবরদস্তি দ্বারা বাণিজ্য পরিচালনা এখন অসম্ভব; সুতরাং মিষ্ট কথার তুষ্টি করিয়া ভারতের ক্রমশঃ বিক্রয়-ক্ষেত্র আয়ত্ত করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। বৃটেন ও মার্কিন উভয়েই এখন সেই স্তনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৃটেনের প্রতি ভারতের অমুরাগে যে ভাটা পড়িয়াছে, তাহা সর্বজনবিদিত। মার্কিন ইহার গৃঢ় কারণ অমুখাবন করিয়াছেন; এবং সেই জন্তই “কার ইষ্টার্ন-সার্ভে” কাগজ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রবন্ধের শেষে টিপ্পনী করিয়াছেন,—“ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার গতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরিসরের উপর নির্ভরশীল।” একটি বৃটিশ সংবাদপত্র ইহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, “সম্পর্কের শেষ নহে, সংশোধনই ইহার স্বার্থ প্রতিকার।”

মার্কিনের ইজারা-ধর্মী-অধ্যক্ষ মিঃ এডওয়ার্ড টেটিনাস্ সেদিন দোষণা করিয়াছেন যে, এটিয়ার রণক্ষেত্রে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অস্ত্রাগার ও উপকরণ-ভাণ্ডার। এই নিমিত্ত মার্কিন এখন ভারতে প্রচুর পরিমাণে বাস্তা নিষ্পাদনের সাজ-সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, কলকারখানায় ব্যবহারোপযোগী ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রপাতি, ইল্পাং এবং অন্যান্য বহুবিধ কাঁচামাল সরবরাহ করিতেছেন। যদিও রণপরিচালন-নীতি অমুখায়ী ভারতের অবস্থিতি এবং তাহার বিপুল উপকরণ-সম্ভার ভারতকে প্রাচ্য রণাঙ্গনের অস্ত্রাগারে ও উপকরণ-ভাণ্ডারের উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তথাপি প্রাচ্য গুচ্ছবৈঠক (Eastern Group Conference) এবং মার্কিনের বিশেষজ্ঞ দূতমণ্ডলীর (American Technical Mission) ভারতপরিভ্রমণের ফলে, ভারতকে আত্মপ্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কোন ব্যাপক অথবা বিস্তৃত নিয়ম-পরিচালনা অবলম্বিত হয় নাই। যুদ্ধের অতি-সংস্কারুল অবস্থার শেষোক্ত দূতমণ্ডলী ভারতভ্রমণে আসিয়া-ছিলেন; এবং সেই জন্ত ভারতবাসীর মনে দৃঢ় আশা জন্মিয়াছিল যে, ভারতের শিল্পসমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্য দৃঢ়গতি লাভ করিবে। কিন্তু দূতগণ ভারতের যুদ্ধসংক্রান্ত উৎপাদন সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন এবং বিমান ও জাহাজ

প্রান্তিক পরিবর্তে মেৰামত কাৰ্য্যের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য প্রদান করেন। এই দৃষ্টমণ্ডলী কি সুপারিশ করিয়াছেন এবং সরকার তাহার কতটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবাসী তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। পরন্তু, সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যুক্তরাষ্ট্র গ্রেডী মিশনের (Grady Mission) প্রস্তাবগুলিকে কাৰ্য্যে পরিণত করিতে বিমুখ হইয়াছেন, কারণ ঐ সকল প্রস্তাবকে কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হইলে, যে-সকল উপায় ও উপাদান অবলম্বন করিতে হয়, অল্প আওতা তাহার বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং গ্রেডী মিশনের অন্তিমোদনানুযায়ী কলকাতা, বঙ্গপাতি এবং সুযোগ-সুবিধা এখন আমরা পাইতে পারিব না। একটি অত্যন্ত আশা-প্রদ বিশেষজ্ঞকৃত অন্তিমোদনের ইহা একটি অত্যন্ত নৈরাশ্যপ্রদ পরিণাম। এই বিফলতা হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে, কোন বহিঃশক্তির প্রতি নির্ভরতা নিরর্থক। স্বাবলম্বন ও আত্ম-নির্ভরশীলতা ব্যতীত আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় উপায় নাই।

ইজারা ঋণ সম্পর্কে মার্কিণের সহিত আমাদের একটি স্বতন্ত্র চুক্তি সংগঠনের প্রস্তাব চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে ঠালিং-সংস্থিতির জ্ঞায় আমাদের একটি ডলার-সংস্থিতির প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান প্রভূত ঠালিং-সংস্থিতির কিয়দংশ ডলার-সংস্থিতিতে পরিণত করিবার প্রস্তাব আমরা বহুবার কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছি, কিন্তু এটা ভুলিবার নয়। পক্ষান্তরে বিনিময়-শাসন এবং ভারতে স্বর্ণের আমদানী প্রতিরোধের ফলে, বৃদ্ধন কিংবা মার্কিণের সহিত বাণিজ্য জমাখরচের আমাদের প্রাপ্য উত্তম জমা (Favourable trade balances) ওয়াশীল আমরা পাইতেছি মাত্র ঠালিং-এ। অধিকন্তু, ভারতের জাতীয় অধিবাসী কর্তৃক অর্জিত ডলার (Dollar credits) বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাহার নিজে ব্যবহার ও উপকারের নিমিত্ত অধিকৃত হইয়াছে; এবং বাণিজ্য জমাখরচের প্রাপ্য উত্তম জমা ভারতে ডলারে প্রাপ্তব্য নহে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন এই ডলার তলপ লক্ষ্য (Dollar Requisition order) ভারতসংরক্ষণ বিধি-নিষেধ (Defence of India Rules) অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত হয়, তখন যুক্তব্যা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আশান-প্রদান রোক্‌শোখ নীতি (Cash and carry) অনুযায়ী চলিতেছিল এবং যুক্তরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রীত জব্য-সামগ্রীর ভগ্ন স্বর্ণ অথবা ডলারে মূল্য দিতে হইত। তৎপরে ইজারা-ঋণ-প্রথা প্রবর্তিত হয়, এবং তাহার ফলে, মার্কিন হইতে ক্রীত জব্যাদির নিমিত্ত ডলার সংস্থানের প্রয়োজন ছিল না এবং এখনও নাই। সুতরাং ভারতবাসীকে তাহার অর্জিত প্রাপ্য ডলাবে অধিকার হইতে বিচ্যুত করার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু এখন বিদ্যমান নাই। ডলার প্রাপ্যের অধিকারী ভারতবাসীকে এখন নিষিদ্ধে তাহার প্রাপ্যের অধিকার ও সন্ধ্যাবহারের সুযোগ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবাসী এই ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কলকতা বঙ্গপাতি ক্রয় করতে সমর্থক।

এই নিষেধাত্মক বিধানের ফলে, ভারতবাসী স্বর্ণ কিংবা ডলার বিনিময়ে (Gold or Dollar Exchange) সক্ষম করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে ভারতের স্বাধীনতা

থাকিলে, ভারত তাহার শিল্পবাণিজ্য-সমুন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অমূল্য ব্যবস্থা করিতে পারিত। অজ্ঞাত দেশ, এমন কি বৃটিশ ডমিনিয়ন-গুলিও এ-বিষয়ে ভাগ্যবান, কারণ তাহারা যুক্তরাজ্যে প্রেরিত জব্যাদির নিমিত্ত তাহাদের প্রাপ্য তাহাদের জাতীয় স্বার্থের অমূল্য উপায়ে ওয়াশীল লইয়াছে। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত ৩৮০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; সুতরাং এখন তাহাকে তাহার প্রাপ্য আদায় করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। বৃটিশ ডমিনিয়নগুলির জ্ঞায় ভারত তাহার কলকারখানার নিমিত্ত কল-কজার বঙ্গপাতি ও সমস্ত সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে। বাধা-বিঘ্নের গুণী অতিক্রম করিয়া সে সুযোগ লাভ করিলে ভারতবর্ষও ডমিনিয়নগুলির জ্ঞায় তাহার গুরুত্ব সংরক্ষণ-শিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধন করিতে পারিত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের ঠালিং-সংস্থিতির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে আও দৃঢ়নিশ্চয়তা প্রয়োজন। ভারতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ-কল্পে নিযুক্ত না হইয়া যদি এই প্রচুর সম্পদ বিলাতী চাকুরিাদেব ভবিষ্যৎ বৃষ্টি ও ভাতা প্রভৃতির নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের পবিত্রাশ্রয় সীমা থাকিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার জ্ঞায় ডমিনিয়নগুলি—বাহাদেব ইংলণ্ডের সহিত জাতীয় সংগ্রহ আছে, তাহারাও তাহাদের অমূল্য সম্পত্তিকে যুদ্ধান্ত পৰ্য্যন্ত অব্যবহৃত রাখে নাই। পরন্তু, উপস্থিত প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহারে লাগাইতেছে এবং তাহাও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বার্থানুযায়ী। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমতঃ তদেব বৃটিশ ধনসম্পদ (Investments) আয়ত্ত করে। এই ধনসম্পদ স্বর্ণবিনি-সংশ্লিষ্ট। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট বিক্রীত স্বর্ণও তাহার পুনরায় ক্রয় করিয়া লয় এবং তাহার পরে তাহারা ঠালিং ঋণ পরিশোধে প্রবৃত্ত হয়। কানাডাও বৃটিশ সরকারের সহিত এই-রূপ আর্থিক বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, কানাডা হইতে ক্রীত জব্য-সামগ্রীর মূল্যের শতকরা চল্লিশ অংশ স্বর্ণে দিতে হইবে এবং আর চল্লিশ অংশ কানাডায় অর্জিত বৃটিশ সম্পদ-সম্পত্তির হস্তান্তর দ্বারা। পক্ষান্তরে, অর্গেন্টাইনাকে একটি স্বর্ণনগ্‌ট্যান্ডা ক্লাউজ (Gold guarantee clause) মারকতে ঠালিং এবং ঘাটতি-পড়ন্ত দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার এক্ষণে কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার ঠালিং-সংস্থিতির মূল্য সম্পর্কে ভারত এখনও বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে কোন বিনিশ্চয়তা (Guarantee or Assurance) প্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা স্বর্ণ অথবা ডলার বিনিময়, অথবা ভারতে অর্জিত বৃটিশ বিনিমোজিত অর্থ-সম্পদের সম্বাধিকার লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতের অধিবাসিবৃন্দ বহুদিন হইতে ভারতের বলিতেছে যে, ভারতের অর্জিত ঠালিং-সংস্থিতি এক্ষণে ভাবে বিনাস্তে আটক রাখিবার একমাত্র অছিল। এই যে, যুদ্ধান্তে বহুবিধ ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির প্রসারণার্থ ভারতের যে বহু কল-কজা ও বঙ্গপাতি প্রয়োজন হইবে, সে সমুদয় এই অর্থে ক্রয় করিবার সুবিধা হইবে। এই হিঁদেবগার অর্থ এই যে, যুদ্ধান্তে ভারতকে বুটেন হইতে এই সকল অত্যাশঙ্কক জব্যাদি উচ্চমূল্যে কিনিতে হইবে।

সুতরাং এই আটক ভারতের প্রতি মমত্বপ্রযুক্ত নগে, বুটেনের যুদ্ধান্তর বাণিজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ। যুদ্ধান্তর পুনর্গঠন-ভাণ্ডার (Postwar Reconstruction Fund) প্রতিষ্ঠার মূলে এই গুঢ় অভিসন্ধি নিহিত।

ভারতের অর্থনীতির বাজেট-বিতর্ককালে বলিয়াছিলেন যে, টালিং অফল ও ডলার অফল, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্র; এবং ইহাদের পবন্যবের সম্পর্ক যুদ্ধশেষে বিবেচ্য সমস্যা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের যুদ্ধান্তর ক্রমকে যুদ্ধান্তর্যের পরিধির মধ্যে নিবদ্ধ রাখাই পুনর্গঠন ভাণ্ডারে মুখ্য উদ্দেশ্য। সুবিধাজনক হইলে যুক্তযাচ্যে এবং প্রয়োজন হইলে যুক্তযাচ্যের বহির্ভাগে, ভারতের যুদ্ধান্তর প্রয়োজনীয় জব্যাদি ক্রয় করিবার অক্ষম-ক্ষমতা ভারতের অবস্থা প্রাপ্য। কেবলমাত্র ক্ষমতা নহে, প্রয়োজনীয় অর্থও ভাবতবাসীর আয়স্বে থাকা সর্বথা বাহ্যনীয়। টাকা সাহায্য প্রাপ্য, খরচের অধিকার তাহারই।

কিছুদিন পূর্বে ভারত-সরকার চারিটি পুনর্গঠন সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল তাহারা যে বিশেষ কোন উন্নয়ন-

যোগ্য কার্য করিয়াছে, আমরা তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। তাহাদের বিবেচনার্থ কোন প্রসঙ্গ পুনর্গঠন-পরিকল্পনার বার্তাও আমরা পাই নাই। আমাদের-বিশ্বাস, ভারতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গন্তব্যস্বরূপ বুটেন ও মার্কিনে বাইরা যুদ্ধান্তর সংগঠন ও পুনর্গঠন-সম্পর্কে কি আলাপ-আলোচনা ও অভিজ্ঞতার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সমিতিগুলি এখনও গাঢ় তিমিরে। ইতি-মধ্যে গত এপ্রিল মাসের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনে সরকারী নায়ক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে শতাধি পরিকল্পনা-কারী গুচ্ছ (Planning Groups) যুদ্ধান্তর ভারতের আর্থিক, অর্থনৈতিক ও শুদ্ধগণকান্ত সমস্যার স্বাধীনভাবে অনুশীলন ও আলোচনা করিতেছেন। সরকার তাহাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। ইত্যাবসরে ভারতের বাণিজ্যে মার্কিন তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে বুটেনকে অতিক্রম করিতে পারে। বুটেনের সমস্যা এইখানে। ভারতের ভবিষ্যৎ হুভাগ্য ও হুভোগ্য এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভালে প্রচ্ছন্ন।

মর্য ও কর্ম (উপসঙ্গ)

এগার

পরের দিন সকালবেলায় উঠে বিকাশ মাসিয়ার কাছে গিয়ে মাথা চুলকে বললে, “মাসিমা, ব’লছিলাম কি?”—কিছু বলা আর চল না, সে শুধু মাথা চুলকাতেই লাগলো।

মাসিমা একটু হেসে ব’ললেন, “কী ব’লছিলাম বল না—চুপ ক’বে দাঁড়িয়ে রইলি যে?”

আরও খানিকক্ষণ মাথা চুলকে ছুঁটো টোঁক গিলে সে বললে, “ব’লছিলাম কী—এই—মানে বিয়েটা যখন ক’রতেই হবে, তখন দেবী ক’রে আর কি হবে? পরশু দিন তো একটা লগ্ন আছে, সেই দিনেই”—

“তবে রে গোলামের পো, কাল রাত্তিরে হ’ল বিয়েটা অসম্ভব, আর এখন তর সইছে না। ‘ক’রতেই হবে’—বেটা যেন ওষুধ গিলছেন! থাক না ওষুধ—নাই খেলি! আর কিছুদিন তেবেই দেখ না।” মাসিমা একগাল হেসে বললেন।

হেসেই বিকাশ বললে, “তা নয় মাসিমা, ভাবছিলাম কি? বিয়ের ক’নের সঙ্গে এমন এক সঙ্গে থাকবে—নিশ্চয় হ’তে পারে, তাই গোলটা চুকিয়ে ফেল—”

“ধাম, ধাম, আর নেকামী ক’রতে হবে না। বিয়ে অমনি পাকা ফলটি কি না? পাড়া যখন হ’রে গেছে গালে পুয়লেই হ’ল। দু’দিনে বিয়ের জোগাড় হয় কখন? ওসব হবে না। তুই পালা এখন—টাকার জোগাড় করগে, আমি আর সব করবো।”

বিকাশ বললে, “টাকাটা আর বেশী কী লাগবে। একজন পুস্ত ভেকে—”

“পুস্তক হলে! কিরক-বজি—সে কি অমনি হয়? আত্মীয়-

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কুটুমদের আনতে হবে, তাদের ব্যবহাব দিতে হবে, নেমস্তর করতে হবে, কেউ যেন বাদ না পড়ে, খাওয়া দাওয়ার উজ্জ্বল—”

বিকাশ আবার মাথা চুলকাতে লাগলে, এবার অজ্ঞভাবে। মাসিয়ার কথার বহর দেখে সে আশ্চর্য কললে যে, তিনি খ’চেন আঁচ করছেন, তাঁর মেয়েব বিয়ের আশর্শে। ছাঁকা বারো হাজার খরচ করেছিলেন মেসোম’শায় সে বিয়েতে! অনেক ছাটকাটি দিয়েও মাসিয়ার মনের মত উৎসব ক’রতে কমসে-কম সাত হাজার টাকা না হ’য়ে যায় না।

কোথায় পাবে সে সাত হাজার টাকা? এ যে বেয়াড়া আবদান মাসিয়ার! রাগই হল তার। কিন্তু সে মুখ ফুটে মাসিমাকে ব’লবে যে—সে হবে না, এত বড় বুকের পাটা তার নেই।

উভয় সঙ্কট!—কিন্তু উপায় নেই। তার সাহসের অভাবটাকে সে ঢাকলে একটা কর্তব্যের ওজুহাত দিয়ে। দুঃখিনী মাসিমাকে মেসোম’শায়ের সত্যার পরই—এই মনোভঙ্গের আলাত দেওয়া হ’ল অকর্তব্য হ’বে। সে নীরবে সরে গেল।

সামনে পড়ল গীতা। সে বোধ হয় আড়ি পেতে কথা শুনিছিল, কিন্তু এমন ভাবে পিছন ফিরে চললে সে, যেন ভিজে বেড়ালটি, কিছু জানে না।

তার নিটোল গোল নরম হাতখানা এমন লোভনীয় ভাবে পাশে স্থলছিল যে, বিকাশ কিছুতেই আপনাকে সামলাতে পারলে না। সে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে মারলে একটা চিমটি।

“উঃ! মেয়ে কেললে গো!” বসে সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে গীতা ফিরে দাঁড়াল। সহাস্ত গর্জন ক’রে সে চোখ পাকিয়ে বললে, “বুড়ো দিগ্বী হ’লে, এখনও শরতানী গেল না।

ছিঃ! লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছে। এখন—এখন কি আর অমনি করতে আছে? লোক বলাবে কি?”

হেসে বিকাশ বললে, “কী আর বলবে? বলবে এরা দুটো বয়ে গেছে। তাতে ব'য়ে গেল আমাদের। ‘তুম্ হুম্ তো মজা লিয়া’।”

“তবে রে। মজাটা দেখাচ্ছি।” বলে হঠাৎ গীতা বিকাশকে একটা কীল মারলে। বিকাশ কস করে ঘুরে পেশী কুলিয়ে এমন ক’রে দাঁড়াল যে কীলটা প’ড়লো গিয়ে তার বাহুমূলের কঠিন পেশীশিঙে।

বজ্রের মত কঠিন পেশীতে আঘাত ক’রে তার হাতে হাত বুলাতে বুলাতে গীতাই বলে উঠল, “উঃ, হাতটা গেল আমার! দেহ তো নয় যেন পাথর। শুণ্ডা একটা।”

বিকাশ ব’লে, “ধাক শোধবোধ। এখন কথার জবাব দে আমার”—

জিত কেটে গীতা ব’লে, “ও কি? ছিঃ! বউয়ের সঙ্গে বুঝি ভদ্রলোকে তুই-তোকাকারী করে।”

কপট অমুতাপের স্তরে বিকাশ ব’লে, “কমা কর দেবি, ভুল হ’য়ে গেছে। এখন, হে দেবি, আমার একটি প্রস্নের উত্তর দিয়ে কৃতার্থ ক’রবে কি?”

গর্ভিতভঙ্গীতে গ্রীবা দাঁকিয়ে চোখ টেনে গীতা ব’লে, “কি প্রশ্ন প্রভু!”

“ও ঠিক হ’ল না। প্রভুটা modern নয়। ব’লতে হবে, প্রিয়তম—”

“যাও, কি যে বল?” বলে লজ্জার লাল হ’য়ে গীতা তাব পিঠে একটা চড় লাগালে।

“ধাক, এখন প্রশ্নটা হ’চ্ছে এই। এখন আমার হব বউটিকে তোমার পছন্দ হ’য়েছে কি?”

গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে গীতা ব’লে, “মোটাই না।”

কপট গাম্ভীর্যের সহিত বিকাশ ব’লে, “তবেই তো মুন্সিল, তোমার পছন্দ না হ’লে আমি বিয়ে করি কি ক’রে? তবে এ বিয়েটা ভেঙ্গেই দি—কি বলিস?”

গীতা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ব’লে, “আমার সন্দেহ হয় তা পারবে না—কমলি নেই ছোড়গা।”

“না ছাড়াই সম্ভব, কেন না তা’ হ’লে, হয় গয়নাগুলো বেহাত হ’য়ে যাবে, না হয় কথার খেলাপ হবে। —তবে কী আর করা যাবে, ক’রবোই বিয়ে।” ব’লে একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিকাশ।

গীতাও সমান গুঞ্জে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব’লে, “আমারও সেই কথা। উপায় নেই, ক’রতেই হবে বিয়ে।” কসু ক’রে গীতার হাত ধরে বিকাশ তখন ব’লে, “তবে এসো প্রিয়তমে, আমরা দু’জনে হাতে হাত ধ’বে এই বিবাহ-অনলে আত্মবিসর্জন করি।” যলেই সট ক’রে সে গীতাকে একেবারে বুকের ভিতর সাপটে ধ’রলে।

“ছিঃ! কি যে কর? ছিঃ! ছেড়ে দাও, কে দেখে

কেলবে।” ব’লে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে, “একেবারে নিলজ্জ বেহারা—আর একটা দানব! হাত তো নয় যেন লোহার বেড়ী। আমার হাড়গোড় সব গুড়ো হয়ে গেছে।” বলে সে এমন একটা পুলকোচ্ছল দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চাইলে যে বিকাশের মনে হ’ল যে এই দানবীর অত্যাচারটার পুনরাবৃত্তি। একেবারেই অপ্রীতিকর হবে না।

কিন্তু যি তখন ঝাঁটা হাতে এসে প’ড়েছে।

গীতা অত্যাশ্চর্য শাস্ত সম্ভাষণে ব’ললে, “কিন্তু শোনি বিকাশদা, জেঠাইমার কথায় ভুলে তুমি একগঙ্গা টাকা খরচ ক’রে না। কি দবকার মিছে কতকগুলো টাকা ঢেলে? বিশেষ যেখানে টাকা নেই তোমার। জোগাতে হবে হয় ধাধা ক’রে না হয় চুরী ক’রে।”

“কিন্তু মনের মতন খরচ ক’রে একটা বজ্র ক’রতে না পারলে যে উনি বড় কষ্ট পাবেন গীতা! ওঁর খুব বেশী করেই মনে হবে যে মেসোমশায় নেই, এখন আমার কাছে হাত পা ততে হ’চ্ছে কাঁদ, তাই হ’ল না।”

“কিন্তু তাই ব’লে কি তুমি ভুববে নাকি? ওঁর খরচের খোরাল মেটাতে মেসোমশায়ই ভুবতে ব’সেছিলেন। তিনি তো তবু সে সব ক’রেছেন তাঁর শেষ বয়সে যখন রোজগার তাঁর শেষ সীমার পৌঁছেছে। তুমি সবে বোজগাব আরম্ভ ক’রেছ—এমনি যদি সেই খরচের ভার নিবিবানে গলায় বেঁধে নাও তবু নির্ধাত ভুবতে হবে তোমার সপরিবারে। একেই তো একটা রাবনের সংসার তোমার ঘাড় প’ড়েছে।”

বিকাশের মনে হ’ল এসব ছাঁকা সত্যি কথা, কিন্তু শুনে তার বুক কঁপে উঠলো। সে বললে, “চুপ, গীতা চুপ, ও কথাও নয়। আমি কী গীতা? মেসোমশায় মাসিমা আমাকে গড়ে পিটে মানুষ ক’রেছেন তাই না আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার কি তোমার মনে বা মুখে যদি একবারও একথা আসে যে মাসিমার সংসার আমাদের একটা বোকা, তবে আমাদের পাপের যে শেষ থাকবে না গীতা।”

বক্তৃতা ক’রে তার মনে হ’ল বেশ বলা হ’য়েছে। বেশ গর্ব হ’ল তাব। সে মনকে চটপট, ভোগা দিলে যে এইটাই তার মনের আসল কথা! সে ত্যাগী দেবক। অপ্রস্তুত হয়ে গীতা চুপ ক’রে গেল। তার ছায়াচ্ছন্ন মুখ দেখে বিকাশের মনে হ’ল যে এই সাদা কথাটা গীতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাও একটু তিরস্কারের মতই হ’য়েছে। তখন সে হাকে আদর ক’রে বললে, “তুমি রাগ ক’রো না লক্ষ্মীটি। কিন্তু ভয় নেই তোমার। সাধের অতীত খরচ আমি ক’রবো না। মাসিমাকে ব’লে ক’য়ে খরচ আমি যথাসাধ্য কমাবো। কেনন? খুঁশী হ’লে তো?”

সংক্ষেপে গীতা বললে, “জাচ্ছ।” কিন্তু তার জু কুঁকিত হ’য়েই রইলো।

তখন বিকাশ বললে, “অমন ক’রে মুখভার ক’রে থেকো না লক্ষ্মী!—হাস তুমি, নইলে বড় দুঃখ পাব আমি।”

নিরুপায় হ’য়ে হাসতে হ’ল গীতার। কিন্তু একটু পরেই সে বললে, “একটা কাজ ক’রলি হ’ল না?”

“কি?”

“জ্যোঠাইমার যজ্ঞ হ’তে তো সেই একমাস বাদে হবে। এর তেতর চল না চুপি চুপি আমরা রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়ে—”

হেসে বিকাশ বললে, “তাই বল, ভরটা খরচার নয়—দেবী হবে তাই—কি জানি, যদি কক্ষে যায়! কেমন? সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু, তাতেও অমনি চট ক’রে হবে না। নোটিশ দিতে হবে, তাতেও দেবী হবে।”

“তবে আব কি করা যাবে?”

“দেখি, বাই টাকার চেষ্টায়।”

বিকাশ চলে গেল।

বার

মাসিমা সেইদিনই অনন্তকে আসতে টেলিগ্রাম ক’রে দিলেন। শুনে বিকাশ মাথায় হাত দিলে। মাসিমার খরচ তবু সামলান যাবে কিন্তু অনন্তব খরচ যে মহাসমুদ্র! একা রামে বন্ধা নেই—ইত্যাদি—

বিকাশ খুব সাহস ক’রে একবার শুধু বললে, “বড়লোকে আনবার মানে এমন কি দরকার? তা’ ছাড়া তিনি যা কাণ্ড ক’রেছেন বাড়ীটা নিয়ে—”

মাসিমা বললেন, “ছোট লোক সে তাই ছোটলোকী করেছে। তার সে কাজের জবাবদিহি ক’রেবে সে তাব ধর্মের কাছে। সেই কথা মনে ক’রে আজ যদি তার বোনের বিয়েতে আমি তাকে না ডাকি তবে সে যে আমার অধর্ম হবে! তা ছাড়া তাব বোনের বিয়ে—সে নইলে সম্প্রদান ক’বেবে কে? আব, এত বড় একটা যজ্ঞ সে কি তুই সামলাতে পারবি? সে জানে শোনে, পাঁচটা ব’য়েছে, সে না হ’লে চ’লবে না।

নিরুপায় হ’য়ে বিকাশ হাত পা ছেড়ে দিলে।

এলো অনন্ত!

অবিলম্বে সে সমস্ত কর্তব্য বেশ সহজভাবে দখল ক’বে নিলে।

প্রথমেই সে বললে, “তা’ হ’লে আমার তো একটা আলাদা বাড়ী নিতে হয়। বিয়ের আগে বর ক’নে এক বাড়ীতে থাকে তো ভাল দেখায় না।”

কথটা শুনে বিকাশের হাড় জলে গেল। উনি বাড়ী নেবেন। টাকাটা গুণবে তো সেই বিকাশ। অথচ এত বড় মান তাঁর যে তাঁর বোন বিয়ের আগে বরের বাড়ী থাকলে তাঁর মানের হানি হবে।

মাসিমা কিন্তু ষাড় নেড়ে বললেন, “তা’ তো নেবেই। দেখ একখানা বাড়ী। বেশ বড়-সড় দেখেই নিও বাড়ী—বিয়ে তো সেখানেই দিতে হবে।”

বিকাশ তাড়াতাড়ি বললে, “আমি বাড়ী ঠিক ক’রে দেবো’খন।”

অনন্ত বললে, “না হে তায় না। নিজের বিয়ের কাজ নিজে ক’রেবে কি? তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমি সব ঠিক ক’রে নিচ্ছি।”

বাড়ী নেওঁদ হ’ল একখানা—পাঁচশো টাকা ভাড়ার। বিয়াট প্রাসাদ।

বিকাশের টাকা, দরাজ হাতে খরচ ক’রতে অনন্তের কোনও সন্দেহ নেই। কেন থাকবে? অনন্ত চিরদিনই পোন্ধরী ক’রে এসেছে—আর চিরদিনই পয়ের ধনে। বিবাহাতার অর্ধেকটা তার বেশ আয়ত্ত করা আছে। পয়ের ধনে আপনার ধনে তার ভোগজ্ঞান নেই, সগর ধনই সে আপনার ব’লে মনে করে এবং সুযোগ পেলেই আপনার ব’লে ব্যবহার করে।

সেইদিনই গীতা ও বসন্তকে নিয়ে, অনন্ত সপরিবারে সেই প্রাসাদে গিয়ে আজ্ঞা নিলে আর এমন ঠাইলে বাস ক’রতে লাগলো যাতে সে প্রাসাদের কোনও অমর্যাদা না হয়।

বিয়ে হ’তে একমাস দেবী। তার আগে গোটা আঠেক তারিখ ছিল, অনন্ত সব নাকচ ক’রে দিলে, বললে এক মাসের আগে জোগাড় হ’য়ে উঠবে না।

বিকাশ গীতা দুজনেরই মুখ অন্ধকার হ’য়ে উঠলো।

নিমন্ত্রণ হ’ল—নারদের নিমন্ত্রণ!

সুধু তাই নয়—লোক পাঠিয়ে খরচা ক’রে দূর দূরান্তর থেকে নানাবিধ উচ্চ ভাইলিউশনের মাসি, পিশি, দিদিমা, ঠাকুরমা, ভাই, বোন, খুড়ো, জ্যেঠা, মেসো, পিশে প্রভৃতি আমদানী ক’রে দুই বাড়ী ভরে ফেলা হ’ল।

বিকাশের চক্ষু ক্রমশঃই উল্কাগামী হ’য়ে উঠলো!—আকাশ স্পর্শ ক’রেবে ব’লে আশঙ্কা হ’তে লাগলো।

এক একটা আয়োজন দেখে আর তার বুক বেঁপে ওঠে। কোথায় পাবে সে এত টাকা?

ফাটকান বাজারে একবার সে টাকা দিয়ে এসেছে। বাজার একেবারে ঠাণ্ডা—উঠতি পড়তি নেই একেবারে, হবো’ না শীগগির। কাজেই সেখানে হঠাৎ কোনও টাকা করবার সম্ভাবনা নেই।

তবে উপায়?

মাসিমার কাছে সে আর কণ্ঠে পায় না। তাঁর ব্যয় বিভাগের মহামন্ত্রী অনন্ত আসবার পর তিনি খরচ পত্র লব্ধকে কোনও আলোচনাই করেন না বিকাশের সঙ্গে—মাঝে মাঝে কেবল বলেন—টাকার জোগায় কর।

মরিয়া হ’য়ে বিকাশ স্থির ক’রল, ব’লবেই সে মাসিমাকে যে টাকা সে দিতে পারবে না এত। বুক ফুলিয়ে সদর্পে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু মাসিমার সামনে এসে সে শুধু ঠাড়িয়েই বইল; কথা ফুটলো না তার।

মাসিমা মহা আনন্দে ছুটোছুটি ক’রে বেড়াচ্ছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাপারের আয়োজনে তার মুখখানি খুসী ক’রে ব’সে আছেন। কোন প্রাণে বিকাশ তাঁকে ব’লবে এ সব কিছু হ’তে পারবে না, টাকা নেই তার।

নীংবে সে ফিরে গেল।

একদিন অনন্ত তাকে বললে, “এইবারে মোটা মোটা খরচ আসছে, পাঁচ হাজার টাকা হাতে কর।”

বিকাশ বললে, “কোথায় পাব টাকা বড়দা? কোথাও টাকা পাচ্চিনে—এসব খরচ—”

তার কথা সম্পূর্ণ করবার অবসর দিলে না অনন্ত। সে কস

ক'রে ব'লে বসলো, “আচ্ছা, কোনও চিন্তা নেই, আমি টাকার জোগাড় করছি। বেচেই দি'গে রাঁচীর বাড়ীখানা।

বিকাশ একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল। সে বখন রাঁচীর বাড়ী বেচবার কি ভাড়া দেবার প্রস্তাব ক'রেছিল তখন অনন্ত কী প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। আর আজ সে এক কথার বাড়ীটা বিক্রী ক'রতে চায় বিকাশের ও গীতার বিয়ের জন্ত! গীতা অবশ্য তার বোন, কিন্তু গীতার বোল বছরের জীবনে কোনও দিন তার সংক্ষেপে অনন্তের এতখানি দুর্দলতার নিঃশাস মাত্রও বিকাশ কোনও দিন দেখে নি—দেখেছে নির্দয় তিরস্কার ও প্রহারের প্রাচুর্য!

বিশ্বয়ের অবধি রইলো না তার।

সে বললে, “রাঁচীর বাড়ী বেচবেন?”

অনন্ত বললে, “আর উপায় কি?—তা ছাড়া একটা সুবিধাও হ'য়েছে বড়। জান তো ও বাড়ীর টাইটল নিরে বা গোলমাল, কেউ নিতেই চায় না। এক বেটা জমীদার ভারী ঝুলোঝুলি ক'রছে তাও। বলে জ্যাঠাইমার কাছে কবলা পেলেই সে নেবে—আর আমাকে বাড়ীর একটা অংশ ছেড়ে দেবে, আমার একটা নানাবী লিখে দিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা সে দেবে। এমন সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না।—যাক গে, তাই করবো—টাকার জন্তে তুমি ভেবো না।

অনন্ত উঠতেই বিকাশ বাধা দিলে।

গোড়া থেকেই কথাটা তার অদ্ভুত ঠেকছিল। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে এটা কেবল অনন্তের নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির একটা চাল। মাসিমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে ক'রে সে নিজস্ব ক'রে নেবে বাড়ীর খানিকটা, আর, কোন না আর হাজার দুই চার টাকা মারবে।

সে ব'লে, “না, বড়না, থাক, ও বাড়ী যেয়ে কাজ নেই। আমি যেমন ক'রে পারি টাকার জোগাড় ক'রবো।”

কথাটা হ'চ্ছিল বিয়ের বাড়ী, অর্থাৎ অনন্তের বাড়ীতে। এখানে বিকাশ বড় একটা আসে না, আজ এসেছে অনন্তের নিমন্ত্রণে—টাকার জন্ত।

তার কথা শুনে অনন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেল। তখন গীতা এদিক ওদিক চেয়ে বিকাশের কাছে এসে ব'লে, “বলি কি সব কাণ্ড হ'চ্ছে বিকাশ দা, খবর রাখ?”

বিকাশ শুক মুখে ব'লে; “খবর রাখবার দরকার করে না, অমুভবেই বুঝতে পারছি—হ'চ্ছে রাজস্বের রক্ত। এবং তার বলি তুমি। কিন্তু শুধু তাই নয়। খরচ বা হ'চ্ছে—তার চেয়ে বেশী গিয়ে উঠছে দাদার সিঁজুকে—

নিজুতেও এ কথা গীতার মুখে শুনে তার বুক কেঁপে উঠলো। অনন্ত শুনে নাকি? সে ব'লে, “থাক গীতা, এ কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে কাজ নেই।” “না থাকলো আমার কাজ, কিন্তু তোমার চেহারাখানা যে এই ক'দিনে আমনি হ'য়ে গেছে—

একটু হেসে বিকাশ ব'লে, “বিরহে এমন হয়, কবিতা বলেন।”

“তামাসা রাখ। তুমি টাকার জন্তে ভেবে ভেবে শুকিয়ে ম'রছো, সে কথা আর কেউ না বোঝে, আমি বুঝি। আমি তোমাকে এমন ক'রে বধ হ'তে দেবো না। জরন ভালো

মাছবটি হ'লে চলবে না। সাহস ক'রে ব'লতে হবে তোমার, আমি দিতে পারবো না। এত ভয় কিসের তোমার?”

সাহসের অভাব তার? গীতার মুখে এই সম্পূর্ণ সত্য অভিযোগেও সে কেঁপে উঠলো। “দাদা কি বলছিলেন জান?—রাঁচির বাড়ী বেচবেন, তা হ'লে!”

“সে তিনি বেচবেনই। সে সব যুক্তি আমি জানি—বউদিকে দাদা বলছিলেন, আড়াল থেকে শুনোছ সব। কথাটা বিয়ের কথার আগেই ঠিক হ'য়ে গেছে।”

একটা বোকা জমিদারকে বাগিয়ে উনি দশ হাজার টাকার আদ্যেকটা বাড়ী তার ঘাড়ে গছাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন, এই ক'কে তপ্ত তপ্ত কাজটা সেয়ে ফেলে জ্যাঠাইমাকে দেখাবেন পাঁচ হাজার টাকা, তারপর বিয়েতে হাজারদুই টাকা খরচ ক'রে বাকী টাকা নিয়ে লটকাবেন।

“কিন্তু আমি তা' বারণ ক'রেছি—

“ব'য়ে গেছে। তুমি মানা ক'রবে তাই জ্যাঠাইমাকে দিয়ে বাড়ী বেচাতে পারবেন না দাদা! তুমি ভেবেছ কি?”

“আমি যেমন ক'রেই হোক টাকাটা তুলে দেবো।”

“তাতে লাভ হবে এই যে আর পাঁচ হাজার টাকা বেশী খরচ দেখাতে হবে। মোটের উপর এই লাভের কাজটা দাদা ছাড়বেন না কিছুতেই।”

“বটে, আচ্ছা দেখি উপায় হয় কি না।”

“আমি বলি, কোনও চেষ্টা ক'রো না। ধনকর হয় বর্করেরই হোক—তুমি সে বর্কর নাই হ'লে! উপায়ের চেষ্টার বিকাশ সটান গেল উকীলের বাড়ী। সেখান থেকে পরামর্শ সেয়ে সে গেল আকিসে। কাজে তার মন বসলো না, টাকার চিন্তায়।

ভাবলে সে, এ কী নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে সে আপনাকে? গীতার কথা যে ঠিক তা' সে জানে। সে দুঃখ পাচ্ছে কেবল জোর ক'রে না বলবার তার সাহস নেই ব'লে। কিন্তু কি ক'রবে সে?

ভবু এ আর চলবে না। বার বার এই শেষ বার। বিয়েরটা চুকে গেলে আর সে ভাল মাছবটি থাকবে না, নাগপাশ থেকে যুক্তি নেবে সে।

কিন্তু এখন উপায়? কোনও উপায়ই সে খুঁজে পেলো না। ধায় ক'রতে পারে সে জমীটা বাধা দিয়ে—কিন্তু বিয়ের জন্ত ধায় ক'রে ডুববে? সে যে আশা ক'রে আছে ঐ জমী বাধা রেখে আস্তে আস্তে ওর উপর বাড়ী করবে একখানা।

যতীনবাবু এসে ব'ললে, “বিকাশবাবু, জমীটা বেচবেন আপনি?”

বিকাশ চমকে উঠলো, এ লোকটা কি শরতান? তার মনের বন্দটা টের পেলো কেমন ক'রে? আমতা আমতা ক'রে সে বললে, “না—কেন বলুন তো?”

“ভারী একটা ভাল অফার আছে। হাঁকা বিশ হাজার টাকা cash down। আমি বলি, বেচে ফেলুন। আর ঐ টাকা দিয়ে ৯ নং কীমের একটা গোটী বাড়ী কিনে ফেলুন। সে চমৎকার

জারগা হবে, আর সেখানকার কতগুলি ভাল বাড়ী না ভেঙেই বিক্রী ক'রছে। তাই করুন।”

নেচে উঠলো বিকাশের প্রাণ। এতদিন ভাগ্যদেবীর যে অপর্যাগ প্রসাদ সে পেয়ে এসেছে তার ধারা আজও অব্যাহত আছে, আর আজ তার প্রয়োজনের দিনে সে প্রসাদ উথলে পড়েছে দেখে সে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

যতীনবাবুর সাহায্যে সেই দিনের ভিতর বাড়ী বিক্রী হ'য়ে ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের একখানা মাঝারী গোছ বাড়ী কেনবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। সব দিয়ে খুঁয়ে সে ছয় হাজার টাকার নোট পকেটে পূরে সে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরলো।

সবচেয়ে এই কথায় সে আরাম শেষ করলে যে, তার কোনও সাহসের কাজ করতে হ'ল না আপন আপন সব বিপদ কেটে গেল। একটু বৃকে জোরও হ'ল—ভাবলে মাসিমাকে এবার দুটো কথা বলবে।

মাসিমাকে সে বললে, টাকার জোগাড় করেছি মাসিমা, কিন্তু তার তিনটে সর্ব্ব আছে।”

টাকা হ'য়েছে শুনে খুশী হয়ে মাসিমা এই সর্ব্বের কথায় বেশ একটু ক্ষুব্ধ হ'লেন। মেসোমশায়ের কাছে তার কোনওদিন কোনও সর্ব্বের কথা শোনা অভ্যাস হয় নি। একটু ভার মুখে সে বললে, “কি সর্ব্ব?”

“প্রথম সর্ব্ব এই যে পাঁচ হাজার টাকার ভিতর সব খরচ সারতে হবে। কেন না, আর টাকা পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় সর্ব্ব এই যে রাঁচীর বাড়ী বিক্রী বা তার সম্বন্ধে কোনও বন্দোবস্ত আপন ক'রতে পারবেন না। তৃতীয় সর্ব্ব এই যে আব একহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনবেন, আর এত পয়সা বখন বা পাখো তার বা বাঁচে সব দিয়ে আপনার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনবেন।”

মাসিমা একটু মান হাসি হেসে বললে, “এমন কড়া শাসন তো তোর মেসো কোনওদিন করেন নি।”

“তিনি করতে পারেন নি কেন না তিনিই আপনাকে বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু আমি যে আপনার ছেলে, আমারই বেলায় যে ভালবাসাটা আপনার বেশী, তাই আমার এ আবদার আপনার না রেখে উপায় নেই।”

ব'লে বিকাশ ছ' হাজার টাকার নোট মাসিমার পায়ের কাছে রেখে দিলে।

প্রসন্ন হান্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখ। টাকাগুলো হাতে ক'রে নিয়ে বললে, এখন এগুলো রাখি কোথায়। গীতাটা না থেকে বড় মুন্সিল হয়েছে। অনন্ত—”

“আমি রেখে দেবো মাসিমা? আমার কাছে থাক, বখন বা' দরকার হবে আমিই দেবো।”

“আচ্ছা তাই রাখ, দেখিস্ হারিয়ে বা খরচ ক'রে ফেলিসনে যেন। যে মনভোলা তুই!” ব'লে টাকাগুলো বিকাশের হাতে দিয়ে ব'ললেন, “কোথ থেকে জোগাড় করলি টাকা?”

“টাকা কি আর আমি জোগাড় ক'রেছি মাসিমা? অল্পপূর্ণ

মার টাকার দরকার হ'য়েছে কুবের পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাড়ার থেকে।”

হেসে মাসিমা ব'ললেন, “ভারী জ্যাঠা হ'য়েছিস। বল না কোথায় পেলি?”

সব কথা খুলে ব'লে বিকাশ ব'ললে, “আপনি চেয়েছিলেন খুব জাঁক করে আমার বিয়ে দিয়ে আমার ঘর গোছাতে, দালালের মারকত কুবের পাঠিয়ে দিলেন টাকা, তাতে বাড়ীকে বাড়ী রইলো, বিয়ের খরচও জুটে গেল।—মাসিমা, সে বাড়ী দেখলে খুশী হ'য়ে যাবেন। একমাসের মধ্যেই বাড়ী মেলামত হ'য়ে যাবে তারপর ভাড়াটে ঘর ছেড়ে আপনাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবো।”

“কিন্তু একটা কথা বাবা, রাঁচীর বাড়ীর কথা—”

“কেন কি ক'রেছেন আপনি? বেচা হ'য়ে গেছে?” চমকে উঠে ব'ললে বিকাশ।

“অনন্ত একখানা চিঠি আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে যে আমি ঐ বাড়ী বেচতে সম্মত আছি।”

বিকাস লাকিয়ে উঠে ব'ললে, “সে চিঠি কোথায়?”

“ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে—”

বিদ্যুৎবেগে বিকাশ ছুটে বেড়িয়ে গেল উকীলের কাছে। তার পরামর্শ নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ রাঁচিতে চারখানা আজেন্ট টেলিগ্রাম ক'রলে, মাসিমার নামে আর তার ভাগ্নে অমলের পক্ষে কমলার নামে। টেলিগ্রাম দুটো গেল যে বাড়ী কিনতে চেয়েছিল তার নামে, আর দুখানা গেল রাঁচীর একজন বড় উকীলের নামে।

অনন্ত চিঠি ডাকে পাঠাননি, নিজেই সে চিঠি নিয়ে রাঁচী গিয়েছিল, চটপট কাথা শেষ ক'রে আসবার জঙ্গ। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল বিকাশের পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে খরিদার পেছ পা'। আর যে উকীলকে টেলিগ্রাম কথা হ'য়েছিল, তিনি তাকে ডেকে শাসিয়ে দিলেন যে বাড়ী বেচাব কোন চেষ্টা করলে অনন্তকে আদালতে লাক্কনা পেতে হবে।

রাগে ফোস ফোস ক'রতে ক'রতে অনন্ত ফিরে এলো ক'লকাতায়। মাসিমার কাছে এসে লক্ষ-বক্ষ ক'রে তাঁকে গালাগালি ক'রতে লাগলো—ব'ললে, “আমি এবিয়ের সাতো নেই পাঁচেও নেই। আমি চন্ডাম, কেমন ক'রে বিবাহ হয় দেখি।”

রাঁচীর বাড়ী বিক্রি বন্ধ হ'য়ে গেছে, সেখানকার উকীলের চিঠিতে এই খবর পেয়ে মহা উল্লাসে বিকাশ আসছিল মাসিমার কাছে। তাঁর সামনে অনন্তকে দেখে তার বুক কঁপে উঠলো।

উকীলের পরামর্শ—স্বধু পরামর্শ নয়, তাঁর ভীত উত্তেজনার কলে বিকাশ টেলিগ্রামগুলো পাঠিয়েছিল। তার পর থেকেই তার বুক কাঁপছিল অনন্তের সঙ্গে এই অবশুস্তাবী সাক্ষাতের কল্পনায়। সে ভাবলে যে অনন্ত তাকে গাল দিয়ে ভূত খেঁড়ে দেবে। কী যে সব কাণ্ড ক'রবে তা কল্পনাই করতে পারছিল না, স্বধু ভয় করছিল। ছেলে বেলার কারণে অকারণে অনন্তর কাছে কাণ্ডমালা ও চড় চাপড় খেয়ে তার অবচেতনায় অনন্তের সম্বন্ধে যে একটা অহেতুক ভীতি ছিল তাতে তাকে এই সাক্ষাতের সন্ধাননা কল্পনায় ভারী সঙ্কচিত ক'রে দিয়েছিল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে প'ড়েই সে দেখতে পেলো অনন্ত ভীষণ ক্রুদ্ধ ; গর্জনশীল অনন্ত । দেখে তার পেটের লীলে চমকে গেল ।

কিন্তু ফিরবার পথ নেই, কাজেই সে যেন কিছুই জানে না এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো অনন্তের ক্রুদ্ধ গর্জন ও ভিরঙ্কার শোনবার শশঙ্ক প্রতীক্ষায় ।

কিন্তু না হ'ল গর্জন না হ'ল ভিরঙ্কার ।

কলে দেখা গেল যে অনন্তের সামনে সামনি দাঁড়াতে বিকাশের যে সঙ্কোচ, অনন্তের ভয় বা সঙ্কোচ তার চেয়ে ঢের বেশী । বিকাশের কাছে তার সব ফন্সী ক'ক হ'য়ে গেছে জেনেই অনন্ত কাবু হ'য়ে প'ড়েছিল । তারপর রাঁচীতে একবার বিকাশের মুখ ভেঙে দেবার একটা সামান্য প্রস্তাব করায় অনন্ত যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিল তাতে বিকাশের সামনে ট্যাংক্‌ই ম্যাগাই করা সম্বন্ধে তার একটা বেশ সূস্থ অকচিৎ জন্মেছিল ।

তাই বিকাশকে দেখেই তার লক্ষ বক্ষ হঠাৎ চুপসে গেল এবং তার মানসিক লাঙ্গুল নিঃশেষে গুটিয়ে নিয়ে সে নিঃশব্দে সটকান দিলে ।

বিকাশের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো ।

সে মাসিমাকে তার সংবারটা জানালে ।

মাসিমা বললেন, “সে শুনেছি অনন্তের কাছে । তাতে ভারী বাগ হ'য়েছে বাবুর !” ব'লে তিনি হাসলেন । তারপর বললেন, “যাক বাবা একথা নিয়েও যদি আর কিছু বলে তাতে কিছু বলিস নে তুই । ও কথা আর ঘাঁট-ঘাঁটি ক'রে কাজ নেই । এখন বিয়েটা নিৰ্ব্বিয়ে—”

অনন্ত যদিও বললে যে, সে এ বিয়ের সাতোড় নেই পাচোড় নেই, তবু, এখনও যখন বিয়ের পাঁচ হাজার টাকা খরচ হ'তে বাকী আছে তখন সেগুলো খরচ না ক'রে অমনি হাত পা ধুয়ে ব'সে থাকবার মতলব তার সত্যি সত্যি ছিল না ।

টাকাটা বিকাশের হাতে পড়েছে—সেটা আদায় করবার চেষ্টার দু'দিন পর সে বিকাশকে বললে, “টাকাগুলো চাই যে এখন ।”

টাকা দিতে সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কিন্তু ‘না’ বলাও বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব । মুখের উপর কাউকেই সে ‘না’ ব'লতে পারে না কোনও দিন ।

বিস্তর সাহস সংগ্রহ ক'রে বিকাশ বললে, “কাজ কত দরকার ?”

অনন্ত দেখলে—হিসেব চায় । আর সব টাকা চাইতে সাহস হ'ল না । ব'লতে গেলো আজ কিছুই ছিল না । তবু অনন্ত বিস্তর চেষ্টা ক'রে মাথার আনাচে কানাচে খুঁজে দশ বারোটা দকা উদ্ভাটন ক'রে ফেললে, তার সব যোগ ক'রে খুব টেনেও চায়শো টাকার বেশী হ'ল না ।

সে টাকাটা ফেললে বিকাশ ।

এর পর অনন্ত হতাশ ও নিকংসাহ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে, তারপর খরচ খুব বাহুল্যের সঙ্গে হ'লেও একটু শৃঙ্খলার সঙ্গে হ'ল ।

[কমণঃ

কালিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

এগার

১২ । হস্তলাঘব—টাকাকার বলিরাছেন—ইহার অর্থ—‘সকল কর্ণে লঘুহস্ততা । কালান্তিপাত দূর করিবার নিমিত্ত ইহার উপযোগিতা । দ্রব্যহানিতে লঘুতা—কৌড়ার্ধ ও বিষয় জন্মাইবার নিমিত্ত ।’

টাকাকারের প্রথম অর্থটি পরিষ্কার । যে-কায়্য কবিতো সাধারণতঃ বহু সময় লাগে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার অন্তর্ধান—হস্তলাঘবের বিষয় । সময় বাঁচানই ইহার উদ্দেশ্য । দ্বিতীয় অর্থটি একটু অস্পষ্ট । মনে হয়—ইহাতে হাত সাফাই-এর ইঙ্গিত আছে । খেলা (অর্থাৎ ম্যাজিক) দেখাইয়া লোকের মনে চমক লাগাইবার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য উড়াইয়া দেওয়া—ঘুঁটিবাজি ।

৩ মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে টাকাকারবাদের বলা হইয়াছে—“অনেক সময় লইয়া নিষ্পাদ কর্ণের অল্প সময়ে শিক্ষা করা । দ্রব্যের হানিতে, কৌড়ার্ধ বা বিষয় জন্মাইবার জন্য লঘুহস্ততা দ্বারা

১ “সর্বকর্ষিত লঘুহস্ততা । কালান্তিপাতনিরাসার্থম্ । দ্রব্য-হানিষু বা লাঘবঃ কৌড়ার্ধঃ বিদ্যাপনার্থকঃ”—জয়মঙ্গলা ।

তাহার রক্ষাকরণ । (অলঙ্কারে অভিধায় হস্ত-সকালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্তন করা । বাজী-বিশেষ ।) ২

৪ তর্করত্ন মহাশয়ের অর্থ—“(হাতসাফাই) তাহার ফলে—ঘুঁটিবাজি ভাস উড়ান প্রভৃতি হইয়া থাকে ” ।

৫ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“অলঙ্কারে অভিধায় হস্ত-সকালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্তন করা । ইহা এক চমৎকার বাজী । এখনও অনেক হস্তলাঘবপটু বাজীকর আছে ” ।

৬ সমাজপতি মহাশয়ের অর্থ—“হাতের লঘুতার কোন কাজ-কর্ম দেখাইয়া উপাঞ্জনের পথ । বোপ হয় ইহাও একরূপ ভোজবাজী ” ।

“কোন কাজকর্ম”—এই অংশটুকু স্পষ্ট নহে । বোধ হয়, টাকাকারের প্রথম অর্থটি প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে—কিন্তু পরিস্ফুট হয় নাই ।

২ পৃঃ ১১ । এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে—টাকা হইতে—“দ্রব্যের হানিতে...লঘুহস্ততা দ্বারা তাহার রক্ষা করণ”—একপ অর্থ আসে কোথা হইতে ? বরং দ্রব্যের হানিতে হস্তের লঘুতা—খেলা দেখাইতে বা বিষয় জন্মাইতে (অর্থাৎ দ্রব্য উড়াইয়া দেওয়া)—একপ অর্থই সম্ভব মনে হয় ।

৮ কুমুদচন্দ্র সিংহের মতে—“সর্বকথ্যে ভক্তের লঘুতা এবং ভক্তি দেখাবার সময় হাতের সাফাই” ৩

১০। বিচিত্র-শাক-মূল-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া

ও

১৪। পানকরস-রাগাসব-যোজন—যশোধরেন্দ্রপাদের মতে এই দুইটি ভিন্ন কলা নহে—একই কলার দুইটি বিভাগ মাত্র। ৪

টাকার অনুবাদ প্রথমে দেওয়া যাইতেছে—“আহার চতুর্বিধ—ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেজ পের। তন্মধ্যে ভোজ্য বলিতে বুঝায়—অন্ন (ভাত) ও বাজ্ঞন। ভাত ও বাজ্ঞনের মধ্যে আবার বাজ্ঞন-রন্ধন প্রায় অধিক লোকেরই ভাল জানা নাই। তাই বাজ্ঞনের শ্রেষ্ঠ যে শাক ভাগকে লইয়াই বাজ্ঞন-রন্ধন-প্রক্রিয়া দেখান হইতেছে। শাক দশবিধ বলা হইয়াছে—মূল, পত্র, করীর, অগ্র, ফল, কাণ্ড, প্রকট, বক্, পুষ্প ও বটক—এই দশপ্রকার শাক।

পের দ্বিবিধ—অগ্নি দ্বারা নিষ্পাদিত ও তদ্বিন্ন। উভাদের মধ্যে পূর্বোক্ত-প্রকার পের ‘ষব’-নামে প্রচলিত। উহা আবার দ্বিবিধ—মৃগাদির নিষ্যাকৃত ও কাষরস।

ভক্ষ্য—খণ্ডখাদ্যাদি। নানাজাতীয় এই সকলের (শাক-মূল-ভক্ষ্য-দ্রব্যের) ক্রিয়া অর্থে পাকবিদ দ্বারা নিষ্পাদন।

আর সে পের অগ্নি-দ্বারা নিষ্পাদিত হয় না, তাহা দ্বিবিধ—সন্ধানকৃত (অর্থাৎ মিশ্র) ও তদ্বিন্ন, (অসন্ধানকৃত)। উভাদের মধ্যে পূর্বোক্ত-প্রকার আবার দ্বিবিধ—দ্রাবিত ও অদ্রাবিত। উভাদের মধ্যে দ্রাব্য গুড়-তিস্তিষ্টী (মিশ্রান) জলের সহিত সংযোগ করিয়া নির্দ্রিত হয়, তাহা ‘দ্রাবিত’। তাহারই নামান্তর ‘পানক’। আর দ্রাব্য অদ্রাবক ঔষধের সহিত তাল-মোচাকল (কদলী) ইত্যাদির সংযোগ করিয়া নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা ‘অদ্রাবিত’—উহারই নামান্তর ‘রস’।

আসব-শব্দটির প্রয়োগ-দ্বারা অসন্ধান-কৃত পেরের সূচনা করা হইয়াছে। উহা মৃদু-মধা-তীক্ষ্ণ সন্ধান-যোজন-দ্বারা তথ্যবিশিষ্টকপে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ৫

‘রাগ’-শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা ‘লেজ’ ব্রুতিত হইয়াছে। যেহেতু উহা (রাগ) দ্বিবিধ। উক্ত হইয়াছে—রাগবিধানজগণ বলিয়াছেন রাগ (দ্বিবিধ)—স্নেহ, চর্ব ও দ্রব। উহা দ্বিধা মধুবাষাদ-সংযুক্ত লবণাক্ত-কটু-ষাদ।

আহাভ-কলার এই চতুর্বিধ বিস্তার শরীৰস্থিতির অনুকূল।

৩ কাঃ স্ঃ বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৫। শিরশুশ্মাঞ্জলি, পৃঃ ৭। কল্পিপ্রাণ, পৃঃ ১০। কৌমুদী, পৃঃ ২৯।

৪ ললিতকলা (চার) বঙ্গজী, চৈত্র ১৩৫০, ত্রৈলোক্য।

৫ টাকার এই অংশ সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ আছে। সন্ধানকৃত (মিশ্রিত) পের—দ্রাবিত বা পানক ও অদ্রাবিত বা রস। অসন্ধানকৃত (অমিশ্র) পের—আসব। ইহা যদি হয় তাহা হইলে আবার উহাতে মৃদু-মধা-তীক্ষ্ণ সন্ধান-যোজন কিরূপে সম্ভব? একারণে মনে হয় শুদ্ধ পাঠ—“মৃদু-মধা-তীক্ষ্ণসন্ধান-যোজন”।

যোগ-বিভাগ ৬ অগ্নিজাত ও অনগ্নিজাত ক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ তন্মধ্যে পাক-দ্বারা শাকাদি-ক্রিয়া ও বিনা পাকে পানকাদিযোজন। অতথা ‘আহাভবিধি’—এইরূপ নাম উক্ত হইতে পারিত। অতএব, (ইহা বুঝা যায় যে) কৰ্মভেদ-বশতঃ আহাভবিধানও দ্বিবিধ। তদ্বশতঃ একটিই কলা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কথিত হইয়াছে। ৭

যশোধরের বক্তব্য একটু পরিষ্কারভাবে বুঝান প্রয়োজন। তাঁহার মতে—খাদ্য-দ্রব্য মোট চারি শ্রেণীর—১ ভোজ্য, ২ ভক্ষ্য, ৩ পের ও ৪ লেজ। ভোজ্য ও চুষ্য (চোষ্য) একই। আবার ভক্ষ্য ও চর্ব্য—একই। ভোজ্য বলিতে বুঝায় ভাত ও তরকারী (বাজ্ঞন)। ভাত-রাধা অপেক্ষাকৃত অন্ন্যাস-সাধ্য। কিন্তু ভালরূপে রন্ধন কৰ্ম্মবিধিতে প্রায়ই লোক জানে না। রন্ধনের মধ্যে

৬ যোগ-বিভাগ—যোগ-সূত্র। প্রত্যেকটি কলার নাম সূত্রাকারে সংগৃহীত হওয়ায় প্রত্যেক নামটিই এক একটি যোগ। আহাভ-কলা মূলতঃ একটি যোগ। তবে উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে—অগ্নিজাত ও অনগ্নিজাত এই দুই শ্রেণীর খাদ্য পৃথক্ করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে।

৭ চতুর্বিধ আহারঃ, ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেজ-পেরমিতি। তত্র ভোজ্যম্—ভক্তব্যজ্ঞনয়োবাজ্ঞনারাধনং প্রায়শো ন সজ্ঞানমিতি বাজ্ঞনাগস্ত শাকভোজ্যাদানেন, দর্শয়তি। তত্র শাকঃ—দশবিধম্। যথোক্তম্—“মূলপত্রকরীরাগ্রফলকাণ্ডপ্রকটকম। বক্ পুষ্প কটকঃ চেতি শাকঃ দশবিধঃ স্মৃতম্।” পেরঃ দ্বিবিধম্, অগ্নিনিষ্পাদ-মিতরচ। তত্র পূর্বঃ যুবাধম্। তত্র দ্বিবিধম্—মৃগাদিনিষ্যাকৃত-কৃতম্, কাষরসক। ভক্ষ্যঃ খণ্ডখাদ্যাদি (খণ্ডখাদ্যাদি)। এষাঃ নানাপ্রকারাণাং ক্রিয়া পাকবিধানেন নিষ্পাদনম্। যদনগ্নি-নিষ্পাদনং পেরঃ তদ দ্বিবিধম্—সন্ধানকৃতম্ ইত্যরচ। তত্রোক্ত-দ্রবিতম্ অদ্রাবিতক। তত্র যদ গুড়তিস্তিষ্টিকাদিজলেন সংযোজ্য-ক্রিয়তে, তদ দ্রাবিতং পানকাধম্। যদদ্রাবকৌষধেন তালমোচা-ফলানি সংযোজ্য নিষ্পাদ্যতে, তদ অদ্রাবিতং ঔষধাধম্। আসব-গ্রহণেনাসন্ধানমূলক্ৰয়তি। তন্মৃদুমধাতীক্ষ্ণসন্ধানযোজনাস্তথা-বিধমেব নিষ্পাদ্যতে। রাগগ্রহণং লেহং সূচয়তি, তস্ত ত্রৈবিধ্যং। তথা চোক্তম্—“রাগো রাগবিধানজৈলেহশূর্ণো দ্রবঃ স্মৃতঃ। লবণাক্তকটুষাদ দ্বিধাধুদস, স্মৃতঃ”। ইতি। এতচ্চতুর্বিধমাহাভ-কলয়াঃ প্রপঞ্চিতং শরীরস্থিত্যর্থম্। যোগবিভাগোহগ্নিজানাদি-জকৰ্ম্মদর্শনার্থঃ। তত্র পাকেন শাকাদিক্রিয়া। বিনা পাকেন পানকাদিযোজনম্। অতথা—আহাভবিধিরিত্যুক্তং—ত্ৰাং। তন্মতঃ কৰ্মভেদাদাহাভবিধানজ্যোহপি (?) দ্বিবিধঃ। তদ্বশাদেকাপি, কলা দ্বিধাকৃত্যোক্তা—জয়ম্।

ত্রৈলোক্যঃ—“আহাভবিধানজ্যোহপি”—পাঠটি, সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ-দুষ্ট। অথবা, উহার একরূপ অর্থও করা চলে—কৰ্মভেদে (অর্থাৎ উপজীবিকার ভেদানুসারে) আহাভকলাবিধি দুই শ্রেণীর (এক শ্রেণীর রন্ধনকারী, চালুইকর ইত্যাদি; ও দ্বিতীয় শ্রেণীর—সরবৎ ইত্যাদি—প্রস্তুতকারক)। এতদনুসারে একটি কলাকে দুই ভাগ করিয়া বলা হইয়াছে।

শাকই প্রধান। শাক—নিরামিষ, ব্যঞ্জন। উহা দশ প্রকার যথা—মূল (মুলা, আলু, কচু, ওল ইত্যাদি), পত্র বা পাতা (ন'টে, পুঁই প্রভৃতি শাকের পাতা), করীর বা কৌড় (কচি বাশের কৌড়), অগ্র বা আগা (বেতের আগা, ন'রিকেল ও খেজুরের আগা—যাহাকে চলিত ভাষায় 'মাখি' বলা যায়), ফল (বেগুন, পটল, লাউ, কুমড়া, ঝিনে, উচ্ছে, কাঁচা পেঁপে ইত্যাদি), কাণ্ড বা গুঁড়ি (অর্থাৎ ডাঁটা—ডেংগো ডাঁটা, ন'টের ডাঁটা ইত্যাদি), প্রকট বা অক্ষুর (ছোট ছোট শাকের চারা, বাশের কৌক ইত্যাদি), বৃক্ষ-জাল (অর্থাৎ খোসা—সজনের জাল, আলু, পটল, কুমড়ার খোসা ইত্যাদি), পুষ্প বা ফুল (মোচা, সজনে, কুমড়ার ইত্যাদির ফুল) ও কণ্টক বা কাঁটা (কাঁটা-ন'টে ইত্যাদি)। এই তইল দশবিধ শাক। ইহাই ব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান। ব্যঞ্জন আবার ভোজ্যের প্রধান অংশ। 'ভোজ্য'—সাধারণতঃ চমিয়া খাওয়া হয়—এ-কারণে ইহাকে 'চুয়া' (না চোষ্য) নামও দেওয়া হইয়া থাকে।

উহার পর্ব 'লক্ষ্য'। ভক্ষ্য সাধারণতঃ চিবাইয়া পাওয়া হয়—এ-ততু ইহাও নামান্তর 'চের্য'। দৃষ্টান্ত—মোদক, পিষ্টক (অপপ), লড্ডুক, খণ্ড (খাঁড়), সিতা (মিছনি) ইত্যাদি। চিড়া, মুড়ি, খই, কচি, লুচি ইত্যাদি কঠিন খাদ্যমাত্রই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পেয়—তবল খাত্ত—পানিব যোগা। পেয় সাধারণতঃ দুই প্রকার—অগ্নি জ্বালায় যাচা রন্ধন করা হয়, আর যাচা রন্ধন করা হয় না। রন্ধন করা পেয়ের নাম যু। যম আবার দুই প্রকার—ঝোল বা নিষ্কাষিত সাবাং (যথা—মুগের ডালের যু, মাংসের মাছের যু ইত্যাদি), ও কাথরস (যথা—কবিবাক্তি পাচন, অরিষ্ট ইত্যাদি)।

শাক, ভক্ষ্য ও অগ্নি-নিষ্পাণ্ড পেয়—উহাদের বিভিন্ন প্রকার অগ্নিতে পাক দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সকল খাত্ত রন্ধনের কৌশল বিচিত্র-শাক যম-ভক্ষ্য-বিকার ক্রিয়া কলাটির অন্তর্গত। এক কথায় এই কলাটিকে 'রন্ধন-কলা' বলা চলে, কারণ রন্ধন-করা যত কিছু খাত্ত-সকলই ইহার মধ্যে পড়ে।

আব বে পেয় রন্ধন করা হয় না—কাঁচাই বাচা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে—অগ্নি সহিত যাচাব সংস্পর্শ-মাত্রও নাই—সেইরূপ পেয়ও দুই শ্রেণীর। নানাবিধ উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া বাহ্য তৈয়ারী করা যায়, তাহা প্রথম শ্রেণীর পানীয়। আব দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—বাহ্য নানা দ্রব্যের মিশ্রণে নিষ্পাদিত হয় না।

নানা দ্রব্যের একত্র সংমিশ্রণে যে পানীয়েব সৃষ্টি, তাহাও আবার দুই প্রকার—জাবিত (অর্থাৎ বাহ্য জলে গুলিয়া তৈয়ারী করা যায়) ও অজাবিত (বাহ্য জলে গুলতে হয় না)।

গুড়, তেঁতুল ইত্যাদি দ্রব্য জলে গুলিয়া তাহার সহিত দধি ও অম্লজ উপাদান একত্র মিশাইয়া যে পেয় উৎপন্ন হয় তাহা জাবিত পানীয়—উহারই ন্যূনতম—পানক (অর্থাৎ সরবত)।

৮ মূলে আছে 'মূলপাদিনিবৃহকৃত'; নিবৃহ অর্থে সাব, ০৬৪০০০, যথা—মুগের বা ময়ূরির যু।

আব বে পানীর জলে গুলিয়া তৈয়ারী হয় না, পাকান্তরে—যাহা অজাবক ঔষধের সহিত তাল, কলা, লেবু ইত্যাদির সংযোগ করিয়া তৈয়ারী হয়, তাহা অজাবিত পেয় বা 'রস'। এমন ঔষধ আছে, যাহার সহিত তাল, কলা, ইন্ডু লেবু (জখীর) ইত্যাদি ফল মিশাইয়া রাখিয়া দিলে ঐ সকল ফলের রস আরকের আকাবে নির্গত হইয়া থাকে। ঐ আরকই 'রস'-শব্দ-বাচ্য। উগ বর্তমানে 'সিবকা' (বা 'ভিনিগার') নামেই প্রচলিত। উহার কিছু মাদকতা-শক্তি ও জীর্ণ করিবার শক্তি আছে।

পানক (সরবত) ও রস (ভিনিগার—সিবকা) মিশ্র পানীয়েব অন্তর্ভুক্ত। অমিশ্রিত পানীয়েব দৃষ্টান্ত—'আসব'। আসব মাদকতা-শক্তি রসের অপেক্ষা অধিক। বর্তমানে আয়ুর্কোষের চিকিৎসালয়গুলির বিজ্ঞাপনের বাতলো আয়ুর্কোষোক্ত—দুইটি বিভিন্ন জাতীয় পানীয় ঔষধের নান আয়ুর্কোষের বিশেষ পরিচয় হইয়া উঠিয়াছে—আসব ও অরিষ্ট। কোন পদার্থ জলে ভিজাইয়া বকযন্ত্রাদির সাহায্যে চুষাইয়া লইলে 'অরিষ্ট' প্রস্তুত হয়। উহাতেও মাদকতা-শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। উহাতে অগ্নিসম্পর্ক বটে—এ কারণে উহাকে কাথ রসের অন্তর্গত বলা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—আসব। উহাতে অগ্নি সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না বা বকযন্ত্রাদি দ্বারা উহা চুষাইয়া লইতেও হয় না। যে কোন একটি দ্রব্য অল্প দ্রব্যের সহিত না মিশাইয়া জলে ভিজাইয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। দীর্ঘদিন পচিলে উহাও মধ্যে সুরাসার (alcohol) আপনি জন্মিয়া থাকে। তখন উহা ছাঁকিয়া লইলে যে দ্রব্য মাদকতা-শক্তি-বিশিষ্ট অথচ পুষ্টিকর তবল অমিশ্র অনগ্নি-নিষ্পাণ্ড পানীয় পাওয়া যায়, উহাই 'আসব'। দ্রব্য-বিশেষ অনুসারে, অথবা পচাইবার কালভেদ অনুযায়ী আসবের মাদকতা-শক্তিও তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে—মৃদু, মধ্য ও তাক্ত। মৃদুর মাদকতা-শক্তি ও কাঁক কম, মধ্যের মাঝারি, ও তাক্তের অত্যধিক।

'রাগ'-শব্দটির ব্যবহার-দ্বারা লেহ-পদার্থের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। লেহ-রাগেরই একটি প্রকার ভেদ মাত্র। 'রাগ' বলিতে তিন প্রকার খাত্ত বুঝায়—(১) লেহ বা অবলোহ—যাহা চাটিকা খাওয়া যায়—চাটনী, আচাব, কাশুলী, মোরকা, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি জাতীয় পদার্থ; এ শ্রেণীর খাত্ত খুব কঠিনও নয়, খুব তরলও নয়—মাকামায নবম—অনেকটা কাদা-কাদা দ্রব্য; (২) চূর্ণ—খুব কঠিন দ্রব্য হইলে উহাকে গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিতে হয়; ইহাও প্রধান দৃষ্টান্ত 'গোটা'; (৩) দ্রব—লেহ যদি অতিরিক্ত তরল হয়, তবে তাহাও নাম 'দ্রব' (পাতলা)। কচি আমের কাঁচা কোল, নানাকপ পাতলা অমল ইত্যাদি দ্রব শ্রেণীর অন্তর্গত ১০।

৯ মূলে আছে—'মোচাকল'। 'মোচা' বলিলে—বৃকতে হইবে—কলা গাছ। মোচাকল = কলা। বাঙ্গালা ভাষায় অবশ্য 'মোচা' = কলার ফুল মাত্র—পূগাপূব কলাগাছটিকে বাঙ্গালার 'মোচা' বলে না। সংস্কৃত কলাগাছের নামও 'মোচা'।

১০ অবশ্য—ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে—এই সকল কোল বা অমল বাহ্য নহে—কাঁচা। বাঁধা হইলে সেগুলি পড়িবে যু

অবশ্য পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে একথা মনে করা অজ্ঞায় হইবে যে, তিন শ্রেণীর রাগ-দ্রব্য কেবল অস্বাদ বা অমমধুর হইয়া থাকে। যশোধর বলিয়াছেন—রাগ-দ্রব্যের আশ্বাদ অতি বিচিত্র। লবণাশ্বাদ, অস্বাদাশ্বাদ ও কটু আশ্বাদ—এই তিন প্রকার আশ্বাদই রাগদ্রব্যে প্রধানতঃ পাওয়া যায়। তবে রাগদ্রব্যে কবাস্বাদের যে একেবারেই অভাব—এমন কথাও বলা চলে না। কেবল তিজাস্বাদেরই ইচ্ছাতে অভাব। আর লবণ-অন্ন-কটু-কবায় বাড়াই আশ্বাদ হউক না কেন, ঈষৎ মধুরাশ্বাদ প্রত্যেক রাগদ্রব্যেই ভূষিত থাকে—ইহাই যশোধরের অভিমত।

'বাগ'-শব্দটির অর্থ—অমুরাগ, শ্রীতি, রুচি, ভালবাসা, টান। খাণ্ড-দ্রব্যে রুচি কিবাইয়া আনে বলিয়াই এ জাতীয় খাণ্ডের নাম 'রাগ-দ্রব্য'।

টীকাকার পরিশেষে বলিয়াছেন—মোটের উপর ২৩ ও ২৪ সংখ্যক কলা দুইটি একই মূল 'আশ্বাত্ত-কলা'র অন্তর্ভুক্ত। আশ্বাত্ত-কলার চতুর্বিধ ভেদ—ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয় ও লেহ (রাগ)। শবীষ বাহাতে শুষ্ক থাকে ও পুষ্টিলাভ করে, তাহার নিমিত্ত আশ্বাত্ত-কলার জ্ঞান ও প্রয়োগের একান্ত প্রয়োজন। আশ্বাত্ত-কলাটিকে কথ্যভেদে (অর্থাৎ প্রক্রিয়াভেদে) অমুরাগী দ্বিধা বিভক্ত করা চলে—(১) অগ্নিজ (অর্থাৎ পাকক্রিয়া-সাপেক্ষ আশ্বাত্ত-বিধান) ও (২) অনগ্নিজ (অর্থাৎ পাকক্রিয়া ব্যতীত আশ্বাত্ত-বিধান)। শাকাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, যম-শ্রেণীর পেয় ও মোদকাদি ভক্ষ্য প্রস্তুত করা পাক-ক্রিয়া-সাপেক্ষ। আর পানক-রস-আসব-শ্রেণীর পেয় ও বাগ (লেহ) প্রস্তুতকরণ পাকক্রিয়া-নিবপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর নাম দেওয়া চলে—'রন্ধন-কলা'। ভাত, তরকারি, বোলস, পাঁচন, পিঠে ইত্যাদি। রাধিব্যার কৌশল রন্ধন-কলার অন্তর্ভুক্ত। ইহাবট কামনুস্তোত্র নাম বিচিত্র-শাক-যুষ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া'। আব দ্বিতীয়টি 'অরন্ধন-কলা'। না রাধিয়া সরবত, সিংক, চাটনী, আচার, গোঠা, ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার কৌশল এই অরন্ধন-কলার অন্তর্গত। কামনুস্ত্রে ইহার নাম—'পানক-রস-রাগাসব-যোজন'।

মোটের উপর এক কথায় এই দ্বিধা বিভক্ত আশ্বাত্ত-কলাই গাণ্ডীয়া-কলা-সমূহের লীধস্থানীয়।

৮ মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে বলা হইয়াছে—“সুতরাং কথ্য-ভেদে আশ্বাত্তবিধানজ্ঞও (?) বিবিধ। তদনুসারে একই কলা

শ্রেণীর মধ্যে। আবার কাঁচার মধ্যেও এই 'দ্রব্য' দ্রব্য অল্প দ্রব্যাক্রমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইবে না। কারণ, নানাদ্রব্য একত্র মিশাইয়া জলে গুলিয়া বাহা প্রস্তুত হয়, তাহা পানক-শ্রেণীর পেরের অন্তর্গত। কাঁচা আম-ইন্দ্রধূমি বোঁড়-গাউয়া উহার কাঁচা রস বাহির করিয়া তাহাই পাতলা চাটনীর মত ব্যবহৃত হইলে উগাক, দ্রব রাগ-দ্রব্যের দৃষ্টান্ত বলা চলে। এই শ্রেণীর যে পাতলা অমল ইত্যাদি, তাহাও রাধা নহে, কাঁচা—ইহাই বৃকতে হইবে।

দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রথমভাগে এবং লেহ-পেয় দ্বিতীয় ভাগে কথিত হইয়াছে। অগ্ন্যথা পরস্পর মিলিত হইয়া একটা গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা ছিল” (পৃঃ ২২)।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে প্রথমভাগে কেবল ভক্ষ্য ও ভোজ্যের কথা বলা হয় নাই পাননিপ্পন্ন, পেয়ের কথাও বলা হইয়াছে। কথ্যও বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় ভাগে কেবল অগ্নক পেয়-সমূহ ও লেহাদি দ্বিবিধ রাগ-দ্রব্যের বিবরণ আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইটি কলা 'পরস্পর লিখিত হইয়া একটা গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা' কোথায়? গণ্ডগোল কিছুই হইত না—তবে সে অবস্থায় দুইটি পৃথক পৃথক কলার নাম না দিয়া একটি মাত্র নাম দিতে হইত—'আশ্বাত্ত-কলা' বা 'আশ্বাত্ত-বিধান'। বক্তৃতঃ, কলা একটিই আশ্বাত্তবিধি। কথ্যভেদে ঐ একটিই কলার দ্বিধা বিভাগ করিয়া দুইটি নামে পৃথক পৃথক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—ইহাই টীকাকারের আশয়।

৯ তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“টীকাকার বলেন, ইহা নামতঃ ভিন্ন হইলেও একই কলা; সর্ববিধ পানাহার প্রস্তুতের উপদেশ এই কলাতে আছে। কিন্তু একই কলা দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগ—ব্যাঞ্জন (শাক), বোল (যুষ), মিষ্টান্ন, অন্ন, পিষ্টকাদি (ভক্ষ্য-বিকার) প্রস্তুত বিষয়ে এবং দ্বিতীয় ভাগ, সরবৎ (পানক), সিঁকা (রস), চাটনি (রাগ) এবং বিবিধ সুরাট আসব প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ের উপদেশে পূর্ণ। এক প্রকার পানাতার পাক-সাপেক্ষ, অল্পপ্রকার পাক-নিরপেক্ষ, এই কারণে পৃথগ্ভাবে উল্লেখ হইয়াছে”।

১০ বেনোন্তবাগীশ মহাশয় নাম দিয়াছেন—“চিত্তভক্ষ্যক্রিয়া আশ্চর্য আশ্চর্য উপায়ে খাণ্ড প্রস্তুত করণ”। কিন্তু কি জাতীয় খাণ্ড তাহা স্পষ্টভাবে বলেন নাই। দ্বিতীয় কলাটিরও নাম তাহার মতে—“পানকরসযোগ—মজ, নানাপ্রকার সরবৎ ও আচার মোরকা প্রভৃতি প্রস্তুত করণ”।

১১ সমাজপতি মহাশয় নামকরণ ও ব্যাখ্যায় ১২ বেনোন্তবাগীশ মহাশয়ের অনুগামী—“চিত্তভক্ষ্য-ক্রিয়া;—চমৎকার ও নানাবিধ খাণ্ডদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, ময়দার কাজ। পানকরস-যোগ; আশ্ব প্রভৃতি ফলের আচার ও সুরা প্রভৃতি পানীয় রসের প্রস্তুত প্রণালী”।

১৩ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—প্রথমটি “নানাপ্রকার শাকব্যাঞ্জন প্রস্তুত ক্রিয়া (স্থপশাস্ত্র)”। আর দ্বিতীয়টি—“সরবৎ, পেয় প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য। জয়মঙ্গলা-টীকার ৪ সম্বন্ধে বিদ্যুত বর্ণনা আছে” ১১১

[ক্রমশঃ]

১১ কাঃ স্থঃ, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬৫; শিঃ পুঃ, পৃঃ ৭; কঙ্কিপুয়াং, পৃঃ ২৪; কোহলী, পৃঃ ২১—৩০।

সৃষ্টিরহস্য (একটি নাটক)

পাত্রপাত্রীগণ—কবি, কবি-পত্নী ও চাবজন ভূত।

দৃশ্য—কবির লিখিবার ঘর। সময়—বাত্তি।

বর্ধাকাল। নদী বঁকের মুখে বাড়ী। চারিদিকে জল। জায়গায় জায়গায় জল ভেদ করিয়া মাটি দেখা যাইতেছে। কবির গদখানি নানারূপ আসবাবে পূর্ণ। একই ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা ও কুংসিতের একপ মিলন সচরাচর দেখা যায় না। ঘরের এক কোণে একটি কর্ণারপিসের (corner piece) উপর Eustien-র Madonna and Child-র অমুকরণে নিখিত সিমেন্ট ভরমান একটি ছোট মূর্তি। এ পর্যন্ত যত মাতৃমূর্তি নিখিত হইয়াছে তাহাব মধ্যে বোধ হয় এই মাতৃমূর্তিই সর্বাপেক্ষা কুংসিত। আর এককোণে কড়িকাঠের কাছে একটি মাকডসা জাল বুনিতোছে। ঘরটা আগাগোড়া সন্ধ্যা কাপেটে মোড়া; এক পাশে খানকয়েক চেয়ার, কিন্তু কোনটাই পূর্ণাঙ্গ নহে। দেওয়ালে সন্ধ্যা একটি ঘড়ী বন্ধ হইয়া বহিয়াছে। খোলা জানলাব সামনে একটি টেবিল। টেবিলের উপর একটি টেবিল-ল্যাম্প জলিতেছে। কবি টেবিলের নিকট চেয়াবে বসিয়া তাহাব মহাকাব্যেব দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে ব্যস্ত। কবির চেহারাটা এমন, যে, ঠিক বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু দেখিলে খানিকটা উপলব্ধি হয়।

(কবিপত্নীর প্রবেশ)

কবি-পত্নী। অনেক বাত হোয়েছে—শোবে চল।

কবি। (প্রথমে আশ্চর্য্যাবৃত্ত ভাবে) বাত, বাত হোয়েছে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি কবি, আমি স্রষ্টা, আমি সত্যস্রষ্টা, আমার কাছে বাতনিন সবাই সমান, কালের গতি এখানে প্রতিহত।

কবি-পত্নী। আচ্ছা, বাত হোয়েছে, আর বোলব না বাত হোয়েছে, কিন্তু সেই কখন থেকে বোসে বোসে কি লিখছ, এখন একটু বিশ্রাম করবে চলো।

কবি। আমার আবাব বিশ্রাম। সৃষ্টিকার্য্য এক মুহূর্তেব ভগ্নেও বন্ধ থাকতে পারে না। আমার কলম যখন বন্ধ থাকে তখনও সৃষ্টিকার্য্য চলে কিন্তু তখন সেটা হয় মনে। সৃষ্টির প্রধান কাজই ত মন।

কবি-পত্নী। হেঁয়ালি রাখ, দেখ যতক্ষণ না তুমি শুতে বাবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ছি না, এই আমি বলুন।

(চেয়াবে বসিতে উত্তত)

কবি। না, না, তা হোতেই পারে না। যখন আমি কবি, আমি স্রষ্টা, তখন আমি একা, নিঃসঙ্গ, একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্; লক্ষ্মীটী তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

কবি-পত্নী। আচ্ছা, দেখ বেশী দেবী কোর না।

(কবি-পত্নীর প্রস্থান)

কবি। (স্বগত) কিন্তু এ কি সৃষ্টিকার্য্য ছেড়েও ত যেতে পারছি না, নিজের সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি না কি? না না, তা হোতেই পারে না; সৃষ্টি আমারই, সৃষ্টির মধ্যে আমি আছি আমার সৃষ্টির অতীতও আমি। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমূলেন্দ্রনারায়ণ দাস, এম-এ, বি-এল,
পি এইচ-ডি

আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যদি সত্য, সত্যই তাদের বক্তব্য এসে বলতে পারত—তাহলে, (ঠাং ঠাং আলে নিবিয়া) গেল, চারিদিক অন্ধকার, একজন শীর্ণকায় মলিন ও ছিন্ন বেশ পরিহিত ভূতের প্রবেশ।

কবি। আলো fuse হয়ে গেল বোধ হয়—

(আলো জ্বলিয়া উঠিল।)

(ভূতের দিকে চাহিয়া) কে? কে তুমি?

প্রথম ভূত। কেন চিনতে পারছেন না, আপানই ত আমার সৃষ্টি করেছেন, এই মাত্র যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন, আমার বক্তব্য শুনে চাইছিলেন।

কবি। ও তুমি, তোমার এরকম অবস্থা হয়েছে।

প্রথম ভূত। সে ত আপনই করেছেন, আপনি আমার ট্যাগ দিয়াছেন কিন্তু তা পূরণ করবার উপায় দেন নাই, দারিদ্র্য দিয়াছেন কিন্তু দাবিদ্র্য দপ করতে হোলে যে রকম মনোবৃত্তি নিঃসঙ্গ হোলে অজ্ঞান করতে হয়, সে রকম মনোবৃত্তি আমার দেন নাই। আধকষ্ট যৌবনেই আমার স্বাস্থ্য কেড়ে নিয়েছেন—কেন আপনি আমার এরকম করে কষ্ট দিচ্ছেন?

কবি। আমি কষ্ট দিচ্ছি? না, না, তোমার কাজেব জঞ্জ তুমিই কষ্ট পাচ্ছ।

প্রথম ভূত। আমার কাজ, আমি কি অজ্ঞান করেছি বলুন। আমার এ অবস্থা উপবও অপরকে ঠকিয়ে পরসা করতে আমার বাধে! অপরের কষ্টে এখনও আমি কষ্ট অনুভব করি। তবুও আপনি বলবেন, আমি আমার কর্তব্য ভোগ করছি।

কবি। তুমি ভুলে যাচ্ছ, যে, এটা আমার কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড। এর আগেকার খণ্ডে তুমি কি রকম জীবন বাপন করেছ তা তুমি ভুলে যেও না—তারই ফল এখন তোমার ভোগ করতে হচ্ছে।

প্রথম ভূত। আমি করেছি, না, আপনি আমার করিয়েছেন। প্রথম খণ্ডে আপনি আমার উচ্ছ্বল বরমাইসভাবে কলন করলেন আর এখন বলছেন আমি আমার কর্তব্য ভোগ করছি। কেন আপনি আমার এ রকম করে সৃষ্টি করলেন?

কবি। না কোরে উপায় ছিল না, তোমায় না করলে আর একজনকে ঠিক এই রকম কোরে সৃষ্টি করতে হোত।

প্রথম ভূত। কেনই বা তা কোরতে হোত। এরকমভাবে দুঃখ না দিয়ে কি আপনি সৃষ্টি করতে পারেন না?

কবি। কাব্যের বৈচিত্র্য রক্ষা করবার জন্য সৃষ্টি দুঃখ দুঃখেরই প্রয়োজন। এই জন্ত আমার সৃষ্টির মধ্যে, সৃষ্টি, দুঃখ, পাপ, পূণ্য, সন্ধ্যা ও কুংসিত এমন পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। দুঃখকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করলে সৃষ্টি হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, বিবাহ।

প্রথম ভূত। (মিনতির সুরে) দোহাই আপনায়, আমি আপনায় পায়ে পড়ি, দুঃখ দিতে হয় আর কারুকে দিন, আমার একটু সৃষ্টি একটু শান্তি দিন। আমি আব পাবছি না।

কবি। সবাই ঐ কথাই বলে, তাদের দুঃখ আমার ভানায়,

সুখ ও শান্তি চায়, কিন্তু আমার এই কার্য থেকে ত' দুঃখকে, অশান্তিকে বাদ দেওয়া যায় না, তাই তাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয়।

প্রথম ভূত। আমি তাদের কথা, সবাইয়ের কথা বলছি না, আমি আমার কথাই বলছি, আমাকে বাচান, আমার একটু সুখ, একটু শান্তি দিন। আপনি ইচ্ছা করলে কি না হোতে পারে, আপনার ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হোতে পারে, আবার সম্ভবও অসম্ভব হোতে পারে।

কবি। হোতে পারে কিন্তু হয় না। যদি মাঝে মাঝে অসম্ভব সম্ভব হোতে থাকে ও সম্ভব অসম্ভব হোতে থাকে তা'হলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হোয়ে যায়। সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করবাব জন্ত আমি কতকগুলি নিয়ম বা বিধান যেনে চলি, সে-বিধানগুলি যথাযথ, তাহা এলোমেলো নয় ও তাহা শাস্ত কালের। যথাতথ্যতো ধর্ম বিদ্যাশাস্ত্র শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যয়।

প্রথম ভূত। তা'হলে আপনিও আপনার নিয়মের মধ্যে, বিধানের মধ্যে বন্ধ।

কবি। বন্ধ নই কিন্তু স্বৈচ্ছায় মেনে চলি, যেমন তোমার দুটো হাত আছে, খাবার সময় যে কোন হাতটা তুমি ব্যবহার করতে পার, কিন্তু তা কি তুমি কব?

প্রথম ভূত। বুঝলাম, কিন্তু এ-রকম সৃষ্টি করে আপনার লাভ কি?

কবি। আনন্দ, আনন্দ ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। এক আমি বহুরূপে নিজেকে ভোগ করতে চাই, তাই আমি নিজেকে বাজা, উজীর, ধনী, নিধন, সুখী, দুঃখী, পাণ্ডা, পুণ্যবান এইকপ নানা ভাবে কল্পনা কবেছি ও তাদের সবাইকে আমার কাব্যে স্থান দিয়েছি।

প্রথম ভূত। আপনাকে আনন্দ দেবাব জন্ত আমি কেন কষ্টভোগ করব—না, না, আমি কখনই কষ্টভোগ করব না, আমি বিদ্রোহ করব।

কবি। বিদ্রোহ করবে, তোমার সে শক্তি কোথায়? তুলে যেও না আমার শক্তিতেই তোমার শক্তি, আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা।

প্রথম ভূত। (কবির কথা কাণে না তুলিয়া উত্তেজিতভাবে) আপনার এ সৃষ্টি আমরা ধ্বংস করব, আমরা বিদ্রোহ করব।

কবি। আমরা কারা?

প্রথম ভূত। আপনি যাদের সৃষ্টি করেছেন।

কবি। তারাও কি তোমার সঙ্গে বিদ্রোহ করবে না কি? না, না, তা কখনই হোতে পারে না। আচ্ছা ডাক তাদের।

(প্রথম ভূতের প্রস্থান ও আর তিনজন ভূতকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ—একজন গৈরিক বসন পরিহিত, একজনের গলায়

কণী ও হাতে খঞ্জরী ও আর একজনের পোশাক সাধারণ কৃষকের স্থায়)

গৈরিক বসন পরিহিত ভূত কবিকে দেখিয়া—শঙ্কাহরণ শব্দ—

খঞ্জরী হাতে ভূত কবিকে দেখিয়া—এ যে আমার বনমালী। কবি। আমাকে অনেকে অনেক নামে ডাকে কিন্তু আমার আসল পরিচয়, আমি কবি, আমি শ্রুতি, আমি সত্যশ্রুতি।

প্রথম ভূত। আপনার সৃষ্টি আমরা ধ্বংস করব। কেন আপনার সৃষ্টির খাতিরে আমরা দুঃখভোগ করব! তোমরা কি বল?

গৈরিক বসন পরিহিত ভূত—তোমার দুঃখ তোমারই কর্মফল, তোমাকেই তা দূর করতে হবে। আমরা কি করব?

খঞ্জরীহাতে ভূত। দুঃখ কি অমনি দূর হবে, ডাক, নাম কর, তবে তো দুঃখ দূর হবে।

কৃষকবেশী ভূত। আরে ক্ষেপে গেছ নাকি, সৃষ্টি ধ্বংস করব এও কি একটা কাজের কথা, সংসারে এসেছি দুঃখ ভোগ করবি নি, সঙ্গ কর, নিজের ভাগ্যকে মেনে নে।

কবি। (প্রথম ভূতের প্রতি) দেখছো, এরা কেউ তোমাব সঙ্গে বিদ্রোহ করবে না।

প্রথম ভূত। তাইতো দেখছি, কিন্তু কেন যে ওরা আপনার এই সৃষ্টিকে বজায় রাখতে চাব, একে এত ভালবাসে, তা আমি বুঝতে পারি নি।

কবি। সেও আমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছাতেই ওরা এই সৃষ্টিকে বজায় রাখতে চায়, আর তুমি এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চাও।

প্রথম ভূত। (নিবাসভাবে) বুঝলাম আপনার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হবে না। কিন্তু কখন আপনি আপনার এই সৃষ্টি ইচ্ছা কবে শেষ করবেন তা জানতে পারি কি?

কবি। সৃষ্টিবত শেষ নেই, আপনও নেই, আদিও নেই অস্তও নেই।

প্রথম ভূত। তা হলে আপনার এ কাব্যের শেষ নেই?

কবি। কাব্যের শেষ আছে কিন্তু সৃষ্টির শেষ নেই। এই কাব্য শেষ হয়ে গেল, অজ্ঞ কাব্য লেখা আবশ্য হবে। যেমন এর আগে অতিকায় জীবদেব কাব্য শেষ হয়ে গেছে তবু আমার কলম বন্ধ হয়নি। (পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া) অনেক রাত হয়ে গেল, তাছাড়া এ সব নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই; এখন তোমরা তা হলে এস।

কৃষকবেশী ভূত। মাথা ঘামিয়ে লাভ ত নেই, উণ্টে লোকসান, মাথা গুলিয়ে যায়।

প্রথম ভূত। আপনি যখন আমাদের বেতে বসছেন তখন খেতেই হবে, তবে আমাকে একটু দয়া করবেন; (অজ্ঞ ভূতদের প্রতি) চল, ভাই।

৩রা ভূতেরা। (যাইতে যাইতে) আমাদেরও একটু দয়া করবেন। (সকল ভূতের প্রস্থান)

যবনিকা পতন

কাচিনদের দেশ*

ক্রীমরেশচন্দ্র ঘোষ

কাচিনদের দেশে পরিভ্রমণের সময় নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই সময় নানা জাতীয় বানরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সকল বানরের ভিতর 'কৃষ্ণকায় হুলক' শ্রেণীর বানরই সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। সকালে ও সন্ধ্যায় হুলক বানরদের বিচিত্র চীৎকারে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে। একটি বা দুইটি নয়, একসঙ্গে একটি দল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে। ইহাদের চীৎকার কতকটা কুকুবের বাচ্চাদের কণ্ঠনাদের অনুরূপ। একশত সারমেয়-শাবক একত্র শব্দ করিলে যেকপ আওয়াজ জন্মিবে তলক জাতীয় শাখাদুগ-গণের এক একটি দলের কণ্ঠ হইতে অনেকটা সেইরূপ শব্দ নির্গত হয়। আশঙ্কার কারণ থাকিলে সঙ্গিগণকে বা স্বজাতি-বর্গকে সাবধান করিবার জ্ঞাত ইহারা আর এক প্রকার শব্দ করে। এই শব্দ কতকটা মানুষের কাসির শব্দের মত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হুলক বানরদের চীৎকারই শুনা যায়, উহাদিগকে দেখা যায় না। অবগ্যঙুল একরূপ নিবিড়, বৃক্ষশ্রেণী একরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট, বৃক্ষবর্গের সহিত ব্রততীরা একপ গাট আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ এবং প্রকাণ্ডকায় পাদপদল একরূপ প্রচুব পত্রপুষ্পে পরিপূর্ণ যে শাখায় বানরগণ প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। পশুপক্ষীর কাষ্যাবলী পর্যবেক্ষণের জ্ঞাত এইরূপ সুগভীর অবগ্যানীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিবার সাহসও সকলেব হয় না। উদ্ভিদরহস্য ও প্রাণিতত্ত্ব জানিবার প্রবল কৌতুহল আমাদের সময়ে সময়ে বিপদকে উপেক্ষা করিয়া এই সকল ঋপদসঙ্কুল পথতারা অরণ্যেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। অবশ্য সেই সাহসের জ্ঞাত আমাদের কোন দিন অমৃতপ্ত হইতে হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা চৈত্রমাস পথান্ত এই প্রদেশে ছিলাম। ফাল্গুন ও চৈত্রমাস হইতে এই দেশে প্রায় প্রবল ঋতু বৃষ্টি প্রভৃতি দ্রব্যোগ দেখা যায়। এই গভীর গহনাবৃত গিরিশ্রেণীর দেশে বজ-গর্জনের সঙ্গে বজ্রার তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে দেখিতে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। চারিদিকে সবুজ শোভায় সমৃদ্ধ নিবিড় অরণ্য এবং ধূমধূসর শৈলমালা, বারবার গুরুগভীর বজ্রনাগের সহিত মেঘ-মেঘুব আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত ধারাপাত অন্তর-তন্ত্রীতে একপ্রকার ভাষাতীত ভাবের বজ্রার ভাগাইয়া তুলা স্বাভাবিক। পাহাড়েব উপর অবস্থিত ঠেজিং বাংলোর বারান্দায় বসিয়া পুরোভাগে প্রসারিত পার্কত্য প্রকৃতির ধারাসিক্ত উদাস মূর্তি দেখিতে দেখিতে আমাদের কল্পনাপ্রবণ মন উধাও হইত সেই অপক্লপ রূপকথাব দেশে, যেখানে কঠোর কঠোর কোন স্থান নাই, আছে শুধু গল্প আর গান। এই জঙ্গলের দেশে জল অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে জোঁকের প্রাচুর্য্যব অভ্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জুতা ও মোজার পদদ্বয় আচ্ছাদিত থাকিলে জোঁকের দ্বা

আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা কম বটে; কিন্তু কোথাও বসিলে বস্ত্রের ভিতর এই রক্তশোষক জীবটি প্রবেশ করা আদৌ অসম্ভব নয়। আমাদের কাচিন অমৃতদিগকে জোঁকের জ্ঞাত সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। ইহারা শরীরের সংলগ্ন হইয়া মানুষের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে একরূপ ভাবে শোণিত শোষণ করিয়া লয় যে, ইহাদের জ্ঞাত সর্বদা শঙ্কিত থাকে খুবই স্বাভাবিক। যথাপরিমাণ শোণিত শোষণের পর যখন ইহাদের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় আসে, তখনই ইহাদের বিজ্ঞমানতার কথা মানুষ জানিতে পারে।

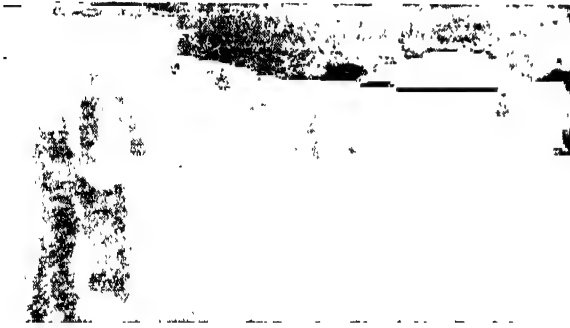
সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। ফুজিন হকা নামক নদীতীর উপত্যকার উপর দিয়া আমরা অশ্বতর-পুষ্ঠে চলিয়াছি। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ অতিশয় পিচ্ছিল; গিরিশ্রেণীর ভূঙ্গ অঙ্গে যাহারা অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে সেই অশ্বতরগণের পক্ষে ঋলিতপদ হইয়া পতিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক না হইলেও পথের অত্যন্ত পিচ্ছিলতা তাহাদের পক্ষেও পদে পদে অসুবিধার কারণ হইতেছে। ঠিক যেন সাবান গুলিয়া পথের উপর ঢালিয়া দিয়াছে। অশ্ব ও গর্দভের সম্মেলনে সঙ্কুত অশ্বতর নামক এই ভারবাহী প্রাণীগুলির বহন ও সহন শক্তি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। পার্কত্য পথ-পরিভ্রমণে ইহারা অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। হিমাদ্রির দুর্গমতম অংশেও ইহারা ইমণকারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার জ্ঞাত পার্কত্য প্রবাহিনীগুলি পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জলের তলদেশে অসংখ্য শিলাখণ্ড বিরাজিত বলিয়া অশ্বতরদিগের পক্ষে পদক্ষেপ অত্যন্ত অসুবিধাজনক; কিন্তু এমনই সহিষ্ণু ও সতর্ক এই প্রাণী যে কখনও ঋলিতপদ হইয়া ইহারা পড়িয়া যায় না।

নদীতীরে কাচিন পন্নী। নদী হইতে পিচ্ছিল পথে পন্নীতে উঠিতে এইরূপ প্রাণীর পক্ষেও একান্ত কষ্ট হইতে লাগিল। আবার প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। আবাব বজ্র গর্জিতে লাগিল, বজ্র তাণ্ডব নৃত্য আবহ করিল। বার বার ব্যর্থকাম হইয়াও



তিনজন মারু-কাচিন মোট পিঠে লইয়া পথে চলিয়াছে ;
পশ্চাতে বেণুনির্মিত কুটার

অশ্বতরগণ প্রাচীনসাম্রাজ্যে কবিল না, তাহারা অবশেষে নদীর উচ্চ তটদেশে উঠিতে সমর্থ হইল। সেই জুয়োগের ভিতর আমরা কাচিনপত্রীর প্রধান ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্ৰহণ করিলাম। সলিলসিক্ত বস্ত্রাদি পরিবর্তনের পর কাচিন সন্দারের দরবারে আমাদের অভিযাত্রী আরম্ভ হইল। এই সন্দারটি কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ব্যক্তি। বর্মাজ ভাষা বাতিয়েকে স্বকিঞ্চিৎ ইংরেজীও তাহা জানা ছিল। তিনি মিয়ংকিনিয়ার স্থলে পড়িয়াছিলেন। বয়স বেশী নয়। চায়ের সকল রকম সৌখীন সরঞ্জাম তাহা ছিল। ক্রমে ভিজিবার পর গরম চা আমাদের পক্ষে দেবতাবাদ আশীর্বাদার জায় হইল বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। এই কাচিন-সন্দারটির শাখা দক্ষিণ চীন কাচিন জাতির প্রাচীন বাসস্থল। ইহার মতে চৈনিক সংস্কৃতি হইতে কাচিন সংস্কৃতিব জন্ম। ইনি আমাদের পক্ষে সগর্বে জানাইয়াছিলেন—নাং লিন্স ও দাকদেবমত আমরা সভ্যতা লোকসমূহ সম্প্রদায় নই, কাচিনরা অতি প্রাচীন জাতি, উৎকৃষ্ট না ইউক কাচিনরাষ্ট্র উপেক্ষণীয় নয়। প্রবল বর্ষার জগা সন্দার



নতাবত কাচিন তরুণদল

আমাদিগকে দুইদিন তাঁহার গৃহ হইতে ঘাইতে দিলেন না। এই তরুণ কাচিন সন্দারের ভ্রাতা আমরা কখনও ভুলিব না। এই দেশের কোনও দলপতির নিকট আমরা এরূপ উদার ভাবাবহান পাই নাই।

দুইদিন পরে আমরা যখন যাত্রা করিলাম, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু বিকালের দিকে আবার বাবিপাত আরম্ভ হইল। এবার আমরা বস্ত্রাবাস বিস্কৃত করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলাম। আমরা যাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম, সেই স্বল্পদগণ সাভে বিভাগে কর্মচারী—তাহা বলা হইয়াছে। সাভে বিভাগের অফিসারদিগকে সর্বদা সদলে ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া তাহাদের সঙ্গে ক্যাম্প বা বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করিবার সকল প্রকার সরঞ্জাম থাকে। এই সকল তাঁবু উৎকৃষ্ট ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্রে প্রস্তুত। এই অঞ্চলটি কেবল জঙ্গল বলিয়া কাহারও গৃহে আতিথ্য স্বীকার ও আশ্রয়-দানের সম্ভাবনা ছিল না। সঙ্গতিশালী সন্দার ভিন্ন সাধারণ কোন লোকের পক্ষে আমাদের পক্ষে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। ইহার কারণ, আমাদের দলটি বিশেষ বৃহৎ না ইউক, বহু ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এবং অশ্বতরসমূহের সংখ্যাও স্বল্প নহে। গৃহ বিশেষ বৃহৎ না হইলে আমাদের সকলকে স্থান দেওয়া কোন কাচিন গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের শিবির হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে এক চীনার দোকান ছিল। সেই দোকান হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি কিনিয়া আনা হইল। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন চীনা অশ্বতর-চালক ছিল। চালকের কাজ চীনারাই করে। আমাদের বাহন ও ভাববাগী উভয় প্রকার অশ্বতরই চীনের য়ুনান প্রদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে আনীত। চালকরাও য়ুনানী বা দক্ষিণ চীনের লোক। প্রবল বর্ষাবাদলের জগা আমবা তিনদিন তাঁবুতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চীনা দোকানীটির দ্বারা একদিন আমাদের চৈনিক অস্ত্রচববর্গ ও অশ্বতর-চালকগণ আমন্ত্রিত হইল। কুনিলাম, ভোজ্য পদার্থসমূহের ভিতর সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল চীনাদের পূর্বপ্রিয় শূকরমাংস। কাচিনরাও প্রায় সর্বপ্রকার প্রাণীর মাংসই খাইয়া থাকে। কুঞ্জমাংস ভক্ষণে সাহাদেব কণা নাত্র কৃপা নাই, তাহাদের নিকট কোন মাংস ন্যাকারজনক অমুভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা পূর্বে যে তরুণ কাচিন সন্দারের কথা বলিয়াছি, তিনি তাহা বাক্সা বা জমিদারীর ভিতর কুঞ্জমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া যোগ্য কারিয়াছিলেন। নিজেও মাছ, মবলী ও ছাগ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মাংস খাইতেন না।

এই স্থান হইতে আমাদের একটি দল কাথ্যাহুরোবে মিয়ংকিনিয়ার প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল, আমরা কয়েকজন পাত্র কাচিনদের দেশ দর্শনের জগা আবও উত্তরে আগসর হইলাম। প্রবল বর্ষা আমাদের বিশেষ অন্তর্বিদ। জম্মাইলেও নানাপ্রকার জজনা ব্যাপার জানিবার প্রবল কৌতূহল আমাদের পক্ষে উৎসাহিত ও অমুপ্রাণিত করিল। আমরা পূর্বে তিন ভ্রমণী কাচিনের নাম উল্লেখ করিয়াছি—কাথা কাচিন, মাক কাচিন ও থাক কাচিন। ইহাদের মধ্যে কাথা বা দক্ষিণী কাচিনরা সভ্যজগতের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পর্কেব জগা কিঞ্চিৎ সভ্যতালোক প্রাপ্ত বলা চলে। মাকরাও নিতান্ত অসভ্য নয়। এক প্রকার সংস্কৃতি তাহাদেরও গ্রহিয়াছে। সর্বোত্তম প্রদেশের অধিবাসী থাক কাচিনদের ভিতর আমরা সভ্যতার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। তবে তাহারাও ক্রমশঃ সভ্যজগতের সহিত পরিচিত হইতে প্রয়াস করিতেছে, এই সত্য সংশয়াতীত। থাক কাচিনদের দেশ দুর্গমতম প্রদেশে অবস্থিত বলিলে অত্যাধিক হয় না। কিঞ্চিৎ দূরেই চীনের সীমান্ত। এই অঞ্চল স্বল্পদিন হইতে ব্রিটিশ শাসনাধীন হইয়াছে। সীমারেখা লইয়া চৈনিক সরকারের সহিত ব্রিটিশ সরকারের বাণবিত্ততা বহুদিন চলিয়াছে। অবশেষে সাময়িক ও সাভে বিভাগের সাহায্যে স্থায়ী সীমা নির্ধারণ সম্পাদিত হওয়ায় সেই বিতণ্ডার অবসান ঘটিয়াছে। পূর্বে ভ্রমণে পাইলেই চীনা সরকার এই দুর্গম ও অজ্ঞাত সীমান্ত-প্রদেশের অংশ-বিশেষ য়ুনানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বিলম্ব করেন নাই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়ার পর জবিপ বিভাগের কর্মচারীরা সহস্র অন্তর্বিদা সতিয়া ও কঠোর পরিপ্রমাণ স্বীকার করিয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত কাচিনদের দেশের সীমারেখা স্থায়ী ভাবে স্থির করিয়াছেন। আমাদের বহু সার্ভেবিভাগের অফিসারদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাহারা সীমা নির্ধারণে সরকারকে সে

সময় সহায়তা করিয়াছিলেন। কাচিনদেশ দেশ, বিশেষতঃ নাক কাচিনদেশ দেশ জরিপ করিয়া যাঁহারা বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ইউ পো নামক বর্মীজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাৰ একটি অতি প্রশংসনীয় কীর্তি নাক কাচিনদেশ মধ্যে প্রচলিত দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য প্রাণত্যাগ প্রবৃত্ত করা। যেমন লোকে গরু, ছাগল বিক্রয় করে এবং বিক্রীত পশুর উপর ক্রেতার সর্বস্বপ্রকার অধিকার স্বাধীনভাবে জগিয়া যায়, তেমনই ক্রীতদাসের উপবেও ক্রেতা কাচিনের সর্বস্বত্ত্ব জগিত। প্রধানতঃ 'উউ পো'র চেষ্টায় এই অতি ঘৃণ্য প্রথা উঠিয়া যায় বলিলে অজ্ঞায় হয় না। উউ পো সরকারের নিকট হইতে কে, সি, এম, উপাধি লাভ করেন। ইটাই বংশ সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি। উপাধিটিব সংক্ষিপ্তসার কে, সি, এম। 'কিয়েং-আয়ে জায়-শয়ে-শাংলোয়ে-ইয়া-মিন' ইটাই উচ্চারণ করিয়া।

প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে এই প্রদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন এই শাসন প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন খাফ কাচিনবা জাতির সাহায্যে মাত্র দ্বিভাষী জ্ঞানিত না। এখন তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই প্রদেশের নদ-নদীতে প্রচুর মাছ আছে। আমাদের সঙ্গিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট অংশ দরিবার নানাপ্রকার সরঞ্জাম ছিল। ইঁহারা স্বদেশে পাঠবামাত্র মাছ দরিবার জগা বাগ হইয়া পড়িতেন। সঙ্গিগণের মধ্যে সুদক্ষ শিকারীও ছিলেন। ইঁহারা বন্দকের সাহায্যে আবগা পশুপক্ষী শিকার করিয়া আনিত। আমাদের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি যে কটকট বৈচিত্র্য সন্ধানিত করিতেন, নবান্বিতা আমি সেই বৈচিত্র্য হইতে বঞ্চিত ছিলাম।

আমাদের বড় দলটি মিয়ংকাংনা হইয়া মাঞ্চালয় চাকিয়া নাওয়াব পব আমবা পবতবজ্বল থাকু কাচিনদেশ দেশের অভ্যন্তর ভাগে গমন করিয়া। চারিদিকে শুষ্ক চড়াই ও উঁচুবাট। এই চড়াই পথে আবোভণ করা গন্তব্যবিশেষের পক্ষেও কষ্টকর হইল : বিশেষতঃ যাহারা গুরুভার বহন করিয়া আরোহণ করিতেছে। কয়েকবার ব্যর্থকাম হইবার পর প্রত্যেক গন্তব্যই আবোভণে সমর্থ হইল। কয়েকদিন ভ্রমণের পর আমরা অবশেষে সেই সঙ্কীর্ণ শৈলমাঝে পৌঁছিয়া, মালিহকা চকলা বালিকাব জায় (জমলাভের কিয়ৎকাল পরেই) যথায় নাচতে নাচতে নাচে নামিয়া আসিতেছে। তুইদিকে অধরচুয়া গুরুগর্ভীর গিরিশিখা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ডের জায় দাঁড়াইয়া, মধ্যে মালিহকা যেন কোঁক-জ্বলে করতালি দিয়া শিলা হইতে শিলাস্তরে লাকাইয়া পাড়ো পড়িতে সবেগে ছুটিতেছে। ইরাবতীকে পূর্ণ পরিণতমোবনা গাভীযাত্রা লাগণ্যবতী যুবতী এবং মালিহকাকে ক্রীড়া-কোঁক-প্রিয়া চিরচকলা বালিকাব সজিত তুলনা করিলে ঠিকই হয়। দেখিলে কল্পনা করা কঠিন হয় যে, এই বালিকা মালিহকাই যুবতী ইরাবতীতে পরিণতি পাইয়াছে। খাফু কাচিনদের বাসস্থল উচ্চ উপত্যকার সকল জল মালিহকাই ব্রহ্মের বৃকে বহন করিয়া লইয়া বাইতেছে। যেমন উচ্চত্বের সাধক নির্জন পুত্রায় সাধনায় যয় রহিয়া জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে, তেমনই এই দুর্গম ও

গুরুত উপত্যকা বহু দূরে রহিয়াও অপূর্ণ অবদানে ব্রহ্মবাসীর অশেষ উপকার সম্পাদন করিতেছে।

আমরা আরও অগ্রসর হইয়া দুর্গমতর প্রদেশে বিরাজিত শিখাম গা নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। এই স্থানটির উচ্চতা আড়াই হাজার ফিট। তখন ফাশন আর শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় মধ্যাহ্নেও ঐ স্থানের উত্তাপ ৫০ ডিগ্রির অধিক নয়। আমরা ঐ গ্রামেব নিকটে শিবির স্থাপন করিলাম। বহা ছিল না বটে কিন্তু শিশির শিশির একপ্রকার প্রচুর পরিমাণে পড়িত যে, তাবুর উপরে ওয়াটারপ্রুফ না বিছাইলে চলিত না। আমরা যে উচ্চ স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিয়াছিলাম, তথা হইতে চারিদিকের দৃশ্য শুধু সুন্দর নয়, বিষয়কর ও বর্ণনাতীত। যে গল্পবহু গভীর উপত্যকার ভিতর দিয়া মালিহকা আকিয়া বাকিয়া সাইতেছে, উঁহাৰ পশ্চাতে নাক কাচিনদের দেশের নির্বিভ বনানী অভিনয়-মঞ্চের পটভূমিকার মত দেখা বাইতেছে। অসঙ্গতিক দৃষ্টিপাত করিলে কিছু দূরে যে তুষারভ্রমীর্ষ তুলন্য শ্রেণী দেখা যায়, উঁহারা ইরাবতী ও মালুইন উভয় নদীর জগদ্বাহনকে বিভক্ত

বহন ব্যাপ্তি: কাচিন-কামিনা

করিতেছে। আরও দূরে চীনের সীমান্তে সঞ্চারমান তুষারবৃত্ত-তত্ত্ব সমুদ্রত শৈলমালা চিরবিনষ্ট প্রতীতির মত বিরাজিত। এই গ্রাম হইতে তিব্বতের সীমান্তও বেশী দূর নহে। সুধা অন্তঃসাগরে ডবিবার পানে, কিয়ৎকাল পুরোভাগে প্রসারিত শৈলশীর্ষসমূহের সজিত সংলগ্ন তুষারবাশি অন্তরবিব বর্মণীয় রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া বহিল। পবে ধীরে ধীরে সেই বক্তরাগে রঞ্জিত রমণীয় বর্ষাশ্র-বহা শ্রো মিত্রিয়া গেল, তল্লাস অধিকারের ইচ্ছাভাল প্রকৃতির বৃকে বিছাইয়া বহনময়ী হারি মুহুমুদ পানে বক্তবাহ বৃকে নামিত আসিল। লক্ষ লক্ষ গজোত বৃক্ষলতা বৃকে বিচরণ করিয়া অরণ্যানীকে অগণিত মণি-খণ্ডে মণ্ডিত বলিয়া ভ্রম ভ্রমাইতে লাগিল। নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র একে একে ফুটিয়া উঠিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন কোন গাণ্ডত বক্তরাগে বিষয়জনক বাস্তা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহায্যে জানাইতে লাগিল। নিসর্গের এইরূপ অপরূপ নিরুপম রূপ দেখিবার জন্য মানুষ দুঃসহ অসংখ্য সহ্য করিলেও তাহা সার্থক বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমরা চৈত্রমাস পর্যন্ত এই দেশে ছিলাম। কাচিন শেষ

হইবার পর যেমন গরমের লেশ বা রেশ দেখা গেল, অমনই কাচিন-দের দেশ নানা প্রকার কীট-পতঙ্গতে পূর্ণ হইয়া পড়িল। নানা রকম মাছি ও মশা নানা রঙ ও আকারের গুণবরে পোকা, হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ দেখা দিল। বর্ষ বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক প্রজাপতিপালের সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিল। লেপচাদের দেশ সিকিম ছাড়া এত সংখ্যক এবং এত প্রকার প্রজাপতি অজ্ঞ কোন প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয় না। পার্শ্বত্যা প্রবাহিনীগুলির পাশেই প্রজাপতিপালের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। সময়ে সময়ে প্রাণিতত্ত্ব-বেত্তা পণ্ডিতরা সিকিমের জায় এই প্রদেশেও প্রজাপতি সংগ্রহের জগা আসিয়া থাকেন। একজাতীয় জালের সাহায্যে প্রজাপতি ধরা হয়। এই প্রদেশের পাদপদলের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্য দর্শকের চিত্ত ও চক্ষু দুইই সহজেই পরিতপ্ত করিয়া তুলে। আচাধ্য জগদীশচন্দ্র পাদপদলতার ভিতর চিরনিহিত প্রাণপ্রবাহের বার্তা আমাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই দেশে আসিলে মহাক্রান্তসমূহের দেখে প্রবাহিত সেই প্রাণধারার কি অপূর্ণ পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। অবগাঙলি এত নিবিড় যে প্রবেশ করা কঠিন। পুনঃ পুনঃ কুঠারের সাহায্য না লইলে প্রবেশ করা অসম্ভব। শাখা-প্রশাখা-সমরিত এক একটি মহান মহাক্রান্ত যেন এক একটি স্থিতল গৃহ। শাখায় শাখায় শ্যামসুন্দর শৈবাল দেখিলে মনে হয়, কোন বর্ষশিল্পী তাহাদিগকে সবুজ রঙে রঞ্জিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বৃক্ষের বক্ষে বিচিত্রকায় অকিডু ও কর্ণ জন্মিয়া উঠাকে শুধু বিশালতর নয়, বিষয়কর করিয়া তুলিয়াছে। এক একটা গাছ যেন এক একটা জগৎ। উঠা কত প্রকার প্রাণীর আশ্রয়স্থল তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? শাখায় শাখায় বানব, পাতায় পাতায় নানাজাতীয় প্রজাপতি ও অজ্ঞাত পতঙ্গ, ফাটলে ফাটলে কমনীয় বা কনধ্যাকার এবং কিস্তৃতকিমাকার কত প্রকার কীট, কোটেবে কোটেবে কতবকম পাখী। এই সকল অবগ্যানী অসংখ্য প্রাণীর কণ্ঠস্থের মুগবিত কি শুধু তবুও কি নিবিড় নিস্তরঙ্গতা ইহাদের বক্ষে অবিরাম বিরাজিত। বনানী এই ধ্যানমোহী মন্দির সম্মুখে দাঁড়াইলে মুগসর্ব্বক মূর্খ মানুষের সকল মুগবতা যেন মুক হইয়া পড়ে।

এই নিবিড় ও নিস্তরঙ্গ অরণ্যানীর, উঠার পাশে অবস্থানকারী কাচিনদের মনের উপর একপ্রকার অদ্ভুত প্রভাব প্রসারিত করা স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয়, ঐশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে ভক্তি ও প্রীতির পরিবর্তে একপ্রকার ভীতিভাব ইহাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। ভীতিই ইহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি। ইহারা পর্কতপুঞ্জ ও বনানীসমূহকে লাট নামক একপ্রকার উপদেবতায় পূর্ণ বলিয়া মনে করে। আমরা ছোটনাগপুর প্রভৃতি পার্শ্বত্যা ও আরণ্য প্রদেশের অধিবাসী আয়ত্তর জাতিদিগকে যেমন ভূত প্রেতের পূজা করিতে দেখি—তেমনই ব্রহ্মের উত্তর-সীমাস্থের এই পার্শ্বত্যা ও আরণ্য সম্প্রদায় লাটদিগের উপাসনা করিয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সভ্যতার পথে অনুগ্রসর বনবাসী সম্প্রদায়গণকে যেমন জীববলির দ্বারা উপদেবতা বা অপদেবতাদিগকে সম্বোধন করিবার চেষ্টা করিতে দেখি, ইহারাও লাটের নিকটে মোরগ, শূকর প্রভৃতি পশু বলি দিয়া

থাকে! কাচিনরা কুকুর ভক্ষণ করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে সুতরাং লাটের উদ্দেশ্যে বলিকর্মে ইহারা কুকুরও হত্যা করে। মোটের উপর কাচিনরা ধর্ম্ম সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরে অবস্থান করিতেছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। বর্ষাজিগের জায় বোধ হইলে এ বিষয়ে ইহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইতে সন্দেহ নাই। কদাচিৎ কোন কাচিন লাটবাদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বোধ বা গুণ্ডান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে! আমাদের স্তম্ভদ এক সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া এই দুর্গম দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। হিমালয়ের পাদদেশে প্রসারিত প্রদেশ-সমূহের অধিবাসী পাগড়িয়া-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচারকেই ইনি জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, ইহা জানিতাম। আমরা এই সন্ন্যাসী স্তম্ভদের সহিত সাক্ষাতের জন্ত একপ্রদেশে ভিতর দিয়া আগাইয়া চলিলাম, যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্গম এবং লাটবাদ যেখানে গজারজনক আকারে প্রচলিত বহিয়াছে বলা চলে।

বুম অর্থে পাহাড় তাহা বলিয়াছি। এই পাহাড়পূর্ণ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামকেও বুম বলা হয়। বুম কাটাউয় প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া আমরা গিয়ে যাইতে হইয়াছিল। আমরা পূর্বের জায় সাধারণতঃ দলপতিদিগের গৃহেই অবস্থান করিতাম। প্রত্যেক পল্লীতে কয়েকটি করিয়া সার্কজনীন গৃহ রহিয়াছে। কোন কোন গামে বিদেশীয় পথিককে শস্তাগারের একটি অংশ থাকিতে দেওয়া হয়। এই শস্তাগার এক জনের সম্পত্তি নহে, সকলের। রণায়ণা আত্ম দনসাম্যবাদ বা কমিউনিজম্ প্রচার করিতেছে কিম্বা একপ্রকার সাম্যবাদ এই সকল পার্শ্বত্যা সম্প্রদায়সমূহের ভিতর প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত রহিয়াছে। নাগা, কুকী প্রভৃতি অসাম-সীমাস্থের আরণ্যজাতিদের মধ্যেও এই ধরণের সার্ক-জনীনতা আমরা দেখিয়াছি। দলবদ্ধ হইয়া সকল কাজ করা ইহাদের অভ্যাস। সন্ধ্যার সময় সার্কজনীন শস্তাগারে সকলে সম্মিলিত হইয়া নানা প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চাউল হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মত্তপানও চলে। পানপাত্র বাণের চোড়া। কদলীপত্র মত্তপানের প্রথাও এই দেশে প্রচলিত। পত্র-পাত্রে মত্তপানের প্রথা ছোটনাগপুরের সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়দের ভিতরও দেখিয়াছি। পান খাওয়ার প্রথাও কাচিনদের মধ্যে প্রচলিত। বেহু নিখিত পাত্রেই পান স্রপাবী প্রভৃতি রক্ষিত থাকে। বক্ষা ও মালয়ের সর্বত্র এবং মালয়দ্বীপপুঞ্জেও আমরা পান খাওয়ার প্রথা প্রচলিত দেখিয়াছি।

বুম কাটাউয় গ্রামটি পাহাড়ের পাশে অবস্থিত। আরও উপরে নিবিড় বনানীতে আচ্ছন্ন গৃহশ্রেণী। এই সকল শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া দেখিলে চীনের য়ুনান প্রদেশের গিরিমালা দেখা যায়। একদিকে কাচিনদের দেশ, অজ্ঞদিকে শাননামক সম্প্রদায়ের বাসস্থলী উপত্যকাবলী বা প্রান্তর। বুম কাটাউয়-এর নিম্নে প্রসারিত নামখাস নামক প্রান্তরটিতে শানরা বাস করে! শানপল্লীর ভিতর কাচিনও থাকে। আমরা কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করিবার পর সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিলাম। তিনি আমাদের দেখিয়া অভিযয় আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

প্রচারকার্য কিরূপ চলিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম—লাটবাদী কাচিন জনসাধারণ তাঁহার বিরোধিতা কোনদিন করেন নাই, তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে পুরোহিতশ্রেণীর কাচিনরা, পল্লীর লাটপূজা সম্পাদন যাহাদের কাজ। কাহারও ঘাড়ে ভুত চাপিলে বা কেহ কোন ডাইনীর প্রভাবে পড়িলে পুরোহিতই মহত্ত্বাদির দ্বারা ভুত ছাড়াইতে বা ডাইনীর কুপ্রভাব হইতে মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত কবে। সম্মানসীম মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে ইহাও বুঝা গেল—এমন কোন কুসংস্কার বা কদর্য কাজ নাই যাহা লাটের পূজারীরা করিতে না পারে। এই পূজারীরা হুমজা আখ্যায় অভিহিত হয়। ডাইনের প্রভাব হইতে কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে যে অল্পমান আবশ্যক—উহা কাচিনভাষায় কুমলাও অখ্যায় অভিহিত। হুমজারা ভবিষ্যৎবাণীও বলে। প্রত্যেক অমুঠানে লাটকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মোরগাদি প্রদান প্রয়োজন। লাটের পুরোহিতদের প্রবল চেষ্টা জনসাধারণকে চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখার দিকে। স্তবরাং সম্মানসীম ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ করা স্বাভাবিক। যে স্বল্পসংখ্যক কাচিন সম্মানসীম প্রচারণা ফলে লাটবাদ পরিচ্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছে, পূজকরা তাহাদিগের উপবেও নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে বলিয়া জানা গেল। খৃষ্টীয় মিশনারীদের চেষ্টাও পুরোহিতদিগের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। নচেৎ নূতন মতবাদ গ্রহণ কবিত্তে কাচিনদের আন্তরিক আগ্রহই দেখা যায়। হুমজাদের দ্ববভিসন্ধিই তাহাদিগকে উন্নতির পথে আগাইতে দিতেছে না। মিথ্যাকথিনা ও ভ্রাম্যের নিকটবর্তী কাচিনপল্লীতে হুমজাদের প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে কিন্তু অল্পসংখ্যক ইহাদের কুপ্রভাব এখনও অব্যাহত রহিয়াছে।

আমাদের সহচরদিগের একজন কাচিনভাষায় কথাবার্তা করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইনি বখাঁজ এবং চীনাভাষাও জানিতেন। সম্মানসীম সাক্ষাসম্মিলনের সময় কাচিনদিগকে লাটবাদেব অপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। বহু-ভাষাবিদ বহুটি প্রবন্ধলেখককে বলিলেন—তুমি বাংলায় বল, আমি কাচিনভাষায় উহা অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিব। লাটবাদের ভিত্তিতে রহিয়াছে ভীতি, অথচ ভক্তি ও প্রীতিই প্রত্যেক প্রকৃত ধর্মের

মূলে বিদ্যমান। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান্ রহিয়াছেন, সেই ভগবানের উপাসনাই আমাদেরিগকে করিতে হইবে। ভগবান্ যে সকল জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তাহাদিগকে ভালবাসাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রধান উপায়। এই ভালবাসাই উপাসনা। জীবহত্যারূপ জঘন্য পাপের দ্বারা প্রেতকে প্রীত করিবার জঘন্য প্রযত্নকে যদি ধর্ম বলা হয় তাহা হইলে অধর্ম কাহাকে বলিব? প্রবন্ধলেখক এই সম্বন্ধে বাংলায় যাহা বলেন, কাচিন ভাষায় নিপুণ সহচরটা তাহাই সমবেত কাচিনদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এক বৃদ্ধ কাচিন মাথা নাড়িয়া জানাইতেছিল, কথাগুলি খুবই ঠিক এবং তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। পবে জানিলাম, সে পার্শ্ববর্তী এক পল্লীর দলপতি। সম্মানসীম বৃদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি সহায় না হইলে আমাব পক্ষে এই স্থানে এক মাস থাকাও সম্ভব হইত না। বৃদ্ধ শুধু নিজে নয়, পুত্র-পরিবারকেও লাটপূজা পবিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

আমরা প্রত্যাবর্তন করিবার তিন বৎসর পরে সম্মানসীম-বৃদ্ধদের পরপার-প্রয়াণেব সংবাদ শুনিতে পাই। তাঁহাদের মৃত্যুসম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রুতি আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ঐ জনশ্রুতিসম্মতম, লাটের পুরোহিতদের অত্যাচার তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তিনি দুই মাসকাল অববোগে শয্যাগত ছিলেন, কেহ কেহ ইহা কহিয়া থাকেন। সকল প্রকার সুখ-স্বাস্থ্যল্যোর আশা ও আকাঙ্ক্ষা পবিত্যাগ করিয়া লোক-লোচনের অগোচরে অতি দুর্গম প্রদেশে অবস্থানপূর্বক সত্যপ্রচাবে যিনি জীবনের একমাত্র ব্রতে পাবিত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রত পালন করিতে কবিত্তে একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে কখন ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, সেই সত্যধর্মপ্রচারক নিকাম-কথ্যবোণীর উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মালিহকাব উচ্চ-কলগীত-মুগুরিত পথহারা কাছারে পূর্ব এই দুর্গম দেশের নাম হকামতী। শীতের সময়ে এই দেশ ভূষারে বজ্র-শুভ্র এবং বর্ষাব কুহেলিকায় ধূম-ধূসর হইয়া পড়ে। যেমন বাঙ্গালার পক্ষে সিকিম, তেমনই ব্রহ্মের পক্ষে হকামতী। মালিহকাব গজ্জনগীত-মুগুরিত হকামতীর স্মৃতি আমাদের অন্তর-পটে চিহ্নিত অঙ্কিত রহিবে। [সমাপ্ত]

শরতের রাণী

শ্রীললিতা দাশ, বি-এ

আলো ঝলমল পূত নির্মল
রামধনু রাঙা পথে
শরতের রাণী এলারে ধরায়
চড়িয়া মেঘের রথে।

ঝরা-শেফালিকা মালতী চাপায়
বনবীথিতে আসন বিছায়,
কাশবন তা'রে প্রগতি জানায়
দূর কান্তার হতে।

বুলবুলি শ্রামা বনে বনে গায়
তা'রি আগমনী গান,
শুনীল গগন অরুণ আলোর
অঞ্জলি করে দান।

ফুলে ফুলময় কুঞ্জকানন,
গন্ধমদির দধিনা পবন,—
পুলকে মগ্ন নিখিল ভূবন
পেয়ে তা'রি সন্ধান।

বঙ্গীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভাবতে যে শ্রীরুদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তদংশনে তৎকালীন রাজত্বকালকে “স্বর্ণযুগ” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই স্বর্ণযুগের উজ্জলতা বহু কবিরাজিহ্নেন তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার গুপ্ত।

দ্বিতীয় ৪১৫ অব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পাবিত্যক উজ্জয়িনী সিংহাসনে তৎপুত্র কুমার গুপ্ত আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই কুমারগুপ্ত সর্বপ্রথমে “ভট্টদত্ত ও মঙ্গলদত্তজ্ঞা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি” যুক্ত এক প্রকাব স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এই প্রকার মুদ্রার একদিকে ভট্টী পৃষ্ঠে বাজা এবং তাঁহার পশ্চাতে একজন চতুর্ধর উপবিষ্ট আছে এবং দিকে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান সনাতোৎপল ও মঙ্গলঘট চতুর্দিক লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি আছে (১)। এই জাতীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রাচীন বঙ্গের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ জনপদ মহানাদে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২)

সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পবেই পুণ্যামিত্রীয় ও হন জাতীয় সহিত কুমার গুপ্তকে বিশেষভাবে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি প্রবল পরাক্রম সহকারে তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বাহ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়-গৌরব প্রকাশার্থে কয়েক প্রকাব স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক প্রকাব মুদ্রার প্রথম দিকে রাজ মন্দির চারি পার্শ্বে উপগীতহুইল—

“ক্ষিতিপতি বজ্রতো বিজয়ী
কুমার গুপ্তো দিব্য জয়তী”

লিখিত আছে। অপরদিকে লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে সনাতোৎপল আছে (৩)।

স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত দৌণ্ডি, মালব এবং মধ্য প্রদেশে কতিপয় জাতীয় রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল। এক জাতীয় রজত মুদ্রার একদিকে রাজ্যব মন্তক এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে তারিখ লিখিত আছে। অপর দিকে একটি মদন ও একটি পদ্ম আছে এবং ইহার চতুর্দিকে উপগীতহুইল—

“বজ্রতো বনিব বনিপতি
কুমার গুপ্তো দিব্য জয়তী”

লিখিত আছে। (৪)

যুদ্ধবিগ্রহের পর কুমার গুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দুই প্রকার স্বর্ণমুদ্রায় ইহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম প্রকার মুদ্রার একদিকে যজ্ঞধ্বজে স্তম্ভজিত অশ্বমেধের অশ্ব এবং অপর দিকে চামর হস্তে প্রধানা মহাবীর মূর্তি (৫)। দ্বিতীয় প্রকাব মুদ্রায় একদিকে অশ্বের নিম্নে “অশ্বমেধ” এবং অপর দিকে “শ্রী অশ্বমেধ মহেন্দ্র” লিখিত আছে (৬)।

বঙ্গসমাপনান্তে তিনি “পবন রাজাদিবাজ” উপাধিতে বিভূষিত হন। তৎকালীন প্রচলিত এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার একদিকে “পবন রাজাদিবাজ কুমার গুপ্ত” এবং অপরদিকে দেবীসহ হস্তে পাশ ও পদ্ম আছে (৭)।

অতঃপর তিনি “মহারাজাদিবাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রচলিত একজাতীয় স্বর্ণমুদ্রার একদিকে “মহারাজা দিবাজ কুমার গুপ্তঃ” এবং অপরদিকে ভামনগুপ্ত সমন্বিতা পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি আছে (৮)। এতদ্বিন্ন তৎকালে তিনি তাম্র মুদ্রাও প্রচলন করিয়াছিলেন। এই প্রকাব তাম্রমুদ্রায় “শ্রী মহারাজা শ্রীকুমার গুপ্তঃ” লিখিত আছে (৯)।

মহারাজাদিবাজ কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে অযোধ্যা, মথুরা, কনৌজ, অজিত্ত, কৌশাম্বী, কাশী, সায়নাথ, গয়া, পাটলীপুত্র, নৈশালী, চম্পা, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, মহানাদ ও পাণ্ড্যপুত্র প্রসিদ্ধ নগর এবং তন্মধ্যে কৌশাম্বী, অযোধ্যা, তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। সপ্তগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বন্দন হইতে বহুবিধ পণ্যদ্রব্য সমৃদ্ধ যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি সমুদ্র দেশে বাণিজ্যব্যাপদেশে রপ্তানি হইত। তৎকালে ভাবতীয় বণিকগণ বালি ও যবদ্বীপে বাটয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং স্থাপত্য-শিল্পে এ সকল অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে তাঁহার সময়ে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ গণিতশাস্ত্র, শিল্প, স্থাপত্য, চিত্র ও ভাস্কর্য্যে ভাবত এবং তথা বহুস্তর ভাবতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

একপক্ষে মহারাজাদিবাজ কুমারগুপ্ত ৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পরাক্রম ও স্বাধীনতা সহিত রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে তাঁহার পদত্যাগ সিংহাসনে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র স্বল্প গুপ্ত আরোহণ করেন।

(১) Ibid. p. 68.

(২) Ibid. p. 69.

(৩) Ibid. No. 194. I. M. C. Vol. I. P. III, Nos. 2-4.

(৪) Ibid. P. 66. Nos. 198-200.

(৫) Ibid. No. 55.

(১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882 pp. 91, 104.

(২) Ibid. p. 88.

(৩) Ibid. 70-71. Nos. 205-209.

(৪) Allan, B.M.C., pp. 107 108, Nos. 385 390.

পিতৃ-পরিচয় (গল্প)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ছেলের পিতৃ-পরিচয় তার মা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তবে মার কাছ থেকে তাহা জানিবার দুর্ভাগা আমার মতন কোনো সন্তানের যেন না হয়।

যেখানে তাহা জানিবার কোতুল আছে, সেখানেই আছে অপমানের বিধ। এই বিষয় জালাই আমার ডাক্তারী জীবনের সব বাধা টেলিয়া নিয়া চলিয়াছে...আর আমাকে মন্থন করিবার জন্ত মায়ের এই যে ক্লান্ত সাধন ও দেহপাত তাহাও এই বিষয়জালায় রস।

এই প্রসিদ্ধ স্যানিটেরিয়মে আমি এসিষ্টেন্ট সার্জন। পার্শ্বতঃ উপত্যকার পাশে আমার কোয়ার্টার। প্রাতে চা খাইতে বসিয়াছি। পেরালা ঠাণ্ডা হইয়া গেল...তবু আবেততি। ভাবিতেছি সেই বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের কথা... তাঁর ইনকিরিগিটি-কম্প্রোমিসের কী দুর্জয় অভিমান! ডাকিলাম—মা? ... একটা দীর্ঘবাস পড়িল।

অনেকদিন পরে দীর্ঘবাস পড়িল। দীর্ঘবাস ফেলি না, দূত তা নষ্ট হয়, বল করিয়া যায়। আমার মনের বল রাখিতে হইবে। মনকে চোখ রাঙাইয়া বলি—ঠিক থাকো! আমার জন্ম আমার আরম্ভের বাহিরে ছিল, তাই বলিয়া আমার মন আমার আরম্ভের বাহিরে যাইতে পারিবে না।

ইহার ফলে আমার মধ্যে দারুণ একটা কম্প্রোমিস আসিয়াছে—আত্মপ্রত্যয়ের কম্প্রোমিস! আমার মনকে আমি 'এসার্ট' করিতে ভয় পাইতাম না। শুধু নীতির দিক দিয়াই নয়, পড়ার দিক দিয়াও আমি খাটি—এই অভিমান আমার পাইরা বসিয়াছিল। ইহার জন্ত আমি পরিমত ব্যায়াম করি, পরিমিত আহার অভ্যাস করিয়াছি। কিন্তু ছাত্রজীবনে কিছুটা অপরিসীম পড়িয়াছি। ডাক্তারী কলেজের শেষ পরীক্ষার কথা মনে পড়িতেছে। হাটের বিষয় আমার বিশেষ পাঠ্য ছিল। তিনজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মৌখিক পরীক্ষা লইতেছিলেন। আমাকে একটা ঘণ্টার প্রশ্ন করিলেন। একটু ভাবিয়াই উত্তর দিলাম। তাহার বলিলেন—আরও ভাবিয়া উত্তর দাও, দুই মিনিট সময় দিলাম। আমি দূতায় সঙ্গে বলিয়াছিলাম—আমার ঐ একটাই উত্তর। একজন বলিলেন, তোমার তুল উত্তর। আমি দুই হাত মুঠো করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিলাম—আমি 'এসার্ট' করিতেছি আমার ঠিক উত্তর। দৈনিন প্রধান পরীক্ষক আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—সত্যি তোমার ঠিক উত্তর, আর তোমার আত্মপ্রত্যয়ের দূতায় জন্ত এবার তুমিই স্বর্ণ পদকটা পাইবে।

আবার ডাকিলাম—মা?...মাকাল থেকে তারি অন্তরনক। মার মুখ ছুঁতে তো আমারই জন্ত, আমি ভাল আছি, তবে? কৈশোরই তিনি বিধবা হন, অসত্য আত্মরপের নির্যাতন সহ্য করিতে পারেন না, লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইয়াই অল্প দিনে নিজের যোগ্যতা দেখান। তারপর তিনি হন শিক্ষয়িত্রী, ইহার মধ্যেই আমি আসিয়াছি। আমার জ্ঞান হইলে দেখিলাম

শুধু আত্মরপ মারকে 'এক ঘরে' করিয়া রাখিয়াছে। গ্রাম্য স্কুল হইতে পাশ করিয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। মার আর আমার পড়ার খরচ চালানো কষ্টকর হইল। তিনি নাস' হইয়া কলিকাতায় একটি হীসপাতালে ঢুকিলেন। আপনি না খাইয়া আমার খাওয়াইয়া পাশ করাইলেন। সেই থেকে মা আমার সঙ্গে সঙ্গে। ইদানীং ধর্ম-কর্মের দিক খুব ঝোঁক হইয়াছে। কিন্তু কয়দিন হইতে এ কী দেখিতেছি? মা তাঁর নাসের পোষাক পরিয়া এখনকার এই হীসপাতালে সর্ব্বদাই খাতাখাত করিতেছেন! একটি বৃদ্ধ যোগী সেখানে আসিয়াছেন, যোগটা যে মুখের কানসার তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ভক্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন আমাদের মহকুমা হাকিম দয়াল চক্রবর্তী। কলিকাতাতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। তাঁর দ্বারা অনুগ্রহের জন্ত আমাদের কলেজের হীসপাতালে ঘর নিয়া থাকেন, আমি তখন পাশ করিয়া হাউস-সার্জন হইয়াছি। তারপর অনেকবার তাঁদের বাড়িতে গিয়াছি। কলেজের পাশে শানকিডাকার তাঁদের বাড়ি ছিল—এখন যে জায়গাটা ভাঙিয়া বড় এতেনিট রাস্তা হইয়াছে। তাঁর স্ত্রী নিজের হাতে আমার কতদিন খাওয়াইয়াছেন। তিনি আমার ভাই বলিয়া ডাকিতেন, আমি তাঁকে দ্বিধা বলিতাম। সেই সুবাদে দয়াল বাবু আমার রোগীটির কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন। কিন্তু ইহাও সঙ্গে মার কি যোগাযোগ থাকিতে পারে বুঝতে পারিতেছিলাম না!

নাস' ভিন্ন যোগীর কাছে কোনো আত্মীয় স্বজনও বেশিখণ্ড থাকিতে পারে না। মা তাই তিন চারবার করিয়া নাসের ঘেঁষে এই রোগীটিকে দেখিতে যাইতেছেন। বুঝিতেছি কাল সমস্ত রাত সেখানেই আছেন। আজ এখনও ফেরেন নাই!

নীচে মোটারের শব্দ শুনিয়া নাসিয়া আসিলাম। দেখিলাম দয়াল বাবু ও তাঁর স্ত্রী আমার হীসপাতালে দিয়া যাইতে আসিয়াছেন। দয়াল বাবুর স্ত্রী আমার দ্বিধা, কাঁদিয়া বলিলেন, ভাই এখন চলুন, বাগ আর বাকেন না। নিমেষের মধ্যে খড়াচুড়া পরিয়া তাঁদের সঙ্গে বাহির হইলাম। দিয়া দেখি বৃদ্ধের শেষ অবস্থা, পাশে দাঁড়াইয়া আমার মা, পাখের মতন নিশ্চল, চোখ দুইটা লাল।

আমি আসিতেই মার মুখ যেন প্রফুল হইল, সচল হইয়া উঠিলেন তিনি। তারপর বিধবাহীন স্পষ্ট কর্তে আমার বলিলেন, কতদিন তুমি পিতৃ-পরিচয় চেয়েছ কিন্তু, দিতে পারি নি! তোমার ভাগা ভাল, এখনো তাঁর জ্ঞান আছে। পায়ের খুঁটা নাও, আশীর্বাদ চেয়ে নাও।

আমি প্রচার সঙ্গে তাঁর পায়ের খুঁটা নিলাম। মনে হটল আশীর্বাদ করিতে তাঁর ডান হাতখানি একটু উঠিল, তাঁর মুখ দিয়া যেন অশ্রু বাহির হইল—'বি, উ'। কিন্তু তখন সব শেষ।

লিপি (গল্প)

শ্রীরমেন মৈত্র

* বয়সের বেঘবেছুর এক সকাল। ভোর হইতে আকাশটা মুখখানি কেমন স্নান করিয়া আছে। ঠাণ্ডা বাতাস থাকিয়া থাকিয়া ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া বাইতেছে। আমি চেয়ারে বসিয়া বাতাসের শৈত্য অনুভব করিতেছি এবং বাহিরের প্রকৃতির এই মন্ত লীলা ও সুশ্র, ঝাপ, বারিপাত দেখিতে দেখিতে কাগজ ও কলম সহযোগে এক বাতিবীর্ণ প্রবললিপি লিখিতেছি।

সত্যি পত্র লিখিতেছি। প্রবাস-বাসের অকৃত অভিজ্ঞতা এবং নিঃসঙ্গ জীবনের বিরহে যেমনা দিশাইয়া, ভাবা-চাতুর্ঘ্যে অপূর্ণ করিয়া পত্র লিখিতেছিলাম শিবানীকে। যাহারা আমাকে চেনেন ও জানেন তাহার আশ্বিন—শিবানী আমার কে? তাহার ভাবন, তবু লিখিব, এখন

তাঁহাদের কথা ভাবিবার সময় নাই। বিরহের পত্র লিখিবার এমন চমৎকার পরিবেশ আমার হয়ত নাও আসিতে পারে।

বাহিরের বয়স দেখিয়া মনে কেমন এক অকৃত বৈক্য ও উদাসীনত আসিয়া উঠিতেছে। জানালা দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখি ছ'একটা শাল গাছ, লাল কীকর বিহানো পার্কটা পথ, আর তারই পাশে উল্লুখ আশ্রয় জামল বারিমানের ঘির্ক। বাতাসের দোলার শাল গাছের শাখা পত্র ছলিতেছে। স্থলর নিতুততার বাসনা আমি চিঠি লিখিতেছি শিবানীকে—

"ওগো বিভা বোর অনেক ঘরের বিভা,

কতদিন হয়ে গেল তোমাকে দেখি নি, কবে দেখবো তাও জানি না।

জীবনের কর্ম কি আমাদের ছুঁজনের সাক্ষাতের মধ্যে এমন করেই ব্যবধান সৃষ্টি করে চলবে চিরদিন! কই তুমিও তো আমাকে আর লেখো না, - নাও না আমার খবর। আমাকে একবারও বুঝ মনে পড়ে না তোমার? একটিকারও না? কিন্তু জানো কি, কেমন করে বাটে আমার নিঃসঙ্গ জীবন এই চন্দ্র প্রবাসে।—

আমার কি বেদনা সেকি জানো তুমি জানো

ওগো মিতা মোর অনেকদূরের মিতা,

আজি মোর ভিন্নির নিবিড় ঘামিনী বিছাৎ সচকিত।

বাদল বাতাস যোগে

আমার হৃদয় উঠিছে কেঁপে,

ওগো সেকি তুমি জানো,

উৎসুক এঁই দুঃখ জাগরণ সেকি হবে হায় বুখা।

বন্ধু আমার—

যদি জানতে দয়িতবিরহের বেদনা কি দুঃসহ। কর্মবহুল দিনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও মনে পড়ে তোমার মুখ। প্রথম কদিনের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের কাহিনী মনে পড়ে। পুরানো দিনের স্মৃতি কেবল দুঃখেই আনে বন্ধু। আর আজ? আজ, বাইরের প্রকৃতির মত অশান্ত হয়ে উঠেছে গম্ভীর মন, চোপে নেমেছে অশ্রুধারা। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই মুখ্য ভাল ছিলো।

আমার ভবন ঘারে

রোগণ করিলে যারে

সজল হাওয়ার করণ পরশে

সে মালতী বিকশিতা,

মিতা মোর অনেকদূরের মিতা।

চিক করে বলতে পাচ্ছি না কবে যানো তোমার কাছে; তবে হঠাৎ কোন সময় যাবে নিশ্চয়ই। এবার যদি যাই, আসবার সময় মনে করে তোমায় নিয়ে আসবো। এখানে বসে বসে আমরা দেখবো পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যা নামছে, আকাশে মেঘে উঠছে তারার দল, শালবনের কঁকে কঁকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জোনাকীর স্তিমিত আলো। আর মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পিকের অশ্রুত হ্রস্ব। শুনবে তো? বাঁদী শুনতে তুমি যে ভানবানো। তুমি না থাকলে আমাকে দেখবে কে? চিঠি পেয়েই জানিও

তোমার ক্ষেত্রে কি নিয়ে যাবো। জানো তো পার্শ্বতা দেখে কিছুই মনে না। বন্ধু -

তুমি যার হৃদয় দিয়েছিলে বাঁধ

মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,

দেই সে তোমার বীণা লোক বিশ্বগুণ,

মিতা মোর অনেকদূরের মিতা।

লেখা চিঠিখানা পড়িতেছিলাম। টের পাই নাই ইতিমধ্যে কখন ভূত বাজারের মুড়ি লইয়া আমার পিছনে আসিয়া ঠাঁড়াইয়াছে পরশা লইবার জন্য। সহসা সে কাঁদল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম ভূত গজেল। কহিলাম—“শিবানীকে আনবো বলে চিঠি লিখে দিলাম।” ভূত পুলকিত হইয়া কহিল—“তাই নাকি?” “হ্যাঁ রে।”

“কই কি লিখলেন দেখি।”

“তুই দেখে বুঝতে পারবি না, বরং আমি পড়ছি শোন।”

“পড়ুন।” বলিয়া গজেল মুড়িটা মেঝেতে নামাইয়া হাসিমুখে বলিল। আমি পড়িয়া চলিলাম।

পড়া শেষ হইল। ভূতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে বাহিরের দিকে হাঁকাইয়া আছে। কহিলাম—“এই লিখে দিয়েছি, কেমন হয়েচে?” ভূত যেন অনেকটা অগ্রসর মুখে কহিল—“তা মন্দ হয়নি। তবে আরও গোটা কতক কথা লিখে দিলে হোত। আর শেষে দিকে নামটা উঠিয়ে দিয়ে লিখে দিন—‘ইতি তোমার ভালতলার বেহারী’।”

“বেহারী কেন রে? আর ভালতলাই বা কেন?”

“বেহারী আমার ডাক নাম। আর ‘ভালতলার বেহারী’ বলেই সকলে ডাকে আমাকে। ভালতলায় বাড়ী কিনা। শিবানীও নাম ছাড়া আমার ভাল নাম জানে না।” “বলিস কি, তোর বউ, অথঃ সে তো—”

ভূত হাসিয়া কহিল—“আর ওর মধ্যে লিখে দিন একটু যে আসছে মনে টাকা পাঠাতে পারবো না।”

সামান্য কয়টা কথা তখন চিঠির মধ্যে একজারগায় লিখিয়া দিলাম। গজেল চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। পরে শুনিয়াছিলাম, আমার লেখা চিঠি তাহার মনোপুত হয় নাই বলিয়া ডাকঘরে গিয়া অস্ত্র কাহার কাছ হইতে সে নুতন করিয়া চিঠি লিখাইয়া ক্রীকে পাঠাইয়াছে।

ত্রাণ-সমিতির একটি নারী (গল্প),

শ্রীসত্যকুমার নাগ

যে ঘরে মেজে পুথাগো বাড়িটার সংস্কার হ'লো। টেবিল চেয়ার সব এসে জুড়ে হ'লো। এ-পথে বাদে দেখিনি, তারও এলো। দিনের আলোকে মন চমক লাগে চোখে। দেয়ালের গায়ে একদিন একটা দিনে কালো সাইনবোর্ডে শব্দ অক্ষরে ‘ত্রাণ-সমিতি’ খুলতে দেখা গেলো। আর আটা দিয়ে বেশ সতর্ককি আটকানো আছে একটি তিনরঙা চবি, মানুষের মুক্তি আর লাসকালোতে সাধন-বাণী—‘এদের মারতে হবে’।

এরা কারা? মন দিয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। হাতে সরীসৃ উঁচিয়ে আছে, নাকবোঁচো, মুখ খানড়া, রং চটা! আর এদেরই বিপরীত দিকে আছে প্রতিদ্বন্দী দল, বাদের মধ্যে নারীর হাতে বীট, নরের হাতে শাবল, ছেলের হাতে লাঠি।

একক্ষণ আঁচ হ'ল সাবাস..আমার দেশের নঃনারী...জাগানকে এভাবে রুখতে হ'বে। ভীক মনে সাহস হ'লো। ছোট বৃকের ছাতি ফুলে উঠল, কানো খুব রংবেরি হাঁসি দেখা দিল।

কিউর কার্যকলাপ দেখবার সাধ হলো। উঁকি বুঁকি মারলাম।

বড়তা চলছে। ‘সত্য ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ’ লটবানো কাগজের বোর্ড। পিছু পা হ'লাম, সহজেই বুঝলাম—আমাদের হিটহা। অর্থাৎ বিপদেই এরা বন্ধু।

নিরাপদ এলাকায় কিরে আসতেই সৌমিত্রী এসে সংবাদ দিল, “ওগো, একটা হুখবর আছে—”

কি?

আমি কাল থেকে ‘ত্রাণ সমিতি’তে যাচ্ছি।

বিশ্বাস হ'ল না। বললাম : কিসের ত্রাণ আবার?

ও-জানো না বুঝি, এই দেখ—কতকগুলো কাগজ দিল হাতে। সমিতির নিয়মকানুন। সৌমিত্রীই বলল, : বাক্, এবার ভাবনা দূর হ'ল তো? নিঃশ্বাস ফেললাম মুখ কিরে।

বাক্, তোমাকে এবার আর চাল-ডালের ভাবনা ভাবতে হবে না। এই দেখ।

সৌমিত্রী চতুর্থা—সন্দেহ নেই। সে জানে এ যুদ্ধের বাজারে পরশা হলেও ‘চিহ্ন’ পাওয়া যায় না।

রেশন পাওয়া যাবে. অ.বাস দিলে সৌমিত্রী।

বললাম, কাজটা ভাল হ'ল না...'

কেন? তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ঘর ছেড়ে বাইরে যাবে...সমিতি রক্ষা করতে?

সমিতি রক্ষা করতে নয়, বাংলাকে রক্ষা করতে। জানো এদের কি কাজ?

যে ফোটার মত বলে চলল সৌমিত্রী। তার মস্তিষ্ক এই যে, জনসাধারণকে জাপানী বোমা থেকে রক্ষা করা, তাদের হিত কথা শুনানো, আহতদের সেবা করা, আরো অনেক কিছু বললে...স'স গুলো মনে নেই।

আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারিত হলো : হায় সৌমিত্রী, তোমাকে নিয়ে আমার নীড় বাঁধা, আজ নীড় ছেড়ে তুমি যাবে রণচণ্ডীর বেগে - দুর্কীলতাকে গোপন করেছে বললাম : ওসব নোংরা কাজে গিয়ে লাভ নেই। অসাধনরতা সৌমিত্রী আনো থেকে মুখ বঁকিয়ে নিয়ে জবাব দিল : কি বললে, সোংরা কাজ? দেখ...এসব কথা আর কখনো বোলো না... সরকার জানলে তোমাকে পক্ষমবাহিনী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

একথা শুনে আমার বাক্য রোধ হ'ল।

কাঁধে প'র দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে কোমরের ছ'পাশে শক্ত করে বাঁধলে কাপড়, আরেকবার মাথার চুলগুলো ত্র'হাত দিয়ে চেপে তুলে ঠিক করে নিলে।

কাছে এসে বললে, তুমি ও জানো সংসারে কি অনাগুষ্ঠি চলছে, চাল নেই, করলা নেই, যা দেখতো কনট্রোল দোকানের দশা - তবু ঘন রেশন পাই—তা দিবা চলে যাবে...

আমতা আমতা করে, বলি : কিন্তু তুমি—

হাঁ, আমার জন্তু ভাব? আমি ত বচিখুঁকী নই, যে, পাথে বেরলেই পথ হারিয়ে কেসবো, আর ঘরের কথা ভুলে যাবে। এই ঘর ত তোমাকে আমাকে নিয়েই, লক্ষ্মীটী...

ছোট অবুজ ছেলেকে যেমন করে বুঝায় তেমন করে সৌমিত্রী আমাকে অনেকখন বুঝালে। মনে মনে বললাম, আজ থেকে সৌমিত্রী তুমি আমার হাতছাড়া।

বললাম, তবুও —

দুঃখে তুমি ছোট ছেলের মতো সহজেই ভেঙ্গে পড়ো।

পৌরুষে যা দিলে সৌমিত্রী। গ্রেব কেটেই বললাম, 'নএ', ঐ কনট্রোলের দোকানই ভাল, পরদা না থাকে আমি আনবো, দোহাই দৈত্বী, তুমি নিজেই সংবত করো, কনট্রোল করো—তোমার ঋণ্যমকে।

যে কথাটা ছিল সৌমিত্রীর মনে মনে, সে কথাটা নির্গমভায়েই আজ আমাকে বলল, ভাগ্যিস, পাশকরা মেয়ে বিয়ে করেছিলে তাই রক্ষে, "

জবাব দেবার কিছু নেই এতে, উচিত বস্তু উচিত কথায় বলেছে বিশেষ মাঝখানে অনেক সময় সৌমিত্রীই রক্ষা করেছে তার পাশকরা বিজ্ঞা বুদ্ধি ধরত করে! এ-ই ত সে বছর আমার অস্থব্ধ হ'লো টাইফয়েড...সৌমিত্রীকে দেখেছি ঘরে বাইরে আনাগোনা করেছে, পরদা উপার্জন করেছে... ধন্ত সৌমিত্রী, তুমি আমার ঘরের গেরহীন নও, বাইরেরও মিতা।

আমাকে নীরব দেখে সৌমিত্রী বুঝলে তার শ্রীমুখের বাণী আমাকে আহত করেছে।

একটু আদর করেই বললে : ক'টা দিন বৈত নয়, তোমার চাকী হ'লেই এ সব হেঁড়ে দেবো...।

নীচে পারের শব্দ শোনা গেল। পাউঁচু করে উঁকি মেরে দেখলে, 'ত্রাণ সমিতির' গাড়ী।

সৌমিত্রী পা বাড়াবার পাথে ছোট আলমারিটা খুলে আমাকে দেখিয়ে বললে : এ প্যাকেটে তুলো, এ শিশিতে গ্লিসেরিন, এ লেবেল আটা শিশিতে টিংচার আণ্ডিন...উপরে কখনো থেকো না, 'সাইরেন' বাজলে সেন্টার রুমে যেও...লক্ষ্মীটী - বলে ক্ষত ভঙিমায় 'ত্রাণ সমিতি'র বীরস্বনী সৌমিত্রী দেবী ভ্যানিটী ব্যাগ বা হাতে কুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভাবলাম, আমার প্রতি সৌমিত্রীর অনুরাগ একটুও শিথিল হয় নি। আমি কি করে বাঁচবো, ভাল থাকবো—তা নিয়ে ওর চিন্তে ভাবনার বিগ্রাম নাই। কেন জানি মন হাঁৎ ডুকের উঠল। আমি একেবারে নিতে গেলাম। উঠে দাঁড়াবার আর ইচ্ছে হল না। মিঃ সেনের শুভানে যাবার কথা ছিল, একটা কাজের কথা ছিল - যাক গে - কার চম্ম এসব করবো - সৌমিত্রী?...সে তো তার পাথর নিজেই খুঁজে নিতে পারে - আর আমার...?

অপ্রসন্ন মনে আঁকলাম সৌমিত্রী আর আমার ভবিষ্যত চবি...। কাগজগুলো খুলে দেখলাম...এ-আর-পি-র সতর্কবাণী...। 'সাইরেন' বাজলে ব্লিট ট্রেক্স আশ্রয় নিন বা কোন নিরাপদ এলাকায় থাকুন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন না...।' সতর্কবাণী...সহস্র! সতর্ক করে দিল সত্য সাইরেন বাজল।

'এ-আর-পি-র বাণী ভুলবার নয়...বিপদে বৈধ হারাবেন না...।

ঘরে আমি, সৌমিত্রী বাইরে...ঐয্য কোথায় রাখি বলুন তো? 'এন্টি-এয়ারক্রফট'র শব্দ শোনা গেল - তড়বড় করে নীচে নেমে এলাম। এক ঝাঁক এরোগেন, মধুগুহ্রন ধ্বনি...জাপানী...সন্বেহ নেই...এতোকাল রাত্রিতে এসেছে ওরা চুপি চুপি...এবার দিনের বেলাই হানা দিলে...উঃ দৃষ্টি মায়ের ডানপিটে ছেলে ওঃ...এরা নেহাৎ ডাকু...মানুষের...যঃ ঐ তো রোহিতমত বোমার শব্দ...তুলো...গ্লিসারিন...তাইত...ওগুলো মে, আল-মারোহেই আছে...এ-আর-পি-র কাগজখানি হাতেই আছে। এরি মধ্যে কে জানি সংবাদ দিল, জাপানী 'প্যারাহুট' দিয়ে নেমেছে...রক্ষা নাই...।

মাথার কলবজাগুলো চিলে হয়ে গেল - কংকর্তবিশিষ্ট সৌমিত্রী কি বেঁচে নেই হবে - মনে মনে বললাম...হে জাপানী, আজকের মত দরজা করো, ভাল ছেলের মত ঘরে ফিরে যাও...।

আবার কে একজন 'রয়টার' বললে : বিধিরপূর ভাঁক বোমা হেলেছে, লোকও মরেছে।

দরজা একটু কঁক করে গলা বের করে দেখতে যাই...এমন সময় গিছন থেকে কোঁচা ধরে টান মেরে বলে, মশাই দোর বন্ধ করুন। জবাব দেই মশাই - আমার হয়ে নানো ওয়াই-ফু—বাধা দিয়ে তত্বলেক বলে উঠেন যাবেন কোথায় পুরন্দরবাবু। মাথা বারাপ হয়েছে না কি?

একঘণ্টা পর 'এল ক্লিয়ার' ধ্বনি হলো। পাথে বেরিয়ে পড়লাম সৌমিত্রীর সন্ধানে। হৃদয়প্ত হ'য়ে ঢুট চলি। ঐ ত 'ত্রাণ সমিতি', দরজা খান্না মাহতই খুলে গেল...কই কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি নে। তবে...আমার মেত্রী...কোথায় গেল...

সহসা নজরে পড়ল বা কোণে টেবলের নীচে শাড়ির...সৌমিত্রী হামাগুড়ি দিয়ে...যাক যে অবস্থায় 'ত্রাণ সমিতি'র সদস্য! সৌমিত্রীকে দেখতে পেলাম - তা বর্ণনা বরণে আমার হাসি ও লজ্জা পায়।

হামাগুড়ি দিয়ে সৌমিত্রী বেরিয়ে এলো টেবলের নীচ থেকে। বাড়ী ফেরবার পাথে নৌ মত্রী আমার সাথে একটুও কথা বলে নি।

কু-লোকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু সে-সব শ্রুতব্য নহে। হয়ত বা ঈর্ষাক্ষেপে রটাইয়া বেড়ায়,—নাথার একটু ছিট আছে, বসমেজাজী! আমরা কিন্তু বলি, বেশ লোক বীরেন দা'। মজার মানুষ।

ঈর্ষা না-হইবেই বা কেন? বয়স প্রায় দু'তুড়ি হইতে চলিল তথাপি সংসার-বর্ষ করেন নাই; তাই সংসারের দারিদ্র্যও স্বকে আসিয়া পড়ে নাই। মার্জ্জিত আপিসে আশি টাকা বেতন সঞ্চয় করিয়া বেশ তেঁকা আরামে নিশ্চিন্তে নাকে সন্নিবার তৈল দিয়া কাটাইয়া দিতেছেন। কয়সার দোকানে বা রেশন শপে লাইন ধরিয়া ধাঁড়াইবার বালাই নাই, গরুয়ার হিসাব রাধিবার প্রয়োজন নাই, 'কাচা-বাচ্চার অহুতার জন্ত ডাক্তারের বিল চুকাইবার ভাবনা নাই, বহনীর অভাবে গৃহিণীর স্বাক্ষর শুনিবার দায়ও নাই। তবে আর পরের চোখনা টাটাইয়া যায় কি?

না হয় একটু চট্ট করিয়া চট্টা উঠেন, কিন্তু তাই বলিয়া বসমেজাজী বলিতে হইবে? আমাদের সহিত তো কেনন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। এক হাতে কখনো তালি বাজিতে পারে না—বিনা ঘর্ষণে দপ্-করির আভন ছলিয়া উঠে না। অথচ মজা এই, বাহারা তাঁহাকে রাগার লোকে তাহাদের কোন দোষ দেখিতে পায় না—তাহাদের তরফে কোন দোষ নাই, বত অভায় শুধু বীরেনদারই—যদি তিনি উত্থাত হইয়া দ্বিতীয় রিপুটিকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিতে না পারেন। এরকম একটোখেনি ও পক্ষপাতিত্ব নির্বিশেষে প্রতিদিন বরদাস্ত করিতে আমাদের বিবেকে বাধে। তাই আজ দাদার হইয়া একটু ওকালতি করিতেছি—অবশ্য একেবারে নিচক সভা কথাই বলিতেছি। দাদাকে যদি আপনারদের প্রকৃত ভাল লাগে তবে তাঁহার উত্তম্বন্ধের নিকট হইতে অধুর ভবিষ্যতে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

এই সেদিন অতুলের সঙ্গে যে কেবোকারটা হইয়া গেল তাহাতে দাদার হাত কতটুকু? তিনি তো নিমিত্তমাত্র। অথচ সে কথা বুঝিবার মত যত্নের স্বাভাবিক উর্ধ্বতা করজনের আঁহ? বড়বাবুও সেদিন খামখা অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন। ইহাকে বরাং ছাড়া আর কী বলা চলে? আমরা কিন্তু বাপু হক্ কথা বলিব—দাদার স্বপক্ষে।

আচ্ছা, চুক্‌লি না কাটিলে কি চলিত না? গ্রীষ্মের বিশ্রহরে আপিসে বৈজ্ঞানিক পাখার নীচে বসিয়া কাজ করিতে করিতে এমন একটু আঁচটু ত্রুটি কর না আসে, বুক হাত দিয়ে বলুক দেখি। তাই বলিয়া দু' সাতাহ্ন মরিসনের গোচরে তাহা আনিতে হইবে? বীরেনদার বিশ্বাস অতুলই তাঁহার নামে চুক্‌লি কাটিয়াছে। ছোঁড়াটা এই সেদিনমাত্র আপিসে চুকিয়া ইতিমধ্যেই সাহেবের নজরে পড়িয়া গিয়াছে, এবং এর-ওর নামে বা শুা বলিয়া সাহেবের মন ভাঙাইয়া দিয়া নিজে আরো শ্রিয়পাত হইবার চেষ্টায় আছে। দাদা দিদির লোক, তবু অতুলের ইন্‌ক্রিমেন্ট তাঁর চেয়ে বেশী হয় কেনন করিয়া? দাদা কি বাস-বিচারি শুদ্ধ করিয়া থাকেন যে ইহার অর্থ বৃত্তিতে বিলম্ব হইবে? হায় আপিস! মহুত্বকে তুমি কতখানি নিয়ে টানিয়া আন। বীরেনদা এক একসময়ে ভাবেন, হয়ত বা পাগরার ছার অতুলেরও ঐশি প্রাপ্ত আছে; নতুং যখন তখন সে এরূপ অকুরন্ত তৈল সংগ্রহ করে কোথা হইতে?

এহেন অতুলকে দাদা এক টিপিক্যাল দুর্জ্জন বলিয়া মনে করেন এবং চাপকা-নীতি অনুযায়ী তাঁহাকে সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। অথচ মবাপ্ত অতুল ছোঁকরা এমন পাজি যে শত নিবেশ সত্ত্বেও তাঁহার শিষ্টসে আঠার ছার লাগিয়া থাকিবে। আমরা কতদিন শুনিয়াছি আপিসে আসিয়া দাদা তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সে যেন তাঁহাকে না বাঁটা। কিন্তু তাঁহার নিত্যন্ত গুরুগম্ভীর গুণার্ণিকে অতুল পরিহাসে তরল করিয়া একেবারে বাপীকৃত করিয়া দেয়। একপক্ষেই দাদা যদি চট্টা উঠিয়া অতুলের উর্ধ্বতন পূর্ণপুরুষকে তাহার কুকর্মে সাক্ষ্য দিবার জন্য

গলাবাজি করিয়া অনুপ্রলোক হইতে টানিয়া আনেন তবে তাঁহার একার উপর গোষারোপ করা চলে কি?

মেল ডে। সকাল সকাল আমরা আপিসে হাজির হইয়াছি। কাজের ডাড়া প্রায় নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই। অথঃ আজই দাদা আঁচ ঘটী লেট করিয়া আপিসে আসিলেন। লেটের কারণ আর কিছু নয়—হঠাৎ সবালে শয্যাভাগ করিয়া আবিষ্কার করিলেন, নাথার আঁচ-ইকি পরিমিত চুল প্রায় পোনে এক ইঞ্চিতে উপনীত হইয়াছে এবং এজন্য মস্তক ভারাক্রান্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হুতরাং নাপিত ডাকিয়া কদম-হাঁট দিতে একটু বেলা হইয়া যাইবে বৈকি।

পালোয়ানী চঙ চুল ছাঁটিয়া মাগকোচা আঁটয়া নীল সাঁটের আভিন ছুটাইয়া আঁচ ঘটী লেটে দাদা আপনার সোটে আসিয়া বসিলেন। সুখে মুহুমল হাসি, হাতে কালিদাসের মেঘদূত। সজ্জবিবাহিত তাই-পোর উপহার সামগ্রী হইতে এখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। কাঁচা-চর্চা করিতে যখনো তাঁহাকে দেখি নাই, তাই এক অজানা আশঙ্কায় আপনার বজ্ঞাতেই বোধ হয় একটু শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম।

অতুলটা ফস করিয়া প্রথমেই তাঁহার চুল ছাঁটা লইয়া একটুখানি টিপনো কাটিল, বলিল, কোথাকার সেলুন দাদা? পাছে কণার কথার কথা বাড়িয়া যায় এই ভয়ে আমিই তাড়াতাড়ি সে-কথার উত্তর দিলাম। বললাম, এমন মন্দার পালোয়ানী ছাঁট দেওয়া নাপিত ছাড়া ক্রি তোমার ঐ সেলুনের কাজ? কী যে বুদ্ধি! দাদা খুশি হইয়া গেলেন। আমার গানে এসব দৃষ্টিতে তা কাইলেন। আমি খুশি হইয়া গেলাম। যাক্, এখুনি একটা রাম-হাংগের পঁকডিনয় হইত—জিটা একেবারে রগ দেখি! গিয়াছে—বড় তাগে সামলাইয়া লইয়াছি।

আমি সে কাজের অন্ত নাই। এদিকে কর্তব্যোপী দাদার আজ কাজে মন নাই। সামনে একাউট খুলিয়া রাখিয়া আপন মনে মেঘদূত পড়িয়া চলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে কেনন যেন উদাস হইয়া যাইতেছেন। দাদার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমরা ভক্তের দল বিশ্রিত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছি।

দাদা তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন। সহসা আবেগ যৌব করা বোধ হয় অসম্ভব হইয়া পড়ার উচ্ছলিত কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন—

...তোমার দেখে ঘোমটা খুলে

সরিরে মাথার ঝাপটা চুলে

চাইবে হেসে মুখটি তুলে

বিরহিণীর দল...

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঞ্জ করিলেন, আচ্ছা অনিল, বস্তুতে পাগো, এই "ঝাপটা চুল" মানে কী? কী রকম ধরণের চুল?

তাঁহার এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে ও অতর্কিত প্রশ্নে আমি প্রথমে হতবাক্ হইয়া গেলাম। পরে একটু হাসিয়া বলিলাম, যে লোক কখনো রসপোজ্জা খায়নি, তাকে তার স্বাধ বোঝাব কেনন করে? এসব বোঝানো কি আর উপায় চলে? বিরহী যকের সর্ধবেদনা যদি আত্মরিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, তা' হ'লে ঝাপটা চুলই বলুন আর এলো টুসই বলুন কোনো কিছুই আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে পারবে না—সব অর্থ সহজ হ'য়ে যাবে। দাদাকে এভাবে ঘুরাইয়া বলিলাম, কারণ আমি নিজেও ঝাপটা চুলের অর্থ জানি না—অথঃ দাদার কাছে এখুনি সে কথা শিকার করিতে আমার অভিযানে বাধে।

এমন সময় অতুল পাকনি করিয়া ভারী গলায় বলিয়া উঠিল—
ব্যালের মানুষের বিশেষ ক'রে যে লোক কোমোদিন কোনো মেয়ের রেশমের মত চুপকে স্পর্শ করবার বা তার আশ্রয় দেখার আশা বা আকাঙ্ক্ষা করিতে

পারে না, তার মেঘবৃত পড়ার অর্থ কী বলতে পারো? আমি তো শ্রেক, একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁচতে পারি।

বলিলাম, কী?

—আর কী! চরিত্রটি একেবারে...

অভূলের কথা শেব হইল না। তাহাকে মুখ খুলিতে দেখিয়া দাদা নিজে মুখ বন্ধ করিয়া প্রথম হইতেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন। এখন ভীষ্ম হওয়ার গর্জিয়া উঠিলেন, শাটু-আপ!

শাটুই বুলিলাম, দাদার কাজ হইতে সেদিন আর কোন কাজ পাইবার আশা নাই—দম দেওয়া কলের গাড়ীর মত অবিরাম কথার গোলাগুলি বর্ষিত হইতে থাকিবে। অথচ বেশ ক্লান্ত করা চাই। তাই তাড়াতাড়ি মৌনী হইয়া যোগে বসিয়া গেলাম। যোগ দিতে দিহেই বোধ হয় প্রাণ বিরোধ হইয়া যাইবে! বাবু, দাদা এখন শান্ত হইলেই স্থস্থির হইয়া কাজ করিতে পাই। নচেৎ তিনি যেভাবে মুখ চুটাইতে চুটাইতে ইঞ্জিনের শিষ্টলের ভায় হাত নাড়িতেছেন তাহাতে আমার কাঁচের গ্লাসটির প্রতি সহজেই অপসৃত্য ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, দাদা, ও অর্ধচাঁচনটাকে এবারের মত মাফ করুন—আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

অনাগত

অনাগত দিনের একটি শীতের আবহাওয়া!...

বতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘরের মধ্যে হুহু করিয়া ফুলের পড়া মুখই করিতেছিল। অপুর সাধনের দালানে বৃদ্ধ ঠাকুর্দা: আনমনাভাবে বসিয়া কী ভাবিতেছিলেন!...হরত অতীত দিনের স্বপ্ন...হরত পরকালের চিন্তা! কিবা—

হঠাৎ যেন ঠাকুর্দার সজাগ হইয়া ওঠেন। পাঠরত একটি ছেলের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেন—কী পড়ছিস্ রে নন্দ? ইতিহাসের পড়া বৃষ্টি? ১৯৩৮ সালের বৃদ্ধ?

নন্দ নামক ছেলেটা, পড়া বন্ধ করিয়া জবাব দেয়—“হঁ দাদা!”

ঠাকুর্দার গলার স্বর বদলাইয়া যায়! বয়সোচিত গাভীরোর সহিত বলেন—“ও আর বই পড়ে তোরা কতটুকু জানতে পারবি বল? দেখিনি তো তোরা সে সব? আর দেখবিই বা কী করে বল? তোরা বাবাই বা তখন কতটুকু? সে একদিন গেছে রে!”...

ছেলেমেয়েগুলি ঠাকুর্দার কথার গম্বীর গন্ধ পায়! পড়া বন্ধ করিয়া মুহূর্তমধ্যে তাহার ঠাকুর্দাকে বিরিয়া বসিয়া পড়ে। আবার করিতে থাকে—“বল না দাদা তখনকার গল্প! দরকার কী বই পড়ে? তোমার কাছে শুনেও তো পড়া হবে? ও দাদা, বল না—”

ঠাকুর্দা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—গল্পনে কেলিরা আসা রজনীন দিনগুলির...কত স্মৃতি...কত আলো...কত আনন্দ সেখানে জন্ম হইয়া রহিয়াছে!...ওঃ! কতদিন হইয়া গেল! এই ছেলেমেয়েগুলি তখন কোথায়ই বা ছিল? অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা! কত কাছে...যেন হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়!...

ছেলেদের আবারের মত স্বপ্ন টুটরা যায়। হরত একটা অজ্ঞাত গীর্ঘবাস বুক ঠেলিয়া পথ করিয়া লয়।

আজন্মবয়স করিয়া ঠাকুর্দা বলেন—“বলছি রে, বলছি। কিন্তু, তোদের পড়া হবে না? এখনি মাটির আসবে, না, না, আর একদিন বলব। এখন পড়গে বা।

বোরেনদা আমাকে বড়ো ভালবাসেন। তাই এখনে ডিকাইং এ্যাটিচুড দেখাইয়াও পরিণেবে বটাপানেক পরে একবার পাড়ু লইয়া ঘুরিয়া আসি। ক্রমশঃ শ্রান্ত ও লাভ হইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তিনি গেলে অন্ততঃ এক বটাপর মধ্যে আর কাহারও সেখানে প্রবেশ করিবার জো থাকে না। হুতরাং রাগ পড়িয়া আসিবার পক্ষে ছ’ বটো সময় একেবারে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।

...হু’দিন পরে শনিবারে দাদা যখন খোপ মেজাজে ছিলেন তখন ট্রামে আসিতে আসিতে আমাকে তাহার মেঘবৃত পড়ার ইতিহাস বলিয়াছিলেন।

বহুর পনেরো আগে একটি পরিবার দাদার পানের বাড়ীটার ভাড়া থাকিত। সেই পরিবারের বি-এ পরীক্ষার্থীরা একটি ঘরে কালিদাসের অরমিষ্টাল মেঘবৃত ভাড়া হুন্দর হুহু করিয়া পড়িত। দাদা সম্ভবতঃ মনে মনে সেই পাঠ-নিরন্তা মেরোটিকে লইয়া একটু লোকসানে পড়িয়াছিলেন! তাই সে যখন অনতিপরে বিবাহ করিয়া অন্ততঃ চলিয়া গেল তখন দাদা তাহার জীবন-নাট্য হইতে বিবাহের একটি বাদ দিতে মনস্থ করিলেন।

সেদিন তাই-পোর ঐতিহ্যোত্তমসেবে তাহার কুঁহুবাড়ী হইতে বাহারা আসিয়াছিল তাহাদের সহিত দাদার সেই পূর্ববৃত্ত মেরোটিক ছিল। সেই নম্রবধূকে মেঘবৃত্তাণি উপহার দিয়া গিয়াছে।

...দাদার উপর আমার মতটা আরো বাড়িয়া গেল।

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ছেলেমেয়েগুলি হাসিয়া ওঠে। মিসু বলে, “ঠাকুর্দা যেন কী। কিছু যদি মনে থাকবে? কাল যোববার না? কাল আবার পড়া কিসের?” সত্যিই। কী যে হইয়াছে ঠাকুর্দার? একান্ত জানা কথাগুলিও যে আজকাল কিছুতেই আর মনে থাকিতে চায় না, কেন যে এমন হয়? জোর করিয়া হাসিয়া ঠাকুর্দা বলেন, মনে থাকবে কী রে? বহুসে তো বড় কম হোল না? কিন্তু মিসুদি—আগে এক পেগালা চা খাওয়াতে হবে যে ভাই। তা’ না হ’লে গল্প তো জন্মবে না। আর নীতটাও বা’ পড়েছে আজ।

মিসুর চেষ্টা ও সুপারিশ চা আসিয়া পড়ে! তোমার করিয়া চা পান করিতে করিতে ঠাকুর্দা বার বার তাহার কোটরগত পীতাক চন্দ্র কীণ বৃষ্টি সম্মেহে বলাইয়া লইতে থাকেন একান্ত উৎসুকচিত্তে শিশুগুলির উপর! বড় ভালবাসেন ঠাকুর্দা এগুলিকে! ইহারাই তো তাহার অন্তরনের সমসাম্যী! ইহার কী তাহার পর? লোকে অবশ্য কত কী বলে? কিন্তু তাহার কী একবারও ভাবিয়া দেখে ইহার বুদ্ধের কত আপনার?...ইহার যে এই বুদ্ধেরই স্মৃতিময় রূপান্তর! নন্দ মিসুর মধ্যেই যে লুকাইয়া আছে এই লোলচর্চ ঠাকুর্দার নবশৈল্য!...

ছেলেরা আবার আবার আরম্ভ করে! গল্প আরম্ভ করিতেই হয়! ঠাকুর্দা বলিয়া চলেন—জার্মানীর বিধাস্বাতকতার কথা...পোলাণ্ড-ডানকার্কের পতন...রাশিয়ার সন্ধিবেশ...জাপানের বর্বরতার কাহিনী!...

কাহিনীতে হয়ত অনেক ক্রটি থাকিরা যায়!...বটনার পারস্পর্য হয়ত সঠিক রক্ষিত হয় না!...অনেক কথা হয়ত বাদ পড়িয়া যায়...কত মূতন কথা হয়ত মিশিয়া যায়! তবু গল্প জমিয়া ওঠে! একটি অনীতিপর বৃদ্ধ ইতিহাসের গল্প বলার ছলে আত্মবিত্তের চিত্রে বলিয়া বান আপনার জীকন মধ্যাহ্নের হায়াইগা বাওরা রৌদ্রবধূর দিনগুলির কথা, আর স্মৃতিয়ে বসিয়া এককল কচিপিপু তাহাই শুনিতে থাকে নির্দীক নিশ্চয় তরুরতায়!...

ইতিহাস নিছক গল্পে রূপান্তরিত হইয়া যায়! কাহিনী প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইতে দেবী হয় না!...ঠাকুর্দা বলিয়া চলেন—“এখন দেখিন

কোল্‌কেতার বোমা পড়ল,—ওঃ! সেদিনও এমনি শীতকাল! তবে, রাত আরও একটু বেশী হবে! বারোটা তো বটেই,...একটা ছুটোও হতে পারে,—টিক মনে নেই! খাটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি আমি, নিচে মেঝেতে শুয়ে আচ্ছ তোদের ঠানদি! তার বৃক্কের একপাশে ঘুমোচ্ছে নন্দর জ্যোতিষি, আর বৃক্কের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে নন্দর বাবা! এই—টিক এটুকু তখন! আর তোদের কাকু তখনও জন্মাইনি!...

ছোট শিশুর দলটা হাসিমা গুঠে! যেন কতবড় একটা অবিখ্যাত কাহিনী শুনিতেছে! বাবা এটুকু...কাকু জন্মায়নি!...তাহাদের ঐ অত-বড় বাবা আর কাকু কিনা!...! বিস্তৃত শুনিতে বেশ লাগে! সাততাই চাঁপার গল্পের চাইতে একটুও খাপস নয়!...

ঠাকুর্দা ততক্ষণে আবার আরম্ভ করেন—“হঠাৎ বুন বুন আওয়াজে বুন ভেঙ্গে গেল! কী হোল? ব্যাপার কী?... আর কী! বোম্ব পড়ছে! ভায়ী সখ হোল দেখবার...বাইরে চলে এলাম! ওঃ! সে, কী আলো রে ভাই! একটা ক রে বোম্ব লাটে আর আলোর বস্ত্র ব'য়ে যায়! ঘর দোর সব ধ্বংস করে কাঁপতে আরম্ভ করে! মনে হয়, এই বুন গেল পড়ে! আর, সে কী আওয়াজ!

শিশুগুলি হাঁ করিয়া যেন গিলিতে থাকে প্রত্যেক কথাটা! ঠাকুর্দার গল্পের ভিতর দিয়া তাহার যেন নিজেগুণে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে অন্ধকালো আকাশপথে বোম্ব ঝাটার তীব্র আলো, শুনিতে থাকে তাহার গুরুগম্ভীর ধ্বন, মাটিটা কাঁপিতেছে বলিয়াই তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস!

ভয়ে ভয়ে মিশু জিজ্ঞাসা করে,—‘তোমার ভর ক'ছিল না দাদু?’ অল্প একটু ভাঙ্কিলোর হাসি হাসিয়া ঠাকুর্দা বলেন,—‘ভয় কিসের? তখনও কী আর আমি এমনি বড়ো ছিলাম রে? তখন আমার ই-রা বৃক্কের ছাতি, এক হাতের ক'জ আর এক হাতে ধরা যায় না! হাঁ, ভয় পেয়েছিল বটে তোদের ঠানদি!’—

ঠাকুর্দা হাসিতে থাকেন। যেন কতবড় একটা মজার কথা হইয়াছে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে তিনি সত্য সত্যই নিজের বর্তমানকে অজ্ঞাতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারেন না। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিতে থাকেন,—‘জানলি ভাই! সে এক মজা! যত কাদে ছেলেছুটো, তত কাদে তাদের মা! আমাকে বল—ভেতরে এসো বল্‌চি! নইলে আমি গিয়ে বোমার তলায় মাথা পেতে দেব!—শোন কথা! বোমা যেন সত্যিই আমার চাপে পড়ছে, যে—”

এক স্বপ্নক্ ঠাণ্ডা উত্তরের হাওয়া হু-হু করিয়া বহিয়া যায়! শিশুগুলি পরস্পর আরও ঘন হইয়া বসে, দেহসঙ্গিখোর উত্তাপ ভাগ করিয়া লষ্টে চায়! বৃক্ক ঠাকুর্দার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়া যায়! বোটা মাপারটার বেশ করিয়া সমস্ত দেহ জড়িয়া লইয়াও যেন শান্ত করিতে চায় না! কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ক বলেন—“আর একটু চা খাওয়াতে পারিস্ মিশুদি? ইঃ! ঠাণ্ডাটা আজ বেশ চেপেই পড়ল রে! রাতে বোধ হয় আরও বাড়বে! দিবি নাকি ভাই?” অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিশু উঠিয়া ধাঁড়ায়! মা জ্যোতিষী হস্ত বকাবকি করিবেন! তবু মিশু বৃক্কের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে না, তাহার শিশুমনের কোথায় যেন বাধে! আহা! শীত করে তো!

মিশু চলিয়া যায়!

বাকীগুলি তাহাদের দাড়র মতই নীরবে মিশুর প্রত্যাগমনের আশায় বসিয়া থাকে। ঢং...ঢং...ঢং...

দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় খড়িটার দশটা বাজিয়া যায়!

রাত হইয়াছে তৈরিক!

হঠাৎ ভিতর মহল হইতে জোরালো মেয়েলী গলার আওয়াজ শোন। স্বর, “বা, বা, বাপু! বিরক্ত করিস্ নে মিশু! হাঁ, কারও তো আর কোন

কাজ নেই। দিবারান্তির শুধু এক বৃদ্ধের জন্তে চা-ই বক্ক! হবে না বলচ্চি, না? বলে দিগে যা”

শিশুগুলি চমকিয়া ওঠে! নন্দ বলে, “এই রে! জ্যোতিষী—”

মহর্ষি মধ্যে দেখা যায়, তাহার যে বাহার নির্দিষ্ট ভানে ফিরিয়া গিয়া কোন না কোন একটা বই খুলিয়া আবার হুঁ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে! জ্যোতিষীকে ইহার বেশী ভয় করে।

বৃক্ক শুনিতে পান, মিশু যেন তাহার জ্যোতিষীকে দিনতিভা নিয়ন্ত্রণে কী বলিতে চাহিতেছে। কিন্তু জ্যোতিষীর উচ্চ কণ্ঠে তাহা চাঁপা পড়িয়া যায়—‘আলাদান মিশু? যা’ বল্‌চি—পড়গে যা! ভায়ী দরদ হুয়েই দেখি যে। পড়াশুনো ছেড়ে...আর এই যা কেনমন? বড়োমানুষ—চুপচাপ অক্ষয় বটের মত ব'সে থাকলেই হয়। তা’ না, হেলেমেলেজোঁর পড়াশুনো চুলোয় দিয়ে খালি কংমাস পাটানো হচ্ছে। বলতে বাধেও না? খালি চা আর চা। যেন কোন ছুশো দশটা খি-চাকর বাহাল করা আছে—ভাষির করবে। যা’ যা’, এখন আর হবে না ওসব। আমার নাব ক'রে বলে দিগে সা’—”

বলিয়া কাঠকেও দিতে হয় না। বৃক্ক নিজেই সব শুনিতে পান!...

একটা অর্ধ দীর্ঘবাস তাহার বৃক্কের মধ্যে গুমরিয়া ফিরিতে থাকে।... হায় রে! এখানে আজ সে আবর্জনা... স্থান নাট। অথচ, তাহার নিজেই সংসার। একদিন এই অব্যাহিত বৃক্ক হইতেই তো ইহার আরম্ভ... ইহারই প্রত্যেক অনুভব পরমাণু দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রত্যেক শাখা। সেই সাথে ছিল কত আশা...কত বন্ধন! কত ছবি। তাহারই সন্তান তাহারই পুত্রাধু, তাহারই পৌত্রপৌত্রাধু। ইহাদের প্রত্যেকের মাঝেই তো সে নিজে মিশিয়া রহিয়াছে। তবু আজ সে এখানে কেহ নয়। কেন এমন হয়? কেন? কেন?

বৃক্ক আর ভাবিতে পারেন না। অন্ধিকোটর ছাণাইয়া অভিমানহত শিশুর মত জল জমিতে থাকে। ওঃ।

পাশে নতমুখী মিশুও কাঁদিতেছে। ছোট্ট হইলেও বৃক্কের বাখা সে হুত্ব বৃক্কিতে পার। তাই বোধ হয়, নিজের অক্ষমতা আর জ্যোতিষীর অপরাধ— এই দুয়ের বোঝাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সে যেন কাঁদিয়া মার্জন পাইতে চায়।

নিঃশেষে হাত বাড়াইয়া বৃক্ক তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লন। স্নেহের পরশ মিশু যেন তাহার দাড়র বোনের মধ্যে গলিয়া পড়িতে চায় অবক্ষম প্রবেশে ছোট্ট দেহটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে!

বৃক্কও বোধ হয় আর নিজেই সামলাইতে পারেন না। উপরে আকাশের পানে চোখ তুলিয়া নিঃশেষে কৌটা কৌটা শ্রু ফেলিতে থাকেন। যেন কোন অদৃশ্যের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে হৃবিচার প্রার্থনা করিতে চান! কথা হস্ত কোন অজ্ঞ মানব আর ভূপের জন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ নিজেই কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চান কোন অদৃশ্য ক্ষমাত্মনের কাছে!

মিশুর বাবা আসিয়া বলেন, “এসব কী হচ্ছে, বাবা? তোমার কাঁধাকাণ্ড জ্ঞান কী কোনদিন হবে না! ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘেঁরেটাকে কী মেরে ফেলতে চাও? এই মিশু—উঠে আর! আর বল্‌চি—

কথা শোন তিনি নিজেই মিশুকে উঠাইয়া লইয়া যান।

বৃক্কের কায়া খানিয়া যায়। নির্দীক বিষয়ে তিনি উপযুক্ত পুত্রের আচরণ লক্ষ্য করেন। মিশুকে মারিয়া ফেলিতে চায় তাহার ঠাকুর্দা? যে ঠাকুর্দা...ওরে হতভাগা! এই কোলে...টিক এমনি শীতের রাতে...এমনি ভাবে তুইও কী সহস্র দিন আসিস নাই? সে কী তোকে মারিয়া ফেলিবার জুই? সেই শ্রবণ বোমা পড়ার স্নাত্তেও যে শেষ পর্যন্ত মায়ের কোলে হাড়িয়া এই কোলে আসিয়াই শুবে শান্ত হইয়াছিল। সেই তুই...কত আদরের খোকা...আজ কি না—ওঃ! ভগবান! আরো কতদিন—

কতদিন এমনভাবে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও? কেন? কোন দরকারে?

গৃহিণী চীৎকার করিয়া ওঠেন—“খাম, খাম! বজ্রহি—”

খাম! পাইয়া গল্পপাঠ খামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেনন লাগছে? ভাল হয় নি গল্পটা? না হয় বলো, পাণ্টে লিখি।”

উত্তর নাই।

দেখি, গৃহিণী কাঁদিতেছেন। গল্পপাঠ বন্ধ করিতে হইল।

—“কী হোল কী?” মুখে জিজ্ঞাসা করিলেও ভিতরে ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন—হরত অজ্ঞাতে কোন মারাত্মক দোষত্রুট, কিবা এত কষ্ট করিয়া লেখা গল্পটা কী—

বহু সাধসাধনায় কথকিত শাস্ত্র হইয়া গৃহিণী মুখ খুলিলেন। বলিলেন, “মুখে আস্তান অমন ছেলেপুলের। আটকু ডো আছি আমরা বেশ আছি। দরকার নেই আমার অমন গুণধরে। শেষে কী বড়ো বাপকে অমন করে—

আর করছেই বা কে? হোল কী চাই এতদিনে একটা কাণা-বাঁড়াও, না হবার কোন আশাই আছে?”

কথা শেষে দ্রুতপদে গৃহিণী কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রদ্ধা দেখিলাম, তাহার দুই চক্রে আবার বর্ণা নামিয়াছে।

অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছি—গৃহিণী কাদিলেন কেন?

কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না।

ভাগ কথা। আজ পর্যন্ত আমার গৃহিণীর কোল আলো করিতে কোন কাণা-খোঁড়া সম্ভাবনও আসে নাই। হরত আর আদিবেও না।

তবু দেখি, গৃহিণী অঙ্গের স্বর্ণভরগুণিক নিরন্তরই এক এক করিয়া স্থানচ্যুত করিয়া সেখানে যত্নে স্থানদান করিতেছেন নানা আকৃতির অল্পশ্রম মানবীয় ও দৈব মাহুগী ও তাবিজের।

বায়ু-পরিবর্তন (নন্দা)

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়, এম-এ

ভাত্রা বাহ্য জোড়া লাগে কিন্তু ভাত্রা মন জোড়া লাগে না। ডাক্তার সে কথা বোঝে না। সে বায়ুবার জিদ করিয়া বলিল—আপনাকে বায়ু পরিবর্তনে যেতে হবে।

দীর্ঘকালের একটানা দাসত্বের বাঁসা হইতে বাহিরে আসিয়া নিতান্ত পোষমানা পাখীর মত আমার সামনের দিকে পা বাড়ানর উৎসাহ রহিল না। চিরন্তন জড়ত্বের বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া রাত্রিশেষে সন্ত-জাগা হরিণের মত কোথায় লাকাইয়া পাড়া-মাতাইব—তার জায়গায় কিনা অন্ধকার-বাদী পেটকের মত আমার নির্জন শুভাভবনে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলাম। বায়ু-পরিবর্তন শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থান-পরিবর্তন। তার জন্ত অজ্ঞা বিদ্বান হটুক, রোপানন্দিনীর কল্পণায় দরকার!

লক্ষ্মী, সরস্বতী, দৈব, পুরুষকার—সকলে একসঙ্গে ঘোঁট করিয়া এ অধমকে দূর হইতে পরিহার করিয়াছেন। কুপা করিয়াছেন কুপাময় যম—পুরাণে ধীকে বলে ধর্মরাজ। ছুটো একটা গাছ লইয়া বোধ হয় বাগান হয় না—নচেৎ কবির কথার বলিতাম—ঐ ধর্মরাজ ধর্ম স্থাপন করিবার জন্তই বোধ হয়—আমার সাজানো বাগান এক নিঃশ্বাসে শুকাইয়া দিয়াছেন। একটি ছোট মেয়ে—মাকে ছাড়িয়া থাকিবে কেনন করিয়া?—ধর্মরাজকে দয়াময় বলিতেই হইবে।

পশ্চিম মূল্যে একটা পাহাড়িয়া জায়গার আমার ভগ্নপতি থাকেন। অনেকদিন হইতেই আমার দেহ ও মনের উপর দিয়া কয়েকটা দম্ভা ঝড় বহিয়া বাওয়ার ভগ্না ও ভগ্নপতি উভয়েই আমাকে সেখানে বাইবার জন্ত অতিরিক্ত জিদ সহকারে চিঠি লিখিতেছিল। ভগ্নপতি একটি ছোট রেল ষ্টেশনের মালিক। বায়ু-পরিবর্তন যখন করিতেই হইবে—তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া বাংলার কাণ হাওয়া পরিভাগ করিয়া বিহারের বিপুলকায় বায়ু আশায় যাত্রা করিলাম।

ষ্টেশনটি ছোট। লোকজনের ভীড় কম। কাঁকা বাঠের মাঝে করগেট টিনে ছাওয়া ছোট বাড়ী। যখন দূর থেকে ইঞ্জিনগুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বিজ্ঞান নিত—তখন সমস্ত ষ্টেশনের মাটি হইতে ছাদ পর্যন্ত কাঁপিত। মহান আভিযুক্তি অত্যাধিকার করার তাহার কোন সম্ভাবনা নাই—এই আশঙ্কায় যেন এই দরিদ্র কুটার সহসা চকল হইয়া পড়িত। ষ্টেশনের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে উত্তর-দক্ষিণে একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উত্তরদিকের প্রাণটি কিছু বড়—সেখানে ছোট একটি বাজার আছে; রবিবারে বুধবারে হাট বসে। ঐ দুই দিন ষ্টেশনের উপর দিয়া বহু লোক চলাচল করে।

বাজারের পাশে একটা ছোট নদী—তার কোলেই অশ্রান। সামনে একটা পাহাড়ের সারি চলিয়া গিয়াছে। তাকে দেখিয়া মনে হয়—সে যেন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম-বাপী একটা অবিচ্ছিন্ন প্রাণীর—তারও পাশে আছে নতুন জগৎ—কলনার ইন্দ্রপুত্র। প্লাটফর্মের একেবারে পশ্চিমদিকে একটা ছোট শিশুগাছের নীচে একটা আধভাত্রা বেকিতে সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া এলো-মেলো চিন্তায় জাল নিতে আমার খুব ভাল লাগিত।

একদিন বিকালে সূর্যাস্তের অর আগে আমার পাশ দিয়া কাঁচা-পাকা চূণ ও ছোট করিয়া ছাঁটা চাপ দাড়োতে বেশ শোভমান গৌরবর্ণ গম্বীর প্রশান্তমুখী এক বৃদ্ধ ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে কয়েকজন চাকর-বাকরও ছিল।

তখনই ট্রো আসিল। ষ্টেশনের যাত্রীর ওয়ানম্যান বুথ কম। সেদিন অপেক্ষাকৃত ভীড় ছিল। গিহনের কামরা হইতে এক স্ত্রীসঙ্গীত সৌধীন তত্ত্বলোক এক যুবতীর সহিত নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধকে ভূমিত হইয়া প্রশংসা করিল। অনুমান হইল ইহার বৃদ্ধের মেয়ে-জামাই। বৃদ্ধ তাহাদের সঙ্গে লইয়া নানাবিধ কথাবার্তা বলিতে বলিতে দক্ষিণের গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন হইতে প্রায় শ্রুতাহ নিরমিতভাবে বৃদ্ধকে দাসদাসী লইয়া মহা-মহারোগে লাইন পার হইয়া উত্তরদিকের গ্রাম হইতে ত্বরিতরকারী, মিষ্টান্ন, জনিষপত্র, কাপড়চোপড় আনিতে দেখিতাম। মনে হইত বৃদ্ধের পুণ্যের প্রশান্তি, গাভীর্ঘা অনেকটা তরল হইয়া গিয়াছে।

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন দেখিলাম বৃদ্ধ উত্তরদিকের গ্রাম হইতে কিরিয়া আসিতেছেন—সঙ্গে ছাই রংয়ের গলাবন্ধ কেট-পরা ফ্রেককাট দাড়োবৃত্ত গলায় ষ্টেথিস্কোপ পরা এক তত্ত্বলোক আসিতেছেন। বৃদ্ধল্যাম বাড়ীতে অস্থব। খানিক পরে ডাক্তার কিরিয়া আসিলেন—বৃদ্ধ কতকগুলি খালি শিশি লইয়া তাহার সহিত আসিলেন। দেখিলাম—তার সঙ্গেই সাময়িক তরলতার মুখোস্তা আবার খসিয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন বৃদ্ধকে আর পুণ্যের মত হাটবাজার করিতে দেখিলাম না—কিন্তু তাহার শুধু বওয়ার বিরাম ছিল না।

একদিন সকালে শব্দহনকারীদের হরি-স্ররণে চকিত হইয়া গিহনে কিরিয়া দেখি—কতকগুলি লোক একটি শব্দ লইয়া আসিতেছে—গিহনে আসে সেই বৃদ্ধ গায়ে একটা সাদা চাদর তড়িয়ায়া কৃষ্ণ কলসী, কাপড় হাতে লইয়া।

আকাশটা মেঘে রোদে আধময়লা। পাশে একটা লাল গাই—যেন
দ্রুত দ্রুত দেশের কোরত—চড়চড় করিয়া স্নাতকরূপের কোলের দুর্গাঘাসগুলি
খাইতেছিল। কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড কালো গন্ধ ছুটিয়া আসিয়া
তাহাকে শিঃ দিয়া আঘাত করিল। আবার পারের কাছে একটা হাড়-
জিরুরি রোগা কুকুর শুইয়া শুইয়া ধুঁকিতেছিল—একটা তিথারী বালক
তাহার মাথার সংজারে একটা বাড়ী মারিতেই সে আর্জনাৎ করিয়া সরিয়া
গেল। কি জানি কেন—হঠাৎ অন্তরনন্ড হইয়া পড়িয়াছিল—এমন সময়
আর একবার হরিধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম—তাহার
উত্তরদিকে নশ্বানের রাস্তা ধরিয়াছে।

বৃহৎক আঁজ যেন পরম প্রণাম দেখিলাম। হুঃ যেন সিদ্ধ পুরুষ
গুরুজীর মত তাহার সমস্ত তরলতা, চপলতা চকলতাকে মুছিয়া দিয়া আজ
তাঁহার সর্বাত্মক বৈরাগ্যের পবিত্র চন্দন লেপিয়া দিয়াছে। দেখিয়া মনে
হইল হৃৎকের লঘুতা বিক্ষিপ্ততার চেয়ে হুঃকের শান্ত সমাধি বিন্দু সোয়া
জ্যোতিতে ভাংরা।

কণেকের জন্ত বোধ হয়—তদ্রূপের হইয়া পড়িয়াছিল—বাণীর শব্দ
শুনিয়া চাহিয়া দেখি—গাড়ী আসিতেছে। ষ্টেশনে অজ্ঞান থাকিয়া গাড়ী
পুনরায় চলিতে শুরু করিল। যে ভয়লোককে সেদিন বৃহৎক প্রণাম করিতে
দেখিয়াছিল—সে ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে চড়িল। আত্মীর কাছে
শুনিলাম—বৃহৎক কত প্রভাঃপাঃ ছিল বলিয়া প্রসবের সময় মারের কাছে
আসিয়াছিল—আর জামাইও বায়ু-পরিবর্তনের মতলবে দু' মাসের ছুটি
লইয়া আসিয়াছিল। মেয়ে যখন পৃথিবীর ধূলো-মাথা ঝড়-ঝাণরা হাওয়া
একেবারে পরিহার করিল—তখন জামাই আর এ দূষিত বায়ুতে বায়ু-পরি-
বর্তন করে কেন্দ্র করিয়া।

মন আর রাস্তা মানিল না। পরদিন তরীতরী বাঁধিয়া আবার রেলের
যাত্রী হইলাম। বেহের পরিবর্তন কিছু হইল কিনা জানি না—মনটা
আগের চেয়ে আরও ভারী হইয়া গেল।

অন্নদামঙ্গলে মানসিংহ-ভবানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রসঙ্গ অন্নদামঙ্গলের একটি প্রধান অঙ্গ।
ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র কবির প্রতিপালক। তাঁহারই
গুণগান অন্নদার গুণগানের পবিত্র তাহার ছিল কবিকৃত্য। মানসিংহ
প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্ত বঙ্গদেশে আসিলেন—“দেখা
হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালি লয়ে বর্ধমান গেল মজুমদার।”
বর্ধমানে মজুমদারের মুখে মানসিংহ বিজ্ঞানস্বন্দর কাহিনী
শুনিলেন। বিজ্ঞানস্বন্দর পৃথক কাব্য নয়, অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত
গর্ভকাব্য। মজুমদারের মুখে ইহা মানসিংহের পরিতোষণের জন্ত
বিবৃত।

ভারতচন্দ্র যে-ভাবে ‘ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ’ বলিয়া
প্রতাপাদিত্যের বিক্রমগাথার সূত্রপাত করিয়াছিলেন—তাহাতে
মনে হইবে, কবি বুঝি প্রতাপাদিত্যের বীরাবদানের কাহিনীই
এইবার বলিবেন। কিন্তু রাজতন্ত্র কবি এক কথাতেই
প্রতাপাদিত্যকে হারাইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধ একটা হইল বটে,
কিন্তু ‘বিমুখী অভয়া কে করিবে দর্য প্রতাপাদিত্য হারে।’ তারপর
মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরে ভরিয়া দিল্লী লইয়া গেল।

প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।

যুতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে।

কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।

সাক্ষাৎ করিল পাতসাহের সহিত।

যুতে ভাজা প্রতাপ-আদিত্য ভেট দিলা।

ক'ব কত কতমত প্রতিষ্ঠা পাইলা।

বাক্সলার যে দেশভক্ত বীর মানসিংহ-প্রেরিত বেড়ী ও
তলবারের মধ্যে তলবার তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল—

কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে।

বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে।

লইলাম তলবার কহ গিয়া তায়ে।

যমুনার জলে ধুব এই তলবারে।

সেই প্রতাপাদিত্যের এই শোচনীয় পরিণামেব কথা বেশ প্রকৃত
চিত্রে বিবৃত করিতে গিয়া কবির একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়িল না।
একটি বেদনার কথাও কবির মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল না। কবির
উদ্দেশ্য প্রতিপালকের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গুণগান। ভবানন্দ
প্রতাপাদিত্যের শত্রু। মানসিংহকে ভবানন্দ বাংলায় নানা-
ভাবে সাহায্য করিয়া ছিলেন বলিয়াই মানসিংহ বিজয়ী
হইতে পারিয়াছিলেন। মানসিংহের বিজয়ই ভবানন্দের বিজয়।
তবে যে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমের অভিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া
কবি প্রসঙ্গের সূত্রপাত করিয়াছিলেন—তাহার কারণ—বিজয়ীর
বিক্রম ও কৃতিত্বকে বড় করিয়া দেখাইতে হইলে বিজিতের বিক্রম
ও বীরত্বকেও বড় করিয়া দেখাইতে হয় বলিয়া। ইহা ছাড়া আর
কিছু নয়। ভারতচন্দ্র দেশদ্রোহী ভবানন্দের গুণগান করিয়া
ভাটের নিগাসনে নামিয়া আসিয়াছেন।

কবি ভবানন্দকে রণবীররূপে দেখাইতে পারেন নাই—কিন্তু
তাঁহার বীরত্ব অজ্ঞভাবে দেখাইয়াছেন—তাঁহাকে বাক্যবীর করিয়া
তুলিয়াছেন। জাহাঙ্গীর পাতসাহ যখন হিন্দুধর্মের অজস্র নিন্দা
করিলেন—তখন ভবানন্দ সহিয়া থাকিলেন না। তিনি হৃৎকের
উপর বলিয়া দিলেন—

দেবদেবী পূজা বিনা কি হবে রোজার।

স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সম্ভান খোজার।

উত্তম হিন্দু মত তাহে বুঝে কোর।

হায় হায় যবনের কি হবে আখের।

তাহার ফলে ভবানন্দের কারাবাস। এখন কবির অন্নদার মহিম-
কীর্তনের প্রয়োজন। ভক্তের বন্ধনে অন্নদা রাগিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গীর বলিয়াছিলেন—হিন্দুর দেবতা ভূত। তাই ভূতনাথ-জায়
অন্নদা ভূতলোকের সমস্ত ভূতকে ডাকিলেন। দিল্লীতে ভূতের
উৎপাতে যে কাণ্ড হইল, তৈমুর নাদিরও সে কাণ্ড কবিত্তে পারেন
নাই।

জাহাঙ্গীর বিপন্ন হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলেন এবং মানসিংহের
উপদেশে মজুমদারকে মুক্তি দিয়া নিজে বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন।
অন্নদা তখন দয়া করিয়া জাহাঙ্গীরকে দেখা দিলেন। জাহাঙ্গীর
তখন মজুমদারকে কৃতজ্ঞ বলি হইয়া নিবেদন করিলেন—

দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিছু অভয়া।
অধম যবন জাতি তপস্বী কি জানি।
অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাই মানি।
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া।
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে স্তরমাথে ॥ ইত্যাদি।

তারপর যাহা যাহা আছে—তাহাতে কবির কাপুরুষতাব চরম
প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হইতে বাঙ্গালীর মহানাবকে
মানসিংহ ঘৃতে ভাজিয়া দিল্লীতে লইয়া গেল। আর মজুমদার
তাহার বিনিময়েও ভূত দেখাইয়া জমিদারী ফরমান লইয়া আসিল।
তাহাও সছ হয়। কিন্তু কবির যত আকোশ ছিল মুসলমান জাতির
উপর, অভয়ার ও তাহার সঙ্গী ভূতগুলির মারফতে তাহা
ঝাড়িলেন—ইহা বড়ই কাপুরুষতা। ইহাই কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের
মুর্শিদাবাদে ‘বৈকুণ্ঠবাসের’ প্রতিশোধ? অন্নদার ভবিষ্যদ্বাণী
অস্বাভাব্য—

আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরগা বলি বারো লক্ষ টাকা চাবে।
বন্ধ করি রাখিবেক মুর্শিদাবাদে।
মোহরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে।

জাহাঙ্গীরের দিল্লী বেকি ছিল আর জাহাঙ্গীর যে কত বড়
প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা জানিতেনও না।
ভারতচন্দ্রের কবিকীর্তি দিল্লীতে পৌছিবারও সম্ভাবনা
ছিল না—এমন কি মুর্শিদাবাদের নবাব কিংবা কোন
প্রতাপাধিত মুসলমানের গোচরে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই
কবি নিশ্চয় হইয়া বাদশাহকে লইয়া নাস্তানাবুদ করিয়াছেন।
দিল্লীর সম্রাটের কাল্পনিক বিভ্রমায় কৃষ্ণচন্দ্রও প্রাণ ভরিয়া আমোদ
উপভোগ করিয়াছেন এবং নিজের পূর্বপুরুষের ভৌতিক কীর্তিতে
খুবই গদগদ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মুসলমান-
ভয় ভীত—মুর্শিদকুলিখা ও সরফরাজ খার দ্বারা নিগৃহীত হিন্দু
পারিষদগণও খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, যখন
তাহারা ভারতচন্দ্রকে আবৃত্তি করিতে শুনিতেন—

বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়ি দিল।
চিতপাত হ’য়ে বিবি হাত-পা আছাড়ে,
কত দোয়া দবা দিলু তবু নাহি ছাড়ে।

কিংবা—বাদশা কহেন বাবা কি কৈল গোপাই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানাপিনা নাই।
মামুর হইল মোর বাবরুচি থানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানান। ॥

এই অংশের কথাবস্তু অতি সামান্য। কবি কথাবস্তুর সৌষ্টব বা
গৌরবের জন্ত আদৌ ব্যস্ত ছিলেন না। ভবানন্দ মানসিংহকে
প্রতাপ-দমনে সহায়তা করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন, ‘রাডাই’ পাইবার
জন্য। তাহার পর মানসিংহের স্তপারশে, অন্নদার কৃপায় ও
ভূতের সাহায্যে ফরমান পাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন।
তারপর তিনি ঘটা করিয়া অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন। অন্নপূর্ণার
পূজা-প্রচার হইলে তাহার শাপ-মুক্তি হইল। পূজাপ্রচারের
জন্ত অন্নদার রাজশক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি তাই
ভবানন্দকে এই রাজশক্তি প্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। তাহার
প্রয়োজন সিদ্ধ হইল,—ভবানন্দের কথাও ফুরাইল।

এই সংক্ষিপ্ত কথাবস্তুর মধ্যে ভারতচন্দ্র কবিত্বপ্রকাশের
অবসর পান নাই। যে সব ঘটনা লইয়া বিস্তৃত বিবৃতির
প্রত্যাশা করা যায়—সে সব ঘটনার কথা কবি সংক্ষেপেই সারিয়া
লইয়াছেন। যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটি মামুলী ধ্বজাত্মক শব্দের দ্বারাই
নিষ্পন্ন অর্থাৎ শব্দ পদকবির দ্বারা কবি রণতাপের প্রকাশ করিয়া-
ছেন। যুদ্ধ বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যুদ্ধটা মানুষে মানুষে হইতেছে
না—হইতেছে শব্দে শব্দে। রণকোলাহলটা শব্দের কেবল ধ্বনির
দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়াছে। সকল মঙ্গল কাব্যেই তাই।
কেবল ঘনরামের যুদ্ধবর্ণনায় একটু বৈচিত্র্য আছে। ভারতচন্দ্রের
যুদ্ধ-বর্ণনা অনেকটা মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে মিলে।

মানসিংহ বাংলা হইতে সোজা পথে দিল্লী যান নাই—
গিয়াছেন ভাবতবর্ষ বেটন করিয়া—তবু এ দীর্ঘ পথের কোন বর্ণনা
নাই। দিল্লীর ঐশ্বর্য বা জাহাঙ্গীরের রাজসভার সমারোহের কোন
বর্ণনা নাই। জাহাঙ্গীর যেন একজন জমিদার মাত্র, আর দিল্লী
যেন আব একটা কৃষ্ণনগর মাত্র।

কবি তাই বহু অবাস্তব কথা দিয়া কবিত্ব-পুষ্টির চেষ্টা
করিয়াছেন। এই কবিত্বও রসিকতা ছাড়া অস্ত্র কিছুই নয়।
মানসিংহের সৈন্যসামন্ত বাংলায় বড়বুড়িতে কিরূপ নাজেহাল
হইয়াছিল—তাহার বর্ণনা দিয়া কবি রসিকতা করিয়াছেন। দিল্লীর
দরবারে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্ম লইয়া তর্ক-দ্বন্দ্বও কিছু রসিকতা আছে।
দাস-বাসুর খেদ রসিকতার একটি দৃষ্টান্ত। দিল্লীতে ভূতের
উৎপাতের বর্ণনা করিয়া কবি সেকালের লোকদের খুব হাসাইয়া
ছিলেন। তারপর কবির চূড়ান্ত রসিকতা (সেকালের পাঠকদের
বিচারে) প্রকাশিত হইয়াছে—ভবানন্দ রাজ্যে ফিরিয়া গেলে দুই
সতীনেব কোন্দলে। ‘রসিকের স্থানে হয় রসের বিচার।’

দু’ সতীনে কন্দল নাহিল রস নহে,
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে।

রাণীদের সঙ্গে রাজার মিলন বর্ণনায় ভারতচন্দ্র অবশ্য যথেষ্ট সংযমের
পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞার বাসরের উল্লেখমাত্র করিয়া ভবানন্দের
প্রসঙ্গে বিহার-বর্ণনাব আর পুনরাবৃত্তি করেন নাই।

কথার না সবে ভয় দুহে কামে জর জর কামক্ৰীড়া করিল বিস্তার।
ভারত কহিছে সার বিস্তার কি কব আর বর্ণিয়াছি বিস্তার বাসর।
কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ত তাহাতেই দেখানো হইয়াছে—এখানে
আবার তাহার পুনর্বর্ণনা কেন ?

কাব্যের অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে তবে কিসে ? অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে
কতকগুলি মামুলি কথায়। সে সব কথা পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যেও
নিরুপাদান হিসাবে পূর্বেই অঙ্গীভূত হইয়াছে।

জগন্নাথ পুরীর বর্ণনা, ডাকিনী যোগিনীর উপজীব, গঙ্গাবতরণের
পৌরাণিক কথা, সংক্ষেপে রামায়ণ কাহিনী, এয়োদের নামের
তালিকা, বাঙ্গালীর ভোজ্যভব্যের তালিকা* ও রন্ধন-গৃহের উপাদান
উপকরণের বিশেষতঃ বিবিধ চাউলেব ফিরিস্তি, অষ্টমঙ্গলার কথা
সংক্ষেপ—এইগুলি দিয়া এই কাব্য্যাংশের অঙ্গপুষ্টি করা হইয়াছে।
এইগুলির মধ্যে কবিত্বের কোন বালাই নাই।

এই অংশে ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভারতচন্দ্রের
পূর্বেও কোন কোন কবি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে
কিছু কিছু আরবি পারসি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা
এক হিসাবে অকার্যকর। কারণ, তাঁহারা মুসলমান-রাজদরবারের
কথা কোথাও বলেন নাই—মুসলমানী পরিবেষ্টনী ও (Environ-
ment and atmosphere) সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁহাদের
ছিল না। যে সব পারসী কথা সেকালে হিন্দুদের মধ্যে
প্রচলিত ছিল তাঁহারা সেগুলিকে কাব্যবচনায় বর্জন করেন নাই।
ভারতচন্দ্র এই অংশে বাঙ্গালার মোগল অভিজ্ঞান ও মোগল
দরবারের কথা বলিয়াছেন। বথায়থ আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে
এবং রস জমাইতে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে মুসলমানী শব্দ
ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—এসকল
কথা আরবি পারসী ও হিন্দুস্থানীতে বলিলেই উচিত হইত। আমি
আরবি পারসী হিন্দুস্থানী বই পড়িয়া শিখিয়াছি—

পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবার পানি।

কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভাবি।

* অজ্ঞাত তালিকার তুলনায় রন্ধনগৃহে প্রস্তুত-করা খাদ্য
দ্রব্যের বিশেষতঃ বিবিধপ্রকার অন্নের তালিকায় এই কাব্যে
সার্বিকতা আছে। কারণ, অন্নপূর্ণার পবিত্রবর্ণের জন্ত অন্নব্যঞ্জন
ঐশ্বর্য অবশ্যই চাই। অন্নপূর্ণার কাছে অন্নভিক্ষার্থী সন্তানের
আবেদনটি কবিত্বময় হইয়াছে—

বেলা চৈল অন্নপূর্ণা রাক্ষস বাড় গিয়া।

পনম আনন্দ দেহ পরমায় দিয়া।

তোমার অন্নের বলে অজ্ঞাবধি আছে গলে

কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।

এক হাতে অন্নপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র

দিতে পার চতুর্ভুজ ঈশ্বর হাসিয়া।

তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কিম্বা তারে ?

সুখাতে কে করে সাধ এ সুখা ছাড়িয়া ?

পরশিয়া অন্ন সুখা ভারতের হর কৃষ্ণ

না বিনা শালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া।

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।

অতএব কহি ভাষা বাবনী মিশাল।”

প্রভূত পরিমাণে মুসলমানী শব্দের সমাবেশে ভারতচন্দ্র
মানসিংহ-জাহাঙ্গীর-ভবানন্দ্রের কাহিনীটিকে অভিনব একটা
ভাবরূপ দিয়াছেন।

ভাষার হ্রস্ব ও পদবিজ্ঞাস যে বিষয়েও অনুগামী হওয়া উচিত
এবং ভাষাই যে বিষয়বস্তুর পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারে, ভারতচন্দ্র
তাহা বুঝিতেন। ভাষাশৈলীর দিক হইতে ভারতচন্দ্র বাংলা
সাহিত্যে একজন গুরু ও রীতিপ্রবর্তক এবং বর্তমান ‘বাবনীমিশাল’
বাংলা ভাষার সূত্রপাত ভারতচন্দ্র হইতেই হইয়াছে একথা
নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। এই ভাষাই যে তাঁহার বর্ণিত
আখ্যামবস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা সেকালের পাঠক ধরিতে
না-ও পারে। সেই জন্ত তিনি একটু কৈফিয়ৎ দিয়া বলিয়াছেন—

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন ক’রে।

যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস সয়ে।

কেবল অন্নদামঙ্গলের শেষ পরিচ্ছেদে নয় বিজ্ঞানসুলভ ও
অজ্ঞদামঙ্গলের অজ্ঞাত লৌকিক অংশেও কবি মুসলমানী কথার প্রচুর
প্রয়োগ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র পল্লীর কবি নহেন—তিনি
নগরের কবি,—নবাবের আশ্রিত বাজার আশ্রিত কবি, ঐশ্বর্য
আড়ম্বরের কবি। সেকালের সভ্যতা-শিক্ষা, নাগরিক জীবন, রাজ
বাজভাব দরবার এবং ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত—সমস্তের মালিক মুসলমান।
কাছেই মুসলমানী ভাষা তখন নাগরিক সভ্যতারই ভাষা। এই
ভাষাকে এড়ানো শোচনদাস নরহরির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে,
তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না—স্বাভাবিকও ছিল না। মুসলমানের
সৌভাগ্যের যুগেই এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র
এই ভাষার সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন।

এই যুগের—“ভাষাই বঙ্গদেশে হিন্দুর ছুঁড়াগ্য ও মুসলমানের
সৌভাগ্যের প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুর গাঁ, মুসলমানের শহর, হিন্দুর
কুড়ে ঘর, মুসলমানের দালান ইত্যাদি। শব্দ কল্পিত হইয়া যখন
মুসলমানের সেবার লাগে তখন তাহা ফসল। ক্ষুদ্র মেটে প্রতীপটি
মাত্র হিন্দুর। ঝাড়, ফাল্গুন, দেওয়ালগিরি ও শামাদান—সমস্ত
বিলাসের আলোই মুসলমানের। হিন্দু অপরাধ করিলে কাজী মেয়াদ
দেয়। বাদশাহ, ওমরাহ, উজীর, নাজির, পেয়ালা, বরকন্দাজ, নফর
সব মুসলমানী শব্দ—জমি জোত তালুক মুলুকও তাই।—কিন্তু
স্বভাবের চন্দ্র সূর্য তরু ফুল পল্লবে হিন্দুর অধিকার ঘোচে নাই।
পল্লীবাসী হিন্দু নিজের অন্তঃপুরে, ধর্ম্মটিতে ও প্রকৃতির মন্দিরে
মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাই”।

তাই অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশ, বীরসিংহের অন্তঃপুর ও
গাজিনী ভীরের নাবিকটির কথায় মুসলমানী শব্দের ছোঁয়াচ বা
খাঁচ লাগে নাই।

অন্নদামঙ্গলে সেকালের ইতিহাস সামান্য কিছু পাওয়া যায়।
এই ইতিহাসটুকু কেবলমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি ও অন্নদার মহিমা-
প্রচারের জন্তই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুজাখার পুত্র সরফরাজখাঁ ছিলেন বাংলার নবাব। আলিবর্দি
ছিলেন পাটনার শাসনকর্তা। আলিবর্দি সরফরাজকে গিরিয়াব

যুদ্ধে বধ করিয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিলেন। দিল্লীর বাদশা তাঁহাকে মহাবাজ্ঞ উপাধি দিলেন। কটকে কুলি খাঁ ছিলেন নবাব। তাঁহাকে দূর করিয়া আলিবর্দি তাঁহার ভাতৃপুত্র সৌন্দর্যকে (সৈয়দ আহমদ ?) উড়িষ্যার মসনদে বসাইলেন। মুরাদ বাখর সৌন্দর্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিল। আলিবর্দি এ সংবাদ শুনিয়া সৈন্তে উড়িষ্যায় গিয়া মুরাদকে যুদ্ধে হারাইয়া ও তাড়াইয়া সৌন্দর্যকে খালাস করিলেন। কটক হইতে বৃক জয় করিয়া আলিবর্দি ভুবনেশ্বরে আসিয়া খুবই দৌরাছা কাবলেন। কবি বলিয়াছেন—নবাব এই দৌরাছায় দণ্ড লাভ করিলেন বর্গীদের হাতে! ভুবনেশ্বরের সেবক নন্দী ত বাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল।

শিব বলিলেন—“না না, এখানে রক্তারক্তি করে কাজ নেই— আমার ভক্ত বর্গীভক্তকে স্বপ্ন দাও—সেই ব্যবস্থা করবে।” ইহারই ফলে বর্গীর উপদ্রব। বর্গীর উপদ্রবে আলিবর্দি বিব্রত হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দু প্রজাদেরই ত সন্ধান হইল। কবি কৈফিয়ৎ দিয়া বলিলেন—নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? এ কৈফিয়ৎ একেবারেই ভোরালো নম। কারণ,—“বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।” এমন কি ধার্মিকের চড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র বারেরই মহাধিদ্দ দটিল। ‘মহাবাজ্ঞ তাঁব ধবে লয়ে যায়। নজবাণ ব’লে বারে লক্ষ টাকা চায়।’ এদিকে বর্গীবা দেশ লুটিয়া

লইল—কৃষ্ণচন্দ্র কোথা হইতে টাকা দিবেন? তাঁহাকে আলিবর্দি মূর্খিদাবাদে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তিনি দেবীপুত্র, তিনি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তব করিলেন। বলা বাহুল্য, চৌত্রিশ অক্ষরেও স্তব শুনিলে দেবী আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে দেখা দিয়া বলিলেন—“বাও বৎস, তুমি কবি ভারতচন্দ্রকে আদেশ কর গিয়া আমার মঙ্গল গান গাইবার জন্য আর চৈত্রমাसे গুরুপক্ষে অষ্টমী তিথিতে আমাব পূজা কর। তোমার আর ভয় নাই।” গ্রন্থের সূচনা ইহাতেই হইল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র কি করিয়া উদ্ধার পাইলেন, সে কথা কবি বলিলেন না। যাহাই হউক, বর্গীরা বঙ্গদেশকে বার বার লুণ্ঠন করিয়া নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই নিরন্ন দেশে যদি কোন দেবীর পূজা করিতে হয়, তবে যে অন্নপূর্ণারই পূজা করিতে হইবে এবং যদি কোন দেবীর মঙ্গলগান গাইতে হয় তবে যে অন্নদারই মঙ্গলগান গাহিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কবি তাই গোড়াতেই নিরন্ন দেশের একমাত্র উপাত্ত অন্নপূর্ণার স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

রূপাবলোকন কর ভক্রেব হুরিত হল দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ।

তুমি দেবী পরাংপর! সূচনাট্রী দুঃখের অন্নপূর্ণা অন্ন কর পূর্ণ।

ইহা অন্নের কাড়াল, নিঃসম্বল, হতসর্বস্ব হতভাগ্য সমগ্র দেশের পক্ষ হইতেই কবির কাতর প্রার্থনা।

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপভাষ)

আট

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ী। একখানা রামনাথের, একখানা বৈজ্ঞর, আর একখানা সুরষের। গাড়ীতে যাবে জিনিং-পত্র, লোহা-লকর, বস্ত্রপাতি আর মেয়ের। রূপাপুরের কামারেরা নগন দল বেঁধে কোথাও বেরিয়ে পড়ে, তখন সহধর্মিণী মেয়েবাও চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকটা প্রাচীন কালের বণ-বাত্রার মতো। দাঙ্গা ভাঙ্গামার দরকার হলে ওদের মেয়েবাও সঙ্গে গাড়িয়ার ধরে। তা ছাড়া শত্রুর অভাব নেই। দু’ একজন অর্থর্ব বড়ো অথবা বড়ি ছাড়া যুবতী মেয়েদের অনেকটা অরক্ষিত ভাবে গ্রামে ফেলে যাওয়া ওরা নিরাপদ মনে করে না।

গাড়ী সাতানো শুরু হল। হাতুড়ি, তাপব, ছেনী, লোহার ঢুকটাকি। বড় বড় পাকা বাশের লাঠিগুলো মরদন্দের হাতে, ওরা পেছনে পেছনে হেঁটে যাবে। মেয়েরা আজকের দিনে বিশেষ ভাবে প্রসাধন করেছে, রঙীন শাড়ী পরেছে, গায়ে রূপোর গয়না। কটাকগুলি চকল আর উৎসুক হয়ে উঠেছে। নানা গোলমালে গত দু’ বছর ওরা মেলায় যায়নি, তাই এবারে উৎসাহ আর উত্তমটা। কিছু বেশী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেকে বসল রামনাথ।

—না রে, তোরা যা চলে। আমার শরীবাটা ভালো নেই, আমি আর যেতে পারব না।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমস্ত কামারপাড়া বিষয়ে হতবাক।

—সে কি কথা তাউই!

—না, আমি যাব না।

স্বব, তা হে কবে হেসে উঠল।—ভয় কয়ে? মেলবে তোমার নতুন বউ হাবিয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু এ কথাতেও রামনাথ প্রশান্ত হয়ে উঠল না, দপ দপ করে ওর চোখে জলে উঠল না সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রের দৃষ্টি। জ্ঞান আর বিনয় মধ্যে রামনাথ শূন্য দিগন্তের দিকে নিরন্তরে তাকিয়ে রইল। কর্মমাস্ত্র বিলেব ভলে ভাল গাছের ছায়া কাঁপছে। শাখাচিল উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে সেই ভাল গাছের ওপর—তাই সমস্ত ধ্যান জ্ঞান তপস্বী ওই বিলের দিকে নিবদ্ধ। কখন একটা দুর্ভাগ্য গজাল মাছ নিঃশাস নেবার জন্যে চকিত মুহূর্তে জলেণ ওপর ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছেঁ দিয়ে—

স্বয়ং বললে, ভয় নেই, আমবা পাহারা দেব বউকে।

অল্প সময় হলে রামনাথ বলত, হঁ, পাহারা দেওয়া যাবে, নিজেরা ভালো করে গ্রাস করবার মতলব!—আর সঙ্গে সঙ্গে এক হাত পরিমাণে একটা জিভ কাটত স্বয়ং। নীচু হয়ে রামনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বলত : ছি ছি তাউই, আমাদেব কি নরকেব ভয় নেই!

কিন্তু আজ সব কিছুই অস্বাভাবিক আর স্বতন্ত্র। রামনাথের মনের স্বব একটে গেছে। একাথা থেকে দেখা দিয়েছে সংস্কার।

দোলা মেগেছে নিজেব না কিছু বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ঘব—ঘব—
দব। ঘবের এত মায়া এ কথা কি রামনাথ আগে জানত কোনো-
দিন? সবুজ কসলে সোণালি সন্ধান। আজ ওর চোখে মুখে
স্বপ্নের মায়া পবন বুলিয়ে দিয়েছে। এখন বিলের জলে চাঁদ
নিজেকে ছায়ায় ফেলে, এখন মন্ডরা বন থেকে পাপিয়ার ডাক
শোনা যায়। বৈজ্ঞানিক জোর মরে গেছে, তাই কামনা নিয়েছে
প্রেমের কপ। একদিনে সেই ধূ—ধূ করা পথ, আশ্রয়হীন শূণ্য
দিগন্ত—সে সব এখন গত-জীবনের ছায়ায় স্থতি। সোনাদীঘির
মেলকে আশ্রয় হবে আবার সেই অনিশ্চয়তা আর সংঘাতের মধ্যে
কাঁপিয়ে পড়া—না, রামনাথকে দিয়ে তা আর হবাব নয়।

বৈজ্ঞানিক কামনা সামনে এসে দাঁড়াল। রূপাপুরের কামারই বটে,
কিন্তু সম্পূর্ণ অগা জাতের লোক। ক্ষীণজীবী মানুষ, পেশীতে
জোব নেই, স্তব্ধ বা দুর্বিস্মৃত কেশোলালের মতো উগ্র বস্তুতায়
তার চোখ দপ দপ করে ওঠেনা। কিন্তু তবু বৈজ্ঞানিক মাত্র করে
সকলে, ভয়ও কবে অনেকে। লোকটা কুটিল আর কুটবুদ্ধি।
জীবনের একটা দীর্ঘ সময় সে কাটিয়েছে সহরে, কাটিয়েছে
কলকাতাতে। গাঁচা, চণ্ড, চব্বস, মদ, ভাং কিংবা কোকেন—সমস্ত
নেশার সে বিশাব্দ। সাবা গায়ে এক সময় বিখ্যাত ক্ষত চির ফুটে
উঠেছিল—এখন হৃদয়ের স্ববনো কালো কালো দাগগুলো ইন্ডের
সহস্র-সোচনের মতো তাকিয়ে আছে। তারপর থেকেই সহর
ছেড়েছে বৈজ্ঞানিক—সহরে শুধু অমৃতের পাত্রই যে পরিপূর্ণ নয়,
সেখানে বিষও আছে—এই সত্যটা ভালো কবে অনুভব কবেছে
সে। গামে কিরে মন দিয়েছে বিষয়-কথ্যে। বৈজ্ঞানিক হাত পাঁজাব,
এমন চমৎকার কাজ কপাপুরে কেউ করতে পারেনা। শুধু তাই
নয়। লোকে বলে গিসা আব রাতের কাজেও তাব জুড়ি নেই।
নবীপুরের কোন্ মহাজনের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে কে জানে,
তার তৈরী ঢাকা, সিকি, আঁচলি নাকি সবকারী জিনিষের সঙ্গে
টকা দিয়ে চলতে পারে। পুণশ ছ' একবার ও সব জিনিসের
সন্ধানে এ তরফে হানা দিয়েছে, বৈজ্ঞানিক ডেকেও নিয়ে গেছে
খানার, কিন্তু কিছু এব কবতে পারেনা।

বৈজ্ঞানিক বলে, তুই যাবেনা মানে? কুমার বাহাদুরকে জবান
দিয়েছে কামনা।

রামনাথ তবু নিঃশব্দ হয়ে রইল।

—রূপাপুরের বামারেরা জবান ভাঙ্গেনা কোনোদিন। তুমি
না গেলে রহমজঞ্জর শেখদের সঙ্গে লাঠি ধরবে কে? এরা
তো এটা চোট খেলে চিং হয়ে পড়বে।

—কেন, স্তব্ধ!

বৈজ্ঞানিক হাসল।—হাঁক-ডাক করলেই মরদ হয় না, মুরোদ চাই।
সুন্দের হাতের গুলি শক্ত হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

—মুরোদটা একবার পরখ করব নাকি তোর সঙ্গে?

বৈজ্ঞানিক একবিন্দু বিচলিত হ'ল না। সাপের মতো কুটিল
আর অত্যন্ত শীতল চোখ পলকেই জ্বল পড়ল সুরষের মুখে।

—তা কীত নেই।

অত্যন্ত স্পষ্ট সংকেত। রূপাপুরের কামারদের বৈশি
আয়োজন দপকাপ দপ না। শক্তির অভাব সেখানে, গলাব

তোড়-জোড়টা সেখানেই বেশি। হু'জনে' মুখোমুখি দাঁড়াল।
কিন্তু সংশয়টা দেখা দিল সুরষের মুখেই। বৈজ্ঞানিক গায়ে ওর মতো
শক্তি নেই এ-কথা সত্যি, কিন্তু কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা
ছোঁরা বের করতে তার সময় লাগে না। হু'জনের মাঝখানে
রামনাথ এসে দাঁড়াল।

—নিজেরাই মারামারি করে মরবি নাকি এখন! গায়ে জোর
কর কত সে পরখ পরে হবে। কিন্তু আমি যাব না। কুমার
বাহাদুরের কাজ নিয়েছিস, তোরাই করবি।

সুরষ বাঘের মতো ফুলছিল। বৈজ্ঞানিক ওপর একটা জলন্ত
দৃষ্টি ফেলল সে। আঁচা দেখা যাবে। অপমান সহ্য কববার
পাত্র সে না। বৈজ্ঞানিক হাসল। সাপের মতো তীক্ষ্ণ আর
শীতল দৃষ্টি।

সুরষ রুদ্ধশ্বাসে বললে, আর ভাগের বেলায়!

এবার রামনাথও হাসল। বললে, সে ভাবনা ভাবতে হবে
না। তাব সবই তোদের।

কথা চলছিল রামনাথের দাওয়ায় বসে। ঠিক এই সময়
ঘবেব ভেতর থেকে ঠৈনঠৈন করে শিকল নড়ে উঠল। সমস্ত
আবহাওয়াটা যেন বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে—যেন একটা গুমোট
অতৃপ্তির ভেতবে খানিকটা মুক্তির ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললে, যাও তাউই, তোমার ডাক পড়েছে। শুধু
আমাদের না বললেই তো হবে না—নতুন বউয়ের মত নিয়ে
এসো আগে।

রামনাথ বললে—থাম হতভাগা।

ঘবেব ভেতরে শিকলটা নড়তে লাগল অধৈর্য্যভাবে। জরুরি
তাগিদ। রামনাথ উঠে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এল একটু
পরেই।

—আঁচা যাব, তোদের সঙ্গেই যাব। যা থাকে কপালে।

ত্রিশটি করাতের মতো প্রখর শব্দ করে ত্রিশজন কামার
একসঙ্গে অটুতাসি কপে উঠল। সে হাসির শব্দে বিলের জলে লাগল
চমক, তালগাছের মাথাব ওপর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে
মংগলোত্তী শংখচিলটা উড়ে চলে গেল রৌদ্র-ঝকিত নীল-দিগন্তে।

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ী। বৈজ্ঞানিক গাড়ীতে উঠেছে
ভানী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি মেয়ে। অপাঙ্গকুটিল
কটাক্ষে ভানীর দিকে একবার তাকালো বৈজ্ঞানিক, তারপর মহিন
ছুটোর লেজে শক্ত করে মোচড় লাগালো। লোহা-বাধানো
ভারী চাকায় বিদীর্ণ পথটাকে আরো চূর্ণ-বিচূর্ণ কবে গাড়ীটা ছুটে
চলল ঘড় ঘড় করে—পেছনে লাগি হাতে যে-সব পুষ্করণ
আসছিল, ধূলোব কুয়াশায় মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে
গেল তারা।

কুমার বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় বৈষ্ণব বসলেন না হরিশরণ।
তিনি কাজের লোক, বিশ্বনাথ কাগজপত্র সই করে দিতে অবহেলা-
ভরে ভাঁজ করে তিনি সেখানাকে পকেটে পুরলেন, একবার
পড়েও দেখলেন না পথ্যস্ত। এ-সব সানাতন বাপারে খুব বেশি
পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আব ক'টাই বা



টাকা। বড় জোর পাঁচ হাজার। একটা টা-পার্টিতেই পাঁচ হাজার টাকা বেরিয়ে যায় লালার হরিশরণের। ইচ্ছা করলে—

কিন্তু হরিশরণের উদ্দেশ্য পাঁচ হাজার টাকা নয়। এই কুমারদহকে ধ্বংস করতে হবে—দেবীকোট রাজবংশকে লুটিয়ে দিতে হ'বে ধুলোর নীচে। ইতিহাসের পাতা থেকে, জনশ্রুতি থেকে, কুমারদহের আকারহীন, অর্থহীন শৃঙ্গ দস্ত থেকে এই কথাটাকেই নিঃশেষ করে মুছে দিতে হবে যে রাঘবেন্দ্র রায় বর্মান্বাণ্যের সন্তান ছিল বামভঙ্গের লাল।

আর কুমারদহ! কী আছে কুমারদহের? বহুদিন পরে আজ চোখ মেলে লালাজী কুমারদহের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। ভাঙা বাড়ী, মজা দাঁঘি, অপব্যয়, ব্যভিচার আর জীর্ণতাব প্রভৃতি। একে শেষ হবে দিতে হবে। কুমারদহের তলা দিয়েই বয়ে গেছে নীলশ্রোতা কাকন—আর ঠিক দশ নাইল দূরে বেলের ইন্টিশন। রাঘবেন্দ্র রায় বর্মান্বাণ্য সাতমহলা বাড়ী যেখানে অজগর-জঙ্গলে দুর্গম হয়ে আছে, ওখানে বসতে পারে মস্ত বড় গজ—নবীপুরের মতো সমৃদ্ধ বিবাত বন্দর। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে আরো নানা রকমের প্রাণ ঘরছে লালাজীব মাথায়। কয়েকটা চাউলের কল এখানে বসালে কেমন হয়? খুব মন্দ হবে না বোধ হয়! আর পাঁচ সাত বছরের মধ্যে একটা মোটর চলবার মতো পাকা বাস্তা স্টেশন পর্যন্ত টেনে নেওয়াও খুব শক্ত হবে না। এই মত, বিস্ময় কুমারদহ নতুন ক'বে গড়ে উঠবে প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে, বাস্তবিকতার নতুন স্বাস্থ্যে। তখন এর নাম কি হবে? নাম হবে হরিশরণপুর।

বিষনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠিক এই জিনিসগুলোই লালাজীব মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সাড়া নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আব একটা চিন্তাও তা'নি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণমুখ খাঁটার মতো খচ খচ করে বিঁধছিল। কালীবিলাস কণ্ডুর মৃত্যুটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। কী কথা বলতে এসেছিল, কুমার বিষনাথের সঙ্গে কী কী দবকাব ছিল তার। আলকাপ দলের ব্যাপার কী? আজ তো তাদের নবীপুরে পৌছবার কথা ছিল—কিন্তু। নাঃ, যাওয়া'ব পথে শোভাগঞ্জের হাট ঘরে ব্রজহরি পালের খবরটা একবার নিয়ে যেতেই হবে।

বিষনাথ বললেন, “তা হলে একটু চায়ে'ব ব্যবস্থা করি।”

লালাজী হাত জোড় করলেন।

—মা'প করবেন, অসময়ে চা আমার চলে না। আচ্ছা আমি তা হলে আসি—রাম রাম।

লালাজী বের হ'য়ে গেলেন। বেবোবা'ব পথে দরজার গায়ে দাঁষ্ট একটা খটাস ক'রে আটকে গেল এক মুহূর্তের জন্তে—লালাজীর পকেটে'ব সেই পিস্তলটা। থমকে থেমে দাঁড়ালেন তিনি, পকেটে হাত পুরে অস্ত্রটাকে টিপে ধরলেন, তাবপ'ব দ্রুত গতিতে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। এটা কি কোনো কিছুর একটা আসন্ন সংকেত! অস্ত্রটা কি সুনিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিল—ওধ পক্ষেটের মধ্যে নিশ্চিত হ'য়ে বিশ্রাম করাই তা'ব কাজ নয়, একটা রক্তাক্ত কর্তব্যের প্রেরণাতে সে উন্মুখ হ'য়ে আছে?

আব এদিকে অলস চোখে টেবিলের ওপরে রাখা নোটগুলোর

দিকে তাকিয়ে রইলেন বিষনাথ। ওগুলো যেন নোট নয়—এক-রাশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো তাঁর হাতের সামনে ছড়িয়ে র'য়েছে। কেন কে জানে, নোটগুলো স্পর্শ করতে বিষনাথের কেমন একটা ভয় আর সংশয় বোধ হ'তে লাগল। মনে হ'ল : ওদের প্রত্যেকটি যেন ছুরির ফলার মতো বিদ্ধ হ'য়ে তাঁর বুকে'কে বিদ্ধ আর রক্তাক্ত ক'রে দেবে।

শিউরে নোটগুলোর ওপর থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। ওগুলো ব্যোমকেশের হাতে তুলে দিতে হবে—টাকার জন্তে ব্যোমকেশ হস্তে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালই সদবে খাজনা পাঠাতে হবে, নইলে সব মহলগুলো একসঙ্গে লাটে চড়ে যাবে। আর নীলামে কিনে নেবাব জন্যে লালার হরিশরণই এগিয়ে আসবেন সর্বাগ্রে। সদর! একবার সদরের ওই কাগজ-পত্রের স্তূপে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যেত—উড়িয়ে পড়িয়ে শেষ ক'বে দেওয়া যেত সমস্ত! কী দিন গেছে রাঘবেন্দ্র রায় বর্মান্বাণ্যের আমলে। দেবীকোট রাজবংশ—বাক্য! তারা। ইজাবাদ'ব দেবী সিংহ হ'তে হাতে বাংলা দেশকে লুটে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেদিনের জমিদারের ক্ষমতাও ছিল হেমান সীমানা'হীন, তেমন অব্যাহত। ইসমারীর খাতিতে চাণ্ডা কাদাব তলার সন্ধান করলে বড় বিস্তোম্ভী প্রজাব জাওলা-পড়া কল্লাল আজও তুলে আনা যায়।

বেলা তিনটাব কাছাকাছি। অন্নাত, অতৃপ্ত বিষনাথ, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শিবাগুলির মধ্যে প্রথ'ব বিদ্যাতের দীপ্তি বয়ে যাচ্ছে। একটু স্থান ক'বে বিশ্রাম নিতে পারলে শরীরের আগুনটা বোধ হয় অনেকখানি জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বিশ্রাম! বিশ্রামের কথা ভাবতেই মনে পড়ল অস্ত্রপুরের কথা—মনে পড়ল অপর্ণাকে। আশ্চর্য্য, অপর্ণার অবস্থাটা অমুভব করেই কি বিষনাথ আজ তাঁর সংশয় মচেন হ'য়ে উঠলেন!

টেবিলের ওপর রাখা নোটগুলো তখনো আগুনের হলকা'ব মতো জ্বলছে। আব একবার সেদিকে তাকিয়ে বিষনাথ এক কোণের কাছে আলমারী খুললেন। মদের বোতল, গ্লাস, কর্ক, ক্রু। এমন সময় আবার মতিয়া'ব আবিভাব।

—ভজুর?

আবস্ত প্রচণ্ড দৃষ্টিতে বিষনাথ যেন মতিয়াকে দৃষ্ট করবার উপক্রম করলেন!—কী চাই?

বিষনাথের চটির ঘা খেয়ে পিঠ শক্ত হ'য়ে গেছে মতিয়ার। সে ভয় পেল না! একবার দ্বিধা ক'রে বললে, রাণীজী ডাকছেন। সম্পূর্ণ অনিশ্চিতভাবে বিষনাথ কয়েক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে রইলেন। পায়ে'ব চটিটা'ই খুলবেন, না—শিষের ভারী কাগজ-চাপটা ছুঁতে মারবেন মতিয়ার মাথায়? কিন্তু বিষনাথ কিছুই করলেন না। কী ভাবলেন কে জানে, তারপর ওই অভিশপ্ত নোটগুলোকেই মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধ'বে বললেন, চল্ হারাম-জাদা, কোন জাহান্নামে যেতে হবে।

মতিয়া একগাল হাসল।

—আজ্ঞে না, জাহান্নামে নয়, রাণীজী ডেকে পাঠিয়েছেন।

চলতে চলতে বিষনাথ খেমে দাঁড়ালেন। পেছন দ্বিধে বললেন, বেশী ইয়াকী দিবি তো একদম খুন ক'বে ফেলব রাঙেল কোথাকার।

—ক্রমশঃ

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা

আটটি

মুসলমানেরা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বিজেতা হিসাবেই এসেছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করি, মুসলমান-দেব নিয়ে ভাষাতে হিন্দুদের শাসন করা, এই ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আদর্শ এবং লক্ষ্য, কিন্তু সে আদর্শ বেশী দিন টিকে পারেন না, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেশী দিন তারা চলতে পারেন না। ভারতবর্ষে হিন্দুবাও ছিলেন এক সত্য জাতি। তাদের নিজেদের উচ্চাঙ্গের ধর্ম, কর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই ছিল। যুদ্ধের ব্যাপারেও তাঁরা অক্ষম ছিলেন না। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, হিসাবপত্রের ব্যাপারে তারা বিজ্ঞ। মুসলমানদের চেয়ে বেশী দক্ষ ছিলেন। শুধু তাই মুসলমানেরা তাঁদের স্বাধীন অবস্থাচ্যাবী রূপে প্রত্যাশিত না হয়ে থাকতে পারেন না।

সে যুগের ইরানী-মুসলিম সভ্যতা, যে সভ্যতা মুসলমানেরা ভারতে আনলেন, উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। যে সভ্যতা আলবেকীর মত শাসনকর্তা সৃষ্টি করেছিল, ফেরদৌসীর মত মহাকাব্য রচনা করেছিল, জাহাঙ্গীরের মত মন্ত্রী ভাবুক যে সভ্যতার প্রেরণা ব্যয় করেছিলেন, সাদা, সাদা, হাফেজ প্রভৃতি অমর কাব্য যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন, সে সভ্যতা যে ইশান জীবনের উচ্ছল আনন্দে ভরপুর ছিল, সহজেই তা বুঝা যায়। এই সভ্যতার জাতি প্রভাব ভারতের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে বিজ্ঞতা এবং বিজিত উন্নত জাতিই পরম্পরের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। মুসলমান সভ্যতার উদার সূক্ষ্মতাবাদ ভারতের হিন্দু মনেও ভাবের জোয়ার এনেছিল। ফলে মধ্যযুগে বহু ভক্তিমূলক ধর্মাদর্শ এবং সাধন-তত্ত্ব ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল এবং তাদের দ্বারা ভারতীয় জীবন যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

প্রয়োজনের তাগিদে মুসলমানরাও হিন্দু-কাম্যচারীদের সাধারণ ক্রমেই বেশী করে নিতে লাগলেন। সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদ হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত হতে লাগলো। প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির পদেও হিন্দু অধিষ্ঠিত হতে লাগলেন। পাঠান-যুগের ইতিহাসে বহু খ্যাতনামা হিন্দু রাজপুত্রদের নাম আমরা দেখতে পাই।

পাবে ধীরে হিন্দু-কাম্যচারের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন এবং সে ভার্য শিক্ষার এবং ব্যবহারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে লাগলেন। মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদর-কায়দা প্রভৃতি হিন্দু আগ্রহের সঙ্গে গৃহ্য করতে লাগলেন। পক্ষান্তরে মুসলমানেরাও হিন্দুদের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করতে লাগলেন। সভ্যতার আদান প্রদান জোরের সঙ্গেই চলতে লাগলো। ফলে ভারতবর্ষে এক সাময়িক সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হতে লাগলো। শুলতান সেকেন্দার লোদীর সময় মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত হল। হিন্দু শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আরবী-ফার্সি সঙ্গে এবং মুসলিম কৃষি সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করতে লাগলেন। কৃষির বৈষম্য ক্রমেই দূরীভূত হতে

এস, ওয়াজেদ আলি, বি,এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

লাগলো। ঐতিহাসিক Blockman-এর ভাষায়: "The Hindoos from the sixteenth century took so zealously to Persian education that before another century had elapsed they had fully come up to the Muhammadens in point of literary acquirements."

(উনসত্তর)

হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতার এই আদান-প্রদানের যুগে দেখা দিলেন মহামানব কবীর। পাঠান আগলের শেষ যুগে বেনারসের এক দরিদ্র জোলা-পরিবারে কবীর জন্মগ্রহণ করেন। অমাহুতিক প্রতিভা এবং অলৌকিক চরিত্রবলে নিরক্ষর এই জোলা-সন্তান মধ্যযুগের ভারতীয় জীবনকে যে ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন তা সভ্যতা বিষয়ক কবীরের প্রভাব সূত্র পাঠ্য থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল। শিখ ধর্মগ্রন্থ নানক কবীরকে নিজের গুরু বলে স্বীকার করেছেন। কবীরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্মের মূলগত ত্রৈকোণ বাণী প্রচার করেছিলেন এবং উভয় জাতির আচার, ধর্মের সংস্কার এবং অসাম্যতাকে লোকে লোকে জাজল্যমান করে তুলেছিলেন। আকবরের উদার ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতির জন্য প্রকৃত-পক্ষে কবীরই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

Mr. Tara Chand লিখেছেন: Kabir's was the first attempt to reconcile Hinduism and Islam: the teachers of the South had absorbed Muslim elements, but Kabir was the first to come forward boldly to proclaim a religion of the centre—a middle path, and his cry was taken up all over India and was reechoed from a hundred places. He had numerous disciples and today his sect numbers a million.

But it is not the numbers of his following that is important, it is his influence which extends to the Panjab, Gujrat and Bengal and which continued to spread under Mughal rule till a wise sovereign correctly estimating its value attempted to make it a religion approved by the state.

Akbar's Din-i-Ilahi was not an isolated freak of an autocrat who had more hours than he knew how to employ, but an inevitable result of the forces which were deeply surging in India's breast and finding expression in the teachings of men like Kabir. Circumstances thwarted that attempt, but destiny still points towards the same goal.

সম্ভব)

রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে পঁাঠান যুগের বাদশাহ'রা হিন্দু প্রজাদের "জিহ্মি" অর্থাৎ আশ্রিত বিধর্মী হিসাবে দেখতেন। তাদের উপর অত্যাচার বা অত্যাচার করা তাঁদের আদর্শ ছিল না, তবে তাদের এবং মুসলমান বিজেতাদের মিলিয়ে বৃহত্তর এক জাতি সৃষ্টি করার কথা তখনও তাঁরা ভাবতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে, কোন দেশের লোকই সে আদর্শের কথা তখন ভাবতে পারে নি। এসব ছিল তখনকার যুগের মানুষের কল্পনার অতীত। মুসলমানেরা তবু ভিন্নধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব সহ্য করতেন, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা করতেন। সে যুগের যুধীনেবা ভিন্নধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। খৃষ্টানদের রাজ্যে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ভাগ্যে ছিল কেবল নিগ্রহ আর উৎপীড়ন, এবং তাদের ধর্মোচরণে পথে সহস্র রকমের বাধা-বিপত্তি।

আকবরের পিতামহ, স্বনামধন্য সুলতান বাবরই সকলপ্রকার ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যশাসন করবার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাহায্যে বৃহত্তর এক বাঙীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন দেখেন। পুত্র জামাশুনল জগা তিনি যে উপদেশ-লিপিকা বা "ওসিয়েতনামা" ছেড়ে দান, তাতে আমরা আকবরের রাষ্ট্রনীতির অঙ্গুর বা পূর্বাভাস দেখতে পাই। বাবর তাঁর "ওসিয়েতনামায়" লিখেছেন :

সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জগা এই "ওসিয়েত" লিখিত হল। ৩ আমার পুত্র, ভারত সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের দ্বার অধ্যুষিত। খোদাকে ধন্যবাদ (তিনি বিচারক, মহান এবং সর্বোচ্চ) যে তিনি এই ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার তোমার হস্তে অর্পণ করেছেন। তোমার কর্তব্য হচ্ছে, সকলপ্রকার গোড়ামি থেকে নিজের অন্তরকে মুক্ত করে, প্রত্যেক জাতির প্রতি সুবিচার করা—তাঁদের ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী। আর তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি গরু কোরবানী (গোহত্যা) বর্জন করবে; কেন না, ভারতবাসীদের অন্তর জয় করার এই হচ্ছে সহজ পন্থা। আর তোমার এই উদারতার পরিচয় পৌনে দেশের প্রজাপুত্র তোমার একান্ত ভক্ত এবং অমৃতব্রত হয়ে পড়বে। তুমি কোন জাতির বা ধর্মের মন্দির এবং ধর্মালম্বের কখনও কোন ক্ষতি করো না। শাসন-বিচার করবে, কেন না তাহ'লে প্রজাদের নিয়ে তুমি সুখে থাকবে, আর প্রজারাও তোমার শাসনে সুখে থাকবে। ইসলামের সম্প্রসারণের প্রকৃত উপায় হচ্ছে দয়ার সহকারি, অত্যাচারের সহকারি নয়।

সিয়া এবং সুরিদের তর্কাতর্কি এবং কলহ-কোন্দলের মধ্যে থাকবে না। এই বিষয়াদি হচ্ছে ইসলামের দুর্বলতা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাদের সেইভাবে মিলিত এবং সংমিশ্রিত করবে, যেভাবে বিখ্যে চারটি উপকরণ (জল, বায়ু, অগ্নি এবং মৃত্তিকা) সংমিশ্রিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ রাষ্ট্রদেহে যাতে কোন ব্যাধি দেখা না দেয়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করবে। আর প্রতিভামহ তাইমুরের কীর্তি-কলাপের কথা মনে রাখবে, কেন না, তা হলে তুমি রাজ্যশাসনেব ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করবে।

আমাদের কতব্য হচ্ছে উপদেশ দেওয়া। ১লা জামাদি উল-আউয়াল ৯৩৫ হিজরী (১১ই জানুয়ারী, ১৫২৯ খঃ অব্দ)।

(একান্তর)

প্রত্যেক মহাপুরুষই যুগেব প্রয়োজনের তাগিদে, যুগেব প্রয়োজন পূরণ করতে, যুগের কামনাকে রূপ দিতে এবং সার্থক করতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। হজরত মোহাম্মদ, গৌতম বুদ্ধ, জিসাস খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষেরা, তথা জর্জ ওয়াশিংটন, মোস্তফা কামাল প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা এই ভাবেই এসেছিলেন। আকবরও এসেছিলেন যুগের বাণী নিয়ে, যুগের কামনার মূর্ত প্রতীকরূপে। কোন আকস্মিক উদ্ধার মত তিনি আসেননি। তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন যুগ-মানব। সে যুগেব ভারতবর্ষেব শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ সাধনা তাঁব ব্যক্তিত্বের নগ্নে এক মোহনায় জ্যোতির্গর্ভ রূপ ধারণ করেছিল।

প্রকৃত মহাপুরুষেব মত আকবর বাল্যকাল থেকেই জীবনকে এবাট এক সাধনক্ষেত্র বলে মনে করতেন, আর একাধ্ব মনে চেষ্টা করতেন সে জীবনকে সার্থক করার জগে। আনন্দের পূর্বেই বলেছি, ধর্মভাব এবং ধোলা-ভক্তির আকবরেব জীবনে চিবকালই প্রবল ছিল। প্রাথমিক জীবনে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সাহায্যেই সেই ভাবেই তিনি কপায়িত করার চেষ্টাই করতেন। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিতভাবে তিনি নামাজ পড়তেন। অকৃত্রিম ভক্তির আবেগে, সম্মার্জনী হস্তে ধর্ম তিনি মসজিদে গিয়ে খাড়া দিতেন। আজান (নামাজের আহ্বান) তিনি নিজেই দিতেন। ধর্মবাক্যদেব তিনি একান্ত ভক্তির চক্ষে দেখতেন। এই তো গেল প্রাথমিক জীবনেব কথা। তারপর কি করে ধীরে ধীরে আকবর আনুষ্ঠানিক ধর্ম থেকে এবং সে ধর্মের পাণ্ডাদের প্রভাব থেকে দূরে গিয়ে পড়লেন, তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারের মীমাংসার ভার আকবর শেষে নিজ হস্তেই গ্রহণ করলেন।

উদার সার্বজনীন মনোভাব ছিল আকবরের মজাগত। ফার্সি সৃষ্টি সাহিত্য সে ভাবেই বিশেষভাবে পুষ্ট করেছিল। কবীর-প্রমুখ ভারতীয় সাধকদের ভাবধারাও যে তাঁব মনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। দরবারের আলেম এবং পণ্ডিতের কলহ-কোন্দল, তর্কাতর্কি এবং একদেশদর্শিতা যে সেভাবেই দূরতর করেছিল, সহজেই তা অনুমান করা যায়। দীর্ঘকালের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং আলোচনার ফলে আকবর যে মতবাদে পৌছেছিলেন, কবি Tennyson অতি সুন্দর ভাষায় তাব ব্যঞ্জনা করেছেন :

If I can but lift the torch,
Of reason in the dusky cave of life,
And gaze on this miracle, the world,
Adoring That Who made, and makes, and is,
And is not, what I gaze on—all else Form,
Ritual, varying with the tribes of men.

এদিকে বাজনৈতিক প্রয়োজন, অন্তরেব নির্দেশ, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত মঙ্গলের চিন্তা, বাঙীয় আইন-কানুনেব দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন, দুনিবাবভাবে ধর্মের সার্বজনীন সত্যেব দিকে, সার্বজনীন ধর্মের দিকে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। [ক্রমশঃ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

৮৮

বাসবদত্তার স্বপ্ন

যে রাত্রে তখন বন্ধুতে মগ্ন। বরলেন, তার পর দিন সকালে সেনাপতি ক্রমধান্ রাজপ্রাসাদে গিয়ে মহারাজের কাছে প্রতি-হারীকে পাঠালেন—‘শীগগির মহারাজকে খবর দাও, বল—সেনাপতি দোরে দাঁড়িয়ে—জরুরী খবর।’

উদয়ন তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। প্রতিহারীর মুখে খবর শুনেই তাড়াতাড়ি বেবিয় এলেন ব্যস্তসমস্ত ভাবে। ক্রমধান্কে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করলেন—‘কি ব্যাপার? সব ভাল ত? এত সকালে যে হঠাৎ!’

ক্রমধান্ মহারাজকে নমস্কার করে বললেন—‘মহারাজ! আমার একজন বিশ্বস্ত চর এইমাত্র ফিরে এসে জানালে যে—আমাদের রাজ্যের শেষ সীমায় ‘লাবাণক’ বলে যে গ্রামখানি আছে, তার পাশে যে গভীর বন, তার মধ্যে একপাল কৃষ্ণসার মৃগের সন্ধান পেয়েছে। তাই মহারাজকে জানাতে এলুম—যদি অল্পমতি করেন, তা হলে সন্ধ্যায় আজই মৃগয়ায় যাবার ব্যবস্থা করি’।

উদয়ন হেসে বলে উঠলেন—‘আজই! এত তাড়া কেন, সেনাপতি?’

ক্রমধান্—‘জানেন ত মহারাজ! কৃষ্ণসারের দল তিন-চার দিনের বেশী এক জায়গায় থাকে না। তাই ভাবছি—আজই যদি রওনা হওয়া যায়, কালই মৃগয়ায় বেরুনা যাবে। নয় ত একবার ঘন বনের মধ্যে ঢুক গেলে আর হরিণগুলোও সন্ধান সহজে মিলবে না’।

উদয়ন—‘তা বেশ! আজই খাওয়া-দাওয়ার পর বওনা হওয়া যাবে। তবে একটা কথা! নীল হাতীর মত ব্যাপার কিছু তলে তলে নেই ত!’

ক্রমধান্ একটু সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নীচু করে আস্তে বললেন—‘না মহারাজ! আর এবার আমি সন্ধ্যায় আগে আগে যাব—আর পিছনে সৈন্ত নিয়ে থাকবেন—মহারাজীন্দ্র দাদা—তিনিও মৃগয়ায় যেতে রাজী আছেন’।

উদয়ন—‘তা হলে মন্ত্রিবর যোগেশ্বরায়ণের উপর নগর বন্ধার ভার থাকুক। আর বয়স্ক বসন্তকও মৃগয়া বড় ভালবাসেন না। তিনি মন্ত্রিবরের সঙ্গে নগরে থেকেই দিব্য রাজভোগ খেতে থাকুন। আমরাই শুধু খাই বনে আধপোড়া মৃগমাংস খেতে। আচ্ছা, ক্রমধান্! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রাণী ত ধরে বসেছেন—তিনি একবার মৃগয়ায় যাবেন। তা এবার তাঁকে কি সঙ্গে নেবার সুবিধা হবে?’

ক্রমধান্ ত’ এই সুযোগই ধুঁজছিলেন। তিনি মহারাজের মুখের কথা লুকে নিয়ে বলে উঠলেন—‘খুব হবে, মহারাজ! খুব হবে। আমি এখনই শিবিরের ব্যবস্থা করছি’।

দেবী বাসবদত্তা ঘরের ভিতর থেকে রাজা ও সেনাপতির কথা

শুনছিলেন। মৃগয়ায় যেতে তাঁর মনে খুবই ইচ্ছা জেগেছিল। নিয়তিকে কে গণ্ডন করে। তাই সেনাপতির সম্মতি জেনে তিনি আব মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন—‘নমস্কার সেনাপতি ম’শায়। আপনার সম্মতিব জগ্নে অসংখ্য পক্ষবাদ জানাচ্ছি’।

ক্রমধান্ হাসিমুখে প্রতিনমস্কার করে বললেন—‘দেবি! আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে—এ ইচ্ছা আমাদের হ’তে পারে না। আমি শিবিরের ব্যবস্থা করছি। তবে কাল পৌছেই হয় ত’ আপনার পক্ষে বনে ঢোকা সম্ভব হবে না। আপনি দু’এক দিন লাবাণকেব শিবিরে বিশ্রাম করবেন। ইতিমধ্যে আমরা বন-জঙ্গল একটু পরিষ্কার করে একদিন আপনাকে মৃগয়ায় নিয়ে যাব’।

বাসবদত্তার মুখে হাসি আর ধরে না। হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—‘মৃগয়ায় আপনার ব্যবস্থাই পালন করা থাকে—এতে আর বাধা কি থাকতে পারে’।

ক্রমধান্—‘মহারাজ! দেবি! আপনারা তা’হলে প্রস্তুত হ’তে থাকুন। আমাব ব্যবস্থা শেষ হ’লেই শিড়ার আওরাজ শুনতে পাবেন। অম্নি যোড়ায় চেপে হুঁতনে বেড়িয়ে পড়বেন। জিনিষপত্র সব হাতীর পিঠে আমি চালান দোব। এই ব্যবস্থা পাকা রইল আমি আসি এখন’।

এই বলে সেনাপতি বেবিয় এলেন। সদর দরজায় যোগেশ্বরায়ণ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—‘কি হ’ল সেনাপতি! সব ঠিক ত! বেক’স হয়নি কিছু?’

‘না মন্ত্রিবর’! হেসে উত্তর দিলেন সেনাপতি, ‘আপনার বেক’স করে কার সাধ্য’!

যোগেশ্বরায়ণ—‘রাণী যেতে রাজী ত?’

ক্রমধান্—‘আমাকে কথা পাড়তে অবধি হয় নি। মহারাজ নিজেই কথা পাড়লেন। আমি ত ভাবছিলুম কি করে গুছিয়ে কথাটা পাড়ি? তা আমার আর কিছুই করতে হ’ল না। খালি মহারাজ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—‘নীল হাতীর মত ব্যাপার কিছু তলে তলে নেই ত?’

যোগেশ্বরায়ণ—‘তুমি কি উত্তর দিলে?’

সেনাপতি—‘আমি উত্তর দোব কি—হাসিতে আমার পেট ফাটবার যোগাড়। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললুম—‘না মহারাজ! এবার কি আর আপনাকে একলা ছেড়ে দোব। এবার সামনে আমি—পিছনে মহারাজকুমার গোপালক সন্ধ্যায় থাকবেন’।

যোগেশ্বরায়ণ (একটু হেসে)—‘হায়! মহারাজ ত জানেন না—এবার ব্যাপার আরও গুরুতর! সেবার প্রজ্ঞোতের চক্রান্ত—যোগেশ্বরায়ণ তা ব্যর্থ করেছিল। এবার যোগেশ্বরায়ণ নিজেই চক্রান্তকারী—বাঁচাবে কে?’

ক্রমধান্—‘মন্ত্রিবর! মহারাজ আপনাকে স্মরণ করছেন। আর বসন্তক কোথায়?’

যোগেশ্বরায়ণ—‘ঐ যে ওপাশে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, আমরা

হু'জনে এক সঙ্গেই ভিতরে বাই। তুমি যাত্রার ব্যবস্থার কোন ক্রটি কোরো না'।

উভয় বন্ধুতে 'একবার স্নেহালিনন ক'রে পরস্পর বিদায় নিলেন। তারপর বসন্তকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে মন্ত্রিবর প্রবেশ করলেন। রুমবান্ চললেন—সেনা সাজাতে।

মহামন্ত্রী ও বিদূষক রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে মহারাজ উদয়নের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন যে যতদিন মহারাজ যুগয়া থেকে না ফিরে আসেন, ততদিন মন্ত্রিবর নিজের প্রত্যেকটি রাজকাৰ্য্য দেখবেন। বিদূষক সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। কথাবার্তা শেষ হবার পর মন্ত্রী ও বিদূষক প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন বলে আসন ছেড়ে উঠেছেন—এমন সময় প্রাসাদের চত্বর এক দিবা জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিষয়ে বিহ্বল রাজা, রাণী, মন্ত্রী, বিদূষক, প্রতিভাহী সৈন্যেরা তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে পড়ল, দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণাটি হাতে নিয়ে হস্ত মুখে আকাশ থেকে রাজ-প্রাসাদের উঠানে নেমে আসছেন। সসন্ত্রমে সকলে আসন ছেড়ে উঠে প্রণাম করতেই দেবর্ষি তাঁর দন্তকটিকোঁড়ী বিকীরণ ক'বে সকলকে আশীর্বাদ জানিয়ে রাজার দেওয়া সোনার সিংহাসনে বসলেন।

মহারাজ ও মহাদেবী পুনরায় নত হয়ে তাঁর পারের ধুলো নিলে তিনি নিজের বীণা থেকে পারিজাত মালা হু'গাছি খুলে নিয়ে হু'জনের মাথায় পরিয়ে দিলেন। তখন মহারাজ করজোড়ে দাঁড়িয়ে অতি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—“হে প্রভু! আজ আমার বংশ পবিত্র, আমার গৃহ পুত্র, আমি ও দেবী ধন্য। বলুন, দেবর্ষি! আমি আপনাব কোন সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি?”

যৌগন্ধরায়ণের অন্তরে এতক্ষণ ভয়ানক ঝড় চলছিল। কারণ তিনি ভানতেন যে, দেবর্ষি অন্তর্ধামী—আর বড়ই কলচপ্রিয়। যৌগন্ধরায়ণের মনের ফন্টী জেনে তিনি যদি তা মহারাজের কাছে ফাঁস ক'বে দেন, তা হ'লে সর্বনাশ! তাঁর আর কারুর কাছে মুখ দেখাবার পথ থাকবে না।

যৌগন্ধরায়ণের অন্তরের কাতরতা দেবর্ষির কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে মন্ত্রিবরের মন্ত্রণা বার্য্য করে দিতে আসেন নি। বরং কয়েকদিন বাদে দেবী বাসবদত্তার বিরহে মহারাজ পাছে আত্মহত্যা ক'বে ফেলেন—এই আশঙ্কায় তিনি আগে হইতে একটি আশাসজনক বর দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাই

মুহূর্ত্তে ও কটাক্ষে যৌগন্ধরায়ণকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন—‘শোনো মহারাজ! শোনো মহাদেবি! শোনো মন্ত্রিবর! আর তোমরা সবাই শোন।—শুনো আনন্দ কর। জেনো আমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না। স্বয়ং কামদেব মহারাজের পুত্র হ'য়ে দেবী বাসবদত্তার গর্ভে এসে জন্মাবেন। আর জন্মের পর তিনি সমগ্র বিজ্ঞাধর সমাজের একচ্ছত্র সম্রাট হবেন। মহারাজ! তোমার পূর্বপুরুষ পঞ্চপাণ্ডব আমার বড় ভক্তি করতেন। তাঁদের সাহচর্য্যে আমি বহুবার ঐক্যের সেবার অবসর পেয়েছি। তাদের সঙ্গে আমার বড় ঐতিহ্য সঞ্চার ছিল। তাঁরা কোন দিন আমার কথা এতটুকুও অমান্য করেন নি। সেই সম্পর্কের জেরে আমি তোমাকে এই সংবাদটি দিতে এলাম। জেনো আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। তবে, একটা কথা! মাঝে হয় ত তোমাকে ও দেবীকে কিছুদিন খুবই কষ্ট পেতে হবে। সে সময় মহারাজ ও মহাদেবি! তোমরা হু'জনেই মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কথামত কাজ করবে—কদাচ তাঁর কথার অগ্রথা করবে না। এ হ'লে ভবিষ্যৎ খুব সুখের হবে। আর বিজ্ঞাধর সম্রাটকে পুত্ররূপে পাবে!’

‘দেবর্ষির ঘেমন আদেশ’—এই বলে রাজা রাণী মন্ত্রী বিদূষক ইত্যাদি সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করতেই দেবর্ষি আবার একবার যৌগন্ধরায়ণের দিকে দ্রুতদৃষ্টি ক'বে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

যৌগন্ধরায়ণ বুঝলেন যে, তাঁর মনোরথ সিদ্ধ হ'তে কোন বাধা ঘটবে না।

এমন সময় রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে শিঙা বেজে উঠল তিন বার।

মহারাজ ও মহাদেবী সুসজ্জিতই ছিলেন। প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এলেন। একজোড়া রাজ-অশ্ব সাজান ছিল। হু'জনে সেই দুই ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আগে সেনাপতি রুমথান, তারপরে সেনাদল, তাবপর শিকারীর দল, তারপর মহারাজ নিজের, তাব পাশে মহারানী, তারপরে রসদ ও নালপত্র নিয়ে হাতীর দল, তার পিছনে কুমার গোপালক সব শেষে আব একদল সেনা।

শিঙা বাজাতে বাজাতে সেনাপতি অগ্রসর হলেন। ধীরে ধীরে শিকারের দল-বল রাজধানী হ'তে বেড়িয়ে গেল।

[ক্রমশঃ

সৃষ্টি বুঝি হয় অবসান-

ত্রিপ্রিয়লাল দাস

মৃত্যুর বিভীষিকা চাড়ে উদ্ধ ডাক
অশান্ত ক্রন্দনে। সৃষ্টি হতবাক।
প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা ওই ধীরে ধীরে
গ্রাসিতেছে পুণ্য ভূমি শ্রাম ধরলীরে
তিলে তিলে। দুর্ন্যাসি আর ধান্নাবাজি
মান্নায় ভরা ধর্ম্মকথায় মহাভাণ্ড সাজি'

সৃষ্টি ভেঙে ওঠ আজি বজ্র হানো শিরে

কলুষ করেছে যারা পুণ্য ধরিত্রীরে।

প্যাশালায় ফিরেছে পাপ যুথোসপরা
পৃথীতল ঘিরলো আজি দুঃখ জরা।
অত্যাচারী অট্টহাসি হাসছে ওই
নবযুগের ভাগ্যেতে আর সাম্য কই?
ব্রহ্মা তোমার সৃষ্টি ছিল মূল্যবান
সর্বনাশের ধাক্কাতে আজ একশ'খান

সত্যের বাড়ীতে আজ জ্যোতি বাবে। ঠিক নেমন্তর নয়, তবে ঐ ধরণেরই একটা কিছু হবে। উপলক্ষ্য দিদির সঙ্গে আলাপ কবা। স্থলেখার মুখে হুঁজনের কথা হুঁজনার কাছে। দিদির সঙ্গে যখন গল্প করে তখন জ্যোতির কথা ছাড়া অল্প কথা অল্পই হয়, আবার জ্যোতির কাছে অতিমাত্রায় দিদির কথা। দিদির কথা যখন বলে, তখন তলে তলে থাকে মেয়েদের প্রশংসা, তাদের মনের যে দিকটা ভালবাসার প্রবল উত্তাপে উত্তপ্ত, তার কথা। নিজেকে প্রকাশ করবার প্রভূত চেষ্টা দিদির প্রচুর ভালবাসার প্রত্যেকটি কথা বলে। 'মানে,' ও বলে, 'দিদির প্রাণে যে অফুরন্ত ভালবাসা আছে তা বহুযুগী নয়, একটি মাত্র মানুষকে উপলক্ষ্য করে ছুটে চলে, অথচ এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে, সে মানুষটি কিছুই জানে না।' পবাক্ষে নিজের মনটাকেই ও জ্যোতির কাছে প্রকাশ করে। আর দিদির কাছে যখন ও গল্প ফাঁদে, তখন চাঁদের সঙ্গে তুলনা করতে থাকে জ্যোতির রূপের, তাঁর স্নিগ্ধ আলোকের সঙ্গে ওব স্বভাবের। বলে অভাব কিছুই নেই, ওর মধ্যে ও সবটাই সুন্দর। ও ঠিক যেন প্রাঞ্জল ভাষায় বরবরে ছন্দে আশার কবিতা।

সতী ওর কথা শুনে বলেছিল, 'আনিস্ না তোব মানুষটিকে একদিন, জানিস ত আমার রূপেব নেশা, হয়ত পছন্দই করে নেব'! 'ভয় পাই'—স্থলেখা উত্তবে বলেছিল। 'তাই ত' আনি না, জানি না হয়ত হাতছাড়াই হয়ে যাবে, যতই ওর বড়াই করি ততই বুঝি ওকে ছোঁয়া আমার কাছে বঁচন কল্পনা ছাড়া আব কিছুই নয়।

আজ তাই আলাপেব আয়োজন।

সত্য কথা বলতে, সতী আব জ্যোতি ওদের দুজনকার জীবনের একটা ওজন করা পরিমাণ একই ধাতুপ তৈরী। স্থলেখাও প্রায় কাছাকাছি। সতীপ ভয়ানক ইচ্ছে স্থলেখার নতুন মানুষটিকে দেখে, স্থলেখাও কৌতুহলটাকে জাগিয়ে দিয়েছে কথার আলপনায়। স্থলেখা নিজেও তাই চায়, কাণ্ড ওর জীবনে দিদি মস্তবড় একটা স্বপ্ন পরিচ্ছেদ, আর কারো কাছে না থাক অস্তিত্ব: তাব কাছে জ্যোতিকে পাশে নিয়ে দাঁড়ায়, যেমন ভাবে মনে মনে ও দাঁড়াতে চায়। জ্যোতি নিজেও দিদির জানবার জন্তে উৎসুক, ও জানে, দিদিই হ'ল ভায় মিডিয়াম। কিন্তু ওদের হুঁজনের জানা-শোনা সবচেয়ে বড় হাত ছিল নিয়তিব—তার ছিল আশীর্বাদ!

শীত পেরিয়ে গেছে, সন্ধ্যাব ঠাণ্ডা আমেজ নেই। দিনের শেষ আলোব বেশ আছে। বেলাটা তবু যাই যাই করেও যাচ্ছে না, বিদায়ের খেলা খেলছে প্রকৃতির সঙ্গে। দিদির বাড়ীর গেট পেরোতেই স্থলেখার দেখা পাওয়া গেল। বারান্দা থেকে নেবে স্থলেখা দাঁড়িয়েছিল হান্সাহানার ঝাড়টির ঠিক পাশে ফিকে লাল রঙের সাড়ীটা পরে। বাড়ীটার বিরাটদেয় সঙ্গে মিশে আছে একটা বনেদি গাভীরা। আসবার কথা যেদিন স্থলেখা জ্যোতিকে বলেছিল, সেদিন নিজের কল্পনায় জ্যোতিকে সৃষ্টি করে বলেছিল, 'বিলেভী পোথাকে জমিদারী মানায় না, সাজতে হবে

সম্পূর্ণ বাঙালী। সাদা পাঞ্জাবীর সঙ্গে থাকবে সাদা ধুতি, গলায় থাকবে সাদা চাদর, বুঝলে? জ্যোতি হাসতে হাসতে বলেছিল, 'জামাই সাজতে হবে, আদরটা মিলবে ত?' 'দিদি জানে,' লেখা বলে, 'প্রাণে যদি তার তেমন রং ঢালতে পারো, তা হ'লে মিলবে, উপরিও কিছু আশা করা যায়!'

উপরি কেমন?

জানো না?

না!

হুঁভাগ্য তুমি, সুন্দর শালী বুঝি কখনও এক ফালিও আলো দেয় নি! আমাদের বাড়ীতে শালীষভাবই শালীনতায় ভরা, অত্যন্ত স্নিয়মে বাধা।

আজ স্থলেখা জ্যোতিকে নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিল। ঠিক যেমনটি ও কল্পনা করেছিল, ঠিক যে রূপে ও মনের মধ্যে আছে, ঠিক তেমনি, কোথাও খুঁত নেই, অমিল নেই।

নিজেকে কোন রকমে প্রকাশ করবে না, এই ছিল স্থলেখার মনের গোপন প্রাতিজ্ঞা। হয়ত প্রতিজ্ঞা না করে যদি মনটাকে ঠিক করত তা হ'লে ঠিক সময়টিতে মনটা এমন বৈঠক হ'ত না। হুঁ হুঁ ছেলে হুঁমি কবতে করতে আপনাই ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম পাড়াতে গেলে ঘুমোবার সময়টিতেই তার হুঁমি বড়ের দাপটেই ছুটে আসে। স্থলেখাও ঠিক তাই হ'ল।

বলে, জামাই সাজলে দেখি, মানিয়েছে সুন্দর, ভারী ভালো দেখায় তোমায় সাদা কাপড়ে।

জ্যোতি ছেলেটা ভয়ানক হুঁ হুঁ, ঠাট্টার ছলে ও কথা বলে, নিজের মনের কথাটা অজ্ঞেব মনের সঙ্গে মিশিয়ে। ওর কথা বলাব মধ্যে আছে অজ্ঞেব গোপন কথাটি ছুঁয়ে যাবার ভঙ্গি, বললে—

'মনে হচ্ছে না স্বর্গ থেকে ঠাকুর নেবে এল' মন ভোলাতে... দোলা লাগল বুঝি মনে...দেখ' শেষে ভোলা যাবে ত' আজকের দিনটিকে, না মনটাকে খুলেই দিয়ে যেতে হবে!'

স্থলেখা বলে, 'বড় কথার উত্তর দিতে গেলে ভাবতে হয়, একসঙ্গে দেবাব সামর্থ্য নেই, হারিয়ে ফেলব যদি চেষ্টা করি!'

সময় দিলে না জ্যোতি, বলে, 'ভাবনা কি, বড় কথার উত্তর না হয় ছোট্ট একটা কথাতেই দাও, উত্তর দেওয়াও হবে অথচ নিজেকে বাঁচানও হবে। বাঁচানোতে আমার সাধ নেই, মনের বাধাও আছে, কিন্তু বাইরের কথা ভাবতেই যত ভয়। তা'ছাড়া নিয়তিটা বড় ছেলমানুষী রঙে রাঙানো। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, ঠিক তার কিছুই নেই, সবই বৈঠক।' 'তাই ত আমার ভয়, স্থলেখা হাসতে হাসতেই বলে, 'চোখ ছোটোতে কিন্তু ওর শক্তার সঙ্কেত।'

জ্যোতি কি উত্তর দেবে ভাবছিল, দিদি এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা দু'জন কি ঐ বাইরে দাঁড়িয়েই বিকেলটা কাটাবে?' 'তাহ'লে' স্থলেখা হাসতে হাসতে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ করে বললে, 'তুমি যে আমার মাথা কাটাতে দিদি! মন আর মাথা দুটো এক সঙ্গে হারাতে রাজি নই।'

বলতে বলতে ওরা দু'জনে ঘরের ভেতর উঠে এল। প্রকাণ্ড ঘরখানা জমিদারীর সঙ্গে ঠিকমত উমেদারী করছে। চারিদিকে মেহেগনীর কার্ণিচার, বকঝকে তক্তকে, ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড় লঠন। পুরাতনের পাশে নূতনের স্থান হয়েছে। ঘরের কোণে কোণে প্রকাণ্ড করণার ল্যাম্প, বড় বড় হং ম্যাচ্ করা সোফা, কোঁচ সেন্টার টেবিল। দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং, বংশ-পরম্পরায় সাজানো। তাদের প্রত্যেকটিতে বংশ-মর্যাদার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে ছবিগুলির অস্পষ্টতার মধ্যে। তারা উজ্জ্বল অতীতের গরীয়ান দিনের সাক্ষ্য, আজকের দিনের অযত্নের উপলক্ষ্য। বাজের আবাতে মরে যাওয়া গাছ, আজও পড়ে বারনি। বড়ের দাপট সস্ত্র ক'রে, বৃষ্টির প্রলেপ মাথায় নিয়ে, রোঙ্গে পুড়ে ছাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্যময় অতীতের সাক্ষ্য দিতে। সমস্ত ঘরখানায় অতীতের ঐশ্বর্যের ওপরে ভবিষ্যতের হুভাগ্যের ছাপ পড়েছে—বাগানবাড়ীর শান বাধানো পুকুরে যেমন হস্তের অভাবে শ্যাওলার প্রাচুর্য।

জ্যোতি নিজের মনকে সহজ করবে, ওর মধ্যে চুল'ভ যা কিছু সব আজ স্থলভ করবে, স্থলেখার অলক্ষ্য স্পর্শ ওর মনের মধ্যে মিশে আছে।

সতী ওর দিকে চেয়ে ছিল, ও বসতে বসতে বললে, 'দিদি আপনাদের কাছে আমার পরিচয় দেবার মতন আজ ঠিক কিছু নেই, দিতে গেলে দিক হারাযো।'

সতী হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি দিক হারাযো না, তোমার ঠিক ঠিক হিসেব নিয়ে গেলে আমি হারাযো। তা'ছাড়া,' দিদি বলে চলে, 'পুরাতনকে ভুলে গিয়েই নতুনকে আবাহন জানানো সমীচীন, পোড় খাওয়া পুরোণো আনকরা নতুনকে হয়ত ঠকাতোও পারে! দরকার কি ওসব ঘরে নিয়ে, আমার কাছে তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় স্থলেখার ভাগ্য।'

দরকার আছে বৈ কি দিদি, যাচাই করে না নিলে যদি ভুল হয়?

ভুলের কথা ভুলো না ভাই; চুলচেরা বিচার করবার জন্তে চাকরির সিলেকশন বোর্ড আছে, সংসারে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়।

ঠাট্টা স্থলেখার ঠোঁটের আগায়, দিদির জন্তে তার বিশেষ সান দেওয়া কথা, বললে, '...দেখ দিদি, প্রহর গেল না, এরই মধ্যে সংসারে মানিয়ে নিচ্ছ ওকে, ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'

‘দোষ কি ভাই,’ দিদি অল্প ইঙ্গিত করলেন, ‘বোনটা ত’ আমি তোরাই, তোরা জালা প্রদীপে নিজের ঘরখানায় আলো জালাযো বই ত’ নয়, কিন্তু তা বলে প্রদীপ ত’ আর আমার হ'ল না।’

‘বারে!’ জ্যোতি বললে, ‘প্রদীপটা হ'ল একজনের, আলো পেল’ অজ্ঞে।’

‘তব পেও না ভাই,’ দিদি বললে! ‘দু'চারটে ‘তোমার’ দিয়ে তবে ‘তোমাদের’ আর সেই ‘তোমাদের’ নিয়ে হবে ‘আমার’।

আমার বাগানে হানু'হেনার গন্ধ, ঘরে বসে তাই পাই, তা'বলে কি ফুল নেই বাইরে, না তা ভালো লাগে না!’ ‘তা তো ঠিকই,’ জ্যোতি বললে, ‘নাতবো’ বুড়ো দাদাম'শাইর ঘর আলো করে, তা'বলে কি নাতি ঘরের অন্ধকার!’

স্থলেখা অবাক হয়ে জ্যোতির কথা শুনছিল। কথায় ওর রঙিন পরশ, জীবনের উষ্ণতা, প্রাণের মৃদু স্পন্দন। বললে, ‘কে পারবে কথায় তোমার সঙ্গে; কথায় তুমি বড় পাল-তোলা জাহাজ!’

দিদিই জবাব দিলে, ‘নিজের জালে বে নিজের ধরা পড়লি, লেখায় বা পালে বাতাস না লাগলে কি জাহাজ গতি পায়? পালে বাতাস লাগলে তবে গতি!’

তার পরের কাহিনীটা আমি বলি, ‘বললে জ্যোতি ‘পালে বাতাস লাগল, বাড়ল গতি, উঠল প্রকাণ্ড ঢেউ, সেই ঢেউ আছড়ে পড়ল তীরের পায়, পড়েই গেল মিলিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও সে কিছু করতে পারল’ না, তীরের শব্দ যা উঠল’ সেটা শূন্য হাহাকার!’

‘ওরে বোকা ছেলে’ সতী বলে, ‘হালকা কথার ঢেউ বড় নষ্টামি করে, ভাঙন ধরায় না, চুপি চুপি ভাঙে। ওপর থেকে পার যেমন পূর্ণ, ভেতর থেকে তীর তেমন শূন্য!’ দিদির কথায় আদরের স্নিগ্ধতা।

স্থলেখা বললে, ‘দিদি, তোমার মনটা কি সেই পূর্ণ পার না শূন্য তীর?’

জ্যোতি হাসতে হাসতে বললে, ‘বরাতটাই আমার খারাপ দিদি, বল এক কথা, বোঝায় অজ্ঞ, গড়তে যাই শিব, হয় বান্দর, ভাঙতে গেলাম এ-পার, ভাঙল’ ও-পার।’

ভাঙতেই কি তোমাদের আনন্দ—তাই কি তোমরা আছ?

‘গড়তে যে তোমরা’—উত্তর দিলে জ্যোতি!

‘তোমরা বড় কৃতজ্ঞ’। লেখা বললে, ‘যারা গড়ে তাদেরই আবাস তোমরা ভাঙে।’ ‘পুঙ্খ জাতটা ওরকম বেরসিক’—জ্যোতি বললে, ‘রাগ কি আমার কম নিজের ওপর, কিন্তু যতবাবই দোষী বলে নিজেকে ধরতে যাই, ততবাবই মনটা ফাঁকি দিয়ে শূন্য কারণ দেয়, মনটা ভোলাবার জন্তে। সত্যি কথা কি জানো? আমরা যখন ভাঙি তখন নিজের মনের মতন করে গড়বার জন্তে ভাঙি, কিন্তু তোমরা যখন গড়ে তখন নিজের মনের মতন করে, নিজের জন্তে গড়ে না, মনকে ভোলাবার জন্তে গড়ে।’

সতী উঠে যেতে যেতে বললে, ‘তোমাদের ভাঙা-গড়ার পাল্লা শেষ হলে তবে আমাকে ডাক দিও, দোহাই বাপু মারামারি কোর’ না, মনের সঙ্গে মনটা মিশিয়ে শেষ পর্যন্ত হুটু কিছু কোর’, শূন্য চেয়ে না। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।’

সতী চলে গেল, সমস্ত ঘরখানার মধ্যে ওর দৌরভ ছড়ানো, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েও রেখে গেল স্নেহের উদ্ভাপ, আর ওদের মনোব পর্দায় একে গেল শ্রদ্ধার অঙ্গলী।

কাব্যকথা ও কালিদাস

এই প্রগতিশীল বহু বিচিত্র বাণীমুখর বঙ্গভূমিরই এক অজ্ঞাত কোনে বসিয়া সেকালের অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব-যুগের কোনও এক কবি এক বৃহৎ ভাবকল্পনার প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন :—

“অসীমের দেশ হ’তে আজি অভ্যাগত
জ্যোতিঃর ঈদ্রিত নব দ্ব্যারে আমার—
আহ্বান করিতে তারে হয়েছি বিব্রত—
নাহি জানি সে দেশের ভাষা ব্যবহার ;
চির-জন্ম-সংবদ্ধিতা ভারতী আমার
সুমনাঃ বরণ লয়ে ভেটিতে তাতারে
ফিরেছে মলিন মুখে অহংকার তার
বিগলিত হয়ে গেছে নয়ন আসারে ।

তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলেন এই বলিয়া—

সে কভু দিল না ধরা বাণীর মুঠায়
চকিতে প্রেমের শুধু হৃদয়-গুহায়,
শরতের ক্ষেত্রশীর্ষে শ্যামলী সীমায়
শিশু বাবু লীলা-রেখা যথা রাখি যায় ।

পরে আপনার কাব্য-প্রচেষ্টার দুঃসাহসে এই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন :—

চিরদিন করে নর তবু পৃথিবীতে
তৃষ্ণাতুর-দৃষ্ট মাঝে অদৃষ্ট চিস্তন ;
ভাগ্যবানে পায় শুধু সুপ্রতীক টিতে
সত্য-সমুদ্রের ঘন উজ্জ্বল গহন ।
লক্ষ কোটি বর্ষ ধরি সুধা-সাগরের
তীরে বসি মরিতেছে এ বিশ্ব সংসার—
চাহেনা জানিতে নর, তারি আশে পাশে
প্রতিবন্ধ খুলিয়াছে আলোকের দ্বার ।

কিন্তু সে আর এক যুগের কথা—তখনও এদেশে বাস্তববাদ ভাল করিয়া প্রবেশ লাভ করে নাই এবং কবিগণেরও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আলাদা। তাই রবীন্দ্রনাথের মুখে তখনও পৃথক আমরা শুনিতে পাই—“আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে ।” পরে অবশ্য তিনি তাহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন কল্পিয়াছিলেন । কিন্তু সে কথা যাক । আজ আমরা বাংলাদেশে কবিতাকে বৃদ্ধি অশ্রুতাবে । অবশ্য সেক্ষণে ভাবে বৃদ্ধিবার পিছনে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সমর্থন আছে কি না আমরা এখানে তাহার আলোচনা করিব না—অথবা সেক্ষণে দেখা ঠিক বা বৈঠক এখানে সে তর্কও তুলিব না । আমাদের বক্তব্য এই যে, সে পথে কালিদাস-শ্রেণীর মহাকবিগণের বিচার করা চলে না—তাহাদিগকে বৃদ্ধিবার পথ আলাদা—বেহেতু তাহাদের কাব্যসৃষ্টি অজ্ঞ জাতীয় । ভারতীয় মহাকবি যদি সত্যসত্যই মহাকবি হন—তবে শুধু ভারতীয় রূপদর্শনের মানদণ্ডে তাহার বিচার না করিয়া অজ্ঞ দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা নির্দেশিত রূপদর্শনের পথেও বিচার করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ নিরূপণ করিতে পারা উচিত । অবশ্য রূপদর্শনের পথ বলিতে আমরা হালফাসানের সাহিত্যভিমানী অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক পথের কথা বলিতেছি না—পরন্তু সে সমস্ত মনীষী কোনও কিছু প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া

এবং সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ‘প্রয়োজন নিরপেক্ষ হইয়া বিমুক্ত সৌন্দর্য্য বিচারের পথে চিন্তা করিয়াই এ যুগে বরণ্য হইয়াছেন, যেমন ক্রোচে, বোমবার্টেন, শোপেনহায়ার, শেলি ইত্যাদি, আমরা তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথের কথাই বলিতেছি । আমরা আমাদের এই প্রবন্ধে সেই পথে চলিয়াই অর্থাৎ আধুনিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াই মহাকবি কালিদাসের সৃষ্টি-গৌরবের একটু পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যদি শাস্ত্রত অর্থাৎ সর্বকালীন হয়, তবে সে ত আর দেখাইবার অপেক্ষা রাখে না—নিজের সৃষ্টিধর্ম্মে আপামর সর্বসাধারণের চক্ষুকেই সে মুগ্ধ করে, নয়ন পাইলেই সেখানে সে অমৃত ঢালিয়া দেয় ; গোলমাল বাধে শুধু আমাদের চশমা-পরা চোখ লইয়া, যেখানে স্বভাব অপেক্ষা বিকৃতিই প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়—সুতরাং আমরা আমাদের প্রবন্ধে কালিদাস অপেক্ষা এই চশমা অর্থাৎ দৃষ্টির স্বরূপ লইয়াই একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিয়াছি এই বিশ্বাসে, দৃষ্টির বাধা যদি একটুও অপসৃত হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও সোজা চোখেই যদি দেখিতে পাই—তাহা হইলে তাহার পরের বাহা তাহাকে আর আলোকপাত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইবে না, কারণ তাহা স্বপ্রকাশ । আশা করি আমাদের এই আলোচনা ধান ভানিতে শিবের গীত অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না, কারণ কাব্যালোচনাই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য, কালিদাস গৌণ ।

আধুনিক যুগেরই কোনও একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন, “কাব্য বিশ্বসৃষ্টির রসাত্ত্ববাদ ।” কথা কয়টা সামান্য হইলেও ইহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে কাব্য সাহিত্যের একটা সংজ্ঞা স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । বাস্তবিক পক্ষে কাব্য একটা রসের খেলা—ইহার সৃষ্টিতেও রস, উপভোগেও রস । সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া যখন দেখা গেল ইহার জাতি নির্ণয় করা দুর্ব্বল ব্যাপার—ইহার কোথায় যে আদি কোথায় অন্ত, বলা কঠিন—তখন আলঙ্কারিক শেষ পৃথক বলিয়া বসিলেন—“কাব্য রসাত্ত্বক বাক্য” । প্রথমটা শুনিতে কথাটা যেন নৈরাশ্রব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়, এটা কি রকম হইল ? ওদের দেশে কাব্য লইয়া কত দার্শনিক গবেষণা, কত বিচার বিশ্লেষণ, কত চুল-চেরা তর্ক, কত প্লেটো, প্লাটিনাস, বোমবার্টেন, ফিসার, ফেকনার, আর আমাদের দেশে শুধু এইটুকু, শুধু বাক্য আর তাহার একটু রস । বাক্য বলে ত সবাই—আর রসও তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে কদাচিৎ কখনও, তবে তাহারা সকলেই কবি এবং তাহাদের রসযুক্ত বাক্য মাত্রই কাব্যসৃষ্টি । কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে কথা কয়টাকে আর তত আজগুবি বলিয়া মনে হয়না । প্রথমতঃ মানুষ মাত্রই কবি ত বটেই, সব সময়ে না হউক ক্ষণ বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রত্যেকেই কবি । দ্বিতীয়তঃ রস বা অমুভূতি (ইংরাজী মতে intuition—ক্রোচের intuition না হউক অস্তুতঃ বার্গসার intuition, ভারতীয় মনীষীগণের মতে রস, আনন্দ বা intuitive ecstasy) যখন জীবনের লক্ষণ এবং কাব্যের প্রেরণাও যখন রস বা অমুভূতি, তখন প্রত্যেক জীবিত মানুষের মধ্যে কাব্য সৃষ্টির মূল প্রেরণাটী ত থাকাই উচিত ।

মনীষী ক্রোচে বলেন কাব্যের ভিত্তি ইহাতে—“the first ingenuous theoretic form of the Absolute which is the lyric or the music of spirit and in which there is nothing philosophically contradictory because the philosophic problem has not yet emerged. It is the region of intuition, of language in its essential character as painting, music or song in a word it is the region of art. (Croce, What is living and what is dead in the philosophy of Hegel) এখন এই first ingenuous theoretic form of the absolute-টি কি? ইহাই কি জীবনেরও গোড়াব কথা নহে? স্তব্ধ ক্রোচের মতেও জীবন-ধারা ও কাব্য ধারার মূল উৎস একই। তবে মানুষ মাত্রই সম্ভাবনায় (potentially) কবি, একথা ভাবা আর এমন অযৌক্তিক কিসের? কিন্তু কাব্যত: ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্টে কেন? তাহার কারণ কাব্য সৃষ্টির মূল কারণটি প্রত্যেক মানুষের মন-চৈতন্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও প্রকাশের ক্ষেত্রে ইহা প্রধানত: উদ্দীপনসাপেক্ষ। যেহেতু ইহার সহজ উদ্দীপন-শীলতা সকল চিত্ত-ধামে নাই, প্রকৃতি-ধামে মনোবৈশিষ্ট্যে কতকগুলি বিশেষ মানুষের মধ্যেই আছে সেই জন্য তাহারা কবি, আমরা কবি নই। তাহাদের জাগ্রত রসামুভূতিব সৃষ্টিগুলি শিল্প-ধর্মের প্রভাবে এবং অথগুণতার কলে কাব্য, আমাদের অজাগ্রত চিত্তের মৌহুতিক রস প্রকাশগুলি কাব্যের উপাদান হইলেও এই দুইটি কারণের অভাবে কাব্য নামের অযোগ্য; কিন্তু তৎসঙ্গেও কাব্যের মূল লক্ষণের অভাব তাহাদিগের মধ্যে নাই। স্তব্ধ কাব্য বসায়ক বাক্য—এইকপ নির্ণয়েব মধ্যে ক্রটি কিছু নাই, বরং উহাই উহার সর্বাপেক্ষা উদার এবং সর্বত্র প্রযুক্ত সাধারণ সংজ্ঞা। মনীষী ওয়াডসওয়ার্থ কাব্যধর্ম আলোচনা করিতে গিয়া তাহার Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় যেখানে প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-শোক, চর-বিষম ইত্যাদি মানব-মনের মৌলিক আবেগগুলিকে কিম্বা অল্প কথায় শৃঙ্গার, করুণ, অদ্ভুত, শাস্ত ইত্যাদি রস প্রবৃত্তিগুলিকে উহার মূলকথা বলিয়াছেন সেখানেও তিনি কাব্যের রসায়কতাই স্বীকার করিয়াছেন। তা ছাড়া আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কি দেখিতে পাই? লোকে প্রেমে পড়িলে কবি হয়, শোকের উচ্ছ্বাস কবিতায় প্রকাশ করে, বিবাহের আনন্দোন্মাদার পরিচয় দিতে সহজেই কবিতার কথা মনে করে—ছড়া বাঁধিয়া বিজ্ঞপ্তি করে—এই সকল তথ্যও কি উল্লিখিত মন্তব্য সমর্থন করেনা? নিছক গদ্যায়ক ন্যূনতম, রস বা আবেগের সংস্পর্শে, পত্র হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহাতে ছন্দ আসে, যতি আসে, স্বাক্ষর আসে, কবিতার প্রয়োজন সব কিছুই আসে। মহর্ষি বাম্বিকীর সাদামাটা ভৎসনা “ওরে নিবাদ, মুঞ্চ-ক্রোধ-দম্পতীর একটিকে অকারণে বধ করায় তুই জীবনে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না” শোকের আবেগে “মা নিবাদ প্রতিষ্ঠাৎ স্বয়ং অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ” ইত্যাদি রূপ শ্লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পল্লী সমাজের রমার “তুই ভারী হুই ছেলে” এই তুচ্ছ কথা কয়টি ভয়ব্যাকুলতার আবেগে “ওরে কি হুই ছেলে তুই” ইত্যাদি হইয়া ছন্দে পড়িয়া

ছিল। রস বা রসাবেগই কবিতার প্রাণ, তাহা প্রকাশের মুখে আপনার ভাষা আপনি বুজিয়া লয়। মধুসূদনের কাব্য-জীবনের প্রথমার্শে যখন বাংলা মিত্রাক্ষর ছন্দ কেন—বালা ভাষাই তাঁহার ভাব-প্রকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল, তখন তাঁহার নিরুদ্ধ কাব্য বেদনা ছন্দের বেড়ি ভাঙ্গিয়া অমিত্রাক্ষরের ভিতর দিয়া আপনার পথ করিয়া লইয়াছিল—সেখানে আবেগের স্বাক্ষরই মিলের স্বাক্ষরের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। এই আবেগের বা প্রাণের স্বাক্ষর—ক্রোচের ভাষায় music of the spirit—না থাকিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের গল্প মূর্তি কত খানি বাহির হইয়া পড়ে তাহা তাঁহার লেখা যে কোনও বড় কবির লেখার সহিত মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। রূপ পীড়ের মৃত্যুর পর বহ্লীক আসিয়া শোকবার্তা বুকের কাছে নিবেদন করিতেছে, আর বীরবাহুর মৃত্যুর পর ভয়দূত আসিয়া শোক-বার্তা রাবণের কাছে নিবেদন করিতেছে; হেমচন্দ্র লিখিলেন, “শোকাকুল বহ্লীক তখন ‘খেদ স্বরে আরম্ভিল’।”, মধুসূদন লিখিলেন, “প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ জুড়ি আরম্ভিল ভয়দূত।” একজনের পরাক্রম প্রাণের সঙ্গীতের অভাবে পড়ের ভাষায় গল্প, আর একজনের রচনা উহার সত্ত্বে গড়ের রাতের মধ্যেও ভাষার স্বাক্ষরে মুখরিত পরিপূর্ণ সঙ্গীত। এই স্বাক্ষরের উদাহরণ তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, যথা:

নিশার-স্বপন সম তোর এ বারতা

রে দূত, অমরবন্দ যার ভুজবলে

কাতর বধিলা সে ধনুকের রাবব

ভিখারী?”

“খানর তিমির গভে, “হারয়ে যেনাত

না পারে পশিতে সৌরকররাশি

সূর্যকাস্ত মণি, কিম্বা বিধা-ধরা রমা

তলে।”

“স্বরদরদ বিনিমিত গৃহস্থার দিয়া

বাহিরলা বিধুমুখা।” ইত্যাদি, ইত্যাদি,

বেশ বুঝা যায় সমস্ত কাব্যখানি ধ্বনি দিয়াই তৈয়ারী, অর্থাৎ মধুসূদনের ধ্বনিমুখা কাব্য-প্রেরণা (music of the spirit) প্রকাশের তাগিদে সমস্ত বাঙ্গলা ভাষাটাকেই কবিতায় পরিণত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। রস বা আবেগই যে কাব্যের মূলকথা—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরই তাহার জলন্ত উদাহরণ।

তবেই দেখা গেল রসায়ক বাক্য বলিয়া কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করলে সেখানে ভুল করা হয় না। কারণ উহার মধ্যে কাব্যের ধ্বনি, অর্থ, ব্যঙ্গনা, রীতি ইত্যাদি বাহিরের সব প্রয়োজনার উপাদানগুলি ত নিদোশত হইয়াছেই, তা ছাড়া অন্তরঙ্গের পারচরও খুব সুরভীর ভাবেই আছে। এক এই বাক্যটি ধারণা আলোচনা করিলেই “কাব্যের স্বার্থ স্বরূপ কি” এক দিক দিয়া বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা উপরে কাব্যের বাহ্যরূপের অর্থাৎ ধ্বনিক দিকটার সহজেই হৃৎকথা বলিলাম, এইরূপ অন্তরঙ্গ দিকের সহজেও অনেক কথা বলা যায় কিন্তু তাহার স্থানাতাব। এখন বিশেষের কথা ছাড়িয়া দিয়া একটু নিবিশেষ বা সমগ্র প্রকৃতির কথা

আলোচনা করিয়া দেখা যাক। প্রথমতঃ কাব্য রসাত্মক বা ক্য বলিলে বক্তার মধ্যে একটা তৎকালীন রসানুভূতির বিধেয় স্বভাবতঃই উপস্থাপ্ত করিতে হয়। রসেব অমুভূতি হইলে তবে ত রসসৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে একটা রসধর্মী চিত্তেব কথাও মনে আসে—চিত্ত রসধর্মী না হইলে রসের অমুভূতি কি করিয়া সম্ভবপন্ন হয়? আবার চিত্ত রসধর্মী বলিলে, রস কি, তাহার ধর্ম কি, তাহার প্রেরণা কিসে হয়, এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রসেব নিত্য উৎসব, অখণ্ড রূপ, প্রবাহ ধর্ম ইত্যাদির কথাও চিন্তা করিতে হয়। ফলে টানে টানে এমন এক জায়গায় গিয়া পৌছিতে হয়—যেখানে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব রসতত্ত্ব এক হইয়া যায়। আবার বা ক্য পরিয়া অগ্রসর হইলেও সে অভিযান বড় কম অনস্তাভিসারী হয় না—সেখানেও পথের বেগা অসীমে ভাবাইয়া গিয়াছে। যাহারা ভারতীয় দর্শনের প্রসিদ্ধ ফোটন্তত্ত্বের খবর বাখেন তাঁহাদের কাছে ইহার পরিচয় দেওয়াই বাতলা। এই বাক্যকে বা ক্য না বলিয়া বাণী বলিলেই ভাল হয়। আমবা এই বাণীর সম্বন্ধে আর সবিশেষ কিছু না বলিয়া, একবার এক কবির সম্বন্ধে অজ্ঞান বাহা বলা হইয়াছিল—এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধাব করিয়া আমাদের বক্তব্যকে পরিষ্কৃত কবির চেষ্টা করিব। যথা :

“ভাবের এত অসামান্য উদারতা” আদর্শেব এতবড় ধোরন—
বঙ্গসাহিত্য কেন, অজ্ঞান কোনও সাহিত্যেও খুব কম দেখা যায়।
কবি একেবারে ভাবের যেখানে শেষ সেইখানে তাঁহাদের বাণীর সুর
বাধিয়াছিলেন—তাঁহার উপজীবীর শিল্পমন্দি ছিল বাণী, আমাদের
দৈনন্দিন ভাববাণিজ্যের বাহন ভাষা নহে—ইহা সেই আদি বাণী,
যাহা অখণ্ড অদ্বয় নির্বিশেষের প্রথম বিশেষণ (the first in-
genuous theoretic form of the Absolute) এবং যাহা
আমাদিগের ভারতীয় স্বগিণেব চিত্তে আনন্দে ও সৌন্দর্যে
ধরা পড়িয়া আরণ্যকেব সতত উল্লসিত গাথাব কাটিয়া পড়িয়াছিল।
তাঁহার কাব্যেব প্রেরণা কোথায়—শব্দ অথ-চন্দ্র বলিলে তিনি কি
বুঝিতেন—তাঁহা কবির নিয়োদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটা হইতেই
জানিতে পারা যায়।

“তোমার অনন্তমুখী আদি রস-খেলা,

ভুবন-কবিতা ছন্দে করি অবতারণা,

বাঁহরের ধ্বনিবঙ্গ বিলাসে বিহ্বল,

শব্দেব অঙ্কবনে ঘূর্বেছি কেবল।

সকল শব্দের অর্থ, পদার্থ-ভাষা,

সে অঙ্ক ঘণিবে মাঝে তুমি ছিলে—তুমি।

অতকিতে, অযাচিত্তে লভিলু তোমায়,

ছন্দেব ওন্দরপরে অন্তর গুহার।

সর্বার্থ-সিদ্ধির মহামহিম-সৌরভে,

ভরে গেল শূণ্য প্রাণ ভূমার গৌরবে।

সেই তুমি উপস্থিত আজি সর্বমতে,

সকল ছন্দেব মিলে একই চন্দ্র পথে।

নিখের সকল ছন্দে সাগর সঙ্গীত,

নিখিল শব্দ অর্থে এক অর্থরীত—

গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস সৃষ্টিত আকারে,
পাশিছে উদাত্ত ছন্দে একের পাখারে।”

আশা করি ইহার পরে “কাব্যের বা ক্য” অর্থ ছন্দ বলিতে এদেশীয়েরা কি বুঝিতেন তাহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে না। এখন অজ্ঞান দেখা যাক।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ইউরোপের সর্বজনবরণ্য রূপ-
দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত কতকটা ইহারই অনুরূপ। অবশ্য সেখানে
বিভেদবাদী যে নাই তাহা নহে—কিন্তু বিভেদ বাঁহারা করেন
তাঁহারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নহেন। তাঁহারা সৌন্দর্যকে খণ্ডে
খণ্ডে ভাগ কবিয়া যাহা দেখেন বা দেখান—তাঁহা স্মরণের অস্থি,
মাংসের টুকরা বা অজ্ঞ বিচ্ছিন্ন দেহাংশ হইতে পারে, কিন্তু উহা
তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নহে। স্মরণ এ সকলকে জড়াইয়া এবং
ইহাদের অতীত, অজ্ঞ এক লোকান্তর বস্তু, উহার খানিকটা বাস্তব
খানিকটা ভাব। তাঁহার স্বরূপ তাঁহার অবয়বের টুকরায় পাওয়া
যায় না, এমন কি অনেক সময়ে সমগ্রও ধরা পড়ে না, কারণ
সৌন্দর্যের আবির্ভাব অতিক্রান্ত, আশ্চর্য ও অলোক-সামান্য—
তাঁহা কোথায় যে প্রকাশ হইবে এবং কখন হইবে বলা কঠিন।
তাঁহা ঠিক আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠিতে কিম্বা যন্ত্রাগারের পরীক্ষায়
ধরা পড়িবার বস্তু নহে, সত্যবাং এই সকল বৈজ্ঞানিক কর্তৃক শব-
ব্যবচ্ছেদের দ্বারা স্মরণের পরিচয় পাইবার যে প্রয়াস তাঁহা
ওদেশেই ভাস্কর বলিয়া বিবেচিত হয়, আমরা আর তাঁহার
কথা কি বলিব? কিন্তু তাঁহারা সত্যই দার্শনিক, অখিল রসস্মরণকে
ভাবের পথে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মূল সিদ্ধান্তে
এবং এদেশীয় মনীষিগণের মূল সিদ্ধান্তে প্রভেদ বিশেষ কিছু নাই।
প্রভেদ শুধু পরিস্থিতিস্থানেন ও দৃষ্টিভঙ্গীর। একদল তাকান
উপরে হইতে নীচের দিকে—আর একদল তাকান নীচ হইতে
উপরের দিকে; একদল দেখেন সমগ্র হইতে বিশেষকে, তাঁহারা সমস্ত
বিশেষকে সমগ্রবৎ পশু প্রকাশ বলিয়া মনে করেন—আর একদল
চলেন বিশেষ হইতে সমগ্রের পথে—তাঁহারা মনে করেন বিশেষের
ভিতর দিয়া সমগ্রকে জানাই ঠিক জানা। প্রভেদ শুধু এইমাত্র—
সত্যবাং হু’ দলের সিদ্ধান্তে মিল থাকিবে বিচিৎ কি? আমরা
ইউরোপীয় দর্শনের মোটামুটি মধ্য কথা, বিশেষ কোনও খুঁটিনাটির
মধ্যে না গিয়া, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা এখানে বিবৃত করিবার
চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য, বিবৃতির ভাষা ও পদ্ধতি আমাদের
নিজেদের, কিন্তু ইহার মূল তথ্যগুলি প্রধানতঃ আধুনিক সৌন্দর্য-
দার্শনিকদের (যেমন ক্রোচে পেটাব ইত্যাদির) কাছ হইতে
লওয়া।

আমরা গোড়াতেই একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য
উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধের মুখবন্দ করিয়াছি। সেখানে আমরা
এলিয়াছি—কথা কয়টি কাব্য সম্বন্ধে আধুনিক দর্শনের চূড়ান্ত কথা।
“কাব্যসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির রসানুবাদ।” অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টি করিতে
গেলে প্রথমে আপনাদের হৃদয় দিয়া সমস্ত বিশ্বের রসপ্রকৃতিকে
অনুভব করিতে হয়, তবেই সেই অমুভূতি-লব্ধপথে কাব্যের
উদ্ভাবন সম্ভবপন্ন হয়। এই রসানুবাদ কোনও রকম বাদেব

প্রভাবে পড়িয়া অথবা নিজের মনোগত কোনও আদর্শের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা নহে। কারণ এক্ষণে আদর্শ জ্ঞান মানুষের চরিত্রে আগন্তুক—ইহা তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে; কিন্তু কবির রস-সংবেদন তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা-নিরপেক্ষ সহজ অনুভূতি কোনওরূপ কৃত্রিম সংস্কারের দ্বারা তাহা বাধিত নহে। বিশ্বের সহিত প্রাণের যোগেব মধ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। কবি যখন মানুষ, তখন বুদ্ধির দ্বারাও তিনি জগৎকে দেখেন। কিন্তু এই বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ জগৎ তাঁহার ভাব চিন্তার জগৎ, আর প্রাণের যোগে, রসের সাহায্যে যাহা পাওয়া, তাহা তাঁহার কাব্য জগৎ। এই চিন্তা-জগৎ আব কাব্য-জগৎ পরস্পর-বিরোধী—একে অপরকে খণ্ডিত করে। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া করিলে তাহা আর কাব্য হয় না—আবার কাব্যের চোখে দেখিয়া বিচার করিলে চিন্তার rationality থাকে না। সেই জগৎ যাহার বাস্তববাদেব দোহাই দিয়া কাব্যের সাহায্যে সামাজিক, নৈতিক, অর্থ-নৈতিক বা এরকম কোনও কিছু সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করেন—তাঁহাদের সে কাব্য কাব্য নহে। বিশ্বের সহিত আত্মার যোগে যে রসের জগৎ, সেখানকার অনুভূতি অখণ্ড—সাবচিন্তার জগৎ কবির সসীম মনের সৃষ্টি, তাহা অল্প মনের অল্প ভাব-চিন্তা দ্বারা, অথবা নিজেই কালান্তর বা অবস্থান্তরের ভাবচিন্তা দ্বারা নানারকমে বাধিত। সেখানে বুদ্ধির দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া বাচা দেখা হয়, তাহাতে আলোর সঙ্গে ছায়া থাকে—রসের সাহায্যে আত্মযোগে পাওয়া জগতে অনাবিল আলোকেরই প্রবাহ। বিশ্ব এখানে রসে গাঁথিয়া অখণ্ড হইয়াই কবির মনে ধরা দেয়। এইরূপে জীবন মরণাভীত সত্যের উপলব্ধি—তাহা বুদ্ধি প্রণোদিত, কোন সমস্তাব সমাধান নহে। যদি সমস্তার মতন কোন কিছু থাকে, সেখানে তাহাব আত্যন্তিক নিরাকরণ। এই রসের পথে চলিয়াই বুদ্ধি জগতে অমৃতের বাণী বহিয়া আনিয়াছিলেন—চৈতন্য বিশ্বব্রহ্মের তরল রস প্রবাহে অধিল রসামৃত-মুগ্ধি দেখিয়া প্রেমে বিগলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলও বৃহত্তর ক্ষেত্রের বৃহত্তর কথা। আমরা আমাদের এই সামান্য ঘর-সংসারের মধ্যেও কবিদেব ভিতর দিয়াই এইরূপ সংশয়ের নিরাকরণ দেখিতে পাই। উদাহরণের সাহায্যে আমাদের বস্তুব্য একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। স্তম্ভের পৃথক পৃথক শাস্ত্র শিব অষ্টমতের পূজারী কোনও একজন কবি—জগতের মধ্যে পুণ্যের সহিত পাপের, মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের সমাবেশ দেখিয়া এবং কোন যুক্তির দ্বারা তাহাব মীমাংসা করিতে না পারিয়া পরে যখন দেখিলেন দুইয়েরই লক্ষ্য বৃহত্তর সার্থকতা—কেবল একজন দীর্ঘ—সে সকল বাধা স্বীকার করিয়া লইয়া শাস্ত্রচিন্তে ক্রমে ক্রমে আপনার গম্ভ্যে পৌছিতে চায়—আর একজন দুর্বাব, সে জ্ঞান অজ্ঞান কোন কিছু না মানিয়া অসহিষ্ণু আগ্রহে সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারেই আপনার কামা বস্তুকে পাইতে চায়—প্রভেদ শুধু এইখানে, তা না হইলে দুয়ের প্রেরণাই সেই বাস্তব প্রেরণের অভাব-বোধে;—তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

“এ বিরোধ, এ জীবাংসা অশান্তি সযম
এই ভ্রান্তি, আশ্রয়ত্যা, তিঃসা, অনাচার
তোমার বিরহ বিধে উদ্গাদ প্রথর

নহে কিগো হে দেবতা নৈবেদ্য তোমার ?
তব তক্ষা বিশ্বলোক কর্ণে না ঘৃণিত।
ভবঃ মরীচিকা কিন্তু, যে জীবনস্বামী ?
সকল পাপের বাহা, পুণ্যের লক্ষিত
শুণুপ্ত সে অজ্ঞাতেরে খুঁজিতেছি আমি।”

তাহাব পর দৃষ্টি যখন আরও খুলিয়া গেল, তখন বলিলেন :—
“খুঁজিছে খুঁজিছে নব অনন্ত জীবন,
অলিছে তৃষ্ণায় যার কিস্বা বেদনায় ;
জীবনের অল্প নাম যারি অবেষণ ;
বংশীমুগ্ধ মর্মে বিদ্ধ হরিণের প্রায়।”

এখন একপ নির্দারণের মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা হৃদয়ের মধ্যে পাওয়া—ব্যাকুল হইয়া বৃহত্তর জীবনকে আশ্র-জীবনের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টায়—তাহা না হইলে ইহা যদি কেবল বুদ্ধির নির্দারণ হইত, তাহা হইলে এতবড় একটা হৃদয়সাহসিক প্রেরণ একপ সহজ মীমাংসা উচ্চারণ করিবার পূর্বে কবিকে নিশ্চয়ই একাধিক বার থামিতে হইত। আত্মযোগলব্ধ সত্যের ইহাকে একটা সহজ উদাহরণ বলা চলে।

এই আত্মযোগের শক্তি কবির দৈবলব্ধ শক্তি—মানুষ-মানুষের ইচ্ছাট হইবার স্রষ্টা নহে এবং ইহা সকলের ভাগ্যই ঘটে না। সকল কবির মধ্যে এই যোগজ অনুভূতি আবার সমান স্পষ্টও নহে। যাহার মধ্যে ইহা যত স্পষ্ট তিনি তত বড় কবি—তিনি ব্রহ্মের বস-রূপের তত বড় দ্রষ্টা। বলা বাহুল্য এই রস নির্কির্শেব ব্রহ্মের বস নহে, পবন ব্রহ্ম যেখানে সৃষ্টিকর ধারণ করিয়াছেন, ইহা তাহাপট রস—সেই জগৎই এদেশে ইহাব আত্মদেব ব্রহ্মাঙ্গদ না বলিয়া ব্রহ্মাঙ্গদ-সংস্কার বলা হইয়াছে। অল্প কথায় ইহা ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রের রস; ঐক্য যেখানে নিছক নির্কির্শেব অবিচিত্র ঐক্য, ইহা তাহার রস নহে।

কিন্তু সকল কবির মধ্যে এই যোগজ অনুভূতি সমান স্পষ্ট হয় না কেন? এবং এই যোগজ অনুভূতি যখন কোনও কবির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে এবং মানব-সাধারণেরও যখন ইহাতে অধিকাব আছে, তখন অনেক মানুষের মধ্যে ইহার আত্যন্তিক অভাব দেখা যায় কেন? কথাটা একটু ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক। আমরা পূর্বেই একবার বলিয়াছি যে, কবি-মানসে ও মানব-মানসে জাতীয়তাব তফাৎ কখনও হইতে পারে না, কারণ কবির মন মানুষেরই মন—এবং সেখানে যদি কিছু বিশিষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি হয় তবে তাহা মানুষের মনোধর্মের কাছ হইতেই পাওয়া। তবে সাধারণ মানব মানসের সহিত উহার পার্থক্য হইতেছে এই যে সাধারণ মানব-মানস অস্বচ্ছ, কবি-মানস স্বচ্ছ। মানব-মানস একটানা প্রবাহে বহিয়া যায় না এবং তাহার ভিতরকার একটা বহির্জগতের বহু বিবোধী সংস্কারাশ্রিত উল্লাস চাপা পড়িয়া যায়—সেই জগৎ তাহাকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফলে তাহার ভিতরের বেগও স্পষ্ট হয় না। কবি-মানসের ঐক্য অনেকখানি স্পষ্ট, তাহাতেও ব্যক্তব্যক্ত জাগ্রত-অজাগ্রতের লীলা আছে বটে, তবে তাহা অনেকখানিই ব্যক্ত ও জাগ্রত—অনেকখানিই অখণ্ডিত। এবং এই অনেকখানি অখণ্ডিত ও

অবাহিত বলিয়াই তাঁহাব মনেব প্রবাহধর্ম বেশ সুস্পষ্ট, কারণ, মনের ধর্মই চলমানত। সাধাবণ মানুষের মনেরও এই প্রবাহ-ধর্মতা আছে, কেবল বাহ্যিকের আবর্তনা-সঞ্চারে ব্যাহত হইয়া তাহা গতিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং অসংস্কৃত বস্তু ও ঘটনা-বাহির সংযোগে তাহাব স্বাভাবিক স্বচ্ছতা মলিন হইয়া দাঁড়ায়, মনোবর্ধিতার গুণেও বটে, ভাবপরম্পরায় গতায়তের জগৎও বটে। কবিহৃদয়ে মানবসাধারণ ছেঁড়া-খোঁড়া খণ্ডখণ্ডগুলি জোড়া লাগিয়া অনেকখানি এক হইয়া যায়। এখানে মনোবর্ধ ও ভাবপ্রবাহ পরম্পরের সহায়ক হয়—মনেব স্বাভাবিক বেগ হইতে ভাব-পরম্পরা জাগ্রত হয়—এবং আবাব ভাবাবস্থানের ফলে চিত্তবৃত্তির গণ্ড খণ্ড অংশগুলি জোড়া লাগিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাব বেগ আবও বদ্ধিত হয়। ফলে, কবির চিত্ত আমাদের চিত্ত অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়, সচেতন ও স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ চিত্তে বিশ্বের রসরূপের প্রতিকলন যে অতি সহজেই হইবে এবং প্রবাহ-ধর্মের ফলে এই অনুভূতিগুলি যে কাব্য হইয়া গড়িয়া উঠিবে তাহা অনাগাসেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এই চিত্ত-স্রোত সকলের মধ্যে ও সকলক্ষেত্রে সমান সক্রিয় ও স্বচ্ছ নহে। দেশ-কাল-পাত্র বৈচিত্র্যে—ঘটনা সংস্থানেব ভিন্নতায়, লক্ষ্যসংস্থানেব ভিন্নতা ও মৃত্যুভেদে এই মনোবাহার কাহারও মধ্যে অধিক স্বচ্ছ, কাহারও মধ্যে অল্প স্বচ্ছ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনই রচনার মধ্যে কোথাও সবল, কোথাও দুর্বল, কোথাও সুস্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও অতিরঞ্জিত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এইখানেই কবিত্তে কবিত্তে এবং কবির পূর্বাধার বচনার মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু তাহা হইলেও বচনা যদি জাগ্রত চিত্তের রচনা হয় এবং নিছক রচনা-বিলাসেব ফল না হয়—তবে এই সকল ক্রটিতে কবির সৃষ্টির অঙ্গহানি হয় না এবং পাঠকের রসানুভূতিতেও বাধেনা। যেখানে অসামঞ্জস্য, তাহার তলায় ডুবিয়া ঐক্য-সুত্রী বাহির করিয়া লইতেও বিলম্ব হয় না—কারণ জাগ্রত মনো-অনুভূতির সৃষ্টিব ঐক্যেব উপরই প্রতিষ্ঠা।

এ পর্যন্ত আমরা বাঁহা দেগিলাম তাহা হইতে বুঝা গেল কবি হইতে গেলে সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন বসের উল্লেখনেন। নকলনবিশী করিয়া কবি হওয়া যায় না কারণ সে চিত্ত জাগ্রতও নহে, সক্রিয়ও নহে। চলমান বিশ্বের নব নব রসলীলা তাহাতে ধরা পড়ে না। বিশ্বপ্রকৃতির সচিত্ত প্রাণের সম্বন্ধে রসের যে বিচিত্র অনুভূতি কবির কাছে হয়, তাহাই যখন তাঁহার প্রাণের ছাপটী লইয়া আমাদের ভাব্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই হয় তাঁহার কাব্য। আর এই নিজের প্রাণের ছাপটী হয় তাহার শিল্প—এইরূপ কাব্যই সাহিত্যের জগতে কবির নূতন অবদান। এদেশে ও বিদেশে যে সকল বড় বড় কবির কথা আমরা শুনিতে পাই তাঁহারা এই হিসাবেই বড় কবি। ডাল-ভাতের সমস্তা, চাতিসা ও জোগানির প্রশ্ন, অর্থনৈতিক বা রাজ-নৈতিক প্রতিবন্ধক, ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের কাছে যত কঠিন ও মর্জাস্তিক হউক না কেন; শুধু সেই সকলেরই ভঙ্গনা কখনও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইতে পারে না—যদি তাহাদের শিখনকার দৃষ্টি কেবল আমাদের বস্তুজগতেই নিবদ্ধ থাকে। তাহাদের প্রয়োজন

আমাদের জাগতিক সুখস্বাস্থ্যের পক্ষে কাব্যের প্রয়োজন অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের ক্ষুধা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতীয় ক্ষুধা এবং তাহার পরিতৃপ্তি কেবল এই সকলের বস্তু-তান্ত্রিক বিবৃতির মধ্যে নাই। কবি যদি পাঠকের চিত্তকে জগতের মোহপঙ্কিল আবিলতা, অজ্ঞ প্রাণঘাতী বাদবিসম্বাদ হইতে সরাইয়া লইয়া উন্মুক্ততর দৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির মূল্য কি? ছোট করিয়াই হউক বা বড় করিয়াই হউক দেখে ত সকলেই এবং প্রকৃতি-ধর্মের রসও অল্পবিস্তর অনুভব করে, যদি তাহাদের কথা—না হয় একটু ফেনাইয়া কাঁপাইয়াই পুনরাবৃত্তি করা হইল, তবে কবি বা ভাবকের স্বয়ং-দৃষ্টি বৃহত্তর অনুভূতির কাছ হইতে আমরা নূতন কি পাইলাম? এ যুগেব শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গিয়াছেন—“জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।” তাহা হয়ত বাজে, কিন্তু আমবা বধির—আমাদের প্রাণের কর্ণে তাহা পৌছায় না। কে তাহার স্রুতি আমাদের কাছে পৌছাইয়া দিবে, কবি ব্যতীত? কবির চিত্তও যদি আমাদের মত আবদ্ধচিত্ত হয়, আমাদের মতই যদি বাস্তবেব প্রয়োজন লইয়া তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন, তবে তাহাব কাছ হইতে আমাদের প্রত্যাশা কি? বৃহত্তর দৃষ্টি, বৃহত্তর হৃদয়, বৃহত্তর স্বার্থ যে আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা আজিকাব এই ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া দানবীয় তাণ্ডব লীলার মধ্যে অপেক্ষা মানুষ আর বেশী কখনও অনুভব করে নাই। কিন্তু হায়, সে কবি কোথায়, যিনি তাঁহার প্রাণের আলোকে দেখাইয়া দিবেন, যে বিশ্ব-মানবীয় মিলন ও হৃদয়ের আদান-প্রদানের মধ্যেই আমাদের চরম ও পরম কলাগণ লুকান আছে,—ব্যক্তিগতই হউক আর জাতিগতই হউক, সঙ্গী স্বার্থ-প্রণোদিত হানী-হানির মধ্যে নহে। কিন্তু সে কথা যাক।

কালিদাস ইত্যাদি মহাকবিগণেব উক্তরূপ অন্তর্গতী বিনোদনার স্বয়ং-দৃষ্টি-স্বচ্ছ সাবলীল প্রবাহ-ধর্মী হৃদয় ছিল, তাই তাহাদের কাব্যকথা, আমাদের শত সংশয়ে ছিল, সংসারের ধূল্য অন্ধ, ক্ষুদ্র জীবনেব ক্ষুদ্র কথা নহে, তাহা সীমায় পরিচ্ছিন্ন মানুষের অসীমের জগা শাশ্বত আকৃতির কাহিনী। অন্তর্গতী শূণ্যতার বৃকে মলহীন ফুলেব মত এই বিশ্বসৃষ্টিব সঙ্গে একটা বিরহ ব্যথা নিরন্তর জাগিয়া আছে, আমাদের পবিত্র স্রবের মধ্যে তাহারই বেশ হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া আমাদের সমস্ত ভোগপ্রথ, সমস্ত আনন্দ উৎসব এমন কি আমাদের অস্তিত্বটাকে পধ্যস্ত ব্যথাসকরূপ করিয়া তুলে। মনে হয়, “কি যেন বয়ে গেল, কোথা কি রয়ে গেল, পড়িয়া এল বেলা, হল না পাওয়া”; কালিদাস ইহারই উল্লেখ করিয়া তাঁহার “অভিজ্ঞান শকুন্তলে” লিখিয়াছেন, “রম্যাণি বাক্য মধুরাংশ নিশম্য শব্দানু-ইত্যাদি। কবি ইহারই দূর স্রুতি সঙ্গীতের মত বেশ আপনাব প্রাণের কর্ণে শুনিয়া অজ্ঞান বিবাদে ব্যাকুল হইয়া উঠেন, আপনাব চিত্তকে স্তব্ধে প্রসারিত করিয়া অভিসারে প্রেরণ করেন, কখনও সেই অপাওয়া স্বপ্নের নিজের মনগড়া একটা রূপ কল্পনা করিয়া মস্তেই অমর্য্য লোকের ছবি আঁকেন। কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিতে বসিলে তাঁহার এই বিশিষ্টতাই সর্বপ্রায়ে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তাঁহার মেঘবৃত্তে কবি-চিত্তের এই শাশ্বত বিরহ-ব্যাকুলতাই যক্ষের বকলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অজ

দেশেও এই জাতীয় অনুপ্রেরণার আদর্শ পাওয়া যায়। হোমাবেব ওডেসী, দান্তের ডিভাইন কমেডি, শেলির অ্যালাস্টার, টেনিসনের সার গ্যালাডাড কর্ক জোর্নি গ্লেসের অধেষণ এই জাতীয় কবিতার অন্তর উৎকৃষ্ট নমুনা। কবি-চিত্তের এই রচনাময় বিরহব্যাকুলতা কাব্যের প্রথম কথা, তাঁহাদের সমস্ত কাব্যসৃষ্টিই এই অনিচ্ছিত উদ্বেগ, এই কি-জানি-কি অভাবের দ্বারা প্রবোধিত। কিন্তু ইহা শুধু কবি-চিত্তের ব্যাকুলতা বলিলে বোধ হয় অজ্ঞায় বলা হইবে, ইহা মানবমনেরই সাধারণ ধর্ম। ইহারই উল্লেখ করিয়া সঞ্জীব চন্দ্র এক জায়গায় লিখিয়াছেন, “চারিটা বাজিলেই আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম, কেন তাহা কখনও ভাবিতাম না, পাহাড়ের কিছুই নূতন নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—তথাপি কেন আমার ঘাইতে হইত জানি না। এখন দেখি, এ .বগ আমার একার নহে, যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময়ে কুলবধুর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে—জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে ঘাইতে পারিল না সে অভাগিনী” ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ও ইহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় যথা,—

আর নাইরে বেলা নামলো ছায়া ধরনীতে
চলবে ঘাটে কলস্থানি ভরে নিতে।

জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা গগন আকুল করে,
ডাকে আমার পথের পরে সেই ধ্বনিতে।

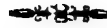
জানিনা আর ফিরবো কিনা, কা'র সাথে আজ হবে চিনা।
(ঘাটে) কোন অজানা বাজায় বীণা তরনীতে।”

সঞ্জীব চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ, উক্ত কুলবধু, আপনি, আমি, আর পাঁচজনে সকলেই কোনও না কোনও সময়ে এই ব্যাকুলতা অল্পবিস্তর অনুভব করি। কিন্তু কবির হৃদয় স্বচ্ছ, তিনি ইহা আরও সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করেন এবং ইহার ইঙ্গিতে আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইংরাজীতে ইহার নাম “call of the infinite” বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা। তাঁহাদের মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাবনের নিয়মে, আমরা সকলেই, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, অল্পবিস্তর কৃষ্ণ-ব্যাকুল, অল্পবিস্তর ব্রজগোপী। এই প্রেরণাতেই আমাদের কর্ণচক্র চলিতেছে। বিশ্বভূবন প্রাবৃত কবিতা বাণীর স্তরে নিয়ত বাজিতেছে “আয় রাধা আয়” আমাদের কেহ তাহা নিয়া ধন জন পার্থিব ভোগস্বর্থের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, চিত্তের পাকায় মনে করিতেছি “বাণী বুঝি এইখান হইতেই বাজিতেছে।” বাবু কুহু বা অধিক ভাগ্যবান, ইহাব ইঙ্গিত অনেকটা ঠিকভাবে হৃদয়ে অনুভব করিয়া কৃষ্ণের পথেই ছুটিয়া চলিয়াছেন, যথানে হৃদয়রাজ বাণীর স্তরে নিখিলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া গিল রসামৃতমুষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন। কবিগণ এই ভাগ্যবান। বকুলের অন্ততম, তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টি এই বাণীর অমুপ্রাণনার মুপ্রাণিত। কালিদাসের মেঘদূত এই চিরন্তন বাণীর অভি-বেরই কাহিনী, সেইজন্ত ইহা আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত ত মধুর হইয়া আছে।

এতদূর পর্যন্ত যাচা দেখা গেল, তাহাতে আমরা এই

বুঝিলাম, বিশ্বের সহিত প্রাণের সংযোগে ‘লক অথও রস ভূভূত, স্বচ্ছ প্রবহমান চিত্ত, আবদ্ধচিত্তের বহুস্তর সৃষ্টির জন্ত ব্যাকুলতা, এই সমস্ত আলোকপন্থী কবিগণের কাব্যসৃষ্টির অপরিণায়া গোড়াকার কথা। তাঁহাদের কবিকৃতা, কৃতপ্রাণ কবিগণের সঙ্গীর্ণ গম্ভীর দ্বারা পরিচ্ছন্ন, স্ফোজিবহুল, রীতি মাত্রে পর্যাবসিত, হৃদ ও বাক্যের স্বরপ্রাণ শিজিনীতে শেষ, সাহিত্যিক চটুলবৃত্তি নহে। তাহা অমৃতের ক্ষুধা; এই ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহারা শতকদম্বতাকলুষিত, ধূলি মলিন, মর্ত্যের সৃষ্টিকার উপর ভাব-রসের আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। ব্যবহারতঃ পৃথিবীর জীব হইলেও, তাঁহাদের চিত্তের জ্যোতনা অনন্তের সেই মিলন-বাসরে, যেখানে জড়ে জীব, বিশেষ বিশেষের অক্ষরস্ব প্রেমের লীলা চলিতেছে। সেই রস-লোকে দাঁড়াইয়া এবং অখণ্ড-রসসুন্দরকে সম্মুখে লইয়া যে স্থরে তাঁহারা তান ধরেন মর্ত্যের ভাষায় প্রকাশ বলিয়া মাটির ছাপ হয়তঃ তাহাতে একটু আধটু থাকে, কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ স্বর্গেরই সঙ্গীত। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলাও এইরূপ একটা মর্ত্যের ভাষায় গঠিত স্বর্গের সঙ্গীত। সেখানে তপোবনের যে গাথা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক স্থরে বাধা। তাঁহার অতুলনীর শকুন্তলা তপোবনেরই শান্ত স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য্যভরা হৃদয়ের এক অপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। বসন্তের অতিক্রান্ত আবির্ভাবে সেখানকার সমস্ত অনাড়ম্বর তপঃক্লিষ্ট জীবনে যে মাধবী মানকতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কবি যেন তাহাকেই রেখার সীমায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইজন্য লালসা, কৃত্রিমতা, ভোগবিলাসের প্রতিকল্প, মর্ত্যের অতিবাস্তব রাজসভার কলুষিত বায়ুস্পর্শে সেই স্বর্গের স্রবম এক মুহূর্তেই হ্রাস হইয়া ধরিত্রা পড়িয়াছিল। আবার যখন আমরা তাহার পুনর্দর্শন পাই, তাহা আর মর্ত্যের মাটিতে নয়, পুস্তক স্বর্গের পথে—অনেক অমৃততাপের অশ্রুজল ঢালিয়া চিত্তচুদ্ধির পরে—তাহাও আর সে তপোবনের কাব্যাত্মা, তপোবন পরিপ্রেক্ষার কোমল সৌন্দর্যের মূর্ত প্রকাশ, অমাহুষী-সম্ভবা শকুন্তলার নহে কারণ তাহা চিবদিনের জন্ত সৌন্দর্যের অখণ্ড আধারে বৃদ্ধদের মত লয় হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যিনি তিনি দৃষ্যস্বের ভাবী রাজমহিষী ও তাঁহার পুত্রের জননী, মানবী শকুন্তলা। ইহাব পবনযাত্রার কথা, তাহা বাস্তব জগতের—বাস্তব বরকন্নার কথা, সৌন্দর্যের স্বপ্নের সহিত তাহা খাপ খায় না, সেইজন্য কবি অতি নিপুণ হস্তে তাহার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। কবি এই-রূপ অপার্থিব দিব্য সঙ্গীতে তাঁহার অমর গ্রন্থকে গাঁথিয়া তুলিয়া-ছিলেন বলিয়াই জাণীরীর অন্ততম মহাকবি শিলার বলিয়াছিলেন “It is too delicate for the stage.” কবে কালিদাস শকুন্তলা রচনা কবিয়াছেন, তাহাও পর জগতের উপর দিয়া কত কদম্ব বাস্তবতা, কত জিয়াস্ত্র ঘাত-প্রতিঘাতের শ্রোত বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সৃষ্ট এই অপার্থিব সৌন্দর্য লোকের ছবি নরসংসারের বাহিরে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া থাকিয়া চিরদিন আমাদের কাছে আনন্দলোকের পথ দেখাইয়া দিতেছে। এইরূপ সৃষ্টিতেই মহাকবির মহাকবিদ্য। কালিদাসের মধ্যে এই সৃষ্টিশক্তি অসাধারণ পরিমাণে বিভ্রামান ছিল বলিয়াই তিনি জগতের সর্বকালের মহাকবিদের অন্ততম।

স্বরলিপি



গান

রচনা : বাণীকুমার

স্বর : গঙ্গজকুমার মল্লিক

স্বরলিপি : অনিল দাস ও

বিমলভূষণ

প্রভু, নিতি-নব প্রেমের করুণা

বিপুল সৃজন-মাঝে হে ।

জাগে তব গীতি নিখিল-ভুবনে

জীবনে-মরণে কাজে হে ॥

সুমধুর রসে অমৃত ধারায়

গ্রহ-ভারা-রবি তব গান গায়,

কি মহোৎসব-সঙ্গীত ভবে

সুরে-তালে-তানে বাজে হে

মানব তোমায় চিন্তা করিয়া

লহে যে চরম-মুক্তি বরিয়া,

হে জ্যোতির্শ্রয়, কল্যাণতম—

তব রূপ চোখে রাজে হে ॥

-ত্রিতাল-

সা সা || { ধা সা রা রা | রা রা মজ্জা -মা | মা মপা মা পা | ১ -১ -১ -১
প্র ভু || { নি তি ন ব | প্রে মে রং . | ক কং গা . |

মা মপা পা পা | পা পা মপধা মপা | মজ্জা -১ ১ -১ | রজ্জা মজ্জা (বজ্জা সা) -১ -১
বি পুং ল সৃ | জ ন মা . . ঝে . | হে (প্র. ভু) . .

মা মা রা রা | সত্বা জ্বা সা -১ | গা গা গা গা | পধা -১ পা -১
জা গে ত ব | গী . . তি . | নি থি ল ভু . | ব . . নে .

পা সা সা সা | সরা সা রপা মপা | মজ্জা -১ -১ -১ | রজ্জা মজ্জা রজ্জা সা
জী ব নে ম | বং গে কা . জে . | হে (প্র. ভু)

|| ০ ১ ২ ৩
গা ধা গা ধা | গা ধা না -১ | না সা রা সনা | সা -১ -১ -১
সু ম ধু র | র . সে . | অ , য় ত ধা . | রা . . য়

গা ধা গা ধা | গা ধগা পা -১ | মা পা পধা মপা | মজ্জা -১ -১ -১
প্র হ তা রা | র . . বি . | ত ব গা . ন . | গা . . . য়

রা -১ ১ ধা | রা -১ রা সা | রমা জা জা মা | রা রা সা -১
কি . . ন | হোৎসব | স . গী ত | . ভ রে .

সাঁ সাঁ -১ গা গসাঁ গা গধা পা মা রা রমা পধা মজা -১ -১ -১
সু রে • তা। লে• • তা• নে না • জে• • • হে• • • •

ইহার পরে “জাগে তব গীতি”.

O ১
[ধা সাঁ সাঁ গা পধা ধগা মা -১]
গা গা গা ধগা ধপা -১ -১ রা রা মা মা পা গা ধগা পা -১
মা ন ব তো• মা• • • য চি ন তা ক রি • • রা •
গা ধা গা ১ গা ধগধা মা পা না -১ না না না নাসাঁ সাঁ (রাঁ)
ল হে যে • চ র•• ম • য় ক তি ব রি •• যা (••) }

সাঁ সঁ সাঁ রাঁ রাঁ রাঁ রাঁ -১ রাঁ রাঁ রমাঁ জাঁ জাঁ মাঁ -১ রমাঁ রসাঁ -১
হে জ্যাঁ তি ব্ ম য ক • • ল্যা গ • ত • ম • •

সাঁ সাঁ -১ গা গসাঁ গা ধগা পা মা রা রমা পধা মজা -১ -১ -১
ত ব • রু প• • চো• পে রা • জে• • • হে• • • •

ইহার পরে “জাগে তব গীতি.. কাজে হে”..... ॥

‘কব্ধি’

বাণী সেন, এম-এ

উন্নত শির বেত উজ্জ্বল পিঙ্গল বর্ণধারী,
পিঙ্গল নরেন চাহিয়া উজ্জ্বল আসে এই ভয়হারা।
বিষের মনোবা
তার আগমন বাক্য করিতে খুঁজে মরে শুধু ভাষা
কল্পলোকের বিলাস লইয়া নবীন যুগের কল্পনা
যুগসন্ধির বাক্যবতার স্বপ্নেরি ভাল বোনা।
মানুষের কোটি ভয়ঙ্কর পাপ ভুসে হ’য়ে উঠে,
বাক্যের ক্ষমার প্রলেপে সে পাপ তিলকে নাহিক টুটে

মানবের বিধাতা,
ধারণ করে নৃসিংহ মুরতি বিভীষণ অপকল্পিত।
অশ্বকুরের ধূলিগুণ্ডে নিভৃত মণ্ডল ঘিরে
দিকসরজনী চলে আসে এই দীপ্ত কৃপাণধারী।

নরের কল্পনার
যে জ্ঞানমন্ডল অঙ্কিত ছিল শুভ্র আল্পনার,
সত্যের চমক তাহারে দেখিতে ঈশান মেঘের কালো,
বীশ্বর বললে বিষণ্ণ বাড়িতে তুতার নেত্রে আলো।

নহে জ্ঞানমন্ডল,
রক্তের বেশে আসিছে দেবতা তেঁদের গিরি কন্দর।
পথে পথে তাই অপেক্ষিছে মরণ-মহোৎসব,
মৃত্যুর স্তূপে অর্ঘ্য রচনা, কৃষকের ভয়রব।
কল্পার বেশে আসিছে দেবতা বিষ রণাঙ্গনে,
পুঞ্জিত পাপ ধ্বংস কাগজে মৃত্যুর গরজনে।

এসেছে অমৃতজনী,
প্রহরনের প্রতি পদপাতে চলিতেছে মার্জনা।
বিধাতা ধরা নিঃশেষিছে রক্তের নিঃধামে,
নব ধরণীর স্বপ্ন তা গড়ে যুগের সন্ধ্যাংশে।

মহাবাক্তর শেষে,
মুখাসিক্ত পুত ধরণিতে দেবতা উঠিবে পেসে।
যুগসন্ধির দুয়ারে গাঁড়ারে ঐক্য বিষজন
বৃথা আশা ল’য়ে দেখিতে কেবল রক্ত সন্ধ্যাক্ষয়।

প্রলয় পরমক্ষণে
হায়, দেবতা শুধুই উজ্জ্বল নয়ন কুটীশাঘক হানে।

অনধিকারী

ঐক্যমুদ্রণ মল্লিক

তোমার চোখে যা লাগে না কো ভাল
দেখেই বলো না—চাই,
হয় ত তাহার মাহিমা বুঝিতে
অধিকারী হওয়া চাই ।
চেনে যারা জানে তাহারই ত দাম,
শিলা হয়ে পড়ে বহু শালগ্রাম,
বোঝে ভুল ভাঙি-রক্তের
মূল্য যে গুণীরাই ।

কল্প প্রাচীন তুলটের পুঁথি
হয় ত অসম্ভব ।
কতই অমৃত ধরিয়া রেখেছে
কালো আঁখরের গড় ।
কতই শাস্তি, কত আনন্দ,
ভাবের ভবন বয়েছে বন্ধ,
তুলনায় যার নেহাৎ ক্ষুদ্র
মোদের পৃথিবীটাই ।

জটাজুটধারী শুষ্ক শীর্ণ
বসে আছে সন্ন্যাসী,
বক্ষে নিবিড় মিলনোৎসব,
যন আনন্দ রাশি ।
সেথা খ্রীষ্টবির কত রাস দোল,
কত স্মলনের মধু তিলোল
সুখা সাগরের কল কল্লোল—
কিছু কি আমরা পাই ?

বাঁহর দেখিয়া আমরাই ভুলি
অনধিকারীর দল,
বুঝিতে পারিনে তবু করি মিছে
তক ও কোলাহল ।
চিন্তিতে হরির চরণ দাগ গো,
চাই প্রেম চাই ভকতি ভাগা,
যত্নেতে যাচা যায় নাকো দূর
মগ্নেতে তাই পাই ।

মন্দির গায়ে অল্লীল ছবি
দেখিলেই হয় ঘৃণা,
আছে ভক্ত ও শিল্পীর কাছে
মূল্য তাহার কি না ?
তদ্ব্যয়-মন জানে না বিকার—
প্রবেশে তাহারি শুধু অধিকার,
পিপাসু চকোর সুখ চায় শুধু,
আন সুখ তার নাই ।

লৌহ মনকে চুষক পাবে
করিতে আকর্ষণ,
সোনা যে হয়েছে, নির্ভিক আর
নিখিল তার মন ।
ছাগলে কি ভয় কল্লতরুর,
ফাঁদে পড়ে ঘৃণ, পড়ে না গরুড়,
কালো ও নিকষে খাঁটি স্বর্ণের
প্রথমে হয় যাচাই ।

মন্দির পথে বিপণি পাতায়ে
বিলাসিনীগণ বয়,
মুক্তা-তোলার ডুবারীয়ে কি সে
ভূলাবে সফরীচয় ?
মাহারা ভক্ত, যারা উপাসক,
তারা দেবশিশু—কঠোর সাধক,
সঙ্গে তাদের অমৃত বাজ্য
সমান সকল ঠাঁই ।

গান

—আব্বাসউদ্দিন আহমদ

সব মুছে যাব, মোড়ে নাকো শুধু স্মৃতি,
হর রহে ভোগে যদি গেমে যার গীতি ॥
জড়ানো যেমন বাণী আর বেণু,
নাশুরীর সাথে যেন ফুল-রেণু,
মোর কণ্ঠের কলকাকতিতে জাগে সেদিনের স্মৃতি,
স্মৃতির দেউলে ম-উপচার নিশা
হারানো দিনের অর্থ্য সাজাই শিখা ,

কত বসন্ত বাদলের রাতে
যে গান গেরেতো তুমি মোর সাথে,
সে স্তব-লহরী মুরতি ধরিয়া
জাগে অন্তরে নিশি ।
মোটে নাকো কত স্মৃতি ॥

মরণ-বাসর

শ্রীনকুলেশ্বর পাণ্ডা, বি-এল,

নিভে আসে আলো ধরণীর বুকে যাবার বেনা,
কি খেলা খেলিবে আঁচি প্রায় মোর, মরণ খেলা?
হৃদয় কাঁপিতে ধর ধর ধর;
উঠে চারিদিকে প্রলয়ের ঝড়;
সাগরের বুকে উঠে ভয়ঙ্কর দিভেছে দোল
গগনে পবনে বাজিছে বিবাণ, অট্ট হোল।
যাবার বেলার ওই বাজে বুদ্ধি মরণ শীঘ্র,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেলিল কণায় দিতেছে ডাক?
আরো কাঁছে এস—এস প্রায় মোর,
শুনিতেন নাকি গুণো চিত্ত চোর—
কালের বক্ষে মুড়া ভয়ের বাজিছে বীণা?
প্রলয় নাচনে ধরা টলমল অট্টহাসি।

রচিয়াছি আজ বাসর-শয়ন যাবার রাতে;
দীপ নিভে আসে—শুধু কুহ্ম শূন্য হাতে!
যুমে আসে ঢুলে অলস মরন,
লও বুকে মোরে হৃদয় হরণ;
কণ্ঠে ঢুলিছে নটকসম প্রশ্ন-ডোর;
আজি দু'নয়নে মিলন-অশ্রু যথেষ্ট জোয়ার।
পাষণ কারার বন্ধ নাশিয়া ভাঙ্গি 'আগল';
মুক্তি-আলোর হাসে দশদিক ধরা পাগল।
সাগরের বুকে মত্ত তুফান,
আকাশে বাতাসে মিলনের গান;
উজাসে আঁচি চিত্ত দোহুল, হৃদয় নাচে
প্রিয়ের পেয়েছে মরণ-বাসরে বুকে কাঁছে।

‘অনন্ত যাত্রা’

শ্রীবিমল রায়

তরীখানি চলে মোর, ভাঙ্গা হাল তার—
এ আঁধার পারাবারে। শুধু চারিদিক!
কল্পা কল্প বৈতরণী! একেলা পথিক—
বাঁহিয়া চলেছি তবী অন্তরে পানে।
দিগন্ত নিঃসাড় শুদ্ধ, বাক্যে আব্দায়া!
অজানা বীণীর সুরে চেঁচুঁচি এ ঘর,—
চলেছি অনন্ত পথে একান্ত একেলা!
কেছই নাহিক মোর, বিরহী বিজন!
ওপারের কালো মাঠ কাঁজল পাতার—
দিয়ে মোরে হাতছানি তেজে দিছে ঘর।
এক কিন্তু নয়নাশ্রু অশেঁছিল হাথ।
চলেছি বাঁহিয়া তবু ক্ষুদ্র তরীখানি।
নাউ নাউ এ যাত্রার শেষ নহি আর,
অসীমের যাত্রা পথে একেলা পথিক।

“যাযাবর মন ভোলে পঞ্চচল”

শ্রীআশা সান্যাল, বি-এ

অনেক ভাবিয়া তোমারে ত’ আমি বলিছি অনেকবার
আমার জীবনে তুমি ধুমকেতু, অতিশয় আঁধার।
বরিষামূণ্ডর মচল প্রভাতে অকারণে বল মন
তুমি ছাড়া মোর বার্থ সকলি প্রাণহারা প্রতিক্ষণ।
কাছে এলে যারে পায় না বাঁধিতে দুক দুক কাঁপে বুক,
দূরে গেলে যারে হৃদয়ে বাঁধিতে ভ্রমে থাকি উৎসুক;
কেন আমি দেখি তব আঁখি ‘পরে মোর দ্বান মূণ্ডারা।
তোমার তৃষ্ণা-মরুতে যে আমি ঘন নীল মেঘমালা।
শিরায় শিরায় জাগে নিঃসরণ মাতাল শোণিত নাচে,
যাযাবর মন ভোলে পঞ্চচল। আপনি বীধন যাচে,
অন্তের মন মোহিত্য কার তল্লাস মতো চাকে,
অনাগতকাল নিরন্তর মতো অবিরত মোরে ডাকে।
স্বপ্নর আবাশে তারার তারার তারি ঘেন হাতছানি,
জ্বাল-ভূণের মুখে যাওরা পথে তারি রেখে-বাঁধা বালী;
পথিক বাড়ল পঞ্চচারি অলি গাছে ঘেন তারি পাখা,
মুক্তি-সমাধির সে তীর্থ ঘারে নীরবে জানাই যথা।

মাইভঃ মাইভঃ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল

মাইভঃ মাইভঃ
গগনে তপন জাগে ত্রি!
অমৃতের পূর মোর।
তুচ্ছ মুড়া-ভীড় নই।

আমরা আনিব জয়,
আমরা জানি না ভয়,

কুখিব অত্যাচার শত অজ্ঞান,
শিব শান্তবে চিত্তে ডমক ব্যাভার
তাইয়ে তাইয়ে।

কে দেবে মায়ের সুরে আত্মহুতি
সমরে ডাকিছে তারে মরণ হুতা—

আমরা আনিব জয়,
আমরা জানি না ভয়,
পীত শত্রু নাশি শান্তি আনিব নিশ্চয়,
আমরা মায়ের ছেলে,
শিরে তাঁর পঞ্চধূল লই।

দৃশ্যরূপ : [নেটিভ্ টেট্—ভেলপুর। এই টেটের সর্বময় ফর্তা দেওয়ানের গৃহ-কক্ষ।...কক্ষটিকে ইঙ্গ-ধরণে সাজানোর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।]...

গৃহভাস্কর হইতে আসিবার একটি দ্বার—দক্ষিণ দিকে, বাম-পার্শ্বে বাহিরে যাইবার দ্বার। সামনের দিকে দক্ষিণ ঘেসিয়া একটি খোলা জানালা।...

কক্ষের মধ্যভাগে একটি বড় গোল টেবিল—সেই টেবিলের সামনে একটি ভালো চেয়ার—দেওয়ান সেই আসনে বসিয়া থাকেন। টেবিলের এক এক ধারে চারটি করিয়া সমবেশায় দুই ধারে আটটি চেয়ার সাজানো।...পিছনদিকে এক কোণে একটি বুক্-কেস্—সেই বুক্কেসের শীর্ষে একটি ঘড়ি, তারপরেই কয়েকখানি মোটা মোটা দস্তুর রহিয়াছে।—পটোভোলনের সঙ্গে দেখা গেল—দেওয়ান সত্যস্বরূপ সর্বাধিকারী সর্বেরূপ সর্বতীর্থের কাছে হাত গণাইতেছে—টেবিলের উপরে আধখোলা অবস্থায় একটি গোটানো কোষ্ঠি, পড়িয়া আছে—একটি স্লেট্ তছপরি একটি পেন্সিল খড়ি—গোটাকয়েক পুথান ও একটি নূতন পাড়ি।...স্লেটে একটি 'ছক্' কাটা রহিয়াছে। অতি মনযোগের সঙ্গে সর্বতীর্থ সত্যস্বরূপের হস্তরেখা বিচার করিতেছে—দৃষ্ট হইল।]

সত্যস্বরূপ। কি রকম দেখছেন বলুন তো—সর্বতীর্থ ম'শায় ? আমি তো মহাভাবনায় প'ড়ে গেছি।

সর্বতীর্থ। ভাবনার খুব বিশেষ কিছু নেই...আবার কিঞ্চিৎ তা'র যোগাযোগও দেখতে পাচ্ছি—হ্যাঁ, তাইতো বটে—(হস্ত-বিচারে মন দিল)

সত্য। দেখুন না চেষ্টা ক'রে—ঐ যোগটাকে কোনো রকমে যদি বিরোধ ক'রে দেওয়া যায়।

সর্ব। ভ...পদমে মঙ্গল যার বন্ধ গন্ত শনি—

কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী।

এই হোলো জ্যোতিষ-বচন...আপনারও দেখ চি অনেকটা এই অবস্থা—অন্তএব গ্রহ-শক্তি কবা আশু প্রয়োজন।

সত্য। যে দুগ্রহ এখন প্রত্যক্ষমার্গে উদয়ের পথে—তাঁর অস্তের ব্যবস্থা আগে না ক'রে, আপনার শূচমার্গে ঘরে-বেড়ানো গ্রহের শাস্তি করবার সময় কোথায় ? মনে রাখবেন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা...সহজে যে-টা হয়—গণনা ক'রে তাই করুন না কেন।

সর্ব। দেখি চেষ্টা ক'রে...তবে গ্রহ যদি হয় বন্ধ—তা'র চক্রকল সাময়িক একটু শক্ত—

সত্য। আপাততঃ দিন কয়েকের ভগ্নে বাঁকাকে একটু সোজা রাখা—বার'না—যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্য-টেবিলে রাখি ? এখন কিছু মানসিক ক'রে রাখা বাক্—তারপরে না হয় মূল্য ধ'রে দেওয়া যাবে।

সর্ব। দেখুন! সর্বাধিকারী ম'শায়—যে যোগাযোগ বিষয়

গ্রহের দ্বারা সম্ভাবিত—সে-স্থলে মায়ামুগের হস্তক্ষেপ করা ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার। কারণ, জ্যোতিষ-বচনেই আছে—

সাত শূচ বহুতর পাণ।

এহার এডান্ নাহিরে বাপ।...

সত্য। বচন-টচন রেখে দিয়ে এখন কাজের কাজটা দেখুন। আপনাদের গণনাটা একটু হুইয়ে-বৈকিয়ে আমার স্তবধেটা যাতে হয়, তাই করতে হবে।

সর্ব। ভাগ্য কি কারো মন রেখে চলে—ম'শায় ! শাস্ত্রই বলছেন—'সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রাকৌ যত্র সাক্ষিণৌ'...বুলেন কথাটা। তাই আমার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রমতেই আপনার ভাগ্য-গণনা করবো, তা' ভালোই হোক আর মন্দই হোক—উপলব্ধি করছেন কথাটা ? জ্যোতিষে ফাঁকি-জুকি নেই—

সত্য। আঃ কি যে বলেন আপনি ? অতো বোঝ'বাব অবসব আমার নেই, আমার শিবে সংক্রান্তি। তবে ম'শায়—আইনে ফাঁকি বয়েচে, আর জ্যোতিষে ফাঁকি নেই ? এ বললেই আমি স্তনবো। একটা গ্রহের যদি কৃষ্টি থাকে—অল্প গ্রহের কৃষ্টি থাকতেও হো পানে...তখন কটান হ'য়ে গেল—। দেখুন দেখুন, কটান-মহল ছাড়ুন...আপনার বক্তা বাড়িয়ে দোবো। কিন্তু আমি চাই এমন ফল—

সর্ব। ফল তো নানা প্রকারের...কোনটা বুঝ'বো—সুফল না কুফল বা পুণ্যফল না কৰ্মফল, মহাফল না প্রতীফল, কৃষ্টিফল না দৃষ্টিফল, কোনটার আশা রাখেন ?

সত্য। সমস্ত পণ্ডিতই কি কড়ে গন্তমূৰ্খ ? ম'শায়, একশো-বার বলছি, আমার সুফল গণে' বা'ব করুন—

সর্ব। তবে ত্রিপাণ-চক্রযন্ত্রে বচনটা স্তনে নিন...

'রবি বৎসর শূচ ফল—

শিরঃশূল গারে জর।

শনির বৎসর শূচভোগ—

বন্ধু-বিচ্ছেদ করার রোগ।

শিলার স্তম্ভ খ'সে পড়ে—

যত অর্জু সব হরে'...

সত্য। আপনার মাথা আর মুড়। আপনি সোজা রাস্তায় আসবেন কি-না—জানতে চাই নইলে আপনার বক্তা একেবারে বন্ধ ক'রে দোবো।

সর্ব। আজ্ঞে—হ্যাঁ বাক্ত হবেন না...দেখতে দিন ধীরে-ধীরে—গণনার ভুল মারাত্মক। আজ্ঞা—আমি কেবল গণনা করছি।...

"সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।

নয়ে একে তাতে হাত।

কি কবে' চটে চটে।

কাখানাশ হয়ে আটে'।

সত্য। কাখানাশ—কাখানাশ ! কাখানাশ বা'তে না হয়—সেইটেই গ্রহ-বিচার ক'রে আপনাকে দ্বিঃ করতেই হবে...নইলে আপনার অবস্থা বা' হবে—বুঝতেই পারেন !

সর্ব। এই দেখুন—গ্রহই আপনাকে অথবা কুপিত ক'রে
তুলছেন... একটু ধৈর্য ধরুন, এবার সমস্ত ঠিক ক'রে দিচ্ছি।
উত্তম—একটা প্রাতঃকালীন ফুলের নাম বলুন তো—

সত্য। মুচুকুন্দ—

সর্ব। এবার একটা মধ্যাহ্ন-কালীন ফুলের নাম—

সত্য। ফলসা—

সর্ব। তারপর, সায়ংকালীন একটি নদীর নাম—

সত্য। এর মানে কি ?

সর্ব। আহা, জীবন-সন্ধ্যায় কোন্ নদী মানুষ পার হয়—

সত্য। বৈতরণী—

সর্ব। এরপর, রাত্রিকালের কোনো দেবতার নাম উচ্চারণ
করুন।

সত্য। রাত্রিকালের দেবতা ?—আচ্ছা, পকানন্দ—

সর্ব। এখন ফলাফল বিচার করছি, দেখে নিন—ফুল, ফল,
নদী আর দেবতার বর্গ, বর্গ, স্বর গুণ ক'রে যে পিণ্ড হবে—

সত্য। আপনার শ্রদ্ধে তাই দেওয়া হবে। সোজা কথায়
বলুন, কোন গ্রহ এখন প্রবল—

সর্ব। দাড়ান তব—অঙ্ক করি, খড়ি পাতি—(রেখা প্রভৃতি
অঙ্কন ও গণনার অভিনয়)

... ধরা পড়েছে—হু-ত—লুকিয়ে ব'সেছিল, আপনার কর্কটে
মর্কট, অর্থাৎ কিনা—আপনার ভাগ্য-স্থানে বর্তমানে দশম
গ্রহ—

সত্য। দশম গ্রহ আবার কি ?

সর্ব। এ তো, তবে আর অন্তর্দৃষ্টি ক'কে বলে—দশম-
গ্রহের বৃত্তান্ত কল্পাপুরাণে ধনখণ্ডে লেখা আছে :—

সদা বক্রঃ সদা ভুরঃ সর্বদা ধনহারকঃ।

বহ্মারশিঃ সদা ভুক্তে ভামাতা দশমগ্রহঃ।

জামাতালাভের যে বিশেষ বাগাখোঁগ দেখ'চি ! তবে ধনক্ষয়ের
যোগ রয়েছে।

সত্য। তা'তে আমি ডবাই না... ক্ষয় যা' হবে—তা'ব
চতুর্গুণ আয় কর্তেও আমাব বেশী সময় লাগ'বে না। কিন্তু
জামাতা-লাভ ! এক্ষেত্রে সে কেমন ক'রে সম্ভব ?

সর্ব। আজে, তা' বলতে পারি না, তবে গণনায় এই
ফলই পাচ্ছি—একেবারে নিভুল।

সত্য। কিন্তু কাল শেষ রাত্রিতে একটা কালো খেড়ে ইঁহর
স্বপ্ন দেখেছি—তা'র কি ফল, বলুন দেখি ?

সর্ব। আজে—ইঁহর সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন, ও খারাপ

কিছু নয়, তবে দশম গ্রহের দৃষ্টি প'ড়ে কালো হ'য়ে গেছে।
আচ্ছা—ইঁহরটা কি ধরা পড়লো—না পালালো ?

সত্য। পালালো—

সর্ব। তবেই তো খারাপ... হু—একটা গণেশ-বাহন কবচ
ক'রে দিচ্ছি—হাতে প'রে ফেলুন... মন্ত্রপুত্বে ক'রে দিচ্ছি—সব খণ্ডন
হ'য়ে বাবে...

[একটি বড় মাল্লি বাতির করিয়া কিঞ্চিৎ ভূর্জপত্র পুরিয়া
মুখ আঁটিয়া সত্যস্বরূপের হাতে পরাইয়া দিল]

—ওসু—আর ভয় নেই। তা' হ'লে—আমার দাঁকণাটা ?

সত্য। কত ? আচ্ছা যাক—এই নিন্ স'পাচ আনা—

সর্ব। আনা কেন, ওটা সিকের পুরিয়ে দিন্ না... সুফল তো
আমলকীর মতো মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন...

সত্য। আচ্ছা—এই নিন্ পুরোপুরি ধোল আনা।

সর্ব। (ট্যাঁকে গুঁজিয়া) ওভমস্ত—ওভমস্ত—চিন্তা নেই !

সত্য। তা' হ'লে আশ্বিন... এখন আমাদের একটা মিটিং
বসবে।

সর্ব। ভালো কথা—নিশ্চিত মনে মিটিং করুন... তবে
দেখুন—সর্বাধিকারী ম'শায়, কলপ্রাপ্তির পরে কিন্তু আমার বৃত্তি
সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

সত্য। সে হবে এখন—হবে এখন্।

[এক রকম তাহাকে তড়া দিয়াই পথ দেখাইয়া দিয়া—
দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।]

ক্ষণপরে স্থানীয় আদালতের বিচারক স্বামীশরণ সিদ্ধান্ত,
দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও জন-স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক গজানন
জয়তিলক চোরাবিয়া, শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক রাখালরাজ
চট্টরাজ, স্থানীয় ডাক্তার জুডনজীবন জানা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের
একে একে প্রবেশ। কিয়ৎক্ষণ পবে ব্যস্তভাবে সত্যস্বরূপ পুনঃ
প্রবেশ করিল।]

সত্যস্বরূপ। মুলেই এসেছেন ?—হ্যাঁ—ভট্টমহোদয়গণ,
আজকে আপনাদের সকলকে ডেকেছি—তা'র বিশেষ কারণ
আছে... জটিল সমস্যা।

স্বামীশরণ। সমস্যা ?

সত্য। হাঁ—সেই কথা আপনাদের জানানোই আমার
উদ্দেশ্য... অত্যন্ত অপ্রিয় খবর : সরকার পক্ষ থেকে এক পদস্থ
কর্মচারী আমাদের এখানে আসছেন—এই ষ্টেট-পরিদর্শন কর্তৃক !

স্বামী। পদস্থ কর্মচারী ?

গজানন। সোর্কারী—আঁ ?

গণকলা, বর্ষরকলা ও নব্যকলা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

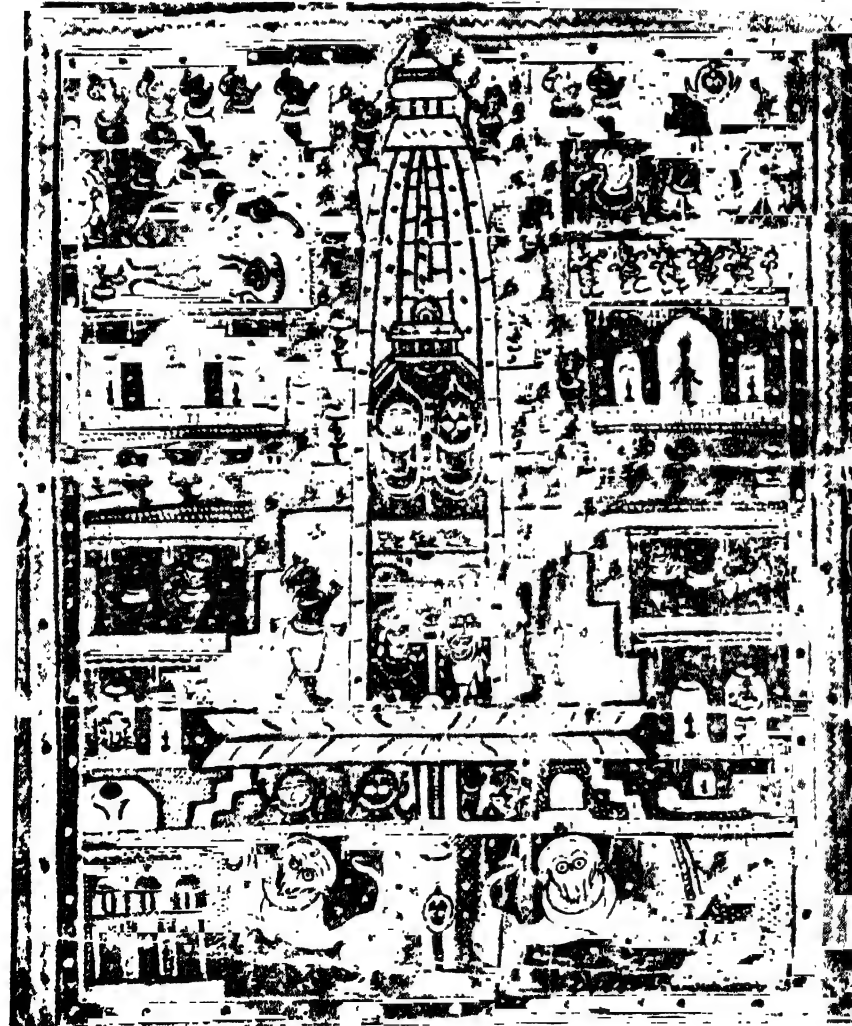
ইতিহাসে কলাকুহেলিও আঁচি। তার ক্রিট ধারণ করে যুগে যুগে সকলের মনোহরণের চেষ্টা করেছে। নাগরিক সভ্যতা সব সময় জটিল আলংকারিক শ্রীকে বহন করে অগ্রসর হয়েছে। উপাখ্যানে যেমন রাজ্য-রাণীর প্রসঙ্গ হয়েছে সব চেয়ে চমকপ্রদ, তেমনি চিত্রাখ্যানেও আলংকারিকদের জটিল রীতিনীতির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সৌন্দর্যধর্ম। এর ভিতর সরলতা, সামান্ততা বা সহজ কাকতা খুব কনই প্রসঙ্গ পেয়েছে।

অন্য চরিত্রের ইতিহাসে এসব সহজ কাকতার প্রভাব বিশেষে নিজের রাজপথ কেটে কোটা কোটা ফদের আনন্দ বর্জন করেছে। ইদানীং জনতার সৌন্দর্যগত বিচার এসব রচনার দিকে চোখ ফিরিয়েছে। শুধু গ্রাম্য কলা মাত্র নয়, বর্ষরকলাও সকলের মনোপুত হয়েছে এবং এদের নিয়ে রূপকলার মূল ভিত্তি বিজ্ঞানে আধুনিক যুগকে মসৃণ করেছে।

বিখ্যাত আলগাচক Roger Fry মহাশয় Bushmen-দের রচনাকে 'Surprising' বলেছেন। তিনি প্রাচীন আমেরিকার Maya ও পেরুর কলাসমূহকে বন্দনা করেছেন এবং নিখোঁ কলার অশিক্ষিত গটুকে উচ্চ-

স্থান দিয়েছেন। ইউরোপ এক সময় কলাকে একটা অনুকরণের চাতুরী মনে করতো—ইদানীং ইউরোপে সে নীতি বর্জিত হয়েছে। গ্রীক ভাস্কর্যের আশ্রিত মধুর লাগিতা ইদানীং মোটেই চিত্তাকর্ষক করে না। Barlach-এর রচনা বা Epstein-এর অদ্ভুত রসের কণ্ঠে জয়মাল্য বিতে ইউরোপ কুণ্ঠিত নয়।

এ হ'ল একটা অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা। এদেশে অজ্ঞতা বা বাঘজাহার রচনাই একমাত্র সৃষ্টি নয়। ভারতের সর্বত্র পটের ও পটুরার আকার এখনও জাগ্রত। পুরী, কাণীঘাট, গগা, কাণী প্রভৃতি সর্বত্র মূর্তি তৈরী হচ্ছে ও চিত্র রচিত হচ্ছে পটের ওপরে। এ সময়ের সহজ ভঙ্গী বিস্ময়কর। এ-সব শিল্পীর রেখাঙ্কন অতি অপূর্ব। কাণীঘাটের পটে একটু রেখা; অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক হিল্লোলের দ্বারা সহসা দেব-দানী, মনুষ্য, পশু রচিত হয়ে যায়। রেখার উপর এরূপ অধিকার খুব কন দেশের শিল্পীরাই দাবী করতে পারে। এসব শিল্পী যাহা বিনা আয়সে করেছেন, অজ্ঞতা তা' বহু সাধনায় হ'তে পারে নি।



উড়িষ্যার চিত্রকলা

পটশিল্পের দ্বারা বহু প্রাচীন—এ দ্বারার উদ্দেশ্য সমগ্র জাতির সহজ হৃদয়বৃত্তিকে সরল মানবিকতার ভিতর দিয়ে উদ্ভূত করা। গ্রাম্য জীবনের সহজ প্রেরণা জামল বনানী, মুক্ত প্রান্তর ও প্রবাসন-ভটিনীর মুখা রেখা-জালেই আবদ্ধ হবে—ই সবের ভিতরকার জটিল রেখাজাল, বিচিত্র বর্ণের গমক বা গভীরতার সীমানা স্তর বাচাই করতে কেউ উৎসাহ-হয় না। মার চোখে যেমন বিকলাঙ্গ খেলো ও খন্দর, তেমনি গ্রাম্য জীবনের চোখে অসংলগ্ন মাটির পুতুল, দোলার তৈরী পাবী, চিনির পলনা, প্রভৃতি যে-সৌন্দর্য্য পুঙ্ক আছে তা অতিদূর সৃষ্টির জমকাল অসম্ভবে পাওয়া যাবে না। বস্তুতঃ বেশির ভাগই তরল আলংকারিক পারিপাট্যে ভূষিত হয়—তা ততই দুর্বল ও অপ্রাণের হয়ে পড়ে। এজন্য কতিন রাগরাগিনীতে আবদ্ধ নাগরিকের নৃত্য-বিলাস অপেক্ষা পল্লীর সাঁওতাল নৃত্যের উদ্যম প্রাণবন্ত। তাকে সভ্যতার গলিত তিক্ততা, অবসর ক্লান্তি এবং সাধ্য রক্তহীনতা নেই। এজন্য ইদানীং ইউরোপ নিখোঁ সভ্যত হ'তে নৃত্য হ'তে গ্রহণ করেছে, বর্ষর নৃত্য হ'তে হুগত উপকরণ সংগ্রহ করেছে এবং এমন সব রচনার মতো গেছে যাকে ইতর লোক একান্ত হেণোমুখি মনে করতে পারে।

বস্তুতঃ গ্রাম্য জীবনের অকুরন্ত উদ্যমতা

এক উল্লেখযোগ্য আচরণ করতে হ'লে এই আর্থিক কলার স্রাব্যপার হ'তে হবে। একতাই বর্তমান সভ্যতা হয়ে পড়েছে, "anti-intellectual"; বুদ্ধিবাহকে অর্জন করে রক্তজ সংস্কারকে আশ্রয় আশ্রয় করা হচ্ছে অগতির চিত্তবিনোদনে। এই সংস্কারের দান এখনও শেষ হয় নি। ইউরোপের আধুনিক অবস্থা কলা এখনও বহিঃস্থ compositionকে বড় ব্যাপার মনে করে না। সব কিছুই ভিতর থেকে দেখতে—অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে জগত ব্যাকুল। একজন ইউরোপের expressionist কলা সংস্কারের বহিঃস্থ দিক থেকে চোখে এক মৃতদেহ হিরন্মতী কলা রচনা করেছে। ম্যাটিসে (Matisse) বা বা হুন্স হারেলিস—ডালি (Dali) Mare, Barlach ও Kleeতে পর্যায়সিত হ'য়েছে। জড় বস্তুর বন্ধন ভেদ করে, তাকে সত্যদেহের মত টুকুরে টুকুরে ভিতরকার সত্য প্রকাশিত ইউরোপ উৎসাহিত—তাই গ্যাবেল ও কনেটবল গেছে জটিলের দ্বারা। ম্যাটি হুন্সে রক্তের সঞ্চার হচ্ছে। একজন কোন শিল্পী বলেন : "We are breaking up the chaste ever deceptive phenomena of nature...We look through the matter and we shall be able to cleave asunder her oscillating mass as if it were air."

সংক্ষেপে বুঝা বস্তু বা রস উদ্ঘাটন করা অনেক সময় বিরূপ রূপ উদ্ঘাটনের দ্বারা সম্ভব হয়। আসল কথা হচ্ছে—শিল্পকলা প্রকৃতি করবার ব্যাপার



নেপালের গ্রাম্যকলা

এই ভিতরকার সত্য গ্রাম্যজীবন বহুকাল পূর্বে দেখেছে, একজন Folk art হয়েছে চিরন্তন, তা আর out of date হয় না—চিরকালই চিত্তরঞ্জন করে এসেছে। এসব আর্টের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ করতে যাওয়া বুঝা। মাতৃদেহের কল্পনাও শুধু এই ভাবটাই ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর সব কিছু হবে তুচ্ছ; এর ভিতর হুবহু অনুপ্রাণের কিছু নেই। ইউরোপ নিগ্রো আর্টের plasticity দেখে মুগ্ধ হয়েছে, গ্রাক আর্টে তা পাওয়া যাবেনা। অতি

হচ্ছে তাই এ "idea", কোন বস্তু নয়। কাগজে উদ্ভিটার অর্ধকৃত চিত্রে বা পটের অশিক্ষিত রেখামালে বেগবান হৃদয়ের উদ্বেলিত রসপ্রসঙ্গ সহজেই প্রকট হয়—তার উপর আর কোন আবরণ থাকেনা। শিল্পের আদৌচ্ছারিত বাক্যনিচয়ের মাধ্যমে যেন অতুলনীয় তেমন রসসমাবেশের এই অভিনব অসংলগ্নতা ভাবকে আরও ঘনীভূত করে, কারণ তাতে পাণ্ডিত্যের কোন আবর্জনাও থাকেনা। প্রশংসার নিমিত্ত চান ওস্তাদদের মুগ্ধ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রাম্য চাক-চালের তুর্ধানাদ তার চেয়েও সময় বিশেষে উপাদেয় হয়। পারস্পরিক গালিচার বা কাশ্মিরী শালে আমরা অভিজ্ঞ হই—কিন্তু দেশী কাঁথা-শিল্পের কারুতার ভিতর পাখী, জন্তু, প্রভৃতির নকশা অনেক সময় অধিক জ্ঞান মনে হয়। বিষ্ণুপুর-মন্দিরে খোদিত relief এর গ্রাম্য শিল্পী এমন অপূর্ণ যে তার কাছে বরভূষণের অতিরিক্ত কালোরাতি হার মানেন। মোট কথা বহিঃস্থ দিক হতে আগ্রহের হয়ে যে শিল্পচর্চনা হয়—তা গায় বিপরীত পথে—অন্তরস্থ দিক হতে যা হগে তার পরিমাপ উদ্ভূত হ'তে বাধ্য। তখন বৈজ্ঞানিক কবির ভাবের এক দণ্ডও 'লাখ লাখ যুগের' মহিমায় অভিযুক্ত হয়।

উদ্ভিটার পটে আমরা যেখান দেখতে পাই, তা' চলে এসেছে বহু শতাব্দী। তাতে রেখামালের সৌকর্য্য অসামান্য—কিন্তু শিল্পী বহিঃস্থ বৈজ্ঞানিক পরিমাপকে ইচ্ছা করেই যেন বাস্তব করেছে। অথচ স্বার্থ দৌলখ্যপ্রস্টার সমগ্র নৈপুণ্য এসব শিল্পীর আছে। এর ভিতরকার schematised ঘোড়া ও সিংহ রূপরসে ভংগুর। যেন এক অশৌকিক সৃষ্টি-প্রেরণার দর্শন পাবেন এটা রূপাংগ্য বুঝার হয়েছে।

নেপালের একটি পটে নারীগন্ধের উপর শ্রীকৃষ্ণকে আরোহণ করে উড়ে যেতে দেখা যায়। একরূপ এমনি ভুলি, কটিন ও গভীর সৃষ্টিপ্রসঙ্গ হঠাৎ যেন ভিত সঠক, মধুর ও জীবন্ত হয়েছে শিল্পীর মারা-তুলকা স্পর্শে। এতে অজস্র কটিন রেখাবর্ত নেই, বর্ণের হিজলিত ধরক নেই—অথচ বা আছে তা অপূর্ণ ও অস্তাব্যনীর। শিল্পী একমুহুর্তে সমগ্র চিত্রপটকে জীবন-রসে আম্লত করে জয়মুক্ত শীর্ষে পরেছে।

এখানে শুধু পটশিল্প বা বর্করশিল্প মাত্র নয়, সভ্যতানন্দিত শিল্প একজন ইচ্ছা করেই অদ্রুত ও অশ্রুত হ'তে আগ্রহের হয়েছে। এদের কোথাও বা sur-real বা অতিপ্রাকৃত বলা হচ্ছে। যা কিছু অসম্ভব, অসংলগ্ন ও অপ্রত্যাশিত তাই ভিতরেই শিল্পের বর্ণমুখ চালায়ে মহিমাতে পরিণত করার



কালীঘাটের পট

চোঁটা চলছে। এগুণে নব্য শিল্পী কতটা অংশের হাতে পারে তা ভাববার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভেবে চিন্তে কৌশল করে' যে রম্যকলা রচিত হবে তাতে গ্রাম্যকলার ঐশ্বর্য ও অক্ষুরস্ত রসকন্ড খাকা সম্ভব নয়। এজন্য আজ পটশিল্পের প্রশস্তির ভিতর জীবনের যে উপাদান লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক চিত্রকলার উদ্দেশ্যে সব সময় তা পাওয়া দুষ্কর হয়।

ইউরোপীয় শিল্পে রুশিয়ার গণকলাকে এজন্যই এক কঠিন সমস্যায় পড়তে



বাবলাকের এঞ্জেল (নিখোঁকলাল অনুসরণ)

হয়েছে। একদিকে গ্রাম্যকলার অক্ষুরস্ত ও সনাতন আহ্বান যেমন রুশীয় চিত্রকে ভুলসৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ করেছে অর্থাৎ রুশিয়ার কর্তৃক নীর্ঘ-স্থাপিত ও নীলমত বাস্তবিক সত্যতাও তাকে নিয়ে গেছে কুটিল রস-মরীচিকার পিচ্ছিল প্রাচুর্যে। কল্পনের লোভে এমনই করে Slav-চিত্র দৃষ্টের পক্ষে পড়েছে। অথচ জনগণের বিস্তারিত কলাবাসরে গণশিল্পের কাকিল ও কৌতুক অক্ষুরস্ত কলহাত্তের ভিতর যুগে যুগে নীলমত হচ্ছে। কাজেই-এ-যুগের শিল্পবিত্তকে আসতে হয়েছে নূতন সাধনার পথে। কিন্তু অহরহ এই শিল্পদর্শ-পরিবর্তন যে ইউরোপের প্রিয়-তা কি কখনও মরশিল্প, পেরুগার শিল্প বা নিখোঁক শিল্প প্রশস্তিতে চরম শাস্তি পাবে! এ-দেশের রসতাত্ত্বিকদের ভিতর নারায়ণই বলেছেন যে অক্ষুরস্ত রসই একমাত্র রস। যা কিছু নূতন, অপ্রত্যাশিত ও strange, তাকে নিয়ে ইউরোপ হয়ে যায় আকর্ষণীয়। ইদানীং বিলাপ রূপচর্চা এসঙ্গে ইউরোপ নিজের গ্রীক-রোমক heritage পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। তাতে করে অন্ততঃ গ্রাম্যকলা ও গণকলা ক্ষণকালের জন্য সমগ্র বিধে বন্দিত হচ্ছে।

কিন্তু গ্রাম্যজীবন যা চেয়েছে তা' বাহ্যিকের বহুমুখী বিশালতা নয়। সামান্য পরিসরে অসামান্য আনন্দের যে উপকরণ সামান্য খেলনা, খুঁতখুঁতি, কাঠের আসবাব, বেতের তৈরী পাখার রচনা অর্পণ করেছে তার ভিতরকার চন্দ-সুখমা বাহিরের কোন করতালির উপর কখনও নির্ভর করে নি। কাঁখে লাঙ্গল খেলে গান গেয়ে কৃষক চলে, মেঠো রাস্তায় বঙ্কম ছায়াপথে যুগযুগান্তের বাস্তবত। যে স্বপ্নাবেশ রচনা করে, বটগাছের ডায়া, দাঁঘির মিল্কতা। রক্ত জীবনের শূন্যতার উপর যে যবনিকা ফেলে—তারে আহ্বান সভ্যতার সুহৃৎ আয়োজনে উপভোগ্য নয়। নাগরিক সভ্যতা কখনও আত্মদান করে অল্প জীবনযাত্রাকে বরণ করবে না—কাজেই আজ যা অভিনন্দন গ্রাম্য কলার জুড়ে, কাল তা' অন্তর্মিত হবে। কিন্তু তবুও মনে রাখতে হবে কোটি কোটি মানব জলে হ'ল যে সৌন্দর্য্যাত্মকে বরণ করে' জীবনের অক্ষুরস্ত রসপিপাসা মেটাচ্ছে—তা সামান্য নয়। তা'তে ভূমার সম্পর্ক আছে—তা মানবিকতার উৎকর্ষণ উজ্জ্বল ও মহান। নিখোঁক আঁটের করতালির সহিত এই বিগটকের ভয়কারকে এক পাংস্তের করলে হুশোভন হবে না।

মহানাদের প্রতি

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রকৃত্ত্ববিদ

মহাশঙ্খের নিনাদ শুনি, দেবতা
আসিলেন স্বর্গ হ'তে,
বশিষ্ঠ হেথায় গঙ্গা আনিলেন
ষাটশ যজ্ঞের কুণ্ড কেটে।
রাজরাজেশ্বর আসিয়া তেথায়
জ্বালিলেন তাঁদের রাজধানী,
কত বীর ষোদ্ধা চলে যেত
বীর গর্জনে যেদিনী।
চন্দ্রকেতু করিলেন দান
মণিমুক্তা বিস্তৃত

পাণ্ডুরাজ ত্যাজিলেন প্রাণ
যবন কর্তৃক হ'য়ে পরাভূত।
আজিও বিজয়মান মঠমন্দির
যোগীর জীবন্ত সমাধি,
গুপ্তবাজেব ভগ্ন প্রাসাদ
অতীতের বহিঃস্বপ্ন স্মৃতি।
পাল রাজেশ্বর মূর্তিগুলি
প্রকাশিছে শিল্পকলা,
ঐতিহাসিকরূপে আসিলাম হেথা,
স্থাপন করিতে প্রত্নশালা।

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চার

এর উদ্দেশ্য প্রথমেই আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে ছাড়া প্রথমে উত্তর দানের প্রয়োজন :— (১) উজ্জ্বল পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে কী সকল ব্যাপার ঘটতে যার ফলে পদার্থটা রশ্মি বিকিরণ করে? (২) কী প্রণালীতে ঐ সকল ব্যাপার আলোক-রশ্মিরূপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে? প্রথম প্রশ্নটা হলো আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে, এবং দ্বিতীয়টা ওর বিস্তারলাভের প্রণালী সম্বন্ধে। এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আলো সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কথাই প্রথমে আমরা বলবো।

আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ যোগ্য প্রথম মতবাদ প্রচার করেন নিউটন। একে বলা যায় আলোর কণাবাদ (Corpuscular Theory of Light)। এই মতবাদের মূল বক্তব্য এই যে, আলো একপ্রকার কণাজাতীয় পদার্থ। বর্ণালি অত্যন্ত দৃশ্য ও ভারহীন। এক এক রঙের আলোর পক্ষে এক এক রকমের কণা। অসংখ্য রঙের আলো, হুতরাং আলো-কণাগুলির রকম-ভেদও অসংখ্য। এতোক উজ্জ্বল পদার্থ থেকে এত খুদে কণাগুলি চিটে গুলার মত, কিন্তু ওদের তুলনায় বহুগুণ বেগে চতুর্দিকে ছুটে বেগিয়ে আসতে এবং আমাদের চক্ষুরিম্নয়ে আঘাত করে ঐ পদার্থটা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মাচ্ছে। আলো-কণাগুলি ভারহীন, হুতরাং ওদের বর্ণের উজ্জ্বল পদার্থটার ওজনের ভ্রাস হয় না। শূন্যের ভিতর সকল রঙের সকল আলো-কণাই চোটে সোজা পথে ও একই বেগে, তাই আলোক-রশ্মির পথ সরল। আলো-কণাগুলি যখন দর্পণের ওপর আঘাত করে তখন প্রতিফলক গোলাকের মত ভরা দর্পণের পিঠে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এই ব্যাপারকে বলা যায় আলোর প্রতিফলন (Reflection)। জল, কাঁচ বা অপর কোন বস্তু পদার্থের ভিতর আলোক-রশ্মি ঢুকলে এই কণাগুলির বেগ বদলে যায়, ফলে ওদের গতির দিক ঘুরে গিয়ে আলোক-রশ্মি নূন পথে চলতে থাকে। এই ব্যাপারকে বলে আলোকের প্রতি-সং (Refraction); রশ্মিগুলি যদি নানা রঙের (বা নানাজাতীয়) কণার মিশ্র আলো হয়, তবে জল বা কাঁচ ঢুকতে গিয়ে ওদের বেগ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বদলে যায়, হুতরাং ওদের প্রতিসরণও ঘটে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে। ফলে গঠিত রঙের রশ্মিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারকেই আমরা পৃথক পৃথক আলোর বিচ্ছিন্ন। এইরূপে কণাবাদের সাহায্যে আলোর সরল পথে গমন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছিন্ন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সহজ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হলো।

কিন্তু আলোর চালচলন সম্পর্কে আগে কতকগুলি ব্যাপার ক্রমে নজরে পড়তে লাগলো যার ব্যাখ্যান কণাবাদের সাহায্যে সম্ভব বা সহজ হলো না। জলের পিঠে বা অপর কোন বস্তু পদার্থের ওপর আলো পড়লে খানিকটা আলো ওর পিঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং খানিকটা ওর ভেতরে ঢুকে যায়। এই প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ব্যাপার একসঙ্গেই ঘটে। এ হয় কি করে? একটা আলোকণা হয় পিঠ থেকে ফিরে আসবে নয় ভেতরে ঢুকে যাবে। হুঁপথে পা দেয় কি করে? কণাবাদ থেকে এর সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্তর্পক্ষে আলোর রশ্মিকে কণার সমষ্টি মনে না করে তরঙ্গজাতীয় পদার্থরূপে কল্পনা করলে এরূপ বিভ্রান্তি পড়তে হয় না। দ্বিতীয় আপত্তি উপস্থিত হলো আলোর নিবর্তন (Interference) ব্যাপার নিয়ে। দেখা যায়, ছুঁদিক থেকে আলো আসতে থাকলে আলোতে আলোতে মিলে হানবিশেষে যেন ছোরাগো আলো এবং হানবিশেষে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়; কণাবাদ মেনে নিলে এর ব্যাখ্যা দিতে হয় এই বলে যে, আলো-কণার আলো-কণার মিলে কণাহীন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এরূপ কল্পনা অত্যন্ত কষ্টকর।

অন্তর্পক্ষে, আলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি স্বীকার করলে এই ব্যাপারের একটা সমীচীন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা অনেকেরই লক্ষ্য করে থাকি যে, জল কলসী দোলাতে থাকলে যে সকল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তার হতে প্রতিফলিত হয়ে যে সকল তরঙ্গ ফিরে আসে, এই উত্তর দলের মিলনের ফলে হানবিশেষে প্রবল তরঙ্গের এবং কোন কোন স্থলে নিস্তরঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খুব উঁচু ঢেউ দেখা যায়, যেখানে উত্তর ত্রৈণীর তরঙ্গের মাথায় মাথায় মিলন ঘটে। আর যেখানে পেটে মাথায় মিলন ঘটে সেখানে জলের পিঠটা থেকে সমতল—তরঙ্গের চিত্রমাত্র দেখা যায় না। হুতরাং উক্ত নিবর্তন ব্যাপার থেকে এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, আলোক-রশ্মিগুলি কণা ধর্মী নয়, তরঙ্গধর্মী।

আর একটা ব্যাপার আলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি থেকে আরো বিশেষভাবে সমর্থন করলো! একে বলা যায় আলোর ব্যাবর্তন (Diffraction of Light)। সহজ দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাঠি, আলো সোজা পথে চলে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ এই নিত্য-প্রত্যক্ষ ব্যাপারের উল্লেখ করি যে, আলোর রশ্মি পথে যদি একটা অস্বচ্ছ পদার্থ রাখা যায়, তবে তার পেছনে একটা স্পষ্ট ছায়া পড়ে। কণাবাদে ছায়ার ব্যাখ্যা দান অতি সহজ। আলো-কণা-গুলি চলে সোজা পথে। ফলে যে কণাগুলি অস্বচ্ছ পদার্থটার ঠিক সাম্না-সাম্ন এসে পড়ে, তা'রা বাধা পেয়ে ওপারে পৌঁছবার সুযোগ পায় না। হুতরাং এ বোঝা যেটেই কঠিন নয় যে, অস্বচ্ছ পদার্থের পেছনটার অন্ধকার থাকবে এবং ওর একটা স্পষ্ট ছায়া পড়বে। কিন্তু আলোক-রশ্মি যদি তরঙ্গী-ধর্মী হয়, তবে ঠিক পেছনটার ছায়া নাও পড়তে পারে। কারণ তরঙ্গগুলি অস্বচ্ছ পদার্থটার চারপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে ওর পেছনে মিলিত হতে পারে—যেমন তরঙ্গসমূহ নদীর মধ্যে কেউ দাঁড়ালে ঢেউগুলি তার পাশ-কাটিয়ে পেছনে গিয়ে মিলিত হয়। এরূপ ঘটে যদি—যেমন এক্ষেত্রে—ঢেউগুলি দৈর্ঘ্যের তুলনায় অস্বচ্ছ পদার্থটার প্রসার খুব বড় না হয়। অন্তর্পক্ষে উক্ত মনুষ্য-দেহ যদি পাণ্ডু পর্বতের মত প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, তবে তার ঠিক পেছনে ঢেউগুলি মিলিত হবার সুযোগ পাবে না। নদীর ভিতর পাহাড় থাকলে দেখা যায় যে, পাহাড়ের পেছনে জলতরঙ্গগুলির একটা ছায়া পড়ে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আলো যদি তরঙ্গধর্মী হয় এবং আলোক-রশ্মির পথে যদি কোন অস্বচ্ছ পদার্থ অবস্থান করে, তবে ওর ঠিক পেছনে স্পষ্ট ছায়া পড়বে না। ছায়া পড়বে যদি অস্বচ্ছ পদার্থটা আলোর ঢেউগুলির তুলনায় প্রকাণ্ড হয়। এখন আলো সম্বন্ধে প্রসারের কল এই যে, আলোক-রশ্মির পথে যদি ফুটবলের মত একটা বড় গোলাকার পদার্থ রাখা যায়, তবেই পেছনের দেয়ালে একটা স্পষ্ট গোলাকার ছায়া পাওয়া যায়, কিন্তু যদি বালুকা'র মত কোন ক্ষুদ্র পদার্থ রাখা যায় তবে দেয়ালের ওপর একটা গোলা ছায়ার বদলে মণ্ডলাকারে সজ্জিত আলো ও ছায়ার পরস্পর সজ্জা দেখতে পাওয়া যায়, যা' কতকটা বিড়ালের চক্ষুর মত। এই ব্যাপারকে বলা যায় আলোর ব্যাবর্তন (Diffraction) এবং আলো ছায়ার এইরূপ সাজের ঘটাকে বলা যায় ব্যাবর্তন প্যাটার্ন (Diffraction Pattern)। আবার আলোক-রশ্মি যদি খুব ক্ষুদ্র চিত্রের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে, তা'হলেও ঠিক অনুরূপ প্যাটার্নেরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আলোককে তরঙ্গ-ধর্মী বলে স্বীকার করলে এবং তরঙ্গগুলিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিন্নরূপে কল্পনা করলে এই সকল ব্যাপার অনাগসেই বুঝতে পারা যায়; কারণ ব্যাবর্তন-প্যাটার্নের উজ্জ্বল মণ্ডলগুলি দেখিয়ে দিয়ে তখন আমরা বলতে পারি যে, এই সকল স্থলে, বিভিন্ন পথের ঢেউগুলির মাথায় মাথায় মিলন ঘটেছে, এবং অন্ধকার মণ্ডলগুলির ভেতর ওরা মিলেছে মাথায়

ও পেটে। অন্তর্গত কণাবাদ থেকে এর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্যবস্থান-পাঠ্য হলো তরঙ্গ-বাদের একটা বড় রকমের সমর্থক।

এই সকল ব্যাপার থেকে বৈজ্ঞানিকগণ আলোককে তরঙ্গ-ধর্মী পদার্থ রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। আরো বাধ্য হলেন এই দেখে যে, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি, যা'রা কণাবাদের সাহায্যে সহজে ব্যাখ্যা হতে আসছিল তাদেরও তরঙ্গবাদের সাহায্যে, অত সহজে না হোক, সঙ্গত ব্যাখ্যা দান সম্ভব। ফলে হাইগেন প্রবর্তিত আলোর তরঙ্গবাদ বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে 'ইথর' নামক এক ক্রমতন্ত্রহীন বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা বৈজ্ঞানিকগণের মনোভাজা অধিকার করে বসলো। কারণ, আমাদের কল্পনা করতে হবে, প্রত্যেক উজ্জ্বল পদার্থ হতে, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা হতে আলোর ডেউগুলি ছুটে এসে আমাদের চোখে আঘাত কচ্ছে বলেই আমরা ঐ সকল পদার্থ দেখতে পাই, এবং আলো বহন ডেউ তুলেই আসতে, তখন তরঙ্গারিত হতে পারে এইরূপ একটা পদার্থও অবশ্যই রয়েছে এবং তা' অন্ততঃ নক্ষত্র জগৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই পদার্থ নিশ্চয়ই জল নয়, বায়ু নয় কিংবা আরো প্রত্যেক করতে পারে এরূপ কোন কিছুই নয়; তবু তা' অস্তিত্ব। এইরূপে সমগ্র জগৎ জুড়ে অদৃশ্য সৃষ্টিতে দেখা দিল অদ্বিতীয় এক ইথর, যার সন্ধে জনসাধারণের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজনই কোনদিন অনুভূত হয়নি, কিন্তু যা' তখনকার বৈজ্ঞানিকগণের বিচারবুদ্ধির কাছে উপস্থিত হলো এত চোরা টোঁটোরের মতঃ বাস্তব সম্ভার দাবি নিয়ে।

ইথর এলো, তরঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু তা'র ফলে আলোর প্রকৃতির সবটা পরিচয় পাওয়া গেলনা। তরঙ্গবাদ এই কথাই শুধু জানতে পারলো যে, ইথরের ভিতর ডেউ তুলে আলোক-রশ্মিগুলি ভীষণে চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এর থেকে আলোর জন্মসূত্র সন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারা গেল না। তবু এইটুকু বোঝা গেল যে, ইথরসাগরে অবস্থিত হয়ে প্রত্যেক উজ্জ্বল পদার্থের অণু-পরমাণুগুলি অথবা ওদের ভিতরকার আরো সূক্ষ্মতর কণাগুলি, জলের ভিতর কলসীর দোলার মত এমন সকল আন্দোলন-গতি—কম্পন বা ঘূর্ণন-গতি—সম্পন্ন করছে যা'র ফলে ইথর-সমুদ্রে আলোর ডেউ উঠতে পারে। সুতরাং গ্রন্থ হলো, সূর্যের পরমাণু যে সকল আলোক-তরঙ্গ বিকিরণ করে, তা' তার কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নর্তনের ফল? গোটা সূর্যদেহ যে কলসীর দোলার মত দুলছে না, তা প্রত্যেকের বিবর; আবার গোটা পরমাণুর দোলন কল্পনা করলেও বর্ণালীর বর্ণবিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অনুমান করতে হয় পরমাণুর ভেতরকার কণাগুলিরই কোন না কোন ধরণের নর্তনের ফলে ইথরসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর ডেউ উঠে থাকে।

যেই দ্রুত, তার দোলন-সংখ্যার সঙ্গে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের একটা সহজ সখ্য অনুরাসেই আমরা কল্পনা করতে পারি। জলের ভিতর কলসীর দোলাই ধরা যাক্। কলসীর প্রতি দোলনে জলের ভিতর একটা ক'রে ঢেউ ওঠে। তার অর্ধেকটা মাথা, অর্ধেকটা পেট। এইরূপ পেট-মাথা-ওগালা প্রত্যেক তরঙ্গের এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যে দূরত্ব, তাকে বলা হয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (Wave-length); কলসী প্রতি সেকেন্ডে যতবার ক'রে দোলে তাকে বলা যায় ওর স্পন্দন-সংখ্যা (Frequency), ধরা যাক্ কলসী সেকেন্ডে ৪ বার ক'রে দুলছে। ফলে, জলের ভেতর প্রতি সেকেন্ডে ৪টা ক'রে ডেউ উঠছে এবং পর পর দাঁড়িয়ে সবাই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এক সেকেন্ড পরে জলের ওপর কোন্ দিকে তাকালে কি দেখা যাবে? দেখা যাবে, পেট ও মাথাওগালা ৪টা ডেউ পর পর সঙ্গে

রয়েছে! এই ডেউ চারটার উত্তর প্রান্তের মধ্যে যে দূরত্ব, প্রথম ডেউটা ঐ সেকেন্ডকাল মধ্যে ঠিক ততটাই ছুটে গিয়েছে এবং প্রত্যেক ডেউই প্রতি সেকেন্ডে ঠিক অতটা দূরেই ছুটেতে পারে। সুতরাং এই দূরত্বের ব্যবধানটা ডেউগুলির বেগের পরিমাণ নির্দেশ করে; অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে তরঙ্গের বেগটা হচ্ছে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ৪ গুণ। সাধারণভাবে বলতে পারা যায়—তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও স্পন্দন-সংখ্যার গুণফলটা সকল ক্ষেত্রেই তরঙ্গগুলির বেগের সমান হয়ে থাকে। তরঙ্গের বেগটা বস্তুতঃ নির্ভর করে, যে পদার্থের ভেতর তরঙ্গ ওঠে তার ধর্মের ওপর, অর্থাৎ জল তরঙ্গের বেগের জলের এবং আলোক-তরঙ্গের বেগের ইথরের ধর্মের ওপর। জল বা ইথরের মত তরঙ্গ-বহন-ক্ষম পদার্থকে বলা যায় মাধ্যম (Medium); একই মাধ্যমের পক্ষে তরঙ্গের বেগ একটা নির্দিষ্ট মাত্রার হবে, সুতরাং এরূপ স্থলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে শুধু স্পন্দন-সংখ্যার ওপর। স্পন্দন-সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও সেই অনুপাতে কমতে থাকবে। জলের ভিতর কলসী দোলানোর পরীক্ষা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, দ্রুত আন্দোলনে বড় বড় এবং ক্ষুদ্র আন্দোলনে ছোট ছোট ডেউ উঠে থাকে।

সুতরাং তরঙ্গবাদ আমাদের এই কথাটাই বিশেষ করে জানিয়ে দেয় যে, উজ্জ্বল পদার্থ যে জিনিষটা বিকিরণ করে, তা' আদৌ জড়পদার্থ বা কণাজাতীয় পদার্থ নয়—তা' হচ্ছে একটা ওঠা-না'মার ভাব বা স্পন্দন এবং তা নির্দেশ করে জড়শক্তিরই সৃষ্টিবিশেষ। সূর্যের পরমাণুগুলির স্পন্দনশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে চতুঃস্পন্দিত ইথরের রাজ্যে তরঙ্গরূপী স্পন্দনের আকারে। সূর্য্যগ্রহণে অসংখ্য রঙের আলো এবং প্রত্যেক রঙের পক্ষে আলো আলো স্পন্দন-সংখ্যা; সুতরাং ওদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও ভিন্ন ভিন্ন। নীল-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা লাল-তরঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং লাল-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নীল-তরঙ্গের প্রায় আধা-আধি। বস্তুতঃ বিভিন্ন আলোক-রশ্মির পরিচয় দানের জন্য বৈজ্ঞানিক ওদের রঙের উল্লেখের কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন না। আলোর স্পন্দন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-বৈ.যার উল্লেখ ক'রেই তাঁদের সব কাজ চালিয়ে নেন। জলে বা কাচে চুকতে তরঙ্গগুলির বেগ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তাই আলোর প্রতিসরণ এবং বিচ্ছুরণ ঘটে।

এই হলো আলোর প্রকৃতি সন্ধে তরঙ্গবাদের মূল কথা। এখন আমাদের কল্পনা করতে হবে, বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রযোগে পদার্থবিশেষের বর্ণালীতে আমরা যে সকল উজ্জ্বল রেখা দেখতে পাই, তার প্রত্যেকটার সঙ্গে এক একটা বিশিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যা ও বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বর্ণালীর পর পর রেখাগুলিকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক ক্রমিক নম্বরের সঙ্গে একটা স্পন্দন-সংখ্যা (বা একটা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য) জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, রেখা বিশেষের ক্রমিক নম্বর দ্বারাই ওর জন্মদাতা আলোক-রশ্মির স্পন্দন-সংখ্যা নির্দিষ্ট হতে পারবে। কিন্তু বাস্তব দেখতে গেলেম যে, ঐ স্পন্দন-সংখ্যা নির্ভর করে কেবল একটা মাত্র ক্রমিক নম্বরের ওপর নয়, পরেও একজোড়া নম্বরের ওপর; অথবা আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে—ছুটো বিশিষ্ট নম্বরের বর্গকে উটে নিলে যা' হয়, তার বিহীন কালের ওপর। ফলে একটা অপ্রত্যাশিত নিয়ম মানতে হলো এবং আমাদের গোড়াই গ্রন্থটা এখন বিশিষ্ট আকার ধারণ করলো—এই নিয়ম থেকে, পরমাণু ভিতর বাদের এবং যে ধরণের স্পন্দন হচ্ছে তার কোন খবর পাওয়া যায় কি? রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিয়ম (সরলানুপাতের ও গুণানুপাতের নিয়ম) থেকে আমরা পরমাণুর সন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। বর্ণবীক্ষণিক বিশ্লেষণের নিয়ম থেকে পরমাণুর ভেতরকার খুদে কণাগুলির গুণিমাটি ব্যাপারসমূহও জানতে পারা যাবে, বিচিহ্ন কি? আমরা দেখেছি। বস্তুতঃ এই পথ অবলম্বনেই ঐ সকল খবর সংগ্রহ সম্ভবপর হয়েছে। [ক্রমশঃ

সামান্য ক্রমসঙ্গ ও আলোচনা

ইউরোপীয় যুদ্ধের গতি

মিত্রপক্ষ খাস জার্মানীর দ্বারা আঘাত হানিয়া ইতিমধ্যেই কয়েকটি গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইয়াছেন—এ সংবাদ আমরা গত মাসেই পাইয়াছি। সকলেই বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ভাবিয়াছিল যে, নিপথ্যস্ত জার্মানীর পরাজিত হইবার আব বিলম্ব নাই। এবং জার্মানীর পরাজয়ের অর্থ যে আশু যুদ্ধাবসান—এ সম্বন্ধে শুধু মিঃ চার্কিল নহেন, স্মূর প্রাচ্য-জন-নায়কবৃন্দও একমত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি মিঃ চার্কিল কমল সভায় যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে জার্মানীর ভাগ্যস্থ্য যে অচিরেই অন্ত ঘাটবে, এমন মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন : জার্মানীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছে, উহা শেষ করিবার শেষ তারিখ আমরা ঘোষণা করিতে পারিতেছি না। সুতরাং তাঁহার মতে ১৯৪৫ সালেরও অনেক সময় যে যুদ্ধ ব্যয়িত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। কারণ জার্মানীর শক্তি এখনও খুব কম নয়। মিত্রবাহিনী যতই জার্মানীর নিকটবর্তী হইতেছে, ততই জার্মানীর বাধাদানের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাম্প্রতিক গত এক মাসের যুদ্ধ-ইতিহাস হইতে দেখা যায় : সিগলিড্ লাইন যাত্রাতে মিত্রবাহিনী ভাঙিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে জার্মান গাইকমাণ্ড প্রবল বাধাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া জার্মানীতে প্রবেশের পথ সহজলভ্য বলিয়া মিত্রবাহিনী এখের সাহায্য লইতে যায়, কিন্তু জার্মান প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। আর্গেমে হইতেও জার্মান প্রতি-আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষীয় বিমানবাহী সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। অবশ্য আর্গেমে আংশিক এই পরাজয় ঘটিলেও জেনারেল ডেম্সির সৈন্যবাহিনী ওয়ান ও নিজ মেজেনে সেতুমুখ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের হেডকোয়ার্টার হইতে বিগত ১লা অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়—মিত্রবাহিনী ক্যালি অধিকার করিয়াছে। ৩শে সেপ্টেম্বর রাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় কমান্ডার বন্দী হন, এবং পরদিবস ভোরে ওখানকার জার্মান সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ অসুচারী দেখা যায়—ক্যালি অধিকারে আসায় ডোভার সম্প্রতি নিরাপদ হইল। ইহার ফলে দূর-পাল্লার কামান হইতে ইংলণ্ডের উপর গোলা বর্ষণ করিতে জার্মানীর পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। এদিকে দেখা যায়—ফরাসী উপকূলের একমাত্র ডানকার্ক ই এখনও জার্মানীর হাতে আছে ; তাহারও আজ প্রায় যায়-যায় অবস্থা। অধিকৃত অঞ্চলসমূহ হস্ত-চ্যুত হইবার ফলে অদূর ভবিষ্যতে জার্মানীকে যে কাঁচামাল ও খাদ্য-শস্যের জন্ত বেগ পাইতে হইবে, জার্মানীর আত্যন্তবীরণ গোলযোগ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। রুম্যানিয়ার তৈলসম্পদ হইতেও আজ সে বিচ্যুত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ জার্মানীর আত্মরক্ষামূলক রণক্ষেত্র সর্বত্রই হওয়ার ফলে তাহার বাধাদানের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সুবিধা হইয়াছে। মিঃ চার্কিলের আশু যুদ্ধাবসান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাই অমূলক নহে।

এদিকে চেকোস্লোভাক সীমান্তে লালকোজের অভিযান প্রচণ্ড-

ভাবে শুরু হইয়াছে। ওয়ারশ'র পথে পথে জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছে জার্মান ও রুশবাহিনীর মধ্যে। ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ার কয়েকটি স্থান রুশের অধিকারে আসিয়াছে। পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ-দ্বারও আজ রুশবাহিনীর ক্রমাগত আঘাতে ভগ্নপ্রায়।

গুরুত্বপূর্ণ সত্তর বোলনার পথে পঞ্চম আর্মি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জেনার গিরিবল্জের ও জার্মানী প্রবেশের পথ এই বোলনায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জার্মান-আক্রমণের মুখে মিত্র বাহিনীর অগতি উপযুক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বোলনার মুখে।

দেখা বাইতেছে, জার্মানী আজ বহু বিপদায়ের সম্মুখীন হইলেও তাহাকে পর্যাস্ত করা মিত্রবাহিনীর পক্ষে আশু সম্ভব নয়। একদিকে যেমন খাস জার্মানীতে মার্কিনবাহিনীর ক্রম-অগ্রগতি চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি জার্মান পার্টি আক্রমণের মুখে মিত্রবাহিনীকে বিপদান্ত হইতে হইতেছে। এই জটিল ইয়োরোপে যুদ্ধের শেষ হইবার যে আশু সম্ভাবনা নাই, কমল সভায় মিঃ চার্কিলের কণ্ঠে তাহারই অভাষ স্পষ্ট পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমান্ডের এক ইস্তাহার হইতে জানা যায়—কলকাতার হইতে চলিশ মাইল পূর্বে এবং পালেটোয়ার পাচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাজু উপত্যকার মৌড়ক এলাকার ভারত-সীমান্তের অভ্যন্তরে সম্প্রতি জাপানীরা তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় চারিশত জাপানী (তাউং বাজারের উত্তরে) ভারত ও আরাকান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ১৪শ আশ্বিন ঘাটি-গুলির উপর হানা দেয়। কাগুর সমরদপ্তর হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানী আত্মপ্রকাশের তিন দিনের মধ্যেই তাহারা আরাকান প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইক্ষল এবং উত্তর ব্রহ্মের শূন্য-বিস্তৃত অঞ্চল হইতে জাপানীরা আবার বিতাড়িত হইয়াছে। জেনারেল ষ্টীলওয়েলের চীনা ও মার্কিন-বাহিনীর সাফল্যে এক দশমাংশ ভূখণ্ড ব্যতীত বাকী সবটাই পুনরাধিকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় চতুর্দশ আশ্বি আরাকানের দিকে নতুন করিয়া আক্রমণ চালাইবার জন্ত কিছুদিন হইতে ব্যাপকভাবে তোড়জোড় শুরু করিয়াছেন।

কিছুকাল হইতে যুদ্ধের ধারা কিছুটা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সমগ্র ভারত-ব্রহ্মের উপর পুনরায় জাপানের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা যদিও ইতিমধ্যেই মিঃ চার্কিলের সাম্প্রতিক যুদ্ধালোচনায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এ কথা বলা অশোভন হইবে না যে, মিত্রপক্ষ তাহাকে বড় সহজে আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দিবে না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাত্মন

বিগত ১০ই অক্টোবর চীনের স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আজ হইতে ৩৩ বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে, 'উচাং' সৈন্যদলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার যে

বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতেই বর্তমান চীন গণতন্ত্রের জন্ম।

মার্কস রাজবংশের কু-শাসন হইতে পরিত্রাণ লাভের জগা চীনেব আশ্রাণ চেষ্টা ক্রমাগত ফলপ্রসূ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাধীন ও পররাষ্ট্র সমস্যায় সে প্রতিনিয়ত বৈদেশিক স্বার্থ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল অন্তরায় হইয়াছে পর-পব দুইটি



চিয়াং কাইসেক

মহাযুদ্ধ। ১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধে চীনকে অবগা প্রত্যক্ষভাবে তেমন বিপ্রত হইতে হয় নাই; কিন্তু জাপানের আক্রমণে বর্তমান মহাযুদ্ধে চীনকে ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতেছে। তথাপি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার চীনবাসীর অর্ন্তম উৎসাহ বিন্দুমাত্র লিখিল হয় নাই। বৃহত্তর মিত্র বাহিন্যসমূহের নিকট সাহায্য চাহিয়া যথাকালে উপযুক্ত সাহায্য সে পায় নাই। সম্প্রতি নানকিং হইতে গণতন্ত্রী গভর্নমেন্টের রাজধানী চুংকিং-এ স্থানান্তরিত হইয়াছে। জাপানীরা নানকিং-এ একটি তাবেন্দার গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সম্প্রতি চীনে মিত্রপক্ষের সাহায্যের পরিমাণ লইয়া যে বিতর্ক উঠিয়াছে, তাহা মি: চাঙ্কিল কুইবেক সম্মেলন হইতে লগুনে ফিরিয়া পাল্লায়মেতে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতেই উদ্ভূত হয়। মি: চাঙ্কিল বলিয়াছেন: এত সাহায্য পাঠিয়াও চীন তাহার সামরিক বিপণ্ডয় ঠেকাইতে পারিল না, ইহা “বিরক্তিকর ও নৈরাশ্রজনক।” ইহাতে চীনের উপর যে কটাক্ষ করা হইয়াছে চুংকিং-এর সরকারী মহল তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীচব খাচা প্রেরণ করেন নাই। তাহার বাধ্য হইতে চাহিয়াছেন যে, জলপথ ও স্থলপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় একমাত্র বিমান পথে চীন

যে সাহায্য পাঠিয়াছে, তাহা নগণ্যমাত্র। এ বিতর্ক সহসা মিটিবার নয়, কারণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও মি: চাঙ্কিলের কথারই একরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়া সাহায্য দানের বহু নিদর্শন দেখাইয়াছেন, যাহা চীনের মতে অমূলক।

এতদসত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা কোনো ক্রমেই ফ্যাসিষ্ট শক্তির পদতলে পিষ্ট হইতে দিব না—ইহাই আজ সমগ্র চীনবাসীর একমাত্র প্রণ। চুংকিং গভর্নমেন্ট সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট দলের সহিত বোঝাপড়ার একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। চীনের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার দিক হইতেই প্রধানত: এই মীমাংসার প্রস্তাব বচিত ও উত্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া চীনের সমগ্র শক্তিকে অধিকতর সংহত ও শক্তিশালী করিবার অভিপ্রায় ইহার মূলে রহিয়াছে। গণ-পরিষদে মার্শাল চিয়াং কাইসেক এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ লইয়া সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্ত তিনটি উপায়েব অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন:

- (১) একটি সম্মিলিত কমান্ড গঠন করিতে হইবে। ইহার পব সৈন্যবাহিনীকে চীন গভর্নমেন্ট ও জাতীয় সমর পরিষদের সমস্ত আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে।
- (২) সৈন্য ও আফিসারগণের বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। ইহার জন্ত প্রচুর অর্থ চাই। গভর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, নিকট সৈন্যদল ভাড়িয়া দিয়া ব্যয়সঙ্কট করিবেন এবং তাহাতে যে অর্থ বাচিবে, তাহা উৎকৃষ্ট সৈন্যদলের জন্ত ব্যয় করিবেন। এতদ্ব্যতীত চীনেব ধনী ও সম্পত্তিশালী বাস্তুগণকে গভর্নমেন্ট এই অনুরোধ করিবেন যে, তাহারা যেন তাহাদের উদ্ধৃত ধন ও অগাধ খাজনা সৈন্যদের জন্ত দান করেন।
- (৩) সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য চীনের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে “সৈন্যদলে যোগ দাও” আন্দোলন জোর দিয়া চালান হইবে।

ইহা কাব্যকরী হইলেও জাপানের জায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার পক্ষে আজ একক চীনের আশ্রাণ চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। ইহার সহিত নাংসী-ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বিশ্বের সর্ববিধ সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। চীনের সাফল্যের অর্থ গণতন্ত্রেরই বিজয় বৃদ্ধিতে হইবে। অজকার চীন-জাপান যুদ্ধের ষষ্ঠমবধে চীনের পক্ষে সেই সাহায্য আশ্রক, ইহাই আজ সাম্যবাদী জাতসমূহের একান্ত কাম্য।

তপশীল-হিন্দু সম্মেলনে ডাঃ আশ্বদকর

সম্প্রতি এলোরে তপশীলভূক্ত হিন্দুদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা ও আক্রোশই দেখা যায় এই সম্মেলনের একমাত্র মূলধন ও অস্ত্র। ভারত সরকারের শ্রমসচিব ডাঃ বি. আর. আশ্বদকর সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: জাতিগণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত যদি ইংরাজদের এক শত কারণ থাকে, তাহা হইলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের যুদ্ধ করিবার সহস্রাধিক কারণ আছে। তপশীলীদের এই কথা জোর গলায় বলিতে হইবে এবং যদি যুক্তিতর্ক নিম্নলিখিত হয়, তাহা হইলে তপশীলীদের অধিকার লাভের জন্ত বলপ্রয়োগ

কৰিতে হইবে। মিত্ৰপক্ষ এবং জাৰ্জাণ্দের মধ্যে যে বিরোধের কারণ আছে, হিন্দু এবং অম্প্ৰশ্দের মধ্যে বিরোধের কারণ তদপেক্ষা অধিকতর মৌলিক এবং পবিত্ৰ। নিজেদের অধিকার অৰ্জনের জগ্ৰ অম্প্ৰশ্দের বস্তপাত কৰিয়াও সংগ্ৰাম কবিত্তে হইবে।

বিস্ববিদ্যালয়ের আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতবৎ মতই ডাঃ আশ্বেদকব ভাবাবেগে কথাব বেগ ছাড়িয়া দিয়াছেন। চিন্তা কৰিয়া দেখিলে মূল বিষয় হয়ত অত্যন্ত নগণ্য হইয়াই দেখা দিবে, কিন্তু তাহা লইয়া উল্লক্ষনেব চূড়ান্ত হইয়া গেল। অধিকারের উপযুক্ততা এবং উন্নত মনের সহজতা-ধৰ্ম্ম হারাই জীবন ও অবস্থাকে উন্নত কবা সম্ভব। বৰ্ণ-হিন্দুদের বিৰুদ্ধে তপশীলী-হিন্দুকে যুদ্ধে প্ৰবোচিত কবিলার মূলে ডাঃ আশ্বেদকব কি একবাণও সে কথা তলাইগা দেখিয়াছেন?

গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যৰ্থতা

বিগত ৯ই আগষ্ট হইতে বোম্বাইয়ে গান্ধীজি ও মিঃ জিন্নাব মধ্যে যে আপোষ-আলোচনা চলিতেছিল, তাহা শেষ পৰ্যাস্ত ব্যৰ্থ হইয়াছে। বাজাজীৰ প্ৰস্তাব লইয়া মিঃ জিন্নাকে স্বীকার কবিয়া লইয়াছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্ৰয়োজনে হিন্দুদেব অধিকার কলাঞ্জলি দিয়াও যে ঐক্যের অখণ্ডতা রক্ষা কবা চলে না, মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনার প্ৰাকালে এই কথাটা



গান্ধীজি



মিঃ জিন্না

সম্ভবতঃ গান্ধীজি ভাবিয়া দেখেন নাই। অবশ্য জিন্নার সম্পূৰ্ণ সৰ্ভ গান্ধীজি মানিয়া ল'ন নাই, তথাপি গান্ধীজি যে ভারত-বভাগের নীতি মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে মিঃ জিন্না অবশ্যই খুসী হইয়াছেন। এতদসঙ্গেও আলোচনা ব্যৰ্থ হইল। না হইলেও অবশ্য সন্দেহের অনবকাশ কিছু থাকিত না! কাবণ 'প্যাষ্টি'জাত স্বাধীনতা প্ৰণয়নের পিছনে স্থিতিহীনতাব ঐতিহাসিক পটভূমি আমবা আগাগোড়া সৰ্কজ লক্ষ্য কৰিয়া আসিয়াছি। মিঃ জিন্না অবশ্যই অসহযোগ কবিয়া আবামে আছেন, কিন্তু গান্ধীজি?

পরলোকে খ্যাতনামা মার্কিং রাজনৈতিক

ওয়েণ্ডেল উইঙ্কি

গত ৭ই অক্টোবর রাতে খ্যাতনামা মার্কিং রাজনৈতিক ওয়েণ্ডেল উইঙ্কি পরলোক গমন করেন। মিঃ উইঙ্কি ১৮৯২



ওয়েণ্ডেল উইঙ্কি

সালের ফেব্ৰুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ানার অন্তৰ্গত এলউডে জন্ম গ্ৰহণ কবেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কৰিয়া আইন ব্যবসায় আৰম্ভ করেন। বিগত মহাযুদ্ধে তিনি মার্কিং গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেনরূপে ক্ৰান্তে যুদ্ধ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কমন-ওয়েল্থ কৰপোরেশন পাবলিক ইউটিলিটি কোম্পানীর কৰ্ত্তা হন। ১৯৪০ সালে মার্কিং নিৰ্বাচন প্ৰতিযোগিতার সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্ৰেসিডেন্টপদে নিৰ্বাচনের জগ্ৰ রিপাব্লিক্যান দলের প্ৰাধিক্ৰপে তাঁহাকে মনোনীত কবা হয়। ঐ সময়েই তিনি আকস্মিকভাবে প্ৰসিদ্ধি লাভ কবেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মিঃ উইঙ্কি প্ৰেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্ৰতিনিধিরূপে সম্মিলিত বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন। এই সময় এবং পরবৰ্ত্তীকালে তিনি ভারতবৰ্ষ এবং অন্তান্ত পৰাধীন দেশের স্বাধীনতার দাবী সমৰ্থন কৰিয়া এবং চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে বখেট পৰিমাণে সাহায্য

মানের প্রভাব করিয়া বিভিন্ন বিবৃতি দেন। যুদ্ধকালে তাঁহার এই বিশ্বক্ৰমণের অভিজ্ঞতা তিনি "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে সত্যেন্দ্রমোহন



সত্যেন্দ্রমোহন রায়

মণ্ডুর জেলার অন্তর্গত কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ লৌহিড় ও বারেন্দ্র কান্ধ কুলভিলক প্রাভঃমরগীর স্বর্গীয় রমণী মোহন রায় মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন রায় মহাশয় গত ১৫ই ভাদ্র ৩১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ষাণ্মাসিক হইতে রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হইলেও সত্যেন্দ্রমোহন ধর্মপ্রসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ লাভের জন্য সর্বদা উৎসুক থাকিতেন। তাগ্যক্রমে তিনি শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীভূপতিনাথ মহারাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর কৃপায় সাধক এবং ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট তিনি 'সাধু রায়' মহাশয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যেন্দ্রমোহনের কৃপায় কাকিনার এবং কানাস্তরের বহুলোক এবং বহু ছাত্র নানাপ্রকারের সাহায্য লাভ করিয়া উপকৃত হইতেন। সত্যেন্দ্রমোহন দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং চারি ভ্রাতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবেন্দ্রমোহন রায়, ই, আই, রেলের এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, এক ভ্রাতা ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়, অপর ভ্রাতাগণের মধ্যে রবি রায় ও ভূমেন রায় মঞ্চ ও পর্দার সুবিখ্যাত অভিনেতা। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি এবং শোকাক্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

"যদি ভগবানের ভগবত্তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্বদা মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ্য এবং সৃষ্টি শৃঙ্খলাময়; বিক্ষুব্ধতা কোথাও নাই! যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা, সেইখানেই আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। মৃত্যুবেদের কার্যের বিষয় এবং রকম অল্পসারে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ পরিবর্তিত শক্তিসম্পন্ন হয়। যেখানে মানুষের শক্তির অভাব সেইখানেই বুঝিতে হইবে, মানুষের কার্যের বিষয়ে এবং রকমে মানুষ কোন না কোন ভুল করিয়াছে। মানুষকে সর্বদা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সে তাহার কার্যের বিষয় ও রকম বাহিয়া লইতে শিখিলে নিজেকে অসীম শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে। কোথায় তাহার শক্তির অভাব, তাহার কার্যের পরিণতি দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। চেষ্টা করিলে নিজের শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, এই হিসাবে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে, কিন্তু কখনও যেন কোথায় শক্তির অভাব তদ্বিষয়ে মানুষ অন্ধ না হইয়া পড়ে।"

বঙ্গপ্রী—১৩৪১, মাঘ।



শ্রীমতী সোহাগা বসু
 চিত্রশিল্পী ও মন্ত্রী
 সার্বজনীন বস্ত্র অনিন্দ্য
 প্রকার অভিনয় ও
 নৃত্য পূর্ণতা লাভ
 করিয়াছেন তাঁহার
 কপের নিখুঁত স্বকৃতি
 ও সৌন্দর্য-সম্বন্ধে
 এবং আমাদের দেশের
 এই যে প্রতি রাত্রে
 নিয়মিত ওটিন ক্রীম
 ব্যবহারের কল্যাণ
 তাঁহার নিখুঁত স্বকৃতি
 ও সৌন্দর্য-সম্বন্ধে
 অসংখ্য প্রশংসা

●OATINE CREAM is indispensable for
 my toilet. I have been using it for a
 long time, and find it delightful,
 and extremely necessary to preserve
 a perfect skin.

Sashona Bose



Oatine

BRAND
 SNOW is nightly
 massage
 for daily
 protection

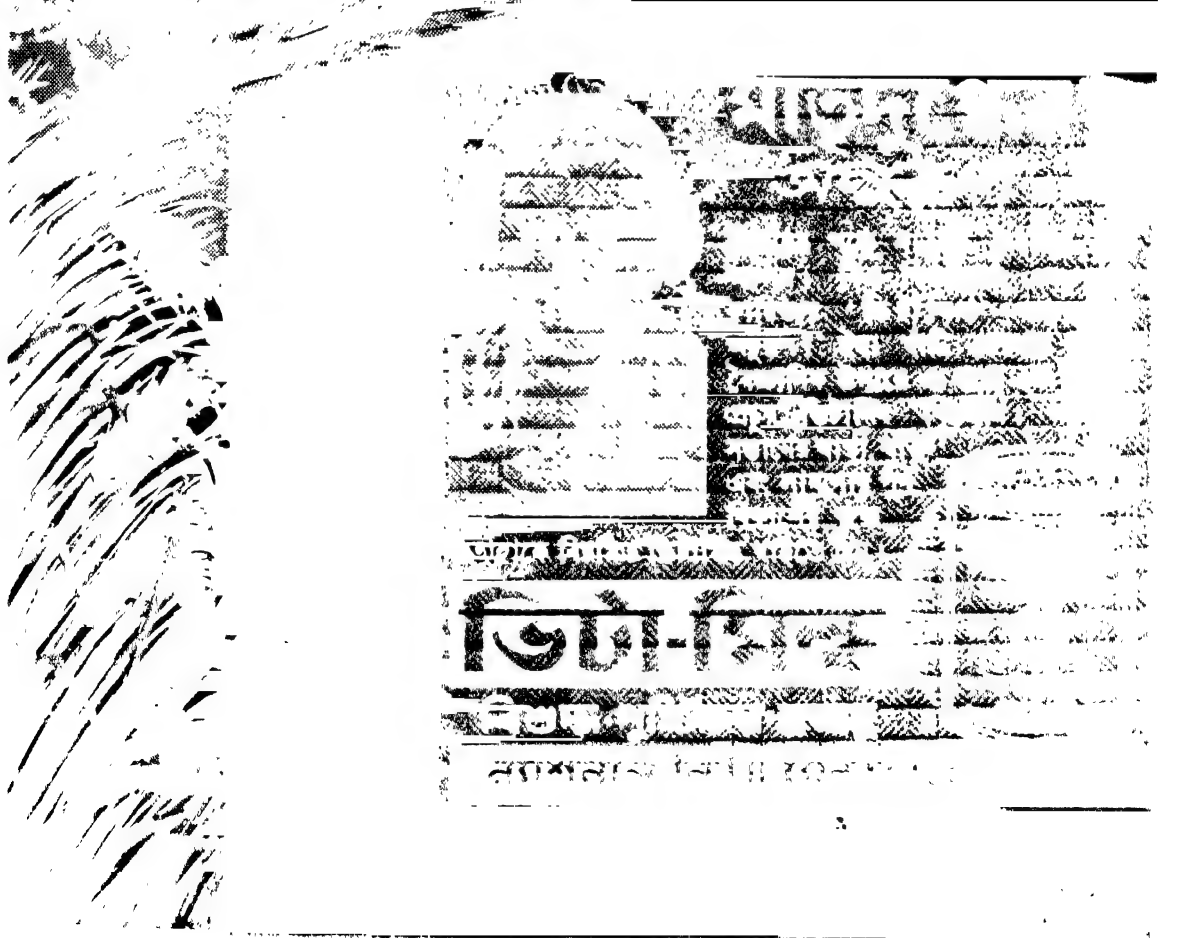
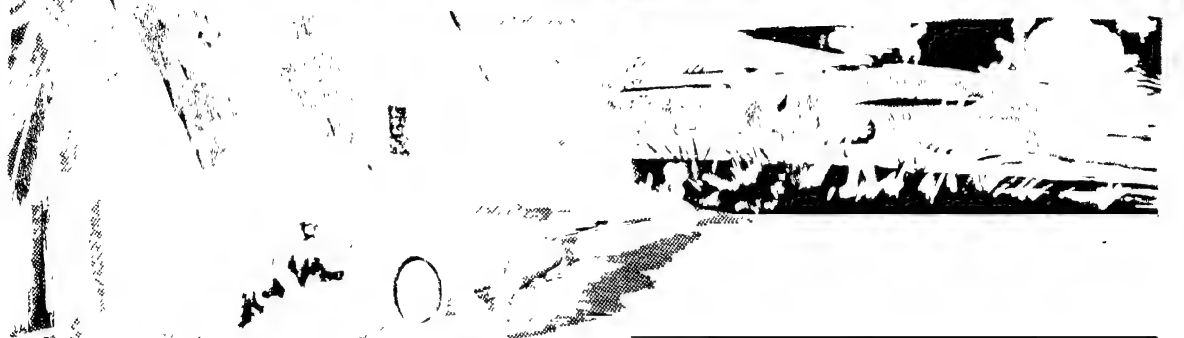


বাংলায়

লক্ষ্মী শ্রী

কিরে আশুক!

লক্ষ্মী দি।





নৃত্যকুশলা ছায়া-
চিত্রশিল্পী শ্রীমতী
সাধনা বসুর অনিন্দ্য-
সুন্দর অভিনয় ও
নৃত্য পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে তাঁহার
অঙ্গের নিখুঁৎ স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে,
এবং আমাদের গর্ব
এই যে, প্রতি রাতে
নিয়মিত ওটান ক্রীম
ব্যবহারের ফলে ই
তাঁহার নিখুঁৎ স্বকৃ ও
উজ্জ্বল বর্ণ প্রথম ও
অমর্যাদা আছে।

OATINE CREAM is indispensable for
my toilet. I have been using it for a
long time, and find it delightful,
and extremely necessary to preserve
a perfect skin

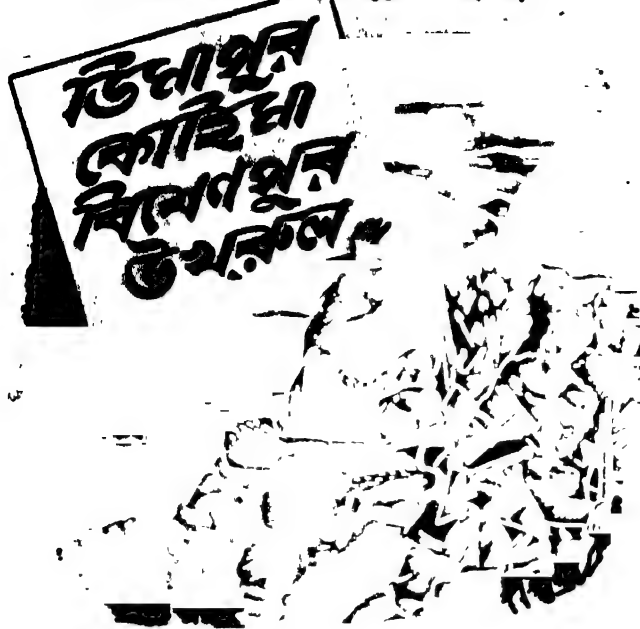
Sadhona Bose



Oatine

CREAM *for nightly
massage*
SNOW *for daily
protection*

শেখ খনির আল



নামগুলি মনে আছে ১০০ কিছুদিন আগেও নামগুলি খবরের শিরোনাম ছিল। ডিধাপুরের কাছে রেলপথে শত্রুর আক্রমণের আশংকা ছিল। কোহিলার ৩০০ ফুট উচ্চতার অনেক বেশি শত্রুসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। জাপানী সৈন্তেরা ইংলিশের সবচুড়িতে প্রবেশ করেছিল এবং বিবেকপূরের উত্তর ও দক্ষিণে পৌঁছেছিল। উত্তর নিরাপদ ছিল না ...

এ সব আজ পুরোনো কথা। জাপানীরা পরাস্ত হয়েছে এক পিছু হটেছে। আজ ডিধাপুরের ১৫০ মাইলের মধ্যে কোথাও তাদের আভিষ নেই। নাগারা কোহিলার ফিরে এসেছে। গুলি, গোলা ও বোমার পছন্দ এই পার্বত্য স্রোতের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা এখিঁরে চলছে। জাপানীরা নিজেরাই বাকি বলেছিল, —“অপরাজেয় বাহিনী” ...আজ সেই সব জাপানীসৈন্তের অস্থি বিবেকপূর পাহাড়গুলিতে ছড়িয়ে আছে। এইভাবে তাদের শেখ খনির আসছে। আগনি যখন এটা পড়বেন...তখন যে সব সাহসী বীরপুরুষ এই অসম্ভব

সম্ভব করেছে তাদের কথা স্মরণ করবেন

আমাদের সৈন্তেরা প্রমাণ করেছে -

জাপানীরা উপবেশতাও নয়, অপরাজেয় জাপানীরা নয়।



আমরা আমাদের
প্রয়াসে
পারিষ্কার
তা বন্দী

জাশনাল ওরার কক কর্তৃক প্রচারিত

বেঙ্গল ব্যাংক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২, লাইভ রো, কলিকাতা

অধিকৃত	২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা
বিলকৃত	১২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা
	১২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা
আদায়ীকৃত ...	৮,২৫,০০০ লক্ষ টাকা
কার্য করা সহবিল	৯০,০০,০০০ লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে বার্ষিক শতকরা

টাকা হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করা

এ পর্যন্ত অংশীদারগণের অর্থের শতকরা এক শত টাকা
হারে ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে।

ক্যানেন্সি ডাইরেক্টর- এম. এম. মুখার্জী, এম-এস-লি (ক্যান),

এ-লি-আই-এস (স.ও.ন), চার্টার্ড সেক্রেটারী।

1185



25

একদাশ গিলি স্বর্নৈব অলঙ্কার বিধাতা

१२४ १२४ १ वरवाकाव झोटे, कलिकाजा

বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ও শাটী

আগেকার দিনের মতই টেকসই
ও সস্তা

কিন্তু কোন মিলের পক্ষেই আজ আর যথেষ্ট
বঙ্গ প্রস্তুত করিবার উপায় নাই।
আমরাও আপনাদের চাহিদা
মিটাইতে পারিতে না।

প্রয়োজন না থাকিলে
আপনি নূতন বঙ্গ কিনিবেন না, বাহা, আছে
তাহা বিয়াই চালাইতে চেষ্টা করিবেন।

কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে
সেলাই করিয়া পরুন। এই ছদ্দিনে
তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।
‘যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়
আমাদের অনুরোধ করিবেন।

== বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ==

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিনিস্ লিঃ

১১, রাস্তা ভায়ে, কালকাতা

FIRE

MARINE

THE
Concord
 OF
India

INSURANCE COMPANY LIMITED.

(Incorporated in India)

Accident

Fidelity

8, CLIVE ROW, CALCUTTA.

ব্যাঘ্র পানিপ্রাণ ক

এবং

অগ্নি সমস্ত

সর্বপ্রকার রক

গারিফ্লম মুদ্রণ

ও

আধুনিক ডিজাইন

রিপ্রোডাক্সন

সিঙিকিট

৭১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

কোল্ড ক্রীম
 জন্ম বোজেড

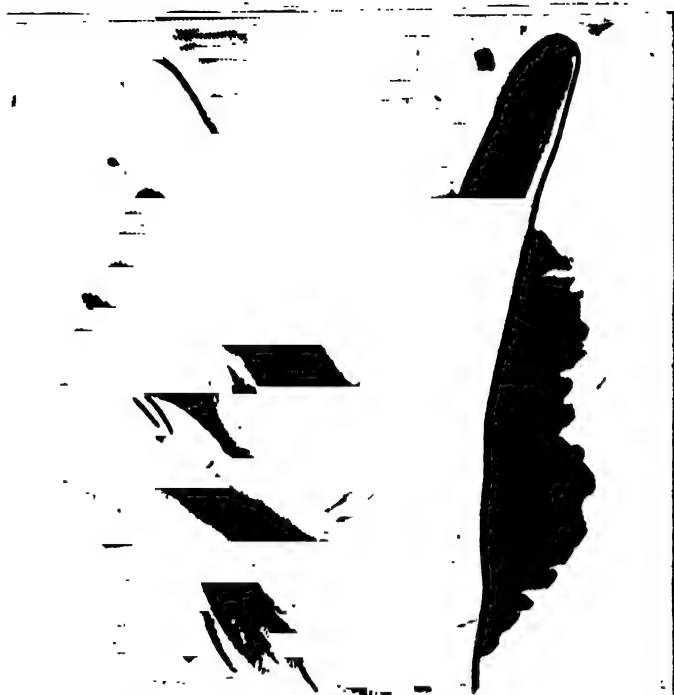
গোলাপ-গন্ধ
 প্রসাধন প্রলেপ

শীতের দীর্ঘায়ু হইতে হাত, পা, মুখ, ঠোঁট ও গাল-
 চর্মের স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য রক্ষা করিতে অল্পমূল্যে
 সৌন্দর্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় এবং শৌখিন সজ্জাব্যয়ের
 পয়সা বন্ধ। ইহাতে চর্বি বা ঘোলের লেশ নাই।

সুদৃশ্য আকারে ও টিউবে পাওয়া যায়।



হেলে কোলিকাতা
 কলিকাতা :: বোম্বে



Two points are
VITAL

● SAFE

● PROFITABLE

Bank with

SREE BANK LTD

3-1, BANKSHALL STREET, CALCUTTA

দি
বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কমার্শিয়াল এণ্ড আর্টিষ্টিক প্রিন্টারস্,
ষ্টেশনার্স এণ্ড একাউন্টবুক মেকার্স

প্রোগ্রাম. সি. টেম্পল এণ্ড সন্স,
কন্ট্রাক্টস্ এণ্ড কমিশন এজেন্টস্,

১২নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল ২১২৮

THE NEW INDIAN GLASS WORKS (Calcutta) LTD.

Factory :—2, Church Road, Dum Dum Cantonment
and
101/1, Ultadanga Main Road.

OFFICE :—7, Rawdon Street, Calcutta.

Manufacturers of all kinds of BOTTLES both narrow and
wide-mouth, stoppered and screw-caps

NEUTRAL GLASS A SPECIALITY

ADRENALINE and VACCINE FILES and TUBES
are manufactured from absolutely neutral glass.

For Particulars Apply to the Head Office of the Company.

কলিকাতা হইতে শিলং যাইবার থু টিকেট
শিলং হইতে কলিকাতা
আসিবার থু টিকেট শিলং অফিসে পাওয়া যায়। আমাদের
১১মং ক্লাইভ রো-স্থিত অফিসে পাণ্ডু হইতে শিলং অথবা
রিটার্ন টিকেটের ভাড়া লইয়া রসিদ দেওয়া হয় এবং ঐ
রসিদের পরিবর্তে পাণ্ডুতে টিকেট পাওয়া যায়।
এই অফিস হইতে রিজার্ভও করা হয়।

❖ ❖

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(আ সা ম) লিমিটেড

দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস

১৩, ক্লাইভ রো, কলিকাতা



বঙ্কো-সুর্ভি কামের অয়েল

ফ্রান্স রস এণ্ড কোং লিঃ



কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মী সোণ ওয়ার্কস্



হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাথা—দু'রকমের সাবানের জুগুই

“বঙ্গলক্ষ্মী” প্রশস্ত ।

গ্রাম—বখের ধন

ফোন :

কাল ০৭০৪

২ জবাদা ব্যাঙ্ক

—স্থাপিত—

১৯২৯

৩০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

আয়করমুক্ত শতকরা ৫ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

— শাখা সমূহ —

কলিকাতা

বাজলা

আসাম

বিহার

মাপিকতলা

ধর্মতলা

বেদিনীপুর

বাঁকুড়া

তেজপুর

পাটনা

ভানুবাড়ার

শিয়ালদহ

বালিচক

বিক্রপুর

হবিগঞ্জ

রাঁচী

কলকাতা

বালিগঞ্জ

শালবনী

মিরকাবীম

—

—

বড়বাজার

পোতা

আলমগড়া

কুফনগর

—

—

—

—

গড়বেতা

খুলনা

—

—

—

—

বাঁটাল

বাগেরহাট

—

—

সেন্ট্রাল অফিস শীঘ্রই ৮০ নং ক্লাইভ স্ট্রীটে
স্থানান্তরিত করা হইবে

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীমুত কালীচরণ সেন।

• ফোন : ক্যাব ৫৮৮৩

স্থাপিত—১৯৩৪

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

হেড অফিস :—

২৮নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

জাতীয় শিল্পোন্নয়নে

সর্বপ্রকার সহযোগিতা করাই আমাদের মূলমন্ত্র।

নিতিময় ব্যবসাকে ক্ষেত্রীভূত শাখা-অফিস

খোলা হইবে, তৎক্ষণাৎ

ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও এজেন্ট আবশ্যিক।

এস. কে. মোহন, ডিরেক্টর-ইন্চার্জ।

সুদেহর দিনেও

“বঙ্গলক্ষ্মী”র আয়ুর্বেদীয় ঔষধসমূহ

পূর্বামুদ্রিত বিপ্লব উপাদানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ

কবিরাজমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে।

সুদেহর অজুহাতে ঔষধের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এ কারণ, “বঙ্গলক্ষ্মী”র ঔষধ সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্য।

অল্পমূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ পাইতে হইলে

“বঙ্গলক্ষ্মী”রই কিনিবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মেট্রোপলিটান ইলিওরেল কোং

১. প্রভৃতির পরিচালক কর্তৃক প্রাপ্তি

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্বেদ ওয়ার্‌হাউস

অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধপ্রস্তুতকারক

প্রধান কার্যালয়—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। কারখানা—সরাহনগর।

শাখা—৮৬নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা, রাঙ্গসাহী, জলপাইগুড়ি, বাগেরহাট, বরিশাল, যশোর, মাদারীপুর ও ধানবাদ।

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিম্নমাবলী

“বঙ্গশ্রী”র বার্ষিক মূল্য সডাক ৩০ টাকা। বাৎসরিক ৩০ টাকা।
ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮/০ আনা। মূল্যাদি—
কর্ণাধাক, বঙ্গশ্রী, C/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই টিকানার
পাঠাইতে হয়।

আখ্যাত হইতে “বঙ্গশ্রী”র বর্ধারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে
গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা—এই টিকানার পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট
দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। কেবলমাত্র
ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে “বঙ্গশ্রী” প্রকাশিত হয়।
যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে
স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের কল আদায়গকে মাসের
২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য
থাকিব না।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও
পরিবর্তনের নির্দেশ না আসিলে পরবর্তী মাসের পত্রিকার তদনুসারে
কার্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ
তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

বাংলা র গো র ব
বাঙ্গালীর নিজস্ব

আর. বি. রোজ

নম্র

সুমধুর পঙ্ক-সৌরভে

পঙ্ক নম্র

জগতে অতুলনীয়

মূল্য—ভিঃ পিঃ মাণ্ডলসমেত ২০ তোলা

১ টিন ৩/০ ; ২ টিন ৬/০ মাত্র।

ক্যালকাটা স্নাক ম্যানুফ্যাক্ কোং

১৩৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

বাংলা কথাসাহিত্যে অনবদ্য
অবদান

বিপ্লব

“শতাব্দী”র কবি ও কথাসিদ্ধা

বিপ্লবী কুমার সেন প্রণীত

সম্পূর্ণ নতুন ধারার কথা-চিত্র। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান
নরনারীর অপূর্ণ জীবনী আলোচ্য। সমাজ ও রাষ্ট্র-
বিপ্লবের পট-ভূমিকায় ক্ষুধিত মানব চিন্তার
শাস্ত্রত বেদগাথা।

মূল্য—এক টাকা বার আনা

আপনার গ্রন্থাগারকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে

কলিকাতার যে-কোনো সস্তা পুস্তকালয় ও ষ্টল হইতে

আজই সংগ্রহ করুন।

উষা পাবলিশিং হাউস

২০, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা

বাংলার বঙ্গ-সমস্যার সঙ্কটে তাঁতের ও মিলের কাপড়ের জন্ত

দি ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী

লিমিটেডকে স্মরণে রাখিবেন

পরিচালক

ফোন
বি. বি. ৩৩১২

বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগারের কর্তৃপক্ষ

কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

(বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে)

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

নিয়মিত ভাল লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

“শেয়ার-ভিলার্স হাউস”

চৌরঙ্গী স্কোয়ার—কলিকাতা।

নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে

টাকা খাটাইতে চান?

—আমাদের—

“স্থায়ী আমানত”-এ

গচ্ছিত রাখুন।

সুদের হার

৩ মাসের জমা... ... শতকরা ৩।০ টাকা
৬ মাসের জমা... ... শতকরা ৪.০ টাকা
৯ মাসের জমা... ... শতকরা ৪।৫ টাকা
১ ও ২ বৎসরের জমা ... শতকরা ৫।০ টাকা
৩ ও ৪ বৎসরের জমা ... শতকরা ৫.৫ টাকা

৫ ও ৬ বৎসরের জমা ... শতকরা ৬.০ টাকা
৭ বৎসরের জমা ... শতকরা ৬।০ টাকা
৮ বৎসরের জমা ... শতকরা ৬।৫ টাকা
৯ বৎসরের জমা ... শতকরা ৬.৫ টাকা
১০ বৎসরের জমা ... শতকরা ৭.০ টাকা

ভারতের বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপ্রধান নগরীতে মূল্যবান জমি খরিদে
আমাদের যে পরিকল্পনা তাহা ক্রমশঃ কার্যকরী করা হইতেছে।

আমরা নাম মাত্র খরচায়

আপনার পার্শেল ইত্যাদি শিয়ালদহে
এবং
শিয়ালদহ হইতে কলিকাতার যে কোন
স্থানে সর্বদা পৌছাইয়া দিয়া থাকি।

দি কমার্শিয়াল ক্যারিয়ার কোং

(বেঙ্কল) লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস্—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

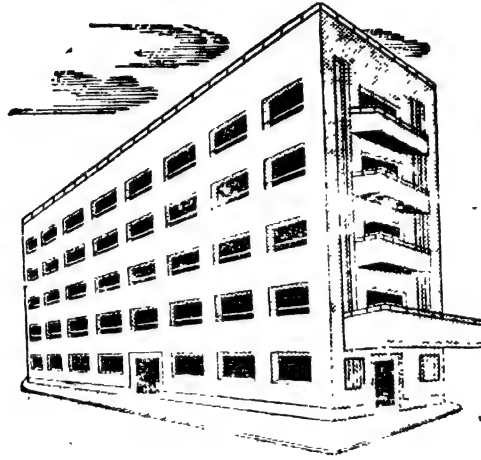
ফোন—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫

গ্রাম—“এরিওপ্ল্যান্টস্”

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট লিঃ

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসারে ভারতের বৃহত্তম
— যৌথ প্রতিষ্ঠান —

হেড অফিস—১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।



ব্রাঞ্চ ও এজেন্সিঃ
এলাহাবাদ, বোম্বে, বেনারস,
ভাগলপুর, বাঁকুড়া, দিল্লী,

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সিঃ
ঢাকা, লাক্ষৌ, মুন্সের, ময়মন-
সিংহ, পাটনা ও রাঁচী।

আমাদের নিজস্ব ভবন

‘মূলধন’

অনুমোদিত—	২৫,০০,০০০ টাকা
বিক্রীত—	১৮,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত—	১০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

আমরা

সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি, টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও লাভজনক
উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।

ভাল সুদে “মাস্তুলী আমানত” গ্রহণ করি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য

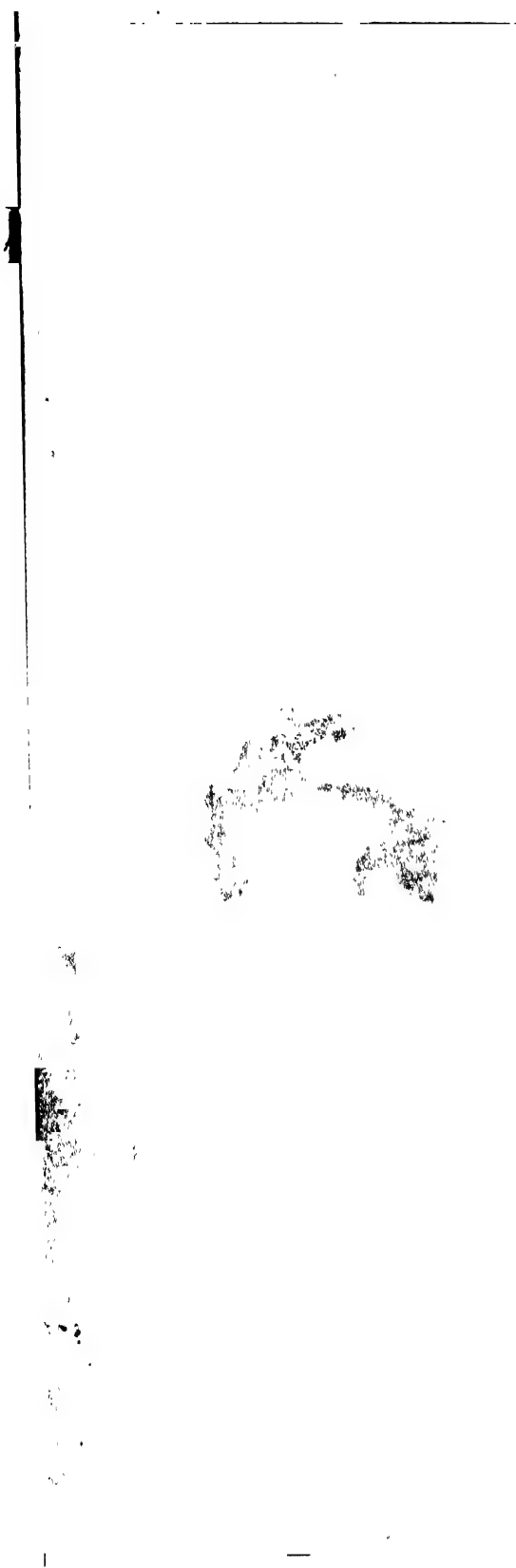
আমাদের “মাস্তুলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” পাঠ করুন।

বিনামূল্যে নমুনা-সংখ্যা পাওয়া যায়।

লক্ষ্মীর বার্তা চির কল্যাণময়,
 দুঃখের আঁধারে আনে আনন্দের জয়।
 সঞ্চয়ের অর্থ্যাতারে অর্জনা তাঁর,
 দেশে দেশে শুনি স্তুতি দেবী কমলার।

অর্থগ্ৰন্থতা আর অর্থ সঞ্চয় এক বস্তু নয়।
 সঞ্চয়ের পথে যাদের প্রশান্ত দৃষ্টি,
 লক্ষ্মীর কল্যাণ-আশীষ তাদেরই শিরে।

দি মোটো পালিচন
 প্রিন্টেড কাং. ৬৬ %
 লি কাতা।





বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বর্তমান মনুস্মৃতিমাজের সমস্তাসমূহের সমাধান করিবার পরিকল্পনা ও কার্যসঙ্কেত —শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ৩৫			হেমন্ত-লক্ষ্মী বন্দনা করো —শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ ৩৭৮ —শ্রীস্বরেশ বিশ্বাস, এম-এ, বার-এট-ল ৩৭৯		
ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর (প্রবন্ধ) —শ্রীকালিদাস রায় ৩৪৭			মন ও বন —শ্রীআশুতোষ সাত্তাল, এম-এ ৩৭৯		
পারসিক চিত্র-শিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি (প্রবন্ধ) —শ্রীগুরুদাস সরকার ৩৫২			নবায় —শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ৩৭৯		
অর্কাটীন (কবিতা) —শ্রীসুনীল ঘোষ ৩৫৫			চাঁদ আয় —শ্রীপ্যারীমোহন সেন ৩৭৯		
মর্ম ও কর্ম (উপতাস) —ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৩৫৬			গল্প—		
আগামী স্বপ্ন (কবিতা) —শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫৭			কামারবুড়ো —শ্রীজনরঞ্জন রায় ৩৮০		
বিচিত্র জগৎ—			রিভলবর —শুদ্ধসত্ত্ব বসু ৩৮০		
গুপ্তপন্নী —শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ ৩৫৮			কথা —শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮২		
ললিত-কলা (প্রবন্ধ) —শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী ৩৫৯			বর্ণসঙ্কর —শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র ৩৮৬		
কথার মর্যাদা } (কবিতা) —শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৩৬২			পাশাপাশি —শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত ৩৮৮		
ভোগ ও লোভ }			দেবীচৌধুরাণীর অমূল্যলনতত্ত্ব (প্রবন্ধ) —শ্রীরামশী কর্মকার ৩৯১		
শিশু-সংসদ—			সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (উপতাস)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪০০		
উদয়ন-কথা —প্রিয়দর্শী ৩৬৩			বিজ্ঞান জগৎ		
দিশাহারা —শ্রীকানাইলাল সাহা ৩৬৫			বাবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য (প্রবন্ধ) —শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪০৩		
আকবরের রাষ্ট্রসাধনা (প্রবন্ধ) এস, ওয়াংজেদ আলি, বি-এ (কেণ্টাব) বার-এট-ল ৩৬৯			প্রাক্তন-স্বপ্ন (গল্প) —শ্রীবটকৃষ্ণ দাস ৪০৬		
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প (প্রবন্ধ) —শ্রীপ্রবোধ ঘোষ ৩৭১			প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব (সচিত্র প্রবন্ধ) —শ্রীবিশ্বনাথ সেন, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল ৪০৮		
কবিতা—					
*হিসাব —শ্রীপ্রিয়লাল দাশ ৩৭৮					

[পর পৃষ্ঠায়

ইন্সিয়ার যাত্রা কা:
৪, রাজা উড্‌মন্ট, ষ্টীট, কলি:

১৮রা ও পাইকারী খরিদারগণের
একমা নিউ-যোগা ভিভান



বিষয় - সূচী - পূর্বাভাস

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোমারই (উপতাস)	—শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়	৪১২
খাত্তশস্ত্রের উৎপাদন বুদ্ধি (প্রবন্ধ)	—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪১৪

বিষয়	লেখক
পুস্তক ও আলোচনা—	
বাংলার ছেলে (শিশু-নাটক)	—শ্রীরঞ্জনকুমার সেন
কবিতা : ১৩৫০ ; মিছিল (কাব্য-সংকলন)	—শ্রীবীরেন্দ্র গুপ্ত
পুরুষ প্রকৃতি (নাটক)	—শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন
রাজা সীতারাম রায় (ঐতিহাসিক নাটক)	

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা— ৪১৮

কলিকাতা ও পূর্ববাংলায় ম্যালেরিয়ার
প্রাদুর্ভাব ; কমলাঘাটে অগ্নিকাণ্ড ; কংগ্রেস
সাহিত্য-সম্মেলন ; পরলোকে মহামহোপাধ্যায়
কবিরাজ গণনাথ সেন ; শ্রীমতী রেখাদেবী ;
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : ১৯৪৩-৪৪ সালের
নোবেল পুরস্কার ; 'জুইশ ডোমিনিয়ন অব
প্যালেষ্টাইন' ; জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অপ-
সারণ ; রুমানিয়ায় নতুন গভর্ণমেন্ট ; বর্ণ-বৈষম্য
না গুণ-বৈষম্য ; বুলগেরিয়ার সহিত চুক্তি ;
মহাযুদ্ধের গতিপথে ।

চিত্র-সূচী

—ভুকা হ' (ত্রিবর্ণ)	শিল্পী—মীরা দেবী
প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রাবলী—	
প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব	
প্রাচীন কলিকাতা	
সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা	
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট	

৪০



জিন্মাগে

বিশুদ্ধ · স্বাদু · হৃদয়

স
ন্দে
শ

৬-৮, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ১৪৬৫

৬৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর

ফোন—পি, কে, ১১৭৭

৪৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ৩০৭৮

ইণ্ডো কন্সাল্ট্যান্ট স্টোর্স

হেড অফিস—৭৭৭, ক্লাইভ স্ট্রীট—কলিকাতা।

ফোন—বি বি ৫৬৪৩

ফ্যাক্টরী—৭২, মালিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

গভর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কন্ট্রাক্টরস্।

আমরা,

ওয়েইং স্কেল, তারের জাল, কোলাপ্‌সিবল ও রট
আয়রণ গেট্‌, গ্রোল, রেলিং এবং নানাপ্রকার
মেসিন ও মেসিনের অংশ তৈয়ার করিয়া থাকি।

কোলিয়ারী, চা-বাগান, মিল ও মিউনিসিপালিটীর
সমস্তপ্রকার অর্ডার সম্বন্ধে কলি।

আমরা আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করি

আপনার পোষাবর্গের সংস্থানের এবং
নিরাপত্তার জন্য

আজই জীবনশীমা করুন।

দি ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স

কোং লিমিঃ

৫, সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সাউথ ২৮৫২।

ତାଓ ଯାଲ ଇଞ୍ଚା ଥ୍ରୀ ଯାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ

== ଲିମିଟେଡ୍

ହେଡ ଅଫିସ—୧୧୫ନଂ କ୍ୟାବିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, କାଲକାତା ।

—ଶାଖାସମୂହ—

ବର୍ତ୍ତମାନକାଳୀ (ହେଡ଼ୱାର ସମ୍ମୁଖେ), ଟାଉଥ କ୍ୟାଲକାତା,
ଲାଲଗୋଲା, ବହରମପୁର ।

ସର୍ବପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ହୁଏ ।

ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର — ବ୍ରାହ୍ମୀ :

ଗ୍ରାମ—ମାର୍କୋବ୍ୟାଙ୍କ

ସ୍ଥାପିତ—୧୯୨୪

ଆମ୍ଭ ନା ଦେବ ସେବାୟ

ନିୟମ ଯାଚେ ଟାଉଲ ବ୍ୟା

ଲିମିଟେଡ୍

ହେଡ ଅଫିସ—୧୧୫ନଂ କ୍ୟାବିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, କାଲକାତା ।

—ଶାଖାସମୂହ—

ଡାୟମଣ୍ଡହାରବାର, ବଜ୍ରବଜ୍ର, ଫଳତା, ନିମତଲା, ବନହରିଗପୁର ଓ କଟକ ।

ସର୍ବପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ହୁଏ ।

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য—২ খণ্ড	১৫৭	ডাকার্ণব		শ্রায়দর্শন (১-৩ অধ্যায়)	১০৭
বান্দীকি-রামায়ণ—প্রতিখণ্ড	১৭	অধ্যাত্মরামায়ণ—২ খণ্ড	১২৭	শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ৩ খণ্ড	১৪৭
কৌলজ্ঞাননির্ণয় (বৌদ্ধতন্ত্র)	৬৭	দেবতামূর্তিপ্ৰকরণম্	৫৭	২য় খণ্ড ২৭, ৩য় খণ্ড ১৭	
বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী	৪৭	কুমারসম্ভব	১১০	রঘুবংশ ২ খণ্ড	৩১০
অভিনয়দর্পণ	৫৭	ছন্দোমঞ্জরী	১৭	ঐ (হিন্দীভাষামুবাদ)	১০
কাব্যপ্রকাশ	৮৭	সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী	১১০	চতুরঙ্গদীপিকা	৩৭
মাতৃকাভেদতন্ত্র	২৭	সামবেদসংহিতা ২ খণ্ড	১২১০	শ্রায়পরিশিষ্ট	৫৭
সপ্তপদার্থী	৪৭	ঐ মূল	১৭	যুক্তিদীপিকা	
শ্রায়ামৃত ও অবৈতসিদ্ধি	১২৭	গোভিলগৃহসূত্র	১২৭	নন্দিকেশ্বর-কাশিকা	
				তত্ত্বচিন্তামণি	যন্ত্রস্ব

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড্

৯০, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা



৩০ খণ্ডে সমাপ্ত

প্রতি খণ্ডের মূল্য—এক টাকা মাত্র।

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড্

৯০, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

আরও ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য
কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রত্যেকটি ২৫ টাকা মূল্যের ২৪,০০০টি আর্ডনারী শেয়ারে বিভক্ত।
দরখাস্তের সঙ্গে শেয়ার প্রতি ৩ টাকা এবং বিলির পর শেয়ার প্রতি
২ টাকা দিতে হইবে। বক্রী টাকা প্রতি শেয়ার বাবদ ৫ হিসাবে
চার কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

দার্জিলিং ব্যাংক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা

বিশদ বিবরণাদির জন্য হেড অফিসে বা আমাদের নিম্নোক্ত যে কোনও

শাখায় আবেদন করুন—

কলিকাতা	বেঙ্গল	বিহার	উড়িষ্যা
ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, শিয়ালদহ, হাওড়া, বেহালা, শ্রামবাজার, বালীগঞ্জ।	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, নিরকাদিম, ইছাপুরা (ঢাকা), বাঁকুড়া, আসানসোল, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং।	পুন্ডলিয়া, রাঁচী, ভাগলপুর, সম্বলপুর, ধানবাদ, ঝরিয়া, জুগসলাই (জামালপুর), সাকচী কাতরাসগড় (মানজুমা), পাটনা।	পুরী, মঙ্গলবাগ (কটক), চৌধুরীবাজার (কটক), খুরদারোড, বেরহামপুর (গঙ্গাম)।
আসাম	ইউ. পি.	"	সি. পি.
তেজপুর গৌহাটি চারালী (দরং)।	জোনপুর, বেনারস।	"	নাগপুর।

টেলি: 'রেনবো'—ক্যাল।

ফোন :—পি. কে.—২৬৮৯।

নি. মুখার্জী,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(আরও শেয়ার বিক্রয় করার জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুযায়ী
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই অনুমতি প্রদানে
ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোনও পরিকল্পনার বা অর্থ-
নৈতিক নিরাপত্তার দায়িত্ব লইতেছেন না।)

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার পরিকল্পনা ও কার্যসঙ্কেত

স্বীকৃতি দান-৪৪৪৪৪৪

আমাদিগের এই প্রবন্ধের বক্তব্য-বিষয় প্রধানতঃ
আট শ্রেণীর, যথা :

- (১) বর্তমান মনুষ্যসমাজের তিন শ্রেণীর সমস্যার নাম ;
- (২) তিন শ্রেণীর সমস্যা-সমাধানের দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার নাম ;
- (৩) দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্যে পবিণত করিবার সঙ্কেতের নাম ;
- (৪) তিন শ্রেণীর সমস্যার সমস্যাই সম্বন্ধে যুক্তিবাদ ;
- (৫) বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিরূপণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ ;
- (৬) বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ ;
- (৭) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ ;
- (৮) দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার এবং এক শ্রেণীর কার্যসঙ্কেতের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিবাদ ।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের তিন শ্রেণীর সমস্যার নাম

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর এবং এই তিন শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে ।

বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা আমাদিগের বিচারানুসারে, যে তিন শ্রেণীর, সেই তিন শ্রেণীর সমস্যার নাম—

- (১) বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিবারণভাবে নিরূপণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা ;

- (২) বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা ;

- (৩) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা ।

মানুষের “দারিদ্র্য” ও “অভাব” আমরা কাহাকে বলি তাহার ব্যাখ্যা না করিলে আমাদিগের বিবেচনায়, উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সমস্যার তৃতীয় সমস্যাটির যে কি অর্থ তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না । মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে মানুষের পারিণত জীবনের অবস্থাসমূহের শ্রেণী-বিভাগ ও মানুষের বিভিন্ন অবস্থার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় । ইহার কারণ মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব তাহার পরিণত জীবনের দুইটা অবস্থা । আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক মানুষের পরিণত জীবনে তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, যথা :

- (১) দারিদ্র্যের অবস্থা ;
- (২) অভাবের অবস্থা ;
- (৩) প্রাচুর্যের অবস্থা । “প্রাচুর্যের অবস্থা”র অপর নাম “ঐশ্বর্যের অবস্থা” ।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের ইচ্ছাপূরণের সক্ষমতার ও অক্ষমতার ভেদানুসারে ইহাদের পবিণত জীবনের অবস্থাসমূহের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে ।

মানুষের জীবনের কাব্যসমূহের ভেদানুসারে ইহাদের ইচ্ছাপূরণের সক্ষমতার ও অক্ষমতার ভেদ হইয়া থাকে ।

মাতৃগর্ভে জন্ম হওয়া অবধি মরণ পধ্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে সমস্ত কাব্য সাধিত হয় সেই সমস্ত কাব্য আমাদিগের মতবাদানুসারে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

- (১) সর্বব্যাপী মনুষ্য-স্বভাবের কাব্য ;
- (২) ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের কাব্য ;
- (৩) মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের কাব্য ।

যে শ্রেণীর কাব্য-বশতঃ প্রত্যেক মানুষের জন্ম স্বতঃই মাতৃগর্ভে সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, সেই শ্রেণীর কাব্যকে আমরা “সর্বব্যাপী মনুষ্য-স্বভাবের কাব্য” বলিয়া থাকি । সর্বব্যাপী মনুষ্য-স্বভাবের কাব্য যে কেবলমাত্র মানুষের মাতৃগর্ভেই বিদ্যমান থাকে তাহা নহে । আমাদিগের মতবাদানুসারে উহা মানুষের জন্মাবধি মরণ পধ্যন্ত বিদ্যমান থাকে ।

যে শ্রেণীর কার্য্য মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার আগে প্রত্যেক মানুষ তাহার শৈশবে অত্যন্তভাবে করিয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্য্যকে আমরা “ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের কার্য্য” বলিয়া থাকি। আমাদের মতবাদানুসারে মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাবের কার্য্যসমূহ তাহার মাতৃগর্ভে বিদ্যমান থাকে না। উহা মাতৃগর্ভ ছাড়া ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজীবন বিদ্যমান থাকে।

যে শ্রেণীর কার্য্য—মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার পর প্রত্যেক মানুষ তাহার সারাজীবনে কখনও অত্যন্তভাবে, কখনও ভ্রম-পূর্ণ বিচারের দ্বারা, কখনও ভ্রমহীন বিচারের দ্বারা সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কার্য্যকে আমরা “মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের কার্য্য” বলিয়া থাকি। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের কোন কার্য্য তাঁহার মাতৃগর্ভে অথবা শৈশবে ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার আগে বিদ্যমান থাকে না। ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার পর উহা আজীবন বিদ্যমান থাকে।

আমাদের মতবাদানুসারে মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশ হইবার পর তাঁহার ব্যক্তিগত অবস্থা উৎপত্তি হয়। মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিকাশের আগে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অবস্থা বিদ্যমান থাকে না। তখন যে অবস্থা থাকে, সেই অবস্থা মানুষের শৈশবাবস্থা। উহা সর্বতোভাবে মানুষের নিজ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের বহির্ভূত।

মানুষের ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী অথবা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহা যখন মানুষ নিভুল ও নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করিতে সক্ষম হন এবং যে সমস্ত সামগ্রী ও ব্যবস্থায় মানুষের তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের অভাব উদ্ভূত হওয়া অনিবার্য্য হয়, সেই সমস্ত সামগ্রী ও ব্যবস্থা যখন মানুষ তৃপ্তির ও স্বাস্থ্যের সামগ্রী ও ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করেন, তখন মানুষের যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থার নাম মানুষের “দারিদ্র্যের অবস্থা।”

মানুষের ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে কি কি সামগ্রী অথবা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহা যখন মানুষ নিভুল ও নিঃসন্দেহভাবে নির্ধারণ করিতে সক্ষম হন, কিন্তু যে সমস্ত সামগ্রী অথবা ব্যবস্থা মানুষের সর্ববিধ ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিতে এবং ব্যবস্থা সর্বতোভাবে সম্পাদন করিতে সক্ষম হন, তখন মানুষের যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থার নাম মানুষের “অভাবের অবস্থা।”

মানুষের দারিদ্র্যের এবং অভাবের অবস্থা দূরীভূত হইলে “প্রাচুর্য্যের অবস্থা”র উৎপত্তি হয়। প্রাচুর্য্যের অবস্থার অপর নাম “ঐশ্বর্য্যের অবস্থা।”

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত ইচ্ছার উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত ইচ্ছা প্রদানতঃ ছয় শ্রেণীর। এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থাও ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ইচ্ছাসমূহ যে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, সেই ছয় শ্রেণীর নাম :

- (১) স্বাস্থ্যগত ইচ্ছা ;
- (২) ধনগত ইচ্ছা ;
- (৩) প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা ;
- (৪) সম্মানগত ইচ্ছা ;
- (৫) তৃপ্তিগত ইচ্ছা ;
- (৬) বিদ্যাগত ইচ্ছা ;

স্বাস্থ্যগত ইচ্ছাসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা :

- (১) শারীরিক আকৃতির স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের) ইচ্ছা ;
- (২) ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বল ও কার্য্য-নৈপুণ্যের) ইচ্ছা ;
- (৩) মনের স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ স্থিরতার ও একনিষ্ঠার) ইচ্ছা ;
- (৪) বুদ্ধির স্বাস্থ্যের (অর্থাৎ ভ্রমহীন বিচারশীলতার) ইচ্ছা ;

আহার-বিস্তারের সামগ্রী সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ইচ্ছা মানুষের হইয়া থাকে সেই সমস্ত ইচ্ছার নাম মানুষের “ধনগত ইচ্ছা।”

যাহা যাহা পাটিলে মানুষের ইচ্ছার পূরণ হয়, তাহার প্রত্যেকটির দ্বারা স্বাস্থ্যের যে শ্রেণীর ইচ্ছা হয়, সেই শ্রেণীর ইচ্ছার নাম “প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা” (Desires for stability)। যখন কোন পরিবর্তন-বিরুদ্ধতা মানুষের ইচ্ছার বিষয় হয়, তখন মানুষের “প্রতিষ্ঠাগত ইচ্ছা”র উদ্ভব হয়।

অসম্মান বাহাতে না হয়, তজ্জন্ম মানুষের যে শ্রেণীর ইচ্ছার উদ্ভব হয় সেই শ্রেণীর ইচ্ছার নাম মানুষের “সম্মানগত ইচ্ছা।” আমাদের মতবাদানুসারে মানুষের দুঃখহীন জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ও নিষেধ পালন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। এই সমস্ত “বিধিমূলক” কার্য্য না করিলে এবং “নিষেধমূলক” কার্য্য করিলে মানুষের অসম্মানের যোগ্য হইতে হয়। মানুষ যাহাতে অসম্মানের যোগ্য না হয় তজ্জন্ম মানুষের স্ব স্ব কর্তব্য ও দায়িত্ববিষয়ক বিধিমূলক কার্য্যসমূহ করিবার ও নিষেধমূলক কার্য্যসমূহ না করিবার ইচ্ছার নাম মানুষের “সম্মানগত ইচ্ছা।”

মানুষের ইচ্ছাসমূহ যেরূপ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, মানুষের দারিদ্র্যাবস্থা, মানুষের অভাবের অবস্থা এবং মানুষের প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্যের অবস্থাও সেইরূপ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

- (১) স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য ;
- (২) ধনগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য ;
- (৩) প্রতিষ্ঠাগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য ;
- (৪) সম্মানগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য ;
- (৫) তৃপ্তিগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য ;
- (৬) বিদ্যাগত দারিদ্র্য, অভাব ও ঐশ্বর্য্য ;

প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছার বিষয় হয় উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য লাভ করা এবং ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাব নিবারণ করা দুই কবি।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাচুর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য লাভ করা প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছার বিষয় বটে কিন্তু আমরা

দিগের মতবাদানুসারে “ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবের কাণ্যসমূহেব” নিয়মানুসারে প্রত্যেক মানুষই উপবোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর দারিদ্র্য লইয়া ব্যক্তিগত জীবন আবশ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্যক্তিগত দারিদ্র্য দূর করিবার জন্ত সজ্জগত সংগঠনের ও ব্যক্তিগত কাণ্যের প্রয়োজন হয়। সজ্জগত সংগঠন না থাকিলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কাণ্যেব দ্বারা কোন ক্রমে এই সমস্ত ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এই সমস্ত ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করিতে হইলে উহার উদ্দেশ্যে সজ্জগত সংগঠন করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। উহার কারণ মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে বিভাগ ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সেই বিভাগ ও ব্যবস্থার অভাব হইলে অথবা যে যে বিভাগ ও ব্যবস্থার মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূরণ করা অসম্ভব হয় সেই সেই বিভাগ ও ব্যবস্থার প্রচলন হইলে মানুষের দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়। সজ্জগত সংগঠন সাধন করিতে না পারিলে যে যে বিভাগ ও ব্যবস্থার অভাবে অথবা প্রচলনে দারিদ্র্য অনিবার্য হয় সেই সেই বিভাগ ও ব্যবস্থার অভাব অথবা প্রচলন দূর করা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভবযোগ্য হয় না।

ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের প্রধান কারণ দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) বিভাগত এবং
- (২) ব্যবস্থাগত।

সজ্জগত সংগঠন সাধিত হইলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের ব্যবস্থাগত কারণসমূহ সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হয় এবং বিভাগত কারণসমূহও আংশিকভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হয়। ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করিতে হইলে উহার জন্ত যেকোন সমস্ত সংগঠনের প্রয়োজন হয় সেইকণ আবার ব্যক্তিগত চেষ্টাও প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করিতে হইলে উহার জন্ত যে সমস্ত ব্যক্তিগত চেষ্টার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত ব্যক্তিগত চেষ্টা দুই শ্রেণীর, যথা :

- (১) বিভাগত চেষ্টা ও
- (২) কার্যগত চেষ্টা।

ব্যক্তিগত দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করিতে হইলে যে শ্রেণীর সজ্জগত সংগঠনের প্রয়োজন সেই শ্রেণীর সজ্জগত সংগঠনের অভাব না হইলে ও উপবোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগত চেষ্টার অভাব হইলে “ব্যক্তিগত মনুষ্যস্বভাবের কাণ্যসমূহেব” নিয়মানুসারে প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত দারিদ্র্য লইয়া ব্যক্তিগত জীবন আবশ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত দারিদ্র্য উপবোক্ত স্বভাবের কাণ্যসমূহের নিয়মে স্বতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং জীবন বিঘ্নমান থাকে।

মানুষের স্ব স্ব বিভাগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য দূর হয়। উহা দূর হয় বটে, কিন্তু কার্যগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হইলে কোন শ্রেণীর প্রকৃত প্রাচুর্য অথবা ঐশ্বর্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কার্যগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হইলে বিভাগত চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও মানুষের কোন না

কোন শ্রেণীর কোন না কোন মাত্রার “অভাব” থাকা অনিবার্য হয়।

যে ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য অথবা ঐশ্বর্য লাভ করা প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছার বিষয়, সেই ছয় শ্রেণীর প্রাচুর্য অথবা ঐশ্বর্য সর্বতোভাবে লাভ করিতে হইলে আমাদের মতবাদানুসারে—

প্রথমত, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কোনও বিভাগ ও ব্যবস্থারের কাহাবও অভাব না হয়, তাহাব সজ্জগত সংগঠন অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষ বাগাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার জন্ত স্ব স্ব বিভাগত ও কার্যগত চেষ্টাসমূহ সম্পাদন করেন, তাহার জন্ত সজ্জগত সংগঠন অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

আমাদিগের মতবাদানুসারে উপবোক্ত দুই শ্রেণীর সজ্জগত সংগঠন সাধিত না হইলে কোন মানুষের এমন কি ব্যক্তিগতভাবে ছয় শ্রেণীর কোন শ্রেণীর প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপবোক্ত দুই শ্রেণীর সজ্জগত সংগঠন সাধন করিবার সমস্যাতে আমরা “মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্যা” বলিয়া অভিহিত করি।

তিন শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার নাম

এ তিন শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, আমাদেরিগের বিচারানুসারে, যে দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার প্রয়োজন, সেই দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার নাম—

- (১) যুগপৎভাবে বর্তমান যুদ্ধের অব্যবসায় নিরাপদভাবে নিষ্কাশন করিবার এবং এতাদৃশ যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার পরিকল্পনা,

- (২) মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা।

আমাদিগের বিচারানুসারে উপবোক্ত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা যে কেবলমাত্র মানবসমাজেব তিন শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা, তাহা নহে। যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলেও এই দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। আমাদেরিগের মতবাদানুসারে এই দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা স্থির করিতে না পারিলে অর্থাৎ কোন উপায়ে বর্তমান যুদ্ধে কোন পক্ষের সর্বতোভাবে জয়লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে। এই হিসাবে উপবোক্ত দুইটি পরিকল্পনাকে “বর্তমান যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিবার পরিকল্পনা” বলি সাহিত্যে পাবে।

দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত

করিবার সংস্কৃতির নাম

আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান মনুষ্যসমাজেব উপবোক্ত তিন শ্রেণীর সমস্যা সমাধান করিতে হইলে যেমন উপবোক্ত দুই

শ্রেণীর পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ঐ দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যাহাতে অনায়াসসাধ্য হয় তাহার কার্য-সম্বন্ধেও প্রয়োজন হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে যে কার্যসম্বন্ধে দ্বারা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা অনায়াসসাধ্য হইতে পারে, সেই কার্যসম্বন্ধের নাম—

“যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়ী হইবার কার্যসম্বন্ধে”—

তিন শ্রেণীর সমস্তার সমস্যাই সম্বন্ধে যুক্তিবাদ

যে তিন শ্রেণীর সমস্যাকে আমরা বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা বলিয়া মনে করি, সেই তিন শ্রেণীর সমস্যাই যে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মনুষ্যসমাজের সমস্যা, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে উহাদিগকে সমস্তা মনে করিবার আমাদিগের যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেই সমস্ত যুক্তি ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণকে অথবা বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ করাকে অথবা মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ ও দূর করাকে আমরা কেন যে বর্তমান মনুষ্যসমাজের তিনটি প্রধান সমস্যা বলিয়া মনে করি, তাহা কাবণ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ তিনটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষই বর্তমান সময়ে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং উহা সাধন করিবার ইচ্ছাও অনেকেবই জাগ্রত হইয়াছে, অথচ ঐ তিনটি কার্য যে কি করিয়া সাধন করা অনায়াসসাধ্য হইতে পারে, তাহা কোন পক্ষ কেহ নিষ্কারণ করিতে পারিতেছেন না।

(২) ঐ তিনটি কার্য সাধন করিতে পারিলে আমাদিগের মতবাদানুসারে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হয় এবং প্রত্যেক মানুষের পক্ষে নিজ নিজ সর্ববিধ অভাব ও সর্ববিধ দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ববিধ উন্নয়ন উপভোগ করা সাধ্যায়ত্ত হয়।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যে সমস্ত কার্য মানুষের ইচ্ছার বিষয় এবং প্রয়োজনীয়, তাহার কোনটি সাধন করা মানুষের কষ্ট-সাধ্য অথবা অসাধ্য হইলে মানুষের সমস্যার উদ্ভব হয়। মানুষের কাম্য অথবা প্রয়োজনীয় কার্যের প্রত্যেকটি যখন মানুষ অনায়াসে সাধন করিতে সক্ষম হন, তখন তাহার কোন সমস্যা থাকিতে পারে না ও থাকে না।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ, যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ এবং মানুষের সর্ববিধ অভাব সর্বতোভাবে দূর করা যद्यপি মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাম্য অথবা প্রয়োজনীয় না হইত অথবা ঐ তিনটি কার্য সাধন করা যद्यপি মানুষের কষ্টসাধ্য না হইত তাহা হইলে ঐ তিনটি কার্যের কোনটিকে মানুষের কোন সমস্যার বিষয় বলিয়া মনে করা যায়ত না।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ তিনটি কার্যের প্রত্যেকটি বর্তমান মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের

অধিকাংশ মানুষের অত্যধিক কাম্য ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, অথচ কেহই উহা সাধন করিবার পন্থা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না বলিয়া আমরা ঐ তিনটি কার্যকে সমস্তার তিনটি সমস্যা বলিয়া মনে করি।

ঐ তিনটি কার্যের প্রত্যেকটি সাধন করা যে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের অত্যধিক কাম্য ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে অথচ কেহই কোনটি সাধন করিবার সঠিক পন্থা যে নির্ধারণ করিতে পারিতেছেন না, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যাহা যাহা বলিবার আছে তাহা অতঃপর আলোচনা করিব।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণকে আমরা যে সমস্তা বলিয়া মনে করি তাহা কাবণ—ঐ অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ, আমাদিগের বিচারানুসারে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের এক্ষণে ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে ; উহা মানুষের মনুষ্যোচিত জীবনধারণের জগা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অথচ ঐ অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ মানব-সমাজের বর্তমান কর্ণধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ যাহাতে অনতিবিলম্বে সাধিত হয়, তাহা যে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের কাম্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের যুদ্ধ-সারথিগণ পশ্চাত্ত বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণের জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন। তাহারা যে অগ্নিবর্ষণের নিকাপণের জগা উদগ্রীব হইয়াছেন তাহা তাহাদিগের কাহারও কোন কথা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। উহাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যেক কথা হইতে বরং বিপরীত ভাব প্রতীয়মান হয়। উহাদিগের কথায় আপাতদৃষ্টিতে যতই বিপরীত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাক না কেন, উহারা যद्यপি সত্যসত্যই যুদ্ধ চালাইবার জগা উদগ্রীব হইতেন তাহা হইলে মানুষের মনস্তত্ত্বের নিষ্কমানুসারে উহাদিগের মুখে শাস্তিস্থাপনের পবিকল্পনার কথা অথবা যুদ্ধের পববর্তী সংগঠন-সমূহের কথা শুনা যাইত না। শাস্তিস্থাপনের পবিকল্পনার কথা এবং যুদ্ধের পববর্তী সংগঠনসমূহের কথা যুদ্ধসারথিগণের মুখে প্রকাশ্যভাবে আজকাল বেকপ শুনা যাইতেছে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে কখনও সেইরূপভাবে শুনা যায় নাই। পাছে মৈনিকগণের যুদ্ধোৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় সেই আশঙ্কায় আধুনিক যুদ্ধনিয়মানুসারে কোন পক্ষের যুদ্ধ-সারথিগণের পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধবিরতির কোন কথা বলা চলে না, ইহা আমাদিগের অভিমত। ঐ কারণে তাহারা স্পষ্টভাবে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণের জগা কোন উদগ্রীবতা দেখাইতে পারেন না। তথাপি তাহাদিগের মুখে যখন শাস্তিস্থাপনের পরিকল্পনার কথা এবং যুদ্ধের পববর্তী সংগঠনের কথা নির্গত হইতেছে, তখন বুঝিতে হয় যে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ তাহাদিগের কাম্য হইয়াছে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকাপণ করা যখন প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তখন উহা

প্রয়োজনীয়তাও যে অধিকাংশ মনুষ্য অল্পবয়সে কবিত্তে আবৃত্তি করিয়াছেন, তাহাও ধরিয়া 'লগ্না' যায়। ইহার কাব্য কোন কাব্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ না হইলে সেই কার্য সম্বন্ধে কোনকপ ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে না—ইহা মনুষ্যস্বভাবের একটি নিয়ম।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিকরপণের প্রয়োজনীয়তা, উপপোক্ত নৃপতি অনুসারে, অনেকটাই অল্পবয়সে কবিত্তে আবৃত্তি করিয়াছেন, ইহা মনে করা যায় বটে, কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা অনেকটাই অনুমান পর্যায়স্থ কবিত্তে পাবেন না—ইহা আমরা মনে করি।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকরপণের প্রয়োজনীয়তা সাধারণতঃ যতখানি মনে হয় বাস্তবিক পক্ষেও উহার প্রয়োজনীয়তা তাহার অনেক দূর বেশী। যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া অনেকটাই হাতিবে বিচায়ে অনেক সামগ্রী পাইতে বহু হইতেছে, আত্মীয়-বন্ধগণ যুদ্ধে নিহত হইতেছেন, স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর কথা শোকাভিমুগ্ত হইতে, হইতেছে, এতদ্বারা আক্রমণের জন্য এক আনা চাউনিয়া অজ্ঞাতনে বসিয়া কবিত্তে হইতেছে বদনসের কান্না কান্না নিশ্চয়তা থাকিতেছে না, যেখানেই বাস করা যায় না, সেখানেই সেখানেই বোমার ও শব্দগণের আক্রমণের ভয়ে অসুস্থ হইয়া পাপন কবিত্তে হইতেছে।

যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সাধারণতঃ উপপোক্ত শ্রেণীর অসুস্থতা সামান্যমাত্রের উদ্ভব হয় বলিয়া এক্ষেপণ করা যায় যে সে কাল বানী করিয়া থাকেন। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে এক শ্রেণীর অসুস্থতা উপপোক্ত শ্রেণীর কারণে যুদ্ধের নিকরপণ বানী বানী বানী হইতে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ যাহারা যুদ্ধজনিত বিভিন্ন কারণেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়া কবিত্তে সক্ষম হইয়া তাহারা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমাদিগের মতবাদানুসারে বই উই শ্রেণীর মানুষের কোন শ্রেণীর মানুষই যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের নিকরপণের প্রয়োজনীয়তা যে কি ও কতখানি তাহা পরিষ্কার করেন।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানুষের মনুষ্যোচিত উৎপত্তি, মনুষ্যোচিত অস্তিত্বের বস্তুকে ছাপ দ্বারা বর্ণিত করা এবং এইভাবে জগৎ যাহা যাহা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা পরিষ্কার, কোন যুদ্ধ চলেই থাকিলে এক একটা মনুষ্যের মনুষ্যত্বের জগৎ নষ্ট হইয়া যায়। অন্যদিকে যে অবস্থায় উক্ত যুদ্ধে মানুষের মনুষ্যত্বের উৎপত্তি, অমানুষ্যোচিত উৎপত্তি, অমানুষ্যোচিত অস্তিত্ব, অমানুষ্যত্ব লাভ করিবার দুঃসাপাতা হইয়া অনিবার্য হয়, সে নষ্ট হইয়া থাকিলে, সেই অবস্থায় উপপত্তি হইয়া ও তাহা কালক্রমে প্রকাশিত হয়।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধের যে সমস্ত বস্তু ও কার্যসঙ্কেত সাধারণ মানুষ গুলুভব বানো এবং অনুমান কবিত্তে বস্তু ও কার্যসঙ্কেত, সেই সমস্ত কুফল উপপোক্ত বস্তু ও কার্যসঙ্কেত দ্বারা কুফল ছাড়া যুদ্ধের কতকগুলি দীর্ঘস্থায়ী কুফল আবিষ্কার করা এবং সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী কুফল সাধারণ মানুষের দৃষ্টিবাস্তব হইয়া

আমাদিগের বিচাবানুসারে, বর্তমান যুদ্ধ আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে তীব্রতায় সঞ্চিত

কবিদ্যাতে সেইরূপ তীব্রতা ও ব্যাপকতার সঞ্চিত আকাশ-বাতাসে, জলে ও স্থলে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী কুফলসমূহের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য হয়।

যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী কুফলসমূহ, বর্তমান যুদ্ধের গত পাঁচ বৎসর চলিবার কালে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই পরিমাণের কুফলবশতঃ আমাদিগের মতবাদানুসারে মানবসমাজের অমূল সংস্কার সাধিত না হইলে, মানুষের অমানুষ্যোচিত উৎপত্তি, অমানুষ্যোচিত অস্তিত্ব, সর্ববিধ দুঃখ এবং প্রকৃত স্তম্ভ লাভ করিবার অসাধ্যতা এখন হইতে চিৎদিনের জগৎ চলিতে থাকিলে।

যে শ্রেণীর তীব্রতা ও ব্যাপকতার সঞ্চিত এই যুদ্ধ চলিতেছে সেই শ্রেণীর তীব্রতা ও ব্যাপকতার সঞ্চিত ইহা আরও দীর্ঘদিন চলিতে থাকিলে, আমাদিগের মতবাদানুসারে, মানুষের পশুত্ব, সর্ববিধ দুঃখ এবং প্রকৃত স্তম্ভ লাভ করিবার অসাধ্যতা আরও তীব্র হইবে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে অথবা মানুষের দুঃখ দূর করিতে হইলে যাহা যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তাহা প্রয়োজনীয় পাওয়া অসম্ভবযোগ্য হইবে।

যুদ্ধ উপপোক্ত দীর্ঘস্থায়ী কুফলের কথা স্বরণ করিয়া বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিকরপণ বানী সাধারণতঃ যতখানি প্রয়োজনীয়তা সাধারণতঃ অধিক বলিয়া

প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে সাময়িক কুফল ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কুফল হইতে কতক মানব-সমাজের যে সমস্ত যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই সমস্ত যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষমান হয় এবং তখন ক্রমে অস্বাভাবিকতা যায় না।

পাঠকগণের মনোনিবেশ হইতে হইয়া পন্থায় এই আড়াই হাজার বৎসরকাল মানবসমাজের যে সমস্ত যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই সমস্ত যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুদ্ধের পক্ষে মানুষের অবস্থা এই যুদ্ধের পক্ষেই যাহা তাহা বর্তমান অবস্থার উপপত্তি হইয়াছে এবং এই উপপত্তির অস্তিত্ব যুদ্ধের পক্ষে অনেক বস্তু বর্ণিত, স্থায়ী হইয়াছে। বিচারক ও ন্যায়ালয়, যাহা যে, যুদ্ধের পক্ষে বর্ণিত না আসিলে মানুষের বিপ্লবের শেষে অবস্থায় তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। যুদ্ধের পক্ষেই যুদ্ধের পক্ষেই মানবের কুফল ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কুফল হইতে অবস্থায় তাহা যুদ্ধের পক্ষেই জগৎ ও জীবন-বিজ্ঞান জানতে পারেন এবং তাহা যুদ্ধের পক্ষেই হইয়া যায়। সে যে স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের অবস্থার, শান্তি ও প্রভুত্বসমূহের উৎপত্তি, অস্তিত্বের ক্ষমতা ও যুদ্ধের ক্ষমতা হইয়া থাকে, সেই সেই স্বাভাবিক নিয়মের জ্ঞানকে আমরা "মানুষের জগৎ ও জীবন-বিজ্ঞান" বলিয়া থাকি। আমাদিগের বিচাবানুসারে "মানুষের জগৎ ও জীবন-বিজ্ঞান" কোন কথা "বর্তমান বর্তমান বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। আমাদিগের বিচাবানুসারে "মানুষের জগৎ ও জীবন-বিজ্ঞান" পাওয়া যায়—কেবলমাত্র ন্যায়ালয় ক্ষমতার লেখা এবং এই লেখাসমূহ যে

ভাষায় লিখিত সেই ভাষা এক্ষণে মনুষ্যসমাজের প্রাক-সকলেরই সম্পূর্ণভাবে অবোধ।

যে যে স্বাভাবিক নিয়ম মানুষের অবয়বের, শক্তির ও প্রকৃতি-সমূহের উপস্থিতি, অস্তিত্বরক্ষা ও বৃদ্ধিসমূহ স্বতঃই হইয়া থাকে, সেই সেই স্বাভাবিক নিয়মের সঠিত পরিচিত হইতে পানিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বয়সের প্রত্যেক মানুষের অবয়বের মধ্যে স্বতঃই তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক মানুষ যে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা ও লিঙ্গের দ্বারা কার্য্য কবিত্তে স্বতঃই সক্ষম হইয়া থাকেন তাহার কারণ অবয়বমধ্যস্থিত ঐ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা। অবয়বমধ্যস্থিত ঐ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলাযুক্ত হইলে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা এবং লিঙ্গের কার্য্য-সমূহ স্বতঃই শৃঙ্খলাযুক্ত হয়। মানুষের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ শৃঙ্খলাযুক্ত হইলে তাঁহার মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য হয়। অবয়বমধ্যস্থিত তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা যত অধিক শৃঙ্খলাযুক্ত হয় মানুষের মনুষ্যত্বও তত বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

অবয়বমধ্যস্থিত ঐ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলাহীন অথবা বিশৃঙ্খল হইলে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা এবং লিঙ্গের কার্য্যসমূহ স্বতঃই শৃঙ্খলাহীন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে। মানুষের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ শৃঙ্খলাহীন অথবা বিশৃঙ্খল হইলে তাহার মনুষ্যোচিত জীবন যাপন করা অসম্ভব হয় এবং মানুষের পক্ষেই উৎপত্তি হয়। অবয়বমধ্যস্থিত তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা যত অধিক শৃঙ্খলাহীনতা অথবা বিশৃঙ্খল-যুক্ত হয়, মানুষের পক্ষে এবং শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাভাবিক অথবা বাদিত অধিক বৃদ্ধি পায়। মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির স্বাভাবিক অথবা বাদিত এবং পক্ষেই বৃদ্ধি পাইলে মানুষের জীবন যাপন-ভাবাক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃ মানুষ মনুষ্যত্বাবে পড়ে হইয়া থাকেন।

যে যে স্বাভাবিক নিয়ম মানুষের অবয়বমধ্যস্থিত তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলাযুক্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, সেই সেই স্বাভাবিক নিয়মের সঠিত পরিচিত হইতে পানিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের অবয়বের মধ্যে সেক্ষণ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা স্বতঃই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের প্রত্যেক অংশে, জলভাগের প্রত্যেক অংশে এবং স্থলভাগের প্রত্যেক অংশেও তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা স্বতঃই সন্ধান-বিদ্যমান থাকে।

উপযুক্ত স্বাভাবিক নিয়মসমূহের সঠিত পরিচিত হইতে পানিলে ইহা ছাড়া আরও তিন শ্রেণীর ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :

- (১) মানুষের অবয়বমধ্যস্থিত তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা নিকট-বর্তী আকাশ-বাতাসের চলৎশীলতার সঠিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং নিকটবর্তী আকাশ-বাতাসের চলৎশীলতা জলভাগের ও স্থলভাগের চলৎশীলতার সঠিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

(২) আকাশ-বাতাসের চলৎশীলতায় অথবা জলভাগের চলৎশীলতায় অথবা স্থলভাগের চলৎশীলতায় কোন শ্রেণীর শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব হইলে মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরস্থ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হয় এবং মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত, পা ও লিঙ্গের কার্য্যসমূহের শৃঙ্খলাহীন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

(৩) আকাশ-বাতাসের অথবা জলভাগের অথবা স্থলভাগের চলৎশীলতায় কোন শ্রেণীর শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব না হইলেও মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরস্থ তিন শ্রেণীর চলৎশীলতা শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার পুনরুদ্ধার করা মানুষের সাধ্যাত্তরংগত। প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধবশতঃ যে মানব-সমাজের দীর্ঘস্থায়ী কল-হওয়া অবগাছাবী হয়, তাহার কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর যুদ্ধে ভূমণ্ডলের আকাশ-বাতাসের, জলভাগের এবং স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের যুগপৎভাবে চলৎশীলতার অল্পবিস্তর শৃঙ্খলাহীনতা উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

আকাশ-বাতাসের, জলভাগের এবং স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের স্বাভাবিক চলৎশীলতায় শৃঙ্খলা-হীনতার উদ্ভব হইলে তিন শ্রেণীর কল-কলোদয় হওয়া অনিবার্য্য হয়। একদিকে মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষের অবয়বস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতার অঙ্গাঙ্গী শৃঙ্খলা-হীনতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। অঙ্গাঙ্গী স্থলভাগের ভূমিভাগ বা চাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার ও তা-ভাগের জলভাগ বা চাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হওয়া এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যধিক উষ্ণতা, অত্যধিক শীতলতা, স্বাভাবিক জলাশয়সমূহের অত্যধিক চল-প্রাবণ, ভূমিকম্প, অত্যধিক বজ্রপাত ও আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎসব হওয়া অবগাছাবী হয়।

মানুষের অবয়বস্থ চলৎশীলতার শৃঙ্খলাহীনতা হইলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয়ের দৌর্দল্য, মনের স্থিরতার অভাব ও গৃহের অভাব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

স্থলভাগের ভূমিভাগ বা চাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার ও জলভাগের জলভাগ বা চাঁচামালসমূহ উৎপাদন করিবার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইলে মানুষের আহার-বিভাবের সামগ্র্য প্রাপ্তি কঠিন হওয়া এবং ক্রমশঃ অভাব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যধিক উষ্ণতা, অত্যধিক শীতলতা, নদী-প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয়সমূহের শুষ্কতা, অত্যধিক প্রাবণ, ভূমিকম্প, অত্যধিক বজ্রপাত এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসব হইতে আবদ্ধ করিলে অধিকাংশ মানুষের জীবন আকস্মিক দুর্ঘটনাময় ও সর্বদা বহুবিধ ভয়ের আশঙ্কাময় হওয়া অনিবার্য্য হয়।

উপরোক্তভাবে যে কোন শ্রেণীর যুদ্ধের ফলে মানবসমাজের অধিকাংশ মানুষের স্থায়ী ভাবে স্বাভাবিক হওয়া, ধনাভাব হওয়া, এবং জীবন আকস্মিক দুর্ঘটনাময় ও সর্বদা বহুবিধ ভয়ের আশঙ্কাময় হওয়া অনিবার্য্য হয়।

যুদ্ধ যখন আকাশে, জলে ও স্থলে ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করে তখন মানুষের স্বাস্থ্যভাব, ধর্মভাব এবং জীবনের আশঙ্কা-ময়তা অধিকতর ব্যাপক ও তীব্র হওয়া উপবোক্ত কারণে অনিবার্য হইয়া থাকে।

আকাশ-বাতাস, জল ও স্থল-পরিব্যাপ্ত যুদ্ধের ফলে যে উপবোক্ত স্থায়ী ভাবে কল্ল সমস্ত অনিবার্য হয় তাহাব জলন্ত দৃষ্টান্ত মানব-সমাজের বর্তমান অবস্থা।

বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হওয়া অবধি আমাদের মতবাদানুসারে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশে অধিকাংশ পরিবর্তন বাধি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই অতিশ্রুতি, অনাবৃষ্টি, নদীসমূহের শুষ্কতার অধিক্য, জলপ্রাবনের অধিক্য, বজ্রপাতের অধিক্য, কখনও উষ্ণতার অধিক্য, আবাব কখনও শীতলতার অধিক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন স্থানে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও দেখা দিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভ হওয়া অবধি যে উপবোক্ত পরিবর্তনসমূহ সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রত্যেক দেশে দেখা দিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের বিচারানুসারে আকাশভাগ, জলভাগ এবং স্থলভাগ-পরিব্যাপ্ত বর্তমান যুদ্ধ এই সমস্ত পরিবর্তনের প্রধান কারণ। আকাশ, জল ও স্থল-পরিব্যাপ্ত যুদ্ধ তীব্রতায় সমৃদ্ধ হইতে থাকিলে আকাশ, জল ও স্থলের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলনশীলতার শক্তি কতদূর পর্যন্ত নষ্ট হওয়া এবং এই শক্তি নষ্ট হইলে মানবসমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্যভাব, ধর্মভাব ও বিপদ-দুর্লভতা কতদূর পর্যন্ত স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি পাত্ত এবং অশান্তি হইবে, তাহা বর্তমান মানুষসমাজের জানা নাই বলিয়া আমাদের বিচারানুসারে এতদংশ যুদ্ধ আর চলিতে থাকিলে মানুষের অবস্থা এক কোথায় উপনীত হইতে পারে, তাহা আজকালকার অনেকের সম্পূর্ণভাবে অনুমান করিতে পারেন না।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপদভাবে সাধন করা বর্তমান মানবসমাজের সাধারণতঃ পক্ষে দুঃসাধ্য—ইহা আমরা মনে করি কেন, আমরা অতঃপর তাহার ব্যাখ্যা করিব।

বর্তমান মানবসমাজের সাধারণতঃ বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে কোনো নির্যাপন করিতে পারেন না—ইহা আমরা মনে করি না। এই পক্ষে কোন পক্ষই উহা নির্যাপনভাবে নির্যাপন করিতে পারেন না, ইহা আমরা মনে করি।

আমাদের বিচারানুসারে বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্যাপনভাবে নির্যাপন করিতে হইলে বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়—এই দুইটি ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধন করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদের বিচারানুসারে এই দুইটি ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধিত না হইলে অথবা কোন উপায়ে বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নির্যাপনভাবে নির্যাপন করা সম্ভবযোগ্য নহে।

আমাদের মতবাদানুসারে এই দুইটি ব্যবস্থা একটা ব্যবস্থাও সাধন করা বর্তমান বিজ্ঞানের সাধ্যাত্মক নহে এবং

সেই হিসাবে উহাদের কোনটাই দুই পক্ষের কোন পক্ষে যুদ্ধ-সারথিগণের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া দুই পক্ষ যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপন করিবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেই পন্থায়, আমাদের বিচারানুসারে, বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপিত হওয়া সম্ভব-যোগ্য নহে। প্রত্যেক পক্ষই বিপক্ষকে বলপূর্বক সন্ধি প্রার্থী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

মানবসমাজে ইতিপূর্বে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত যুদ্ধে এক পক্ষকে বলপূর্বক সন্ধি প্রার্থী করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে মানবসমাজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান যুদ্ধে, আমাদের বিচারানুসারে, উহা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

আমাদের বিচারানুসারে যুগপৎভাবে উপবোক্ত যে দুইটি ব্যবস্থা সাধন করিলে যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপিত হওয়া অবগুস্তাবী হইতে পারে, সেই দুইটি ব্যবস্থা সাধন করিবার উদ্যোগ না করিয়া যে পদ্ধতিতে এই অগ্নিবর্ষণে নির্যাপিত করা সম্ভবযোগ্য নহে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

উপবোক্ত যুক্তি অনুসারে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, দুই পক্ষের কোন পক্ষই বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপনভাবে নির্যাপন করিতে সক্ষম নহেন।

বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ, বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়—এই দুইটি ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধন করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়, তাহাব কারণ দুই শ্রেণীর।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত হয় তাহাব ব্যবস্থা না করিয়া বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপন করিলেই যুদ্ধের দলতন্ত্র সৈনিকগণের দারিদ্র্য ও অভাব অবগুস্তাবী হইবে এবং উহাদের দারিদ্র্য ও অভাব অবগুস্তাবী হইলে প্রত্যেক দেশে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া এবং শাসক-সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন হওয়া, আমাদের বিচারানুসারে, অনিবার্য হইবে।

উপবোক্ত যুক্তি অনুসারে, বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপনের পদ দলতন্ত্র সৈনিকগণের কোন উপদ্রব যাহাতে না হইতে পারে তাহা করিবার জন্য অগ্নিবর্ষণে নির্যাপন করিবার আগে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হইতে পারে তাহাব সংগঠন করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, মানবসমাজ এক্ষণে যে শ্রেণীব দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিচারানুসারে বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাহাতে আর না হয় তাহাব ব্যবস্থা নির্যাপনযোগ্যভাবে সাধিত না হইলে দুই পক্ষের কোন পক্ষই যেহেতু বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে নির্যাপন করিতে স্বীকার করিতে পারেন না। এবং দুই পক্ষ যেহেতু অগ্নিবর্ষণে নির্যাপিত করিতে স্বীকৃত না হইলে এতদংশ যুদ্ধের

অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এই যুদ্ধ দুই পক্ষই স্ব স্ব অস্তিত্ব বক্ষা করিবার জন্য কর্ষণ পূর্ণ করিয়া চালাইতেছেন। এই যুদ্ধে দুই পক্ষের যে-পক্ষ পরাজিত হইবেন সেই পক্ষেরই অস্তিত্ব পয়ান্ত্র বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এই শ্রেণীর আর কোন যুদ্ধের পরিচয় মানবসমাজের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই কারণে আমরা মনে করি যে, দুই পক্ষ স্বেচ্ছায় অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত কবিত্তে স্বীকৃত না হইলে, একপক্ষের পরাজয় দ্বারা এই যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এবং মানবসমাজে যুদ্ধ বাহাতে আব না হইতে পারে তাহা বারম্ভা নিভবযোগ্যভাবে সাদিত না হইলে দুই পক্ষের কোন পক্ষই স্বেচ্ছায় অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত কবিত্তে পারেন না। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর যুক্তি বশতঃ আমরা নিম্নে সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমান যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ নিবারণভাবে নিকাশিত কবিবার একমাত্র পথ উপরোক্ত অভাব ও যুদ্ধ নিবারণ করিবার দুইটা ব্যবস্থা যুগপৎভাবে সাধন করা।

বর্তমান যুদ্ধে দুইপক্ষের কোন পক্ষই যে অপর পক্ষকে পরাজিত করিয়া বলপূর্বক অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত কবিত্তে ও শান্তি-প্রার্থী হইতে বধ্য কবিত্তে পারেন না, তাহা প্রমাণ কারণ, আমাদের মতবাদানুসারে, মানবসমাজের বর্তমান বনগত দাবিদা ও অভাবের অবস্থা। আমরা নিম্নে বিচারানুসারে বর্তমান মানব-সমাজ বনগত দাবিদা ও অভাবের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বর্তমান মানবসমাজ যে বনগত দাবিদা ও অভাবের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা কোনদেশের শাসকসম্প্রদায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন না। তাহাও স্পষ্টভাবে উহা স্বীকার না করিলেও প্রাচ্যবিশ্বে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাও যদি প্রাচ্যবিশ্বে উহা স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে প্রাচ্যবিশ্বে শাসকসম্প্রদায়ের দাবিদা ও অভাব দুই কবিবার সমস্ত কথা শুনা হইত। কোন দেশের শাসকসম্প্রদায় হু হু করে ভাবে স্বীকার করেন না তাহা প্রমাণ প্রত্যেক দেশের শাসন-বিবরণীর মন্তব্যসমূহ। যে কোন দেশের যে কোন বংশের শাসন-বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ঐ বিবরণী অনুসারে ঐ বংশের ঐ দেশে জনসাধারণের গ্রন্থিত বুদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যে এক্ষণে দাবিদার ও অভাবের চূড়ান্তস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা শাসকসম্প্রদায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন আব নাই করেন, উহা জনসাধারণ স্বীকার করিতে পারেন না। আমরা নিম্নে মতবাদানুসারে বর্তমান যুদ্ধে দুই পক্ষেরই যে অভূতপূর্ণ সংখ্যায় দৈনিক সংগ্রহ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহা মানবসমাজের চূড়ান্ত দাবিদা ও অভাবের অবস্থার নিদর্শন। বর্তমান যুদ্ধে দুই পক্ষেরই দৈনিক সংগ্রহ যে অভূতপূর্ণ সংখ্যায় সাধিত হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। “অনাহায়ে বাচসা থাকা আব মরিয়া যাওয়া এই দুই-ই সমান” এতদূশ মনোভাব বনগত অভাবের ও দাবিদার তাড়নায় এত মানুষের মনে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া দুই পক্ষের এতদূশ অভূতপূর্ণ সংখ্যায় সৈন্স সংগ্রহ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে। সমাজমাধ্য দাবিদার, অভ-

বের ও অনাহারের তীব্রতা না থাকিলে বলপূর্বক মানুষকে প্রাণ বিসর্জন করিবার কার্যে যোগদান করান সম্ভবযোগ্য হইতে পারেন না। মানুষের অভাব ও দাবিদা না থাকিলে তাহাদিগকে প্রাণ বিসর্জন করিবার কার্যে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ করা যায় না। বলপূর্বক অথবা ভীতি প্রদর্শন করাইয়া প্রাণ বিসর্জন করিবার কোন কার্যে যোগদান করাইতে না পারিলে বিদ্রোহের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয়। মানবসমাজে এতদূশ দাবিদা ও অভাবের উদ্ভব হওয়ায় দুই পক্ষেরই অভূতপূর্ণ সংখ্যায় সৈন্স সংগ্রহ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবং দুই পক্ষই অতুর্কিতভাবে টেলিগ্রামমান স্ব-স্ব অস্তিত্ব বক্ষায় বাগিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আত্মবিক্রমে মৃত্যু যুদ্ধ কবিত্তেছেন।

উপরোক্ত কারণে কোন পক্ষকে বলপূর্বক সন্ধি প্রার্থী করেন অথবা অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত কবিত্তে বাধ্য করান সম্ভবযোগ্য নহে— ইহা আমরা নিম্নে সিদ্ধান্ত।

মানবসমাজের ইতিহাসে এই যুদ্ধের পূর্ববর্তী যে সমস্ত যুদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় সেই সমস্ত যুদ্ধের অধিকাংশেরই বাহ্য আমাদিগের বিচারানুসারে, হয় ধন্যকৃত্য, নতুবা কামান্ধতা, নতুবা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, নতুবা ঐশ্বর্যের ও আদিপত্যের প্রসার সাধন এই যুদ্ধের পশ্চাতে মানুষের যে শ্রেণীর বনগত দাবিদা ও অভাব বিজ্ঞান আছে সেই শ্রেণীর বনগত দাবিদা ও অভাবের পক্ষবর্তী কোন যুদ্ধের পশ্চাতে বিজ্ঞান ছিল না। বিচার বা দেখিলে আমরা নিম্নে এই কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এতদূশ অভূতপূর্ণ একমের বনগত দাবিদা ও অভাব এবং বর্তমান যুদ্ধে অভূতপূর্ণ একমের ব্যাপকতা ও তীব্রতা— এই কথা বলা হয়।

“বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ বাহাতে আব না হয় তাহা বারম্ভা নিভবযোগ্যভাবে সাদিত না হইলে অল্প কোন উপায় এই— অগ্নিবর্ষণ নিকাশিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে”— ইহা যে অনিবার্য কবি তাহাও কারণ মানবসমাজের বর্তমান দাবিদা ও অভাবের অবস্থা।

আমাদিগের মতবাদানুসারে মানবসমাজে মানুষের বনগত যুদ্ধের প্রবৃত্তি ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ না করিলে মানুষ দাবিদার ও অভাবের ব্যাপকতা ও তীব্রতা হওয়া কখনও সম্ভব যোগ্য হয় না। মানবসমাজ প্রথমে সামাজিক সংগঠনের বনগত বশতঃ তুষ্টিগত, সম্মানগত এবং প্রতিষ্ঠাগত দাবিদার ও অভাব উদ্ভব হয় এবং তাহাও পরে ক্রমে ক্রমে সামাজিক সংগঠনের চূড়ান্তবশতঃ ঐ তুষ্টিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত দাবিদার ও অভাব কিম্বদ্ব পয়ান্ত্র স্বতঃই ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করে। তুষ্টিগত, সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত দাবিদা ও অভাব কিম্বদ্ব পয়ান্ত্র ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করিলে মানুষের দৈনিক প্রবৃত্তিও তীব্রভাবে জাগ্রত হয় এবং মানুষ স্থানগত সম্মানগত করিতে আবদ্ধ করেন। এই স্থানগত সম্মানমত্তের নাম হয় একটা দেশের এক একটা জাতি। মানুষের স্থানগত সম্মানগত কার্য অগ্রসর লাভ করিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ

প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি তীব্রতা লাভ করে এবং তখন ক্রমে ক্রমে 'সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত প্রাধান্ত' লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং একটান পর একটা কপিয়া যুদ্ধ হইতে থাকে। মানব-সমাজে যুদ্ধের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের সম্মানগত ও প্রতিষ্ঠাগত দাবিদ্র্য ও অভাব তত ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধিব, মনোব, ইন্দ্রিয়ের ও শরীরের স্বাস্থ্যগত দাবিদ্র্য ও অভাব এবং অবশেষে ধনগত দাবিদ্র্য ও অভাব আশিয়া দেখা দেয়।

উপবোক্তভাবে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের ফলে যখন পতনের (অর্থাৎ আহার-বিচাের সামগ্রীর) অভাব ও দাবিদ্র্য মনুষ্যসমাজে তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করে, তখন স্বভাবের নিয়মে মানব স্বতই অতিক্রমভাবে যুদ্ধ যাত্রাতে আপনা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন।

আমাদিগের বিচারালুসারে মানবসমাজ বর্তমানে উপবোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন এবং যুদ্ধজাত ধনগত দাবিদ্র্য ও অভাববশতঃ অতিক্রমভাবে বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাত্রাতে আপনা হয় তাহার ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য হইয়াছেন।

মানুষের ব্যক্তিগত দাবিদ্র্য ও স্বভাবসমূহ এর মনুষ্যসমাজের যুদ্ধসমূহ দর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন করিতে হইবে যে সমস্ত বিজ্ঞান অপবিচায়াভাবে প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বিজ্ঞান যে বর্তমান মনুষ্যসমাজে পাওয়া যায় না তাহা জানিত ই হা বিষয়ক আলোচনায় দেখাইব।

প্রথমতঃ বর্তমান যুদ্ধে কোন পক্ষকে বলপূর্বক সমস্ত শাসন পুৰ্ব্বিক্ত করা অথবা সন্ধিপ্রার্থী হইতে বাধ্য করা সহজসাধ্য নহে কেন এবং দ্বিতীয়তঃ বর্তমান যুদ্ধের অগ্রবর্তন নিকট করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত দাবিদ্র্য ও অভাবের সমস্যার সমাজের যুদ্ধ দর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন এবং অপবিচায়াভাবে প্রয়োজনীয় কোন—এই দুইটা বিষয়ে আমরা যে সমস্ত কথা বলিবারছি সেই সমস্ত কথা হইতে ইচ্ছা স্পষ্ট প্রকাশমান যে বর্তমান যুদ্ধসময়কার পতন কাবয়াছেন সেই পন্থায় উহার আরও নিকটাপত্ত হওয়া যোগ্য নহে।

ইহাব্যক্তি জ্ঞান, যাদও বর্তমান যুদ্ধের অগ্রবর্তন নিকট করা সমস্ত মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের বীনা ও প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে, তথাপি ইহা সম্পাদন করা মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে, পক্ষ বর্তমান যুদ্ধ-সময়কার অবস্থা—ইহা আমরা মনে করি। বর্তমান যুদ্ধের আরও নিবারণপূর্বে নিকটাপত্ত করিবার ব্যবস্থা করা যে বর্তমান মনুষ্য-সমাজের একটি প্রধান সমস্যা তাহাও উপবোক্ত কারণে প্রকাশিত না করিয়া পাওয়া যায় না।

বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্যা মনে করিবার যুক্তিবাদ

আমাদিগের মতবাদালুসারে মানবসমাজে যুদ্ধ যাত্রাতে আপনা হয় তাহার ব্যবস্থার কথা বর্তমান মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক

দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যোচিত অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে হইলে অপবিচায়াভাবে প্রয়োজনীয়। মানবসমাজে যুদ্ধ যাত্রাতে আপনা হয় তাহার ব্যবস্থা আমাদিগের মতবাদালুসারে মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে এবং উহা মানুষের প্রয়োজনীয়ও বটে কিন্তু এই ব্যবস্থা সাধন করা বর্তমান মানবসমাজের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে। উহা মানুষের কান্দা এবং প্রয়োজনীয় যত অনায়াসসাধ্য নহে—এই কারণে আমরা এই ব্যবস্থাকে একটি সমস্তা বিসয় বাচা নহে করি।

বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাত্রাতে মানব-সমাজে আপনা হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা যে বর্তমান মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা এই যুদ্ধ-প্রবৃত্তি উই পক্ষের মাঝখানের মুখ হইতে প্রকাশিত এই মধ্যস্থে যে সমস্ত কথা নিবারণ হইতেছে সেই সমস্ত কথা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ যাত্রাতে মানব-সমাজে আপনা হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা করা আমাদিগের মতবাদালুসারে বর্তমান মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের কেবলমাত্র যে সাধারণভাবে একটি ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে তাহা নহে। উহা আমাদিগের মত ইচ্ছার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। উহা বর্তমান মনুষ্যসমাজের তীব্র ইচ্ছার বিষয় না হইলে মনুষ্য-সমাজের বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধ যাত্রাতে মানবসমাজে আপনা হয় তাহার ব্যবস্থা সমস্তে কোন কথা বর্তমান মনুষ্যসমাজে উদ্ভূত পাবিত না। বর্তমান মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ পাবিত হইত মনুষ্যসমাজের মানবের সমস্ত সাধারণ মানুষের পাশ্চাত্যের মধ্যে উই উহা অনাব্যক্ত হইয়া থাকে। এই মনুষ্যসমাজের বর্তমান মনুষ্যসমাজে যুদ্ধবিজ্ঞানের বিকাশ (development) সাধন কাবয়াছেন। অতীত মনুষ্য ও যুদ্ধবিজ্ঞানের বিকাশের প্রবৃত্তি সংগত যে যুদ্ধ যাত্রাতে মানবসমাজে আপনা হয় তাহার ব্যবস্থা সমস্তে যখন কথা উদ্ভূত পাবিয়াছে, তখন আমাদিগের বিচারালুসারে এই কথাই উপস্থাপন হইতে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে হয় যে, যুদ্ধ নিবারণ কাবয়া ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তা বর্তমান মনুষ্য-সমাজে ইহাকাল বাধ্য করিয়াছে।

আমাদিগের মতবাদালুসারে যাত্রা মানবের যে, মনুষ্য-সমাজে আপনা হইয়া মানুষের পাশ্চাত্যের মধ্যে উই উহা অনাব্যক্ত হইয়া থাকে। এই মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা এই যুদ্ধ-প্রবৃত্তি উই পক্ষের মাঝখানের মুখ হইতে প্রকাশিত এই মধ্যস্থে যে সমস্ত কথা নিবারণ হইতেছে সেই সমস্ত কথা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

মানুষের যুদ্ধ নিবৃত্তি করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে হইলে উহা জ্ঞান সামাজিক সংগঠন করিবার প্রয়োজন হয়। এই

সামাজিক সংগঠন সাধিত না হইলে মানুষের স্বাভাবিক যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং যুদ্ধ-প্রবৃত্তির জাগরণ অবশ্যজ্ঞাবী হয়। অন্তর্দিকে উপরোক্ত সামাজিক সংগঠন সাধিত হইলে মানুষের স্বাভাবিক যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে দূরীভূত হওয়া ও নিবারণিত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

যুদ্ধ নিবারণ করিবার ইচ্ছার পরিচয় যখন পাওয়া বাইতেছে, তখন যুদ্ধ নিবারণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথাও যে অস্বাভাবিক পরিমাণে বর্তমান মানবসমাজে বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন তাহা স্থির করিতে হয়।

যুদ্ধ নিবারণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু না কিছু বর্তমান মানবসমাজ যে বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে কিন্তু আমাদের বিচারামুসারে যুদ্ধ মানুষের মনুষ্যোচিত অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতে হইলে সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত করিবার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তাহা আধুনিক মনুষ্যসমাজ এখনও বৃদ্ধিতে সক্ষম হন নাই।

আমাদিগের মতবাদামুসারে মানুষের পণ্ডিত নিবারণ করিয়া ও দূর করিয়া মনুষ্যজ্ঞাত করিতে হইলে এবং প্রকৃত মনুষ্যোচিত সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে হইলে মনুষ্যসমাজে বাহাতে যুদ্ধ না হইতে পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। মনুষ্যসমাজে বাহাতে যুদ্ধ না হইতে পারে তাহার সংগঠন বিত্তমান থাকিলে কোন দেশের কোন মানুষের আকৃতি ভীতিপ্রদ অথবা কুংসিত, কাহারও কোন ইন্দ্রিয়, কোন অঙ্গ দুর্বল, কাহারও মন কোনরূপ অস্থিরতা এবং কাহারও বুদ্ধি দৃষ্টতায়ুক্ত হইতে পারে না। কোন দেশের কোন মানুষের ধনাত্মক অথবা প্রতিষ্ঠার অভাব অথবা সম্মানের অভাব অথবা জ্ঞানভ্রম-পূরণের ব্যবস্থার অভাব হইতে পারে না।

অন্তর্দিকে ঐ সংগঠন বিত্তমান না থাকিলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আকৃতি অস্বাভাবিক কুংসিত অথবা ভীতি-প্রদ হওয়া, ইন্দ্রিয়সমূহের অস্বাভাবিক দুর্বলতা হওয়া, মনের অস্বাভাবিক অস্থিরতা হওয়া, বুদ্ধির অস্বাভাবিক দৃষ্টতা হওয়া, ধনের অস্বাভাবিক অভাব হওয়া, জীবনবাত্রা-নির্বাহে অস্থায়িত্বের, অসম্মানের ও অসন্তোষের অস্বাভাবিক আশঙ্কা থাকা, এবং জ্ঞানের বিকৃতি ঘটা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

আমাদিগের মতবাদামুসারে মনুষ্যসমাজে যুদ্ধ বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হয় তাহার সংগঠন বিত্তমান থাকিলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে পণ্ডিতের লেশহীন মানুষ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। আর ঐ সংগঠন না থাকিলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে পণ্ডিতযুক্ত মানুষ হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

উপরোক্ত হিসাবে মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হয় তাহার সংগঠন যতখানি প্রয়োজনীয় তাহা বর্তমান মনুষ্যসমাজ বিদিত নহেন—ইহা আমরা মনে করি।

ঐ কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যসমাজের যুদ্ধ বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারণিত হয় তাহার সংগঠনের

বাহা মূল প্রয়োজন, তাহা বর্তমান মনুষ্যসমাজে অসম্ভব করিতে পারেন না।

মানবসমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হইতে পারে তাহার সংগঠন করা, আমাদের মতবাদামুসারে যে বর্তমান মানবসমাজের অনাস্থাসাধ্য নহে, তাহার প্রধান কারণ ঐ সংগঠন সাধন করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর জ্ঞানের প্রয়োজন, বর্তমান মানবসমাজে বিজ্ঞানের অপূর্ণতার জন্য সেই সেই শ্রেণীর জ্ঞানের প্রত্যেকটির অভাব বিত্তমান আছে। মানবসমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হইতে পারে তাহার সংগঠন করিতে হইলে কোন মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে কোন শ্রেণীর মারামারির অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি বাহাতে উদ্ধৃত অথবা অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে—তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে মারামারির অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি বাহাতে উদ্ধৃত হইতে অথবা অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে—তাহার সংগঠন করিতে হইলে কোন মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে বাহাতে ধৈর্য, হিংসা এবং স্বপ্ন-কল্পের প্রবৃত্তি উদ্ধৃত হইতে অথবা অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে ধৈর্য, হিংসা এবং স্বপ্ন-কল্পের প্রবৃত্তি বাহাতে উদ্ধৃত—ও অবাধে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তাহার সংগঠন করিতে হইলে কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে শরীরের, স্বাস্থ্যের অথবা কোন ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের অথবা মনের স্বাস্থ্যের অথবা বুদ্ধির স্বাস্থ্যের অথবা প্রয়োজনীয় ধনের (অর্থাৎ আহার-বিহারের সামগ্রী) অথবা প্রতিষ্ঠার অথবা যোগ্য সম্মানের অথবা তৃপ্তির অথবা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বাহাতে কোনরূপ অভাব না হইতে পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। কোন মানুষের ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত অভাবসমূহের কোনটা বাহাতে উদ্ধৃত না হইতে পারে তাহা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, ভূমণ্ডলের জলভাগের এবং স্থলভাগের কোন অংশে বাহাতে সেই অংশের স্বভাবজাত চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব হইতে না পারে তাহার সংগঠন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, ভূমণ্ডলের জলভাগের এবং ভূমণ্ডলের স্থলভাগের কোন অংশে সেই অংশের স্বভাবজাত চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতার উদ্ভব বাহাতে না হইতে পারে তাহার সংগঠন করিতে হইলে স্বভাবজাত পদার্থসমূহের অবয়বে স্বতঃই চলৎশীলতাসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্তন হয় স্বভাবের যে যে নিয়মে সেই সেই নিয়মের সহিত পরিচিত হওয়া অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

উপরোক্ত হিসাবে মানবসমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণিত ও দূরীভূত করিতে হইলে চারিশ্রেণীর বিজ্ঞান অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা :

- (১) মানুষের মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারণিত করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিজ্ঞান।

- (২) মানুষের ঘেব-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা ;
- (৩) মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যের, ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাস্থ্যের, মনের স্বাস্থ্যের, বুদ্ধির স্বাস্থ্যের, প্রয়োজনীয় ধনের, যোগ্যতা-হুবারী, সম্মানের, প্রতিষ্ঠার, তৃপ্তির এবং প্রয়োজনীয় বিচার অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা ;
- (৪) মানুষের অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, জলভাগের এবং স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতাসমূহের শৃঙ্খলাহীন হওয়ার আশঙ্কা সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূরীভূত করিবার সংগঠনের বিদ্যা ।

মানবসমাজের সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ বাহাতে সর্বতোভাবে নিবারণ ও দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংগঠন সাধিত না হইলে কোন শ্রেণীর যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ ও দূরীভূত হইতে পারে না । সর্বশ্রেণীর যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ ও দূরীভূত করিবার সংগঠন একাধিক শ্রেণীর হইতে পারে না । মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি বাহাতে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে দূরীভূত ও নিবারণ হইতে পারে ও হয় তাহা করিতে না পারিলে অল্প কোন পন্থায় মানবসমাজের যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ ও দূরীভূত করা সম্ভব-যোগ্য হয় না । মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পন্থা একটীর বেশী দুইটি হইতে পারে না ও হয় না ।

মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের ঘেব-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি বাহাতে নিবারণ ও দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংগঠন সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূরীভূত করা সম্ভবযোগ্য হয় না । মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের ঘেব-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পন্থা একটীর বেশী দুইটি হইতে পারে না ও হয় না ।

মানুষের ব্যক্তিগত সর্ববিধ অভাব ও সর্ববিধ অভাবের আশঙ্কা বাহাতে নিবারণ ও দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংগঠন সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবের ঘেব-হিংসার ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূরীভূত করা সম্ভবযোগ্য হয় না । মানুষের ব্যক্তিগত সর্ববিধ অভাব ও সর্ববিধ অভাবের আশঙ্কা সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পন্থা একটীর বেশী দুইটি হইতে পারে না ও হয় না ।

মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতা বাহাতে ঘটতে না পারে তাহার সংগঠন সাধন

করিতে না পারিলে অল্প কোন উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব শ্রেণীর অভাব ও তাহার আশঙ্কা সর্বতোভাবে নিবারণ করা ও দূর করা সম্ভবযোগ্য হয় না । মানুষের ব্যক্তিগত অবয়বের, আকাশ-বাতাসের, জলভাগের ও স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক চলৎশীলতাসমূহের কোনরূপ শৃঙ্খলাহীনতা বাহাতে ঘটতে না পারে—তাহার সংগঠন এক শ্রেণীর বেশী দুই শ্রেণীর হইতে পারে না ও হয় না ।

মানবসমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার সংগঠন করিবার পন্থা ও প্রয়োজনীয় চারিশ্রেণীর বিদ্যা সবচেয়ে আমরা উপরে যে সমস্ত কথা বলিলাম, সেই সমস্ত কথার কোনটী কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না ।

যে চারিশ্রেণীর বিদ্যা মানবসমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হইতে পারে তাহার সংগঠন করিবার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেই চারি শ্রেণীর বিচার কোন শ্রেণীর বিচারই আমাদের বিচারমুসারে বর্তমান মানবসমাজে বিদ্যমান নাই । এই চারি শ্রেণীর বিচার কোন শ্রেণীর বিচারই যে বর্তমান মানব-সমাজে পাওয়া যায় না, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না ।

প্রথমতঃ, এই চারি শ্রেণীর বিচার কোন শ্রেণীর বিচার সহিত বর্তমান মানব-সমাজ পরিচিত নহেন ; দ্বিতীয়তঃ, মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার পন্থা একাধিক হইতে পারে না ; এবং তৃতীয়তঃ, মানব-সমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-সারথিগণের মুখে যে সমস্ত কথা শুনা যাইতেছে, সেই সমস্ত কথা আমাদের মতবাদমুসাবে যুক্তিবিহীন—এই তিন কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমান মানবসমাজের সারথিগণের দ্বারা মানব-সমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার পন্থা নির্ধারিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে ।

মানব-সমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হইতে পারে, তাহার যে সমস্ত পরিকল্পনা যুদ্ধ-সারথিগণের মুখে শুনা যাইতেছে, সেই সমস্ত পরিকল্পনার প্রত্যেকটীর মধ্যে সমগ্র মানব-সমাজের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কথা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার কথা আছে । মানবসমাজে বাহাতে যুদ্ধ আর না হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের মতবাদমুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজন থাকিলে, মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ হওয়া ত' দূরের কথা, যুদ্ধ আরও বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যসম্ভাবী হইবে ।

আমাদের মতবাদমুসারে যুদ্ধ বাহাতে আর না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের মনস্তত্ত্বের নিয়মমুসারে ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে না থাকে এবং পুনরায় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্যভাবে

যুদ্ধ প্রধানতঃ ত্রয়শ্রেণীর, যথা :—

- (১) বর্ণাশ্রম বশতঃ বর্ণপ্রাধিকার স্থাপিত করিবার যুদ্ধ ;
- (২) কাব্যবৃত্ত বশতঃ কাম চরিতার্থ করিবার যুদ্ধ ;
- (৩) ধর্মবিশ্বাস বশতঃ কুজ্ঞান বশতঃ উপনিবেশ স্থাপনের—রাজ্য-বিস্তারের ও রাজ্যের বিজয়ের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যুদ্ধ ;

- (৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বশতঃ কুজ্ঞান বশতঃ প্রভুত্ব ও শ্রুতি লোভ করিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যুদ্ধ ;

- (৫) দারিদ্র্য ও অভাব বশতঃ অতিথি বজায় রাখিবার যুদ্ধ ;

- (৬) অভাব দূর করিবার জন্য প্রতিষ্ঠা করিবার যুদ্ধ ।

প্রয়োজনীয়। যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে না থাকে ও পুনরায় না হয়, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে, উপরোক্ত মনস্তত্ত্বের নিয়মগুলির যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয় এবং যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইলে যুদ্ধ ও মারামারি হওয়া সম্ভব হয় এবং অবস্থা বিশেষে অনিবার্য হয়। যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে না থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া যত্বে যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে আমাদের বিচারামুসারে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যবস্থায় যুদ্ধ নিবারিত করা কোনক্রমেই সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদের উপরোক্ত মতবাদামুসারে আমরা মনে করি যে, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামরিক বল বৃদ্ধি করিবার আয়োজন থাকিলে মল্লযা-সমাজে যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহাতে পুনরায় যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য হইবে।

যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে না থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া যত্বে যুদ্ধের ও মারামারির প্রবৃত্তি বাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে যে মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করা যায় না পরন্তু যুদ্ধ অবশ্যজ্ঞাবী হয়—তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত মানবসমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

মানবসমাজের গত আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস আদ্য হইয়াছে খৃষ্ট জন্মবার সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে হইতে। খৃষ্ট জন্মবার সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে গ্রীকগণের অভ্যাদয়কাল বিজ্ঞমান ছিল। গ্রীকগণের অভ্যাদয়কাল হইতে মানবসমাজের আড়াই হাজার বৎসরের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই ইতিহাস আমাদের বিচারামুসারে একটি স্বর্গীয় যুদ্ধের ইতিহাস। এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি জাতির উত্থান হইয়াছে এবং বধনই যে-জাতির উত্থান হইয়াছে তখনই সেই জাতির বিরুদ্ধে কতিপয় প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিরও উদ্ভব হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত উত্থানশীল জাতির পতন না ঘটিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত ঐ উত্থানশীল জাতি এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। সময় সময় ক্রান্তির জগা এক পক্ষ আব এক পক্ষের নিকট সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছেন এবং কিছুদিনের জগা যুদ্ধের বিরতি ঘটিয়াছে কিন্তু আবার দুই পক্ষের যুদ্ধ চলিয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত উত্থানশীল জাতির সর্বতোভাবে পতন না ঘটিয়াছে ততদিন পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে স্থগিত হয় নাই। এইরূপভাবে একটি উত্থানশীল জাতির পতনের পর আর একটি জাতির উত্থান ঘটিয়াছে এবং আবার তাহার পতন ঘটিয়াছে। প্রত্যেক পরবর্তী উত্থানশীল জাতি তাহার পূর্ববর্তী উত্থানশীল জাতির তুলনার সময়বলের প্রসার সাধন করিয়া আসিতেছেন এবং প্রত্যেক পরবর্তী যুদ্ধও পূর্ববর্তী যুদ্ধের তুলনার অধিকতর বিস্তৃতি ও তীব্রতা লাভ করিয়া আসিতেছে। কোন জাতি কখনও মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দূরীভূত ও নিবারণ করিবার জন্য কোনরূপ সংগঠন করেন নাই।

সময়-বলের প্রসার সাধন করিলে যত্বে মানবসমাজের যুদ্ধের

নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত তাহা হইলে আমাদের বিচারামু-সারে মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের যুদ্ধের নিবৃত্তি অনেক দিন আগেই দেখা বাইত এবং উপরোক্তভাবে একটির পর একটি ক্রিয়া, অত্যধিক সংখ্যক উত্থানশীল জাতির পতন ঘটিত না।

সময়বলের প্রসারসাধন করিলে যে মানবসমাজের যুদ্ধের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না পরন্তু যুদ্ধের বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়, তাহা মানবসমাজের আড়াই হাজার বৎসরের উপরোক্ত ইতিহাস হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যুদ্ধের নিবৃত্তি সাধন করিতে হইলে যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি নিবারণ করা প্রয়োজনীয়, তাহাও ঐ ইতিহাস হইতে বুঝা যায়।

মানবসমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার পন্থা যত্বে একাধিক হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত তাহা হইলে আমরা যে পন্থাটিকে মানব-সমাজের যুদ্ধ নিবারণ করিবার পন্থা বলিয়া মনে করি, সেই পন্থা যুদ্ধ-সারথিগণের দ্বারা অবলম্বিত না হইলেও তাহাদিগের পরি-কল্পনায় যুদ্ধের নিবৃত্তি হইলেও হইতে পারে ইহা মনে করা বাইত। কিন্তু একে মারামারি ও যুদ্ধের প্রবৃত্তির সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধিত না হইলে অল্প কোন উপায়ে মানবসমাজের যুদ্ধনিবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং তাহার পর আবার যুদ্ধ-সারথিগণের পরিকল্পনায় যে পন্থার আভাস পাওয়া যায় সেই পন্থায় মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য।

তাহার পর আবার মারামারির ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার ও দূর করিবার সংগঠন করিতে হইলে যে চারি শ্রেণীর বিজ্ঞা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়—সেই চারি শ্রেণীর বিজ্ঞা কোন শ্রেণীর বিজ্ঞাই বর্তমান মানবসমাজে বিজ্ঞমান নাই। কাজেই মানবসমাজে যুদ্ধ বাহাতে আর না হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করা বর্তমান মানবসমাজের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে—ইহা মনে করা অপরিহার্য হইয়া থাকে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, মানবসমাজে যুদ্ধ আর বাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করা মানুষের কাম্য এবং প্রয়োজনীয়, অথচ বর্তমান মানবসমাজের পক্ষে উহা অনায়াসসাধ্য নহে—এই কারণে ঐ ব্যবস্থাকে আমরা বর্তমান মানবসমাজের অসম্ভব সমস্তা বলিয়া মনে করি।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে সমস্তা মনে করিবার যুক্তিবাদ

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থাকে আমরা যে বর্তমান মানব-সমাজের একটি সমস্তা বলিয়া মনে করি, তাহার কারণও তিন শ্রেণীর; যথা:

- (১). মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে;

(২) ঐ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহাও অনেকে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ;

(৩) অথচ ঐ ব্যবস্থা করা যে কিরূপে সম্ভবযোগ্য তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কারণের বিজ্ঞমানতা বশতঃ মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ব্যবস্থাকে আমরা বর্তমান মনুষ্যসমাজের একটি সমস্তা বলিয়া মনে করি।

অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ইচ্ছা মানুষের অন্তিরে সজিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের চিরদিনই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে,—“মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে” এই কথাটি অর্থহীন হয়।

আমাদিগের বিচারানুসারে, যদিও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ইচ্ছা মানুষের অন্তিরে সজিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, তথাপি মানুষের কোনরূপ অভাব না থাকিলে মানুষের মুখে অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার কোন কথা উদ্ভূত হয় না। আমাদিগের মতবাদানুসারে সমগ্র মানবসমাজে একদিন এমন একটি অবস্থা বিজ্ঞমান ছিল যে, কোন দেশে কোন শ্রেণীর অভাবের কথা কাহারও মুখে শুনা যাইত না। মানবসমাজে যেদিন এই অবস্থা বিজ্ঞমান ছিল সেই দিনের কোন ইতিহাস—মানবসমাজে এক্ষণে যে ইতিহাস প্রচলিত আছে সেই ইতিহাসে স্থান পায় নাই।

মানবসমাজে যেদিন উপরোক্ত অভাবহীন অবস্থা বিজ্ঞমান ছিল, সেইদিন আধুনিক কালের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক কালের অবস্থা দেখিলে সমগ্র মানবসমাজে যে একদিন উপরোক্ত ভাবের অভাবহীন অবস্থা বিজ্ঞমান থাকে সম্ভবযোগ্য হইতে পারিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। আজকালকার অনেকে হয়ত আমাদিগের এই কথাটিকে আমাদিগের কল্পনার নিদর্শন বলিয়া মনে করিবেন। যিনি বাহাই মনে করুন, আমাদিগের মতবাদানুসারে ছয় হাজার বৎসর আগে সমগ্র মানবসমাজ সর্বশ্রেণীর অভাবের হাত হইতে সর্বতোভাবে মুক্তাবস্থায় বিজ্ঞমান ছিল। আমাদিগের এই মতবাদ এখনও অকাটাভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, অভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব, সম্মানের অভাব, তৃপ্তির অভাব ও জ্ঞানের অভাব আরম্ভ হইয়াছে গত ছয় হাজার বৎসর হইতে। যদিও ব্যক্তিগত উপরোক্ত স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাব গত ছয় হাজার বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি ধর্মের অভাব এই ভূমণ্ডলের কুত্রাপি এক হাজার বৎসর আগেও দেখা দেয় নাই। যতদিন পর্যন্ত ধর্মের অভাব দেখা দেয় নাই ততদিন পর্যন্ত অভাবের ভিত্তি কোন অভিযোগ মানবসমাজের কুত্রাপি উদ্ভূত হয় নাই। যত দিন পর্যন্ত ধর্মের অভাব দেখা দেয় নাই ততদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র ধর্মবিকৃতির অভিযোগ এবং ধর্মসংকাজের কথা মানবসমাজে উদ্ভূত হইয়াছে। বুদ্ধদেব, শ্রীশ্রী ও নবী মহম্মদ মানবসমাজের ধর্মনীতির কোন সংস্কার

সম্বন্ধে কোন কথা কহেন নাই; ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন হয় নাই; তাঁহাদিগের অত্যাধুনিককালে মানবসমাজের কুত্রাপি কোন শ্রেণীর ধনাভাবের অভিযোগ উদ্ভূত হয় নাই। ধনাভাবের অভিযোগ যে চিরদিন মানবসমাজে বিজ্ঞমান ছিল না তাহা বুদ্ধদেব, শ্রীশ্রী ও নবী মহম্মদের সমসাময়িক মানবসমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধনাভাবের অভিযোগ মানবসমাজে গত এক হাজার বৎসর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও ঐ অভিযোগ কেবলমাত্র ইউরোপ ছাড়া ভূমণ্ডলের অন্তরস্থ স্থান পায় নাই। ঐ অভিযোগের বিস্তৃতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে নববিজ্ঞানের বাষ্প-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহারের কাল হইতে অর্থাৎ গত সোমশত বৎসর হইতে। ঐ অভিযোগের তীব্রতা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে নববিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহারের কাল হইতে অর্থাৎ গত বাট বৎসর হইতে। মানুষের ঐশ্বর্য বিধান করিবার এবং ঐ ঐশ্বর্যের সামঞ্জস্য বিধানের চিন্তা মনুষ্যসমাজে অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু মানুষের অভাব দূর করিবার কোন উল্লেখযোগ্য চিন্তা, উল্লেখযোগ্য ভাবে আধুনিক মানবসমাজের কুত্রাপি বর্তমান যুদ্ধের আগে স্থান পায় নাই। ঐ চিন্তার নিদর্শন বর্তমান যুদ্ধের সারথিগণের মুখে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক বৎসরেরও অধিককাল পরে উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এতদিন পরে যখন সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মনুষ্য দারিদ্র্য ও অভাবে জর্জরিতপ্রায় হইয়াছেন তখন মহামাত্র সারথিগণের মুখে উহা দূর করিবার জন্ত কয়েকটা আধ-অস্পষ্ট কথা শুনা যাইতেছে। ঐ অস্পষ্ট কথা কয়েকটি শুনা যাইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি যে, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা যে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে তাহা দেখিলে উহার প্রয়োজনীয়তাও যে অনেকেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা মনে করিতে হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার জন্ত কোন না কোন ব্যবস্থার যে প্রয়োজন আছে তাহা প্রত্যেক দেশের অনেক মানুষই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ঐ ব্যবস্থার প্রয়োজন যে কতখানি তাহা আমাদিগের মতবাদানুসারে এখনও মনুষ্যসমাজের কোন দেশের সারথিবৃন্দ যথাযোগ্য ভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করেন নাই। উহা যদি মনুষ্যসমাজের কোন দেশের সারথিবৃন্দ যথাযোগ্য ভাবে অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে মানবসমাজের কুত্রাপি কোন শ্রেণীর যুদ্ধ চলিতে পারেনা।

আজকালকার প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞান-বিশারদগণ, রাষ্ট্রনীতি বিশারদগণ এবং অর্থনীতি-বিশারদগণ প্রায়শঃ য য দেশের মানুষের ঐশ্বর্য এবং শ্রুত ও শাস্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত নানাজেণীর

পরিকল্পনার আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই এমন কি স্ব স্ব দেশের মানুষের পর্যাপ্ত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার জন্য কোন পরিকল্পনার অথবা কোন সংগঠনের আলোচনা করেন না। ইহাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে, ইহাদিগের মতবামুসারে, মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কোন সংগঠন না করিলেও কেবলমাত্র মানুষের ঐশ্বর্য, সুখ ও শান্তি বিধান করিবার সংগঠন করিলেই মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখ স্বতঃই দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবহার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ বর্তমান মনুষ্যসমাজের কোন দেশের সারথিবৃন্দেই যে স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ ধারণা নাই, তাহার অজ্ঞতম সাক্ষ্য—মানুষের ঐশ্বর্য ও সুখশান্তি সাধনের জন্য ঐ বিশারদগণের উপরোক্ত কার্য-প্রচেষ্টা।

আমাদিগের বিচারামুসারে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখযোগ্যভাবে সংগঠন সাধিত না হইলে মানুষের ইচ্ছাসমূহের অথবা প্রয়োজনসমূহের পূরণ করা সম্ভব-যোগ্য হয় না এবং ইচ্ছাসমূহের ও প্রয়োজনসমূহের সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে মানুষের কোন শ্রেণীর প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য না হইলে প্রকৃত সুখ অথবা শান্তি লাভ করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যমূলক সংগঠন সাধন না করিয়া ঐশ্বর্য ও সুখশান্তি সাধন করিবার সংগঠন সাধন করিবার চেষ্টা ভিত্তিহীন সৌধ নির্মাণ করিবার চেষ্টার অনুরূপ। আমাদিগের বিচারামুসারে মানুষের ঐশ্বর্য ও সুখশান্তি সাধন করিবার সংগঠন সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সংগঠন সাধন করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়। কোনরূপ সাধনা অথবা কার্য না করিয়া মানুষের পক্ষে স্ব স্ব প্রয়োজনের প্রাচুর্য স্বতঃই লাভ করা যতপি স্বভাবের নিয়ম হইত তাহা হইলে আমাদিগের উপরোক্ত ক্রথা যুক্তিবিহীন হইত। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে কোনরূপ সাধনা অথবা কার্য না করিলে স্ব স্ব প্রয়োজনের প্রাচুর্য স্বতঃই সর্বতোভাবে লাভ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না।

স্ব স্ব প্রয়োজনের প্রাচুর্য স্বতঃই সর্বতোভাবে লাভ করা তাই দূরের কথা, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই লাভ করিয়া থাকেন—প্রত্যেক প্রয়োজনের বিষয়ে দারিদ্র্য ও অভাব। শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া কোন বিষয়ক প্রাচুর্য স্বতঃই লাভ করা স্বভাবের নিয়মামুসারে কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। সুচিন্তিত ও সুবিচারিত শিক্ষা ও সাধনার আশ্রয় লইতে পারিলে স্বভাবের নিয়মে প্রত্যেক প্রয়োজনের প্রাচুর্য মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়। শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া কোন বিষয়ক প্রাচুর্য স্বতঃই লাভ করা স্বভাবের নিয়মামুসারে কোন মানুষের পক্ষে যে সম্ভবযোগ্য হয় না তাহার নিদর্শন বালকের অবস্থা। দরিদ্রের সন্তানই হউক আর ধনী সন্তানই হউক, প্রত্যেক বালক

পূর্ববয়স্ক মানুষের শরীরের, ইঞ্জিরসমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য ও অভাবযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। সুচিন্তিত সুবিচারিত শিক্ষার ও সাধনার আশ্রয় না পাইলে প্রত্যেক বালক পূর্ববয়স্ক হইয়া শরীরের, ইঞ্জিরসমূহের, মনের ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যের অভাবযুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক বালকেরই প্রতিষ্ঠা, সম্মান, তৃপ্তি-শান্তি ও বিচার অভাব থাকে।

সুচিন্তিত ও সুবিচারিত শিক্ষার ও সাধনার ব্যবস্থা না থাকিলে পূর্ববয়স্ক হইলেও বালকগণের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রাচুর্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষ বাহা বাহা আহা-বিহারের সামগ্রী বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার কোনটা স্বতঃই ব্যবহার-যোগ্যভাবে উৎপন্ন হয় না এবং শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া কোনটা ব্যবহারযোগ্যভাবে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। যে-সমস্ত সামগ্রী স্বতঃই বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেকটিকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার প্রয়োজন হয়, নতুবা প্রত্যেকটি স্বতঃই যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় মানুষের ব্যবহারের অযোগ্যাবস্থা।

প্রত্যেক মানুষ স্বভাবের নিয়মে স্বতঃই যে প্রত্যেক বিষয়ে দারিদ্র্য ও অভাবযুক্ত হইয়া থাকেন এবং মানুষের ঐশ্বর্য, সুখ ও শান্তির বিধান করিতে হইলে যে উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার সংগঠন অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্তমান মনুষ্যসমাজে মানুষের ঐশ্বর্য ও সুখ-শান্তি সাধন করিবার সংগঠন বিদ্যমান থাকিলেও মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার কোন উল্লেখযোগ্য সংগঠন যে কোন দেশে নাই তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কাজেই ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা—বলিও প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি কোন দেশের সারথিগণ ঐ প্রয়োজনীয়তা সম্যক ভাবে অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যখন সারথিগণ সম্যকভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন আমাদিগের বিচারামুসারে মানবসমাজের কৃত্রিম কোনরূপ বৃদ্ধ থাকিতে পারিবে না। পরন্তু সর্বত্র সমস্ত জাতির পরস্পরের মধ্যে মিলনের প্রবৃত্তি অবশ্যজ্ঞাবহী হইবে। ইহার কারণ কোন মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিতে ও নিবারণ করিতে হইলে আমাদিগের মতবামুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের মিলিত কার্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের মিলিত কার্য ছাড়া অজ্ঞ কোন উপায়ে কোন মানুষের এমন কি ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করা অথবা নিবারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে বলিও এখন পর্যন্ত মানব-সমাজের সারথিগণের বুঝা সম্ভবযোগ্য হয় নাই, তথাপি এ

প্রয়োজনীয়তার কথা যে প্রত্যেক দেশের মানুষ অল্প সঠিকভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা প্রত্যেক দেশের মানুষ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত অভাব ও দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার যে একটীমাত্র পন্থা বিদ্যমান আছে, সেই একটীমাত্র পন্থা কেহই সঠিকভাবে এখনও নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই হিসাবে, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা আমাদের মতবাদানুসারে মনুষ্যসমাজের বর্তমান সারথিগণের সাধ্যাতিরিক্ত।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা মনুষ্য-সমাজের বর্তমান সারথিগণের সাধ্যাতিরিক্ত বলিয়া আমরা যে মনে করি তাহার প্রধান কারণ—এ সম্বন্ধে কোন কথা বর্তমান বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানে মানুষের ধননীতি বিষয়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও চাকুরী সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত কথার প্রধানতঃ উদ্দেশ্য মানুষের ঐশ্বর্য সাধন করা। আমাদের বিচারানুসারে এই সমস্ত কথার মধ্যে মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার কোন কথা পাওয়া যায় না এবং বর্তমান বিজ্ঞানের ধননীতি অনুসারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত কার্য করা হয়, সেই সমস্ত কার্যে মানুষের ঐশ্বর্যের যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ দারিদ্র্য, অভাবেরও বৃদ্ধি হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের ধননীতি অনুসারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত কার্য করা হয়, সেই সমস্ত কার্যে যে মানুষের দারিদ্র্য এবং অভাবের বৃদ্ধি হয়, তাহা জাতিগণের অবস্থা দেখিলে কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানের ধননীতি অনুসারে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে জাতিগণ জাতি যে উন্নতির উচ্চ-শিখরে উঠিয়াছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, অথচ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিবার পর, জাতিগণ জাতিগণী হইতে তাঁহাদের অধিবাসিবৃন্দের অল্পসংস্থান করিতে অক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত যে উপনিবেশের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা জাতিগণ কর্তৃপক্ষকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে। অল্পসংস্থান করিলে দেখা যাইবে যে, একশত বৎসর আগে জাতিগণ জাতিগণ যে শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাব ছিল না, এক্ষণে সেই শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অভাব দেখা দিয়াছে। শুধু জাতিগণ জাতিগণ কেন, আমাদের বিচারানুসারে প্রত্যেক জাতিগণই অভাব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা যে মনুষ্যসমাজের বর্তমান সারথিগণের সাধ্যাতিরিক্ত নহে, তাহা এই সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত কথা বলিতেছেন সে সমস্ত কথা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বর্তমান সারথিগণের অনেকেই যুদ্ধের পর মানুষের অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে নিজ নিজ সঙ্কল্পের পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু কেহই উহার কোন পরিকল্পনার কোন

কথা স্পষ্টভাবে বলিতেছেন না। আমাদের মতবাদানুসারে মানুষের যখন কোন কার্যের পরিকল্পনা জানা থাকে তখন এই কার্য সম্বন্ধে কোন কথা বাহির হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে উহার পরিকল্পনার কথা বাহির হওয়া মানুষের স্বভাব। আমাদের বিচার, মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা যতপি মনুষ্যসমাজের সারথিগণের জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা এতদিনে উহা মানবসমাজের সমুখ প্রকাশ করিতেন।

মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা অধিকাংশ মানুষের কাম্য ও প্রয়োজনীয়, অথচ এই ব্যবস্থার পন্থা কেহই নির্ধারণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া এই ব্যবস্থাকে আমরা বর্তমান মনুষ্যসমাজের একটি সমস্তা বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় শ্রেণীর পরিকল্পনার এবং এক শ্রেণীর কার্যসঙ্কেতের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিবাদ

বর্তমান মানবসমাজের তিনটি সমস্তা সর্বতোভাবে সমাধান করিবার একমাত্র পন্থা আমাদের বিবেচনানুসারে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীর কার্য সাধন করা, যথা :

প্রথমতঃ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সর্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করিবার কার্য ;

দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিবার এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার পরিকল্পনা স্থির করিবার কার্য ;

তৃতীয়তঃ, নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর কার্য যুগপৎভাবে সাধন করিবার কার্য, যথা :

(১) উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা সমগ্র মানবসমাজে জনসাধারণের এবং বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণের সমুখে উপস্থিত করিবার কার্য ;

(২) সমগ্র মানবসমাজের—বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণ যদিও প্রথম পরিকল্পনানুযায়ী কার্য করিতে স্বীকৃত হ'ন তাহা হইলে তাঁহাদের সর্ববিধ আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কার্য ;

(৩) ভারতবর্ষের সংগঠনের উপরোক্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনা—কার্যে পরিণত করিবার জন্ত এবং ভারতবর্ষের শাসন-কার্য পরিচালনার জন্ত প্রত্যেক দেশের—বিশেষতঃ বিপক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধি আহ্বান করিবার কার্য।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর কার্যের প্রথম শ্রেণীর কার্যের নাম—“মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা ;”

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যের নাম—
“যুগপৎভাবে বর্তমান যুদ্ধের অগ্রবর্ণ নিরাপদ ভাবে নির্ধারণ
করিবার এবং এতাদৃশ যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার
পরিকল্পনা”;

যে তিন শ্রেণীর কার্যের যুগপৎ সাধন করা উপরোক্ত পাঁচ
শ্রেণীর কার্যের তৃতীয় শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত, সেই তিন শ্রেণীর
কার্যের যুগপৎ সাধন করিবার নাম—

“যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়ী হইবার কার্যসম্বন্ধে”—

আমাদিগের মতবাদানুসারে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক
মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে ষ ষ ইচ্ছানুরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ঐশ্বর্য
সর্বতোভাবে লাভ করা বাহাতে সম্ভবযোগ্য হয় তাহা করিতে
হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও
অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সম্ভব
সংগঠন অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। সমগ্র মনুষ্যসমাজের
প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে ষ ষ ইচ্ছানুরূপ প্রত্যেক
শ্রেণীর ঐশ্বর্য সর্বতোভাবে লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইলে কোন
মানুষের যুদ্ধের ত' দূরের কথা, মারামারির অথবা হত্যা-কলহের
অথবা ঘেব-হিংসার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত জাগ্রত হইতে পারে না।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের কোন দেশের কোন মানুষের ঘেব-হিংসার
অথবা হত্যা-কলহের অথবা মারামারির অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত
বাহাতে জাগ্রত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে
বিভিন্ন দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোন শ্রেণীর যুদ্ধ হওয়া
বে অসম্ভব হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে আমরা মনে করি যে, সমগ্র মনুষ্য-
সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও
অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সম্ভব
সংগঠন করিতে পারিলে মনুষ্যসমাজে বাহাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ
না হয় এবং প্রত্যেক মানুষ বাহাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি স্বতঃপ্রণোদিত
হইয়া পরিত্যাগ করেন তাহা করা অবশ্যসম্ভাবী হয়।

এই হিসাবে, বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ
করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও
অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার জন্ত সম্ভব
সংগঠনের সাধন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। ঐ
সংগঠন সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে উহার পরিকল্পনা স্থির
করিতে হয়।

প্রথমতঃ, বর্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ সর্বতোভাবে নিবারণ
করিবার ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্তা এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ব্যক্তিগত
দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার
ব্যবস্থা-বিষয়ক সমস্তা—এই দুই শ্রেণীর সমস্তা সমাধানের জন্ত,
আমাদিগের বিচারানুসারে, মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব
সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার জন্ত সম্ভব
সংগঠন সাধন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় এবং ঐ সম্ভব
সংগঠন সাধন করিবার জন্ত উহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির
মানুষের সর্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব বাহাতে সর্বতোভাবে দূরীভূত
ও নিবারিত হইতে পারে তাহার সম্ভব সংগঠন সাধন করিতে
হইলে, আমাদিগের বিচারানুসারে, সর্বপ্রথমে উহার পরিকল্পনার
প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু একমাত্র ঐ পরিকল্পনা নির্ধারণ করিতে
পারিলেই যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ
দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত ও নিবারিত করিবার
সম্ভব সংগঠন সাধিত হইতে পারে তাহা আমরা মনে করি
না। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ দারিদ্র্য ও
অভাব সর্বতোভাবে বাহাতে দূরীভূত ও নিবারিত হইতে পারে ও
হয় তাহার সম্ভব সংগঠন সাধন করিতে হইলে একদিকে যেদিক
উহার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার ঐ পরিকল্পনা
বাহাতে কার্যে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবারও আবশ্যক
হয়।

ঐ পরিকল্পনা বাহাতে কার্যে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা
করিতে হইলে আমাদিগের বিচারানুসারে ঐ উদ্দেশ্যে সমগ্র মানব-
সমাজের সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির আন্তরিকভাবে মিলিত কাহা
অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। উহা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু
আমাদিগের বিচারানুসারে, দুই পক্ষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি যেদিক ভাবে
প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাতে ঐ দুই পক্ষের আন্তরিকভাবে মিলন
ত' দূরের কথা, কোন শ্রেণীর মিলন হওয়া সহজসাধ্য নহে।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের আন্তরিকভাবে মিলন বাহাতে সম্ভব-
যোগ্য হয়, তাহা করিতে হইলে, আমাদিগের বিচারানুসারে, এক-
পক্ষ বাহাতে আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-প্রবৃত্তি
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহার ব্যবস্থা করা
অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

একপক্ষ বাহাতে সর্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-
প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা করিতে হইলে, আমা-
দিগের বিচারানুসারে, অপর পক্ষ বাহাতে যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়-
লাভ করিতে পারেন তাহা করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়
হয়।

আমাদিগের বিবেচনার একপক্ষ বাহাতে সর্বতোভাবে ঐ
যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা করিতে পারিলে, অপর পক্ষ
আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন এবং তখন সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত
দেশের আন্তরিক মিলিতভাবে কার্য করা সম্ভব হইবে। সমগ্র
ভূমণ্ডলের সমস্ত দেশের আন্তরিক মিলিতভাবে কার্য করা সম্ভব
হইলে মানুষের সর্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার
ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে
এবং প্রত্যেক দেশে উহার সংগঠন করা অসম্ভবসাধ্য হইবে।
প্রত্যেক দেশে ঐ সংগঠন সাধিত হইলে বর্তমান মানব-সমাজের
তিন শ্রেণীর সমস্তার সমাধান যুগপৎভাবে হওয়া অনিবার্য্য
হইবে।

উপরোক্ত উপায়গুলি ইহা বুঝিতে হয় যে, বর্তমান মানব-সমাজের তিনটি সমস্যার সমাধান সর্বতোভাবে করিতে হইলে একপক্ষ বাহ্যতে এই যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করেন, তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। এই কারণে আমরা “যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়ী হইবার কার্য্যসূচককে” মানব-সমাজের তিন শ্রেণীর সমস্ত সমাধানের কার্য্যসূচক বলিয়া মনে করি।

অতঃপর আমরা এই যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিবার কার্য্যসূচক কি হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিব। এই যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিবার কার্য্যসূচক কি হইতে পারে তাহা স্থির করিতে পারিলে আমাদের প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা যে কি তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

আমাদিগের বিচারানুসারে গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবসমাজে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যুদ্ধ করিবার যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতিতে কোন যুদ্ধে কোন পক্ষের সর্বতোভাবে জয়লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে বিপক্ষ বাহ্যতে আবার যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্তিলাভ হইতে না পারেন এবং আবার ঐ বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে না হয় তাদৃশভাবে যুদ্ধ-জয় করিতে হয়। যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে বিপক্ষ বাহ্যতে আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ঐক্যগণের অভ্যুদয়কাল হইতে গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবসমাজে যুদ্ধ করিবার যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি অনুসারে বিপক্ষকে বলপূর্ব্বক হটক অথবা ছলপূর্ব্বক হটক অথবা কৌশলপূর্ব্বক হটক বিধ্বস্ত করিয়া শান্তিপ্ৰার্থী করিতে হয়। উপরোক্তভাবে বলপূর্ব্বক অথবা ছলপূর্ব্বক অথবা কৌশলপূর্ব্বক বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া শান্তিপ্ৰার্থী করিতে পারিলে, আমাদিগের মতবাদানুসারে, বিপক্ষকে আন্তরিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করান যায় না। উহাতে বিপক্ষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি দ্রবীভূত হয় না, বরং প্রতিহিংসা লইবার জন্য বিপক্ষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি অধিকতর তীব্রতার সহিত জাগ্রত হয় এবং সুবিধা পাইলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

গত আড়াই হাজার বৎসর কালে মানবসমাজে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি আমাদিগের উপরোক্ত মতবাদের সমর্থক।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যে কোন যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে বিপক্ষ কেন অতগুলি মনুষ্য-জীবন স্ফটাপন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে হয় এবং যে সমস্ত অভিযোগবশতঃ বিপক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত অভিযোগ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রতিজ্ঞা বিপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বিপক্ষকে প্রদান করিতে হয় এবং ঐ সমস্ত অভিযোগ দূর করিবার ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়।

উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে যে বিপক্ষ আন্তরিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে এবং যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে পশ্চিভূত করিয়া শান্ত্যাব বিসর্জিত করিতে ও মিত্রতাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন তাহা কেহ স্বীকার করিতে পারেন না। এই পন্থায় যে, যে-কোন যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয় করা সুনিশ্চিত হয় তাহাও প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

আমাদিগের মতবাদানুসারে যে দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন সেই দুই পক্ষের যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের অভিযোগ দূর করিতে সক্ষম হন না। এই কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষের যে কোন পক্ষ সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না ও সক্ষম হন না।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, বর্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ সমগ্র মানবসমাজব্যাপী ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব। আমাদিগের মতবাদানুসারে যুদ্ধের অভাব আত্মকাল অধিকাংশ মানুষকেই নাই কিন্তু প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ মানুষ আহা-বিহারের একান্ত প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রীর অভাবে জর্জরিত হইতেছেন। আহা-বিহারের সামগ্রীর অভাবকে আমরা ধনাভাব বলিয়া অভিহিত করি। এই কারণে আমাদিগের বিচারানুসারে বর্তমান এ যুদ্ধের প্রধান কারণ ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব।

ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব বর্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ বটে, কিন্তু আমাদিগের বিচারানুসারে অল্প পশ্চিগ্রেণীর অভাবও এই যুদ্ধের পশ্চাতে বিদ্যমান আছে।

আমাদিগের মতবাদানুসারে অ্যাকুসিস্ পক্ষ প্রধানতঃ তাঁহার অধিবাসিবৃন্দের ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিবার ও নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রসার সাধন করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর মিত্রপক্ষ তাঁহার অধিবাসিবৃন্দের ধন-গত দারিদ্র্য ও অভাব-বাহ্যতে বৃত্তি পাইতে না পারে তাহার উদ্দেশ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বাহ্যতে থরক না হয় তাহা করিবার জন্য অ্যাকুসিস্-পক্ষের হাত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দুই পক্ষের উপরোক্ত যে দুই শ্রেণীর মনোভাব এই যুদ্ধের পশ্চাতে বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই দুই শ্রেণীর মনোভাব যে দুই পক্ষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিবেন অথবা নিশ্চিত আছেন—তাহা আমরা মনে করি না। আধুনিক মানবসমাজের মানুষ অনেক সময়ে অনেক কার্য্যে কোন উদ্দেশ্য অথবা কারণ নির্ধারণ না করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাহারা এই সমস্ত কার্য্য করেন তাহারা কার্য্যের উদ্দেশ্য অথবা কারণ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিদিত না হইলেও ব্যতির হইতে কার্য্যের ধারা দেখিয়া উহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

আমাদিগের বিচারানুসারে এই যুদ্ধে যে পক্ষ সমগ্র মানব-সমাজের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণকে, তাঁহাদিগের আহা-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিজ্ঞা ঐ জনসাধারণের বিশ্বাস-যোগ্যভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষ সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

পেটের দ্বারে মাছব কতপি যুদ্ধ করিতে। প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের উপরোক্ত কথা অসার বলিয়া বাতিল করা যাইত। বর্তমান যুদ্ধের পশ্চাতে যে মাছবের পেটের দ্বার দারুণভাবে বিতর্কিত আছে, তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না। মাছবের পেটের দ্বার উপস্থিত না হইলে জীবননাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও এত অগণিত সংখ্যার যুদ্ধে যোগদান করা সম্ভব-যোগ্য হয় না। জার্মানগণের পেটের দ্বার না থাকিলে হিটলারের কিবা তাহার অমৃতবর্গের পক্ষে তাহাদিগকে আশ-পেটা ধাওরাইয়া এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধে অটল রাখা সম্ভবযোগ্য হইত না। জাপান, রুশিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পক্ষেও এই একই কথা খাটিতে পারে।

“যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে দেশের লোকের কোনরূপ অভাব-অসুবিধা থাকিবে না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে প্রত্যেকের অভাব অসুবিধা অনিবার্য”—এতাদৃশ কথা প্রকারান্তরে জনসাধারণকে বুঝাইয়া প্রত্যেক দেশের যুদ্ধ-সারথিগণ স্ব স্ব দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধে নানারূপ ক্লেশ থাকা সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল অটল রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন—ইহা আমরা মনে করি।

প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহে নানারকমের ক্লেশ ও অসুবিধা আছে বলিয়াই উহা সম্ভবযোগ্য হইতেছে। উপরোক্ত ক্লেশ ও অসুবিধা না থাকিলে জনসাধারণকে ঐরূপ ভাবে এত দীর্ঘকাল যুদ্ধে অটল রাখা সম্ভবযোগ্য হইত না। “যুদ্ধে জয়লাভ হইলে জনসাধারণের সর্ববিধ অভাব ও অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিবেন”—এতাদৃশ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক দেশের যুদ্ধ-সারথিগণ নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধে অটল রাখিতে সক্ষম হইতেছেন বটে, কিন্তু কোন দেশের জনসাধারণকে নিজ নিজ দেশের যুদ্ধ-সারথিগণের দেওয়া অভাব-অসুবিধা দূর করিবার প্রতিশ্রুতির প্রতি সর্বতোভাবে বিশ্বাসযুক্ত তাহা আমরা মনে করি না।

প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ প্রায়শঃ নিজ নিজ নেতৃবর্গের সদিচ্ছার প্রতি বিশ্বাসশীল এবং তদনুসারে নেতৃবর্গ যে জনসাধারণের মঙ্গলার্থ কার্য করিয়া থাকেন তাহা বিশ্বাস করেন এবং তদনুসারে নেতৃবর্গের আদেশ পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ স্ব স্ব কিসমতের দোহাই দিয়া নৈরাশ্য ও হতাশাপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। জনসাধারণের উপরোক্ত ভাব লক্ষ্য করিলে আমাদের বিচারে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ অতর্কিত ভাবে স্ব স্ব নেতৃবর্গের দেওয়া অভাব-অসুবিধা দূর করিবার সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে কোন দেশের নেতৃবর্গই স্ব স্ব দেশের মাছবের কোন শ্রেণীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিতে অথবা নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। এই সক্ষমতা যে কোন এই নেতৃবর্গের থাকিতে পারে না—তাহা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমাদের বিচারানুসারে কোন দেশের নেতৃবর্গ এতদবহার “ব্যক্তিগত মনুষ্য-স্বভাবে” নিরানুসারে জনসাধারণের সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেন না।

প্রত্যেক দেশের উপরোক্ত অবস্থার যদি কোন পক্ষ সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণকে তাহাদিগের আহা-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি এই জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমাদের বিচারানুসারে সেই পক্ষের প্রত্যেক দেশের বিশেষতঃ বিপক্ষীয় দেশের জনসাধারণের সর্বোপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাজনক হওয়া অনিবার্য হইবে। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের এই পক্ষের আদেশ ও পরামর্শ যত আন্তরিকতার সহিত পালন করিতে উদ্যত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হইবে, স্ব স্ব দেশের নেতৃবর্গ কতপি এই পক্ষের বিতর্কী হন তাহা হইলে এই নেতৃবর্গের আদেশ ও পরামর্শ তত আন্তরিকতার সহিত পালন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইবে না। ইহার ফলে প্রত্যেক দেশের নেতৃবর্গকে হয় উপরোক্ত পক্ষের আদেশ ও পরামর্শানুসারে চলিতে বাধ্য হইতে হইবে, নতুবা তাহাদিগের নেতৃত্বের পথ-গোঁড় হইতে ইস্তফা দিতে হইবে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই যুদ্ধে যে পক্ষ সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণকে তাহাদিগের আহা-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি এই জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষের সর্বতোভাবে জয়লাভ করা অবশ্যজ্ঞাবী হইবে।

সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের আহা-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি যে পক্ষ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষের এই যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয়লাভ করা অবশ্যজ্ঞাবী হইবে বটে, কিন্তু কোন পক্ষের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করা সহজসাধ্য নহে।

এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করা যে সহজসাধ্য নহে তাহার কারণ—এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মাছবের ব্যক্তিগত সর্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির করা অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। এই পরিকল্পনা স্থির করা আমাদের বিচারে মতবাদানুসারে বর্তমান বিজ্ঞানের সাধ্যাতিত। উহা বর্তমান বিজ্ঞানের সাধ্যাতিত বলিয়া মানবসমাজের বর্তমান অবস্থার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহার কারণ—বর্তমান মানবসমাজ বর্তমান বিজ্ঞানকে অধিক শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকে।

এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করা কোন পক্ষের সহজসাধ্য নহে বটে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে মানবসমাজের কোন সমগ্র সমাধান করা অত কোন উপায়ে আরো সম্ভবযোগ্য হইবে না। বতদিন পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই পক্ষের এক পক্ষ মানব-সমাজের জনসাধারণকে

ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করিতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত মানব-সর্বাঙ্গ হইতে ধূম দূর করাও কোনক্রমেই সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং এমন কি বর্তমান যুদ্ধের অন্তিমবর্ণ নিরাপদ ভাবে নির্দোষ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না—ইহা আমাদের অভিমত। আমাদের এই অভিমত বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা যে বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বিচার বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষের বুঝা সহজসাধ্য নহে। আমাদের উপরোক্ত অভিমত যে সন্দেহের অযোগ্য, তাহা যুদ্ধের অবস্থা বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সক্ষমতা লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা নির্ধারণ করিতে হয়।

প্রথমে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সর্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে নিবারণ করিবার ও দূর করিবার পরিকল্পনা; তাহার পর, উপরোক্ত প্রথম পরিকল্পনামুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিবার এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার পরিকল্পনা।

আমাদের বিচারামুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব দূর ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনামুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিতে না পারিলে শুধু ঐ পরিকল্পনা নির্ধারণ করিলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের সর্ববিধ আহাৰ-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ঐ পরিকল্পনামুসারে ভারতবর্ষ ছাড়া অল্প কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে ভূমণ্ডলের বর্তমান অবস্থার সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের সর্ববিধ আহাৰ-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ঐ পরিকল্পনামুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিলে উপরোক্ত অভাব পূরণ করিবার সক্ষমতা অর্জন করা অবশ্যজ্ঞাবী হয়।

ঐ পরিকল্পনামুসারে অল্প কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে যে উপরোক্ত অভাব পূরণ করিবার সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, অথচ ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিলে যে উহা অর্জন করা আমাদের মতবাদামুসারে অবশ্যজ্ঞাবী হয়, তাহার কারণ দুইশ্রেণীর; যথা :—

- (১) ভারতবর্ষের স্বাভাবিক স্থানগত বৈশিষ্ট্য; এবং
- (২) ভারতবর্ষের জমির অজ্ঞাত দেশের জমির তুলনায় স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বৈশিষ্ট্য ও আধিক্য।

ভারতবর্ষের যে স্বাভাবিক স্থানগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে তাহা ভূমণ্ডলের সর্বোচ্চ পর্বতশিখর গৌরীশঙ্করের অবস্থান দেখিলে অনুমান করা যায়। গৌরীশঙ্করের মত উচ্চ পর্বতশিখর ভূমণ্ডলের অপর কোন দেশে পাওয়া যায় না।

অজ্ঞাত দেশের জমির তুলনায় ভারতবর্ষের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তিন শ্রেণীর ব্যাপার হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

- (১) মানুষের তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যকর বহু আহাৰ-বিহারের সামগ্রী একমাত্র ভারতবর্ষে ছাড়া অল্প কোন দেশে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না ;
- (২) মানুষের বুদ্ধির ও মনের স্বাস্থ্য সর্বতোভাবে বজায় রাখিতে হইলে যে-যে সামগ্রী অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়, তাহার কোনটা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না অথচ অল্প কোন দেশে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ হয় না ;
- (৩) ভারতবর্ষের জমি হইতে যে পরিমাণের ফসল প্রতি বৎসর কোনরূপ কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিয়া স্বভাবতঃ উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য, অল্প কোন দেশের জমি হইতে সেই পরিমাণের ফসল প্রতি বৎসর কোনরূপ কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিয়া স্বভাবতঃ উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য নহে।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনামুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার সক্ষমতা অর্জন করা কেন অবশ্যজ্ঞাবী হয়, আর অল্প কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে উহা কেন সম্ভবযোগ্য হয় না—তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে স্বভাবের কোন্ কোন্ নিয়মে, ভূমির ও ভূমির উৎপাদিকাশক্তির এবং তাহাদিগের বৈশিষ্ট্যসমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় তাহার বর্ণনা করিতে হয়। ঐ সমস্ত কথা খুব বিস্তৃত এবং সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে বুঝা দুষ্কর। ঐ সমস্ত কথা আমরা ইতিপূর্বে বঙ্গভাষাতে ব্যাখ্যা করিয়াছি।

অল্প কোন দেশের সংগঠন সাধন করিলে ঐ দেশের পক্ষে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর বর্তমান অভাব সর্বতোভাবে দূর করা বর্তমান সময়ে সম্ভবযোগ্য নহে বটে, কিন্তু আমাদের মতবাদামুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের দারিদ্র্য ও অভাব সর্বতোভাবে দূর করিবার পরিকল্পনামুসারে যে কোন দেশের সংগঠন করা যাক না কেন ঐ সমস্ত দেশ নিজ নিজ অধিবাসিগণের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর এবং এমন কি কাঁচামালের পর্যন্ত অভাব সর্বতোভাবে দূর করিতে ও নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন।

ভারতবর্ষের উপরোক্ত সংগঠন সাধন করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপরোক্ত সংগঠন সাধন করা বর্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে সম্ভবযোগ্য নহে।

বর্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি না হইলে ভারতবর্ষের সংগঠন করা এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া আমাদের মতবাদামুসারে বর্তমান যুদ্ধের

নিবৃত্তি হইবার আগে সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ঐ অভাব পূরণ করিবার প্রতিজ্ঞা দিওয়া অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

আমাদিগের বিচারালয়সারে প্রথমতঃ, সমগ্র মানবসমাজের অভাব ও দারিদ্র্য সর্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের সংগঠন সাধন করিবার পরিকল্পনা; তৃতীয়তঃ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের আহাৰ-বিহারের প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার পরিকল্পনা, সমগ্র মানব-সমাজের বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলে এবং ভারতবর্ষের সংগঠনকার্য সাধন করিবার জন্ত ও সংগঠনকার্য পরিচালনার জন্ত প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি আহ্বান করিলে মানবসমাজের কেহই তাহাদিগের অভাব পূরণ করিবার প্রতিজ্ঞাতির সত্যতা সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোনরূপ অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের আহাৰ-বিহারের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক সামগ্রীর অভাব সর্বতোভাবে পূরণ

করিবার প্রতিজ্ঞাতি বে-পক্ষ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পক্ষের এই যুগে সর্বতোভাবে জয়লাভ করা বে অবশ্যজ্ঞাবী—তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

যুগে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে বাহা বাহা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় তাহা লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগে সর্বতোভাবে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদিগের প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা ও কার্যসম্বন্ধে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর পরিকল্পনা আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশান্তরে বঙ্গভীতে প্রকাশ করিয়াছি।

আমাদিগের মতবাদালয়সারে ভারতবর্ষের শাসনভার বে-পক্ষের কায়স্থ, কেবলমাত্র সেই পক্ষেরই এই যুগে সর্বতোভাবে জয়লাভ করা অনায়াসসাধ্য। অতঃপক্ষের এই যুগে সর্বতোভাবে জয়লাভ করা কোনক্রমে সম্ভবযোগ্য নহে। ঐ হিসাবে বর্তমান অবস্থার মিত্রপক্ষের সর্বতোভাবে জয়লাভ করা সুনিশ্চিত হওয়া উচিত।

ধর্ম ও ধর্ম

বর্ণের অর্থালয়সারে “ধর্ম” বলিতে বুঝায় সেই কার্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যে কার্যে অথবা চালচলনে জীবের উপস্থিতি, বহিঃ এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। অথবা যাহা মানুষের কন্ম উচিত, তাহার নাম ধর্ম, ইহা বলা যাইতে পারে। আর “ধর্ম” বলিতে বুঝায় সেই কার্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপস্থিতি ও তেজ বশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, জীব যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম, যথা—চোঁড়ের ধর্ম, সাধুর ধর্ম, পণ্ডিত ধর্ম ইত্যাদি।.....

বঙ্গভী—১৩৪৩, বৈশাখ, পৃঃ ৪১৩

ব্রাহ্মণ

একদিন বহু ভারতবাসী যে “ব্রাহ্ম”কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, তাহা “ব্রাহ্মণ” শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মকে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে মানুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত না। ঋক বেদের অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইয়া বেদান্ত-দর্শনের বক্তব্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এখনও ব্রাহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়।... ..

বঙ্গভী—১৩৪৩, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৭৫

বঙ্গশ্রী

জাদিশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

{ ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতচন্দ্রে র বাতালন্দর

শ্রীকালিদাস রায়

ভারতচন্দ্রে রজন্যস ও রত্নিরসের কবি। সে জন্ত তাঁহার নিজস্ব কবিত্ব-প্রতিভা যেমন বিভ্রাম্বলে পরিচুট, অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত ভেমনটি হয় নাই। অন্নদামঙ্গলের বাকী অংশ রসালকলের আচ্ছাদনীর মত। ইহার রসালো অংশ এই বিভ্রাম্বল। এই গর্ভকাব্যের রুচি বর্জমান যুগের রসাদর্শের অমুগত নয়। তবু ইহার কবিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নায়ক-নায়িকার ‘স্বন্দর ও বিভা’ নামকরণ বেশ বাঞ্ছনীয়। সৌন্দর্য্যবোধের সহিত বিভাবস্তার মিলন বড়ই চুল্লভ ও দুর্লভ—কচিং কখনও ঘটে। যেখানে ঘটে, সেখানেই প্রকৃত কবিত্বের জন্ম হয়। এই মিলনের দৃতীই প্রকৃতি—এই কাব্যে সেই পুণ্ড্রবাসিনী মালিনী। অন্তরের গভীর স্তরে এই মিলন—মনের স্রবঙ্গ-পথে। এই মিলনের আনন্দ কবিত্তি গোপনেই উপভোগ করেন—চরম দৈহিক আনন্দের Symbol-এর দ্বারাই বিভ্রাম্বলে সেই আনন্দের আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কবিত্তিস্তের গোপন স্তরেই এই আনন্দলীলা পর্য্যবসান লাভ করে না। তাহা রসস্রষ্টার মধ্য দিয়া বহির্জগতে প্রকাশ লাভ করে।

এখন এই কাব্যখানিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক—ইহাতে কতটা রস স্রষ্টি হইয়াছে।

তুলিকার করেকটি আঁচড়ে কবি বর্জমান শহরের ঐখ্যেব আভাস দিয়াছেন।

চৌমিকে শহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ঘোল গুলি ব্রীজ বাজার।
ধামে বাঁধা মস্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মন বাড়ে বলকে বলকে।
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী ভাহাজী।
হাজার হাজার দেখে ধামে বাঁধা বাজী।
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পণ্ড-পক্ষী যে আছে সসারে।

স্বন্দরকে দেখিয়া বর্জমানের কুলবধুগণের জল আনিতে আসিয়া কি দশা হইল—তাহার রুচি যেমনই ইউক, তাহার বর্ণনা বড়ই সরস—

দেখিয়া স্বন্দর রূপ মনোহর স্তরে জরজর বত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচলী কণক কটির বসন খসে অমনি।
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদনআলার মরম গলায় বকুলতলার বসিয়া আই।
আহা ময়ে বাই লইয়া বালাই কুলে দিয়া হাই ভজি ইহারে।
- বোপিনী হইয়া ইহারে লইয়া হাই পলাইয়া সাগরপারে।

কহে একজন লর মোর মন এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে আলিয়া সোহাগে গালিয়া হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে।
আর জন কর এই মহাশর চাপা ফুলময় খোঁপায় রাধি।
হলদী জিনিয়া তহু চিকনিয়া মেহেতে ছানিয়া ক্ষমরে রাধি।
যরে গিয়া আর দেখিব কি ছার মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাওড়ী রাগিনী মনদী নাগিনী বিবেক ভরা।

ইত্যাদি শেষ পর্য্যন্ত রুচি স্রীলতার গণ্ডী অভিক্রম করিয়াছে। যুক্তাকর বর্জন করিয়া কবি ঘন ঘন মিল দিয়া মালিনীর আবির্ভাবের আগেই ললিত পদের এই মালিকাটি গাঁথিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের হীরা একটি অপূর্ণ স্রষ্টি। বাস্তবনিষ্ঠ হীরা-চরিত্রটি কবি বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়—ইহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বেন পরিচয় ছিল এবং কুকনগরের রাজবাড়ীর কাছেই ইহার মালিক-ঘোড়া বাড়ীটিও ছিল। হীরার পরিচয়—

কথার হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাঝা দোলা হস্ত অধিরাম।
গালভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাড়ী কথা কর ছলে।
চূড়া বাঁধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী।
ফুলের চূপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু শুঁড় আছে শেষে।
ছিটা ফেঁকটা মস্ত তত্ত্ব জানে কতগুলি।
চেন্সড়া ভুলারে খার কত জানে ঠুলি।
বাতাসে পাতিয়া কাঁদ কন্দল ভেজার।
পড়লী না থাকে কাছে কন্দলের দার।

রামপ্রসাদের মত মালিনীর বেসাতিতে কবি বঙ্গের একটা জমকালো তালিকা দিয়াছেন, সেটা বড় কথা নয়। ইহাতে

১ রামপ্রসাদের বিভ্রাম্বলে ঠিক এই ছন্দে এইরূপ ভাবার পূরনারীদের আক্ষেপের বর্ণনা আছে। ভারতচন্দ্রে রত্নের উপর রসান দিয়াছেন মাত্র।

“জয়-মাকারে রাখিয়া ইহারে নয়ন-দ্বারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো নিরখিতে ভালো দেখে সখি আলো আঁখি মুদ্রিয়া।
কহে রামা আর গলে পরি হার এ হার কি ছার কেলিগো টেনে।
সাধ পূরে তবে হেন দিন হবে কোন জন কবে ঘটাবে এনে।
বলে কোন আই আমি যদি পাই পলাইয়া হাই এদেশ থেকে।
নীলী-কলা কঁাদে বাঁধি নানা ছাঁদে প্রাণ বড় কাঁদে
দে না-লো ডেকে।”

মালিনীর যে চরিত্রটি কুটরাছে তাহা কথা-সাহিত্যেরই উপযোগী। যে যুগে কথা-সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, কাব্যের মধ্যে বাহ্যিক অলঙ্কার থাকিত, সে যুগে এই চরিত্রটি কাব্যের রসপুষ্টিরই সহায়তা করিয়াছে।

বিভার রূপ-বর্ণনা ঠিক কবিত্বের না হউক—রচনা-চাতুর্ধ্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত—আলঙ্কারিকতার কসরৎ। বলা বাহুল্য, ইহাতে 'বিভা'র রূপ কিছুই ফুটে নাই। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাবতী'র রূপই কুটরাছে। ইহাতে একটি বাহ্যিক অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন নাই।

সুন্দরের রূপ অবশ্য ইতিমধ্যেই কুটরা উঠিয়াছে,—কোন বর্ণনার দ্বারা নয়—বর্তমানের কুলবধূদের রূপমুগ্ধতার মধ্য দিয়া।

বিভার রূপবর্ণনাঙ্কলে কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যতিরেক অলঙ্কারে পক্ষ বাক্যচাতুর্ধ্যের পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

বিনানিয়া বিনোদিনী বৈশীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকার।
কে বলে শায়দ শবী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলি।
কি ছায় মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
তুফর সমান কোথা তুফতঙ্গে ডুলে।
কাড়ি নিল যুগমদ, নয়নহিম্মলে।
কাঁদে কে কলকী চাঁদ যুগ লরে কোলে।
দেবাসুরে সদা বন্দ্য সুধার লাগিয়া।
ভরে বিধি তার মুখে ধুইল লুকাইয়া।
পদ্মবোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
তুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল।
কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িষ বিধরে।
নাভিকূপে যেতে কাম কুচশঙ্ক বলে।
ধরেছে কুন্ডল তার রোমাবলি তুলে।
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অত্যাশি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু।
যে জন না দেখিয়াছে বিভার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ।
জিনিয়া হরিজা চাপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে কবি তারে মরশন।

এই যে বাক্যচাতুর্ধ্য—ইহাতেও ভারতচন্দ্র মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। ২ চিরপ্রচলিত রূপবর্ণনার ভাবাই ইহা।

২ রামপ্রসাদও বিভাসুন্দরে এইরূপ কষ্টকল্পিত আলঙ্কারিকতার সাহায্যে বিভার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ভুবিল কুরঙ্গশিত মুখন্দু-সুধার।
লুপ্ত গাত্র তজ্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।
নাভিপত্র পরিহরি মত্ত মধুপান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুন্তহান।

তবু ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব আছে। উপমান-উপমেয়গুলিকে কবি অভিনব চক্রে সাঙাইয়াছেন। এই আলঙ্কারিক, কলাচাতুর্ধ্যকে সে-কালের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নির্দশন মনে করা হইত। সে-যুগে সকল আর্টই-ছিল decorative, কবিত্বের আর্টও সে-যুগে এইরূপ decorative না হইবে কেন?

কবি বিভা-সুন্দরের বিহার অসঙ্কোচে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমান সাহিত্যের বিচারে ইহা রুচি বিগর্হিত। 'বাক-প্রিয় রচনার দিক' হইতে ইহাকে সরসই বলিতে হয়। কবি আলঙ্কারিকতার প্রাচুর্য ও পদবিভ্রাসের চাতুর্ধ্যের দ্বারা অলীলতাকে কতকটা নিগূহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বিহার-বর্ণনার কবি সাধারণ ভাষা ত্যাগ করিয়া জঙ্ঘলি ও বৈক্যব কবিত্বের ছন্দ আশ্রয় করিয়াছেন। এই ভাষার এই ছন্দে রাধা-শ্যামের বিহার বর্ণনার প্রথা পূর্ব হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল। অন্নদার পূজার জন্ত অবচিত পুষ্প বস্ত্রের কামার্তা পত্নীর রতি-সজ্জার নিয়োজিত করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল—রাধা-শ্যামের লীলা-বর্ণনার ভাষা ও ছন্দকে বিভাসুন্দরের বিহারবর্ণনার বিনিয়োগ করিয়া অনেকের মতে ভারতচন্দ্র সেই অপরাধ করিয়াছেন। বস্ত্রের মত ভারতচন্দ্রও বঙ্গ-সাহিত্যে শাপগ্রস্ত (রাহগ্রস্ত?) হইয়া আছেন।

বিভাসুন্দরের মূল আখ্যান-বস্ত্র সহিত কামকেলি-বর্ণনার অপরিহার্য সম্বন্ধ নয়। কামকেলির বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য—বিভা ও সুন্দরকে অবলম্বন করিয়া রসাইয়া রসাইয়া সেই কেলির বর্ণনা করিয়া নিজেও আনন্দ পাইয়াছেন—রাজকুন্তিরও আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। রাজসভার প্রোভায়াও ইহাতে নিশ্চয়ই প্রচুর রস পাইয়াছেন। এই অকারণ কেলিবর্ণনার জন্ত বিভাসুন্দর ভ্রাক্ষ-যুগের সভ্যসমাজে অপাত্তের হইয়াই ছিল। এক জ্ঞেয়ীর প্রোভা ভ্রাক্ষযুগেও গোপাল উড়ের মারকতে ইহার রস কতকটা উপভোগ করিত। বর্তমান যুগের পাঠকদের রুচি ইহাকে সহ্য করিলেও সং-সাহিত্য বলিয়া বরণ করিতে প্রস্তুত নয়।

শ্রদ্ধারসাসক্ত কাব্যে ধণ্ডিতার বর্ণনা একটা কবি-পদ্ধতি। বিভা রহস্য করিবার জন্ত সুন্দরের মুখে সিন্দুর-কাজল লাগাইয়া অত্যাশঙ্কো চিত্রিত করিয়া আদিরা ঈর্ষ্যাক্ষারিতা ধণ্ডিতার রূপ ধরিল। ইহা গতানুগতিক কাব্য-পদ্ধতির অহুত্তি মাত্র। ইহাতে কবির কোন মৌলিকতা নাই।

ভারতচন্দ্র বৈক্যব কবিত্বের অল্পকরণে বিভার মান ও মানভঙ্গের চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। মান-ভঙ্গের কিয়দংশ গীতগোবিন্দের অল্পবাদ বলিলেই হয়। তবু ইহাতেও কিছু মৌলিকতা আছে, রূপের পুতুরী রমণী-রসজ্ঞ কবি সুন্দরকে বিদ্যার পারে ধরাইয়া বলিয়াছেন—

হৃদে ধরে রাঙাপদ হৃদে বেন কোকনদ নুপুং জমর ধনি করে।
ভারত কহিছে সার বলিহারি বাই তার হেন পদ মাথায় যে ধরে।

কিবা সোমরাজি হলে বিধি বিচরণ।

বৌবন-কৈশোর-বন্দ্য করিল ভজন।

কোন বা বড়াই কাম পঞ্চমর তুণে।

কতকোটি ধরশর সে নয়নকোণে।

আর একখানি সমসাময়িক কাব্য নিধিরায আচার্য্যের কালিক-বদল। ইহাতেও এই ধরনের রূপবর্ণনা আছে।

যাহার মায়কতে যে-সব কথা বলা হইত—বিষয় মায়কতে সে-সব কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র অল্প সাহসের পরিচয় দেন নাই।

চোরবেশে গুপ্ত সুল্লরকে দেখিয়া রাণীর মাতৃ-বাৎসল্যের উদ্ভব ও খেদ বেশ সরস করিয়া বর্ণিত। সুল্লরকে দেখিয়া পুরনারীদের পতিনিধা—আর একটি সরস রচনা। পুরনারীদের পতিনিধা একটি চিরপ্রচলিত প্রথা, ইহাতে ভারতচন্দ্রের মৌলিকতা নাই।
কিন্তু রচনা-চাতুৰ্য্যে কবি এ শ্রেণীর পূর্ববর্তী সকল রচনাকেই পরাজিত করিয়াছেন। এই রচনার রুচিও জঘন্য। ইহাতে রঙ্গ-রসের চাতুৰ্য্য আছে। অধিকাংশ স্থল তুলিয়া দেখাইবার উপায় নাই। অপেক্ষাকৃত শিষ্ট অংশ উৎকলন করিয়া দেখাই—

রাজভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই তারে।
লাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ,
আমি কাঁপি কামিজের সে বলে উবন।
চতুর্দ্বার খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়,
বন্ধর পড়ুক চতুর্দ্বারের মাথায়।
আর রামা বলে সেই কিছু ভাল বটে,
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে।
রাজ-ভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিবে বঞ্চিত। ইত্যাদি

কবি পুরনারীদের মধ্যে দণ্ডবী, ঘড়েলের বধূদেরও বাদ দেন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ীতে যে সকল লোক চাকুরী করিত, ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গে যেন তাহাদের সকলেরই পরিচয় দিয়াছেন। সম-সাময়িক সুপরিচিত লোকদের লইয়া রঙ্গরস করাও কবির উদ্দেশ্য ছিল। সমস্তের মধ্য দিয়া সুল্লরের মদনমোহন রূপেরই মতিমা

সুল্লরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চাঁদে পাইলেক লাজ।
কষ্টতপ করে চাঁদে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে গিয়ে না হয় সমান।
ভিলকুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপে শুণে খগপক্ষী চকুর সমান।
লজ্জার আকুল হৈয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিকুসেবা করে পক্ষী হৈতে সমসর।
তথাপি না পারিল নাসা সমান হৈতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আসে ভারতে।
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তাহা অপমানে ভঙ্গ।
খঞ্জন উড়িয়া গেল যুগ বনমাঝে।
চকোর চান্দ্রের আগে রহিলেক লাজে।

৩ ভারতচন্দ্রের জন্ম পরীতে হইলেও তিনি নাগরিক জীবনই বাপন করিতেন। তাহার কাব্যে বাংলার পরাজীবনের পরিচয় নাই। বাংলার নাগরিক জীবনই সর্বত্র ফুটিয়াছে। এই যে নগর—তাহা কৃষ্ণনগর ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান—এমন কি দিল্লীও কৃষ্ণনগরেরই পুনরাবৃত্তি।

কীর্তিত হইয়াছে। কবি এই প্রসঙ্গে সে-কালের কুলীন-দমণীর করুণ-কাহিনীর আভাস দিয়াছেন—

হুঁ চারি বৎসরে যদি আসে একবার,
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার।
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তার,
তবে মিষ্ট মুখ, নহে রুট হ'য়ে যার।

কুলীন-কন্ডা চরকার সুতা কাটিয়া, সেই সুতা হাতে বিক্রয় করিয়া কিছু সঞ্চয় করিত—তাহাই দক্ষিণা দিয়া কুলীন পতির একদিনের মূল্য দাক্ষিণ্যটুকু লাভ করিত—এ কাহিনী বড়ই করুণ।

এক কথাতেই সমাজের একটি অঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—
“শান্তী বাঘিনী নন্দ নাগিনী”—তখন ঘরে—ঘরে। কিন্তু প্রত্যেক কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে “সতিনী বাঘিনী।”

সারীকে ভৎসনাচ্ছলে শুকের মুখে সুল্লরের পরিচয় কবির রচনাচাতুৰ্য্যের একটি নিদর্শন। কবিকল্পণের সুল্লার বারমাতার মত বিজ্ঞার একটি বারমাতার বর্ণনা আছে। ইহার রচনা গতাত্মগতিক। ভারতচন্দ্র ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কবিকল্পণ-চণ্ডীর সুল্লার বারমাগ্যার চের বেশি প্রেমাকুলতা ও নবপরিণীতাত্মলত আশ্রয় অভিযুক্ত হইয়াছে।

সুল্লরকে ভারতচন্দ্র বিজ্ঞা ও সৌন্দর্য্য দিয়া গড়িয়াছেন—রক্তমাংসের দেহ সে পায় নাই। কাজেই তাহার বাঙুর দেহে কবি প্রাণসঞ্চারের চেষ্টাও করেন নাই। কেবল কামসঞ্চারই তা প্রাণসঞ্চার নয়। যাহার দেহে ভৌতিক প্রাণই নাই—সে যাতকের কৃপণের তলে প্রাণের জন্ত আকুল হইবে কেন? সে রাজার সঙ্গে রসিকতা করিতেছে—আপনার পরিচয় না দিয়া রাজাকে হতবুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে, চোরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া বিজ্ঞাপকে ও কালাপকে ব্যাখ্যা করিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে—শেষে মশানে গিয়া শব্দচাতুৰ্য্যের দ্বারা পঞ্চাশ অক্ষরে গ্রথিত স্তব পাঠ করিতেছে—কিন্তু নিজের আসন্ন মৃত্যুর জন্ত বিদ্যুদ্ভাষ্য ব্যাকুল হইতেছে না। অক্ষর গণনার দ্বারা নিশ্চয় স্তব পঞ্চাশ অক্ষরে না হইলেও চৌত্রিশ অক্ষরে শ্রীমন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্রীমন্ত ছিল ভীষন্ত—তাই সে প্রাণের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল—সে অতি করুণ ভাবার দাসী হুর্দ্বার উদ্দেশেও তর্পণের জল নিবেদন করিয়াছিল। আসন্ন-মৃত্যুর ছায়ার অন্ধিত শ্রীমন্তের চিত্রের কাছে সুল্লরের চিত্র একটা ছায়ামাত্র।

একজন ছদ্মবেশী রাজপুত্র ও একটি রাজকন্যার গুপ্তপ্রণয়-কাহিনী লইয়া রচিত গল্প এদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। ‘চৌরীপীরিত’র মাধুর্য্য যে অপারসীম তাহা বহুকাল হইতে কবির স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন—সে পীরিত ‘যেবারোধসি বেতসী-তরুণুলেই’ হউক আর ‘যমুনারোধসি’ তমালতরুণুলেই হউক। ‘যমুনারোধসি’ যে ‘চৌরীপীরিত’ তাহা ধর্ম্মভাবের সহিত বিজড়িত। ধর্ম্মভাববজ্জিত চৌরীপীরিতের কাহিনী লইয়াও এদেশে বাংলার কাব্য রচিত হইত। যেমন, কব্জের বিজ্ঞানন্দ। মঙ্গলকাব্যের যুগে এই কাহিনী আবার দেবীর মহিমা প্রচারের

সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের প্রচলিত কাহিনীর সৃষ্টি করিল। এই দেবী চণ্ডী নহেন—চণ্ডীরই রূপানীৰূপ—কালী। ফলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের রূপ ধারণ করিল। এই কালিকামঙ্গলের প্রধান কবি গোবিন্দদাস, (চট্টগ্রামের) কালীনাথ, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ইত্যাদি। এই কাহিনীর সহিত কালীরের কবি বিজ্ঞানের চৌর-পঞ্চাশিকার কাহিনী সংযুক্ত হইল। কবি বিজ্ঞান কোন রাজকন্ডার সহিত গুপ্তপ্রণয় করিয়া ধরা পড়েন। তাহার ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কবি পঞ্চাশটি স্বরচিত আদি-রসাত্মক শ্লোক ওনাইয়া রাজাকে মুক্ত করেন। তাহার ফলে তিনি প্রাণ ও প্রাণাধিকা হুইই কিরিয়া পান, কোন দেবদেবীর অমুগ্রাহে নয়। এই কাহিনী-বাংলার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হওয়ার প্রণয়ী রাজপুত্র একাধারে কালীর ব্রতদাস, অমুগ্রহীত ভক্ত এবং কবিরূপে অঙ্কিত হইলেন এবং পঞ্চাশটি আদিরসাত্মক শ্লোকের দ্বারা কবিনায়ক রাজাকে মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু নিস্তার পাইলেন—কালিকার অমুগ্রাহে। তাহা ছাড়া, কালিকার কৃপাতেই সুন্দর সিঁদকাটির সাহায্যে হুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া রাজকন্ডার গৃহে প্রবেশ লাভ করিলেন।

বাংলার মঙ্গলকাব্যের ধারা ও পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দর শাপভট্টা দেবদেবী, কালিকার পূজাপ্রচারের জন্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ। ভারতচন্দ্র গ্রন্থেই বর্ণিত—কালী মূর্তিমতী হইয়া সুন্দরকে বলিতেছেন—

তোরা হোক লক্ষ্মীসী শাপেতে ভুতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।

ব্রত হইল পয়কাল এবে চল স্বর্গবাস
নারামন্তে আমারে তুমিরা।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ও চৌরপঞ্চাশিকা কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত হইল। এই শ্রেণীর কালিকামঙ্গল কাব্য বহুগুলি রচিত হইয়াছে উদ্ভূত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলই প্রাথমিকতার ও কবিরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার অল্পদিন পূর্বে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। রামপ্রসাদও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অমুগ্রহীত কবি ছিলেন। রামপ্রসাদও সম্ভবতঃ রাজার আদেশেই এই কাব্য রচনা করেন। রাজা এই কাব্য পড়িয়া সম্যক তৃপ্তিলাভ না করিয়া ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ দেন বলিয়াই অল্পমিত হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হওয়ার ফলে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের রূপ হইল সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রের মত। রামপ্রসাদের গীতির ঐশ্বর্য ছিল—দেশের লোকও তাঁহার পুরাবলীর ঐশ্বর্যলাভ করিয়া তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে জুলিয়া গেল। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক সঞ্চল ছিল, সে সঞ্চলের বলে রামপ্রসাদ চিরদিনই একেবারে ধর্মগুরুরূপে পূজ্য। ভারতচন্দ্রের সে সৌভাগ্য হয় নাই।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত বর্ধমান রাজপরিবারের কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন বিদ্যার নিজস্ব রাজকন্যার বয়স, কবি কৃষ্ণরাম বলিয়াছেন—বীরসিংহপুর। ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপরিচিত স্থানেরই নাম দিয়াছেন—অর্থাৎ এমন একটা নগরের নাম দিয়াছেন বাহার বর্ণনার কৃষ্ণনগরে বর্ণনা করিলেই

চলিবে। কেহ কেহ মনে করেন—বর্ধমান রাজপরিবারের উপর তাঁহার পারিবারিক অঙ্গশোণ ছিল। বর্ধমানরাজের অন্ত্য্যচারে তাঁহাকে বিবরসম্পত্তি হারাইয়া দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও বর্ধমানরাজের প্রতি একটা ঈর্ষ্যা থাকিতে পারে। বাহাই হউক—ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে এমনভাবে অল্পদামব্রতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—বাহাতে বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

বিদ্যাসুন্দরের সহিত মঙ্গল-কাব্যগুলির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, অনেক বিষয়ে বৈষম্যও আছে। বিদ্যাসুন্দরে দেবতার মহিমা প্রচার মুখ্য নয়—গৌণ; আদিরসাত্মক কবিত্ব-সৃষ্টিই মুখ্য। সুন্দর কালীপূজা প্রচারের জন্ত শাপভট্ট—কবি গ্রন্থেই এ কথা উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। কোন্ স্বর্গবাসী যে শাপভট্ট হইলেন এবং কি অপরাধের জন্ত বা দেবতার কোন্ গুণ উদ্বেগ সাধনের জন্ত তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন—এ সকল কথা ইহাতে নাই। হরিহোড় বা ভবানন্দের অভিলাষ সবেই বেরূপ একটা কাহিনী আছে, সুন্দর সবেই সেরূপ কাহিনী নাই। অন্ত্য্য মঙ্গলকাব্যে দেবতা আপন পূজা-প্রচারের জন্ত যে ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন, যে সং ও অসং উপায়-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন এবং যেভাবে বিদ্রোহীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরে সেসকল কথা একেবারেই নাই। তাহা ছাড়া, বিদ্যাসুন্দরে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তদের মারফতে দেবতার দেবতার বন্দনের কথা একেবারে নাই। দেবদ্রোহী চরিত্রের সমাবেশ একেবারে নাই। তবে দেবী আপনার ভক্তকে অসাম্য

৪ মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-নামের জন্ত বর্ধমানে আসিয়া পৌঁছিলে ভবানন্দ তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বিবৃত করিতে-ছেন—মানসিংহ গজপুত্র আরোহণ করিয়া স্বরূপ দেখিয়া আসিলেন। ভবানন্দ বলিতে চাহিয়াছেন—বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-ব্যাপার এই বর্ধমানে বহু পূর্বে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মানসিংহের বঙ্গাভিযানের পরে বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা। অতএব ইহা বর্ধমানের কোন কালিকার রাজার অন্তঃপুরের কাহিনী। মোগলযুগে বর্ধমান একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। জাহাঙ্গীরের যৌবনকালে এখানে শের আফগান শাসনকর্তা ছিল। সে কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই বর্ধমানকেই কবি ঘটনাস্থল কল্পনা করিয়াছেন—কাব্যের আবেষ্টনী-সৃষ্টির সুবিধার জন্ত। বিজ্ঞানের চৌর-পঞ্চাশিকার রাজাটির নাম বীরসিংহ। ভারতচন্দ্র সেই নামই গ্রহণ করিয়াছেন। সুকবি সুপণ্ডিত সুন্দরের উপযুক্ত প্রণয়িনী পথিকরনার জন্ত রাজকুমারীকে বিব্রী কল্পনা করিয়া তাঁহার নামও দিয়াছেন বিদ্যা। বর্ধমান নগরের সহিতও ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। এরূপ ঘটনা যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে কাশীরে কিংবা অন্ত কোন স্থলে। ইতিহাসোক্ত ভবানন্দ-মানসিংহের সহিত হুজু বন্দনের জন্তই কবি বাংলা দেশের একটি সুপরিচিত স্থানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। নায়ককে কোন দূরবর্তী দেশ হইতে সমাগত কল্পনা করার মধ্যে একটা Romance আছে—সেই Romance সৃষ্টিপ জন্ত সুন্দরকে বহুদূরবর্তী কাশীদেশের রাজকুমার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

সাধনে সহায়তা করিতেছেন এবং তত্ত্বকে রক্ষা করিবার জন্ত মশানে অবতীর্ণ হইতেছেন। ইহা মঙ্গলকাব্যের ধারাই অমূল্য।

তত্ত্ব প্রণয়ের কথা অথবা প্রণয়-প্রণয়িনীর উচ্চশ্রেণীর বৈদ্যের কথা অজ্ঞ কোন মঙ্গলকাব্যে নাই। কুটনী-চরিত্র কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ও গীতিসাহিত্যে পূর্ব হইতেই ছিল। মীনচেন্দ্রেনে ছিল ধোঁগিনী, ধর্মমঙ্গলে ছিল নয়ানী। মৈমনসিংহ গীতিকাব্যেও এইরূপ চরিত্রের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গলে রত্না, রামপ্রসাদের বিভাসন্দরে বিদ্যামণী, কুমারবীর কালিকামঙ্গলে বিমলা, ভারতচন্দ্রের বিভাসন্দরে সে-ই হীরা। দীনেশবাবুর মতে এই কুটনী-চরিত্র মুসলমান সাহিত্য হইতে আমদানী করা। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। দৃষ্টান্তে এ চরিত্রটি চিরকালই সাহিত্যে বর্তমান আছে। ভারতচন্দ্র এই চরিত্র-রচনার অনেকটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। হীরার বেসাতি কবিকঙ্কণের দুর্কলার বেসাতিরই অমূল্য। সুপুরুষ দর্শনে পুরনারীদের মোহমুগ্ধতার বর্ণনা সংস্কৃত কাব্য হইতেই চলিয়া আসিতেছে—বাংলা কাব্যের ইহা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। গৌর-গীতিকার নদীয়া-নাগরীদের রূপমুগ্ধতার কথা নরহরি, লোচন দাস ইত্যাদি কবিরা খুব রসাইয়া রসাইয়া বলিয়াছেন। এ বিষয়ে

৫ দীনেশ-বাবু বিভাসন্দ্রের কুচিকার মুসলমানী প্রভাবের ফল বলিয়াছেন। কাব্যের আবহাওয়া মুসলমানী হওয়ারই কথা—নবাবী আমলে রাজা-জমিদাররা মুসলমানী কেতাই অমূল্য করিত। তাই বলিয়া মুসলমান-সাহিত্যের প্রভাব পড়িয়াছে মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিদ্যার রূপ-বর্ণনার মত আলঙ্কারিক কসর পাশী সাহিত্যেও থাকিতে পারে, কিন্তু এইরূপ আমাদের দেশের সাহিত্যেও ছুরি ছুরি দৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্রের রচনার সংস্কৃত কবিত্বের প্রভাব যদি কিছু স্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তবে এই আলঙ্কারিকতার। কুটনীর চরিত্রই বা মুসলমান সাহিত্য হইতে আসিয়াছে এ কথা মনে করিবার কি কারণ আছে? সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টীই ত বাংলা সাহিত্যের কুটনী। প্রেমের ব্যাপারে দৃষ্টী একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কৃষ্ণ-কীর্তনের বড়াই-ই ত বাংলা সাহিত্যের আদি কুটনী। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দা, ললিতা, বিশাখার কাজই অপরূপতা লাভ করিয়া মালিনীর কাজে পড়াইয়াছে। গোপনে গর্ভসঞ্চারের জন্ত মায়ে তিরস্কার একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ জন্ত অজ্ঞ দেশের সাহিত্যের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন কেন হইবে? বরং রামপ্রসাদের বিভাসন্দ্রে মা ও মেয়ের কথা-কাটা-কাটির মধ্যে যে ইতর শ্রেণীর বসিকতা ফুটিয়াছে—তাহাকে বিজাতীয় মনে করিবার কারণ আছে।

দীনেশবাবু বিভাসন্দ্রের কয়েকটি অসঙ্গতির কথাও বলিয়াছেন। সন্দর সম্বাসী বেশে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে রঙ্গরসিকতা করিয়াছে, তাহা খণ্ডের প্রতি জামাতার অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক আচরণ। জ্ঞানবীর খড়্গ বখান সন্দরের মাথার উপর—তখন সন্দর নিশ্চিন্ত মনে গিয়া গিয়া পঞ্চাশ অক্ষরের আত্মপ্রসিক্ত ভব করিতেছে, ইহাও বড়ই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অথচ দীনেশ বাবু বিভাসন্দ্রের Realism বা বাস্তবনিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ।

ভারতচন্দ্রের চৌর-গীতিকার মৌলিকতা নাই। পুরনারীদের পতি-নিন্দার পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যের চিরপ্রচলিত প্রথা। তবে ভারতচন্দ্র ইহা লইয়া প্রচুর রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিহারের কথা কোন কোন মঙ্গলকাব্যে অল্পবিস্তর আছে বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কেহ এমন নিলজ্জভাবে বর্ণনা করিতে সাহসী হ'ন নাই। কবি এই সাহস পাইয়াছেন—বৈষ্ণব পদাবলী হইতে। কবি এই বিষয়ে বিভাপতি, গোবিন্দ দাসকেও পরাজিত করিয়াছেন।

চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীসুন্দর (চৌত্রিশা) কথা প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্র পঞ্চাশ অক্ষরের স্তব রচনা করিয়াছেন। বারমাস্য বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সুশীলার বারমাস্যের অমূল্যে ভারতচন্দ্র বিদ্যার একটি বারমাস্য রচনা করিয়াছেন। শুক-শারীর মুখে কথা বসানো পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি। বিভাসন্দ্রের সেই প্রথারই অমূল্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

অজ্ঞাত মঙ্গলকাব্যের সহিত বিভাসন্দ্রের প্রধান প্রভেদ, বিভাসন্দ্রের রচনাভঙ্গীতে। বিভাসন্দ্রের আখ্যান-মূলক খণ্ডকাব্য হইলেও ইহা প্রধানতঃ কতকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। অনেক প্রসঙ্গের গীতি-কবিতা হিসাবে স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অজ্ঞাত মঙ্গলকাব্যে গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার অজুহাতে অনেক অনাবশ্যক নীরস কথার সমাবেশ আছে, এ কাব্যে তাহা নাই। কবি স্বতন্ত্র সুরস করিয়া বসিতে পারিয়াছেন—ততটুকুই বলিয়া গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন। অজ্ঞাত কাব্যে নীতি-প্রচারের জন্ত,

করিয়াছেন। আমি বিভাসন্দ্রকে অন্নদামঙ্গলের গর্ভকাব্য বলিয়াছি। বিভাসন্দ্রের গর্ভসঞ্চার ছাড়া এই কাব্যে বাস্তবনিষ্ঠ কোন কথা নাই। যে কাব্যে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসা যায় এবং দেবী ও সিঁদ কাটি দিয়া মালিনীর বাড়ী হইতে রাজ-অন্তঃপুরের (কোন তালায়? একতলা নিশ্চয়ই নয়) বিভাসন্দ্র কক্ষ পর্যন্ত হুড়গ খনন করা যায়—সে কাব্যে সঙ্গতি-অসঙ্গতি স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন তোলাই বিভ্রম। দীনেশবাবু স্বাভাবিকতার অভাবের জন্ত দোষ দিয়াছেন, সুকুমার বাবু উট্টা কথা বলিয়াছেন। সুকুমারবাবুর উক্তিও সঙ্গত নয়। “রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে চরিত্রগুলি Typical আর যেন Satirical এই জন্ত ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিম্নত।” স্বাভাবিকতা স্বেচ্ছ নয়, গুণই। এ জন্ত নয়, অজ্ঞাত কারণে রামপ্রসাদের কাব্য নিম্নত।

মোটের উপর ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। আলঙ্কারিকতার ভঙ্গী ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও বিশেষ কিছু নাই—প্রাচীনতর বাংলা সাহিত্যের প্রভাবই সমধিক পরিমাণে বর্তমান। বাংলা সাহিত্যের চিরপ্রচলিত প্রথাপদ্ধতিগুলিই অন্নদামঙ্গলে অমূল্য হইয়াছে। আর বিভাসন্দ্রও পূর্ববর্তী বিভাসন্দ্রগুলির পরিমার্জিত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতচন্দ্রের কৃতিত্বের অনেক অংশই পূর্ববর্তী কবির প্রাণ্য।

লোকশিক্ষার জন্ত এবং বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্ত যে অনেক অবাস্তব কথার সমাবেশ হইয়াছে—অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান আসিয়া পড়িয়াছে—এই কাব্যে তাহা নাই। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির নীরস তালিকাও ইহাতে স্থান পায় নাই। কবি যেন কতকগুলি গীতি-কবিতাকে একত্র গ্রথিত করিয়া কাব্যখানিকে রূপ দান করিয়াছেন। মাঝে মাঝে অনেক গান এবং স্তবও সংযোজিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে আমরা বাহাকে গীতি-কবিতা বলি—বলা বাহুল্য, বিভাঙ্করদের গীতি-কবিতা সেই শ্রেণীর নয়। এইগুলিতে মনের আবেগের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি নাই। বেদনার কথা বস্তুর সম্ভব বর্ণন করা হইয়াছে। যেখানে বেদনার কথা আছে, সেখানে

কবি যে সংঘম দেখাইয়াছেন, তাহা ইচ্ছাকৃত সংঘম নয়। রস-রসের কবি ভারতচন্দ্রের লেখনীতে বেদনার চিত্র স্বভাবতই সৃষ্টিত না। অনেক স্থলে বেদনাকে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। রসরসের আভিষ্যে ছোটখাট সুখ-দুঃখ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দাম্পত্য জীবনের গভীর বেদনাও তাঁহার পরিহাসের বস্ত্র ছিল। একমাত্র রত্নরসের আবেশটাই কবির রচনার আকর্ষণ পরিণত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের গীতি-কবিতা বাক-চাতুর্য ও মণ্ডনকলার সু-পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। রসের আবেদনটা মৃদু-বৃত্তিকে আশ্রয় করে নাই—পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

পারসীক চিত্রশিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি

শ্রী গুরুদাস সরকার

প্রাচীন সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে কোন দেশের চাক-শিল্প কি করিয়া গড়িয়া উঠিল তাহা ভালরূপ উপলব্ধি করা যায় না। অতীতের ইতিহাস একবারে বাদ দিলে বর্তমান নিত্যস্থাপন খাপছাড়া হইয়া পড়ে, তাই সন-তারিখের ও প্রয়োজন রহিয়াছে। পারস্যের ইতিহাসের প্রধান কয়টি যুগের উল্লেখ করিয়া মোটামুটি রকমের একটা কালমুঠা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একিমিনীর যুগ	...	৫৫০—৩৩০ খৃঃ পূঃ অব্দ
গ্রীকাদিকার কাল	...	৩৩৪—১২৯ খৃঃ পূঃ অব্দ
পারস (পার্থীর) যুগ	...	২৪৮—২২৬ খৃঃ পূঃ অব্দ
সাসানীর যুগ	...	২২৬—৬৫২ খৃঃ অব্দ
হিজরা (পরগণার মহম্মদের মদিনাগমন)	...	৩২২ খৃঃ অব্দ
আরবগণ কর্তৃক পারস্যজয়	...	৬৩৫—৬৫২ খৃঃ অব্দ
দামাস্কে ওমাইয়া বংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব	...	৬৬১—৭৫০ খৃঃ অব্দ
বোম্বাদে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব	...	৭৫০—১২৫৮ খৃঃ অব্দ
সেলজুক ভাতার বংশীয়দিগের রাজত্ব	...	১০৩৭—১১৯৭ খৃঃ অব্দ
চেলিজখার সময়ভিধান ও রাজত্বকাল	...	১২০৬—১২২৭ খৃঃ অব্দ
মোঙ্গলদিগের হস্তে বোম্বাদ নগরীর পতন	...	১২৫৮ খৃঃ অব্দ
তৈমুরের বিজয়াভিধান ও রাজত্বকাল	...	১৩৬৯—১৪০৫ খৃঃ অব্দ
তৈমুর বংশের রাজত্বকাল	...	১৩৬৯—১৪৯৪ খৃঃ অব্দ
শাকাবীর বংশের রাজত্বকাল	...	১৫০২—১৭৩৬ খৃঃ অব্দ
শাকাবংশীয় নৃপতিগণ	...	১৭৫০—১৭৬৪ খৃঃ অব্দ

কাজর রাজবংশ ১৭৩৮—১৯২৫ খৃঃ অব্দ
রিজা সাহ পলাতী ১৯২৫—১৯৪১ খৃঃ অব্দ

পারস্যের নিজস্ব সভ্যতার ঐতিহাসিক পত্তন হয় ৫৫০ খৃঃপূঃ অব্দে, মহামুভব সাইরাস কর্তৃক একিমিনীর বংশের প্রতিষ্ঠা হইতে। মধ্যযুগের পারসীকগণ একিমিনীর সম্রাটদিগের কথা একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই প্রাচীন স্কোলস্টিস লিপিতে যথেষ্ট উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাদের গৌরব-পাখার কোন সংবাদই সাহনামায় পাওয়া যায় না। এ ক্রটি সংশোধন করিয়াছেন জাতীয়তা-প্রবন্ধ আধুনিক মুসলমান পারসীক কবিগণ। কবি আমিরী তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতে মহামুভব সাইরাসকে চিরজীবী করুনা করিয়া প্রভাত-পবনকে দূতপদে বরণ করিয়ছেন এবং সম্রাট সকাশে সহায়ত্বপূর্ণতার জন্য অমুযোগ্য করায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন যে, এ দুর্দশার দিনে তিনি স্বদেশের প্রতি এত বিশ্বাস কেন? ফারখী নামক অপর একজন কবি নিজ মাতৃভূমি প্রতীচ্যের দুইটি শক্তিশালী জাতির দ্বারা পদদলিত হইতেছে দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—“এই” কি সেই ইরাণ—বাহা কাই-কাউস ও দারিযুসের বিশ্রাম স্থান, যেখানে সাইরাস তাঁহার শাস্তিময় আবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বাহা জাল, রক্তম প্রভৃতি বীরগণের স্বদেশ বলিয়া পরিচিত।” পুর-ই-দাভুদ দেশজবোষ উজ্জিক করিয়া তাঁহার “ইরাণবাসী! ইরাণবাসী!” নামক বিখ্যাত কবিতার প্রাচীন যুগের জয়দ্রুপ সেনাবাহিনীর ও সুবিখ্যাত নৃপতিগণের কথা স্মরণ করিয়া শুধু যে সাইরাস, ক্যামবাইসিস প্রভৃতিরই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, পৌরাণিক শিশুদায়ী বংশেরও গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। শুধু ইঁহারাই নহে, আরিয়, বাইজাই, হুসামবাদ, রহিজান, নরতগর ও মস্কর-প্রমুখ কবিগণ তাঁহাদের কবিতায় প্রাচীন ইরাণের অতীত গৌরব ও সে যুগের অজয় বীরবৃন্দ ও অপরূপ বৈভবশালী নৃপতিগণের কথা উল্লেখ করিয়া ঐতিহ্যের

ধারা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন (১)। আধুনিক ইরাণ, শিল্প ও সংস্কৃতির দিক দিয়া আপনাকে একিমিনীয় সভ্যতার নিকট খণী বোধ না করিলে, একগু বশঃকর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইত না।

একিমিনীয় যুগের শিল্পোৎকর্ষের কথা অন্তর আলোচিত হইয়াছে (২)। পাথরে কোদাই করা, রত্নাদির উপর উৎকীর্ণ, মিনা করা ইষ্টক দিয়া গড়া—তখনকার কালের যে সকল চিত্র কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার কোনটিতে পরাজিত জাতির প্রতিনিধিদিগের ক্ষমা-প্রার্থনার, কোথাও বা বিজয়োৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রার, আবার কোথাও বা যুগয়ার ও বন্দ্যযুদ্ধের আলেখ্য অঙ্কিত। (৩) কোথাও নৃপতি ধর্ম্মযুদ্ধে নিরত রহিয়াছেন, কোথাও বা তিনি নিঃহস্তে হিংস্র ঋগ্নাদ নিহত করিতেছেন। শীলমোহর ও মূল্যবান প্রস্তরাদির উপর দেব আহরমজ্ঞার চিত্রও স্থান পাইয়াছে। একসময় বোন-রোমক (গ্রীক-রোমক) প্রভাব পারস্যশিল্পে শক্তিমান হইলেও একিমিনীয় ও মেসোপটেমীয় (বর্ত্তমান ইরাক) বাধা হাঁটগুলি শিল্পিগণ একবারে তুলিয়া যান নাই। পারস্যের শিল্পসম্মিলিত সেগুলিকে নিজ রক্ষণশীলতাগুণে সজীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে শক প্রভাব আসিয়া জাস্তব মূর্ত্তিসমূহের পরিকল্পনা বিষয়ে পূর্ণতা প্রদান করে এবং নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। মহাবীর সেক্সসরের (Alexander the Great-এর) বিজয়াভিযান একিমিনীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেও পারস্য শিল্পের কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। পারস্য শিল্পের জীবনশ্রোতঃ সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইলেও যে মূলতঃ অব্যাহত ছিল, তাহা অন্ধার রাকারেল চিত্রশালার খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর আইবেল্ল মূর্ত্তিয়ার সহিত কাইজার ফ্রেডেরিক বাহুবরে রক্ষিত খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত উল্লেখ্য উন্মুখ একটি পক্ষযুক্ত আইবেল্লের পরিকল্পনা ও সম্পাদনের দিক দিয়া তুলনা করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শেবোস্ত মূর্ত্তিটি যে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ, তাহা যে কোনও রচিতসম্পন্ন ব্যক্তি তুলনামূলক বিচারে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন; আর ইহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, একিমিনীয় যুগের শিল্প-পদ্ধতির দ্বারা পুষ্ট না হইলে সাসানীয় যুগের প্রথমার্ধের এই শিল্প-নিদর্শনটি কোন ক্রমেই শিল্পীর হস্তে মূর্ত্ত হইতে পারিত না। সাসানীয় যুগের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত জন্তুমূর্ত্তিগুলি এখনও পারসীক শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া পরিগণিত। কালবশে শিল্পের যে কেবল অধোগতিই হইবে, একথা সকলক্ষেত্রে বলা চলে না। মধ্যবর্ত্তী পারস্য (Parthian) যুগের ইরাণীয় শিল্পধারা অমুদ্রাবন করিলেও দেখা যাইবে যে, তাহাতে পাশ্চাত্য

প্রভাব একটি বটে কিন্তু তাব-ভঙ্গীতে ও বেশভূষার, দেশীয় ছাপ মুছিয়া যায় নাই। বেলিনের কার্যকার ফ্রেডেরিক মিউজিয়মে রক্ষিত পারস্য যুগের একটি পোড়ামাটির ফলকের (plaque এর) উপর যে অখারোহী ধামুকীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে দৃষ্টান্তরূপে তাহারই উল্লেখ করা যাইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে প্রস্তরপটে উৎকীর্ণ একটি যুগয়ারত অখারোহী ধামুকীর মূর্ত্তির (১) সহিত ইহার আশ্চর্য্য সোসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ভারতের সহিত ইরাণের প্রথম প্রামাণিক সংস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ৫১৯ হইতে ৫১১ অব্দের মধ্যে তক্ষিত বেহিষ্টান লিপি হইতে। সে সময় গান্ধারের অধিবাসিগণ সম্রাট দেরিয়ুসের (দরায়ুসের) প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তর্গত ছিল। একিমিনীয় রাজ্যের অংশহিসাবে গান্ধার বোধ হয় এই সময়েই ইরাণীয় প্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়া থাকিবে। একিমিনীয় যুগের অবসান হইতে সাসানীয় যুগ পর্যন্ত পারসীক কৃষ্টির ইতিহাস অনেকাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইরাণ হইতে পরাক্রান্ত পারস্যজাতি ভারত আক্রমণ করে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে। পারস্যদিগেরই আর্সাকীয় রাজবংশ (Arsakidae) পারস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে খৃঃ পূঃ ২৪৮ হইতে ২২৬ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত। এই বংশেরই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি প্রথম মিথ্রিডেটস (Mithridates) নিজরাজ্য পঞ্জাবের ফিলাম নদীর উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ভারতের সহিত ইরাণের ইহাই বোধ হয় অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সংস্পর্শ।

কেহ কেহ গুপ্তযুগের ভাষ্যে গ্রীক (বোনক) ও ইরাণীয় (পারসীক) প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদের মূলভিত্তি কতটুকু তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। গান্ধার শিল্পে ইরাণীয় প্রভাব সাসানীয় যুগে (খৃঃ অঃ ২২৬-৬৪২) অমুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল—পণ্ডিতগণ এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মৌর্যযুগের সেই স্তম্ভশীর্ষে পার্সিপোলিসের স্থাপত্যপদ্ধতির অমুপ্রতি (Parsepolitan Capital), খৃঃ চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত গুপ্ত ভাষ্যের অপর্য্য মৌলিকতা কল্প করিতে পারে নাই। ভারতীয় বর্দ্ধকী পূর্ব হইতেই কাটিয়া মূর্ত্তি নির্মাণ করিতে জানিত। হারান্নার প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের খণ্ডিত প্রস্তরমূর্ত্তি এই সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতেছে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই (খৃঃ পূঃ ৩০০—২৩২) পারসীক প্রভাব ভারতীয় ভাষ্যে প্রথম দেখা দেয়। লভর্ম মিউজিয়মে যে একটি একিমিনীয় স্তম্ভশীর্ষ রক্ষিত আছে, তাহা আর্টাক্সেরিক্সিস নেমেনের (Artaxerxes Mnemon-এর) রাজত্বকালের (খৃঃ পূঃ ৪০৪-৩৫৮)। ঐতিহাসিকেরা অমুমান করেন যে, খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে ইরাণীয় প্রভাব ভারতে প্রথম প্রবেশ লাভ করে। কিকিদিগের এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্যে এ পদ্ধতির স্তম্ভশীর্ষের প্রবর্তন হওয়া হয়তো, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কিন্তু যেখানে হয়, শক্ত

১ M. Ishaque, Modern Persian Poetry, pp. 150, 151, 152.

২ "দেশ" পত্রিকার প্রকাশিত লেখকের "একিমিনীয় যুগে পারসীক শিল্প ও সংস্কৃতি" নামক নিবন্ধ।

৩ বুসা (Busa) নগরীর ধ্বংসাবশেষমধ্যে প্রাপ্ত, মিনা করা ইষ্টক সাহায্যে রচিত সিংহরূপী ও ধামুকীগণের ভিত্তিচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১ K. Mishkin Collection, ইহা খৃঃ ১৯৩১ সালের পারসীক শিল্পপ্রদর্শনীতে বাসিঙন মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্বিবরক স্মারক (Souvenir) এর ক্রয়।

শতাব্দীর ব্যবধান, সেখানে অল্পকরণের কথা সহজে উঠিতে পারে কি করিয়া? পারস্তে, পূর্বভাগে, যে সকল উল্লসিত চিত্র তক্ষিত আছে, তাহার বেঙলি বেশ উঁচু করিয়া দোলাই করা, সেগুলি যে ভারতীয় শিল্পীর হাতের কাজ, এ কথাও তুলিতে পাওয়া যায় (১)। অশোকের রাজত্বকালের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বেরকার মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে (২)। প্রাক-মৌর্য যুগের এ মূর্তি করটিতে যে পারস্ত প্রভাব বর্ণিত আছে এ কথা কাহাকেও বলিতে তুলি নাই, আবার পারস্যক রাজত্বকর্তৃক ভারতীয় ভাস্কর নিয়োগও একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। শিল্পকুলের বাতায়ত ছিল বলিয়াই এক দেশের বিশিষ্ট পদ্ধতি বা শিল্পধারা আর একদেশে সংক্রামিত হইতে পারিত। শিল্পের দিক দিয়া প্রত্যেক সভ্যতাই একটা নতুন বিশিষ্ট ভঙ্গী, একটা নতুন ছন্দের প্রবর্তন ঘটায়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পরিসর অথবা বিস্তৃতি এবং কালপারম্পর্য্য, এই দুইয়ের কোন দিক হইতে আমরা যদি কোনও সভ্যতার সীমানা পরিমাপের চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখা বাইবে যে, কেবল সৌন্দর্য্যবিশেষ ও রসগ্রাহিতার সাহায্যেই ইহার মধ্যস্থ সীমাংসা সম্ভব। এরূপ স্থল বিচার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন মাপকাঠির সাহায্যে করা বাইতে পারে না (৩)।

প্রাচীন ভারতের বেশজ শিল্পের পর্যালোচনার কলে ইহাই দ্বিগুণিত হইয়াছে যে, বিদেশীয় প্রভাব ইহার ক্রমবিকাশে যে সহায়তা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কারণে উহা শুধু নকল-নবীণ পর্যায়ে অবনমিত হয় নাই। এ কথার বাস্তব্য্য সার্থী ভাব্য্য হইতেই প্রতীত হইবে। মূৰ্ত্তি (motif) বা ভাবধারার কতকংশ পারস্ত হইতে গৃহীত হইলেও ইহাতে প্রাচীন ইরানীয় শিল্পের তুয়ারয় উল্লাসী হৈর্য্য, অবিভিন্ন পুনরাবৃত্তি ইংবা উহার মহিম বিপুলতা (massiveness) কুড়াপি অঙ্কিত নাই।

লোকপরিম্পরায় প্রাপ্ত শিল্পের ইজিত বা উপাদান সকল জাতিরই সম্ভাবণ উপলব্ধি রূপে গণ্য হইতে পারে। আসিরীয়রা প্রাচীন সভ্যতার নিকট আংশিক ভাবে স্বাধীন হইলেও আসিরীয়

১ Roger Fry, Introduction to the illustrated of the Burlington House Exhibition of Art, London, 1931.

ডাক-ই-বোভানে, সম্রাট দ্বিতীয় থস্কর (খৃঃ অঃ ১০০-৬৪২) শিল্পের চিত্রে যে ভারতীয় প্রভাব প্রকটিত রহিয়াছে, সুবী এনে'ট ডি'সু (E. Dietz) তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, Eastern Art, Philadelphia (U. S. A.) October, 1928.

২ দৃষ্টান্ত স্বরূপ পার্শ্বকালে প্রাপ্ত, পূর্বে বাহা অজাতশত্রুর বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই মূর্ত্তিটির এবং কলিকাতা বাহুঘরের, মূর্ত্তি বলিয়া বিতণ্ডার বিবরীকৃত অপর দুইটি মূর্ত্তির কথা। করা বাইতে পারে।

৩ Toynbee, Study of History, Vol. III, p. 378, ১০ কানুন সংখ্যা বিয়তাবতী পত্রিকার উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৮৬।

কল্পনার জাঁকাল আড়ম্বরের সমুচ্চ গৌরবে ভারতের শিল্প কদাপি লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয় নাই এবং ভাঙ্গের প্রতিলিপি নিকট রাহুল্য বরণ করিয়া লয় নাই। প্রাচীন ভারতের শিল্প ছিল প্রকৃতই জাতীয় শিল্প আর তাহার ভিত্তি ছিল ভারতবাসীর স্বয়মনির্ভর ধর্ম্মবিশ্বাসে এবং বহিঃপ্রকৃতির সহিত গভীর ও আন্তরিক সহায়তবিত্তার। সর্বল স্বতঃস্ফূর্ত্ত পদার্থিকতাই ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই মৌর্য্য পালিশে (Mauryan polish এ) তত্ত্বাদির স্বত্বাধিকারিত অগ্রভাগ অথবা জাতব প্রকৃতিসম্মিলিত স্বত্বাধিকারিত প্রভাব সূচিত হইলেও আমরা বহুখণী প্রতিলিপি:সহ এই অকপট অভিব্যক্তি ভারতীয় ব্যতীত আর কিছুই বলিব না (১)। খৃঃপূর্বে পুন্ড্রাবির নজার কোথায় হয় তো আসিরীয় প্রভাব এবং পক্ষসম্মিলিত জন্তুসমূহের নজার কোনও কোনও স্থলে বা পশ্চিম এসিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয় বটে কিন্তু ইহাতে ভারতীয় শৈলীর মৌলিকতা কোথাও বিকৃত হয় নাই। শিল্পজগতে পারস্তের নিকট ভারত যে স্বাধীন, তাহা স্বীকার করিতে অগ্রণী হইলেও আমরা বেন বৈদেশিক পক্ষপাত হেতু ভারতের প্রতি অবিচার করিতে প্রবৃত্ত না হই।

পারস্তের প্রকৃত জাতীয় শিল্পের অত্যাশ্রয় হয় সাসানীয় যুগ হইতে। বিশ্বভ্রমণের একিমিনীর যুগ সম্বন্ধে অলীক বা অর্ধজ্ঞাত ধারণা পোষণ করিলেও পরবর্ত্তী যুগের শিল্পসাধক পারস্যিকেরা সাসানীয় যুগ হইতেই শক্তি ও অহুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সাসানীয় রাজগণ রেশম-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বরন-শিল্পের উন্নতির সহিত রেশম-বস্ত্রে নানারূপ শোভন অলঙ্কার ও চিত্রাদি স্থান পাইতে থাকে। ইরাণে আলঙ্কারিক চিত্র যে তখন হইতেই আদরপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়—যে বর্ষ কিংবা সপ্তম শতাব্দীর ডামাক নামধের বিচিত্র কোবের বস্ত্রের অভাববিধি বিদ্যমান নমুনাগুলি হইতে। এরূপ একটি নমুনার অর্ধলব্ধি অর্ধপক্ষী একপ্রকার কাল্পনিক জন্তু পক্ষপদ-সংলগ্ন মণ্ডলের (medallion-এর) ভিতর প্রধান অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুট দিয়া বেরা বৃত্তগুলি কাপড়ের জমিতে এরূপ কৌশলে সুবিভক্ত যে, পাশাপাশি যে কোনও দুইটি বৃত্তে এই অর্ধবিহীন স্বাপদের মুখ বধাক্রমে দক্ষিণ ও বামদিকে কিরান, বেন সেগুলি পরস্পর মুখামুখি করিয়া রহিয়াছে। এই সামঞ্জস্যচক্ৰ অলঙ্কারবিভাগ-পদ্ধতি পারস্যক চিত্রশিল্পেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রক্তশিল্পের এই সকল নমুনা পারস্যক ললিত কলার চর্চায় যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। শিল্প-কলার ধারাবাহিক বিবরণে কেবল পুঁথিতে আঁকা সূত্রক চিত্রগুলি প্রশংসা লাভের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ধাতব মূর্ত্তি ও পাথরে খোদাই চিত্র ব্যতীত পোড়ামাটির পিঠিকা ও সূত্র সূত্র মূর্ত্তিনিচর (terra-cotta plaques and figurines), চীনা মাটির পাত্রসমূহ অঙ্কিত ও চিত্রিত টালিগুলি এ পর্য্যবে আসিয়া পড়ে। রেশম-বস্ত্র, মখমল ও কার্পেটের নমুনা চিত্রসমূহেরও সুপারম্পর্য্য বিবেচনা

১ Cambridge History of India, Vol. I. pp. 692, 644.

করিয়া; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অল্পসংখ্যে ক্রমবিভাগ করা প্রয়োজন। মধ্যম ও কার্পেটের উৎকর্ষ নমুনাগুলি যুগ্মপদ্য হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর, এবং বিচিত্র রেশম-বস্ত্রের বিবিধ নমুনাগুলি একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে পারস্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি রচিত হইয়া লোকলোচনের গোচরে আইসে। এ যুগে ভারতীয়-প্রতিভা অবলুপ্ত হইলেও যুগ্মপদ্য (চীনা মাটির তৈজসে ও গোড়ামাটির জীবন্ত মূর্তিতে) নির্মাতৃগণের অপূর্ণ সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ-বেরঙের চিত্রে ও নক্সায় সজ্জিত বাতি (Bavy), রাজেশ (Rhages) ও স্থলতানাবাদি প্রভৃতি আড়ংএর চীনা মাটির স্রব্যা হালী (plates), কটোরা ও ভগ্ন প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি নবম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত।

পারস্যের আর একটি কারুশিল্প নিজ মনোহারিত্বগুণে শিল্প-জগতে উরুস্থান অধিকার করিয়াছিল। পারস্যের পুরাতন কচি-নির্মিত স্রব্যাদি এখনও সমঝদারদিগের নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিয়া থাকে। এ শিল্পের উৎকর্ষ নিদর্শনগুলি যে বহুমূল্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেও চীনা বাজারের নাখোনা সওদাগরদিগের ওদানে পারস্যের ক্রিষ্টাল কাঁচের সুন্দর স্তম্ভের পুরাতন জিনিস, সাদা ক্রিষ্টালের উপর গোলাপী ক্রিষ্টালের ফুলের নক্সায়ুক্ত বাটি, 'সবুজ দুর্বীর মত রঙের' উপর 'সোনারাজ কাজ করা' হুক, গোলাপপাশ প্রভৃতি যে পাওয়া যায়, তাহা আচর্য্য অবনীন্দ্র নাথের বর্ণনা হইতে জানা যায়।

সাসানীয় যুগের শিল্পে (খৃঃ অঃ ২২৮-৩৫২), প্রাচীন ও নবীন, দেশীয় ও বিদেশীয়, বিভিন্ন শিল্পধারা সম্মিলিত হইলেও আসলে উহা দেশীয় শিল্পেরই বৈশিষ্ট্যগুণে অলঙ্কৃত। তৎকালীন শিল্পে যে আশ্চর্য্য শক্তি, সংযম ও গাভীর্ষ গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা সাক্ষ্যের (hybridity) মালিক ও দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কবিশ্রলভ ভাবাভিষয়া ও উজ্জ্বল কল্পনার স্বন্দ্র খেলাপণ্য এ যুগের শিল্পশৈলীতে স্থান পায় নাই, যদিও পরবর্তীকালের স্বচন্দ্র-শীল পারস্যীক শিল্পী যে ভাগ্যবেগ গীতি কবিতার সম্পদ বলিয়া

১ ঘরোয়া, পৃঃ ৩৬-৩৭।

বিবেচিত, তাহাই নিজস্ব বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শব্দ-সম্পর্কের কলে নবশক্তিতে সজীবিত সাসানীয় শিল্প জাতব্য মূর্তি রচনায় এক প্রকার যুগান্তর ঘটাইতেই সমর্থ হইয়াছিল। ইহার উদাহরণ শুধু ব্রোঞ্জ মূর্তিতে নহে চূণ-বালি দিয়া গড়া সমস্তল পৌষ্টিকার উপর অমূল্যভাবে পরিকল্পিত (basso relievo) পত্ত পক্ষী প্রভৃতির মূর্তি হইতেও যথেষ্ট উপলব্ধি হয়। এই প্রকারে গঠিত একটি তিস্তির পক্ষীর প্রতিকৃতি এমনই সুন্দর যে, তাহার প্রত্যেক রেখায় প্রাণ-শক্তির চাক্ষুষ যেন স্বতাই স্পৃহিত হইয়াছে।—পাখী পা তুলিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার চক্ষুর অর্ধ-বিক্ষারিত, যেন এখনই ডাকিয়া উঠিবে। ইহার তুলনায় সাসানীয় কারুশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ নমুনা কোনও সিলেসনের অর্ধ-গ্রিফিনাকৃতিঃ ব্রোঞ্জ-বিনির্মিত পায়, সুগঠিত ও সুকল্পিত হইলেও সেরূপ স্বন্দ্র অমূল্যত্বপূর্ণ ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ নহে। যুগ্মপদ্যে যে জীবন্ততাব বিকশিত হইয়াছে, সিংহাসনের আওতার কারুশিল্পী তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই—হর তোঁ বা প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। যে কৌশলে শিল্পী পত্ত বা পক্ষীর জীবন্ত ভাবটি টানিয়া লইয়া সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রূপন (plastic) শক্তির অদ্ভুত বিকাশ ঘটাইয়াছেন পাশ্চাত্য কলা-বিদেবো তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। সাসানীয় যুগে পূর্বাগত শিল্পধারার সহিত শুধু শব্দশৈলী নহে ভারতের বোধ শৈলীও সম্মিলিত হইয়াছিল। এই ত্রিধারার যুক্তবেণী, বাইজান্টাইনভিত্তিমূলক আব্বাসীয় শিল্পের এবং বিশেষ করিয়া প্রবল চৈনিক প্রভাবযুক্ত মোঙ্গল শিল্পের কচির সঙ্গমে যে নবীন বল সঞ্চয় করে—তাহাই ক্রমে উপচিহ্নিত হইয়া বাস্তব ও তাহার অমূল্যগুণের শিল্পচর্চার কেন্দ্রসমূহে পরম্পরিগতি লাভ করিয়াছে।

পারস্যের ললিত-কলা ও কারুশিল্প সাসানীয় যুগ হইতেই বর্ণযোজনায় সমৃদ্ধ। কার্পেট, ঘিনা করা রঙ্গিন টালিতে, মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রাচীর গায়ে চূণবালির (stucco) মণ্ডলে ও দেওয়াল চিত্রে অথবা ভিত্তিচিত্রে বর্ণিকভাসের অপূর্ণ নৈপুণ্য দেখা যায়। উত্তরাধিকারস্বত্রে লব্ধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সুপ্রাচীন ধারা মুসলমান বিজয়ের পবন ইরানেব শিল্পবাজ্য হইতে বিসর্জিত হয় নাই।

১ পুরোঁক Souvenir গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রিকিন একপ্রকার কাল্পনিক ভক্ত, সিংহ ও ইগল পক্ষীর সমবায়ে গঠিত।

অর্কটীন

শ্রীমুনীল ঘোষ

ওরা কি মানুষ সব? জীবনের এত রঙ ফাঁকি
বুকে ও বুঝে না ওরা—অপমান সহ্যে প্রতিপল;
দহমান জীবনের নির্ঝাপিত ছাইটুকু বাকি;
পৃথিবীর দেনা বত শোধ কর ব্যর্থ আশিঙ্গল।

একদা ওতাও ছিল এ-বিশ্বের সহজ পুত্রারী;
বপনের মোহজালে হস্ত ছিল এদেরও কামনা;
তাহাদের পক্ষান্তরে রাজপথ হয়েছিল ভারি;
অপাতনের জীবনের দুর্ভিক্ষহ ছিল না বাড়না।

তারপর এল নেমে ঝটিকার ঘন আঁধার;
বুড়াকার মহামারি ছেয়ে এল ওদের আকাশ—
মৃত্যুর করাল দূত—হাতে তাব তীক্ষ্ণ হাতিয়ার;
দিশেছারা হ'ল ওরা—অবিচারে রুদ্ধ হ'ল হাস।

আজ আর কিছু নাই; বার্থ ওবা জগতের মাঝে;
বাঁচবাব অধিকার ভীকৃত্যর পড়ে গেছে ঢাকা;
অভিযোগ নাহি তাই অভিশপ্ত মরণের কাছে;
ওদের তো আশা নাই—কান মতে শুধু বেঁচে থাকা।

পনের

বিয়ের হ'য়ে গেল।

যে বিরাট ধক্তি মাসিমা চেয়েছিলেন তার চেয়ে এক চুলাও কম হ'ল না। মাসিমা আনন্দে ভাগতে লাগলেন।

বিয়ের আগেই বিকাশের নতুন বাড়ীর কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ীতে বিকাশ উঠলো বিয়ে ক'রে ক'নের বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে এসে।

গীতা কখনও এ বাড়ী দেখে নি। মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীতে অনেক কিছু নতুন হ'য়েছে—তাতে বাড়ীখানা তক্ তক্ ক'রছে—নতুন বিজলীর আলোর স্বকমক ক'রছে যেন ইন্দ্রপুরী! আনন্দে নাচতে লাগলো গীতার প্রাণ।

বাড়ীর ইট কাঠ পাথর সব যেন পরম আত্মীয়তার সঙ্গে গীতাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন ক'রে নিলে। গীতা দেয়াল স্পর্শ ক'রে থাকে—তাতে বৃকের ভিতর ব'য়ে যায় আনন্দের স্পন্দন। চক্চকে মেঝের উপর লুটিয়ে প'ড়ে তার নিবিড় স্পর্শ নেয়, খামগুলোকে দেয় তার আলিঙ্গন। সর্বদা দিয়ে সে অমূল্যব ক'রতে চায় 'এ আমার বাড়ী—আমার স্বামী'র।

বিকাশ ছটফট্ ক'রছিল যতক্ষণ আত্মীয়স্বজনের অনাবশ্যক ভীড় তাকে আর গীতাকে ঘিরে অবধা তার হাত-পা আড়ষ্ট ক'রে রাখছিল।—অবশেষে—দীর্ঘ-সুদীর্ঘকাল পরে তারা দূর্য্য ক'রে তাদের হৃ'জনকে একলা রেখে সরে' গেল।

অমনি বিকাশ তড়াক ক'রে উঠে গীতাকে ঘিরে নাচতে লাগলো।

নাচাটা বিকাশের স্বভাব। ফুটবল খেলবার সময় সবাই তাকে বলতো নাচওয়ালা—কেন না, সে প্রায়ই নেচে উঠতো। গোলে বখন বল আসছে, সে তখন উবু হ'য়ে দুই হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়ে নেচে নেচে গোলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াত। আর বল এলে বখন সে তাকে ধ'রে মেরে দিত অনেক দূরে, তখন গোল-পোষ্টের নীচে ফিরবার আগে চক্কাকারে ঘুরে এক চোট নেচে নিতো। আর যখন তাদের পক্ষ গোল দিত, তখন বিকাশ খেই খেই ক'রে নাচতো।

বিয়ের সময় থেকে বিকাশের তাই নাচ পাচ্ছিল, কিন্তু এই শক্রগোষ্ঠী—এরা একদণ্ড তাকে সময় দিলে না নাচবার।

এখন সময় পেয়ে সে মনের সুখে এক চোট নেচে নিলে।

গীতারও প্রায় নাচতে ইচ্ছা ক'রছিল, কিন্তু সে ব'সে রইলো। বিকাশের নাচ দেখে সে বললে, "ও কী রঙ্গ?"

বিকাশ বললে, "ঠিক ধ'রেছ—এ রঙ্গ—আনন্দ-তরঙ্গ।" ব'লেই গীতাকে দুই হাত দিয়ে সবলে বেঁঠন করে ধ'রে বললে, "ওঃ! গীতা—গীতা তুমি কী?"

গীতা হেসে বললে, "আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি একটা পাগলের হাতে বন্দি।"

ছেড়ে দিয়ে বিকাশ আর এক পাক নেচে এসে ব'সে বললে, "তুমি নিশ্চয় মনে ভাবছ তুমি গীতা—শুধু গীতা! কেমন?"

"তা নয় তো কী?" হেসে বললে গীতা।

"তা নয়, তা নয়! ছিলে তুমি তবু একটা। বাজে গীতা এখন তুমি—প্রিয়া। অনাদি অনন্ত প্রিয়া—"

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মথিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিকটাগু লয়ে বায় করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্দু মন্ত্রশাস্ত্র ভূজঙ্গের মত
প'ড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত কণালক্ষ লন্ত
করি অবনত।

ঠিক এমনি।"

ব'লে বিকাশ গীতার আলতাপরা পা হৃ'ধানির কাছে মাথা হুইয়ে নিয়ে হৃ'হাতে পা চেপে ধ'রে ক'রলে চুষন।

"ও কি? ছি!" বলে গীতা পা হু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে বিকাশকে ক'রলে প্রণাম।

তাকে তুলে নিয়ে শুকাতে ধ'রে বিকাশ শুধু চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। গীতাও বিকাশের মুখের দিকে বিপুল আনন্দে শুধু চেয়ে রইলো।

গীতা বললে এবার, "ভরানক আশ্চর্য্য, না?"

"কি আশ্চর্য্য?"

"বোলাটি বছর ধ'রে আমরা পরস্পরের মুখ দেখে আসছি, কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান? যেন এ মুখ দেখি নি কোনও দিন।"

"ঠিক! আমারও তাই মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে যে, তোমার মুখখানি যেন ঠিক এই মুহূর্ত্তে বিশ্বকর্ম্মার কামারশালা থেকে সজ্জা ঢালাই হ'য়ে এলো।—কাল কি তোমার এ মুখ ছিল?—পরন্তু ছিল? হ' মাস আগে ছিল? তবে কেন আমি দেখতে পাই নি এ মুখে এত রূপ, দেখি নি ওই চোখের ঐ অপূর্ণ লাবণ্য, পাতলা মেঘঢাকা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত ঐ অপক্লপ মিষ্টি রঙটি তোমার।"

গীতা হেসে বললে, "বলবো কেন?"

"বল।"

"তখনও তুমি অস্থ ছিলে, তাই—পাগল হও নি, তাই।" ব'লে হেসে বিকাশের কোলের উপর গড়িয়ে পড়লো।

বিকাশ গীতার মাথা কোলে ক'রে ব'সে তাকে দীর্ঘ চুষন দিলে। তারপর তার হাত ধ'রে গয়নাগুলো নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলো।

ইঠাং বিকাশ বললে, "গীতা, এ কী অজ্ঞায়? এ গয়নাগুলো তোমার আমার স্ত্রীকে দেবার কথা ছিল।"

হেসে গীতা বললে, "দিয়েছি তো সব।"

"কি আশ্চর্য্য—বল, সব দিয়েছ অথচ সব র'য়ে গেছে তোমার। এই কথা ভেবেই বোধ হয় জিকালজ্ঞ স্বমিরা ব'লে গেছেন, 'পূর্ণত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশয্যতে'।"

গীতা বললে, "ভটা কি? গাল দিলে না কি আমার? দিয়ে থাক তো বুঝিয়ে বল। জান তো সংস্কৃত পড়ি নি কোনও দিন।"

"ওর মানে হচ্ছে এই যে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট রইলো।—আচ্ছা গীতা, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না-হ'ত

আর ঐ গরনা যদি তোমার সত্যি সত্যি দিতে হ'ত আমার জীকে, তা' হ'লে তোমার হার্ট ফেল হ'ত নিশ্চয়।"

গীতা বললে, "বেটা একেবারেই অসম্ভব, তা' কল্পনা ক'রে কি লাভ?"

"কেন, আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারতো না? আমি বিয়ের বাজারে এমনি অচল জিনিষ ছিলাম না কি?"

"একেবারে অচল হ'লে চললে কি ক'রে এখানে? কিন্তু তবু অসম্ভব। এ গরনা আমি প'বেছিলাম, তাই কাণ টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি গরনাটার টান পড়তেই আমার আসতেই যে হবে।"

একটা ছোট মেয়ে—বিয় ঘেন মূর্তিমতী—এসে বললে, "আপনার এক বন্ধু এসেছেন, কাকাবাবু।"

মুখ ঝাঁচিয়ে বিকাশ বললে, "আ মরি বন্ধু রে আমার। এমন সময় মরতে এসেছেন! বন্ধু! জন্মজন্মান্তরের শত্রু আমার।"

ব'লে সে বাইরে যেতে যেতে ব'লে গেল, "পালিও না কিন্তু, আমি এলাম ব'লে ফিরে।"

গীতা কিন্তু উঠে পড়লো। বললে, "ফিরে এলে খুঁজে নিতে পারবে, এ বাড়ী তোমার গোলোক-ধাধা নয়।"

ব'লে থাকতে তার মন চাইছিল না। তার ইচ্ছা করছিল আনন্দে ছুটে বেড়াতে। সব ঘরে গিয়ে সবগুলিকে তার আলিঙ্গনে বেঁধে কবুতে—তার নতুন সৌভাগ্যের কথা সবাইকে কাণে ধ'রে শোনাতে।

বের হ'তেই তার সামনে পড়লো বসন্ত। সে অমনি ফস্ ক'রে তার কাণ ধ'রে টেনে বললে, "এ বাড়ীর শালাবাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

বসন্ত ফস্ ক'রে ঘুরে গীতাকে এক প্রবল চিম্টি কেটে দিলে দৌড়।

"মস্তি ছেলোটা", ব'লে সে তাকে তাড়া করতে গেল, কিন্তু বিয়ের জবড়জঙ্গ কাপড়-চোপড় গয়না-পত্তর নিয়ে ছোটাটা সুবিধে হবে না ব'লে ছেড়ে দিলে।

সে সবার সঙ্গে হাসি-মস্করা ক'রে বেড়াতে লাগলো। কমলাকেও ছাড়লো না।

কমলা মাসিমার বিধবা মেয়ে, ভারী ঠাণ্ডা স্বস্থির চুপ চাপ মেয়েটি। সে নিশ্চক্ষে বোনের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে, আপনাদের ঘরে ব'লে পড়ে বা সেলাই করে, আর মা'য়ের ফরমায়ের মত এটা ওটা কাজ করে। বিধবা সে, কিন্তু বাপ-মা তাকে থান প'রতে দেন না, চণ্ডা কস্তা পেড়ে শাড়ী ও হাতভরা চুড়ী প'রে থাকে সে। এ বেশ সে পরে দায়ে প'ড়ে, মা বাপের মুখ চেয়ে। বেশভূষা বা সংসারেব আব কিছতেই তার আসক্তি নেই।

এ হেন বৈরাগিনীকেও গীতা স্বস্তি দেয় না। সে তার কাছে গিয়ে বলে "ই! দিদি, কি কাণ্ডটা হ'ল বল দেখি—একটা দারুণ সীমানার মামলা চারদিকে। জ্যাঠাঠামা—তিনি আমার জ্যাঠাঠামা, না মাসী?—তুমি আমাব দিদি, না ঠাকুবাবি?—অমল আমার বোনবি, না ভাগনে?—এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আচ্ছা, তুমি বল তুমি কার দিদি?"

কমলা হেসে ব'লে, "বে বোশী পাগল, তার।"

"বুঝেছি, তবে তুমি ঠাকুবাবি।"

"পোড়ারমুখী, বিকাশ পাগল হ'ল কিসে?"

"বন্ধ পাগল, দিদি, বন্ধ পাগল! একেবাবে কাকের গারদের পাগল। বিয়ের আগে এত কি জানি? এখন দেখছি একেবারে unmanagable."

[ক্রমশঃ

আগামী স্বপ্ন

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ঐ শুনিরে জগৎজুড়ে ধ্বংস-বিষাণ বাজে,
নধু হয়ে এই ধরণী নতুন বেশে সাজে।
যুদ্ধকালের ডঙ্কা বাজে,—শঙ্কা জাগে ভয়ে,
ঝঙ্কা আসে উড়িয়ে কেতন অসীম দিগ্বিজয়ে!

আগুন দেখে ভর করে আজ? গর্জনে কি ডর?
প্রলয়, সে-তো খেলার সাথী—মৃত্যু নহে পর।
জীবনটাকে উজাড় ক'রে সুখ আছে তাই চলে,
দুনিবার এই দৈত্যারথের চাকার তলায় ফেলে

আগ্নেয়গিরি কেঁপে ওঠে বুঝি!—অগ্নিগর্ভজালা,
নিশার আকাশে ফোটে ফুলঝুবি,—বিফোরণের মালা,
ঝলকি উঠিছে বিদ্যুৎশিখা কর্কশ চীৎকারে
জীবনের কীপ দীপ নিতে যায় মুহূর্ত ফুংকাবে!

তারই মাঝে আসে নতুন ফসলে স্বপ্নের নবদান,
গত জীবনের আশান ভয়ে নব জীবনের গান।

আশান-পেচক ডাকিছে কোথায় জনহীন প্রান্তরে,—
আস্তনে বোমার ফসল বনিছে মানুষ মাটির 'পড়ে!
দাউ দাউ জলে রক্তিম শিখা,—চট্টনি যন্ত্ররবে
মৃত্যু-দেবতা অক্ষয় হ'য়ে আজিকে নেমেছে পথে!
কাঁপে মৃত্তিকা, আকাশে তারকা, সপ্ত সাগরে জল,
হুলিছে তুবন, বিশ্বনিখিল প্ৰলভাবে টলমল,
জীবন মৃত্যু আজ একঠাই—খাদ ও ক্ষুদ্ত আসি'
নতশিরে তাই দুইজনে তাই দাঁড়ায়েছে পাশাপাশি।
বায়ুলোক হ'তে গর্জন ক'রে বাতাসেরে জর্জর'
মৃত্যুশব্দ পাগা মেলিয়াছে—ধ্বংস পড়িছে ঝরে;
সব সন্মোহ ভঙন করি' বন্ধ এসেছে ঘরে—
কামানগোলকে মৃত্যু ঝলকে, জীবনের ফুল ঝরে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ

প্রাচীনকালে গুপ্ত-পল্লী বঙ্গের অগ্রতম সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিতসমাজ অহোরাত্র সারস্বত পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। নিদান-টাকাকার বিজয় রক্ষিত এবং অমর-কোষাভিধানের টাকাকার ভরও মল্লিক এই গুপ্ত-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ‘শ্রীশ্রামাকল্পলতিকা’র কবি মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ব্রজদেব তর্কবাগীশ, রামগোপাল তর্কবাগীশ, রাধামোহন তর্কভূষণ, নৈয়ায়িক গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, স্মার্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার, ক্ষুদিরাম জায়ভূষণ, নীলকমল বিদ্যাসাগর, রামধন জায়রত্ন, রামপ্রসাদ চূড়ামণি, রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, কালীকিশোর বিদ্যাবাচস্পতি, রঘুনাথ সিদ্ধান্ত, রামলোচন জ্ঞান-লঙ্কার, রামজয় তর্কভূষণ, রামজীবন বিদ্যভূষণ, গ্রামসুন্দর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ সনাতন বিদ্যাচর্চা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গুপ্ত-পল্লীর যশোরশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্ত-পল্লীর সংস্কৃতচর্চা অব্যবহিত ছিল।

সংস্কৃতচর্চা ব্যতীত স্থাপত্য-শিল্পে গুপ্ত-পল্লী বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে গুপ্ত-পল্লী-নিবাসী বৈষ্ণবংশীয় বিষ্ণেশ্বর রায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি তাঁহার গুরু সত্যদেব সনাতনকে স্বীয় বিপুল সম্পত্তি প্রদান করেন (১)। সত্যদেব এই সম্পত্তি পাইয়াই গুপ্ত-পল্লীতে একটি মঠ স্থাপন এবং আরাধ্য দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থকার ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকে (১৬৭৫ খ্রষ্টাব্দ) “চন্দ্রপ্রভা” নামক কুলগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে বিষ্ণেশ্বর রায়ের সাতটি কন্যা বিশিষ্ট কুলীন বৈষ্ণবে অর্পিত হইয়াছিল (২)। ইহাতে বেশ অল্পমিত হয়, বিষ্ণেশ্বর রায়ের পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি গুরুদেবকে দান করিতে পারিয়াছিলেন।

সত্যদেব সরস্বতী কয়েক বৎসর যাবৎ বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিবার পর দেহত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার প্রিয়শিষ্য গোমুখানন্দ সংস্কারী সেবাকাধ্যে নিযুক্ত হইলেন।

গুপ্ত-পল্লীনিবাসী চন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী নামক জনৈক পণ্ডিত গোমুখানন্দের শিষ্য ছিলেন। চন্দ্রচূড় ত্রিপুরার রাজবংশীয় চম্পক নরপতির নির্দেশমত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালীপঙ্কজ এক টাকা ১৬২৭ শকে রচনা করেন। এই টাকার শেষাংশে গ্রন্থকার ও তাঁহার গুরু গোমুখানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—

“আন্তে শ্রীগুপ্ত-পল্লী সুরবরসরিতস্তীরদেশে শুদ্ধা
তত্র শ্রীগোমুখাখ্যো নিবসতি সততং দণ্ডিনামগ্রগণ্যঃ।
তচ্ছাত্রচন্দ্রচূড়ব্রহ্মপুত্রনরপতিঃ শ্রীযুতঃ চম্পকাখ্যঃ
দৈবাৎ তৎকেতু টাকাস্তদ্রুমমতিবশাৎ ব্যারচন্ ব্রহ্মচারী।”

কিছুদিন পরে গোমুখানন্দ দেহত্যাগ করিলে ঐবানন্দ কাব্য-ভার গ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ‘দণ্ডী’ নামে অভিহিত হন। তৎপরে পীতাম্বর নন্দ, সুমুখানন্দ ও রানানন্দ যথাক্রমে

দণ্ডী হইয়াছিলেন। রামানন্দ একজন সাধক ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রের বামপার্শ্বে শ্রীরাধার মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ‘দেশ-কালিকা’ তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

এইরূপে তৎকালে গুপ্ত-পল্লীর মঠে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

রামানন্দের পর পূর্ববোধানন্দ ও তৎপরে মধুসূদানন্দ দণ্ডী হইলেন। মধুসূদানন্দ রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, গৌর, নিতাই প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্বীর স্থায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত হইয়াছিল। তৎকালীন রথখানি ১৩ চুড়াবিশিষ্ট ছিল। কোন এক দুর্ঘটনার ফলে ইহা ৯ চুড়াবিশিষ্ট করিয়া সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ইহা উচ্চতায় ৫১ ফুট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৮।০ ফুট, ৩৬ চক্রবিশিষ্ট, প্রত্যেক চক্রের ব্যাস ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং অশ্বযুগলের প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ১৩।০ ফুট। অত্যাশিও ভারতের রথসমূহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম বলিয়া বিদিত।

এতদ্ভিন্ন মধুসূদানন্দের সময়কালীন আরও একটি ঘটন সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনচন্দ্রের সম্পত্তির কর বাকী থাকায় বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দী খা মধুসূদানন্দকে মূর্তিটিকে দরবারে আনয়ন করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। মধুসূদানন্দ মহাসমস্কার পড়িলেন। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুরূপ একটি নূতন মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহা বাজদরবারে লইয়া গেলেন। অতঃপর শ্রীযুত রামচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত ব্রজনাথ মুন্সীর চেষ্টায় মঠের বাকী কব মিটাইবার ব্যবস্থা হইলে নবাব বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্তি লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। তখন মধুসূদানন্দ বৃন্দাবনচন্দ্রের এই নকল মূর্তিটিকে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি বাম-সীতাব মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত ‘চিত্রচম্পু’ কাব্যের ২৭৮ম শ্লোকে বর্ণিত আছে—

“সর্গগ্রাম-সমীপ-ধাম পরমঃ শ্রীগুপ্তপল্লীতি যৎ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রনন্দিতমপি শ্রীবামচন্দ্রোজ্জলম্।”

রামসীতা মন্দিরের কারুকাধ্যে অতীত মনোরম। শেওড়াফুণাণি বিখ্যাত ভূমিদার হরিশচন্দ্র রায় মন্দিরটির নির্মাণকাব্যের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মধুসূদানন্দ রামসীতা মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি স্তরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়া সেই নকল বৃন্দাবন চন্দ্রের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইবার এই মূর্তি রক্ষচন্দ্রের মূর্তি বলিয়া অভিহিত হইল।

খৃষ্টীয় ১৭২৪ অব্দে মধুসূদানন্দ দেহত্যাগ করিলে রাজা রামচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ সেন ‘সরবরাহকার’ রূপে ৯৫ বৎসরের জন্ত মঠের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ১৭৯০ খ্রষ্টাব্দে বৃন্দাবন চন্দ্রের জন্ত এক নূতন মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরটির শিল্পচাতুর্য ও বর্ণের সৌন্দর্য্য যথার্থই প্রশংসনীয়। তাঁহার সময় হইতে গোবিন্দাটায়ের মূর্তি বৃন্দাবনচন্দ্রের পুণ্যতনু মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮২৭ অব্দে দণ্ডী কেশবানন্দ মঠটি উদ্ধারকরে ৭৫

(১) Hoogly District Gazetteers. vol. XXIX, P269

(২) “চন্দ্রপ্রভা”—পৃঃ ১০০, ১৬৭, ২৭২ ৭৩, ২৯৯ ইত্যাদি।

অভিযোগ আনয়ন করেন এবং অত্যধিক চেষ্টার ফলে কৃতকার্য হন। ইহার পর কিছুকাল যাবৎ দণ্ডিগণের দ্বারা মঠটি স্ফটিকরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই অর্থাভাব হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ১৯৩০ অব্দে ৯ই এপ্রিল হইতে শ্রীযুত বিশিনচন্দ্র মজুমদার উক্ত মঠের 'রিসিভার' নিযুক্ত হইলেন; তিনি মঠের কার্যপরিচালনায় জগ্নু বহু টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে মঠের সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় হইবার উপক্রম হইল। খৃষ্টীয় ১৯৩৩ অব্দে এই ব্যাপারে

এক মামলা হয়। তৎকালীন হুগলী জেলা-কোর্টের বিচারপতি Mr. Jamison. I.O.S. মহোদয় মঠটিকে একটি সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মঠের কার্যাদি পরিচালনার্থে নয় জন সভ্য লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠন করেন। শ্রীযুত জুগানকুমার সেন ম্যানেজার এবং খগেন্দ্রানন্দ দত্ত, নিযুক্ত হইলেন।

পূর্বাপেক্ষা মঠটির অবস্থা শোচনীয়। মঠের উন্নতিকল্পে জেলার মনীষিবৃন্দের চেষ্টা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

বাব

২৫। সূচীবান-কর্ম—যশোধরের মতে সূচী দ্বারা যে সন্ধান-করণ (অর্থাৎ সেলাই করিয়া জোড়া দেওয়া) তাহাই 'সূচীবান'। উহা ত্রিবিধ—১ সীবন, ২ উতন ও ৩ বিরচন। প্রথম প্রকার (অর্থাৎ সীবন)—কঙ্কুকাটির পক্ষে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ উতন)—ক্রটিত বস্ত্রাদি বস্ত্রে ক্রটি কর্তব্য। আর তৃতীয় (অর্থাৎ বিরচন)—কুথ আস্তরণ ইত্যাদি নির্মাণে প্রযুক্ত হয়।

"বান" শব্দটির অর্থ বয়ন বা সেলাই। সূচী ও সূত্রের সাহায্যে যে বাধন বা সেলাই দেওয়া যায়, তাহাই এ কলাটির আলোচ্য। এক লাটি দবজীরই আয়ত্ত, কাবণ, কেবল বয়ন-কর্ম হইলে উহা তন্তুবায়েব কর্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত; কিন্তু উহা সূচী-দ্বারা বয়ন, অতএব তাঁতি অপেক্ষা দবজীরই ইহাতে অধিকার অধিক।

সূচীবান তিন প্রকার—(১) সীবন বা কাটাকাপড়ের কাজ—কাপড় ইচ্ছামত আকারানুযায়ী কাটিয়া নূতন সেলাই করিয়া জামা (কঙ্কু) ইত্যাদি নানারূপ পোষাক তৈয়ারী ইহার মধ্যে পড়ে।

(২) উতন—ছেঁড়া কাপড় সেলাই বা রিপু করা।

(৩) বিরচন—কাঁথা ২, লেপ, তোষক, বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈয়ার করা—ইহার মধ্যে পড়ে। তাহা ছাড়া কাপড়ের জমিতে নানা রঙ-বেরঙের ফুল তোলা, শালের উপর নানা রকম সূতের কাজ, উল বোনা, কার্পেট বোনা, আসন বোনা—ইত্যাদি সকল রকম সৌখীন বোনার কারু-কার্য ইহারই অন্তর্গত।

১। 'সূচ্যা যৎ সন্ধানকরণং তৎ সূচীবানং ত্রিবিধং—সীবনম্ উতনং, বিরচনঞ্চ। তত্রাত্মং কঙ্কুকাদীনাম্। দ্বিতীয়ং ক্রটিতবস্ত্রাণাম্। তৃতীয়ং কুথাস্তরণাদীনাম্।"—জয়ম

সন্ধান-করণ—যোজনাকরা, জোড়া দেওয়া, বাধন দেওয়া, সেই, রিপু ইত্যাদি করা।

২। মূলে আছে—'কুথ'—(১) কুশ, (২) গজের পুচ্ছ আস্তরণ বিচিত্রবর্ণ কবল। উহা হইতে 'কুথ' অর্থে 'কাঁথা'—এরূপ অর্থও করা হয়।

৩তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"বান-বন্ধন, সূচী ও সূত্রের বন্ধন দ্বারা যে কর্ম হয়, (১) সীবন, (২) 'রিপু' করা সংস্কৃত নাম উতন এবং (৩) বিরচন,—জামা ইত্যাদি প্রস্তুত সীবন-সাধ্য,—এই জগ্নু (১) সীবন শব্দের অর্থ—কাপড় কাটিয়া নূতন সেলাই। (২) ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশ যোজন, উতন, 'রিপু' করা, (৩) শাল প্রভৃতির সূচীকর্ম, তাহার নাম বিরচন"।

৬বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"সূচীকর্ম ও বস্ত্র বয়ন কাঁথ্য"।

৭সমাজপতি মহাশয় বলেন—"দরজী ও তাঁতির ব্যবসায়"।

৮কুমুদচন্দ্রের মতে—"সূচী (ছুঁচ) দ্বারা বস্ত্র সন্ধান করা (যোড়া লাগান); ইহা তিন প্রকার—

(১) সীবন (২) উত্ন ও (৩) বিরচন। সীবন (কঙ্কুকাডি, জামা প্রভৃতি সেলাই করা; উত্ন বোধ হয় ক্রটিত বস্ত্রের সংস্কার, রিফু কর্ম প্রভৃতি; বিরচন অর্থাৎ কাঁথা লেপ প্রভৃতিতে সেলাই করিয়া ফুল কাটা প্রভৃতি"।

২৬। সূত্রকৌড়ী—টীকাকার মতে—"নালিকা-সঞ্চার-দ্বারা নালাদ সূত্রের অল্পখা অল্পখা প্রদর্শন। (সূত্র) ছিন্ন ও দন্ধ করিয়া পুনশ্চ অচ্ছিন্ন ও অদন্ধ ভাবে (উহার) পুনঃ প্রদর্শন। উহা অঙ্গুলিভ্রাস-দ্বারা (সম্ভব) হইয়া থাকে। দেবকুলাদি প্রদর্শন—এইরূপ অঙ্গাঙ্গ ব্যাপার কৌড়ীর্থ (প্রদর্শন)"।

৩। কা: সূ:, পু: ৬৬, ব: সং।

৪। শিরপুষ্পাঞ্জলি, পৃ: ৭

৬বেদান্তবাগীশ মহাশয় 'সূচী' ও 'বান' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, টীকাকারের দ্বারা 'সূচীদ্বারা 'বান' এরূপ অর্থ করেন নাই।

৫। ৭সমাজপতি মহাশয় ৬বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের উক্তির সমর্থ্য করিয়াছেন। ককিপুবাণ, পৃ: ২৪

৬। কৌমুদী, পৃ: ৩০। ইহাতে যে 'উত্ন' শব্দটি পাওয়া যায়, উহা সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদবশতঃ হইয়াছে—'উতন' হওয়াই উচিত। 'উত্ন বোধ হয় ক্রটিত বস্ত্রের সংস্কার' এ বাক্যে আর 'বোধ হয়' প্রয়োগ কেন—নিশ্চয়ই এই অর্থ।

৭ "নালিকাসঞ্চারনালাদিসূত্রাণামঙ্গাখা দর্শনম্। ছিন্না

টীকাকারের উক্তিও একটু পরিষ্কার আবশ্যক। সূত্রকীড়া এক রকমের ভেলু্কি বা বাজী সূতার সাহায্যে বাজী দেখান—ইহার বিষয়। নলের এক মুখ দিয়া নীল, লাল ইত্যাদি কোন এক রঙের ও কার্পাস-পদ্মনালি কোন এক জাতীয় সূতা প্রবেশ করাইয়া নলের অপর মুখ হইতে অল্প রঙের বা অল্প জাতীয় সূতা বাহির করার কৌশল। যেমন ধরুন এক মুখ দিয়া নীলরঙের সূতা প্রবেশ করাইবার অপর মুখ হইতে লাল রঙের সূতা বাহির করণ। অথবা, পদ্মনালের সূত্র সূত্র নলের একমুখে ঢুকাইয়া অপর মুখ দিয়া কার্পাসের মোটা সূতা বাহির করার কৌশল। মুখ হইতে নানা বর্ণের সূতা বাহির করা; এক খণ্ড সূতা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা জোড়া লাগান; সূতা পুড়াইয়া ফেলিয়া পুনশ্চ উহাকে পোড়ান হয় নাই—এই ভাবে দেখান—এই সকল কৌশল; এই কলাটির বিষয়। বলা বাহুল্য যে, এ সকলই হাতের ও আঙ্গুলের কারদার সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সূতার সাহায্যে শুল্কে দেবমন্দির, দেবমূর্তি, তন্ত্রী, অশ্ব ইত্যাদি জীব-গণের মূর্তি একরূপভাবে দেখান যাইতে পারে যে, মনে হইবে যেন শুল্কেই ঐ সকলের আবির্ভাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে—সূতার সাহায্যে পুতুল নাচ, সূতা বা দড়ির উপর চলাকেরা করা ও নাচ, হাতে ও পায়ে সূতার বান্ধন কৌশলে নিমেষের মধ্যে খুলিয়া ফেলা—ইত্যাদি সূত্রকীড়ার অন্তর্গত।

৩৩তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“সূত্র সম্পর্কে বাজি, মুখ দিয়া বিবিধ সূত্র বাহির করা—সূত্র দণ্ড করিয়া অদণ্ড সূত্র প্রদর্শন ইত্যাদি” ৮

৩৪বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—“সূত্র-সংযোগে পুতুলিকা পরিচালন (পুতুলের নাচ)।

৩৫সমাজপতি মহাশয়ের মতে—“সূতা দিয়া কৌশলপূর্বক পুতুলিকা নাচাইয়া জীবিকা নির্বাহের পথ”।

৩৬কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় টীকাকারের অনুসরণে বলিয়াছেন—“ইহা একপ্রকার বাজি বা খেলা মাত্র। নলিকামধ্যে সূত্র-সঞ্চার ও তাহা অন্তভাবে প্রদর্শন, ছেদন ও দহন প্রভৃতি করিয়া সূত্রকে পুনর্ব্যার আচ্ছন্ন অদণ্ড ভাবে দেখান। সূত্র-সাহায্যে শুল্কমার্গে দেবতা প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য” ৯

৩৭৪ চ পুনরুদ্ধিষ্ণুহৃদয় ৪ দর্শনম্। তচ্ছাস্ত্রলিঙ্গাসং। দেবকুলাদিদর্শনম্—ইত্যেবম্প্রকারা ক্রীড়াধৈব—জয়ম।

“নালানিহুত্ৰাণাম্”—অর্থ অম্পষ্ট। নাল অর্থে পদ্মনাল হইতে পারে। পদ্মনালিদির সূত্র নালিকার (নলের) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ক্রীড়া—এ অর্থ হয়। অথবা—‘নাল’ মুজাকর-প্রমাদ—‘নীল’ একরূপ পাঠও আছে। নীলবর্ণ-সূত্র নলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ক্রীড়া। অঙ্গুলিভাস—আঙ্গুলের কৌশল। দেবকুল—দেউল, মন্দির।

৩৮কা: সূ:, ব: সং, পৃ: ৬৬।

৩৯বেদান্তবাগীশ ও সমাজপতি মহাশয়ের—এই কলাটিকে পুতুলনাচের সহিত অভিহিত বলিয়াছেন—টীকাকার-সম্বন্ধে ‘সূতার

২৭। বীণাডমরুকাবাত্ত—মল্লোদয়ের মতে—‘বাদ্যজ্ঞের অন্তর্গত হইলেও সকলপ্রকার বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রীবাদ্যই প্রধান। তন্ত্রীগত বাদ্যবস্তুর মধ্যে আবার বীণাবাদ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। ডমরু-বাদ্য-শিকাতেও বিশেষ কৌশল প্রয়োজন। কারণ, উহা বাল্যকাল হইতে শিখিতে আরম্ভ করা কর্তব্য ও উহার (বাদন-কৌশল) অতি দুর্বিজ্ঞের। (উহার বাদন-কৌশল) সম্যগুপ্তে আয়ত্ত হইলে উহা হইতে স্পষ্টভাবে অক্ষরসমূহ উচ্চারিত হইতেছে—ইহা শুনিতে পাওয়া যায়’ ১০

কামসূত্রকারের মতে—বিত্তীয় কলাটিই বাদ্য-কলা। বাদ্যের চতুর্বিধ বিভাগ—(ক) নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে—তত-অবনদ্ধ-যন-সুবিহ; (খ) যশোধর মতে—তত-বিতত-যন-সুবিহ ১১

টীকাকারের মতে—এই চতুর্বিধ বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রী-বাদ্য বা তত প্রধান। তন্ত্রী বাদ্য হইতেছে তারের বা তাঁতের বাদ্য। ইহার দৃষ্টান্ত—বর্তমানের বীণা, স্বরদ, সেতার, এসরাজ, সুরবাহার, বেহালা, বাজো ইত্যাদি। প্রাচীনকালে কি কি তন্ত্রীবাদ্য ছিল, তাহার সুবিজ্ঞত বিবরণ বর্তমানে পাওয়া না যাইলেও—ইহা সুনিশ্চিত যে বীণা অতি প্রাচীন বাদ্য—উপনিষদে ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

যশোধর বলিতেছেন—সকলপ্রকার তন্ত্রীবাদ্যের মধ্যে বীণাই শ্রেষ্ঠ। মহাকবি মাঘ ‘শিশুপাল-বধ’ কাব্যে (১।১০) দেবর্ষি নারদের বীণা ‘মহতী’র উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শ্লোকটির টীকায় মল্লিনাথের মন্তব্য—বিষাণ-নামক গন্ধর্ব্বরাজের বীণার নাম ‘বৃহতী’, তুশুর-নামক সুপ্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্বের বীণার নাম ‘কলাবতী’ দেবর্ষি নারদের বীণার নাম ‘মহতী’ ও বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বীণার নাম ‘কচ্ছপী’। ঐ শ্লোকটির উপর বল্লভদেব তাঁহার ‘সন্দেহবিমোচন’ টীকায় বলিয়াছেন—রুদ্রের বীণার নাম ‘নালবী’, নারদের বীণার নাম ‘মহতী’, সরস্বতীর বীণার নাম ‘কচ্ছপী’ ও গণদিগের বীণার নাম ‘প্রভাবতী’।

তন্ত্রী-বাদ্যের মধ্যে যেমন বীণা প্রধান, অবনদ্ধ (বা বিতত) বাদ্যের মধ্যে তেমনই ডমরু প্রধান। কারণ, ডমরু বাদ্য বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবাল্য অভ্যাস না করিলে ডমরু-বাদ্য আয়ত্ত করা যায় না। আর যদি ডমরু-বাদ্য একবার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে স্পষ্ট স্পষ্ট বোল বাহির করা যায়। এই কারণে, পূর্বে একবার সাধারণভাবে বাদ্য-কলায় উল্লেখ করা হইলেও এ স্থলে পৃথগভাবে দুইটি বিশিষ্ট বাদ্য—বীণা ও ডমরুর উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহাই যশোধরের অভিপ্রায়।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বীণা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর ও ডমরু দেবর্ষিদের মহাদেবের প্রিয়

ম্যাজিক—এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। শি: পু:, পৃ: ৭। ক: পু:, পৃ: ২৪; কোমলী পৃ: ৩০।

১০“বাদ্যজ্ঞানগতঃসংগীতঃ তন্ত্রীবাদ্যঃ প্রধানম্। তত্রাপি বীণাভ্যং ডমরুকাবাত্তমাবশ্যকার্হম্, বালোপক্রমহেতুর্হৃদয়-বিজ্ঞেয়ত্বাচ্। ততো হরুণাশি স্পষ্টাঙ্গ্যকার্যমাণানি জ্ঞায়ন্তে” জয়ম।

১১—এ সবই বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গী বৈশাখ ১৩৫১ চরিত্র

বান্ধ। এ-কারণেও এই দুইটি বাজের পৃথগ্ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু ভাষাপি এ-প্রকার ব্যাখ্যা আমাদের মনোমত নহে; এ-সবের স্বর্গত তর্কবাক্য মহাশয় বাহা বলিয়াছেন, তাহার বৌদ্ধিকতা অল্প নহে—

“বীণা ও ডমরুর ভাষা বাজধ্বনি—কণ্ঠ ও মুখের সাহায্যে করিবার কৌশল। এখানে ‘ডমরুক’ এই যে ক-প্রত্যয়, ইহাই কৃত্রিমতার চোতক। টীকাকার বলেন,—প্রকৃত বীণাবাদ্য ও ডমরু-বাদ্য;—ইহা বাজনাটক দ্বিতীয় কলার অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্যহেতু পুনর্দ্রষ্টব্য। এ-অর্থ আমার ভাল লাগে নাই।”

মুখে বীণী বাজান বা মুখ হইতে তবলা ও ঢোলকের বোল বাহির করিতে আমি স্বয়ং বহুবার শুনিয়াছি। ব্যাপকভাবে উহা ‘ভেটি লোকুইজন্’ কলার অন্তর্গত। উক্ত অর্থ যে এ-ক্ষেত্রে অসঙ্গত—তাহা মনে হয় না।

বেদান্তবাসীশ ও সমাজপতি মহাশয় এই কলাটির উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই—ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়—“ইহা স্পষ্ট” বলিয়া এক কথায় শেষ করিয়াছেন।

২৮। প্রহেলিকা—টীকাকার বলিয়াছেন—“ইহা লোক-প্রতীভা”—ক্রীড়ার্থ অথবা বাকবরণার্থ ইহার উপযোগ।

‘প্রহেলিকা’ পদটির অর্থ ৮মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে কথিত হইয়াছে—“কবিতার গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান”। ১৪ এরূপ অর্থ প্রহেলিকা বস্তুটির স্বরূপ বুঝাইতে পারে না।

৮তর্কবাক্য মহাশয় এক কথায় সমাপ্তি করিয়াছেন—“হৈয়ালি বচনা ও পুরাতন হৈয়ালির অভ্যাস”। ১৫ অবশ্য দৃষ্টান্ত তিনি দেন নাই।

৮বেদান্তবাসীশ মহাশয়ের মতে—“কবিতার গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান”। ১৬ এ-সবকে আমরা আলোচনা করিব।

৮সমাজপতি মহাশয়ের মতে—ইহা “হৈয়ালি”। ১৭

কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—“কবিতার গুপ্ত অর্থের জ্ঞান (হৈয়ালি)”। ১৮

প্রহেলিকা বলিলে বুঝায় হৈয়ালি। হৈয়ালি বলিলেই যে কবিতার রচিত হৈয়ালি বুঝাইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। তবে সাধারণতঃ সংস্কৃতে উহা কবিতার ও বাঙ্গালায় ছড়ায় রচিত হইয়া থাকে—কিন্তু গুপ্ত হইলেও কোন অসঙ্গত থাকিতে পারে না।

হৈয়ালি দুই প্রকার—স্বরচিত ও পররচিত (প্রাচীন)

১২ কাঃ সূঃ, বঃ সঃ, পৃঃ ৬৬,

১৩ “লোকপ্রতীভা ক্রীড়ার্থা বাদ্যার্থা চ”—জয়ম। লোকপ্রতীভা—সকল লোকেরই জানা।

১৪ পৃঃ ২৩

১৫ কাঃ সূঃ, বঃ সঃ, পৃঃ ৬৬

১৬ শিঃ পৃঃ, পৃঃ ৭

১৭ ককিপুত্রাণ, পৃঃ ২৪

১৮ কৌমুদী, পৃঃ ৩০

হৈয়ালির উল্লেখও দুই প্রকার—(১) ক্রীড়ামূলে আনন্দ উপভোগ (২) পরস্পরের সহিত বাদ-করণ। কিছুকাল পূর্বেও বিবাহের সভায় বর ও বরযাত্রীদ্বয়কে কল্পাপেক্ষণ হৈয়ালি-প্রয়োগে উদ্ব্যস্ত করিতে ছাড়িতেন না।

মহাকবি দণ্ডী তাঁহার ‘কাব্যাদর্শ’ গ্রন্থে বলিয়াছেন—ক্রীড়া-গোষ্ঠী-বিনোদের নিমিত্ত, জনাকীর্ণ দেশে গুপ্ত ভাষার্থ, ও পরব্য্যা-মোহনার্থ প্রহেলিকার উপভোগ হইয়া থাকে।

ক্রীড়া—বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর বাকচাতুরী কৌতুক (অর্থাত্ কথাকটাকাটি)।

গোষ্ঠী—বিদগ্ধগণের একত্র আসনবন্ধ বা মিলন (assembly club)—চলিত ভাষায় ‘আড্ডা’।

বিনোদ—কাব্যালোচনা কালহরণ।

এই সকল স্থলে প্রহেলিকা চলিয়া থাকে।

আর যথায় বহু লোক উপস্থিত, তথায়ও প্রহেলিকাভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণ অপরের সমক্ষেই গুপ্ত বিষয়ে স্বচ্ছন্দে প্রকাশে পরস্পর আলাপ করিতে পারেন, অথচ সাধারণ জনগণ সেই আলাপের মর্মগ্রহ করিতে পারে না।

আর পরের বুদ্ধি বিকল করিয়া অজ্ঞের নিকট পরকে বোকা বানাইবার নিমিত্তও প্রহেলিকার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দণ্ডীর মতে প্রহেলিকার ষোড়শ ভেদ—১ সমাগতা, ২ বক্ষিতা, ৩ ব্যুৎক্রান্তা, ৪ প্রমুখিতা, ৫ সমানরূপা, ৬ পক্ষবা, ৭ সঙ্খ্যাতা, ৮ প্রকল্পিতা, ৯ নামান্তরিতা, ১০ নিভৃত্য, ১১ সমানশলা, ১২ সমুদ্রা, ১৩ পরিহারিকা, ১৪ একচ্ছিন্না, ১৫ উভয়চ্ছিন্না ও ১৬ সন্ধীর্ণা চ।

দণ্ডীর মতে এই ষোড়শ প্রকার অষ্টা প্রহেলিকা। ইহাদিগের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কাব্যাদর্শে উল্লিখ্য। ১৯

এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্বাচার্য্যগণ-কথিত চতুর্দশবিধ দৃষ্টা প্রহেলিকারও উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার ৮মহেশচন্দ্র তর্কবাসীশ মহাশয়ের মতে চ্যুতাক্ষরা, দণ্ডাক্ষরা, চ্যুতদণ্ডাক্ষরা, বিক্ষুব্ধী ইত্যাদি কোন কোন মতে দৃষ্টা প্রহেলিকার অন্তর্গত; মতান্তরে, গুপ্তা ইত্যাদি দৃষ্টা প্রহেলিকার অন্তর্গত। ২০

কাদম্বরীতেও এইরূপ নানাজাতীয় প্রহেলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—“কদাচিত্ অক্ষরচ্যুতক, মাত্রাচ্যুতক, বিক্ষুব্ধী, গুঢ়-চতুর্থপাদ, প্রহেলিকা ইত্যাদির আলোচনা-দ্বারা—

ধর্ম্মদাস-রচিত বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনের চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রহেলিকার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—যে কোন একটি অর্থের প্রকাশন-পূর্বক, স্বরূপার্থের গোপন করিয়া যথায় বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ অর্থ কথিত হয়, তাহার নাম প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা দ্বিবিধ—আর্থী ও শাকী। দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

‘তরুণী-দ্বারা কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিত ও (তরুণীর) মিত্রবহুলে আশ্রিত হইয়া গুরুজনের সন্নিধানও কে মুহমূহঃ কুজন করিয়া থাকে’?

১৯ কাব্যাদর্শ ৩৯৬-১২৪।

২০ কাব্যাদর্শ ৩১০৬।

উক্তর—সজল পানীর-কুস্ত। কুস্তন করে—তু কু তু ক (বা হল হল দুলাং) শব্দ করে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ সুস্পষ্ট। ইহা আর্থী প্রেহলিকার দৃষ্টান্ত। ১২১

সদা অরিমধ্যা হইয়াও বৈবিক্তা নহে, নিত্যান্ত রক্তা হইয়াও নিত্য সিতা,—বথোক্তবাদিনী হইয়াও দৃতী নহে, এরূপ প্রীতিকরী কে?—শীঘ্র বল।

উক্তর—সারিকা। ইহা শাকী প্রেহলিকার দৃষ্টান্ত। সদা অরিমধ্যা—‘অরি’-শব্দটি সর্বদা বাহ্যিক মধ্যে বর্তমান। সারিকা পদটির মধ্যে ‘অরি’ শব্দটি আছে। অথচ, বৈবিক্তাব সারিকার নাই।

রক্তা—রক্তবর্ণী, অথচ অমুরক্তা। সিতা—শেতবর্ণী। রক্তা হইয়াও সিতা—আপাত-বিরোধ। উহার সমাধান—অমুরক্তা ও শেতবর্ণী (সারিকা—‘সার’ শব্দের অর্থ—কৃষ্ণ-শেত-মিশ্র বিচিত্র বর্ণ)।

দৃতীকে যেমন যেমন বাক্য বলিয়া দেওয়া হয়, নায়কের কাছে যাইয়া সে ঠিক তেমন তেমন বলে। আর কাস্তের সমীপে যায় বলিয়া দৃতীও সারিকা। আবার দেখুন—সারিকাকে যে যে কথা পড়ান যায়, সে সেই সেই কথা যথাযথভাবে উচ্চারণ করে, অথচ তাহাকে দৃতী বলা চলে না। ১২২

এস্থলে শব্দগত হইয়ালি।

২০। প্রতিমালা—টীকাকারের মতে—ইহার নামান্তর—‘অন্ত্যাকরিকা’। উহারও প্রয়োগ—ক্রীড়ার্থ বা বাদ্যার্থ হইয়া থাকে। প্রতিম্নোকে যথাক্রমে অন্তিম অক্ষরের সন্ধান-পূর্বক

২১ “ব্যস্তীকৃত্য কমপার্থঃ স্বরূপার্থঃ গোপনাং। যজ্ঞ বাহ্যস্তরাবর্থে কথ্যেতে সা প্রেহলিকা। ১১।

সা ষিধার্থী চ শাকী চ...ভরুণ্যানিদিভঃ কঠে নিভব্বল-সাজিতঃ। গুরুণাং সন্নিধানেনি কঃ কৃজতি মুহমূহঃ”। ৩।

— ২২। সদারিমধ্যাপি ন বৈবিক্তা নিত্যান্তরক্তাপি সিভৈব নিত্যম্। (প্যসিভৈব নিত্যম্—পাঠান্তর)।

বথোক্তবাদিত্তাপি নৈব সারিকা কা নাম কাস্তেতি নিবেদয়াও ১৭।
বিদগ্ধমুখমণ্ডন, ৪র্থ পরিঃ

যখন হুইজেন পরস্পর ম্লোক পাঠ করে তখন তাহাকে প্রতিমালা বলা হয়।

প্রতিমালা—ছড়া-কাটাকাটি। অনেকটা তরঙ্গার মত। তবে এর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ধরুন,—প্রথমে কোন এক ব্যক্তি একটি ম্লোক বলিলেন। তাঁহার ম্লোকের যেটি অন্তিম অক্ষর, সেইটিকে প্রথম-অক্ষর-রূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিবন্দীকে একটি ম্লোক রচনা করিতে হইবে। আবার তাঁহার ম্লোকের অন্ত্য অক্ষরকে প্রথম অক্ষর ধরিয়া প্রথম বাদী আর একটি ম্লোক করিবেন। এইরূপে বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে, যতক্ষণ না কোন একজন নিরুত্তর হন। যিনি প্রথম নিরুত্তর হইবেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার হার হইল। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বরচিত ম্লোকের সমাদরই অধিক। কদাচিত্ কেহ কেহ প্রাচীন কবি-রচিত ম্লোকেরও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আবার মতান্তরে—ইহার অর্থ—ভাঙ্কর্য্যশিল্প।

৬তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—“হুইজেন ছড়া-কাটাকাটি। এক ব্যক্তির ছড়ার শেষ অক্ষর অন্য ব্যক্তির ছড়ার প্রথম অক্ষর হইবে—এইরূপ যোজনা আবশ্যক”। ১২৩

৬বোদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার এক অভিনব অর্থ করিয়াছেন—“বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুতকরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বিজ্ঞান একটি শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নাম ফটোগ্রাফী”। ১২৪ বোদান্তবাগীশ মহাশয় এ অর্থ কিরূপে পাইলেন, তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেন নাই।

৬সমাজপতি মহাশয় ও অমুরক্ত উক্তি করিয়াছেন—“বস্তুর প্রতিরূপ রচনার কৌশল”। ১২৫

৬কুমদচন্দ্র সিংহ মহাশয় টীকাকারের অনুগামী—“অন্ত্যাকরিকা নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক ম্লোকের অন্ত্যাক্ষর সন্ধান করতঃ পরস্পর ম্লোক পাঠের সঙ্কেত”। ১২৬ (ক্রমশঃ)

২৩। কাঃ স্তঃ, বং সাং, পুঃ ৬৬

২৪। শিঃ পুঃ, পুঃ ৭

২৫। কঃ পুঃ, পুঃ ২৪

২৬। কোমুদী, পুঃ ৩০

কথার মর্যাদা

ত্রীকালোক্তির সেনগুপ্ত

কথার অর্থগৌরব আর মর্যাদা যদি চাও,
স্বাক্ষর সার্থক কথা কম করে বোলাও তবে;
সূর্য্যকান্ত মণির ভিতরে রবির কিরণ দাও,
সূচের মতন তাঁক দহন অগ্নিরে পরাভবে।

ভোগ ও লোভ

ভোগে লোভ বাড়ে লোভে কদাচার,
প্রমাণ স্বয়ং সূর্য্য নিজে;
মীম হ’তে মেঘ—মেঘ হ’তে বৃষ
রাশি ভোগ করি রসনা ভিজে।

গান শুধুই ভানী, কামিনী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি যুবতী আর প্রোঁচ। ভাড়ির পাঁজ হুস্কে হুস্কে নিঃশেষ হয়ে বাচ্ছে, গানের মধ্যে আসছে মত্ততার আমেজ। দশকিরা কখনো কখনো এক একটা অলীল উক্তি করছে, কখনো বা বলে উঠছে, বাঃ—বাঃ—বাহবা!

ভারিই মধ্যে সবটার সুর কেটে দিয়ে একবার চকিত কলরব।

—জমিদার, জমিদার!

রসভঙ্গে বিরক্ত এবং সমস্ত হয়ে জনতা উঠে দাঁড়াল। গান এক করে শেষেরা জড়োসড়ো করে সবে বসল একপাশে। ঢোল, করতাল, বাঁশি আর বজ্রের বাজনা যুহুর্ন্তে খেমে গেল।

বিখনাথ ডাকলেন, ওজাদ!

সামনে এসে আত্মরি অভিবাধন জানাল রামনাথ। পেছনে পেছনে এল সুরব, এল বৈজু।

—সব ঠিক আছে?

রামনাথ মাথা নীচু করে বইল। সুরবের পেছিতে লাগল হিংস্রতার মত্ত আন্দোলন। বৈজুর চোখ দুটো সাপের মতো কুটিল আর বিবাক্ত হয়ে উঠল—মশালের রাঙা আগুন প্রতিকলিত হতে লাগল সেই চোখে।

জবাব দিলে বৈজু। শান্ত গলায় বললে, হাঁ হজুর, সব ঠিক আছে। আপনার চাকর আমরা।

—বেশ, মনে থাকে বেন।—ঠোঁটের ওপর বিখনাথের দাঁত চেপে পড়ল: কোনো ভাবনা নেই তোদের।

শেষ পর্যন্ত বা হবে, তার দায় আমার।

রামনাথের মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। কিন্তু সুরবের সমস্ত চেতনায় রূপাপূরের বিজ্রোহী পূর্বপুরুষেরা সাজা দিয়ে উঠেছে। অতীতের সম্রাট আর অতীতের সৈনিক।

বিখনাথ বললেন, খামলে কেন, গান চলুক ভোমাদেব।

একজন কোথা থেকে এর মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার বোগাড় করে এনেছে। বিখনাথ চেয়ারে ভালো করে চেপে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ে গেল ভানীর ওপদ—এমন সুগঠিত, এমন পূর্ণায়ত। রামবেজ রায় বর্নার লালসা আর লোভ উত্তর পুরুষের সমস্ত শিবা-স্নায়ুগুলোকে মাতাল করে দিলে। কোথায় রইল অপর্ণা, কোথায় রইল আসর সজ্জার সেই আবিষ্ট আকুরতা। কী হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে—কী হবে লালা হরিশরণের কথা ভেবে। আপাততঃ এই যুহুর্ন্তটাই সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ভানীর এই উজ্জলিত বোবনজী। বিখনাথ ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করলেন ছ বোতল মদ জোগাড় করে আনবার জন্তে—আর ছ চোখের তীব্র নিলজ দৃষ্টি নিয়ে বেন গিলতে লাগলেন ভানীকে। ওপাশ থেকে বৈজুর সাপের মতো তীক্ষ্ণ চোখ বার বার এসে বিখনাথের মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল—আর কেউ না হোক, সে বিখনাথকে বুকতে পেরেছে।

বৈজু যুহু হাসল। ভানী একদিন ঘটির ঘারে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে কথা বৈজু ভোলে নি—প্রতীকা করে আছে। আজ তার প্রতিশোধের দিন ফিরে এসেছে ইরত্যা।

রাত বাড়তে লাগল। এল মদের পাত্র, শূন্য হয়ে চলল ভাড়ির ভাঁড়। ওদিকে নিজের ঘরে বসে কী একখানা বই পড়তে পড়তে বার বার উৎকর্ষ হয়ে উঠতে লাগলেন অপর্ণা। জানলার ফাঁকে বাইরে শুধু কালো অন্ধকার—আকাশে অল্প সপ্তর্ষি। রাত্রির স্তম্ভতার সঙ্গে সঙ্গে সোনালীখির দিক থেকে ঢোলের শব্দ আরো উত্তাল আর উন্নত হয়ে উঠছে।

—ক্রমশঃ

বিজ্ঞান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

পাঁচ

কিন্তু তার আগে তড়িৎ পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কাচের নল রেশমের ক্রমালের সঙ্গে ঘষলে উভয়ই তড়িৎবদ্ধ হয়। এক কথা বলা হয় এই জন্ত যে, ঘষবার পর দেখা যায়, প্রত্যেকেই ওরা কাগজের টুকরা এবং অন্যান্য হালকা পদার্থকে অনারাসে আকর্ষণ করে থাকে। অমুমান করতে হয়, ঘর্ষণের ফলে ঐ নলটা এবং ক্রমালখানা এমন কোন পদার্থের মালিক হয় বার কালে ওদের ঐক্লপ আকর্ষণ-ক্ষমতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই অজানা পদার্থের নাম তড়িৎ বা বিদ্যুৎ। আরো দেখা যায় যে, যদি ছুঁটা কাচের নলকে ছুঁখানা রেশমের ক্রমালে ঘষা যায় তবে কাচের নল ছুঁটা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং রেশমের ক্রমাল ছুঁখানাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; কিন্তু

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেকটা কাচের নলই প্রত্যেকটা ক্রমালকে আকর্ষণ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে কাচে ও রেশমে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তার ভিন্ন প্রকৃতির। মোটের ওপর ছুঁপ্রকার তড়িৎের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় এবং বলতে হয়, ছুঁটা সর্ব-জাতীয় তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত জাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

উক্তপ্রকারের ঘর্ষিত কাচের তড়িৎকে বলা যায় ধন-তড়িৎ এবং রেশমের তড়িৎকে বলা যায় ঋণ-তড়িৎ। সুতরাং সংকেশন বলতে পাওয়া যায়—ধনে-ঋণে আকর্ষণ এবং ধনে-ধনে বা ঋণে-ঋণে বিকর্ষণ ঘটে। আরো দেখা যায় যে, ঘর্ষণের পর যদি কাচের নল ও রেশমের ক্রমালকে একত্র করা যায় তবে সংযুক্ত অবস্থায় ওরা বাইরের কোন পদার্থকে আকর্ষণ করে না, অর্থাৎ উভয় তড়িৎ

মিলে মিলে একটা তড়িৎবিহীন অবস্থা জ্ঞাপন করে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে যে ধন ও ঋণ তড়িৎের আবির্ভাব হয় তার পরিমাণে সমান এবং যদি সমপরিমাণে উভয় তড়িৎের মিলন ঘটে তবে ওরা পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে তড়িৎ-হীন অবস্থার সৃষ্টি করে। আরো দেখা গেছে যে, কেবল কাচের নল ও রেশমের রুমালই নয়, বিভিন্ন প্রকৃতির যে কোন পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলেই একটার ধন ও অপরটার ঋণ তড়িৎের উৎপত্তি হয় এবং পরিমাণেও ওরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সমান। এর থেকে এবং অজ্ঞাত পরীক্ষা থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জড়ব্যা মাত্রই উভয় জাতীয় তড়িৎের আধার। বতকণ ওর উভয় তড়িৎের মাত্রা সমান থাকে ততকণ ঐ জড় পদার্থে—উভয় তড়িৎের কাটাকাটির ফলে—তড়িৎের বিকাশ হয় না। ছুটা বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণের ফলে এই সমতা নষ্ট হয়—একটার ধন-তড়িৎ বেড়ে যায় এবং অপরটার সম পরিমাণে কমে যায়। ফোঁটার বাড়ে সেটা ধন-তড়িৎের এবং যেটার কমে সেটা সম পরিমাণে ঋণ-তড়িৎের আধার হয়। সুতরাং পদার্থ বিশেষকে তড়িৎসত্ত্ব করার অর্থ ঠাঁড়ালো, ওর অন্তর্গত ধন ও ঋণ তড়িৎের সমতা নষ্ট ক'রে ওদের মধ্যে কারুক খানিকটা প্রাধান্য প্রদান।

কিন্তু তড়িৎ মূলতঃ কি পদার্থ তা' এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা থেকে জানতে পারা যায়না। তড়িৎের গঠন কিরূপ? তড়িৎ কণাময় না কল্পিত ইথেরের মত ক্রমভঙ্গহীন পদার্থ? তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ ধরে নিয়েছিলেন যে, তড়িৎ এক প্রকার সরিল পদার্থ (Fluid) এই পদার্থ ক্রমভঙ্গহীন ও ভারহীন এবং এর আংশসমূহ পরস্পরকে বিকর্ষণ ক'রে থাকে। ভারহীন অহুমান করা হয়েছিল এই জন্ত যে, তড়িৎবিশিষ্ট হওয়ার ফলে পদার্থের ওজনে ভার কোন তারতম্য দেখতে পান নি। ঘর্ষণের ফলে এইরূপে যে তড়িৎের আবিষ্কার হলো তাকে বলা হয় ঘর্ষণজ তড়িৎ বা স্থির-তড়িৎ। স্থির-তড়িৎ বলা হয় এই জন্ত যে, এইরূপ তড়িৎ বিশিষ্ট কোন পদার্থকে কোন তড়িৎ-অপরিচালক (Non-conductor) আধারের ভেতর রেখে দিলে ওর তড়িৎের মাত্রা ঠিকই থেকে যায় এবং ঐ নির্দিষ্ট মাত্রা নিয়ে নানা পরীক্ষা করা চলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যাল্বানি প্রবহমান তড়িৎের ক্ষতিজ্ঞ আবিষ্কার করলেন। এর কিছুদিন পরে ভল্টা দেখালেন যে, একটা কাচের পাত্রে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত ধানিকটা জল ঢেলে দিয়ে তার ভেতর একটা তামার চাক্তি ও একটা দস্তার চাক্তি দাঁড় করিয়ে রাখলে তারমধ্যে ধন-তড়িৎ এবং দস্তা-ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ তড়িতাধারকে বলা যায় তড়িৎ-কোষ। আরো দেখা গেল যে, ঐ চাক্তি দুটাকে যদি একটা তামার তার (বা অন্ত কোন তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ) দ্বারা বাইরের দিক দিয়ে সংযুক্ত করে দেওয়া যায় তবে এই চক্রের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হ'তে থাকে। প্রবল তড়িৎ-প্রোত পেতে হ'লে একটা তড়িৎকোষের বদলে পর পর সংযুক্ত বহু কোষ ব্যবহার করতে হয়। এইরূপ কোষের সমষ্টিকে বলা যায় বৈদ্যুৎ-ব্যাটারী।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে একটা তামার তার চুম্বকের ওপর বিশিষ্ট ধরণের প্রভাব বিস্তার করে। একটা চুম্বক শলাকায় সুতা বেঁধে বুলিয়ে দিলে স্বভাবতঃই শলাকা উত্তর-দক্ষিণ দিক-বরাবর অবস্থান করে। উইলিয়াম দেখালেন যে, তড়িৎ-প্রবাহবিশিষ্ট একটা তারকে যদি চুম্বক-শলাকাটার সমান্তরাল ভাবে, এবং ওর ঠিক ওপরে বা নীচে ধরে রাখা যায়, তবে চুম্বকটা ঘুরে গিয়ে পূর্ব-পশ্চিম দিক-বরাবর অবস্থান করতে চায়। এর থেকে এইটা প্রতিপন্ন হলো যে, তড়িৎ-প্রবাহ চুম্বক-ঋণের ওপর বলপ্রয়োগ করে এবং এই বল কতকটা স্থিতিজাড়া ধরনের। কারণ, বলটা আকর্ষণও নয় বিকর্ষণ-বলও নয়, পরন্তু তড়িৎ-প্রবাহটার আড়-ভাবে (perpendicularly) অবস্থিত। আড়াআড়ি বল-প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রথম। এই পরীক্ষা থেকে আর একটা সিদ্ধান্তও আপনি এসে পড়লো। আমরা জানি ক্রিয়ামাত্রেরই সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং বলতে পারা যায়, তড়িৎ-প্রবাহ যেমন চুম্বক-ঋণের ওপর, চুম্বক-ঋণও সেইরূপ তড়িৎ-প্রবাহের ওপর উদ্ভাসিত সমান বল প্রয়োগ করবে। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত তারটা যদি স্বাধীন ভাবে চলবার সুযোগ পায় তবে চুম্বকের মত তারটাকেও উদ্ভাসিত করে যেতে দেখা যাবে। বস্তুতঃ ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

ফ্যারাডের আর একটা বিশিষ্ট পরীক্ষা থেকে তড়িৎ সম্বন্ধে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। পরীক্ষাটা হলো যৌগিক তরলপদার্থের বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ সম্পর্কে; আর তথ্যটা হলো এই যে, তড়িৎ জিনিসটা বস্তুত ক্রমভঙ্গহীন সরিল পদার্থ নয়, পরন্তু সাধারণ জড়পদার্থের মতই কণাময়,—অর্থাৎ তড়িৎের গঠনেও ক্রমভঙ্গ রয়েছে। পরীক্ষার বিষয়টা এখন না তুলে তথ্যটার কথাটাই আগে আমরা বলবো। যৌগিক তরলপদার্থের দুটাস্ত-স্বরূপ লবণাক্ত জলের উল্লেখ করা যেতে পারে। খাত্তরূপে আমবা যে লবণ ব্যবহার করি তা' একটা যৌগিক পদার্থ। ওর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম-ক্লোরাইড; কারণ রসায়ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, একটা সোডিয়াম-পরমাণু ও একটা ক্লোরিন-পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে এক একটা লবণের পরমাণু গঠিত হয়েছে। কিন্তু জলের ভেতর দ্রব অবস্থায় লবণের অণুগুলি আন্ত থাকে না। আরহিনিয়স্ এই মত প্রচার করলেন যে, জলে দ্রবীভূত হ'তে গিয়ে যৌগিক অণুগুলির অনেকেই ছ'টুকরা ভেঙ্গে যায়, ফলে সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের পরমাণু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে; অধিকন্তু উভয় পরমাণুর অবস্থাই তখন তড়িৎসত্ত্ব অবস্থা। সোডিয়াম-পরমাণু বহন করে ধানিকটা ধন-তড়িৎ এবং ক্লোরিন-পরমাণুতে থাকে ঠিক সম-পরিমাণের ঋণ-তড়িৎ। সমপরিমাণের কারণ গোটা অণুর অবস্থাটা ছিল তড়িৎবিহীন অবস্থা। বিতক্ত অণুর এই ভ্রাম্যমাণ ও তড়িৎসত্ত্ব অংশকে বলা যায়, -'আয়ন' (ion)। বর্তমান ক্ষেত্রে সোডিয়াম ও ক্লোরিন-পরমাণুর প্রত্যেকেই এক একটি আয়ন, কিন্তু ক্ষেত্র-

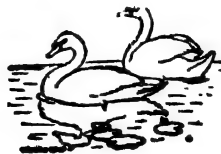
ভেদে কোন কোন আয়ন একাধিক পরমাণুর সমষ্টিও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ .বেরিয়ম-ক্লোরাইড নামক যৌগিক পদার্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেরিয়মের ভ্যালেন্সি বা সঙ্গ-স্পৃহা১র মাত্রা হচ্ছে ২ বা সোডিয়মের দ্বিগুণ। সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের অণু গঠিত হয়েছে প্রতিটি বেরিয়ম-পরমাণুর সঙ্গে একজোড়া করে ক্লোরিন-পরমাণুর সংযোগের ফলে। ফলে দ্রবীভূত অবস্থায় এই অণু ভেঙ্গে গিয়ে ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং সমমাত্রার ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ঐ অংশদ্বয়ের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ফলের ভেতর বিচরণ করতে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে ‘আয়ন’ বলতে বোঝায় একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুকে। প্রত্যেক স্থলেই অণুর ভাঙনের ফলে আয়নের পরিণতি। এই ব্যাপারকে বলা যায় ‘আয়নী ভবন’ (ionisation)

জিজ্ঞাস্য হয়, যদি এক মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহাবিশিষ্ট সোডিয়ম-পরমাণুর তড়িৎের মাত্রা ১ ধরা যায় তবে দু’মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহা-সম্পন্ন বেরিয়ম-পরমাণু কতটা তড়িৎ বহন করে থাকে? উক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, বেরিয়ম-পরমাণুর তড়িৎের মাত্রা হবে ২। কারণ, সোডিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণু বলছে, আমি বহন করি সোডিয়ম-পরমাণুর সমান তড়িৎ বা একমাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণুগুলি বলবে আমরা উভয়ে বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-পরমাণু বলবে আমি একাই বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ, নইলে দুটি ক্লোরিন-পরমাণুর পাণিগ্রহণ করে আমার অমুকপ ক্ষুদ্র সংসারে তড়িৎ-বিহীন অবস্থা ঘটতে পারতো না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে দেখতে পাওয়া যায় যে, ল্যান্থিম নামক ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে রয়েছে ৩ মাত্রার তড়িৎ। মোটের ওপর এরূপ একটা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় যে, পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহাব সঙ্গ তার তড়িৎের মাত্রার একটা অঙ্গাঙ্গী সঙ্গ রয়েছে—যে পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহা যত সে বহন করেও থাকে সেই পরিমাণে তড়িৎ। এখন সঙ্গ-স্পৃহা নির্দেশ করতে হয় ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাধারা সুতরাং পরমাণুদের তড়িৎের মাত্রাও নির্দেশ করার প্রয়োজন ঐ সকল পূর্ণসংখ্যা দ্বারা। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, জড়সত্ত্বের মত তড়িৎপদার্থের গঠনও কণাময়। তড়িৎ-পদার্থ বিভাজ্য হলেও ওর বিভাজ্যতার একটা সীমা রয়েছে। সঙ্গ-স্পৃহা ১ পরিমিত এইরূপ আয়ন কিংবা পরমাণু যতটা তড়িৎ তার অন্তরে বহন করে ঐ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা বা তড়িৎ-পদার্থের হ্রস্বতম মাপকাঠি। সোডিয়ম বা ক্লোরিন-পরমাণুর মত হাইড্রোজেন-পরমাণুরও সঙ্গ-স্পৃহা ১; সুতরাং হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে যতটা তড়িৎ গ্রথিত হয়ে রয়েছে তাকেই ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বাপেক্ষা

হাল্কা পরমাণুই বহন করে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম তড়িৎের মাত্রা; সুতরাং পূর্বোক্ত টেবলে হাইড্রোজেন-পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যে ১ দ্বারা নির্দেশ করা গিয়েছে তা যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

আরহিনিয়সের উক্ত মতবাদ একটা অমুমান মাত্র; কিন্তু এর আগেই ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে বৈদ্যুৎ-বিলেবণ সঙ্কে যে নিয়মটা আবিষ্কৃত হয়েছিল তা’র থেকেই এই মতবাদ সমর্থন লাভ করেছে। আরহিনিয়সের উক্তি থেকে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, লবণাক্ত জল বা অম্ল কোন যৌগিক তরল পদার্থের ভেতর যদি তড়িৎ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করে—তড়িৎ-বল প্রয়োগ করা যায় তবে ধন-তড়িৎবিশিষ্ট আয়নগুলি দল বেঁধে ঐ বলের অভিমুখে এবং ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট আয়নগুলি তার উটাদিকে অভিযান শুরু করবে। সুতরাং অমুমান করা যেতে পারে যে, তরল পদার্থে তড়িৎ-স্রোত উৎপন্ন করার প্রণালীই হচ্ছে এইরূপ দ্বি-মুখী অভিযানের সৃষ্টি করা। প্রত্যেক আয়ন তার নির্দিষ্ট তড়িৎের মাত্রাকে বন্ধে ধারণ করে, হয় তড়িৎ-বলের অভিমুখে নয় তা’র উটাদিকে ছুটে চলে এবং তারি ফলে তড়িৎ-প্রবাহ। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, বৈদ্যুৎ-বিলেবণের ফলে বড়টা করে আয়ন (লবণ-জলের বেগার সোডিয়ম-আয়ন ও ক্লোরিন-আয়ন) ঐ তরল পদার্থ থেকে উদ্ধৃত হবে তাদের ওজন এবং তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা একই অমুপাতে বাড়তে থাকবে। এই নিয়মটাই ফ্যারাডের পরীক্ষা ও পরিমাপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কেন এই নিয়ম তার কতকটা ব্যাখ্যা পাই আমরা আরহিনিয়সের মতবাদ থেকে; এবং ফলে, আনুমানিকভাবে এই তথ্যটাও আবিষ্কৃত হলো যে, তড়িৎ-পদার্থও জড়সত্ত্বের মতই কণাময়। তড়িৎ-কণাগুলি জড়-পরমাণুর মতই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও সসীম এবং জড়-পরমাণুদের মতই মস্ত কারবারী। উভয় শ্রেণীর কণাই সসীম মাপকাঠিরূপে কারবারের জগতে সমান মধ্যাদার দাবি করে। বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো জড় এবং তড়িৎ উভয়ই কণাময় এবং ঐ কণাগুলি সসীম পদার্থ। সুতরাং এখন পর্যন্ত ব্যবহারিক সত্য খাঁটি সত্যের মধ্যাদা দাবী করে দাঁড়িয়ে রইলো এবং গাণিতিক সত্যের একমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হলো ব্যবহারিক সত্যগুলির বাস্তব রূপের কল্পনায় কোন ভুলভ্রান্তি না আসতে পারে সে-বিষয়ে সাবধান করার জ্ঞা। হুই আর একে যে তিন হয় এ খুবই ঠিক কিংক এ-ঠিকের কোন মূল্যই থাকতো না যদি তিনটা জড়কণা বা তিনটা তড়িৎ-কণা সশরীরে বিচ্ছিন্ন থেকে এবং আমাদের অজ্ঞতবোধগো স্বরূপ নিয়ে গাণিতিকের ফরমুলার ভেতর উপস্থিত হতে না পারতো। ফলে এখন পর্যন্ত গাণিতিক বৈজ্ঞানিকের বাহন রূপেই কল্পিত হতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]



পাথের বাকিই হঠাৎ ওর স্মৃতির তার সঙ্গে দেখা, ...আখিচে
ধোয়া আকাশে এক টুকরো উড়ো হাঙ্গা মেঘের মত একেবারে
আচমকা, আকস্মিক। এ রকম হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়াটা ব
আশ্চর্য্য ঠেকে অপূর্ব্বের কাছে, এত আশ্চর্য্য যে বিশ্বাস কর
পারা যায় না; অথচ এই অবিশ্বাস, অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশি
আশ্চর্য্যটাই আজ হঠাৎ ওর সামনে এসে এমনভাবে চমক লাগি
দিল যে, বিশ্বাস না ক'রেও কোনও উপায় নেই। ক্ষুদ্র থে
ক্ষুদ্রতর ঘটনা, অথচ অপূর্ব্বের কাছে সেটা একটা মস্ত বড় হৈয়ালি,
বার ইজিতে ও বোবা হ'য়ে গেছে, অসাড় হ'য়ে গেছে, অজ্ঞান
হ'য়ে গেছে। কি ক'রবে ও? কিছু একটা বলতে হবে নিশ্চয়ই,
কিন্তু কিছু না বলাটাই যেন আরো সহজ ওর কাছে। একটা
ভয়ঙ্কর দোটারায় পড়েছে অপূর্ব্ব, একটা বিস্তী আবর্তের ফেনিল
উচ্ছ্বাসে যেন টলমল করছে ও, কখন তুলিয়ে যায় তার ঠিক নেই।
স্মৃতির তা কিত্ত আর চূপ ক'রে থাকতে পারে না, ডাকে—
“অপূর্না।” অপূর্ব্ব একটু হাঙ্গা হোল, খানিকটা নিশ্চিন্ততার
ভেতর হঠাৎ স্বপ্ন ও নিজে থেকে পারলো একটুখানি জানতে,—
বিশ্বাস্ত বাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবার পর রোগী যেমন নিজেকে
একটু জানতে পারে, ঠিক সেই রকম। অপূর্ব্ব স্মৃতির মুখের
দিকে চায়, দেখে—স্মৃতির হাতে একটা মস্ত বড় গোলাপ
ফুলের তোড়া, আর তার ওপর ঢাকা জেলীর মত কোমল একটা
হালকা ক্রমাল। মুহূ একটু হেসে স্মৃতির তা জিজ্ঞাসা করে—
“খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছো, না?” অপূর্ব্ব একটু হাসতে চেষ্টা
ক'রেও পারে না, ভাড়াভাড়ি জবাব দেয়—“একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছি
বৈ কি। আজ পাঁচ বছর পরে হঠাৎ দেখা।” স্মৃতির তার চোটে
এক টুকরো মরা, বর্ণহীন হাসি ভেসে ওঠে, মাথা নীচু ক'রে ও
বলে—“আজ তোমার জন্মদিন, তাই আসছিলাম তোমায় ফুল-
গুলো দিতে... মাঝখানের পাঁচটা বছর তো আর আসতে পারি
নি।” বছরদিন পরে আজ হঠাৎ অপূর্ব্বের মনে হোল,—আজ ওর
জন্মদিন। একেবারেই ভুলে গেছলো ও... জন্মদিনের কথাটা
তখন মনে লাগলো না অপূর্ব্বের, বললো—“এসছে। যখন, তখন
একবার বাড়ীতে চল স্মৃতির তা।” “না-না, বাড়ীতে আর এখন
যাব না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি পেছনে... ফুলগুলো নাও”—
স্মৃতির তা ফুলগুলো ভুলে দিলো অপূর্ব্বের হাতে। আবার এক
মুহূর্ত্তের ছন্দ... একটা অসম্মিত মুহূর্ত্তের মৃত্যু। নতুন মুহূর্ত্তের
স্মৃতির প্রথমই কথা বললো অপূর্ব্ব—“স্মৃতির তা, চল বাড়ীতে
গিয়ে একটু বসি।” স্মৃতির তার মনের এক অজ্ঞাত, অলঙ্কিত
আগ্নেয়গিরির গহ্বর ফেটে যেন একমুঠো বিসাক্ত গরম কালো
ধোয়া বেরিয়ে আসতে চাইলো, একটা সঙ্কল্প প্রবল উচ্ছ্বাস
ওর মনের শাস্ত্র, মরা নদী থেকে উপহু পড়ে যেন ফেটে পড়তে
চাইলো ওর হুটো চোখের শুকনো তারে, কোন রকমে বললো
ভাড়াভাড়ি—“না, না, অপূর্না... ও বাড়ীতে আর আমার যেতে
বলো না, তার চেয়ে চলো এ পার্কে গিয়ে বসি।”

করেক পা হেঁটে ওরা যখন পার্কে গিয়ে বসে, গোখুরির
অন্তরালে তখন সমস্ত আকাশটা রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। ওরা

হৃদয়ে বসে আছে নিশ্চাপ উপস্থিতির মত, ...ভুলে গেছে যে ও
বসে আছে, বসে আছে অর্থহীন প্রয়োজনে। হঠাৎ জ্ঞান কি
পাওয়া চেতনার খানিকটা টাটকা, গরম নিশ্বাস আছড়ে প
ওদের অহুভূতির তোরণে। ওরা চমকে ওঠে হঠাৎ বিদ্যুতে
খানিকটা বলসানির মত, ভাবে—কিছু বলতে হবে, অন্ততঃ কি
বলাই প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে মগজের কামরায় কোন্ বাহুরের
চমক লাগানো বাহুর অপূর্ব্বের ছোঁয়ার ঘূমিতে থাকা রাশি রাশি
কথা যুগপৎ জেগে ওঠে, লাফিয়ে ওঠে, অস্থির হ'য়ে ওঠে বাইরেব
একটু আলো আর বাতাসের লোভে। অনেক কথার ঠোঠালি
আর বাস্তবতার উদ্যম হ'য়ে ওঠে ওরা, কোনটা বলবে আগে
আর কোনটা শেষে? এই বিচার করতে করতেই স্মৃতির তার
ঠোঁটের ওপর প্রথমই বেজে ওঠে—“পাঁচ বছর আগের দিনগুলো
মনে পড়ে অপূর্না?” অপূর্ব্ব যেন কুল থেকে কুলে ভাসতে
ভাসতে হঠাৎ একটা অবলম্বন পায়... স্মৃতির তার মুখের দিকে
চেয়ে জবাব দেয়—“পড়ে; কিন্তু আজ সেটাই সকলের চেয়ে বড়
পরিহাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।” “ঠিক তাই”—স্মৃতির তার কোমল,
মাসেবল বুক বেয়ে একটা কম্পমান দীর্ঘশ্বাস আন্তে আন্তে
বেরিয়ে আসে, ওর বেদনার্ত্ত মনের অশরীরী প্রোভাষা, অস্পষ্ট
হাহাকার সেই দীর্ঘশ্বাস। আবার কিছুক্ষণের মুহূর্ত্ত, মনের
সজাগ চেতনার ওপর অবচেতনার খানিকটা হালকা ছায়া এগিয়ে
আসে, আবার সরে যায়; রক্ত বিরহী শিল্পীর বাশির মত
স্মৃতির তার মনের মুক্ত বহু বাহুর থেকে বেরিয়ে আসে গোটা কতক
উদাস অজস্রিত বাণীর স্রবণের স্রবণেই টুকরো—“কিন্তু,
আজো যখন সারাদিনের কথক্লাস্ত, হাঁপিয়ে-পড়া মনটাকে একটু
নিজ্জনতার কোমল ছায়ায় ছেঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, তখন
বারবার কেন সেই হারানো মরচে-পড়া দিনগুলোর সর্কাস থেকে
রকমারী আলো ঠিকবে এসে চোখ ছুঁতে বলছে দেয়, তা আজো
বুঝে উঠতে পারিনি অপূর্না।” স্মৃতির তার চোখের কোল ছুঁতে
চিক্চিক ক'রে ওঠে, কালো ভাসমান মেঘের আড়াল থেকে উজ্জল
তারার মত... ওর মনের উজ্জ্বল মরুভূমির ওপর দিয়ে পাঁচবছরের
জমা কালবৈশাখী ছুঁতে চলেছে হু-হু ক'রে। অপূর্ব্বের মন কিন্তু
শাস্ত্র, দৃঢ়, নিরুপদ্রব; ও সহজ, সরল, সাধারণ,—একেবারে নতুন,
তাই বেশ শাস্ত্রস্বরেই ও বলে, “মিথ্যাকে বুঝতে
গেলে মনকে অনেক মিথ্যা কৈফিয়তই দিতে হয় স্মৃতির তা।”
“মিথ্যা?” জমাট বিষয়ে স্মৃতির তা আছড়ে পড়ে অপূর্ব্বের সর্কাসে।
অপূর্ব্ব হাসে, কৃপণের জ্ঞান তামাটে চাঁদের মত, জবাব দেয়
“তা ছাড়া আর কি! হুটো মুখের রঙীন কথার প্রেরণায় যে
মন হুটো কোন কুলের সন্ধান না নিয়েই পাল-ছেঁড়া নৌকার মত
প্রবল জোয়ারে ভেসে চলেছিল, আজ হঠাৎ তা স্থির হয়ে গেছে
কেন? একদিন যাকে প্রেম ব'লে ভুল করেছিলাম, তা প্রেম
নয়... সে শুধু মহর্কের জলে-ওঠা মহর্কের উপচে-পড়া।”

“অপূর্না” ক্রম নিশ্বাসে চোঁচিয়ে ওঠে স্মৃতির তা। অপূর্ব্ব
মধ্যে তবু কোন পরিবর্তন নেই... ও যেন সাগরের পাখাণ-তীর,
যার ওপর ঢেউ এসে যথ ধুবড়ে আছড়ে পড়লেও কোনও সাড়া

নেই। সূচরিতার বেদনা-পাতুর মুখের সহজ প্রকাশেও তাই ও ফুলে ওঠে না, দৃঢ় কণ্ঠে বলে, “ঠিক তাই সূচরিতা; অপরিণত মন নিয়ে যে মিথ্যার পেছনে একদিন ছুটেছিলাম আমরা, সেই মিথ্যাই আজ চৈত্রের সূর্যের মত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। যা হয়েছে তা সবই মিথ্যে, আর আজ যেগুলো কারণে অকারণে হৃৎক্লেশের মত চোখের স্নানতম পাতায় পাতায় নেচে বেড়ায়, সেগুলো তার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।”

সূচরিতা জলে ওঠে, একফুলকি আঙনের ছোঁয়ায় একরাশি টাটকা বারুদের মত। বলে,—“বাণীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বাস্তব সুরের কোমল প্রাণ রঙীন সূর্যের একটুখানি স্নানিত উত্তাপের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছিল, বিচ্ছেদের পরেও সেই প্রাণের সত্যিকারের স্পন্দন যদি কোনদিনই প্রতিফলিত হোত তোমার সর্বগ্রাসী মনের শূন্য আনাচে-কানাচে, তা হলে আজ তুমি এক কথা বলতে পারতেন না অপূর্ণ।” তোমার নিষ্ঠুর বৃকের ভেতর এখনো যে প্রাণটা সজীব হয়ে আছে, তুমি ভুললেও, সে আজো ভোলেনি কিছুই; সে জানে, তোমার আর আমার মাঝখানে কত উচ্ছ্বসিত, কত পরিপূর্ণ সোণালী মুহূর্তে দুটো অদৃশ্য অশরীরী মনের কত শতবার আলিঙ্গন হয়েছে, কত বোবা মুছিত মুহূর্তের ভগ্নাংশে আমরা দুজনে দুজনকে লুপ্ত করে নিয়েছি শত সহস্র হাতে,—দুজনকে রিক্ত করে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছি দুজনের কাছে।”

সূচরিতা কেঁদে ফেলে, শুণ্ড বেদনার আকস্মিক জাগরণের মর্মান্তিক কশাঘাতে। অপূর্ণ তখনো পূর্ণের মত কঠিন, তাই বেশ সহজভাবেই বলে, “সে সবই একটা চমৎকাব ফাঁকি, একটা অভিনব অভিনয়, তাই তার চিরমৃত্যু হওয়াই ভাল।” সূচরিতার দেহী হয় না। উত্তর দিতে, সঙ্গে সঙ্গেই ওর কম্পিত ঠোঁট দুটোয় বেজে ওঠে “বাণীর নুপুর পায়ে দিয়ে তোমার দুটো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে সেদিন যে একটুখানি প্রাণের স্পন্দন বেজে উঠেছিল, আজ তার মৃত্যু হয়েছে জানি; তবু কোনও গুরুপক্ষেব পূর্ণিমা তিথির ক্ষমভোলানো তবী চাঁদের মায়ায়, বাসন্তিক মলয়ের নিশাসের আবেশ-যন্ত্রণায়, কোনদিনই কি সে মাটিব গভ থেকে একটা আলো-বাতাসবন্ধিত দুর্লভ চারার মত, তোমাব মনে ভীকৃ ক্ষণস্থায়ী প্রাণকে নিয়ে এক ফোঁটা আনন্দেও বেঁচে ওঠে না?” “না, না, না”, অপূর্ণের দৃঢ় জবাব। মিশকালো সাড়ীটার আঁচলে মুক্তোর মত ধবধবে অশ্রুকাণ্ডোলকে সমস্ত লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললো সূচরিতা, “আমি অপূর্ণ; যাবার সময় আশা-ভীকৃ মনে একটা অমুরোধ শুধু তোমায় করছি, ফুলগুলো বন্ধ ক’রে রেখো, ওগুলো আমাব অন্তবেব অকৃত্রিম প্রীতি-উপহার, পাঁচ বছর আগে তোমার তিনটে জন্মোৎসবে যা দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার,—আর এই চিঠিটা পড়ো।” খোলাস্ত, উত্তপ্ত বৃকের ওপর বক্ষোবাসের আড়ালে বেগে দেওয়া একটা নীলচে, ধলধসে খাম বারু করে ও দেয় অপূর্ণের হাতে, অধূর্ণ নিঃশব্দে গ্রহণ করে। সূচরিতা উঠতে উঠতে হয়েছে, এমন সময় অপূর্ণ বললো, “আমার কবে আসবে সূচরিতা?”

“ঠিক জানি না; কালই আবার “ও”র সঙ্গে ব্যিরা বেতে হবে।”

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা চললো সোজা রাস্তা ধরে, কম্পান প্রদীপ-শিখার মত। রাস্তার ওপার দিয়ে ছুটন্ত একটা ট্যাক্সিকে ডেকে সূচরিতা উঠে বসে, বলে, “যদি কিছু ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা করো অপূর্ণ।” নেহাৎ সৌজন্য আর ভদ্রতার তাড়নায় স্ত্রী জবাব দেয় অপূর্ণ, “ওকথা বলে লজ্জা দিও না।” “আমি” সূচরিতার ট্যাক্সি ছুটে চললো—অপূর্ণের দৃষ্টিকে পছনে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ণের মনে পড়ে, রীতিমত প্রয়োজনীয় একটা কাজ এখনো বাকী আছে ওর। শাড়ী একখানা কিনতে হবে ওকে মানসীর জন্তে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় ও, তারপর উঠে বসে একটা ট্রামে। দোকানে গিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনার পর কেনে একখানা শাড়ী, ওর মতে। মানসীকে সকলের চেয়ে বেশী মানাবে যেটা। মানসীর বিদ্যুতের বলসানির মত স্পষ্ট আর উজ্জল দেহে অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে রঙের সাড়ীই মানায় ভালো।

মানসীর কাছে অপূর্ণ যখন এসে পৌঁছালো, রাত তখন প্রায় নটা। অপূর্ণের প্রতীক্ষায় থেকে মানসী তখন পিয়ানোর ঠং ঠং ছন্দে নিজেকে হালকা ক’রে তুলছে, তরঙ্গায়িত ক’রে তুলছে, পল্লবিত ক’রে তুলছে। দরজার আড়ালে খুঁখাট, শব্দ, অপূর্ণ ঢুকলো ঘরে এসে। মানসী চঞ্চল হয়ে উঠলো, অপূর্ণের সামনে গিয়েই লাল গোলাপগুলোর দিকে চেয়ে বললো, How lovely! আমার ফুলগুলো দেবেন?” “আপনার জন্তেই তো এনেছি, ফুল ফুলের পাশেই মানায় ভালো” নির্বিকারে, নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তে জবাব দিলো অপূর্ণ। অধীর আনন্দে মানসী ফুলগুলো ছিনিয়ে নিলো অপূর্ণের হাত থেকে, তারপর নিয়ে গেল নাকের কাছে,—এক মুহূর্তে আশ্রয় নিয়ে আস্তে আস্তে ওর পরিপূর্ণ ঠোঁট দুটোয় একটা হালকা চুখন এনে রেখে দিলো একটা ফুলে, অস্তি সন্তপণে, সচেষ্ট সাবধানতায়, পাছে ওর চুখনের আঘাতে ফুলের কোমল পাপড়িগুলো ভুয়ে পড়ে, ক’রে পড়ে বৃন্ত থেকে খসে। টেবলের ওপর ফুলদানিতে মানসী স্তম্ভ ক’রে স্টোডাটা রাখলো সাজিয়ে। অপূর্ণ মানসীর হাতে সাড়ীটা দিলো,—বললো, “দেখুন, এবাব গৃহস্থ হয়েছে তো?” বৈদ্যুত আলোর সাহায্যে সাড়ীটা খুব ভাল করে নাড়াচাড়া ক’রে দেখে মানসী,—ওর চোপের ভেতর থেকে ঠিকবে পড়ে গভীর তৃপ্তির উজ্জল আলো,—খুব পছন্দ হয়েছে ওর, অপূর্ণের পাশে এসে বসে মানসী,—একবারে পাশে। অপূর্ণের মনে তখন উদ্গাদনাব রক্ত চঞ্চল হ’য়ে উঠেছে, একটা চুখনের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছে ওর চির-তৃষ্ণার দুটো লোভী ঠোঁট; মানসীকে ও টেনে আনে একবারে নিবিড়তম সম্পর্কে,—ছড়িয়ে দেয় একটা উত্তপ্ত, প্রলম্বিত চুখন ছাদশীর চাঁদের মত মানসীর দুটো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে,—টেনে নেয়, শুবে নেয়, লুপ্ত করে নেয় মানসীর ঠোঁট দুটোর এক অজ্ঞাত, অদৃশ্য কোণ থেকে বত রাজ্যের সক্ষিত মধু। মানসী বাধা দেয় না, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে একটা অবলম্বনের মত অপূর্ণের একখানা হাত টেনে আনে একবারে নিজের কোলের ভেতর।

উঃ, কি সাংঘাতিক গরম মানসীর কোলের ভেতরটা, অপূর্ণ

শিউরে ওঠে।.....হঠাৎ অপূর্ব নিজেকে মানসীর কাছ থেকে মুক্ত করে দেয়, বলে—“কাল কিন্তু আপনাকে আমার ওখানে যেতে হবে।”

“ধাব” আবেশ-কম্পিত স্তরে জবাব দেয় মানসী। অপূর্ব যায় বেরিয়ে।

ঘরে এসে এই সর্বপ্রথম অপূর্ব আবিষ্কার করে,—ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা ইজি-চেয়ারের কোমল আঁকে ও নিজেকে বিলিয়ে দেয়,—তার পর চোখ দুটো দেয় বুজিয়ে, নিশ্চিন্ত আলস্বে গভীর শান্তিতে। মানসীর চুড়িত, কম্পিত, আরক্ত ঠোঁট দুটোর কথাই মনে পড়তে লাগলো ওর বার বার,—সেই ঠোঁটে কত মধু, কত মদিরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় স্মৃতির তার দেওয়া চিঠিটার কথা,...কোটের পকেট থেকে খামটা বার করে চিঠিটা ও ধরে চোখের সামনে, পড়ে...

“অপূর্না,

স্বামীকেই সর্বস্ব অর্পণ ক’রে আজ রিক্ত হয়ে আছি; একদিন তোমাকেই সব দিয়েছিলাম, পেয়েও ছিলাম অনেক;

সে সব আজ “প্রাক্তন স্বপ্নের” মতই মনে হয়। যুগল হিয়ার কল্পনা দিয়ে নীড় বেঁধেছিলাম একদিন, সে নীড় ভেঙে গেছে। জীবনের ক্ষেত্রে বীজ বপন করাই শুধু সার হোল, কসল কললো না। সে দুঃখ আজো বিবাক্ত গ্যাসের মত গুমরে গুমরে ওঠে মনে, জানি না কবে মুক্তি পাব। স্বামী থাকতেও অস্ত্র কোনও পুরুষের চিন্তা করা মহাপাপ জানি, কিন্তু কি করব অপূর্না, আমার অতীত আমার সমস্ত বর্তমানকেই যে গ্রাস ক’রে নিয়েছে। বাক, পুরাণে দিনের জের টেনে তোমায় ভারাক্রান্ত করতে চাই না, তুমি আমায় চিরদিনের জন্তে ভুলে যাবার চেষ্টা কর।

—স্মৃতিরতা।”

অপূর্ব একটু হাসে, তল্লাজড়িত অবসাদের গুরুভারে হয়ে পড়ে ওর দুটো ক্লান্ত চোখের পাতা, বিশ্বস্তির শূন্যতায় লীন হয়ে যায় ওর সমস্ত চেতনা—বুঝতেই পারে না কখন, কোন এক অজ্ঞাত অসতর্ক মুহূর্তে ওর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে যায় পাশের Waste Paper-box-এ।

প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব

শ্রীবিষ্ণুনাথ সেন, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল

কলিকাতা বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ও অজ্ঞতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। ইংরাজ-রাজত্বের বহু পূর্বে ইহাতে ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠের দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য জরীপ বা সার্ভে করিয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত তাহার সময়ে প্রজাস্বত্ব বিবয়ক যে, “আইনি আকবরি” নামক পুস্তক প্রচলিত ছিল, তাহাতেও কলিকাতার পরিচয় পাওয়া যায়(১)। কলিকাতার ইতিহাস এখন ইহাতে স্তব্ধ নহে, ইহার বহু পূর্বে কবি বিপ্লবদাস চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও কলিকাতার উল্লেখ আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কলিকাতার উৎপত্তি হিন্দুদিগের রাজত্বকালে হইয়াছে(২)। তবে এ-কথা বলা হইতে পারে যে, কলিকাতা অতি প্রাচীন নগর হইলেও ইহা নিজে একটি স্বতন্ত্র পরগণা ছিল না। এক সময়ে ইহা সপ্তগ্রাম অর্থাৎ বর্তমান হুগলীর মালগুজারং সেরস্তার অধীন ছিল। আরও দেখা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাহার সেনাপতি

মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে দমন করিবার জন্ত বঙ্গদেশে আসেন। তখন তাঁহাকে নদীয়ার জমিদার ভবানন্দ, সাবর্ণ চৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এবং বংশবেড়িয়ার রাজা জয়ানন্দ এই তিনজন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পারিতোষিক হিসাবে তিনি কলিকাতাকে উক্ত তিনজন ব্যক্তিকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহারাই কলিকাতার আদিম মালিক (৩)। কলিকাতা এখন City of Palaces এবং বৃটিশ রাজত্বে দ্বিতীয় নগর বলিয়া বিখ্যাত। বর্তমান কলিকাতার দৃশ্য হইতে প্রাচীন কলিকাতার কোন ধারণা করা যায় না। প্রাচীন কলিকাতার পরিমাণ (area) বর্তমান কলিকাতা হইতে অনেক অংশে ক্ষুদ্র ছিল এবং সে সময়ে ইহা গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বর্তমান কলিকাতা তিনটি গ্রামের সমষ্টি—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমানে ইহার কতখানি পরিবর্তন ঘটয়াছে(৪)। বর্তমান কলিকাতার উত্তর অংশই সুতানুটি অর্থাৎ উত্তরে মহারাত্রি ডিচ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বর্তমান Minthouse পর্যন্ত যে অংশ, উহাই সুতানুটির পরিমাণ। উদ্বিগ্নে অর্থাৎ Minthouse হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে Customs

(১) Statistical Account of Bengal, Vol. 1 page 381.

(২) Bengal District Gazetteer—24 Pargannas page 26.

(৩) Calcutta Guide—S. C. Sarker. page 2.

(৪) Notes on Geography of Old Bengal—Monmohan Chakravarti—page, 284-5.

House পর্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার পরিমাণ এবং তারিয়ে অর্থাৎ যে স্থানে বর্তমান দুর্গ ও ময়দান উহা গোবিন্দপুরের চিহ্ন (৫)। নিয়ে প্রাচীন কলিকাতার একটি মানচিত্র দেওয়া গেল :—

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কলিকাতার উল্লেখযোগ্য পরিচয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকালে পাওয়া যায়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হুগলী নগরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির এজেন্ট Charnock-এর সহিত মোগল কর্মচারীদিগের মনোমালিন্য ঘটে। তাহার ফলে ইংরাজগণ হুগলী পরিত্যাগ পূর্বক বর্তমান কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ সূতাছুটি গ্রামে আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। সূতাছুটির অর্থ সূতার হাট; ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন কলিকাতা সহর ছিল না বটে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব ছিল। বর্তমান বড়বাজার তাহার স্পষ্ট পরিচয় এবং উহার মধ্যে “সূতাপাটা” “তুলাপাটা” প্রভৃতি স্থানের নাম প্রাচীন গৌরব জাহির করিতেছে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে Charnock সাহেব যখন হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিলেন, তখন কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পাকা বাটী ছিল না বলিলেই চলে এবং ইহার চতুর্দিকে জঙ্গল ও পুষ্করিণীপূর্ণ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কলিকাতার জঙ্গলে হিংস্র জন্তু ও পুষ্করিণীতে কুচ্ছীর বাস করিত(৬)। যে স্থানে বর্তমান ময়দান উহা পূর্বে গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্য এতই মন্দ ছিল যে, Charnock সাহেব এখানে আসিবার অল্পদিন পরে বহুসংখ্যক ইংরাজের অকালমৃত্যু ঘটে। সেজগৎ ইংরাজগণ ইহাকে Golgotha(৭) বলিত। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও Charnock সাহেব এখানে সূচাক রূপে বাণিজ্য করিতে থাকেন, তাহার ফলে বহুসংখ্যক ইংরাজ আসিয়া এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিলেন। ইহার পর ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনা হয়। বাহার দ্বারা ইংরাজগণ কলিকাতার দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হইলেন।

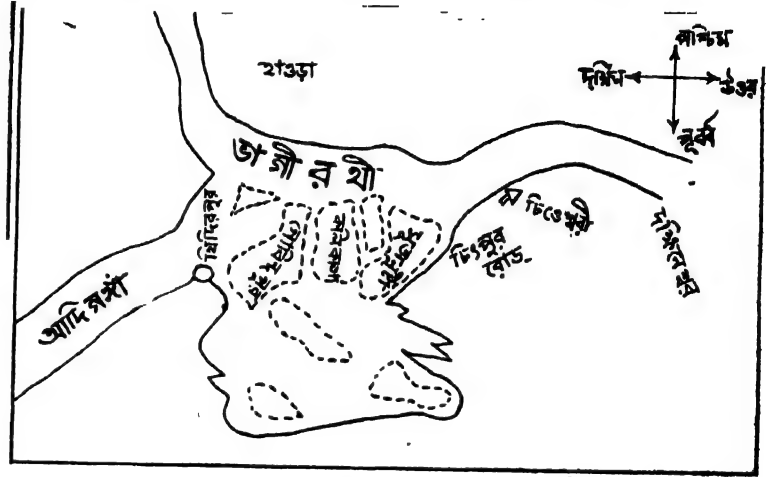
(৫) সরল বাঙ্গালা অভিধান—স্ববলচন্দ্র মিত্র—৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৬) A place of mists, allegators and wild boars—Staendal's Historical Account of Calcutta page 208।

(৭) Place of skulls—District Gazetteer—24 Pargannas—page 28.

Death overshadowed every living soul—Wilson's Early Annals of English in Bengal—page 208,

বর্তমান জেলার জনৈক জমিদার সুরবিসংহ হঠাৎ মোগলদিগের উপর বিরোধী হইয়া রহিম খাঁ নামক একজন আকগানের সহিত যোগদান করেন। ইংরাজগণ সেই সুযোগে তৎকালীন বঙ্গদেশের মোগল সুবাদের সম্রাট, আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে শাস্তিবন্ধা ও শত্রু দমনের জন্য একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই উপলক্ষে ইংরাজদুর্গ কোর্ট উইলিয়াম বর্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিস যে স্থানে আছে ঐ স্থানে নির্মিত হয়(৮)। তাহার পর ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ



প্রাচীন কলিকাতা

অর্থাৎ তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০০ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব বিনিময়ে গোবিন্দপুর, সূতাছুটি ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিবার নিমিত্ত তৎকালীন নবাব শ্রীম আজিম আমানের নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র (letters patent) লয়েন এবং পূর্বোক্ত লক্ষীকান্ত রায়ের নিকট হইতে একটি সনদমূলে তিনখানি মৌজার জমিদারী (dependent talukdari) স্বত্ব লাভ করেন। জায়গীর হস্তান্তরের আবেগ্য, সেই কারণে ইংরাজগণ উক্ত সনদমূলে মাত্র খাজনা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। অল্প কথায় তাঁহারা প্রজাস্বত্বের মালিক হইলেন। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের কালেক্টরীতে যে খাজনা দেওয়া হয়, তাহাকে rent বা ground rent বলে, উহা কিন্তু revenue নহে। ইংরাজদিগের এই জমিদারী স্বত্বই ক্রমশঃ বিশাল রাজস্ব পরিণত হইয়াছে (৯)। তাহার পর ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের মালিক হইলেন। ঐ বৎসরই তাঁহারা তৎ-

(৮) History of India—Meadows Taylor Page 396.

(৯) Constitutional Law—Sarbadhikary, page 350. Mayor of Lyons vs. East India Co. 1 M. I. A. 173 (271)

কালীন বঙ্গদেশের নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থিত জমিসমূহের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। এবং এঁরা সেই উপলক্ষে প্রাচীন কলিকাতা অর্থাৎ সূতাছুটি গ্রামটিকে সম্পূর্ণ লাক্ষরাজ বা নিক্কর স্বত্বে পরিণত করেন। তাহার পর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পুনরায় দুর্গ পরিচালনা করিয়া গোবিন্দপুর গ্রামে বর্তমান দুর্গ নির্মাণ করেন; সেই সময় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বর্তমান ময়দান প্রস্তুত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে যতই সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, কলিকাতা ততই সমৃদ্ধি লাভ করিল এবং ভারতের রাজধানী বলিয়া পবিচিত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজধানী ছিল। ইহাই কলিকাতার সাধারণ ইতিহাস।

* * * *

রাজকার্য্য-পরিচালনা—

কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপন করিবার বহু পূর্বে ইংরাজগণ মাস্ত্রাজ দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথমে কলিকাতা মাস্ত্রাজের অধীন ছিল। ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ইং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ পর্য্যন্ত ইহা বোম্বাই ও মাস্ত্রাজের মত একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন(১০) প্রচার করেন—যদ্বারা ইংরাজ-অধিকৃত সকল স্থানের মধ্যে কলিকাতা সর্বোচ্চ প্রাধান্য লাভ করে এবং বোম্বাই ও মাস্ত্রাজ ব্যতীত অঙ্গ সকল স্থান কলিকাতার অধীনে পরিগণিত হয়; এই উপলক্ষে কলিকাতার গভর্ণর “গভর্ণর জেনারেল” অথবা পাইয়াছিলেন ও কলিকাতা মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশের রাজধানী হইল। সেই সময়ে সবকারী মালখানা (Imperial Treasury) কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলের অমুপস্থিতিকালে তাহার কার্য্য তদাবক কবিবার জঙ্গ একটা ডেপুটির পদের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসন-ভার স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিবার জঙ্গ একজন লেফটেন্যান্ট (Lieutenant) গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন, তাহাকে চলতি কথায় ছোটলাট বলা হইত। এই সময়ে আলিপুরে Belvedere নামক প্রাসাদ নি্মিত হইয়াছিল; উহা Lieutenant গভর্ণরের বাস-স্থান ছিল। পূর্বে গভর্ণর দুর্গে (fort) বাস করিতেন। বর্তমান Government Palace লর্ড ওয়েলেস্লির সময় নি্মিত হইয়া-ছিল।

রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনা—

ইং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ অর্থাৎ তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর অধিপতি শাহ আলমেব নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। এই দেওয়ানি লাভই ব্রিটিশ সম্রাজ্য স্থাপনের বীজ (১১)। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দেশীয়

কর্মচারিগণ ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্ব-স্থিত স্থানসমূহের রাজস্ব (ground rent) আদায় করিতেন। এই বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন দেওয়ান ছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে এই বীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। দেওয়ানের স্থানে একজন কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার কালেক্টর এক ex-officio কর্মচারী মাত্র। রাজস্ব বলিতে যাহা বুঝায় উহা ground rent মাত্র। সেই হেতু গভর্ণমেন্ট ইস্তাহারমূলে কলিকাতার যে কোন অধিবাসী পূর্বে ৩০ এবং বর্তমানে ৩৫ বৎসরের ground rent একসঙ্গে দিয়া তাহাব দখলী জমিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিক্কর করিয়া লইতে পারে। এ-স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার ground rent একজন ডেপুটি দ্বারা আদায় হয় এবং তিনি ট্যাক্স ও আবগারি সংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন।(১২)

আইন-আদালত—

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলী পরিচালনা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পরে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে সূতাছুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন ও বহুসংখ্যক ইংরাজ কায়মী ভাবে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই উপলক্ষে তৎকালীন ইংলণ্ডের আইন অর্থাৎ Common Law ও Statutory Law উভয়েই এদেশে প্রচার হইয়াছিল। বিদেশে বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজ দেশীয় আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা ইংরাজগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সনন্দ (charter) মূলে পাইয়াছিলেন এবং এই সনন্দমূলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার দখলস্থিত সমুদয় স্থানে নাবিক ও নৌ-যান সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ও ফ্যাক্টরী ও তথাকার কর্মী সম্পর্কে ও বাণিজ্য বিষয়ে সকল ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন-কানুন প্রচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছিলেন(১৩)। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Charles II-এর সনন্দ (charter)-মূলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ অধিকৃত সকল স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা পান। কিন্তু সে সময়ে এদেশীয় অধিবাসী-দিগের উপর ইংলণ্ডের কোন প্রভাব ছিল না, সুতরাং তৎকালীন ইংরাজ অধিবাসিগণই কেবলমাত্র ইংলণ্ডের আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বহুসংখ্যক ইংরাজ এখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার হেতুও কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী Common Law or Statutory Law এদেশে প্রচলনের ফলে বিলাতী আদালতের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার জমিদার ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, সুতরাং তৎকালীন জমিদারদিগের অমুকরণে কলিকাতায় একপ্রকার আদালতের সৃষ্টি হয় এবং তাহার কার্য্য-প্রণালীও (procedure) জমিদারদিগের আদালতের মত

(১০) Regulating Act of 1773 (13 Geo. III. C. 63).

(১১) Aitchison Treaties (India) page 60
Courts & Legislative Authorities in India—Cowell
page 23

(১২) District Gazetteer—24 Pargannas.

(১৩) Mayor of Lybns vs. East India Co.
1 M. I. A. 272.

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ কবি। সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর পরম পরিচয়ও ঐ—তিনি কবি। বিড়ম্বিত আমাদের জীবনের অন্তরে তার রসরূপটি তিনি উপলব্ধি করেছেন—সত্যেব অন্তরালে শিবকে অনুভব করেছেন এবং সুন্দরের রূপে সত্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর রচনায়—গানে, গল্পে, কাব্যে, নাট্যে, আবৃত্তিতে, ব্যাখ্যানে, অভিনয়ে।

কবি বলতে ঠিক কি বোঝায় ঠিক করে বোঝানো শক্ত। সোজা হিসেবে আমরা তাঁকে কবি বলি যিনি কবিতা বচনা করেন। অক্ষর গুণে গুণে মিল খুঁজে খুঁজে লিখলেও লেখা কবিতা হয় এবং হিসাব মত তার লেখককেও কবি বলতে হয়। ঐ সব কবির্য কিম্বদন্তি বৈশী দিন ধবে কবিতা লিখতে পাবেন না এবং কথাটা ভাবতে গেলে মনে হয় যে গাছেব যেমন ফুল ফোটবার একটা সময় আছে কবিতা লেখাবাবও হয়ত সেই রকমের একটা বয়স আছে মানুষের। গাছের সঙ্গে এই ব্যাপারের সাদৃশ্য এই আছে যে মানুষও এই সময়ে তার অন্তরে বাহ্যেব সুন্দর হয়ে ওঠে এবং নিজের সুন্দর হয়ে অগ্নকেও সে সুন্দর দেখে। এই বিশেষ বয়সে আমাদের যাবা কবিতা নাও লেখেন মনে মনে তাঁরাও গুন গুন করেন বা স্বপ্ন বচনা করেন নিজের খোসাথেয়ালে। এই সঙ্গীত বা স্বপ্নের সম্পর্ক ধবেই সুন্দরের আবির্ভাব হয় মানুষের মনে এবং মনের গুণে শব্দেব তাব লাভণ্য ফুটে ওঠে। কবিতা লেখার এই প্রেবণা যাব মধ্যে সাময়িক বা মরত্মমী-ব্যাপাব মাত্র নহ—ভেতরের তাগিদে যিনি কবিতা বচনা করেন, কবি পরিচয় তাঁবই সার্থক।

জগৎ জুড়ে উদার স্তরে যে আনন্দগান বাজচে গভীর তাব স্রবটি ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে বেজেচে এবং সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে চেয়েছেন তিনি নিজের তাঁব জীবনেব। কবিতা লেখা সেই তাঁর সাধনাব একটা বিমাত্রাশষ্ট প্রকাশ এবং দেখা যায় যে মাত্র কবিতা লিখেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি তিনি। কবিতাত তিনি লিখেছেনই অধিকন্তু ছবি এঁকেছেন, গান গেয়েছেন, গল্প বলেছেন। নিজের লেখা কবিতা তিনি আবৃত্তি কবেছেন—নিজের রচিত নাটক অভিনয় করেছেন। তিনি কথকতাও করেছেন অর্থাৎ কথায় কথায় নীতি ও ধর্ম ব্যাখ্যান কবেছেন। ঐ আবৃত্তি অভিনয় বা কথকতা যা তিনি কবেছেন সে সবই নূতন ভাবে কবেছেন—নূতন জোতনা জাগিয়ে তুলেছেন তিনি তাব মধ্যে দিয়ে। এই বিচিত্র সাধনায় সুন্দরকে তিনি জীবনে ফুটিয়ে তুলতে, আনন্দকে সহজ কবে ধবতে চেয়েছেন। মানুষকে তিনি ভাল বেসেছেন, তাকে দেখে তাব কথা শুনে নিজের মনে তিনি আনন্দ পেয়েছেন এবং কথা তার আলোকে ছায়ায়, রঙে বসে বিচিত্র কবে রচনা করেছেন তিনি সাহিত্যে। তাঁর দিকে চেয়ে সুন্দরকে আমরা প্রত্যক্ষ কবেচি এবং তাঁরই মধ্যে সুন্দরকে দিনে দিনে সুন্দরতর হয়ে উঠতে দেখেচি। সাধারণ ভাবে কবি বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথকে কবি বলে আমরা তার চেয়ে অনেক বেশীই বুঝেচি। বাড়তির দিকের সেই হিসাব কিম্ব আঙ্গ আর বোঝাবার উপায় নেই—কবির সঙ্গে অনেকখানিই তার চলে

গিয়েচে। তাহলেও যা তিনি রেখে গিয়েছেন অসামান্য অপূর্ণ তাঁর সেই সাহিত্য সাধনা।

সাহিত্য কথাটা সহিত শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত। অজ্ঞের অনেকের সঙ্গে অন্তরে যিনি সংযুক্ত নন—সত্যানুভূতিশীল নন তাদের সম্পর্কে, সাহিত্যে তাঁর সাধনা মানুষের মন পর্যন্ত পৌছতে পারে না। অজ্ঞকে যিনি ভাল দেখতে পান না সুন্দরকে উপলব্ধি তাঁর পক্ষে সহজ নয়। অবশ্যই সব সময় চোখে দেখে সুন্দরের পরিচয় হয় না—মনে অনুভব কবে নিতে হয়। বাপ মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেবই আমাদের আছে এবং সকলেই আমরা তাদের ভালবাসি যদিও দেখতে তাঁদের অনেককেই ঠিক সুন্দর বলা যায় না। কিম্ব সুন্দর নয় বলে আত্মীয়দের সম্পর্কে আমাদের মনেব ভালবাসা কম হয় না। কারণ তার এই যে চোখের দেখাকে এখানে আমরা বড় কবে ধরিনে বা চবম বলে মানিনে, মন দিয়ে এই সব আত্মীয়দের মন আমরা অনুভব কবিত্তে পাঁচি এবং মনের স্রবদ ধরেই এদের আমরা সুন্দর দেখি এবং ভালও বাসি। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাব এই পরিচয় অলঙ্ঘ্য থাকে আমাদের মনে। এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে এ পরিচয় আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে পাঁচি। এই মনই কবির সম্পদ—তাঁর পরিচয়। অজ্ঞকে অনেককে তিনি ভাল দেখেন ভালবাসেন এবং তাঁর সেই ভালবাসাই কবিকে সকলেব আমাদের আপনার কবে দেয়। তাঁর সমসাময়িক ও পববস্তীদের জীবনে কবির প্রভাব প্রত্যক্ষ। নেপথ্যে থেকে কবি তাদের জীবনের গতি নির্দেশ করে দেন—অলঙ্ঘ্য থেকে পরিচালিত করেন সে জীবনকে।

হুই

খুব কম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। সেই প্রথম বয়সেব তাঁর বচনার মধ্যে অর্থাৎ “মানসী”ব আগে পর্যন্ত লিখিত তাঁর কবিতার মধ্যে নিজের তাঁর কথাটি প্রাধান্য লাভ কবেচে। “নিব্বারের স্বপ্নভঙ্গ” “প্রভাত উৎসব” প্রভৃতি কবিতাব কথা এই সম্পর্কে মনে করা যেতে পারে। উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যতীত নিজের বাইরের প্রায় কিছুই ঐ সময়কার তাঁর রচনায় যথেষ্ট স্থান জুড়ে নেই। কারণ সম্ভবত তার এই যে নিজেকে ঐ সময়ে তিনি যেমন জানতেন নিজের বাইরের অনেক কিছুই তখন পরিচয় তখন তাঁর হয়নি এবং তাব স্রবোগও তিনি তখন পাননি।

বাণ্যকাল তাঁর কেটেচে চাকরদের হেফাজতে, ফলে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁব খেলাব সাখা ছিল না। কিম্ব সে অভাব তিনি পূরণ কবে নিয়েছিলেন নিজের খেলালখুসি মত সখা ও সাখী রচনা করে। ঐ সব সঙ্গীদের সঙ্গে রীতিমত আনন্দে দিন কেটেচে তাঁর। সেই জগাই সেদিনের সেই তাঁব অভ্যাস বড় হয়েও জীবনে তিনি ভুলতে পারেননি এবং সারা জীবন ধরে নিজের খেলালখুসি মত মানুষ রচনা কবে গিয়েছেন তিনি।

ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে পৈতৃক জমিদারি পরিচালনার

ভার নিয়ে কবিকে কলকাতার বাইরে* পদ্মাতীরের পল্লী অঞ্চলে বাস করতে হয়েছিল। ঐ সময়ের আগে পূর্ণাস্ত সময় তাঁর কেটেচে কলকাতা বা তারই মত ছোট বা বড় কোন না কোন সহর জায়গার ঔৎসাহ্যহীন উদাসীন জনতার মধ্যে প্রায় নিঃসঙ্গ ভাবে। পিতার সঙ্গে হিমালয় প্রদেশে বা মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশে বা বিলাতে তিনি কিছুদিন কবে বাস কবেচেন বটে কিন্তু সঙ্গীর অভাবে ঐ সব স্থানে বাসও প্রায় প্রবাসবাসেব মতই অনুভূত হয়েচে কবির কাছে। ফলে তাঁর আর যাই হোক সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েচে এবং দূবে থেকে আবছা দেখা অনেক মানুষের অনেক কথাই মনের তাঁর সৃজনী-প্রতিভা উসকে দিয়েচে এবং নিজের মনে ঐ সব মানুষকে যেরূপ তিনি দিয়েচেন সে তাদের নিজেদেরও বিশ্বসেব কারণ হয়েচে—নিজেরা তাবা নিজেদের তেমন সহজ ভাবে অনুভব কবতে পারে নি যেমন কবে কবি পরিচয় দিয়েচেন তাদের। ঐ পল্লী অঞ্চল শিলাইদহে কবি যেন তাঁর মনের মত জায়গা পেয়ে গেলেন। প্রতিবাসীদের সঙ্গে পল্লীবাসীদের আত্মীয়তার আদান প্রদানে পল্লী-জীবনের মাধুর্য্য কবির মনে প্রচুব আনন্দ দিয়েচে। সেই সময়ে যারা তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করেছে, জীবনে নানাভাবে বিড়ম্বিত বলে অগ্নেব সহানুভূতিব একান্ত প্রয়োজন অনেকেরই তাদের ছিল এবং কবির কাছে এসে অনায়াসে তাবা তাঁর সহানুভূতি লাভ কবেচেন। শাস্ত্রমুখ প্রকৃতি এবং কোমল শীতল তার আবেষ্টনের মধ্যে সচিস্থংগত মানুষের সমাজ—হুই-ই কবির মনে তাদের প্রভাব ফেলে গিয়েচে।

কবির দিন ঐসময়ে খুব আনন্দের কেটেচে এবং তাঁর চিঠি-পত্রেও সেই আনন্দের কথা তিনি বলেচেন—না বলে থাকতে পারেন নি। সেই আনন্দের প্রেবণায় রচনাব তাঁর নবজন্মের সূচনা দেখা যায়—নিজেকে ছাড়িয়ে অগ্নেব কথা নিজে লেখবার প্রেরণা ঐসময়ে তিনি অনুভব করেন। নাস্তি-চঞ্চল সেই জীবন-প্রবাহেব অন্তরে তিনি গেন তাঁর কবিতার চন্দ্র, তাব গতি যতি, আবেগ আনন্দ অনুভব কবলেন এবং নিজেকে প্রস্রবালে রেখে অগ্নেব কথা নিয়ে লেখা তাঁর আবস্ত হল সেই সময় থেকে। অগ্নেব কথা বলবার জ্ঞান ঐ সময়ে কবিকে ছোট গল্প লিখতে হয়। ঐ অগ্নেব কথা তিনি বলেচেন সে কথাকে নিজের কথা কবে নিয়ে এবং যা তিনি বলেচেন তা বলতে যে প্রচুব আনন্দ তিনি পেয়েচেন তাঁর লেখা পড়ে সে কথা আমবাও বেশ অনুভব কবতে পাৰি।

শিলাইদহে বা সাজাদপুরে দীর্ঘদিন ধরে কবি নদীতীরে নৌকায় বাস করেচেন এবং শত প্রয়োজনে নদীতীর হুধাবের গ্রামবাসী সব নরনারীদের নদীতে আসাযাওয়ার শত ফাঁকে পল্লীজীবনের যে বিচিত্র খণ্ডাংশ তাঁর সামনে ভেসে এসেচে গিয়েচে অন্তরেব প্রীতিরসে অভিযুক্ত করে সেই জীবনের কথা দিয়েই তিনি তাঁর ছোট গল্প রচনা কবেচেন। নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে রচিত কবির ঐ সব গল্প অনায়াসেই আমাদের মন স্পর্শ করে এবং লেখকের মনের আনন্দ রচনার বাহনগ্নে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। মানুষকে ভাল দেখে তাকে ভালবেসে লেখা ঐ সব গল্প পড়তে বোধ হয় চিরদিন ভাল লাগবে।

কবির গল্পে যে সব ঘটনার কথা আমরা পড়ি তেমন ভাবে

ঘটনা অনেক সময়েই আমাদের আশেপাশে ঘটে। কিন্তু ঐ সব ঘটনার অন্তরে প্রচ্ছন্ন তার বসন্তপটি প্রায় সময়েই আমাদের নজর এড়িয়ে যায় কারণ ঘটনাব যেটুকু মানুষের মনে অগোচরে থাকে তার সম্পর্কে নিজেদের হিসাবে প্রায় সময়েই আমরা ভুল ক'রে বসি যেহেতু অগ্নেব ক্রটি-বিচ্যুতির দিকটাই বিশেষ ভাবে আমাদের হিসাবে বড় হয়ে ছায়াপাত করে। গোড়াকার কথা হয়ত ঐ যে জীবনকে একটা যুদ্ধ বলেই আমরা মানতে শিখেছি এবং যুদ্ধক্ষেত্র বলেই জীবনের গোরব বোধ করতে চাই আমরা অগ্নেব বিপন্ন বিব্রত করবার সুযোগ তাই আমরা হারাতে চাইনে—অনেক সময়েই এবং তাকে বিভূষিত দেখলেও খুসি হই আমরা মনে মনে। জীবনে যুদ্ধের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু সম্ভবত মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় প্রয়োজন পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করা। সেই জ্ঞানই হয়ত মনে অগ্নেব সম্পর্কে আমরা প্রীতি অনুভব করি। প্রত্যক্ষ বিরোধের অন্তরালে অগ্নেব সম্পর্কে তাঁর অন্তরে কবি মৈত্রীভাব অনুভব করেন এবং জীবনেব তাঁর যুদ্ধের ব্যাপারেও যথাসাধ্য সহায়তা করতে চান। পরস্পরের সম্পর্কে যে প্রীতি সত্যকাবে আমাদের জীবনে অনেক সময়েই আমরা অনুভব করতে পারিনে সেই প্রীতির উৎসমুখ তিনি খুলে দিতে চান অপ্রত্যক্ষ আমাদের মনে। অগ্নেব সম্পর্কে অন্তরেব তাঁর ঐ সহানুভূতিতেই কবির পরিচয়। মানুষকে তিনি প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখেন না বলেই সমকক্ষ বলে মনে করতে পারেন এবং তার পরে অগ্নেব কথা তার ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়ে যায় কবির পক্ষে। দ্রব দিয়ে লেখা তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের কথা নিজেদের অনেকানেক আত্মীয়দের চেয়ে আমাদের মনে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে এবং অন্তরঙ্গ মহলে সত্যকাবে আত্মীয়ের মত ভাবেই তাদের কথা নিয়ে আলোচনা-আলোচনা করি আমরা।

তিন

প্রত্যক্ষ ঘটনা অনেক সময়েই কবির গল্পের পটভূমিকা মাত্র এবং তাঁর গল্প হচ্ছে মানুষের মনের ওপরে ঐ ঘটনার প্রভাব ফেলাব, তাব স্পর্শ বুলিয়ে দেওয়ার। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে ঘটনাব মধ্যে বেশ একটু অসাধারণ আছে এবং বলা যেতে পারে যে, রাইচরণ যা করেছিল আমরা কেউ নিশ্চয় তা করতাম না। তা' হলেও কিন্তু আমরা বলতে পারিনে যে অজ্ঞায় করেছিল রাইচরণ। কারণ বোঝা যায় যে, তার মনের ভাব যেমন ছিল তাতে ঐ যা সে করেছিল তা অসঙ্গত হয় নি। আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে আর কারো পক্ষে যে তা স্বাভাবিক হবে না এমন মনে করা সুস্থ প্রকৃতির লক্ষণ নয়।

তার পরিচয়ে কবি বলেছেন যে রাইচরণ ভদ্র ঘরের ছেলে*। জন্মসংস্কারে তাই তার পক্ষে মনে করা সহজ ছিল যে অকারণে কারো মনোবেদনার কারণ হওয়া উচিত হবে না তার পক্ষে। গরীব বলে কিন্তু তার জীবনে শিক্ষার সুযোগ সে পায় নি। ফলে অবস্থাব জটিলতার মধ্য দিয়ে তার বিচার করবার যোগ্যতা সে আয়ত্ত করতে পারে নি। শুধু যে শিক্ষার অভাব তার হয়েছে তা নয়—ছেলেবয়স থেকেই পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে নিজের উদরান্নের সংস্থান করতে হয়েছে তাকে। সেই ধাঁর কাজ করে

নিজের তার জীবিকা তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে—সেই মনিবেব স্থখ-দুঃখের ব্যাপারে নিজেকে কোনমতেই সে উদাসীন করে তুলতে পারে নি কোন দিন।

পরের কাজ হলেও নিজের কর্তব্য রাইচরণ ঠিকমতই করে যাচ্ছিল। কববার তার কাজ অবস্থা তেমন শক্ত ছিল না, কারণ সে কাজ ছিল ছোট একটি ছেলেকে কোলে পিঠে করে বেড়ানো—তার খবরদারি করা। নিজের সে কাজ সে ঠিকমতই করে গিয়েছিল। তাই ঐ ছোট ছেলে বড় হয়ে উঠলেও ঐ বাড়ীর কাজে তাবজবাব হল না। ক্রমে ঐ ছেলে আবার বড় হতে যখন আবার তার একটি ছেলে হ'ল তখন সেই শিশুটিকে 'মাল্লখ' করার ভারও গিয়ে পড়ল রাইচরণের ওপর। রাইচরণ নিজে তখন আর ছোট নয়—তাই ছোট ছেলের বকম সকম ধারণা-দাবণ তার কাছে বিচিত্র বলে মনে হতে লাগল এবং সেই অবস্থায় আনন্দের তার আতিশয্যে শিশুর মায়ের কাছে গিয়েও শিশুর বুদ্ধি ও চাতুর্যের তাবফি করে সন্তানবৎ জননীকে পগ্যস্ত বাববাব সে চমৎকৃত করে দিতে লাগল।

ছেলেব বাপ ছিলেন মুস্লেফ এবং পদ্মাতীবেব কোন একটা সহবে বদলি হয়ে এসেছিলেন তিন এক সময়ে। সেখানে বর্ষাকালে একদিন সকাল থেকে সমস্ত আকাশে মেঘ কবে ছিল কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না। রাইচরণের ইচ্ছা ছিল না যে আকাশের সে অবস্থার পোকাবাবুকে নিয়ে সে বাইরে বেবোয় কিন্তু বোজকাব মত তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবাব জগ্ন বিকলেব দিকে ছেলে বায়না ধরে বসল এবং নিজের ইচ্ছামত কাজ কববাব অধিকার রাইচরণের ছিল না বলে ঠেলাগাড়ীতে পোকাবাবুকে চড়িয়ে নিয়ে বেবোতে হয়েছিল তাকে শেষ পগ্যস্ত।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল কিন্তু ছেলে নিয়ে রাইচরণ বাড়ী ফিরল না। ছেলের মা বাবা উদ্ভ্রম হয়ে উঠলেন এবং দিকে দিকে লোক ছুটল ছেলেব খোজে। পগ্যস্ত দিকে যে গিয়েছিল সে দেখল যে ভাঙাগলায় 'পোকা বাব' 'খোকাবাবু আমাব'—বলে ডাকতে ডাকতে অন্ধকাব একটা জায়গাব মধ্যে আবিষ্টেব মত রাইচরণ কেবলই এদিক ওদিক বণে বেড়াচ্ছে।

ছেলেকে আর পাওয়া গেল না এবং সকলেই বুঝলেন যে বাফসী পগ্যাই তাকে উদবগাং কণেচে। ছেলেব মা'ব কিন্তু কেমন মন্দেহ হতে লাগল যে ছেলের গায়েব গহনাব লোভে হযত বুইচরণই তাকে কোথাও লুকিয়ে রেণেচে। ছেলেকে ফিবিয়ে দেবাব জগ্ন বার বার তাই তিনি রাইচরণকে অহুৰোধ কবলেন—মিনতি পগ্যস্ত করলেন তাব। রাইচরণ তাঁর সে অহুৰোধ বাণেতে পারল না—শুধু নিজের কপালে কবাবাত কবল কিন্তু তা দেখে মনিব পঙ্কী তার খুসি হতে পারলেন না। শেষ পগ্যস্ত তাই চাকরিতে তার জবাব হয়ে গেল এবং রাইচরণ মোড! তার দেশে চলে গেল—চাকরির আর কোন চেষ্টা কবল না। কার জগ্ন চাকরি করবে সে? নিজের তাব ছেলে ছিল না—হয়ই নি।

দেশে তার ঘর-বাড়ী ছিল এবং জমিজমাও কিছু ছিল। সেখানে গিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমে রাইচরণের একটি ছেলে হল এবং বেশি বয়সে সন্তান প্রসব করাব হুভোগ সহ্য কবতে না পোবে স্ত্রী তার মা'ব গেল সেই ধাকায়। ছেলের জন্মেব পরে ছেলের মায়ের মৃত্যুব জগ্ন না হলেও ছেলেব ওপরে প্রথম থেকেই রাইচরণেব মন বিকপ হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল যে মনিবেব তাব ছেলেব নিগোজ হওয়াব নিমিত্ত হওয়াব পণে নিজের তাব পুত্র-স্বপ্নভোগ কবা অত্যন্ত অসম্ভব অগায়। ছেলের দিকে তাই রাইচরণ ফিবণ্ড চাইত না এবং ছেলেব এক পিসি যদি না সে সময়ে তাব ভাইয়েব সংসাণে থাকত তাহলে হযত অযত্নেই ছেলেটাব প্রাপ্ত হত অকালে।

পিসিব যত্নে ছেলে দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল এবং দেখে রাইচরণ অবাক হয়ে যেত যে ঐ শিশুও হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পাব হতে যায় এবং সে সময়ে তাকে কেউ আটকাতে আসচে বুঝলে পিসিখিল ববে কলহাঙ্গ তুলে দ্রুত গতিতে কোন এক নিবাপদ স্থানে যাবার চেষ্টা করে। রাইচরণেব মনে পড়তে লাগল যে তাব খোকাবাবুও সিক ঐ কবত এবং তাই দেখে মনে কতদিন সে প্রচুর কৌতুক অহুভব কবতে এবং শিশুর মায়ের কাছে গিয়ে তাব ঐ সব বাহাহুরির কথা আনন্দে গলে সে যোগণা করেচে এবং বলেচে যে বড় হয়ে ছেলে তাঁব জজ হবে। এখন নিজের ছেলের কাণ্ড দেখে মনে দিন দিন রাইচরণেব বিষয় বাড়তে লাগল। জজ হবাব কোন সম্ভাবনা যাব নেই সেও এমন করে কেন? কথাটা তার মনেব মধ্যে তোলাপাড়া করতে লাগল এবং স্থিতি যোগ কবতে পাবল না সে কিছুতেই। এমন অবস্থায় একদিন যখন সে শুনল যে ছেলে হাব পিসিকে 'পিচি' বলাচে তখন ব্যাপারটা তাব কাছে হঠাৎ বেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল এবং তার মনে হল যে তাব খোকাবাবুই আবাব দিব এসেছে তাব কাছে চোব বদনাম তাব মুছে দেবাব জগ্ন। মনে তাব আব কোন সন্দেহ বইল না—কারণ সে ভাবল যে তাই যদি না হবে তা হলে ঐই অসময়ে বুড়া বয়সে তাব ছেলে হতে যাবে কেন? আরো তাব মনে হতে লাগল যে খোকাবাবু'ব মা নইলে বার বার তাকেই বা কেন বলচেন ছেলেকে তাঁব ফিবিয়ে দেবাব জগ্ন? তাব মনে হল যে মায়ের মন সিকই বুঝেছিল এবং সে স্থির কবল যে ছেলেব মাকে সে তাঁব ছেলে ফিবিয়ে দেবে।

অতঃপর রাইচরণ তার ছেলেকে নিয়ে পড়ল এবং নিজের অবস্থার অতিবিক্ত খবচপত্র কবে সে তাকে মাল্লখ কবতে আনন্ত করল। ক্রমে ছেলে বড় হলে তাব লোখাপড়াব বন্দোবস্ত কববাব জগ্ন দেশে তাব জমিজমা সব বিক্রা করে রাইচরণ ছেলে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল এবং সেখানে ভালে একটা ছাত্রাবাসে ছেলেকে বেণে নিজের জগ্ন একটা চাকরী সে জুটিয়ে নিল। সেই ভাবে বেশ কিছুদিন কাটলে নিজের তাব শবাবের অবস্থা ক্রমে পগ্যাপ হয়ে আসতে মনে তাব হতে লাগল যে তাব দেবী না ববে যাদের ছেলে তাদের কাছে ছেলেকে পৌছে দেবে সে। অতঃপর তার পুত্র মনিবেব ঠিকানা সংগ্রহ কবে একদিন ছেলেকে নিয়ে রাইচরণ তাব বাবাসতের বাসায় গিয়ে উপহিত হল।

বাইচরণের সঙ্গে স্বদর্শন ছেলেটিকে দেখে তাকে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করিতে অমুকুল বাবু স্বীকৃত্যে কিছুমাত্র বিধা বোধ করলেন না। অমুকুল বাবু কিন্তু অত সহজে মনে নিতে পারলেন না ব্যাপারটা কিন্তু তিনিও ভেমন কড়া হতে পারলেন না কারণ তাঁর ভয় হল যে ছেলে যে তাঁর সে কথা ঠিকমত প্রমাণ করতে না পারলে তার ফল হয়ত এই হবে যে জীকে তাঁর দ্বিতীয়বার পুত্রসীনা করা হবে। সে অবস্থায় নিজের মনকে বোঝাবার তাঁর যুক্তি এই ছিল যে মিথ্যা বলবার বাইচরণের কোন কারণ ছিল না যেহেতু কোনদিক থেকেই কোন লাভের সম্ভাবনা তার ছিলনা ছেলেটিকে তাঁদের বলে দিয়ে যাবার মধ্যে। ছেলের দিকে চেয়েও তার স্নিগ্ধ নথবকাস্তি দেখে নিজের ছেলে বলে তাকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তির কাণ্ড তিনি দেখতে পেলেন না। ছেলেকে জিজ্ঞাসা কবেও তিনি জানলেন যে বাইচরণ বরাবরই চাকরের মত কাজ কবে আসতে তাব।

ছেলেব মা তাঁর হারাধন কবে পেলেন এবং সেই আনন্দে বাইচরণের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা কবে তিনি তাকে বাড়ীতে স্থান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু অতি-সাবধানী অমুকুল বাবু তাতে সম্মত হতে পারলেন না। তাব মা-বাবা সেই মতভেদের মধ্যে বাইচরণের জ্ঞা কিছু মাসাহারার বরাদ্দ কবে দেবার প্রস্তাব কবল ছেলে। শুনে অমুকুলবাবু খুঁসি হয়ে গেলেন এবং মনে করলেন যে অতঃপর বাইচরণের সম্পর্কে নিজের তাঁব কণ্ডব্য তিনি করতে পারবেন।

বাইচরণ সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল—দেখে শুনে সে ব্যাপার বুঝল সম্ভবত সেও মনে করেন যে এমন হবে নিজের ছেলেকে অন্ধের হাতে সঁপে দিয়ে নিজের পথ দেখতে হবে তাকে। কিন্তু তাই করবার প্রয়োজন যখন হল তখন দ্বিধামাত্র না কবে ফেলনাকে ফেলে রেখে সে তাব পুণ্যে মনিববাড়ী থেকে বেবিয়ে পড়ল—একবার কবেও চাইল না পিছনেব দিকে। আশ্বিনী এই মাসটিব ওপরে মনে আমাদের শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়েচেন কবি তাই জীবনের তার বিড়ম্বনার জ্ঞা অন্তরে আমবা বেদনা বোধ কবেচি। তাব কোন কথা বাইচরণ নিজে বলল না বলে তাব ব্যথা বুঝতে চাইলেন না তিনি।

তার

যে চোখে আমবা অন্ধ সকলকে দেখি সেই চোখ দিয়ে কিন্তু আমবা নিজেদের দেখতে পাটিনে। সে দেখবার জ্ঞা মনের দরকাব হয়। আরশিতে অবগু নিজেব দেখা যায় কিন্তু সেই দেখা ঠিক প্রত্যক্ষ দেখা নয়—মনের সাহায্য নিয়ে দেখা। সেই ভাবেব পবোক্ষ দৃষ্টির একটা কথা আছে সমস্তাপূর্ণ গজেন নেপাথ্যে।

বিকবকোটাব কৃষ্ণদয়াল সরকার তাঁর শিক্ষিত পুত্র বিপিন-বিসহারী হাতে জমিদারিবা তার দিয়ে বৃদ্ধবয়সে যখন কাশীবাসী হলেন, তখন দেশেব বত অনাথ আতুব সকলে হায় হায় করতে লাগল কারণ গরীব দুঃখীর অমন বন্ধু সে সময়ে সেদিগরে আর কেউ ছিলেন না। জমিদারি হাতে নিয়ে এদিকে ছেলে দেখলেন যে বিস্তার জমি বিনা খাজনায় ছেড়ে দেওয়া আছে এবং কতলোকের যে খাজনা কমি করা হয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। নূতন

জমিদার স্থির করলেন যে অন্ধের জমিদারি তিনি লাখরাজে ছেড়ে রাখতে পাববেন না। প্রজাখা বুঝল যে শক্তলোকের পাটনায় পড়েতে তারা কিন্তু অমন ছাড়তে পারলে না তারাও—কাশী পর্যন্ত দরকাব করল। তাদের হয়ে কৃষ্ণদয়াল ছেলেকে চিঠি লিখলেন কিন্তু ছেলের জবাব পড়ে নিরস্ত হয়ে গেলেন। কথাটা তিনি বুঝলেন যে কাজের ভার যাব ওপরে থাকবে ওপর থেকে তার সেই কাজে বাধা দিতে গেলে কাজই পণ্ড হবে। আবও তিনি ভেবে দেখলেন যে সেই জমিদারিই যদি তিনি চালাতে লাগলেন তা হলে আর এই কাশীবাসের ঘটনা করার কি প্রয়োজন ছিল তাঁর ?

কৃষ্ণদয়াল সবে দাঁড়ালেন এবং মামলা-মোকদ্দমা কবে জমিদার তাঁর সম্পত্তির অনেকখানিই পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। গরীব প্রজা অনেকেই আহুগত্য স্বীকাব করল, করল না কেবল একজন—আছিমদি তাব নাম। লোকটা আবাব বিস্তার জমি বিনা খাজনায় ভোগদখল করে। তার কথাটা বিপিনবিসহারী ঠিক সমজাতে পারলেন না এবং ঠিক ভাল বোধ হল না ব্যাপারটা তাঁর কাছে। সে যা হোক আছিমের সঙ্গে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়ে গেল এবং শেষ হাতে চাইল না সহজে। ফৌজদারি থেকে দেওয়ানী, মহকুমা থেকে জেলা এবং সেগান থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে উঠল মোকদ্দমা এবং জেববার হয়ে পড়ল আছিম। কিন্তু তেজ তাব তবু কমল না, এমন কি একদিন বাজারের মধ্যে জমিদারকে সামনে পেয়ে সে তাঁর ওপরে চড়াও হয়ে উঠেছিল এবং অবস্থা এমনি হয়েছিল যে আশ-পাশ থেকে লোকজন সব ছুটে এসে না পড়লে হয়ত একটা বক্তাবক্তি হয়ে যেত সেদিন সেইখানে। তেমন কিছু হল না বটে কিন্তু ঐ ব্যাপার থেকে যে ফৌজদারির স্থিতি হল জমিদার মনে করলেন যে তারই জোরে দুঃখিনীত তাঁর প্রজাকে তিনি একবাবে ঠাণ্ডা করে দিতে পাববেন। মিটমাটের চেষ্টায় কিছু ভেট নিয়ে আছিমের মা একদিন জমিদার-বাড়ীতে গয়েছিল কিন্তু সেখানকাব আবহাওয়ায় মধ্যে আশার কোন আশ্বাস সে পায় নি।

মামলার দিন অভাবনীয় এক কাণ্ড ঘটে গেল। শুনানী হয় হয় এমন সময়ে একজন লোক বাইরে থেকে এসে আদালতঘবে সম্মানে উপবিষ্ট জমিদার বাবুব কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে জানিয়ে দিল যে বাবা তাঁব বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েচেন। কথাটা একবাবে অবিশ্বাস্য কিন্তু কথাটা যে বলল সে জমিদার বাবুব প্রতিবাদ মানল না—বাববার তাঁকে ঐ একই কথা বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ছেলেকে তাই উঠে গিয়ে দেখতে হল ব্যাপারটা কি এবং বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন যে শুধু শীর্ষদেহধারী তাঁর কাশীবাসী পিতা একখানি নামাবলি মাত্র গয়ে দিয়ে সত্যই একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে জমিদার বাবু তাঁকে প্রণাম করে তাঁব পায়ের ধূলা নিতে, বাপ আছিমদির বিবৃদ্ধের ফৌজদারি মিটিয়ে ফেলবার কথা ছেলেকে বললেন। শুনে ছেলে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে বাপকে তাঁর সেই অভাবিত নির্দেশের

কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে আছিম তার ভাই।

রীতিমত মজাদার এই কাহিনীটি কিন্তু সমস্যাপূর্ণেব গল্প নয় তার পটভূমিকা মাত্র। ব্যাপার এই যে জমিদার কৃষ্ণদয়াল অনেক রকমে অনেকের অনেক ভাল করেছিলেন এমন কি অঘাতিত ভাবেও অনেকের উপকার তিনি করতেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে একজন উকিল হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। দরিদ্রদের মেধাবী অথচ ভদ্রবংশোদ্ভব ছেলেকে, লেখাপড়া শিখিয়ে জমিদার তাকে ওকালতিতে বসিয়ে দেন। নিজের জীবনেও ঐ অতীত ইতিহাস-টুকুর জ্ঞান কিন্তু মনে উকিলের জটিল একটি কমপ্লেক্স জমে উঠছিল এবং ওকালতিতে যত তাঁর সুনাম হচ্ছিল মনেও তাঁর অস্বস্তিও তত বেড়ে উঠছিল দিনেদিনে। ভেতরে ভেতরে কৃষ্ণদয়ালের ওপরে মন তাঁর নারাজ হয়ে উঠছিল। পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী মনের তাঁব অস্বস্তিও জন্ম—খামকা তাঁর ওপরে অতটা সদয় হ'বাব কি প্রয়োজন তাঁর ছিল?

সেদিন কাছারিবা গাছতলায় কৃষ্ণদয়ালের আবির্ভাবে দেশে রীতিমত একটা চাকল্যের সন্ধান হয়েছিল এবং ইতবভদ্র সকলেই আলোচনা করছিলেন কথাটা। কৃষ্ণদয়াল তাঁর ছেলেকে যা বলেছিলেন কেউ তা শোনে নি কিন্তু অমন জবাব ফৌজদারিটা ফেসে যাওয়ায় মনে মনে অনেকেই কল্লনা-জল্লনা আবস্ত করে দিয়েছিলেন তার কাণে সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সত্য কথাটা চাপা থাকল না—প্রকাশ হয়ে পড়ল। বুড়ো জমিদারের যৌবন কালেও অনাচারের সেই পুরোণো কথাটা অনেকের কাছেই বিশেষ অস্বাভাবিক সৈকে নি ব'ব ভুলে যাওয়া সেই কথাটা নিজের শিক্ষিত ছেলেকে বলবাব কল্ল কাশী থেকে ভদ্রলোকের সেই আসাব অন্তরালেও তাঁব সংসাহসেব ভগ্ন অনেকেই বিশেষভাবে প্রজ্ঞাবোধ করেছিলেন তাঁদের জমিদারের ওপরে।

উকিলও মনে মনে খুঁসি হয়ে ছিলেন সব দেখে শুনে কিন্তু সে অল্প কাণে। মনের তাঁব সমস্যা মিটে গেল কাণে তিনি বুঝলেন যে তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে বড় বকমের একটা গলতি-গলদের কথা চাপা দেওয়ায় জন্মই ঐ দানধ্যানের ভড়ং করতে হয়েছিল বেচারিকে।

পাঁচ

মানুষের মনের আর একটা কমপ্লেক্সের হিসাব আমবা পাঠ 'সদব-অন্দব' গল্পের পরোক্ষে। বাজা টিওবজ্ঞানেব উন্মেষযোগ্য কোন বদখেয়াল ছিল না এমন কি নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তিনি শয়ন-ভোজন করতেন। এই মানুষের চর্য্য একবার থিয়েটার করার সখ চাপল এবং অভিনয় ব্যাপারে স্বরক্ষ অধিকন্তু স্তদর্শন স্রগায়ক বিপিনকিশোরকে পেয়ে ভদ্রলোক তাকে যেন একবারে লুকে নিলেন।

অভিনয়ের আয়োজন চলতে লাগল এবং বিপিনেব যত্নে চেষ্টায় আয়োজন দিনে দিনে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে লাগল। ফল তার এই হল যে আর ঠিক সময়ে রাজা

থেতে যেতে পারেন না এবং আখড়াই শেষ করে ফিরতেও মাঝে মাঝে তাঁর বেশ রাত হয়ে যায়। রাজার ঐ সব অনিয়ম অনাচার রাণী বসন্তকুমারী ঠিক প্রসন্ন মনে নিতে পারলেন না কিন্তু চেষ্টা করেও বাজাকে তিনি তাঁর আগেব নিয়মেব মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। স্বামীর নিঃশব্দ জীবনের একমাত্র কণ্ঠস্ব এই থিয়েটারি নেশার জগা রাণী বিপিনকিশোরকেই দাগী কবলেন কারণ বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে বিপিনের জন্মই আখড়াইটা জমে উঠেচে। ফল তাব হল পরোক্ষে এবং বিপিন দেখলেন যে রাজের তাঁব খাবার অনেক সময়েই আ-ঢাকা পড়ে থাকে এবং স্নানের পরে ছাড়া তাঁর কাপড়ও আ-কাটা থেকে যায় পবেব দিন পর্যন্ত। ছোট-খাটো আবে কিছু কিছু অস্ববিধা জমতে লাগল তাঁব এদিকে ওদিকে সেদিকে কিন্তু ফলে মুগ্ধল তাঁর যতই বাড়ুক সমস্তই ভদ্রলোক নীপবে সহ্য করে যেতে লাগলেন—কাকেও জানতে দিলেন না তার কোন কথা।

ইতিমধ্যে রাণী একদিন বাজাকে অনুবোধ করেছিলেন বিপিনকে বিদায় করে দেবাব জন্ম। রাণীর সে অনুবোধ রাজা বাখতে পারেন নি কিন্তু রাণীব কথা শুনে মনে মনে তিনি ব'ব একটু খাস্ত হয়েছিলেন এই মনে করে যে তাঁব স্ববিধাব কথাই বিশেষ-ভাবে রাণীব চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেচে এবং সে পক্ষে একটু আখটু অস্ববিধাব সম্ভাবনা দেখা দিতেই বিপিনের ওপরে রাণাব মন নাবাজ হয়ে উঠেচে। রাণীর মন বিপিনের ওপরে নাবাজ হয়ে উঠছিল সত্য, কিন্তু সে বাজাব কথা ভেবে নয়—নিজেব কথা ভেবে। সেই কথাটা পরে বাজা বুঝলেন এবং বোঝাব সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় করে দিলেন তিনি বিপিনকে।

তাঁব আগে যথাসময়ে রীতিমত আডম্বরের সঙ্গে থিয়েটার হয়ে গেল। আশ্চর্য্য অভিনয় কবলেন বিপিনকিশোর এবং তাঁব সে কৃতিত্বে অল্প সকলের কথা চাপা পড়ে গেল। রাজা নিজেও অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন এবং মন্দ হয় নি তিনি বা করেছিলেন কিন্তু তাঁব সে স্ব-অভিনয়ও লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না—বিপিনেব অভিনয় এত ভাল উতবে গেল। অল্প লোকের কথা থাক নিজে রাণী পর্যন্ত বাজাকে ডিড়িয়ে তাঁরই কাছে বিপিনেব কথায় পণমুখ হয়ে উঠলেন। ওনে রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন—ব্যাপারটা ঠিক মনঃপুত হল না তাঁর। অতঃপর আবে ছ'একটা ছোটখাটো বিষয়ে বিপিনের সম্পর্কে রাণীর পক্ষ-পাতের পরিচয় তিনি আবিষ্কার করলেন। মনের তাঁব অপ্রসাদ গোফুলে বাডতে লাগল। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল যে চাকরবাকবদের সব সময়ে তিনি যেন ঠিক তাঁর হাতের কাছে পাচ্ছেন না এবং সেই কথা বলে সে দিন একজন চাকরকে ধমক দিতে সে বলে ফেলল যে রাণীর নির্দেশ মত বিপিনবাবুব কাজ করতেন তাঁর অনেক সময় কেটে যায় এবং সেই জগ্গই অল্প অনেক কাজ করার সময় সে পায় না। বাজা চাকরকে কিছু বললেন না—রাণীকেও না; শুধু বিপিনকে বিদায় করে দিলেন।

মনের সঙ্গে এই সহজ লুকাচুবি খেলার অবস্থাটা অপূর্ণ কোশলে ফুটিয়ে তুলেচেন কবি তাঁর এই স্বচ্ছন্দ অন্দব গল্পে।

ছয়

ভালবাসার কথা নিয়েও গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং পড়তে ভালই লাগে সেসব গল্প। মনের সম্পর্ক ধরেই ভালবাসার গতিও পরিণতির কথা তিনি লিখেছেন। ধনজন গৌরবের সংস্কারমুক্ত সাধারণ নরনারীর মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশের পরিচয় আছে 'দালিয়া' গল্পে। গল্পটির পরিকল্পনায় এবং তার উপযোগী পরিবেশ রচনায় কবি তাঁর শিল্পী মনের স্তম্ভের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন।

গল্প এই যে দেশের তরুণ রাজা কুটিবাসিনী এক রমণীকে দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের সত্য পরিচয় গোপন করে দালিয়া নাম নিয়ে দরিতেষে ছদ্মবেশে তিনি সেই কুটিবাসিনীর সঙ্গে আলাপ করেন। আলাপ ক্রমে জমে উঠতে লাগল এবং বয়সের ধর্ম প্রেমের সঞ্চার হল দুজনের মনে। নিজের পরিচয় যিনি সেই ভাবে গোপন করেছিলেন সেই রাজাও কিন্তু জানতেন না যে ঐ কুটিবাসিনী তাঁর প্রণয়িনী, তাঁর দীর্ঘ প্রজার মেয়ে নয়—সাজাদার কন্যা। নিজেও তরুণী নিজের সে পরিচয় তখন জানতেন না। সে তিনি জানলেন যখন একদিন জুলিখা সেই কুটিরে এসে নিজেকে আমিনার দিদি বলে পরিচয় দিলেন। সেই দিদিই বললেন যে অনেক খোঁজাখুঁজি করে তবে তিনি আমিনার সন্ধান পেয়েছেন। জুলিখা আবার বললেন যে দেশের রাজার চক্রান্তে বাপকে তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে এবং সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে সে।

দীর্ঘের কুটিবে দালিয়ার আসা-যাওয়া জুলিখার ঠিক ভাল বোধ হয় নি কারণ তরুণ তরুণীর ঘনিষ্ঠতা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে তা ঠিকই জানত এবং মনে করতে বেচারি স্বস্তি বোধ করতে পারে নি যে, সাজাদার মেয়ে আমিনা একজন বনচারী বর্ষরের অমুরাগিনী হবে। দালিয়ার সম্পর্কে আমিনাকে সে তাই সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তখন আব তাব সময় ছিল না কারণ আমিনার মনে ইতিমধ্যেই ৩৬ ধরে গিয়েছিল। ছোট বোনের সঙ্গে কথায় কথায় জুলিখা তার মনের ভাব বুঝল এবং সে আরো বুঝল যে বাদশাহীর গৌরব আমিনার কাছে গল্প-কথা মাত্র এবং সেই অলীকের মোতে আমিনা তার অন্তরের আবেগ মিথ্যা করে দিতে পারবে না। সে-জন্ম জুলিখা অবশ্যই আমিনাকে দোষ দিতে পারল না কারণ নিজের দিয়েও সে বুঝছিল যে সেই সীমান্ত প্রদেশের বনভূমির মধ্যে সাজাদার উপযুক্ত মর্যাদা কেউ তাঁদের দেয় না বা সে মর্যাদা দাবি করবার কোন সম্ভব কারণও সেখানে তাঁদের নেই। বাধ্য হয়েই সেইখানে জীবন কাটাতে হচ্ছিল তাঁদের, কিন্তু আড়ম্বরবিহীন সেই তাদের জীবনেও আনন্দের সুযোগ ছিল। চারপাশের আকাশ জল আলোবাতাসের প্রীতি এবং মানুষের সম্পর্ক থেকে যে সহৃদয়তা তাঁরা পেয়ে আসছিল—সত্যকান পেই সমস্তকে মিথ্যা মনে করবার কোনই প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। ফুল তার গন্ধ থেকে তাদের বঞ্চিত করে না—দখিন বাতাস তাদের শরীরে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যায়। সকাল সন্ধ্যায় আকাশের বর্ণবিজ্ঞাস নিত্য-নূতন ভাবে মন তাদের রাঙিয়ে দেয়, নীল নির্মল আকাশে

চাঁদের হাসিও মধুর—ফেলনা নয় এদের কোনটাই। মনে ভাবতে যাই হোক আমিনা যে তার জীবনের অভিনব আশ্বাদ পাচ্ছিল এবং ভাল লাগছিল সে জীবন তার সে পরিচয় জুলিখা আমিনার চোখে মুখে কথায় কাজে প্রত্যক্ষ করতে পারছিল। দেখতে দেখতে জুলিখার যুবতী-মনের নেপথ্য থেকে ও কুলগর্ভ ও অভি-জাত্যাভিমান কিকে হয়ে আসছিল এবং শেষে এমনও হল যে পুশ্পিত কৈলুতরুব ছায়ায় আমিনা-দালিয়ার বিরহ-মিলনের বিচিত্র লীলা দেখতে তাবও ভাল লাগতে লাগল যদিও মন তার মাঝে মাঝে হাহাকার করে উঠত আমিনার দিকে চেয়ে তার কথা ভেবে।

তরুণ-তরুণীর প্রেম ধীরে ধীরে তার পরিণতির পথে চলছিল কিন্তু মন জুলিখার অধীর হয়ে উঠছিল দিনে দিনে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধে দৌঁড় হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রতিশোধের মস্ত্রে সে আমিনাকেও দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রথম প্রেমের পুলাকে মন তার তখন প্রীতিতে ভবপুর এবং কোন একজনকে প্রাণে মানবাব কথায়—মনে সে কোনই উৎসাহ বোধ করতে পারে নি। ব্যাপারটাকে আমিনা গুরুতর বলেই মনে করে নি এবং লীলাছলে দালিয়ার কাছেও কথাটা উল্লেখ সে করেছিল বড় করে নিজের পরিচয় দিয়ে দালিয়াকে হকচকিয়ে দেবার ছেলে-মানুষিতে। কথাটা দালিয়া প্রথমে ঠিক-সমঝাতে পারে নি, কিন্তু এত লোক থাকতে হঠাৎ দেশের রাজাকে হত্যা করবার কথাটা আমিনাব মাথায় এল কেন সে কথাটা বোঝবার চেষ্টা না করে সে থাকতে পারেনি।

দুই বোনের কাছে অতঃপর একদিন খবর এল যে দেশের রাজা দীর্ঘের কুটিরে তাদের দুই বোনের সন্ধান পেয়েছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখে তার অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। তারা আবার শুনল যে শীঘ্রই দুই বোনকে তাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই অভাবিতভাবে বৈব-নিয়্যাতনের সুযোগ এসে উপস্থিত হওয়ায় মন জুলিখার অতিমাত্র উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বিশেষ করে সে তাব ছোট বোন আমিনাকে জানিয়ে দিল যে বোনদের মধ্যে তাকেই বাবা তাদের সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতেন এবং সম্ভবত সেইজন্যই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ শেষ পর্যন্ত তারই পক্ষে স্তম্ভ হয়ে এল। রাজাকে হত্যা করার কথায় কিন্তু আমিনা বিশেষ উৎসাহ বোধ করতে পারছিল না কারণ সে বুঝেছিল যে সেই হত্যার চেষ্টা করার পরে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না তার পক্ষে এবং মরবার জন্ম মন তার প্রস্তুত ছিল না তখন।

অতঃপর একদিন রীতিমত সমারোহের মধ্যে রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল তারা দুইবোন। আমিনা আশা করেছিল যে, চিরদিনের জন্ম দীর্ঘের কুটির ছেড়ে যাবার আগে অন্ততঃ একবার দালিয়ার সঙ্গে তাব দেখা হবে; কিন্তু দালিয়া যে সেই সেদিন এসেছিল তারপরে আর একদিনের মধ্যে তার আর দেখা নেই। মন আমিনার তাই ভাল ছিল না। কিন্তু দালিয়ার সম্পর্কে নিরাশ হয়ে রাজাকে হত্যা করবার জন্ম সে তার মনস্থির করে ফেলল। রাজবাড়ীতে গিয়ে 'দুই বোন' তারা দেখল যে, প্রকাশ সভায়রের মাঝখানে মসলন্দ-আসনে

রাজা বসে আছেন। পথে আসতে আসতে রাজাকে হত্যা করার সম্পর্কে মনে আমিনা যেটুকু সাহস লক্ষ্য করেছিল সভাঘরের বিচিত্র আলোক-সজ্জা ও বিপুল লোকসমাগম দেখে মনেব তার সে সাহস নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় উবে গেল এবং সেই ঘরের দোর খঁবে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে—এক পা এগোবার সামর্থ্যটুকু পথস্থল যেন সে হারিয়ে ফেলেচে। জুলিখা তার সে অবস্থা না বুঝেই তার আসন্ন কর্তব্য সম্পর্কে শেষ বারের মত আমিনাকে উপদেশ দিয়ে একটু আগিয়ে গিয়ে সে দেখল যে, নিজের আসনে বসে বাজা সর্কোতুকে হাসছেন। রাজার সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'তেই জুলিখা তাঁকে চিন্তে পারুল এবং মনের তার আকস্মিক আনন্দে মুখ দিয়ে তার শুধু বেরিয়ে গেল—দালিয়া! সেই অসম্ভব জাগরায় অভিভূত ভাবে অতর্কিতে দগিভব নাম শুনে এবং তারই সামনে রাজাসনে উপবিষ্টকেই সেই দগিভব বৃদ্ধ পুলকাবগেব আকাঙ্ক্ষক আতিশয্যে নিমেষের মধ্যে আমিনা সেই দোবের পাশেই মুছিত হ'য়ে পড়ে গেল।

জন্তে ব্যস্তে নিজের আসন ছেড়ে উঠে বাজা তখন সেটখানেক আমিনার মাথা কোলে তুলে নিয়ে তাব শুষ্কায় অবহিত হলেন এবং একটু পরে আমিনা চোখ মেলে দালিয়ার সঙ্গে দিদিব সঙ্গে তাব চোখোচোখি হ'য়ে গেল। তিনজনেই তাঁরা তখন হাসছিলেন এবং নীরব সেই তাঁদের হাসির মধ্যে গল্পের শেষ হ'য়ে গেল।

এই সম্পর্কে এই গল্পে ছোট ভূমিকাটি উপলক্ষ এখানে কব। যেতে পারে। বাজা-বাদশার ছেলে মেয়ে মধ্যে বিবাহের সে প্রস্তাবে একদিন আরাকানের বনভূমিতে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল বাজা-বাদশাব সেই ছেলেমেয়ের অন্তরতব নিরুপাধি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে কবি তাঁর এই অনবদ্য প্রেমের কাহিনীটি গেথে তুললেন। প্রেমের সাধনায় যারা অনায়াসে নিজেদের আভিজাত্য-অভিমান ভুলতে চেয়েছিল—সেই প্রেমের পবিত্র অবস্থায়—জীবনের কর্মক্ষেত্রে—রাজা-রাণীর অভিনব ভূমিকায় অভিনয় কবাব সময় এল তাদের। সেইক্ষেণে আমিনা তার বৃকব পাশে লুকোন ছুঁখানি তাব খাপেব ভেতর থেকে একটু খুলতে ছুরিব ফলায় হাজার বাতির আলো পড়ে যে বিলিক খেলে গেল—হাসি ফুটে উঠল যেন সেই তার চমকানির মধ্য দিয়ে এবং অভিভূত সেই হাসিই হয় ত কঠিন কঠোর কথ-জীবনে তাদের সফলতাব ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

সাত

বাইরের ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁব ছোট গল্পেব মধ্যে প্রাধান্য পেতে দেন নি। ঘটনার গৌরব তিনি বেখেছেন মানুষের মনে তার প্রভাব ফেলে পরিচয় দিয়ে তার। নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা অনেক সময়েই তিনি করেন নি, কিন্তু তাদের মনের পরিচয় প্রায় সময়েই তিনি দিয়েছেন এবং সে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁব নিজের কথায় নয়—যাদের কথা বলছেন নিজেদের তাদের জবানীতে ও বাইরের ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণেব মধ্যে দিয়ে। তাঁব গল্প, অন্ততঃ শিলাইদহ যুগের গল্প, সম্ভবতঃ সেই জগুই পাঠকদের এত ভাল লাগে। মনের পরিচয় এই সবে গল্প যেমন মনোজ্ঞ

তেমনি সুন্দর। এই সৌন্দর্য সম্ভবতঃ সেই আবে-সত্যের ব্যাপার যার ব্যাপারী বলে তাঁব শেষেব দিকের রচনা গল্পস্বল্পেব কুসুমির কাছে কবি নিজেকে কবুল কবেচেন। আবে-সত্যেব সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে কুসুমিকে তিনি বলেছেন যে, যেদিন সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেদিন তার সম্পর্কেব সত্য—তার দেহ এই পৃথিবীতে প'ড়ে থাকবে এবং তাব সম্পর্কেব আবে-সত্য—যার হিসেবে কবি তাকে পরীক্ষানেব পরী বলেছেন, সেই আবে-সত্য যে-কোথায় যাবে বা কি তার হবে কেউ আমবা তা' দেখতে পাব না।

শিলাইদহে কবির বাসের সময়টাই ছিল ছোট-গল্প লেখার স্বর্ণযুগ এবং ঐ পাঁচ বৎসবে যত গল্প তিনি লিখেচেন পববর্তী তাঁর পয়তালিশ বৎসবেব জীবনেও তিনি তাব চেয়ে বেশী গল্প লেখেন নি—ঐ সময়ের পরে বছরের পাঁচ বছর কেটে গিয়েচে কিন্তু একটি গল্পও তিনি লেখেন নি। কিন্তু এ নিশ্চয় হতে পাবত না গল্প লেখাব জগু আগেকার দিনে যে প্রেবণা তিনি অন্তরে পেয়েচেন তাব আনন্দ যদি তিনি তাঁর পববর্তী জীবনেও অনুভব কবতে পারতেন।

শেষেব দিকে পপাশোষ্ট্র সবুজ পত্র বেবোবাব সময়ে আর একবাব তিনি গল্প লেখাব তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সে সময়ের গল্পেব সঙ্গে আগের দিনেব তাঁব গল্পেব বেশ একটু তফাৎ দেখা যায়। শিলাইদহ যুগের গল্প রস-গবীর্ষ—অবাস্তব কোন কথাই ঐ সব গল্পের মাধ্যমেব পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নি এবং সব বকমের পাঠকই ঐ সব গল্প পড়ে আনন্দ অনুভব কবতে পারেন। সবুজ পত্র যুগেব গল্পে কিছু দেখা যায় যে, বসের সঙ্গে কথ ও জমে উঠে গল্পের অন্তরালে এবং গল্পের বেনামীতে লেখক তাঁর মতামত প্রকাশ করেচেন ঐ সময়ের বচনায়। হিসাবে পাওয়া যায় যে, ঐ সব গল্প বচনার সময়েই কবি তাঁব 'বলাকা' 'গীতিমালা' প্রভৃতি রসসম্পদে সমৃদ্ধ ও সাহিত্য গৌরবে অপূর্ণ সব কবিতা গান রচনা কবেচেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সব বচনার সম-পণায়ভুক্ত কোন ছোট গল্প তিনি ঐ সময়ে লেখেন নি। বেশ মনে হয় যে, ছোট গল্প লেখায় তাঁব প্রেবণা ফুরিয়ে গিয়েছিল ততদিনে এবং সম্ভবতঃ বাইবেব তাগিদে লেখা ঐ সময়ের তাঁব গল্প সেই জগুই রসসম্পদে আগেকার দিনের তাঁব গল্পের সমপণায়ভুক্ত হ'তে পারে নি।

আবে কথা এই সম্পর্কে যা আমাদের মনে হয় সে এই যে, সাহিত্যে ছোট-গল্পই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান নয় যদিও অনেক ভাল ছোট গল্প তিনি লিখেছেন। সন্দেহ হয় যে, মানুষের মনে দোলা দেবার ব্যাপারে ছোট গল্পের সার্থকতাব সম্পর্কে হয়ত পরবর্তীকালে মনে কবিব সংশয় এসেছিল এবং সেই জগুই কি না জানি কিন্তু আমবা দেখি যে কোন কোন তাঁর গল্পকে তিনি নাট্যরূপ দিয়েচেন এবং অনেক গল্প তিনি রচনা করেচেন কবিতায়। কবিতায় গল্প রচনা তিনি আগেও কবেচেন এবং 'পুরাতন ভূত্য' বা 'দুই বিধা জমি'তে তাব পরিচয় আছে; ঐ সব ও পরবর্তীকালের ঐ ভাবেব রচনাব মধ্যে গল্প অবশ্যই আছে কিন্তু কবিতায় পরিবেশনের জগুই হয়ত ঐ সব কথা আমাদের অত ভাল লাগে।

‘কথা ও কাহিনী’র অনেক রচনাতেই গল্প-লেখকের চেয়ে কবির পরিচয়ই সমধিক ও সার্থক। মনে হয় যে, গল্প লিখে মনে একদিন আনন্দ পেয়েছেন বলে, গল্প লেখার ভাগিদ কোন দিনই তিনি একবারে অবহেলা করতে পারেন নি। কিন্তু শেষের দিকে কবিতার

গল্প রচনা করে তিনি নিজের কবি-পরিচয়ই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। একথাও এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রথম দিকের তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়েও তাঁর কবি-প্রকৃতি বারবার আপনাকে জানান দিয়েছে।

হিসাব

শ্রীপ্রিয়লাল দাশ

স্তম্ভ লগনে কগন সহসা এই পৃথিবীর আলো
প্রথম প্রভাতে দেখিছু যবে লেগেছিল বড় ভালো,
আবেশ মাখানো নয়নযুগল, শৈশবের সে ছবি
লুকাইল ভায় দিগঙ্কলের মেঘের মত সবই।
এল কৈশোর নিয়ে এল স্তম্ভ দুঃখ দ্বন্দ্ব সাথে
কণ্টকপথে চলিছু অভয়ে স্বপ্না করিয়ে মাথে।
এমনি যখন পুষ্প কুড়িয়ে চলেছি পথের মাঝে
বিশ্ব তখন ধবা দিল এসে অপূর্ব এক সাজে।
এই ধরণীর সব কিছুতেই লাগলো কিসের নেশা
দৃষ্টি আমাব রাঙিয়ে দিল কে, সবার সহিত মেশা

হোল মধুময় ; অবাস্তবের রঙের পরশ লেগে
লাগলো শিহর চিতে আমার উঠলো ফাগুন জেগে
বইল আমেজ নবীন জীবন, সবার মুখেই হাসি,
এমুখ পানে চেয়ে শুরু হোল কত ভালবাসাবাসি
কত এল গেল কেহবা রহিল অভিমানে বুক ভ’রে
কেহ হাসি দিল নিমেষেই কারো পড়িল নয়ন ঝ’রে
মিলন বিরহে জীবন জোয়ারে কতনা রচিছু গান
জানি না তাহাবা পৃথিবীর কাছে পাবে কি কখনো দাম!
এমনি করিয়া জীবন চলিল সহসা হঠাৎ দেখি
কঠিন কণ্ঠে আমারে ঘিরেছে বিষয়ে হেরি এ কি।

বড়িন স্বপন মিলে গেল ধীরে দিগঙ্কলের শেষে
কর্মক্লান্ত শীর্ণ শ্রান্ত সর্বস্বহারার বেশে
দাঁড়িয়েছি কূলে আমাব ভুবনে আসিবে আবার ঘিবে
সন্ধ্যার ছায়া থেমে যাবে বাঁশি চেয়ে রব নদীতীরে
কেহ অবশেষে ভিডাবে তবণী তুলে নেবে হাতে ধরি’
ফুবাবে তথুনি জটিল হিসাব ওপাবে ভাসালে তরী।

হেমন্তলক্ষ্মী

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ

পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রে ‘সন্তর্পণ চরণসঞ্চারে
মেলিয়া আয়ত আঁগি বহুদর’ দিগন্তেব পারে
কুয়াসা গুণ্ঠন তুলি’ সঙ্কুচিতা বধূটির মত
নীববে দাঁড়ালে তুমি ; ওই ঢটি ঘন কুমায়ত
উজল নয়নে আব নাহি দীপ্ত চকিত বিলাস।
শারদ প্রাতেব সেই শুভ্রাকাশ স্নিগ্ধ স্মিত হাস
কোথায় মিলায়ে গেছে। ঝলকিছে ঢটি আঁখিপাতে
নীহার অশ্রুর বিন্দু ; শত কোটি বুভুকুর সাথে

সমদুঃখভোগী মাতা ! দয়াময়ী অন্নদাত্রী রূপে
হে কল্যাণি, দাঁড়াইলে সন্তর্পণে আজি চুপে চুপে।
দিগন্ত মুখরি’তোলা উচ্ছ্বসিত রাখালিয়া সুরে
তোমার বন্দনা বাজে ! পূজা তব হৃদি-অন্তঃপুরে।
হৈমন্তিকা, হৈমন্তের দয়াময়ী অপকুপা বধু !
নয়নে অভয় বহি বক্ষে বহি নন্দনের মধু
হালোক তাজিয়া এলে তুলোকের মাটির কুটিরে !
অসহায় আর্ন্ত যেথা অন্নহীন কেঁদে কেঁদে ফিরে !

হৃৎখীর জননী অয়ি, বুভুকুর অন্নপূর্ণা মাতা
কাব্যে তব মূর্তি রচি’ গাতি দেবি তব জয়গাথা।

বন্দনা করে

বন্দনা করে, বন্দনা করে লাক্তিতা জননী
লোনা হ'য়ে গেল বন্ধের স্রুধা মিশিয়া নয়ননীরে ।
স্বপ্ন তাঁহার হয়েছে ধূসর, মরু হয়ে গেছে শ্রাম প্রাস্তর,
পল্লীর ছায়ে প্রেতের নৃত্য তটিনীর তীরে তীরে ।

কে দেবে অন্ন কে হ'বে ধন কে দেবে অর্থ্য পায়ে
কে দূরবে এই আত্মকলহ হুনীতি অত্যায়ে ?
বিগত দিনের গৌরবকথা হৃদয়ে জাগায় হুঃসহ ব্যথা,
আঁধার নেমেছে ছুটি পাখা মেলি তাজমহলেরও শিবে ।

মন ও বন

বনের কাঁটা তুলতে পারি,—
মনের কাঁটা যায় না তোলা,
মরমে যা' রইল গাঁথা
সহজে তা' যায় কি ভোলা ?
থাক্‌লো যাহা স্রুপ্ত হ'য়ে
যায়নি তা'হা লুপ্ত হ'য়ে ।
প্রাণেব দ্বাবে শিকল দিলে
কেমনে তা' যায় গো খোলা !
বনের আগুন সবাই দেখে
মনের আগুন যায় কি দেখা ?
পেলাম যাহা—তিয়ার খাতার
পাতায় পাতায় বইলো লেখা !

নবান্ন

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

এবার হবে নবান্ন বাঙ্গালীর ঘবে
নয়-নাবায়ণ নাই ভরিবে কে খালা ?
ফুলগুলি ফুটে রয় কে রচিবে মালা
মানুষ কোথায় আছে দেবতাব বরে ?
তিথি ঘুরে পদে পদে অতিথি পলায়
শিবহীন যজ্ঞ মাঝে শৃগালের তাড়া
দেবতা মানুষ তাই হ'য়ে পথহারা
অন্ধের মতন চলে বেলা অবেলায় ।
লালসা মিটাতে চায় অর্থহীন কুধা
অহঙ্কার নৃত্য করে অপমান সাথে
অন্নপূর্ণা আছে ঘরে অন্ন শুধু নাই— ;
দানব নবান্ন নিয়ে লুটে কত স্রুধা
ভক্তিহীন ফুল পড়ে ফলহীন মাথে
পূর্ণ আয়োজনে হায় নাহি হবে ঠাই !

শ্রীমুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

পুত্র যাঁহার ধ্যানী বৃদ্ধ স্রুদ্ব মালয় পারে,
অহিংসা নীতি সামোর গীতি প্রচারিল দ্বারে দ্বারে ।
ভুলি অতীতের মধুময় স্মৃতি উদার মগ্ন শাস্তি ও শ্রীতি,
পীত-রাক্ষসী ধনলালসায় বন্ধ বিধিল গীবে ।
জৈন ও শিখ, বৌদ্ধ ইহুদী, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ,
জননীর পায়ে সঁপিও তোমার সকল শ্রেষ্ঠ ধন ।
এস মুসলিম এস খৃষ্টান, ভুলি ভেদাভেদ মুছি অভিমান,
জাতি ও ধর্ম এক হ'য়ে যাক্ মিলন মন্দিরে ।

শ্রীআশুতোষ সাহালা এম্-এ

লুকিয়ে রেখে প্রাণের ক্ষত
বেড়াই মেতে সবার মত ।
সংসারেব এই করুণালায়
কতই যে ভাল হল শেখা ।
বনের আঁধার—ক্ষণিক সে যে,
মনের আঁধার যায় কি ছুটে ?
বিগাদ ঢাকা হৃদয়-গুহায়
ববিব আলো আর কি ফুটে ?
ঘনায় প্রাণে তিমির-বাতি,
নাইকো আহা, প্রাণের সাথী !
মনেব মানুষ হারিয়ে গেলে
আর কি ধরায় সঙ্গী জুটে ।

চাঁদ চায়

শ্রীপারীমোহন সেনগুপ্ত

(গান)

চাঁদ চায় আমাব পানে,
আমি চাই চাঁদের পানে ।
উভয়ে কি কথা হয় সদয় জানে ।
সে কথায় চাঁদ মুচকে হাসে,
আমাব তিয়া স্রুখে ভাসে,
আমি ও চাঁদ এমনি বাধা প্রাণে প্রাণে ।

চাঁদ তো এমনি হাসে যুগে যুগে,
কত বুক ভবিয়েছে সে অপাব স্রুখে ।
তবু সে আমাবে চায়,
আমাকে কি গুণ সে পায় ?
হিয়া তার উদার তায় অবাক্ মানে ।

‘হিঁচুয়া যে কয় ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’—মিথ্যা কথা নয়! এই ধূপের মধ্যে কি বেরুনো যায়? ঋণ খুললে যেন আশ্রয় আসতে।—রহমতুল্লা আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছে...তার মাথাটা বোধ হয় কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছে। চালের বাতা হইতে সোলা চকমক নিয়া সে তামাক সাজিতে বসিল। ওদিকে মোল্লাপাড়ায় খুব সোরগোল শোনা যাইতেছে। কলিমুদ্দিন হাজি বেলা দশটায় মারা গিয়াছে...এখনো কবর দেওয়া হয় নাই। রহমতুল্লা খানিকটা ভয়ে, খানিকটা ঘুণায় বাহির হইতে চাহিতেছিল না। ভয়ে মানে ধরচের ভয়ে...কফন থেকে কতহা—সব সে কেন ঘাড়ে চাপাইয়া নিবে? একবার বাহির হইলে আর রক্ষা নাই। লোকে তো জানে কলিমুদ্দিন না থাকিলে সে আজ পকাইত হইতে পারিত না...সে ধনী মানী কিছুই নয় শুধু চাষী।—কলিমুদ্দিন দিনকে রাত করিতে পারিত...রাতকে দিন! তার ভয়েই তো লোকে তাকে ভোট দিলে।...না দিলে তাদের ভিটে মাটি কি আর থাকিত?...ভায়ে ভায়ে, চাচা ভাঙতের মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া সব বরবাদ করিয়া দিত।...দারোগা পুলিশ সব তার হাতে!...খাইবার কেউ ছিল না—কিন্তু লোভ ছিল আকণ্ঠ।...তার সঙ্গে ফুরান ছিল কুড়ি টাকা তা তো নিয়াছেই...তা ছাড়া খানায় যাতায়াত বলিয়া আরো আট টাকা...একখানা নতুন লুঙ্গি—শেষে সদরের বড় দারোগার নাম করিয়া তার পোষা খাসীটাকে পর্যন্ত খুলিয়া নিয়া গিয়াছে। উঃ! কলিমুদ্দিন না মরিলে দু’দিন পরে তার অবস্থা কি না হইত? কিন্তু—!

রহমতুল্লা যেন কাঁপিয়া উঠিল। গ্রামের কেইকি এ কথা জানে না? জানিলে বোধ হয় এতদূর খুব যেটুকু বাধিত। তাইতো আগেই যাওয়া উচিত ছিল কফনের কি-ই বা খরচ? সে বাড়ি হইতেই শুনিতে ছ তাহা নাকি কামারবুড়ে আনিয়া দিয়াছে।

ও কি ও?...কলিমুদ্দিন কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে। তার বলিতেছে—আমার কফন কেনার টাকা জুটছে না—তা এনে দিলে রামত্রক কামার। আর আমার টাকা ভরা হাতবাগ্গটা তুই গায়েব কোরে ফেলবি?

রহমতুল্লা সেখানেই পড়িয়া গোড়াইতেছে।—তখন বৃদ্ধ রামত্রক কর্ণকার তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। বদনাটা নিয়া সে তাড়াতড়ি তার চোখে জলের ছাট দিতে লাগিল। রহমতুল্লা তাকাইল। কিন্তু তার আতঙ্ক যায় নাই। কলিমুদ্দিন এইমাত্র রামত্রক কর্ণকারের নাম করিয়া গিয়াছে—সেই রামত্রক সম্মুখে!

কিন্তু রামত্রক বলিল—পকাইত সাহেব চলেন—ওরা সব আমার পাঠালে আপনার কাছে—আপনাকে যে আগে মাটি দিতে হবে।—তিনি তো আপনার খালু হোতেন।

রহমতুল্লা সামলাইয়া নিবার চেষ্টা করিতেছে।

কলিমুদ্দিন এই কয় বছর পূর্বে আসিয়া এখানে ছোট একটা টুটি তোলে। বহুপুত্র্য আগে তাদের এখানে বাস ছিল। আসিয়া বলে সে হজ করিয়া আসিয়াছে। সে যেন চোখে মুখে কথা কহিতে মামলা মোকদ্দমা

বাধাইতে অস্বীকার ছিল। বৎসরপাঁচেক আগে রহমতুল্লায় এক ফুফুকে নিকা করে। এক বছর হইল ফুফু মরিয়া গিয়াছে। কোনো ছেলেপুলে নাই।

সম্পর্কটা এইখানে। তাই কলিমুদ্দিন এবার অহঙ্ক হইতেই রহমতুল্লাকে গোপনে ডাকিয়া হাতবাগ্গটা রাখিতে দেয়—বলে সারিয়া উঠিয়া লইব। রহমতুল্লা সামলাইয়া নিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। বলিল—কর্ণকার মশাই আপনি ভালই করলেন, শোক পেয়ে আমার মাথাটা কিছু খারাপ হয়ে গিয়েছিল, চলুন বাই, মাটি দেওয়ার তো বন্দোবস্ত করতে হবে।

বাইতে বাইতে সে রামত্রককে বলিল—হাজি সাহেব ভারি ঝগড়াটে লোক ছিল, তাকে মাটি দিতে সবাই আসবে না বোধ হয়।

কিন্তু সে আসিয়া দেখিল সে ছাড়া গ্রামের কোন মুসলমানের আসিতে বাকি নাই। মায় তার পকারতি যুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী পাশের গ্রামের মুখারো আসিয়াছে। কিন্তু কফন কিনিয়া আনিবার কেহই আগ্রহ দেখায় নাই এতই স্বজাতির অপ্রিয় ছিল লোকটি। বৃদ্ধ রামত্রক কর্ণকারের প্রাণটা কাঁদিয়া ওঠে, সে উহা কিনিয়া আনে।

...

সকালে রামত্রক কামারশালায় আস্তে আস্তে ভিড় জমিতেছে। মুসলমান চাবীরা কেহ লাঙ্গলের ফাল, কেহ কান্তে, কেহ কাটারি নিয়া ঘোমত করিতে আসিয়া দল ভারি করিতেছে। গাড়ীর চাকায় হাল বগাইবার জন্ত দূর থেকে যারা আসিয়াছে তাহারাও জমিয়া গিয়াছে। আজ কামারশালায় হাণ্ডের আশ্রয় পড়ে নাই। কর্ণকারের আজ বিকর্ণী পূজা। পবনন্দারূপ মুখরোচক আলোচনা চলিয়াছে, আর কামারশালায় হরক্ষিতে যে দাকটা তামাক ছিল তাহা বিশেষ করিয়া কলিকার পর কলিকা চলিয়াছে। চোড়ার দল বলিল—খালুর কবরে মাটি দেবার সময় এগিয়ে গেল রহমতুল্লা, কিন্তু কতহা করিল না? এবার তাকে শুধু একঘরে করা নয়, পকাইতও খতম করিতে হবে। তাতে লাগবে কিছু খরচ, আমরা চাইলে বুড়ে তা না-দিয়ে পারবে না। ছেলের মতন আমাদের ভালবাসে। বৃদ্ধের দল বলিল—বিদ্বেষাভি মুখ-দুঃখে কামার বুড়ে চিরদিন আমাদের দিগে আসছে কিন্তু আমাদের দলদলিতে তাকে টেনে আনলে খোদার কাছে কহর করা হবে, সে একজন খোদার বান্দা।

এমন সময় দেখা গেল রামত্রক ও তার ছেলে দুইটা বুরি মাথায় নিয়া তাদের দিকে আসিতেছে, আর মুখে বলিতেছে সবুর করো ভাই সব সবুর করুন আপনারা। নিকটে আসিয়া বলিল—আমার পূজার পর এ-দিকে আসছি দেখি কফনবাধা হাজি সাহেব ঐ নিম্ন গাছটার ঠেস দিয়া বসিয়া আতে, আমায় দেখে বললে—আজ আমার একচল্লিশ কর্ণকার! আমার বুকটায় ভারি বাজল। তাই নিয়ে এলাম এই মুড়কি আর বাতাস। আপনারা চলুন ভাই সব তার কবরখানায়, এ-সব দিয়ে কতহা করে।

রিভলবর

হৃদয় যে কোন সহরের নোংরা অন্ধকারায় আবর্জনাপঙ্কিল স্রু গলির ওপর বিরাটকার প্রাচীন বাড়িগুলির একটি। নব্য কৃষ্টির স্পর্শ এখানে নেই, কিন্তু অপকৃষ্টির বিস্তার রূপে এইসব গলি ঘুঁজির বাড়িগুলিতে ক্ষতের সঞ্চার হয়েছে। সভ্যতার আলো পড়ে না এখানে, কেমনদার নির্জীবতা সব সময় জমাট হয়ে থাকে। এই ধরণের যে কোন বাড়ীর অন্দরে গিয়ে খোঁজ করলেই দেখা যাবে অত্যন্ত সর্পণ-জুয়ার আড্ডা চলতে। মুখোশ-আঁটা বহু সাহসিক ভয়ালোকট নিজেদের ভাগ্য কিরিয়ে নিতে এখানে এসে জমায়েত হয়েছেন।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

এই ধরণের একখানা বাড়ীর পিছনদিককার চত্বরে একটি যুবককে দেখা গেল। মধ্যবয়স, গৌর, সমাহুপাতিক হৃদয় চেহারা। কাণো ছাট পরা। চোখ মুখ রূপ নিরাশার স্তিমিত এবং নিশ্চিন্ত। হঠাৎ চোট খেয়ে বেশ খানিকটা মুবড়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের আলো এসে পিছনদিককার বাগানের পাথরে বাধানো পৈঠায় ঝকঝক করছে। যুবকটি তার গকেট থেকে অকস্মাৎ একটি রিভলবর বের করল। নির্জন হাব, তার ভূপর নগ্ন চাঁদের আলোর বিগত শতাব্দীর রোমান্টিক নায়কের মত মনে হ’ল

যুবককে; বার্থ প্রেমের বিরহে কিংবা অল্প কোন কারণে হয়তো যুবকটি আত্মহত্যা করবে। অনাবৃত রিত্তলবরের ফলাটা পরিষ্কার নিকেলের তৈরী ছিল—এখন সেটি মেঘের পটভূমিকার বৈজ্ঞানিক বীজের মত চকমক করতে লাগলো।

সেই মুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গী নিয়ে একটি মেয়ে অন্দরের মধ্যে থেকে সেই চতুরে বেরিয়ে এল, এবং উদ্ভিতস্রুততায় যুবকটির হাত চেপে ধরলো। ভয়-চকিত মেয়েটিকে দেখে, মনে হ'ল, সে বেশ ঘাবড়ে গেছে। মেয়েটি পুষ্ট-যৌবন; তবুও তম্বু লালিত্যে বেশ খানিকটা ভাঁটা দেখা যায়, জীবনের শ্রোতোবেগ বেন লম্ব ও শিথিল—সাধারণ দৃষ্টিতেই তা ধরা যায়। মনে হয়, মনের দিক থেকেও মেয়েটি চঞ্চল, বিধুর এবং বেদনাগ্রবণ।

মেয়েটি। আমি অনুরোধ করছি—আপনি ও ভাবে—এ কাজ করবেন না, আমি অনুরোধ করছি।

যুবক। (নিরস্তুর)।

মেয়েটি। কি চুপ করে রইলেন যে—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন কি? আপনি ক্ষান্ত হোন। আপনি এ কাজ করতে পারবেন না। না—করবেন না এ কাজ।

যুবক। বেগ ইওর পার্ডন। আপনার কথা টিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি ভেবেছেন, আমি কোন লোককে খুন করতে যাচ্ছি এই রিত্তলবর দিয়ে? হঠাৎ উজ্জ্বলিত হয়ে অনুরোধ করছেন, আবেগময়ী হয়ে আদেশ করছেন—কি ভেবেছেন বলুন ত? কোন লোককে খুন করছি আমি নাকি?

মেয়েটি। কোন লোককে মানে? আপনি কি নিজে—

যুবক। থামলেন কেন, বলুন—আমি কি? আমি কি নিজেই নিজেকে খুন করতে যাচ্ছিলাম—সাদা কথায় যাকে আত্মহত্যা বলে? ওঃ, এবার বুঝলাম আপনি আমার হাত চেপে ধরেছিলেন কেন?

মেয়েটি। আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন না?

যুবক। আকস্মিক অপঘটন কিছু না ঘটলে নিশ্চয়ই নয় বলতে পারি কেন না, বর্তমানে আমার সেরকম কোন প্রবৃত্তি আদৌ নেই। অন্ততঃ মনের দিক থেকে ত' আমি তাই জানি। আপনার যদি এ রকম কিছু মনে হয়ে থাকে—তা' হ'লে স্বস্তির কথা, আমার অল্প আত্মহত্যার কামনা নেই এখন।

মেয়েটি। ও—

যুবক। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের কোন কারণ নেই। আপনাকে অজ্ঞপ্র ধখা-বাদ জ্ঞাপন করছি—আর আপনার ঐ নরম আঙ্গুলগুলোর যথেষ্ট তাৎপর্য করতে বাধ্য হচ্ছি—আমার কজিটা এখনো টন টন করছে।

মেয়েটি। পকেট থেকে হঠাৎ আপনি রিত্তলবরটি 'এমনভাবে বের করলেন কেন, জানতে পারি কি?

যুবক। বিশেষ প্রয়োজন আছে তার?

মেয়েটি। আমি ভালোমত আপনি বুঝি আত্মহত্যা ক'রে বসবেন, তাই ভয় পেয়ে বাধা দিতে এলাম। আপনি যখন বলছেন—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি নেই, তখন আর অল্প কথা কি? অথচ—

যুবক। অথচ কেন আমি পকেট থেকে এমন অকস্মাৎ রিত্তলবরটি বের করলাম—এইত? আমি দেখতে চেয়েছিলাম পকেটে রিত্তলবরটি আছে না একেও খুঁয়েছি এখানে।

মেয়েটি। তা—ওই অমন সহসা?

যুবক। হ্যাঁ। কেননা অমন সহসাই ওর স্থিতি সম্পর্কে আমার মনে চেতনা জাগলো।

মেয়েটি। এটা আপনার কোন রকম বুজিই হ'ল না। অকারণে কারুর প্রাতি প্রয়োগ করার মানস না করে পকেট থেকে অল্পটি সহসা বের

করা কোন লোকের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভব বলে মনে হয় না—অন্ততঃ অল্প অবস্থায়।

যুবক। উক্তির জোয়ারে আপনার যুক্তির জোয়ারটা ভেসে যাচ্ছে। কেন সম্ভব নয় বলুন? আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি: যখন টেশনারী বাজারে গেছেন হুসাধনের জিনবপত্র কিনতে, হঠাৎ মনে হ'ল—পাসটা কোথায়? সঙ্গে আছে ত? তখন যন্ত্র-চালকের মত আকস্মিক অভিব্যক্তি হাতটা ভ্যানিটি ব্যাগে কিংবা পাশ পকেটে চালান কিনা?

মেয়েটি। আপনি বলতে চান অকস্মাৎ রিত্তলবরটির কথা মনে পড়ায় আপনি সেটা চাঁদের আলোয় বের করে তাকাচ্ছিলেন ওর দিকে?

যুবক। কিন্তু আমি এর ব্যবহার করবোনা—এমন কথা বলিনি ত। এমন একটা হুম্মর অল্প, বিশ শতাব্দীতে সভ্য মানুষের এমন পরম হুম্মর—একে কখনো অবজ্ঞা করা যায়? আমি ত' খুব শীঘ্রই এর উত্তম ব্যবহার করবো। মাল্লি আই ইয়ুস ইট হুন।

মেয়েটি। এই ত' বললেন কোন লোককে বা নিজেকে হুট করে চান না—উঁবে এর উত্তম ব্যবহার করবেন কি করে? রিত্তলবর দিয়ে কোন পাখী মারবার দৃষ্টতা বোধ হয় আপনার হবে না—আশা করি।

যুবক। না, এ মুহূর্তে এর ব্যবহার সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন উঠতে পারে না কেননা—এটা খালি, এতে একটুও কার্তুজ নেই। আমি আশা করছি কাল এর ব্যবহার করবো চরম ব্যবহার।

মেয়েটি। (নিরস্তুর)

যুবক। এই রিত্তলবরটি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে গড়া। এর ওপরকার শিল্পীহস্ত কাস্তাক্ষীর কথা বাদ দিয়েও এর গঠন প্রশালীর সৌকর্য্য আপনি একবার দেখুন—অপূর্ব্ব হুম্মর! এটা হারাতে তাঁ মন যায় না। দেখুন, নিজে হাতে ধরেই দেখুন না। বিশ্বাস করুন টোটা নেই।

মেয়েটি। (হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে) দেখলাম—সত্যিই হুম্মর। বিশেষ বরে রিত্তলবরের মাঝখানে নিকেলের ওপর দামী পাখরটা বসানো—শিল্পীজ্ঞানোচিত কিনা বলতে পারি না—বিল্যসের আভিজাত্য বড়ায় হয়েছে নিঃসন্দেহ! পনেরো মিনিট আগে যদি জানতে পারতাম অদৃষ্টিতে গুলিভরা নেই, তাহলে এই নাটকটা ঘটতো না!

যুবক। নাকি? বেশ কথা বলেন আপনি! কিন্তু এ নাটক ত' আমার বেশ লাগলো।

মেয়েটি। আমরা যারা প্রতিনিয়ত নাটকের মধ্যে বাস করছি—নাটকীয় রূপে রসে ডুবে বসে রহি—আমাদের কাছে নাটকের এসব দৃষ্টাবলী বড় পুরাণো আর বড় হেতু হয়ে গেছে।

যুবক। অর্থাৎ—

মেয়েটি। এই শতাব্দীর সভ্যতার একটা দিককে আমরা রূপায়িত করছি, দিন রাত করতে বাধ্য হচ্ছি বলাই বরং শ্রেয়ঃ।

যুবক। এত জুয়ার অভ্যাস ত' আপনারা কমিশন বেসিনে কাজ করেন এবং সে কাজে খেঁচায় নিয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা।

মেয়েটি। বাইরে ঘটনাটি সেই রবম রঙেই ত্রুটিবলিত হয়েছে। আমাদের দোকানোর স্বেচ্ছা বা ছোটখাটো রবমের কোন উপকার করে দিয়ে এখানকার কর্মবস্তার আমাদের টেনে এনেছেন তাদের মধ্যে, আমরা আর যাতে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারি, তাদের বিপক্ষে চলতে না পারি—তা তারা করেছে। আমাদের গোপম বিচুর সন্ধান এলে এরা আমাদের ওপর শোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। একদমলংটেশনের অলম্ব উদাহরণ যদি চান—হাঃলে এই। এর চেয়ে মধ্যস্থিত এবং ভাবস্ব দৃষ্টান্ত আর হতে পারে না। অথচ এখানে যে কটি মেয়েকে ধরে রাখা হয়েছে—সকলেই আই, এ, বি-এ, পাশ করা। স্বাধীনতার ডিজিতে তাদের চলবার সৌভাগ্য এখানে দেওয়া হল অথচ বাইরে বিজ্ঞাপন কায়দায় চলছে—আমরা

চাকরী করছি এখানে নিজস্ব মজিঁতে। জুয়ার আড্ডা চালু রাখতে গেলে মেয়েদের রাখতেই হবে। অভিনয়ের ছলে প্রচ্ছন্ন ক্যানভাসের জোরেই লোক আসবে এখানে; যেমন আপনাতা এসে থাকেন। লোকটানার যন্ত্রের মত করে বিশ শতাব্দীতে আমাদের মূল্য মিলছে—এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে! খেতে পরতে দেয় কোনরকমে, কিন্তু স্বাধীনভাবে সরে পড়তে দেয় না; নিয়মের নানা শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। আর নিজেরা চালু রেখেছে জুগকে। গভর্ণমেন্টের চোখকে ফাঁকী দিচ্ছে, পাণ্ডানদারের বাকী ফেলছে, এবং কর্তৃকর্তার লাগ হয়ে যাচ্ছে। আমরাও এদের কবলে পড়ে তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছি, স্বাধীন আত্মশ্রুতিও ছিল, কিন্তু জীবনে দ্বিভ্রের সন্ধান নিয়ে এরা চৈতন্তের চাবুক হাতে করে আমাদের কাবু করে ফেলেছে। শিক্ষিকার ভাবে আমরা তা' সহ্য বরখি—কোন প্রতিবাদ নেই, প্রতীকারের কোন আশাও নেই!

যুবক। ভাবনার নতুন একটা দিক ত' আপনি খুলে দিলেন। এ নিয়ে এক পশলা হৈ-চৈ করা উচিত। আমরা জানি আপনাতা কথা বলে আমাদের আটকে রেখে কতুর করার কাজে সহায়তা করেন; মোটা রকমের রেসিটো ধরা আছে, তাই পান।

মেয়েটি। শুধু তাই নয়। আমাদের লাজনার এখানেই শেষ নয়। আমাদের সাংগো জুগাড়ীর আড্ডা জমে টিকই, লোককে টেনে আনবার ভার আমাদের, তাদের টাকা পরমা শোষণ করার কাজে আমাদের সহায়তাও করতে হয়, নিঃস্ব না হওয়া পর্যন্ত নানা ছলাকলার তাদের রিক্ত করতে হয়; কিন্তু রোসিয়ার কথা যা বললেন সেটা ভুল। এখানে যারা বাঁধা মাইনেতে চাকরী করে তাদের অর্ধও শোষণ করতে হয়। নব্বই টাকা মাইনের পাকা জোচ্চর নিধুরাম রোজ দু'পাচজন লোককে হারিয়ে যে হাজার টাকা কামিয়ে দিয়ে যায় বড়বাবুকে, সেই নিধুরামের নব্বই টাকাও হাত করতে হয় নানা রকম অত্যাচার করে। সে টাকা বড়বাবুই পায়। সবটাই চুরি এখানে। এখানে এসে শাসন নিয়ে ফেরবার সাধ্য কারো নেই। স্রেফ ধূসর মরুভূমি হয়ে যেতে হবে। বুঝলেন।

যুবক। আমি সেই নীতিকে ভেঙে দেবার জন্তেই উঠে এলাম আড্ডা থেকে। ট্যাক গাড়ের মাঠ হয়েছে বটে, কিন্তু এখানে উষর বা ধূসর—যাই বলুন হতে পারিনি। এই পাথর খচিত রিস্তলবরটি নিয়েই উঠে এলাম এখানে মনস্ত্রির কবর জন্তে কি করা যায়! রিস্তলবর বাঁধা দিয়ে খেলব না, না ছুটে পালাবো এখান থেকে—তাই।

মেয়েটি। তাই আমাকেও ছুটতে হল এখানে। রিস্তলবর না থাকলে আমি এসে নাটকীয় ভাবে আপনার হাতখানা চেপে ধরতে যাবো কেন?

যুবক। বার বার ওই কথা বলছেন কেন বলুন ত? আপনার কোমল হাতের কঠোর স্পর্শ আমার বেশ লাগলো। কেমন উত্তেজনা প্রবণ, কেমন মোহন্যর।

মেয়েটি। আমার নিজের কথাই বললে গেলাম এতক্ষণ। এবার

যাবো। যাবার আগে আপনার রিস্তলবরটি হঠাৎ বের করার সঠিক কারণ শুনে যেতে চাই।

যুবক। উত্তর আমি সঠিক দিচ্ছি। হঠাৎ ওর স্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন মনে এল—তাই।

মেয়েটি। এই যে বললেন—এর চরম ব্যবহার করবেন কাল না পরশু। সে কথাই শুনতে চাই।

যুবক। আমার পকেট শূণ্য—এই মাত্র শুনলেন। তাই ভাবছি রিস্তলবরটি বিক্রী করে দেব। এবং সেই পরমা নিয়ে কোনো ব্যবসায় ঝেঁপে বসবো—চোটখাটো রকমের। ধূপের ব্যবসায় কিংবা গামছা কিনে বিক্রী করবো পথে পথে। তবু এপথে আর নয়। আজ যখন হেরে গেলাম সব, মনটা খুব ধারাপ হয়ে গেল—সব খারাপলাম এখানে এসে। চতুরে এসে হঠাৎ রিস্তলবরের কথা মনে হল, চট করে পকেট থেকে বের করলাম। চোখের সামনে তুলে ধরলাম। সব সময় কার্জ্জবিহীন বরে এটিকে সঙ্গে রাখি আমি। বড় শ্রম জিনিষ আমার। তুলে ধরে ভাবতে লাগলাম—কত টাকার পাথরজন্তু এই রিস্তলবরটি বিক্রয় করা যেতে পারে। সেই চিন্তার মধ্যে আপনি এসে বন্দী করলেন আমাকে।

মেয়েটি। আপনার বৈরাগ্য দশা উপস্থিত হয়েছিল—তাতো বুঝতে পারিনি। আমি যা ভেবেছিলাম, তা আগেই বলেছি। যাক্ আহুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

যুবক। কই রিস্তলবর আমার? দিন।

মেয়েটি। (চোখের নতুনরকম ইসারা করবার পর) ব্যস্ত হবেন না; ভাগ্য কিয়ং দেবার মালিক আমরা। আহুন, এই রিস্তলবর বাঁধা দিয়েই বহন আর একবার টেবিলে। মন বাঁধা দিয়ে ফেলেছেন এর মধ্যে—রিস্তলবরটি বাহ্যিক বস্তু মাত্র, এর জন্তে এত মারা কিসের?

যুবক। অর্থাৎ?

মেয়েটি। অর্থাৎ, আমরা যার মুন খাই—তার গুণ না গাইলেও অমর্যাদা করি না। খন্দের হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেতে নেই—এই নীতি-বান্দকে মানি।

যুবক। কি বলছেন আপনি? মানে—

মেয়েটি। কি আবার বলবো আমার সঙ্গে আহুন! বিংশ শতাব্দী অনেকদূর এগিয়েছে। আমরা সভ্যতার অগ্রদূত! আপনি পেছিয়ে পড়তে পারবেন না কোনমতে; আমাদের কাছে ভর দিয়ে এগিয়ে আহুন। বুঝলেন?

যুবক। আমার রিস্তলবর?

মেয়েটি। রিস্তলবর আর আপনার নয়,—এখন আমি আপনার। ভাগ্যের চাকা নিয়তই ঘুরছে। টেবিলে বসবেন আহুন। মুখোস-আঁটা জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে এগিয়ে আহুন।

কথা (গল্প)

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া কাতারানী গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া বাহিরে তাকাইলেন। ছপুয়ের থরোজ্জ নারিকেল পাতার উপর পড়িয়া বক্ বক্ করিতেছে। লিচু গাছের বড় ডালটার হুঞ্জীতির ভুলিবার দোলনার দড়িট খুলিতেছে, তক্তাখানিকে কেহ খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। এ-কমদিন হুঞ্জীতি ও-দিকে যায় নাই। অহর্কিত আগন্ত দীর্ঘখাস মোচন করিয়াই কাতারানী আপনা-আপনিই কহিলেন, “বাট গাট, জন্ম জন্ম বাচ্চা আমার সেই ঘর করুক।”

হুঞ্জীতি চলিয়া গিয়াছে আজ চারদিন হইল।

হুঞ্জীতির বিবাহ হইরাছে করদিন হইল। মুন্সেরে বসুধালায়ে গিয়াছে। জোড়ে কিরিতে এখনও করদিন বিলম্ব আছে।

বিগত বিবাহদিনের চিহ্ন এখনও সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছে। টিনে টিনে ভরা রসগোল্লা, মুড়িতে মুড়িতে দরবেশ, ডালায় ডালায় ভরা লুচি এখনও ফুরাইয়া শেষ হয় নাই। দাসী চাকরের কলখাবার ইহা হইতেই চলিয়াছে। উত্তরের পুকুরে ষাওয়া যায় না, যন্ত্রের বড় বড় বড়া, ডেক, বাজুতি, টব, ডুবাইরা রাখা হইরাছে। পুকুরটা ঘি ও তেলে যেন গাঁজিয়া উঠিয়াছে।

চারদিকে উৎসবজনিত বিশৃঙ্খলা গোচর করিতে করিতে দানী-ভূত্যাগণকে উদ্দেশ্য দিতে কাত্যায়ন আপনার নিজস্ব এই ছোট ভাগ্যবানিত্যে এ কয়দিন প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাহার খাদ্য ও মোক্ষদা কেবল ঝাঁট দিয়া মুছিয়া গেছে।

ছোট ড্রেসিং টেবলটার উপর স্থপীতির ব্যবহৃত পূরণো ফিরা, কাটা, স্নো, ক্রীম, চিকুণী, ভ্রান, কত কি রহিয়াছে। সম্মুখে নয়নে কাত্যায়ন সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শুক দুপুরে ক্রান্ত দাসীভূতের দল তাহাদের মহালে বিশ্রাম করিতেছে। ঠাকুরদালানে পারাবতের কুজন স্পষ্ট ধ্বনিতে হইতেছে। জানালা দিয়া দেখা যায় গোশালায় সম্মুখে বড়গাভীটি সম্মুখস্থ বাচ্চাটির গা চাটিয়া দিতেছে।

কক্সার বিচ্ছেদ-বেদনায় নীরব দুপুরে কাত্যায়নের মনটা যেন ছুট করিতে থাকে। সতেরো বৎসরের আবেষ্টনো ছাড়িয়া তাহার পরম আদরের স্থপীতি শব্দ-বহু করিতে গিয়াছে।

এই বিবাহের কক্স কত চিন্তা, কত ভাবনা, কেমন করিয়া স্থাপন পাওয়া যাইবে? কেমন ঘরে স্থপীতি পড়িবে? বাহাদের গৃহে স্থপীতি যাইবে তাহার কেমন চক্ষে স্থপীতিকে দেখিবে? ইহাই ছিল কাত্যায়নের ইদানিংকার বিশেষ চিন্তা। তাহার সকল চিন্তার অবসান করিয়া স্থপীতি স্থপাত্রে উত্তম গৃহে পড়িয়াছে। দুইহাত জোড় করিয়া কাত্যায়নো উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

আই, এ পড়িবার সময় স্থপীতিকে দেখিয়া অনিল পছন্দ করিয়াছিল। অনিল তখন এম, এ,—ল' একসঙ্গে পড়িত। তাহার পর পাশ করিয়া মুন্সেফ হইয়া এখানে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। দুইজন দুইজনকে পুরু হইতে চিনিত। ভালবাসার বিয়ে। একটু সলজ্জ সৌহার্দ্য মাতার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

আজকালকার দিন। হেলেও কলেজে পড়ে। মেয়েও কলেজে পড়ে। দখানাক্ষণ হতেই পারে। তাহার পর যদি ভালবাসিয়া বিবাহ হয়, তবে তাহা সুখের কথাই।

স্থপীতির বিবাহ তো এমনই বয়সটি হইল। তাহাদের সেকালের কথায় 'যাচা পাত্র'।

স্থপীতির গর্বভরা আনন্দোজ্জ্বল মুখ। জামাতা যেরূপ উচ্ছসিত হাসিমুখে মুখে কথা কহিতেছিলেন তাহাতে মনে হয় উভয়ে উভয়ের প্রার্থিত ছিল। তাহাদের প্রণয় যেন সুগভীর হয়।

কাত্যায়নো ভাবিলেন, তাই বলিয়া কি তাহাদের প্রণয় সুগভীর হইত না? তাহাদের প্রণয়ের বন্ধন যে বাল্যস্থিতির হৃদযন্ত্রকেন্দ্র বাঁধা।

কাত্যায়নীর মনে হয় আপনার বিবাহের কথা। স্থপীতি যেমন তাহার চিরপরিচিত বাল্যের গৃহ ছাড়িয়া তাহার জন্মান্তর কালের নিজের গৃহে ঘর করিতে চলিয়া গেল, তিনিও তেমনি একদা তাহার আবাস্যপরিচিত গৃহ, তাহার স্নেহময় পিতার কোল ছাড়িয়া এই গৃহে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার আরো পুত্রকক্সা রহিয়াছে। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই গৃহের একমাত্র কক্স। পিতার বক্ষের নিধি। পিতার সে ক্রন্দন কি ভুলিবার? স্বর্গগত পিতার কথা স্মরণ করিয়া ছোট কাত্যায়নীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

সেই গৃহে প্রায় তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি ও তাহার গৃহের সকলে যেমন স্থপীতির অশেষ কল্যাণ কামনা করিয়া, তাহার সেই গৃহে অশ্রু হৃদক চাহিয়া, আবার তাহার অদর্শন-জনিত বিহবে আচ্ছন্ন হইয়া সম্মুখে তাহার পথ চাহিয়া আছেন! তেমনি সেখানেও সেদিন তাহার পথ চাহিয়া তাহার পিতা, তাহার বিমাতা সবাই আকুল হইয়াছিলেন। কারণ তিনি তাহাদের তখন একমাত্র কক্স।

সেই গৃহ! সেই হৃদয় বিহার প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রাম বিষণ্ণগঞ্জে তাহার পিতালয়। চোখেয় সম্মুখে উজ্জল হইয়া ওঠে।

পিতা তাহার জন্মের দুই বৎসর পরে গয়ায় প্রাকৃষ্ণের হাবা না হওয়ায় এই অখ্যাত নির্জন প্রদেশে নতুন সাবডিভিশনাল কোর্ট খোলার ভাগ্য-পরিবর্তনের আশায় প্রাকৃষ্ণ করিতে আসিয়াছিলেন। পিতার সেই আশা পূর্ণ হইয়াছিল এইখানেই তাহাদের অবতার পরিবর্তন ও স্থানাंतर হইলেও এইখানেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মাতা? কাত্যায়নো দৌর শৈশব যেন ফিরিয়া আসে। স্নেহময়ী তাহার মা। উজ্জল গৌরবর্ণ সেই স্নেহের মুখের খানিকটা আবছায়া আজও তাহার মনে পড়ে। মায়ের সেইরূপের অংশ কাত্যায়নো দেবীও কিছু পাইয়াছেন।

বিস্তৃত রূপটাইতো তাহার প্রধান ছিল না, তাহার গুণের পরিমাণ এতই বেশী ছিল যে তাহা তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্যকে অধিকতর সুসমামিত করিয়াছিল। আজ সন্ধ্যা নতুন করিয়া মাতার গুণের কাহিনী কাত্যায়নীর মনে পড়িয়া যায়।—পিতার মুখে বহুবার যাহা শুনিয়াছেন, এবং কনিয়া শুনিয়া যাহা তিনি শ্রুতকৈ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

নিজের গৃহতলে বসিয়া পড়িয়া কক্স কাত্যায়নো সেই কথাই ভাবিতে থাকেন।

ম্যাটিকুলেশন পাশ করিবার পরই যতীন্দ্রনাথের পিতা তাহাদের গ্রামের এক অবস্থাপন্ন বড় চাকুরেকে ধরিয়া পুত্রের চাকুরীর চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন যতীন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে কয়মাস। কাত্যায়নীর মাতার বয়স তখন ১৪ বৎসর।

বাল্যকাল হইতেই যতীন্দ্রনাথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। গ্রামের আর সনাতী যাহা, তিনি তাহাদের হইতে উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহাই ছিল তাহার বাসনা।

কক্স ডিভিশনে ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়া তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা আরো অদূর হইয়াছিল। অকস্মাৎ পিতার এই ইচ্ছা তাহার সেই বাসনাকে শ্রবণ আখ্যাত করিল। মাতার দ্বারা তিনি পিতাকে জানাইলেন যে তিনি আরো পড়িতে চান। কিন্তু পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন, “আমার দ্বারা আর পড়ানো সম্ভব নয়, একটা পাশ তো করলে, এবার কাজ করাই ভাল।”

রাসভারা গভীর স্বামীকে আর অনুরোধ করিতে সাহস না করিয়া মাতা পুত্রকে বলিলেন, “তুই কাজের চেষ্টাই দেখ বাবা, যা একদিন মানুষ যা এবার বলেছেন তা সে মত তো কিছুতেই টলবে না, মিশো মনবাক্যি হবে।”

যতীন্দ্রনাথ শুক হইয়া রহিলেন। ওই রাম, শিবে, সন্তোষ, কালুর মত চারটি ভাত কোনরকমে নাকে মুখে স্তীজিয়া হাতে খাবারের কোঁটা লইয়া সকাল ৮টায় ডেল প্যাসেঞ্জারী, এবং মাসান্তে ৩০।০০ টাকা ঘরে লইয়া আসা? না, না, না, তাহা হইবে না। তেমন জীবন যাপন করিব না। পকেট হইতে একমুঠা টাকা তুলিয়া কাঠকেও দিতে মনে যাহাতে কষ্ট না হয়, তেমনি উপাঞ্জন করিব। চিরদিন মুখ হইয়া অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন? তাহা হইবে না। শূন্য অপমানিত পুত্রের চিন্তাঘূর্ণিত মুখের পানে সশ্রমনয়নে চাহিয়া মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

গভীর রাতে বালিকা বধু মুন্সুরী আসিয়া বিনির্দ্রস্বামীকে মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মুদ্রকণ্ঠে কহিল, “তুমি যদি আরো পড়া করতে চাও তবে আমার গয়নাগুলো নাও না। অনেক তো আছে? বাবা তাহলে বোধ হয় রাগ করবেন না। তুমি বলে দেখ, উনি নিশ্চয় মত করবেন।”

কিন্তু বধু জানিত না যে তাহার গহনা শব্দের সম্পত্তির অর্থভুক্ত

শশুরের তাহাতে মত হইল না উপরন্তু এই প্রস্তাবে তিনি অধিকতর বিরক্ত হইলেন। যত সব পাকা ছেলে মেয়ে।

ভিতরে ভিতরে পিতা-পুত্রের মনোমালিঙ্গা বন্ধিত হইতে লাগিল। স্বামী-পুত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মাতা অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাহার আদেশ সত্ত্বেও পুত্র কর্ত্তের কোন চেষ্টা করে না দেখিয়া অব্যাহা পুত্রের প্রতি পিতা ক্রুদ্ধ হইতে থাকেন এবং সেই প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তাপ মধ্যে মধ্যে পুত্রের অঙ্গে বর্ষিত হয়।

মাতা অত্যন্ত অশান্তিতে থাকিয়া স্বামীকে শাস্ত করেন এবং পুত্রকে সাঙ্ঘনা দেন।

যতীন্দ্র কোনক্রমেই কলেজে ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে দিন কাটাইতেছিলেন।

ইঠাৎ কবেক মাসের মধ্যে যতীন্দ্রের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। মুন্সরী তখন পিত্রালয়ে গিয়াছে, সে আসন্নপ্রসব। যতীন্দ্রের মাতৃ-গিরোগ হইল। এবং অসম্ভব পিতা আকস্মিক শোকের আঘাতে একেবারে ক্রিপণশায় হইয়া উঠিলেন। এবং সহসা একদিন সামান্য বাক্যান্তরের ফলে পুত্রকে তাঁর কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “এমন ছেলের মুখ দেখতে চাই না তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরাও।”

অতিমানী পুত্র ভ্রাতৃর মত গৃহত্যাগের সংকল্প লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আজ তাহার মাতা নাই কে তাহাকে ফিরাইবে?

যতীন্দ্র প্রথম ঘাইয়া শশুরালয়ে উঠিলেন। সহসা স্বামীকে আসিতে দেখিয়া উদ্বেগা মুন্সরী বার বার প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাছিল কি হইয়াছে।

যতীন্দ্র পিতার বাক্য ও ব্যবহারের কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে জানাইয়া কহিলেন, “ডোটকাজ একটা দেখে শুনে নিতেই হবে দেখছি। পড়ার স্বপ্ন আমাকে ছাড়তেই হল অবশেষে।”

মুন্সরী তাহার ক্রন্দন রোধ করিতে পারিল না বলিল, “না না তুমি তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধটিকে নষ্ট করো না। আমার যা আছে তাই দিয়ে তুমি স্কুল কর তারপর দেখা যাবে।”

মুন্সরী তাহার সঙ্কট প্রায় ৬০ টাকা আনিয়া স্বামীকে দিল।

যতীন্দ্র যেন অকুলে কুল পাইল। সেই অর্থে সে কলিকাতায় ঘাইয়া অনেক চেষ্টায় কলেজে সিট জোগাড় করিল, মেসের ব্যবস্থাও হইল। বিবাহে প্রাপ্ত সোনার আংটি বোতামও বিক্রয় করিতে হইল।

একমাস কাটিবার পর যতীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে দেখিলেন তাহার নামে মণি-অর্ডার আসিয়াছে। প্রেরিকা মুন্সরী দেবী। শশুরালয় হইতে আসে নাই। অশু ঠিকানা।

চিঠি পাইয়া যতীন্দ্র ভানিলেন যে ওই ঠিকানায় হরপ্রসাদ বাল্যোপাধ্যায় মুন্সরীর “সখের বাগানের” স্বামী। পাড়ার একটি মেয়ের সহিত মুন্সরী “সখেরবাগান” পাঠাইয়াছিল। সেই মেয়েটি উপস্থিত সিমুলপোতায় রহিয়াছে, তাহার স্বামী অক্ষিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়াছেন।

মুন্সরী লিখিয়াছে, “টাকাটা লইতে লজ্জা করিওনা, ইহা আমার নিজের টাকা, বাবা আমার প্রতিমাসে হাতখরচের জন্য ১০ করিয়া দেন। আমার মা থাকিলে তিনি তোমার ভার লইতেন। আমার তো কোনও খরচ নাই। বুঝা জমা হয়। তোমার ব্যবহারে লাগিলে সার্থক হইবে।” তোমার বাবা যতদিন না তোমার ডাকিয়া লইবেন ততদিন সেখানে আমিও যাইব না।”

এই সাহায্য যতীন্দ্রনাথের পরম সম্বল দাঁড়াইয়াছিল। বালিকা স্ত্রীর এই সাহায্য না পাইলে জীবনে দরত সাফলালাভ সম্ভব হইত না।

কাত্যায়নীর চক্ষুর সম্মুখে বর্ণগঞ্জের বৃহৎ অভাগিনী, মস্ত বাগান, বাধানো ইশারা, ফলের বাগান সব ভাসিমা উঠিল।

মুন্সরী প্রায় বছর চারি পিত্রালয়ে রহিলেন। যতীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আসিছেন। কষ্টা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেও চারি বৎসরের হইল।

চারি বৎসর পরে ইংলিশ অনার্স সহ বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতার নিকটস্থ আগড়পাড়া হাই স্কুল ৩০ টাকা মাহিগানার চাকুরী করিতে করিতে এম. এ.—ল. পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার কর্মজীবনের লক্ষ্য স্থির হইল। গিয়াছিল, ওকালতী।

কলিকাতা সহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন ওকালের দল যতীন্দ্রের মনে আশা জাগাইয়াছিল।

এই সময়ে প্রথমা কষ্টাটির মৃত্যু হওয়ায় শোকাভূত মুন্সরীকে যতীন্দ্র নিকটে রাখিলেন।

তিন

এম. এ.—ল. পাশ করিবার পর শয়ন অর্থ যাহা মাস্তুরী করিবার সময় জাময়াছিল, তাহা লইয়া তিনি গয়ায় ওকালতী করিতে গেলেন। কারণ এতদিনে তাহার সে অপ্রিয়তা জন্মিয়াছিল যে, তাহার মত সহায়সম্বলীন জুনিয়রের পক্ষে কালকাতা নগরীতে ওকালতীতে বসার সমুচিত হইবে না।

তাহার বন্ধুবান্ধবগণও পরামর্শ দিলেন বিহারে যাইতে। সেখানে এখনও দ্রাবিড় আছে। গয়ায় আসিয়া যতীন্দ্রনাথ প্রাকটিস আরম্ভ করিলেন। কিছু কিছু হইতে লাগিল, একেবারে অনশনে কাটিল না, তবে তেমন কিছু সুবিধা হইল না। এই সময়ে কাত্যায়নীর ওম্ম হয়। ইহার দুই বৎসর পরে কিশগঞ্জের নূতন সাবডিভিশনাল কোর্ট খুলিল এবং যতীন্দ্র এইখানে চলিয়া আসিলেন। এইখানেই তাহার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় হইল। আর্থিক সম্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মুন্সরীর গহনা, কাত্যায়নীর গহনা নূতন জামা কাপড় হইতে লাগিল।

জমি কেনা হইল, গৃহ-নির্মাণের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যতীন্দ্র-নাথের সম্মুখে রঙ্গীন জীবন।

ইতিমধ্যে মুন্সরীর একটি পুত্রসন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। এবং বৎসর না ঘুরিতেই আবার একটি কষ্টা সন্তান হইল।

মুন্সরী ভিতরে বড় দুঃখলতা বোধ করিতেন। অর প্রায় প্রত্যাহই হইত। কিন্তু স্বামীকে জানাইতে অবসর পাইতেন না। স্বামী দিবাকার কর্ত্তের মধ্যে যেন জুবিয়া আছেন। নূতন-উৎসাহ, নূতন প্রেরণা। যে জীবন তাহার কামা ছিল, তাহা যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সম্মুখে উজ্জল ভবিষ্যৎ।

তাহার পর যেদিন মুন্সরী সহসা অজ্ঞান হইয়া গেলেন, সে এক বিপদের দিন। সারাদিন যতীন্দ্র উন্মত্তের স্থায় ছুটছুটি করিয়া ডাক্তার, ঔষধ-পত্রের, পথের বন্দোবস্ত করিলেন। দিবাকার স্ত্রী-সেবার নিজেও নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ভিতরের অস্বাভাবিক রক্তহীনতা মুন্সরীকে এবেবাসে অসুস্থ করিয়া দিয়াছে। তিলে তিলে আপনাকে বন্ধিত করিয়া অভাবের সংসারে স্বামী ও কষ্টাকে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন। হৃদয়ময় আসিল যখন, তখন তাহাকে বরণ করা তাহার জীবনে সম্ভব হইল না।

তাহার পর একদিন প্রভাতে কাত্যায়নী দেখিলেন তাহার মাকে সিন্দুর আলতা পরাইয়া, ফুলসাজে সাজাইয়া সমরোহ করিয়া কোথায় যেন লইয়া চলিয়া গেল। এতলোকের আনাগোনা কালক্রমে দেখিয়া কাত্যায়নী বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর মা আর কিরিয়া আসেন নাই। ৭ বৎসরের শিশু সন্তান “মা কোথায়?” প্রশ্নের উত্তরে পিতা অশ্রুজলে ভাসিয়া নীরবে তাহাকে জোড়ে তুলিয়া লইতেন। মাতৃহীন সন্তান প্রতি যত্নের তাহার সীমা ছিল না। কতদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাত্যায়নী দেখিয়াছেন, পিতা তাহার মুখপানে সজলনেত্র চাহিয়া বসিয়া আছেন। স্নানাহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকিত।

কোর্ট হইতে আসিয়া টাকাগুলি কষ্টার সম্মুখে ঢালিয়া দিতেন।

আনন্দিতা বলিল। সবগুলি টাকা আপনার ফ্রকের কোঁচড়ে তুলিয়া লইয়া বলিত “সবগুলো আমার তো বাবা।”

ছুইহাতে বকে টানিয়া স্নেহে মৃতক চুম্বন করিয়া পিতা বলিয়াছেন, “সবই তো তোমার মা, তুমি যে আমাদের সব।”

পিতার অত্যধিক স্নেহযত্নেও বেন মায়ের অভাব ঢাকা পড়িত না। খেলিতে খেলিতে কুখা পাইয়া যায়, কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। মা যেমন কুখা পাইবার আগেই ডাকিয়া খাওয়াইতেন তাহা তো আর হয় না।

অকস্মাৎ কত সময় কানের বাছে সেই মিষ্টি গলা বাজিয়া ওঠে, “কাতু খাবে এস বাবা।” বকের মাঝে না জানা কেমন এক বেদনা বোধ হয়। ছুই চক্ষু দিয়া হ হ করিয়া অকারণে জল বাহির হইয়া পড়ে। অকারণ কান্নার বারনার আশ্বাদে পিতাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে।

এমনি করিয়া কতদিন যে কাটিয়া গেল মনে নাই। বাবা তাঁহাকে লইয়া দেশে আসিলেন। পিতামহের মুতু হইয়াছে। তাহারি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে আসিতে হইল। ইতিমধ্যে পিতার সহিত যতীশের মনোমালিন্য মিটিয়াছিল।

সেই অচেনা বাটিতে অজানা অনেক লোক রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া, পিতাকে দেখিয়া, তাহার কত কাঁদিল, কত দুঃখে প্রকাশ করিল।

তাহার পর ক্রিয়াকর্মে গোলযোগে কয়দিন গেল। ক্রমে ভীড় কমিতে লাগিল। বাহার্য রহিল তাহাদের সহিত বাবার কি সব কথাবার্তা হইতে লাগিল। বাবা প্রথমে কাঁদিলেন, তাহার পর রাগ করিলেন। অবশেষে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

তাহার পর একদিন কাত্যায়নী দেখিলেন, পিতা তাঁহাকে কত আদর করিলেন, কত নুতন জামা পুতুল খেলা কিনিয়া দিলেন এবং তাহার পর ছুইদিন তিনি বাটিতে থাকিবেন না বলিয়া কাত্যায়নিকে লজ্জা হইয়া থাকিতে বলিয়া কোথায় যেন আরো কতজনদের সহিত চলিয়া গেলেন।

চার

পিতা ও নুতন বিমাতার সহিত আবার কাত্যায়নী তাঁহাদের পুরাতন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই যেন মায়ের কথা নুতন করিয়া কাত্যায়নীর মনে হয়। নুতন মাতার বাচ্চ তাহা বলিতে ন পারিয়া কান্নার আবদারে তাহা প্রকাশ হয়। পিতামাতার স্নেহযত্নে ক্রমে বালিকা তাহার শোক ভুলিতে লাগিল।

তখন তিনি গৃহের এবমাত্র কল্পা। তখনও নুতন মাতার সন্তানদি হয় নাই। তিনিও কাত্যায়নিকে স্নেহ করিতেন।

পিতা তাহার নব-বিবাহের অপরাধে হয়ত অন্তরে লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাই মৃদুগীর স্মৃতিকণাটুকু অধিকতর আগ্রহে সমাদরে বুকে করিয়া রাখিতেন। নুতন বধুও ইহার ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

কাত্যায়নীর বয়স যখন দশ বৎসর তখন তাহার বিবাহ হইয়া গেল। যতীশ নাথ বড় দিনের বন্ধে জ্যৈষ্ঠ-কল্পা সহ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। “জু” গাভেঁনে জ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় বারাসতের জমিদার-গৃহীণীর কাত্যায়নিকে দেখিয়া ভারি চন্দন হয়। তিনি তাহাকে বধু করিতে চাহেন। বলেন “আমার মাকে আমি কয় বছর হ’ল হারিয়েছি, এটি আমার মা হ’লে আমার শ্রুত ঘর পূর্ণ করবে।”

“যতীশনাথ খবর লইয়া জানিলেন, ঘর ও বর মনের মতই। তাহার পর মহাসমারোহের সহিত অতিথিগণ উকালের কল্লার সহিত জমিদারপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। অতীতের সেতদিন? কি সে যত্ন? কি সে আদর? স্নেহময়ী শাশুড়ী, যশুর ও গৃহস্থ পরিজনের স্নেহ-সম্মানের পাত্রী।

ঘরে ঘরে কতদিন গত হইয়াছে। যশুর-শাশুড়ী পরলোকগত হইয়াছেন। এই বৃহৎ সংসারের তিনি কতী হইয়াছেন।

তাঁহার পিতার মুতুও হইয়াছে আর ১৯১৬ বৎসর।

যশুরাণের স্নেহ যত্ন প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া শ্রোতা কাত্যায়নী আজও অভিমানী নববধু। সামান্য ত্রুটিতে তাহার রাগ ও দুঃখের সীমা থাকে না। সে মানভঙ্গন করিতে বামী অজয়নাথ ভাড়া আর কেহ সাহসী হয় না।

পিতার স্নেহ সমভাব্যই ছিল। তাহার অসংখ্য স্নেহপূর্ণ পত্রেই তাহার পরিচয় আছে। বিমাতার পত্রেও সে আশ্রয় যেন পাওয়া যাইত। তাই এই দীর্ঘ ১৮:৫ বৎসর জমিদারগৃহের বৃহৎ সংসারের জটিলতা ভাড়াইয়া পিতৃগৃহে না যাঁতে পারিলেও মনে মনে তিনি স্থির নিশ্চয় জানেন যে তাহার কন্যাত্বের স্বামী মধ্যাধার যে আসন কিষণগঞ্জের সংসারে একদিন পাতা হইয়াছিল, তাহা আজও অটুট আছে। শুধু তিনি দূরে থাকেন এবং জাতারা কর্মে ব্যস্ত বলিয়া তাহা শুক হইয়া আছে। তাই মাতার পত্রও বিরল সংখ্যক হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কিছু আলাপ করিয়া দিয়া যান নাই বলিয়া অজয়নাথ কণায় একদিন রহস্ত করিয়া বিনিয়াজিলেন, “দ্বিতীয় পক্ষ বিয়ে ক’রে তোমার বাবা তোমার মায়ের সব কথাই একেবারে ভুলে গেছেন, তাই তোমার কথা তাঁর মনে হ’ল না। না হ’লে ন্যায়তঃ ও সম্পত্তিতে তোমারও কিছু অধিকার ছিল।”

রহস্যচ্ছলেও পিতার বা পিতৃপুত্রের নিন্দা কাত্যায়নী সহ্য করিতে পারিতেন না।

তৎসংগাত উত্তর দিয়াছিলেন, “কেন এত খরচ ক’রে বিয়ে দিয়েছেন, এত বড় বিরাট সম্পত্তি আমার যশুরের রয়েছে, তবে আমার দেবার দরকার কি? তাই দেন নি। তা ব’লে কি তাঁর সম্পত্তি থেকে আমার দরকার হ’লে কিছু পাব না? ভাইয়া আমার তেমন নয়।” কথা বাড়িবার ভয়ে অজয়নাথ জবাব দেন নাই; তবে মুখে তাহার আসিয়াছিল যে, “১০ হাজার কি ২০ হাজার খরচ ক’রে বিবাহ দিলে লাখ টাকার সম্পত্তিতে ঘা পড়ে না। মুখে বলিয়াছিলেন, ‘তা হটে।’

কাত্যায়নী পিতার স্বপক্ষে আরও ভাবিতছিলেন বলিলেন, “আমার মাঝে বাগা তত্ত্ব ক’রে পাঠাতে পারেন নি ব’লে ৫০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন। তা ভাড়া নানারকমে তিনি কত দিয়েছেন, সেগুলো কি দেওয়া নয়? সামান্য সামান্য কাজে তিনি ৪০০০ এর কম কখনও দেন নি। তবে?” অজয়নাথ রাগাইলেন না, মুদু হাসিয়া বলিলেন, “দিয়েছেন তো বটেই, বৈচে যতদিন ছিলেন, খুবই দিয়েছেন, তবে এটাও জানতেন যে, ও দেওয়া ওইখানেই শেষ হবে।”

এ সকল পুরাতন কথা। কাত্যায়নী ভাবিতছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাহার দুই জাতার বিবাহ হইয়াছে, নিমন্ত্রণে যাঁতে না পারিলেও তিনি ভাগমত উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন এবং তাহার পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। সেদিক দিয়া সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণই আছে।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার প্রথম বড় কাজ স্মৃতিস্তর বিবাহ। ভাইদের ও মাকে তিনি অনেক করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু দূরে থাকায় তাহারা কেহ আসিতে পারে নাই। সেজন্য চিঠিপত্র দিয়াছেন নিশ্চয়, এমনও তাহা আসিয়া পৌঁছায় নাই।

পুরাতন কথা ভাবিতে ভাবিতে বর্তমানে আসিয়াও কাত্যায়নীর চমক ভাঙ্গে নাই। কতক্ষণ তিনি এমনি দিব্যস্বপ্ন দেখিতেন তাহার ঠিক নাই, সহসা সরকারের কণ্ঠস্বর তাহার চমক ভাঙ্গিল।

সরকার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, “মা, আমার বাড়ি থেকে এখন মণি-অডার এল, ২০ টাকা পাঠিয়েছেন। টাকাটা কি দিদিমণির উপহার পাওয়ার খাতায় লিখে রেখে জমা করে দেবো?”

কাত্যায়নীর বিষয়ে কণ্ঠ চিরিয়া প্রশ্ন নির্গত হইল, “কত?”

সরকার লজ্জিতমুখে মুদু কাশিয়া গলা বাড়িয়া হাত কলোইয়া নতমুখে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিল, “আজ্ঞে ২০ টাকা, মা।”

হঠাৎ অজয়নাথের মুদ্রহস্তযুক্ত ব্যঙ্গোক্তি বিষয়হতা কাত্যায়নীর কর্ণে বাজিয়া ওঠে “দেওয়া তো বটেই তবে ও দেওয়ার এখানেই শেষ হল বোধ হয়”।

কি নিদারুণ সত্য কথা।

কিস্ত? কিস্ত পিত্রালয়ের অমর্যাদা জ্ঞাতার হীনচিত্ততার যে নিজের অপমান! তিনি যে সেই গৃহের কল্যাণ।

বর্গসঙ্কর (গল্প)

ত্রীকাশীনাথ চন্দ্র

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী-বাড়ীর স্তম্ভীকৃত ইট কাঠ পাথরের অন্তরাল হইতে গুরুগভীর কণ্ঠে শোনা যায় মাতৃ-আহ্বান—“তারা ব্রহ্মমহী মা”—বোঝা যায় যে চৌধুরী-বংশের সপ্তপুরুষের নিয়ন্ত্রণ পুরুষ শ্রামাকান্ত চৌধুরী সন্ধ্যা-পূজা সাস্র করিয়া “কারণ-বারি” পান করিতে হুরু করিলেন। চৌধুরীরা পুরুষানুক্রম শক্তির উপাসক—কারণ-বারি পান করা তাঁহাদের পক্ষে দ্রুত নহে।

চৌধুরীদের সাতমহলা বাড়ী আজ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিরাট প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে আজ বহু কবুতর ও চামচিকার জীলাভূমি। মাঝে মাঝে দু একটা হুবিশাল স্তম্ভ অথবা দু একটা হুউচ প্রাচীর দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতীতকালের গৌরব-স্মৃতি বহন করিতেছে। নিশ্চয় অগ্নানের মত বিশাল বাড়ীর খোপে-খাড়ে দিনের বেলাতেই গ্রামসিংহ আর্ন্তবরে ধান-মৌন কালের দেবতাকে প্রণয় করিতে থাকে—“কেয়াহুয়া—কেয়াহুয়া”—সেই অতীত গৌরব, সেই দৈর্ঘ্যও প্রতাপ সে কি হইল? স্তম্ভীকৃত নক্সাকাটা ইট, কাঠ, পাথর আজ নিভাঙ্কই ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তু।

আসে—তিনশত বৎসর পূর্বেরকার এই জমিদার-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দর্শনকামনার ঐতিহাসিকেরা যে আসে না তা-ও, আসে। শ্রামাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র সন্তান হুবিমলকান্তি এম এ পড়ে—ইতিহাসে। প্রাচীন ও পুরাতত্ত্বের উপর প্রবল অনুরাগ। এই প্রাচীন জমিদার-বংশের ইতিবৃত্ত আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিবার স্বপ্ন দেখে। তাই ইট, পাথরের স্তূপের ভিতর অমূল্যবান করিয়া ফিরে তাকান অথবা প্রস্তর ফলক—শিলালিপি। তাহার সহিত তাহার সত্যগণও আসে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কটো তোলে, সত্য-মিথ্যা জড়িত প্রাচীন কাহিনী শোনে, খায়, দায় চলিয়া যায়।

একবার ছাত্রদের সঙ্গে এক অধ্যাপকও আসিলেন।

অধ্যাপককে অভ্যর্থনা করিলেন স্বয়ং শ্রামাকান্ত চৌধুরী। দুধারে কালকণ্ডম বন, মৃগা আর শিয়ালকাঁটার ঝোপ, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ—সে পথের প্রান্তে বিস্তৃত রাজপথ। কিশকলী যে সেইখানেই না কি পূর্বে চৌধুরী-বাড়ীর ছিল সিংহদ্রুমার। শ্রামাকান্ত চৌধুরী সেইখানে দাঁড়াইয়া অধ্যাপককে অভ্যর্থনা করিলেন। মহানমারোহে ঘরে আনিয়া বলিলেন, “কী বা দেখতে এসেছেন—সবই গেছে। সাতমহলা বাড়ীর এইটুকুই অবশেষ। শুনিচি এইটুকুই না কি দুর্ধ্যোধন চৌধুরীর খাসমহল ছিল—তিনিই এই চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সিংহের মত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন এই দুর্ধ্যোধন চৌধুরী। বর্ষা এক আঘাতে এক বিশাল ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া কোন এক মোগল বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বাদশা প্রাণ-পাতাকে শুধু কটিদেশের উকাপিণ্ডের লোহের নির্মিত ত-বারি উপহার দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তৃত জমিদারী জায়গীর দিয়াছিলেন। কক্ষপ্রাচীরগাত্রে অবলম্বিত হৃদয় ভরবারিখানি নামাইয়া লইয়া

কাত্যায়নী ভীষ্মচোখে একবার চারিদিকে চাহিলেন আর কেঁহ সেখানে উপস্থিত কি না। তাহার পর অন্তরিকে চাহিয়া অস্ত্রকণ্ঠে সরকারকে কহিলেন, “না না, সরকার মশাই, ওটা, আর থুকীর নামে জমা করবেন না। যা পাটিয়েছে তার ডবল করে মিলি খাবার জন্ত টাকাটা আজই তাদের নামে পাটিয়ে দেবেন!”

“আর...আর আমার নামে আমার ব্যাঙ্ক থেকে কাল ১০০ টাকা! আপনি নিজে চেক নিয়ে গিয়ে ভান্সিয়ে আনবেন, বুঝলেন?”

শ্রামাকান্ত বলিলেন, “এই দেখুন, এই সেই তরোয়াল। এই যে দামাটের ওপর বাদশার নাম পর্যন্ত কৌণা রয়েছে”—দ্রুবেদ্য ভাষায় কয়েকটি অক্ষর অধ্যাপক একবার শুধু দেখিয়া তরবারি কিংগিয়া দিলেন। সেখানিকে পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে গভীর স্বরে শ্রামাকান্ত বলিলেন, “সেদিনকার সঙ্গে আজকের কোন তুলনাই হয় না। দুর্ধ্যোধন চৌধুরীর আয় ছিল শুনিচি সালিয়ানা দেড় কোটি টাকা—আর সেই জায়গার এখন দু’হাজারে এসে ঠেকেছে। ওই যে দেখছেন”—মুগ্ধ বাতায়ন-পথে শ্রামাকান্ত ধ্বংসাবশেষগুলির প্রতি অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।—“হাঁ ওই যে প্রকাণ্ড চারটে খাম রয়েছে, ওখানে ছিল দুধসায়র। দুর্ধ্যোধন চৌধুরীর স্ত্রী ওখানকার দৌঘির ঘাটে বসে ছুধে করতেন স্নান। অসামান্য ছিল তাঁর রূপ, শুনিচি তখনকার লোকে দুর্গাপ্রতিমা না দেখে তাঁকে দেখতে আসত। লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল বাংলার পদ্মিনী। সে রূপ পাছে দৌঘির কালো জলে মরলা হয়ে যায় তাই ছুধে স্নান করতেন। দৌঘির নাম হয়েছিল তাই দুধসায়র।”

অধ্যাপক বিস্মিতভাবে শুনিতে থাকেন অশ্রুতপূর্ব কাহিনী। হুবিমল গর্বভরে চাহে তাহার সহপাঠীদের দিকে। পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা গোরবকাহিনী তাহার প্রতি শিরার শিরায় আনে উদ্দামতা, প্রতি লোমকূপে জাগায় শিহরণ। তাহার সহপাঠীরা নীরব, বিষমমুগ্ধ। একজন চুপি চুপি হুবিমলকে বলিল, “অশোকের শিলালিপি আর মারাঠাদের লুণ্ঠ ইতিহাস নাড়াচাড়া করার চেয়ে তুমি এদিকে মন দে ভাই, চট করে নাম করে ফেলবি। অজস্রার গৃহের চেয়ে তোদের বাড়ীর এই দৃষ্টান্তলো কম বিষয়ের নয়।”

শ্রামাকান্ত বলিলেন, “কিন্তু মাত্র তিন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীদের অচকল মালম্ভী হলেন চকলা। তখন গনী পেয়েছেন দুর্ধ্যোধন চৌধুরীর পৌত্র দুর্জয়নারায়ণ চৌধুরী—তিনিই এই চৌধুরী-বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নামেও যেমন ছিলেন দুর্জয়, কাজেও ছিলেন তেমনি দুর্জয়। তাহার অজ্ঞাতারে সমস্ত জমিদারীর ভিতর উঠিয়াছিল হাহাকার। তাহার ভয়ে কেঁহ হুমকী তরুণীকে বধুরূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। কি জানি কখন দুর্জয়-নারায়ণের দৃষ্টি বধুটির উপর পড়ে। কাহারও গৃহে হুমকী কল্যাণিকলে সে নিত্য প্রভাতে কল্যায় মুতাকামনা না করিয়া জল গ্রহণ করিত না। একবার কাহারও উপর দুর্জয়নারায়ণের দৃষ্টি পড়িলে আর তাহার রক্ষা ছিল না। নামে, কাজে, শক্তিতে, আকৃতিতে দুর্জয়, দুর্জয়নারায়ণ সেই দিনই সন্ধ্যাকালে সেই তরুণীকে তাহার প্রমোদ-কক্ষে পাঠাইবার জন্ত শিবিকা এবং তরুণীর স্বামী অথবা পিতার প্রতি হুকুমনামা পাঠাইয়া দিতেন। মহাল পরিদর্শন করিতে যাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য পথ বাহির হইলেই দুর্জয়-নারায়ণের আগে আগে বাহির হইত অজ্ঞাতারী সহস্র গোড়নগুয়ার। সন্ধ্যার গিছনে তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া মুলকী চালে দেখা দিত কালাপাহাড়—দুর্জয়-

দ্রাক্ষারণের প্রিয় হস্তী, মেঘের মত কালো রং, পাছাড়ের মতই বিরাট বপু, সুবর্ণমণ্ডিত হৃদয়ী শুভ্র দন্ত, সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে থাকিত যুদ্ধবাজ—দামামা, নাকাড়া, টিকারা—ডু ডুম ডু ডুম ট্রাম...পথচারীদের পথ ছাড়িয়া দিবার সঙ্কেত। রাজার সঙ্গে প্রজা একসঙ্গে পথ চলিতে পারে না। আজিও লোকে দুর্জয়নারায়ণের নামে ভয়ে শিহরিয়া উঠে।”

“তখন বাংলার নবাব বুদ্ধ আলীবর্দী খাঁ। বর্গীর অত্যাচারে সারা বাংলা সমস্ত। অমন যে দুর্জয়নারায়ণ তিনিও মারাঠা দস্যুদের ভয়ে তাঁহার বাবতীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া ফেলিলেন। কোথায় যে রাখিয়াছিলেন, মুতাকামল তাহার কোন সন্ধান বলিয়া বাইতে পারেন নাই। সেই চৌধুরীদের পতন আরম্ভ হইল। অপরিমিত ধনরত্নের অভাবে চৌধুরীদের পূর্বকার ভৌলুশ আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিল না।”

বিস্ময়-মুগ্ধ অধ্যাপক একমনে স্তম্ভিত ছিলেন। চোখের সামনে ভাসিতেছিল, অতীত যুগের অলিখিত ইতিহাস। গোলাকার আকাশচুম্বি গম্বুজের উপর নিশীথ রাত্রে দূরবীক্ষণ যন্ত্রহস্তে বসিয়া জ্যোতির্বেত্তা করিতেছেন, গ্রহ তারাগুলোর সংখ্যা আয়তন নির্ণয়, দুখনারর বাপীতটে শত হুন্দরী তুলিয়াছে আনন্দের কল-উচ্ছ্বাস...সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারে কোন এক হুন্দরী হস্ত-ভাগিনীকে দুর্জয়নারায়ণের প্রেমদ-কক্ষে আনিবার জন্য নিঃশব্দে চলিয়াছে, কিংবাণে আবৃত শিবিক...রাজপথে চলিয়াছেন দুর্জয়নারায়ণ...আগে পিছে সহস্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা...বন্ধুধনীর প্রবাহকে শীতল করিয়া তাহার রণ দামামা বাজিতেছে—ডু-ডুম ট্রাম—

শ্রামাকান্ত বলিলেন, “তবে তাঁর একটা গুণ ছিল। তিনি ছিলেন মশু তান্ত্রিক—বিস্মিত অধ্যাপক বলিলেন, “তান্ত্রিক?” গর্ভগরে শ্রামাকান্ত বলিলেন, “হাঁ, এমনি যা তা করে সাধনা করেন নি, রীতিমত পঞ্চমকার দিয়ে করতেন উপাসনা, এমন কি পঞ্চ-মণ্ডির আসনে পারতেন বসতে। আর চেহার ছিল কি...হঠাৎ দেখলে, কাপালিক বলে মনে হ’ত। ওই যে দেয়ালের গায়ে ছবি দেখতেন—ওই তাঁর ছবি—”

অধ্যাপক ফিরিয়া দেখিলেন। সত্যিই কাপালিক বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকাণ্ড দেহ...মাথায় হৃদয়ী কুণ্ডিত কেশ...মুখমণ্ডলে শদৌর্ঘ্য খাম্বারাজী দ্বারা আচ্ছন্ন, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র...গলার রক্তাক্তের মালা। শ্রামাকান্তের কেশ বেশও সেইরূপ। অধ্যাপক একবার ছবির দিকে, একবার শ্রামাকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তিনিই আপনাদের আদর্শ।”

শ্রামাকান্ত হাসিলেন, ঈশং লজ্জিত ভাবে বলিলেন, “ওই চেহারাতেই যা দেখতেন নয়তো সাধনার দিক থেকে আমি তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নই। একটু আধটু চর্চা করি নয়তো তাঁর আসন গুলোতো আজও রয়েচে, আমার সাধা কি যে তাতে বসি।”

“কেন পারেন না।”

“আজুড়ে মেরে ফেলবে না।”

প্রকৃত সিদ্ধ সাধক ভিন্ন কেহ সে আসনে বসতে পারে না। বসিতে ভয় পায়। এমন কি সময় সময় আসনোপবিত্ত ব্যক্তির প্রাণ পর্যন্ত আসন ভিতরস্থ নরকরোটির অশ্বারী আত্মাধারা নিহত হয়। বসিতে না পারায় কারণচক্র ব্যস্ত করিয়া শ্রামাকান্ত বলিলেন,—তিনি নিজে হতে বসতে পারেন নি। প্রথম দিন আসনে বসবার সময় তাঁর গুরুদেব তান্ত্রিকাচাৰ্য্য নিগমানন্দ আগমবাগীশ তাঁর মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন—

অধ্যাপক একমনে স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে হয়ত অবিখ্যাসের রেখাও আসিয়া পড়ে। ইতিহাসের অধ্যাপক তিনি—প্রত্নতাত্ত্বিক তিনি। শিলা-লিপির পৃষ্ঠে উৎখাত লেখ পাঠ করিয়া বলিতে পারেন সেখানি কোন রাজার আমলের শিলালিপি, তান্ত্রিকলক হাতে লইয়া বলিতে পারেন সেখানি কাহার অমুশাসন। ত্রি-শক্তিই তবু তাঁহার কাছে দুর্কোষ বিঘর। তথাপি

কৌতুহলী হইয়া গিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আসন দেখাতে পারেন—বানে আমরা দেখতে পারি—?”

“বহুল্প—আমর আমার সঙ্গে।”

ভূগ-শুদ্রলতা-আচ্ছাদিত শুড়িগুণ। সে পথ দিয়া আগে আগে চলিলেন শ্রামাকান্ত, পিছনে অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, সকলের পশাতে হুমিল। বনের কীকে কীকে উঁকি মারিতে থাকে প্রাচীন শিল্পকলা—হৃণতিবিভা...প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত। তারি চতুর্দিকে ছাগলের নাদি, আর গরুর চোনার আশ্রয়। ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরাল থেকে মানুষের মল করে সুগন্ধ বিস্তার।

একটা নাতিউচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত স্তম্ভের নিকট আসিয়া অধ্যাপক বলিলেন, “এটা কি কোন স্মৃতিস্তম্ভ?”

শ্রামাকান্ত হাসিলেন, বলিলেন “হ্যাঁ তা স্মৃতিস্তম্ভ বলতে পারেন। তবে এও সেই দুর্জয়নারায়ণেরই দোদীর্ঘ প্রতাপের স্মৃতিচিহ্ন। বিজোহী প্রজার কঠকে চিরদিনের মত শুরু করে দিয়েছিলেন—পাষণ-স্তম্ভের অন্তরালে লোকটার হয়েছিল জীবন্ত সমাধি।”

“হু”—বলিয়া অধ্যাপক অগ্রসর হন।

যেতপাথরের তৈয়ারী করেকটি বেদী। প্রত্যেক বেদীর চারিদিকে পাথরের তৈয়ারী জবার কেয়ারী সার্ব দুই শতাব্দীর প্রচণ্ড আঘাতে জবাগুলির দল ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই। শ্রামাকান্ত বলিলেন, “এই সেই আসন”—আসনের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক বলিলেন, “ওখানটা অমন কালো কেন?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শ্রামাকান্ত বলিলেন, “বানে চতুর্ভুজের চারটি পুঙ্খ-বর করেটি, আর মাঝখানে দিতে হয় এক ব্যক্তিচারিণী চণ্ডাল রমণীর করেটি—ওটি, সেইটি।”

অধ্যাপক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। শতাব্দীর অন্তরাল হইতে স্তম্ভে পান শতশত হস্তভাগের মর্ষণভেদী আর্ন্তনাদ, চোখের সামনে ভাসিতে থাকে স্বপ্নময় কবজের প্রতীমুর্তি...সত্যিই অন্ধদেশে বহিয়া ঝরিতেছে রক্তধারা ..

...

...

...

বিদায়কালে অধ্যাপক বলিলেন, “নৃশল হুমিল, ওই কালো পাথরের স্তম্ভটার ওপর আমার সন্দেহ হয়। সত্যিই হয়তো ওটার ভেতর কাউকে সমাধিস্থ করা হয় নি। আমার বিশ্বাস ওটার ভেতর এমন কিছু গুপ্ত-ভাবে রাখা হয়েছে, যা আবিস্কৃত হলে একটা মশু গুলটপালট হয়ে যাবে। খুব সম্ভব দুর্জয়নারায়ণ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ওইখানেই লুকিয়ে রেখেছেন। লোকের মনে ধাঁধা হঠক করার জন্তে একটা মিথ্যা গল্প প্রচার করেছিলেন, কথাটা মিথ্যা নাও হইতে পারে। হুমিল লাফাইয়া উঠিল। সপ্ত পুরুষের বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার তাহার করায়ত্ত না হইলেও এমন কিছু উহার ভিতর হইতে আবিস্কৃত হইতে পারে যাহা অখ্যাত ভাষাকে লইয়া যাঁইবে খ্যাতির উচ্চ শিখরে। হয়ত বাংলার ইতিহাসের বর্গীর হাদ্যমার পৃষ্ঠাখানি আবার নুতন করিয়া লিখিতে হইবে। শ্রামাকান্তের কাছে এই স্তম্ভ ভাঙ্গি-বার অহুমতি চাহিল।

শ্রামাকান্ত অহুমতি দিলেন। পুরুপুরুষের কীর্তি সবকিছু তাহার কৌতুহলও বড় কম নয়। নির্দিষ্ট দিনে গাঁতি হাতে আসিল পাথরকাটার দল। হুমিল তাহাদের কাজে লাগাইয়া দিয়া অনতিদূরে একটা প্রস্তর-নির্মিত বেদীর উপর বসিয়া থাকে মুখেচোখে তাহার খেলা করিতে থাকে আশা ও উৎসাহের দীপ্তি।

প্রস্তর স্তম্ভ—লোহার গাঁতির আঘাতে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। অব্যক্ত আর্ন্তনাদের মত একটানা একটা শব্দ উঠিতে থাকে—চ-চঙা-চ-হুমিলের অন্তরে ধমনীর স্পন্দন বাড়িতে থাকে। মনে হয় গুপ্ত স্থান হইতে লুপ্ত ইতিহাস তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

পাখর খুলিল। একখানা, দুইখানা—তারপর সবটা। কিন্তু সবটা খুলিয়া পড়িতেই পাখরকাটার দল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। হুবিমল ব্যস্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “কি—কি”—তাহারা শুধু হাত তুলিয়া দেখাইয়া দিল।

অন্তর তন্তর অন্তরে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কাল। তাহার পদতলে যেহ—গিনি কাঠের তৈয়ারী একটা ব্যস্ত এবং কালো শবের মত কতকগুলি কি! হুবিমল আশ্রয় সহকারে ব্যস্ত তুলিয়া লইল। আড়াই শত বৎসরের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় জীর্ণ ব্যস্ত সহজেই খুলিয়া যায়। ভিতর হইতে বাহির হইল তুলসী কাগজের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। তাহাতে বড় বড় পরিষ্কার অক্ষরে কি যেন লেখা। হুবিমল পড়িতে লাগিল।

...

...

...

আড়াইশত বৎসর পূর্বকাল এক ঘন ‘দ্রুহোগম্য’ বর্ণনামূলক রচনায় লিখিত ইতিহাস—লেখক স্বয়ং দ্রুহুগম্যনারায়ণ চৌধুরী। হুবিমল পড়িতে থাকে—আমার রক্ষিতা চণ্ডালিনী যখন সন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল, তখন সেই দ্রুহোগম্য গভীর নিশাথে আমি একাকী সত্যই বিপদে পড়িলাম। প্রথম চিন্তা কি করিয়া নিজের এই দুঃপনয় কলঙ্ক গোপন করিব—দ্বিতীয় চিন্তা কি করিয়া এই সন্তানকে শিশুর প্রাণ রক্ষা করিব। উপায়ান্তর না দেখিয়া গুপ্ত পথে প্রাসাদে ফিরিলাম। সেখানে আসিয়া বিশ্রমে শুক হইয়া গেলাম। গৃহিণী মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অচেতন পাক্ষে তাহার প্রিয় পরিচারিকা যমুনা। গৃহিণী মৃতবৎসা—তাহার একটি সন্তানও জীবিত নাই। তিনি অসুস্থতায় তাহা জানিতাম, কিন্তু তাঁর বলিয়া ঠিক আজই এই সময়ে প্রসব করিলেন। বৃষ্টিলাম ইহা মা ব্রহ্মদেবী ইচ্ছা। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার কর্তব্য স্থির করিলাম। সেট মৃত শিশুকে লইয়া যমুনা আমার অনুসরণ করিতে বলিলাম। তারপর গুপ্ত পথে পুনরায় প্রাসাদ-কক্ষে ফিরাই গিয়া মৃত চণ্ডালিনীর পাখে সেট মৃত শিশুকে রাখিলাম; আর তাহার সন্তানকে লইয়া গেলাম মুচ্ছিত। গৃহিণীর শব্দা-পাক্ষে। কেত সে কথা জানিল না। জানিলাম শুধু আমি—যমুনা আর ভগবান বলিয়া যদি কেহ থাকেন তাহা তিনি। আমি একথা কাহাকেও বলিব না—ভগবান নিকাক—কিন্তু যমুনা? তাই রাত্রির অবসান হইবার পূর্বে তাহার কণ্ঠে চিরদিনের মত শুক করিয়া দিলাম, এই পাখর-তন্তর অস্তরালে। আর এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম—ভবিষ্যতে কেহ এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে এই আশায়। ব্যাভিচারিণী চণ্ডাল-রমণীর মস্তক নিক্ষেপ করিলাম, আমার পক্ষমুণ্ডর আসন মধ্যে। পরদিন

প্রাত্যে সকলে শুনিয়া গত রাত্রের আমার পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে। মহাসমারোহে নবজাত পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইল। শিশুর নাম হইল—রাবণেশ্বর চৌধুরী—”

...

...

পড়া শেষ করিয়া হুবিমল ডাকিল—বাবা—

অন্ধর মহল হইতে শ্রামাকান্ত উত্তর দিলেন, কিয়ৎ বেগল নাকি কিছু—বলিয়া, “তার ব্রহ্মদেবী”—নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পুত্রের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুবিমল নত মস্তকে তাহার হাতে সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তুলিয়া দিল। বিস্মিত শ্রামাকান্ত হুবিমলের হাত হইতে তাহা লইয়া পড়িতে শুরু করিলেন। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখে ঝোঁতুল ও আগ্রহের ভাব দেখা দিল। তারপর ক্রমশঃ তাহার মুখ গভীর ও আরক্ত হইয়া উঠিল। পড়া শেষ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্তর তন্তরদিকে আগাইয়া গেলেন। একবার শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর কঙ্কালের পারশ্বস্থ পাতত ধূসর “শন”গুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশ বুঝা যায় রমণীর কেশরাশি। স্বর্গীয় কালের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় আজ ধূসর—বিবর্ণ, কিন্তু একদিন তাহা ঘন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছিল। শ্রামাকান্ত ফিরিলেন। গভীরভাবে বলিলেন,—ব্যাভিচারিণী চণ্ডালিনীর সন্তান, রাবণেশ্বর চৌধুরী—চৌধুরী বংশের চতুর্থ পুরুষ...হঁ...তিনি আমার প্রপিতামহ—বলিয়া খটখট করিয়া খড়মের আগুয় করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। সে শব্দ চৌধুরী বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের প্রতি রক্ত, রক্ত, প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেন কোন এক অশ্রুগর্ভ ব্যস্তের অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, ‘হা-হা-হা’।

হুবিমল স্থানুর মত বসিয়া থাকে। ইতিহাস—প্রাচীন সাকী—অজীত কালের মোনদেবতা—কথা কও। একবার বল যে, ইহা মিথ্যা। তুমি সত্য—মৃত্যুর মতই সত্য কিন্তু কিছুতেই তোমাকে আলোকের সমুখে প্রকাশ করা যায় না। যে অভিশপ্ত আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাখর প্রাচীর অস্তরালে অবরুদ্ধ থাকিয়া গুমরিয়া মরিতেছিল, সে আজ সহসা যেন মুক্তি পাইয়া কোষমুক্ত শাণিত ভরবারির আঘাতে চৌধুরী-বংশের মিথ্যা গর্ভকে খুলিয়া করিয়া বিজয়োল্লাসে অট্টহাসি হাসিতেছে।

দূরে হুবিমলের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পাখরকাটার দল। বিস্মিত, কিন্তু স্থির; অচঞ্চল...যেন সারিবদ্ধ কালো গ্র্যানাইটের তৈয়ারী গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মূর্ত্তি। হুবিমল মাথা তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিতেও পারিল না।

পাশাপাশি (গল্প)

ফুল আর কাঁটা তিনে যতই অসঙ্গতি থাকে না কেন, প্রকৃতির বাজ্যে এক সাথে তাদের দর্শন পাওয়াও হুলভ নয়, এক শাখাতেই তো থাকে গোলাপ আর কাঁটা; যে মৃণালে পদ্ম ফোটে কাঁটাও তো থাকে সেই মৃণালে।

তাঁই ত্রিভুজ অটালিকাব পাশে ছোট খোলায় ঘণনা নিতান্ত বেমানান হলেও, পবনস্পর্শ থেকে খুব দূর দক্ষাও তানা করে নি। তবু পাছে বা ত্রিভুজবাসীদের চোখে নিঃশব্দ ঘণনাবিন্দ অস্তিত্বিত দৈর্ঘ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যায়, সেজ্ঞাই বোধ হয় গুরদরজা-জানালগুলোকে তৈরী করা হয়েছিল যথাসম্ভব ক্ষুদ্র আকারে; আর সে নিজে,—তারই চোখে সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ঐখণ্ডের ওই বিরাট প্রতীকের সঙ্গে তুলনায় আপনার দারিদ্র্যকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

শ্রীনিরঞ্জন গুপ্ত

এই ছুটি বাসস্থানের মত এদের অধিবাসীদের মধ্যেও ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয় স্থানের অধিবাসীদেরই ছিল কণ্ঠের উপযুক্ত ছুটি বাহ্য আবহুভবের উপযুক্ত একটা হৃদয়। প্রাসাদের অধিবাসিগণ এই অসামঞ্জস্যের লজ্জা ঘূচাবার জ্ঞাই বোধ হয় বেশভূষায়, আহাবে-বিহারে এবং কথাবার্তায় কুটীরবাসীদের সঙ্গে নিজেদের স্বাভাবিক যথাসম্ভব বজায় রেখে চলত।

কুটীরবাসী মজুরী যখন দিনের পরিশ্রমের পর অপরিচ্ছন্ন দেহ আর শ্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরত, তখন প্রাসাদের অধিবাসীরা সাবানমাখা ও পাউডারঘসা দেহে নিজেদের মূল্যের চেয়ে মূল্যবান পোষাক এঁটে সেখান দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে যাবার সময় যেন একথাই প্রমাণ করে যেত যে, কুটীরবাসী আর প্রাসাদবাসীদের

মধ্যে পার্থক্য ওই কুটীর আর প্রাসাদের মতই তুল্য। কুটীর-বাসীরাও তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি বিমিত্র ও সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে কথা যেন নীরবেই মেনে নিত, জানত না তাবা যে বিধাতার সৃষ্ট মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই—প্রভেদ মানুষেই সৃষ্ট প্রাসাদে ও কুটীরে।

প্রাসাদ আর কুটীর! কাছাকাছি থেকেও তারা পরস্পর থেকে কত দূরে!...রোজ ভোরবেলা প্রাসাদের একটা সুপ্রশস্ত কক্ষে একখানি টেবিলের সম্মুখে বসে স্বামী-স্ত্রী যখন প্রাতরাশের আনন্দ উপভোগ করে তখন কুটীরেব অধিবাসী মজুরটি লুণ দিয়ে চাবুটা পাস্তা খেয়ে তার দিনমজুরীতে বেরিয়ে যায়, আর রাত্রে প্রায়ই বধন তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে এসে বউকে ধবে আচ্ছা কবে ঠেকানি দেয় তখন প্রাসাদের আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে বেড়িয়ে গান জাগে—“আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে”...

প্রাসাদের মহিষী-সুমিত্রা! আর লক্ষ্মী? সে-ও তার কুটীব-রাজ্যের রাণী বই কি!...মাঝে মাঝে তেতলাব ঘবে যখন নপুংসের শব্দ জেগে ওঠে, লক্ষ্মী কোঁতুহলী হয়ে তাব ছোট্ট জানালাটাব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—তেতলাব উন্মুক্ত জানালার পানে তাকিয়ে থাকে। নৃত্যরতা-সুমিত্রার দেহখানি এক একবার জানালাব চিত্রণ দিয়ে দেখা যায়, পরক্ষণেই আবার আড়ালে চলে যায় নৃত্যের তালে তালে। লক্ষ্মী মনে মনে ভাবে স্বর্গ কি ওই প্রাসাদের চেয়েও ছলভ, দেবকন্ডা কি নৃত্যরতা ওই তরুণীর চেয়েও সুখী?

সুমিত্রা আর লক্ষ্মী দুজনেই কাঁদছিল। সুমিত্রা কাঁদছিল মূল্যবান খাটের বুকে বিস্তৃত ততোধিক মূল্যবান বিছানাব উপর এলিয়ে পড়ে। হুঁহাতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে সে কাঁদছিল। ক্রন্দনের বেগে পরিধানের মূল্যবান শাড়ীর ভাঁজগুলো বেঁপে বেঁপে উঠছিল—এলো খোপাটা ভেঙ্গে স্তগন্ধে ঘব গিয়েছিল পূর্ণ হয়ে।

লক্ষ্মীও কাঁদছিল। ঘরেব মাঝে পা ছড়িয়ে বসে বেশ শব্দ করেই সে কাঁদছিল। কিন্তু তার কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল কোলের শিশুটাব সুউচ্চ ক্রন্দনের বোলে।

সুমিত্রা কাঁদছিল স্বামীর উপর তাঁর অভিমানে। শুধু অভিমানই বা কেন দুঃখও তাব অপরিণীম। নারীর জীবনে সে আঘাত সব চেয়ে মর্মান্তিক সুমিত্রা সেই আঘাতই আজ পেয়েছে। ধীরে ধীরে মাথা তুলে সুমিত্রা। অশ্রুধারা শিমালীভূত গালের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ‘লিপ্টিক’-মাথানো চোঁট স্পর্শ করেছে। হাতের কোমল কমলাখানা দিয়ে সাবধানে সে অশ্রুধারা মুছে ফেললে।

কিন্তু অশ্রুধারা মানে কই। তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা যে কতটুকু সে পরিচয় আজ সুমিত্রা পেয়েছে। পেয়েছে বৈ কি! নইলে তার এত অহুরোধ তিনি কেনন করে উপেক্ষা করলেন। স্বামীর সন্তিকার ভালবাসা সুমিত্রা পায় নি। তার প্রতি স্বামীর এত আদর-যত্ন, তাঁর সপ্রেম বাণী ও সন্তোষ ব্যবহার সবই ছলনামাত্র—সবই প্রবঞ্চনা।

‘কারণটা গুরুতর। বহুদিন থেকেই বন্ধু বাসন্তী সুমিত্রাকে অহুরোধ জানাচ্ছিল তার ওখানে গুকে একবার যাবার জেগে। দু’

তিন দিন নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণও করেছিল তাদের। কিন্তু স্বামীর সময়েব অভাবেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারার অভদ্রতা সুমিত্রাকে স্বীকার করতে হয়েছে। বাসন্তী সুমিত্রাব সহপাঠিনী। বিয়ের পূর্ব এক সহবে থাকা মধ্যেও উভয়ের দেখা হয় নি আর।

সেদিন সকালে অপ্রত্যাশিতভাবে বাসন্তী এসে সুমিত্রাকে বিমিত্র ও আনন্দিত করে দিলে। প্রাথমিক অভ্যর্থনা সাদৃশ্যে সুমিত্রা বললে, “এক! আসিস্ নি নিশ্চয়। সঙ্গেব ভ্রমলোকটাকে কোথায় বেখে এলি?”

বাসন্তী আঙ্গুল দিয়ে মোটরবেল দিকে দেখিয়ে দিলে হেসে বললে, “গাড়ী পাঠাবা দিচ্ছন।”

“আব গাড়ী পাঠাবা দিয়ে কাজ নেই—গাড়ীর অধিকারিণী-টাকেই এসে পাঠাবা দিন। আমি একে পাঠাচ্ছি ডেকে আনবার জেগে।”

চা খাওয়া উপলক্ষ্য কবে সকলে টেবিল ঘিরে বসে হাসিকলরবে আনন্দ-পবিত্রাসে আবগাওবারে মধুময় করে তুলল।

বাসন্ত, বললে, “আমাকে একেবারেই ভুলে গেছিস সুমি, অবশ্য ভোলাব কথাই।” বলে সুমিত্রার স্বামীদিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলে।

সুমিত্রাব ওঠপ্রাশ্তে মৃদু হাসির ঈষৎ আভা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগেই সে বললে, “ভুলে গেছি এ খবর তোকে কে দিলে?”

“সে জানাই যায়”—বাম জু কুণ্ঠিত করে বাসন্তী বললে, “তিন দিন নেমন্তন্ন করলুম, অন্তরোধ জানালুম, গাড়ী পাঠিয়ে দিলুম, তবু একদিনও তোব দেখা মিললো কি? অগত্যা আমাকেই আসতে হ’ল। অবশ্য বিয়ে করলে সবাই এ-বটা কবে স্বামী পায়, কিন্তু তোর মত বন্ধুদের বেউ বিস্ময় বরং বলে জানা নেই।”

সুমিত্রাব স্বামী সাহিত্যিক। তিনি বাসন্তীদেবীকে লক্ষ্য কবে বললেন, “এটা কি কানোন? ‘ভুলে থাকা, নয় তো সে ভোলা, বিস্মৃতির মধ্যে বসে বসে মোর দিচ্ছে দে দোলা’।”

বাসন্তীর স্বামী অন্ধ্রব প্রযোয়। কবিব্রের চেয়ে হিসাব-নিকাশটাই তিনি বোধেন ভাল, তাই বললেন, “আমাদের যুগল আগমনের সম্মান রক্ষাব জেগে আপনাদের কিন্তু একবার যুগল-মর্দিতে room visit দেওয়া উচিত।”

সুমিত্রা সাগ্রহে বললে, “নিশ্চয়! দেব বৈ কি। আজ আসছে বোবাব বিবেলেই—বি বল?” বলে সুমিত্রা স্বামীর অন্তর্ভুল উত্তর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

স্বামী হেসে সম্মতি দিলেন, “বেশ হে! এতে আর আপত্তি কি আছে।”

নির্দিষ্টদিনে যথাসময়ে সাজসজ্জা সেরে দু’জনে যখন বাইরে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় টেলিফোন খর্চা সহসা বেজে উঠল। সুমিত্রা স্বামীর টেলিফোন ধাব থাকে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সাজসজ্জা আব একবার যাচাই কবে নিতে লাগল।

স্বামী দিগে এসে জানি বলে বললেন, “এ-বটা বড্ড ভুল হয়ে গেছে, মিছা।”

জিজ্ঞাসদৃষ্টিতে তাকাতাই স্বামী বললেন, “আজ সম্মায় আমাদের একটা বিশেষ জরুরী সাহিত্যসভা হবার কথা আছে।

আমি একেবারেই ভুলে ছিলাম, ওরা টেলিফোনে জানালে যে সবাই আমার জন্তে অপেক্ষা করছে।”

“তুমি জানিয়ে দিয়েছ যে যেতে পারবে না?”

“তা হয় না সুমিত্রা। আমি আগেই ওদের কথা দিয়েছিলাম, আমার ভরসাতেই বিশেষ করে এ সভার আয়োজন হচ্ছে। আমি না গেলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে।”

“তাহলে কি করতে চাও?” সুমিত্রার নয়নকোণে প্রশ্নময় দৃষ্টি।

“আমাকে যেতেই হবে। তুমি কিছু মনে করো না মিত্রা আজ না হয় তুমি একাই যাও, আর একদিন হুজুনে যাওয়া যাবে। কি করি বল? আগেই কথা দিয়ে ফেলেছি।”

“আর আমার কথার কি একটা দাম নেই?” সুমিত্রার আচত কণ্ঠ করুণ তীব্রতায় ছড়িয়ে পড়ল, “বাসন্তীকে কথা দিয়েছি, এখন যদি না যাই কি লজ্জার বিষয় হবে ভেবে দেখেছ?”

“ভেবেই বলছি মিত্রা, আমি সভায় না গেলে তার চেয়েও বেশী লজ্জার কারণ হবে।”

সুমিত্রা স্তব্ধ হ’য়ে দাঁড়িয়ে রইল। জড়োয়া গহনা আবর্জনা শাডী যেন বিকিমিকি হাস্তো তাকে বিদ্রূপ করছিল।

সুমিত্রা কাদবে না তো কি? তার সম্মান, তার অনুরোধ অপেক্ষা স্বামীকে কাছে বড় ভাল সাহিত্যসভা ও বন্ধুদের সাহচর্য। তার প্রতি স্বামীর এতদিনকার ভালবাসা সকল অভিনয়, সকলই ছিলনা! আবাব বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল সুমিত্রা।

লক্ষ্মী কাদছিল ক্ষুধায়। নিজেব ক্ষুধাব জ্বালায় ততটা নয়—যতটা ক্ষুধার্ত শিশুর নিষ্ফল ক্রন্দনের বেদনায়।

সকাল বেলা সেই যে পাশ্চাত্যে লক্ষ্মীর স্বামী দিনমজুরীতে বের হ’ল—সেদিন সাবা দিনরাত্রি এবং পরদিন সমস্তটা দিনেও আব তাব দেখা মিলল না। ঘরে থাকার কিছুই ছিল না, কিন্তু ক্ষুধা-দানব সে-জন্ত বিন্দুমাত্র দয়া প্রকাশ তো করলেই না বরং উপহাসের স্ত্রয়োগ বুঝে যেন আনন্ড প্রবলভাবে নিজের শক্তি প্রকাশ করতে লাগল। লক্ষ্মী সহ্য করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু শিশুটা নৈদে সারা হ’ল। বৃকে স্তম্ভ তার শুকিয়ে গেছে, তবু শুক স্তম্ভটা শিশুর মুখে দিয়ে সে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেও কি সম্ভব! এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেলে, লক্ষ্মীর মনে পড়ল—একটা সিকি সে খোকার জন্ত মানস করে লুকিয়ে বেগেছিল। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে লক্ষ্মী উঠে পড়ল, কিছুক্ষণ খুঁজে পেতে বের ক’বে আনল সিকিটাকে। কিন্তু এ যে মানতের সিকি! যদি খোকার কিছু অমঙ্গল হয়। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বাকি আছে, থোকা যে না খেতে পেয়েই মরে যাবে। সিকিটা হাতে নিয়ে সে বের হবার উপক্রম করল। নিজের জন্ত কিছু ভাবে না সে, কিন্তু খোকার জন্তে একটু দুঃখ তাকে কিনে আনতেই হবে।

সহসা ঝড়ের মত তার স্বামী এসে ঘরে ঢুকল। চোখ ছুটো রক্তবর্ণ—চলন্তলো রক্ত—এলোমেলো—সে এক ভয়াবহ মূর্তি। লক্ষ্মী মুহূর্তের জন্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল, পরক্ষণেই চিংকার ক’বে

বললে—“হ্যাঁ গা, তোমার আকেশখানা কি রকম? দু’দিন ধ’রে কোথায় ছিলে? ছেলেটা যে না খেয়ে আধমরা।”

স্বামী সে কথার জবাব না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—“কোথায় যাচ্ছিল তুই?”

স্বামীর মেজাজে লক্ষ্মী অবাক হ’ল, বললে, “ছেলের জন্ত দুঃখ আনতে।”

“পয়সা বের কর, আমার দরকাব আছে,” বললে স্বামী,—তার চোখ ছুটোতে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। দরকাব তাব সত্যিই ছিল। দু’দিন ধ’রে সে কিছুই রোজগাব করতে পাবে নি, তাড়িও খেতে পায় নি এককোঁটা।

“আমি পয়সা কোথায় পাব?” লক্ষ্মী সিকিটা লুকোতে চেষ্টা করলে।

স্বামী গর্জন করে উঠল, “ছেলেব জন্ত দুঃখ আনতে যাচ্ছিল; পয়সা ছাড়া কোন বাক্স তোকে দুঃখ দিত শুনি। দে বলাছি, আমার মেজাজ ভাল নেই।”

রকম দেখে লক্ষ্মী ভয় পেল, বললে, “ভিক্ষে মেগে আনতুম, পয়সা কোথায় পাব।”

কিন্তু স্বামীর তীব্র দৃষ্টি প্রয়োজনীয় পদার্থটাব সন্ধান পেয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে সে লক্ষ্মীর হাত চেপে ধরল, বললে, “এখনো দে বলছি।”

লক্ষ্মী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক’বে বললে, “ছাড়া ছাড়া, ছেলে মরে যাচ্ছে—আর তুমি চাইছ তাড়ি খাবাব পয়সা।”

পাগলের মত হেসে উল্ল শিশুর পিতা। জোব ক’বে সিকিটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার ঝড়ের নতই সে বের হ’য়ে গেল। তার প্রবল ধাক্কায় উপবাসরঞ্জে লক্ষ্মী বে শক্ত মেঝেব উপর সজোবে নিষ্কপ্ত হয়েছো তা সে লক্ষ্যও করলে না।

উঠে বসে মেঝে পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ ধবে লক্ষ্মী নাদলে। আবাত পেয়ে কপালটা তাব ফুলে উঠেছিল, তবু কেটে গিয়ে রক্ত বেরোয় নি। শিশুটা কাদছিল অবিশ্রান্তভাবে, কাদতে কাদতে গলা যেন তার ধবে এসেছিল।

চঠাং কি মনে হল লক্ষ্মীর। ছেলেটাকে বৃকে নিয়ে সে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল, চলতে চলতে দাড়াতে গিয়ে ওই ত্রিতল প্রাসাদের কাছে। মুহূর্তমাএ ইতস্ততঃ কবে লক্ষ্মী সোজা উপরে উঠে গেল।

সুমিত্রা তখন ঘর ছেড়ে সামনেব খোলা বাবান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল,—জলভরা দু’টা চোখের উদাস দৃষ্টিকে স্তম্ভে প্রসারিত করে দিয়েছিল সে। লক্ষ্মী তার সামনে গিয়ে ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে বললে, “মা, কিছু খেতে দিন আমার ছেলেকে, নইলে ও মরে যাবে।”

সুমিত্রা অভিমানভরা উদাসকণ্ঠে বললে, “আমার কিছু দেবার কোন অধিকার নেই গো, আমি এ বাড়ীর কেউ নই।”

অবাক হয়ে লক্ষ্মী শুধু বললে, “সে কি মা?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা বুঝবে না—কেউ বুঝতে পারবে না আমার দুঃখ।” বেদনায় ভারী হ’য়ে এল সুমিত্রার কণ্ঠ। “যাও,

নীচে যাও, আমার বিরক্ত করো না। আমার দুঃখ তোমরা কি বুঝবে?”

নিরীক্ষাকৃৎ হয়ে দাঁড়িয়ে বইল লক্ষ্মী। বলবার তাব অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু প্রকাশের ভাষা তাব কোথায়? কোন ভাষায়? সজানাবে, “ওগো দুঃখিনী, তোমাব দুঃখ শুধু বিলাস, আর আমাব দুঃখ নির্মম, নিষ্ঠুর প্রয়োজন।”

নিজের ঘবে দিবে এসে লক্ষ্মী পাথরের মত বসে বইল। অবিশ্রান্ত ক্রন্দনরাস্তা শুউটাব কণ্ঠ হ’তে এখন আব স্তবীর নম্র-ভেদী স্বর জাগছিল না—জাগছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা অস্ফুট কাতরোক্তি। লক্ষ্মীও আর কাঁদছিল না, বসেই ছিল নিশ্চল হ’য়ে।

ধীবে ধীবে অন্ধকার ঘনিষে এলো। লক্ষ্মী আলোটাও জ্বাললে

না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে সে যেন লুপ্ত ক’রে দিতে চাইছিল।

তর্কাত্ত জানালার দিকে নজর পড়তেই লক্ষ্মী উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর শত দুঃখ-দুর্দশাকে উপেক্ষা ক’রে জ্যোৎস্নাব সে কি হাসি! তেতলার জানালার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সে দেখতে পেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছ’টা নরনারী।

স্মিত্রা আব তার স্বামী। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোব নেশায় আব স্বামীর অনুতাপমাখানো আদর্শে স্মিত্রাব সব দুঃখ—সব অভিমান নিঃশেষিত হ’য়ে গিয়েছে। তা’রা দু’টিতে দাঁড়িয়ে আছে হাতে হাত বেগে। একটা মুহূর্ত মিষ্টি হাসির ঝঙ্কারও লক্ষ্মীর কাণে এসে আঘাত কবল।

তাড়াতাড়ি আজ সে জানাশাটা বন্ধ করে দিলে।

দেবী চৌধুরাণীর অনুশীলনতত্ত্ব

শ্রীরামশশী কন্দকার

“বঙ্গ ভারতাব সাথে মিলায়ে তোমাব আঁশ গণি,
তাই তব কবি জয়ধ্বনি।”

—ববীন্দ্রনাথ

জাতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, পন্থ ও নৈতিকতায়, সমাজে ও বাজনাতিক্ষেত্রে—সমস্ত দিকে যাহাব মঙ্গলপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, যিনি ভিক্ষার্থী রূপে পূর্বের স্বাবে উপস্থিত বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে আপনাব ঘরে দিবাঁইয়া আনিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালাব প্রাণে অক্লান্ত আলো, সঙ্গীত ও নৈচিত্র্য ফুটিবার অবকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি সবাসাটাব জায় এক হস্ত গঠনকাণ্ডে অপর হস্ত নিবারণকাণ্ডে নিবৃত্ত রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যকে দ্রুত পরিণতি লাভে সমর্থ করিয়াছিলেন, সেই প্রাণতঃস্বর্গায় মর্তনীয়কর্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব অমব লেখনী হইতে যে-সকল সাহিত্য-রত্ন বাহিন হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘দেবী চৌধুরাণী’ব স্থান খুব উচ্চে। ‘দেবী চৌধুরাণী’ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তখন লেখকের বয়স ৪৬ বৎসর। পরিপক্ব মস্তিষ্ক হইতে উনবিংশ বৎসরের সাহিত্যোন্নয়নশীলনের পব ‘দেবী চৌধুরাণী’ প্রসূত হইয়া সংসারধর্মের—পারিবাবিক ধর্মের—সুদৃঢ় মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

‘দেবী চৌধুরাণী’ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাসত্রয়েব অগতম। ভাবাব ক্রটি স্থানে স্থানে লক্ষিত হইলেও ইহাব মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণের নমুনাব অভাব নাই। শিবনাব শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন, “আমাদের দেশেব প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণেব সাধারণ নিয়মামুসারে বঙ্কিমেব প্রতিভাশক্তি পর্যালোচনা বৎসরের পর যেন মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাব ভাষা ও চিত্রাঙ্কনশক্তিব সেই

পূর্বকাল উন্নাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাহার দৃষ্টিও সমুখ হইতে পচাত্তদিকে পড়িতে লাগিল।”

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস ‘সীতাবাম’ ‘দেবী চৌধুরাণী’র প্রকাশেব তিন বৎসর পবে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাব পব বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন—উপন্যাস-রচনাব শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। মতিলাল দাস লিখিয়াছেন—His last novel is Sita-ram. In it we see the decline of the powers of the great artist. Bankim Chandra was conscious of this, so he did not lay his hand in novel-writing hereafter.’

‘সীতাবামের’ সম্বন্ধে যে-কথাটি সম্ভব হইতেছে, তাহা ‘দেবী চৌধুরাণী’ব সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে না হইলেও কতকাংশে যে সত্য, তাহা গ্রন্থপাঠে স্থানে স্থানে দবা যায়। উপন্যাসপাঠে পাঠকের মনে যে উন্নাদনার স্রষ্টি হয়, ‘হুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপাল-কুণ্ডলা’, ‘বয়ধূক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তেব উইল’ এবং ‘রাজসিংহ’ সে-বিষয়ে পরিপূর্ণমাত্রায় সাফল্যলাভ করিয়াছে। ‘দেবী চৌধুরাণী’ নানাবিধয়ে উল্লিখিত গ্রন্থবাজ হইতে বর্ত বিসয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও উপন্যাসেব মাদকতা বহু পরিমাণে তাবাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা পাঠকমাত্রেরই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু চবিত্তস্রষ্টির কাণ্ডে এই গ্রন্থেব মধ্যে বঙ্কিম যে অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্বাে নাবাভেব ভগ্ন যে গৌববময় পদ প্রসূত করিয়াছেন, আজ অন্ধতাব্দীর পবেব প্রগতিবাদী কোন নবীন লেখক পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জীবন্তচবিত্র অঙ্কন করিয়া অনেক আধুনিক উপন্যাসিক নবাবাঙ্গালীব নিকট বাহবা পাইতেছেন, কিন্তু নারীকে গৌববায়িত পদে অধিষ্ঠিত করিতে কেহই অতাপি

সমর্থ হন নাই। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী হইতে আরম্ভ করিয়া 'শেষ প্রস্নে'র শিবানী পর্যন্ত প্রাণান্ত করিয়াও গৌরবলাভ করিয়াছে কি না সুধিগণের অবিস্মিত নাই।

'দেবী চৌধুরাণী'র চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া যে-সব চরিত্রের উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমার ক্রটি হইয়া থাকিলে, আমি পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বঙ্কিমের গ্রন্থ মধ্যেও এইরূপ চরিত্রের অসম্ভাব নাই, জ্ঞানি। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের বহর এবং রোহিণীর যত্নদণ্ড এই সকল চরিত্রের নিকটস্থ প্রমাণ করিতেছে। বহর জঙ্গ, সমাজের জঙ্গ, একের দণ্ড দিতে বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ সমাজশুল্ক রক্ষার দায়িত্ব তাঁর হাতে দ্রুত।^৩ বালবিধবা রোহিণীর স্বাভাবিক নিয়মে পদস্থলন হইলেও বঙ্কিম তাহাকে সমর্থন কিংবা সহানুভূতি কিছুই দেখাতে পারেন নাই বলিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় অত্যন্ত হত্বিত। কিন্তু বারোজ যোষ মহাশয়ের 'মানবতার প্রথম শ্বশিও কি তাই করেন নাই? যথার্থ অপরাধীকে দণ্ড দিতে শরৎচন্দ্রও যে ছাড়েন নাই, অচলা ও কিরণময়ী যে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে তাহা সরস্বতী দেবীও লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।^৪ অথচ শরৎবন্দনায় তাঁহারই একজন সহযোগী দেখাইয়াছেন রমেশ ত শাস্ত্রাদি অবহেলা করে নাই; রমার স্বল্প দুর্বলতাও কালীতে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবচিত্র আশেপাশে থাকিলেও উপজ্ঞাসেব মূলস্বরূপ—ভারতীয় আদর্শবাদ। সংস্কার তাঁহার কামনা হইলেও, একেবারে ভাঙ্গিয়া নতন করিয়া গড়িবার কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। বিধবা-বিবাহও তাঁর বিশ্বাস থাকিলে, রমা ও রমেশের মিলন করাইয়া হয় ত তাহাদিগকে সুখী করিতে পারিতেন। সেইজন্ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত বলিতে হয় 'শরৎচন্দ্র বিপ্লবপন্থী নহেন সনাতনপন্থী'^৫।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মতে শরৎচন্দ্রে সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কারণ 'তাঁর মত দৃষ্টি নিয়ে দেশের মানুষের পানে কেউই চায় নি; তাঁর মত দরদ নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি; সাহিত্যের সহিত তাই অপূর্ণতাই থেকে গিয়েছিল, সাহিত্য সত্যিকার রূপ ধরে মানুষের চোখের সামনে ফোটে নি।' 'এর পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য ছিল কেবলমাত্র সাহিত্য, সে যুগের সাহিত্য কেবলমাত্র কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে ঘেরা থাকত। সেই অতীত যুগটাকে বঙ্কিমের যুগ বলা চলে।'^৬ দেবী সরস্বতীর উল্লিখিত বাক্যে বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথিগণ বাঁহার রচনাকে ভাঙ্গিরখীর অমৃতধারার জায় বলিয়াছেন, যিনি একাধারে উপজ্ঞাসিক, কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, প্রকৃত্যাত্মিক, সমাজধর্ম-রাষ্ট্রনীতিবিদ হইয়া বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এবং 'মাতৃভাবার বক্ষ্য দশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ, কি চিরস্থায়ী

উপকার করিয়াছেন, সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালা উপজ্ঞাস পূর্ণ-যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।^৬ ইহা নিরপেক্ষ সমালোচকপ্রবরের অভিমত।

কিন্তু আজকালকার কালচারবিলাসী—dilettante (আট-ভক্ত?) বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তা ও সাহিত্য পরম্পর-বিরোধী। সাহিত্যে এখন বিশ্বজনীনতার নামে ব্যক্তিহীনত্ব।—ব্যক্তির খেয়াল খুসী সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে Spirit-এর উপর Matter জয়ী, তাহার অনুকরণে আধুনিক লেখকেরা ব্যস্ত।^৭ তাই 'এই লেখকেরা আত্মপ্রস্তুত বস্তুনিগূহীত সামাজিক সমস্তার অন্ধ তাড়নার সনাতন ভাব-সত্য হইতে তিরস্কৃত। ইহারা স্বাধীন নয়, ইহারা জড়জীবী, চিংশক্তিহীন, বর্তমানের আবির্ভাব ও বিক্ষুব্ধ জলপ্রোত্তের ক্ষণ-বৃষ্টি—ইহাদের রচনা শতাব্দী পরে যুগবিশেষের দাহচিহ্ন মসীরেখার মতই মিলাইয়া যাইবে। অতি-আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং তাহার সন্ধানে বসিকের রসোচ্ছ্বাস দেখিলে মনে হয়, ইহারা কাব্যকে হারাওয়া ফেলিয়া সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিতেছে'।^৮ সুতরাং আধুনিক তথাকথিত মনস্তত্ত্বপূর্ণ উপজ্ঞাসে দলনীকে ফেলিয়া শৈবালিনীকে আদর্শ করা হইলে, তাহা বঙ্কিমের দোষ নয়; দোষ তাঁহার যিনি কাচ ও কাঙ্কনের মধ্যে গ্রহণীয় বাহিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন—'পূর্বের জায় বীরত্বের পূজা মানুষ এখনও করে। শরৎচন্দ্র বীরত্ব দেখেছেন বশ্বচন্দ্রপরা লোকে নয়, জীবনের ছোটখাট কাজে সাধারণ জীবনে। গৌরবের পরিমাপে তিনি নুতন বাটখারা প্রয়োগ করিয়াছেন।'^৮ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের উক্ত বাক্যটি বঙ্কিমের সন্ধক্ষেই যে বেশী খাটে তাহা দুই একটি উদাহরণ দেখিলেই প্রমাণিত হইবে। জয়সিংহ, ওসমান, হেমচন্দ্র, পশুপতি, প্রতাপ, মীরকাশেম, রাজসিংহ, মোবারক, ফৌজদার তোরাবখা, এই সব বশ্বচন্দ্রপরা বীর, বঙ্কিমের উপজ্ঞাসে থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থ জীবনের চিত্রের এবং গৃহস্থ বীরের আদর্শের অভাব নাই। কপালকুণ্ডলায়, বিবুদ্ধে, ইন্দিরায়, রাধারাণীতে, রজনীতে, দেবীচৌধুরাণীতে বশ্বহীন জীবনের ছোটখাট কাজে সাধারণ জীবনে বীরত্ব প্রদর্শনে সমর্থ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রচুর রহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কোন লেখক নাই যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট শ্বশি নন, একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন। 'নুতন বাটখারা' সৃষ্টি বঙ্কিমের; শরৎচন্দ্রের নয়।

শ্রীযুক্ত জয়ন্তীকুমার দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধক্ষে লিখিয়াছেন—'His characters are all life-like, to be found in actual life,—no unreality. From real life Bankim

৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ভূমিকা' (নন্দলাল সেনগুপ্ত)।

৪ 'শরৎবন্দনা' p. 212.

৫ 'শরৎবন্দনা' p. 41.

৬ 'উপজ্ঞাসের ধারা' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৭ 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য' (মোহিতলাল মজুমদার)।

৮ 'শরৎবন্দনা' pp. 11-12.

gathered materials.'^{১০} অর্থাৎ বঙ্কিমের নায়ক-নারিকা বাস্তবজীবন হইতে সংগৃহীত। ইহার পর দশগুণ বলিয়াছেন, 'Still he is not a realist like some of the modern novelists.'^{১১} আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ Miss Mayo-র জায় বাস্তববাদী হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা সমাজের গ্লানিগুলির নগ্নমূর্তি অঙ্কিত করিয়াই—নিজেদের রচনা-শক্তিকে সার্থক করেন। ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় বলিয়াছেন—“রিয়ালিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা বাঁহারা, তাঁহারা বস্তুর রূপকে হুবহু তার বাস্তবরূপেই দেখাইয়া থাকেন, সে রূপের সঙ্গে তাহাদের আবেগ, অনুভূতি অথবা কল্পনা মিশাইয়া থাকেন না। তাঁহারা বাস্তব জীবনের ফটোগ্রাফার; আর্টিষ্ট নহেন।”^{১২} শরৎচন্দ্র সেরূপ রিয়ালিষ্ট নহেন। ‘এ ছোটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা’ কিছু দেখি—ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্বতকে পাহাড় পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।^{১৩} স্বয়ং শরৎচন্দ্র এইরূপ কথা বলিয়া ভগবান কর্তৃক তিনি বিড়ম্বিত হউন আর না হউন, তিনি তাঁহার অন্ধ ভক্তজনকে সাংঘাতিকভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। তাঁহাব নিজের কথা, নিজের লেখায় মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। মহাশ্মশানের অন্ধকারের অপকল্প রূপ বর্ণনা ‘সত্য কথা সোজা করিয়া বলা’ নয়। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। ‘এ কথা সত্য নহে যে, জগৎকে তিনি অকবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিংবা...সাধারণ লোকে যাহা দেখিয়াছে, তার চেয়ে বেশী কিছু দেখেন নাই। সব কবির মতই তিনি জগৎ ও জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন অনেক কিছু, যা সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।’^{১৪} শ্রেষ্ঠ লেখক মাত্রেই যাহা চোখে দেখেন ঠিক তেমনটিই আঁকেন না, নিজের কল্পনানৈবেদ্য দ্বারা বস্তুর ভিত্তরকার সত্যও আবিষ্কার করিয়া তাহাও বিচিত্র রূপ দিয়া ফলিত করেন। Aldous Huxley তদীয় ‘Music at Night’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন :—“They (Artists) receive from events much more than most men receive, and they can transmit what they have received with a particular penetrative force, which drives their communications deep into the reader's mind.”^{১৫}

বড় লেখক বাস্তবের উপর যে রংটুকু লাগাইয়া দেন, সেটুকুকেই Romance বলিয়া আধুনিকেরা তুচ্ছ করিতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব-বর্ণনার মধ্যে অতি-প্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের মধ্যে একটা ভীত আবেগ ভরিয়া...তাহাকে রোমান্সের আবেগে ফেলিয়া এবং একটা আদর্শ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তাহার অবসান ঘটাইয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে বাস্তব জগৎ হইতে অনেক উচ্চে...উঠাইয়া লইয়াছেন।^{১৬} ‘শরৎচন্দ্রও বাস্তব-

জীবনের অবিকল ছবি আঁকিয়া চোখের সম্মুখে ধরেন নাই,— সে ছবিকে তিনি হৃদয়ের রক্তে রঙাইয়াছেন, আবেগে তাহাকে কম্পিত করিয়াছেন এবং সর্বোপরি তাহাকে কল্পনামুভূতিতে রস পরিপ্লুত করিয়াছেন।’^{১৭} ‘পল্লী-সমাজে’ লাঠিয়াল আকবর, এবং ‘পণ্ডিত মহাশয়’ বৃন্দাবন, অভিযান্ত্রিকতার কতখানি মহিমা ধারণ করিয়াছে, তাহাও সকল পাঠকের নিকটই সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট হইলেও অসাধারণ বলিয়া অবিশ্বাস করা চলে না। Aldous Huxley বলিয়াছেন, “Good art possesses a kind of super truth—is more probable, more acceptable, more convincing than fact itself.”^{১৮} হাক্সলির এই কথার অর্থ মহাকবির ভাষায় কেমন সুন্দর বিবৃত হইয়াছে!—
বান্দীকি জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।’

নারদ কহিলা ধীরে, ‘অযোধ্যার রঘুপতি রাম।’

‘জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীটিকথা,’

কহিলা বান্দীকি, ‘তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,

সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে ?

পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।’

নারদ কহিলা হাসি,—‘সেই সত্য যা রচিব তুমি,

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি—

রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনে।’^{১৯}

Huxley গ্রন্থান্তরে স্পষ্টতর ভাষায় এই কথাটি বলিয়াছেন—
“In the best art we perceive persons, things and situations more clearly than in life and as though they were in some way more real than realities themselves.”^{২০} এই জগুই উচ্চ লেখকের নাম হয় কবি,—
ঋষি—তত্ত্বদর্শী। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার ঋষি—‘বন্দ্যোপাধ্যায়’
মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি। বারীন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন—‘বাংলায় শরৎচন্দ্র মানবতার প্রথম ঋষি।’^{২১} রবীন্দ্রনাথ—সত্যজ্ঞ।
ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ কবির মানসক্ষেত্রোদ্ভূত চরিত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন—“সত্যরক্ষা পূর্বক বড় করিবার ক্ষমতার সাহিত্যিকারের স্বার্থ পরিচয়। যেমনটি ঠিক তেমনি, লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।”^{২২} শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টির যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। মনোবোঝার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধির বিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়—ধর্ম্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।^{২৩} বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-বুদ্ধি যে কত প্রবল ছিল তাহা পাঠক মাত্রেই জানেন। রবীন্দ্র

১০ ‘Life and Works of Bankimchandra.’ ১১ ‘শরৎ-বন্দনা’ p. 184. ১০ ‘ঐকান্ত’ ১ম পর্ক। ১১ ‘শরৎবন্দনা’ p. 8. ১২ ‘Music at Night’ pp. 5-6. ১২ক ‘বঙ্গ-সাহিত্যে উপ-জ্ঞানের ধারা’ pp. 60, 64, by শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২খ নীহাররঞ্জন রায় in ‘শরৎবন্দনা’ p. 184, ১৩ ‘Music at Night’ p. 5. ১৪ ‘ভাষা ও ছন্দ’—(কাহিনী) by রবীন্দ্রনাথ। ১৫ ‘The Olive Tree,’ p. 30. ১৬ ‘শরৎবন্দনা’ p. 36. ১৭ ‘সাহিত্য’ p. 16 by রবীন্দ্রনাথ। ১৭ক Ibid. pp. 16, 34.

নাথের অধ্যয়নদৃষ্টি প্রমাণ আছে তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁহার পাঠকবর্গকে শুধু আনন্দ দিতে চান নাই, চেয়েছিলেন 'to lift them above the common sordid atmosphere of everyday life.'^{১৮}

যাঁহারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা পাঠকের আনন্দ-বিধানকেই আটের একমাত্র উদ্দেশ্য বলেন, তাহাদের পূর্ণ সৌন্দর্য্যের জ্ঞান থাকিলে, সৌন্দর্য্যাত্মনের সঙ্গে মঙ্গলমূর্ত্তির অঙ্কনও পরিত্যক্ত হইবে না। লক্ষ্মী শুধু সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের দেবী নহেন, মঙ্গলেরও দেবী। সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি এবং মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ স্বরূপ।^{১৮} বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের পূর্ণমূর্ত্তি অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন।

'বঙ্কিমচন্দ্রের উপজ্ঞাসাবলী উৎকৃষ্ট নারী-চিত্রে পরিপূর্ণ। তিলোত্তমা, আয়েসা, দলনী, সূর্য্যমুখী, রাধারাবী, মুণালিনী, ভ্রমর—বাঙ্গালীর আদর্শ নারী-চরিত্রের নিদর্শন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রফুল্ল, সতাই চির-প্রফুল্ল মন্দারপ্রস্থনের জায় বঙ্গবাসীর প্রাণে চিরকাল আনন্দদান করিবে। জনৈক প্রাচীন সমালোচক বলিয়াছেন—'প্রফুল্ল চরিত্র একটি প্রেহেলিকা বলিয়া মনে হয়। উত্থাকে শাজ্জেব মাপকাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপকাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যাইবে না।' কিন্তু কেন? এলিজাবেথ-যুগের ইংরাজ সাহিত্যের নারী-আদর্শে যাহাদের নেত্রপাত করিবার সুযোগ ঘটে নাই, মহাভারতীয় ধর্ম্মব্যথা উপাখ্যানের নারী-চিত্রে যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে নাই,—নব্য-যুগের নভেলী স্ত্রী-চরিত্রে যাহাদের চিত্তবিকার ঘটে, তাহাদের কাছে বঙ্কিমের আদর্শ সাংঘাতিক অস্বাভাবিক ঠেকিলে বিষয়ের বিষয় ছিল না। কিন্তু পাঁচকড়ি বাবু জায় প্রবীণ ব্যক্তির একরূপ অভিমত অত্যন্ত বিষয়কর হইয়াছে। উক্তর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "দেবী চৌধুরাবী" উপজ্ঞাসটি অসাধারণ ঘটনাত্মকাত্ম ও ধর্ম্মভাবগম্বু হইলেও একটি বাস্তব জীবন-চিত্র বলিয়াই আমাদের কাছে আকর্ষণ করে। এবং ইহার মধ্যে যে একটা প্রবল ভাবাবেগ বহিয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার বাস্তব চিত্রের উপর একটা গভীরতা ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে।"^{১৯} প্রথম মহাসময়ের পর ইউরোপীয় সাহিত্যে বস্তুতাত্ত্বিকতা এমন প্রবলভাব ধারণ করিয়াছিল যে, সাহিত্যেব প্রয়োজন যে লেখকের আনন্দের উপরেও আরো কিছু থাকিতে পারে তাহা অস্বীকৃত হইয়াছিল। সাহিত্যের মধ্যে কি থাকা উচিত, কোন্ বস্তু স্থায়ী সাহিত্যের সামগ্রী হইবার যোগ্য, পাশ্চাত্য স্কুলের পড়ুয়া আমরাও তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্যকে নির্বিচারে অনুসরণ করিয়াছি। তাই আজ আদর্শবাদ আমাদের চোখের বিষ না হোক কর্ণশূল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নব্য যুবকসম্প্রদায়ের জনৈক প্রতিষ্ঠাবান নেতা স্বমতনিষ্ঠ হইয়াও যে সত্য কথাটা বলিয়াছেন, তাহা তরুণদের,—ভবিষ্যৎ বাংলার নায়কদের—শ্রবণ করা উচিত :—"Progressive literature if it is of right type, must be realistic and should draw

substance from the life of the people, both in its dark and bright sides.' It must have two ideals before it, (i) it must stir up people and (ii) it should place the highest idea before the people."^{২০} অর্থাৎ বথার্থ প্রগতিশীল সাহিত্যে সমাজের বথার্থ প্রতিচ্ছবি থাকিবে এবং জাতিকে সর্ব্বোচ্চ ভাবধারা পান করাইয়া তাহার মধ্যে কর্ম্মের উদ্বোধন সৃষ্টি করিবে।

সাহিত্য যে স্বভাবানুগামী হইবে, তাহা আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। 'উত্তর চরিত্রের সমালোচনায় বঙ্কিমের মতবাদ প্রকটিত হইয়াছে। ভূদেব বাবুকে একখানি পত্রের মধ্যেও বঙ্কিম যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেও বঙ্কিমের আটের জ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা দূর হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—'The highest poetry is also the highest practical wisdom—the poetry of real life. There is more practical wisdom in Shakespeare's plays than Bacon's Essays or in any English writing whatever.'^{২১} লেখক wisdom শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রকৃতির মধ্যে যাহা ঘটিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটিতে পারে তাহার কথাও যে জানিতে বলিতেছেন, তাহা বোধ কপি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে না। Shelley-ও তাই বলিয়াছেন—"A great poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight."^{২২} সেই জন্য বড় কবিরা যাহা লেখেন তাহা কখনও জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। জাতির সনাতন বৈশিষ্ট্য কল্পধারায় জায় সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত থাকিবে। 'The works of our greatest poets are all episodes in that one great poem which the genius of man has created since the commencement of human history,' এ কথা স্বয়ং Lord Avebury বলিয়াছেন।^{২৩}

বড় কবি প্রকৃতির নগ্নরূপ অঙ্কন করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তাহার গুপ্ত সৌন্দর্য্যও আবরণমুক্ত করিয়া দেখান; কখনও বা তাহা বিচিত্র বর্ণে বঞ্জিত করিয়া আমাদের নয়ন মন মুগ্ধ করেন।* শুধু সাহিত্যে নয়, স্বভাবের উপরও মানব কারসাজি করিতে ছাড়ে না। নগ্ন, নিরাভরণ একটি বালিকা-দেহকে কত চেষ্টাশ্রম করিয়া, কত কল্পনা করিয়া রঞ্জে, বসনে, ভূষণে, হাবে, ভাবে বৈচিত্র্যমপন্ন

২০ 'Presidential Address'—Nabayuga Sahitya Sansad, Calcutta, published in the Daily-Advance, Town Ed., 9/8/1939, Wednesday.

২১ Letter, dated Jajpur, Nov. 13, 1882.

২২ Shelley, quoted in the essay on poetry in 'The Pleasures of Life', part 2. chap. 6, by Lord Avebury, ২১খ Ibid.

* 'Poetry lifts the veil from the beauty of the world, and throws over the most familiar objects the glow and halo of imagination.'—The Pleasures of Life, (Part 2, chap. 6) by Lord Avebury.

১৮ 'Calcutta Review', Octo. 1939, pp. 87-88.

১৯ 'সাহিত্যে সৌন্দর্য্যবোধ' by রবীন্দ্রনাথ, ১৯ 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপজ্ঞাসের ধারা,' p. 130.

করিয়া মানব স্বীয় সৌন্দর্য্যবৃত্তিকে চরিতার্থ করে! আমার বিশ্বাস 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'।^{২২}

মহাকবি এই উক্তি কোন শক্তিশালী সাহিত্যিকই খণ্ডন করিতে বুধা প্রশংসাইবেন না। সাহিত্যেও তেমনি। স্বভাবের মধ্যে সচরাচর যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই একমাত্র সত্য, তাহার অধিক অসাধারণ কিছুই ঘটতে পারে না, এ ধারণা অজ্ঞজন-জুলভ। মানুষ তাহার কল্পনাশক্তির দ্বারা কোন স্বভাব-আলেখ্য সুন্দরতর করিয়া অঙ্কিত করিলে তাহা, এবং প্রকৃতির মধ্যে আকস্মিক হইলেও কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিলে তাহাও, কোন মতে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ্য হইতে পারে না।

'যাহা কিছু ঘটে, তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না অথচ সমাজ ও প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটিলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তাহার উচ্ছ্বল গতিতেও সাহিত্যের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে, ২৩—এইরূপ একটা স্ব-বিরোধী (Self-contradictory) কথা বড় সাহিত্যিকের মুখে শোনাটাই বরং বিড়ম্বনা। কল্পনা উচ্ছ্বল হয় কখন? যখন লেখক কল্পনা দ্বারা রামের চরিত্র অঙ্কন করেন, তখন? না, যখন শিবনাথের চরিত্র চিত্রিত করেন তখন? ত্যাগে উচ্ছ্বলতা, না ভোগে? ভ্রমের চরিত্রাঙ্কণে উচ্ছ্বলতা প্রশংসাইয়াছে, না কিরণময়ীর চরিত্রবর্ণনে উচ্ছ্বলতাব পূণ্যকান্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে? পুত্ররাজ উল্লিখিত মতের মূল্য স্বীকার করা যায় না। উল্লিখিত প্রিয়রঞ্জন সেন যথার্থই বলিয়াছেন—The standard of revolt is raised in every channel.^{২৪} "সেই ভালমন্দ, সেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন, শুধু এই উচিত-অনুচিতেরই রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিতুলের লক্ষ্য করিয়া দাড় করাইয়াছিল। এই অসঙ্গত জবরদস্তি আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছেন না।" ১২৪ক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এইরূপ অসঙ্গত জবরদস্তি দেখাইবার পূর্বে শরৎচন্দ্রের মত বিবৃতি সাহিত্যিকের একটা চিন্তা করা উচিত ছিল এবং কিরণময়ীকে উদ্ভাসপ্রসূত করিয়া আঁট কি সার্থকতা লাভ করিল তাহাও মনে রাখা উচিত ছিল।

'ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাস্পটুকুও দেন নাই।' ১২৪ক এইরূপ উক্তি দ্বাবা কবিদের দুর্ভাগ্য কল্পনাশক্তির প্রতি কটাক্ষ কখনও শোভনীয় হয় নাই। কল্পনাশক্তিই অভাবে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র অঙ্কণ করিয়া পাঠকবর্গকে বিমুগ্ধ করিতে পারিতেন না। এই কল্পনা না থাকিলে কি মহাকবি মধুসূদনের মধুচক্র রচিত হইত? 'Heavenly Muse' নামে কল্পনাকে মহাকবি Milton মহাকাব্য রচনার প্রাণকোষ

আবাহন করিয়াছেন। ইহাকেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'প্রেরণী' রূপে পুনঃপুনঃ সংবর্ধনা করিয়াছেন। এই শক্তির প্রভাবেই চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করিয়া শতবর্ষ পূর্বে শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ প্রামাণিক দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যে আছে। Plato বলিয়াছেন—"He who, having no touch of the Muse's madness in his soul, comes to the door and thinks he will get into the temple by the help of Art—he, I say, and his poetry are not admitted."^{২৫} মহাকবি সেক্সপীয়ার (Shakespeare) প্রেমিক এবং কবিকে এক পর্যায়ের আনিয়া বলিয়াছেন, উভয়েই—"Are of imagination all compact."^{২৬} এক বাণীশ্রেষ্ঠ Cicero বলিয়াছেন—"A poet isinspired by what we may call the spirit of divinity itself."^{২৭} এই সকল দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কাল্পনিক বলিয়া সকলের সকল কথা মিথ্যা বলা চলে না। জগতে কখন কি ঘটতে পারে, কাহার মুখ দিয়া কোন সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা ধরা কঠিন। একদিন শরৎবাবুই শ্রীকান্তের মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন—"যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলবে? ২৬ যাহা আমি দেখি না কিম্বা জানি না, তাহা অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ত দেখিতে পারেন? তবে কল্পনা-বিলাসী বলিয়া কবিকে গালি দেওয়া বুধা। "দো দহান দারীম পূয়া হম্ চুন নায,"—তাপস কবি কুমীর এই বাক্যের অর্থ, কবি মোহমদ বরুকতলাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কবির প্রাণ বাণীমাত্র; উহার একপ্রান্ত সেই সনাতন মহাগায়কের অধরে এবং অঙ্গ প্রান্ত এই বিশ্বমানবের নিকট স্বর্গীয় স্তবে অপূর্ব অশ্রুত সঙ্গীতের আলাপ করে।^{২৭}

এই তৃণশূন্য দেশে যে স্থাব আশুতোষের গায় শাল-মসীকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ'—শাস্ত্রবাক্যে বিমূঢ়িত হিংসাপরায়ণ জনসমাজের মধ্যে যে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহের আবির্ভাব ঘটয়াছিল, তাহা কি আকস্মিক নয়? এই, অনন্ত যুগ ধরিয়া এই অনন্ত কোটি মানুষ মধ্যে কয়জন মহামানব পৃথিবী-পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া জনসাধারণকে নূতন দীপ্তি দেগাইয়াছেন? সংখ্যালঘিষ্ঠ (minority) বলিয়া কি তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের আদর্শকে, এমন কি তাঁহাদের স্মৃতিকে, পৃথিবী হইতে—পৃথিবীর সাহিত্য হইতে নির্দাসিত করিয়া দেওয়া হইবে?—তাহা কখনও হয় না। মানুষ যতই উদ্ধামগতি অবলম্বন করুক, তাহার একটা প্রশমস্থান আছে,—এ ধাবণা প্রত্যেক মানুষের কেন জীবজগতের সকলেরই আছে। সেই স্থানকেই আদর্শস্থান করিয়া মানুষ অগ্রসর হয়। এইটাই নীতি। ইউরোপীয় বালক 'Herculean strength' এর স্বপ্ন দেখে; হিন্দুবালক দেখে

২৫ Plato quoted by Lord Avebury in his 'Pleasures of Life', part 2, chap. 6.

২৬ এক (২৫) Ibid.

২৬ শ্রীকান্ত, ১ম পর্ক p. 140.

২৭ 'পারশুপ্রতিভা' by বরুকতলাহ।

২২ 'চৈতালি' (নারীপ্রতিভা) by রবীন্দ্রনাথ।

২৩ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ—নদীয়া শাখা, সন ১৩৩১ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ।

২৪ Influence of Western Literature in Bengali Novels by Dr. Priyaranjan Sen.

২৪ক 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ক।

ভীম-বিক্রমের, মুসলমান বালক দেখে সোরাব-রোস্তমের। কেহবা Bismark কিংবা চার্লসের জায় কুট-নীতিবিৎ হইতে চায়। এমন সমস্ত দিকেই একটা করিয়া আদর্শ মানুষ চোখের সামনে আঁকিয়া রাখে। জীবনের কোন ক্ষেত্রে সেই আদর্শবাদেরকে অবহেলা করিয়া চলিতে চেষ্টা করাকে শুধু foolish নয় fatal না বলিয়াও পারি না। ভারতবর্ষ যে নূতন সভ্যতাকে ধ্রুবতারা করিয়া জীবনতরি ভাসাইয়া দিয়াছিল, সে সভ্যতাকে আদর্শ ধারণা করিয়াই করিয়াছিল। সুতরাং আদর্শবাদ অখণ্ডনীয়।

আদর্শ-অন্ধন করাই উত্তম সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হওয়া উচিত। আদর্শবাদী বলিয়া কোন লেখকের নিন্দা হওয়া দূরের কথা, বরং যিনি আদর্শ ত্যাগ করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার গ্রন্থ গ্রন্থোক্ত মতবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। Lord Avebury উৎকৃষ্ট কাব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“Poetry has been well called the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds, it is the light of life; the very image of life expressed in its eternal truth; it immortalises all that is best and most beautiful in the world.”^{১৮} লর্ড এভেবরিবর্ণিত কাব্য যাহারা না লেখেন তাঁহারা second-rate কবি। Second-rate poets, like second-rate writers generally, fade gradually into dreamland; but the work of the true poet is immortal.—ইহা তিনিই বলিয়া দিয়াছেন। এইমত সর্বসম্মত। শরৎচন্দ্রকে এই এই সংকট হইতে রক্ষা করিবার জগ্জী বুদ্ধি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত দেখাইয়াছেন—“সমাজে যারা অনাদৃত, উপেক্ষিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের খাঁটি আদর্শে যারা কাব্যে ছোট নয়, তাদের লইয়াই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সংসাধ।” ‘রিয়ালিজমের প্রথম রূপদক্ষ ভাষ্যরকেও রোমান্টিক আখ্যা দিতে সেনগুপ্ত Walt Whitman-এর মত তুলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র যে সম্পূর্ণ Realist নহেন, তাহা আমি আগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তফাৎ বেশী নয়। যুগপ্রভাবে আদর্শের কতকটা বিভ্রান্ততা ঘটিয়াছে। বন্ধিমচন্দ্রে যে Romanticism আছে তাহা ত সর্ববাদিসম্মত। শরৎচন্দ্রেও তাহার অভাব নাই। তবে একটা প্রাচীন অপবটা আধুনিক। Aldous Huxley তদীয় প্রসিদ্ধ Music at Night গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“Modern Romanticism is the old Romanticism turned inside out, with its values reversed. Their plus is the modern minus; the modern good is the old bad. What then was black is now white, what was white is now black.” (pp. 212-213). পূর্বকালে যাহা ছিল উত্তম, আজ তাহা অধম হইয়াছে। নারীর সতীধর্মের উপর প্রাচীন কালে জাতিধর্মনির্কীর্ণশেষে অসীম শ্রদ্ধা ছিল। Milton তাঁহার Comus নাটকে Chastityর জয়গান করিয়াছেন। Shakespeare টাকুইন-ধর্মিতা Lucrece সৎকে বলিয়াছেন—But she hath lost a dearer thing than life^{২৯}

আত্মীয়-স্বজন যদিও ‘Her body's stain her mind untainted clears’^{৩০} বলিয়া লিউক্সাসীর অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সতীধর্মপরায়ণা নারী সে মার্জনা অস্বীকার করিয়াছিল এবং সতীত্ব হারানকে ‘Hard misfortune’ গণ্য করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল—

“No, no” quoth she, “no dame, hereafter living,
By my excuse shall claim excuse's giving.”^(৩১)

সতীত্ব ছিল প্রাচীনভারতেও নারীর প্রাণস্বরূপ। আর আত্ম আশালতা দেবী শরৎচন্দ্রের কতিপয় উজ্জ্বল নারিকাকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—‘পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যে কেবল সতীত্বের সহিত একান্ত এক নয় এবং এর চেয়ে ঢের বড় এবং ঢের সর্বোত্তম এ কথা সামাজিক এবং সাংসারিক দিক্ থেকে না হোক বুদ্ধির দিক্ থেকে কে না চট্ করে বুঝতে পারে? ^{৩২} এবং কমল, কিংবদন্তী ও রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ‘বিবাহ অনেক ঘটনার মত একটা ঘটনামাত্র’।^{৩৩} আশালতা দেবীর মতে বিবাহটার মত প্রেমটাও করিলেই হইল। ‘গ্যেটে ছিলেন বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ, কিন্তু তিনি ক’বার প্রেম করেছেন? কমল এতখানিই দাবী করচে।—এই ‘অখণ্ডনীয়’ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সংজ্ঞাটা দিলে আমরা দেবীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতাম। আশালতা দেবী যে বিজয়ার ডাক্তার-প্রেমকে লক্ষ্য করিতেছেন না তাহা নিশ্চিত।^{৩৪} রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্ত-প্রেমটাও আশালতা দেবীর সম্মত বলিয়া মনে না। আশালতা দেবীর প্রেমের আদর্শ কমলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কমল মাত্র তিন জনের সঙ্গিত তথাকথিত প্রেম করিয়াই যদি আদর্শস্থানীয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে বারবনিতাগণ এক জীবনে অসংখ্যবার প্রেম করিবার যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে, তাহারা কি আশালতা দেবীর মতে নারীসমাজের ইষ্টদেবতা বলিয়া গণ্য হইবে? আজকাল film starদের প্রশংসাপত্র ব্যবসাদারদের নিকট বেদব্যাক্যের চেয়ে মূল্যবান হইয়াছে সত্য। কিন্তু এইটাই কি যথার্থ সত্য? রাজলক্ষ্মী পাঠকের সত্যিকার শ্রদ্ধা পাইল কখন? তাহার মধ্যে অন্নদাদিদির আবির্ভাবের পূর্বে কি পিয়ারী বাইজি অত করিয়াও শ্রীকান্তের চক্ষেও বাইজীকপেই প্রতিভাত হয় নাই? ত্যাগ মানুষকে বড় করে; সংঘম মানুষকে প্রশংসাই করে, উজ্জ্বলতা নহে। ‘চরিত্রহীনের’ সাবিত্রী প্রশংসনীয় কেন? যে-হেতু সে সংঘমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

এখন কথা হইল ত্যাগ ও সংঘম যদি উভয়কালেই প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে হাক্সলির দ্বিবিধ Romanticism রহিল কই? সব ত একজাতীয় চরিত্র হইল।—না, হইল না। K. M. Das লিখিতেছেন—“Like Dickens he (Sarat) has peopled his creations with low class despised people. ^{৩২} শরৎ সৎকে দাস মহাশয়ের কথা যে সত্য তাহা সেনগুপ্ত স্ত্রীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ‘শরৎচন্দ্রের উপজাতি-

৩০ Ibid. verse 245.

৩১ শরৎবন্দনা p. 102, 104.

৩২ ‘Wertern Influence on Bengali Novels.’

২৮ The Pleasures of Life, part 2 chap. 6.

২৯ The Rape of Lucrece, verse 99.

সমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে, তাঁহার (এই) নূতন ও পুরাতন উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে।^{৩৩} যেখানে তিনি পুরাতন ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন সেখানে পুরাতন স্রবের প্রাধান্য আছে। সেখানে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার কোন বিবাদ হইতে পারে না। যেখানে তিনি বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া বঙ্গসাহিত্যের গতিবেগ বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে নূতন ভাবের উত্তেজনা স্পষ্ট হইয়াছে। এইখানেই বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহার অনেকখানি পার্থক্য। “এক দিনের কোন গভীর অপরাধও যে তার জীবনের আকাশকে নিশিদিন কালিমাময় করে রাখতে পারে না এবং এ কথা যে স্ত্রীলোকের পক্ষেও নিরতিশয় সত্য এ তিনি কোন ছলেই ঢেকে রাখতে চান নি।”^{৩৪} শরৎ সম্বন্ধে আশালতা দেবীর এই কথা প্রমাণ। সাবিত্রীকে দিয়া তিনি এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য দেখাইয়াছেন। অভয়া দিকিকেও দিদির সম্মান দিতে শরৎচন্দ্র কৃতিত নন; অথচ তিনিও বৃক্বে মধ্যে অম্লদা দিদির দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। রমা প্রেমোপদেয়কে নিকটে বসাইয়া আহার কবাইতে পারিয়াছে, কিন্তু তজ্জগৎ কাশীবাস কবিতোও বাধ্য হইয়াছে। কমল অভুক্ত অতিথিকে নিজের জগৎ রন্ধিত শাকারও দিতে কৃতিত হয় নাই। পিয়ারী বাইজীব সেবাপরায়ণতার সীমা নাই। পতিতার মধ্যে—এমনি কবিতা বহু গুণ, শব্দ ও শরৎপরবর্তী সাহিত্যে দেখান হইতেছে। “অমূল্যবের মধ্যেও তিনি (শরৎ) সত্যস্বভাবের দেবোজ্জ্বল মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সব মন্দই যে দেবতার আসন আছে, তাহাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।^{৩৫} শ্রীযুক্ত মৃণাল সর্বাধিকারী শরৎচন্দ্রের যে কোন নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের মধ্যে ঐ দেবোজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়াছেন, এবং অপরাপর চরিত্রের ত কথা নাই ‘কমলের মধ্যেও অসামঞ্জস্য এবং অস্বাভাবিক কোন আচরণই’ তাঁহাদের চোখে পড়ে না। আমাদের ত পড়ে। ইন্দুনাথের মত নায়কে এবং রাজলক্ষ্মীর মত নায়িকায় অনেক সৌন্দর্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সে স্বীকারোক্তি দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, ইন্দুনাথ তাহার পণ্ডিত মহাশয়ের টিকি কাটিয়াছিল বলিয়াই এবং রাজলক্ষ্মী পিয়ারী বাইজি হইয়াছিল বলিয়াই, তাহারা আজ শব্দ-সাহিত্যের পাঠকের কাছে দেবোপম হইয়া উঠিয়াছে। Lord Clive ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজ জাতির নিকট দেবমর্যাদা লাভ করিয়াছেন, তিনি কিন্তু বাল্যকালে গির্জার শিখরে চড়িয়া পথিকের উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতেন। অতএব এখন কি generalise করা যাইবে যে, গির্জার উপর হইতে ঢিল মারিয়া পথিকের কলসী ভাঙ্গিয়া দিলে Clive হইতে পারিবে? সেরূপ generalisation মূর্খের কাজ। তেমনি কোন বিশেষ পতিতা ঘটনাচক্রে পড়িয়া কিংবা দৈববশে পড়িয়া কিংবা সাধুতা দেখাইলে, সমস্ত পতিতাকে কি পবিত্রামধ্যে

প্রতিষ্ঠিত করিলে মঙ্গল হইবে? K.M. Das মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, “Sabitri who though a fallen woman (fallen for causes for which she was not much to blame) has many lovable traits of character.”^{৩৬} ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বলিয়াছেন—“Not having personal knowledge of fallen women, we do not know whether there is any real Sabitri among them or not.”^{৩৭} এ-সন্দেহ যে অনেকেই আছে তাহা বলা বাহুল্য।

সুতরাং Aldous Huxley-র কথা খাঁটি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র মন্দকে মন্দ করিয়াই দেখাইয়াছেন। এবং ভালকে আরো ভাল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎ প্রভৃতি মন্দের মধ্যেও ভালবাস্তি দেখাইয়াছেন। ইহাই change of vision.

একটা বিশেষ সমস্যা লইয়া প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে বিচার করা যাক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞান একজন নিরপেক্ষ সমালোচক বলিতেছেন—“প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ববাববই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অমুদোদনের ছাপ মারা না থাকিলেও, চিরাভ্যন্ত সংস্কারের খোলসবস্ত্রিত হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেগ আছে সে-বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপজ্ঞানসেও বেশ সচেতন ছিলেন।”^{৩৮} শরৎচন্দ্রের জীবনচরিত্রে এই সমাজ-নিরপেক্ষ স্বাধীন জীবনের স্পষ্ট স্ফূরণ হইয়াছে। ওদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন চরিত্রেই সমাজকে অবহেলা কবিতো পারে নাই। Bankim had social defects in mind, but did not attempt to over-ride society...^{৩৯} সমাজের ক্রটি যে তাঁহার চক্ষে ধরা পড়ে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সমাজ কোন মতে অবজ্ঞাত হইবে না। প্রেম যে নৈসর্গিক তাহা তিনি গোড়া হইতেই জানেন, কিন্তু প্রেমকেও সমাজের নিয়ম অবহেলা কবিতো তিনি দিবেন না! ‘He liked love married or leading to marriage.’^{৪০} তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের প্রেমকে বঙ্কিম মাথক করিয়াছেন; কিন্তু আয়েসার এত বড় একনিষ্ঠ প্রেমও সমাজবিধিবিগত বলিয়া বার্থ করিতে তিনি কৃতিত নন নাই। ‘নবাবনন্দিনী’ উপজ্ঞানসে আয়েসাকে জগৎসিংহের সহিত মিলিত কবিবার চেষ্টা করিয়া দামোদরবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি-বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছেন। হরলাল পিতার ত্যাজ্যপুত্র হইয়াও রোহিণীকে বিধবা-বিবাহে সন্নিহিত করিতে নারাজ। কুন্দনন্দিনীকে ‘শাস্ত্রসম্মত’ বিধবাবিবাহ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্র-স্বয়ম্বরীর গৃহে বিধবাকে ফল ধবাইলেন। রোহিণীর প্রতি, কুন্দনন্দিনীর প্রতি, এমন কি মতিবিবির প্রতিও বঙ্কিমের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই কারণ তাহারা সমাজদ্রোহী। আর শরৎচন্দ্র

^{৩৩} উপজ্ঞানসের দ্বারা ১ম পরি, বা শরৎবন্দনা p. 140.

^{৩৪} শরৎবন্দনা p. 101.

^{৩৫} শরৎবন্দনা p. 94.

^{৩৬} The History of Bengali Literature p. 173.

^{৩৭} শরৎবন্দনা p. 148.

^{৩৮} ‘The Life and Works of Bankim Chandra’ by J. K. Dasgupta.

গভীর মমতা ও সমবেদনা দিয়া অচলা, কিরণময়ী, কমললতা, এমন কি অভয়াদিককে অঙ্কন করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর রূপ ত' তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

বালবিধবার প্রকাণ্ড সমস্তা বঙ্কিম ও শরৎ উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রহিয়াছে। শরৎচন্দ্রে বঙ্কিমের নীতিনিষ্ঠা নাই ইহা স্পষ্ট। মাহুয়ের দুঃখ-ব্যথা, খলন-পতনকে শরৎচন্দ্র সুগভীর সহানুভূতির রঙে চিত্রিত করিয়াছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান হইতে উদ্ধৃত উন্ন্যাসগামী সমাজকে দেশীয় সংস্কৃতির মহানু ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত করাকেই জীবনের ত্রুত করিয়াছিলেন^{৩৯} 'Bankim looked to his country's cultural heritage for inspiration' এ-কথা দাশগুপ্তও বলিয়াছেন। সুতরাং

জগতে ভাল ও মন্দ দুই-ই থাকিবে। সতী, সীতা, সাবিত্রীর সমকালে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তীও কেন, রম্ভা, তিলোত্তমারও আবির্ভাব ঘটিবেই। সাহিত্যেও দলনীর সঙ্গে শৈবলিনীর, ভ্রমরের পার্শ্বে রোহিণীর, এমন কি সুরবালার সম্মুখে কিরণময়ীর চরিত্র-চিত্রণও সম্ভব হইবে। কিন্তু মন্দকে মন্দজ্ঞানে পবিত্র করিয়া দোষের হইবে কেন? পাপের সংশ্রব ত্যাগ করাই ত' চিরন্তন নীতি। যদি বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রের গৃহে আশ্রয়প্রার্থিনীরূপে না আনিতেন, ডাক্তার সুরেশ যদি মহিমের পত্নীভবনে গিয়া অচলার চঞ্চলচিত্তকে আরও চঞ্চল না করিত, পাপীয়সী বোহিণী যদি তাহার রূপের ছটা গোবিন্দলালের নয়নগোচর না করিত, তাহা হইলে যে-সব কুংসিং ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিত না। পাপের আকর্ষণ-শক্তি প্রবল। আশাব্রাত্য চরিত্র, অমরের স্ত্রীর চরিত্র, পাপের আকর্ষণ হইতে প্রিয়জনকে রক্ষা করিতে পারে নাই। পতনের পথটাই সুগম কি না। সেই জন্ত পাপকে 'নিন্দা' করিয়া দূরে পরিহার করিবারই বিধান বিজ্ঞ ব্যক্তির দিয়াছেন। নবকুমার এই নীতিকে স্বীকার করিয়া মতিবিবির চক্ষু পরিভ্রম করিবার জন্তও সে পথে চলিতেও স্বীকার করিল না। আর Lucrece স্বামীর বন্ধু বলিয়া Tarquintকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিল, অচলা গৃহদাহ ঘটাইল। পাপকে দূরে পরিহার করার প্রাচীন নীতি প্রাচীন কাল অপেক্ষা বর্তমান কালে বেশী পালনীয় হইয়াছে। শুনা গিয়াছিল আমেরিকার স্ত্রী সমাজের পীঠস্থানেও school girls' দেব মধ্যেও abortion case অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'পাশ্চাত্য সভ্যতার' হীন অঙ্কুরণে স্ত্রী-স্বাধীনতা নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেছি; এতদূর পাতিত্য হিন্দুর মধ্যে অনেকের ঘটিয়াছে যে, কুলবধু হইতেছে বিতাড়িত কিম্বা অবজ্ঞাত আর সতীত্বের মধ্যাদা হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে ধূল্যবলুপ্ত। আজ আর আমরা বন্ধুর সহিত বান্ধবীর নিভৃতলাপে, সহপাঠীর সহিত সহপাঠিনীর কুঞ্জবিহারে দোষ দেখিতে পাইতেছি না। এতটা পরিবর্তন আমাদের ঘটিয়াছে। এইরূপ আচরণের অবশ্যজ্ঞাবী ফল কাহারও অবদিত নাই। আমেরিকার স্ত্রীর অর্থ-নৈতিক

সৌভাগ্য লাভেই মানুষ জীবনে সুখী হইতে পারে না। সেই অপেক্ষা প্রাণের সুখ যে অধিকতর কাম্য তাহা তর্কের বিষয় নয়। সেই সুখ পাইতে হইলে প্রাণের পবিত্রতার একান্ত প্রয়োজন; এবং সেই পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্তই নীতিচর্চা আবশ্যক। 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'^{৪০} এই শিক্ষা সাধু সজ্জনের আচরণ দেখিয়া যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাধু সজ্জনের জীবনী পাঠ করিয়াও পাওয়া যায়। সেই জন্তই বিশেষ করিয়া সংসাহিত্যের প্রয়োজন। যে সাহিত্য সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ এবং সত্য ও সন্দেহের জন্ত সৃষ্ট, তাহা সংসাহিত্য। সংসাহিত্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। 'জাতীয়তাগঠন করিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যগঠন সর্বপ্রথমে আবশ্যক'^{৪১} আমাদের সাহিত্যকে জাতীয়তাগঠনের উপযোগী করিবার জন্ত স্ত্রীর আন্তরিকতা যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, "দেশের জনসম্মুখে যদি সংপথে লইয়া যািতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বান্ধালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ বাহ্যতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে।...কোন পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন জাতির কি উন্নতি হইয়াছে...বিশেষ-বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এদেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্তিত করিতে হইবে।...এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন পথে যাওয়ায়, কোন দুর্নীতির প্রশ্রয়বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপতন ঘটয়াছে বা ঘটতেছে—সর্বনাশ হইয়াছে। কোন জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরুঢ় হইয়াও কোন কঠোর দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে।"^{৪২} জনৈক ইউরোপীয় কবি গাহিয়াছেন—

"What is good and fair,
Shall ever be our care;
Thus the burden of it rang,
That shall never be our care.
Which is neither good nor fair."^{৪৩}

উত্তম সাহিত্যের উত্তম বিষয়বস্তু পাঠকের মনের উপর "a civilising and ennobling influence"^{৪৪} বিস্তার করে। বান্ধালীকে বান্ধালা সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত করিতে হইবে। কারণ দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনমতেই খবরের ভাষার সম্ভবপর নহে।^{৪৫} ইহা রবীন্দ্রনাথের বাক্য। একথার সম্ভাব্য জাপানে বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রামেন্দ্রচন্দ্রের তলীর "চরিত-কথা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, "বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া

৪০ 'সাহিত্যদর্পণঃ'।

৪১ 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' by স্ত্রীর আন্তরিকতা।

৪২ 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' by স্ত্রীর আন্তরিকতা

৪৩ Theognis's Ode on the Marriage of Cadmus and Harmonia quoted by Lord Avebury in his Essay on Education.

৪৪ The Pleasures of Life, part. 1. chap. X,

৪৫ 'সঙ্কলন' P. 27. ৪৬ P. 34.

৩৯ See 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' p. 217 by নন্দলাল সেনগুপ্ত।

আমরা যে বড় হইতে পারিব না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদেরকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।^{১০৬} বঙ্কিমচন্দ্র আপনার শিক্ষাকর্মে বঙ্গভাষার প্রতি আগ্রহ বা অগ্রদৃষ্টি দেখান-নাই; তিনি তাঁহার সমস্ত জ্ঞান ও সঙ্গে সঙ্গে পরম শ্রদ্ধা সহকারে বঙ্গবাণীর পূজা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও বাহাতে বঙ্গের ইতিহাসধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশেরও বা উত্তম, বাহা উদার এবং নির্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার সুব্যবস্থা করেন। বঙ্কিমের পূর্বে ইংল্যান্ডপ্রিয় বাঙ্গালীর জ্ঞান ছিল “যে তাঁহাদের পাঠ্যযোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না।... ইংরাজিতে বাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?”^{১০৭} কিন্তু বাঙ্গালীর এই আত্মাবমাননার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টায় পরিবর্তিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই ইংরাজি শিক্ষার ও সাহিত্যের দ্বাৰে ভিক্ষার্থিবশে উপস্থিত বাঙ্গালীকে আপনার ঘরে ডাকিয়া আনেন। “আজ বঙ্গভাষা কেবল দূতবাসযোগ্য নহে, উর্দুরা শশ্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে—বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাত প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।^{১০৮} এই কথা বলিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পরম গৌরব প্রচার করিয়াছেন। “বাহা কিছু নীচ, বাহা কিছু সংকীর্ণ, বাহা কিছু অসং, ধর্মভাববর্জিত, তাহা উরগ-কৃত অঙ্গুলির ছায়া পরিহার করিয়া, বাহা সুন্দর, নির্মল, নিষ্পাপ, মনোহর—বাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সম্ভাবপূর্ণ চয়ন করিয়া, সেই সম্ভাবকুসুমে আমরা জননী অনাদৃত, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃত” করিয়া মাতৃভক্ত সন্তানের গ্রায মাতৃপূজা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধন্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিয়াছেন। বঙ্কিমের সাহিত্য পাঠ করিয়া বাঙ্গালী সেদিন চব্বম দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আজ সমাজ ও সাহিত্য আবার যেক্রপ উদ্ধার গতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা রুদ্ধ করিবার জগু পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিচর্চা আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জগু বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনার একান্ত প্রয়োজন।

‘দেবীচৌধুরাণী’ আদর্শবাদমূলক উপন্যাসসাজিব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্যজীবনের মধ্যে নারীর নিকাম কর্মসাধনই যে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম তাহা তিনি এই উপন্যাসে স্থাপন করিয়াছেন। “শকুন্তলার জীবনেও ‘যেমন হয়ে থাকে’ তপস্যায দ্বারা অবশেষে ‘যেমন হওয়া ভালো’র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। হৃৎখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।^{১০৯} তেমনি সকলকে হইতে হইবে—হইবাব চেষ্টা করিতে হইবে। এমনি করিয়াই এই উপন্যাসে একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে নামা ঘটনাবিপর্ধ্যায়ের মধ্য দিয়া, নানান শিক্ষাদীকার মধ্য দিয়া, অবস্থার বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, একটি সর্বস্ব-সম্পূর্ণ কুলবধূরূপে—‘গৃহিণীরূপে—গঠন করা হইয়াছে। গৃহই যে নারীর শ্রেষ্ঠ সাধনক্ষেত্র; সংসারধর্মই যে জীবিতার শ্রেষ্ঠ

কর্ম, তাহা দেখান হইয়াছে।’ সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।^{১১০} এই বাক্যের মধ্যে সেই আদর্শবাদের বীজ নিহিত আছে। পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

এই জগুই এই উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি কোন পুরুষ হইতে পারে না। গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে সেই একটি নারীর অদ্ভুত প্রভাব কোন না কোন প্রকারে অল্প বিস্তর প্রকাশ পাইয়াছে। কোন সমালোচক^{১১১} বলিয়াছেন—‘Brojeswar is the pivot round which the plot centres. The different crises in Devi's life are all very closely linked with him. He is the main spring behind all the activities of that spirited leader of philanthropic robbers.’—অর্থাৎ ব্রজেশকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসখানা রচিত হইয়াছে।—ইহা তুল। অক্ষুর জীবনের আলোচনার স্বামী ব্রজেশকে কেন্দ্র বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু গ্রন্থের দিক হইতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেবীকে কেন্দ্র করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। নিকাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই এ গ্রন্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন প্রধান ব্যক্তি দ্বারাই সাধিত হয়। স্মরণ এই গ্রন্থের প্রধান ব্যক্তি দেবী চে স্বয়ং। সেই জগুই গ্রন্থের নাম ‘দেবী চৌধুরাণী’। ব্রজেশ্বরের বহুগুণ সত্ত্বেও, দেবীর বজ্রায় একজন খেতকায় ব্যক্তির সম্মুখে বীৰ্য্য দেখাইতে পারিলেও, দেবীর বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে সে প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলীর সংঘটনে ও পরিণামে তাহার ব্যক্তিত্ব—স্বাধীন অভিব্যক্তি কোথাও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় নাই। প্রারম্ভে পিতাব সম্মুখে জায়ের পক্ষেও বাক্য ব্যবহাবে অপারক, অন্তে পত্নীর বিশালতার কাছে সঙ্কুচিত। ব্রজেশকে যতটা উৎকৃষ্ট করিয়া অঙ্কন করা হইক না, কবি তাহাকে প্রাধান্য দিতে চান নাই; অত্যা গ্রন্থের নামে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন কবিরও অভিপ্রেত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র Stuart Mill প্রণীত Subjection of Women পড়িয়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন করিতে হইলে নারীরও সমান মর্যাদা দবকার, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবং হিন্দুর সনাতন ধর্মমতকে লঙ্ঘন না করিয়া নারীকে বিরাট মর্যাদা দিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস মোট ১৪ খানি; তন্মধ্যে ১০ খানি নায়িকাব নামানুসারে নাম পাইয়াছে। ‘বিষবৃক্ষ’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘রাজসিংহ’ এমন কি ‘আনন্দমঠ’ ভিন্নজাতীয় নামাঙ্কিত হইলেও নারীর প্রভাবমুগ্ধ নয়। ‘চন্দ্রশেখরে’ স্বামী চন্দ্রশেখরদেব চৈয় শৈবলিনীর প্রভাব খুব বেশী। ‘রাজসিংহে’ রাণাব প্রতাপের পাশ্বে চকলকুমারীর তেজোময়ী মতি সব সময়েই ভাসিতে থাকে। শাস্তি ‘আনন্দমঠ’কে সত্যই আনন্দময় করিয়াছে। তাই বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করিয়া ‘দেবী চৌধুরাণী’তে প্রধান চরিত্র নারী।

প্রাচীন প্রথা অনুসারে, প্রত্যেক গ্রন্থে নায়ক এবং নায়িকা, Hero and Heroine যদি একান্ত থাকা দবকার হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া ব্রজেশকে নায়ক এবং দেবীকে নায়িকা বলিতে হয়। কিন্তু আমরা ‘দেবীচৌধুরাণী’তে ‘দেবী’কেই প্রধান ব্যক্তি না বলিয়া পারি না। (ক্রমশঃ)

১০. ‘দেবীচৌধুরাণী part 2, chap. 8,

১১. Prof. Amiya Kumar Sen M. A., (Cal. University) writes in the Cal. Review, Oct. 1938,

১০৬ ‘চরিত-কথা’ p. 34

১০৭ ‘বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম’ by হারাণচন্দ্র রক্ষিত

১০৮ আধুনিক সাহিত্য by রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯ ‘ভপোবন’ by রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নয়

অনেক দিন পৰে বিশ্বনাথকে সামনে বসিয়ে থাওৱালেন।

। আজ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেছে, নিজের মধ্যে একটা বিষময়কর পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করছেন বিশ্বনাথ। মনের মধ্যে কোথায় একটা নিভৃত দুৰ্বলতার বীজ পড়ে ছিল—এতদিন পৰে সেটা যেন ফুলে ফলে রূপায়িত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বাইরে ভাঙন ধরেছে—অজগর সাপের মতো লালা হরিশরণের ঋণের বন্ধন চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরছে তাঁকে। অবশিষ্ট ছিল সোনাদীঘির মেলা—কুমারদত্ত রাজবংশের শেষ একচ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু তাও আজ হরিশরণের হাতে তুলে দিতে হল। কোথাও কিছু আর বাকী থাকবে না। তাই কি বিশ্বনাথের মন আজ আকাশমিক ভাবে ঘবের দিকে ফিরে গিয়েছে? তাই কি আজ মনে হচ্ছে অপর্ণার কাছে এমন একটা কিছু আছে যেখানে তাঁর শেষ আশ্রয়? ৰাত্ৰির অন্ধকাৰে গুঁৱাও মেয়েদেৱ মাংসস্তুপে কামনাব আঙুন লেলিত হয়ে ওঠে—মদে আর মত্ততাৰ মধ্যে বাঘবেল্লু ৰায় বস্ত্ৰাৰ জড়তা-জীৰ্ণ ৰং-মহালে যেন দূৰবিস্মৃত লক্ষ্মীয়েৰ সেই সৱয় বাদ্ৰীজীৰ নূপুৰেৰ নিকণ স্তনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ৰাত যখন শেষ হয়, তখন, তখন? গ্লানি আৰ অবসাদ। মদ নয়, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। আজ কি সমস্ত জীবনের ওপৰ থেকে সেই বাত প্ৰভাত হয়ে গেল? সে ৰাত কি আৰ কোনোদিন ফিৰে আসবে না? এক পাত্ৰ শীতল জলের মতো অপর্ণা কি সমস্ত জালা জুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু অপর্ণা। অপর্ণা ইংরেজী জানে, অপর্ণা নিজের বিছানার গৰ্ছে বিশ্বনাথকে ব্যঙ্গ করে।

অপর্ণার ব্যবহারে কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না।

বেলা পড়ে এসেছে; দিনান্তের আলোয় ধূসর হয়ে আসছে দিগ দিগন্ত। দেউড়ির ভাঙ্গা সিংহ দুটো বিকেলের স্নান আলোয় যেন ক্লান্ত বিষন্নতার প্ৰতিচ্ছবি। কাছাৰীবাড়িৰ কবুতৰগুলো দূৰেৰ মাঠ থেকে ধান খাওয়া শেষ করে ফিৰে আসচে। নীড় আৰ শাবকেৰ জন্তু ব্যাকুল উৎকণ্ঠ।

অসীম শ্ৰান্তিতে বিশ্বনাথ একখানা ডেক চেয়াৰে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন অপর্ণা। স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, সাদাৰিন এমন পাগলের মতো ছুটোছুটি কবে বেড়াও কেন?

নীড়মুখী কবুতৰগুলোর দিকে দুটি নিবন্ধ রেখেই নিরুৎসুক গলায় বিশ্বনাথ বললেন, কী করব?

করবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু তুমি পথ খুঁজে পাছ না।

পথ খুঁজে পাছ না?—দেবীকোট ৰাজবংশেৰ সামন্ত-ৰক্ত একবাৰ চলকে উঠেই আবাৰ নিৰুত্তাপ হয়ে গেল। আলগ্ন আৰ অবসাদেৰ মতো পাণ্ডুৰ সক্ষা। সক্ষাৰ এত কৰুণ কোমল ৰূপ যেন আৰ কখনো বিশ্বনাথৰ চোখে স্পড়ে নি। আৰ সেই সক্ষা মোহ ছড়িয়েছে—কৰুণ প্ৰশান্তি ছড়িয়েছে বিশ্বনাথৰ মনে।

না।—অপর্ণা তেমনি স্নেহ-মধুর গলাতে বললেন, পথ খুঁজে পাছ না তুমি। একটা কথা এখনো বুঝতে পাৰো নি। তিন শো বছৰ আগে পৃথিবী যা ছিল আজ আর তা নেই।

বিশ্বনাথ নিৰ্ৰোধ আৰ হতাশ চোখ মেলে অপর্ণাৰ দিকে তাকিয়ে ৰইলেন। কথাগুলোর অর্থ তিনি এখনো ধৰে উঠতে পাৰছেন না। শুধু অনাসক্তভাবে তিনি অপর্ণাৰ বক্তব্যের গতিটো লক্ষ্য করতে লাগলেন।

অপর্ণা লঘুভাবে আঙুলগুলো বুলাতে লগলেন বিশ্বনাথের কক্ষ অবিকল চুলের মধ্যে।

—আজ নতুন দিন। ৰাজাৰ অধিকাৰ আজ টলে গেছে, এটা লালা হরিশরণের যুগ। এয়ুগে হরিশরণেৰ জোৰ বেশ, তায়া জিতবেই। তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও না, কিন্তু ব্যোমকেশ সব জানিয়ে গেছে আমাকে। সোণাদীঘির মেলা চলে গেল, এৰ পৰে তুমি দাঁড়াৰে কোনখানে?

—সোনাদীঘির মেলা চলে গেল।—ডেক চেয়াৰেৰ ওপৰ বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বললেন, কখনোই না। তুমি দেখো অপর্ণা, ও মেলা কিছুতেই ওৰ ভোগে লাগবে না—কখনোই না। আমিও এবাৰ দেখে নেব ওই বেণেৰ বাচ্চাকে, দেখে নেব কাৰ জোৰ কতখানি।

অপর্ণা স্নেহ হাসলেন। শীতল একপানা স্নিগ্ধ হাত রাখলেন বিশ্বনাথের কপালে। আশ্চৰ্য, অপর্ণাৰ হাতেৰ স্পৰ্শ এত মধুর! মনেৰ সমস্ত উত্তেজনা যেন কিমিয়ে মৰে যায়—যেন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

—কী কববে? লাঠালাঠি কববে, মেলা ভেঙে দেবে? কী লাভ হবে তাতে? ফৌজদারী। কী জিতবে তাতে? তোমার কত টাকার জোৰ আছে যে লড়াই কববে তুমি ওই বেণেৰ বাচ্চাৰ সঙ্গে? বৰং তোমার যা আছে তাও শেষ হয়ে যাবে, জিত হবে কাৰ?

বিশ্বনাথ চুপ করে ৰইলেন। এসব কথা কি কখনো ভাবেন নি তিনি? নিশ্চয় ভেবেছেন, অনেকবাৰ ভেবেছেন। মনের দিক থেকে যতটা নিৰ্ৰোধই তিনি হোন না কেন, এসব অতি সাধাৰণ সত্যকে বুঝাব মতো বুদ্ধি তাঁব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বোবাটাই তো আৰ সব নয়। মদেৰ পাত্ৰে যে মৃত্যুৰ বিন ফেনিয়ে ওঠে—উচ্ছ্বল উদ্ভত ৰাত্ৰিগুলো যে নিয়তিৰ মতো একটা নিষ্ঠুৰ আৰ অনিবাৰ্য্য পৰিণতিৰ ইঙ্গিত কৰে—এ তথ্যকে তিনি চেতনা দিয়ে শিৱান্দ্ৰিয় দিয়েই অমুভব কৰেছেন। কিন্তু দেবীকোট ৰাজ-বংশেৰ ৰক্ত। সে ৰক্ত একাধাৰে আশীৰ্বাদ আৰ অভিশাপ। তীব্ৰ বহুজালাৰ মতো তা নিজেকে ৰাজমহিমায় জাগ্ৰত কৰে ৰাখে, আবাৰ তীব্ৰ বহুজালাৰ মতোই ইন্ধনেৰ দাবীতে সে নিজেকেই দাহন কৰতে থাকে। সমস্ত বুঝেও ৰক্তেৰ মধ্যে সেই বংশক্ৰমেৰ শৃঙ্খল-বন্ধন বিশ্বনাথ অমুভব কৰতে থাকেন। অপ্ৰতি-হত প্ৰতাপে ৰাজত্ব কৰে—নিজের ইচ্ছাৰ ওপৰে কোথাও ৰাশ টেনে দিহো না, ভেঙে চূৰে সব শেষ কৰে দাও। ৰাজা ঈশ্বৰেৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি—বিধাতাৰ দূত। তাকে বাধা দিতে পাৰে কে, কে তাকে কথতে পাৰে?

তাই বিশ্বনাথ বাধা দিলেন না, অপর্ণার কথার প্রত্যুত্তর দিলেন না। এর মধ্যে সত্য আছে। 'যা আর কারো কাছে গুনতে ভালো লাগত না—যা লাগত নিজের আত্মমর্যাদায়, অপর্ণার স্নেহস্বিচ্ছ পরিচর্য্যার সঙ্গে তাঁর যেন একটা নতুন আবেদন নিয়ে মনের কাছে এসে দেখা দিল। দেউড়ির সীমা ছাড়িয়ে চোখের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে। সিংহদ্বারের হিজলবন যেন গাড় কালীর স্নেহায় চক্ৰবালে আঁকা রয়েছে। ওই জঙ্গলে একদিন বাঘ থাকত, থাকত শূন্যচূড়—নীল গাইকে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরত অতিকায় ময়াল সাপ। আজ ওখানে রাখালের গোরু চরায়—বাঁশি বাজায়। কুমীরমারার কাঞ্চন নদীর নীল জল থেকে কুমীরের বংশ উচ্ছন্ন করেছে—গোরু চরানো শেষ করে রাখালেরা ওই নদী সাঁতার দিয়ে ওপারের গ্রামে চলে যায়। তিনশো বছর! তিনশো বছর কেন, পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল, তাও কি আজ আছে? রামসুন্দর লালা একদিন কুমারদহ রাজবাড়িতে ঘোড়াকে চাল শেখাত, এ কথা আজ কি কারো মনে পড়বে কখনো?

ইঠাৎ নিজের অত্যন্ত সজাগ মর্যাদাবোধ, দেবীকোটের রক্তের অনমনীয় উদ্ভূত যেন কী একটা মস্তবলে শাস্ত হয়ে গেল। অত্যন্ত নতুন—অপ্রত্যাশিত গলায়, আশ্রয়ার্থী মতো অসহায় স্বরে বিশ্বনাথ অপর্ণাকে বললেন, তুমি কী করতে বলো?

অপর্ণা জয়ের পূর্বাভাস অনুভব করলেন—অনেক দিন পরে নিজের মধ্যে ফিবে এলেন তিনি। কুমারদহের অসুখাম্পশ কুলবধু নয়—পাটি আফিসের অপর্ণা, ভূগ-মিছলের অপর্ণা।

—তুমি জমিদার, জমির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আর সেই জমির মালিক যারা—জমি যারা চাষ কবে, তাবাই তো তোমার আপনাব লোক। তাদের জোবেই তোমার জয় হবে। তুমি একা কেন?

—একা কেন?—বিশ্বনাথ যেন চমকে গেল। সত্যি তো—আজ কেন তাঁর এই নিঃসহায় একাকিত্ব। তাঁর অসংখ্য প্রজা যদি আজ এসে দাঁড়ায়—তা হলে তাঁর মতো শক্তি কার আছে। কোনো হরিশরণের সাধ্য নাই তাঁকে জয় করতে পারে।

অপর্ণা বললেন, তিনশো বছর ধরে ওদের অস্বীকার কবে এসেছে তোমরা। ওদের কাছ থেকে শুধুই নিয়েছ, এতটুকুও ফিরিয়ে দাও নি। আজ একটুখানি ওদেব কাছে নেমে এস—একবার ওদের স্বীকার করে নাও, দেখবে আর কোনো ভাবনা নেই। মনে রেখো ওদের আপনাব জন যদি কেউ থাকে, তা হলে সে জমিদার—জমিদারের সঙ্গেই ওদের হাত মিলবে সুকুলেব আগে। আব মহাজন! সে যে ওদের কতখানি শত্রু—তা বোঝবার দিনও ওদের আসছে।

বিশ্বনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইলেন অপর্ণাব মুখের দিকে। কিছু একটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু ঠিক ধবতে পারছেন না। বাইরে রক্তসন্ধ্যা। ক্রমে কালো হয়ে আসছে। আর আধো অন্ধকারে অপর্ণার মুখখানা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু কী একটা সম্ভাবনা আর আশার সংকেতে সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—বিশ্বনাথের অনুভূতির মধ্যে সেটা সঞ্চারিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা ভেবে দেখব।—ক্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। উঠবার ইচ্ছা ছিল না, 'এই সন্ধ্যা আর অপর্ণাকে কেমন ভালো লাগছিল, কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল চেতনাকে'। কিন্তু উঠতেই হবে—অনেক কাজ। এ সব কথা পরে ভাবলেও চলবে, তার আগে ব্যোমকেশের সঙ্গে লালাজীর টাকাগুলো পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্বেই সদরে লোক না পাঠালে লাটের নীলাম বোধ করা যাবে না।

মস্থর বিষয় পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন বিশ্বনাথ, আগে আগে লঠন ধবে চলল মতিয়া। আর বারান্দার রেলিং ধরে খুঁকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা নির্নিমেস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাঁধানো উঠানের ওপর দিয়ে ভাবাতুর পায়ে বিশ্বনাথ এগিয়ে চললেন। অপর্ণার কথাগুলো মনেব মধ্যে থেকে থেকে গুঞ্জন তুলছে—এতদিন পবে কোথায় যেন জাগিয়ে তুলছে একটা মুহু অথচ তীব্র আলোড়ন। ওদের দাবীকে স্বীকার কবে নিতে হবে, ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে এই মিলন সম্ভব, কী ভাবে চলবে ওদের সঙ্গে হাত মেলানো, ওদের দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া। দেবীকোট রাজবংশ কারো দাবীকে স্বীকার করে না কোনো দিন, শুধু নিজের দাবীকেই প্রতিষ্ঠা করে যায়। তিনশো বছর ধবে আগুন আর রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আজ কি তাব একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল?

কাছারী-বাড়ির সামনে আসতেই শোনা গেল ব্যোমকেশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তীব্র গলায় সে বলছে, না, এ অপমান চূড়ান্ত অপমান। কখনোই এ সহ্য করা যায় না। আমরা মরি নি এখনো।

কাছারীতে ঢুকে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?

বিশ্বনাথকে দেখে ব্যোমকেশ তেমনি উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। বললেন, এই যে ভজুব—নিজেই এসেছেন। শুনুন—এই মার্গিক ঘোষের কাছেই ব্যাপাবটা শুনুন।

মার্গিক ঘোষ আকর্ণ বিস্তৃত হাসি চেসে সাষ্টাঙ্গে বিশ্বনাথকে প্রণাম করল। বিশ্বনাথের প্রজা—সোনাগঞ্জের তাটে দই ফীর বিক্রী করে। মোটাসোটা মাঝাঝি বয়সের মানুষ। অত্যন্ত সাদা-সিঁধে লোক—জমিদারের অতিশয় অনুগত। কুমারদহ রাজবংশের প্রতি তার বংশানুক্রমিক শ্রদ্ধা—চার পুরুষ এখানে সে নিয়মিত ভাবে দই ফীরের নজর আব যোগান দিয়ে আসছে।

—ব্যাপার কী মার্গিক?

মার্গিক সংকুচিত হয়ে গেল।—আজ্ঞে এই আলুকাপের দল।

—আলুকাপের দল?—বিশ্বনাথ ভ্রূকৃষ্ণিত করলেন। কী একটা কথা মনে পড়ে গেল চকিতের মধ্যে।—ঠিক ঠিক, আজ তো ওদেব সোনাদীঘির মেলায় গান গাইবার কথা ছিল। আসে নি কি?

—আজ্ঞে আসবে কি?—ব্যোমকেশ সশব্দে ফেটে পড়ল: কেন আসবে তারা? নবীপুরের কাঁচা পরসা—লালা হরিশরণ ওখানকার লাট সায়েব। এক একরাত পঁচিশ টাকা করে পাবে,

দশ টাকা দরে কেন তার গান গাইতে আসলে সোনাদীঘির মেলায় ?

বিশ্বনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, “ব্যোমকেশ তুমি খামো। যা বলবার তা মাণিক ঘোষকেই বলতে দাও। কী করেছে আল্কাপের দল ?”

মাণিক ঘোষ বিব্রত বোধ করল। সোনাগঞ্জের হাটে সমস্ত ব্যাপারটার নীরব দর্শক ছিল সে, ব্যোমকেশের কাছে তারই খানিকটা সরল বর্ণনা দিয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে এতখানি গোলমাল আছে, তা সে কল্পনাতে আনতে পারেনি। পারলে কখনই বলত না। সে ছাঁ-পোষা মানুষ, সকলের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়। লালাজীর প্রতাপ তারও অক্ষিত নয়। কুমার বিশ্বনাথের প্রতি তার আনুগত্য আছে, লালাজীকেও সে ভেট দিয়ে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। ঐহিক এবং পারত্রিক জগতে তেত্রিশকোটি—তারও অনেক বেশী যত দেবতা আছে, সকলকেই তুষ্ট করবার জন্তেই সে প্রস্তুত।

বার কয়েক দ্বিধা করে টাকা চুলকে মাণিক ঘোষ ব্যাপারটা বিবৃত করে ফেলল। ব্যোমকেশ কথার মধ্যেই বার বার লক্ষ্য-বস্প করতে লাগল, বলতে লাগল, এ অপমান সহ্য করে গেলে কুমারদেহের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় থাকবে না। আব বিশ্বনাথের সর্বাস্তে হিংস্রতা বীজিত এমন ভাবে শিখায়িত হয়ে উঠল যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরোল না। এতক্ষণ ধবে অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে নেশার মতো যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—মুহূর্তের আগ্নেয়-কষাঘাতে তা মিলিয়ে গেল। প্রজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়ে যদি লালাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তা হলে তার স্বযোগ পরে ঢের পাওয়া যাবে, কিন্তু তার আগে—

বিশ্বনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—বহুদূর সম্মিলিত চীৎকার ভেসে আসছে। কিন্তু একটু কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে—ওটা চীৎকার নয়, গান। কাল থেকে সোনাদীঘির মেলা, মেলার যাত্রীরা রাতে উৎসবের আয়োজন করেছে।

মাণিক ঘোষ বললে, রূপাপুরের কামারেরা খুব গান জমিয়ে বসেছে। ভায়ে ভায়ে তাড়ি চলছে, আর তাব সঙ্গেই—

রূপাপুরের কামারেরা! ঠিক। মুহূর্তে বিশ্বনাথের মনের মধ্যে সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্বনাথ বললেন, লাঠি ধরবে ওই রূপাপুরের কামারেরা। ভেঙে দেবে—উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। দেখব বেনের বাচ্চা এবার সোনা-দীঘির মেলা থেকে কত টাকা লুটে নিতে পারে।

মাণিক ঘোষ কথাটা শুনে শিউরে উঠল। মেলার সে-ও দোকান নিয়ে এসেছে। মেলা যদি লুট হয়ে যায়, তা হলে তারও বিপদ কম নয়। তা ছাড়া মাণিক ঘোষের টাকার নাকি ঞ্চাওলা পড়ে—এমন একটা জনশ্রুতি সর্বসাধারণে চলিত আছে। অতএব বুদ্ধিমানের মতো কালই দোকান-পাট তুলে নেওয়া ভালো। তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতলবটাও লালাজীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মাণিক ঘোষ সাধাসিধে নিরীহ মানুষ, কারও

সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সুতরাং দু’জনকে খুঁসি করাই তার উচিত।

বিশ্বনাথ বললেন, ব্যোমকেশ, আমার সঙ্গে এস।

—কোথায় ?

—চল, রূপাপুরের কামারদের খবরটা একবার নিয়ে আসা যাক।

কুমারদেহ রাজবাড়ী থেকে সোনা-দীঘি মাত্র ছটাকখানেক পথ। একটা বড় আমবাগান, তারপরে ছোট একখানি তৃণবিয়ল কংকরমণ্ডিত মাঠ পেরোলেই দীঘির উঁচু পাড়টা চোখে পড়ে। আগে ওই পাড়টা ছিল পাহাড়ের মতো উঁচু—কিন্তু বছর বছর ওখানে মেলা বসাতে পাড়টা ধসে ধসে ঢালু আর জায়গায় জায়গায় প্রায় সমতল হয়ে গেছে।

দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সোনা-ফকিরের ভাঙা দরগা। ওপরে গম্বুজ নেই—প্রায় বারো আনী অংশেরই ছাদ ভেঙে পড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি ইট আর পাথর ছড়ানো। দরগায় ঢুকবার প্রধান দরজার দু’পাশে সম-চতুর্কোণ কতকগুলো কষ্টি-পাথর সাজানো—লাল লাল ছোট ইটের সঙ্গে বেমানান, দেখলেই বোঝা যায় স্থানান্তর থেকে সংগ্রহ করে ওদের ওখানে সর্গোরবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু সর্গোরবে নয়, বিজয়-গোরবে। গোড়-বঙ্গজয়ী মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত দেবমন্দির থেকে সংগৃহীত শিলাখণ্ড। তাদের বুক দ্বয়ে আসা পয়ের চিহ্ন এখনো দেখা যায়, দেবমন্দির অস্পষ্ট রেখাঙ্কন এখনো চোখে পড়ে। ঠিক সদর দরজার পেছনেই পাশাপাশি দুটি খেত-পাথরের সমাধি। একটির ওপরে নানা রঙের কাচের টুকরো দিয়ে মিনে করা, সেটি সোনা-ফকিরের, পাশেরটি কার ইতিহাস সে কথা বলতে পারে। আর একপাশে কালো পাথরের একটা দীপাধার—ওখানে ফকিরের নামে বারোমাস ‘চিরাগ’ জ্বলে। তেল পড়ে পড়ে তার অর্ধেকটাতে একটা পুরু কালো আস্তরণ জমে উঠেছে।

দরগাকে কেন্দ্র করে কোথাও উঁচু পাড়ের ওপর, কোথাও বা নীচের ইট পাথর ছড়ানো সমতল মাটিতে অর্ধচন্দ্রাকারে মেলার ছাউনিগুলো মাথা তুলেছে। আর তারই একটা ছাউনিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে রূপাপুরের কামারেরা। এরই মধ্যে হাপর বসিয়েছে, আগুন জালিয়েছে—সোনা-দীঘির উত্তরপাড়ে মেলার যে-সমস্ত গাড়ি এসে আস্তানা গেড়েছে, এর মধ্যেই তাদের চাকাতে লোহার পাত পরিয়ে দিতে শুরু করেছে ওরা। ওদের দেখে এখন কে বুঝতে পারে যে, মেলা ভেঙে দেওয়াই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার জন্তে ওরা কুমার বিশ্বনাথের কাছ থেকে একশো টাকা আগাম বায়না নিয়েছে।

কিন্তু দুদিন পরে যা হবার তা হবে, আপাততঃ ওরা মনের আনন্দে গান জুড়ে দিয়েছে। তিন চারটে বড় বড় মশাল জ্বলে পুঁতে দিয়েছে মাটিতে, চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে মেলার কোঁতুহলী দর্শকের দল। শ্রবণ ঢোল বাজাচ্ছে, রামনাথ একটা করতাল পিটিছে ঝম ঝম করে। একজন প্রাণপণে বেসুরা একটা বাঁশি বাজাচ্ছে, আর একজন দু’হাতে কতকগুলো ধূসর নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাল দেবার চেষ্টা করছে। আর মাঝখানে বসে সমস্ত

গান জুড়েছে ভানী, কামিনী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি যুবতী আর প্রোটা। তাড়ির পাঁজি চুমুকে চুমুকে নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে, গানের মধ্যে আসছে মত্ততার আমেজ। দর্শকেরা কখনো কখনো এক একটা অন্নীল উক্তি করছে, কখনো বা বলে উঠছে, বাঃ—বাঃ—বাহবা!

তারই মধ্যে সবটার স্বর কেটে দিয়ে একবার চকিত কলরব জেগে উঠল।

—জমিদার, জমিদার!

বসভঙ্গে বিরক্ত এবং সজ্জ হইয়া জনতা উঠে দাঁড়াল। গান বন্ধ করে মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে সরে বসল একপাশে। ঢোল, করতাল, বাঁশি আর ঘুংঘরের বাজনা মুহূর্তে থেমে গেল।

বিশ্বনাথ ডাকলেন, ওস্তাদ!

সামনে এসে আড়ম্বি অভিবাধন জানাল রামনাথ। পেছনে পেছনে এল স্বরব, এল বৈজু।

—সব ঠিক আছে?

রামনাথ মাথা নীচু করে রইল। স্বরবের পেছিতে লাগল হিংস্রতার মত্ত আশ্বোলন। বৈজুর চোখ ছোটো সাপের মতো কুটিল আর বিবাক্ত হয়ে উঠল—মশালের রাজা আগুন প্রতিকলিত হতে লাগল সেই চোখে।

জবাব দিলে বৈজু। শাস্ত গলার বললে, হাঁ হুজুব, সব ঠিক আছে। আপনার চাকর আমরা।

—বেশ, মদে থাকে যেন।—ঠোটের ওপর বিশ্বনাথের দাঁত চেপে পড়ল: কোনো ভাবনা নেই তোদের।

শেষ পর্যন্ত যা হবে, তার দায় আমার।

রামনাথের মুখে ক্লান্তি আব অবসাদের ছায়া। কিন্তু স্বরবের সমস্ত চেতনায় রূপাপুরের বিজ্রোহী পূর্বপুরুষেরা সাড়া দিয়ে।

। অতীতের সন্মাত্র আর অতীতের সৈনিক।

বিশ্বনাথ বললেন, থামলে কেন, গান চলুক তোমাদের।

একজন কোথা থেকে এর মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ঝোঁগাড় করে এনেছে। বিশ্বনাথ চেয়ারে ভালো করে চেপে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ে গেল ভানীর ওপর—এমন সুগঠিত, এমন পূর্ণায়ত! রাঘবেন্দ্র রায় বর্ষার লালসা আর লোভ উত্তর পুরুষের সমস্ত শিরা-স্নায়ুগুলোকে মাতাল করে দিলে। কোথায় রইল অপর্ণা, কোথায় রইল আসন্ন সন্ধ্যার সেই আবিষ্ট আচ্ছন্নতা। কী হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে—কী হবে লাল হরিশরণের কথা ভেবে। আপাতত: এই মুহূর্তটাই সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ভানীর এই উচ্ছলিত যৌবনত্ব। বিশ্বনাথ ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করলেন দু বোতল মদ জোগাড় করে আনবার জন্তে—আর দু চোখের তীব্র নিলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে যেন গিলতে লাগলেন ভানীকে। ওপাশ থেকে বৈজুর সাপের মতো তীক্ষ্ণ চোখ বার বার এসে বিশ্বনাথের মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল—আর কেউ না হোক, সে বিশ্বনাথকে বুঝতে পেরেছে।

বৈজু মুহূর্ত হাসল। ভানী একদিন ঘটির ঘারে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে কথা বৈজু ভোলে নি—প্রতীক্ষা করে আছে। আজ তার প্রতিশোধের দিন ফিরে এসেছে হয়তো।

রাত বাড়তে লাগল। এল মদের পাঁজি, শব্দ হয়ে চলল তাড়ির ভাঁড়। ওদিকে নিজের ঘরে বসে কী একখানা বই পড়তে পড়তে বার বার উৎকর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন অপর্ণা। জানলার ফাঁকে বাইরে শুধু কালো অন্ধকার—আকাশে জলন্ত সপ্তর্ষি। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সোনাদীঘির দিক থেকে ঢোলের শব্দ আবে উত্তাল আর উন্নত হয়ে উঠছে।

—ক্রমশ:

বিজ্ঞান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ

কিন্তু তার আগে তড়িৎ পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কাচের নল রেশমের রুমালের সঙ্গে ঘষলে উভয়ই তাড়িৎ হয়। এক কথা বলা হয় এই জ্ঞান যে, ঘষবার পর দেখা যায়, প্রত্যেকেই ওরা কাগজের টুকরা এবং অজ্ঞাত হাল্কা পদার্থকে অনায়াসে আকর্ষণ করে থাকে। অহুমান করতে হয়, ঘর্ষণের ফলে ঐ নলটা এবং রুমালখানা এমন কোন পদার্থের মালিক হয় যার ফলে ওদের ঐরূপ আকর্ষণ-ক্ষমতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই অজানা পদার্থের নাম তড়িৎ বা বিদ্যুৎ। আরো দেখা যায় যে, যদি ছুটা কাচের নলকে ছু'খানা রেশমের রুমালে ঘষা যায় তবে কাচের নল ছুটা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং রেশমের রুমাল দু'খানাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; কিন্তু

প্রত্যেকটা কাচের নলই প্রত্যেকটা রুমালকে আকর্ষণ করে। এর থেকে অহুমান করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে কাচে ও রেশমে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তার ভিন্ন প্রকৃতির। মোটেব ওপর ছু'প্রকার তড়িৎের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় এবং বলতে হয়, ছুটা সম-জাতীয় তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিষম জাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

উক্তপ্রকারের ঘর্ষিত কাচের তড়িৎকে বলা যায় ধন-তড়িৎ এবং রেশমের তড়িৎকে বলা যায় ঋণ-তড়িৎ। স্তবরাং সংক্ষেপে বলতে পারা যায়—ধনে-ঋণে আকর্ষণ এবং ধনে-ধনে বা ঋণে-ঋণে বিকর্ষণ ঘটে। আরো দেখা যায় যে, ঘর্ষণের পর যদি কাচের নল ও রেশমের রুমালকে একত্র করা যায় তবে সংযুক্ত অবস্থায় ওরা বাইরের কোন পদার্থকে আকর্ষণ করে না, অর্থাৎ উভয় তড়িৎ

মিলে বিশেষ একটা তড়িৎবিহীন অবস্থা জ্ঞাপন করে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঘর্ষণের ফলে যে ধন ও ঋণ তড়িৎের আবির্ভাব হয় তাবা পরিমাণে সমান এবং যদি সমপরিমাণে উভয় তড়িৎের মিলন ঘটে তবে ওরা পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে তড়িৎ-হীন অবস্থার সৃষ্টি করে। আরো দেখা গেছে যে, কেবল কাচের নল ও রেশমের কমালই নয়, বিভিন্ন প্রকৃতির যে কোন পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণে ফলেই একটায় ধন ও অপবটায় ঋণ তড়িৎের উৎপত্তি হয় এবং পরিমাণেও ওরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সমান। এর থেকে এবং অজ্ঞাত পরীক্ষা থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জড়জব্ব্য মাত্রই উভয় জাতীয় তড়িৎের আধার। যতক্ষণ ওর উভয় তড়িৎের মাত্রা সমান থাকে ততক্ষণ ঐ জড় পদার্থে—উভয় তড়িৎের কাটাকাটির ফলে—তড়িৎদ্বয়ের বিকাশ হয় না। দু'টা বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণের ফলে এই সমতা নষ্ট হয়—একটার ধন-তড়িৎ বেড়ে যায় এবং অপবটায় সম পরিমাণে কমে যায়। যেটার বাড়ি সেটা ধন-তড়িৎের এবং যেটার কমে সেটা সম পরিমাণে ঋণ-তড়িৎের আধার হয়। সুতরাং পদার্থ বিশেষকে তড়িৎস্বত্ব করার অর্থ পাড়ালো, ওর অন্তর্গত ধন ও ঋণ তড়িৎের সমতা নষ্ট ক'রে ওদের মধ্যে কার্যকর পানিকটা প্রাধান্য প্রদান।

কিন্তু তড়িৎ মূলতঃ কি পদার্থ তা' এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা থেকে জানতে পারা যায়না। তড়িৎের গঠন কিরূপ? তড়িৎ কণাময় না কল্পিত ইথেরের মত ক্রমভঙ্গহীন পদার্থ? তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ ধ'রে নিয়েছিলেন যে, তড়িৎ এক প্রকার সরিল পদার্থ (Fluid) এই পদার্থ ক্রমভঙ্গহীন ও ভাবহীন এবং এর অংশসমূহ পরস্পরকে বিকর্ষণ ক'রে থাকে। ভারহীন অমুমান করা হয়েছিল এই জন্ত যে, তড়িৎবিশিষ্ট হওয়ায় ফলে পদার্থের ওজনে তাঁরা কোন তারতম্য দেখতে পান নি। ঘর্ষণের ফলে এইরূপে যে তড়িৎের আবিষ্কার হলো তাকে বলা হয় ঘর্ষণজ তড়িৎ বা স্থির-তড়িৎ। স্থির-তড়িৎ বলা হয় এই জন্ত যে, এইরূপ তড়িৎ বিশিষ্ট কোন পদার্থকে কোন তড়িৎ-অপরিচালক (Non-conductor) আধারে রাখলে তৎক্ষণাৎ ওর তড়িৎের মাত্রা ঠিকই থেকে যায় এবং ঐ নির্দিষ্ট মাত্রা নিয়ে নানা পরীক্ষা করা চলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যালভানি প্রবহমান তড়িৎের ক্ষম্তিষ্ক আবিষ্কার করলেন। এর কিছুদিন পরে ভল্টা দেখালেন যে, একটা কাচের পাত্রে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে তার ভেতর একটা তামার চাকতি ও একটা দস্তার চাকতি দাঁড় করিয়ে রাখলে তাম্রখণ্ডটা ধন-তড়িৎ এবং দস্তা-খণ্ড ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ তড়িতাধারকে বলা যায় তড়িৎ-কোষ। আরো দেখা গেল যে, ঐ চাকতি দু'টাকে যদি একটা তামার তার (বা অল্প কোন তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ) দ্বারা বাইরের দিক দিয়ে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া যায় তবে এই চক্রের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হ'তে থাকে। প্রবল তড়িৎ-স্রোত পেতে হ'লে একটা তড়িৎকোষের বদলে পর পর সংযুক্ত বহু কোষ ব্যবহার করতে হয়। এইরূপ কোষের সমষ্টিকে বলা হয় বৈদ্যুৎ-ব্যাটারী।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে উরেষ্টেড্ তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধিত একটা তামার তার চুম্বকের ওপর বিশিষ্ট ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। একটা চুম্বক শলাকার সূতা বেঁধে বুলিয়ে দিলে স্বভাবতঃই শলাটা উত্তর-দক্ষিণ দিক-বরাবর অবস্থান করে। উরেষ্টেড্ দেখালেন যে, তড়িৎ-প্রবাহবিশিষ্ট একটা তারকে যদি চুম্বক-শলাকাটার সমান্তরাল ভাবে, এবং ওর ঠিক ওপরে বা নীচে ধ'রে রাখা যায়, তবে চুম্বকটা ঘুরে গিয়ে পূর্ব-পশ্চিম দিক-বরাবর অবস্থান করতে চায়। এর থেকে এইটা প্রতিপন্ন হলো যে, তড়িৎ-প্রবাহ চুম্বক-ক্ষেত্রের ওপর বলপ্রয়োগ করে। এবং এই বল কতকটা সৃষ্টিছাড়া ধরনের। কারণ, বলটা আকর্ষণও নয় বিকর্ষণ-বলও নয়, পরন্তু তড়িৎ-প্রবাহটার আড়-ভাবে (perpendicularly) অবস্থিত। আড়াআড়ি বল-প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রথম। এই পরীক্ষা থেকে আর একটা সিদ্ধান্তও আপনি এসে পড়লো। আমরা জানি ক্রিয়ামাত্রেরই সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং বলতে পারা যায়, তড়িৎ-প্রবাহ যেমন চুম্বক-ক্ষেত্রের ওপর, চুম্বক-ক্ষেত্রও সেইরূপ তড়িৎ-প্রবাহের ওপর উর্টাদিকে সমান বল প্রয়োগ করবে। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত তারটা যদি স্বাধীন ভাবে চলবার সুযোগ পায় তবে চুম্বকের মত তারটাকেও উর্টাদিকে সরে যেতে দেখা যাবে। বস্তুতঃ ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

ফ্যারাডের আর একটা বিশিষ্ট পরীক্ষা থেকে তড়িৎ সম্বন্ধে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। পরীক্ষাটা হলো যৌগিক তরলপদার্থের বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ সম্পর্কে; আর তথ্যটা হলো এই যে, তড়িৎ জিনিসটা বস্তুত ক্রমভঙ্গহীন সরিল পদার্থ নয়, পরন্তু সাধারণ জড়পদার্থের মতই কণাময়,—অর্থাৎ তড়িৎের গঠনেও ক্রমভঙ্গ রয়েছে। পরীক্ষার বিষয়টা এখন না ভুলে তথ্যটার কথাটাই আগে আমরা বলবো। যৌগিক তরলপদার্থের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লবণাক্ত জলের উল্লেখ করা যেতে পারে। খাতরূপে আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তা' একটা যৌগিক পদার্থ। ওর রাসায়নিক নাম সোডিয়ম-ক্লোরাইড; কারণ রসায়ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, একটা সোডিয়ম-পরমাণু ও একটা ক্লোরিন-পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে এক একটা লবণের পরমাণু গঠিত হয়েছে। কিন্তু জলের ভেতর দ্রব অবস্থায় লবণের অণুগুলি আন্ত থাকে না। আরহিনিয়স্ এই মত প্রচার করলেন যে, জলে দ্রবীভূত হতে গিয়ে যৌগিক অণুগুলির অনেকেই ছুঁটকরা ভেঙ্গে যায়, ফলে সোডিয়ম এবং ক্লোরিনের পরমাণু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে; অধিকন্তু উভয় পরমাণুর অবস্থাই তখন তড়িৎস্বত্ব অবস্থা। সোডিয়ম-পরমাণু বহন করে খানিকটা ধন-তড়িৎ এবং ক্লোরিন-পরমাণুতে থাকে ঠিক সম-পরিমাণের ঋণ-তড়িৎ। সূক্ষ্মপরিমাণের কারণ গোটা অণুর অবস্থাটা ছিল তড়িৎবিহীন অবস্থা। বিভক্ত অণুর এই ভ্রাম্যমাণ ও তড়িৎস্বত্ব অংশদ্বয়কে বলা যায়, 'আয়ন' (ion)। বর্তমান ক্ষেত্রে সোডিয়ম ও ক্লোরিন-পরমাণু প্রত্যেকেই এক একটি আয়ন, কিন্তু ক্ষেত্র-

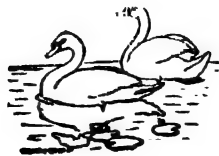
ভেদে কোন কোন আয়ন একাধিক পরমাণুর সমষ্টিও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বেরিয়ম-ক্লোরাইড নামক যৌগিক পদার্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেরিয়মের ভ্যালেন্সি বা সঙ্গ-স্পৃহা বা মাত্রা হচ্ছে ২ বা সোডিয়মের দ্বিগুণ। সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের অণু গঠিত হয়েছে প্রতিটি বেরিয়ম-পরমাণুর সঙ্গে একজোড়া করে ক্লোরিন-পরমাণুর সংযোগের ফলে। জলে দ্রবীভূত অবস্থায় এই অণু ভেঙ্গে গিয়ে ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট একটি বেরিয়ম-পবমাণু এবং সমমাত্রার ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ঐ অংশদ্বয়ের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জলের ভেতর বিচরণ করতে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে ‘আয়ন’ বলতে বোঝায় একটি বেরিয়ম-পরমাণু এবং একজোড়া ক্লোরিন-পরমাণুকে। প্রত্যেক স্থলেই অণুর ভাঙ্গনের ফলে আয়নব পরিণতি। এই ব্যাপারকে বলা যায় ‘আয়নী ভবন’ (ionisation)

জিজ্ঞাস্য হয়, যদি এক মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহাবিশিষ্ট সোডিয়ম-পরমাণুর তড়িৎের মাত্রা ১ ধরা যায় তবে দু’মাত্রার সঙ্গ-স্পৃহা-সম্পন্ন বেরিয়ম-পরমাণু কতটা তড়িৎ বহন করে থাকে? উক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, বেরিয়ম-পবমাণুর তড়িৎের মাত্রা হবে ২। কারণ, সোডিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পবমাণু বলছে, আমি বহন করি সোডিয়ম-পরমাণুর সমান তড়িৎ বা একমাত্রা তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-ক্লোরাইডের ক্লোরিন-পরমাণুগুলি বলবে আমরা উভয়ে বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ; সুতরাং বেরিয়ম-পবমাণু বলবে আমি একাই বহন করি ২ মাত্রার তড়িৎ, নইলে দুটি ক্লোরিন-পরমাণুর পাণিগ্রহণ করে আমার অল্পরূপ ক্ষুদ্র সংসারে তড়িৎ-বাহিনী অবস্থা ঘটতে পারতো না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে দেখতে পাওয়া যায় যে, ল্যান্থিম নামক ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে রয়েছে ৩ মাত্রার তড়িৎ। মোটেব ওপব একপ একটা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় যে, পরমাণুর সঙ্গ-স্পৃহা বা সঙ্গ-স্পৃহা যত সে বহন করেও থাকে সেই পরিমাণে তড়িৎ। এখন সঙ্গ-স্পৃহা নির্দেশ করতে হয় ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাধারা সুতরাং পরমাণুদের তড়িৎের মাত্রাও নির্দেশ করার প্রয়োজন ঐ সকল পূর্ণসংখ্যা দ্বারা। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, জড়দ্রব্যের মত তড়িৎপদার্থের গঠনও কণাময়। তড়িৎ-পদার্থ বিভাজ্য হলেও ওর বিভাজ্যতা বা একটা সীমা রয়েছে। সঙ্গ-স্পৃহা ১ পরিমিত এইরূপ আয়ন কিংবা পবমাণু যতটা তড়িৎ তার অন্তরে বহন করে ঐ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা বা তড়িৎ-পদার্থের সূক্ষ্মতম মাপকাঠি। সোডিয়ম বা ক্লোরিন-পবমাণুর মত হাইড্রোজেন-পরমাণুরও সঙ্গ-স্পৃহা ১, সুতরাং হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে যতটা তড়িৎ গ্রথিত হয়ে রয়েছে তাকেই ক্ষুদ্রতম তড়িৎ-কণা রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বাপেক্ষা

হাল্কা পরমাণুই বহন করে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম তড়িৎের মাত্রা; সুতরাং পূর্ণোক্ত টেবলে হাইড্রোজেন-পবমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যে ১ দ্বারা নির্দেশ করা গিয়েছে তা যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

আরহিনিয়সের উক্ত মতবাদ একটা অস্বাভাবিক মাত্রা; কিন্তু এর আগেই ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে বৈদ্যুত-বিলেপণ সম্বন্ধে যে নিয়মটা আবিষ্কৃত হয়েছিল তার থেকেই এই মতবাদ সমর্থন লাভ করেছে। আরহিনিয়সের উক্তি থেকে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, লবণাক্ত জল বা অম্ল কোন যৌগিক তরল পদার্থে ভেতর যদি তড়িৎ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করে—তড়িৎ-বল প্রয়োগ করা যায় তবে ধন-তড়িৎবিশিষ্ট আয়নগুলি দল বেঁধে ঐ বলের অভিমুখে এবং ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট আয়নগুলি তার উটাদিকে অভিবাহন শুরু করবে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, তরল পদার্থে তড়িৎ-স্রোত উৎপন্ন করার প্রণালীই হচ্ছে এইরূপ দ্বি-মুখী অভিবাহন সৃষ্টি করা। প্রত্যেক আয়ন তার নির্দিষ্ট তড়িৎের মাত্রাকে বন্ধে ধারণ করে, হয় তড়িৎ-বলের অভিমুখে নয় তা’র উটাদিকে ছুটে চলে এবং তারি ফলে তড়িৎ-প্রবাহ। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, বৈদ্যুত-বিলেপণের ফলে যতটা করে আয়ন (লবণ-জলের বেলায় সোডিয়ম-আয়ন ও ক্লোরিন-আয়ন) ঐ তরল পদার্থ থেকে উদ্ধৃত হবে তাদের ওজন এবং তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা একই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। এই নিয়মটাই ফ্যারাডের পরীক্ষা ও পরিমাপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কেন এই নিয়ম তার কতকটা ব্যাখ্যা পাই আমরা আরহিনিয়সের মতবাদ থেকে; এবং ফলে, আল্পবঙ্গিকভাবে এই তথ্যটাও আবিষ্কৃত হলো যে, তড়িৎ-পদার্থও জড়দ্রব্যের মতই কণাময়। তড়িৎ-কণাগুলি জড়-পরমাণুর মতই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও সঙ্গীম এবং জড়-পরমাণুদের মতই মস্ত কারবারী। উভয় শ্রেণীর কণাই সঙ্গীম মাপকাঠিরূপে কারবারের জগতে সমান মর্যাদার দাবি করে। বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো জড় এবং তড়িৎ উভয়ই কণাময় এবং ঐ কণাগুলি সঙ্গীম পদার্থ। সুতরাং এখন পর্যন্ত বাবগাবিক সত্য খাঁটি সত্যের মর্যাদা দাবী করে দাঁড়িয়ে রইলো এবং গাণিতিক সত্যের একমাত্র প্রয়োজন অস্বভূত হলো ব্যবহারিক সত্যগুলির বাস্তব রূপের কল্পনায় কোন ভুলভ্রান্তি না আসতে পারে সে-বিষয়ে সাবধান করার জন্য। দুই আর একে যে তিন হয় এ খুবই ঠিক কিন্তু এ-ঠিকের কোন মলাই থাকতো না যদি তিনটা জড়কণা বা তিনটা তড়িৎ-কণা সশরীরে বিচ্ছিন্ন থেকে এবং আমাদের অল্পভযোগ্য স্বরূপ নিয়ে গাণিতিকের কর্মমলার ভেতর উপস্থিত হতে না পারতো। ফলে এখন পর্যন্ত গাণিতিক বৈজ্ঞানিকের বাহন রূপেই কল্পিত হতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]



পথের বাঁকেই হঠাৎ ওর স্মৃতির তার সঙ্গে দেখা!...আখিনের ধোয়া আকাশে এক টুকরো উড়ো হাঙ্গা মেঘের মত একেবারে আচমকা, আকস্মিক। এরকম হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়াটা বড় আশ্চর্য্য ঠেকে অপূর্ব্বর কাছে, এত আশ্চর্য্য যে বিশ্বাস করতে পারা যায় না; অথচ এই অবিখ্যাত, অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্যটাই আজ হঠাৎ ওর সামনে এসে এমনভাবে চমক লাগিয়ে দিল যে, বিশ্বাস না ক'রেও কোনও উপায় নেই। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা, অথচ অপূর্ব্বর কাছে সেটা একটা মস্ত বড় হৈয়ালি, যার ইঙ্গিতে ও বোঝা হ'য়ে গেছে, অসাড় হ'য়ে গেছে, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। কি'রকবে ও? কিছু একটা বলতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কিছু না বলটাই যেন আরো সহজ ওর কাছে। একটা ভয়ঙ্কর দোটার পড়েছে অপূর্ব্ব, একটা বিকী আবর্তের ফেনিল উচ্ছুসে যেন টলমল করছে ও, কখন তলিয়ে যায় তার ঠিক নেই। স্মৃতির তা কিন্তু আর চূপ ক'রে থাকতে পারে না, ডাকে—“অপূর্না।” অপূর্ব্ব একটু হাঙ্গা হোল, খানিকটা নিশ্চিন্ততার ভেতর হঠাৎ যেন ও নিজেকে পারলো একটুখানি জানতে,—বিষাক্ত ঘাম দিয়ে জর ছেড়ে যাবার পর রোগী যেমন নিজেকে একটু জানতে পারে, ঠিক সেই রকম। অপূর্ব্ব স্মৃতির তার মুখের দিকে চায়, দেখে,—স্মৃতির তার হাতে একটা মস্ত বড় গোলাপ ফুলের তোড়া, আর তার ওপর ঢাকা জেলীর মত কোমল একটা হালকা ক্রমাল। মুহূ একটু হেসে স্মৃতির তা জিজ্ঞাসা করে—“খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছো, না?” অপূর্ব্ব একটু হাসতে চেষ্টা ক'রেও পারে না, তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—“একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছি বৈ কি! আজ পাঁচ বছর পরে হঠাৎ দেখা।” স্মৃতির তার ঠোঁটে এক টুকরো মরা, বর্ণহীন হাসি ভেসে ওঠে, মাথা নীচু ক'রে ও বলে—“আজ তোমার জন্মদিন, তাই আসছিলাম তোমায় ফুল-গুলো দিতে,...মাঝখানের পাঁচটা বছর তো আর আসতে পারি নি।” বছরদিন পরে আজ হঠাৎ অপূর্ব্বর মনে হোল,—আজ ওর জন্মদিন। একেবারেই ভুলে গেছলো ও,...জন্মদিনের কথাটা শুনে মন লাগলো না অপূর্ব্বর, বললো—“এসেছো যখন, তখন একবার বাড়ীতে চল স্মৃতির তা।” “না-না, বাড়ীতে আর এখন যাব না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি পেছনে...ফুলগুলো নাও”—স্মৃতির তা ফুলগুলো ভুলে দিলো অপূর্ব্বর হাতে। আবার এক মুহূর্ত্তের ছেদ...একটা অসম্মিত মুহূর্ত্তের মৃত্যু। নতুন মুহূর্ত্তের স্মৃতির তার প্রথমেই কথা বললো অপূর্ব্ব—“স্মৃতির তা, চল বাড়ীতে গিয়ে একটু বসি।” স্মৃতির তার মনের এক অজ্ঞাত, অলক্ষিত আগ্নেয়গিরির গহ্বর ফেটে যেন একমুঠো বিষাক্ত গরম কালো ধোয়া বেরিয়ে আসতে চাইলো, একটা সক্রিয় প্রবল উচ্ছুস ওর মনের শান্ত, মরা নদী থেকে উপড়ে পড়ে যেন ফেটে পড়তে চাইলো ওর ছোটো চোখের শুকনো তীরে, কোন রকমে বললো তাড়াতাড়ি—“না, না, অপূর্না,...ও বাড়ীতে আর আমায় যেতে হলো না, তার চেয়ে চलो ঐ পার্কে গিয়ে বসি।”

কয়েক পা হেঁটে ওরা বর্ধন পার্কে গিয়ে বসে, গোখুরি অন্তরাগে তখন সমস্ত আকাশটা রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। ওরা

হ'জনে বসে আছে নিশ্চাপ উপস্থিতির মত,...ভুলে গেছে যে ওরা বসে আছে, বসে আছে অর্থহীন প্রয়োজনে। হঠাৎ জান কিরে পাওয়া চেনার খানিকটা টাটকা, গরম নিশ্বাস আছড়ে পড়ে ওদের অহুত্বের তোরণে। ওরা চমকে ওঠে হঠাৎ বিদ্যুতের খানিকটা বলসানির মত, ভাবে—কিছু বলতে হবে, অন্ততঃ কিছু বলাই প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে মগজের কামরায় কোন্ যাহুরের চমক লাগানো যাহুর অপরূপ ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে থাকা রাশি রাশি কথা যুগপৎ জেগে ওঠে, লাফিয়ে ওঠে, অস্থির হ'য়ে ওঠে বাইরের একটু আলো আর বাতাসের লোভে। অনেক কথার ঠেলাঠেলি আর ব্যস্ততায় উদ্ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে ওরা, কোনটা বলবে আগে আর কোনটা শেষে? এই বিচার করতে করতেই স্মৃতির তার ঠোঁটের ওপর প্রথমেই বেজে ওঠে—“পাঁচ বছর আগের দিনগুলো মনে পড়ে অপূর্না?” অপূর্ব্ব যেন কূল থেকে কূলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একটা অবলম্বন পায়,...স্মৃতির তার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দেয়—“পড়ে; কিন্তু আজ সেটাই সকলের চেয়ে বড় পরিহাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।” “ঠিক তাই”—স্মৃতির তার কোমল, মাংসবল্ল বুক বেয়ে একটা কম্পমান দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে, ওর বেদনার্ত্ত মনের অশরীরী প্রেতাত্মা, অস্পষ্টকৃত হাহাকার সেই দীর্ঘশ্বাস। আবার কিছুক্ষণের মূছা, মনের সজাগ চেনার ওপর অবচেনার খানিকটা হাল্কা ছায়া এগিয়ে আসে, আবার সবে যায়; কিন্তু বিরহী শিল্পীর বাণীর মত স্মৃতির তার মনের মুক্ত বন্ধুবুহ থেকে বেরিয়ে আসে গোটাকতক উদাস অক্ষসিক্ত বাণীর সুসংলগ্ন স্মৃতির তার টুকরো—“কিন্তু, আজো যখন সারাদিনের কণ্ঠস্বাস্ত, ইপিং-পড়া মনটাকে একটু নিষ্কর্ষিতার কোমল ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, তখন বারবার কেন সেই হারানো মরচে-পড়া দিনগুলোর সর্কাক থেকে রকমারী আলো ঠিকবে এসে চোখ দুটো ঝলসে দেয়, তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি অপূর্না।” স্মৃতির তার চোখের কোল দুটো চিক্‌চিক্‌ ক'রে ওঠে, কালো ভাসমান মেঘের আড়াল থেকে উজ্জ্বল তারার মত...ওর মনের উচ্ছ্বল মরুভূমির ওপর দিয়ে পাঁচবছরের জমা কালবৈশাখী ছুটে চলেছে হ-হ ক'রে। অপূর্ব্বর মন কিন্তু শান্ত, দৃঢ়, নিরুপদ্রব; ও সহজ, সরল, সাধারণ,—একেবারে নতুন, তাই বেশ শান্তস্বরেই ও বলে, “মিথ্যাকে বুঝতে গেলে মনকে অনেক মিথ্যা কৈফিয়তই দিতে হয় স্মৃতির তা।” “মিথ্যা?” জমাট বিষয়ে স্মৃতির তা আছড়ে পড়ে অপূর্ব্বর সর্কাক্সে। অপূর্ব্ব হাসে, কৃষ্ণকর্ণের মন তামাতে চাঁদের মত, জবাব দেয় “তা ছাড়া আর কি! ছোটো মুখের রঙীন কথার প্রেরণায় যে মন ছোটো কোন কূলের সন্ধান না নিয়েই পাল-ছেঁড়া নৌকার মত প্রবল জোয়ারে ভেসে চলেছিল, আজ হঠাৎ তা স্থির হয়ে গেছে কেন? একদিন যাকে প্রেম বলে ভুল করেছিলাম, তা প্রেম নয়,...সে শুধু মুহূর্ত্তের জলে-ওঠা, মুহূর্ত্তের উপচে-পড়া।”

“অপূর্না” রুদ্ধ নিশ্বাসে চোঁচিয়ে ওঠে স্মৃতির তা। অপূর্ব্বর মধ্যে তবু কোন পরিবর্তন নেই...ও যেন সাগরের পাখা-তীর, যার ওপর ঢেউ এসে মুখ ধুবে আছড়ে পড়লেও কোনও সাড়া

নেই। সূচরিতার বেদনা-পাণ্ডুর মুখের সহজ প্রকাশেও তাই ও ফুলে ওঠে না, দৃঢ় কর্তে বলে, “ঠিক তাই সূচরিতা; অপরিণত মন নিয়ে যে মিথ্যার পেছনে একদিন ছুটেছিলাম আমরা, সেই মিথ্যাই আজ চৈত্রের সূর্য্যের মত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। যা হয়েছে তা সবই মিথ্যে, আর আজ যেগুলো কারণে অকারণে হৃৎস্পন্দের মত চোখের স্পন্দিতম পাতায় পাতায় নেচে বেড়ায়, সেগুলো তার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।”

সূচরিতা জলে ওঠে, একফুলকি আগুনের ছোঁয়ায় একবাশি টাটকা বান্ধের মত। বলে,—“বাণীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেবণায় মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বাস্তব সুরের কোমল প্রাণ রতীন সূর্য্যের একটুখানি স্নানিত উত্তাপের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছিল, বিচ্ছেদের পরেও সেই প্রাণের সত্যিকারের স্পন্দন যদি কোনদিনই প্রতিধ্বনিত হতো তোমার সর্বগ্রাসী মনের শূন্য আনাচে-কানাচে, তা হলে আজ তুমি একথা বলতে পারত না অপূর্ণ।” তোমার নিষ্ঠুর বুকের ভেতর এখনো যে প্রাণটা সজীব হয়ে আছে, তুমি ভুললেও, সে আজো ভোলেনি কিছুই; সে জানে, তোমার আর আমার মাঝখানে কত উজ্জ্বলিত, কত পরিপূর্ণ সোণালী মুহূর্তে দুটো অদৃশ্য অশরীরী মনের কত শতবার আলিঙ্গন হয়েছে, কত বোবা মুচ্ছিত মুহূর্তের ভগ্নাংশে আমরা হুজনে হুজনে লুপ্ত করে নিয়েছি শত সহস্র হাতে,—হুজনে রিক্ত করে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছি হুজনের কাছে।”

সূচরিতা কেঁদে ফেলে, সূত্র বেদনাব আকস্মিক জাগরণের মর্মান্তিক কশাঘাতে। অপূর্ণ তখনো পূর্বের মত কঠিন, তাই বেশ সজ্ঞভাবেই বলে, “সে সবই একটা চমৎকার ফাঁকি, একটা অভিনব অভিনয়, তাই তার চিবুয়ত্ব হওয়াই ভাল।” সূচরিতার দেহী হয় না উত্তর দিতে, সঙ্গে সঙ্গেই ওর কম্পিত ঠোঁট দুটোয় বেজে ওঠে “বাণীর নুপুর পায়ে দিয়ে তোমার দুটো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে সেদিন যে একটুখানি প্রাণের স্পন্দন বেজে উঠেছিল, আজ তার মৃত্যু হয়েছে জানি; তবু কোনও গুরুপক্ষেব পূর্ণিমা তিথির মনভোলানো তরী চাঁদের মায়ায়, বাসস্তিক মলয়ের নিখাসের আবেশ-যন্ত্রণায়, কোনদিনই কি সে মাটির গভ থেকে একটা আলো-বাতাসবিক্ত দুর্লভ চারার মত, তোমার মনে ভীকৃষ্ণস্থায়ী প্রাণকে নিয়ে এক ফোঁটা আনন্দেও বেঁচে ওঠে না?” “না, না, না”, অপূর্ণের দৃঢ় জবাব। মিশকালো সাড়ীটার আঁচলে মুক্তোর মত ধবধবে অশ্রুকাণ্ডলোকে সযত্নে লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললো সূচরিতা, “আসি অপূর্ণা; যাবার সময় আশা-ভীকৃষ্ণ মনে একটা অল্পবোধ শুধু তোমায় করছি, ফুলগুলো বন্ধ করে রেখো, ওগুলো আমার অন্তরের অঙ্গুষ্ঠিত অশ্রু-উপহার, পাঁচ বছর আগে তোমার তিনটে জন্মোৎসবে যা দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার,—আর এই চিঠিটা পড়ে।” খেদাক্ত, উত্তপ্ত বুকের ওপর বন্ধাবাসের আড়ালে রেখে দেওয়া একটা নীলচে, ঋগ্বেদে খাম বাবু করে ও দেয় অপূর্ণের হাতে, অপূর্ণ নিঃশব্দে গ্রহণ করে। সূচরিতা উঠতে উজ্জত হয়েছে, এমন সময় অপূর্ণ বললো, “আবার কবে আসবে সূচরিতা?”

“ঠিক জানি না; কালই আবার “ঐ”র সঙ্গে ঝরিয়া যেতে হবে।”

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা চললো সোজা বাস্তা ধরে, কম্পমান প্রদীপ-শিখার মত। বাস্তার ওপর দিয়ে ছুটন্ত একটা ট্যাক্সিকে ডেকে সূচরিতা উঠে বসে, বলে, “যদি কিছু ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা করো অপূর্ণা।” নেহাৎ সৌজ্ঞায় আর ভ্রততার তাড়নায় স্তম্ভী জবাব দেয় অপূর্ণ, “ওকথা বলে লজ্জা দিও না।” “আসি” সূচরিতার ট্যাক্সি ছুটে চললো—অপূর্ণের দৃষ্টিকে পছন্দে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ণের মনে পড়ে, রীতিমত প্রয়োজনীয় একটা কাজ এখনো বাকী আছে ওর। শাড়ী একখানা কিনতে হবে ওকে মানসীর জন্তে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় ও, তারপর উঠে বসে একটা ট্রামে। দোকানে গিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনার পর কেনে একখানা শাড়ী, ওর মতে মানসীকে সকলের চেয়ে বেশী মানাবে যেটা। মানসীর বিদ্যুতের ঝলসানির মত স্পষ্ট আর উজ্জল দেহে অস্পষ্ট আর ধোয়াটে রঙের সাড়ীই মানায় ভালো।

মানসীর কাছে অপূর্ণ যখন এসে পৌঁছালো, রাত তখন প্রায় নটা। অপূর্ণের প্রতীক্ষায় থেকে মানসী তখন পিরানোর ঠোঁট ছন্দে নিঃস্বপ্নে হালকা করে তুলছে, তরঙ্গায়িত করে তুলছে, পল্লবিত করে তুলছে। দরজার আড়ালে খুটখুট, শব্দ, অপূর্ণ চকলে বসে এসে। মানসী চকল হয়ে উঠলো, অপূর্ণের সামনে গিয়েই লাল গোলাপগুলোর দিকে চেয়ে বললো, How lovely : আমরা ফুলগুলো দেবেন?” “আপনার জন্তেই তো এনেছি, ফুল ফুলেব পাশেই মানায় ভালো” নির্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তে জবাব দিলো অপূর্ণ। অধীর আনন্দে মানসী ফুলগুলো ছিনিয়ে নিলো অপূর্ণের হাত থেকে, তারপর নিয়ে গেল নাকের কাছে,... এক মুহূর্তে আশ্রয় নিয়ে আস্তে আস্তে ওর পরিপূর্ণ ঠোঁট দুটোয় একটা হালকা চুখন এনে বেখে দিলো একটা ফুলে, অস্তি সম্ভরণে, সচেষ্ট সাবধানতায়, পাছে ওর চুখনের আঘাতে ফুলের কোমল পাপড়িগুলো হয়ে পড়ে, ঝরে পড়ে বৃন্ত থেকে খসে। টেবলের ওপর ফুলদানিতে মানসী স্তম্ভের ক’রে তোড়টা রাখলো সাজিয়ে। অপূর্ণ মানসীর হাতে সাড়ীটা দিলো,... বললো, “দেখুন, এবার পছন্দ হয়েছে তো?” বৈদ্যুত আলোর সামনে সাড়ীটা খুব ভাল করে নাড়াচাড়া করে দেখে মানসী,... ওর চোখের ভেতর থেকে ঝিকরে পড়ে গভীর তৃপ্তির উজ্জল আলো,... খুব পছন্দ হয়েছে ওর, অপূর্ণের পাশে এসে বসে মানসী,... একেবারে পাশে। অপূর্ণের মনে তখন উদ্ভাদনার বন্ধ চকল হ’য়ে উঠেছে, একটা চুখনের তৃষ্ণায় হাঁপিয়ে উঠেছে ওর চিবু-তৃষ্ণার দুটো সোজী ঠোঁট; মানসীকে ওটেনে আনে একেবারে নিবিড়তম সংস্পর্শে,... ছড়িয়ে দেয় একটা উত্তপ্ত, প্রলব্ধিত চুখন ঝান্সীর চাঁদের মত মানসীর দুটো ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে,... টেনে নেয়, শুবে নেয়, লুপ্ত করে নেয় মানসীর ঠোঁট দুটোর এক অজ্ঞাত, অদৃশ্য কোণ থেকে যত রাজ্যের সঞ্চিত মধু। মানসী বাধা দেয় না, নিঃশব্দে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে একটা অবলম্বনের মত অপূর্ণের এক-খানা হাত টেনে আনে একেবারে নিজের কোলের ভেতর।

উঃ, কি সাংঘাতিক গরম মানসীর কোলের ভেতরটা, অপূর্ণ

শিউরে ওঠে।.....হঠাৎ অপূর্ব নিজেকে মানসীর কাছ থেকে মুক্ত করে নেয়, বলে—“কাল” কিন্তু আপনাকে আমার ওখানে যেতে হবে।”

“যাব” আবেশ-কল্পিত স্বরে জবাব দেয় মানসী। অপূর্ব যায় বেরিয়ে।

ঘরে এসে এই সর্বপ্রথম অপূর্ব আবিষ্কার করে,—ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা ইজি-চেয়ারের কোমল অঙ্কে ও নিজেকে বিলিয়ে দেয়,—তার পর চোখ দুটো দেয় বুজিয়ে, নিশ্চিন্ত আলস্বে গভীর শান্তিতে। মানসীর চূড়িত, কল্পিত, আরক্ত ঠোঁট দুটোর কথাই মনে পড়তে লাগলো ওর বার বার,—সেই ঠোঁটে কত মধু, কত মদিরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় স্মৃতিস্তম্ভ দেওয়া চিঠিটার কথা, কোটের পকেট থেকে খামটা বার করে চিঠিটা ও ধরে চোখের সামনে, পড়ে...

“অপূর্বা,

স্বামীকেই সর্বস্ব অর্পণ করে আজ বিস্তৃত হয়ে আছি; একদিন তোমাকেই সব দিয়েছিলাম, পেয়েও ছিলুম অনেক;

সে সব আজ “প্রাক্তন স্বপ্নের” মতই মনে হয়। যুগল হিয়ার কল্পনা দিয়ে নীড় বেঁধেছিলাম একদিন, সে নীড় ভেঙে গেছে। জীবনের ক্ষেত্রে বীজ বপন করাই শুধু সার হোল, ফসল ফললো না। সে দুঃখ আজো বিবাক্ত গ্যাসের মত গুম্বরে গুম্বরে ওঠে মনে, জানি না কবে মুক্তি পাব। স্বামী থাকতেও অল্প কোনও পুরুষের চিন্তা করা মহাপাপ জানি, কিন্তু কি করব অপূর্বা, আমার অতীত আমার সমস্ত বর্তমানকেই যে গ্রাস করে নিয়েছে। যাক, পুরাণো দিনের জের টেনে তোমায় ভারাক্রান্ত করতে চাই না, তুমি আমায় চিরদিনের জন্তে ভুলে যাবার চেষ্টা কর।

—স্মৃতিস্তম্ভ।”

অপূর্ব একটু হাসে, তন্দ্রাজড়িত অবসাদের গুরুভারে হয়ে পড়ে ওর দুটো ক্লান্ত চোখের পাতা, বিশ্বস্তির শূন্যতায় লীন হয়ে যায় ওর সমস্ত চেতনা—বুঝতেই পারে না কখন, কোন এক অজ্ঞাত অসতর্ক মুহূর্তে ওর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে যায় পাশের Waste Paper-box-এ।

প্রাচীন কলিকাতার বিশেষত্ব

শ্রীবিখনাথ সেন, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল

কলিকাতা বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ও অল্পতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। ইংরাজ-রাজত্বের বহু পূর্বে হইতে ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠের দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, মোগল-সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য জরীপ বা সাভে করিয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার সময়ে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে, “আইনি আকবরী” নামক পুস্তক প্রচলিত ছিল, তাহাতেও কলিকাতার পরিচয় পাওয়া যায়(১)। কলিকাতার ইতিহাস এখন হইতে শুরু নহে, ইহার বহু পূর্বে কবি বিপ্রদাস চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও কলিকাতার উল্লেখ আছে। স্বতরাং বুঝিতে হইবে যে, কলিকাতার উৎপত্তি হিন্দু-দিগের রাজত্বকালে হইয়াছে(২)। তবে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতা অতি প্রাচীন নগর হইলেও ইহা নিজে একটি স্বতন্ত্র পরগণা ছিল না। এক সময়ে ইহা সপ্তগ্রাম অর্থাৎ বর্তমান হুগলীর মালভূজারং সেরেস্তার অধীন ছিল। আরও দেখা যায় যে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার সেনাপতি

মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত বঙ্গদেশে আসেন। তখন তাঁহাকে নদীয়ার জমিদার ভবানন্দ, সার্বণ চৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এবং বংশবেড়িয়ার রাজা জয়ানন্দ এই তিনজন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পাদিতোষিক হিসাবে তিনি কলিকাতাকে উক্ত তিনজন ব্যক্তিকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইংরাজী কলিকাতার আদিম মালিক (৩)। কলিকাতা এখন City of Palaces এবং বৃটিশ রাজত্বে দ্বিতীয় নগর বলিয়া বিখ্যাত। বর্তমান কলিকাতার দৃশ্য হইতে প্রাচীন কলিকাতার কোন ধারণা করা যায় না। প্রাচীন কলিকাতার পরিমাণ (area) বর্তমান কলিকাতা হইতে অনেক অংশে ক্ষুদ্র ছিল এবং সে সময়ে ইহা গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বর্তমান কলিকাতা তিনটি গ্রামের সমষ্টি—সুতাহুটা, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমানে ইহার কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে(৪)। বর্তমান কলিকাতার উত্তর অংশই সুতাহুটা অর্থাৎ উত্তরে মহারাষ্ট্র ডিচ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বর্তমান Minthouse পর্য্যন্ত যে অংশ, উহাই সুতাহুটার পরিমা। তন্নিম্নে অর্থাৎ Minthouse হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে Customs

(১) Statistical Account of Bengal, Vol. 1 page 381.

(২) Bengal District Gazetteer—24 Pargannas page 26.

(৩) Calcutta Guide—S. C. Sarker. page 2.

(৪) Notes on Geography of Old Bengal—Monmohan Chakravarti—page, 284-5.

House পর্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার পরিমাণ এবং তন্মিয়ে অর্থাৎ যে স্থানে বর্তমান দুর্গ ও ময়দান 'উহা গোবিন্দপুরের চিহ্ন (৫)। নিয়ে প্রাচীন কলিকাতার একটি মানচিত্র দেওয়া গেল :—

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কলিকাতার উল্লেখযোগ্য পরিচয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকালে পাওয়া যায়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হুগলী নগরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির এজেন্ট Charnock-এর সহিত মোগল কর্মচারীদিগের মনোমালিন্য ঘটে। তাহার ফলে ইংরাজগণ হুগলী পরিত্যাগ পূর্বক বর্তমান কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ স্নতাহুটী গ্রামে আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। স্নতাহুটীর অর্থ স্নতার হাট; ইহাতে বুঝিতে পারা যায়— প্রাচীন কলিকাতা সহর ছিল না বটে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব ছিল। বর্তমান বড়বাজার তাহার স্পষ্ট পরিচয় এবং উহাব মধ্যে "স্নতাপটী" "তুলাপটী" প্রভৃতি স্থানের নাম প্রাচীন গৌরব জাহির করিতেছে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে Charnock সাহেব যখন হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিলেন, তখন কলিকাতায় অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পাকা বাটী ছিল না বলিলেই চলে এবং ইহার চতুর্দিকে জঙ্গল ও পুষ্করিণীপূর্ণ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কলিকাতার জঙ্গলে হিংস্র জন্তু ও পুষ্করিণীতে কুড়ীর বাস করিত(৬)। যে স্থানে বর্তমান ময়দান উহা পূর্বে গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্য এতই মন্দ ছিল যে, Charnock সাহেব এখানে আসিবার অল্পদিন পরে বহুসংখ্যক ইংরাজের অকালমৃত্যু ঘটে। সেজন্য ইংরাজগণ ইহাকে Golgotha(৭) বলিত। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও Charnock সাহেব এখানে স্চটাক রূপে বাণিজ্য করিতে থাকেন, তাহার ফলে বহুসংখ্যক ইংরাজ আসিয়া এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিলেন। ইহার পর ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনা হয়। বাহার দ্বারা ইংরাজগণ কলিকাতার দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হইলেন।

(৫) সরল বাঙ্গালা অভিধান—স্ববলচন্দ্র মিত্র—৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৬) A place of mists, allegators and wild boars—Staendal's Historical Account of Calcutta page 208।

(৭) Place of skulls—District Gazetteer—24 Pargannas—page 23.

Death overshadowed every living soul—Wilson's Early Annals of English in Bengal—page 208.

বর্তমান জেলার জনৈক জমিদার সুবসিংহ হঠাৎ মোগলদিগের উপর বিদ্রোহী হইয়া রহিম খাঁ নামক একজন আফগানের সহিত যোগদান করেন। ইংরাজগণ সেই স্তম্ভযোগে তৎকালীন বঙ্গদেশের মোগল সুবাদের সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে শাস্তিরক্ষা ও শত্রু দমনের জন্ত একটি দুর্গ নিৰ্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই উপলক্ষে ইংরাজদুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম বর্তমান জেনারল পোষ্ট অফিস যে স্থানে আছে ঐ স্থানে নিৰ্ম্মিত হয়(৮)। তাহার পর ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ



প্রাচীন কলিকাতা

অর্থাৎ তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০০ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব বিনিময়ে গোবিন্দপুর, স্নতাহুটী ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিবার নিমিত্ত তৎকালীন নবাব প্রিন্স আজিম আমানের নিকট ইহাতে আজ্ঞাপত্র (letters patent) লয়েন এবং পূর্বোক্ত লক্ষ্যীকান্ত রায়ের নিকট ইহাতে একটি সনদমূলে তিনখানি মৌজার জমিদারী (dependent talukdari) স্বত্ব লাভ করেন। জায়গীর হস্তান্তরের অযোগ্য, সেই কারণে ইংরাজগণ উক্ত সনদমূলে মাত্র খাজনা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। অল্প কথায় তাঁহারা প্রজাস্বত্বের মালিক হইলেন। এ স্থলে বলা যাউতে পারে যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের কালেক্টরীতে যে খাজনা দেওয়া হয়, তাহাকে rent বা ground rent বলে, উহা কিন্তু revenue নহে। ইংরাজদিগের এই জমিদারী স্বত্বই ক্রমশঃ বিশাল রাজস্ব পরিণত হইয়াছে (৯)। তাহার পর ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের মালিক হইলেন। ঐ বৎসরই তাঁহারা তৎ-

(৮) History of India—Meadows Taylor Page 396.

(৯) Constitutional Law—Sarbadhikary, page 350. Mayor of Lyons vs. East India Co. 1 M. L. A. 173 (271)

কালীন বঙ্গদেশের নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুর্পার্শ্বস্থিত জমিসমূহের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। এবং এরা সেই উপলক্ষে প্রাচীন কলিকাতা অর্থাৎ সুতাহুটী গ্রামটিকে সম্পূর্ণ লাখরাজ বা নিম্বর স্বত্বে পরিণত করেন। তাহার পর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর গ্রামে বর্তমান দুর্গ নির্মাণ করেন; সেই সময় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বর্তমান ময়দান প্রস্তুত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে যতই সুদৃঢ়ভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, কলিকাতা ততই সমৃদ্ধি লাভ করিল এবং ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজধানী ছিল। ইহাই কলিকাতার সাধারণ ইতিহাস।

* * * *

রাজকার্য্য-পরিচালনা—

কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপন করিবার বড় পূর্বে ইংরাজগণ মাদ্রাজ দখল করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথমে কলিকাতা মাদ্রাজের অধীন ছিল। ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ইং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ পর্য্যন্ত ইহা বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন(১০) প্রচার করেন—যদ্বারা ইংরাজ-অধিকৃত সকল স্থানের মধ্যে কলিকাতা সর্বোচ্চ প্রাধান্য লাভ কবে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সকল স্থান কলিকাতার অধীনে পরিগণিত হয়; এই উপলক্ষে কলিকাতার গভর্ণর “গভর্ণর জেনারেল” আখ্যা পাইয়াছিলেন ও কলিকাতা মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশের রাজধানী হইল। সেই সময়ে সবকারী মালখানা (Imperial Treasury) কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলের অস্থায়িত্বকালে তাঁহার কার্য্য তদারক কবিবার জগ্গ একটি ডেপুটির পদের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসন-ভার স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিবার জগ্গ একজন লেফটেন্যান্ট (Lieutenant) গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন, তাত্কাৎ চলতি কথায় ছোটলাট বলা হইত। এই সময়ে আলিপুরে Belvedere নামক প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল; উহা Lieutenant গভর্ণরের বাস-স্থান ছিল। পূর্বে গভর্ণর দুর্গে (fort) বাস করিতেন। বর্তমান Government Palace লর্ড ওয়েলেসলির সময় নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনা—

ইং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ অর্থাৎ তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর অধিপতি শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। এই দেওয়ানি লাভই ব্রিটিশ সম্রাজ্য স্থাপনের বীজ (১১)। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দেশীয়

কর্মচারিগণ ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও তাহার চতুর্পার্শ্বস্থিত স্থানসমূহের রাজস্ব (ground rent) আদায় করিতেন। এই বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন দেওয়ান ছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে এই রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। দেওয়ানের স্থানে একজন কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার কালেক্টার এক ex-officio কর্মচারী মাত্র। রাজস্ব বলিতে যাহা বুঝায় উহা ground rent মাত্র। সেই হেতু গভর্ণমেন্ট ইস্তাহারমূলে কলিকাতার যে কোন অধিবাসী পূর্বে ৩০ এবং বর্তমানে ৩৫ বৎসরের ground rent একসঙ্গে দিয়া তাহার দখলী জমিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিম্বর করিয়া লইতে পারে। এ-স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার ground rent একজন ডেপুটি দ্বারা আদায় হয় এবং তিনি ট্যাক্স ও আবগারি সংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন।(১২)

আইন-আদালত—

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পরে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে সুতাহুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি মৌজার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন ও বহুসংখ্যক ইংরাজ কায়মী ভাবে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই উপলক্ষে তৎকালীন ইংলণ্ডের আইন অর্থাৎ Common Law ও Statutory Law উভয়েরই এদেশে প্রচার হইয়াছিল। বিদেশে বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজ দেশীয় আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা ইংরাজগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সনন্দ (charter) মূলে পাইয়াছিলেন এবং এই সনন্দমূলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার দখলস্থিত সমুদয় স্থানে নাবিক ও নৌ-যান সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ও ফ্যাক্টরী ও তথাকার কর্মী সম্পর্কে ও বাণিজ্য বিষয়ে সকল ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন-কানুন প্রচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছিলেন(১৩)। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Charles II-এর সনন্দ (charter)-মূলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ অধিকৃত সকল স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচার করিবার ক্ষমতা পান। কিন্তু সে সময়ে এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর ইংলণ্ডের কোন প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং তৎকালীন ইংরাজ অধিবাসিগণই কেবলমাত্র ইংলণ্ডের আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বহুসংখ্যক ইংরাজ এখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার হেতুও কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী Common Law or Statutory Law এদেশে প্রচলনের ফলে বিলাতী আদালতের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার জমিদার ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, সুতরাং তৎকালীন জমিদারদিগের অল্পকরণে কলিকাতায় একপ্রকার আদালতের সৃষ্টি হয় এবং তাহার কার্য্য-প্রণালীও (procedure) জমিদারদিগের আদালতের মত

(১০) Regulating Act of 1773 (13 Geo. III C. 63).

(১১) Aitchison Treaties (India) page 60
Courts & Legislative Authorities in India—Cowell page 28

(১২) District Gazetteer—24 Pargannas.

(১৩) Mayor of Lyons vs. East India Co.
1 M. I. A. 272.

ছিল। পারস্য ভাষা আদালতে ব্যবহার হইত এবং নথীপত্র-সমূহে লেখা হইত(১৪)। কিন্তু কলিকাতার এদেশীয় অধিবাসী-দিগের উপর কোম্পানীর আদালতের কোন ক্ষমতা (jurisdiction) ছিল না; উহাদের বিচার জনৈক মুসলমান কাজির দ্বারা হইত(১৫)। তাহার পর George I.-এর রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Director-গণ তৎকালীন কলিকাতা প্রভৃতি ব্রিটিশ-অধিকৃত স্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ে সূক্ষ্ম ও শীঘ্র বিচারের উত্তম বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ রাজ্যশাসন-বিষয়ে অসুবিধাসমূহ ইংলণ্ডের অধীশ্বর অর্থাৎ Crownকে জানান। তাহার ফলে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Mayor's Court স্থাপিত হয়(১৬)। Mayor's Court কোম্পানীর আদালত ছিল না, উহা Crown কোর্ট ছিল। এ-স্থলে বলা বাহিত্তে পারে যে, Mayor's Court নাম হইতে বর্তমান Old Court House Street-এর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং বর্তমানে Dalhousie Square-এর উত্তর-পূর্ব স্থানে যেখানে St. Andrew's Church অবস্থিত, উহা প্রাচীন কলিকাতার Mayor's Court-এর স্থান ছিল। Mayor's Court-এর ক্ষমতা (jurisdiction) এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর ছিল না, যদিও ইহা Crown Court ছিল। ইংলণ্ডের King's Bench-এর জায় ইহা Court of Records ছিল এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে Probate ও Letters of Administration grant করিবার ক্ষমতা ইহার ছিল। পূর্বে বলিয়াছি যে, Mayor's Court-এর এ-দেশীয় অধিবাসীদিগের উপর কোন বিচারক্ষমতা ছিল না। উহাদিগের জন্ত কোম্পানিকর্তৃক পরিচালিত সদর দেওয়ানি ও নিজামত আদালত ছিল। ফৌজদারী ব্যাপারের বিচারের জন্ত Justices of Peace নামক কতিপয় বিচারাধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হয়(১৭), উহারা সকলে নিয়ন্ত্রিত Government Court-এর উচ্চ কর্মচারী। Mayor's Court-এর বিচারে আপিল Government Court স্নানিতেন। উহার উপর King-in-Council ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে Government Court ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতেন, স্বয়ং গভর্ণর সাহেব এই কোর্টের President ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ এই কোর্টের বিচারকার্য চালাইতেন। ইহা ব্যতীত Government Court-এর অনেক অল্প অল্প কার্য ছিল(১৮)। পূর্বে বলিয়াছি যে Mayor's Court-এর এদেশীয় অধিবাসীদিগের

উপর কোন বিচারক্ষমতা ছিল না, তবে তাহাদের মধ্যে পক্ষ একমত হইলে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্ত আদালতে নিবেদন জানাইতে পারিত।

ই: ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে একটি নতুন আইন (১৯) জারি হয় যদ্বারা কলিকাতায় Mayor's Court থাকা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বিচারের জন্ত একটি Court of Request স্থাপিত হয় (২০) এই Court of Request হইতে Small Causes Court-এর উৎপত্তি হইয়াছে।(২০)

ইহার পর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে Regulating Act (২১) প্রচলিত হয় এবং তাহাতে কলিকাতায় Supreme Court প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত থাকে। উক্ত আইন অনুযায়ী পর বৎসর অর্থাৎ ইং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে Royal Charter (২২) ইং ২৬শে মার্চ তারিখে প্রচার হয় এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার অনুকরণে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুপ্রীম কোর্টকে প্রাচীন কলিকাতার অল্পতম আশ্রয়জনক বিশেষত্বগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া যায়। সুপ্রীম কোর্ট King's Court ছিল সত্যবাং তৎকালীন ইংলণ্ডের King's Bench-এর জজদিগের সকল ক্ষমতা উক্ত Charter মূলে পাইয়াছিল(২৩)। ইহার ক্ষমতা (Jurisdiction) ছিল অসীম। পূর্বে বলিয়াছি যে, Mayor's Court-এর এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর কোনপ্রকার বিচারক্ষমতা ছিল না, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে সেরূপ কোন আর বাধাবিধি ছিল না। সমস্ত কলিকাতার ইংরাজ ও এদেশীয় অধিবাসীদিগের উপর ইহার বিচারক্ষমতা ছিল এবং বাহিরের, এমন কি, বঙ্গদেশের সীমান্তে ও ইংরেজদিগের উপর অনেক বিষয়ে ইহার বিচারক্ষমতা ছিল।(২৪) বর্তমান হাইকোর্টের যে Writ of Habeas Corpus, Mandamus or Certiorare প্রভৃতি আজ্ঞা (order) জারি করিতে পারে উক্ত সকল ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের ছিল(২৫)। উহা King's

(১৯) George II (26 Geo. II).

(২০) Act IX of 1850.

(২১) Stat 13 Geo 3, Cap 63, 1773.

(২২) Supreme Court Charter, dated the 26th March 1774.

(২৩) "To have such authority as the Justices of King's Bench in England," clause 4 of Charter dated the 6th May 1777.

(২৪) "It was vested with full power and authority to exercise civil, criminal, admiralty, ecclesiastical and equity jurisdiction over all His Majesty's subjects in the three provinces. It had power to veto laws... the object was to place the whole government under the control of this court—Constitutional Law.—Sarbadhikary Page 364.

(২৫) হাইকোর্টের উক্ত ক্ষমতার বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সর্বশেষ জ্ঞানার্থে Criminal Procedure Code এর ৪৯১ ধারা ও Specific Relief Act (Act 1 of 1877) এর ৪১ ধারা দ্রষ্টব্য।

(১৪) Rules and Orders of the High Court—Ormond.

(১৫) Court's and Legislative Authorities in India—Cowell, page 12.

(১৬) 13 Geo. I.

(১৭) High placed officials or private persons appointed by special commission for keeping peace and enquire into and try felonies, misdemeanours.—Law Dictionary,—Ayer, Page 146.

(১৮) Courts and Legislative Authorities in India, Page 14.

Bench-এর প্রদত্ত। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত ক্ষমতা এত বেশী ব্যবহার করিত যে উহাকে অপব্যয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার ফলে তৎকালীন কোম্পানীকর্তৃক পরিচালিত সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আদালতদ্বয়কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিত। এবং তৎকালীন জমিদারদিগের কার্যসম্পর্কে অনেক হুকুম (writ) জাহির করিয়া তাহাদের উপর নানাপ্রকার অভিযাচার করিত। ইহার Common Law ও Equity Jurisdiction ছিল। সুপ্রীম কোর্টের এইরূপ ক্ষমতা-অপব্যয় ক্রমে এতই অধিক পরিমাণে

হইতেছিল যে ইং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইনবলে উহা বন্ধ করিলেন(২৬)। সুপ্রীম কোর্ট ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল। তাহার পর বিলাতের নতুন আইন অনুযায়ী বর্তমান High Court এর সৃষ্টি হয়। পূর্বোক্ত Court of Request ও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইন (২৭) অনুযায়ী Small Causes Court-এ পরিগণিত হইল। [ক্রমশঃ

(২৬) Declaratory Act 1781, 21 Geo. III, C 70).

(২৭) ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল।

তোমারই

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

দিবির চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে হঠাৎ নেবে এল প্রকাশ গভীর হাওয়া! কথার ধারা গেল বদলে, হালকা কথার স্বর্ণাধারা হঠাৎ ভ'রে উঠল সাগরের গাঙ্গীর্ঘ্যে। পঞ্চমীর প্রতিমা যেন অষ্টমীর মহিষাসুরমর্দিনী। ওরা দু'জনেই নীরব, কথার স্রব বদলাবার আগে নিস্তব্ধতার মধ্যে দিগে যেন নতুন স্রব বাধার পালা; এ যেন সেই শুভদৃষ্টির প্রথম পর্ব, পর্বতাকার ব্যবধান পেরিয়ে নীরব দৃষ্টির মধ্যে দিগে নতুন মেয়েটি নতুন মাহুয হয়ে ওঠে, নতুন পুরুষটিকে স্বামীর আসনে বসিয়ে।

ওদের মধ্যে চকিত নেমে আসা এই নিস্তব্ধতা লেখার মনের উপর গভীর রেখা টানল। বর্তমানের একটা অস্পষ্ট পরিপূর্ণতার প্রভাব কাটিয়ে মনটা ওর ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করল অতীতের বেদনার মধ্যে, অনাগত দিনের হিসেবের পাতায় পাতায়! মেয়েরা চিরকাল এমনি ধারাই সঞ্চরী। আজকের সন্ধ্যাটা নতুন সূর্যের আলোতে উদ্ভাসিত। এমনি ধারা সন্ধ্যাটাকে ও ধরে রাখবে মনের কোণে কোণে। আজকের সন্ধ্যাটাকে জানবে ফুলসজ্জা রাত্রের স্নিগ্ধতার ও মুগ্ধতার মধ্যে অপরিচিত স্বামীর স্পর্শের মতন! আজকের 'জ্যোতি'কে ও জানবে ওর মনের স্বপ্ন সূর্যের আলোকে রান কবান জ্যোতির মতন, বিজয় তুর্ঘ্যের গভীর নিনাদের মতন, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

জ্যোতি হঠাৎ অবাক হয়ে ওঠল গাঙ্গীর্ঘ্যের উত্তাপে লেখার মুখখানা দেখে। ওকে অনেকবার অনেকরকম ভাবে ও দেখেছে, কিন্তু আজকের ও যেন নতুন মাহুয, নতুন ওর রূপ, অপরূপ সুরে বাঁধা? নতুন হৃদয়ের বন্ধন ওর চারিদিকে। তুলনা? তুলনা দেবার মতন কোন চেহারাই ওর মনে পড়ল না, কেবল অস্পষ্ট ওর কেবলই মনে হ'তে লাগল, কোথায় কোনদিন এমনি সূর্যের একটি মাহুয ও দেখেছে। এমনি একটি নারী ওর ভারী পরিচিত। মনকে অনেক প্রশ্ন করেও ও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে, মনে করতে পারল না যে বাস্তবে কোনদিনও দেখে নি, দেখেছে নিজের মনের রঙিন কল্পনার ভবিষ্যতের অস্পষ্টতার মধ্যে!

লেখাই আগে কথা বললে, 'কথা বুঝি হারিয়ে ফেললে?' হঠাৎ কি না, তাই জ্যোতি একটু চমকে উঠল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ভাগ্যিস মনটা চোখ কি নাক কি মুখের মতন স্পষ্ট নয়, অগোচর, শোনা যায় না কিবা যায় না দেখা!'

স্বলেখা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, সেটাও বুঝি হারিয়েছে?'

'তাকে হারাইনি, সে হেরেছে।' বার বার সে ফেরে পড়েছে, বার বার সে হেরে মরেছে।'

'কায় কাছে?'

'যার কাছে সে আছে'। জ্যোতি বলে চলে 'এমন কারো কাছে, যারা কোনদিন হারে না, যারা কোনদিন নিজেকে হারাতে পারে না, পরাজয়ে যাদের গ্লানি, জয়ে যাদের আনন্দভূক্তি, অজ্ঞেয় যারা তারা যাদের চক্ষুশূল!...তারপর একটু হেসে, জ্যোতি বললে, 'নারীর কাছে'...

স্বলেখাকে আঘাত করবে বলে জ্যোতি কোন কথাই বলে নি, বলেছিল সহজ একটা অভিমানের ইঙ্গিত করে। কিন্তু লেখার মনের ওপর হঠাৎ যেন দাগ পড়ল। স্তম্ভীর দাগটা। সচেতন হ'য়ে উঠল স্বলেখা, বুঝলে জ্যোতির কথা জীবন্ত প্রাণের অনন্ত অভিমান। বললে, 'তোমার কথার অভিমানের ছোঁয়াচ, বেদনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।'

জ্যোতি হেসে বললে, 'তোমরা অত্যন্ত অদ্ভুত, কথার মানে করতে তোমরা বেশ জানো! স্পষ্ট কথা শুনেলে তোমরা সেটাকে অস্পষ্ট ক'রে কানে তোলা, প্রাণে তোমাদের সেটা আরো অস্পষ্ট হ'য়ে উঠে! আমার উক্তি কেবলই কথা নয়, তাতে অভিজ্ঞতার যুক্তি আছে।'

'কোন কামিনীর না কল্পনার?'

'অর্থাৎ?' জ্যোতি সর্কোতুক প্রশ্ন করলে।

'অহেতুক তোমরা অনেক কিছুই কল্পনা কর। যেয়ে জাত-টাকে তোমরাই করেছ মহত্তমরী, যখন দরকার হয় তখন আবার তোমরাই তাদের কর সহজ ও সোজা!'

খেমে আবার বললে, 'স্ববিচারের চাইতে তাদের ওপর অবিচারই তোমরা কর বেশী।'

জ্যোতি বললে, 'অভিমাণে ভেঙ্গে পড়ছ, বুঝতে পারছি, কিন্তু জীবনের আলোতে যদি ভালো করে দেখ' তাহ'লে হয়ত' সুবিচার অবিচারের কথাটা সহজ না হ'য়ে সমস্তাও থেকে যেতে পারে।' একটু পরে আবার ও বলে চলল, 'তোমাদের দোষ কোথায় জান? তোমরা সবই বোঝ কিন্তু যখন বোঝ তখন অতীতটা মনে বোঝা হ'য়ে যায়, বোঝবার দিন তখন পেরিয়ে গেছে। যখন কোন পুরুষ তোমাদের স্নেহ, প্রেম কিংবা সহানুভূতির উত্তাপে নিজের উত্তপ্ত করবার জন্য আপনা থেকেই এগিয়ে আসে কাছে, তখন তোমরা তার কাছ থেকে প্রায়ই সরে যেতে থাক দূরে। কখনও নিজের অত্যন্ত সহজ করে দিয়ে, আবার কখন শক্ত করে নিয়ে। তোমরা এমন ধারা অনুভূত যে ঠিক যে জিনিষটা তোমাদের কাছে পাবার জন্যে পুরুষ তোমাদের কাছে আসে, তোমরা ঠিক তার উল্টোটা দাও। নিজের তোমরা নিজেরাই কর রহস্যবৃত, অথচ নিজেরাই যাও ঠিক'।

ঘরের মধ্যে করণ একটা স্তর। লেখা অভিজ্ঞত, কেবলই শুনে চলে। জ্যোতি এই মানুষটিকে হৃদয়ের রক্তে, রক্তে অম্লভব করেছে। ওর কেবলই মনে হয়েছে এর কাছে সব বলা যায়, ও সব বলবে। ওর যত কিছু অভিমান, ওর অতৃপ্ত মনটার যা কিছু কথা, যা কিছু ব্যাখ্যা, বেদনা। যতই ও বলে যায় ওর ভাষা ততই নির্ধম হ'য়ে ওঠে, ততই করণ। ভৈরবীর মিষ্টতা, কোমল রেখাবের প্রাণস্পর্শী স্বাক্ষর কিন্তু শুদুট। কবে কোনদিন অকারণে ও পূর্ণিমাকে ভালোবেসে ছিল, কিন্তু তার আলো পায় নি, তারই ক্ষুদ্র অভিমান ওর দৃষ্টিতে স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সজাগ গ্রহরীর মতন তা'রা ওর ভাবার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। পূর্ণিমাকে যে ভাবে জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ও চেয়েছিল, পূর্ণিমার যে আলো ও চেয়েছিল কিন্তু পায়নি, আজ হঠাৎ ওর মনে হ'ল লেখার মধ্যে তার প্রাচুর্য। পূর্ণিমার কাছ থেকে যা ও শুনতে চাইত, আজ লেখার নিস্তরতার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা বেশানো আছে। পূর্ণিমার ওপর ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিমান যা কিছু তা সবই আজ ও লেখাকে সুগভীর ও স্তম্ভিত ভাবে জানিয়ে গেল। কথায় কথায় ও বলে গেল, ওর জীবনের প্রথম ভালোবাসার কথা, ওর জীবনের প্রথম নারীর কথা, ওর প্রথম বেদনার কথা।

পূর্ণিমার কথার পরূর চুকিয়ে দিয়ে ও চূপ করলে। মনটাকে লুকিয়ে ফেলল অতীতের আড়ালে। ঘরময় একটা গভীর প্রাণ ছড়িয়ে রইল মস্তবড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন বুকে নিয়ে।

স্বলেখা ভাবতে লাগল, জ্যোতি আজ এত কথা ওকে কেন বললে?

ঘরটায় আবার গভীর নিস্তরতা। ঘরের কোণে কোণে ওর কথার গভীর প্রতিধ্বনি। স্বলেখা সচকিত হ'য়ে উঠল। আজকের দিনেই ওর মনটিকে জেনে নেবে। বললে, 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে, পূর্ণিমার ওপর তোমার ভয়ানক অভিমান

প্রত্যেক নারীর ওপর ভারী বুটবুট লাথির পদাঘাতের মতন নির্ধম। পূর্ণিমার অবিচার প্রত্যেক মেয়েকে তোমার দৃষ্টিতে করেছে অপরাধী। প্রত্যেক মেয়ের ওপর তোমার সুগভীর অভিমান করেছে রূপ পরিগ্রহ।' খেমে আবার বললে, 'এ বেন এক বিগ্রহকে প্রণাম ক'রে অস্ত্রের কাছে ইনাম চাওয়া!'

জ্যোতি বললে, 'রাজার মালকে যে বেল ফুল ফোটে আর গরীবের তুলসীমন্ডের ধার ঘেঁসে যে বেল ফুল ফোটে, দুটোর মধ্যে তারমত কি কিছু আছে? বেলফুল যে ভালোবাসে না, সে কোন বেলফুলই ভালোবাসে না, তা সে রাজার বাগানেই হ'ক আর গরীবের আঙিনাতেই হ'ক!...কিন্তু ও কথা থাক', জ্যোতি বলে চলে, 'তোমার মনে এ-কথা কেন জাগল যে, নারী জাতির প্রতি আমার অতিমাত্রায় অভিমান আছে! অভিমান মোটেই নেই, জ্যোতিনি সৌভাগ্য তোমাদের চিনবার, তাই অভিমানের চেয়ে কৌতূহলই বেশী!'

'বুঝলাম' স্বলেখা বললে, 'পূর্ণিমার ওপর তোমার অভিমান, কিন্তু নিজে কে দিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারি, অভিমান ভাড়াবার সুযোগ তুমি তাকে দাওনি, হয়ত অভিযোগও করনি কেবলই মনে হচ্ছে আমার', স্বলেখা একটু খেমে আবার বলে চলে, 'অভিমানটা তোমার তুলের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে।' লেখা যে ওর মনটা জানবার জন্যেই নিজেকে পূর্ণিমার আড়ালে রেখে ছুটে চলেছে, এ-কথা জ্যোতি ঠিক বুঝতে পারে না। ও নিজেকে নিয়েই মেতে ওঠে অস্ত্রের মনের মধ্যে যেতে ওর সময় নেই। বললে, 'নারীর প্রতি তোমার সহানুভূতি বুঝতে পারি, কিন্তু নারী-আন্দোলন ও নারীর ভালবাসা এক জিনিষ নয়। এসেমরিতে যখন পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকারের প্রশ্ন ওঠে তখন নারী জাতির ব্রিফ্-ধরে যতই করবে চাঁৎকার, ততই পাবে বাহবা, পাবে হাততালি, কিন্তু দোহাই তোমার, পূর্ণিমার মনটাকে বিশ্লেষণ করতে-গিয়ে বড় বড় কথার মালা গাঁথো না, নিজেকেও বোঝাতে পারবে না, আমার বোঝাও নামবে না'।

জ্যোতি খেমে খেমে বলে চলে, 'সাধারণ বিশ্লেষণে মেয়েরা উদার, কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে তা'রা সঙ্কীর্ণ। দু'জানগার তাদের দুই বিভিন্ন রূপ। বাইরে তা'রা নিজের যে পরিমাণে বাদ দেয় অন্তরে তা'রা নিজের সেই পরিমাণে চিনে নেয়। বাইরে তাদের কেবলই দেনা, ঘরে কেবলই পাওনা।

সমস্ত ঘরখানায় একটা ধমধমে ভাব। স্বন্দর ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে আছে, বাইরে পাখীর একটানা স্বন্দর সুর থেকে থেকে ভেসে আসছে। স্বলেখা নিশ্চল পাথরের মতন সামনের লোকটির কথা শুনেছে। আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস পড়ছে, চাপা কান্নার মতন।

জ্যোতি বলে চললো, 'অভিযোগ করছ অভিমান ভাড়াবার সুযোগ দিইনি। বলতে পারো লেখা মানুষ অভিমান করে কার কাছে? যাকে চিনি না, জানি না, তার ওপর হয় করব রাগ, নয় হব অসন্তুষ্ট। কিন্তু ঠিক মানুষটির কাছে যা করব তা ও দুটোর চাইতে স্বতন্ত্র। অভিমান মানুষ করে তারই কাছে যে অভিমান বোঝে—অভিমানটা এমনই জিনিষ যে চোখে অনুভূ

দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না! আর তাছাড়া আমার অভিমান তুমি ভাঙাও বলে অভিমান করব?—সে ত ভালবাসা নয়, সে কেবলই ভালোবাসার অভিনয়। ভালোবাসতে পারি, অভিমানও করতে পারি কিন্তু সেই অভিমান আরোপ করে অপমান করতে পারি না।' সুলেখা অস্পষ্ট বললে, 'হয়ত' তোমার মনটাকে চেনবার সুযোগ তুমি তাকে দাওনি।' ওর শেষ কথাগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে মিলিয়ে গেল!

'তাজারটি ছেলের মাঝখান থেকে যদি একটি ছেলে মা বলে ডাকে' জ্যোতি বললে, 'ছেলেটির মা ঠিক তাকে চিনে নেয়। হাজার বারের মধ্যে একটাবারও ভুল তার হয় না। ভালবাসাটাও ঠিক সেই রকম, সত্যিই যে ভালবাসে সে ভালবাসার প্রত্যেকটি রূপকে চিনে নেয় কোন ভুলই তার হয় না। অভিমানটাও ভালবাসার একটা অঙ্গ। যে ভালবাসার মধ্যে ভুলের স্থান আছে, হয় সেটা ভালো লাগা, না হয় অভিনয়, নয়ত কেবলই শরীরের আকর্ষণের প্রাচুর্যে মনের ওপর অসার প্রভাব।'

'ছুটোই কি একই জিনিস?'

'নয় কেন? ভালোবাসার ভিত্তি কোনখানে? বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে তুমি মানুষটাকে আমি মানুষটা ভালোবাসি না। আমার মধ্যে যে পৌকুষ, যে সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে মত্ত, আমার যে মনটা সৃষ্টিকর্তার একটা অংশ, সেই মানব ভালোবাসবে তোমার মধ্যকার যে মাতৃত্ব তাকে। ভালোবাসার আরম্ভে মোহ শেষে সৃষ্টির আনন্দ। পুরুষ যখনই কোন মেয়েকে ভালবাসে তখন কর্তনায় তাকে একটা মনের মতন রূপে গড়ে নিয়ে তাকে ভালোবাসে। তা যদি না হত তাহ'লে সে যে কোন মেয়েকে ভালোবেসে স্বামী হতে পারত! মেয়েতে মেয়েতে প্রভেদ দেখতে নয়, পুরুষের কর্তনায়। একজন পুরুষ যখন ভালোবাসে তখনই সে দেখতে পায় মেয়েটার দৃষ্টিতে তার নিজের স্বপ্ন-কাননের

ছায়া। নিজের কর্তনায় রঙে তাকে রঙিয়ে নেয়, নিজের আশায় আলোকে তাকে নতুন রূপে চিনতে শেখে, অনবরত কেবলই ডুবতে থাকে, তুমি তুমি নও, তুমি আমার মানসী—আমার মানস-প্রতিমা। এমনকি করে নিজের আকাঙ্ক্ষার আভরণে তাকে সাজিয়ে নিয়ে তাকে ভালোবাসে। জানতে চাও পুরুষের আশা কি, আকাঙ্ক্ষা কি, বাসনা কি? জানতে চাও, একটি মেয়েকে ভালোবেসে তার কাছে কি সে চায়? পুরুষের মনে সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সে চায় ভালোবেসে নারীর নারীত্বকে জাগিয়ে দিতে, তার মাতৃত্বকে মহিমাযিত করতে। নারী হল তার সৃষ্টির অভিধানে অক্সিডিনী, তাদের মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রবল আবেগ। পুরুষ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে চায় তার সেই আবেগকে নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে—সেই পথে যার পরিণামে পিতৃত্ব। বুঝলে তাহলে দুজনের সৃষ্টির ভিত্তির ওপরে পাড়া যে ভালোবাসা, সে ভালোবাসায় রূপান্তর ঘটবে সন্তানের স্নেহে, এ এমন বড় কথা কি? দুয়ের মাঝে প্রভেদ তা হলে ভিত্তিতে নয় রূপে! ছুটি ভালোবাসা হল একই আরম্ভের একই শেষ, দুই পরিণয়ের একই পরিণতি।'

সুলেখা নীরব স্তনতে থাকে। জ্যোতি যেন দিক্‌হারী সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস, সুলেখা পূর্ণিমার পূর্ণশশী। একের প্রভাবে অস্ত্রের প্রবলতা। জ্যোতির কথায় আছে অতি সত্যের রূপ, আছে বলবার মাধুর্য্য, আছে গতি—সে গতি গতানুগতিক ধারার বাইরে, সুলেখার মনের সঙ্গে মিশিয়ে। তার মনের কোণে কোণে ওর কথার প্রতিধ্বনি। সুলেখা নীরব হয়ে তাই ভাবতে থাকে।

নীরবতায় ঘরখানা স্তব্ধ। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে সমস্ত ঘরখানা গভীর অন্ধকারে যেন স্তিমিত। বাইরে রাত্রি বাড়ছে।

[ক্রমশঃ]

খাজাশস্ত্রের উৎপাদনরুদ্ধি

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান যুদ্ধ সাময়িক প্রযোজনে খাজাশস্ত্রের অত্যন্ত টান পড়িতেছে। তাহার উপরে এত বাজালা প্রদেশের শাসকদিগের অপরিণামদর্শিতার ফলে বাজালায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এরূপ দুর্ভিক্ষ বাজালায় আর কখনও দেখা দেয় নাই। এখানে দুর্ভিক্ষ প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক অনাহার ও কষ্টহারজনিত রূপে শমনভবনে গমন করিতেছে। এখনও সেই ভীষণ যুদ্ধের বিরাট নাই এবং শীঘ্র যে ইহার বিরাট হইবে সেরূপ আশাও করা যাইতেছে না। সত্য বটে হিঙ্গালুয়ে সমস্তের বাজালায় অনেক লোক ক্ষয় পাইয়াছিল। সেবৎসর আকৃতিক কারণের সহিত বাজালায় নুতন শাসক-দিগের অবিস্মৃতিকারিতার সংযোগ হওয়ার বাজালায় এক-তৃতীয়াংশ লোক (স্থানে স্থানে অর্ধেকেরও অধিক) লোক মরিয়াছিল। এবার আকৃতিক কারণের প্রতিকৃতা হয় নাই। হিঙ্গালুয়ে সমস্তের খাজাশস্ত্রেই অনটন হইয়াছিল এবারকার মত প্রয়োজনীয় সর্বপন্যেই অনটন বটে নাই। এবার রোগে লোক ঔষধ পথান্ত পাইতেছে না। পথও প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছে। কাজেই লোক অধিক মরিতেছে। সেই জন্য আমি এরূপ দুর্ভিক্ষ বাজালা দেশে কখনও হয় নাই বলিলাম।

মুখ্যতঃ খাজাশস্ত্রের অভাবই বাজালায় বর্তমান দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়া সর্বব্যবসায়িত। ইহার জন্য দায়িত্ব কাহার বা কাহাদের এক্ষেত্রে আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। যে কথা অনেকেরই বলিতেছেন। যাহাইউক, একথা সত্য যে বৎসরাধিক পুষ্ক্রে সরকার এবার বঙ্গদেশে খাজাশস্ত্রের অভাব ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন সেইজন্য তাহারা এতদপ-বাসীকে অধিক খাজাশস্ত্র উৎপাদনের জন্য কতারা জাহির করিয়াছেন। কিন্তু একগায়েই সেই হুকুম তামিল করা সম্ভবে না। কারণ বাজালায় কৃষক এবং কৃষির যেসকল অবস্থা তাহাতে জম অধিক না হইলে অধিক কমল উৎপাদন করা যাইতে পারে না। অতাবে মরণাপন্ন কৃষক জোতা লাঙ্গল এবং অর্ধমৃত বলর লাইরা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করিলে কমল অধিক উৎপন্ন করা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। বর্তমান অবস্থায় কৃষি-পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কাজেই অন্তর্দিকে শস্তের অধিক টান ধরিলে দেশের লোকের পক্ষে উহা পাওয়া কঠিন হইবেই।

কিন্তু চিরকাল বাজালায় এ অবস্থা ছিল না। বাজালী জাতি ইংরাজ শাসনের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত কখনই খাজাশস্ত্রের অভাব অনুভব করেন

নাই। ওর্মে (Orme) লিখিয়া সিদ্ধাছেন বাঙ্গালার এক কার্দিং মিলে একসের চাউল পাওয়া যাইত। (১) তখন এক শিলিং-এর মূল্য আট আনা ছিল মনে করিলে আট আনার দুই মণ ১৫ সের চাউল মিলিত। সুতরাং একটি পয়সা মিলে দেড় সের চাউল মিলিত। ওর্মের বিবরণ পাঠ্যকার প্রসঙ্গ হইল। উহা তাঁহার সমসাময়িক লেখা সুতরাং উহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র ওর্মে এই কথা বলেন নাই, ডাউ (Dow) প্রভৃতিও বাঙ্গালার প্রচুর খাদ্যশস্ত্র উৎপন্ন হইবার কথা বলিয়াছেন। ডাউ বলিয়াছেন যে বাঙ্গালাদেশে কৃষির অতি অমুকুল ক্ষেত্র। তিনি বলিয়াছেন যে প্রভৃতি এই বাঙ্গালাদেশকে যেন স্বহস্তে কৃষির সর্বাপেক্ষা অমুকুল ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (২) অনেকের ধারণা বাঙ্গালা দেশে কৃষিন্যেপক্ষে গোপন জমিত না। স্ট্যান্ডার্ডনিউজ লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালাদেশে অতি উত্তম গম জমিত। এই গম পূর্বে বাটেভিয়ার চালান যাইত কিন্তু পরে উত্তমশাণ্ড অন্তর্যাপের শস্তগণিস্যের হুবিধার জন্য বাঙ্গালার এই পণ্যের রহিবর্ণিগতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (৩) পূর্বেই বলায় অতি উত্তম গম উৎপন্ন হইত। তন্নির এই অঞ্চলে গোলমরিচ ও পিপ্পল এবং অন্যান্য সর্ববিধ শস্ত উৎপন্ন করা হইত, ইহা রেনেল তাঁহার জার্নালে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন। সরকার মামুদাবাদে গোলমরিচ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জমিত। এই সরকার মামুদাবাদ উত্তর-পূর্ব নদীয়া জিলার উত্তর-পশ্চিম, যশোহরের উত্তর-পশ্চিম-এ করিমপুর জিলার পশ্চিমাংশ লইয়া অবস্থিত ছিল। রেনেল আরও বলিয়াছেন বারানসী হইতে যশোহর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলেই খোলা মাঠ ছিল। এই মাঠে অতি হুম্মরভাবে চাষ আবাদ হইত, এই অঞ্চলে ধান এবং ভোলা প্রভৃতি ভূর পরিমাণে জমিত। (৪) কলিকাতা হইতে হাজিগঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত স্থানেই ধান চাষ করা হইত। বারানসীর সম্বন্ধিত চালমাবেড়িয়ার রেনেল অতি হুম্মর নারিকেলকুঞ্জ এবং পানের বরোজ দেখিয়াছিলেন। মহেশপুত্রার নালার ধারে বিস্তার ধান এবং কাঁপাস জমিত। এই মহেশপুত্রা জলাঙ্গার ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। নদীয়া জিলার শ্রীরামপুর এবং শুভুগুড়ি অঞ্চলে অনেক খাদ্য উৎপন্ন করা হইত। (৫)

আলেকজান্ডার ডাউ, ওর্মে ও রেনেল প্রভৃতি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী এবং বঙ্গদেশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কারণই নাই। এই সময়ে অন্যান্য যুরোপীয় পর্যটকের লেখা হইতেও এইরূপই পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার তৎকালে যে প্রভূত খাদ্যশস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহা অস্বীকার করা যায় না। মাষকলাই, মুগ, কলাই, ছোলা, অড়হর, বরবটী, যব, মটর, ধান, খেসারী প্রভৃতিও ভূরি

(১) Rice which makes the greater part of their food is produced in such plenty in the lower parts of the province, that it is often sold at the rate of two pounds for a farthing; a number of other arable grains and a still greater variety of fruits and culinary vegetables as well as spices of their diet are raised with equal ease etc. Vide Military Transactions of the British Nation in Indostan, Vol. II. Page 4.

(২) It seems marked out by the hand of nature as the most advantageous region of the earth for agriculture. —Dow's Hindusthan, Vol. I, CXXVI.

(৩) Stavornius—Voyage to the East Indies, Vol. I p. 391,

(৪) Rennel's Journals, p. 78.

(৫) Ibid. p. 15.

পরিমাণে বাঙ্গালার উৎপাদন করা হইত। (৬) এই সকল খাদ্যশস্ত্রের মূল তখন এখনকার তুলনায় নামমাত্র ছিল। কলাইয়ের মূল ছিল তিন আনা। খেসারীর মূল্য আরও কম ছিল। রেনেলের জার্নাল পাঠে জানা যায় যে বীরভূম জেলায় অষ্টদশ শতাধীতে প্রচুর কাঁপাস-তুলা উৎপন্ন হইত। বরবটগুঞ্জ কাঁপাস অনেক জমিত। হুর্বার কুঠীর পার্শ্ববর্তী বঙ্গপাণি অঞ্চলে প্রচুর কাঁপাস জমিত। (৭) এই অঞ্চল হইতেই ঢাকা জিলায় বস্ত্র নির্মাণের জন্য কাঁপাস তুলী নীত হইত। ঢাকা জিলাতেও কাঁপাস উৎপন্ন হইত। রেনেলের জার্নাল পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। জেমস রেনেল ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গপ্রদেশের সার্ভেয়ার-জেনারেল নিযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালাদেশে তখন প্রচুর চিনিও উৎপন্ন হইত। ফলে বাঙ্গালা চিরকালই অন্যান্য দেশের অন্ন যোগাইয়াছে। বাঙ্গালাকে কখনই খাদ্যশস্ত্রের জন্য অন্ত্রের নিকট হাত পাতিতে হয় নাই।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পরাশীর যুদ্ধ হয়। রবার্ট ওর্মে তৎপূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। সুতরাং তিনি তখনকার পণ্যের মূল্য বিবরণ ছিল তাহা ভাল জানিতেন। তাঁহার প্রণীত History of Military Transactions of the British Nation in Indostan পরাশীর যুদ্ধের পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ এদেশের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিবার সময় এদেশে খাদ্যশস্ত্রের বিক্রয় প্রাচুর্য ছিল, উহার বিক্রয় বাজারদার ছিল, তাহা তিনি বিশদরূপে জানিতেন। তিনি যে লিখিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালায় এক কার্দিং মিলে দেড় সের চাউল পাওয়া যায়,— তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

বাট, পর্যটক বৎসর পূর্বে আমরাই দেখিয়াছি যে বাঙ্গালার বাজারে চাউল পাঁচসকা, দেড় টাকা মন বিকায়িত। তখন তেটে চাউল নামক এক প্রকার চাউল প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত। উহা মোটা চাউল এবং দুই শ্রেণীর ছিল। একশ্রেণীর নাম তেটে আর একশ্রেণীর নাম দুখে-তেটে। তখন কলকাতা চাউল ছিল না। তেটে চাউল একটু লাল এবং দুখে তেটে সম্পূর্ণ সাদা ছিল। উভয় চাউলই সুবাস্ক ছিল। গরীব লোকেরা লাল তেটেই খাইত। উহা বড়জোর পাঁচসকা মণ বিকায়িত। তৎপূর্বে বারদা চাউল নামক এক প্রকার চাউল দশ আনা, বার আনা মণ বিকায়িত—পূর্বজ-গণের মধ্যে উহা প্রায় স্ফা যাইত। ডাইল, কলাই, বেগুন এবং তরিতরকারী তদনুপাতে সম্ভা ছিল। কাজেই তখন অন্নকষ্ট ছিল না।

কেহ কেহ বলেন যে তখন খাদ্যশ্রব্য যেমন হুলস্থল ছিল, পয়সা সেইরূপ দুর্লভ ছিল। কাজেই লোকের অন্নকষ্ট ছিল। অনেক ইংরাজ একথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের প্রকাণ্ড ভুল। কারণ মুসাম্মুল তখন অধিক থাকায় লোকে বাহা পাইত তাহাতেই তাহাদের খজুলে সংসার চলিত। তখন একজন দিনমজুর প্রতিদিন ছয় পয়সা করিয়া পারি-শ্রমিক পাইত, ইহা সত্য। কিন্তু সেই ছয় পয়সা দিয়া তাহার নর সের চাউল কিনিতে পারিত এবং মজুররা এক বেলা আহার পাইত। এখন বার আনা করিয়া দিনমজুরী করিয়াও তাহার প্রতিদিন দেড় সেরের অধিক চাউল পায় না। এই ছয় পয়সার কলাই, খেসারী প্রভৃতি ডাইল প্রায় অর্ধ মণ পাইত। তখন সরিষার তৈলের মূল্য ছিল টাকায় ২৫ সের। অর্থাৎ প্রায় আড়াই পয়সা সের। সুতরাং দিনমজুরের এক দিনের রোজগার ২ সের তৈলের অধিক। এখন সে মজুরী করিয়া দেড় পোরা তৈল পায়। সুতরাং

(৬) ধান, চাল, মাষ, মুগ, ভোলা, অড়হর
মহরাদি, বরবটী বাটুলা, মটর।
দেধান, মাড়ারা, কোড়া, চিনা, ভুয়া যব।

ভারতচন্দ্র, মানসিংহ।

(৭) Rennel's Journals p. 109—111.

তখন দিনমজুরদিগের অবস্থা অধিক ভাল ছিল কি এখন অধিক ভাল হইয়াছে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন। তখন কেবল কাপড়ের মূল্য অজ্ঞাত জিনিষের মূল্য অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু অনেক বরে চরকার সূতা কাটিয়া তাহাতে কাপড় বুনিয়া পরিহিত,—তখনকারকালে এখনকার লোকের মত বরে ছু চার কর্তন বাহিরে কোঁচা পতন ছিল না। কাজেই লোকের অভাব মোটেই হইত না। চাষীরা যেমন অল্প মূল্যে শত বিক্রয় করিত, তেমনই অল্প মূল্যে অজ্ঞাত সকল জিনিষ কিনিত। তখন এক একজন চাষীর জোতে গড়ে এখনকার চাষীদের প্রায় তিন গুণ জমি থাকিত। তখন বিবিধ শ্রমশিল্পে অনেক লোক খাটিত। কাজেই জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য এত চাপ পড়ে নাই। এখন শ্রমলোপ হেতু সকলেই চাষ-কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেছে, ফলে চাষের জমি নানানভাবে বিভক্ত হইয়া চটকন্ত মাংসে পরিণত হইতেছে। কাজেই তখনকার চাষাদিগের অবস্থা ভাল ছিল। তখন একজন চাষীর ৪টি ভেলে থাকিলে সবাই শৈতুক জোত-জমি বিভক্ত করিয়া লইত না,—অন্ত শ্রমকার্যে আত্ম নিয়োগ করিত। তখন জীবনযাত্রা-নির্বাহের ব্যয় অল্প ছিল এবং দেশে শিল্প ছিল বলিয়া জনসাধারণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। বাট পরষটি বৎসর পূর্বে আমরা তাহাদের অনেক নমুনা দেখিয়াছি। সুতরাং বাঙ্গালী খাজনাত উৎপাদনে বরাবর অবহিত ছিল, বাঙ্গালীর আহাঃাদি বিষয়ে কোন অভাব ছিল না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে অধিকার স্থাপন হইতে বাঙ্গালী দেশে এই দুর্দশার সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালার শিল্প ঘরে ঘরে লোপ পাইতে থাকে,—খাজের ফসল উৎপাদন সমুচিত করিয়া বাণিজ্য-ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়, খাজনাত বিদেশে ক্রমাগতই অধিক পরিমাণে চালান যাইতে থাকে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে পরিমাণ খাজনাত, বিশেষতঃ, চাউল, যব প্রভৃতি বিদেশে চালান যাইত, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক অধিক ঐ সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। খাজনাতের চাষ কমিতেছে, খাইবার লোক বাড়িতেছে। তাহার উপর দেশীয় শ্রমশিল্পের বিলোপ হেতু বুজুর্গদিগের দল পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু সরকার শ্রমশিল্প প্রবর্তন ব্যাপারে এ পয্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন দেখাইয়া আসিতেছেন, কৃষির উন্নতির জন্যও বিশেষ কিছুই করেন নাই। তাহার কৃষির উন্নতির জন্য সামান্য বাতা কিছু করিতেছেন, তাহাতে দেশীয় কৃষির উন্নতি কিছু মাত্রও সাধিত হইতেছে না। তাহার বাঙ্গালার নানানস্থানে কৃষি বিভাগের অধীনে অনেকগুলি কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্বে অঞ্চলে ৭টি জিলায় মধ্যে মাত্র ৪টি জিলাতে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। পশ্চিম অঞ্চলে ১১টি জিলায় মধ্যে ছয়টি জিলায় এং উত্তর অঞ্চলে ৭টি জিলাতে ৮টি সরকারী কৃষিক্ষেত্র বিস্তারিত। কিন্তু উহাতে যে সকল পরীক্ষা হয়, দেশের অশিক্ষিত চাষীরা তাহার কিছুই জানিতে পারে না। তাহাদিগকে উহা জানাইবার বা উহার ফসল দেখাইবার কোন চেষ্টাই এ যাবৎ করা হয় নাই। তাহাদের রিপোর্ট কৃষকরা জানিতে ও বুঝিতে পারে না। যে ভাষায় উহা লিখিত হয় ভারতীয় চাষীরা তাহার কিছুই বুঝে না। চাষাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বোধ হয় বর্ণজ্ঞানবিহীন মূর্খ, বৈজ্ঞানিক চাষের মর্শ্ব তাহার বুঝে এতদূর আশা করাই মূর্খত। সরকারী কৃষিশালায় সকল বিষয়ের পরীক্ষা করা হয় নাই। তাহা করিবার আয়োজনও নাই। ভারতীয় সরকারী কৃষিশালায় প্রধানতঃ চা, ককি, পাট, ইন্দু প্রভৃতি কয়েক প্রকার কৃষি ও পণ্যের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গীয় সরকারী কৃষিশালায় অধিকন্তু কয়েক প্রকার ধানের ও ইন্দুর সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়াছে। ডাইলের পরীক্ষা অধিক হয় নাই। তরিতরকারীর ফলন এবং গুণবৃদ্ধির জন্য কি পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা কেহই জানে না। খাজনাতের মধ্যে ফলও গণনীয়। কিন্তু ফলের চাষের উন্নতি-সাধনের জন্য বিশেষ কিছু করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কানপুরের

এইচ. সি. বোটানিক্যাল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে পরীক্ষার দ্বারা পেশিয়ার মধ্যে যে পেশেন নামক অরিষ্ট আছে, তাহা অনেক বৃদ্ধিত করিবার পরীক্ষা সকল হইয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেক পেশিয়ার গাছ হইতে প্রতি বৎসর ১৫ পুণ্ডিও করিয়া পেশেন নামক ঔষধ পাওয়া যায়। এক একর (৩ বিঘা) জমিতে ৫০০ পাচ শত পেশে গাছ উৎপাদন করিলে ১ শত পাউণ্ড পেশেন পাওয়া যায়। উহার মূল্য ৮ শত টাকার কম নহে। এখন বরং অধিক। অর্থাৎ কেবল পেশের চাষ করিলে প্রতি বিঘার বাৎসরিক ২ শত ৬৭ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। ইহা ভিন্ন আর একটা দ্রব্য দিয়াও ইহার শ্রেয়জনীয়তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই ম্যালেরিয়া-প্রাণিত বঙ্গদেশে বহুলোকই দ্রোণ যকুতের বিকৃতফলে অজীর্ণ রোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। ইহার যদি পেশের তরকারী ধায়, তাহা হইলে অনেকটা উপকার পায়। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি যেমন উদাসীন, সরকারও তেমন উদাসীন। দেশীয়েরাও কৃষি ব্যাপারে আপনাদের ইষ্ট দর্শন করেন না।

বাঙ্গালার সরকারের ২৭টি কৃষিশালা ভিন্ন বঙ্গদেশে আরও নামে মাত্র ২ শত ৫০টি বেসরকারী কৃষিশালা বা বৈজ্ঞানিক খামার আছে। উহার অধিকাংশই গভামগতিক ভাবে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য পরিচালিত করিয়া থাকেন। উহার মধ্যে ৬টি পূর্বে অঞ্চলে ১৮৬টি পশ্চিম অঞ্চলে এবং ৫৯টি উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত। উহার মধ্যে তিনটির আয়তন ২ শত হইতে ৫ শত বিঘা এবং একটির আয়তন ১৮ শত বিঘা। সমুদ্র জমিদারগণ কর্তৃক ইহা পরিচালিত হইতেছে। এগুলি সমস্ত রাজসাহী জিলায় অবস্থিত। কিন্তু ইহাদের কোনটিরই কার্য্যফল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বাঙ্গালীর খাজনাতের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবল ধান গম প্রভৃতির উন্নতি সাধনে অবহিত হইলে চলিবে না, তরিতরকারী, শাক-শজীরও উন্নতি করিতে হইবে। এই সকল কৃষিশালায় সরকারী কৃষিশালায় বাহা পরীক্ষা দিচ্ছি তাহারই অনুবর্তন করা হইয়া থাকে। বাধানভাবে কোন অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত হয় কি না, তাহা আমি জানি না। এবিষয়ে ইহার পরিচালকবর্গের অনুরোধ আছে তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্যভাবে কিছু করা বর্তব্য। ইহার স্বত্বাধিকারীরা সাধারণ কৃষক অপেক্ষা শিক্ষিত। পাশ্চাত্য খণ্ডে কৃষকরাই স্বাধীনভাবে কৃষির অনেক উন্নতি করিয়াছে। যে গোল বাছুরের ডাকে সাড়া দেয় না, সে যে ভেড়ার ডাকে সাড়া দিবে ইহা আশা করা যায় না। দেশের কৃষির উন্নতি করিব এইরূপ ব্রত লইয়াই এই সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সকল সময় লাভ-লোকসান খতাইলে চলে না। শিক্ষিত শ্রেণীরও কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা বিধেয়। তা না করিলে খাজনাত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।

আমল কথা কি সরকার কি দেশীয় লোকেরা কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধন বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অধিক খাজনাত উৎপাদন বিষয়ে কেবল মাত্র কতোর দিলে কোন লাভ হইবে না।

স্বাধীন যুরোপীয় দেশে জনসাধারণই চেষ্টা করিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছে। বোয়িংগট (Bousingault) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, লাইবিগ, নামক একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং জন চেনেট লাইস নামক জনৈক ইংরাজ কৃষাবিদ এই প্রথমে যুরোপে বৈজ্ঞানিক প্রণয় কৃষির উন্নতি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় একশত বৎসরের কথা। কিন্তু এই একশত বৎসরই এই সকল দেশে কৃষির প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের লোক এ-বিষয়ে কিছুই করেন নাই, সুতরাং আমাদের যে দুর্দশার একশেষ হইবে, তাহাতে বিশ্বাসের বিষয় আর কি আছে? ভারতবর্ষ অধীন দেশ। শাসকেরা এদেশবাসীদিগকে কৃষির উন্নতির কথা জানান নাই, পরাধীন ভারতবাসী উহা জানিবার চেষ্টাও করে নাই। ইহার পূর্বে হইতেই ভারতের শ্রমশিল্পের বিলোপের ফলেই বহুলোক বেকার অবস্থায় নীত হইতেছিল। লোক জঠরখালায় কৃষিকার্য্যে (লাভদর্শন না

হইলেও) আত্মনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সরকারও বনজঙ্গল উদ্ধার করিয়া নতুন কৃষিক্ষেত্রের প্রসারসাধন করিতে থাকেন। বনজঙ্গল উদ্ধার হওয়াতে বারিপাতের অল্পতা ঘটে এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস পায়। সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একদল বণিকই ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিল। বণিকের স্বভাবতঃ স্বার্থপরায়ণ হইয়া থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকেরও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কাজেই তদানীন্তন সরকার পক্ষ হইতে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। ভারতের মুসলমান শাসন ভাঙ্গিয়া পড়বার পূর্বে হইতেই ভারতবাসীরা মোহাজির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই জন্য তাহারা আপনাদের হিতাধিত অনুমান করিতে পারে নাই। কাজেই উত্তর পক্ষের দোষেই ভারতের এই দুর্দশার বটবীজ উদ্ভূত হইয়াছিল। এখন আমরাই তাহার অবশুস্বাবী কলভোগ করিতেছি।

কিন্তু আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকা চলে না। লীগপন্থী মন্ত্রমণ্ডলীর নিরস্ত্রিত মূল্যে বিক্রীত খান পাথর প্রভৃতি মিশ্রিত চাউল খাইয়াও যদি এ দেশের লোকের চৈতন্য না জাগ্রদে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এ দেশের লোকের আর উদ্ধারের উপায় নাই। সরকারী কর্মচারীবর্গের অনবধানতা অথবা অব্যবস্থার ফলে এবার বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহার সহজে উপশান্তি হইবে না। সেইজন্য আমরা বলি যে এখন এদেশের লোকের স্বতন্ত্র সম্ভব অধিক খাদ্যবস্তু উৎপাদনের চেষ্টা করা অত্যাধিক কর্তব্য।

কিন্তু উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে খাদ্যশস্য অধিক উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান হইতে পারে তাহা সকলের চিন্তনীয় হইয়াছে। আমাদের চিন্তার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি এদেশে প্রবর্তিত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে কৃষকদিগের জ্যেষ্ঠের জমি বৃদ্ধি করিতে এবং লাঙ্গল ও বলদের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে জমির উপর চাপ কমাইতে হইবে তাহা করিতে হইলে সরকারী এদেশে শ্রম-শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার সাধন করা চাই। তাহা করিলে কতক লোক অধিক অর্থলাভের আশায় অনিশ্চিতফলপ্রদ এবং অজ্ঞানজনক কৃষি ভাগ করিয়া শ্রমশিল্পসেবায় রত হইবে। ফলে চাষীর সংখ্যা কমিলে কৃষকের জ্যেষ্ঠের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। জমি বৃদ্ধি পাইলেই কৃষকের অবস্থা ফিরিবে। কৃষকের অবস্থা ফিরিলেই তাহারা ধাইতে পাইবে, বলীবর্ধকেও খাওয়াইতে পারিবে এবং জমিতে সার দি-ও পাইবে। ফলে শস্যের উৎপত্তি কিছু না কিছু বাড়িবেই। তাহা হইলে 'খাদ্যশস্য অধিক উৎপাদন কর' এই উপদেশ মার্থক হইবে। একজন কৃষক সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সর্বোপায় প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক কৃষি ভালভাবে প্রবর্তিত করিতে হইলে একসঙ্গে এক জন কৃষকের জ্যেষ্ঠে অন্তঃ একশত একর বা তিনশত বিঘা জমি রাখা চাই। কলের লাঙ্গল (Tractor) দ্বারা চাষ করা হইবে। কলের লাঙ্গলের সাহায্যে এক ফুট গভীর করিয়া জমির চাষ করা যায়। দেশীয় বলীবর্ধবাহিত লাঙ্গলে ছয় ইঞ্চির অধিক গভীর চাষ দেওয়া সম্ভব নহে। ক্ষেত্র বিশেষে গভীর চাষ প্রয়োজন না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে। সেসকল ক্ষেত্র অধিক নহে। একটা বাম্পারালিত কলের লাঙ্গলের সাহায্যে একজন লোক তিনশত বিঘা অনায়াসে ভাল করিয়া চাষ করিতে পারে। বলিষ্ঠ বলিবর্ধ এবং লাঙ্গলের সাহায্যে একটা লোক একদিনে বড় জোরে বিঘার অধিক জমি চাষ করতে পারে না। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য কত তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। জমিতে গভীর চাষ দি-ও যদি উচ্চাঙ্গে রাসায়নিক সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে জমির ফসলের পরিমাণ সহজেই তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। ভারতবাসীর আর আপদকালে সামরিকদিগকে খাদ্য যোগাইতে বস্তু হইবে না। রুশিয়ায় ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। আর শাসিত রুশিয়ায় কৃষিবলের অবস্থা ভারতীয় কৃষিবলের হইয়াছে। আর শাসিত রুশিয়ায় কৃষিবলের অবস্থা ভারতীয় কৃষিবলের অবস্থার চেয়ে অথবা এতদপেক্ষাও হীন ছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থাতে ১৯১০

খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাহার বিব্রাহ উপস্থিত হয়। বিব্রাহের পরবর্তী ফল বিশেষ ভাল হয় নাই। উহার ফলে ভূমধ্যসাগরদিকের উদ্ধার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষকদিগের অস্থায়ী উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর রুশিয়ার সরকার যখন পক্ষ-বাহিনী পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়া শ্রমশিল্পেব উন্নতিসাধনে রত হন তখন সমগ্র জমি সরকারের কারিয়া এবং কৃষকদিগকে শ্রমিকে পরিণত করিয়া যে ব্যবস্থা করেন, তাহাতে জমির উপর চাপ কমিয়া যায় এবং বহু কৃষক কলে শ্রমকের কার্য্য করিতে যায়। তাহারা হল বর্ষণ করিত তাহাদিগকে সম্মিলিত ভাবে চাষ করিতে বাধ্য করা হয়। ঐ কার্য্য করিতে রুশিয়া যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা অত্যন্ত অসম্মত। এরূপে তাহার আলোচনা করিব না। ভারতে তাহা প্রবর্তিত করা সম্ভব হইবে না, বৃত্তিসম্মতও হইবে না। তবে উত্তর একটা দিক এই যে যতদিন শ্রমশিল্পের দিকে লোকদিগকে নিয়োগ করা না হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার না করা হইয়াছিল, ততদিন কিছুই হয় নাই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে এই শিক্ষাটি সর্বোপায় গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু রুশি সরকার তাহা করিতে সম্মত হইবেন কি? তাহারা কি ভারতকে বর্তমান রুশিয়ার স্থায়ী শ্রমশিল্পপ্রধান করিতে সহায়তা করিবেন?

সমস্তা সম্মত। ভারত রুশিয়া নহে, রুশিয়াও ভারত নহে। উভয় দেশের ঐতিহ্য এবং অবদানপরস্পরা বিভিন্ন। এরূপ অস্থায়ী রুশিয়ার যে বাসস্তা সফল হইয়াছে ভারত তাহা সফল হইবে কি না তাহাও বিবেচ্য। উভয় রাজ্যের রাজনীতিক অবস্থা এক নহে। সুতরাং রুশিয়ার ব্যবস্থা যে ভারতে সম্বোধনযোগ্য খাটিবে ইহা বলা না যাইলেও অনেক বিষয়ে খাটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যথা, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে শ্রমশিল্পের এবং সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন। ইহা না হইলে কেবল অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে বলিলে স্থায়ী লাভ হইবে না। অধিক কতক পণ্ডিত জমি আবাদ করিলে কিছু লাভ হয়ত হইবে, কিন্তু লোকবৃদ্ধি ও অজ্ঞান ব্যাপারে আবার অল্পদিন পরেই একই অবস্থা উপস্থিত হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারত অধিকারের পর হইতে এ পদ্ধতি কৃষিক্ষেত্রের অনেক প্রসার সাধিত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে আজ এই দুর্দশা হইত না। অল্প সময়ের মধ্যেই সার্বজনীন প্রয়োজনে অত্যধিক পয়সায়ে খাদ্যশস্য ক্রয় যে এক দুর্দশার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আপদকালের চরম ব্যাপ্তিও করিয়া গাথিত হয়। ভারতে যদি অধিক শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সে ব্যাপ্তি করা কঠিন হইত না। সত্য বটে সমগ্র পৃথিবীতে যত চাউল উৎপন্ন হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতে জন্মে। ইহাও সত্য যে যে বাঙ্গালীয় এককালে প্রয়োজনের অনেক অধিক চাউল উৎপন্ন হইত, সেই বাঙ্গালীয় আজ অসুস্থভাবে লোক মরিতেছে এবং বহু লোক ধানে-চালে খাইতেছে। সেইজন্য বলি, ফসলের উৎপাদন বর্ধন করা আবশ্যক। অজ্ঞান কিছু হইবে না।

এবার ভ্রমলোকদিগের কষ্ট অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। বহু লোক প্রত্যাহ মরিতেছেন। আমার মনে হয় তাহারা যদি তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে খাদ্যশস্য, তরিতরকারী উৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এত দুর্দশা হইত না। এখন অনেকেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এখন উপায় করিবার পথও আর নাই। কৃষকদিগের বড় কম লাভ হয় না। কাশপুরের হার-কোট বাটলার টেকনলজিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক মিষ্টার এইচ. ডি. সেন এববার হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ১০ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করিলে ৮ হাজার ৮ শত ৬০ টাকা খরচেরচা বাদ লাভ হয়। অর্থাৎ এক বাটা জমিতে বার্ষিক প্রায় ১০ টাকা লাভ হয়। যদি ৫ টাকাও লাভ হয় তাহা হইলে ত দৈন্য সম্পূর্ণ লাভ। এ সম্বন্ধে অজ্ঞান কথা পেরে বলিব না বাঙ্গালী এখনও এ বিষয়ে মনোযোগী হইন।

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

কলিকাতা ও পূর্ব বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

সম্প্রতি কার্তিকের গোড়া হইতে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল সংবাদ আমাদের দৃষ্টারে আসিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়—বিশেষ কবিয়া নোয়াখালি, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উপযুক্ত কুইনাইন ও পথের অভাবে রোগ প্রশমিত হওয়া দূরের কথা, ইতিমধ্যেই ইহা সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে। কলিকাতার পূর্বাঞ্চলেও এইরূপ সংক্রামক ম্যালেরিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুহার প্রায় লক্ষাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মূলে যেমন একধিকে রহিয়াছে যুদ্ধজনিত খাচ্ছাভাব, অন্যদিকে তেমনি রহিয়াছে করপোবেশন ও মিউনিসিপালিটিগুলির কার্যপরিচালনার অযোগ্যতা। যে আকারে এই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, তাহার তুলনায় গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কুইনাইন বণ্টনও উল্লেখের বাহিরে। বাকালী আজ নানাভাবে মথিতে বসিয়াছে; ম্যালেরিয়া তাহার মধ্যে প্রধানতম একটি। অথচ আগাগোড়া লক্ষ্য কবিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা হইতে বাংলাকে বাচাইবার জ্ঞান গভর্ণমেন্ট অত্যাধিক এইদিকে কোনরূপ প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেন নাই। কলিকাতা ও পূর্ব বাংলার ম্যালেরিয়ায় ইতিমধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট এই সংক্রামণের জ্ঞান কি করিতেছেন?

কমলাঘাটে অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা বিক্রমপুরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র কমলাঘাটে সম্প্রতি ২৬শে অক্টোবর রাত্রিতে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ২২৫টি গুদাম এবং বহুসংখ্যক গৃহস্থ বাড়ী জ্বলিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। কমলাঘাট পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। এত বড় অগ্নিকাণ্ড ইতিপূর্বে কখনো পূর্ববঙ্গের কোথাও ঘটিতে দেখা যায় নাই। ইহার ফলে প্রায় দুই কোটি টাকাবও উপরে ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়—সরকারী গুদামের প্রায় লক্ষ মণ ধান, চাউল, পাঁচ হাজার মণ লবণ, নয় শত বস্তা চিনি এবং প্রচুর কেরোসিন তেল প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে। এই সর্বনাশকর অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্যবসায়ের যে কি প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। কেহ কেহ এই অগ্নিকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িক প্রক্রিয়া বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মূল কারণ এখনও বিশুদ্ধস্বত্রে জানা যায় নাই। সরকারী মহল হইতে আমরা অবিলম্বে তাহা জানিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।

কংগ্রেস সাহিত্য-সভা

গত ১৮ই কার্তিক শনিবার সায়েন্স কলেজ স্ট্রীটস্থ কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে ছাত্রকর্মী, কংগ্রেসকর্মী এবং সাহিত্যিকবৃন্দের এক প্রতিনিধি স্থানীয় সম্মেলনে “কংগ্রেস সাহিত্য সভা” নামে একটি নূতন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীমত প্রিয়বঞ্জন সেন অধ্যক্ষানের সভাপতিত্ব করেন। এবং দেশের সাম্প্রতিক দুর্দশা ও বিপন্ন সংস্কৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস জাতি ও

সাহিত্যকে সংহত ও রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যিকতা বর্ণনা করেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনমূলক কর্মসূচী অনুযায়ী আলোচ্য সভ্য বৃহত্তর দেশের কাজে আসিলে শাস্তির কথা। ভয় হয়, বাংলার অধিবাসীদের মতো এই সজ্জন জীবনকালও স্বল্পকাল-স্থায়ী না হয়! সজনীবাবুর প্রতিভা ও কর্মশক্তির উপর অনেকখানি ভরসা রাখি।

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন

গত ৮ই কার্তিক বুধবার রাত্রি ১০-৫০ মিনিটের সময় কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন তাঁহার চিত্তবঞ্জন এভিনিউস্থ কল-তরু ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি কলতরু আয়ুর্বেদ ওয়ার্কস্-এর স্বত্বাধিকারী এবং বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বাংলার আয়ুর্বেদীয় ষ্ট্রেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। বাংলা ১৩৮৭ (ইং ১৮৭৭) সালের ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার বারাগাঙ্গীধামে গণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ বিজ্ঞানকল্লভ্রম এবং মাতার নাম সৌদামিনী দেবী।

গণনাথ সেনের পরলোকগমনে বাংলা, তথা ভারতীয় আয়ুর্বেদ-জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীমতী রেখা দেবী

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে মহিলা বিভাগের পরিচালিকা এবং মাসিক বঙ্গশ্রী পত্রিকার অন্তঃস্থ বিভাগের প্রাক্তন লেখিকা হিসাবে বাংলা দেশের যবে যবে শ্রীমতী রেখাদেবীর প্রতিষ্ঠা আছে। সম্প্রতি তিনি বাংলা দেশ হইতে প্রথম মহিলা কর্মী হিসাবে লণ্ডনের বেতারকেন্দ্রে বাংলা বিভাগের ভার লইয়া গিয়াছেন। বাংলার নারী সমাজে তিনি যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভারতের বাহিরে সুদূর লণ্ডনেও তিনি বাংলার ততখানি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

মাকিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

সম্প্রতি মাকিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাণর বৎসরের জায় এবারও মিঃ রুজভেন্ট নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় রিপাব্লিকান দল হইতে দাঁড়ান মিঃ ডিউই। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ৩৯৫টি ভোট সমেত ৩৪টি ষ্টেটে ডিউইকে পরাজিত করিয়া মিঃ রুজভেন্ট এই চতুর্থবারের জ্ঞান পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। ১৩৬টি নির্বাচনী ভোট সমেত ১৪টি ষ্টেটে মিঃ ডিউই রুজভেন্টের পুরোভাগে ছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বস্বাধীন ভোটে তিনি পরাজিত হন।—নিউইয়র্ক হইতে বলা হইয়াছে, রুজভেন্ট পন-নির্বাচিত হওয়ার অর্থ হইল, প্রতিষ্ঠানে পূর্ণভাবে স্থান

কাল ও চীনের সহিত সহযোগিতা অক্ষর থাকিবে

ইহা হইবে। বস্তুহীনতা ইহা বাক্যের ভাষ্য। বস্তুহীনতা ইহা বাক্যের ভাষ্য। বস্তুহীনতা ইহা বাক্যের ভাষ্য।



প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

—এই ভিত্তিতে ভারত সম্পর্কে গণতন্ত্রী রুজভেল্ট কার্যকরী প্রচেষ্টা কিছু করিবেন কি ?

১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার

ষ্টকহলমের ২৬শে অক্টোবরের এক সংবাদে ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। শরীর-বিজ্ঞান ও ঔষধের জন্ম ১৯৪৩ সালে পুরস্কার পাইয়াছেন—কোপেনহেগেনের প্রফেসর কেনরিক ডাম ও মিন্তরীর অন্তর্গত সেন্ট লুইর প্রফেসর এডওয়ার্ড এডেনবার্ট ডয়সী। ১৯৪৪ সালের উক্ত পুরস্কার পাইয়াছেন সেন্টলুইর প্রফেসর এমেরিটাস জোসেফ এরলেনজার ও নিউইয়র্কের প্রফেসর হার্বার্ট গেসার। দুই বৎসরই সম্মিলিত পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য কার্যকলাপের পার্থক্য সম্পর্কিত গবেষণার জন্ম শেখোক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। 'কে' ভিটামিন আবিষ্কারের জন্ম প্রফেসর ডামকে ১৯৪৩ সালের নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক এবং এই ভিটামিনের রাসায়নিক কার্য কলাপের গবেষণার জন্ম প্রফেসর ডয়সীকে অবশিষ্ট অর্ধাংশ দেওয়া হইয়াছে। শাকসজ্জা, চর্বি ও পালংশাকে 'কে' ভিটামিন রহিয়াছে। ডয়সী ও ডাম কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-কেমিক্যাল ইনস্টিটিউটে এই ভিটামিন আবিষ্কার করেন। গবেষণাগারে মুরগীর সাবককে বিভিন্ন খাদ্য দিয়া এবং সে সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণা দ্বারা 'কে' ভিটামিন আবিষ্কার সম্ভব

'জুইশ ডোমিনিয়ন অব প্যালেস্টাইন লীগ'

প্যালেস্টাইনকে একটি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্ত লর্ড ষ্ট্রাবলগির সভাপতিত্বে একটি নতুন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া লণ্ডন হইতে ৬ই নভেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার অভাবশালী ইহুদীদের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে; উহার নাম হইবে—'জুইশ ডোমিনিয়ন অব প্যালেস্টাইন লীগ'।

লীগের সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জায়, সাধারণ স্বার্থ ও আদর্শের ভিত্তিতে বৃটিশ ও ইহুদীদের মধ্যে সখ্য স্থাপন এবং প্যালেস্টাইন উপনিবেশ ও প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় উৎসাহ দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহ খোলা হইবে এবং জাতিধর্মনির্ভরশেবে সকলেই ইহার সদস্য হইতে পারিবেন। পার্লামেন্টের সদস্য স্যার প্যাট্রিক হানন, ফিল্ড মার্শাল স্যার ফিলিপ চেষ্টার্ড এবং লেডি ওয়েল্ডউ প্রভৃতির ভাইস প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। বিভিন্ন দলের কতিপয় লর্ড ও পার্লামেন্টের সদস্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য তালিকার আছেন।

জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অপসারণ

সম্প্রতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল তাঁহার কার্য্যপদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন। বিগত ৩১শে অক্টোবর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় ব্রুক এ্যাটকিনসনের একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—মার্শাল চিয়াং কাইসেকের চাপে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে অপসারিত করিতে সম্মত হন। মার্শাল চিয়াং কাইসেক এবং জেনারেল ষ্টিলওয়েলের মধ্যে প্রধান বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল এই জন্ত যে, ষ্টিলওয়েল কালবিলম্ব না করিয়া চীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্ত উদ্যোগ হইয়াছিলেন। কিন্তু মার্শাল চিয়াংয়ের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। ষ্টিলওয়েলের সহযোগী মিঃ ডারেল বেবিগানও সম্প্রতি চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গন হইতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অপসারণ সম্পর্কে তত্ত্বের ব্যাপার বিবৃত করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন : 'চীন হইতে জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে নিতান্ত ব্যক্তিগত প্ররোচনায় সরাইয়া আনা হইয়াছে। উহা না করিয়া উপায় ছিল না। জেনারেল চিয়াংকাইসেক রাষ্ট্রপতি; সেদিক হইতে তাঁহার (ষ্টিলওয়েলকে সরাইবার) ইচ্ছাকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে, ষ্টিলওয়েলকে সমমধ্যাদাসম্পন্ন অপর একটি পদে নিযুক্ত করা হইবে।

রুমানিয়ায় নতুন গভর্নমেন্ট

গত ৪ঠা নভেম্বর রুমানিয়া রেডিও হইতে প্রচারিত এক রাজকীয় ঘোষণায় রুমানিয়ায় নতুন গভর্নমেন্ট গঠনের কথা

প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভায় আছেন : মন্ত্রিসভার প্রেসিডেন্ট ও অস্থায়ী-সমরসচিব জেনারেল কনষ্টান্টাইন সানাটেক্স ; মন্ত্রিসভার ভাইস প্রেসিডেন্টে পিটার গ্রোজা ; পররাষ্ট্র সচিব কনষ্টান্টাইন ভিসোনাউ ; এবং সমর উপপাদন-সচিব কনষ্টান্টাইন রাতিনাউ। প্রকাশিত সংবাদ-পরিচিতি হইতে দেখা যায় : আগষ্ট মাসের শেষে রুমানিয়া যখন যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করে এবং এন্টিনেস্কুর কর্তৃত্বের অবসান হয়, তখন জেনারেল সানাটেক্স নূতন গভর্নমেন্টের গঠন করেন। জ্ঞাননালিষ্ট পাটির সদস্য মিঃ গ্রোজা যুদ্ধপূর্ব গভর্নমেন্টগুলির আমলে বিভিন্ন মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছিলেন। ভিসোনাউ একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ; মস্কোতে সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে যে যুদ্ধবিরতি প্রতিনিধিদল পাঠানো হইয়াছিল, ভিসোনাউ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এতদ্ব্যতীত ব্রাতিলাউ গত ১২ বৎসরকাল ধরিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন।

বর্ণবৈষম্য না গুণবৈষম্য

কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন অথবা রেজিমেন্টের পরিচালনা ভার পাইবার অযোগ্যতা দর্শাইয়া ক্রান্তের মার্কিন নিগ্রো সৈন্যবৃন্দের অধিকার লাভের দাবীর উত্তরে সম্প্রতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার ইউরোপীয় রণাঙ্গনে নিগ্রো সৈন্যদের আশা আকাজকার এক বিস্তৃত সীমারেখা টানিয়া দিয়াছেন। তাহার মতে, একমাত্র প্রথম লেফটেন্যান্টের পদ ভিন্ন তাহাদের বেশী আশা করা স্বপ্ন মাত্র। ইহার উপর মন্তব্য করিয়া নিগ্রো দৈনিকপত্র 'পিটস্বার্গ কুরিয়ার' বলেন : কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন, রেজিমেন্ট ও ব্রিগেড সর্বদাই শ্রেষ্ঠতায় ব্যক্তিগত পরিচালনা করিবে, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের ইহাই সার কথা।—বর্তমান সংস্কৃতিপূর্ণ যুগে গুণোপ-বুদ্ধতাব্য দাবীতে এখনও এই শাদাকালোর বৈষম্য ঘুচিল না ; ইহাকে সভ্য ভাষায় কি বলা যায় ? ইহার পিছনে গণতন্ত্রের ক্রীণমাত্র পরাকাষ্ঠাও দেখা যায় কি ?

বুলগেরিয়ার সহিত চুক্তি

গত ২২শে অক্টোবর রাত্রিতে বুটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক চুক্তির অন্ততম প্রধান সর্গ প্রকাশিত হইয়াছে। সর্গ এইরূপ : বুলগেরিয় সৈন্যবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করিবে এবং বুলগেরিয়া কর্তৃক অধিকৃত গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার এলাকা-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার আইনমূলক ও শাসন বিষয়ক ব্যবস্থা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে হইবে। চুক্তির খসরায় এইরূপও বলা হইয়াছে যে, বুলগেরিয়া অবিলম্বে গ্রীক ও যুগোস্লাভ অধিবাসীদের জন্ত খাজদ্রব্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা গ্রীসের ও যুগোস্লাভিয়ার ক্ষতিপূরণের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।—বুলগেরিয়া সোভিয়েট ও অন্তর্গত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাধীনভাবে পরিচালনার সুযোগ দিবে। মিত্র সামরিক কর্তৃপক্ষের সাধারণ নির্দেশমত প্রয়োজনীয় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সাহায্য দিতে বুলগেরিয়া বাধ্য থাকিবে। জার্মানীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে বুলগেরিয়ার সমস্ত

বাহিনীকে ভাঙ্গিয়া মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ মিশনের তত্ত্বাবধানে শান্তিকালীন অবস্থায় আনিতে হইবে।—যুদ্ধবিরতির সর্বমুহুর্তে বুলগেরিয়-গভর্নমেন্ট বুলগেরিয়ায় জার্মান সৈন্যদের নিরস্ত্র করিবার এবং জার্মান ও তাহার অধীন রাষ্ট্রবর্গের অধিবাসীদের আটক করিবার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত—অবিলম্বে বুলগেরিয়ার সমস্ত ক্যাসিষ্টপক্ষীয় রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্তর্গত যে সকল প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছে, সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে ; এবং যুদ্ধের জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পত্তির বৈধতা হইয়াছে, বুলগেরিয়াকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। বুলগেরিয়ান বাণিজ্য জাহাজ সমূহ সোভিয়েট হাই কমান্ডের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকিবে।

মহাযুদ্ধের গতিপথে

ভারত-সীমান্ত—

এই বৎসর শীত পড়িবার প্রাকালেই জাপানী বিমান পুনরায় ভারত সীমান্তে দেখা দিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হইলেও কলম্বাজায়ে পুনরায় জাপানী বোমা বর্ষিত হইয়াছে। যাহাতে জাপানীরা চট্টগ্রাম ও কলিকাতা অঞ্চলে ভবিষ্যতে বিমান আক্রমণ করিতে সুযোগ না পায়, সেই উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষ আরাকান অঞ্চলে জাপানীদিগকে অনবরত বিব্রত রাখিবার জন্ত ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছেন। এইরূপ আশা করা যায় যে, নৌবহর ও বিমানের সাহায্যে রেলুন আক্রমণ ও ইয়াবতী দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশের যে পরিকল্পনা মিত্রপক্ষের আছে, শীঘ্রই তাহার কার্য-কারিতা দেখা যাইবে। বঙ্গোপসাগর ধরিয়া ব্রহ্ম অভিযানের পরিকল্পনাও মিত্রপক্ষ করিতেছেন।

উত্তর-ব্রহ্ম-রণাঙ্গন—

সম্প্রতি ভাংমা অধিকারের উদ্দেশ্যে চীনব্রহ্মপথ উন্মুক্ত করিবার জন্ত মিত্রপক্ষের অভিযান চলিয়াছে। চীন সৈন্যদল মিচিনা-ভাংমা সড়ক ধরিয়া দক্ষিণমুখী অভিযানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এতদ্বিধ ৩৬তম বৃটিশ ডিভিসন মগাউং-মান্দালয় রেলপথ সোজা কালা অভিমুখে ৪৬ মাইল অতিক্রম করিয়াছে। উত্তর-ব্রহ্মযুদ্ধে এডমিরাল মাউন্ট ব্যাটনের অভিযান-তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চীন-রণাঙ্গন—

জাপানীরা চীনের কিউলিন অধিকারের জন্ত অনবরত আগাইয়া চলিয়াছে। কিউলিন সহর কাংশি প্রদেশের রাজধানী ও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মস্কোর 'ওয়ার এ্যাণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাশ' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের কোনো কোনো রণাঙ্গণে কার্যতঃ যুদ্ধবিরতির অবস্থা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা চীনের প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরাজিতের মনোবৃত্তিস্থলভ ব্যক্তিদের চেষ্টায় ঘটাইয়াছে, এবং জাপানীরা এই অবস্থার স্থিতিকাল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ওয়াকিবহাল মহলে উক্ত পত্রের কোনো কোনো মন্তব্য গৃহীত না হইলেও এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে,

মিত্রপক্ষের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্যের অভাবে চীনকে বাধ্য হইয়াই বিশেষ অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধাভিযানে নিরত হইতে হইয়াছে।

পূর্ব-রণাঙ্গন—

শীতকালীন অভিযান আরম্ভ করিবার জগ্ন সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব রণাঙ্গণে সোভিয়েট বাহিনী নরওয়ে হইতে যুগোস্লাভিয়া পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত রণক্ষেত্র জুড়িয়া উত্তরে ও দক্ষিণে একই সঙ্গে আক্রমণ চালাইয়াছে। লালফৌজের অপূর্ব কৃতিত্ব আগাগোড়া উল্লেখযোগ্য। নরওয়ের বহু অঞ্চল ইতিমধ্যেই তাহারা নাৎসী-কবলমুক্ত করিয়াছে। এদিকে ফিনল্যান্ডে জার্মানবাহিনীর সহিত ফিন সেনাবাহিনীর সংগ্রাম চলিতেছে, এবং ফিন সৈন্তেরা ইতিমধ্যে উত্তর মেরু অঞ্চলে ভূয়োটিমো অধিকার করিয়াছে। পূর্ব প্রশিয়ায় জেনাবেল চার্নিয়াকোভস্কীর বাহিনীর অভিযান প্রতিবোধের জগ্ন জার্মানরা তাহাদের বৃহত্তর শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ধনের সম্মুখে জার্মানগণের পাল্টা আক্রমণ ক্রমাগত ব্যর্থ হইয়া যািতেছে। এদিকে ওয়ারশ'র উপকণ্ঠ প্রাণা হইতে আক্রমণ চালাইয়া লালফৌজ ও পোলিশবাহিনী একটি রেলওয়ে স্টেশন দখল করিয়াছে। গত ৭ই নভেম্বর রাতে জার্মান ওভারসীজ নিউজ এজেন্সীর সাময়িক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, হান্সেরিয়ান রাজধানী বুদাপেষ্টেব পাশ কাটাইয়া লালফৌজের সাঁড়াসী অভিযান বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বুদাপেষ্টের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নতুন আক্রমণ শুরু হইয়াছে। জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাময়িক সংবাদদাতা কর্ণেল ফন হ্যামার বুদাপেষ্টের পূর্বস্থ রণাঙ্গনে তিন্সা নদীর উপরে দুইটি নতুন সোভিয়েট সেতু-যুক্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে চোকা-ক্লোভাকিয়ায় রুশবাহিনীর ক্রম-অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম রণাঙ্গণে রয়টারের সংবাদদাতা জার্মানগণ নতুন গোপন অস্ত্রের আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া বহুরত ভীতি-বাক্যের অবতারণা করিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েটকে সে সম্পর্কে উচাটন হইতে দেখা যায় নাই। নির্ভীক লালফৌজ সর্বত্র নিজেদের শৌর্যের পরিচয় দিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যে রুশ-জার্মানগণ পুনর্মৈত্রী স্থাপিত না হইলে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে লালফৌজের কাছে জার্মানবাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পশ্চিম-রণাঙ্গন—

• সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত বিগত ৯ই নভেম্বরের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ভালচেরেন' বীপে ভাউভেনপোল্ডার জার্মান কবল মুক্ত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল প্যাটনের আক্রমণ পূ-আ-মোসাঁর পূর্বদিকে দশ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণ জুড়িয়া সম্প্রসারিত হইয়াছে। গোলন্দাজবাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণের ফলে জালাকৃত ও ক্ষেজাঁ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে; মার্কিন সৈন্ত-দল গুরুত্বপূর্ণ সহর সাতো সার্গি হইতে চার মাইলেরও কম দূরে

উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। জেনারেল প্যাটনের তৃতীয় আশ্বিন সংশ্লিষ্ট রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, তৃতীয় আশ্বিন পদাতিক সৈন্তগণ মেংস এবং নাসির মধ্যবর্তী ১৩টি সহর অধিকার করিয়াছে। মার্কিন বিমানবহন শমিডট অঞ্চলে প্রতি-পক্ষের কামান সমাবেশের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া স্থলবাহিনীর সহায়তা করে। উত্তরদিকে কিন্তু মার্শাল মন্টগোমারীর সৈন্তদল মোয়েরদিক অঞ্চলে সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং হল্যাণ্ডে জার্মানদের একটি ঘাঁটি উচ্ছেদ করিয়াছে।

বন্ধন-রণাঙ্গন—

গ্রীক গণবাহিনী ও ব্রিটিশ সৈন্তদের সম্মিলিত অভিযানে যুগো-স্লাভিয়ায় লালফৌজের উপস্থিতিতে গ্রীস হইতে জার্মানগণ পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য হইয়াছে। লালফৌজের সহিত সম্মিলিত ভাবে মার্শাল টিটোর বাহিনী যুগোস্লাভিয়ার জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। সাম্প্রতিক সংবাদে বুলগেরিয়ার সহিত মিত্রশক্তির চুক্তি সাক্ষবের কথা জানা গিয়াছে, বর্তমানে বুলগেরিয়ার বাহিনী যুগোস্লাভ সৈন্তদের সহিত এক যোগে ম্যাসিডোনিয়ার জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছে।

জার্মানভূমিতে মিত্রসেনার আক্রমণ—

সম্প্রতি জার্মান ইউবোটের উপদ্রব একরূপ বন্ধ হইয়াছে এবং পূর্ব ওপশ্চিমে মিত্রবাহিনী জার্মানভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। মি: চার্সিল বলেন যে, স্তরীর্ধকাল ধরিয়া মিত্রশক্তির সামনে জার্মান-বিমানজনিত যে ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা ছিল, জার্মানবাহিনীর সেই বিমান উপদ্রবও বিদূরিত হইয়াছে। জার্মানভূমিতে বিমান হইতে মিত্রপক্ষের অগ্নিবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি কথ্য উল্লেখ করিয়া মি: চার্সিল বলেন, যে ১৯৪৪ সালে এই সকল গুভলক্ষণ দেখা যািতেছে; কিন্তু সে জগ্ন কেহ যেন ১৯৪৫ সালেই মিত্রপক্ষের জয়লাভ বা ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে মনে করিয়া কন্ডো-ছমে শিথিলতা না আনেন।

বিভিন্ন রণাঙ্গণের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, চক্রশক্তির আশু পরাজয় অবধারিত। অথচ ইহার মধ্যে স্পষ্ট যেন একটা 'কিন্তু' বহিয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তির জয়ের সূচনা দর্শাইয়া রয়টার যতই সংবাদ পরিবেশন করিতেছে, মি: চার্সিলের কণ্ঠে যেন ততই 'যথাক্রমে যুদ্ধাবসান'-এর দিনগুলি ক্রমশ: পিছাইয়া পড়িতেছে। ১৯৪৪ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল—এই প্রলম্বিত একবৎসর একমাস মধ্যেও যে যুদ্ধেব এই দুঃসহ বিভীষিকা নিশ্চিহ্ন হইতে পারে এবং পুনরায় শান্তির আবির্ভাবে বিশ্বব্যাপী জনমানবগণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে, এমন কোন আশার চিহ্ন চার্সিল সাহেব দেখেন না। তবে কি বুঝিতে হইবে, সর্বত্রই চক্রশক্তি এখনও দুর্বল হইয়া পড়ে নাই? অথবা কি বুঝিতে হইবে যে, পূর্ববাধের জ্বালা এবাবেও অন্তর্গত দ্বারা এক পক্ষ অপর পক্ষকে সহজে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারিবেন না?

পুস্তক ও আলোচনা

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

(ক) বাংলার ছেলে (শিশুনাটিকা)

শ্রীসতীকুমার নাগ ১০

(খ) ভারতের চিঠি : পাল'বাক্কে

শ্রীঅষ্টোত্তম নাম বর্ণন ৫০

(গ) কবিতা : ১৩৫০—শামসুদ্দীন

40

(ঘ) মিছিল (কাব্য সংকলন)

21

চয়নিকা পাব্লিশিং হাউস, ৪২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

(ক) লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে সত্যীকুমার নাগ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ধনবৈষম্যের অপকৃষ্টতায় আমাদের সমাজ আজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারই পটভূমিকায় রচিত ‘বাংলার ছেলে’। একদিকে জমিদারী ধন-সংরক্ষণ, অন্য দিকে বাংলার নিষ্পেষিত প্রাণ-প্রতিভা, —শায়ত এই দুইয়ের উপর ভিত্তি করিয়া স্বল্প আয়তনে লেখক অতি নিপুণভাবে গ্রন্থের চরিত্র-গুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পাঠে ও অভিনয়ে শিল্পীরা আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই। তবে যে-ধনতন্ত্রবাদের উপরে গ্রন্থের ভিত্তি, তাহা শিগুমনে কতখানি গহীত হইবে, বলা শক্ত।

(খ) পত্রাঙ্ককরণে লিখিত 'ভারতের চিঠি'তে লেখক নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তা পাল বাকুকে উদ্দেশ্য করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য ধর্মের যেকোন নৃশঙ্ক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারশীল মননশীলতাই পরিচয় পাই! অষ্টেতবাবু সাম্প্রতিক যুগের সত্যিকারের একজন শক্তিশালী লেখক, আরতনে সংকীর্ণ হইলেও গ্রন্থখানি তাহাই প্রমাণ করে।

(গ) রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে ‘আধুনিকতা’র যে হাওয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কোনো কোনো ‘ধার করা মননশীল’ কবির রচনা অমার্জ্জনীয় অপরাধে দোষী। কবি সামন্তদ্বন্দ্বিতা সে দলের নহেন। স্বল্পদৃষ্টি ও নতুন প্রকাশভঙ্গীমার রূপ-সাধনা তাহার মধ্যে যে অভিসিক্ত, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই সাক্ষি দেয়। কবির ক্রমোন্নতি কামনা করি।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ইহাতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক যুগের অন্যান্য তেতাল্লিশজন লেখকের কবিতা 'মিছিল'এ স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি আধুনিক ইহলেও শ্রেষ্ঠতর। পরবর্তী সংস্করণে আরও উন্নত রচনা দ্বারা 'মিছিল' সমৃদ্ধ হইবে, ইহাই আশা করি।

শ্রীব্রজজিৎকুমার সেন

পুরুষ প্রকৃতি : নাটক । সুবোধকুমার দাস প্রণীত ।

সত্যবতী পাব্লিশিং হাউস, ৫-ডি, বামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।
মূল্য ২১ মাত্র।

লেখক নবীন । কিন্তু সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ উল্লেখযোগ্য ।

যে শ্রমলব্ধ সময়ের ব্যয়ে তিনি নাট্য রচনা করিয়াছেন, তাহা ছোট গল্প রচনায় প্রযোজিত হইলে লেখক কৃতকার্য হইতে পারিতেন বলিয়া মনে করা যায়। ভূমিকায় প্রকাশ, গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণে লেখক কিছুই বলিতে পারেন নাই। দ্ব্যর্থ-দায়ক। বর্তমান কাগজসঙ্কটের দিনে এইরূপ প্রকাশ-দীনতা নীতিশোভন নয়। গ্রন্থের সর্বত্র নারী-বিষয়ে পূর্ণ। সমাপ্তির দিকে অনেকটা সুর বদলাইবার প্রয়াস আছে। তরল বিষয়বস্তুর উপরে কালিকায়ের দিন অতিবাহিত। দেশ, কাল ও জীবনে আজ যে নতুন স্তরের ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে ‘পুরুষপ্রকৃতি’র বাণী জনসমাজের কানে যাইয়া পৌঁছিতে কিনা সন্দেহ! ভবিষ্যৎ রচনাকালে লেখক অনেকখানি আশ্বস্ত হইলে আশ্বস্ত হইবার কথা।

ଶ୍ରୀବୀରେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ

রাজা সীতারাম রায় (ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, কবিভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—ভারতবর্ষ
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০৩১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—
দেড় টাকা।

মুগল রাজত্বকালে বাঙ্গালার স্ববেদারদের দুর্বলতার সুযোগ
লইয়া বাঙ্গালাদেশের কতিপয় জমিদার রাজা উপাধি লয়েন।
সীতারাম সন্ন্যাসী ওরফেজের পাঞ্জা সহযুক্ত ফরমান লইয়া
বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি
অমিত বিক্রমে ফিরঙ্গী, আরাকান, মগ ও অগাঠ দস্যকে গাঁড়ন
করিয়া রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসঙ্গেও সীতারাম
রায়ের ইতিহাসও ব্যর্থতার ইতিহাস। এই ব্যর্থতার কারণ
অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, পরশ্রীকাতর বিশ্বাসঘাতক-
দলই এই জ্ঞান প্রধানতঃ দায়ী। বিশ্বাসঘাতকদলই বাঙ্গালার
ইতিহাসকে ব্যর্থতায় পর্যাবসিত করিয়াছে। সীতারামরায়ও
বিশ্বাসঘাতকদলের হাত এড়াইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত মজুমদার
ইহাই এই নাটকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকের গতি অব্যাহত
রাখার জন্য তাহাকে স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে

~~এই~~ যাটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ঘটনার অঙ্গহানি হয় নাই।

**Sajanikanta Das
Collection**

শ্রী অমল্যভূষণ সেন



লিলি বিস্কুট

স্বাদে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।

আবাল-বৃদ্ধ-বর্ণিত

সকলেই পছন্দ করেন।

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

পালি এবং পাউডার

পা ও পানীয় হিসাবে শীতস্থানীয়।

সকলে শিশু অঙ্ক, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

LILY BISCUIT CO.
CALCUTTA BOMBAY
MANUFACTURERS OF THE FAMOUS LILY BRAND BARLEY



বাংলায়
লক্ষ্মী শ্রী
ফিরে আসুক!
—লক্ষ্মী ঘি

